যাত্রা শিল্পের ইতিহাস

গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ

পুস্তক
তের, 'বি' ব্লক, বাঙুর এভিন্যু
কলকাতা সাত লক্ষ পঞ্চান্ন

প্রথম প্রকাশ : ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৬

প্রকাশক : ভারতী দত্ত/পুষ্প ; প্রযত্নে ঘোষ লাইব্রেরী

১৩ বি, ব্লক/বাঙুর এভিন্যু/কলকাতা-৭০০ ০৫৫

বর্ণ গ্রন্থণে : এফ. আর. কমেক্স

পি-৩১, সি. আই. টি রোড/কলকাতা-৭০০ ০১৪

মুদ্রণ : গিরি প্রিণ্ট সার্ভিস

বৈঠকখানা রোড/কলকাতা-৭০০ ০০৯

বঙ্গ সংস্কৃতি আর সাহিত্য ক্ষেত্রে যাঁর অবাধ বিচরণ,
যিনি দিয়েছেন অনেক কিন্তু চাননি কিছু
সেই দিব্যেন্দু সিংহকে শ্রদ্ধা আর ভালবাসাসহ—

গৌরাঙ্গপ্রসাদ

আমার কথা

চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে মোকাবিলা করতে কত লোকই তো কত জীবিকা বেছে নেয়, আমি কেন যে সাহিত্যের দুর্গম পথ বেছে নিয়েছিলাম জানি না। হঠাৎ একদিন একটা কাজ জুটে গিয়েছিল কলেজ স্ট্রীটে। ভারত ফটোটাইপ স্টুডিওতে। বড় প্রেস। এর মালিকও ছিলেন যথেষ্ট খ্যাতিমান। স্বনামখ্যাত ললিতমোহন গুপ্তের ছেলে অজিতমোহন গুপ্ত আমাকে কাজ দিয়েছিলেন একটা। এখান থেকেই প্রকাশিত হতো নিছক সাহিত্যের পত্রিকা 'তরুণের স্বপ্ন'। এরপর প্রকাশিত হয় 'চিত্রাঙ্গদা'। 'তরুণের স্বপ্নের' অন্তিম আর 'চিত্রাঙ্গদা' সিনেমা বিষয়ক পত্রিকার সূচনাকালে আমার ফটোটাইপের পরিমন্ডলে গুটি গুটি প্রবেশ। তারপর থেকে একদিকে যেমন কর্মজীবন অন্যদিকে তেমনি বাংলার সংস্কৃতির অঙ্গনে নিজেকে অন্যভাবে তৈরির কাজ চলল পূর্ণোদ্যমে। শুরু করলাম সাংস্কৃতিক সাংবাদিকতার পবিত্র দায়িত্ব পালনের ভূমিকাকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় প্রতিষ্ঠা দেবার বাসনাকে সার্থক করে তোলার সংগ্রাম। এই সময়ে 'উল্টোরথ' পত্রিকার খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অকল্পনীয়। ষাটের দশককে সবাই বলতো উল্টোরথের যুগ। এই সময়ে 'উল্টোরথ' পরিমন্ডলটি ছিল সাহিত্য ক্ষেত্রের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কদের মহামিলনের এক বিস্ময়কর রঙ্গিন চিত্রের মত। বুঝেছিলাম, এই পত্রিকার কর্ণধার প্রসাদ সিংহ এবং প্রসাদ সিংহের বন্ধু গিরীন্দ্র সিংহের যৌথ ভাব ও ভাবনা, অক্লান্ত পরিশ্রম আর সাধনায়, সমকালীন সাহিত্য ও সংস্কৃতির একমাত্র দর্পণ হিসেবে 'উল্টোরথ' প্রতি ঘর আর প্রতি মনে যতটা প্রিয় হয়ে উঠেছিল, তার চাইতে ঢের বেশি একটি 'প্রতিষ্ঠান'-এর মর্যাদা পেয়েছিল। অপ্রত্যাশিত ভাবে একদিন সেই প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করার আন্তরিক আমন্ত্রণ পেয়ে গেলাম। গিরীনদাকে আমি 'শ্রী অরূপ' নামেই জানতাম। এই নামে উল্টোরথের পাতায় অনেক লিখেছিলেন তিনি। চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার পাশাপাশি এই শ্রীঅরূপ সহকারী চিত্রপরিচালক হিসেবেও কাজ করতেন স্টুডিওতে। প্রসাদদাও লিখেছেন অনেক। প্রসাদ সিংহের একটি উপন্যাস একবার আলোড়নও তুলেছিল। সেই প্রসাদদা উল্টোরথের অভ্যন্তরীণ সব কাজ যেমন করতেন, তেমনি বাইরের জগতের যাবতীয় কাজের দায়িত্ব পালন করতেন গিরীনদা। সেই গিরীনদার করুণার দৃষ্টিই আমাকে এই প্রতিষ্ঠানে কাজ পাবার সুযোগ করে দিয়েছিল। প্রথমে কিছু কিছু নিয়মিত লেখার কাজ পেয়েছিলাম আমি। অল্পদিনের মধ্যে কেরানিও বনে গেলাম। আমার দারিদ্র্যের ছাপ চোখে, মুখে, পোষাকে এতই প্রকট ছিল যে প্রসাদদা স্পষ্ট করেই বলেছিলেন, উল্টোরথের সংগে যুক্ত থাকতে হলে বাপ ঠাকুর্দার দেওয়া নামটি বদল করতে হবে।

হলো তাই! মায়ের মলিন মুখ, বাবার শীর্ণ শরীর, মামা বাড়ির আশ্রয়ে থাকার যন্ত্রণা, পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে মাস মাইনের লোভই সেই শর্ত মেনে নিল। মরে গেল গোরাচাঁদ। জন্ম নিল গৌরাঙ্গ। প্রসাদদা আমার নাম পাল্টে নাম রাখলেন—গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ। এর পিছনে একটা উদ্দেশ্য ছিল বৈকি ! কিন্তু কখনই আত্মস্মৃতি নয় বলে এখানে সে সব কথার বিস্তারিত অবতারণা নিষ্প্রয়োজন।

উল্টোরথে নিয়মিত লিখি আবার সার্কুলেশন বিভাগে কেরানি বৃত্তিও চালিয়ে যাই। অবসর যখন থাকে তখনই নতুন কিছু করার চেষ্টা চলে। সেই চেষ্টার ফলশ্রুতি হলো, আমার লেখা একাধিক নাটক। 'জোনাকীর কান্না' 'নাটকীয়' ইত্যাদি একাংক নাটক অতি অল্প সময়ের মধ্যে নাট্যচর্চার রমরমা কালে অতি দ্রুত সমাদর পেল। ইতিমধ্যে একবার 'উল্টোরথ' পুজো সংখ্যার জন্য প্রসাদদা একটা গুরু দায়িত্ব দিলেন আমাকে। যাত্রাদলে বা যাত্রা পার্টিতে যে পুরুষেরা স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করতে করতে প্রায় কিংবদন্তীর পর্যায়ে পৌঁছেছেন তাঁদের সাক্ষাৎকার নিতে হলো

আমাকে। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সূচনা। সে এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়। আমি সেবার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম উপেন রাণী, কমল রাণী, ছবি রাণী, আর শতদল রাণীর। আসলে এঁরা হলেন ; উপেন অধিকারী, কমলকৃষ্ণ খাঁ, ছবি রায়, শতদল মাইতি। আমার ভাগ্য আমাকে যে রশিতে চিরকালের জন্য বাঁধবে দূরদর্শী প্রসাদ সিংহের নির্দেশে আমি সেই রশি দর্শন করে এলাম। এ সব ১৯৫৯ সালের কথা। এরপর আবার বিরতি। আর কোন সম্পর্কই রইল না যাত্রাপল্লীর সঙ্গে আমার। আমি তখন গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের একজন শরিক হয়ে উঠেছি। গড়েছি 'রূপাবেশ'। নাটক লিখি, নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করি, দল বেঁধে বন্ধুরা খুঁজে বেড়াই রিহার্সাল রুম। খুঁজে পাই ; অভিনয়ও করি। দ্বারে দ্বারে ঘুরে কালেক্টরির স্ট্যাম্প মারা কার্ড পুশ সেল করি। এই সময়ে নিতান্ত শিক্ষানবীশ হিসেবে আমাদের ক্লাবে এলো চকচকে, অত্যন্ত প্রাণবন্ত একটি ছেলে। সে শুধু এলো না, দেশবন্ধু পার্কের গা লাগোয়া একটা বাড়ির বৈঠকখানা ঘরে আমাদের রিহার্সাল করার ব্যবস্থা করল সে। বাড়িটিও তাদের। আসলে ছেলেটির মা ছিলেন নাট্যপ্রেমী। আমরা মাসিমা বলে ডাকতাম। মনে হতো তিনি আমাদেরও মা! তেমনি মায়ের সন্তানরা ভাল হয় বৈকি! তাই হয়েছে। সেদিনকার সেই ছেলেটির নাম বিপ্লব। আজকের চলচ্চিত্র ক্ষেত্রের বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়।

এ সবের মধ্যে একদিন অবসর সময়ে দপ্তরে বসে একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর লেখা একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি যদিও নাট্য বিষয়ক তবুও তারই মধ্যে নাট্যাচার্য 'যাত্রা'র প্রতি সুগভীর প্রীতির ছোঁয়া রেখেছিলেন। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন– 'আমাদের জাতীয় নাট্য বলতে যদি কিছু থাকে তবে তা হচ্ছে যাত্রা....।'

এরপর থেকেই 'যাত্রা'-কে জানার তীব্র আকাঙ্খা আমাকে যেন প্রতি মুহূর্তের জন্য ভরিয়ে রাখল। এরই মধ্যে ললাট লিখনে এল নতুন সুযোগ।

একদিন আমার মাসতুতো দাদা ইলু এসে হাজির। ইলুদা থাকতেন সাঁতরাগাছির রেলওয়ে স্টাফ কোয়ার্টারে। চাকরি করতেন সাঁতরাগাছির রেলইয়ার্ডে। ইঞ্জিনে বেলচা দিয়ে কয়লা জোগান দেওয়া আর ইঞ্জিন শান্টিং করার কাজ। একজন ষোল আনা ঘাম ঝরানো শ্রমিক। সব শ্রমিকদের মধ্যে যেমন আলাদা একটা মানুষ থাকে, যে মানুষটি সংসারে পিতা, ব্যক্তি জীবনে কবি, গায়ক অথবা খেলোয়াড় কিংবা প্রেমিক। ইলুদার মধ্যেও তেমনি একটা মানুষ ছিল। আর তাই ওঁরা সব শ্রমিক বন্ধুরা মিলে একটা ক্লাব করেছিলেন সাঁতরাগাছিতে। বার্ষিক 'যাত্রা থিয়েটারের ক্লাব'। বাজার থেকে পালা কিনে মহাসমারোহে ওঁরা যাত্রা করতেন পাড়ায়। মাঝে মধ্যে সিনেমার খবর থেকে সাহিত্যের খবরও থাকতো তাঁর নখদর্পণে। আর সেই কারণেই বোধ করি উল্টোরথ-এর খ্যাতির কথা শুনে আমিও ইলুদা আর তাঁর বন্ধুমহলে একজন গুণী ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিলাম।

মাসতুতো দাদা ইলু আমার ওপরে একটা দায়িত্ব চাপিয়ে দিলেন। ওঁদের ক্লাবের যাত্রাপালার নির্দেশক করলেন আমাকে। সপ্তাহে তিন দিন সাঁতরাগাছিতে গিয়ে পালার নির্দেশনার কাজ করতে হবে। রাতে দাদার বাড়িতেই থাকা। আসা-যাওয়ার খরচ বহন করবে ক্লাব। আমার মাত্র আঠারো বছরের তাজা মনটা আনন্দে নেচে উঠল। আমি রাজি হলাম।

সেই আমার প্রথম সরাসরি বাংলার প্রাচীন লোক সংস্কৃতির অন্যতম শরিক 'যাত্রা' বা পালাগানের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া। যাত্রাকে জানার যে তীব্র আকাঙ্খা আমাকে গ্রাস করেছিল, এই ভাবেই তার পথের সন্ধান পেলাম আমি। পিতৃরক্তের এই বিস্ময়কর মিলকে অস্বীকার করবে কে! সেবার বাবার মত আমিও সাঁতরাগাছি রেলওয়ে শ্রমিকদের কাছ থেকে অফুরন্ত শ্রদ্ধা আর ভালবাসার মালা পরে এলাম। ষাটের দশকের প্রথম দিকে আমার জীবনের প্রথম যাত্রা প্রীতির স্মারক চিহ্ন হিসাবে আজও সেই প্রমাণপত্রটি সযত্নে রক্ষা করে রেখেছি।

যাত্রার খবর সেই সময়ে কোন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতো না। কিন্তু সেদিনকার 'নতুন খবর' পত্রিকার সম্পাদক ধীরেন মল্লিক বেশ ফলাও করে প্রকাশ করেছিলেন সেই খবর। খবরটি হুবহু তুলে ধরছি এখানে।

সাঁতরাগাছি রেলওয়ে অপেরাপার্টি

গত ২৪শে আগষ্ট ১৯৫৯, শনিবার কলকাতা থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে সাঁতরাগাছিতে শ্রীযুক্ত সাবিত্রী মুখোপাধ্যায় রচিত 'জাগরণ' যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। কয়েক হাজার দর্শক সারারাত্র ধরে এর অভিনয় দেখেন। চিত্রসাংবাদিক শ্রীগোরা ঘোষের পরিচালনায় যাত্রাভিনয় অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয় ..."। বলে রাখা দরকার, এই সময়ে আমি গৌরাঙ্গে রূপান্তরিত হলেও, যেহেতু 'নতুন খবর' পত্রিকায় গোরা ঘোষ নামে চিত্র সাংবাদিকতা করতাম, সেই হেতু স্নেহপরবশ হয়ে ধীরেনদা এখনও আমাকে পিতৃদত্ত নাম ধরেই সম্বোধন করেন।

এ দেশে পয়সাওলা মানুষেরা যত বেশি সিনেমা বিষয়ক পত্রপত্রিকা প্রকাশে উৎসাহী, থিয়েটারের কাগজ করার ব্যাপারে ঠিক ততখানি উদাসীন। যাত্রার কাগজের তো প্রশ্নই ওঠে না। এ কথা বুঝেছিলাম তখনই যখন থিয়েটার চর্চা বা গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন জমজমাট। পরিস্কার বুঝেছিলাম, এ দেশে যে পরিমাণে প্রতিদিন নাট্যচর্চা হয়, যে পরিমাণ নাটক লেখা হয়, যত পরিমাণে ঘরে ঘরে নাটুকে ক্লাবের জন্ম দেওয়া হয়, ঠিক তত পরিমানে সিনেমার মত নাট্য দর্শক তৈরি করার চেষ্টা হয়নি। গল্প উপন্যাসের মত এ দেশের অনেক প্রকাশক যত পরিমাণে নাটক ছাপেন, তার পাঠক তত পরিমাণে তৈরি করার চেষ্টা হয়নি। নাটক পড়ার জন্য যেমন নিছক পাঠক তৈরি হয়নি, তেমনি সিনেমার পত্র পত্রিকার পাঠক তৈরি হয়েছে। নাট্য বিষয়ক পত্র পত্রিকা প্রকাশ করার উদাসীনতাই এই একটা মস্ত বড় ফাঁক রেখে গেছে। একমাত্র শম্ভু মিত্র, গঙ্গাপদ বসুদের 'বহুরূপী' পত্রিকা ছাড়া আর কোন নাট্যবিষয়ক পত্রিকা ছিলই না বলা যেতে পারে ঐ ষাটের দশকের একেবারে গোড়ায়। আর তাই ঐ সময়েই, ঐ বয়সেই আমার মনে হয়েছিল, উল্টোরথের মত ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি নাটকের কাগজ করা যায় মন্দ কি। সেই খেলা নিয়ে মেতে গেলাম। উল্টোরথের মাস মাইনের কিছুটা অংশ বাবা-মায়ের হাতে দিয়ে বাকি অংশে কাগজ করা। কয়েকটি সংখ্যা নিয়মিত বার করতে পারলে নিশ্চয়ই এখানকার নাট্যপ্রেমীরা পৃষ্ঠপোষকতা করবেন এই ছিল বিশ্বাস। তখনকার বাজারে কাগজ করা খুব একটা কষ্টসাধ্য ছিল না। না ছিল রঙের খেলা, না ছিল পি.টি.এস. বা অফসেট। এক রীম নিউজ প্রিন্ট বড় জোর ১৯ টাকা। পাইকা ড. ডি ১/১৬ সাইজ ফর্মা ছাপতে বড় জোর ২০ টাকা। আমি বৈঠকখানা থেকে ছাঁট কাগজ কিনে ছাপতে আরম্ভ করলাম 'মঞ্চজগৎ'। এর চিরস্থায়ী প্রচ্ছদ এঁকে দিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী। নান্দীকারের প্রাণপুরুষ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু ছোট ছোট বিজ্ঞাপনই দিতেন না, মনোজ্ঞ কিছু লেখাও লিখতেন। সবিতাব্রত দত্ত, মনোজ মিত্র, বিভাস চক্রবর্তী, কিরণ মৈত্র তখন গ্রুপ থিয়েটারের জগতে এক একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। এই সময়ে গোপালদা ছিলেন আমার একমাত্র শক্তি। গোপাল পাল ভীষণ নাটক পাগল। নাটককে ভালবেসে অনেক ভালবাসার ধনকে তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। গোপালদার গড়া 'শিল্পীতীর্থ' ক্লাব তখন একের পর এক নাটক হাজির করছে মঞ্চে। সেই গোপালদাকে নিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে মঞ্চজগতের আলাদা একটা পরিমণ্ডল তৈরি হয়ে গেল। অনেক কারণে, অনেক বিষয়ে 'মঞ্চজগৎ', এমন একটি ইতিহাস রচনা করল যার এই স্বল্প পরিসরে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। পুরাতন স্মৃতি রোমন্থন যখন অনিবার্য হয়ে উঠেছে, তখন দু' একটি নমুনা এখানে হাজির করা দরকার।

মঞ্চজগৎ পুরস্কার :

ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে 'উল্টোরথ' পুরস্কারের মত আমিও 'মঞ্চজগৎ' পুরস্কার

ঘোষণা করলাম। রঙমহল থিয়েটারের পাদপ্রদীপের আলোয় এ দেশে সেই প্রথম নাট্য পত্রিকার পক্ষ থেকে গুণীজনদের পুরস্কৃত করার ইতিহাস রচিত হলো। নাট্যকার বাদল সরকার, নির্দেশক-অভিনেতা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে তখনকার দিনের অনেক ব্যক্তিত্ব সেই পুরস্কার গ্রহণ করেছিলেন।

"মুক্তঅঙ্গন"-এ দান ঃ

যেবার দক্ষিণ কলকাতার "মুক্তাঙ্গন" পুড়ে গেল, সেবার চোখের জল ফেললেন অনেকেই। আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ভস্মীভূত রঙ্গমঞ্চের ছবি প্রকাশিত হলো। আমি কিন্তু সেবার নীরব থাকতে পারিনি। শুনলাম, গ্রুপ থিয়েটারের শিল্পী-কর্মীরা একজোট হয়ে দক্ষিণ কলকাতায় পথ পরিক্রমার ভিতর দিয়ে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দ্বারে দ্বারে যাবেন। ভস্মীভূত রঙ্গমঞ্চের পুননির্মাণে যে অর্থের প্রয়োজন তার কিছুটা অংশ তোলার এই পরিকল্পনা। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, 'মঞ্চজগৎ' পত্রিকার সাপ্লিমেণ্ট প্রকাশ করেই সেই মিছিলে যাব। হকারি করবো। পত্রিকা বিক্রির সব টাকা দান করবো মুক্তাঙ্গনের তহবিলে। করলামও তাই। সে মাসে বাড়িতে বরাদ্দের টাকা না দিয়ে, দু'রাত হাতিবাগানের এক প্রেসে পড়ে থেকে সেই সাপ্লিমেণ্ট যথা দিনে ভোর পাঁচটা নাগাদ ট্যাক্সি বোঝাই করে নিয়ে গেলাম মুক্তাঙ্গনের সামনে। সবিতাব্রত দত্তের কথা ভুলিনি। সবিতাদা সেই 'মঞ্চজগৎ' অনেক থিয়েটার কর্মীদের হাতে তুলে দিলেন। সকলেই বিক্রি করে পরিক্রমার পর টাকা জমা দেবেন। তেমন নির্দেশ আমার হয়ে তিনিই সবাইকে দিলেন। তাই হলো। আমি আমার অনেক শ্রম, অনেক স্বপ্ন দিয়ে তৈরি নাটকের কাগজের বিক্রির সম্পূর্ণ টাকা দিলাম কেষ্টদার হাতে। কৃষ্ণ কুণ্ডু। 'যুগান্তর' পত্রিকায় পরের দিন প্রকাশিত হয়েছিল সেই সংবাদ। সেদিন এই ভাবে নাটককে-নাট্যশালাকে ভালবাসতে গিয়ে আমার মা বাবাকে কিন্তু অর্ধাহারে, অনাহারে রেখেছিলাম। পরে নাটক আর নাট্যশালাকে ভালবাসতে গিয়ে ঋণের বোঝা মাথায় নিয়েছিলাম। পরিতাপের বিষয়, সেই দান মুক্তাঙ্গনের সেদিনকার কর্তৃপক্ষেরা দু'হাত ভরে নেবার পর মুহূর্ত থেকে আজ পর্যন্ত একটি দিনের জন্য কেউ খবর নেননি, 'মঞ্চজগৎ' বেঁচে আছে কিনা ! আমি বেঁচে আছি কি না ! এই স্বার্থপরতা, এই হৃদয়হীনতা, এই প্রেমহীনতার মধ্যে আজও আমার সেই খেলা অব্যাহত আছে। সেদিন যাঁদের ব্যবহারে আমি নিদারুণ আহত হয়েছিলাম, আজ তাঁদের মধ্যে অনেকেই নেই, আবার অনেকে কে কোথায় আছেন জানি না, কিন্তু এখনও যে নতুন খেলায় মেতে আছি সেখানেও সেই একই ছবি বিদ্যমান। যা হোক, 'মঞ্চজগৎ' যখন নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে তখন আমাদের চারপাশের দৈনিক পত্রিকায় আলাদা করে সিনেমার সাপ্তাহিক পাতা অবশ্যই ছিল, কিন্তু থিয়েটারের জন্য আলাদা কোন পাতা নির্ধারিত ছিল না। থিয়েটারের কিছু কিছু খবর মাঝে মাঝে প্রকাশিত হতো বটে, কিন্তু এ দেশে 'যাত্রা' নামক কোন বস্তু যে বিদ্যমান, তার কোন হদিশ পাওয়া যেত না মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিকের পাতায় !

প্রথম পরিচয় ঃ একদিন দুপুরে উল্টোরথ দপ্তরে বসে আছি এমন সময় এলেন এক ভদ্রলোক। তিনি প্রসাদ সিংহের সাক্ষাৎপ্রার্থী। নাম শিব ভট্টাচার্য। নাম শুনে একটু ভাবনায় পড়লাম। শোনা শোনা নাম। কোথায় শুনেছি! পরিচয় করলাম। জানা গেল, যাত্রায় ইনি একজন প্রধান কৌতুক অভিনেতা! যাত্রা জগতের কিছু কিছু সংবাদ এক টুকরো কাগজে লিখে নিয়ে বেরিয়েছেন পত্র-পত্রিকার দ্বারে দ্বারে। সংবাদপত্রের পাতায় নিয়মিত 'যাত্রার' সংবাদ প্রকাশিত হোক, এই তাঁর আবেদন। গোটা পাঁচেক যাত্রা দলের খবর তাঁর কাছে। শুনলাম, কারা যাত্রা পাড়ার উল্লেখযোগ্য দল। শিববাবুর প্রৌঢ়ত্বের রেখা পড়া মুখের দিকে চোখ রেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলাম। সেই আমার প্রথম এক যাত্রাপ্রেমিক দর্শন! ভাবতে অবাক লাগে, যে সময়ে চারদিকে শুধু স্বার্থপরতা, সেই সময়ে এ দেশের তথাকথিত শিক্ষিত-অভিজাত-প্রতিষ্ঠিত কিছু মানুষের কাছ

থেকে যাত্রার প্রতি যথার্থ মর্যাদা, যথার্থ শ্রদ্ধা আদায় করে নিতে একা শিব ভট্টাচার্যের মতো একজন মানুষ যেন মরিয়া হয়ে উঠেছেন! আমি যেন অকস্মাৎ কলালক্ষ্মীর আশীর্বাদী প্রসাদ লাভ করে বসলাম!

নিজের পরিচয় দিলাম। 'মঞ্চজগৎ' পত্রিকার কথা বললাম। বললাম আমার স্বপ্নের কথা। যাত্রার কথা সব কাগজেই নিয়মিত লিখতে চাই, অন্ধকারে ঢাকা পড়ে থাকা এক শিল্প প্রতিমার আবরণ উন্মোচন করতে চাই! শিব ভট্টাচার্যও যেন সহসা খুশিতে ঝলমল করে উঠলেন। তিনি হলেন আমার পথ নির্দেশক!

যাত্রা অঙ্গনে প্রবেশ ঃ এবার বিডন স্ট্রীট ধরে সোজা এসে দাঁড়ালাম রবীন্দ্রকাননের সামনে। বছর খানেক আগে একবার-দু'বার এখানে আসতে হয়েছিল 'পুরুষরাণী'দের খোঁজে। এবার এলাম জীবনের সন্ধানে! শিব ভট্টাচার্য আমাকে 'ক্যালকাটা অপেরা'র গদিতে আসতে বলেছিলেন। আমার দু'চোখে তখন পুরাতন কলকাতাকে ভাল করে দেখার বিস্ময়! পুরাতন কলকাতার চেহারা তখনও স্পষ্ট ছিল চিৎপুরে। এখনও আছে। মনের গভীরে শিব ভট্টাচার্যকে খোঁজার তাগিদ! ট্রাম লাইন ধরে ডানদিকে চলতে থাকলাম আমি। এই সেই বটতলার বইয়ের জগৎ! এক সময়ে বটতলার বই বলতে আমার মনে একটা ছবি আঁকা হয়ে গিয়েছিল। চিৎপুরের কোথাও একটা বটগাছ আছে, যার ছায়ায় পাওয়া যায় কলেজ স্ট্রীটের পুরাতন বইয়ের মত অজস্র পুরাতন বই, যাকে সবাই বলে বটতলার বই! কিন্তু চোখের সামনে অন্য ছবি। বড় বড় বইয়ের দোকান। শো কেসে ঠাসা ভোলানাথ রায়, ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ, পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় থেকে ব্রজেন দের পালা বই, নাটক, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা-চন্ডী-মেয়েদের ব্রতকথা থেকে পঞ্জিকা। খেরো খাতার দোকান। ডাইনে-বাঁয়ে খুপরির মতো দোকান। দোকানে বড় বড় লোহার সিন্দুক, দেওয়ালে লাল শালুর কাপড় টাঙ্গানো। এঁরা নাকি এ তল্লাটের ত্রাণ কর্তা। গরীবের মা-বাপ। এই খুপরির মধ্যে সোনা-রূপোর গয়না-বাসনের বন্ধকী কারবার! এরপর সেই বিখ্যাত বিদ্যালয়। ওরিয়েন্টাল সেমিনারী। গিরীশচন্দ্র ঘোষ থেকে কে না পড়েছেন এই স্কুলে! এ সব কিছু ফেলে রেখে এগিয়ে যেতে যেতে নজরে পড়ল 'ক্যালকাটা অপেরা'। একটা বিশাল বাড়ি। বাড়ি তো নয়, যেন পুরাতন কলকাতার স্থাপত্য শিল্পের এক ফসিল। পায়ে পায়ে ঢুকলাম বাড়ির মধ্যে। একটু একটু করে অন্ধকারে প্রবেশ করলাম। স্যাঁত-স্যাঁতে পরিবেশ। কেমন যেন সোঁদা-সোঁদা একটা বিশ্রী গন্ধ। একটু ভিতরে ঢুকেই পেলাম গদিঘর। দিনের বেলায় হ্যারিকেনের আলো! এখন যেটি আর্য অপেরার ঘর, এখানেই ছিল ক্যালকাটা অপেরা। গদিতে পা রেখে দেখলাম এক বৃদ্ধকে। পরণে ময়লা গেঞ্জি আর লুঙ্গি। মাথায় একরাশ ঘন সাদা ধবধবে চুল। ভদ্রলোক বসে আছেন পোষাক বাক্সের ওপরে। দৃষ্টি তাঁর প্রাইমাস স্টোভের দিকে। একটা বাটিতে কিছু চাপিয়ে দিয়ে সেদিকে চোখ রেখে কী যেন ভাবতে ভাবতে একেবারে তন্ময় হয়ে গেছেন। ভদ্রলোকের নাম উপেন অধিকারী। চিনলাম ওঁকে। বছর খানেক আগে উল্টোরথ পত্রিকায় যাঁদের নিয়ে লিখেছিলাম ইনি তাঁদের একজন। ব্যাপারটা একেবারে বিস্মরণ হয়ে গিয়েছিল। উপেনবাবু আমাকে বসতে দিলেন। বার বার শুধু কৃতজ্ঞতা জানাতে থাকলেন। বললেন, সারাটা জীবন এই অন্ধকারে থেকে একটা পুরাতন ঐতিহ্যকে আগলে রেখেছি। সেই কোন ছেলেবেলায় ঘর পালিয়ে ঢুকেছিলাম কৃষ্ণযাত্রার একানে ছেলের দলে, তারপর কত পালায়-কত-চরিত্রে অভিনয় করে এখনও পাহারা দিয়ে চলেছি অপেরার বাক্স প্যাঁটরা। ছেলেবেলায় ভাবতাম যাত্রা দলে থাকতে পারলে জীবনটা ধন্য হবে, কত গ্রামে গ্রামে, কত রাজবাড়িতে ঘোরা যাবে! এখন ভাবছি, কবে মরবো! এখানে বসে, ভগবানের কাছে বলি, ভগবান এমন সুন্দর আর্টের জগৎকে কেন অন্ধকারে রেখেছ, তুমি এই অন্ধকার মুক্ত কর! আগামী দিনে যাত্রার সবাই যেন সুখে থাকে— ; সেই উপেনবাবু বার বার বললেন,—"আমার

কথা কোন কাগজে লেখা হবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। আপনি লিখেছেন, সে কী কম বড় কথা"!—আমি উপেনবাবুর কাছে শিব ভট্টাচার্যের কথা বললাম! শিববাবু আমাকে এখানে আসতে বলেছেন। তাঁকে দেখছি না তো!–

উপেনবাবু বললেন,—"ঐ একটা উঁচু দরের অভিনেতা! ওঁরও কেউ নেই। থাকে বিডন স্ট্রীটে ভাইয়ের কাছে! যাত্রাকে জাতে তোলার জন্য ওঁর একটা চেষ্টা আছে! অনেক পড়াশুনো করে! বাড়িতে পুরোনো দিনের অনেক পত্রিকা! হলে হবে কী, যাত্রার পাপ থেকে সেও তো মুক্ত নয়–, আসবে এখুনি–"

কথা শেষ করার আগেই শিবদা এলেন। আমাকে দেখে খুশিতে ঝলমল করে উঠলেন! বললেন, 'বুঝেছ উপেন, এবার মনে হচ্ছে অন্ধকার ঘুচবে!' –তারপর বললেন, 'এ দেশের শিক্ষিত মানুষরা যদি একবার জেগে ওঠে, যাত্রা যে কী তা যদি বুঝবার চেষ্টা করে, বাংলার লোকশিল্প বলতে যা যা বোঝায় তার মধ্যে এই যাত্রা একটা বহু পুরাতন ধারার ধারক ও বাহক এই কথাটা যদি তাঁরা একবার উপলব্ধি করতে পারেন তা হলে, এই যাত্রা আর এমন ধারা অন্ধকারে থাকবে না–; এদিকে আপনি যাত্রা নিয়ে লেখালেখি করার জন্য যেমন অনেক দিন ধরে ভাবছেন, যাত্রা পাড়ায় চলে এসেছেন, ওদিকে শুনলাম বিশ্বরূপার 'সেতু' নাটকের নাট্যকার কিরণ মৈত্র, আনন্দবাজারের প্রবোধবন্ধু অধিকারী আরও জনাকতক মানুষ নাকি যাত্রা পাড়ায় ঢুকে পড়েছে- ; আমার মনে হচ্ছে এবার যাত্রা জাতে উঠবে–।'

এই প্রসঙ্গে প্রবোধবন্ধু অধিকারীদের যাত্রা পাড়ায় প্রবেশের নেপথ্য কাহিনী একটু শুনিয়ে রাখার বাসনা জাগছে। মনে রাখতে হবে, এই যাত্রা পাড়ার মানুষেরা একদিন প্রবোধদাকে তাঁদের পিতৃশ্রদ্ধায় বরণ করেছিলেন। মনে রাখতে হবে, এঁরাই প্রবোধদাকে বসিয়েছিলেন সব চাইতে উঁচু আসনে। মনে রাখতে হবে, প্রবোধবন্ধু অধিকারীই এক সময়ে যাত্রাকে কেমন করে জাতে তুলতে হবে তার পাঠ শিখিয়েছিলেন এই জগতের মানুষদের! থাক, সে সব কথা বিস্তারিত বলব পরে।

কৈফিয়ৎ ঃ

'আমার কথা' আসলে কৈফিয়ৎ।

বঙ্গদেশ তথা অবিভক্ত বঙ্গদেশের সুপ্রাচীন যাবতীয় লোক সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান শরিক, লোক সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান অঙ্গ 'যাত্রা' বা পালাগানের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বা চরিতাভিধান রচনা, এ দেশের যে পণ্ডিত সমাজের সামাজিক দায়বদ্ধতার নজির হওয়া অনিবার্য ছিল, কার্যতঃ তা হয়নি। না হওয়ার চাইতেও যা মর্মান্তিক তা হলো, এই বিষয়টির ওপরে গুরুত্ব আরোপেও কোথায় যেন বড় বেশি অনীহা তাও লক্ষ্য করা গেছে। তবে সুখের কথা হলো, যাত্রা বা পালাগানের পূর্ণাঙ্গ তথ্যবহুল, ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণধর্মী ইতিহাস রচনার দায়ভার যিনি সুসম্পাদন করেছেন তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক, সরাসরি যাত্রা জগতের প্রেমিক ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। সেই গ্রন্থের নাম "বাংলার লোকনাট্য সমীক্ষা", যা 'থিসিস' হিসেবে চিহ্নিত। এ ছাড়া বাংলার বহু সাহিত্যে, দেশ-কাল-সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাস, সমালোচনা, পর্যালোচনা, ইতিবৃত্ত রচনার ক্ষেত্রে অবশ্য আমাদের পূর্বসূরি বহু পণ্ডিতপ্রবর ঐতিহাসিক, প্রাবন্ধিক, সমালোচক প্রয়োজনের অনুশাসনে "প্রসঙ্গ ঃ লোকসংস্কৃতি"-র অঙ্গ হিসেবে উত্থাপন করেছেন 'যাত্রা' বা পালাগান। আবার এমন কয়েকজন মানুষের কথা জানি, যাঁরা স্ব স্ব দৃষ্টিকোণ থেকে এঁকেছেন যাত্রার কিছু কিছু আদিপুরুষের জীবন ও কর্মের ছবি। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই স্মরণীয় নাম হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য। শ্রীভট্টাচার্যের সীমাহীন শ্রমের ফসলের নাম "যাত্রাগানে মতিলাল রায়"।

এর পরেও এই গ্রন্থ রচনার ধৃষ্টতা কেন তার কৈফিয়ৎ হিসেবে যদিও উপস্থাপিত এই গ্রন্থই যথেষ্ট, তবুও যে কথা বলার আছে তা হলো, নিতান্ত অল্প বয়স থেকে যে যাত্রাকে গভীরভাবে জানার তীব্র আকাঙ্খা ছিল, সে যাত্রার সার্বিক কল্যাণের জন্য জীবনের সেরা সময়টাই উৎসর্গ করে উপলব্ধি

করেছিলাম "যাত্রা মাতৃকা"-র অস্তিত্ব বিপন্ন। ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে যাত্রা নিছক 'পণ্য' হিসেবে বিকিয়ে যাচ্ছে বাজারে অকাতরে। প্রেমহীন, বিবেকহীন সভ্যতায় লাভ আর লোকসানের প্রেক্ষাপটে "যাত্রা মায়ের ভাবমূর্তি" অবহেলিত। অন্ধকারে বিসর্জিত! সুতরাং এই গ্রন্থ আমার যাত্রামাতৃকার বন্দনা। যাত্রার এই ইতিহাস বা চরিতাভিধান আমার সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতীক, সাহিত্যচর্চা-সাংস্কৃতিক সাংবাদিকতার ধর্মপালনের নজির। এই নজির সৃষ্টির মূলে আমি ঋণী শুধু 'যাত্রা মা'-এর তাঁদের যাঁদের কাছে রেখে যাওয়া সূত্রে আমার অনুসন্ধিৎসু জীবনবেদের পূর্ণতা!

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ "আজকাল" দৈনিকের প্রাক্তন সম্পাদক, পরম শ্রদ্ধেয় গৌরকিশোর ঘোষের কাছে, কারণ এই দৈনিকের জন্মলগ্নে তিনি স্ব সিদ্ধান্তে আমার ওপর ন্যস্ত করেছিলেন এই দৈনিকের পাতায় "প্রসঙ্গ যাত্রা"-তুলে ধরার। সেই প্রথম সংখ্যা থেকে একটানা তের-চোদ্দ বছরের মধ্যে অনেক পরিবর্তন-বিবর্তনের ভিতরে ছিলাম অপরিবর্তিত। ১৯৯৪-এর একটি সময় থেকে আমার বিসর্জনের বাদ্যি আমি শুনেছি। তারপরই বিসর্জন! যাত্রার প্রতি ৩৬ বছরের নিঃস্বার্থ ভালবাসা থেকে হৃদয় উৎসারিত একটি প্রতিবাদই নিয়ে এল অকাল বিসর্জনের ইংগিত। কোন স্বার্থপর, লোভী বিবেকের অনুচ্চারিত ঈর্ষা আর গোপন ষড়যন্ত্রে যাত্রা সংসারে সর্বজন স্বীকৃত, সর্বজন বন্দিত 'যাত্রা মাতৃকার পুরোহিত' নিধন হলো সুসম্পাদিত! চাটুকারিতা আর স্তাবকতার স্মরণীয় পৃষ্ঠপোষকতায় 'আজকাল' আমরা কলমকে দিল মুক্তি। সেই মুক্তি আমার দারিদ্র্যের শক্তিকে করল মহান। এই মুক্তি প্রকারান্তরে আমার দীর্ঘ শ্রমের ফসল তোলার সুযোগ করে দিল। যে কাজ শুরু করেছিলাম বছর পনের আগে, সেই কাজ উদয়-অস্ত শ্রম দানে সমাপ্ত করেছি বিগত দুই বছরে। চিরকৃতজ্ঞ রইলাম 'আজকাল'-এর সকলের কাছে। শুধু মানসিক প্রশান্তি খুঁজে পেলাম একটি বাণীতে—"অপরাধী জানিল না কিবা তাহার অপরাধ, শাস্তি হইয়া গেল!"...

যাত্রা জগতের কয়েকজন কর্মীবন্ধুর শ্রদ্ধা আর ভালবাসা আজও যাত্রা সংসারে আমাকে মাঝে মাঝে টানে, তাই চির কৃতজ্ঞ তাঁদের কাছে। আমি ধন্য, কৃতার্থ বিশেষভাবে যাত্রা সম্রাজ্ঞী জ্যোৎস্না দত্ত, শিল্পী অসীমকুমার, অসীম জায়া সীমা বোস, শিল্পী রুমা দাশগুপ্ত, রাখাল সিংহ, মনোজ মিত্র, প্রশান্তকুমার, দুলাল চট্টোপাধ্যায়, অনল চক্রবর্তী এবং কালিপদ দাসের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার জন্য। ওঁদের বিশ্বাস, সাহায্য, সহযোগিতা এবং সহমর্মীতা জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত আমার অলঙ্কার হয়ে থাকবে।

'পুষ্প' প্রকাশনীর কর্ণধার শ্রীমতী দত্ত এবং তাঁর মেরুদণ্ড, আমার সুপ্রিয় বন্ধু আশিস দত্তের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার নেই। এই বিশাল গ্রন্থ প্রকাশ শ্রী ও শ্রীমতী দত্তের একটা বড় ঝুঁকি তাতে কোন সন্দেহ নেই। কৃতজ্ঞতা জানাই অল বেঙ্গল পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি, প্রকাশক ও অগ্রজপ্রতিম দ্বিজদাস কর, বর্তমান সভাপতি, প্রকাশক বন্ধু অভয় বসু, সম্পাদক স্বপন বসুকে, এঁদের উৎসাহ দান এবং নানা সহযোগিতা স্মরণযোগ্য।

পরিশেষে এমন একজন সপ্রতিভ-তীক্ষ্ণধী প্রকাশক বন্ধুর কথা বলি যাঁর কাছে আমার সুখ-দুঃখের জীবন-দলিলের এমন কিছু পাতা গচ্ছিত আছে, যেখানে আমার সাহিত্য ও কর্ম ভাবনার ইতিবৃত্ত স্পষ্ট, এবং যাঁর উপলব্ধি আমাকে তাঁর অনেক কাছে এনে দিয়েছে, তিনি অনুজপ্রতিম স্বপন ঘোষ। এই গ্রন্থ প্রকাশে তাঁর নেপথ্য অবদান স্মরণযোগ্য।

যাত্রা জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত আলোকচিত্রী রবি দাস, টুলু দাস, ঢুলু দাস, রতন পোদ্দার, বাবু ঘোষ এবং নিমাই ঘোষের কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম। কৃতজ্ঞতা জানাই দুর্গাপুর নিবাসী স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক-গবেষক মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়কে, শিল্পাঞ্চলের 'যাত্রা প্রসঙ্গ'-র জন্য।

এই সুবৃহৎ ইতিহাসের পাতায় অতীত ও বর্তমানের সমস্ত কর্মী, শিল্পী, কলাকুশলী, প্রযোজক ও মালিকদের অমর করে রাখার জন্য আমার কৃতিত্বের চাইতে কৃতিত্ব ওঁদের প্রতিভা আর কর্মকুশলতার। সুতরাং কৃতার্থ হব, সার্থক হব যদি আগামী দিনের গবেষক-ছাত্র-ছাত্রী এবং যাত্রা প্রেমিকদের সামনে কোন শূন্যস্থান পূর্ণ করেছি বলে এই গ্রন্থ সমাদৃত হয় কোনদিন।

গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ

সূচীপত্র

ফণি মতিলাল ষষ্ঠীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মাখন সমাদ্দার দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মনোরঞ্জন চক্রবর্তী ফণি গাঙ্গুলী গোপাল চট্টোপাধ্যায় সুজিত পাঠক পূর্ণেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় শিব ভট্টাচার্য ভোলা পাল পঞ্চু সেন পান্না চক্রবর্তী ননী ভট্ট অনাদি চক্রবর্ত বিজন মুখার্জী নির্মল অধিকারী অভয় হালদার রাখাল সিংহ মোহিত বিশ্বাস স্বপনকুমার অরুণ দাশগুপ্ত অসীমকুমার অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় অশোককুমার শ্যামল ঘোষ সমীর লাহিড়ী নীলোৎপল দে শ্যামল সেন শক্তি মুখার্জী ভবানী সরকার রাজকুমার গোপাল হালদার মনোজ মিত্র মনোজকুমার শেখর গাঙ্গুলী অরম বোস দেবগোপাল মধু ব্যানার্জী সুজনকুমার বীণা দাশগুপ্ত ছন্দা চ্যাটার্জী মীনাক্ষী দে বর্ণালী ব্যানার্জী অঞ্জনা ব্যানার্জী তারারাণী পাল মিতা চ্যাটার্জী বেলা সরকার লীনা চক্রবর্তী লতা অধিকারী স্বপ্নাকুমারী ছবি রায় ফিরোজাবালা অঞ্জলি ভট্টাচার্য চিত্রা মল্লিক সাহানা বোস সীমা বোস ছবি চ্যাটার্জী শিখা বোস মৌসুমী চ্যাটার্জী শ্যামলী মজুমদার শর্মিলা পাল জ্যোৎস্না দেব ইন্দিরা দে কল্যাণী ঘোষ অন্যান্য শিল্পীর তালিকা কানু বন্দ্যোপাধ্যায় বিনোদ ধাড়া ভক্ত মল্লিক তারা ভট্টাচার্য বলাই হালদার ক্ষিতিশ রায় গুরুদাস ধাড়া।

পৃষ্ঠা ৪৩১-৪৪৪

যাত্রাগানের সাজা রানী

রেবতী রানী উপেন রানী যতীন রানী ছবি রানী সন্তোষ রানী শতদল ক্ষিতীশ রানী চপল রানী ফণি রানী মৃত্যুঞ্জয় রানী জনার্দন রানী টগর রানী রাখাল রানী বাবলি রানী হরিপদ রানী

পৃষ্ঠা ৪৪৪-৪৫৩

রামকৃষ্ণ অপেরা ঃ বেলা সরকারের চিকিৎসা গোরাচাঁদ রায় শিবদাস মুখার্জী শমভু বন্দ্যোপাধ্যায় বিনোদকুমার অনল চক্রবর্তী সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় দেবকুমার ব্যানার্জী জহর রায় সুব্রত বসু অনিল রায় সুনীল চৌধুরী কালীদাস আচার্য রুমা দাশগুপ্ত বিজলী দে মধুছন্দা

পৃষ্ঠা ৪৫৩-৪৬৫

সুর-সংগীত-সংগত-নৃত্য

রাজ্যেশ্বর নন্দী মহেন্দ্র দত্ত অমিয় ভট্টাচার্য পঞ্চানন মিত্র অজিতকৃষ্ণ বসু পশুপতি ভট্টাচার্য প্রশান্ত ভট্টাচার্য (বড়) প্রশান্ত ভট্টাচার্য শিবেশ বিশ্বাস সুধীর বসু স্বপনকুমার পাকড়াশী পার্থসারথি ভট্টাচার্য চিত্তশঙ্কর

পৃষ্ঠা ৪৬৬-৪৮৭

যাঁদের কথা বলে না কেউ

অজিত বিশ্বাস অবনী বাগ আনন্দ চক্রবর্তী দীপক ভট্টাচার্য চিত্ত বসু চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঝণ্টু দাস বাজেন মণ্ডল রমেন পালিত ঃ এরোপ্লেন পর্ব তারাপদ ঘোষ দিলীপ মুখার্জী প্রদীপ সাহা প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় হারাধন নন্দী বাসুদেব সাহা বিনোদ সাহু শক্তিপদ দাঁ শম্ভু মুখার্জী (ম্যান) জানকী মেদ্দা জগদীশ হালদার কার্তিক মুখার্জী শঙ্কর কোলে শিবনাথ পাল সুধীর মুজুমদার সতীশ নন্দী সনৎ মুখার্জী রণজিৎকুমার রায় হিমাংশু রায় হারাধন রায় দেবু হাজরা মিলন দত্ত অন্যান্য

পৃষ্ঠা ৪৮৮-৪৯০

প্রসঙ্গ সাজঘর ঃ রন্ধনশালা

পৃষ্ঠা ৪৯০-৪৯৭

বুকিং এজেন্ট

অনিল ভাণ্ডারী আশুতোষ গাঙ্গুলী অজয় ঘোষ (চিনা) গোষ্ঠবিহারী ঘোষ নিরাপদ দাস কুলদা গাঙ্গুলী জীবন মুখার্জী নারায়ণ মণ্ডল সাধন মুখার্জী সন্দীপ ভাণ্ডারী

পৃষ্ঠা ৪৯৯-৪৯৯

আলোক সম্পাত / আলোক নিয়ন্ত্রণ

তাপস সেন কনিষ্ক সেন অন্যান্য

পৃষ্ঠা ৪৯৯-৫০৬

পালা উদ্বোধনের পট পরিবর্তন রূপ সজ্জা : হরিপদ চন্দ পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় নাথ কোম্পানি ড্রেস হাউস রূপসজ্জা কুটির : সুধীরকুমার দে পি. জি. কুমার—পশুপতি মিত্র বামনদাস দত্ত অন্যান্য

পৃষ্ঠা ৫০৬-৫১০

অস্ত্রশস্ত্র : উইগ

ক্যালকাটা উইগ উলুবেড়িয়া লাভলি উইগ হাউস নিতাই কুণ্ডু

পৃষ্ঠা ৫১০-৫১৩

গণেশ মুখোপাধ্যায় শম্ভু ভট্টাচার্য

পৃষ্ঠা ৫১৩-৫১৮

স্থিরচিত্র প্রসঙ্গ বিজ্ঞাপন প্রচার যানবাহন রেকর্ড ক্যাসেট

পৃষ্ঠা ৫১৮-৫৫৩

সমাজ ও জনকল্যাণে যাত্রার অবদান আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত যাত্রাদলের তালিক : কলকাতা। **হাওড় জেলা** বেলঘরিয়া ঐকতান ক্লাব আরতি কটন মিলস রিঃ ক্লাব ফলতা খেয়ালী সংঘ তাড়দহ রাস কমিটি ঠাকুরাণীবেড়িয়া প্রভাত সংঘ চড়িয়াল বয়েজ ক্লাব উজালী স্বাগতা সাংস্কৃতিক সংঘ বজবজ যুগযাত্রী শক্তি সংঘ বাওয়ালী সংখ্যসংঘ বসিরহাট স্মৃতি সংঘ কোন্নগর মিলন সংঘ শ্রীপুর স্টাফ ক্লাব। **মেদিনীপুর জেলার** বহু ক্লাব ও সংগঠন **নদিয়া** জেলার বহু ক্লাব ও সংগঠন **হুগলী জেলার** বহু ক্লাব ও সংঠন হাওড়া কৃষ্ণনগরের আনন্দ সমাজ দঃ চব্বিশ পরগণার আরও কিছু প্রতিষ্ঠান এবং যাত্রা শিল্পীকর্মী কাকদ্বীপের সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং যাত্রা **মেদিনীপুর :** প্রসঙ্গ যাত্রা আঞ্চলিক যাত্রার সেকাল ও একাল (রামনগর, কাঁথি, দীঘা) ইত্যাদি মেদিনীপুরের সৌখিন যাত্রা সম্প্রদায় বিশিষ্ট নায়েক, ডেকরেটিং কোম্পানি **বর্ধমান জেলা :** জামুরিয়া নেতাজি সংঘ কাইতি তরুণ সংঘ কাটাগড়িয়া তরুণ সংঘ ড্রেস-মেকআপ কোম্পানি আলোক শিল্পী রুণু অধিকারী কাটোয়া শ্রীখণ্ড এবং যাত্রা অন্যান্য দল, পোশাক, স্টেজ-লাইট সমিতি ও সমাজসেবী সংগঠন দুর্গাপুর রবীন্দ্র পরিষদ উজ্জ্বল সংঘ খনি ও শিল্পাঞ্চলের যাত্রা ভাবনা

পৃষ্ঠা ৫৫৪-৫৫৫

নদিয়া : তারক দাস স্মৃতি নাট্য সংঘ যুব গোষ্ঠী। হুগলী : আরামবাগ : দুর্গাদাসবাবু অন্যান্য পোশাক কোম্পানি

পৃষ্ঠা ৫৫৫-৫৫৮

বাঁকুড়া : রামকিঙ্কর বিষ্ণুপুর।



শুরু সেই জব চার্ণক ঃ

কলকাতা। সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতিকলাসঙ্গম। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একদা যে রাখীবন্ধনের ভিতর দিয়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানবতার মেলবন্ধন রচনা করেছিলেন, বিংশ শতাব্দীর অন্তিমকালে কলকাতার সামাজিক প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও শিল্প-সংস্কৃতির স্তরে যতই অস্থিরতা, হতাশা-নৈরাজ্য থাক, এ কথা স্বীকার করতেই হয়, এ সব কিছুরই মধ্যে আজও পরোক্ষভাবে কলকাতা তথা গোটা পশ্চিমবঙ্গে নানা চেতনার রঙে রঞ্জিত জীবনে প্রতি মুহূর্তে চলছে সেই রাখীবন্ধন।

এই কলকাতার জন্ম ও নামে বিতর্ক থাকলেও 'সুতানুটী-গোবিন্দপুর-কলিকাতা' এই তিনে মিলে এখন শুধু আমাদেরই 'কলকাতা'। এই যে মিলে মিশে এক হয়ে তিলে তিলে তিলোত্তমা, তা শুধু মানুষের বা গণদেবতার অবদান। কলকাতার সামাজিক প্রেক্ষাপটে যে গণ অভ্যুত্থান, যে সার্বিক নব চেতনার জাগরণ, যে সভ্যতার ক্রমবিকাশ তারই মূল্যায়ন সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ৩০০ বর্ষপূর্তি উৎসব। মহৎ প্রয়াস। অবহেলিত শুধু লোকসংস্কৃতি।

কলকাতার ৩০০ বর্ষপূর্তি উৎসবের পরিপ্রেক্ষিতে যাঁরা যেখানে যে কর্মযজ্ঞই করে থাকুন, কলাভূমি কলকাতার সংস্কৃতি-প্রেক্ষাপটের যে ক্রমবিবর্তন, গ্রামীণ সামাজিক প্রেক্ষাপটে লোকগাথার যে গৌরব, বিশেষ করে বঙ্গদেশের প্রাচীনতম লোকসংস্কৃতির শরিক 'যাত্রা'র ক্রমবিবর্তনের যে রূপ আজকের মানুষের একটা বড় অংশকে আন্দোলিত করেছে, যে 'যাত্রা' আজকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, এই ৩০০ বছর উৎসব পালনের প্রবল উদ্দীপনার মধ্যে বলতে দ্বিধা নেই সেই 'যাত্রা' প্রসঙ্গ থেকেছে অবহেলিত। এই অবহেলা অনিবার্য ভাবেই অবজ্ঞার নামান্তর।

কলকাতা তথা অবিভক্ত বঙ্গদেশের মাটিতে যাবতীয় লোকসংস্কৃতির ইতিহাস সুপ্রাচীন। সেই সুপ্রাচীন লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রধান অঙ্গ 'যাত্রা'। সেই যাত্রার উৎস এবং ক্রমবিস্তার প্রসঙ্গে সহস্র জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল আজ সর্বস্তরের অধিকাংশ মানুষের মনে জমাট বেঁধে আছে। আমার লক্ষ্য, কলকাতার জন্মকাল থেকে অর্থাৎ জব চার্ণকের সুতানুটীর মাটিতে পা রাখার দিন থেকে কলকাতার যে ক্রমোন্নতি, অগ্রগতি, তার সঙ্গে বঙ্গদেশের লোকসংস্কৃতির নাড়ির সম্পর্কের বন্ধনে সমান গতিতে যে জাগরণ, তার একটা রচনাগত ছবি এঁকেছি মাত্র। আসলে কলকাতার ৩০০ বছর বয়স প্রাপ্তির সঙ্গে সমান তালে 'যাত্রা'র উত্তরণেরও ৩০০ বছর অতিক্রান্ত। এ ইতিহাসের দায়বদ্ধতা। ইতিবৃত্তের ধর্ম। আমার এই কর্মকান্ড হয়তো ইতিহাস নয়। হয়তো ইতিবৃত্ত। অথবা বাংলা যাত্রার চরিতাভিধান। শুরু সেই জব চার্ণক। ....

প্রসঙ্গ বঙ্গদেশ ও ভাষা ঃ

অবিভক্ত বঙ্গদেশের মধ্যে এখন আমরা যে অঞ্চলকে পূর্ববঙ্গ বলে থাকি, মূলতঃ সেই অঞ্চলেই ছিল বঙ্গজাতির বাস। আর সেই কারণেই একমাত্র ঐ অঞ্চলই ছিল বঙ্গদেশ। এখন আমাদের যে পশ্চিমবঙ্গ তার প্রায় সবটাই ছিল রাঢ় ও সুহ্মদেশ। এখন যা উত্তরবঙ্গ নামে চিহ্নিত তার নাম ছিল পুণ্ড্রবর্ধন। এখানকার অনার্য জাতিদের বলা হতো পুণ্ড্র, বোধ হয় তা থেকে ঐ নাম। পরবর্তীকালে বঙ্গ, রাঢ়, সুহ্ম, পুণ্ড্রবর্ধন মিলেই বঙ্গদেশ।

বাংলা দেশে আর্যদের প্রবেশ ঘটেছিল খ্রীষ্টজন্মের কয়েক শতাব্দী আগে। আর এই আর্যদের প্রাচীনতম ভাষা থেকেই প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষার জন্ম।

বাংলা সাহিত্যের আদি কথা ঃ

বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ তথ্যনির্ভর জন্ম বৃত্তান্ত প্রকৃতপক্ষে রহস্যাবৃত। তবে গবেষকদের সিদ্ধান্ত মতে বাংলা ভাষায় লেখা প্রাচীনতম যে বইয়ের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল তার নাম 'চর্যাপদ' বা 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়'। গবেষক ভূদেব চৌধুরীও এমন কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেননি যা থেকে এই বই বাংলা ভাষাতেই যে লেখা তা প্রমাণ করা যায়। 'পদ' বলতে ধরা যায় 'গীত' বা 'কবিতা', সেদিক থেকে এই বইটিকে গীতি-কবিতা সংকলন বলা যেতে পারে। পন্ডিতজনদের মতে চর্যাপদাবলীর প্রধান অংশ মূলত অপভ্রংশ ভাষায় লেখা। আর সেই লেখার মধ্যে বাংলার পূর্বসূরী মাগধী অপভ্রংশের চেয়ে হিন্দির পূর্বরূপ শৌরসেনী অপভ্রংশের পরিমাণ বেশি।

যেহেতু আমি বাংলার লোকসংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ 'যাত্রা'-র ক্রমবিবর্তনের ছবি আঁকতে চেষ্টা করছি, সেই হেতু বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ অনিবার্য, কারণ এই বিবরণের সঙ্গে বিবর্তন সম্পৃক্ত। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রসঙ্গে যে চর্যাপদাবলী বা চর্যাগীতির কথা উল্লেখ করেছি তার কথা ছেড়ে দিলেও আমরা বিভিন্ন পন্ডিতবর্গের রচনায় আদিকালের বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য প্রামাণ্য নিদর্শন অনেক পাই। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সেই ধরনের এমন একটি দুর্লভ তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন, যা শ্রদ্ধেয় ভূদেব চৌধুরীর রচনার ভিতর থেকে এখানে হাজির করছি।

রাজা তৃতীয় সোমেশ্বর ভূলোকমল্ল ছিলেন মহারাষ্ট্রের চালুক্যবংশীয় নরপতি। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ১১২৯ খৃষ্টাব্দে 'মানসোল্লাস' বা 'অভিলাষার্থ চিন্তামণি' নামে একখানি বিশ্বকোষ-গ্রন্থ সংকলিত হয়। তাতে সংগীত বিষয়ক একটি আলোচনা আছে,—নাম 'গীত-বিনোদ'। শ্রদ্ধেয় সুনীতিকুমারের সিদ্ধান্ত, এই আলোচনার কিছু কিছু শ্লোক আদিমকালের বাংলাভাষায় লেখা।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন আলোচিত প্রাচীন বাংলা রচনার মধ্যে উল্লেখ আছে শূন্যপুরাণ, ময়নামতীর গান, গোরক্ষবিজয়।

শূন্যপুরাণ রাঢ়ের গ্রামাঞ্চলে পূজিত ধর্মঠাকুরের পূজা-পদ্ধতি। এই গ্রন্থ বিশেষভাবে বলা যায় রামাই পন্ডিতের ভণিতায় লেখা। 'ভানুমতীর গান'-এর কাহিনী সম্বলিত প্রথম কাব্য আবিষ্কার করেন ডঃ গ্রীয়ার্সন, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে। বাংলা ভাষার এই কাব্য রোমান হরফে প্রকাশ করেন গ্রীয়ার্সন। নাম ঃ "The Song of Manic Chandra". লৌকিক নাথ-সিদ্ধা সম্প্রদায়ের আচার্যদের জীবনকথার আলোচনা। সেই সঙ্গে 'নাথ ধর্মের কীর্তনই এই কাব্যের উদ্দেশ্য।

'গোরক্ষবিজয়'ও নাথ ধর্ম বিষয়ক কাব্য। নাথ সম্প্রদায়ের আদিগুরু হলেন মীননাথ। মীননাথ এবং গোরক্ষনাথ দু'জনেই ছিলেন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে এঁদের আবির্ভাব।

প্রেম-গীতি ঃ

বাংলা ভাষার জন্ম-কালে মানবিক উপাদান আশ্রিত কিছু রচনার পরিচয় পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীতে লেখা 'সেকশুভোদয়া' নামের ইতিকথা আশ্রিত বইটি তার সাক্ষ্য বহন করছে। এই বইয়ের উনবিংশ অধ্যায়ে আছে বাংলা ভাষায় লেখা 'প্রেম-গীতি'। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের যুক্তি নির্ভর সিদ্ধান্ত হলো, এটি বাংলা দেশে মুসলমান আক্রমণের আগে লেখা। আর ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের অভিমত হলো, — বাংলাভাষায় বাঙালির গল্প লেখার প্রয়াসও তখন থেকে। শ্রীসেনের সিদ্ধান্ত অনুসারে 'রূপকথা'-সাহিত্যের জন্ম তুর্কী আক্রমণের আগে। 'ডাক ও খনার বচন'ও 'প্রাকতুর্কী আমলের প্রবাদ-সংগ্রহ"।

তুর্কী আক্রমণ ঃ

১২০২ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে মহম্মদ-বিন্-বখ্‌তিয়ার খিল্‌জি প্রথম বাংলা দেশ আক্রমণ করেন। গৌড়ের রাজা তখন লক্ষ্মণ সেন। রাজা তখন বৃদ্ধ। লক্ষ্মণ সেনই বাংলা দেশের দুরন্ত প্রতাপশালী হিন্দু-গৌড়াধিপতি। সেন-বংশের উত্তরসূরী। জীবনের শেষ দিকে লক্ষ্মণ সেন থাকতেন নবদ্বীপে। বখ্‌তিয়ার আক্রমণ করেন সেখানেই। বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। এরপরই গোটা বাংলা দেশে ছড়িয়ে পড়ে বিভীষিকা-অরাজকতা। তুর্কী মুসলমানেরা কেবল বিধর্মী ছিলেন না। বিদেশীও ছিলেন। বাঙালি ঐতিহ্য বা বাংলার জীবনধারার প্রতি তাঁদের কোন মমত্ববোধই ছিল না। ফলে তাঁদের এই আক্রমণ ছিল সম্পূর্ণ বিবেকবর্জিত। পৈশাচিক।

অর্থ, মান, প্রাণ, ধর্ম-আচার সব কিছু চূর্ণ হয়ে যাবার জন্যই বাঙালি ভয়ঙ্কর ভাবে বিমূঢ় হলো। তবে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেই বখ্‌তিয়ার এক বছরের মধ্যে শাসকের সিংহাসনে বসে যে শান্তি সংস্থাপনায় ব্রতী হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তবে মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ, পাঠশালার বদলে মাদ্রাসা তৈরির ঝোঁকটা তাঁর বেশি ছিল।

মাত্র তিন বছরের মধ্যে ক্ষমতা লোলুপ মুসলমান আততায়ীর হাতেই নিহত হন বক্‌তিয়ার। মূলকথা, ১২০২ থেকে ১৩৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কার্যত বঙ্গসাহিত্য ছিল অনুর্বর।

১৩৪২ খৃষ্টাব্দে ইলিয়স শাহী বংশের রাজত্বকাল। তখন বাংলা দেশে আবার সর্বস্তরে শান্তি ফিরে আসতে থাকে। দেখা দেয় নবতর সৃষ্টির প্রবাহ।

যাত্রার উদ্ভব ঃ অজস্র জিজ্ঞাসা

'যাত্রা' কি? কোন শতকের ওপার থেকে আজও বেজে চলেছে লোকরঞ্জনের সুর ? গঙ্গার যেমন উৎস আছে, তার ধারা বা রূপে যে বিবর্তন অনিবার্য, তেমনি এই 'যাত্রা'র উৎস এবং তার বিবর্তনও অনিবার্য। সুতরাং সূচনায় উৎস সন্ধান সে তো স্বাভাবিক। 'যাত্রাগানে মতিলাল রায়'-এ আছে ঃ সংস্কৃত 'যা' ধাতু 'গমন করা' থেকে 'যাত্রা' শব্দের উৎপত্তি (যা + ত্র + ভাবে আপ্)। সুতরাং যাত্রা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ প্রস্থান বা গমন। যাত্রা অর্থে যুদ্ধার্থে গমনও বোঝায়। আবার উৎসবার্থেও যাত্রা! রামকেশর তন্ত্রে দেবীর ষোড়শ প্রকার যাত্রার কথা আছে। যেমন ঃ

"বৈশাখে মণ্ড যাত্রা চ চন্দনা গুরু কল্পনা।
জ্যৈষ্ঠে মহাস্নান যাত্রা অম্বুবাচী দিনত্রয়ম্।।
আষাঢ়ে রথযাত্রা চ দিঙ্খিনব্যাপিনীপরা।
শ্রাবণে জলযাত্রা চ বস্ত্রভূষণ চামরৈ ।।
ভাদ্রে যাত্রা ধূননাখ্যা চণ্ডিকায়া দিনত্রয়ং।
আশ্বিনে চ মহাপূজা যাত্রা যজ্ঞাবলিপ্রিয়া।।
কার্তিকে দীপযাত্রা চ নবান্নমগ্রহায়ণে।
পৌষে চাঙ্গরাগ যাত্রা বস্ত্রালংকারভূষণৈঃ।।
মাঘে মাসি মহাদেবী রটন্তী চ চতুর্দশী।।
দোলা কেলি ফাল্‌গুণে চ চৈত্রে যাত্রা চতুষ্টয়ী।।
দূতীযাত্রা রাসযাত্রা বাসন্তী নীলযাত্রিকা।
এবং যাত্রা ময়া প্রোক্তা ষোড়শী ভবশোচিনী।।

ঠিক এইভাবেই স্কন্দপুরাণে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দ্বাদশ যাত্রার কথা আছে। এই স্কন্দপুরাণের

এক জায়গায় আছে, ভগবান জগন্নাথ রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে দ্বাদশ যাত্রা প্রসঙ্গে একটি মনোজ্ঞ তালিকা পেশ করেছিলেন।

গ্রীক মেগাস্থেনেসের বিবরণ থেকে জানতে পারি, এখনকার যাত্রাভিনয় বা যাত্রাগানের মত এক রকম গান প্রচলিত ছিল পাটলিপুত্রে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সভায়।

ভারত নাট্যশাস্ত্রে, ভবভূতির 'মালতি মাধব'-এ যাত্রার কথা আছে। 'মালতি মাধব'-এ ভগবান কালপ্রিয়নাথের যাত্রাভিনয় বা যাত্রাগানের বিবরণ আছে। সম্রাট অশোক খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে তাঁর অষ্টম শিলালিপিতে উৎসব অর্থে যাত্রা ব্যবহার করেছেন। তিনি যা লিখেছেন তা থেকে জানতে পারি, পূর্ববর্তীকালের রাজারা 'বিহার যাত্রা' করতেন। সম্রাট অশোকের অভিষেকের দশমবর্ষে তাঁর 'ধর্মযাত্রা ', যাত্রার উৎসস্থল হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে।

মহাভারতের আশ্রমবাসিক পর্বে ধৃতরাষ্ট্রের বিহার যাত্রায় 'সঙ্গীত, কৌতুক, সুখাদ্য' ইত্যাদি ছিল। যা যাত্রার আদি পরিচয়ই বহন করে। এই 'মহাভারত'-এই আছে 'ঘোষযাত্রা'র কথা।

হরিবংশে আছে 'বন-যাত্রা'র কথা। আমরা এখন যাকে 'বনভোজন' বলি, মূলতঃ তাই হলো অতীতের 'বন-যাত্রা'। এই 'বন-যাত্রা' বা বনভোজনের একটা বড় অঙ্গ ছিল নৃত্য-গীত। তার সঙ্গে নাকি এক রকম অভিনয়ও ছিল, যাতে তুলে ধরা হতো ধর্ম সম্বন্ধীয় ও পৌরাণিক বিষয়।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আছে ঃ "যঃ প্রেক্ষা প্রেক্ষতে, যাত্রা-বিহারে রমতে"—, এ থেকে পরিস্কার বোঝা যায়, বিহার যাত্রায় রাজা রীতিমত নাট্যানুষ্ঠান (প্রেক্ষা) উপভোগ করতেন।

সম্রাট অশোকের 'ধর্মযাত্রা' 'যাত্রাগানে মতিলাল রায়' বইতে যে ভাবে পর্যালোচিত হয়েছে তা বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য।—"অশোকের ধর্মযাত্রা কেবলমাত্র তীর্থযাত্রা নয়। এর মূল উদ্দেশ্য "এতযং হোতি ব্রাহ্মণ--সম নানং দসণে চ দানে চ থৈরানং দসণে (চ) হিরণং-পটি বিধানো চ জানপদস চ জনস দস্পনং ধংমানুসষ্ঠী চ ধম পরিপুচ্ছা চ তদোপয়া।"—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ শ্রমণগণকে দর্শন দান, স্থবিরগণকে দর্শন ও স্বর্ণদান, জনপদ (দেশ) ও জনগণকে দর্শন, তাঁদের প্রতি ধর্মীয় উপদেশ এবং ধর্মবিষয়ক জিজ্ঞাসা। সুতরাং সম্রাট অশোকের এই 'ধর্মযাত্রা' এক রকম ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উৎসব হিসেবে চিহ্নিত ছিল। বিহারযাত্রা যে প্রমোদকর অনুষ্ঠান তার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়।

'যাত্রা' শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন—"যাত্রা শব্দের মূল অর্থ হইয়েছে দেবতার উৎসব উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা ও উৎসব। আধুনিক কালে 'নদীর যাত', 'মানাদের যাত', এই সব স্থলে মূল অর্থ অনেকটা বজায় আছে। তাহার পর অর্থ হইল, দেবতার উৎসব উপলক্ষ্যে নাটগীত, তাহা হইতে দেবলীলাত্মক অথবা অন্য কাহিনীময় নাটগীতি।"

যাত্রা সম্পর্কে আমরা বিশ্বকোষের (১৫শ খণ্ড, ১৩০৯) বক্তব্য যা পাই তা হলো—"ধর্মপ্রাণ হিন্দুগণ সেই দেব-চরিত্রের অলৌকিক ঘটনা পরম্পরা স্মরণ রাখিবার জন্য এক একটি উৎসব অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। গীত-বাদ্যাদিযোগে ঐ সকল লীলোৎসব প্রসঙ্গে যে অভিনয়ক্রম প্রদর্শিত হইয়া থাকে তাহাই প্রকৃত যাত্রা বলিয়া অভিহিত—" এই যাত্রার আবার বহু প্রকার ভেদ আছে। দেশ ও জাতি ভেদে এর প্রকার ভেদ। এ ক্ষেত্রে, অতি প্রাচীন যাত্রা হলো "শিব যাত্রা"।

সব রকম প্রচলিত যাত্রার অনেক আগে এই "শিব যাত্রা"র প্রচলন ছিল।

এরপর 'রাসযাত্রা'। মূলত হিন্দু রাজত্বের সময় থেকেই এই 'রাসযাত্রা'র প্রচলন।

'কৃষ্ণযাত্রা'। রাসযাত্রার পরেই এই কৃষ্ণযাত্রা আমাদের দেশে বিস্তার লাভ করে।

ভাগবতেও লীলাভিনয়ের কথা আছে। কোন ধর্ম বা সামাজিক উৎসবের অন্যতম প্রধান অঙ্গ ছিল এই সব দেবলীলা বিষয়ক অনুষ্ঠান। তদানীন্তন 'যাত্রা'য় অবশ্যই কোন দৃশ্যাপটাদির ব্যবহার ছিল না তা বলাই বাহুল্য।

গানের সঙ্গে বাজনা আর উক্তির সঙ্গে প্রত্যুক্তি দিয়েই তখন বিষয় উপস্থাপিত হতো। এই সময়ে শুধু আমাদের দেশেই নয়, গোটা ভারতেই বিভিন্ন আঞ্চলিক লোকউৎসব বা লোকনাট্যে বাদ্যযন্ত্রের প্রভাবই বেশি ছিল।

চতুর্দশ শতকের সামাজিক প্রেক্ষাপটে চোখ রাখলে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে দেখা যায়, তদানীন্তন অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদ, উৎসব ইত্যাদি জনজীবনের শরিক ছিল, তেমনি বিদ্যাভ্যাস ও শাস্ত্র অধ্যয়নেরও চর্চা ছিল পাশাপাশি।

মানুষের মধ্যে সৎ মানুষের বাস ছিল প্রধান, সুতরাং ঐ ধরনের লীলাভিনয়ের আয়োজন একটা উদ্দেশ্য সাধন করত, তা হলো মানুষকে ধর্মভাবাপন্ন করে তোলা। অর্থাৎ এখন যাকে আমরা 'গণজাগরণ' বলি সেই 'গণজাগরণ'-ই ছিল ঐ সব লীলাভিনয়ের মূল উদ্দেশ্য।

এরপরই 'কথকতা', 'কীর্তন'-এর আবির্ভাব ঘটেছিল লোকশিক্ষার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে। সাংসারিক বিপদমুক্তির জন্য 'মঙ্গলচণ্ডী', 'সত্যনারায়ণ পূজা', সাপের ভয় থেকে মুক্ত থাকার জন্য 'মনসা', 'পদ্মা', 'বিষহরি'র গান, বসন্ত বা ওলাওঠা রোগ থেকে মুক্তি পাবার জন্য 'শীতলার গান', তা ছাড়া সন্তান লাভের বাসনা ও সন্তানের মঙ্গল কামনার জন্য ছিল যথাক্রমে 'কার্তিক' ও 'ষষ্ঠীর গান'। তা ছাড়া 'বাসলী' ও 'গজলক্ষ্মী'র গানও বহুল প্রচলিত ছিল।

এই সব আনন্দ বা প্রমোদ অনুষ্ঠানে 'গান'-এর সঙ্গে করতাল, মৃদঙ্গ ব্যবহার করা হতো। অবস্থা বিশেষে ঢাক, ঢোল, ডঙ্কা, বীণা, সানাই, বাঁশি, কাঁসি ইত্যাদি প্রায় বিয়াল্লিশ রকমের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হতো।

এল গাজনের গান।

'শিবের গাজন' তখনকার বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলকে মাতিয়ে রাখত শুধু না, অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিস্ময়করভাবে প্রসার লাভ করেছিল।

"।। ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্য পেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্।।"

'মালদার গম্ভীরা', এই সময়কালেই প্রচলিত হয় এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই বিষয়টি 'আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতি'র মর্যাদা পায়।

মনে রাখতে হবে 'যাত্রা' শব্দের সঙ্গে 'গান' শব্দটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, এর কারণ, যাত্রাভিনয় বা লীলাভিনয়ের প্রধান ছিল গান, তাই সহজেই অনুমান করা যায় যাত্রার সঙ্গে গানের নাড়ির যোগ। সেই কারণেই 'যাত্রাগান'-এর প্রচার।

* * * * * *

আমাদের কাছে যেমন দুর্গোৎসব, তেমনি 'যাত্রা' শিল্প বা বর্তমান চিৎপুর অঞ্চলের যাত্রার ক্ষেত্রে পবিত্র দিন হলো 'রথযাত্রা'। দল বা প্রতিষ্ঠানের দ্বারোদ্ঘাটন, পালা বায়না, নতুন পালার সূচনা, পালার গানে সুর বসানো ইত্যাদি যা কিছু শুভ কাজ অর্থাৎ যাত্রার 'নববর্ষবরণ' বলতে যা বোঝায় সবই এই রথযাত্রার দিনে অনুষ্ঠিত হয়।

ইদানিং যদিও নব্য প্রযোজকরা বা যাত্রার সঙ্গে জড়িত সকলে ১লা বৈশাখ, সরস্বতী পূজা ইত্যাদি দিনে এই সব শুভ কাজ করে থাকেন, তবুও রথযাত্রার দিনটিকে যাত্রাপল্লী চিৎপুরে আলাদা একটা বিশেষ দিন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

প্রশ্ন জাগে, কেন 'রথযাত্রা'র দিনটিকে বিশেষ ভাবে আজও চিহ্নিত করে রেখেছে যাত্রা জগতের মানুষেরা! এ প্রসঙ্গে একটু আলোকপাত করা যাক—

অতি প্রাচীনকালে গ্রহদের মধ্যে সূর্যকেই প্রধান ও উজ্জ্বলতম গ্রহ হিসেবে মানা হতো। পৃথিবীর বহু জাতি তাই আজও সূর্যের উপাসনা করে থাকে। আমরা যারা হিন্দু- বাঙালী তারা সূর্যস্তব করি—"ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্..."

কৃষিজীবি সমাজের কাছে সূর্যের উত্তরায়ণ অপেক্ষা দক্ষিণায়নের দাম অনেক। এর কারণ গ্রীষ্মের অবসান ও বর্ষার সূচনা। এই সময়ের মধ্যে কৃষকরা তাঁদের কৃষিজাত যা কিছু ফসল ঘরে তুলতেন। এই সময়ে পূর্বভারতে যে সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব পালন করা হতো তাকে বলা হতো 'সূর্যোৎসব'। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের 'সূর্য-যাত্রা'কে বলে দক্ষিণায়ন। শীতপ্রধান দেশে 'সূর্য-যাত্রা'কে বলে উত্তরায়ণ ; সুতরাং এ সব দেশে সূর্যোৎসবই প্রধান। পাশ্চাত্য দেশে যেমন 'বড়দিন', তেমনি এ দেশে বিশেষ করে উড়িষ্যায় শ্রেষ্ঠ উৎসব 'রথযাত্রা'। অবিভক্ত বাংলাদেশেও তাই 'রথযাত্রা' উৎসবের আলাদা একটা চেহারা বা ঐতিহ্য আজও বজায় আছে। এই 'রথযাত্রা' সূর্যের দক্ষিণায়ন উৎসব নামে খ্যাত।

ধর্মের প্রশ্নে, হিন্দুধর্মের অন্যতম উৎসব হলো রথযাত্রা, কারণ দেবতার রথযোগে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া। দেবতাদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবার ক্ষেত্রে যে উৎসব পালিত হয় তাকেও 'যাত্রা' বলে। আর সেই কারণেই বোধ হয় রথযাত্রার দিনটি যাত্রার সঙ্গে জড়িত সকলের কাছেই এক পবিত্র দিন।

কালক্রমে এ দেশে বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাপক প্রভাব যখন পড়ল তখনই 'কৃষ্ণ বিষয়ক' নানা উৎসবের প্রসার। আর সেই প্রসারতা থেকেই এক সময়ে 'কৃষ্ণযাত্রা'র জন্ম। এই 'কৃষ্ণযাত্রার' অঙ্গ হলো 'ঝুলন যাত্রা', 'হিন্দোল যাত্রা', 'রাসযাত্রা' ইত্যাদি।

ঠিক এই ভাবেই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেও আছে লোকগাথা অবলম্বনে লোকসংস্কৃতি। যেমন ঃ

❑ **ওরাওঁ যাত্রা ঃ**

ছোটনাগপুরের আদিবাসী 'ওরাওঁ'দের আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতির মধ্যে অন্যতম প্রধান হলো 'ওরাওঁ' যাত্রা।

ওরাওঁদের মধ্যে প্রতিবেশী গ্রামগুলির আদিবাসী যারা তাদের মধ্যে অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের সমবেত নৃত্যই 'ওরাওঁ যাত্রা'র স্বরূপ।

এই 'ওরাওঁ যাত্রা'র মধ্যে আঞ্চলিক লোকসঙ্গীতের সঠিক প্রয়োগ ছিল। এই যাত্রা গ্রামের একাধিক আসরে উপস্থাপিত হতো।

❑ **জেঠ যাত্রা ঃ**

ওরাওঁ যাত্রার চাইতে অনেক বেশি খ্যাতি ছিল 'জেঠ যাত্রা'র। জ্যৈষ্ঠ মাসে হতো বলে এর নাম 'জেঠ যাত্রা'। এই যাত্রায় অংশগ্রহণকারী অবিবাহিত ওরাওঁ আদিবাসী যুবক-যুবতীরা পরস্পর পরিচিত হতো। যে জায়গাটিতে এই অনুষ্ঠান হতো তাকে বলা হতো 'যাত্রা টাঁড়'। এই উৎসব ক্ষেত্রে একটি কাঠের খুঁটি পুতে রাখা হতো, যাকে ঘিরে ফুলসাজে সজ্জি ত যুবক-যুবতীরা নাচ-গান করত। সেই খুঁটিটির নাম ছিল 'যাত্রা খুঁটিয়া'।

❑ **মারী যাত্রা ঃ**

এই 'মারী যাত্রা'র ব্যাপক প্রচলন আছে দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলে দ্রাবিড় ভাষাভাষীদের মধ্যে।

দাক্ষিণাত্যের গ্রামের আরাধ্য দেবীর নাম 'দেবী মারী' বা 'মারী আম্মা'। এই দেবীর বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠানকে' 'মারী যাত্রা' বলে। মাদ্রাজের সমুদ্রকূলের নিরক্ষর মৎসজীবিরা নিত্য যে পূজা অনুষ্ঠান করে থাকে তাকে এরা 'যাত্রে' বলে।

❑ সাহী যাত্রা ঃ

বাংলার গাজন উৎসবের মত উড়িষ্যার গ্রাম-গঞ্জের সাধারণ মানুষেরা যে উৎসব করে থাকে তারই নাম "সাহী যাত্রা"।

উড়িষ্যার এই 'সাহী' যাত্রার ক্রমবিবর্তনেরই রূপ আজকের "উড়িষ্যা যাত্রা"। আজকের উপস্থাপনার রীতিতে এই যাত্রা যে কী বিস্ময়কর ভাবে সমকালীন চমক-সভ্যতার নজির তা বর্ণনাতীত। আলোর যাদু সর্বস্ব এই ব্যয়বহুল যাত্রার প্রভাব আজকের শহর কলকাতার ব্যবসায়িক যাত্রাপালায় প্রকট।

❑ যাত্রা পরব ঃ

মাঘ মাসে সাঁওতাল পরগণার সাঁওতাল ও ভূঁইঞাদের একটি লৌকিক উৎসব হয় তার নাম "যাত্রা পরব"।

* * * * * *

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রাম-গঞ্জের নিম্নজাতির মধ্যে লৌকিক দেবতার যে উৎসব হয় তাকে এরা 'যাত' বলে থাকে। এই 'যাত' শব্দটি দ্রাবিড় ভাষা থেকে এসেছে বলে অনেকেই মনে করেন। সুতরাং 'যাত্রা' শব্দটি দ্রাবিড় ভাষা থেকে এসেছে বলে মনে হয়। মধ্যযুগে যাত্রাকে দেব-দেবীর উৎসব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এই সব উৎসবে নাচ-গান-বাজনার প্রাধান্য ছিল বলেই একে 'নাটগীতি' বলা হতো। কৃত্তিবাসী রামায়ণের 'উত্তরা কাণ্ডে' শিব-দুর্গার বিবাহের যে বর্ণনা আছে তা থেকে নাটগীতের ভাব উদ্‌ঘাটিত হয়! ......

"নাটগীত দেখি শুনি পরম কুতুহলে।
কেহো বেদ পঢ়ে কেহ পঢ়এ মঙ্গলে।।
নানা মঙ্গল নাটগীত হিমালয়ের ঘরে।
পরম আনন্দে লোক আপনা পাসরে।।

(সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, পৃঃ ৬)।

প্রাচীন যাত্রার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হলো জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'। এই 'গীতগোবিন্দ' সর্গবদ্ধ কাব্যে রাগ ও তালের প্রাধান্য ছিল, এবং স্বয়ং কবি জয়দেবও তাই চেয়েছিলেন। প্রাচীন এই নাটগীত-এর মধ্যেই যে ঊনবিংশ শতাব্দীর 'যাত্রা'র বীজ লুকিয়ে ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

* * * * * *

যাত্রার জন্ম বা যাত্রার উদ্ভব প্রসঙ্গে বিশ্বকোষ ১৫শ খণ্ডে বলা হয়েছে ঃ

"ধর্মপ্রাণ হিন্দুগণ সেই দেব চরিত্রের অলৌকিক ঘটনা পরম্পরা স্মরণ রাখিবার জন্য এক একটি উৎসব অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। গীত বাদ্যাদিযোগে ঐ সকল লীলোৎসব প্রসঙ্গে যে অভিনয়ক্রম প্রদর্শিত হইয়া থাকে তাই প্রকৃত যাত্রা বলিয়া অভিহিত।"

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস'-এর ৬৯ পৃষ্ঠায় বলেছেন ঃ

"যাত্রা বা উৎসব উপলক্ষে নাটগীতের অনুষ্ঠান হইত বলিয়া ক্রমে নাটগীতকেই যাত্রা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে"।

সংস্কৃত বিশ্বকোষ যাত্রা প্রসঙ্গে যে অভিমত দিয়েছে ঃ

"যাত্রাতু যাপনোপায়েভাতৌ দেবার্চনোৎসবে"।

দেবী ভগবতীর উদ্দেশে এক সময়ে প্রতি মাসেই যাত্রা উৎসব হতো। এই ধরনের ষোড়শ

প্রকার যাত্রার উল্লেখ আছে 'কামকেশ্বর তন্ত্রে'। যেমন ঃ বৈশাখে মঞ্চ যাত্রা, চন্দন যাত্রা, জ্যৈষ্ঠে মহাস্নান যাত্রা, আষাঢ়ে রথযাত্রা, শ্রাবণে জল যাত্রা, ভাদ্রে ধুনন যাত্রা, আশ্বিনে মহাপূজা যাত্রা, কার্তিকে দীপ যাত্রা, অগ্রহায়ণে নবান্ন যাত্রা, পৌষে অঙ্গরাগ যাত্রা, মাঘে মহাদেবী যাত্রা, ফাল্গুনে দোল যাত্রা, চৈত্রে দূতী যাত্রা, রাস যাত্রা, বাসন্তী যাত্রা, নীল যাত্রা।

স্কন্দ পুরাণে দ্বাদশ যাত্রার কথা আছে।

প্রতিমাসে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশে যে উৎসব উদ্‌যাপিত হতো তাও যাত্রা নামে খ্যাত ছিল। রঘুনন্দনের 'যাত্রাতত্ত্বম্'-এও দ্বাদশ যাত্রার বর্ণনা আছে।

যেহেতু 'যাত্রা' শব্দের যথার্থ উৎপত্তির ব্যাখ্যা আছে সেই হেতু তার রচনার উদ্ভবকালও আছে।

কালপ্রিয়নাথের যাত্রা উপলক্ষে ভবভূতির রচনা প্রাচীন উদাহরণ। যেমন ঃ উত্তররাম চরিত, মালতিমাধব।

কালিদাস বিরচিত ঃ মালবিকাগ্নিমিত্র ও হর্ষ রত্নাবলী।

নাট্যশাস্ত্র বিশারদ ভরতমুনির 'জয়বিজয়'-এরও অভিনয় হয়। অতএব ইতিহাস বা ইতিবৃত্তে আদি যাত্রা প্রসঙ্গে আলোকপাত অনিবার্য।

বৈদিক যুগে এক রকম গীতিনাট্যের অস্তিত্ব ছিল বলে ইউরোপীয় পণ্ডিতরা মনে করেন। তাঁদের স্থির সিদ্ধান্ত, আজকের যাত্রা সেই বৈদিক যুগের যাত্রা বা নাটকের দ্বারা প্রভাবিত। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ বহন করেছে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'।

কিন্তু বাংলা যাত্রায় বৈদিক যাত্রা শৈলীর প্রভাব নেই বলে অনেকে মনে করেন।

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদে 'বুদ্ধ নাটক'-এর উল্লেখ আছে।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'নাট' শব্দ পাওয়া যায়। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত'-এ নাচ ও গানের মিলনে এক প্রকার অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে। 'চৈতন্যভাগবত'-এ 'কৃষ্ণ যাত্রা'র উল্লেখ আছে।

চৈতন্যদেবের অভিনয় লীলার মধ্যে আজকের অভিনয় প্রসঙ্গের ছবি ছিল। নাট্যাভিনয়ের জন্য বিশেষ সাজ পোষাকের প্রয়োজন এই ইংগিত দেন সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খান। তবে এর মূলে ছিল চৈতন্যদেবেরই নির্দেশ। এই নির্দেশনামায় পরবর্তীকালের নাট্য প্রযোজনা আর নাট্য নির্দেশনার যে রূপ তারই অঙ্কুর নিহিত ছিল।

নাটক বা যাত্রার যে অংক ভাগ তার ইংগিতও ছিল চৈতন্যর নাট্যলীলায়। যাত্রার মতই এই নাট্যলীলায় কীর্তন ও গৌরচন্দ্রিকার অবতারণা ছিল।

হরিদাস স্বয়ং নাট্যলীলার উপস্থাপনা বা মুখবন্ধ করেছিলেন। আজকের যাত্রার 'প্রস্তাবনা' অংশ তারই ভাবাদর্শে চলমান। চৈতন্যনাট্যলীলায় শ্রীনিবাস নিয়েছিলেন 'নারদ' ভূমিকা। যে চরিত্রটি বার বার চৈতন্যের অবতারতত্ত্বের ব্যাখ্যা এবং চৈতন্যের দার্শনিকতাকে স্পষ্ট করে তোলে। সেদিনকার সেই শ্রীনিবাস রূপায়িত 'নারদ', পরবর্তী যাত্রার মহান্ত, দূতী, পৌর্ণমাসী বা আরও আধুনিক যাত্রার 'উচিত', 'বিবেক', 'পাগল' ইত্যাদি চরিত্রগুলির আদিপুরুষ।

চৈতন্য নাট্যলীলায় 'সংলাপ' ছিল, আজকের যাত্রায় সেই সংলাপেরই প্রাধান্য।

আজকের যাত্রায় যেমন অধিকারী, সেদিনের অদ্বৈতাচার্যের ভূমিকাও ছিল তাই।

অষ্টাদশ, ঊনবিংশ শতাব্দীর যাত্রায় চৈতন্য নাট্যলীলার যথেষ্ট প্রভাব আছে তা প্রমাণিত হয় যে যে ক্ষেত্রে এখানে তার কিছুটা পর্যালোচনা দরকার।

আমাদের দেশে বুদ্ধ নাটক, ডাকের গান, কালিয়দমন গান, দানদণ্ড নাচ যে এক সময়ে প্রচলিত ছিল, সেখানে একজন প্রধান রূপকার বা অভিনেতা নাচবে এবং তাকে ঘিরে অনুচরেরা গাইবে এই যে প্রথা, তার উল্লেখ আছে বাংলার প্রাচীন অভিনয় সাহিত্যে। প্রাচীন বাংলার প্রাচীন

অভিনয় সাহিত্য হলো 'মঙ্গলকাব্য'। ভাল করে সেজেগুজে, চামর হাতে, মন্দিরার মূর্ছনার সঙ্গে সুর দিয়ে এই 'মঙ্গলকাব্য' প্রধান গায়ক গাইতেন। পয়ার অংশ সুরেলা আবৃত্তিতে পরিবেশন করতেন প্রধান গায়ক বা অধিকারী।

লাচারী অংশ অনেকে এক সঙ্গে গাইত। এখনও সেই আদি রীতিতে মনসার গান, ভাসানের গান, রামায়ণ গান গাওয়া হয়ে থাকে।

বড়ু চণ্ডীদাসেব 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' চৈতন্য যুগের আগেকার এক উৎকৃষ্ট অভিনয় সাহিত্য। এখানে বন্দনার পদ থাকত। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, এই 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' কাব্য কি একটি পালার রূপ? না। কয়েকটি পালার সমষ্টিগত মিলনে একটি অখণ্ড পালা। এখানে তাম্বুলখণ্ড থেকে বংশীখণ্ড একটি করে অংক হিসেবে বিবৃত হয়েছে। এখানে বড়ু চণ্ডীদাস 'জন্মখণ্ড'কে প্রস্তাবনা হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

পরবর্তীকালে গোবিন্দ অধিকারী, কৃষ্ণকমল গোস্বামী এঁরা বড়ু চণ্ডীদাসের 'জন্মখণ্ড'কে তাঁদের পালায় মুন্সিয়ানার সঙ্গে আরোপ করেছেন। তাঁরা আরও বিস্তৃত করেছেন গান। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর পালার সঙ্গে 'কৃষ্ণকীর্তন'-এর ভাবের মিল আছে।

কৃষ্ণকমলের পালা মূলতঃ সঙ্গীত প্রধান, কৃষ্ণকীর্তনও গানে গানে ভরা।

কৃষ্ণকমলের পালার প্রস্তাবনার সঙ্গে কৃষ্ণকীর্তনের প্রস্তাবনার অনেক ক্ষেত্রে মিল।

কৃষ্ণকমলের পালার যে কাহিনী বা পাত্র পাত্রীদের যে মনোভাব তা এক একটা সম্পূর্ণ গানের মাধ্যমে উক্তি ও প্রত্যুক্তিতে প্রকাশ পেত। কৃষ্ণকীর্তনও মূলতঃ তাই।

কৃষ্ণকমলের সংলাপ পয়ার ও ত্রিপদী শ্লোকের ভিতর দিয়ে, তেমনি কৃষ্ণকীর্তনে একই গানের পদগুলি দু'জনের উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে।

কৃষ্ণকমল তাঁর গীতাভিনয়ে রাধাকে যেমন করে এঁকেছেন, রাধার উক্তি এবং কাজ যা দেখিয়েছেন, কৃষ্ণকীর্তনে রাধাও সেই ভাবে চিত্রিত। কৃষ্ণকমলের রাধা যেমন করে কৃষ্ণ বিরহে যোগীনি, কৃষ্ণকীর্তনের রাধাও তাই।

পালাকার রায় বামানন্দের "জগন্নাথ বল্লভ" পালা থেকে 'বাঙ্গালা যাত্রার' উৎপত্তি যে ব্যাখ্যা অনেকেই দিয়েছেন। রামানন্দের পালায় 'গীতগোবিন্দ'-এর প্রভাব ছিল। গীতগোবিন্দ'র প্রধান ঐশ্বর্য হলো গান, যে গান অনুপ্রাসে সমৃদ্ধ করে কবি জয়দেব বৈষ্ণব সাহিত্যে নতুন চেতনার জোগান দিয়েছিলেন। রামানন্দের পালায় শ্রীকৃষ্ণের জয়গানই প্রধান। এই জন্যই তাঁর পালায় গীত-গোবিন্দ'র প্রভাব বেশি। রামানন্দের 'জগন্নাথ বল্লভ' পালায় দীর্ঘ প্রস্তাবনা এসেছে নান্দীর পর। প্রস্তাবনার সমাপ্তিতে নেপথ্যে সংস্কৃত শ্লোক। এরপরই কৃষ্ণরূপ বর্ণনাত্মক গান।

রায় রামানন্দ তাঁর পালায় অঙ্ক ভাগ করেছেন। প্রথম অঙ্কের নাম—পূর্বরাগ ; দ্বিতীয় অঙ্ক—ভাব পরীক্ষা ; তৃতীয় অঙ্ক—ভাব প্রকাশ। রামানন্দের পালায় গল্প ছিল খুবই কম। গদ্য সংলাপ সংগীত ও শ্লোক অবতারণার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

গোবিন্দ অধিকারীর পালায় পদাবলী সাহিত্যে উল্লিখিত বিদগ্ধ মাধব ও ললিতমাধব নাটকের অনুসরণ মানসিকতা রয়েছে। 'বিদগ্ধ মাধব'-এ নানা চরিত্রের মুখ দিয়ে কৃষ্ণের অতিলৌকিক ভূমিকার দার্শনিক ব্যাখ্যা যেমন পরিস্ফুট হয়েছে, গোবিন্দ অধিকারীও তেমনি ললিতা, পৌর্ণমাসী, বৃন্দার মুখ দিয়ে সেই ব্যাখ্যারই পুনরাবৃত্তি করিয়েছেন।

গোবিন্দ অধিকারী অনেক ক্ষেত্রে দার্শনিকতা প্রকাশ করেছেন অর্থ-সংশ্লেষের দ্বারা। যেমন 'মুক্ত'। এই শব্দের অর্থ সুবলের কাছে 'রত্ন' বিশেষ। আবার বড়াই শ্লেষের সঙ্গে 'বন্ধন-হীন' বুঝেছে 'মুক্ত'কে।

রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থটি বৈষ্ণব রস শাস্ত্রের এক অমূল্য সাহিত্য দর্পণ। তা ছাড়া তিনি নাট্যকার হিসেবেও খ্যাতিমান! 'পারমার্থিক ভক্তিভাবের সহিত অলঙ্কার শাস্ত্রের সংগতি

রাখিয়া তিনি উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন।' পরবর্তী বৈষ্ণব পদসংকলকরা রূপ গোস্বামীর পথেই রাধা কৃষ্ণের প্রেমের পর্যায়-ভেদে নিজেদের সাহিত্যকার্য পদাবলী-সংযোজন করেছেন।

যাত্রায় গৌরচন্দ্রিকার আদর্শ প্রতিফলন ঘটেছে রূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধ মাধব' থেকে।

গৌরচন্দ্রিকার ব্যাখ্যা ঃ

রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, বৈষ্ণব রস সাহিত্যের ৮৯ পৃষ্ঠায় বলেছেন ঃ

"আমার বোধ হয় গৌরচন্দ্রিকার সূত্রপাত নরোত্তম ঠাকুর হইতে।" পদামৃত-মাধুরীর ১ম খণ্ডে আবাব বলা হয়েছে ঃ

"ঠিক কোন সময়ে গৌরচন্দ্রিকার প্রবর্তন হয় তাহা বলা কঠিন। তবে চৈতন্য ভাগবত, শ্রীরূপ গোস্বামীর নাটক, রামানন্দের নাটক, চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ আরম্ভ করিবার পূর্বেই চৈতন্য-চন্দ্রকে প্রণাম করিতে হয়। চরিতামৃতের প্রায় প্রত্যেক অধ্যায়ের অবতরণিকারূপে এক একটি গৌর গুণাত্মক শ্লোক প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাই গৌরচন্দ্রিকার সূত্রপাত বলিয়া মনে হয়।"

সুতরাং রূপ গোস্বামীর যাত্রা থেকেই যাত্রায় গৌরচন্দ্রিকার আদর্শ সংস্থাপিত হয়েছে।

কীর্তন থেকে যাত্রার উদ্ভব এ ব্যাপারে চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন বৈদ্যনাথ শীল তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা' বইতে। বৈদ্যনাথ শীল বলেছেন—". .সুতরাং উপসংহারে আমরা বলিতে পারি, কীর্তন ভাঙ্গিয়া ঢপ কীর্তন ও ঢপ কীর্তন ভাঙ্গিয়া যাত্রার উৎপত্তি হইয়াছিল। এই ক্রম বিকশিতরূপের উদাহরণ গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা। গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রারই ক্রম বিকশিত রূপ ব্রজমোহনের যাত্রা। কীর্তনের অব্যবহিত বিবর্তিত রূপটিই আমবা কৃষ্ণকমলেব রচনায় দেখতে পাই।......

"অনেকে মনে করেন পাঁচালী হইতে যাত্রার উৎপত্তি হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে সাঙ্গোপাঙ্গো কথকতাই যাত্রা। এই দুইটি মতের আলোচনা প্রয়োজন। ...পাঁচালী বলতে আমরা সাধারণত দাশরথি রায়, মনমোহন বসু, ঠাকুর দাস প্রভৃতির রচনা বুঝি। যাত্রা সাহিত্যের যখন পতন হইয়াছে তখন পাঁচালী সাহিত্যের এই শৈলীর বিশেষ অনুকরণ চলিতেছিল। সুতরাং সেদিক দিয়া, ইতিহাসের দিক দিয়া বিচার করিতে হইলে পাঁচালী হইতে যাত্রার উৎপত্তি হইতে পারে না।"

বৈদ্যনাথ শীল এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন "বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা" বইতে।

শ্রীশীল আরও মনে করেন......"সপ্তদশ শতকে নিবন্ধ কীর্তনের প্রভাবে এক প্রকার পাঁচালী সাহিত্যের যে সম্ভাবনা দেখা গেল, তাহার চরম পরিণতি হইল অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে। ইহার মধ্যে যাত্রার উন্নতি-অবনতি পর্যন্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং পাঁচালীর প্রভাবে যাত্রার উৎপত্তি হইবে কি করিয়া?"

অথচ মন্মথমোহন বসু তাঁর "বাঙ্গলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ" বইতে বলেছেন— "পাঁচালীর ভাবকালি থেকে সংলাপ সৃষ্টি হয়েছে।" কিন্তু বৈদ্যনাথ শীল কোন পাঁচালিকারের বইতে 'ভাবকালি' পাননি।

ডঃ সুশীলকুমার দে তাঁর 'Bengali Literature in the 19th Century' বইতে পাঁচালির অনুমেয় পাঁচটি অঙ্গের কথা বলেছেন, সেই পাঁচটির মধ্যেও 'ভাবকালি' পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া যে মনোমোহন বসু দাশরথি রায়ের পাঁচালি শুনেছিলেন এবং নিজেও পাঁচালি গান করতেন সেই তিনিও 'ভাবকালি'র কথা বলেননি। সুতরাং পাঁচালি থেকে যাত্রার উৎপত্তি নয় এই সত্যই বৈদ্যনাথ শীল প্রমাণ করেছেন।

কথকতা থেকে যাত্রার উৎপত্তি? যাত্রার অনেক আগে এই কথকতা ছিল। কিন্তু তার প্রকৃতি কেমন ছিল? এ ব্যাপারেও বৈদ্যনাথ শীল তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন তাঁরই বইতে।...তিনি এক জায়গায় বলেছেন..."যে কীর্তন হইতে যাত্রার উৎপত্তি হইয়াছিল, কথকতার ভাবুকতা ও সংলাপময়তা তাহার স্বতঃস্ফূর্ত হৃৎ-স্পন্দন-রূপে গোড়াগুড়ি হইতে অলক্ষিত ভাবে যাত্রায় আসিয়া যাইতেছিল। প্রথম প্রথম তাহা লক্ষ্য করা খুব বেশী সম্ভব হয় নাই। কিন্তু ক্রমে যাত্রার সংলাপ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহা পল্লবিত হইয়া ফুটিয়া উঠিল। ইহা কথকতার প্রভাব নহে। কীর্তন জ্ঞানের মূলীভূত বৈষ্ণব পদাবলীরই উহা অন্তর্নিহিত প্রেরণা। পদাবলীর যে উন্নত ভাব-প্রেরণা হইতে যাত্রার সৃষ্টি, পরবর্তী কালে তাহাতে যখন ভাঁটা লাগিল, তখন যাত্রা সাহিত্যেরও পতন হইতে শুরু হইল। অন্যদিকে কৃষ্ণ-যাত্রা সাহিত্যের জনপ্রিয়তার সুযোগ লইয়া বৈষ্ণবেতর বিষয়ে অনেক যাত্রাওয়ালা পালা রচনা করিলেন। তাঁদের সাহিত্যের মধ্য দিয়া কুরুচি, ভাঁড়ামো, অশ্লীলতা যাত্রা সাহিত্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল।" এর চরম রূপ গোপাল উড়ের "বিদ্যাসুন্দর"।

* * * * * *

কবি জয়দেব বাংলা সাহিত্যের আদি এবং মধ্য যুগের মধ্যে এক চিরস্মরণীয় মিলন সেতু। জয়দেব সংস্কৃত ভাষার কবি। তিনি ছিলেন রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজ সভার পঞ্চ রত্নের মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ রত্ন। বাঙালীর সারস্বত সাধনার যে পবিত্র অঙ্গন, যে মানসভূমি—মূলতঃ সেখানে তিনি বরণীয় প্রতিভা হিসেবে চির আদরণীয়, শুধু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর অনুবর্তীদের একান্ত অনুরাগের প্রভাবে। চৈতন্য যে বাংলা সাহিত্য পথের মুক্তি প্রণেতা আশ্চর্যভাবে "গীতগোবিন্দ" পদাবলীতে তার প্রতিফলন অথবা পূর্ব সূচনা অঙ্কিত বলেই আদিযুগ-পরিণাম ও কবি জয়দেবের পর্যালোচনা, বিশদ ব্যাখ্যাই বলে দেবে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সরণির প্রথম ও একক নির্মাতা স্বয়ং কবি জয়দেব।

শ্রীভূদেব চৌধুরী তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' বইতে বলেছেন—"চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি"র "রাধাকৃষ্ণ প্রেম" কবিতাবলী ও অপরাপর বৈষ্ণব-রস গ্রন্থের সঙ্গে মহাপ্রভু যে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'ও আস্বাদন করতেন এমন প্রমাণ রয়েছে প্রচুর—"

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বৈষ্ণব পদাবলীর শিরোভূষণ হিসেবে কবি জয়দেবের প্রথম প্রত্যক্ষ প্রবেশ। এবং চৈতন্য মহাপ্রভুই পূর্বাচার্যের পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছেন জয়দেব-প্রতিভাকে।

কবি জয়দেব ঃ

বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলি গ্রামে ভোজদেবের ছেলে জয়দেবের জন্ম। অনেকে মনে করেন, জয়দেব মিথিলা বা উড়িষ্যার অধিবাসী। সংস্কৃত সাহিত্যে যে ক'জন জয়দেবের নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলির জয়দেবই বিখ্যাত। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় গোবর্ধন, শরম, ধোয়ী, উমাপতি ও জয়দেব এই 'পঞ্চরত্ন' শোভা পেতেন। কিন্তু জয়দেব রচিত 'গীতগোবিন্দ' কাব্যগ্রন্থে উক্ত কবিদের নাম থাকলেও ঘটনাটি সত্য বলে প্রমাণিত হয় না লক্ষ্মণ সেনের নাম না থাকায়। জয়দেব কিছুদিন উৎকল রাজেরও সভাপণ্ডিত ছিলেন বলে অনেকে মনে করেছেন। সেকালে 'সদুক্তিকর্ণামৃত' নামের কোষ কাব্যগ্রন্থে 'গীতগোবিন্দের' পাঁচটি শ্লোক ছাড়া তাঁর নাম যুক্ত আরও ছাব্বিশটি শ্লোক পাওয়া যায়। তাঁর স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী। জয়দেব-পদ্মাবতী প্রসঙ্গে অনেক কাহিনী বা লোকগাথা প্রচলিত আছে। তাঁর লেখা 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থ দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত এবং বসন্ত রাসের বর্ণনা যুক্ত। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে এই কাব্যগ্রন্থ নৃত্য-গীতে রোজ পরিবেশিত হতো। উল্লেখ্য, পদ্মাবতী সেই কাব্যগীতে নিজে অংশ নিতেন। সহজিয়াগণ জয়দেবকে আদিগুরু ও নবরসিকের অন্যতম বলে থাকেন।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে 'গীতগোবিন্দ'র টীকার সংখ্যা চল্লিশেরও বেশি। এর অনুকরণে

'গীতগৌরীশ' প্রভৃতি অনেক কাব্য গ্রন্থ লেখা হয়েছিল। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে ভারতে ও ভারতের বাইরে মূল 'গীতগোবিন্দ' বইয়ের বহু সংস্করণ প্রকাশিত ও বিভিন্ন ভারতীয় এবং ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

কবি জয়দেবের নিজস্ব একটি দল ছিল। সে দলে কবি স্বয়ং গান বাঁধতেন, গান গাইতেন সুললিত কণ্ঠে এমনকি অধিকারীর ভূমিকাও পালন করতেন অন্তরের সবটুকু ভালবাসা উজাড় করে দিয়ে। কবি জয়দেবের পরমাত্মীয় হলেন পরাশর পণ্ডিত। সেই পরাশর এবং তাঁর মত আরও কয়েকজন পরমাত্মীয় ছিলেন জয়দেবের দলের 'দোহার' আর 'বায়ন'। জয়দেব জায়া পদ্মাবতী স্বয়ং সেই নাটগীতে নৃত্য ছন্দে প্রকাশ করতেন কবির ভাব।

* * * * * *

'গীতগোবিন্দ'র পর আসে 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন'।

'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন'-এ ছিল গীতগোবিন্দর প্রভাব। এই গ্রন্থে গীত-সংলাপ এবং নাটকীয় সংলাপ ছিল। এই গ্রন্থে প্রথম উক্তি-প্রত্যুক্তি ছিল বলেই দেখা গেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর 'যাত্রা'র অনেক লক্ষণ তাতে বিদ্যমান ছিল।

এরই মধ্যে এসে পড়ে মুসলমান রাজত্বকাল। এর ফলশ্রুতি, এ দেশের মাটিতে প্রবলতর হতে থাকে মুসলমান ধর্ম প্রচার।

এ প্রসঙ্গে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"বাঙ্গলায় পাঠানগণ আসিলে, পশ্চিমবঙ্গের কতক অংশ জয় করিয়া বসিলে, সহজিয়া ও বৌদ্ধগণ তাহাদিগকে খুব আদরের আসন দিয়াছিলেন—"

অখন্ড বাংলা দেশে যে মুসলমান ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল, তাতে কোরান অনুযায়ী ধর্ম অপেক্ষা সুফী মত বিশেষভাবে প্রচারিত হয়েছিল। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ভারত সংস্কৃতি' গ্রন্থের ১১৫ পাতায় এই মতের সমর্থন জানিয়ে বলেছেন—"সুফী মতের ইসলামের সহিত বাঙ্গলার সংস্কৃতির মূল সুরটুকুর কোন বিরোধ ছিল না—"

এই অভিমতেরও সমর্থন পাওয়া যায় ভূদেব চৌধুরীর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' বইয়ের ৯৮ পাতায়।

আদিযুগ বিপর্যয়ের শেষে, মধ্যযুগের সূচনায় তুর্কী আক্রমণ সার্থক বিপ্লব-প্রেরণারূপেই স্মরণীয়। যা হোক, তুর্কী আক্রমণ বা তুর্কী রাজত্বকালে পরাজিত জাতির যা কিছু মূলধন যেমন অর্থ, সামর্থ স্বাভাবিক ভাবে সবই বিপর্যস্ত হলো। এর পরেই শাসক শ্রেণীর হৃদয়হীনতা, প্রেমহীনতা এ দেশের পরাজিত জাতিকে বার বারই বাঁচার বা নতুন করে জাগার প্রেরণা জুগিয়েছে।

বাংলায় রাজত্ব করে এবং চারপুরুষ ধরে বসবাস করে এক সময়ের বিদেশী মুসলমানরা একটু একটু করে বাঙালি হতে থাকে। আর একটি সূত্র ছিল, তা হলো বাংলাদেশের মুসলমানরা ছিল বাঙালি। সুতরাং এখান থেকেই সূচিত হয় 'একতা বিন্যাস'। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় শাসক গোষ্ঠীও ছিল হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির পরিচয় লাভে আগ্রহী। শুধু তাই নয়, বাংলা ভাষা চর্চাও তারা শুরু করেছিল। সুতরাং এদেশের লোকভাষায় বিবর্তন দেখা দিল। বাংলা সাহিত্যের উপযোগী হয়ে উঠল লোকভাষা। মুসলমানরা তাদের ধর্মপ্রচার করতে থাকল, হিন্দুরা তৎপর হল তাদের ধর্ম প্রচারার্থে ভাগবত-পুরাণ-রামায়ণ ইত্যাদি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদে। এই সময়ে বাংলায় প্রথম কৃষ্ণলীলা বিষয়ক "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" নামে একটি বই লিখলেন মালাধর বসু। এটি মূলতঃ ভাগবতের অনুবাদ।

*　　*　　*　　*　　*　　*

যা কিছু অতীত তাকে ভিত্তি করেই বর্তমানের স্বভাব বিকাশলাভ করে।

আবার বর্তমানের যা কিছু সঞ্চয় তা পাথেয় করেই ভবিষ্যতের রূপ-রেখা অঙ্কিত হয়। আদি যুগের পরিণতি বা আবেগ মণ্ডিত পরিণামই মধ্যযুগের সামগ্রিক ভূমিকা বিকাশের সহায়ক হয়েছে। মধ্যযুগের সমাপ্তির যে সন্ধিলগ্ন সেখানেই আধুনিক যুগধর্ম-লোকধর্ম-লোকমানসের ভাব ও ভাবনার শৈশব সূচিত হয়েছে।

লক্ষ্মণ সেনের পরাজয় ও মৃত্যু বাংলা সাহিত্যের বা লোকধর্মের মধ্যযুগকে সূচিত করে। ১২৬০ সালে সেন রাজত্বের অবসানে মধ্যযুগের পূর্ণ বিকাশ। মধ্যযুগ আবির্ভাব লগ্নেই বাংলার লোকধর্মে-সাহিত্যে অনিবার্যভাবে যুক্ত হয়েছে মুসলিম আক্রমণের ইতিবৃত্ত। মহম্মদ বিন্-বখ্‌তিয়ার খিলজী রাঢ় ও বারেন্দ্রভূমি দখল করে লক্ষ্ণাবতীতে রাজধানী স্থাপন করেন। মাত্র দুই বছরের মধ্যে তাঁর শাসনকালের অবসান হলেও, গৌড়ের অধিকার ভোগ করতে একের পর এক অনেক সুলতানের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল।

১৩৪০ সনে বাংলা দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন সুলতান ফক্‌রউদ্দীন। তিনি বিক্রমপুর অঞ্চলের সোনারগাঁওতে রাজধানী স্থাপন করেন। যা হোক, এই পর্যায়ক্রমে কবি মালাধর বসুর কবি- প্রতিভা খুবই বিস্তার লাভ করেছিল। সুতরাং এখানে বাংলার কবি পর্যায়ের মূলতঃ প্রথম পুরুষ হিসেবে চিহ্নিত সেই মালাধর বসুর কথা কিছুটা বলে রাখা দরকার—

❑ মালাধর বসু ঃ

ভগীরথ বসু ও ইন্দুমতীর ছেলে মালাধর বসু জন্মেছিলেন বর্ধমানের এক কুলীন পরিবারে। তিনি "গুণরাজ খান" উপাধি পেয়েছিলেন। এই বংশের আদি পুরুষ দশরথ বসু। এর নেপথ্যে একটা তথ্যাভাষ আছে তা হলো,—কান্যকুব্জ থেকে আদিশূর যে পাঁচজন সৎ-কায়স্থ আনিয়েছিলেন, এই দশরথ সেই পাঁচজনের একজন। বল্লাল সেন এই বংশকে কুলীন মর্যাদা দিয়েছিলেন। স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভু এই 'কুলীন' গ্রামবাসীদের সম্মানিত করেছিলেন।

"গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।
তাঁহা একবাক্য আছে মহাপ্রেমময়।।
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
এই বাক্যে বিকাইলাম তাঁর বংশের হাত।।
তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেও মোর প্রিয় হয় অন্যে বহু দূর।।"

এই কবি সম্প্রদায় যুগ-ধর্মের নামে লোকধর্মের রূপ বর্ণনার ভিতর দিয়ে জাতি ধর্মের ভূমিকা প্রসঙ্গে সকলকে সচেতন করার গৌরবে গৌরবান্বিত। এই শতাব্দীতেই কৃত্তিবাস ওঝা বাংলায় প্রথম রচনা করেন "শ্রীরাম পাঞ্চালী"। আর এই শতাব্দীর শেষ লগ্নে রচিত হয় বিজয় গুপ্তের "মনসা পাঁচালী"। এই দু'জনের কথা একটু বলে রাখি বিস্তারিত।

❑ কৃত্তিবাস ওঝা ঃ

নদিয়ার ফুলিয়া গ্রামে ১৩৯৯ সনে, বনমালী ওঝার ছেলে, বাংলা ভাষার প্রাচীনতম কবি এই কৃত্তিবাস ওঝার জন্ম। কবির মূল রচনার পুঁথি যেমন সংগ্রহ করা যায়নি, তেমনি সংগ্রহ করা যায়নি তাঁর জন্ম তারিখ। তবে মূল রচনা যে 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' ১৮০২ অথবা ১৮০৩ সালে প্রথম ছাপা হয় শ্রীরামপুরে খৃষ্টান কয়েকজন যাজকের আন্তরিক চেষ্টায়। পরে এই 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ দুই খণ্ডে ১৮৩০ থেকে ৩৪ সালের মধ্যে প্রকাশ করেছিলেন জয়গোপাল

তর্কালঙ্কার। এই কবি গৌড়াধিপতি রাজা দনুজমর্দন কংস গণেশের সভাকবি ছিলেন। অনেকে আবার বলেছেন, তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণের সভাকবি ছিলেন কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাসের কবি প্রতিভার বিস্ময়কর স্ফূরণ ঘটেছিল আদি রামায়ণের অনেক ক্ষেত্রে রদবদল, স্বকল্পিত অংশ সংযোজন এবং আধুনিকতার স্বাদ দেবার জন্য। তাই বোধ করি আজও বাংলার ঘরে ঘরে এমন কি ভারতীয় হিন্দুদের ঘরে কৃত্তিবাসের অনূদিত রামায়ণের জনপ্রিয়তা অব্যাহত। এই 'রামায়ণ' কাহিনীর মধ্য দিয়ে কবি কৃত্তিবাস ওঝা তৎকালীন জাতি ধর্মের চেতনা জাগরণের ভিতর দিয়ে লোকধর্ম প্রতিষ্ঠার বিবর্তনের সূচনা করেছিলেন।

❑ **বিজয় গুপ্ত ঃ**

বরিশালের গৈলা ফুল্লশ্রী গ্রামে জন্মেছিলেন। বাবা, সনাতন গুপ্ত। গৌড়ের নবাব হুসেন শাহের সিংহাসনে আরোহণ করার দশ বছর আগে, লোকধর্ম প্রচারের ভিতর দিয়ে জাতি ধর্মের প্রচারার্থে যে বিজয় গুপ্ত মনসাদেবীর মাহাত্ম্য অবলম্বনে "পদ্মপুরাণ" গ্রন্থ রচনা শুরু করেছিলেন, শেষ করেছিলেন ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে। হুসেন শাহর সিংহাসনে বসার পর। গ্রন্থটি লিখেছিলেন পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে। পরে তাঁর 'মনসা মঙ্গল' গান বা 'মনসা পাঁচালী' গান ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুরে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। ইংরাজী ১৮৯৬ সালে বিজয় গুপ্তের 'পদ্মপুরাণ' বরিশাল থেকে বই আকারে প্রকাশিত হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে 'মনসাদেবীর মাহাত্ম্যে-এ চরম বিশ্বাসী মানুষের ধর্মভাবকে সজীব ও সতেজ রাখবার জন্যে বিজয় গুপ্ত গ্রামে মনসাদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এই ভাবে এখানে-সেখানে লোকধর্মের বিশেষরূপ সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল শুধুমাত্র জাতি ধর্মের প্রতি আনুগত্য স্পষ্ট করে তোলার জন্যে। এর কারণ, তৎকালীন মুসলমান রাজত্বে জাতি-ধর্ম প্রসঙ্গে নিত্য অশান্তি। হিন্দুধর্মকে নানা ভাবে খর্ব করার চক্রান্ত।

❑ **যশোরাজ খান ঃ**

১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ শেরিফ, মক্কা ; যিনি রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে দিলেন শুধু না, সেই সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর সভাসদ্‌দের কাব্য রচনায় উৎসাহ দিলেন। এই সময়ে তাঁর অন্যতম সভাসদ শ্রীখণ্ডের যশোরাজ খান ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে লিখলেন "কৃষ্ণ পাঁচালী"। ব্রজবুলীতে রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক পদ রচনায় তিনিই প্রথম এগিয়ে আসেন এবং যুগধর্ম বিবর্তনের অন্যতম প্রধান নজির তাঁর "কীর্তন" অঙ্গের গান অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এরপরই আমরা বিপ্রদাসের সন্ধান দেব।

❑ **বিপ্রদাস পিপলাই ঃ**

এখনকার ২৪ পরগণার বাদুড়্যা বটগ্রামে মুকুন্দ পিপলাই-এর ছেলে বিপ্রদাস পিপলাই জন্ম গ্রহণ করেন। 'মনসা মঙ্গল' কাব্য রচয়িতাদের মধ্যে যাঁরা অতি প্রাচীন, বিপ্রদাস তাঁদের একজন। ইনি হুসেন শাহর সভা কবি হবার পর থেকে কাব্য রচনায় বিশেষ মনোযোগী হন। ইনি ১৪৯৫ সালে 'মনসা বিজয়' রচনা করেন। যে বিজয় গুপ্তের কথা আগে বলেছি তিনি এবং বিপ্রদাস মূলতঃ একই সময়ে কাব্য রচনা করেন। বিপ্রদাস পিপলাইয়ের 'মনসা মঙ্গল'-এ চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য যাত্রার সময়কার সুপ্রাচীন সপ্তগ্রামের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

❑ **কবীন্দ্র পরমেশ্বর ঃ**

বাংলার নবাব সুলতান হুসেন শাহের অধীনে তখন চট্টগ্রাম। সেই চট্টগ্রামের শাসনকর্তা এবং জায়গীরদার ছিলেন রাস্তি খানের ছেলে পরাগল খান। এই পরাগল খানের সভা কবি ছিলেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর। পরাগল খান তাঁর সভাকবি পরমেশ্বরকে দিয়ে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করান। সেই গ্রন্থ বা পুঁথির নাম ছিল 'পান্ডব বিজয়'। যেহেতু শাসনকর্তা পরাগলের নির্দেশে এই

কাব্য সৃষ্টি, সেই হেতু পরমেশ্বরের কাব্যরচনায় সম্পূর্ণ মৌলিকতা ছিল না, অনেকাংশে পরাগল খানের মত করেই লিখতে হয়েছিল বলে 'পান্ডব বিজয়'-এর অন্য নাম ছিল, 'পরাগলী মহাভারত'। এই কাব্যগ্রন্থ থেকে জানা যায় পরাগল খানের বাবা রাস্তি খানও এক সময়ে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন।

এই সব কাব্য কাহিনী রচনা এবং তা আর পাঁচজনের মধ্যে মনের খোরাক হিসেবে পরিবেশন করার ভিতর দিয়ে বৃহত্তম বঙ্গদেশের সর্বত্র এক সংস্কৃতি চর্চার বিকাশলাভই বোঝায়। এ প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন সে যুগের যে তথ্যগত বর্ণনা দিয়েছেন তা এই রকম ঃ

"এই সময়ে মনসার কাহিনী, ধর্মের কাহিনী, চণ্ডীদাসের কাহিনী ইত্যাদি দেশীয় বস্তু এবং রামকাহিনী ও কৃষ্ণলীলা কাহিনী ইত্যাদি পৌরাণিক বস্তু ছোট-বড় গানে অথবা পাঁচালীতে বাদ্য ও নৃত্যের যোগে পরিবেশিত হইত গ্রামোৎসবে অথবা দেবপূজা উপলক্ষ্যে দেব মন্দিরে—"।

সম্রাট হুসেন শাহের রাজত্বকালেই পল্লীকবি বড়ু চণ্ডীদাস "শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন" নাটগীত লেখেন। সেটা ১৫০০ খৃষ্টাব্দে।

❑ **কবি চণ্ডীদাস ঃ**

বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। তবুও অনেক প্রশ্ন থেকে গেছে চণ্ডীদাসকে ঘিরে। চণ্ডীদাস তা হলে ক'জন? এর মূলে আছে একাধিক "মন্দ ঃ কবি-যশ প্রার্থী" চণ্ডীদাসের বাংলা পদ। অথচ সন্দেহ দেখা দেয় তখন যখন চণ্ডীদাসের ভণিতায় বহু উৎকৃষ্ট কবিতার যেমন সন্ধান মেলে, তেমনি তাঁর নামে চালু দ্বিতীয় শ্রেণীর নিকৃষ্ট পদও অনেক পাওয়া গেছে।

এই প্রশ্ন আরও জটিল হয়েছে তখন যখন বড়ু চণ্ডীদাসের লেখা "কৃষ্ণ কীর্তন" কাব্যের পুঁথি পাওয়া গেছে। জানা যায়, ১৩১৬ সনে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ নামে একজন পণ্ডিত, প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহের জন্য যখন সারা দেশময় ঘুরছিলেন তখন একদিন তিনি বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে কাকিল্যা নামের এক গ্রামে যান এবং সেখানে এক সাধারণ গৃহস্থের বাড়ির গোয়ালঘর থেকে 'কৃষ্ণ কীর্তন'-এর পুঁথি আবিষ্কার করেন। দুর্ভাগ্য, সেই পুঁথির না ছিল প্রথম দিকের কিছু পাতা, না ছিল মাঝের কিছু অংশ। এমন কি শেষের কিছু অংশও পাওয়া যায়নি। কিন্তু পাঠোদ্ধারে স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল এর উপজীব্য ছিল 'রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা'। শেষ পর্যন্ত পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় নিজে সেই পুঁথি সম্পাদনা করেন। তারপর তার নাম রাখেন 'কৃষ্ণ কীর্তন'। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' তার পুঁথির ভাণ্ডারের অমূল্যরতন থেকে সেই 'কৃষ্ণ কীর্তন' পুঁথি বই আকারে প্রকাশ করে।

কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এর প্রভাব দেখা দেয় 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন'-এ। এ প্রসঙ্গে গবেষক-অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু বলেছেন,—"শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে মহাকাব্য ও গীতিকাব্যের অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছে। কবি সংস্কৃত ভাষায় রচিত কাব্য গ্রন্থাদির সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। বোধ হয় ঐ সকল গ্রন্থপাঠে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যের সেই আদি যুগে মহাকাব্য গীতিকাব্য ও নাটকের সংমিশ্রণে এই গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকিবেন।"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চণ্ডীদাস সম্বন্ধে বলেছেন—"বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি—। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নেই। বিদ্যাপতি এসবের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন। চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি। চণ্ডীদাস সুখের মধ্যে দুঃখ এবং দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার সুখের মধ্যেও ভয়-দুঃখের প্রতি অনুরাগ—"

❑ **কবি বিদ্যাপতি ঃ**

কবি জয়দেব থেকে চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতি কবি প্রতিভার বিকাশ পর্যালোচনা করলে, পুরাতন পুঁথি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় তৎকালীন লোকজীবনের ধর্ম-কর্ম

আচার এবং দেব-দেবীর পূজা-বিধি ও প্রকরণ, কবি কুলের ভাব ও ভাবনার প্রতিফলন। সুতরাং গীতগোবিন্দে যেমন গীত্-নাটকম্-এর প্রচ্ছন্ন ছাপ, ঠিক তেমনি করেই "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" নাট-গীতের উৎস।

বিদ্যাপতি মিথিলার রাজকবি। জন্ম পণ্ডিত পরিবারে। বাবা গণপতি ঠাকুর মহারাজ গণেশ্বরের সুহৃদ ছিলেন। তাঁর লেখা "গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিনী" মহারাজের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। বিদ্যাপতি ছিলেন বহুগুণের আধার। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। বিদ্যাপতি শুধু কবি নন, ছিলেন ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, স্মার্ত পণ্ডিত, পুরাণবিদ। মহারাজ শিবসিংহ তাঁকে "পুরুষ পরীক্ষা" গ্রন্থ রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিলেন। মামুদ গজনীর সময় থেকে বিদ্যাপতির সময়কাল পর্যন্ত যাঁরা কর্মে, ব্যক্তিত্বে, পৌরুষের দিক থেকে আদর্শ ছিলেন সংস্কৃতে তাঁদের কাহিনী এই বইতে তুলে ধরা হয়েছিল। তাঁর লেখা বহু বইয়ের মধ্যে ভৈরব সিংহের প্রীতিতে প্রণতি জানাতে লেখা 'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কবির আর একটি বই "দানবাক্যাবলী"ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলার বারো মাসে তেরো পার্বন নিয়ে রচনা করেছেন 'বর্ষক্রিয়া', আবার গ্রাম ও নগর জীবনের ওপর লেখা "ভূ-পরিক্রমা"। দায়ভাগকে উপজীব্য করে লিখেছেন "বিভাগ সার" ইত্যাদি। মহারাজ শিবসিংহ তাঁকে 'কবি কণ্ঠহার' (কবিরঞ্জন) উপাধি দেন।

'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' থেকে বাংলার লোকসংস্কৃতি, বাংলার পালা সাহিত্য বা যাত্রাগানের উৎস ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে যুগ বিবর্তনের গবেষণা বা পরবর্তী সাহিত্য সাধনা যাঁদের লক্ষ্য তাঁদের জন্য এখানে সামান্য হলেও সূত্র উল্লেখ করছি মাত্র। তবুও বিদ্যাপতি প্রসঙ্গে আরও কিছুটা বিশদ আলোচনা দরকার বলে মনে করি।

যতদূর জানা যায় গণপতি ঠাকুরের এই কবিপুত্রের জন্ম হয় ১৩৭৪ বঙ্গাব্দে সীতামারী মহকুমার বিস্ফী নামের এক গ্রামে। রাজা বল্লাল সেন যখন সিংহাসনে বসেন তখন তিনি বাংলাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে নিয়ে শাসনকাজ চালাতেন। এর একটি ভাগের নাম মিথিলা। সেই মিথিলার রাজকবি বলে অনেকেই তাঁকে বাঙালী হিসেবে মেনে নিতে পারেন না। কিন্তু বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেনের নামে যে লক্ষ্মণাব্দ মিথিলায় প্রচলিত ছিল তা বিশ্লেষণ করলে বিদ্যাপতি বাঙ্গালী তা অনায়াসেই দাবী করা যায়। বিদ্যাপতি প্রথম সংস্কৃত শিখেছিলেন হরি মিশ্রের কাছে। কীর্তিসিংহ মিথিলার রাজসিংহাসনে যখন বসেন তখন বিদ্যাপতিকে সভাপণ্ডিত করেন। এই সময়ে রাজার নির্দেশে হোক বা রাজাকে স্বপ্রতিভার নজির উপহার দেবার জন্যেই হোক তিনি রচনা করেন "কীর্তিলতা"। এরপর রাজা হন দেবসিংহ। দেবসিংহের পর শিবসিংহ। শিবসিংহের পত্নী লছিমা দেবীর সঙ্গে বিদ্যাপতির প্রণয় ছিল এটা বিশেষ ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিদ্যাপতির কবিখ্যাতি লাভ হয়েছিল রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা আশ্রিত গীত রচনার জন্য। তাই তাঁকে প্রেমের কবিও বলা হয়। প্রায় দশটি বই লিখেছিলেন সংস্কৃতে। তার মধ্যে দু'টি 'স্মৃতি' পর্যায়ের বই।

বিদ্যাপতির ওপরে গবেষণা প্রথম করেন বীমস্, সম্ভবতঃ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে। বিদ্যাপতিকে নিয়ে বড় মাপের গবেষণা হওয়া দরকার এই সত্য বীমস্ প্রথম উপলব্ধি করেন। পরে গবেষণায় এগিয়ে আসেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও গ্রীয়ার্সন প্রমুখ। এরপর দ্বারভাঙ্গার মহারাজার সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়ে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিদ্যাপতির ওপরে শুধু নয় সাহিত্যকীর্তির ওপরে বিশদ আলোচনা করেন। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কবি বিদ্যাপতির সমস্ত গানের একটি মনোজ্ঞ সংকলন প্রকাশ করেছিলেন।

বিদ্যাপতি নামে বা উপনামে একাধিক কবির বা পণ্ডিতের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলায় প্রচলিত বিদ্যাপতির যত পদ পাওয়া যায় তা সংখ্যার দিক থেকে বেশি নয়। আবার সেগুলি খুব বেশি প্রাচীন নয় বলে বহু গবেষকই সিদ্ধান্ত পোষণ করেছেন। তবে কীর্তন গায়ক যাঁরা আর

পদাবলী রচয়িতা যাঁরা তাঁদের মুখে এবং লেখনীতে, অধিকাংশ ব্রজবুলিপদের ভণিতায় বিদ্যাপতির নাম বার বার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অনেক গবেষক-ঐতিহাসিক মনে করেন, চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পব যখন শান্তিপুরে গিয়েছিলেন, তখন যে গানের সঙ্গে অদ্বৈত নেচেছিলেন সেই গান বিদ্যাপতির সবচেয়ে প্রাচীন 'ধ্রুব গীত'।

একটি ব্যাপার আমাদের মনে রাখতেই হবে তা হলো, 'গীতগোবিন্দ'-এর মতই 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে'ও অঙ্কিত হয়েছিল তিনটি বিশিষ্ট এবং প্রধান চরিত্র। কৃষ্ণ, রাধা আর দূতি। বড় আশ্চর্য লাগে যখন জানতে পারি "গীতগোবিন্দম্" আর "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" এই দুই কাব্য গীতিমাল্যে "দূতি"-ই প্রধান চরিত্র। এই তিন চরিত্রের কণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীত সুধাই পান করেছিলেন নগরবাসী।

চৈতন্যের কাল ঃ

আজ সন্ধ্যায় সেই সুধা বিতরণ।

দলে দলে পায়ে পায়ে ধুলো উড়িয়ে, খুশিব নিশান উড়িয়ে নগরবাসী চলেছে আচার্যের অঙ্গনে। ...আজ মাটিতে চাঁদের উদয় হবে। গৌরচাঁদের এমন রূপ নদিয়ার কে-ই বা দেখেছে আগে? চারদিকে রটেছে, সবাই জেনেছে আজ আচার্যের অঙ্গনে বসবে 'কৃষ্ণকীর্তন'-এর আসর। প্রধান রূপকার আর কেউ নয়, স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভু। আরও আছে তালিকা।

শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে অবতীর্ণ হবেন, অদ্বৈতাচার্য। শ্রীরাধিকা আর রুক্মিণীর বেশে অবতীর্ণ হবেন স্বয়ং মহাপ্রভু।

নিত্যানন্দ সাজবেন, দূতি অর্থাৎ বড়ায়ি।

নারদ হবেন শ্রীবাস। তাই হয়েছিল। লাঠির মাথায় ন্যাকড়া জড়িয়ে সেই ন্যাকড়া তেলে ভিজিয়ে অগ্নি সংযুক্ত করে যে আলো, তাকে উপেক্ষা করে ভরা পূর্ণিমার চাঁদের আলো সেদিন সেই আসবকে করেছিল প্রভান্বিত। নগরবাসীরা বৃত্তাকাবে বসে উপভোগ করেছিলেন সেই অপরূপ কাব্যগীতিমাল্য।

চৈতন্য মহাপ্রভু যখন জন্মগ্রহণ করেন তখনও লোকসমাজে কৃষ্ণকীর্তনের প্রচলন ছিল না। লেখা হয়েছিল ১৫০০ খৃষ্টাব্দে। তবে চৈতন্যের যৌবনে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' প্রচলিত ছিল। এই কাব্যগীতিমাল্যে কিন্তু চণ্ডীদাস সঙ্গীতের সঙ্গে অতিরিক্ত কোন সংলাপ ব্যবহার করেননি। কিন্তু চৈতন্যদেব যখন গীতিমাল্যে স্বয়ং অবতীর্ণ হন তখন তিনি নিজে কিছু কিছু সংলাপ ব্যবহার করেছিলেন। সেই সংলাপের কিছু কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা দরকার—

"ডাকি বোলে হরিদাস কেসব তোমরা।
ব্রহ্মানন্দ বোলে যাই মথুরা আমরা।।
শ্রীবাস বোলয়ে তুই কাহার বণিতা।
ব্রহ্মানন্দ বোলে কেনে জিজ্ঞাস বারতা।।
শ্রীনিবাস বোলে জানিবারে না জুয়ায়।
'হয়' বলি ব্রহ্মানন্দ মস্তক ঢুলায়।।

চৈতন্যদেবের সময়ে মঞ্চ তৈরি করে অভিনয় হতো না। মাটিতে নববস্ত্র বিছিয়ে দেওয়া হতো, সেই আসরেই অভিনয় হতো। চতুর্দিকে বৃত্তাকারে বসতেন মহাপ্রভুর পার্ষদরা ও নগরবাসী। এই সূত্র থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, যাত্রার প্রচলিত আসর ব্যবস্থা মহাপ্রভুর আসর রচনার রীতি অনুসারে। যা হোক, চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহ অঙ্গনে মহাপ্রভুর অভিনয় লীলা প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছিলেন ঃ

"আচার্যরত্নের নাম শ্রীচন্দ্রশেখর।
যার ঘরে দৈবীভাবে নাচিলা ঈশ্বর।।"

এই কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রসঙ্গে একটু বলে নেওয়া দরকার।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঃ

আনুমানিক ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে বর্ধমানের কাটোয়ার নিকটবর্তী বহরাল স্টেশনের কিছু দূরে ঝামটপুরে ভগীরথের ছেলে কৃষ্ণদাসের জন্ম। 'চৈতন্য চরিতামৃত' রচয়িতা, পরমভক্ত, কবি এবং পণ্ডিতপ্রবর এই কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাসের দারিদ্র্য ছিল না। একদিন কৃষ্ণদাসের বাড়িতে অহোরাত্রি হরি সংকীর্তন হয়েছিল। ঐ দিন গ্রামবাসী নিত্যানন্দের প্রিয় সহচর মীনকেতন রামদাস এসেছিলেন নিমন্ত্রিত হয়ে। সেখানে কৃষ্ণদাসের ভাই নিত্যানন্দপ্রভু প্রসঙ্গে অশ্রদ্ধা দেখালে মীনকেতন রামদাস অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং সেই মুহূর্তে চলে যান। এই ঘটনায় কৃষ্ণদাস আহত হন। একদিন কৃষ্ণদাস যেন ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখলেন, নিত্যানন্দ মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যেতে বলছেন। এর পরেই কৃষ্ণদাস ঘর-সংসার সব ত্যাগ করেন। বৃন্দাবনে গিয়ে তিনি রূপ গোস্বামী, জীব গোস্বামী, রঘুনাথ গোস্বামীর সঙ্গ লাভ করেন। বৃন্দাবনে বসেই কৃষ্ণদাস কাব্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেন। শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলা প্রসঙ্গে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ২৫৮৮টি শ্লোক সংস্কৃত ভাষায় রচনা করে মূলতঃ মহাকাব্য রচনার মর্যাদা পান। শ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণদেশে অবস্থান করার সময়ে যে 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' কাব্য অনুলিখন করে এনেছিলেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'সারঙ্গ রঙ্গদা' নামে তার টীকা লেখেন। জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে এক টানা সাত বছর পরিশ্রম করে ১০৫০টি পয়ার এবং ১০১২টি শ্লোকে "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" রচনা করেন। ঐ শ্লোকগুলির মধ্যে ৯৭টি তাঁর নিজের লেখা। বাকিগুলি পুরাণ, স্মৃতি, কাব্য এবং বিশেষ ভাবে রূপ গোস্বামী, কবি কর্ণপুর, রঘুনাথদাস গোস্বামীর বই থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।

মুরারী গুপ্তের কড়চা, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ইত্যাদিতে চৈতন্যদেবের শেষ জীবনের কথা, তাঁর দিব্যোন্মাদ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, চৈতন্যচরিতামৃতের পুঁথি চুরি হয়ে যায়। এই ঘটনায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ খুবই ব্যথা পান। শুধু তাই নয় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে রাধাকুণ্ডের জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

এই আত্মহত্যার বিবরণ আছে 'প্রেমবিলাস' ও 'কর্ণানন্দে'।

❑ কবি-কর্ণপুর ঃ

নদিয়া জেলার কাঁচড়াপাড়ার শিবানন্দ সেনের ছেলে পরমানন্দ সেনের জন্ম ১৫২৫ সালে। শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ শিবানন্দের ছেলে এই পরমানন্দ। পরমানন্দ মাত্র সাত বছর বয়সে মহাপ্রভুকে একটি শ্লোকে ব্রজাঙ্গনাদের কর্ণভূষণের শ্লোক শুনিয়ে 'কর্ণপুর' উপাধি পেয়েছিলেন। ১৫৪২ সালে সংস্কৃতে 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত', 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়' নাটক, 'গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা' নাটক, 'আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ' কাব্য, 'অলঙ্কার কৌস্তুভ' রচনা করেছিলেন। পরমানন্দ ভণিতা যুক্ত যে ১২টি পদ পদকল্পতরুতে পাওয়া যায় অনেকে মনে করেন তা চৈতন্য সমসাময়িক পরমানন্দের রচনা।

চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহ অঙ্গনে শ্রীচৈতন্যদেবের যে অভিনয় লীলার কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, সেই অভিনয় লীলার বর্ণনা দিয়েছিলেন কবি কর্ণপুর তাঁর "চৈতন্য চন্দ্রোদয়" নাটকে। তেমনি বৃন্দাবন দাসও মহাপ্রভুর সেই অভিনয় লীলার বিবরণ দিয়েছেন। সেই বিবরণ ছিল এই রকম ঃ

"সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানেরে ডাকিয়া।
বলিলেন প্রভু কাচ সজ্জ কর গিয়া।।
শঙ্খ কাঁচুলি পাট শাড়ি অলঙ্কার।
যোগ্য যোগ্য করি সজ্জ কর সভাকার।।
গদাধর কাচিবেন রুক্মিণীর কাচ।
ব্রহ্মানন্দ তাঁর বুড়ী সখী সুপ্রভাত।।
নিত্যানন্দ হইবেন বড়াই আমার।
কোতয়াল হরিদাস জাগাইতে ভার।।
শ্রীবাস নারদ-কাচ স্নাতক শ্রীরাম।
দিয়ড়িয়া হাড়ি-মুঞি গেলয়ে শ্রীমান।।

* * * *

সর্বগণ সহিত ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
চলিলা আচার্য চন্দ্রশেখরের ঘর।।"

অভিনয়লীলার সূচনায় পরিবেশিত হলো কীর্তন। কীর্তন শেষে হরিদাস আত্মপ্রকাশ করলেন উন্মুক্ত আসরে। এ প্রসঙ্গে বৃন্দাবন দাস বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

"প্রথমে প্রবিষ্ট হৈলা প্রভু হরিদাস।
মহা দুই গোঁফ করি বদন বিলাস।।
মহাপাগ শোভে শিরে ধটী পরিধান।
দণ্ডহস্তে সভারে করয়ে সাবধান।।
আরে আরে ভাই সব হও সাবধান।
নাচিব লক্ষ্মীর বেশে জগতের প্রাণ।।"

এরপরই নারদবেশী শ্রীবাস এলেন আসরে। বৃন্দাবন দাস লিখলেন ঃ

"ক্ষণেক নারদ-কাচ কাচিয়া শ্রীবাস।
প্রবেশিলা সভামাঝে করিয়া উল্লাস।।
মহাদীর্ঘ পাকা দাড়ি ফোঁটা সর্বগায়।
বীণাকান্ধে কুশ হস্তে চারিদিগে চায়।।
রামাই পণ্ডিত কক্ষে করিয়া আসন।
হাতে কমণ্ডলু পাছে করিলা গমন।।"

এবার সকলের চিত্ত বিচলিত হলো। সবার চোখের মণি অস্থির হলো। কোথায় মহাপ্রভু? কারও দেরি যেন সয় না। এমন সময় রুক্মিণীরূপে সজ্জিত শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ধীর পদক্ষেপে এলেন আসরে। এর বর্ণনা দিয়েছেন কবি। তিনি রচনা করেছেন ঃ

"গৃহান্তরে বেশ করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
রুক্মিণীর ভাবে মগ্ন হইলা নির্ভর।।
আপনা' না জানে প্রভু রুক্মিণী-আবেশে।
বিদর্ভের সুতা হেন আপনারে বাসে'।।
নয়নের জলে পত্র লিখয়ে আপনে।
পৃথিবী হইল পত্র আঙ্গুলী কলমে।।"

প্রথমে মহাপ্রভু রুক্মিণী রূপে আসরে অবতীর্ণ হয়ে সকলের হৃদয়ে রাশি রাশি আনন্দ ঢেলে দিলেন। দ্বিতীয় প্রহরে প্রভু অবতীর্ণ হলেন আদ্যাশক্তি শ্রীরাধিকা রূপে।

কবি বর্ণনা দিলেন ঃ

"হেনই সময়ে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
প্রবেশ করিলা আদ্যাশক্তি-বেশধর।।
আগে নিত্যানন্দ বুড়ী বড়াইর বেশে।
বঙ্ক বঙ্ক করি হাঁটে, প্রেমরসে ভাসে।।"

* * * *

আদ্যাশক্তি বেশে নাচে প্রভু গৌরসিংহ।
সুখে দেখে তাঁর যত চরণের ভৃঙ্গ।।
কম্প স্বেদ পুলক অশ্রুর অন্ত নাঞি।
মূর্ত্তিমতী ভক্তি হৈলা চৈতন্য গোসাঞি।।"

এই সময়েও বিশেষ বিশেষ উৎসব বা পার্বনে যাত্রাগানের প্রচলন ছিল, তার প্রমাণ আচার্য চন্দ্রশেখরের বাড়ির আঙ্গিনায় মহাপ্রভুর এই লীলাভিনয়। যেদিন মহাপ্রভু এই লীলাভিনয় করেন সেদিন ছিল "রুক্মিণী দ্বাদশব্রত" তিথি। সেই তিথি ছিল বলেই মহাপ্রভু লীলাভিনয় করেছিলেন। এর পরও তিনি একটি গীতিমাল্য করেছিলেন। তাও ছিল কৃষ্ণযাত্রা। সে পালার নাম ছিল 'ব্রজলীলা'।

❑ বুদ্ধিমন্ত খানের বাড়িতে যাত্রা ঃ

কে বুদ্ধিমন্ত খান? নবদ্বীপের জমিদার। তিনি ছিলেন মহাপ্রভুর ভক্ত। তাঁর অট্টালিকার অভ্যন্তরে যে বিশাল দালান, সেই দালানে মহাপ্রভুর অভিনয়লীলা হয়েছিল। সেদিন যাঁরা অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা হলেন নিত্যানন্দ, হরিদাস, শ্রীবাস, ব্রহ্মানন্দ, মুরারি গুপ্ত, শ্রীরাম, অদ্বৈতাচার্য, গদাধর। এখানে প্রথম প্রহরে শ্রীরাধিকারূপে অভিনয় করেছিলেন গদাধর, আর দ্বিতীয় প্রহরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য! বিদূষক বেশে অভিনয় করেছিলেন অদ্বৈতাচার্য।

আজকের যাত্রার সঙ্গে মহাপ্রভুর এই অভিনয় লীলার কোন সম্পর্ক নেই বটে, কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভুই যে আজকের যাত্রাগানের প্রাথমিক পর্যায়ের প্রবর্তক তাতে কোন সন্দেহ নেই। ষোড়শ শতাব্দীতে যাত্রার বীজ বপন হয়েছিল এ দেশের লোক মানসে, তারই অঙ্কুর দেখা দিয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীতে। তবে অনেকেই মনে করেন, বিশেষ করে হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য তাঁর গবেষণা গ্রন্থে [যাত্রাগানে মতিলাল রায়] যা বলেছেন তা হলো, যাত্রা গানের অঙ্কুর দেখা দিয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীতে তা সত্য, কিন্তু এর বীজ বপন করা হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীরও আগে, সেই চতুর্দশ বা দ্বাদশ শতাব্দীতে!...

আমি আগেই সেযুগের শ্রীচৈতন্যর লীলাভিনয়ের কথা বলেছি। এই লীলাভিনয়ের ভিতর দিয়ে আমাদের দেশে, বিশেষ করে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে আর এক অপূর্ব সম্মিলিত গীতিমাল্যের প্রবর্তন করেন শ্রীচৈতন্য, তারই নাম সংকীর্তন। এই সংকীর্তনের সুর ও ভাব দেশবাসীকে ধর্মভাবে উদ্বুদ্ধ করে। তারই ফলশ্রুতি, নবদ্বীপ শুধু নয়, শান্তিপুর তথা গোটা নদিয়া জেলার ঘরে ঘরে মানুষ মেতে ওঠে সংকীর্তনে। পল্লীতে পল্লীতে একের পর এক আখড়া গড়ে ওঠে। ক্রমশ এই কৃষ্ণলীলার মাধুর্য আস্বাদনের প্রাবল্য দেখা দেয়। আর জনপ্রিয় হয়ে ওঠে মান এবং মানভঞ্জন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এই কৃষ্ণকীর্তনে মেতে যাওয়ার পরই শাক্ত সম্প্রদায়ের মানুষও আর এক শ্রেণীর কীর্তনে মেতে উঠল। সেই কীর্তনই 'কালীকীর্তন'। এই 'কালীকীর্তন' মূলত রামপ্রসাদ সেনেরই আবদান।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সখ বা আনন্দ বিনোদনের জন্য কৃষ্ণযাত্রাভিনয় বা সংকীর্তনকে প্রাধান্য দেননি। এই সংকীর্তনের সংগীত ও বিষয়-ভাব এবং অভিব্যক্তিকে অপরূপ কারুকার্যে মণ্ডিত করে গণচেতনা, গণজাগরণের জন্য ব্যবহার করেছিলেন। দিকে দিকে এর প্রচার ঘটুক এই মানসিকতায় স্বয়ং চৈতন্যদেব সেই সংকীর্তন বা কৃষ্ণযাত্রার রূপকার হয়েছিলেন।

নীলাচলে চৈতন্যদেবের লীলাভিনয় ঃ

চৈতন্য চরিতামৃত থেকে, — "চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস। চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস" — জীবনের শেষ চব্বিশ বছর শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু নীলাচলে বাস করেছিলেন। সেখানে থাকাকালীন রাজা প্রতাপরুদ্রের সহায়তায় তিনি বার কতক অভিনয় করেছিলেন। জন্মাষ্টমীর সময় 'নন্দ উৎসব' হয়। তখন চৈতন্যদেব 'ব্রজলীলা' লীলাভিনয় বা যাত্রাগান করেছিলেন। এই যাত্রাগানে আর যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেন — কাশী মিত্র, নিত্যানন্দ, সার্বভৌম, কানাই খুঁটিয়া, তুলসী পাত্র, জগন্নাথ মাইতি আরও অনেক বৈষ্ণব পণ্ডিত। প্রসঙ্গত বলা দরকার, রাজা প্রতাপরুদ্রও মহাপ্রভুর সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। এ প্রসঙ্গেও কৃষ্ণদাস কবিরাজ আরও বলেছেন —

"এত মত নানা রঙ্গে চতুর্মাস্য গেলা।
কৃষ্ণ-জন্ম যাত্রায় প্রভু গোপবেশ হৈলা।।
কৃষ্ণ-জন্ম যাত্রা দিনে নন্দ মহোৎসব।
গোপ বেশ হৈলা প্রভু লইয়া ভক্ত সব।।
দধি-দুগ্ধ ভার সবে নিজ স্কন্ধে করি।
মহোৎসব স্থানে আইলা বলি হরি হরি।।
কানাই খুঁটিয়া আছে নন্দ বেশ ধরি।
জগন্নাথ মাহিতি হইয়াছে ব্রজেশ্বরী।।
আপনে প্রতাপরুদ্র আর মিত্র কাশী।
সার্বভৌম আর পরিছাপত্র তুলসী।।
ইঁয়া সব লৈয়া প্রভু করে নৃত্যরঙ্গ।

এই অভিনয়ে গোপবেশী চৈতন্যদেবের লাঠি খেলা ব্যাপারটা দর্শকরা সেদিন বিশেষভাবে উপভোগ করেছিলেন, তাও আমরা জানতে পারি 'চৈতন্য চরিতামৃত' থেকে ঃ

"...অলাত চক্রের প্রায় লগুড় ফিরায়।
দেখি সব লোকচিত্তে চমৎকার পায়।।"

বিজয়া দশমীতেও চৈতন্যদেব সদলবলে ঐ নীলাচলেই 'রাবণ বধ' যাত্রাগান করেছিলেন। স্বয়ং মহাপ্রভু হনুমানের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এই প্রসঙ্গটিও অতি চমৎকারভাবে 'চৈতন্য চরিতামৃতে' বর্ণিত হয়েছে ঃ

"বিজয়াদশমীলংকা-বিজয়ের দিনে।
বানর সৈন্য হৈল প্রভু লইয়া ভক্তগণে।।
হনুমান বেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লৈয়া।
লঙ্কার গড়ে চড়ি ফেলে গড় ভাঙ্গিয়া।।
কাঁহা রে রাবণা প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
জগন্মাতা হরে পাপী, মারিমু সবংশে।।
গোঁসাইর আবেশ দেখি লোক চমৎকার।
সর্বলোক জয়জয় বলে বার বার।।"

চৈতন্যদেবের 'কৃষ্ণলীলা' দীর্ঘ সময় ধরে চলত। আচার্য চন্দ্রশেখরের বাড়িতে যখন অভিনয় লীলা হয়েছিল তখনও রাত ভোর হয়ে গিয়েছিল। এই শ্রেণীর পালার যে বৈশিষ্ট্য তখন থাকত সেগুলি এই রকম ঃ

যাত্রাপালা আগে থাকতে বাঁধা বা লেখা থাকত না। তবে গান বাঁধা থাকত।

বর্তমানেও এই ধারা সামান্য হলেও টিকে আছে। এখন আর অধিকাংশ পালা আগে লেখা হয় না। আগে স্থির হয়, কোন যাত্রা দলে শিল্পীতালিকার প্রথম শিল্পী কে, বা কে কে? সেই শীর্ষস্থানীয় শিল্পী কি ধরনের চরিত্রে অভিনয় করলে দর্শককুলের মন ভরতে পারে তা অধিকাংশ পালাকার জানেন। তাই প্রথম যাত্রাদলের মালিকের সঙ্গে পালাকার স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান, দলে শীর্ষস্থানীয় শিল্পী কে বা কারা? মালিক যদি জানাতে পারেন, তা হলে পালাকার সেই শিল্পীকে মনের মধ্যে রেখে পালার নামকরণ করেন। তারপর সেই নামটির ওপর নির্ভর করে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। বিজ্ঞাপনে পালার নামটি পড়ে নায়েক পক্ষ বায়না নিতে থাকেন। যদি অল্প সময়ের মধ্যে দেখা যায় 'নামকরণ' সার্থক হয়েছে, তখন পালাকার নামটিকে মনের মধ্যে গেঁথে নিয়ে পালা রচনায় হাত দেন। পালা রচনার পূর্বে কয়েকটি গান লেখা হয়, মূল পালার মহলা আরম্ভ করার আগেই অনেক ক্ষেত্রে সুরকাররা গানে সুর বসান। যা হোক, চৈতন্য মহাপ্রভুর সেই সব গানেব সঙ্গে উপস্থিত বুদ্ধি ও প্রয়োজন অনুসারে পাত্র-পাত্রীরা নিজেরাই বানিয়ে সংলাপ বলতেন। বলা বাহুল্য, এই সব পালাগানে মেয়েদের চরিত্রে পুরুষেরাই অভিনয় করতেন।

যে লীলাভিনয়ে বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা চরিত্র থাকত মূলত তারা পালাভিনয়ের হাস্যরস পরিবেশন করত বিভিন্ন ভাব-ভঙ্গিমায়। যেমন ব্রহ্মানন্দ অভিনীত বড়াই বুড়ি অথবা শ্রীবাস অভিনীত বৃদ্ধ নারদ দর্শকদের হাসির খোরাক হয়ে উঠেছিল। এ প্রসঙ্গে 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে' আছে ঃ

"পাকিল দাড়ী মাথার কেশ।
বামন শরীর মাকড় বেশ।।
নাচএ নারদ ভেকের গতি।
বিকৃত বদন উমত মতী।।"

* * * *

"না না পরকার করে অঙ্গ ভঙ্গ।
তাক দেখি সব লোকের রঙ্গ।।......"

যেহেতু চৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন 'যাত্রা' শব্দ বা সংস্কৃতির অন্যতম প্রবক্তা এবং স্বয়ং যাত্রাপালার বা নাট্যাভিনয়ের নানা চরিত্রের রূপকার, সেই হেতু আমি এখানে মহাপ্রভু এবং তাঁর সহচর বা সহ অভিনেতাদের কিছুটা পরিচয় তুলে ধরছি ঃ

❑ **চৈতন্যদেব ঃ**

নবদ্বীপ-নদিয়ায় ১৪৮৫-৮৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম। বাবা জগন্নাথ মিশ্র। চৈতন্যদেবের পিতৃদত্ত নাম বিশ্বম্ভর। পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্রের আদি নিবাস ছিল শ্রীহট্ট। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক এই মহাপুরুষ নিমাই, গৌরাঙ্গ, মহাপ্রভু, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য এবং চৈতন্যদেব ইত্যাদি নামে সমধিক পরিচিত। মহাপ্রভুর যখন ছয়-সাত বছর বয়স তখন তাঁর বড়ভাই বিশ্বরূপ সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন। যা হোক, উপনয়নের পর বিশ্বম্ভরকে লেখাপড়ার জন্য গঙ্গাদাস পন্ডিতের টোলে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার পাঠ করেছিলেন। হঠাৎ তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। বাবার মৃত্যুর পরও বিশ্বম্ভর পড়াশুনা করেছিলেন এবং বেশ পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। ষোল বছর বয়সে তিনি অধ্যাপনা শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিয়ে করেন। নবদ্বীপে কিছুকাল অধ্যাপনা করে গৌরাঙ্গদেব যান শ্রীহট্টে। সেখানে কয়েকমাস

অধ্যাপনা করে ফিরে আসেন এবং সর্পদংশনে লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু হয়েছে সেই সংবাদ জানতে পারেন। এই মর্মান্তিক সংবাদে চৈতন্যদেবের বৈরাগ্য দেখা দেয়। এই ঘটনার কয়েক মাসের মধ্যে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিয়ে করেন। এক সময়ে তিনি বাবার উদ্দেশে পিন্ড দান করতে যান গয়ায়। সেখানে ঈশ্বরপুরীর কাছে দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা নেন।

এ সবের অনেক আগে নবদ্বীপে অদ্বৈতাচার্য, যবন হরিদাস, শ্রীবাস পন্ডিত এবং আরও অনেকের চেষ্টায় তিনি একটা বৈষ্ণব গোষ্ঠী গঠন করেন। তাঁদের ভক্তি ও জ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে চৈতন্যদেব অধ্যাপনা ত্যাগ করে সংকীর্তনে মেতে ওঠেন। ক্রমশঃ এই বৈষ্ণব গোষ্ঠী খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। চব্বিশ বছর বয়সে চৈতন্যদেব কাটোয়ায় গিয়ে কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষা নেন। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে তিনি বেড়াতে যান নীলাচলে। সেখান থেকে দক্ষিণভারত। এই পরিক্রমার মূল উদ্দেশ্য ছিল, বিভিন্ন দেশের পন্ডিতদের বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্ব বোঝানো এবং বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করা। সেই কর্ম সুসম্পাদিত করে তিনি পুনরায় ফিরে আসেন পুরী। এখানে দু'বছর থাকার পর তিনি আসেন গৌড়ে। ইতিমধ্যে রাজমন্ত্রী রূপ ও সনাতন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এরপর তিনি মায়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আবার তীর্থ পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েন। যান বারানসী, প্রয়াগ, মথুরা-বৃন্দাবন। তারপর আবার পুরী। জীবনের শেষ চব্বিশটি বছর মহাপ্রভু পুরীতেই কাটান। তাঁর মহাপ্রয়াণ নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন। তবে একথা সত্য নীলাচলেই তিনি ব্রহ্মলীন হন।

এবার আবার একটু গোড়ার দিকে ফিরে যাই। ফিরে যাই চন্দ্রশেখর আচার্যর কথায়। চন্দ্রশেখরের বাড়িতে চৈতন্যদেব যাত্রা বা লীলাভিনয় করেছিলেন শুধু না, আগেই বলেছি চন্দ্রশেখর স্বয়ং মহাপ্রভুর সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। সুতরাং এখানে সেই চন্দ্রশেখরের কথা একটু আলাদা করে বলে নেওয়া দরকার।

॥ চন্দ্রশেখর দাস ॥

আসল নাম চন্দ্রশেখর দাস। ইনি অদ্বৈতাচার্যের শিষ্য ছিলেন এবং বেশ কিছু লীলাভিনয় বা পালা রচনা করেছিলেন। তাঁর 'হরিবিলাস' খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। পরে ঐ যাত্রা 'শেখরী যাত্রা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এই 'হরিবিলাস' পালায় তাঁর শিষ্য জগদানন্দ 'রাই' সাজতেন।

॥ নিত্যানন্দ ॥

চৈতন্যদেবের সঙ্গে লীলাভিনয় করেছিলেন আর একজন, যিনি চৈতন্যদেবের পার্ষদদের একজনই শুধু ছিলেন না, যিনি ছিলেন মহাপ্রভুর আত্মার আত্মীয়। তিনি হলেন নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু নামে যিনি সমধিক পরিচিত। ১৪৭৭-৭৮ সনে বীরভূমের একচক্রায় হাড়াই পণ্ডিতের ছেলে এই নিত্যানন্দের জন্ম। ইনি ছিলেন চৈতন্যদেবের পার্ষদদের মধ্যে প্রধান। ইনি মাত্র বারো বছর বয়সে ঘর ছেড়ে, সব ছেড়ে একটানা কুড়ি বছর তীর্থ পরিভ্রমণ করে নবদ্বীপে আসেন। নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈতাচার্যই চৈতন্যদেবকে অবতার হিসেবে প্রচার করেছিলেন। মদ্যপ কোতয়াল জগাই আর মাধাইকে উদ্ধার করার কৃতিত্ব প্রধানত তাঁরই।

নিত্যানন্দের প্রভাবেই চৈতন্যদেব বৃন্দাবনের বদলে পুরীতে বাকি জীবন কাটান। পুরীতে তিনিই ছিলেন গৌরাঙ্গদেবের সঙ্গী। বরানগর থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত গঙ্গার দু'ধারের যত গ্রাম তার ঘরে ঘরে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্প্রীতির জন্য প্রেমধর্ম বিতরণ করেছিলেন। এই সময় সপ্তগ্রামের শ্রেষ্ঠবণিক উদ্ধারণ দত্তের জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটে। এই প্রেমধর্মের ভাবমূর্তি তাঁর হৃদয় স্পর্শ করেছিল। এই উদ্ধারণ দত্ত পরিশেষে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং নিত্যানন্দের শরণ নেন। নিত্যানন্দ সংকীর্তনের পুরোভাগে নৃত্যের সঙ্গে কীর্তন পরিবেশন করতেন। চৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ বসুধা ও জাহ্নবীকে বিয়ে করেন। বসুধা দেবীর গর্ভে বীরভদ্র ও গঙ্গাদেবীর জন্ম হয়।

॥ অভিনয় ঃ অনন্ত জিজ্ঞাসা ॥

চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাভিনয়, অভিনয় কলারই রূপ বর্ণনা। এর ক্ষেত্র বিন্যাস ঘটেছিল আর্যসভ্যতা আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। আসলে ভারতীয় অভিনয়-কলার উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশের ধারা চলে আসছে আবহমান কাল ধরে।

বৈদিক যুগ থেকেই নাট্যাভিনয়ের প্রচলন। 'যভ্যুর্বেবদীয় বাজসনয়ী সংহিতা'য় পাই ঃ

"নৃত্যায় যুতং গীতায় শৈলূষং ধর্ম্মায়সভাচরং"

'শৈলূষং' শব্দের ব্যাখ্যা দিয়েছেন মহীধর— "শৈলূষং নটং"।

পাণিনির ৪ অধ্যায় ৩ পাদের ১১০-১১১ সূত্রে লেখা আছে ঃ

"পারাশর্য্যা শিলালিখাং ভিক্ষুনট-সূত্রয়োঃ"

"কর্ম্মদ কৃপাশ্বাদিভিঃ"

পাণিনি মুনি দু'জন নটের নামও উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন শিলালিন, ও কৃশাস্ব। আমরা জানি, পাণিনি প্রায় চার হাজার বছর আগের রচনা। রামায়ণের অযোধ্যা খন্ডে আছে, রামের রাজ্যাভিষেকে তাঁর সুখ-শান্তি এবং চিত্তভৃপ্তির আকাঙ্খায় কেউ মনোহর পণ্য অঞ্জলি দিয়েছিলেন কেউ নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন, কেউ কেউ বিবিধ প্রহসন নাট্যাভিনয় করেছিলেন।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় কালিদাসের 'অভিজ্ঞানম্ শকুন্তলম্' নাট্যাভিনয় হয়েছিল তাও ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। ভবভূতির 'মালতি মাধব' নাটকে দেখতে পাই, কেবল রাজসভায় নয় উজ্জয়িনীর পবিত্র দেবালয় 'কালিপ্রিয়নাথের মন্দির'-এ নাটকের অভিনয় হয়েছিল। তৎকালীন রাজাদের মধ্যে কেউ কেউ স্বয়ং নাট্য রচনার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

মহারাজ শূদ্রক নৃপতি 'মৃচ্ছকটিক' নাটক লিখেছিলেন।

সামন্ত রাজকবি বিশাখা দত্ত রচনা করেছিলেন 'মুদ্রারাক্ষস'।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শ্রীরূপ গোস্বামী সংসার ত্যাগ করে সাধু জীবন গ্রহণ করাব পর লেখেন 'কর্পূরমঞ্জরী' নাটক।

এই শ্রীরূপ গোস্বামী সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত বলা যাক ঃ

॥ শ্রীরূপ গোস্বামী ॥

বরিশালের বাকলা চন্দ্রদ্বীপে কুমারদেব গোস্বামীর ছেলে ১৪৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীরূপের পিতৃদত্ত নাম সন্তোষ। সন্তোষ যখন চৈতন্য মহাপ্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে বৈষ্ণব ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করেন, তখন শ্রীচৈতন্য তাঁকে 'রূপ' বলে ডাকতেন। পরে এই নামেই তিনি পরিচিত হন। তিনি কয়েক বছর রাজকর্মচারী ছিলেন। পরে রাজকর্ম ত্যাগ করে চৈতন্যের পদধূলি নিয়ে বৃন্দাবন যান। তেতাল্লিশ বছর বয়সে চৈতন্যের আদেশে তিনি বৈষ্ণব গ্রন্থ রচনা করতে শুরু করেন। তাঁর লেখা ঃ হংসদূত, উদ্ভবসন্দেশ, দানকেলি-কৌমুদী, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি, লঘুগণোদ্দেশদীপিকা, গঙ্গাষ্টক, বিদগ্ধ মাধব, ললিত মাধব প্রভৃতি। মহাপ্রভুর নির্দেশেই রূপ গোস্বামী রসশাস্ত্র নিরূপণ, লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার ও কৃষ্ণভক্তি প্রচারে সারা জীবন কাটান। রূপ এবং তাঁর বড় দাদা সনাতন গোস্বামী, ভাইপো জীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস বৃন্দাবনের এই ছয় গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সিদ্ধান্ত নির্ণয় করেছিলেন। রূপ গোস্বামী গৌড়ীয় 'বৈষ্ণব রসতত্ত্ব', ও মজুরীভাবের উপাসনারীতির প্রবর্তক।

রূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধ মাধব' মূলত সাত অঙ্কে বিভক্ত 'কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা' বিষয়ক নাটক।

অপৌরাণিক কাহিনী, 'কৃষ্ণের ঘাট দান' নিয়ে লেখা 'দানকেলি-কৌমুদী' ভণিতা। 'ললিত মাধব' কৃষ্ণের বৃন্দাবন-মথুরা ও দ্বারকালীলা বিষয়ক দশ অংকের নাটক।

এরপরই যুগধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যদেব চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়ির অঙ্গনে স্বয়ং 'কৃষ্ণলীলা' অভিনয় করেছিলেন। এই পর্বের বর্ণনা আমি আগেই দিয়েছি।

এই নাটক শ্রীচৈতন্যের ব্যক্তিপ্রীতিতে মূলত শিল্পে রূপান্তরিত হয়েছিল তখনই। এ কথাও জানা যায়, তৎকালে আজকের মতই রঙ্গমঞ্চ বা রঙ্গালয় তৈরি করে তার পাদপ্রদীপে নাট্য উপস্থাপনা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে 'সঙ্গীত দামোদর'-এ পেয়ে যাই ঃ

"হস্ত বিংশতি-বিস্তারা রঙ্গভূমির্মনোহরা।
পূর্বাভিমুখ প্রবাত্র নায়কঃ শোভতে পরম্ ॥
দক্ষিণে মুরজস্থানং পৃষ্ঠে যবনিকা তথা।
তন্মধ্যে মন্ডলস্থানং নেপথ্যং তচা গীয়তে ॥ "

এর ব্যাখ্যাও আছে 'সঙ্গীত দামোদরে'।—চাই বিশ হাত বিস্তৃত রঙ্গভূমি। নায়ক পূর্বাভিমুখে অবস্থান করবে।

দক্ষিণ পার্শ্বে বাদ্যযন্ত্র এবং পশ্চাতে থাকবে যবনিকা—

নটের কার্য আদৌ নিন্দনীয় ছিল না। দোষনীয়ও ছিল না। আমাদের ভগবান শিবশম্ভুর আর এক নাম নটরাজ বা নটবর।

॥ রায় রামানন্দ এবং তাঁর দল ॥

চৈতন্যদেবের সমসাময়িক রায় রামানন্দ। ইনিও লীলাভিনয় বা যাত্রা করতেন। তিনি ছিলেন নাট্যাচার্য। এই রায় রামানন্দের দলে স্ত্রী ভূমিকায় মেয়েরাই অভিনয় করেন বলে 'চৈতন্যচরিতামৃত' সাক্ষ্য বহন করছে। এই গ্রন্থে উল্লেখ আছে, রায় রামানন্দ নির্বিকার চিত্তে যুবতী অভিনেত্রীদের পাঠ মুখস্থ করিয়ে অভিনয় করাতেন। এ দলেও শ্রীবাস, গদাধর, অদ্বৈতাচার্য অভিনয় করতেন। আরও জানা যায়, মাঝে মাঝে স্বয়ং অভিনয় করতেন চৈতন্যদেব।

॥ প্রতাপ রুদ্র ॥

শ্রীচৈতন্যের অনুগত প্রতাপরুদ্রও যাত্রা করতেন। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা দরকার, চৈতন্যদেব এবং তাঁর পারিষদবর্গ যে যাত্রাপালা অভিনয় করেছিলেন, সেই সব পালার পাণ্ডুলিপির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে আগেই যে "শেখরী যাত্রা"র কথা বলেছি, সেই শেখরী যাত্রার অন্যতম অংশ, চন্দ্রশেখর দাস রচিত 'হরিবিলাস'-এর কিছু নমুনা পাওয়া যায়।

আগে যাত্রাকে 'দেবলীলা' বলেই সবাই জানতেন। বৈষ্ণবদের সময় থেকে 'কৃষ্ণবিষয়ক' যাত্রার প্রবর্তন। সেই কারণেই তখন একে 'কৃষ্ণলীলা' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। এ সব যাত্রায় কীর্তনাঙ্গ সুরের প্রভাব ছিল। প্রথমে মহড়া দেবার রেওয়াজ ছিল। তারপর "গৌরচন্দ্র" পাঠ। অর্থাৎ গৌরচন্দ্রিকা। প্রস্তাবনা। তারপর মূল পালার সূচনা। সূচনাপর্বে, কৃষ্ণের নৃত্য হতো। এরপর "মণি গোসাঞি"র আবির্ভাব। এরই ভিতর দিয়ে চলতে থাকল পাশাপাশি যুগবিবর্তন। যুগবিবর্তনের মধ্য দিয়েই যাত্রার ক্রমবিবর্তন। একটু একটু করে চৈতন্য সমসাময়িক পালার বিবর্তনে এলো পুরাণ ও কাব্যাশ্রিত পালাগান। যেমন 'রামযাত্রা', 'চন্ডীযাত্রা'! এর সঙ্গে এলো "মনসার ভাসান যাত্রা", "বিদ্যাসুন্দর"। থাক সে কথা।

॥ লোকসংস্কৃতির বীজ ॥

তুর্কী আক্রমণ-এর আগে বাংলা দেশের সমাজ ও সংস্কৃতি ছিল দ্বিধা বিভক্ত। সমাজের উচ্চাসনে বসেছিলেন অভিজাত বংশজ ব্রাহ্মণ্য-হিন্দুরা। তাঁদের সাহিত্যের ভাষা ছিল দেবভাষা, সংস্কৃত। অন্যদিকে তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর বৌদ্ধ, হিন্দু, নাথ সহজিয়া লোক-সাধকেরা তাঁদের অপরিচ্ছন্ন জীবন বোধকে মুক্তি দিয়েছেন আড়ষ্ট, অপূর্ণ, অপভ্রংশ ভাষার মধ্য দিয়ে। ফলে

চর্যা- পদাবলীর সমসাময়িক বাঙালী কবি জয়দেব তাঁর "মধুর কান্ত পদাবলী"-র অমৃত-সুর-ঝংকার সৃষ্টি করেছেন সংস্কৃত ভাষায়।

তুর্কী আক্রমণের পর সমাজ ও সংস্কৃতিগত বিভেদ দূর হলো। এই যুগে কবি কৃত্তিবাস ছিলেন সংস্কৃত ভাষার পন্ডিতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পন্ডিত। পান্ডিত্যের দম্ভ ছিল অপরিসীম। নিজের সম্বন্ধে লোকমুখের প্রশস্তির কথা নিজেই লিখেছিলেন—

"মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পন্ডিতের মধ্যে বাখানি কৃত্তিবাস গুণী।'

এই কৃত্তিবাসও বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ বাংলাভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। অথচ ইতিহাস বলে, তুর্কী আক্রমণ ও নিপীড়নের যুগের বয়স কাল দেড়শ বছর। এই দীর্ঘ সময়কালের মধ্যে ঐক্যের ভীষণ অভাব ছিল বাঙালী সমাজে। অভিজাত এবং অনভিজাতের মধ্যে বিভেদ প্রকট থাকায় বাঙালী সমাজ ছিল দ্বিধাবিভক্ত। অভিজাত সমাজে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের। এর ফলে হিন্দু সমাজপতিরা টেনে নিলেন তথাকথিত অন্ত্যজদের নিজেদের ধর্ম ব্যবস্থার বৃত্তের মধ্যে। তারই ফলশ্রুতি, সংস্কৃত শাস্ত্রের জ্ঞান-মনীষার পসরা বাংলা সাহিত্যের পাত্রে। অতঃপর এই যে যুগ, তা হলো বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সংস্কৃত ভাষা আশ্রিত। কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং মালাধর বসুর অনূদিত ভাগবত 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' এই অনুবাদ সাহিত্যের বিশেষ উদাহরণ।

অভিজাত হিন্দুরা নিজেদের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জ্ঞান সম্পদকে বাঙালী সমাজের সাধারণ মনের কাছে পৌঁছে দিয়েই কিন্তু থেমে থাকেননি। অন্যদের ধর্ম-বিশ্বাস-পূজাচার নিজেদের উন্নত রুচি-কল্পনা আর চেতনার রঙে রঞ্জিত করে হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম করেছেন। এর ফলে বাংলা সাহিত্যের "মঙ্গলকাব্য"-র পরিণত রূপ সুগঠিত হয়েছে।

সাপের দেবতা মনসা, পশু দেবতা মঙ্গলচন্ডী এবং ধর্মঠাকুরকে মূলতঃ অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরাই পুজো করে এসেছে। আর সেই বিশ্বাস, ধর্মাচার, পুজাচার উঠে এসেছে সংস্কৃত ভাষায় ধ্যান-মন্ত্রে। এই ভাবেই পুরাণে শিবের মেয়ে হলেন মনসা আর পত্নী হলেন মঙ্গলচন্ডী। আর সেই কাব্যাশ্রিত বিষয় রূপান্তরিত হতে থাকল 'মহিমাগান'-এ। এই মহিমাগান বাংলা মঙ্গলকাব্যের নামান্তর।

যে যুগের কথা বলছি সেই যুগে আর এক শ্রেণীর গীতি-সাহিত্য রচিত হয়েছিল। আব তা ছিল রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের মধু-নির্ঝর আলেখ্য।

এই লৌকিক প্রণয়-কাহিনীকে হিন্দু-পুরাণের কৃষ্ণ-কথার সূত্রে গেঁথে এলো নতুন গীতি কবিতার ধারা। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের আগেই এই কাব্যগাথা বৈষ্ণব পদ সাহিত্য নামে খ্যাত হয়েছিল। এই যে যুগের কথা বলা হচ্ছে, সেখানে রাধা-কৃষ্ণ লীলা কীর্তনের শ্রেষ্ঠ চারণ ছিলেন কবি চন্ডীদাস এবং বিদ্যাপতি।

॥ লোকজীবন ও লোকসাহিত্য ॥

"বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" রচয়িতা ভূদেব চৌধুরী তাঁর গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। "...বাংলা সাহিত্যের আদি পর্যায়ে চর্যাপদ ছিল শ্রেষ্ঠ লোকসাহিত্যের নিদর্শন। তার পাশে বাঙ্গালীর রচিত অভিজাত সাহিত্যের উৎকৃষ্ট পরিচয় পাই জয়দেবের গীতগোবিন্দে। আদি-মধ্য পর্যায়ে বিদ্যাপতির বিদগ্ধ কলাকুশলতার পাশে বড়ু চন্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন" স্থূলাবয়ব লোক সাহিত্যের নিদর্শন। চৈতন্য-সমকালীন বাংলায় লোক- সাহিত্য নেই, কারণ নিখিল বাঙালীর একীভবনের মধ্যে লোক সমাজের পৃথক অস্তিত্ব সেদিন একেবারে বিলীন হয়ে গিয়েছিল।"

বঙ্গদেশের সামাজিক প্রক্ষাপটে লোকসাহিত্য বা লোকনাট্যের বিবর্তনের ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণনা করতে হলে এ কথা স্বীকার করতেই হয়, ষোড়শ ও সপ্তদশ এবং এই দুই শতকের পণ্ডিতবর্গ ও লোক কবিরা তার বীজ বপন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য যা বলেছেন এখানে সংক্ষিপ্তভাবে তার পুনরাবৃত্তি করছি ঃ

"......মধ্য যুগে পাল রাজাদের কাহিনী লইয়াও পালাগান প্রচলিত ছিল। ষোড়শ শতক হইতে চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম বিস্তার লাভ করিতে থাকায় রাধা-কৃষ্ণ কথা পালাভিনয়ের প্রাধান্য পাইতে আরম্ভ করে। কিন্তু লোকায়ত চণ্ডী, মনসা প্রভৃতি শাক্ত কাহিনী, ধর্মমঙ্গল কাহিনী এবং ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্র (গোপীচন্দ্র), গোরক্ষনাথ প্রভৃতি নাথ সিদ্ধদের কথা অবলম্বনে পালাভিনয় অপ্রচলিত থাকিবার কথা নহে। চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, নাথ সাহিত্য প্রভৃতি যাহাদের প্রিয় ছিল তাহারা ইহাদের কাহিনী অভিনয় করিতেন, শুনিতেন—"

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নাথ কাহিনী অবলম্বনে লেখা 'গোপীচন্দ্র' প্রকৃত অর্থে নাটক, যাতে প্রকৃত অর্থে লোকনাট্যের ভাব ও রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। গোপীচন্দ্র নাটক নেপালে পাওয়া গিয়েছিল। তাতে বাংলা ও নেপালী উভয় ভাষার সন্ধান ছিল। এ থেকে প্রমাণিত হয়, বাংলার সঙ্গে নেপাল প্রদেশের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন সেই সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে। এর আসল গানগুলি বাংলার ক্ষেত্রে অপরিবর্তিত।

॥ নাথ সাহিত্য প্রসঙ্গ ॥

বাংলা সাহিত্যের আদি যুগের যে ঐতিহাসিক ভূমিকার সামগ্রিক রূপ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়েছে, বা গবেষণায় যে তালিকা উল্লিখিত হয়েছে বিভিন্ন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে, তার মধ্যে নাথ সাহিত্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য। নাথ সাহিত্যের নিদর্শনের প্রথম আবিষ্কারক ডঃ জি. এ. গ্রীয়ার্সন। সেসব ১৮৭৮ সালের কথা। গ্রীয়ার্সনের সেই গবেষণার নাম ছিল "The Song of Manik Chandra." আসলে রাজা মানিকচন্দ্র, তাঁর স্ত্রী ময়নামতী ও ছেলে গোপীচন্দ্রের উপাখ্যান। নাথধর্ম বিশ্বাসের মূল তথ্য আর নাথধর্ম সাধনার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা এই উপাখ্যানের মূল বিষয়। অনেকেই প্রথম দিকে মানিকচন্দ্রকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে দেখেছিলেন। অনেকেই ধারণা করেছিলেন, পাল রাজত্ব কালের পালরাজ ধর্মপালের সঙ্গে তিনি সুসম্পর্ক সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। পরে আরও গবেষণায় এই সিদ্ধান্তে অনেকেই পৌঁছেছেন যে, গোপীচন্দ্র হলেন 'বঙ্গাল' রাজ গোপীচন্দ্র, যিনি ছিলেন একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের লোক।

আরও পরে উত্তর ও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে লোকগাথার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল 'ময়নামতীর গান', 'গোপীচন্দ্রের গীত', 'মানিকচন্দ্রের গীত'। এগুলি বিভিন্ন নামে (বিষয় এক) পুঁথি আকারে পাওয়া গিয়েছিল। যে 'গোরক্ষনাথ' কথা অবলম্বনে পালাভিনয়ের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে, সেটি আসলে 'গোরক্ষ বিজয়' বা 'মীনচেতন' নামে নাথধর্ম বিষয়ক কাব্য, যার আবিষ্কর্তাদের মধ্যে প্রথম হিসেবে চিহ্নিত করা যায় মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদকে।

যা হোক, যেহেতু আমার বিষয় 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' রচনা নয়, সেই হেতু এই প্রসঙ্গে সামান্য আলোকপাত করে বিষয়ান্তরে চলে যাব।

অনেকেই মানিকচন্দ্র আর ময়নামতীর ছেলে গোপীনাথকে গোবিন্দচন্দ্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর 'গোরক্ষনাথ' হলেন নাথ ধর্মসিদ্ধা ময়নামতীর গুরুদেব। পরে ময়নামতীর উপাখ্যান থেকে আলাদা আলাদা ভাবে একাধিক কাব্য বা পালা হয়েছিল, যা 'ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্র',

'গোরক্ষনাথ' ইত্যাদি নামে পরিচিত। গোপীচন্দ্রের উপাখ্যানের গীত সম্বলিত পালা উপাখ্যান জনমানসে সাড়া তোলার মূলে বোধ হয় ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মন্তব্যই সঠিক। তিনি বলেছেন—"গোবিন্দচন্দ্রের মত একটি ভাগ্যবান যুবকের নবীন যৌবনে অষ্টাদশ বৎসর বয়সে সমস্ত রাজ্য-ধন-সুখ-সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া যাওয়ার মত করুণ ঘটনা জগতে বড় বেশী ঘটে নাই। ভারতবর্ষে গোপীচাঁদের পূর্বে এবং পরে মাত্র একবার ঘটিয়াছিল —" নাথ সাহিত্যে সেই জীবনচিত্র বা তৎকালীন সমাজচিত্র কেমন আঁকা হয়েছিল তার কিছুটা নমুনা এখানে তুলে ধরছি। এর মধ্যে গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাস-সম্ভাবনায় শঙ্কিত বধূগণের আর্তির মধ্যে তাদের বিরহের চেয়ে যৌন লালসাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। নাথ সাহিত্যে সেই জীবন-চিত্র আমি এখানে শ্রদ্ধেয় ভূদেব চৌধুরীর "বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ" থেকে উদ্ধৃত করলাম ঃ

"যখন আছিনু আমি মা বাপর ঘরে।
তখন কেনে ধর্মি রাজা না গেলেন সন্ন্যাসী হইয়ে।।
এখন হইতু রূপর নারী তোর যোগ্যমান।
মোকে ছাড়িয়া হব সন্ন্যাস মুই তেজিমু পরাণ।।
তোমার আগে কাল যৌবন মোর পড়ুক গড়িয়া।
পাকিলে মাথার চুল যাবেন সন্ন্যাস হইয়া।।
এ রঙ্গ মালতীর ঘরে লইয়া পড়ে ডাল।
নারী হইয়া রঙ্গরূপ রাখিমু কত কাল।।
কতকাল রাখিমু যৌবন বান্ধিয়া-ছান্দিয়া।
নিরবধী ঝোড়ে প্রাণ স্বামী বলিয়া।"

এই নাথধর্ম বা উপাখ্যান অবলম্বনে লেখা যে লোকগাথা বা লোকনাট্য তা সামাজিক বিবর্তনেরই রূপ। থাক এ সব কথা।

ষোড়শ শতাব্দীতে লোচন দাস যেমন 'জগন্নাথ বল্লভ' নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন, তেমনি এই শতকেই বৈষ্ণব জীবনীকারদের মধ্যে অন্যতম প্রধান লোচন দাসের 'চৈতন্য মঙ্গল' খ্যাতি অর্জন করেছিল। ষোড়শ শতাব্দীর কথা শেষ করার আগে লোচন দাস সম্পর্কে কিছুটা বলা দরকার।

॥ লোচন দাস ॥

বর্ধমানের কোগ্রামে কমলাকর দাসের ছেলে লোচন দাসের জন্ম। তারিখ ও সাল জানা যায়নি। তবে একাধিক সূত্র থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, তিনি ষোড়শ শতাব্দীর মানুষ। বিখ্যাত 'চৈতন্যমঙ্গল' জীবন কাব্যের রচয়িতা। শ্রীখণ্ড বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শিরোমণি নরহরি সরকারের শিষ্য লোচন দাস গীত রচনাতেও খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

লোচন দাস বিরচিত গৌরলীলার ধামালির পদ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

মনে রাখা দরকার, ষোড়শ শতাব্দীতে যে যাত্রার বীজ রোপিত হয়েছিল, তার অঙ্কুর দেখা দিয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে। বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যাত্রা মহীরূহ এবং নানা করণে যাত্রার অগ্রগতির পরিবর্তে যাত্রার অবলুপ্তির ইংগিত বহন করছে। যা হোক, সপ্তদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ ১৬০৭ সালে যদুনন্দন দাস 'রাধাকৃষ্ণ লীলা কদম্ব' নামে 'বিদগ্ধ মাধব'-এর বঙ্গানুবাদ করেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব জীবনীকারদের মধ্যে আর একজনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যিনি 'চৈতন্য ভাগবত' রচনা করে সকলের শ্রদ্ধাভাজন আজও। তিনি বৃন্দাবন দাস। বাংলা যাত্রা বা লোকনাট্যের আদিপর্বে যাঁর দান অস্বীকার করা যায় না। সেই বৃন্দাবন দাস প্রসঙ্গে বলা যাক।

॥ বৃন্দাবন দাস ॥

১৫০৭ খৃষ্টাব্দে বৈকুণ্ঠনাথ বিপ্রর ছেলে বৃন্দাবনের জন্ম হয়েছিল নবদ্বীপে। বৃন্দাবনের মা হলেন শ্রীবাসের ভাইঝি নারায়ণী দেবী। বৃন্দাবন ছিলেন নিত্যানন্দের শিষ্যদের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ ও প্রিয়। পরম বৈষ্ণব। তিনি রচনা করেছিলেন 'চৈতন্য ভাগবত'। মহাপ্রভুর তিরোধানের পর 'চৈতন্য ভাগবত' ও নিত্যানন্দের বংশমালা প্রচার করেন।

বর্ধমান জেলার দেনুড় গ্রামে বৃন্দাবন দাস প্রতিষ্ঠিত মন্দির ও বিগ্রহ বিরাজমান। বৈষ্ণব সমাজের এই মন্দির "দেনুড় শ্রীপাট" নামে খ্যাত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁকে 'চৈতন্যলীলার ব্যাস' বলে সম্মান জানিয়েছিলেন।

রস কল্পসার, রিপু চরিত্র, তত্ত্ববিলাস, চৈতন্য-নিতাই সংবাদ, বৈষ্ণব বন্দনা, ইত্যাদি ছাড়াও ভজন নির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এছাড়া ভক্তি চিন্তামণি, ভক্তি মাহাত্ম্য, ভক্তি লক্ষণ ও ভক্তি সাধন প্রভৃতি গ্রন্থও বৃন্দাবন দাস লিখিত বলে জানা যায়।

॥ যদুনাথ দাস ॥

মালিহাটী নিবাসী বৈদ্যকুলের এই বিশিষ্ট পদকর্তার জন্ম সম্ভবতঃ ১৫৩৭। বৈষ্ণব সমাজে 'যদুনন্দন দাস ঠাকুর' নামে খ্যাত ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তিনি 'কর্ণানন্দ' নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থ এবং 'গোবিন্দ লীলামৃত' ও 'বিদগ্ধ মাধব'-এর বাংলা পদ্যানুবাদ করেন এবং অধিকাংশ কবি-ভণিতায় 'যদুনাথ দাস' বলে উল্লেখ করেছেন।

॥ প্রেমদাস (পুরুষোত্তম মিশ্র) ॥

নবদ্বীপের কুলিয়া গ্রামে গঙ্গাদাস মিশ্রের ছেলে পুরুষোত্তম মিশ্রের জন্ম। তারিখ-সন উদ্ধার করা যায়নি।

মাত্র ষোল বছর বয়সে তিনি বৃন্দাবনে গিয়ে গুরুদত্ত প্রেমদাস নামে পরিচিত হন। গোবিন্দজীর মন্দিরের পূজারী হিসাবে জীবনের অনেকগুলি বছর কাটান। তারপর আবার দেশে ফেরেন। ১৭০৮ সনে কবি কর্ণপুরের 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়' নাটকের পদ্যরূপ দেন। ১৭১২ সনে তিনি লেখেন 'বংশী শিক্ষা' গ্রন্থ। পুরুষোত্তম দাস ওরফে প্রেমদাস এক সময়ে সিদ্ধান্তবাগীশ উপাধি পান। প্রেমদাসের আরও কিছু বইয়ের মধ্যে 'আনন্দ ভৈরব', 'চৈতন্য চন্দ্রোদয় কৌমুদী' বিখ্যাত। এই 'চৈতন্য চন্দ্রোদয় কৌমুদী' আসলে 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়' নাটকের বঙ্গানুবাদ।

ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব জীবনীকারদের মধ্যে আর যাঁরা বাংলা লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট তাঁদের মধ্যে জয়ানন্দ, চূড়ামণি দাস বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' ও চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গ বিজয়' খুবই প্রসিদ্ধ।

সপ্তদশ শতাব্দীতে লেখা কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত', নরহরি চক্রবর্তীর সঙ্গীতাকারে লেখা 'গৌর চরিত্র চিন্তামণি', ও 'গীত চন্দ্রোদয়', বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস, নরোত্তম দাস প্রমুখ বৈষ্ণবপদকর্তাদের বিভিন্ন ভাবের পদের সংকলন, বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'ক্ষণদা গীত চিন্তামণি', রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃত সমুদ্র', বৈষ্ণব দাসের (গোকুলানন্দ সেন) 'গীত কল্পতরু', কবি চন্দ্রের 'কৃষ্ণমঙ্গল', বলরাম দাসের "কৃষ্ণলীলামৃত" গ্রন্থগুলি তখনকার দিনে জনমানসে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিল। এই গ্রন্থগুলির প্রসারের ভিতর দিয়ে একদা 'কৃষ্ণযাত্রার' প্রসার লাভ ঘটেছিল। শ্রীচৈতন্য বিষয়ক গ্রন্থের বহুল প্রচারের ভিতর দিয়েই একদা সামাজিক প্রেক্ষাপটে 'চৈতন্য যাত্রা'র প্রসার ঘটে। অদ্বৈত আচার্যের শিষ্য চন্দ্রশেখর দাস 'হরিবিলাস' নামে কৃষ্ণযাত্রা বিষয়ক যাত্রাপালা লেখেন।

এবার জয়ানন্দের কথা একটু বলা যাক। ষোড়শ শতাব্দীতে জয়ানন্দের 'চৈতন্য-মঙ্গল'-এর কথা বলেছি আগেই।

॥ জয়ানন্দ ॥

বর্ধমান জেলার আমাইপুরায় সুবুদ্ধি মিশ্রের ছেলে জয়ানন্দের জন্ম। শৈশবে নাম ছিল গুইঞা। চৈতন্যদেব নীলাচল থেকে যখন নদিয়ায় ফিরছিলেন তখন আসার পথে কয়েকদিন সুবুদ্ধি মিশ্রের বাড়িতে অতিথি হিসেবে ছিলেন। তখনই তিনি গুইঞার নাম রাখেন জয়ানন্দ। এই জয়ানন্দ পরে অভিরাম গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য হন। পরে বীরভদ্র গোস্বামী ও গদাধর পণ্ডিতের আদেশে তিনি ১২ বছর ধরে (১৫৫৮-১৫৭০) ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করেন। জয়ানন্দের লেখা আরও কিছু গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ধ্রুব চরিত্র' ও 'প্রহ্লাদ চরিত্র'।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের কথা আগে সবিস্তারে বলেছি। এই পর্যায়ে আর যাঁদের কথা স্মরণীয় করে রাখা দরকার তার মধ্যে নরহরি চক্রবর্তী ওরফে ঘনশ্যাম চক্রবর্তী, জ্ঞান দাস, গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস, নরোত্তম দাস, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, বৈষ্ণব দাস ওরফে গোকুলচন্দ্র সেন, কবিচন্দ্র এবং অদ্বৈত আচার্যের শিষ্য চন্দ্রশেখর দাস। আমরা প্রথমেই আলোচনা করব নরহরি চক্রবর্তীকে নিয়ে।

॥ নরহরি চক্রবর্তী ওরফে ঘনশ্যাম চক্রবর্তী ॥

নরহরি চক্রবর্তীর জন্ম নদিয়া জেলায়। বাবা জগন্নাথ চক্রবর্তী। নরহরি চক্রবর্তীর আর এক নাম ঘনশ্যাম চক্রবর্তী। এই নামেও তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন। ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার, পিতৃগুরু, বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য ছিলেন নরহরি। পরে তিনি শ্রীনিবাস আচার্যের কাছেও দীক্ষা নিয়েছিলেন। বেশ কিছুদিন বৃন্দাবনে বাস করে নরহরি বৈষ্ণব শাস্ত্র পড়াশোনা করেছিলেন। এই পড়াশোনা কালে নরহরি ছিলেন শ্রীরূপ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ গোবিন্দজীর পাচক। নরহরির লেখা বৃহৎ গ্রন্থের নাম 'ভক্তি রত্নাকর'। তাঁর গ্রন্থাবলী ঃ 'গৌর চরিত', 'চিন্তামণি', 'নরোত্তম বিলাস', 'ব্রজ পরিক্রমা', 'শ্রীনিবাস চরিত', 'গীত চন্দ্রোদয়', 'ছন্দ সমুদ্র', 'প্রক্রিয়া পদ্ধতি', 'নবদ্বীপ পরিক্রমা', 'লীলা সমুদ্র' ইত্যাদি। 'গৌর চরিত চিন্তামণি' ও 'গীতচন্দ্রোদয়' সঙ্গীতাকারে লেখা।

॥ জ্ঞান দাস ॥

বর্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামে জ্ঞান দাসের জন্ম। জন্মের সাল-তারিখ সঠিক ভাবে কেউ আবিষ্কার করতে পারেননি। অনেকেই মনে করেন, ১৫২০ থেকে ১৫৩৫ সালের মধ্যে তাঁর জন্ম। জ্ঞান দাস মঙ্গল ব্রাহ্মণ বংশীয় ছিলেন বলেই বোধ করি তিনি এক সময়ে মঙ্গল ঠাকুর, শ্রীমঙ্গল, মদন মঙ্গল নামেও পরিচিত ছিলেন। ষোড়শ গোপালের রূপ বর্ণনা করে একমাত্র তিনিই প্রথম উৎকৃষ্টপদ রচনা করেছিলেন। বৃন্দাবনে থাকাকালীন তিনি শ্রীজীব, রঘুনাথ দাস, গোপাল ভট্ট, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি বৈষ্ণব সাধক, পণ্ডিত ও স্বনামধন্য পদকর্তাদের সান্নিধ্যলাভ করেছিলেন। জ্ঞান দাস ব্রজবুলিতে যেমন প্রচুর পদ রচনা করেন, তেমনি রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার বিভিন্ন পর্যায়ের পদকে রসসিক্ত করেছিলেন। তাঁর লেখা 'মাথুর' ও 'মুরলীশিক্ষা' বৈষ্ণব গীতিকাব্যের মহামূল্য রত্ন। এই দুই কাব্য-ভাষা ও রচনা শৈলীতে চণ্ডীদাসের ছাপ পাওয়া যায়। সাধক হিসেবেও জ্ঞান দাসের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তাঁর 'ভক্তি রত্নাকর' কাটোয়ার উৎসব বর্ণনার এক দলিল। এই রচনার জন্য তাঁকে অন্যতম 'মোহান্ত' হিসেবে গণ্য করা হয়। বর্ধমান কাঁদড়ায় জ্ঞান দাসের মঠ আজও বিদ্যমান। এই সাধক, এই মহৎ কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রতি বছর পৌষ পূর্ণিমায় আজও মেলা বসে। সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবেও যেমন খ্যাতিমান ছিলেন তেমনি কীর্তনের নতুন পদ্ধতির উদ্বোধক তিনি। বাংলার যাত্রাগানের অন্যতম প্রধান প্রবর্তক।

॥ গোবিন্দ দাস ॥

১৫৩৪ থেকে ১৫৩৭ সালের মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার তেলিয়াবুধুরী গ্রামে চৈতন্যদেবের পরিকর চিরঞ্জীব-এর ছেলে গোবিন্দ দাসের জন্ম। শ্রীখণ্ডের মহাকবি দামোদর কবিরাজের দৌহিত্র। গোবিন্দ শ্রীখণ্ডেই লালিত পালিত।

গোবিন্দ দাস ছিলেন শাক্ত। পরে শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে দীক্ষিত হয়ে বৈষ্ণব। রাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ লীলা বিষয়ক পদকর্তা হিসেবে তামাম বঙ্গদেশ ও বৃন্দাবনে খ্যাতিমান ছিলেন। গোবিন্দ দাস সংস্কৃতে 'সঙ্গীত মাধব', 'কর্ণামৃত' দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই কবির পদ রচনায় বিদ্যাপতির অলঙ্কারের প্রভাব ছিল। উদ্ভট কবিতা রচনায় বিশেষ করে শ্রীরূপ গোস্বামীর ভাব নিয়ে পদ রচনায় তিনি যথেষ্ট খ্যাতি পান। জানা যায়, তাঁর 'সঙ্গীত মাধব' নাটক নরোত্তম ঠাকুরের অনুজ সন্তোষ দত্তের অনুরোধে লেখা। শ্রীদাসের গীতামৃত রচনায় খুশি হয়ে শ্রীজীব গোস্বামী তাঁকে 'কবীন্দ্র' উপাধি দেন।

॥ বলরাম দাস ॥

বৈষ্ণব সাহিত্য ক্ষেত্রে এই নামে একাধিক রচয়িতার নাম যদিও পাওয়া যায়, তবুও লোকনাট্যের বীজ বপনকারীদের মধ্যে যে বলরাম অন্যতম তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর জন্ম বর্ধমানের শ্রীখণ্ডে। শ্রীখণ্ডের অধিবাসী আত্মারামের ছেলে বলরামের জন্ম ১৫৩৭ সালে। জাহ্নবী দেবীর কাছে দীক্ষা নেন। ইনি বিবাহ করে সংসারী হন। বলরামের আর এক নাম নিত্যানন্দ। এই নামকরণ করেছিলেন গুরুদেব। এই নামে তিনি লেখেন 'প্রেমবিলাস'। সেই বইটি খুবই খ্যাতি পেয়েছিল। বলরাম দাস বা নিত্যানন্দের লেখা আরও কয়েকটি বই ঃ 'গৌরাঙ্গষ্টক', 'বীরচন্দ্র চরিত', 'রসকল্পসার', 'কৃষ্ণলীলামৃত'। নবোত্তম ঠাকুরের খেতুরী উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন বলরাম।

॥ নরোত্তম দাস ॥

আসলে নরোত্তম দাস ঠাকুর। রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের ছেলে নরোত্তম ১৫৩১ সালে রাজশাহী জেলার খেতুরী গড়েরহাট পরগণায় জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র আঠার বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ কবে বৃন্দাবনে গিয়ে জীব গোস্বামীর আশ্রয়ে থাকেন। সেখানে লোকনাথ গোস্বামীর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করেন। বৈষ্ণব শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন জীব গোস্বামীর কাছে। এরপর "ঠাকুর মহাশয়" উপাধি পান। এক সময়ে বঙ্গদেশে বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রসারের উদ্দেশ্যে অনেক বৈষ্ণবগ্রন্থ সহ জীব গোস্বামী ও শ্রীনিবাস আচার্য এই নরোত্তম দাস ও কৃষ্ণানন্দকে পাঠান। পথ থেকে সব গ্রন্থ অপহৃত হয়। নরোত্তম দেশে ফেরেন কিন্তু সংসারী হন না। খেতুরীতে তিনি ৬টি বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উৎসব মহাসমারোহে হয়। খেতুরীতে তিনি যে মহাবৈষ্ণব সম্মেলন করেছিলেন তাতে কীর্তন গানে রস সঞ্চারের যে নতুন ধারা এনেছিলেন, তা সমগ্র বৈষ্ণব সমাজ সানন্দে অনুমোদন করেন। এই সম্মেলনেই তিনি প্রথম প্রণালীবদ্ধ ভাবে গৌরচন্দ্রিকা গানের পর লীলাকীর্তন গানের প্রথা প্রবর্তন করেন। নরোত্তম দাসের সৃষ্ট সুরের রসকীর্তনকে গড়েরহাটি বা গড়ানহাটি কীর্তন বলা হয়। এর কারণ তিনি খেতুরীর গড়েরহাটির লোক ছিলেন বলে। খেতুরীতে যে বাড়ি তৈরি করে তিনি সাধন ভজন করতেন তাকে বলা হতো 'ভজনস্থলী'। রাজশাহী, পাবনা, মালদহ, রঙপুর, বহরমপুরে তাঁর বহু শিষ্য ছিলেন। মণিপুরের রাজ পরিবারের বহু জনই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

॥ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ॥

রামনারায়ণ চক্রবর্তীর ছেলে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর জন্ম মুর্শিদাবাদের দেবগ্রামে। তিনি একদিকে যেমন ছিলেন দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, অন্যদিকে ছিলেন নিম্বার্ক মতাবলম্বী। ১৭০৪ সালে 'সারর্থ দর্শিনী' নামে ভাগবতের একটি টীকার রচনা শেষ করেন। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্রামাণিক ব্যাখ্যাই এই টীকা। শ্রীজীব গোস্বামীর মত খণ্ডন করে 'সারার্থবর্ধিনী' নামে ভাগবতের টীকা লেখেন। তাঁর ভাগবতের টীকা বৃন্দাবনের বনমালী রায়ের ভাগবতের সংস্করণে এবং গীতার টীকা কলকাতার দামোদর মুখোপাধ্যায়ের গীতার সংস্করণে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও 'শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃত', 'মাধুর্য্যকাদম্বিনী', 'রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা', 'গুণামৃতলহরী', 'প্রেমসম্পুট', 'স্বপ্নবিলাসামৃত', 'অনুরাগবল্লী', 'রূপচিন্তামণি', 'সঙ্কল্প কল্পদ্রুম', 'সুরথ কথামৃত', 'বিদগ্ধ মাধবী', (মাধব নয়), ইত্যাদি বহু গ্রন্থের টীকা তিনি রচনা

করেন। 'বৈষ্ণব পদাবলী' গ্রন্থে ইনি হরিবল্লভ দাস নামেই পরিচিত। ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দ থেকে পঁচিশ বছর তিনি ব্রজধামে বাস করেছেন।

বৃন্দাবনে গোলকানন্দজীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা তাঁরই কীর্তি। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মৃত্যু হয় বৃন্দাবনে।

॥ বৈষ্ণব দাস ওরফে গোকুলানন্দ সেন ॥

বর্ধমানে টেঁয়াবৈদ্যপুরে জন্ম। রাধামোহন ঠাকুরের মন্ত্র শিষ্য। তিনি বিখ্যাত 'পদকল্পতরু'র সংকলক। নিজের পদ এবং সংগ্রহ করা পদ সম্বলিত এই গ্রন্থ ১৮শ শতাব্দীতে শেষ হয়। কীর্তন গায়ক হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন। তাঁর রচিত গান বর্তমানেও 'টেঞার ঢপ' নামে খ্যাত।

॥ কবিচন্দ্র ॥

পানুয়ার মুনিরাম চক্রবর্তীর ছেলে। বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহের সভাকবি কবিচন্দ্রের নাম শঙ্কর। তিনি 'কবিচন্দ্র' উপাধি পেয়েছিলেন। রচনা করেছিলেন, 'গোবিন্দ মঙ্গল', 'কৃষ্ণমঙ্গল', 'পাঁচালী', 'রামায়ণ' ইত্যাদি।

কলকাতার জন্ম ও সামাজিক বিবর্তন এবং উত্তরকালের যাত্রা

জব চার্নকের জাহাজ ভিড়ল সুতানুটীর ঘাটে।

এই সময়ে সুতানুটী, গোবিন্দপুর আর কলিকাতা এই তিন গ্রাম বা অঞ্চলে কোন ইট-কাঠ-সিমেন্ট বা পাথরে তৈরি পাকাবাড়ি ছিল না। সূর্য ডুবল তো সব ডুবে গেল অন্ধকারে। জেগে থাকে চিতে, শিয়াল, কুকুর, বাদুড় আর চামচিকে! পেঁচা ডাকে এখানে ওখানে। বজ্র মুষ্ঠিতে লাঠি আর ধারালো অস্ত্র নিয়ে, কালো পাথর খোদাই করা, মাথায় ফেট্টি বাঁধা, কিছু মানুষ জবার মত লাল চোখে আগুন জ্বালিয়ে, মশাল হাতে জেগে থাকে। ওরা দস্যু-ডাকাতের দল। গভীর অরণ্যের এখানে-ওখানে-সেখানে কিছু মানুষ নামক জীবের মাথা গোঁজার আস্তানা। পূর্ণিমার চাঁদ উঠলে শুধু সেই আলো-আঁধারির মাখামাখি চলে গোটা রাত। ভোরে পাখি ডাকলে, মাথার ওপরে রাজার দেওয়ানের মত রুক্ষ রূপ নিয়ে সূর্যটা এসে দাঁড়ালে, ভয়ে হোক আর বাধ্যতায় হোক অন্ধকার গা ঢাকা দেয়। কিছু কাঁচা ঘরের বাসিন্দে বেরিয়ে পড়ে পেটের ক্ষুধা মেটাবার রসদ যোগাড়ে।

এমনি এক পরিবেশ আর পরিমণ্ডলের যে স্নিগ্ধতা তা জব চার্নকের আগেও একবার ভাল লেগেছিল। তা ছাড়া তাঁর মনের গভীরে ছিল কোম্পানির কর্মচারী হয়ে কোম্পানিব স্বার্থ রক্ষা করার স্বপ্ন! স্বপ্ন যে আরও কত সে ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায় ইতিহাসের পাতায়!

চার্নক যেদিন জাহাজ থেকে নামলেন সেদিন ছিল ১৬৯০ সালের ২৪ আগষ্ট। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ!

পাকা বাড়ির কথা যখন তুলেছি তখন ইতিহাসের পথ ধরে আর কিছুটা এগিয়ে দেখাই যাক না, জব চার্নক যখন সুতানুটীতে থাকার কথা পাকাপাকি ভাবে স্থির করলেন তখনই সেই গ্রামীণ পরিমণ্ডলে কোন স্মরণীয় পরিবর্তন ঘটেছিল কিনা!

না ঘটেনি। এমন কি প্রায় ১৪-১৫ বছরের মধ্যে জন জীবনের কল্যাণে কিছুই করা হয়নি কোথাও। ঔরঙ্গজেব বাদশাহের রাজত্ব। তখনও সুতানুটী-গোবিন্দপুর-কলিকাতা নামের কোন গ্রামেই পাকা বাড়ি যেমন ছিল না, তেমনি পথ ঘাটের অবস্থাও তথৈবচ। জব চার্নক যখন সুতানুটীতে আসেন তখন মুসলমান রাজত্বের সময় কাল। পুরোপুরি নবাব-বাদশার আমল।

জব চার্নক থাকুন সুতানুটীতে। সুতানুটী-গোবিন্দপুর-কলিকাতা থাক পাশাপাশি অথচ বিচ্ছিন্ন। আমরা একটু সপ্তদশ শতাব্দীর অন্তিম থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিমকাল পর্যন্ত এ দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের পর্যালোচনা করি।

ইংরেজরা সুতানুটীর গা লাগোয়া হাটকোলায় প্রথম দিকে আস্তানা গড়েছিল। সুতানুটীতেও

হাট বসত। সুতরাং এখানে আস্তানা গেড়ে বসলে ব্যবসা-বাণিজ্যেও ষোলকলা পূর্ণ হবে ভেবেই নিয়েছিল তারা। জব চার্নক এসে যোগ দিয়ে এই জায়গাটাকে এক বিশাল-বিস্ময়কর বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার কাজে লেগে গেলেন। মাত্র তিন বছরের মধ্যে বিস্ময়কর পরিবর্তন অবশ্য এনেওছিলেন। কিন্তু আরও স্বপ্ন সার্থক করার আগেই চলে গেলেন চার্নক।

১৬৯২ সালে ১০ জানুয়ারি মারা গেলেন চার্নক! বিলেতের এক পররাজ্যলোভী কোম্পানির আদর্শ কর্মচারী। বঙ্গদেশের এক হিন্দু ললনার স্বামী, তিন মেয়ের বাবা, আজকের বিদ্বজনের বিচারে কলকাতার জনক জব চার্নক রইলেন 'সেণ্ট জন্ চার্চে', প্রাচীন গীর্জায়। এর মধ্যে সমাধিস্থ চার্নক!

১৬৯৬ সালে চার্নকের বড় জামাই চার্লস আয়ার ইংরেজ তথা কোম্পানির পক্ষে মাদ্রাজ থেকে চলে এসে কলকাতার সর্বময় কর্তা হলেন। শ্বশুর মশাই যা যা স্বপ্ন দেখেছিলেন তার বাস্তব রূপায়ণের জন্য কাজ শুরু করে দিলেন চার্লস।

ওদিকে ঔরঙ্গজেব ইব্রাহিম খাঁকে বাতিল করে সেই সিংহাসনে বসালেন নাতি আজিম ওসমানকে।

এদিকে ইংরেজদের সর্বগ্রাসী কালো থাবা একটু একটু করে এগিয়ে আসতে থাকল। কলকাতা, সুতানুটী, গোবিন্দপুরের একচ্ছত্র মালিক সাবর্ণ চৌধুরীদের আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকার দুর্বলতাকে কাজে লাগাল তারা। ১৬৯৮ সালের ১০ নভেম্বর, সাবর্ণ চৌধুরীদের সেই তিনটি গ্রাম মাত্র ১৩০০ টাকায় কিনে নিল ইংরেজরা। এই বৃহত্তম অংশের পুরো জমিদার তখন ইংরেজ। কিছু অফিস, কিছু কিছু ভাঙা-গড়ার কাজও আরম্ভ হয়ে গেল।

১৭০০ সাল। অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনা। কলকাতা বড় হতে শুরু করেছে। দশ বছরের বালিকা কলকাতা। এবার কলকাতায় এলো, এক নতুন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ; তার নাম তখন, "English Company Trading to the East Indies". এই সময়ে বাংলার নবাব আজিম ওসমান আর দেওয়ান মুর্শিদকুলী খাঁ। ১৭০১ সালে মুর্শিদকুলী উপাধী সহ দেওয়ান হওয়া মুর্শিদকুলী খাঁ প্রথমেই মুখশুদাবাদের নাম পাল্টে নাম রাখলেন মুরশুদাবাদ! সেই মুরশুদাবাদই ভাষান্তরে আজকের মুর্শিদাবাদ! এই মুরশুদাবাদকেই করা হয়েছিল বাংলার রাজধানী। শুধু তাই নয়। এই সময়ে যে মেদিনীপুর ছিল উড়িষ্যার সঙ্গে যুক্ত মুর্শিদকুলী খাঁ সেই মেদিনীপুরকে উড়িষ্যা থেকে আলাদা করে বাংলার সঙ্গে যুক্ত করে বঙ্গদেশের সীমানা বা আয়তন বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি, মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের উৎপত্তির মূলেই ছিলেন মুর্শিদকুলী খাঁ।

এই সময়ের মধ্যে অর্থাৎ জব চার্নকের সুতানুটী বা কলকাতায় আসার পর থেকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে একটা বড় ধরনের চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতায় আর্মানীয়ানদের বসবাস পুরোপুরি শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেই সঙ্গে জমে উঠেছিল ব্যবসা বাণিজ্য। ১৭০৬ সালে কলকাতায় সর্বসাকুল্যে পাকা বাড়ির সংখ্যা মাত্র আট। কাঁচা বাড়ি ছিল আট হাজার। এ সব থেকে প্রমাণিত হয়, লোকসংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। এই সালেই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নবাবের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে, পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে কাশীমবাজারে একটি কুঠি তৈরি করে। এর ফলে মুর্শিদাবাদ এবং আশে-পাশের অঞ্চলে কিছু দিনের মধ্যেই প্রাণচঞ্চলতা দেখা দেয়। ব্যবসা-বাণিজ্য চলতে থাকে। কলকাতার চেহারাও পাল্টাতে থাকে মূলতঃ ইংরেজদের সুচতুর ভূমিকায়। এই সময়ে কলকাতায় রোড বলতে যা বোঝায় তেমন কোন বিশাল রাস্তা একটিও ছিল না। স্ট্রীটের মোটামুটি বড় ধরনের রাস্তা ছিল মাত্র দু'টি। গলি ছিল দু'টি। বাই লেন বলতে কিছুই ছিল না।—তথ্য ঃ কলিকাতা দর্পণ।

১৭০৭ সালে ১০ ফেব্রুয়ারি ভারত সম্রাট ঔরঙ্গজেব মারা যান। ১৭০৮ সালে সিংহাসনে বসেন বাহাদুর শাহ, ওরফে প্রথম শাহ আলম্। ভারত সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর,

তাঁর ছেলে বাহাদুর শাহ বাধালেন গৃহযুদ্ধ। আরও দুই ভাইকে যুদ্ধে পরাজিত করে নিজেই সিংহাসনে বসলেন। এই ব্যাপারটা ইংরেজ সরকার নিজেদের কাজে ব্যবহার করল। তারা রটিয়ে দিল, ঔরঙ্গজেবের মত সম্রাটের মৃত্যুতে রাষ্ট্রবিপ্লব হবার সম্ভাবনা!

১৭০৬ থেকে ১৭৫০ সাল পর্যন্ত ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মোগলদের সঙ্গে সব দিক থেকে সহযোগিতা করবে এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে শুধু মুর্শিদকুলী খাঁ বা পরে বাহাদুর শাহ ও অন্য নবাব ছাড়াও ১৭৩০ সালে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত সম্রাট আলিবর্দী খাঁকে পর্যন্ত কব্জা করে নিজেদের অধিকারের জাল বিছিয়ে ছিল। এ কথাও সত্য, কলকাতায় যে দস্যু-ডাকাতের সন্ত্রাস ছিল তা থেকে মুক্তিও দিল। সত্যি সত্যি জব চার্নকের স্বপ্ন দিয়ে গড়া কলকাতা হয়ে উঠল বিশাল ব্যবসায়িক কেন্দ্রভূমি। কলকাতায় পথ-ঘাট আর পাকাবাড়ির সংখ্যা, বসতি আশাতীত ভাবে বেড়ে গেল।

আকস্মিকভাবে এক সময়ে মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত তার পর্তুগীজ সৈন্যদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাংলার বুকে। সেটা ছিল ১৭৪২ সাল। মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলী, বীরভূম, রাজসাহী সর্বত্র বর্গীদের অত্যাচার সীমা ছাড়াল। গ্রামের পর গ্রাম, মহলের পর মহল প্রায় নিশ্চিহ্ন হলো। হুগলী, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম, রাজসাহী অঞ্চল থেকে গৃহহারা-সর্বহারা মানুষ কাতারে কাতারে ছড়িয়ে পড়তে থাকল সর্বত্র। বিশেষ করে সেই উদ্বাস্তুর দল জমা হতে থাকল 'কলিকাতা' গ্রামে এবং আশে-পাশে। মারাঠা বর্গীদের হাত থেকে রক্ষা পাবার প্রার্থনা জানালো তারা সরাসরি ইংরেজদের কাছে অর্থাৎ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে।

নবাব আলিবর্দী খাঁর অনুমতি নিয়ে কোম্পানি 'কলিকাতায়' ৩ মাইল ব্যাপী একটা গভীর পরিখা খনন করল যাতে সহজে মারাঠা বর্গীদের গতিরোধ করে সহজে মোকাবিলা করা যায়। যা আজও 'মারাঠা ডিচ্' নামে পরিচিত। নবাব আলিবর্দী নানা কৌশল বিস্তার করে মারাঠা সেনাপতির মৃত্যুদণ্ড দিলেন। বর্গীর হাঙ্গামা কিন্তু আরও বহুদিন বাংলাকে আতঙ্কিত করে রেখেছিল। এই অত্যাচারের রূপ এমনই ছিল যা পরবর্তী সময়ে বাংলার ঘরে ঘরে 'ঘুমপাড়ানি ছড়া'য় রূপায়িত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল!

এর মধ্যে গঙ্গা দিয়ে কত জল গড়িয়ে গেছে, তেমনি জব চার্নকের সুতানুটী কখন যে কলিকাতা আর গোবিন্দপুরের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে 'কলিকাতা' হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট তারিখ নেই। ইতিমধ্যে সিংহাসনের লোভে একদিকে যেমন নবাব-বাদশার বুকের রক্ত ঝরিয়েছে নবাব-বাদশাদেরই বংশধর-প্রিয়জনেরা, তেমনি আবার রক্ত ঝরিয়েছে পরসাম্রাজ্যলোভী, পর-সম্পদলোভী মানুষেরা। তবুও এরই মধ্যে ইষ্ট ইন্ডিয়াকোম্পানি ভারতের একচ্ছত্র আধিপত্য ভবিষ্যতে ছিনিয়ে নিতে পারবেই সেই বিশ্বাস থেকে, স্থায়িত্বকে কায়েম করতেই কলকাতার চেহারা একটু একটু করে অনেকটাই পাল্টেছে! ১৭০৬ সাল থেকে আলিবর্দী খাঁয়ের মৃত্যু পর্যন্ত বড় রাস্তার সংখ্যা ২৭ হয়েছে। ১৭০৬ সালে যেখানে ২টি গলি ছিল সেখানে গলি তৈরি হয়েছে ৫২টি। গোড়ায় যখন কলকাতায় কোন ছোট গলি ছিল না, সেখানে গলির সংখ্যা হয়েছে ৭৪টি! ১৭৫২ সালে যখন কলকাতার জমিদার হল হলওয়েল তখন কলকাতায় লোকসংখ্যা আশাতীতভাবে বেড়ে গিয়েছিল। বাড়তে শুরু করেছিল ১৭৫১ সাল থেকেই। যার যেখানে খুশি বাস করত। হলওয়েল নির্দেশ জারি করলেন, যারা যে কাজ নিয়ে আছ তারা এক জায়গায় থাকার ব্যবস্থা কর। এর ফলে কলকাতায় আস্তে আস্তে গড়ে উঠল 'পাড়া', 'টোলা', 'টুলী', ইত্যাদি।

মুর্শিদকুলী খাঁর পরে দু'জন অযোগ্য নবাব নবাবী করেছে, দেশ শাসন করেছে, সিংহাসন নিয়ে রক্তগঙ্গা বইয়েছে। ইংরেজরা দৌরাত্ম্যপনা করেছে কিন্তু কোন অবস্থাতেই বাংলার সামাজিক শৃঙ্খলা যেমন ভেঙ্গে পড়েনি, তেমনি আর্থিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়েনি। এর প্রধান কারণ ছিল

মুর্শিদকুলি খাঁয়ের শাসন পদ্ধতি! তিনি যে শাসন পদ্ধতি তৈরি করে গিয়েছিলেন তার জন্যে মুর্শিদকুলি খাঁয়ের নাম ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। থাক সে সব কথা।

১৭৫৬ সালে আলিবর্দী খাঁয়ের মৃত্যু হলো। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতি হলেন নবাবের নাতি ; জইনউদ্দীনের ছেলে, সিরাজ। সিরাজদ্দৌলা। মাত্র একটি বছর। এক সর্বনাশা আগুন নিয়ে খেলা করলেন তিনি। সিরাজ বুঝেছিলেন ইংরেজদের প্রকৃত অভিসন্ধি। ইংরেজরা নবাবী আমল নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে যে বাংলা প্রায় স্বাধীন সেই স্বাধীনতাকে মুছে দিয়ে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে বদ্ধপরিকর এটা যুবক সিরাজের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সিংহাসনে বসে প্রথমেই আক্রমণ ও জয় করলেন কাশিমবাজার কুঠি। ১৭৫৬ সালের ২৩ জুন অধিকার করেন কলকাতা। পরে ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি হয়। সিরাজ ঘোষণা করেন, কোন রকম কর না দিয়েই ইংরেজরা বাণিজ্য করতে পারবে শুধু না, কিছু ক্ষতিপূরণও পাবে। সন্ধি করলেন বটে, কিন্তু ইংরেজদের অভিসন্ধি তাঁর কাছে স্পষ্ট ছিল বলেই, ভিতরে ভিতরে সিরাজ ফরাসীদের সঙ্গে চুক্তি করলেন ইংরেজদের তাড়াবেন বলে। খবরটা লর্ড ক্লাইভের কানে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চন্দননগর অধিকার করলেন ক্লাইভ। ক্লাইভের পথ প্রশস্ত করল নবাবের কয়েকজন বেতনভোগী, অতি বিশ্বস্তজন। যেমন, জগৎ শেঠ-মীরজাফর-রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য এই রাজপুরুষরা গভীর ষড়যন্ত্র শুরু করলেন লর্ড ক্লাইভের সঙ্গে হাত মিলিয়ে। শেষ পর্যন্ত পলাশী নামের গ্রামে ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন যুদ্ধ শুরু হলো। মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজ পরাজিত হলেন। পরে মীরজাফরের ছেলে মীবনের আদেশে মহম্মদী বেগ সিরাজকে হত্যা করে! মনে রাখতে হবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার প্রকৃত অর্থে শেষ নবাব হলেন সিরাজদ্দৌলা!

১৭৬৩ সালে সিংহাসনে বসেন মীরকাশেম।

মীরকাশেমের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ চরমে পৌঁছুলো। এর ফলে ১৭৬৫ সালে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী চলে যায় ইংরেজদের হাতে। ফৌজদারি যাবতীয় কাজ রইল নবাবের আর রাজস্ব আদায়ের ভার ন্যস্ত ইংরেজদের। কোম্পানির কুঠিয়ালরা সেই রাজস্ব আদায় করত। কিন্তু কিছু ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য নবাব পক্ষের সঙ্গে ইংরেজ পক্ষের বিরোধ দানা বাঁধতে থাকে।

১৭৭০ সালে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এই দুর্ভিক্ষই 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' হিসেবে স্মরণীয়। এই দুর্ভিক্ষে দেশ উজাড় হলো। মৃতদেহের উপর মৃতদেহ জমা হলো। মৃতদেহ সরাবার লোক পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াল। ইংরেজ কুঠিয়ালরা এই মহামারী নিবারণের কোন ব্যবস্থাই করল না, বরং দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়েও যারা কোনমতে বেঁচে ছিল তারা শোষিত হতে থাকল। ওয়ারেন হেস্টিংস ঘোষণা করলেন, — যারা মরেনি, জমি জমা আঁকড়ে রেখেছে অত্যাচার করেই হোক অথবা যেভাবেই হোক রাজস্ব আদায় করতেই হবে।

ধনী আর শক্তিমানরা এই অত্যাচার-শোষণ থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য নতুন পথ নিল। বিবেক-মনুষ্যত্ব সব ভুলে গিয়ে সরাসরি তোষামোদপ্রিয় হল। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, শঠতা, পাপাচার যেন তাদের ধর্ম হয়ে দাঁড়াল। তার প্রভাব গিয়ে পড়ল নিচুতলার সাধারণ মানুষের ওপর। মানমর্যাদার বালাই রইল না। জাল-জুয়াচুরি-ঘুষ নেওয়া ও দেওয়ার সীমা ছাড়াল। মনুষ্যত্ব-বিবেক বলতে কিছু রইল না। কীভাবে টাকা বানানো যায় তাই হলো একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। ঘরে ঘরে এমন কিছু বিশ্বাসঘাতক তৈরি হলো যারা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ইংরেজদের হাতের পুতুল হলো স্ব-ইচ্ছায়। এর ফলে কিছু ভুঁইফোঁড় ধনীর জন্ম হলো। তারা পুরোনো জমিদারি ইজারা নিল। জনরুচির চূড়ান্ত অধঃপতন ঘটল। শিক্ষা-সংস্কৃতি বলতে কিছু ছিল না বটে, যা ছিল তাও বিনষ্ট হলো। অবক্ষয়ের সূচনা সেখান থেকেই। নিম্নরুচির যা কিছু উপকরণ এই হঠাৎ নবাবরা তাতে ইন্ধন জোগাতে থাকল।

জনরুচির কী মর্মান্তিক পরিণতি! লোকচিত্ত বিনোদন বলতে পূর্ব প্রচলিত যা কিছু অনুষ্ঠান বা লোকসংস্কৃতি তার অনিবার্য বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এ দেশের সাধারণ মানুষ নানা জাতের, নানা ধর্মের যাত্রা, ঝুমুর, পাঁচালী, কথকতা, এবং কীর্তনের যে রস পান করে মনের ক্ষুধা মিটিয়ে চলছিল, তার মধ্যে আসর জাঁকিয়ে বসেছিল আদিরসাত্মক খেউড়। যে নদিয়া-হুগলী, নীলাচল থেকে বরিশাল এক সময়ে উদ্বেলিত ছিল ঈশ্বরের নাম গানে, সেই নদিয়া-হুগলীর জনমানসে এই আদিরসাত্মক খেউড় যে কীভাবে বিস্তার লাভ করল তার বর্ণনা পেয়ে যাই ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" থেকে। সেই বর্ণনার নমুনা ঃ

"নদে শান্তিপুর হতে খেঁড়ু আনাইব।
নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব।।"

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন ভারতচন্দ্র। সেই ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলেন আদিরস। বহুকাল আগে ধর্ম প্রচারের অভিপ্রায়ে যত ভাবে এবং যত ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন বা কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্যলীলা উপস্থাপিত করা হতো কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে তার রূপ বদলাতে থাকল। পাঁচালী, কথকতা, তরজা-গান, তার উপরে আদিরসে টইটম্বুর যে তরজা-গানের প্রচলন হলো, তারই মধ্যে বিবর্তনের হাত ধরে জন্ম নিল শুধু না, অনেকটা বিস্তার লাভ করল কবিগান।

॥ কবিগান ॥

শ্রীসজনীকান্ত দাস কবিগানের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন,—"বাংলা দেশে বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত তরজা, পাঁচালী, খেউড়, আখড়াই, হাফ আখড়াই, দাঁড়া কবিগান, বসা কবিগান, ঢপ, কীর্তন, টপ্পা, কৃষ্ণ যাত্রা, তুক্কগীতি, প্রভৃতি নানা বিচিত্রনামা বস্তুর সংমিশ্রণে কবিগান জন্মলাভ করে—"। 'কবি' বলতে যাঁরা স্বভাবকবি তাঁদের বোঝায়। এঁরা মূলত অশিক্ষিত। এঁদের আবার 'কবিওলা' বলা হতো। এই স্বভাব কবিতা আদৌ 'কবিতা' নয়, 'কবিগান'। এই ধরনের রচনা ব্যাপক প্রতিষ্ঠা বা প্রচার পেয়েছিল পলাশীর যুদ্ধের কিছুকাল আগে থেকে, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই কলকাতাই এই কবিগানের কীর্তি তীর্থ। তবে গ্রাম গ্রামান্তরে এর প্রসার ঘটেছিল সীমাহীন। কবিগানের উদ্ভবের ইতিহাস চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলেছেন,—"ইংরেজদের নূতন সৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয় দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি, এবং সেই হঠাৎ-রাজার উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। তখন যথার্থ সাহিত্যরস আলোচনার অবসর, যোগ্যতা এবং ইচ্ছা কয়জনের ছিল। তখন নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধশালী কর্মশ্রান্ত বণিক সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া আমোদের উত্তেজনা চাহিত—তাহারা সাহিত্যরস চাহিত না।"

কবিগান পড়ার জন্য লেখা হতো না। দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বী গায়ক আসরে নেমে কোন বিষয় ঠিক করে নিয়ে পদ্য আকারে বিতর্কের অবতারণা করত। একজন প্রথমে 'চাপান' গাইতেন, অপরজন সেই 'চাপান'-এর 'উতোর' বা উত্তর দিতেন। 'সংবাদ প্রভাকর'-এর সম্পাদক গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্দ্র 'কবিওলা'-দের নিয়ে যে ঐতিহাসিক সন্ধানের দলিল রেখে গেছেন, তাকে পরবর্তী কালে কোন গবেষকই তথ্যের দিক থেকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারেননি। ঈশ্বরচন্দ্র ১২৬১ বঙ্গাব্দে লিখেছিলেন—"১৪৩ বা ১৫০ বর্ষ গত হইল, গোঁজলা গুঁই নামক এক ব্যক্তি পেশাদারি দল করিয়া ধনীদিগের গৃহে গাহনা করিতেন—"।

গুপ্তকবি সেই গোঁজলা গুঁইয়ের একটি মাত্র পদ আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। কালে কালে 'কবিগান'-এর বিবর্তনে আমরা পাই গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মহাপ্রভুর অভিনয় লীলার বিষয়গত 'কৃষ্ণলীলা'র মধ্যে 'যাত্রার অঙ্কুর'। পরবর্তী সময়ে তারই বিকাশ ঘটেছিল চণ্ডীযাত্রা,

মনসার ভাসানযাত্রা, রাসযাত্রা, চৈতন্যযাত্রা, বিদ্যাসুন্দর যাত্রায়। বিষয় 'কৃষ্ণলীলা' হলেও কৃষ্ণচন্দ্র বা সভাকবি ভারতচন্দ্রের আমলে যে কবিগানের সূচনা হলো তাতে যাত্রাগানের যে অগ্রগতি তা ব্যহত হলো। "যুগ-রুচির" প্রভাবে হলো অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট। সেই কবিগান বা যাত্রাগান মেয়েদের পক্ষে শোনা পাপ পর্যায়ে পৌঁছুলো।

১৭৯৯। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। এই পর্যায়ে কবিগান দিকে দিকে চরম বিস্তার লাভ করতে থাকল। একে একে বহু কবিয়াল বঙ্গদেশের সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে, চিত্তবিনোদন যে একটি অন্যতম প্রধান অঙ্গ তা প্রমাণিত করলেন। আমরা পেলাম, সবে বেড়ে ওঠা, সবে যুবতী হয়ে ওঠা 'কলিকাতা'র সিমলা বা সিমুলিয়ার হরু ঠাকুরকে। পেলাম 'কলিকাতা'র বাগবাজারে ভোলা ময়রা, ফরাসডাঙ্গার গোন্দল পাড়ার বাসু রায় ও নৃসিংহ রায়, চন্দননগরের নিত্যানন্দ বৈষ্ণব, হেন্‌সম্যান এ্যান্টনী, ঠাকুরদাস সিংহের মত বিরাট বিরাট লড়াকু কবিয়ালদের।

সামাজিক প্রেক্ষাপটে পররাজ্যলোভীদের, সিংহাসন লোভীদের, ষড়যন্ত্রকারী, চক্রান্তকারীদের সৃষ্ট কত না রক্তস্রোতের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে মানবপ্রেমের ঐশ্বর্য! কত না ফুটেছে মানব কল্যাণকামী মানব পদ্ম! কত না অগ্রগতি এসেছে সামাজিক অঙ্গনে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সমানভাবে তাল রেখে চলেছে জনস্বার্থ রক্ষার কর্মযজ্ঞ। দেশ গড়ার সঙ্গে এই মানুষই আবার মানুষ গড়ার কাজ করেছে উদয়-অস্ত। মানব শিক্ষা-সংস্কৃতির চেতনা উন্মেষের সঙ্গে চলেছে নব জাগরণের গান। অষ্টাদশ শতকে গড়ানহাটি, রাণিহাটি কৃষ্ণ বিষয়ক পালা কীর্তন, রামায়ণ গান, পাঁচালি, ভাসান গান, মনসার গান, আখড়াই, ঝুমুর, তরজা, কবিগান, সারিগান, মালসী, গঙ্গাগীতি, বিজয়াগীতি, গোবিন্দমঙ্গল, চৈতন্য চরিতামৃত, কালিয় দমন, রাস চণ্ডী, চৈতন্য যাত্রার রস প্রস্রবণে কলকাতা তথা বঙ্গদেশে গণচেতনার জোয়ার এসেছে।

এরই মধ্যে যাত্রায় এসেছে ভাঁড় জাতীয় চরিত্রসৃষ্টির প্রবণতা। বহু পৌরাণিক চরিত্রকেও ভাঁড় করে যাত্রায় মোটা দাগের কাজ শুরু হয়ে গেল। ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" অবলম্বন করে যে 'বিদ্যাসুন্দর' পালার সৃষ্টি তা যুগের চাহিদায় আদিরসাত্মক হলো। জনচাহিদা বৃদ্ধি পেল। এই সব যাত্রা যেমন সবে যৌবন প্রাপ্ত 'কলিকাতা'র অন্যতম বিনোদন হয়ে দাঁড়াল, তেমনি নাটমন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। কলকাতার সবে ধনী হয়ে ওঠা বড়লোকেরা যেন মরিয়া হয়ে উঠল এই অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট যাত্রা গানের পৃষ্ঠপোষকতায়। ওদিকে নতুন নতুন যাত্রাওয়ালার আবির্ভাবে কল্লোলিত হয়ে উঠল বিষ্ণুপুর, বর্ধমান, বীরভূম, যশোর, খুলনা, বরিশাল—এদিকে নদিয়া, হুগলী।

এই অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন রুচির যাত্রা গানের প্রাদুর্ভাব ঘটল। নাথ যাত্রা, পাল যাত্রা, শক্তি যাত্রা, চৈতন্য যাত্রা ইত্যাদি। সুখের বিষয়, এর মধ্যে অবশ্য রাধাকৃষ্ণ প্রেম-বিষয় জনমানসে বিশেষ ভাবে আসন পেতে বসেছিল। এই সব কৃষ্ণলীলা বিষয়ক যাত্রা এই শতকের শেষ দিকে 'কালীয়দমন যাত্রা' হিসেবে পরিচিত হলো। এই সময়ের মধ্যে অবশ্য এই সব যাত্রা বা চিত্তবিনোদনসূচক আনন্দ-অনুষ্ঠানের আঙ্গিক ভাঙ্গাগড়ার প্রবণতাও ছিল। ছিল নতুন নতুন দৃষ্টিকোণের ইঙ্গিত। ছিল ধর্ম প্রচারের জন্য এই মাধ্যমকে কাজে লাগাবার চেষ্টা।

অষ্টাদশ শতকে এই সব প্রমোদ অনুষ্ঠানে যত বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হতো তার মধ্যে 'ঢোল' বিশেষ ভাবে চিহ্নিত ছিল। সেই সময়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা কলকাতার এক ধরনের অভিজাত 'কালচার' হয়ে উঠেছিল বলে তারই প্রভাবে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সুরে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-এর গানও।

॥ উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক প্রেক্ষাপট / যাত্রার রূপবদল ॥

১৮০০ সাল। লর্ড ওয়েলেসলি কলকাতায় তৈরি করলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ।

সিভিলিয়ানরা দেশীয় ভাষা ও আইন বিষয়ক শিক্ষা লাভ ও তার প্রসারের জন্য অগ্রণী ভূমিকা নিল। বাংলা ভাষা প্রসারের জন্য, শিক্ষার প্রয়োজনে পাঠ্যপুস্তক লেখার দায়িত্ব পালনে তৎপর হলেন অনেকেই। এঁদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন, কেরীসাহেব, রামরাম বসু, চণ্ডীচরণ মুন্সী, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। দিকে দিকে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি, বাংলা ভাষা চর্চার জন্য পাঠশালা বা প্রাথমিক স্কুল তৈরি হতে থাকে। এই সব প্রাথমিক স্কুলের পাশাপাশি ইংরেজরা বিশেষ করে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তারের জন্য তৈরি করেন স্কুল।

১৮১৪ সালে চুঁচুড়ায় একটি ইংরেজি স্কুল তৈরি হয়। ১৮১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীরামপুর কলেজ। কলকাতার চিৎপুরে গরাণহাটা অঞ্চলে গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু কলেজ। পরে এই কলেজ, কলেজ স্ট্রীটে স্থানান্তরিত হয়। ১৮১৮ সালে ডেভিড হেয়ারের চেষ্টায়, রাধাকান্ত দেবের সম্পাদনায় প্রতিষ্ঠিত হয় স্কুল বুক সোসাইটি। এখান থেকে অনেক বই প্রকাশিত হয়। এরই মধ্যে রাজা রামমোহন রায় ধর্ম সংস্কারের জন্য 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করেন। ১৮১৮ সালেই রাজা রামমোহন 'সতীদাহ' প্রথা নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেন শুধু না, সতীদাহ বিচার সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করেন।

১৮২৮ সালে ডিরোজিও হিন্দু কলেজের ছাত্রদের নিয়ে গড়ে তোলেন আকাদেমিক অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সভা।

১৮২৯ সালে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন।

১৮৩০ সালে আলেকজেণ্ডার ডফ্ কলকাতায় এসে খৃষ্টধর্ম প্রচারে ভীষণ তৎপর হয়ে উঠলেন। এর ফলশ্রুতি-মাইকেল মধুসূদন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর খৃষ্টান হন।

১৮৪২ সালে শিক্ষা বিস্তারের জন্য গড়ে তোলেন মতিলাল শীল 'SEAL'S FREE COLLEGE.' ১৮৪৫ সালে খৃষ্টান ধর্মের দ্রুত বিস্তারের পাশে হিন্দু সমাজের আন্দোলনের জন্য তৈরি হয় 'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়'। রাধাকান্ত দেব স্থাপন করেন 'ধর্মসভা'। আবার এই ধর্মসভার শাখা তৈরি করেন মতিলাল শীল কলুটোলায়।

১৮৪৬ সালে কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্রের উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছিল ইংরেজি মহাবিদ্যালয়। এরই মধ্যে গোটা কলকাতা, শ্রীরামপুর, বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া, কৃষ্ণনগর, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ সর্বত্র শিক্ষা প্রসারের জন্য বিদ্যালয় তৈরি হয়।

দিকে দিকে যেমন শিক্ষা-ধর্ম ইত্যাদির ব্যাপারে একটা নবযুগের সূচনা হলো, তেমনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে ইংরেজদের নীলচাষের অধিকার লাভের ফলশ্রুতিতে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে গ্রাম-গঞ্জে কৃষকরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল কুঠিয়ালদের অত্যাচারে। এই অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশিত হতো বিভিন্ন সংবাদপত্রে। যেমন ১৮২২ সালের 'সমাচার দর্পণ', ১৮৩০ 'ভগ্নদূত', ১৮৪৮ 'সংবাদ প্রভাকর', ১৮৫০ সালের 'তত্ত্ববোধিনী', ১৮৫৩ সালের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' নীলকর বা কুঠিয়ালদের অত্যাচারের দলিল হিসেবে চিহ্নিত হলো।

স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের জন্য একদিকে যেমন 'বেঙ্গল লেডিস সোসাইটি' তৈরি হয়েছিল তেমনি এই সোসাইটির উদ্যোগে বহু জায়গায় গড়ে উঠেছিল বিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠিত হয় বেথুন কলেজ। ১৮৪৩ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। ১৮৬৪ সালে মেয়েদের জন্য স্থাপিত হয় ব্রাহ্মিকা সমাজ, কেশবচন্দ্র সেন হন আচার্য। ১৮৬৬ সালে আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও ১৮৭৮ সালে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ পরে নব বিধান ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়. বর্ধমানে মহারাজ মহাতাবচন্দ্র বাহাদুর ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। এই ব্রাহ্মসমাজ ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে। ঢাকা, ত্রিপুরা, মেদিনীপুর আরও অনেক জায়গায়। এরই মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় 'বিধবা বিবাহ'

আইন পাশ হয়। ১৮৭২ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশে এক শ্রেণীর 'ইয়ং বেঙ্গল' মাথা চাড়া দেয়। মদ এবং গোমাংস খাওয়া বৃদ্ধি পায়।

'সংবাদ প্রভাকর' ইয়ং বেঙ্গলদের এই মদ্যপানের প্রবণতা নিয়ে শুধুমাত্র কবিতাই প্রকাশ করেনি, মাইকেল মধুসূদন দত্তর 'একেই কি বলে সভ্যতা', দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটকে সমাজের সেই অবক্ষয়ের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নাটকের কথা যখন এসেই গেল তখন এ প্রসঙ্গে আরও একটু বিস্তারিত বলা দরকার।

* * * * * *

এই নব নাট্য যেমন মধ্যযুগে প্রচলিত সংস্কৃত নাট্যধারা থেকে প্রভাবিত নয়, তেমনি অনেক আগেই যে 'নাটগীত' প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছি, সেই 'নাটগীত'ও এক্ষেত্রে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। এদেশে বিদেশী রঙ্গালয় বা রঙ্গপ্রিয় পরিমণ্ডলে শেক্সপীয়ারিয়ান রচনাশৈলীর যে আধিপত্য বিস্তার লাভ করেছিল, মূলতঃ শেক্সপীয়রের নাট্যসম্ভার যে ভাবে প্রসার লাভ করেছিল, আমরা অনায়াসেই দেখতে পাই বাংলা নাটকের সূচনা পর্বে তার প্রভাব ছিল প্রকট।

১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে বাংলায় গদ্য রচনার যে ব্যাপক অনুশীলন শুরু হয়েছিল, তারই মধ্যে বাংলা নাটকের জন্ম সূচিত হয়। আর সেদিন যে বীজ দেখা দিয়েছিল হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর, অচিরেই তার অঙ্কুর দেখা দিল এবং অতি দ্রুত সেই অঙ্কুর মহীরূহ হতে থাকল। সুতরাং বাংলা নাটকে ইংরেজি ভাবাদর্শ, আঙ্গিক এবং উপস্থাপনা রীতির বৈশিষ্ট্যের ধারা প্রবাহিত হয়েছিল।

কিছু দিনের মধ্যেই কলকাতার ধনী ও সম্ভ্রান্ত কিছু মানুষের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতায় 'সখের থিয়েটার' একের পর এক জন্ম নিতে থাকল, তারই ফলে মৌলিক নাটকের চাহিদা বৃদ্ধি পেল। এই চাহিদা বৃদ্ধির নেপথ্যে যে কারণগুলি ছিল, তা হলো ইতিপূর্বে বাংলা নাটক যত রচিত হয়েছিল সেগুলি প্রধানত সংস্কৃত নাটকের ছাঁচে গড়া। সুতরাং 'সখের থিয়েটার'-এর পত্তনকালে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করা নাটক পরিবেশিত হতো। এই নাট্যকর্ম কোন অবস্থাতেই কাউকে তৃপ্ত করতে পারত না, বা সখের থিয়েটারের জনকদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুতরাং মৌলিক বাংলা নাটকের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে গেল। অগত্যা অনেকেই মৌলিক নাটক রচনায় মন দিলেন। তারই ফলশ্রুতিতে দুটি ভিন্নধর্মী ধারা এলো নাটকে। একটি হলো, পৌরাণিক বিষয় নিয়ে নাটক, অন্যটি তৎকালীন সামাজিক জীবনের যা কিছু ভাল ও মন্দ তার প্রেক্ষাপটে লেখা নাটক।

পৌরাণিক নাটক যদিও বিষয়গত দিক থেকে উত্তীর্ণ হলো, কিন্তু সামাজিক নাটক প্রহসন ধর্মী হলো। এই সময়ে যাঁরা সখের থিয়েটার নিয়ে মেতে উঠেছিলেন এখানে তাঁদের কথা বলব। তার আগে এ দেশে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রসঙ্গে সামান্য আলোকপাত করি।

১৭৯৫ খ্রীঃ হেরাসিম লেবেডফ প্রতিষ্ঠা করেন প্রথম বাংলা নাট্যশালা। বাঙালীর দ্বারা নাট্যশালার জন্ম এর প্রায় চল্লিশ বছর পর। জনক, প্রসন্নকুমার ঠাকুর। এ প্রসঙ্গে ১৮৩১ সনের ১৭ সেপ্টেম্বর 'সমাচার দর্পণ' যে সংবাদ দিচ্ছে তার পুনরুল্লেখ করি ঃ

"এতদ্দেশীয় নর্ত্তনাগার ঃ কিয়ৎকালাবধি কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয়েরদের মধ্যে এক নর্ত্তনাগার গ্রন্থননিমিত্ত আন্দোলন হইতেছে। তদর্থ বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অনুরোধে এতদ্দেশীয় শিষ্ট বিশিষ্ট মহাশয়দের গত রবিবারে এক বৈঠক হয় এবং তৎসময়ে আনুষ্ঠানিক কর্ম্মসকল নির্ব্বাহকরণার্থ নীচে লিখিতব্য মহাশয়েরা কমিটি স্বরূপ নিযুক্ত হইলেন শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুত বাবু গঙ্গানারায়ণ সেন ও শ্রীযুত বাবু মাধবচন্দ্র মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুত বাবু তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ঐ নর্ত্তনশালা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের

রীত্যানুসারে প্রস্তুত হইবেক এবং তন্মধ্যে যে সকল নাটকের ক্রীড়া হইবে সে সকলি ইঙ্গলন্ডীয় ভাষায়।"

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নাট্যশালা ছিল নারকেলডাঙ্গার বাগান বাড়িতে। ১৮৩১ সালের ২৮ ডিসেম্বর এর দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়। শেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সিজার'-এর অংশ বিশেষ এবং উইলসন কর্তৃক অনূদিত ভবভূতির 'উত্তর-রামচরিত' এই রঙ্গালয়ে প্রথম অভিনীত হয়......

এর অভিনয় প্রসঙ্গে ১৮৩২ সালের ৭ জানুয়ারি 'সমাচার দর্পণ'-এ যে পত্র ছাপা হয়েছিল তা ছিল এই রকম......'গত ১৪ পৌষ বুধবার [২৮ ডিসেম্বর ১৮৩১] রজনী যোগে শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাগানে হিন্দু থিয়েটার এক্‌ট অর্থাৎ নৃত্যাগারের কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে...ঐ রামযাত্রা দর্শনে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলাম তদ্দ্বারা অবগত হইলাম—রামলীলা নাটকের মত যাহা ২ ইঙ্গরেজী ভাষায় তরজমা হইয়াছে..হিন্দু বালকেরা...রাম লক্ষ্মণ সীতা ইত্যাদি সং সাজিয়া যাত্রা করিয়াছেন...এ দেশে পূর্ব্বকালে রাজারা নানা প্রকার যাত্রা দর্শন করিতেন তৎপ্রমাণ নাটক গ্রন্থ সকল বর্ত্তমান আছে এক্ষণে কেবল কালীয়দমন রাসযাত্রা চণ্ডীযাত্রা যাহা রাঢ় দেশীয় ক্ষুদ্র লোকের সন্তানেরা করিয়া থাকে তাহাতেই দেখা যায় এক্ষণে ভদ্রলোকের সন্তানরা ঐ ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন ইহা অবশ্যই উত্তমরূপে হইতে পারিবেন। অধিকন্তু সুখের বিষয় ইঁহারা ধনী লোকের সন্তান ইঁহাদিগকে প্রতি পদে পেলা দিতে হইবেক না কালিদমুনের ছোঁড়া গুলা সর্বদাই টাকা পয়সা চাহে তাহারা পয়সা বা সিকি আধুলি না পাইলে দর্শকদিগের নিকট আসিয়া অনেক রকম রঙ্গ ভঙ্গ করে সম্মুখ হতে যায় না...এ রকম যাত্রায় সে আপদ নাই।...'

প্রসন্ন ঠাকুরের থিয়েটারের নাম ছিল—হিন্দু থিয়েটার।

১৮৩৫। শ্যামবাজারের ধনাঢ্য নবীনচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠা করেন সখের থিয়েটার। আজকের শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর পাশে যে প্রাসাদোপম বাড়িটি গর্বের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে এটি নবীন বসুর বাড়ি, যে বাড়িতে ছিল তাঁর রঙ্গশালা। এই নাট্যশালায় বছরে চার-পাঁচটি নাটক হতো। প্রথম নাটক 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনীত হয় এই সালের ৬ অক্টোবর। ২২ অক্টোবর 'হিন্দু পাইয়োনিয়ার' (পাক্ষিক) পত্রিকা লিখল ঃ

'দেশীয় নাট্যশালা।...এই অভিনয় দেশীয়, ইংরেজী ধরণে সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের দ্বারা দেশের ভাষায় হইয়া থাকে।...এই নাট্যশালায় বাঙালী রমণীরা সর্বদাই দেখা দিয়া থাকেন। কারণ, স্ত্রীলোকের অংশের অভিনয় ইহাতে হিন্দু রমণীরাই করিয়া থাকেন...'

এখানে বলে রাখা দরকার, বিদ্যার ভূমিকায় সেদিন অভিনয় করেছিলেন ১৬ বছর বয়সের রাধারাণী দাসী। নবীনচন্দ্র ব্যয় করেছিলেন ২ লক্ষ টাকা।

নবীনচন্দ্র বসুর পর এই সখের থিয়েটার অত্যন্ত উদ্যমের সঙ্গে পরিচালনা করেছিলেন নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৭২ সালের ১১ ডিসেম্বর 'The National Paper' পত্রিকায় এ দেশের নাট্যশালার পূর্ব ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছিল। তার পৃষ্ঠায় আমরা চোখ বুলিয়ে নিলে দেখতে পাব ঃ

"The first project of the kind was contemplated by the late Hon'ble Baboo Prosono Commer Tagore. The next attempt of the kind was made by Baboo Nabin Chunder Bose, of Shambazar...The third attempt of the kind was made by the late Baboo Nagender Nauth Tagore. He was very successful in his attempt."

এর অনেক আগে থেকেই কলকাতার বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্ররা ইংরেজি নাটকের অংশ আবৃত্তি করার একটা রেওয়াজ এনেছিল।

১৮৩৭ সালের ২৯ মার্চ কলকাতার গভর্নমেণ্ট হাউসে হিন্দু কলেজের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে ছাত্ররা শেকস্‌পীয়রের লেখা থেকে নির্বাচিত অংশ আবৃত্তি করেছিলেন।

১৮৫১ সালের ৭ আগষ্ট চিৎপুরে বটতলায় ডেভিড হেয়ার আকাদেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৩ সালে এই স্কুলের ছাত্ররা 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস' নাটকটি অভিনয় করেন।

এই স্কুলের দেখাদেখি ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর ছাত্ররা নাটক মঞ্চস্থ করতে থাকে। এমন কি এই স্কুলে নাট্যশালা তৈরি হয়। এই ভাবে গোটা কলকাতায় নাট্যচর্চা, নাট্য রচনা, নাট্য উপস্থাপনার একটা বড় রকমের জোয়ার আসে। পাশাপাশি কলকাতার ধনী ব্যক্তিদের সখের থিয়েটার তৈরি অব্যাহত থাকে। ১৮৫৭ সালে আশুতোষ দেব তাঁর বাড়িতে সখের রঙ্গশালা তৈরি করেছিলেন। এখানে নন্দকুমার রায়ের 'শকুন্তলা' খ্যাতির সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ ছিল এই নাটক।

আমি যেহেতু এখানে নাটক বা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করছিনা, সেই হেতু আবার যাত্রার কথায় চলে আসি।

আধুনিক যাত্রাগানের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে। যাত্রা অভিনয় প্রসঙ্গে দুটি শতাব্দীর কথা মনে রাখা দরকার। সেই দুটি শতাব্দী হলো ষোড়শ আর ঊনবিংশ। ষোড়শ শতাব্দীতে আমাদের দেশের মাটিতে যাত্রার বীজ বপন হয়েছিল। আর অঙ্কুর দেখা দিয়েছিল ঊনবিংশ শতকে। চৈতন্য মহাপ্রভুর অভিনয় লীলা অর্থাৎ কৃষ্ণলীলাই হলো যাত্রাগানের প্রাথমিকরূপ তা অনায়াসেই বলা যেতে পারে।

প্রাচীন যাত্রা পালায় এক সময়ে দেখা দিল 'কালীয়দমন' অভিনয়। এই 'কালীয়দমন' প্রসঙ্গে সকলেই যা বোঝেন তা হলো, যমুনার জলে কৃষ্ণ কর্তৃক কালীয় নাগের দমন। কিন্তু তখনকার দিনে 'কালীয়দমন' বলতে তা বোঝাত না। কৃষ্ণলীলায় যা বর্ণিত হতো তা সবই এই কালীয়দমনের অন্তর্ভূক্ত ছিল। কালীয়দমন বলতে বোঝাতো, গোষ্ঠ, রাস, দোল, নৌকাবিহার, মানভঞ্জন, কংসবধ, মিলন ইত্যাদি।

এরপরই 'পাঁচালি' গানের প্রবর্তন। সেই সূত্রে 'কবিগানের' আবির্ভাব। কবিগানের প্রভাবেই কৃষ্ণকীর্তন বা পাঁচালি সব কিছুই নিম্নরুচিসম্মত হয়। অতিদ্রুত কুরুচিপূর্ণ সেই যাত্রাগান এতই অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট হয়ে ওঠে যে, মেয়েদের পক্ষে সেই যাত্রাগান শোনা অত্যন্ত দোষের বলে বিবেচিত হতো। এ প্রসঙ্গে ১৮২২ সালের ১৩ এপ্রিল 'সমাচার দর্পণ' লিখছে—

—"অনেক শাস্ত্রে লিখিত আছে, স্ত্রীলোকের অকর্তব্য এই ২ দুষ্ট বুদ্ধিতে অন্যপুরুষ অবলোকন ও সহবাস ও যাত্রোৎসবে গমন ও একাকিনী গমন ও ব্যাভিচারিণীর সংসর্গ। এ সকল কর্ম্ম স্ত্রীলোকের ধর্ম্মনাশের কারণ হয়..."।

॥ শিশুরাম অধিকারী ॥

ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে এই অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট যাত্রাগানের জোয়ারকে রোধ করে উন্নতমানের যাত্রাগানের অবতারণা করেন শিশুরাম অধিকারী। এ সম্পর্কে ১৮৫৯ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-তে লিখেছিলেন, —"গত বিংশতি বৎসরের মধ্যে কবির হ্রাস হইয়াছে। তাহার ত্রিংশত বৎসর পূর্ব হইতে যাত্রা বিশেষ প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। শিশুরাম অধিকারী নামা এক ব্যক্তি কেঁদেলী গ্রাম নিবাসী ব্রাহ্মণ তাহার সম্পাদন করেন। তৎপূর্ব হইতে বহুকালাবধি নাটকের জঘন্য অপভ্রংশ স্বরূপ এক প্রকার যাত্রা এতদ্দেশে বিহিত আছে। সংকীর্তন ও পরে কবির প্রচারের মধ্যে তাহার প্রায়ঃ লোপ হইয়াছিল। শিশুরাম হইতে তাহার পুনর্বিকাশ হয়। শিশুরামের পর শ্রীদাম সুবল ও তৎপরে পরমানন্দ প্রভৃতি অনেকে যাত্রার পরিবর্ধনে নিযুক্ত হইয়া অনেকাংশ কৃতকার্য হইয়াছে..."

যা হোক, কালীয়দমন যাত্রা চৈতন্যের সময়ে উদ্ভব হয়েছিল এবং রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর অনেক বছর পর পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় এই 'কালীয়দমন' পালাগানের জন্যই খ্যাতিমান হয়েছিলেন। সেদিক থেকে হিসাব করলে এই কালীয়দমন যাত্রার আয়ু ছিল চারশ বছর।

॥ শ্রীদাম সুবল প্রসঙ্গ ॥

শিশুবাম অধিকারীর পর সুরুচিপূর্ণ যাত্রাগান পরিবেশন করা বা যাত্রাগানকে মার্জিত করে তোলার জন্য যাঁদের দান অনস্বীকার্য তাঁরা হলেন শ্রীদাম-সুবল। এঁরা দুই ভাই। যতদূর জানা যায়, ১৭৫৭ সালে, অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের কিছু আগে, এই দুই ভাই কালীয়দমন পালাভিনয়ে খুবই খ্যাতিমান হয়েছিলেন। শ্রীদাম-সুবলের সময়ে আর যাঁরা খ্যাতিমান ছিলেন তাঁরা হলেন, 'বিদ্যাসুন্দর' রচয়িতা ভারতচন্দ্র, কবি গায়ক ভারতচন্দ্র, কবি গায়ক লালুনন্দ লাল, কীর্তন গায়ক বাঞ্ছারাম বৈরাগী, কথক অর্থাৎ পুরাণ বক্তা গদাধর শিরোমণি।

১৮২০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে শ্রীদামের মৃত্যু হয়। এই মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার ১৮২১ সালের ২১ অক্টোবর।...

"ওলাওঠা রোগ এতদ্দেশে পুনরাগমন করিয়াছে তাহাতে স্থানে (২) রোগে অনেক লোক মরিতেছে। 'কালীয়দমন' যাত্রাকারী শ্রীদাম-সুবল দুই ভ্রাতা দুর্গোৎসবে মোং শ্রীরামপুরে যাত্রা করিতে আসিয়াছিল তাহাতে নবমী পূজার দিন দুই প্রহর সময়ে শ্রীদাম ঐ রোগে হঠাৎ মরিয়াছে। এবং পূর্ব রাত্রিতে ঐ সম্প্রদায়ের এক বালক মরিয়াছে।"—

শ্রীদাম-সুবল দু'জনেরই কবিত্ব ভাব প্রবল ছিল। শ্রীদাম শুধু যাত্রা অভিনেতা ছিলেন না, তিনি একাধারে ছিলেন গীতিকার ও সুরকার। এই সময়ে আখড়াই গানে প্রসিদ্ধ নিধুবাবু তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

১২৬১ সনের ১লা শ্রাবণ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকাব একটি সংবাদ ছিল এই রকম ঃ

"১২১১ অব্দে নিধুবাবুর উদ্যোগে এতন্নগরে (কলকাতায়) দুইটি সংশোধিত সখের আখড়াই দলের সৃষ্টি হইল। তাহার এক পক্ষে বাগবাজার ও শোভাবাজারস্থ সমুদয় ভদ্রসন্তান এবং আর এক পক্ষে মনসাতলা অথবা পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী নীলমণি মল্লিক মহাশয় ও তাঁহার বন্ধুবর্গ ব্রতী হইলেন...নিধুবাবু বাগবাজারের পক্ষ হইয়া গীত ও সুর প্রদান করিলেন, এবং মল্লিকবাবুর পক্ষে শ্রীদাম দাস প্রভৃতি কয়েকজন গীত ও সুর প্রস্তুত করনার্থ প্রবৃত্ত হইলেন।"

শ্রীদাম-সুবল যে যাত্রাগানের মর্যাদাবৃদ্ধি করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে যাত্রাগান শোনা মেয়েদের পক্ষে পাপতুল্য বলে গণ্য হতো, সেই হেন যাত্রাদলের অধিকারী এবং গায়ক শ্রীদাম-সুবলের আত্মীয়তা শ্লাঘার বিষয় হয়েছিল। শ্রীদাম-সুবলের আত্মীয়া যে পাত্রী বিবাহের বাজারে তার দাম ছিল চড়া। ১৮২৫ সালের ৫ মার্চ 'সমাচার দর্পণ'-এর সম্পাদকের কাছে লিখিত একটি পত্র থেকে জানা যায় ঃ "আমড়াগাছি গ্রামের শ্রীকেনারাম ঘোষালের কন্যা, মেয়েটি উত্তম শ্যামবর্ণা অঙ্গ সৌষ্ঠব আছে। বয়স ১১ বৎসর কিন্তু একটু লক্ষ্মী টেরা সে লক্ষ্মীসূচক। ঘোষাল প্রধান লোক শ্রীদাম-সুবল যাত্রাওয়ালার সহিত আদান-প্রদান এমন ঘরের কন্যা পাওয়া ভার ৬০০ টাকা পণ তদ্ভিন্ন ডেলা সেলামী ও মোড়চা ৫০ টাকা লাগিবেক গহনা যে দিবা সে তোমারি থাকিবে এই কথাতে ঐ বিশিষ্ট বয়োজ্যেষ্ঠ কুল শ্রেষ্ঠ বর নষ্ট ঘটকের মিষ্ট কথায় ইস্টজ্ঞানে হৃষ্ট হইয়া যথেষ্ট চেষ্টাতে তাবৎ পৈত্রিক বিষয় নষ্ট করিয়া প্রকাণ্ড একান্ত প্রত্যাশাবৎ জলপিণ্ডাশাতে ঐ গণ্ডমূর্খ এক মাংসপিণ্ড ক্রয় করিয়া পণ্ডশ্রম মাত্র করিল ও একখানি মুগ্ধবোধ প্রস্তুত করিয়া রাখিল অর্থাৎ পরোপকৃতয়ে ময়া।"

শ্রীদাম-সুবলের সমসাময়িক আখড়াই গায়ক বা যাত্রা গানের ধারক ছিলেন রামপ্রসাদ ঠাকুর আর নসিরাম সেকরা। যদিও শ্রীদাম-সুবলের পরই পরমানন্দ দাসের কথা আসে।

॥ পরমানন্দ দাস ॥

এই পরমানন্দ শ্রীদাম দাসের দলে সখি সাজতেন এবং পরে নিজে আলাদা যাত্রাদল তৈরি করে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা বা গুরু স্মৃতিকে অক্ষুণ্ণ রাখার নৈতিক দায়িত্ব পালন করেন। পরমানন্দ দাস বা অধিকারী শুধু কৃষ্ণযাত্রার পদকর্তা, গায়কই ছিলেন না, তিনি ছিলেন অধিকারীদের অধিকারী। তিনি ছিলেন প্রাচীনতম অধিকারী এবং গোবিন্দ অধিকারীর বৃত্তিগুরু। তাঁর যাত্রা রীতির বৈশিষ্ট্য হলো দূতিয়ালিতে। পরমানন্দ নিজে দূতী সেজে গানে গানে সবার মনোরঞ্জন করতেন। ১৮শ শতাব্দীর শেষ ও ১৯শ শতাব্দীর প্রথম দিকে তিনি বেঁচে ছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। সম্ভবত তাঁর জন্মস্থান ছিল, বীরভূমে।

পরমানন্দ 'কালীয়দমন' পালায় গানের সঙ্গে কথা বা গদ্য সংলাপ (DIALOUGE) শুধু সংযুক্তই করেননি, তিনি 'তুক্কো' প্রথা প্রবর্তন করে যাত্রার যেমন রুচি পাল্টে দিয়েছিলেন, তেমনি বৈচিত্র্যও এনেছিলেন। পরমানন্দ জন্মেছিলেন হুগলী জেলার তাবা গ্রামে।

পরমানন্দের এই কর্মকাণ্ডের কথা 'INDIAN STAGE'-এ আছে ঃ

"He used to run the show by acting the part of a Duti'. Krishna and Radhika were but nominal characters......

There was not too much abundandance of songs in Parama's yatra. For producing poetic effect Parama used Dialouges in greater proportion and songs were composed in prayers (on rhymed couplets) and they were after sung in the tune with which prayers were used to be sung. At the last end of the rhymed couplets he used to sing in the tune of Kirtan...That was known as Tukko and Paramananda was its creator."

সেই পরমানন্দের তুক্কো'র নমুনা কিছুটা এখানে হাজির করা যাক ঃ

"সারা বন বুলে বুলে
বনফুল আনলাম তুলে
তার বোঁটাগুলি দিলাম ফেলে
তোমার শ্যামঙ্গে বাজিবে বলে।।"

॥ প্রেমচাঁদ ॥

পরমানন্দের সময়কার আর একজন যাত্রাওয়ালা বা অধিকারী এই প্রেমচাঁদ। ইনি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবপদগুলির সহজ ভাষা রূপান্তর শুধু করেননি, সেই সঙ্গে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবপদগুলিতে নিজের কিছু মৌলিক পদ যুক্ত করে একটি নতুন পদ রচনায় প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। স্বরচিত পদ নিজেই এমন সুন্দর গাইতেন যাতে শ্রোতারা মুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারতেন না।

॥ বদন অধিকারী ॥

প্রেমচাঁদের দলে একটি ছেলে ছিল। ছেলেটি প্রেমচাঁদের খুবই প্রিয়পাত্র শুধু নয়, অত্যন্ত অনুগতও ছিল। আজকের যাত্রায় হয়তো অনেক মালিকের এই ধরনের প্রিয় অথবা অনুগত ছেলে আছে কিন্তু তারা কখনই কুরুচিপূর্ণ আখ্যায় আখ্যায়িত নয়। প্রেমচাঁদের সময়ে কিন্তু এই অনুগতের দল একটি বিশেষ আখ্যায় আখ্যায়িত হতো, তা হলো "ছোকরা"। প্রেমচাঁদের 'ছোকরা'। সেই ছোকরার নাম বদন। প্রেমচাঁদের পরই বদন নিজে একটি দল খোলেন। তাকে বলা হতো "বদন

যাত্রা”র দল। সেই বদন অতি অল্প সময়ের মধ্যে বদন অধিকারী নামে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলেন। হাওড়া জেলার শালখেতে বদনের জন্ম। বদনের এত খ্যাতির মূলে ছিল সুললিত কণ্ঠের গান। যে তাঁর গান শুনতো সে-ই মুগ্ধ হতো। এর ফলে “বদন যাত্রা” দল আশাতীতভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। বদনের গানের নমুনা ঃ

“যাও যাও যাও কালাচাঁদ, এথা এস না।
ঘুমের ঘোরে নিশিভোরে
(তুমি) কোথা হ'তে এলে বল না......”

বদন অধিকারীই প্রেমচাঁদের “তুক্কো”কে সংস্কৃত করেন এবং গানে অনুপ্রাস যুক্ত করেন। এর ফলে যাত্রাগান আরও কিছুটা শ্রীমন্ডিত হলো। বদন অধিকারীর মৃত্যুর পর তাঁর নিজের ছেলে ক্ষেত্র, ভাইয়ের দুই ছেলে যদু আর ব্রজ ‘তুক্কো’কে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেও পারেননি, বরং কাজটি সহজ নয় মনে করে তাঁরা যাত্রা থেকে সরে যান।

॥ গোবিন্দ অধিকারী ॥

বদন অধিকারীর মৃত্যুর সঙ্গে ‘কালীয়দমন’ যাত্রার যে পুরাতন রীতি বা ফর্ম তাও প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এই সময়কার শ্রোতা বা দর্শকদের রুচির সঙ্গে তাল রেখে নতুন ফর্মের প্রবর্তনা করে যিনি আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তিনি হলেন গোবিন্দ অধিকারী। Indian Stage গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ “It is to keep with these Govinda had to Introduce New Style.” ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায়, সম্ভবতঃ ১৮০০ সালে কৃষ্ণনগর নদিয়ার জঙ্গপাড়ায় গোবিন্দ অধিকারীর জন্ম। গ্রামের পাঠশালায় তাঁর বাল্য শিক্ষা। শৈশবের লেখাপড়া শেষ করে সংকীর্তনে আকৃষ্ট হন এবং হাওড়া জেলার ধুরখালি গ্রামের গোলকদাস অধিকারীর কাছে কীর্তন শেখেন। জাতিতেও তিনি ছিলেন বৈষ্ণবশ্রেণীভুক্ত ব্রাহ্মণ। এই কীর্তন শেখার পর তিনি জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাত্রাদলের ‘ছোকরা’ হিসেবে খ্যাতি পান। এরপর তিনি নিজেই কীর্তনের দল তৈরি করেন। কিন্তু এই দলের আর্থিক অবস্থা যখন কোন মতেই পাল্টাতে পারলেন না তখন তিনি “কালীয়দমন” যাত্রাদল তৈরি করে অভিনয় করতে আসরে অবতীর্ণ হন। ‘রাধাকৃষ্ণের লীলা’ অভিনয়ে তিনি নিজে দূতীর ভূমিকায় অভিনয় করতে আসরে অবতীর্ণ হন। খুবই জনপ্রিয় হন এবং তাঁর দলও প্রতিষ্ঠা পায়। এরপর গ্রামের বাড়ি ছেড়ে তিনি চলে আসেন সালখিয়াতে। যাত্রাদলের জন্য গোবিন্দ অধিকারী যে পদাবলী ও গান রচনা করেছিলেন তা বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল। শুধু যাত্রা নয়, একই সঙ্গে কীর্তন, কথকতা ইত্যাদি করে জীবনে বহু অর্থ রোজগার করেছিলেন। পরে তিনি জমিদারী কিনতেও সক্ষম হয়েছিলেন। গোবিন্দ অধিকারীর উল্লেখযোগ্য যাত্রাপালা হলো, ‘শুকসারির পালা’ ‘চূড়া নূপুরের দ্বন্দ্ব’। ১৮৭২ সালে এই শক্তিমান পদকর্তা ও উন্নত যাত্রার প্রবর্তকের মৃত্যু হয়।

গোবিন্দ অধিকারীর পোশাক ঃ গোবিন্দ অধিকারী যে পোশাক পরে আসরে অবতীর্ণ হতেন, সেগুলি ছিল জরি বসানো শালুর কাপড়ে তৈরি।

ব্যবহৃত বাদ্য যন্ত্র ঃ গোবিন্দ তাঁর যাত্রাগানে প্রধানতঃ ব্যবহার করতেন তানপুরা, খোল, করতাল।

যাত্রাগানে গোবিন্দর বক্তৃতা ঃ এ প্রসঙ্গে বিশ্বকোষ (১৩০৯) থেকে পাওয়া যায়—
“বিদ্যাসুন্দরের আদি রসাশ্রিত প্রীতিপ্রদ গীতি স্রোতে যখন কলিকাতা এমন কি সমগ্র বঙ্গদেশ একরূপ মজিয়া উঠিয়াছিল, তখন সকরুণ বক্তৃতা ও সুমধুর কৃষ্ণ প্রেম গানে সমস্ত বঙ্গদেশকে মাতাইয়া বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দ অধিকারী যাত্রার আসরে প্রতিপত্তি বিস্তার করিতেছিলেন—”

প্রধান আসর ঃ বর্ধমান রাজবাড়িতে গোবিন্দ একচেটিয়া পালাগান গাইতেন। বঙ্গভাষার লেখক হরিমোহন মুখোপাধ্যায় বলেছেন—"যাত্রার আসরে লোক ধরিত না, তিল ফেলিবার স্থান কুলাইত না। গোবিন্দ আসরে নামিবেন এই আশায় সকলেই সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিত।"

কৃষ্ণ যাত্রা ঃ এই পালার নাম, 'কৃষ্ণকালী'। এতে প্রায় ৭০ খানা গান ছিল। পালাটি ৩ অঙ্কের।

কালীয়দমন ঃ চার অঙ্কের 'কালীয়দমন' পালায় ৫৬ খানা গান রাখা হয়েছিল।

প্রতিটি গান রাগরাগিণী যুক্ত ও কীর্ত্তনাঙ্গ ছিল। পালায় 'তুক্কো'র অবতারণা ছিল।

গানের নমুনা ঃ 'কৃষ্ণকালী' পালার একটি গানের নমুনা ঃ

"কৃষ্ণ আজি কালী হইল নিধুবনে,
বন আলোকিত হল রূপের কিরণে।।
চতুর্ভুজা এলাকেশী, দিগম্বরী করে অসি,
লোলজিহ্বায় অট্টহাসি করালবদনে।।
প্রভাকর জিনি প্রভা শিরেতে কিরীটের শোভা,
মুণ্ডমালা গলে কিবা দুলিছে সঘনে।।
নানা জাতি বনফুলে রক্তজবা বিল্বদলে,
পূজা করে যাই কুতুহলে অভয়ার চরণে।।
আয়ান আসিয়ে দেখে, রাধিকে পূজে কালীকে,
পুলকে পুলকে ভরে লুটাবে ধরাসনে ;
কৃষ্ণকালীর চরণ কমলে দাসগোবিন্দ ভাবে কেবল
দারুণ শমন কবল এড়াতে নিদানের দিনে।" (৩য় অঙ্ক, বৃন্দার গান)

'মুক্তাবলী' ঃ গোবিন্দ অধিকারী তাঁর এই পালায় যে গদ্য সংলাপ দিয়েছিলেন তা সুর করে বলা হতো। ৫ অঙ্কের এই পালায় সেই সংলাপের নমুনা ঃ

সুবল ঃ "ওগো ব্রজেশ্বরী রাই কিশোরী, কৃষ্ণ প্রেমোন্মাদিনী রসময়ী রসবতী রাইধনি গো! প্রণাম হই গো!"

ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য বলেছেন,—"এই প্রকারের সুরে গদ্য সংলাপ পরিবেশনে কথকতা ও রামায়ণ গানের প্রভাব রহিয়াছে।"

'দেয়াশিনী মিলন' ঃ ৩ অঙ্কের এই পালা গানে 'ঢপ'-এর তুক্কো ছিল বলে মনে হয়। খুব আশ্চর্য লাগে যখন দেখি গোবিন্দের যাত্রাগানে ব্যবহৃত সংলাপ বিন্দুমাত্র দীর্ঘ নয়। যেমন—

কৃষ্ণ বলছেন ঃ "ওগো দাদা! এ কালীদহের জল যে বিষে বিষে নীল হয়েছে গো। ওরা যদি এ জল খেয়ে থাকে তা হলে তো বাঁচবে না গো।"

আরও বিস্ময় এনে দেন গোবিন্দ অধিকারী, যখন তিনি পাণ্ডুলিপিতে নাট্য নির্দেশনাও উল্লেখ করেন। উদারণ স্বরূপ ৪ অঙ্কের "কলঙ্কভঞ্জন" পালার, চার অঙ্ক ;—নন্দালয়।

"যশোদা কৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া উপবিষ্ট, বৈদ্য,
রাম, কুটিলা ও জটিলার প্রবেশ।"

গোবিন্দ অধিকারী কিছু কিছু পালায় 'গৌরচন্দ্রিকা' ব্যবহার করেছিলেন।

হাওড়া জেলার সালখিয়ায় ছিল গোবিন্দ অধিকারীর দল। ১২৭৭ বঙ্গাব্দে তিনি সালখিয়ার গঙ্গার ধারে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, এই গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা খুব ছেলেবেলায় দেখেছিলেন বীরেশ্বর। আমাদের স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দের সেই বাল্যস্মৃতি অতি সুন্দরভাবে লিখে গেছেন স্বামীজীর ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত।

॥ যাত্রা দেখে বালক নরেন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া ॥

"......মহেন্দ্র গোস্বামীর গলিতে বা ডোমপাড়ায় আগে একটা বড় পুকুর ছিল। তাহার ধারে অনেক গয়লার বাস ছিল। এখন পুকুর বুজাইয়া একটা মাঠ হইয়াছে। এবং যেখানে অনেক ভদ্রলোক বাস করিতেছেন।

ইংরাজী ১৮৭১ বা ৭২ সালে গয়লাদের মাঠে বারোয়ারী পূজা হইল এবং সেখানে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা হইয়াছিল। আমরা দুই ভাই তখন খুব ছোট। শেষ রাতে কাপড় পরিয়া গয়লা পাড়ার যাত্রা শুনিতে গেলাম। চোখে তখন ঘুম ছিল।

মাঠের গয়লারা আমাদের সকলকে চিনিত সেই জন্যে খুব যত্ন করিয়া আমাদের লইয়া বসাইল।

আমার বয়স তখন চার বা পাঁচ এবং স্বামীজির দশ বা এগারো। সবে ভোর হইয়া আসিয়াছে এমন সময় একজন হরবোলা আসিয়া নানা রকম পাখীর আওয়াজ করিতে লাগিল। তারপরে কতকগুলি গান হইল। তারপরে কতকগুলি সঙ্ আসিল। সে জাজিমের উপর শয়ন করিল। পরে মাথা আর পা মাটিতে রাখিয়া পিঠের শিরদাঁড়াটাকে ধনুকের মত করিয়া ফেলিল এবং ঘুরিয়া ফিরিয়া নানা রকম নাচ দেখাইল। তাহার পর ১০।১২ বছরের ছেলে আসিল, সেও পাক দিয়া নাচিতে লাগিল। তাহার খানিক পরে আমরা চলিয়া আসিলাম। গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রার কথা এই মাত্র মনে আছে......

বীরেশ্বর বাড়িতে আসিয়া সেই যাত্রা শুরু করিয়া দিল। কাপড়খানি যাত্রাওয়ালাদের মত পরিয়া যাত্রায় যাহা যাহা শুনিয়াছিল তাহারই আবৃত্তি চলিল। সেই লইয়া বেশ দিন কতক চলিল!......"

॥ লোচন অধিকারী আর জন হ্যালহেড ॥

গোবিন্দ অধিকারীর সমসাময়িক আর একজন যাত্রাওয়ালা ছিলেন যিনি আশাতীত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। নাম লোচন অধিকারী। এই গোবিন্দ আর লোচন অধিকারীর সময়ে আর একজন মানুষের কথা জানা যায়, এ্যান্টনী ফিরিঙ্গির মতই ছিলেন সেই মানুষটি। নাম, নাথানিয়েল জন হ্যালহেড। তাঁর কথা বলার আগে লোচন অধিকারীর কথা একটু বলি। "অক্রুর সংবাদ" ও "নিমাই সন্ন্যাস" পালা গান করে লোচন খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলেন। লোচনের যাত্রা প্রধানত ছিল করুণ রসাশ্রিত।

জন হ্যালহেড হলেন বৈয়াকরণ হ্যালহেডের ভ্রাতুষ্পুত্র। এই নাথানিয়েল জন হ্যালহেড (Nathaniel Jhon Halhed) বাঙলা দেশের মাটিতে জন্মাননি বটে কিন্তু বাংলাভাষার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। এখানকার আচার-আচরণ ইত্যাদি সব কিছুর প্রতি তাঁর প্রীতি ছিল অসম্ভব। তিনি মাঝে মাঝে এ দেশীয় ধুতি-পাঞ্জাবি পরে, আসল পরিচয় গোপন করে বাঙালি মহলে মিশতেন বেশি। তিনি যখন আর পাঁচজন বাঙালি ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে বসে তামাক খেতেন তখন তাঁকে ইউরোপিয় বলে আলাদা করে চিহ্নিত করা কষ্টকর ছিল। এই নাথানিয়েল শোনা যায় গোবিন্দ অধিকারীর দলে বার কতক যাত্রাভিনয় করেছিলেন।

'কালীয়দমন' যাত্রার অনুসরণে চণ্ডী যাত্রা, রাম যাত্রা, মনসার ভাসান যাত্রা ইত্যাদির প্রচলন ঘটে সে কথা আগেই বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে যা অবশ্যই বলা দরকার তা হলো, চণ্ডী যাত্রায় ফরাসডাঙ্গার গুরুপ্রসাদ বল্লভ, মনসার ভাসান যাত্রায় বর্ধমানের লাউসেন বড়াল খুবই খ্যাতি পেয়েছিলেন। পাড়াই হাটার প্রেমচাঁদ অধিকারী, আনন্দ অধিকারী এবং জয়চন্দ্র অধিকারীর জন্যই 'রামযাত্রা' জনপ্রিয় হয়।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে 'কালীয়দমন' যাত্রার যখন খুবই রমরমা অবস্থা ঠিক তখন এই 'সখের যাত্রা' নামক এক বৈচিত্র্যপূর্ণ যাত্রার প্রসার ঘটে। "বিবিধার্থ সঙ্গাহতে" (বিবিধার্থ সংগ্রহ) রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় লিখেছিলেন,—"নাটকের অনুরূপ যাত্রা কল্পিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা সকলের প্রিয় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।—"

১৮২১ সালে ১৬ জুন 'সমাচার দর্পণ' 'বিদ্যাসুন্দর' প্রসঙ্গে উল্লেখ করে ঃ ভারতচন্দ্র রায় কৃত 'অন্নদামঙ্গল' ভাষা গ্রন্থের অন্তঃপাতি 'বিদ্যাসুন্দর' বিষয়ক এক প্রকরণের ধারা অনুসারে এক যাত্রা সৃষ্টি হইয়াছে......"

॥ ভারতচন্দ্র রায় ॥

নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের ছেলে ভারতচন্দ্র রায়ের জন্ম ১৭১২ সালে, বর্ধমানের ভুরসুট্ পরগণার পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামে। অষ্টাদশ শতাব্দীর খ্যাতনামা 'মঙ্গলকাব্য' রচয়িতা কবি। ভারতচন্দ্র জন্মেছিলেন খুবই সচ্ছল অবস্থার মধ্যে। বাবা নরেন্দ্রনারায়ণ তদানীন্তনকালে এতহ ভূ-সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন যে, বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সংঘাত হয়েছিল সেই ভূ-সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে। সংঘাতের ফলে এই ব্রাহ্মণ পরিবারে নানা অশান্তি দেখা দেয়। তারই ফলশ্রুতি, অতি অল্প বয়সে ভারতচন্দ্রকে আশ্রয় নিতে হয় মামা বাড়িতে। এই মামা বাড়িতে থেকে তিনি ব্যাকরণ ও অভিধানে ব্যুৎপত্তি লাভ করে চৌদ্দ বছর বয়সে আবার নিজেদের বাড়িতে ফিরে আসেন। এরপর তেজপুরের কেশরকুলী আচার্যের মেয়েকে তিনি বিয়ে করেন। এই বিয়ের ব্যাপারে গৃহবিবাদ। ভারতচন্দ্রের ভাইয়েরা অত্যন্ত অমানবিক ব্যবহার শুরু করায় ভারতচন্দ্র শেষ পর্যন্ত সস্ত্রীক হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া গ্রামের পশ্চিমে দেবানন্দপুর নিবাসী রামচন্দ্র মুন্সির বাড়িতে আশ্রয় নেন। এখান থেকেই বহু কষ্টে ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন। বিশ বছর বয়সে নিজের ঘরে ফিরে এলে তাঁর ভাইরা তাঁকে সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য মোক্তারস্বরূপ বর্ধমানে পাঠান। বর্ধমানে থাকাকালীন কোন এক ষড়যন্ত্রে তিনি কারাবাস করেন। এরপর তিনি কটকে যান এবং কটকের তৎকালীন মহারাষ্ট্রীয় সুবেদার শিব ভট্টের অনুগ্রহে পুরুষোত্তমধামে থাকার অনুমতি পান। এখানে বেশ কয়েকবছর ভারতচন্দ্র সন্ন্যাসজীবন যাপন করেন। পরে আত্মীয়-স্বজনদের চেষ্টায় তিনি আবার সংসারে মন দেন এবং কয়েক দিনের মধ্যেই ফরাসডাঙ্গার দেওয়ান ইন্দ্রচন্দ্রের আশ্রয়ে বাস করেন। আকস্মিকভাবে তাঁর ভাগ্য রথের চাকার গতি পরিবর্তন হয়। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে সভাকবি হিসেবে কৃষ্ণনগর রাজ সভায় নিযুক্ত করেন। রাজার আদেশেই ভারতচন্দ্র "অন্নদামঙ্গল" কাব্য রচনা করেন। রাজা খুশি হয়ে তাঁকে "রায় গুণাকর" উপাধি দেন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, "বিদ্যাসুন্দর", "রসমঞ্জরী", "সত্যপীরের কথা", "নাগাষ্টক" ইত্যাদি। তিনিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি এবং ভাষার লালিত্যে, ছন্দের নৈপুণ্যে, চরিত্রচিত্রণের দক্ষতায় বাংলা কাব্যে নতুন সুষমার প্রবর্তনা করেন। ১৭৬০ সালে এই কবির মহাপ্রয়াণ হয়।

এই "বিদ্যাসুন্দর" যুগের কথা আরও কিছুটা বিশদভাবে বলা যাবে, তার আগে একটা ব্যাপারে কিছুটা আলোকপাত করে নেওয়া যাক। ব্যাপারটি হলো অষ্টাদশ শতাব্দীর লীলাভিনয় বা পালাগানে যন্ত্র সংগীতের ব্যবহার। এই শতকের প্রধান যন্ত্র ছিল 'ঢোলক'। ভারতচন্দ্র তাঁর

'অন্নদামঙ্গল' পালায় উচ্চাঙ্গ সংগীত ব্যবহার করেছিলেন। এই পালাগানের মধ্যে যে ষোলটি গান ছিল সেই গান বসন্ত, কেদারা, হাম্ভির, দেওবিভাস রাগেই গাওয়া হয়েছিল।

কবি গানের সুরে প্রধানতঃ উত্তরাঙ্গ রাগরাগিণী ব্যবহৃত হতো। যে সব গানে উত্তরাঙ্গ রাগের ব্যবহার সম্ভব হতো না, সেখানে একটি চড়া সুরে গান বাঁধা হতো।

এ প্রসঙ্গে ১৮২০ সালে জয়নারায়ণ ঘোষাল "করুণানিধান বিলাস"-এ যে বর্ণনা দিয়েছেন এখানে তার কিছুটা উল্লেখ করা যাক! এই অংশ থেকে হিন্দুস্থানী ও বাংলা গীতরীতির মধ্যেকার পার্থক্য কতটা তা বোঝা যাবে—

"হিন্দুস্থানে শুনি ইহা করিল প্রচার।
বাংলা দেশের ছাপ ভিন্ন রীতি তার।।
সংকীর্তন নানা ভাঁতি অপূর্ব্ব সুন্দর।
গড়াহাটি রাণিহাটি বিরহ মাথুর।।
অভিসার মিলনাদি গোষ্ঠের বিহার।
কবি পশত তালফেরা শুনিতে মধুর।।
পাঁচালি অনেক ভাতি রামায়ণ সুব।
কথকতা তরজাতে সারিতে প্রচুর।।
ভবানী ভবের গান মালসীমায়ুর।
গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী বিজয়াতে ভোর।।
বাইশ আখড়া ছাপ প্রেমে চুর চুর।
গোবিন্দমঙ্গল জারি গাইছে সুধীর।।
চৈতন্যচরিতামৃত প্রেমের অঙ্কুর।
শ্রবণে যাহার গানে ভকত আতুর।।
কালীয়দমন রাস চণ্ডীযাত্রাধীর।
রচিল চৈতন্য যাত্রা রসে পরিপুর।।
সাপুড়িয়া বাজিয়ার ছাপের লহর।
বাঙ্গালার নবগানে নূতন ঝুমুর।।"

* আধুনিক বাংলা কাব্য-সাহিত্যের সূত্রপাত কবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের হাতে। তাঁর মহাপ্রয়াণের পর একটা শতাব্দী পার করে তবে আমরা পেয়েছিলাম মধুসূদনকে। মাঝের এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে জেঁকে বসেছিল অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ, ভাঁড়ামো যুক্ত কবিগান, তরজা, খেউড় ইত্যাদি। ইতিমধ্যে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার পাঁচালীগানের শ্রেষ্ঠ কবি দাশরথি রায়ের আবির্ভাব।

এরপরই এক ধরনের সঙ্-এর আমদানি হলো!

সঙ্ প্রসঙ্গে 'সমাচার দর্পণ' অনেক সংবাদই পেশ করেছে। তার একটি সংবাদ এখানে হাজির করা হলো—"কলিকাতাতে এক নূতন যাত্রা প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে অনেক ২ প্রকার ছদ্মবেশধারী আরোপিত বিবিধ গুণ বর্ণনাকারী মনোহর ব্যবহারী অর্থাৎ সং হইয়া থাকে। তাহার বিবরণ প্রথমতঃ বৈষ্ণব বেশধারী ২ সং আইসে দ্বিতীয়তঃ ১ সং কলিরাজা তৃতীয়তঃ ১ সং রাজার পাত্র চতুর্থ ১ সং দেশান্তরিয় বেশধারী বিবিধ উপদেশকারী পঞ্চম ২ সং চট্টগ্রাম হইতে আগত পরিষ্কৃত বেশান্বিত এক সাহেব আর এক বিবি ষষ্ঠ ২ সং ঐ সাহেবের দাসদাসী এ সকল সং ক্রমে আগত একত্র মিলিত হইয়া বেশবিন্যাস হাস্য রহস্য সম্বলিত অঙ্গভঙ্গ পুরঃসব নর্তন কোকিলাদির স্বর

ন্যক্কত মধুর স্বরে গান নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাদন আশ্চর্য ২ প্রশ্নোত্তর ক্রমে পরস্পর মৃদু মধুর বাক্যালাপ কৌশলাদির দ্বারা নানা দিগ্‌দেশীয় বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ সর্বজনে সনোমোহন প্রভৃতি করেন।"

এই সময়ে আরও কয়েকপ্রকার যাত্রাভিনয়ের প্রচলন হয়। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, 'নন্দবিদায়', 'কামরূপ', 'নলদময়ন্তী' যাত্রা। এই সময় গোটা কলকাতা মেতে উঠেছিল এই সব যাত্রা গানে চিত্তবিনোদনের নেশায়। পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ধনাঢ্য ব্যক্তিরা। এবার একটু দেখা যাক কারা তাঁরা—

॥ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ্যাসুন্দর ॥

বাংলা সাহিত্য পর্যালোচনায় 'বিদ্যাসুন্দর 'প্রসঙ্গ অনিবার্য উপস্থাপনা। এর মধ্যে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দাদা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এর পাতায় যা রেখে গেছেন, বোধ করি আজকের যাত্রা প্রসঙ্গে তার ভূমিকার তাৎপর্য যথেষ্ট। সঞ্জীবচন্দ্রের প্রবন্ধ সংযোজনের আগে সেই মানুষটির কথা বলে নেওয়া দরকার।

১৮৩৪ সালে নৈহাটীর কাঁটালপাড়ায় সঞ্জীবচন্দ্রের জন্ম। মেদিনীপুর স্কুল এবং হুগলী কলেজে সঞ্জীবচন্দ্র পড়াশোনা করেন। ইংরেজি সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ইতিহাসে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। কৃষ্ণনগরে থাকাকালীন বিদ্রোহী নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। সঞ্জীবচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য রচনা ঃ যাত্রা সমালোচনা, সৎকার, বাল্যবিবাহ, জাল প্রতাপচাঁদ। বেশ কিছু উপন্যাসও বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে রেখে গেছে। যেমন, রামেশ্বরের অদৃষ্ট, কণ্ঠমালা, মাধবীলতা, দামিনী। 'পালামৌ' তাঁর শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ বৃত্তান্ত। সঞ্জীবচন্দ্রের আর একটি ইংরেজি বিখ্যাত বই ঃ Bengal Ryota : Their Rights and Liabilities.

'বঙ্গদর্শন' প্রেস তাঁরই কীর্তি। 'ভ্রমর' পত্রিকার সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র ১২৮৯ থেকে ১২৯৪ পর্যন্ত 'বঙ্গদর্শন'ও সম্পাদনা করেছেন। ১৮৮৯ সালে সঞ্জীবচন্দ্র মারা যান।

১২৭৯ সনের পৌষ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন' থেকে নেওয়া 'যাত্রা সমালোচনা' প্রবন্ধটি এই ঃ

"অনেকে বলিয়া থাকেন যে, সামাজিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নাটকাদির উন্নতি হইয়া থাকে। এথেন্স (Athens), স্পেন ও ইংলণ্ডের নাটকাদি তাহার প্রমাণ স্থান। এবং কথিত আছে যে, ভারতবর্ষেও হিন্দু রাজাগণের সময়ে নাটকাদি বিশেষ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল। সমাজের আরম্ভ মাত্রেই বাক্যরসানুভব শক্তি জন্মায় না ; তাহা প্রথমে অতি রূঢ় অবস্থায় থাকিয়া ক্রমে মার্জ্জিত হন। প্রথম অবস্থায় রচনার অর্থ বা ভাবের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকে না, কেবল শব্দ মিল থাকিলেই হইল, যথা,—

শান্তিপুরের খাসা খই,
বৰ্দ্ধমানের বসা দই,
বঁধু আমি তোমা বই,
আর কারো নই।

এইরূপ রচনা এক সময়ে সমাজে অদ্ভুত বলিয়া গৃহীত হয়। পরে ক্রমে রচনার ভাবের প্রতি দৃষ্টি হইতে থাকে এবং একবার সাধারণের রস বোধ হইলে রসহীন রচনায় সহস্র শব্দ মিল বা অনুপ্রাস থাকিলেও তাহা আর সমাদৃত হয় না।

কিন্তু এক সময়ে যেটি কাব্যের গুণ বা রস বলিয়া গৃহীত হয়.সময়ে যেটি রসহীন বলিয়া সমাজে পরিত্যক্ত হইয়াছিল সময়ান্তরে তাহা আবার রস পূর্ণ বলিয়া সমাদৃত হইয়াছে। অবশ্য, যে

রচনায় স্বভাব বর্ণন আছে, এবং যাহা বাস্তবিক রসপূর্ণ, তাহা যুগযুগান্তরে ও দেশ দেশান্তরে সমাদৃত হইয়া থাকে। হয়ত প্রণয়ন কালে তাহা সমুচিত আদর প্রাপ্ত হয় নাই। তৎকালে সমাজের রসগ্রাহিণী শক্তি বিশেষ পরিমার্জ্জিতা ছিল না, পরে সুমার্জ্জিত হইলে তাহার যত্ন আরম্ভ হইল। কিন্তু এরূপ ঘটনা অতি বিরল। যে গুণাগ্রাহী নহে, সে ঐ রচনার গুণ গ্রহণ করিতে পারে নাই, এই মাত্র। সে যাহাই হউক, এক্ষণে আমাদিগের রসগ্রাহিণী শক্তির কোন্ অবস্থা? এক্ষণে আমরা রসপূর্ণ রচনার গুণ গ্রহণ করিতে পারি, কি তাহা ত্যাগ করিয়া অপকৃষ্ট রচনাকে উৎকৃষ্ট বলিয়া সমাদর করি?

যে রচনা সমাজে বিশেষ সমাদৃত হয়, সেই রচনা সমাজের তাৎকালীক রসগ্রাহিণী শক্তির পরিচয় স্বরূপ। রসহীন রচনা যদি সমাদৃত হইয়া থাকে, তবে অবশ্য সে সমাজকে রসজ্ঞ বলিতে হইবে। সেইরূপ যে নাটক বা যাত্রা জনসমাজের প্রিয়, সে নাটক বা যাত্রার দ্বারা ঐ সমাজের রসজ্ঞতা অনুভব করা যাইতে পরে। যদি এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে আমাদের রসগ্রাহিণী শক্তি কতদূর পরিমার্জ্জিতা হইয়াছে, তাহা এক্ষণকার প্রচলিত যাত্রাদি দ্বারা অনুভব হইতে পারে।

এক্ষণকার প্রচলিত যাত্রা বিদ্যাসুন্দর। প্রায় সকলেই এই যাত্রায় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এমন কি, যে গ্রামে একবার এই যাত্রা হইয়াছে, সে গ্রাম নিবাসীগণ সময় পাইলে কখন কখন তদ্বিষয় স্পর্দ্ধা করিতে ত্রুটি করেন না। অন্য যাত্রাপেক্ষা এক্ষণে বিদ্যাসুন্দরের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে এবং বাঙ্গালার রসজ্ঞতা বিষয় বিচার করিতে হইলে, এই বিদ্যাসুন্দর যাত্রা দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।

নায়ক নায়িকাদিগের প্রেমালাপ, বিচ্ছেদ, মিলন ইত্যাদির অভিনয় করিয়া শ্রোতাদিগের চিত্তরঞ্জন করা প্রায় সকল যাত্রার উদ্দেশ্য। কাব্য কি নাটক কি নাটকাভিনয়, এ সকলেরই উদ্দেশ্য মনুষ্য হৃদয়ের চিত্র। মনুষ্য চিত্তবৃত্তির মধ্যে বিশেষ বেগবতী এবং সুখকরী যে বৃত্তি, তাহা স্নেহ, অনুরাগ, প্রণয় ইত্যাদি নামে পরিচিতা। একজনের প্রতি অন্যের আত্মাপেক্ষা আন্তরিক সমাদরকে এই নাম দেওয়া যায়। এই বৃত্তির পাত্র ভেদে, বৈষ্ণবেরা সখ্য বাৎসল্যাদি নানা প্রকার নাম দিয়াছেন। এবং সে সকল নাম সাধারণ্যেও চলিত। যে কারণেই হউক, ইহার মধ্যে দম্পতী প্রণয়ই সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সকল কবি কর্ত্তৃক বর্ণিত এবং সকল নাটকে অভিনীত হইয়া আসিয়াছে। বিদ্যাসুন্দর যাত্রাও সেই উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রণয় কি পদার্থ, তাহার শক্তি কি প্রকার, যাহাকে একবাব স্পর্শ করে, তাহাকে সাধারণ অপেক্ষা কিরূপ উন্নত করে, তাহার হর্ষ কিরূপ, বিষাদ কিরূপ, আকাঙ্ক্ষা কিরূপ, চাঞ্চল্য কিরূপ, ধর্ম্ম কিরূপ, জগতের সমস্ত পদার্থের সহিত তাহার সহৃদয়তা কিরূপ, তদ্বিষয় বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় কিছুই দেখা যায় না। এবং তাহা দেখাইবার স্থানও এ যাত্রায় নাই, বকুলতলায় সুন্দরের সহিত মালিনীর সাক্ষাৎ, মালিনীর বাটীতে তাঁহার বাস এবং দৌত্যকর্ম্মে মালিনীর প্রবৃত্তি, এই কয়েকটী অংশ লইয়া সচরাচর যাত্রা হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে কোন্ অংশে রসোদ্ভাবনের সম্ভাবনা? ইহার মধ্যে কোন্ স্থানে প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হইবে? যাত্রায় এই অংশের শেষভাগে কখন ২ বিদ্যাসুন্দরের মিলন পর্য্যন্ত অভিনীত হইয়া থাকে। ইহা রস সৃষ্টির উপযুক্ত স্থান বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রায় এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়, সূর্য্যকিরণ প্রচণ্ড হইয়া উঠে। মা মা করিয়া দুইটা ঠাকুরাণী বিষয়ক গীত গাইয়া যাত্রাকরেরা শেষ করিয়া দেয়। অতএব বিদ্যাসুন্দরের প্রথম আলাপ কিরূপ হইল, তাহা কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না।

বিদ্যার সহিত মিলন হইলে পর সুন্দর সন্ন্যাসির বেশ ধরিয়া রাজসভায় যাতায়াত করিতে লাগিলেন, এই অংশকে সন্ন্যাসির পালা বলে। ইহার যাত্রা সর্ব্বদা না হউক, মধ্যে হইয়া থাকে। বিদ্যাকে সন্ন্যাসি বিবাহ করিবেন বলিয়া যাতায়াত করিতেছেন, এই কথা শুনিয়া বিদ্যা কি করেন,

তাহা দেখিবার জন্য সুন্দর স্বয়ং সন্ন্যাসি সাজিয়াছিলেন। রাত্রে যখন সুন্দর বলিলেন যে, সন্ন্যাসির যাতায়াতে তাঁহার বড় চিন্তা হইয়াছে, তখন বিদ্যা কেবল বলিলেন,

"জান মনে মনে উভয়ের মিলন ;
তবে চিন্তা কর কেন?"

যে বস সুন্দর প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, তাহা হইল না, ভাসিয়া গেল।

আদিরসের তীব্রতা নাই, রস মধ্যে করুণ রসের তীব্রতাই অধিক। সুতরাং করুণ রসে যাদৃশ্য মনুষ্য চিত্তকে আলোড়িত করা যায়, কেবল আদিরসে তাহা হয় না। এই জন্য জনসাধারণ আদিরস প্রিয় হইলেও, সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে কবিগণ তাহার সহিত কৌশল ক্রমে করুণ রস মিশ্রিত করিয়া কাব্যাদির মনোহারিত্ব বিধান করেন। যে কৌশলের দ্বারা ইহা সম্পন্ন হয়, সচরাচর তাহাকে বিরহ না বিচ্ছেদ বলে। বিদ্যাসুন্দরের মিলন কত সরস দেখা গেল,—বিচ্ছেদ কিরূপ দেখা যাউক।

বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে বিচ্ছেদ অতি অল্প। সুন্দরের আসিতে যেটুকু বিলম্ব হয়, সেইটুকু বিদ্যার বিচ্ছেদ যন্ত্রণা। বিলম্ব দেখিলে বিদ্যা কিঞ্চিত ব্যস্ত হইয়া থাকেন ; নাচিয়া তদ্বিষয় দুই একটি গীত গাহিয়া থাকেন, অথবা অধীরা হইলে হীরা মালিনীর সহিত দুটা রহস্য করিয়া সময় অতিবাহিত করেন। বিদ্যার বিচ্ছেদ এইরূপ। এতদ্ভিন্ন যদি অন্যরূপ বর্ণিত হইয়া থাকে তাহাও সামান্য। সে বিচ্ছেদে কেহ তাপিত হয় না। "আমার উড়ু ২ কচ্চে প্রাণ" এ কথায় বা তদনুরূপ কথায় যতটুকু যন্ত্রণা প্রকাশ হয়, বিদ্যার বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ততটুকু হইয়াছিল, তাহার বেশী নহে।

সামান্য বিচ্ছেদ সম্বন্ধে এইরূপ। আবার যখন যাবজ্জীবনের মত বিচ্ছেদ সম্ভাবনা হইয়াছিল, অর্থাৎ যখন মস্তক ছেদ করিবার নিমিত্ত সুন্দরকে মসানে লইয়া চলিল, বিদ্যা তখন উঠিয়া কঙ্কাল দোলাইয়া, নয়ন ধরিয়া নাচিতে নাচিতে আড়খেমটায় শোক করিতে থাকে। নৃত্য দেখিয়া দর্শক মণ্ডলীতে রসের স্রোত বহিতে থাকে, অমনি বাহবার ঘটা পড়িয়া যায়। বিদ্যা আরো ঘুরিয়া ২ নাচিতে থাকে। রসিক শ্রোতাদিগের আহ্লাদের আর সীমা থাকে না। বিদ্যার কঙ্কাল কেমন দুলিতেছে। বেশ্যাস্বভাবানুকরণে সুপটুনট, কেমন নয়ন; হৃদয় ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাচাইতেছে, ইহা দেখিয়া দুর্ভাগা সুন্দরের বিষাদ শ্রোতারা একেবারে ভুলিয়া যায়।

এক্ষণকার রুচির এই এক পরিচয়। শোকাকুলা নাচিয়া হাসিয়া চোখ ঠারিয়া শোক করিতেছে, আর আমাদিগের চিত্ত আর্দ্র হইতেছে। শ্রোতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছে, বড় আশ্চর্য যাত্রা হইতেছে। এমন যাত্রা না শুনিয়া অরসিক বৃদ্ধেরা কৃষ্ণ বিষয় কীর্ত্তন শুনিতে ইচ্ছা ক রন কেন? কেহ উত্তর করিতেছেন যে, তাঁহারা ধর্ম্মার্থে কালীয়দমন যাত্রা শুনিয়া থাকেন, সুখার্থ নহে। এরূপ শ্রোতাদিগের বুঝাইতে চেষ্টা করা বৃথা, তথাপি বিদ্যাসুন্দর যাত্রার সঙ্গে কৃষ্ণযাত্রার এত স্থানের তুলনা করিতে ইচ্ছা করি।

কিন্তু কৃষ্ণ যাত্রারও উল্লেখ করিতে সঙ্কুচিত হই। কেননা কৃষ্ণযাত্রা নীতি বিরুদ্ধ বলিয়া আপত্তি হইতে পারে। তবে ইহা বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা এতদংশেও কিছু ভাল, এই জন্যই আমরা সে প্রসঙ্গ করিতে সাহস পাইতেছি বিশেষ যে দেশে কৃষ্ণ প্রধান দেবতা, কৃষ্ণলীলার কথা প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র, যেখানে গুরু কর্ণে কৃষ্ণ মন্ত্র দিতেছেন, পুরোহিত মন্দিরে মন্দিরে কৃষ্ণলীলা দেখাইতেছে, কথক গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণলীলা কহিয়া বেড়াইতেছেন—যেখানে আবাল বৃদ্ধ, আপামর সাধারণ, দোকানি-গোসাঞি, অবসর পাইলেই কৃষ্ণলীলার গ্রন্থ লইয়া পড়িতে বসে, যে দেশের লোকের হাড়ে হাড়ে কৃষ্ণলীলা ঢুকিয়াছে,—যাহাদের কথায় রাধাকৃষ্ণ, চিন্তায় রাধাকৃষ্ণ, উৎসবে রাধাকৃষ্ণ, সঙ্গীতে রাধাকৃষ্ণ, যে দেশে মাঠে ঘাটে, বনে বাজারে, মন্দিরে, নাট্যশালায়, বৈঠকখানায়, বেশ্যালয়ে চাষা, চুয়াড়, নটনটী, বাবু, বেশ্যা, ইতর, সাধারণ সকলেই অহরহ কৃষ্ণগীত গায়িতেছে, যেখানে গৃহচিত্রে কৃষ্ণ, গাত্র বস্ত্রে কৃষ্ণ, দোকানের খাতায় পর্য্যন্ত কৃষ্ণ, সেখানে একা যাত্রাওয়ালার প্রাণ বধিয়া কি ফল?

নাটকগুণাংশে কৃষ্ণযাত্রা বিদ্যাসুন্দর যাত্রা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। বাবুদিগের মুখ চাহিয়া বিদ্যাসুন্দরের দুই একটি গীত উদ্ধৃত করিয়াছি বৃদ্ধ ও বৈষ্ণবদিগের মুখ চাহিয়া কৃষ্ণযাত্রার একটি গীত উল্লেখ করিলাম। কৃষ্ণ মথুরাধিপতি, গোপকন্যা বৃন্দা-দূতী তাঁহার আনয়নে যাইতেছে। তাহার কথায় রাজার গোচারণে পুনরাগমন করিবার সম্ভাবনা নাই—এজন্য দূতী দর্প করিয়া বলিল যে,—যদি না আসে, তবে বাঁধিয়া আনিব। কৃষ্ণকে বাঁধিবে! রাধার একথা অসহ্য হইল—

"আমি মরি মরিব, তারে বেঁধ না,
হে দূতি তোর পায়ে ধরি, তারে বেঁধ না,
সে আমারি প্রিয়।
সে যেখানে সেখানে থাকুক,
তাহারে রাধানাথ বই তো বলিবে না।"

ইত্যাদি গীত সকলেরই অভ্যস্ত আছে, এ জন্য সমুদয়াংশ উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নাই।

রাধার এই কথায় অনেককে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে হয়। কৃষ্ণকে বাঁধিবে, এইটি কেবল কথায় মাত্র বলা হইয়াছিল, রাধা তাহাতে ব্যথা পাইলেন।

কিন্তু সুন্দরকে কেবল কথায় নহে, প্রকৃত প্রস্তাবে রজ্জুসংযুক্ত করিয়া বাঁধিল, মসানে কাটিতে পর্য্যন্ত লইয়া গেল, তথাপি বিদ্যার কণামাত্রও দুঃখ হইল না, শ্রোতাদিগেরও দুঃখ হইল না ; অশ্রুপাতের ত কথাই নাই। বিদ্যাসুন্দর ভক্তগণ, বোধ হয়, এই তুলনায় বুঝিতে পারিবেন যে, বিদ্যার প্রণয় অতি প্রগাঢ় বলিয়া যাত্রায় বর্ণিত হয় নাই। এই তুলনায় আরো বুঝিতে পারিবেন যে, পূর্ব্বকালের কীর্ত্তন কি যাত্রা এখনকার অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ছিল। উহার প্রণেতৃগণ কবি ছিলেন এবং শ্রোতৃগণ অপেক্ষাকৃত রসজ্ঞ ছিলেন। ক্রমে উভয়েরই এক্ষণে অধঃপতন হইয়াছে। অধিক কি, পূর্ব্বে যাত্রার যে স্থলে দেবতা এবং দেবতুল্য ঋষি সাজা হইত, এক্ষণে সেই স্থলে মেতর মেতরাণী সাজিয়া শ্রোতাদিগের মনোরঞ্জন করা হয়।

সচরাচর যেরূপ চিত্তবৃত্তির বেগ দেখা যায়, তাহাতে আমাদের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না। তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অসাধারণ চাই। অন্ততঃ কিঞ্চিৎ স্বর্গীয় সুখসৌরভ মাখা অকৃত্রিম পবিত্র চিত্তের পরিচয় পাইলেও সুখ হয়। কিন্তু সে পরিচয় কবি ভিন্ন আর কাহারো দিবার সাধ্য নাই। তাহাতে কবির কল্পনা শক্তি আবশ্যক। যদি অপরে চেষ্টা করে, তাহা হইলে এই যাত্রায় যেরূপ বিদ্যাসুন্দরের পরিচয় আছে, সেইরূপ হইয়া পড়ে—অর্থাৎ মাহাত্ম্যের পরিবর্ত্তে রহস্য হইয়া পড়ে।

বাস্তবিক এই যাত্রায় রহস্যের ভাগ অধিক। মালিনী সুন্দরের কথা-বার্ত্তা কি বিদ্যাসুন্দরের কথাবার্ত্তা, উভয়ই সমভাবে রহস্য পরিপূরিতা। কখন কখন প্রণয়ীদিগের মধ্যে রহস্য কি কৌতুকালাপ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহা অতি সাধারণ। যে স্থলে প্রণয় গভীর, সে স্থলে উপহাস রহস্যাদি স্থান পায় না। কিন্তু এই যাত্রায় যদি রহস্যের ভাগ ত্যাগ করা যায়, তবে সুন্দরের বাক্‌রোধ হয়, মালিনীর ত কথাই নাই। বিদ্যার কথাবার্ত্তা সহজেই অল্প রহস্যের উত্তর না দিতে হইলে, তাঁহার গীতের ভাগ অর্দ্ধেক কমিয়া যায়।

এই যাত্রায় মালিনীই প্রধানা। তাহার রঙ্গরস লইয়াই এই যাত্রা। কাজেই ইহাতে হাস্যরস ব্যতীত আর কোন রসের প্রবলতা নাই। নায়ক নায়িকা অর্থাৎ বিদ্যাসুন্দর উপলক্ষ মাত্র। মালিনীর যৎকিঞ্চিৎ ছায়া আছে, কিন্তু বিদ্যা কিছুই নহে ; না প্রণয়িণী না উন্মাদিনী, না জড়, না অন্য।

পূর্ব্বে বাঙ্গালায় করুণরস প্রবল ছিল। এই যাত্রাদ্বারা বোধ হইতেছে যে, এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে এ দেশে হাস্যরসের প্রাধান্য জন্মিয়াছে। নতুবা বিদ্যাসুন্দর যাত্রা কোন ক্রমেই সাধারণপ্রিয় হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

এই যাত্রা সাধারণপ্রিয় হইবার আর দুই একটি কারণ আছে। যে ভাবায় ইহার গীত গুলিন

রচিত হইয়াছে, তাহা সরল, অনায়াসেই অপর সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করে, তদ্ভিন্ন সঙ্গীতেরও কিঞ্চিৎ পারিপাট্য আছে। আর অনেকে সন্দেহ করিয়া থাকেন যে, এই যাত্রায় যতটুকু সামান্য কাব্যরস আছে, তাহাই এক্ষণকার শ্রোতাদিগের বোধোপযোগী। তদতিরিক্ত হইলে তাঁহাদিগের বোধাতীত হইত। যে রচনার রসগ্রহ হয়, তাহাই ভাল লাগে।

আমরা এ পর্য্যন্ত বিদ্যাসুন্দর যাত্রার কবিত্ব এবং শ্রোতাদিগের রসজ্ঞতার আলোচনা করিয়াছি; এক্ষণে এই যাত্রার নীতি সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু তাহার অধিক প্রয়োজন নাই; আমরা যাহা বলিব, তাহা অনেকেই বলিয়া থাকেন। মালিনী, সুন্দর ও বিদ্যা এই তিনটি লইয়া যাত্রা হইয়া থাকে। এই তিন জনের মধ্যে কোন্‌টি অনুকরণীয়? কে প্রার্থনা করে যে, বিদ্যার ন্যায় তাহার কন্যার চরিত্র হউক, অথবা সুন্দরের ন্যায় তাহার পুত্রের স্বভাব হউক। কেই বা প্রার্থনা করে যে, মালিনীর ন্যায় তাহার গৃহিণী হউক, অথবা দাসী হউক। লোকে এরূপ প্রার্থনা করা দূরে থাকুক বরং তাহাতে অবমাননা বোধ করে। ইহাদ্বারা বুঝিতে হইবে যে, এই তিনটির মধ্যে কোনটিও আদর্শ যোগ্য নহে বরং সচরাচর লোক অপেক্ষা অপকৃষ্ট। যদি বাস্তবিক তাহা হয়, তবে অপকৃষ্ট ব্যক্তির চরিত্র হইতে অপকর্ম ব্যতীত আর কি শিক্ষা হইতে পারে? কখন কখন কবিরা অপকৃষ্ট ব্যক্তিকে এমত ভয়ানক করিয়া চিত্রিত করেন যে, তদ্দ্বারা অপকৃষ্টতার প্রতি ঘৃণা এবং ভয় উভয়ই অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। সে স্থলে অপকৃষ্ট হইতে উৎকর্ষ শিক্ষা হইল। কিন্তু বিদ্যাসুন্দরে অপকর্ম সেরূপ চিত্রিত হয় নাই। কাযেই বিদ্যাসুন্দর হইতে যে শিক্ষা পাওয়া যাইতে পারে, তাহা অপকৃষ্ট ব্যতীত আর কি হইবে?

অনেকে ভাবিতে পারেন যে, যাত্রা কি নাটক উভয়ের কোনটিই শিক্ষার নিমিত্ত নহে, ইহা হইতে সৎশিক্ষা প্রত্যাশা করা অসংগত। বিশেষতঃ যে নায়ক নায়িকা বর্ণন করা ইহার উদ্দেশ্য, সে স্থলে অন্য আর কি শিক্ষা হইতে পারে। কিন্তু এটি তাঁহাদের ভুল। যাত্রার বর্ণিত হউক, আরো অধিক হৃদয়ঙ্গম হয়। গীতের ছন্দে বিশেষতঃ সুরে তদ্বিষয়ে কতক সাহায্য করে। আর "আদিরস" বর্ণন থাকলেই যাত্রা দ্বারা কুশিক্ষা প্রদত্ত হইল, এমত নহে। কেবল বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় নায়ক নায়িকা হইলেই সেরূপ শিক্ষা সম্ভব।

মহাকবি সেক্ষপীয়রের প্রণীত ওথেলো নাটকে নায়ক নায়িকার প্রেম আদ্যোপান্ত বর্ণিত আছে। বিদ্যা যেরূপ পিতার অজ্ঞাতে সকলকে লুকাইয়া সুন্দরকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ওথেলোর নায়িকা ডেসিডিমোনা আপন পিতার অজ্ঞাতে এক জন অতি কুরূপ কাফ্রির প্রেমে বদ্ধ হইয়া তৎসমভিব্যবহারে পিত্রালয় হইতে পলায়ন করেন। বিদ্যা এবং ডেসিডিমোনা, এই উভয় নায়িকার প্রেমারম্ভ প্রায় একই প্রকার দোষাবহ। কিন্তু ডেসিডিমোনার কার্য্যে, ব্যবহারে, কথায় বার্ত্তায়, চিন্তায় এত সরলতা, এত নির্ম্মলতা, এত পবিত্রতা প্রকাশ আছে যে, তাহা দেবদুর্লভ বলিয়া বোধ হয়। এবং যদিও তিনি "কুলত্যাগ" করিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, তাবৎ তাঁহার সতীত্ব সতীদিগের আদর্শস্বরূপ থাকিবে। যিনি ডেসিডিমোনাকে ভাল বাসেন, তিনি সতীত্ব ভাল বাসেন। ধর্ম্ম বেত্তা, নীতি বেত্তা, পিতা মাতা বা অন্য উপদেশ দাতা, সকলেই বলিয়া থাকেন, সতীত্ব স্ত্রীলোকদিগের প্রধান ধর্ম্ম; সতীত্ব রক্ষা স্ত্রীলোকদিগের কর্ত্তব্য; সতীত্ব রক্ষা করিলে সুখসম্পদ হয়। এসকল কথা শিরোধার্য্য। কিন্তু কেবল শুষ্ক উপদেশে অন্তরস্পর্শ করে না। এক ডেসডিমোনার চরিত্রে সতীত্বের সপক্ষে ইংলণ্ডের যাহা করিয়াছে, সহস্র উপদেষ্টা একত্র হইয়া কস্মিনকালে তাহা পারিতেন না। অতএব যাত্রা কি নাটকের নায়ক নায়িকা দ্বারা যে নীতি কি ধর্ম্মশিক্ষা হয় না, এমত নহে।

আমাদিগের দেশে সাধারণ লোকদিগের শিক্ষা কেবল পুরাণ ব্যবসায়ী কথক আর যাত্রাকরের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। পুরাণ ব্যবসায়ীরা ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছেন। এক্ষণে যাত্রাওয়ালারা দেশের শিক্ষক দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু যে যাত্রার আলোচনা আমরা করিলাম, সে যাত্রা যেখানে সমাদৃত,

তথাকার শিক্ষা যত উৎকৃষ্ট হইবে, তাহা এক প্রকার অনুভূত হইতে পারে। পল্লীগ্রাম অনুসন্ধান করিলে এই যাত্রার ফলভোগী অনেককে পাওয়া যাইতে পারে। মালিনী মাসি দৌত্যক্রিয়ার অধ্যাপিকা ; তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে দেশ ব্যাপিতেছে। ছোট খাটো সুন্দরের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। বিদ্যার বংশবৃদ্ধি কিরূপ হইয়াছে, তাহা বিশেষ জানা নাই, কিন্তু বোধ হয়, নিতান্ত অল্প না হইতে পারে। পল্লীগ্রামের যৌবনোন্মুখী সরলা যুবতীগুলি বিদ্যার মুখে নিম্নলিখিত বা তদনুরূপ গীত শুনিলে তাহাদের শিক্ষা কিরূপ হয়?

"এখন উপায় আয়ি, কর তারে আনিতে।
"কামানলে জ্বেলে ছলে, ভুলে আছে মনেতে।।
"কবে সে সুদিন হবে, সুধাকর প্রকাশিবে ;
"বারি বিন্দু বরষিবে, চাতকীরে বাঁচাতে।।"

আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এইরূপ গীত পিতা পুত্র লইয়া, মাতা কন্যা লইয়া শুনেন ; লজ্জা করেন না। সেই পুত্র কন্যা জ্ঞানবান হইলে পিতা মাতাকে কিরূপ ভাবিবেন, সে দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত।"

★ ★ ★ ★ ★ ★

বিদ্যাসুন্দর এবং তৎকালীন নাট্যভাবনা

ব্যোমকেশ মুস্তাফীর 'বঙ্গে রঙ্গালয়'-এ বিদ্যাসুন্দর এবং তৎকালীন নাট্যভাবনার একটা স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়।

১৮১১ সালে 'কলিরাজার যাত্রা' নামের এক নাটকের অভিনয় হয়েছিল সে খবর ছাপা হয়েছিল Calcutta Review পত্রিকায়।

১৮২১ সালের 'সংবাদ কৌমুদী' পত্রিকা এই অভিনয়ের পূর্ণ বিবরণ ছেপেছিল। নানা দিক পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে এটিই বাঙালির প্রথম নাটক বা নাট্যাভিনয়।

১৮৩১ সালের অক্টোবর মাসে অর্থাৎ কোজাগরী পূর্ণিমায় 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রা অভিনয় হয়। তখন এই 'বিদ্যাসুন্দর' পালার খুব বেশি কদর ছিল। ডোমটুলীতে লেবেডফ তাঁর প্রতিষ্ঠিত মঞ্চে ইংরেজিতে 'বিদ্যাসুন্দর' মঞ্চস্থ করেছিলেন।—"By permission of the Honourable the Governor General, Mr Lebedeffs New Theatre in Doomtulla, decoreted in the Bengali style, will be opened very shortly with a play called—"The Disguise"...The words of the much admired poet Shree Bharat Chandra Roy are set to music"

জানা যায় 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রা থেকেই নবীন বসুর মঞ্চ ও অভিনয়ের প্রতি আকর্ষণ তীব্র হয়।

আপন অট্টালিকার মধ্যে যে মুক্ত অঙ্গন সেখানে 'বিদ্যাসুন্দর' প্রথম দেখেন তিনি। এই নাটকের জন্য কোন মঞ্চ তৈরি হয়নি। নাটকে যে দৃশ্যগুলি ছিল, তার বর্ণনা অনুসারে বাড়ির ভিতরের নানা জায়গা সাজানো হয়েছিল। এক ঘর থেকে আর এক ঘরের মধ্যে মাটি খুঁড়ে সুড়ঙ্গ তৈরি হয়েছিল। বিদ্যাসুন্দরে বর্ণিত বকুলতলার পুষ্করিণীর রূপ দেওয়া হয়েছিল বাড়ির ভিতরকার পুকুরটির। বীরসিংহের দরবার সাজানো হয়েছিল প্রশস্ত বৈঠকখানায়। বাড়ির মধ্যে যে ফুলের বাগান ছিল তার মধ্যে মালিনীর কুটির ও মালঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। এখন যেমন অনেক সময় কিছু কিছু জিনিস স্টুডিও ফ্লোরের বাইরে তৈরি করে নেওয়া হয়, ঠিক তেমনি বাড়ির মধ্যেকার নানা জায়গায় দৃশ্য সাজানো হয়েছিল। সেই জায়গায় একটা দৃশ্যের অভিনয় দেখে, আবার অন্য যেখানে অভিনয় দর্শকরা সেখানে ছুটে গিয়ে অভিনয় দেখতেন। দৃশ্য অবতারণার সঙ্গে দর্শকদেরও ছুটে বেড়াতে হতো। এই অভিনয়ে স্ত্রী চরিত্রে স্ত্রীরাই অংশ নিয়েছিলেন। তবে সেই স্ত্রীলোকেদের

আনা হতো পতিতালয় থেকে। ১৮৩৫ সালে 'হিন্দু পাইওনীয়ার' অক্টোবর মাসে এই অভিনয়ের পূর্ণ বিবরণ দিয়েছিল।

এই অভিনয় রাত ১২টায় আরম্ভ হয়েছিল, শেষ হয়েছিল সকাল ৬।। টায়। এই যাত্রাগান দেখার জন্যে সেদিন নবীনবাবুর বাড়িতে সর্ব জাতির মিলনক্ষেত্র হয়েছিল। অভিনয়ে বেজেছিল পাখোয়াজ, সেতার, বেহালা আর সারেঙ্গী। উল্লেখযোগ্য খবর হলো, সব বাদ্যকারই ছিলেন ব্রাহ্মণ। বেহালা বাজিয়েছিলেন ব্রজনাথ গোস্বামী। যাত্রাভিনয় আরম্ভ হবার আগে প্রস্তাবনা ছিল। পরমেশস্তুতি গান হবার পর যাত্রাগান আরম্ভ হয়েছিল।

এই 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রাগানে সেবার যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁরা হলেন ঃ

সুন্দর ঃ শ্যামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বরাহনগর বাসী), বিদ্যা ঃ রাইমণি, রানী ঃ জয়দুর্গা, মালিনী-ঐ, সহচরী ঃ রাজকুমারী ইত্যাদি।

শোনা যায়, এই 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রা অনুষ্ঠানের জন্য সেদিন নবীনবাবুর খরচ হয়েছিল দুই লক্ষ টাকা। এই টাকা নবীনবাবু এনেছিলেন তাঁর ইংরেজ টোলার 'খাতাবাড়ি' নামের একটি বাড়ি বিক্রি করে। এখন যে বাড়িটি মিলিটারী একাউণ্টস্ অফিস, একদিন সেই বাড়িই ছিল নবীনবাবুর 'খাতাবাড়ি'। যাঁরা সেদিন নবীনবাবুর বাড়িতে এই যাত্রাভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন তাঁরাই একটানা চাব বছরে বহুবার, বহু স্থানে কল্ শো করেছিলেন।

প্রসঙ্গ ক্রমে বলা দরকার, ১৮৬৫ সালে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরও 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক লিখেছিলেন।

কলকাতার ঘরে ঘরে যাত্রার কাল

॥ ভবানীপুরের বেলতলায় প্যারীমোহনের দল... ॥

প্যারীমোহন ছিলেন ববানগরের লোক। বেহালা বাদক হিসেবে ছিলেন খ্যাতিমান। যাত্রা দলে বেহালা বাজাতে বাজাতে প্যারীমোহন ভবানীপুরের বেলতলায় এসে একটা যাত্রা দল খোলেন। এই বেলতলায় ছিল শিবঠাকুরের দল, ছিল লোকমুখে ছড়ানো বেলতলার দল। এই দলে আর "নলদময়ন্তী" খুবই জনপ্রিয় ছিল। এগুলি লোকপ্রিয় হবার মূলে ছিল নর বেহালা আর উদাত্ত কণ্ঠের গান। প্যারীমোহন তাঁর দলে বহু মূল্যবান এবং চরিত্রানুগ পোশাক ব্যবহার করতেন। দল করে প্রভূত অর্থের অধিকারী হয়েছিলেন তিনি।

প্যারীমোহনের গাওয়া অনেক গানের মধ্যে যেটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল তার কিছুটা নমুনা এখানে হাজির করা যাক—

"আমি আর যাব না তোমার সনে তুমি ফচকে মেয়ে ;
পুরুষ দেখলে অমনি থাক তার পানেতে চেয়ে
ঘরে থাকে ঘোমটার আড়ে ; ঘাটে মাঠে রঙ্গ বাড়ে,
পুরুষ দেখলে পড়ে ঘাড়ে কুলের ভয় থাকে না।
নষ্ট মেয়ের দুষ্ট স্বভাব কখনো ঘোচে না।"

॥ ভবানীপুরের জগমোহন বসু ॥

ভবানীপুরের অভিজাত ও ধনী ব্যক্তি জগমোহন বসু 'কামরূপ' যাত্রাভিনয় করেছিলেন। বাংলায় লেখা এই যাত্রাপালার বিষয় নেওয়া হয়েছিল লেফ্টেন্যাণ্ট উইলিয়াম ফ্রাংকলিনের ইংরেজিতে লেখা 'কামরূপ' নামের একটি বই থেকে। এ থেকে একটি কথা বোধ করি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হলো ইদানীং যেমন সাহিত্যের পালারূপ দেবার রেওয়াজ আছে—কামরূপ গ্রন্থ থেকে 'কামরূপ' পালাভিনয় আসরস্থ করার মধ্যে তারই শুভ সূচনা হয়। সমাচার দর্পণ পত্রিকার ১৮২২

সালের ২৩ মার্চ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বসুর এই পালাভিনয়ের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদটি ছিল এই রকম—"গত ৪ঠা চৈত্র (১৮২২ খৃঃ) শনিবারে শ্রীশ্যামসুন্দর সরকারের বাটীতে ঐ যাত্রা প্রকাশ হইয়াছে।"

প্রসঙ্গক্রমে এ কথা বলে রাখা দরকার, এই সময়ে সব পালাভিনয়ের মধ্যে খুব বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল "নলদময়ন্তী"।

জগমোহন বসু রাজা রামমোহন রায়ের সমসাময়িক একজন বিদ্যোৎসাহী। ১৮২৯ সালের মার্চ মাসে জগমোহন বসু ভবানীপুরে "ইউনিয়ান স্কুল" নামে একটি স্কুল স্থাপন করে ছাত্রদের সার্বিক উন্নতির জন্য অনেক কল্যাণমূলক কাজ করেছিলেন এবং স্কুলের সঙ্গে জীবনের সাঁইত্রিশটি বছর ধরে গভীর সম্পর্ক ছিল। "হিন্দু ইন্টেলিজেনসার" পত্রিকা প্রকাশ করে তিনি শিক্ষা জগতে ডেভিড হেয়ারের সম মর্যাদা অর্জন করেছিলেন। ভবানীপুরের তৎকালীন গণ্যমান্য ও সরকারি উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি প্রায় সকলেই তাঁর তত্ত্বাবধানে স্কুলের শিক্ষা পেয়েছিলেন। ১৮৫৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

জগমোহন বসু, লেফ্‌টেন্যাণ্ট উইলিয়ম ফ্রাংকলিনের "কামরূপ" নামের ইংরেজি ভাষায় লেখা বইটিকে বাংলায় রূপান্তর করে যাত্রাভিনয় করেছিলেন। শ্রীবসুরই সখের দল এই পালাগান করেছিল। পালাটি অভিনীত হয়েছিল ভবানীপুরের ধনাঢ্য শ্যামসুন্দর সরকারের বাড়িতে।

"নল দময়ন্তী" পালাভিনয় নিয়ে 'সমাচার দর্পণ' অনেক সংবাদই প্রকাশ করেছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ৪ঠা মে তারিখে প্রকাশিত একটি সংবাদ।—"কলিকাতার দক্ষিণ ভবানীপুর গ্রামের অনেক ভাগ্যবান বিচক্ষণ লোক একত্র হইয়া 'নল-দময়ন্তী' যাত্রার সৃষ্টি করিয়াছেন......ঐ যাত্রাতে নলরাজার সং ও দময়ন্তীর সং ও হংসদূতের সং ইত্যাদি নানাবিধ সং আইসে এবং নানাপ্রকার রাগ-রাগিণী সংযুক্ত গান হয় ও বাদ্য নৃত্য এবং গ্রন্থ মত পরস্পর কথোপকথন-এ অতি চমৎকার ব্যাপার সৃষ্টি হওয়াতে বিস্তর টাকা চাঁদা করিয়া ঐ সুরসিক ব্যক্তিরা ব্যয় করিয়াছেন। ঐ যাত্রা প্রথমে ঐ ভবানীপুরে গঙ্গারাম মুখোপাধ্যায়ের দং বাটিতে গত ২৩ আষাঢ় শনিবার রাত্রিতে প্রকাশ হইয়াছে......"

নল-দময়ন্তী যাত্রাগান অনেক দিনই বেঁচে ছিল। এই পালাভিনয়ের জনপ্রিয়তার মূলে ছিল গান। বিশেষ করে প্রথম দিকে রাম বসুর লেখা গান। কবি ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত "সংবাদ প্রভাকর"-এও এই 'নল-দময়ন্তী' পালাগানের প্রশংসা প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীযুক্ত গুপ্ত স্বয়ং লিখেছিলেন—"কলিকাতার নিজ দক্ষিণ ভবানীপুরস্থ ভদ্র সন্তানেরা যে এক 'নল-দময়ন্তী' যাত্রার দল করিয়াছিলেন, অদ্যাপি যে দলের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা হইয়া থাকে, রাম বসু সেই দলের সমুদয় গান ও ছড়া প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। সেই গীতে গায়কেরা সকলকেই পুলকিত করিয়াছিলেন।" কবি ঈশ্বর গুপ্ত সেই 'নল-দময়ন্তী' পালাভিনয়ের রাম বসু রচিত গানের নমুনাও প্রকাশ করেছিলেন। আমরাও তার নমুনা হাজির করছি—

"কেন গো সজনী আমার উডু উডু করে মন,
পিঞ্জরের পাখী যেমন, পালাবারি আকিঞ্চন।।......

★ ★ ★ ★ ★ ★

নল্ নল্ নল্ বলিস্ কি তা বল্।
দাবানল, মনানল্, প্রেমানল্, কি অনল্
কি সেই কুলমজানে কামানল্......"

রাম বসুর কথা পরে বলছি।

॥ গঙ্গারাম মুখোপাধ্যায় ॥

এই মানুষটির কথা বিশেষ জানা যায় না। তবে তিনি ভবানীপুরের তৎকালীন বড়লোকদের একজন। শিশুরাম যখন 'যাত্রা' প্রসঙ্গে ভাঙ্গচুর করতে আরম্ভ করেছেন, যাত্রার উন্নতি সাধনই যখন তাঁর একমাত্র সঙ্কল্প হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার অনেক আগে থেকেই যাত্রার ওপর সাধারণ মানুষের প্রীতি কমে আসছিল। এর প্রধান কারণ, যাত্রায় কুরুচিপূর্ণ ভাঁড়ামি ইত্যাদি। শিশুরামই যাত্রাকে রুচি সম্মত করে তুলতে প্রথম প্রয়াসী হন। তারপর থেকেই এ দেশের মানুষ, বিশেষ করে কলকাতার ধনাঢ্য ও শিক্ষিত মহলও ধীরে ধীরে যাত্রার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন, সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা দিতে থাকেন, বাড়িতে সখের দল গড়ার একটা রেওয়াজ চালু হয়। এঁদের মধ্যে গঙ্গারাম মুখোপাধ্যায় একজন প্রথম সারির পৃষ্ঠপোষক। তা ছাড়া পালাকার ভৈরব হালদার, বিশ্বনাথ মতিলাল, বীরসিংহ মল্লিক, রাধামাধব সরকার-এঁরাও সব দিক থেকে যাত্রার প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে ব্যাপক প্রস্তুতি নেন। এ ক্ষেত্রে বিশ্বনাথ মতিলাল বিশেষভাবে চিহ্নিত এই কারণে, তিনি ছিলেন হৃদয়বান। তাঁর সহৃদয়তার জন্য বাংলার লোকসংস্কৃতি বা বাংলার লোকনাট্যের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন গোপাল করণ। প্রশ্ন জাগে, কে এই গোপাল করণ?

॥ গোপাল করণ বা গোপাল উড়ে ॥

এই গোপাল করণই হলেন গোপাল উড়ে।

অতি দীন-দরিদ্র চাষী মুকুন্দ করণের ছেলে গোপালের জন্ম হয়েছিল কটক জেলার জাজপুরে। সংসারে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত পেটে দেবার অবস্থা ছিল না বলেই একদিন, নিতান্তই বালক বয়সে গোপাল চলে আসেন কলকাতায়। বেছে নেন ফেরিওয়ালার জীবন। অনেকেই বলে থাকেন, গোপাল করণ বা গোপাল উড়েকে কলকাতায় প্রথম আশ্রয় দেন জোড়াসাঁকোর ধনী পুরুষ বীরসিংহ মল্লিক। কিন্তু পুরাতন নথি-পত্র তা বলে না। 'বাঙ্গালার গান' বইতে গোপালের প্রথম আশ্রয় দাতার যে বর্ণনা আছে তা এখানে হুবহু তুলে ধরছি।—"একদিন মধ্যাহ্নে বৈঠক চলিতেছে, এমন সময় একজন ফেরিওয়ালা 'চাঁপাকলা' বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। চিৎকার বৈঠকখানার বাবুদের কর্ণে আসিল। বিশ্বনাথ মতিলাল তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন, –'ওরে কে আছিস রে, 'গান্ধার' বলেছে, চাঁপাকলাওয়ালাকে ধরে আন—'

মতিলালের নির্দেশে তাঁর লোকজন সেই চাঁপাকলাওয়ালাকে ধরে আনল। সেই লোকটিই হলেন গোপাল। গোপালকে দেখে মতিলাল বিস্মিত হলেন। গোপাল শুধু দেখতেই ভাল নয়, সুপুরুষ। তার উপর তাঁর গলাও মিষ্টি! মতিলাল এরপর গোপালের সঙ্গে কথা বললেন এবং বৈঠকখানায় গোপাল সবার পীড়াপীড়িতে 'গান্ধার' রাগে একটা গানও শুনিয়ে দিল। মুগ্ধ বিশ্বনাথ মতিলাল সঙ্গে সঙ্গে গোপালকে পাঠালেন বউবাজারের ধনী বাবু রাধামোহন সরকারের কাছে। Bengali Literature in 19th Century, by Dr. S. K. Dey' র বইতে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে—

'In his early life, he used to be a Street Vendor selling ripe Plantain. It is said that Biswanath Motilal, a rich man, who loved music, heard Gopal's street cry and recognised the Gandhara Rag (গান্ধারে বলেছে চাঁপাকলা চাই)। He called Gopal and at his recommendation Radhamohon Sarkar of Bowbazar (Calcutta) took Gopal into his party which was patronised by Raja Naba Krishna of Sovabazar."

* প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা দরকার, গোপাল উড়ের 'বিদ্যাসুন্দর' পালার গানগুলি একটিও গোপাল উড়ের লেখা নয়, বিভিন্ন কবিরা গান বাঁধতেন এবং তাতে সুর দিতেন। যেমন ভৈরব

হালদার। কিন্তু পরবর্তীকালে অনেকেই বলেছেন, গানগুলি গোপাল উড়ের লেখা। গোপালের পালায় ঠুমরী আর টপ্পা জাতীয় গানই থাকত বলে তখন ছড়িয়ে পড়েছিল 'গোপালের ঠুম্‌রী', 'গোপালের টপ্পা' ইত্যাদি।

গোপালের মৃত্যুর পর উমেশ আর ভুলো অর্থাৎ ভোলানাথ দাস দুটি বিদ্যাসুন্দরের দল করেছিলেন। উমেশের দল বেশিদিন চলেনি। ভোলানাথের দল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। ভোলানাথের মৃত্যুর পরেও তাঁর দল বেঁচে ছিল। ভোলানাথ বা ভুলোর দুই ছেলে গগন আর পূর্ণচন্দ্র দল চালিয়েছিলেন।

এই বিদ্যাসুন্দর যাত্রা দীর্ঘকাল কলকাতার মানুষের মনোরঞ্জন করেছিল। কলকাতার বড়লোকদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস' বইতে বলেছেন—"......যাত্রা ও থিয়েটারের মিলন ঘটাইয়া যে সকল সখের দল উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল তাহার মধ্যে বিশেষ ভাবে স্মরণীয় হইতেছে ভবানীপুরের উমেশ মিত্রের দল, মধ্য কলিকাতার আরপুলি গলির দল ও সিমুলিয়ার সখের যাত্রা কোম্পানী।"

উমেশ মিত্রের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা খুবই খ্যাতি পেয়েছিল। ভোলানাথ দাসের দুই ছেলে গগন আর পূর্ণচন্দ্র উনিশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত কলকাতায় আলাদা আলাদা বিদ্যাসুন্দর আসরস্থ করেছিলেন। এই দুই ভাইয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতাও ছিল।

বিদ্যাসুন্দর যাত্রা আর তৎকালীন বঙ্গসমাজ প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর "হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা" বইতে যে বর্ণনা দিয়ে গিয়েছেন তার তুলনা নেই।......

"......একবার শহরের শ্যামবাজার অঞ্চলের এক বনেদী বড় মানুষের বাড়ীতে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা হচ্ছে। বাড়ীর মেঝোবাবু পাঁচো ইয়ার নিয়ে শুন্‌তে বসেচেন, মালিনী ও বিদ্যে 'মদন আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ, করলে কি গুণ ঐ বিদেশী' গান ক'রে মুটো মুটো প্যালা পাচ্ছে,—বছর ষোল বয়সের দুটো (স্টেড্‌ ব্রেড্‌) ছোকরা সখী সেজে ঘুরে ঘুরে খেমটা নাচ্চে। মজলিসে রূপোর গ্লাসে ব্রান্ডি চল্‌চে—বাড়ীর টিক্‌টিকী ও শালগ্রাম ঠাকুর পর্যন্ত চুরচুরে ভোঁ। যাত্রায় ক্রমে মিলনের যন্ত্রণা, বিদ্যার গর্ভ, রাণীর তিরস্কার, চোর ধরা ও মালিনীর যন্ত্রণার পালা এসে পড়লো, কোটাল মালিনীকে বেঁধে মাত্তে আরম্ভ কল্লে। মালিনী বাবুদের দোহাই দিয়ে কেঁদে বাড়ী সরগরম করে তুললে।......"

॥ ভবানীপুরের উমেশ মিত্রের দল ॥

ভবানীপুরের বর্ধিষ্ণু ও ধনাঢ্য ব্যক্তি, হলেন উমেশ মিত্র। যাঁর নামে কলকাতায় আছে উমেশ মিত্র লেন। সেই উমেশ মিত্র সখের যাত্রা দল করে এই 'থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা' করতেন এবং বেশ সুনামও অর্জন করেছিলেন। মূলতঃ 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রার জন্য এ দলের খ্যাতি।

॥ জোড়াসাঁকোর বীরসিংহ মল্লিক ॥

গোপাল উড়ে বা গোপাল করণকে আনন্দে ডেকে নিয়েছিলেন জোড়াসাঁকোর বীরসিংহ মল্লিক। মল্লিকবাবুরও টাকার অধিগতি ছিল না। তাঁরও ছিল সখের যাত্রা দল।

বীরসিংহ তাঁর সখের দলের 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রাগান লিখিয়েছিলেন সিঙ্গুরের ভৈরবচন্দ্র হালদারকে দিয়ে। উনবিংশ শতাব্দীতে যে ক'জন মানুষ যাত্রাকে নানা দিক থেকে পুষ্ট করেছিলেন তাঁদের মধ্যে এই ভৈরব হালদার একজন। বীরসিংহ তাঁর পালায় এই গোপালকেই দিয়েছিলেন মালিনী'র ভূমিকা। এই যাত্রা'র মহড়া দু'বছর ধরে চালিয়ে মাত্র তিন রাত শো করে তিন লক্ষ টাকা ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। বীরসিংহ বাবু গোপালের অভিনয়-গানে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁকে প্রকাশ্যে পুরস্কৃতও করেছিলেন!

এরপরই গোপাল নিজে "যাত্রাদল" তৈরি করেন। সম্ভবতঃ রাধামোহন সরকারের দলকেই তিনি নিজের দল করে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। গোপাল ঐ ভৈরব হালদারকে করেছিলেন সঙ্গীত

লেখক ও সুরকার। কিন্তু নিজের দলে গোপাল নিজে মালিনীর চরিত্রে অভিনয় না করে কাশী নামের এক যুবককে তৈরি করেছিলেন। এই কাশী মূলত ছিলেন নাচের শিল্পী। তাঁর নাচ সবাইকে মুগ্ধ করত এবং এই নাচের আলাদা একটা চরিত্র ছিল। আলাদা একটা ধারা। যে ধারার নাম, খেম্‌টা। এ থেকেই প্রমাণিত হয় খেম্‌টার প্রবর্তকই কাশী। কাশীর আগে অবশ্য মালিনী সেজেছিল রূপো নামে একটি ছেলে।

যা হোক, গোপালের দলে বিদ্যা আর সুন্দর চরিত্রে অভিনয় করতেন উমেশ আর ভোলানাথ দাস। এই খবর পাওয়া যায় Indian Stage থেকে। নিজের দল মাত্র দশ বছর চালিয়েছিলেন গোপাল করণ বা গোপাল উড়ে। দুর্ভাগ্যের কথা হলো, মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে ১৮৫৯ সালে গোপালের মৃত্যু হয়।

॥ জোড়াসাঁকোর রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় ॥

চারদিকে রীতিমত হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিলেন, ছাতুবাবুর দেওয়ান রামচাঁদ মুখুজ্জে।।

কলকাতার অন্যতম বড়লোক ছাতুবাবু-লাটুবাবুর নাম কে না জানে? সেই ছাতুবাবু অর্থাৎ আশুতোষ দেবের দেওয়ান রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় থাকতেন জোড়াসাঁকোয়। তিনি হাফ আখড়াই দলের একজন পাণ্ডা বা প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

যেমন লিখতেন কবিতা, তেমনি ছিলেন ওস্তাদ গাইয়ে। ১৮৪৯ সালে রামচাঁদ একটা যাত্রা দল তৈরি করলেন। তাঁর যাত্রা দল করার মধ্যে গোড়া থেকেই আলাদা একটা উদ্দেশ্য ছিল। তা হলো উৎকৃষ্ট মানের যাত্রা করা। এই দলে 'নন্দ বিদায়' পালা হতো। এই প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে' লিখেছেন ঃ "এই যাত্রা গতানুগতিক যাত্রা থেকে স্বতন্ত্র ছিল। ইহাতে স্ত্রী চরিত্রে মেয়েরা অভিনয় করতেন। ১৮৪৯, ১৪ এপ্রিল তারিখে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাটিতে 'নন্দবিদায়' যাত্রার তৃতীয় অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। যাত্রায় রামচাঁদ খুব সুনাম অর্জন করেন।"

নারী ও পুরুষ মিলিতভাবে এই দলে প্রথম অভিনয় করেন। এ দলের অভিনয়রীতি প্রসঙ্গে "সম্বাদ ভাস্কর" লিখেছিল,..."জোড়াসাঁকো নিবাসী শ্রীযুত রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "নন্দ বিদায়" নামক যে একটি নূতন যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন এবং তাহার জন্য যে সুর ও গীত প্রস্তুত করেন তাহা শ্রবণ করিয়া সর্বসাধারণ গোচরার্থে আমি এই পত্র লিখিলাম...। কয়েক বৎসর হইল কলিকাতা মহানগরে যাত্রার অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এবং যদ্যপিও তাহাতে অনেকে সর্বসাধারণের মনোরঞ্জন করিতেছে অথচ পেশাদারিতা প্রযুক্ত ভদ্রবিদ্বান লোক তাহাদের মধ্যে না থাকাতে কোন সম্প্রদায় যথার্থরূপে উৎকৃষ্ট হইতে পারে নাই এবং বোধ করি শ্রীযুত রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও এই বিবেচনাতেই সঙ্গীত বিদ্যায় গুণান্বিত কয়েকজন ভদ্র সন্তান লইয়া যাত্রা করিতে মানস করিয়াছিলেন। তাঁহার পক্ষে এ বিষয় সুকঠিন নহে, যেহেতু তিনি জোড়াসাঁকোর হাফ্ আখড়াই দলের প্রথমাবস্থাবধি সম্পাদকতা করিতেছেন, এবং কবি ও নিজেও সুরসিক ধনাঢ্য, কবিতা এবং সঙ্গীত বিদ্যায় তাঁহার প্রচুর ব্যুৎপত্তি আছে এবং ঐ পাড়ার তাবাত তাঁহার অতিশয় সম্মান করেন।

জ্ঞাত হইলাম এক বৎসর হইল ঐ হাফ্ আখড়াই দলের প্রধান লোক লইয়া এবং ৪/৫ হাজার টাকা ব্যয়ে নন্দ-বিদায় যাত্রার সূত্র করেন এবং পূর্বগত তৃতীয় শনিবার রাতে ঐ যাত্রার প্রথম বৈঠক হয়,......গত পূর্বে শনিবারে যাত্রার দ্বিতীয় বৈঠকে তাঁহার বাটিতে গিয়াছিলাম...সমস্ত রাত্রি বেলা চারি দণ্ড পর্যন্ত যাত্রা হইয়াছিল, যাত্রা যে অতি উত্তম তাহার কোন সন্দেহ নাই...যে সকল ব্যক্তিরা সাজিয়াছিলেন তাহাদের বস্ত্রালংকারাদি অতি উত্তম হইয়াছে, বেহালা, তবলা এবং ঢোলক বাদকেরা অতিশয় গুণান্বিত এবং গীত সকলের মধ্যে প্রচুর কবিতা শক্তি প্রকাশ আছে। বোধ করি বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহার মধ্যে মহাকবি নিধুবাবুর টপ্পার সমান অনেক হইবে, প্রায় তাবৎ

গীত হাফ আখড়াইর খেয়াল, কীর্তনের এবং টপ্পার সুরেতে গাহনা হইবাতে অতিশয় মিষ্ট ও সুশ্রাব্য হইয়াছিল...তিতুরাম বড়াল, রাজনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র (কি উপাধি তাহা জানি না) প্রভৃতি যাঁহারা নন্দ মন্ত্রী এবং উপানন্দ সাজিয়াছিলেন এবং অন্যান্য যাঁহারা আসরে বসিয়াছিলেন তাঁহারা যে গান করিলেন বোধ করি এ প্রকার গান সচরাচর শুনা যায় নাই, তাহাদের আফ্ আখড়াইর সুরে পয়ার কাটান বড় চমৎকৃত হইয়াছিল, কিন্তু সর্বোপরি ছিদাম নাম্নী এক বালিকার গানে তাবৎকে মোহিত এবং চমৎকৃত করিয়াছে। ছিদামের বয়স ঊর্ধ্ব ১৩ বৎসর...তাহার সুরের ন্যায় মিষ্ট সুর আমি আর কখনও শ্রবণ করি নাই...অন্যান্য বালকেরা এবং আর একটি বালিকাও অতি উত্তম গান করিয়াছিল......"

নন্দ বিদায়ের একটি গানের নমুনা এখানে দেওয়া যাক ঃ

আড়ানাবদর—আড়া খেমটা

"চোরের বিচার রাজা করে জানিরে অন্তরে।
রাজা হয়ে চুরি করে তার বিচার কে করে।।
তুমিত ভাই রাখাল রাজা ব্রজ বালক তোমার প্রজা
মধুপুরে হলে রাজা ব্রজবাসীর মন হরে।।
ঘরে ঘরে মাখন চুরি, যমুনাতে বসন চুরি,
বাঁশীর গানে মন চুরি করেছ তুমি—
দ্বিজ রামচন্দ্রে চিন্তে এ চোর কে পারে চিনতে
যে মজেছে পদ প্রান্তে কৃতান্তে সে তুচ্ছ করে।।"

॥ জোড়াসাঁকোর বারানসী ঘোষের বাড়িতে যাত্রা ॥

জোড়াসাঁকো অঞ্চলে বারানসী ঘোষের বাড়িতে রামচাঁদের 'নন্দবিদায়' হয়েছিল। সেদিন দর্শক সংখ্যা হয়েছিল ১০,০০০। বারানসী ঘোষের বিশাল দীঘির পাড়ে এই আসর বসেছিল।

সেদিন এই পালায় আফ আখড়াই-এর খেয়াল, কীর্তন আর টপ্পার সুর সংযুক্ত হয়েছিল। কিছু ধ্রুপদ অঙ্গের গান ছিল। সেদিন বিখ্যাত ধ্রুপদ গায়ক ছটুলাল পাখোয়াজ বাজিয়ে ধ্রুপদ গেয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। সম্বাদভাস্কর, ১২৫৫ সনের ১৮ চৈত্র লিখছে ঃ—

"এই যাত্রায় হাফ আখড়াইর সুরে পয়ার কাটানো বড় চমৎকৃত হইয়াছিল।"

॥ জোড়াসাঁকোয় দ্বারকা মল্লিকদের দল ॥

জোড়াসাঁকোয় দ্বারকানাথ মল্লিকের বিরাট দাপট ছিল। একদিকে পাড়ার গণ্যমান্য মানুষ তায় আবার ধনী। যেখানে দ্বারকানাথ মল্লিক থাকতেন লোকে বলত দ্বারকানাথের পাড়া। সেই পাড়ার সম্ভ্রান্ত লোকেরা একত্রিত হয়ে একটা সখের দল তৈরি করেছিলেন। ১৮৭২ সালে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকটির যাত্রারূপ অর্থাৎ গীতাভিনয় এই দল করত।

॥ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মেজ কাকা গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥

রবীন্দ্রনাথের মেজ কাকা একটা সখের দল তৈরি করেছিলেন। তিনি নিজে পালা লিখতেন, নাট্য শিক্ষকও ছিলেন। এই প্রসঙ্গে কবির মন্তব্য—'আমাদের সময়কার কিছু পূর্বে ধনী ঘরে ছিল সখের যাত্রার চলন। মিহি গলাওয়ালা ছেলেদের বাছাই করে নিয়ে দল বাঁধার ধুম ছিল। আমার মেজ কাকা ছিলেন এ রকম দলের দলপতি। পালা রচনা করবার শক্তি ছিল তাঁর। ছেলেদের তৈরি করে তোলবার উৎসাহ ছিল—"

॥ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ॥

১৮৩১ সালের ১৬ মে তারিখে হরকুমার ঠাকুরের ছেলে যতীন্দ্রমোহন কলকাতার পাথুরিয়া ঘাটার বিখ্যাত জমিদার বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পিতৃব্য প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বিপুল সম্পত্তির

অধিকারী হন। হিন্দু কলেজে পড়ার পর বাড়িতে শিক্ষক রেখে ইংরেজি, ও সংস্কৃত শেখেন। অল্প বয়স থেকেই নাটক লেখার প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণ ছিল। মূলতঃ এদেশে থিয়েটারের সূত্রপাতে তিনি যেমন অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন, তেমনি সম্মিলিত যন্ত্র মূর্ছনার আসর বসাবার সূত্রপাত তিনিই করেছিলেন। তাঁরই উৎসাহে এদেশে 'Settled Estates Act' প্রচলিত হয়েছিল। কবি মধুসূদন দত্তের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' নিজের টাকায় প্রকাশ করেছিলেন যতীন্দ্রমোহন। তিনি ইংরেজি, সংস্কৃত এবং বাংলায় বহু প্রবন্ধ ও গান লিখেছিলেন। তাঁর লেখা 'ফ্লাইট্স্ অব ফ্যান্সী', 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক, স্তব-সঙ্গীতের সংকলন 'গীতিমালা' বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে অন্যতম রত্ন। ১৯০৮ সালের ১০ জানুয়ারি যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যু হয়।

॥ দুর্গাচরণ ঘড়িয়াল ॥

উত্তর কলকাতার চিৎপুরে হাড়কাটা অঞ্চলে দুর্গাচরণের জন্ম। ঘড়ি মেরামতি এবং বিক্রির ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি অঞ্চলের সকলের কাছে খুবই পরিচিত ছিলেন। ঘড়ির ব্যবসা করতেন বলে তাকে লোকে ঘড়িয়াল বলে ডাকতে ডাকতে এক সময়ে ঐ পদবীতেই খ্যাতিমান হয়ে যান। তিনি যাত্রার দল তৈরি করেছিলেন। তাঁর দল সুনামের সঙ্গে 'চণ্ডীযাত্রা' আসরস্থ করত। আগে 'চণ্ডীযাত্রায়' যারা দোহার থাকতেন তাঁরা হতেন বৃদ্ধ ; কিন্তু দুর্গাচরণ তাঁর চণ্ডীযাত্রায় বালক দোহার রাখতেন। এই দোহার প্রসঙ্গে বিশ্বকোষ, ১৩০৯ বলছে—"দুইজন করিয়া চারদিকে আটজন বালক দাঁড়াইয়া যখন সমস্বরে তালমান সহকারে গান ধরিত ; তখন শ্রোতার কর্ণ কোমল মধুর নিক্বণে ঝঙ্কারিত বোধ হইত।"

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটবেলায় যাত্রা দেখার স্মৃতি ছবির মতই এঁকে রেখে গেছেন আমাদের জন্য। 'পালা বাঁধেন অবন ঠাকুর'-এ কবি-অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষ যা মুন্সিয়ানার সঙ্গে হাজির করেছেন, এখানে তার পুনরাবৃত্তি বোধ করি সুপ্রযুক্ত হবে—

শঙ্খ ঘোষ লিখছেন ঃ কখনো কখনো অবনীন্দ্রনাথ আমাদের শুনিয়েছেন তাঁর ছোটবেলায় যাত্রা দেখার গল্প। 'নবমীর দিন যাত্রা বসত কয়লাহাটায়'—একবার বলেছেন তার গল্প। বলেছেন,—

"যাত্রায় দেখতুম সব বালকের দল গান গাইতে বেরুত। তাদের মাথায় সব পালকের টুপি। যে পালকের বাহার দেখে নাম দেওয়া হয়েছিল বক দেখানো পালকের টুপি। অধিকারী আসতেন যাত্রার আসরে চাপকান প'রে, মাথায় শামলা জড়িয়ে, বুকে গার্ডচেন ঝুলিয়ে। জুড়িদের শুধু শাদা কাপড়ের ইজের আর চাপকান। রাজাদের গালপাট্টা—মোড়ানো পাগড়ী-মন্ত্রীরও তাই, খালি যা পাকা গোঁফ। নারদ এখনও যেমন, তখনও তেমন। একরাশ পাটের দাড়ি গোঁফ, ছেঁড়া এক নামাবলী গায়ে—আর বাঁশের আগায় লাউ খোলা বাঁধা। কাঁধে একটা একতারার মতন নিয়ে দেখা দিতেন। ছেলেরা সব পেশোয়াজ আর নোলক প'রে সখী সাজত। মাথায় জরি দিয়ে জড়ানো বিনুনি চুল। বুকে উকিলদের মতো ক'রে ওড়না জড়ানো। তবে কারুর কারুর গোঁফ দাড়ি কামানো হয়ে উঠত না তাও দেখেছি।"

॥ কালী হালদার ॥

দুর্গাচরণ ঘড়িয়ালের দলে লোকনাথ ছাড়াও আর একজন গায়ক ছিলেন, তার নাম ছিল কালী হালদার। দুর্গাবাবুর মৃত্যুর পর কালী হালদার বেরিয়ে গিয়ে একটা যাত্রা দল করেছিলেন। এই দলে যিনি পালা লিখে ছিলেন তাঁর নাম ঠাকুরদাস দত্ত।

॥ বোকো আর সাধুর দল ॥

বোকো আর সাধু দুই ভাই। এঁরা ছিলেন মুসলমান ধর্মাবলম্বী। এঁরা একটি যাত্রা দল তৈরি করেছিলেন, যে দলটি 'বোকোর যাত্রা দল' নামে খ্যাত ছিল। এই দলে পালাকার ঠাকুরদাস দত্তের 'লবকুশ', ভগবান গাঙ্গুলীর 'রাবণ বধ' অভিনীত হত। পালা দুটি জনপ্রিয়তাও পেয়েছিল যথেষ্ট।

একবার হাওড়া অঞ্চলে বারোয়ারিতলায় বোকোর দল যখন গাইতে গিয়েছিল তখন ঐ পল্লী অঞ্চলে তাদের নিয়ে একটা গান বাঁধা হয়েছিল। বিশ্বকোষের পাতা থেকে এই গানটির কিছুটা নমুনা এখানে তুলে ধরা যাক।

"কালাবেড়ের মাটি, উলুবেড়ের খড়
গড়েছিল নদের কার্ত্তিক কারিগর,
দিলি বোকোর বায়না, শুনলি নারে গাওনা—",

দুঃখের খবর হলো, এই অঞ্চলে বোকোর দলের বায়না হয়েছিল কিন্তু নানা রকম বাকবিতণ্ডার জন্য গান হয়নি।

॥ বাগবাজারের ঝড়ু দাস ॥

বিশ্বকোষ থেকে আরও একটা তাৎপর্যপূর্ণ সংবাদ পাওয়া গেল। এক সময়ে যাত্রা দলের তিনজন জনপ্রিয় অধিকারীকে নিয়ে একটা প্রবাদই ছড়িয়ে পড়েছিল। এই তিনজন তিনটি বিষয়ে ছিলেন ওস্তাদ! প্রবাদটি এই রকম ঃ "গাইয়ে লোকা (লোকা ধোপা), নাচিয়ে ঝড়ু (ঝড়ু দাস), বক্তৃতায় গোবিন্দ (সংলাপে গোবিন্দ অধিকারী!)"

এই প্রবাদ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, ঝড়ু দাস নাচিয়ে হিসেবে বিরাট জনপ্রিয় ছিলেন। ঝড়ু ছিলেন বাগবাজারের লোক। তিনি নিজে একটি যাত্রা দল তৈরি করেছিলেন। এই দলের "কমলে কামিনী" পালাটি খুব জনপ্রিয় ছিল। তা ছাড়া ঠাকুরদাস দত্তের "অক্রূর আগমন', 'রাবণ বধ'ও খ্যাত হয়েছিল।

॥ চয়ে পাগলার দল ॥

এই চয়ে পাগলার একটা যাত্রা দল ছিল, কিন্তু এই দল প্রসঙ্গে বিস্তারিত কিছুই জানা যায় না। তবে চয়ে পাগলা ঐতিহাসিক পালা উপস্থাপনার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রথম ব্যক্তি। তাই তাঁর দলের ঐতিহাসিক পালার আলাদা একটা চাহিদা ছিল। চয়ে পাগলা প্রথম আসরে নামান "কালাপাহাড়"।

॥ বাগবাজারের জয়গোপাল/নবগোপাল মিত্র ॥

উত্তর কলকাতার সিমলার ধনী জয়গোপাল মিত্র এবং নবগোপাল মিত্র 'শ্রীবৎসচিন্তা' যাত্রার দল তৈরি করেছিলেন। সেই যাত্রাগান একবার গোপালবাবুর বাড়িতে হয়েছিল। কে গোপালবাবু? ইনি ছিলেন বাগবাজারের মদনমোহনতলা নিবাসী নীলমণি চক্রবর্তীর ছেলে গোপাল চক্রবর্তী। এই গোপালবাবুও তৎকালীন বাবু সমাজের থিয়েটার কালচারের অন্যতম প্রধান শরিক ছিলেন। এই যাত্রাগান শোনার পরই গোপালবাবু শোভাবাজার রাজবাড়ির 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক দলে যোগ দেন।

॥ রাধাবিনোদিনীর দল ॥

এই রাধাবিনোদিনী এক বারবণিতা। ইনি নিমতলা অঞ্চলের ফুলবাগানে দলের গদি তৈরি করেছিলেন। নারী চরিত্রে মেয়েরাই অভিনয় করতেন। এই দলে জনপ্রিয় পালা ছিল "কল্যাণী", "শ্মশান"।

॥ রাজা বৈদ্যনাথের রক্ষিতার দল ॥

বিশ্বকোষের পাতা থেকে পাওয়া যায়, রাজা বৈদ্যনাথের রক্ষিতা, কোন এক বারবণিতা ঊনবিংশ শতাব্দীতে একটি যাত্রা দল তৈরি করেছিলেন, যেটি তদানীন্তন বঙ্গদেশে প্রথম মহিলা পরিচালিত যাত্রা দল।

॥ কলকাতার হাড়কাটার স্বরূপ দত্ত ॥

উত্তর কলকাতার হাড়কাটা গলির বাসিন্দা স্বরূপ দত্ত সখের দল তৈরি করে "বিদ্যাসুন্দর" যাত্রা করতেন।

॥ কলকাতায় মেয়েদের দল ॥

কটাগোলাপীর যাত্রা বলতে এক সময়ে একটা দল কলকাতার চিৎপুরে গড়ে উঠেছিল। কটাগোলাপীর দলে নারী চরিত্রে মেয়েরাই অভিনয় করতেন। মূলত 'কৃষ্ণ যাত্রা' ছিল এই দলের প্রধান পালা ভাবনা।

॥ ভবতারিণীর দল ॥

ভবতারিণী নামের একজন মহিলা চিৎপুরের জোড়াবাগানে একটা যাত্রার দল করেছিলেন। এ দলেও নারী চরিত্রে মেয়েরাই অংশ নিতেন। 'হরিশ্চন্দ্র', 'রাবণ বধ' ইত্যাদি পালাগুলি এই দলে অভিনীত হতো।

॥ শোভাবাজারের রাজবাড়িতে সাবিত্রী-সত্যবান ॥

১৮৬৫ সালের ২৫ নভেম্বর শোভাবাজারের রাজ বাড়িতে রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেব বাহাদুর 'সাবিত্রী-সত্যবান' গীতাভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। এই রাজা বাহাদুরের সখের দলের নামই হয়ে গিয়েছিল "কৃষ্ণকুমারী" নাটক দল।

॥ ত্রৈলোক্যতারিণীর দল ॥

ত্রৈলোক্যতারিণীরও কোন ব্যক্তিগত পরিচয় পাওয়া যায় না। এই মহিলা শোভাবাজারে তাঁর দল তৈরি করেছিলেন। এ থেকে অনেকেই মনে করে থাকেন, ত্রৈলোক্যতারিণী ছিলেন কলকাতার সোনাগাছি অঞ্চলের বারবণিতা। নারী চরিত্রে মেয়েরাই অভিনয় করতেন। দলের জনপ্রিয়তা হয়েছিল খুবই। 'বভ্রুবাহন', 'নলদময়ন্তী', 'অভিমন্যু বধ', অঘোরচন্দ্র চক্রবর্তীর 'চিত্রাঙ্গদা', হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'অন্নপূর্ণা', ইত্যাদি পালাগুলি অত্যন্ত খ্যাতিব সঙ্গেই এই দলে অভিনীত হয়েছিল। এই দলও আধুনিক অপেরা পার্টিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। এই দলের শ্যাম বাগ্‌দী গায়ক হিসেবে এতই জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন যার ফলে সবাই তাঁকে 'শ্যামের বাঁশি' বলে সম্বোধন করত। বর্ধমানের নিতাই দাস ও পূর্ণ দাস এই দলের অভিনেতা ছিলেন। ত্রৈলোক্যতারিণীর দলের শেষ ম্যানেজার যতীন্দ্রনাথ ঘোষ থাকতেন ২নং বনমালী সরকার স্ট্রীটে। ইনি মেদিনীপুরে যাত্রা করতে গিয়ে নৌকাডুবি হয়ে মারা যান।

॥ বাগবাজারে গিরিশচন্দ্র ঘোষের উদ্যোগে যাত্রা দল ॥

১৮৬৭ সাল। পাড়ার অনেক উৎসাহী যুবক একটা যাত্রা দল তৈরি করল। মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ হলেন এই দলের প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যমণি। এঁরা পালা গাইতেন আবার মাঝে মাঝে মাইকেল মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকও করতেন।

॥ অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শিশিরকুমার ঘোষের দল ॥

অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক-প্রতিষ্ঠাতা, যশোর জেলার বর্ধিষ্ণু ব্যক্তি শিশিরকুমার ঘোষ একটা যাত্রা দল তৈরি করেছিলেন। দলটি হয়েছিল আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারের সবাইকে নিয়ে। এখানে "কৃষ্ণ যাত্রা" অভিনীত হতো। শিশিরকুমার নিজেই দলের জন্য ভক্তিমূলক, বিশেষ করে শ্রীচৈতন্যমূলক পালা লিখতেন।

॥ বাগবাজারে মদনমোহনতলায় গীতাভিনয় ॥

বাগবাজারে মদনমোহনতলায় (শ্যামপার্কের পিছন দিকে) 'নল দময়ন্তী' গীতাভিনয় হয়েছিল। এই গীতাভিনয়ের লেখক ছিলেন কালিদাস সান্যাল। 'নলদময়ন্তী' আসলে নাটক, কিন্তু কালিদাস সান্যাল এই নাটকে এত বেশি গান রেখেছিলেন যে, এটি গীতাভিনয় হিসেবেই খ্যাতিলাভ করেছিল।

॥ বৌবাজারে অক্রূর দত্তের দল ॥

যাঁর নামে এখন বৌবাজারে 'অক্রূর দত্ত লেন', সেই অক্রূর দত্ত একবার সখের যাত্রা দল তৈরি করেছিলেন বাড়িতে। এই দলে মাইকেলের 'পদ্মাবতী' গীতাভিনয় অভিনীত হতো। অক্রূর দত্ত খুব রসিকজন ছিলেন। তিনি সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন! সুতরাং গীতাভিনয় উপস্থাপনায় তিনি বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাবনার পরিচয় দিয়েছিলেন।

॥ বউবাজারের বাবু রাজেন্দ্রলাল দত্তের বাড়িতে "পদ্মাবতী" গীতাভিনয় ॥

১৮৬৫ সালের ১৪ নভেম্বর কার্তিক পুজোর দিন রাত্রে বউবাজারের আর এক ধনী রাজেন্দ্র দত্ত 'পদ্মাবতী' গীতাভিনয়ের আয়োজন করেন। 'পদ্মাবতী' হলো মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাটক বা গীতাভিনয়। রাজেন্দ্র দত্তের পরিচয় এখানে কিছুটা দিয়ে রাখি।

ধনাঢ্য পার্বতীচরণ দত্তের ছেলে রাজেন্দ্র দত্তের জন্ম হয় ১৮১৮ সালে, বউবাজারে। এই রাজেন্দ্র দত্তই ভারতবর্ষে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রথম প্রচারক। ইনি রামতনু লাহিড়ীর সঙ্গে হিন্দু কলেজে পড়তেন। যদিও রাজেন্দ্র দত্তের বাড়িতে কার্তিক পুজোর দিনে 'পদ্মাবতী' গীতাভিনয় হয়েছিল, তবুও তিনি ডিরোজিও'র প্রভাবেই মূর্তি পুজোর বিরোধী হয়ে পড়েন।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ইনি তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নানা ভাবে সাহায্য করেছিলেন।

রাজেন্দ্র দত্ত কিছুদিন কলকাতা মেডিকাল কলেজে পড়ার পর ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তায় নিজের বাড়িতে দাতব্য অ্যালোপ্যাথি ডিস্‌পেন্সারী খুলেছিলেন। পরে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শুরু করে খ্যাতি পান। শোনা যায়, রাজেন্দ্র দত্তের উপদেশে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার অ্যালোপ্যাথি ছেড়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আরম্ভ করেন। শ্রীদত্ত সারাজীবনে যত অর্থ রোজগার করেছিলেন তা থেকে তিনি দরিদ্র ব্যক্তিদের সাহায্য করতেন, একটি বৃহৎ পাঠাগার তৈরি করেছিলেন। ১৮৫৩ সালে মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপনে রাধাকান্ত দেব, আশুতোষ দেব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পূর্ণ সহেযোগিতা করেছিলেন। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও রাজেন্দ্র দত্ত ছিলেন অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা।

সেই হেন রাজেন্দ্র দত্ত গীতাভিনয়ের ব্যাপারেও ছিলেন উৎসাহী ; তাই তাঁর বাড়িতে অভিনীত হয়েছিল 'পদ্মাবতী'। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই গীতাভিনয়ের দিন স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। আগেই বলেছি, এটি ছিল নাটক, তবে যাত্রার ফর্মে অভিনীত হয়েছিল কিন্তু একমাত্র ড্রপ সিন ব্যবহার করা হয়েছিল।

এই অভিনয়ের দিনে দত্ত বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন—, শ্রীযুত সত্যশরণ ঘোষাল, বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ, রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু হীরালাল শীল, বাবু শ্যামাচরণ, মৌলবী আবদুল লতিফ ও আরও অনেকে।

॥ *রাধামোহন সরকার* ॥

রাধামোহন সরকার ছিলেন বউবাজারের অনেক বড়লোকের একজন। ইনি 'বিদ্যাসুন্দর' সখের যাত্রা দল করেছিলেন। সব চেয়ে বড় খবর হলো, স্বয়ং গোপাল উড়ে প্রথম এই রাধামোহনের দলে যোগ দেন। এই গোপাল উড়ের কথা আগেই বলেছি!

বিশ্বনাথ মতিলালের সাহায্যে গোপাল করণ বা গোপাল উড়ে দেখা করলেন বাবু রাধামোহনের সঙ্গে। রাধামোহনের তখন সখের যাত্রাদল ছিল। সেই দলের প্রয়োজনে রাধামোহন মাসিক দশ টাকা মাইনেতে রেখে দিলেন গোপালকে। গোপালের গলা মিষ্টি, সুর-তাল প্রসঙ্গেও ভাল জ্ঞান ছিল, তা ছাড়া এ বাড়িতে যে সঙ্গীতের আসর বসত, তার প্রতিও গোপালের আকর্ষণ

তীব্র ছিল। রাধামোহনের বাড়িতে তদানীন্তন কালের সঙ্গীত ওস্তাদ হরিকিষণ মিশ্র গানের আসর বসাতেন, গোপাল একদিন তাঁর কাছে গান শেখার সুযোগ পেলেন। আশ্চর্যের বিষয়, অতি অল্প সময়ের মধ্যে গোপাল ঠুম্‌রী শিখলেন। এরপরই রাধামোহন তাঁর নিজস্ব সখের যাত্রা দলে গোপালকে কাজে লাগিয়ে দিলেন। 'বিদ্যাসুন্দর' পালায় গোপাল সাজলেন 'মালিনী'। রাধামোহনের সখের দলে বিদ্যাসুন্দরের মহড়া শেষ হবার পরই, রাধামোহন শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণকে জানালেন, তাঁর বাড়িতে পালা আসরস্থ করতে হবে। রাজা নবকৃষ্ণ ছিলেন এই সব লোকনাট্য বা লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তিনি রাধামোহনের অনুরোধ রাখলেন, এবং 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনীত হলো। সেই রাতেই সবার মুখে ছড়িয়ে পড়ল গোপালের প্রশংসা। মালিনী চরিত্রে যেমন মানিয়েছিল তেমনি সবাইকে মুগ্ধ করেছিল তাঁর গান ও অভিনয়। এই অভিনয় রজনীর পরই গোপালের মাইনে বেড়ে গেল। মাসে দশ টাকার বদলে মাসিক পঞ্চাশ টাকা মাইনে ধার্য হয়ে গেল। এরপর একবার হাটখোলার দত্ত বাড়িতে, মনে হয় বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের আধুনিক যাত্রার জনক বা প্রবর্তক, নাট্যকার-নির্দেশক চিরস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব অমরেন্দ্রনাথ দত্তের বাড়িতেই হয়েছিল গোপাল উড়ে বা রাধামোহনের বিদ্যাসুন্দর। এই সময়ে অবশ্য অমরেন্দ্রনাথেরও বয়স অতি অল্প। পরে অবশ্য অমর দত্তের পূর্বপুরুষেরা, যাঁরা ছিলেন হাটখোলার বর্ধিষ্ণু ও ধনাঢ্য দত্ত পরিবার, তাঁরা হাটখোলা ত্যাগ করে চলে আসেন হাতিবাগানে। পরবর্তী কালে হাতিবাগানের বাড়ি থেকেই অমর দত্তের প্রতিভা ও নাট্য দক্ষতার স্ফূরণ ঘটেছিল। অমরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মস্মৃতিতে ছেলেবেলার যাত্রা দেখার যে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছিলেন, তা থেকেই সহজে অনুমান করা চলে গোপাল উড়েরই যাত্রা দেখেছিলেন অমর দত্ত। যাক, রাধামোহনবাবু আর গোপাল উড়ের যাত্রা সিমলার ছাতুবাবুদের বাড়িতেও আসরস্থ হয়েছিল। সখের যাত্রা দলের জন্য রাধামোহন ব্যয় করেছিলেন লক্ষাধিক টাকা। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে রাধামোহনবাবু মারা যান।

॥ বৌবাজারের বিশ্বনাথ মতিলালের বাড়িতে সাবিত্রী-সত্যবান ॥

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে জগদ্ধাত্রী পুজোর দিন বৌবাজারের প্রখ্যাত ধনী ব্যক্তি বিশ্বনাথ মতিলালের বাড়িতে সাবিত্রী-সত্যবান গীতাভিনয় হয়েছিল।

॥ কলকাতার নবীন ডাক্তার ॥

ইনি 'রাসযাত্রা'য় নাম করেছিলেন। ফরাসডাঙ্গায় দল রেখে বায়না করতেন। এই দলের 'সীতার পাতাল প্রবেশ' বিশেষ সুনাম পেয়েছিল।

॥ শ্রীনাথ সেনের সখের দল ॥

কলকাতার ধনাঢ্য গুরুচরণ সেনের ভাইপো শ্রীনাথ সেন একটা সখের যাত্রা দল তৈরি করে 'বিদ্যাসুন্দর' করতেন। এ দলের অনেক পালায় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অনেক গান লিখেছিলেন। এ ব্যাপারেও বিশ্বকোষের পাতায় একটা চমৎকার খবর আছে—"এই সময়ে বাংলার প্রতি পল্লীতে বিদ্যাসুন্দরের প্রীতিপ্রদ গীত সমুদয় প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। তৎকালে ছোট বড় ধনী নির্ধন সকল শ্রেণীর লোকই বিদ্যাসুন্দর গাইয়া আপনাপন প্রাণের সখ মিটাইয়া গিয়াছিল—" শ্রীনাথ সেনও খুব খ্যাতি পান।

॥ আরপুলি লেনের যাত্রা দল ॥

এই আরপুলি গলির যাত্রা দল, সিমলার যাত্রা দল ঐ একই কারণে বিখ্যাত হয়।

॥ তালতলায় রামধন ঘোষের বাড়িতে 'পদ্মাবতী' ॥

তালতলার এই রামধন ঘোষও ছিলেন খুব ধনী ব্যক্তি। তাঁর বাড়িতেও ঐ 'পদ্মাবতী' গীতাভিনয় হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, রাজেন্দ্র দত্তের বাড়িতে যাত্রা গীতাভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন যাঁরা, তাঁরাই আবার এ বাড়িতে অভিনয় করেছিলেন।

॥ শ্যামাচরণ মল্লিকের বাড়িতে 'জানকী বিলাপ' ॥

'জানকী বিলাপ' গীতাভিনয় লিখেছিলেন হরিমোহন কর্মকার। এই গীতাভিনয়ে শ্যামাচরণ মল্লিক অনেক টাকা ঢেলেছিলেন। ১৮৭৫ সালে 'মালিনী গীতিকা'র ভূমিকায় স্বয়ং লেখক হরিমোহন কর্মকার লিখেছিলেন—"অপেরা অর্থাৎ বিশুদ্ধ গীতিকা এ পর্যন্ত কেহই প্রণয়ন করেন নাই। বহু দিবস হইল আমি 'জানকী বিলাপ' নামে একখানি গীতিকা রচনা করি। স্বর্গীয় বাবু শ্যামাচরণ মল্লিক মহাশয় নিজ ব্যয়ে সমধিক উৎসাহের সহিত উক্ত গীতিকা অভিনয় করিয়েছিলেন।"

এ ছাড়া রাধানাথ মিত্র লিখেছিলেন "মায়াবতী", এই গীতাভিনয়ে কালকেতু-ফুল্লরা বৃত্তান্ত প্রাধান্য পেয়েছিল।

॥ হরিমোহন রায় ॥

এই হরিমোহন কলকাতা থেকে দূরদেশে যখন যেতেন তখন রাজা-মহারাজাদের মত হাতির পিঠে চড়েই যেতেন। এমন মেজাজ তো তাঁর থাকারই কথা। রাজার চাইতে হরিমোহন কম ছিলেন কিসে? তিনি একদিকে রাজা রামমোহন রায়ের পৌত্র, তৎকালীন বিচারপতি রমাপ্রসাদ রায়ের ছেলে। হরিমোহন ছেলেবেলা থেকেই যাত্রাকে ভালবাসতেন। শেষ পর্যন্ত যাত্রার দল তৈরি করে 'কৃষ্ণযাত্রা'য় খ্যাতিলাভ করেছিলেন। হরিমোহন নিজে গান লিখেও জনপ্রিয় হন। হরিমোহন আরও অনেক নাটক বা গীতাভিনয় রচনা করেছিলেন। যেমন, রত্নাবলী (১৮৬৫), শ্রীবৎস চিন্তা (১৮৬৬), জানকী বিলাপ (১৮৬৭), ইন্দুমতী (১৮৬৯), মাতা সর্বস্ব (১৮৭০), মালিনী (১৮৭৫), পর্বতকুসুম (১৮৭৮), ইত্যাদি।

॥ কাশী মালিনী ॥

কাশী হলো নাম। পদবী জানা যায় না। কাশী ছিলেন গোপাল উড়ের দলের অভিনেতা। ইনি নাচে এবং গানে পারদর্শী ছিলেন। গোপালের দলে যখন 'বিদ্যাসুন্দর' নিয়মিত হতো, তখন এই কাশী মালিনীর ভূমিকায় অসাধারণ রূপ দান করতেন। তাঁর যে কী পরিমাণে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়, যখন জানা যায় লোকে তাঁকে ডাকত কাশীমালিনী বলে।

॥ এঁড়েদার ঠাকুরদাস মিত্র ॥

আড়িয়াদহের ঠাকুরদাস মিত্র ১৮২২ সালে "বিদ্যাসুন্দর" পালা গেয়ে খুবই যশ লাভ করেছিলেন।

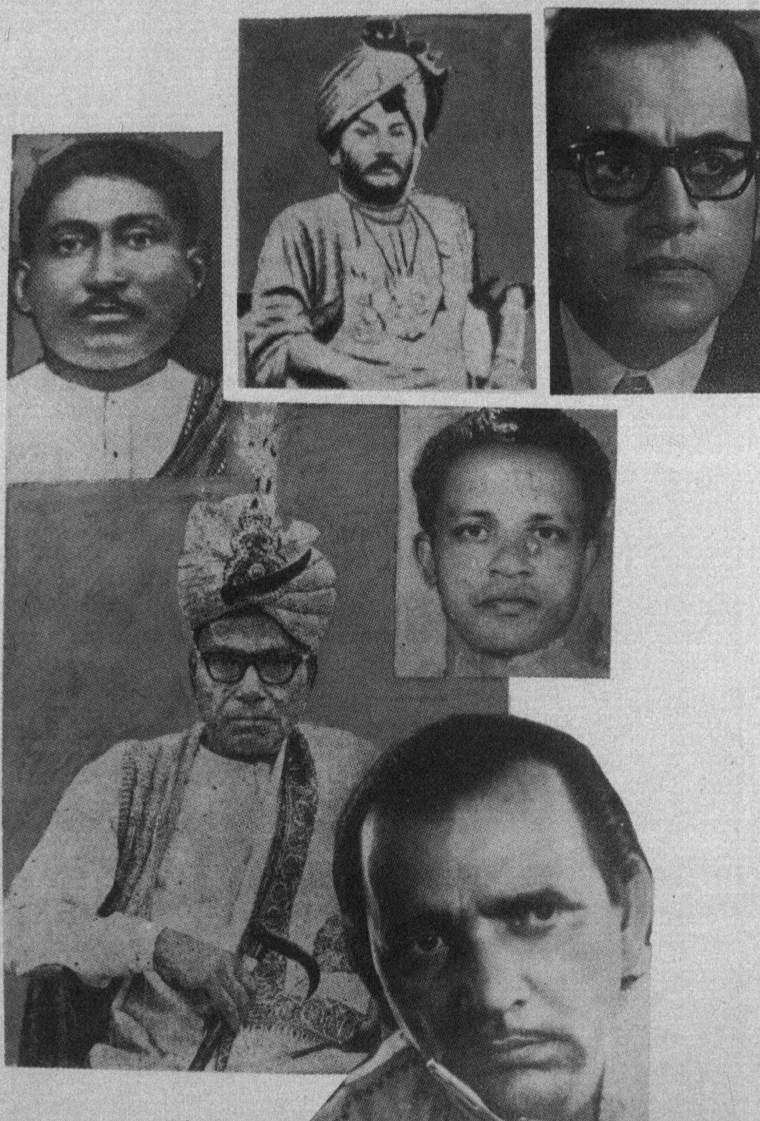
॥ দক্ষিণ বরানগরের দল ॥

দক্ষিণ বরানগরের দলের যে একজন মাত্র কাণ্ডারী ছিলেন না তা দলের নাম থেকেই অনুমান করা চলে। এই অঞ্চলের বেশ কয়েকজন সম্ভ্রান্ত-শিক্ষিত ব্যক্তি এই দল তৈরি করে 'বিদ্যাসুন্দর' করতেন। দলটির জনপ্রিয়তা প্রসঙ্গে বিশ্বকোষ বলছে—"উত্তরপাড়ার কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়িতে অভিনয় দেখিয়া তথাকার কুলকামিনীগণ মোহিত হইয়া কোন প্যালা না দিয়া পুরস্কার স্বরূপ আহ্লাদে পর্দার আড়াল হইতে হাত বাড়াইয়া অভিনেত্রীবর্গকে সাজা পানের খিলি প্রদান করিয়াছিলেন"। সংবাদটি একদিকে যেমন বিস্ময় জাগায় তেমনি গৌরবান্বিত করে। এ থেকে বোঝা যায়, 'বিদ্যাসুন্দর' ধীরে ধীরে এমন একটি মাত্রা পেয়েছিল যার জন্যে ভদ্রবংশের মেয়েরা এই পালা শুধু দেখেননি, খিলি পান খাইয়ে অভিনেতাদের অগ্রগতি কামনা করেছিলেন।

এছাড়া, জনাইয়ের 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রা সম্প্রদায়, ঠাকুরদাস দত্তের 'বিদ্যাসুন্দর' দল রীতিমত হৈ, চৈ ফেলে দিয়েছিল।

॥ বরানগরের ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ॥

১৮২২ সালে বরানগরের খুব পয়সাওলা মানুষ ঠাকুরদাস মুখার্জী শেষ পর্যন্ত একটা সখের



যুগ স্রষ্টা □

ভোলানাথ রায় (কাব্যশাস্ত্রী), মুকুন্দ দাস, উৎপল দত্ত, ব্রজেন দে, শম্ভু বাগ, ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়।

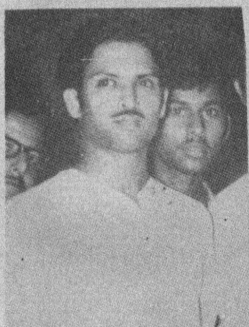
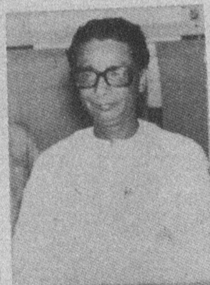


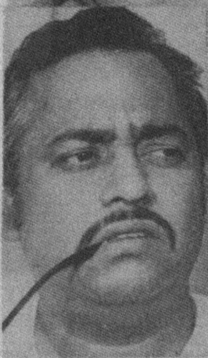



যুগ স্রষ্টা

☐ ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ (রূপ, অ-রূপে) (রয়েল ড্রেসে)

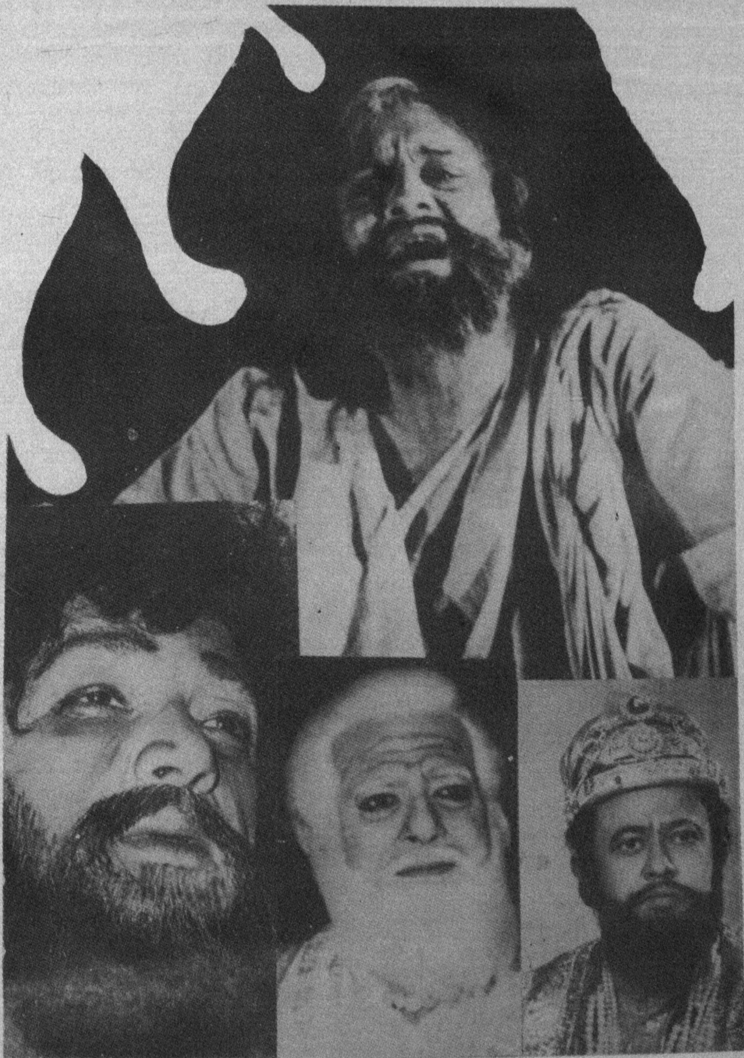
ফণি মতিলাল (সিরাজ), সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জী




যাঁদের ভুলবে না কেউ ☐
প্রাক্তন সংস্কৃতি মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, প্রবোধবন্ধু অধিকারী, মহেন্দ্র গুপ্ত, পঞ্চানন মিত্র, হৃষিকেশ মিত্র, নিরাপদ দাস, আশুতোষ গাঙ্গুলী, পুটাইবাবু।



□ বসন্ত চৌধুরী, তপনকুমার, ঠাকুরদাস মিত্র, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়।





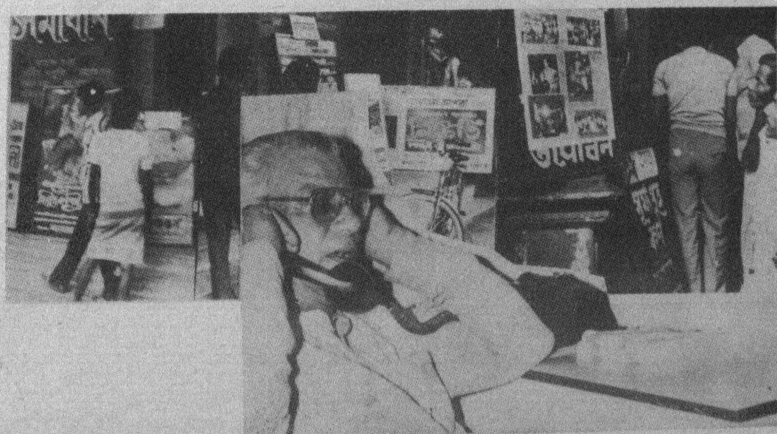


[illegible] গোয়েন্দা রূপ, বিশেষ কপালগোপে
অসিত বসু, চন্দ লাহিড়ী, প্রশান্ত কুমার, সজিত পাঠক









শান্তিগোপাল অভিনীত একটি পালা, বাংলা যাত্রা পালায় অন্যতম সর্বাধুনিক কেরিওগ্রাফি! পালাকার-নির্দেশক অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় মেক-আপ দেখে নিচ্ছেন। বেশকারীর ভূমিকা পালন। যাত্রার প্রবেশ পত্র সংগ্রহের হিড়িক, যাত্রার বকিং-এর জন্য সদা জাগ্রত লর্ড এজেন্ট অনিল ভাণ্ডারী।



মীণাক্ষি দে, নমিতা বিশ্বাস, মহুয়া চ্যাটার্জী, বিদিশা মোহান্তী, সুপর্ণা ঘোষ, সীমা সরকার, গীতা মিত্র, সঞ্চয়িতা।

যাত্রা দল খুললেন। 'বিদ্যাসুন্দর' পালা হত এই দলে। রাধামোহন চট্টোপাধ্যায়, প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, নিমাই মিত্র ছিলেন অভিনেতা। 'নান্দীগান' প্রথম চালু হয় এই দলে। এই সখের দলে পালাগান গেয়ে যাঁরা বেশ খ্যাতি পেয়েছিলেন তাঁরা হলেন, তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী ভট্টাচার্য, কেবলরাম পাল, নিমাই মিত্র। তাঁরা ধোপা কালুয়া'র গানে জনপ্রিয় হয়েছিলেন।

'বিদ্যাসুন্দর' যখন দিকে দিকে অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট বলে প্রচারিত হচ্ছিল, তখনই ঠাকুরদাস অত্যন্ত নতুন ভাবনা ঢেলে 'বিদ্যাসুন্দর'কে নতুন মাত্রা দিয়েছিলেন। ঠাকুরদাস নিজেও 'চণ্ডীযাত্রা', 'কৃষ্ণযাত্রা'র লেখক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। হাওড়া জেলার মাকড়দার ধনাঢ্য বেণীমাধব বাবুর দলে ঠাকুরদাসের অনেক পালা অভিনীত হয়েছিল। ঠাকুরদাস যেমন ছিলেন 'রামযাত্রা' লেখায় সিদ্ধ হস্ত, তেমনি 'হরিশ্চন্দ্র' ও 'শ্রীবৎস-চিন্তা' লিখেও খ্যাতি পেয়েছিলেন।

আড়িয়াদহ বা যাকে আঞ্চলিক লোকে বলে থাকেন এঁড়েদা, (দক্ষিণেশ্বরের অতি কাছে, এখন যেখানে আদ্যাপীঠের আদ্যামায়ের মন্দির) সেখানেই থাকতেন ঠাকুরদাস। সেই ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের যাত্রা প্রসঙ্গে ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত Indian Stage-এ লিখেছিলেন ঃ

"The Information of an Amature Yatra Party...Seemed to be at Adiadaha in 24 Parganas dist. in 1822 a Brahmin named to be Thakurdas Mukherjee formed a party in the name of his father Ramjay... he selected scenes from it (Vidyasundar)"...

এই উক্তি থেকে বোঝা যায় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের বাবার নাম ছিল রামজয় মুখোপাধ্যায়। দলের নাম ছিল রামজয়ের দল।

॥ গগন দাস এবং পূর্ণ দাস ॥

এঁরা হলেন দুই ভাই। দুই ভাইয়ের সংসারে কিন্তু পৃথক হাঁড়ির ব্যবস্থা ছিল না অথচ দু'জনেরই আলাদা-আলাদা যাত্রা দল ছিল। দু'জনেই 'বিদ্যাসুন্দর' পালা করতেন। দুই ভায়ের মধ্যেই একটা প্রতিযোগিতা ছিল। আজকের যাত্রা জগতে যেমন কোন দলের সঙ্গে কোন দলের আত্যন্তিক সম্প্রীতি দেখা যায় না, ঠিক তেমনটি ঊনবিংশ শতাব্দীতেও ছিল, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই গগন দাস আর পূর্ণ দাস। এই 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রা প্রসঙ্গে 'হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য তাঁর "যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও তাঁর সম্প্রদায়" গ্রন্থে চমৎকার তথ্য পরিবেশন করেছেন।—'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রার প্রসার বৃদ্ধি ঘটেছিল যে পরিমাণে ঠিক সেই পরিমাণে এর রুচি বদলের চেষ্টা ছিল না।

॥ শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাড়িতে যাত্রা ॥

কলকাতার আর একজন ধনী ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ সিংহ 'নন্দ বিদায়' যাত্রার একজন সেবা পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ এপ্রিল শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাড়িতে নন্দ বিদায়ের তৃতীয় অভিনয় হয়েছিল।

শহর কলকাতা ছাড়িয়ে এই 'নন্দ বিদায়' পালা তদানীন্তন গোটা বাংলাদেশে অর্থাৎ পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। নদিয়া জেলার ভাজন ঘাটের বেশ কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তি মিলিতভাবে এই 'নন্দ বিদায়' যাত্রাগান করেছিলেন। এই 'সখের যাত্রা'র প্রভাব পড়েছিল গোটা ঢাকা শহরে। কলকাতার মত ঢাকার ধনী ব্যক্তিরাও যাত্রাগান নিয়ে মেতে উঠেছিলেন। একটা প্রতিযোগিতামূলক যাত্রা গানও হয়েছিল। ঢাকার প্রসিদ্ধ ধনী রামপ্রসাদবাবু প্রভৃত অর্থ ব্যয় করে "অর্জুন সংবাদ" যাত্রাভিনয় করেছিলেন।

॥ বিডন স্ট্রীটে কালীপ্রসন্ন ঘোষের বাড়িতে যাত্রা ॥

ধনী কালীপ্রসন্ন ঘোষের বাড়িতে দুর্গাপূজায় বেশ জাঁক জমক করে যাত্রা হতো। সখের যাত্রা। এমনি এক যাত্রা আসরের বর্ণনা পাই, আধুনিক থিয়েটারের অন্যতম জনক অমরেন্দ্রনাথ

দত্তের ভাইপো, তদানীন্তন কায়স্থ সমাজের স্বনামধন্য এবং খ্যাতনামা ব্যক্তি হীরেন্দ্রনাথ দত্তের ছেলে ও কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ভাই, আমাদের শ্রদ্ধেয় হরীন্দ্রনাথ দত্তের লেখা একটি প্রবন্ধ থেকে। তিনি কালীপ্রসন্ন ঘোষের বাড়িতে আসরস্থ যাত্রা গানের বর্ণনা দিয়েছেন এই রকম ঃ—

"......১৯১৭ সালের কালীপূজা উপলক্ষ্যে দেবপ্রসন্ন ঘোষ আমাদের বাড়িতে এসে নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন—যাত্রা হবে, যাওয়া চাইই-চাই! পত্রে লেখা—যামিনীযোগে যাত্রাভিনয়-ভবানীপুর বান্ধব সমাজ কর্তৃক 'পার্থ-প্রতিজ্ঞা'।...ভোর হবার আগেই যাত্রা সুরু হতো, শেষ হতো দুপুর দেড়টা-দুটো নাগাদ। বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, সাদা ফরাস পাতা রয়েছে, চারদিকে চক্রাকারে দর্শকেরা বসে আছেন—মাঝখানটা ফাঁকা। একপাশে স্বল্প পরিসর পথ অভিনেতাদের আগমন ও নির্গমনের জন্যে খালি রাখা হয়েছে। সেই সরু পথের শেষে যে রোয়াক, সেখানে পর্দা দিয়ে ঢাকা সাজঘর। রোয়াকে বাকি জায়গাটায় চেয়ার পাতা।...মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটায় অভিনেতারা অভিনয় করবেন। বেলা দশটা নাগাদ যাত্রা আরম্ভ হল।"...

॥ দর্জিপাড়ার রাজকৃষ্ণ মিত্রের বাড়িতে যাত্রা ॥

ধনাঢ্য গণেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র জগদ্ধাত্রী পূজার দিন বাড়িতে যাত্রার আসর বসাতেন। আত্মীয় স্বজনদের দুপুরে ভোজন ও রাত্রে যাত্রা দেখার নিমন্ত্রণ থাকত। এখানে ভবানীপুরের বান্ধব সমাজের 'পার্থ প্রতিজ্ঞা' হয়েছিল একবার। সকাল ৯।। টায়। সেই যাত্রা আরম্ভ হয়ে শেষ হয়েছিল সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা।

এই 'পার্থ প্রতিজ্ঞা' পালার নায়ক ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী। তখন অবশ্য অহীনবাবু থিয়েটারে আসা নবাগত এক তেজোদীপ্ত শ্বেত অশ্ব। ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন সেই সখের যাত্রার অভিনেতা।

॥ নারকেলডাঙ্গার রাইচরণ অধিকারী ॥

প্রখ্যাত নৃত্য শিক্ষক তারকনাথ বাগচী নারকেলডাঙ্গার রাইচরণ অধিকারীর সঙ্গে বিনিয়োগে 'গ্র্যাণ্ড অপেরা' নাম দিয়ে একটি যাত্রাদল তৈরি করেছিলেন। দলটি এক বছর বেঁচে ছিল।

॥ কারবালা ট্যাঙ্ক রোডের বঙ্কু মিত্র ॥

গ্র্যাণ্ড অপেরা বন্ধ হবার পর তারক বাগচী গেলেন বঙ্কু মিত্রের কাছে। শলা পরামর্শ ক'রে বঙ্কুবাবুর টাকায় তারকবাবুর চেষ্টায় তৈরি হলো চণ্ডী অপেরা। এই দল দুই বছরও টেঁকেনি।

॥ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ॥

১৮৬৩ সালের ১২ এপ্রিল গুরুচরণ ভট্টাচার্যের ছেলে, প্রখ্যাত নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ জন্মান খড়দহে। মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউট থেকে রসায়নে বি. এ. এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে রসায়নে এম.এ পাশ করার পর ১৮৯২ থেকে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্‌টিটিউশানে অধ্যাপনা করেন। ছাত্র জীবনের মধ্যে সাহিত্য চর্চা করতেন। ১৮৮৫ সালে তাঁর 'রাজনৈতিক সন্ন্যাসী (২ খণ্ড) প্রকাশিত হয়। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'ফুলশয্যা' নামে প্রথম কাব্য নাটকটি 'উচ্চ কবিত্বপূর্ণ বাংলা নাটক' হিসেবে চিহ্নিত হয়। তাঁর 'আলিবাবা' (১৮৯৭) আজও খ্যাতির শীর্ষে। এ ছাড়া তাঁর ঐতিহাসিক নাটক 'রঘুবীর', 'বঙ্গের প্রতাপাদিত্য', 'আলমগীর', 'নন্দকুমার', 'ভীষ্ম', 'নরনারায়ণ' মঞ্চসফল নাটক। গ্র্যাণ্ড অপেরায় ক্ষীরোদপ্রসাদের 'সাবিত্রী' এবং 'বভ্রুবাহন' পালা দুটি আসরস্থ হয়। ১৯০০ সালে 'শ্রীমদ্‌ভগবদগীতা' অনুবাদ করেন। ১৯২৭ সালের ৪ জুলাই মারা যান।

এই স্বনামখ্যাত নাট্যকার নিছক নাট্যরচনা আর তার চরম সাফল্যের জন্য নয়, আরও এমন কিছু কীর্তি আছে যার জন্যে তিনি মরেও অমর। তেমনি একটি কীর্তির কথা এখানে হাজির করা যাক।

॥ পুরাতনী ঃ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ও পতিতাদের দেশপ্রেম ॥

১৯০৫। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। ১৯০৬। স্বাদেশিকতার ঢেউ উত্তাল। দেশের স্কুল-কলেজের ছাত্ররা নিয়েছে মাতৃমুক্তি পণ। দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার চোখে ঘুম নেই। এই সময় স্বাদেশিকতায় মেতে উঠল কলকাতার পতিতারা। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে সবাই দেখল, রাস্তায়-রাস্তায়, অলিতে-গলিতে স্বদেশী গান গেয়ে পতিতরা টাকা তুলছে। প্রশ্ন জাগল অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং আরও কয়েকজনের মনে, এই টাকা দিয়ে ওরা কী করবে! কোথায় যায় এই টাকা! আসলে ও ব্যাপারে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ সব জানতেন। জানা গেল, পতিতারা ঐ টাকা তুলে দিতেন পরিচিত স্বদেশী কর্মীদের হাতে। অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য তখন চিত্তরঞ্জন দাশের 'নারায়ণ' পত্রিকার ভার নিয়েছেন। টাকা তাঁরও দবকার। সব শুনে ক্ষীরোদপ্রসাদ একটা চিঠি লিখে দিলেন। লিখে দিলেন এক বারবণিতার কাছে। একটা নয়, তিনটে চিঠি লিখে দিলেন তিনজন বারবণিতাকে। এর মধ্যে একটা চিঠি সোনাগাছির বিখ্যাত-সর্বশ্রেষ্ঠ বাঈজীকে লেখা, আর একটা চিৎপুরের এক বাঈজীকে লেখা, তৃতীয় চিঠিটিও তাই। অবিনাশচন্দ্র তাঁর আত্মস্মৃতিতে লিখেছিলেন—"প্রথম সোনাগাজীতে (এখন সবাই বলে সোনাগাছি) গেলুম। বেলা তখন প্রায় তিনটে। প্রকাণ্ড বাড়ি, গেটের ফাঁক দিয়ে একটা বড় বাঁধান উঠান দেখা যায়। উঠানের পরে দোতলার ঘর থেকে গানের ঝঙ্কার ভেসে আসছে। কাউকে দেখা যায় না। বন্ধ গেটের মধ্যে টুলের ওপর একজন দরওয়ান বসে আছে। ভেতরে যেতে চাইলে বললে, হুকুম নেই বাবু, আপনি কাকে চান, কি দরকার এই শ্লেটে লিখে দিন—"

তাই করলেন অবিনাশচন্দ্র, সেই সঙ্গে ক্ষীরোদবাবুর দেওয়া চিঠিটাও পাঠালেন বাঈজীর কাছে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে একজন দরজা খুলে বেরিয়ে অবিনাশকে নিয়ে গেলেন। অবিনাশ আবার লিখছেন—"একজন সুরুচি সজ্জিতা, হাস্যমুখী মহীয়সী শ্যামবর্ণা নারী, বয়স প্রায় তিরিশ এগিয়ে এসে আমায় অভ্যর্থনা করে নিয়ে এসে বসালেন বাঁ দিকের একটা খুব বড় ঘরে। ঘরের সাজসজ্জা, আসবাব-পত্র দেখে তো আমার আক্কেল গুড়ুম। এত দামী দামী জিনিষ বোধ হয় কোন ধনীলোকের বাড়ীতে নেই। আমায় একটা উৎকৃষ্ট কৌচে বসিয়ে স্মিত হাস্যে বললেন,—ক্ষীরোদবাবুর চিঠিতে আপনার পরিচয় পেলুম। আপনাদের মত ব্যক্তির পদধূলি পাবার যোগ্য আমরা নই। 'যুগান্তর' আমরা নিয়মিত পড়ি। 'সন্ধ্যা'ও পড়ি। দেশের কাজে আমরা যদি কিছু সাহায্য করতে পারি নিজেদের ধন্য বলে মনে করি। আপনাদের কাছে যাবার সাহস আমাদের হয় না। তাই যে কেউ ভদ্রলোক আসেন দেশের কাজ করছি বলে তাদের আমরা ফেরাই না।...এখন থেকে আর কাউকে দেব না, আমরা যা তুলি সমস্তটাই আপনার হাতে দেবো......"

এরপর ২য় বারবণিতাকে খুঁজে বার করে তার হাতেও ক্ষীরোদবাবুর চিঠিটা দিলেন অবিনাশবাবু। এই বাঈজীর একটি মেয়ে ছিল, যে তখন বি.এ. পাশ করেছে ভিন্ন পরিচয়ে, ভিন্ন স্থান থেকে। ছেলেটি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেবে, এই বাড়িতেই থাকে, তবে তার স্কুলে বাড়ির ঠিকানা আলাদা দেওয়া ছিল। বাঈজী ব্রাহ্মণ কন্যা ছিলেন, যৌবনে বুদ্ধির দোষে এই পথে তাঁকে আসতে হয়েছিল। এক অনুতাপের আগুন তাঁকে অহর্নিশি তাঁকে পুড়িয়ে মারছে, এ সব কথা মহিলা নিজেই বলেছিলেন আবিনাশবাবুকে। দেশের কাজে টাকা তিনি দেবেন জানালেন। তৃতীয় বাঈজীর কাছে সেদিন আর যাওয়া হয়নি।

সেদিন এই সামাজিক ছবিটা দেখার পর, মাসে মাসে শ'আটেক টাকা পাওয়া যাবে তা জেনে অবিনাশবাবু এক রাশ আনন্দ আর খুশি নিয়ে খবরটা শুধু ক্ষীরোদবাবুকে নয়, অশ্বিনীকুমার দত্ত, পি. মিত্রকে দিলেন। বারীন দাশ, অরবিন্দ তখন কলকাতায় ছিলেন না। যা হোক, সব শুনে

অশ্বিনীবাবু স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ও টাকা নেওয়া হবে না। অশ্বিনী দত্ত বলেছিলেন—"মাতৃ সেবার পবিত্র কাজে ও টাকা নেওয়া যেতে পারে না—"

কিছুটা তর্ক বিতর্ক হয়ে গেল। পি. মিত্র বললেন, "ও তো ওদের টাকা নয়, দেশের লোকেরই টাকা, ওরা এনে দিচ্ছে মাত্র, তা নিতে দোষ কি?—"

অশ্বিনীকুমার দত্তের যুক্তি ছিল, ও টাকা ওদের দেহ বিক্রির টাকা। পি. মিত্র যুক্তি দিয়ে বলেছিলেন—"যদি তাই হয় তাতে ক্ষতি কি? ওরা কি মায়ের সন্তান নয়? মায়ের সেবার জন্য যদি দেয় নেবো না কেন?"—

তর্ক-বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছিলো। শেষ পর্যন্ত সেই বাঈজীদের টাকা আর আনা হয়নি। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের মানসিক অশান্তি হয়েছিল এই ঘটনার পর।...

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের মৃত্যুর পর বিশেষ করে যে সময়টিতে যাত্রাগানের ক্ষেত্রে থিয়েট্রিক্যাল যাত্রার বিস্তার লাভ ঘটতে থাকল, যে সময়ে মঞ্চনাটক যাত্রাগানের ধারায় আসরে উপস্থাপনার প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকল। তখন এ দেশের বহু যাত্রার অধিকারীরা ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক অপেরা ফর্মে আসরে হাজির করতে থাকলেন। বিশেষ করে ষাটের দশকের সূচনা কাল থেকে এ যাবৎকাল ক্ষীরোদপ্রসাদ সে কত পালাকারকে পালাকার হতে সাহায্য করে গেছেন তার সঠিক হিসাব পাওয়া ভার। ক্ষীরোদপ্রসাদ যদি এ দেশে না জন্মাতেন বোধ করি অনেক নাট্যকার এবং পালাকারও জন্মাতে পারতেন না। তাই এখানে ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রসঙ্গে এই বিস্তারিত বর্ণনার অবতারণা।

॥ অন্যান্য ॥

দত্তপাড়ার আর্য নাট্য সমাজ, আহেরীটোলার ডায়না ক্লাব, বেনেটোলার বঙ্গীয় নাট্য পরিষদ এগুলি ছিল সখের যাত্রা দল, কিন্তু এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত কিছুই জানা যায় না। স্বনামধন্য অভিনেতা, নাট্য নির্দেশক, নাট্য শিক্ষক সন্তোষ সিংহ তাঁর স্মৃতি খুঁড়ে যা রেখে গেছেন তা থেকে কিছুটা বলা যাক—"সারাদিন পরিশ্রমের পর প্রতিপাড়ার অধিবাসীরা সন্ধ্যায় সেই পাড়ার ধনবান, বর্ধিষ্ণু ব্যক্তির বৈঠকখানায় সমবেত হতেন শখের দলের যাত্রাপার্টির মহড়া দেবার জন্য। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি পুস্তক থেকে শিক্ষামূলক গল্প নিয়ে মৌলিক নাটক লেখা হতো, পরে এতে সুর সংযোজিত হত। এবং প্রতিটি গানই উচ্চাঙ্গের রাগ রাগিণীতে পরিপূর্ণ ছিল। যন্ত্র সঙ্গীতের মধ্যে থাকত ক্লারিওনেট, কর্নেট, বেহালা, পাখোয়াজ, ঢোল, বাঁয়া তবলা, হারমোনিয়াম, তানপুরা। প্রত্যেক দলেই একটি করে কনসার্ট পার্টি ছিল। বেহালা আর বাঁশিও ছিল প্রধান অঙ্গ।

আসরের মাঝখানে ৩০। ৪০ জন লোক গোল হয়ে বসতেন, তাঁদের থেকে একটু দূরে গরদের চাপকান পরে বসে আছেন বাঁশি-বেহালা-কর্নেট-ঢোল পাখোয়াজ বাদক। আসরের মাঝখানে অভিনেতৃবর্গ সংলাপ বলে যাচ্ছেন। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক সীতার বনবাস পালায় রাম বলছেন—"সংসারে সবই অনিত্য"—সংলাপ উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে হারমোনিয়ামে সুর উঠলো, চাপকান পরা ৩ জন উঠে দাঁড়িয়ে গান ধরলেন—"অনিত্য সব অসার ভবে সার সত্য সনাতন—", এঁরা এক লাইন গান গেয়ে ছেড়ে দিলেই ঐ যে ৩০। ৪০ জন লোক, যাঁরা বসে ছিলেন আসরে তাঁরা স্বস্থানে বসেই এক সঙ্গে উদাত্ত কণ্ঠে গান ধরলেন "অনিত্য সব অসার ভবে সার সত্য সনাতন—," এই যে ৩০। ৪০ জনের একটা গাইয়ে গ্রুপ এঁদের বলা হতো 'দোয়ার,' আর চাপকান পরা লোকদের বলা হতো 'জুড়ি',—এক একটি গান শেষ হতে সময় লাগতো আধ ঘণ্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট।...

॥ শ্যামপুকুরের ব্রজনাথ দেব ॥

শ্যামপুকুরে থাকতেন ব্রজনাথ দেব। ইনি নটগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষের শ্যালক। একবার নিজের

বাড়িতে একটা থিয়েটারের দল তৈরি করেছিলেন। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফীর হাতে থিয়েটারের নাট্য শিক্ষা থেকে সব ভার তুলে দিয়েছিলেন। ব্রজবাবু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন একটা স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ তৈরি করবেন। তিনি এ ব্যাপারে অনেকের কাছ থেকে চাঁদাও নিয়েছিলেন। সেই টাকা দিয়ে শ্যামপুকুরে গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে (উঠনে) মঞ্চ তৈরির কাজ আরম্ভ করেছিলেন। মঞ্চের প্লাটফর্ম পর্যন্ত তৈরি হয়েছিল। হঠাৎ ব্রজনাথ সাংঘাতিক অসুস্থ হলেন। সেই দল ভেঙ্গে গেল। দলের অনেকে বেরিয়ে এসে শ্যামপুকুরের কয়েকজন উৎসাহী ছেলেদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে একটা যাত্রা দল তৈরি করেছিল। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফীও ছিলেন। অর্ধেন্দুবাবু আর যাঁদের সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁরা হলেন—নিতাই চক্রবর্তী, দুর্লভ গোস্বামী, হিঙ্গুল খাঁ। পাথুরেঘাটা রাজবাড়িতে 'বিদ্যাসুন্দর'-এ যিনি মালিনী সাজতেন সেই কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখে দিলেন 'শকুন্তলা'। এরপর এই যাত্রা দল 'দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ' পালা করেছিল। এখানে অর্ধেন্দুবাবুরা তথাকথিত যাত্রার ফর্ম ভেঙ্গে থিয়েটারী ফর্মে তৈরি করেছিলেন।

॥ ভবানীপুর গিরীশ মুখার্জীর বাড়িতে বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তীর নায়ক উত্তমকুমারের যাত্রাভিনয় ॥

জাতে ওঠা আর জাতে ওঠানোর মধ্যে কোন ফারাক নেই।
বাংলা সিনেমার সোনার নায়ক উত্তমকুমারের ক্ষেত্রে ঐ দুটোই ঘটেনি। তিনি একেবারে কিশোর বয়স থেঁকেই ছিলেন জাত অভিনেতা, যাকে অনায়াসে বলা যায় "বরন্ আর্টিস্ট"।

উত্তমকুমারের মাতৃদেবী বছর বারো আগে এক জায়গায় বলেছিলেন, তাঁর দুই ছেলে আর এক বৌমা অভিনেতা ও অভিনেত্রী, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'স্টার'। স্টার অর্থ তারা। সেই তারায় ভরা ছিল ভবানীপুরের গিরীশ মুখার্জী রোডে চপলাদেবীর সংসার। চপলা দেবীর ভুবন। আরও একটা ব্যাপারে উত্তমকুমারের মাতৃদেবীর চাপা তৃপ্তি ছিল, তা হলো এই বর্ধিষ্ণু পরিবারের কর্তারাও ছিলেন অভিনয় পাগল। ভাশুর-স্বামী সবাই বাড়িতে তো একটা সখের থিয়েটারের আখড়াই তৈরি করে রেখেছিলেন। সেদিক থেকে সেই রক্ত ধারার ধারক ও বাহক উত্তমকুমার। সেই সঙ্গে আর একটা প্রবাদ ভবানীপুরের ঐ পল্লীতে মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। প্রবাদটি হলো "একা রামে রক্ষে নেই সুগ্রীব দোসর"। আসলে ভবানীপুরের গিরীশ মুখার্জী রোডের বনেদি মুখুজ্জে বাড়িতে ছিল যাত্রা আর থিয়েটার নিয়ে মাখামাখি। সেই সূত্রে ঐ মুখুজ্জ্যে পরিবারের সঙ্গে চাটুজ্জ্যে বাড়ির সংস্কৃতি চর্চা ও মাখামাখি বরাবরই দগদগে ছিল। ঐ গিরীশ মুখার্জীর বাড়ির ছেলে দিলীপ মুখার্জীর সঙ্গে অরুণ ওরফে উত্তম চ্যাটার্জীর গাঢ় বন্ধুত্ব ছিল ছেলেবেলা থেকেই। লুকিয়ে বাবা-জ্যেঠাদের রিহার্সাল দেখা থেকে বাড়ির ছাদে অভিনয়ের চমৎকার স্মৃতিচারণ তিনি করেছেন 'আমার আমি'-তে।

এগারো বছর বয়স থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে অনেকবারই পাড়ায় মঞ্চ বেঁধে অথবা মুখুজ্জ্যে বাড়ির ঠাকুরদালানে থিয়েটার আর যাত্রা করেছেন উত্তমকুমার। সুযোগ পেলেই যাত্রার কথা বলতেন।

উত্তমকুমার যাত্রার শিল্পীদের শ্রদ্ধার সঙ্গে যেমন ছবিতে আমন্ত্রণ জানাতেন বার বার, তেমনি তাঁরই পরিকল্পনায় যাত্রার ডাকসাইটে প্রবীণ শিল্পীরা 'শিল্পীসংসদ'-এর সাংগঠনিক দিকেও মিলে মিশে যেতে পেরেছিলেন। যাত্রার সর্বশক্তিমান নট, নটসম্রাট স্বপনকুমারকে উত্তমকুমার যতখানি শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন অভিনেতা হিসেবে, তপনকুমারকেও ভালবাসতেন অন্তর দিয়ে। এই হেন যাত্রাপ্রেমিক উত্তমকুমার প্রসঙ্গে তাঁর বাল্যবন্ধু দিলীপ মুখার্জী এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন— "উত্তম ১৯৭৫ সালে আমাদের ঠাকুর দালানে শেষ যাত্রাভিনয় করে ব্রজেন দে'র 'নটী বিনোদিনী' পালায় গুর্মুখ রায় চরিত্রে—" দিলীপবাবু আরও বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের 'মুকুট' ওঁদের এবং

উত্তমকুমারের ছেলেবেলাকার বেঁধে নেওয়া মঞ্চে প্রথম অভিনীত নাটক। উত্তমকুমার যখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র তখন "আগামীকাল" নামে একটা যাত্রাপালায় অভিনয় করেছিলেন 'তরলা' নামে এক নারী চরিত্রে। অভিনয়ে পাড়া মাৎ করেছিলেন তিনি। তারপর একবার বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ"কে সংক্ষিপ্ত করে "সন্তান" নাম দিয়ে যে মঞ্চ বেঁধে অভিনয় হয়েছিল তাতে উত্তমকুমার হয়েছিলেন মহেন্দ্র। সেই নাটকে কার্ড বিক্রি করে সংগৃহীত ১১০০ টাকা তখন আই. এন. এ.-এর তহবিলে সতীশচন্দ্র বসুর হাতে তুলে দিয়েছিলেন উত্তমকুমার।

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়কে খুব ভালবাসতেন, শ্রদ্ধাও করতেন উত্তমকুমার। উত্তমবাবুর বেশ কয়েকটা হিট ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্যকারও ছিলেন ডাঃ বিশ্বনাথ রায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামাতা।

১৯৮৩ সালে সেই শ্রদ্ধেয় বিশ্বনাথদা এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন--"উত্তমকুমারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় বঙ্গশ্রী কটন মিলস্-এর কর্ণধার প্রয়াত শিল্পপতি দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মেট্রোপলিটান বিল্ডিং-এর ফ্ল্যাটে। আলাপ হয়েছিল এর অনেক আগে গিরীশ মুখার্জীদের বাড়িতে। মুখার্জী পরিবারের এক কন্যা রমলার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় চক্রধরপুরে। আমিও তখন ভবানীপুরে নীলগোপাল মিত্র লেনে মানে থিয়েটার সেন্টারের পিছন দিকে থাকতাম। অরুণকুমারের বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ি পায়ে হাঁটলে পাঁচ মিনিট। রমলার আমন্ত্রণে জগদ্ধাত্রী পুজোয় যাত্রা দেখতে গেলাম। গিরীশ মুখার্জীর প্রাসাদ প্রতিম বাড়ির উঠোনে যাত্রা হতো। সেই যাত্রা করত পাড়ার ছেলেরা। অরুণকুমার তথা উত্তমকুমার নায়ক, নাটকের নাম "স্বর্ণলঙ্কা"। উত্তমকুমার রাম। ফরসা ধবধবে গায়ে নীল রঙ মেখে আশ্চর্য সুন্দর রাম রূপে আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন--"

দৃষ্টিকোণ

॥ যাত্রা এবং অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী ॥

অর্ধেন্দুশেখর তাঁর 'নাট্যজীবনের স্মৃতি'তে লিখেছেন ঃ "...বোসপাড়ার গতিনাথ দত্তের বাড়িতে একটি যাত্রার দল বসেছিল। সেখানে 'শর্মিষ্ঠা'র পালা গাওনা হতো। তাঁদের দলে একজন আমায় লক্ষ্য করে বললেন—'বাবা এতো আর রঙচঙে পোষাক পরে রঙচঙে কাপড়ের আড়াল থেকে শুনে শুনে চিৎকার আর লাফালাফি করা নয়, এতে রীতিমত নাচ গান বাজনা সুর-তাল চাই।" আমি উত্তর দিয়ে এলেম—"বেশ, আজ হতে ১৫ দিন পরে তোমাদের এই সুর-তাল বাজনাওয়ালা যাত্রা করে শুনিয়ে দেব ; কিন্তু তোমরা আজ থেকে একমাস পরে একটা থিয়েটার কর দেখি।" সেই দিনই নগেন্দ্রবাবুর বাড়িতে যাত্রার পরামর্শ স্থির করলেম।

মণিমোহন সরকারের 'ঊষা অনিরুদ্ধ' অভিনয় করা স্থির হল। একখানা বই নিয়ে গিরীশবাবুর কাছে গেলেম, তিনি তাতে ২৬ খানা গান রচনা করে স্থানে স্থানে বসিয়ে দিলেন। ঠনঠনে নিবাসী অদ্বিতীয় বাজিয়ে শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ চক্রবর্তী আমাদের দলে বাজিয়ে হলেন। বর্ধমান আমোদপুর নিবাসী সুগায়ক উমাচরণ চক্রবর্তী আর তাঁর ভাগ্নে দুর্লভচন্দ্র গোস্বামী আমাদের দলে জুড়ী গাবেন স্থির হলো। হিঙ্গুল খাঁ নাচগান শেখাতে লাগলেন।...মহেন্দ্রলাল বসুর সঙ্গে এই সময় ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হলো। যাত্রা দলের উপযুক্ত অনেক পোষাক তাঁর কাছে ছিল। তিনি কতকটা আমাদের পোষাক সরবরাহকারী হয়ে পড়লেন। নগেন্দ্রবাবুর বাড়ি আমাদের যাত্রার প্রথম গাওনা হলো। এই দলেই সুপরিচিত মতিলাল সুর আমাদের সঙ্গে যোগ দেন। যেদিন আমাদের গাওনা সেইদিনই 'শর্মিষ্ঠা'র দল বোসপাড়ার মাঠে আটচালা বেঁধে যাত্রা কল্লেন। শেষে উভয় দলে সং দেবার ছলে উভয় দলকে উপস্থিত কবির মত গান বেঁধে শ্লেষ-বিদ্রূপ, শেষে গালাগালি দেওয়া পর্যন্ত হলো। তারপরে আমাদের যাত্রার আর চার পাঁচ আসর গাওনা হয়ে যাত্রার দল বন্ধ হয়।..."

অর্ধেন্দুশেখরের স্মৃতি থেকে আরও কিছু যাত্রা দলের খবর পাওয়া গেল। ..."শ্যামপুকুরের যুবকদের আগ্রহে একটা যাত্রাদল বসল, আমরাও অনুরোধে যোগ দিলেম। আমরা এসেই নিতাই চক্রবর্ত্তী, উমাচরণ চক্রবর্ত্তী, দুর্লভ গোস্বামী, হিঙ্গুল খাঁ প্রভৃতিকে আনালেম। প্রথমে 'শকুন্তলা' দু-চার আসর গাওনা হলো। তারপর 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' খোলা হলো। এই পালা অনেক আসরে গাওনা হলো। তারপর 'সীতার বনবাস' হয়।"

গিরীশচন্দ্র ঘোষ যে সখের যাত্রাদল করেছিলেন তার বর্ণনাও অর্ধেন্দুবাবু দিয়েছেন। অর্ধেন্দুবাবু বলেছেন—"...গিরীশবাবু এক সখের যাত্রাদল করেন। এই দলে তিনি সঙএর পালা বেঁধে দেন। ঐ সঙের দলে একজন প্রয়াগের লুপ্ত বেণী ত্রিধারা ভাগীরথীর বর্ণনাত্মক একটি গান গাইত। এই গানটিতে থিয়েটার দলের প্রেসিডেন্ট হতে আরম্ভ করে প্রত্যেক ব্যক্তির নাম সুন্দর সুকৌশলে গাঁথা ছিল যে তাতে রচয়িতা গিরীশবাবুর বিশেষ কবিত্বশক্তি ও শব্দ গাঁথার আশ্চর্য ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছিল।...রাধামাধব বাবুই এই গানটি গাইতেন।"

গানের নমুনা ঃ

"লুপ্তবেণী বইছে তিরিধার
তাতে পূর্ণ-অর্দ্ধ-ইন্দু-কিরণ, সিঁদুর মাখা মতির হার
নগ হতে ধারা ধায় সরস্বতী ক্ষীণকায়
লুপ্তবেণী ব'চ্চে তেরো ধার।
সিঁদুর মাখা মতির হার।
বিবিধ বিগ্রহ ঘাটের উপর শোভা পায়,
শিবশম্ভুসুত মহেন্দ্রাদি যদুপতি অবতার।।
অলক্ষ্যেতে বিষ্ণু করে গান কিবা ধর্মক্ষেত্র স্থান
অবিনাশী মুণি ঋষি করছে বসে ধ্যান
সবাই মিলে ডেকে বলে 'দীনবন্ধু' কর পার।।...
কিবা বালুময় বেলা, পালে পালে রেতের বেলা
ভূবনমোহন চরে করে গোপালে খেলা ;......"

॥ **প্রবীণ নাট্যকার রাধামাধব কর তাঁর আত্মস্মৃতিতে যাত্রা প্রসঙ্গে বলেছেন,—**

"তখন কলিকাতায় যাত্রা গানের খুব ধুম। গোবিন্দ অধিকারীর দল, রাধাকৃষ্ণ বৈরাগীর দল, বদন অধিকারীর দল, মহেশ চক্রবর্ত্তীর দল, বৌ মাষ্টারের দল, ঝোড়োর দল, ব্রজ অধিকারীর দল, উমেশ মিত্রের দল (গোপাল উড়ের দল নামে খ্যাত), মদন মাষ্টারের দল, লোকা ধোপার দল প্রভৃতি যাত্রা দল তখনকার বাঙ্গালী সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

গোবিন্দ অধিকারী রাত্রি শেষে আসরে নামিতেন। তখন যাত্রা শুনিবার জন্য কর্তারা আসিয়া বসিতেন। তৎপূর্বে রাত্রি নয়টা হইতে তিনটা পর্যন্ত ছেলে ভুলাইবার জন্য অনেক রকম সঙের ব্যবস্থা ছিল। গোবিন্দ অধিকারীর পোষাক জরি বসানো শালুর কাপড়ে প্রস্তুত ছিল। যাহারা স্ত্রীলোকের ভূমিকা লইত, তাহারা কলাপাতার গহনা পরিত। অধিকাংশ গানের পালা কৃষ্ণ বিষয়ক। প্রধান বাদ্যযন্ত্র ছিল তানপুরা, খোল আর করতাল। যাত্রার 'কোরসের' ব্যাপারটায় খুব গোল হইত। কিন্তু প্রত্যেক দলই নাচ-গানে প্রসিদ্ধ ছিল। গোবিন্দ অধিকারী বৃদ্ধ বয়সেও স্ত্রীলোকের পোষাক পরিয়া বিন্দে দূতী সাজিয়া আসরে নামিতেন ; অথচ কিছুমাত্র বেমানান বলিয়া মনে হইত না। অতি মধুর কীর্ত্তনাঙ্গে তিনি সকলকে মোহিত করিয়া দিতেন। মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে আসিয়া বিন্দে দূতীর গান ঃ

শ্যামশুক নামে প্রিয় পাখী
এ দেশে এসেছে উড়ে,
সাধের গোকুল আঁধার করে
রাধারে দিয়েছে ফাঁকি।...

এই সঙ্গীতের তালে তালে এক পা, দুই পা, তিন পা অগ্রসর হইয়া আবার এক পা দুই পা পশ্চাতে হটিয়া বিন্দে দূতীর নৃত্য তাঁহার গানকে অধিকতর মধুর করিয়া দিত।...নাচ গানের উপর যাত্রার দল খুব ঝোঁক দিত। ঝোড়োর দল 'কমলে কামিনী' পালার জন্য সর্বদাই বাহবা পাইত। ঝোড়ো নিজে চমৎকার নাচিতে-গাইতে পারিত। বৌ মাষ্টারের দল 'ধ্রুব চরিত্র' পালা গাহিয়া আপামর জনসাধারণের মনোরঞ্জন করিত। আমার মনে পড়ে দুই রাণীর নাচ। তাহাদের অপূর্ব নৃত্যভঙ্গী তখনকার কলাকুশলীর বিস্ময়োৎপাদন করিত ।

রাণীর গান ঃ

রাজ-সিংহাসনে বসিতে বাসনা করো না।
জন্ম-জন্মান্তরে পূণ্যপুঞ্জ কোরে
জন্মাইতে পারো যদি মম উদরে,
তবু হয় কি না হয়—
আমার উত্তম কুমার আছে জান না।

আমি এত নিবিষ্ট চিত্তে সেই গান শুনিলাম যে তৎক্ষণাৎ সর তাল লয় সহ সেই গান আমার কণ্ঠস্থ হইয়া গেল।

ঝোড়োর 'কমলে-কামিনী'র গান গুলিও খুব মিষ্ট ছিল। কুকুভ রাগিনীতে সে গাহিত—

শুন নৃপমণি
না দেখি, না শুনি,
এমন কখনও রূপসী রমণী।
কালীদহ মাঝে,
সরোজ বিরাজে,
উগারিছে গজে গ্রাসিয়ে অমনি।

আবার ললিত রাগিনীতেও সকলকে চঞ্চল করিয়া সে গান ধরিত—

এই যে ছিল কোথা গেল কমলদলবাসিনী।
লোক লাজ ভয়ে বুঝি লুকালো শশি বদনী।...
... এ মায়া বুঝিতে নারি,
হবে এ কা'র রমণী।।"...

রাধামাধব কর তাঁর স্মৃতি কথায় আরও বলেছেন—"মহাশয়, যাত্রা গানের সেদিন এখন আর নাই। গানের সুরের সঙ্গে সঙ্গে পর্দায় পর্দায় যেন আমাদের মনশ্চক্ষুর সমক্ষে নব নব সৌন্দর্যের উন্মেষ হইত ; আসরের প্রত্যেক ঝাড় লণ্ঠন যেন সেই শব্দের তরঙ্গে রণ্‌রণ্‌ করিয়া বাজিয়া উঠিত ;......নৃত্যকলার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বোধ হয় আমাদের দেশে হইয়া গিয়াছে। প্রজ্বলিত দীপশীর্ষ পিত্তলের পিলসূজ মাথায় লইয়া প্রকাণ্ড আসরের মাঝখানে নটবরের বিস্ময়কর নৃত্যলীলা, আজকালকার বঙ্গ সমাজে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ফুলের ডালি হাতে লইয়া বিদ্যাসুন্দরের মালিনীর চৌতালে নাচ আবাল বৃদ্ধ বণিতাকে চমক লাগাইয়া দিত। আবার মহেশ চক্রবর্তীর দলের 'দক্ষযজ্ঞ' অভিনয়ে যজ্ঞস্থলে সতীকে না দেখিতে পাইয়া ভৃগুমুণির স্ত্রী গাহিল ঃ

কই গো প্রসূতি, তোমার সতী ভবনে।

এ যজ্ঞ হবে না পূর্ণ সে কন্যা বিনে।...

তাহার গানের রেশ পর্যন্ত যখন মিলাইয়া গেল সহসা নৃত্য কুশলা নাপ্‌তিনী আসরে অবতীর্ণা হইয়া পুঁটলিটি হাতে লইয়া তাহার বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীর লীলা তরঙ্গে দর্শক মণ্ডলীকে মোহিত করিয়া গান ধরিত—

'আলতা পরাবো মার রাঙ্গা চরণে।'

পুরবাসিনীর ভূমিকায় বেশ বিন্যাস করিয়া সুসজ্জিত নট তাহার ঘনবিন্যস্ত কেশের উপরে স্থাপিত তিনটি কলস লইয়া সে অদ্ভুত Poetry of Motion-এর সৃষ্টি করিত। তাহা আপনারা কল্পনাও করিতে পারিবেন না।

নাচ গানের সেদিন আর এখন নাই। এখন আপনারা কথায় কথায় আর্ট লইয়া আলোচনা করেন। কিন্তু আজকাল দেখিতেছি আপনারা—কায়মনোবাক্যে কিনা বলিতে পারি না—অন্ততঃ বাক্যে অত্যন্ত Puritan ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন ; কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ সরম সঙ্কোচে আপনাদের নাসিকা কুঞ্চিত হইয়া ওঠে।

সে সঙ্গীতের আসরে ভদ্রসমাজে পিতা-পুত্র একত্র বসিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিত না ; পর্দার আড়ালে মাতা স্ত্রী কন্যার অধিষ্ঠান কাহারও কিছুমাত্র উদ্বেগের কারণ হইত না।

...পৌরাণিক ঘটনা বিশেষ তখনকার দিনে যাত্রা গানের বিষয়ীভূত হইত।...সত্যবতী অম্বালিকাকে যখন বংশ রক্ষার জন্য ব্যাসদেবের নিকট যাইতে পীড়াপীড়ি করিতেন, তখন কোনও ভদ্র সন্তানই সভা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন না। বরং সকলেই অম্বালিকার উত্তর শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিতেন।

সত্যবতীর কথার পর ঢুলী উঠিয়া ঢোল বাজাইতে আরম্ভ করিল ; সেই অবসরে অম্বালিকা তাহার উত্তর রচনা করিয়া লইল। কিছুক্ষণ পর ঢুলী থামিলে অম্বালিকা উঠিয়া দাঁড়াইয়া গান ধরিত—

গানের নমুনা

আমার ঘট্‌ল আজ এ কি জ্বালা,
ঠাকরুণ গো,
ভেবে মরি করব কি উপায়।
ছিল ঠেক্‌রো সিংহি ধীবর রাজা,
জানি তা'র ফরাসডাঙ্গায় ধাম,
তা'র জ্যেষ্ঠা কন্যা মান্যা তুমি
সত্যবতী মৎসগন্ধা নাম।
কাশীরাজার কন্যা মোরা সামান্য কেউ নই,
তোমার পুত্রবধূ হই।
চিত্র সেন পতি ছিল,
সে আমারে ছেড়ে গেল গো,
সেই পতির শোকে মনোদুখে
মর্মে মরে রই।
ক'রে ধর্মে ধর্মরক্ষা
প্রাণ রেখে সেই পতির পায়।।
তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র যিনি,

ঐ দ্যাখ ব্যাসমুনি বড়ঠাকুর যিনি,
দেখে তায় মরি লাজেতে,
তিনি কোন সাহসে ঢুকলেন এসে আমার ঘরেতে।
সে যে মস্ত দেড়ে, দাড়ী নেড়ে, অন্দরে ঢুকে,
গিয়ে বসল তাল ঠুকে।
আমি তা দেখতে পেয়ে,
চলে যাই ঘোমটা দিয়ে গো,
সে যে পথ আগুলে,
দাঁড়ায় সম্মুখে ;
ধরে আঁচল করে টানাটানি আঁচল ছাড়ে না।
তোমার কথার ভাবে বোঝা গেছে,
এ ঘটন তুমি ঘটিয়েছ,
এমন রাজ্যরক্ষের বংশরক্ষের দায়,
বল কি ফল হবে তায়।
ছি ছি লজ্জায় মরে যাই,
আমরা সতীর মেয়ে সাধ্যা সতী পতিব্রতা হই,
বরং আত্মঘাতি হতে পারি এমন কর্মে দিই না সায়।।

সত্যবতী অনেক নজির দেখাইলেন। অম্বালিকা সোজা উত্তর দিলেন—

যদি করতে হয় ত আপনি কর, ঠাকরুণ্।
ও কথা আমায় ব'ল না।
অমন সদ্য ছেলে বিইয়ে দিতে
অন্য কেউ ত পারবে না।
বাল্যকালে নদীর তীরে বাইতিস তরণী,
কথা লোক মুখে শুনি,—
দেখে তোর রূপের ডালি, অফুট' কমল কলি'
তাতে হুল বসিয়ে স্থুল বাধালেন পরাশর মুনি।
তুমি একবার ক'রে পার পেয়েছ নাইক কিছু ভয়,
এখন যত ইচ্ছে তত কর কেউ তা কিছু বলবে না।
যদি করতে হয় ত আপনি কর, ঠাকরুণ্,
ও কথা আমায় ব'ল না।।

তখনকার ভদ্র সমাজের আসরে পুরাণের এই শ্বাশুড়ি বধূর কথা কাটাকাটি আজকাল একেবারেই অচল হইয়া পড়িয়াছে। কবির লড়াইয়ের একটি খাঁটি নমুনা পর্যন্তও আজকাল আপনাদের সাহিত্য ভাণ্ডার হইতে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ।...

শুধু যে বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরাই এ আনন্দ উপভোগ করিতেন, তাহা নহে। যে গৃহস্থের প্রাঙ্গণে যাত্রাগান, কবির লড়াই প্রভৃতি হইত, তাহার গৃহে সেদিন সকলের অবারিত দ্বার। দ্বারে টিকিট দেখাইতে না পারিলে এই সামাজিক আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে, এমন কল্পনা কারও মনে উদিত হয় নাই। এখন আমাদের অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে দেখুন। আপনি নিমন্ত্রণ পাইলেন, তথাপি আপনার আমন্ত্রণকারীর গৃহে যথাসময়ে প্রবেশলাভ করা দুর্ঘটনা ; সেখানে গিয়া একখানি

টিকিট দেখাইতে হইবে। তখন হিন্দু গৃহস্থের ক্রিয়া কর্মে আপামর জনসাধারণ সকলেই নির্বিচারে আনন্দে যোগদান করিতে পারিত।..."

॥ শোভাবাজার হাটখোলায় বারোয়ারীতলায় শ্রীরামকৃষ্ণ শুনলেন নীলকণ্ঠের যাত্রা ॥

আগেই একবার বলেছি, 'কালীয়দমন' যাত্রার আবির্ভাব ঘটেছিল চৈতন্যদেবের সময়ে। তারপর থেকে আমাদের দেশের বহু মানুষই, বহু পালাকারই চেষ্টা করেছিলেন 'কালীয়দমন' যাত্রাকে সমকাল চেতনায় ভরিয়ে তুলে, কুরুচির কবল থেকে মুক্ত করে, রুচিশীল লোকনাট্যে পরিণত করতে। এ ব্যাপারে কৃষ্ণকমল গোস্বামীরও চেষ্টার অন্ত ছিল না, তবে অত্যন্ত সুখের খবর ঊনিশ শতকের শেষ ভাগে এই নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ই সফল হয়েছিলেন অনেকটাই। নীলকণ্ঠ এই 'কালীয়দমন' যাত্রায় যেমন চরম খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তেমনি এই বিষয়টিকেও জনপ্রিয় করেছিলেন। নীলকণ্ঠ পেয়েছিলেন ঠাকুরের আশীর্বাদ।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ভক্তদের মধ্যে একজন ছিলেন নীলকণ্ঠ। নীলকণ্ঠের গলায় রাধাকৃষ্ণ লীলার গান শুনতে ভালবাসতেন ঠাকুর। আর সেই গান শুনেই ঠাকুর একদিন প্রকাশ্যে বলেছিলেন,—"যাত্রা ছেড়োনি নীলকণ্ঠ, ওতে লোক শিক্ষে হয়—"

কলকাতার কোথাও নীলকণ্ঠের যাত্রাগান হলে ঠাকুরের মন হত উচাটন। দেখতে যেতেন সেই যাত্রাগান। কিন্তু কী পরিচয় এই নীলকণ্ঠের? কেমন করেই বা তিনি ঠাকুরের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন? তা হলে একটু আগে থেকে বলা দরকার।

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় ঃ

১৮৪২ সালের জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি মাসে (১২৪৮ সনের ৬ মাঘ) বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর মহকুমার ফরিদপুর থানার অন্তর্গত ধরণী গ্রামে নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম। ছেলেবেলা থেকেই যাত্রাগানের প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণ ছিল। পাশেই জামুই গ্রামের গোপাল রায়ের তখন যাত্রাগানে খুব নাম। ভাল কীর্তন গাইতেন গোপাল। বালক নীলকণ্ঠ সেই গোপাল রায়ের কাছে কীর্তন শিখে, সেই বয়সেই গোপালের দলেই "কৃষ্ণযাত্রা"-য় কিছুদিন কাটিয়ে সুযোগ পান গোবিন্দ অধিকারীর দলে।

১২৭৭ সনে গোবিন্দ অধিকারী মারা গেলে ভীষণ বিপাকে পড়তে হয় নীলকণ্ঠকে। ঘরে উন্মাদ বাবা। শত ছিন্ন সংসার। দু'বেলা দু'মুঠো ভাতও জোটে না, অগত্যা নীলকণ্ঠ এক দিন সোজা চলে যান রামমোহন পাঁড়ের কাছে। রামমোহন শুধু আশ্রয় দেননি, তিনি নীলকণ্ঠকে হিন্দি ভাষা শিক্ষা দেন। হিন্দি শিখে নীলকণ্ঠ একটি মাড়োয়ারীর দোকানে খাতা লেখার কাজ পান। সেই কাজের ফাঁকে ফাঁকে গান শেখা আর মাঝে মাঝে আসরে নেমে গান করা সমানে চালিয়ে যান তিনি। মাত্র ১৯ বছর বয়সে নীলকণ্ঠ নিজেই যাত্রা দল তৈরি করেন। দল তৈরির সঙ্গে কবিতা লিখতে শুরু করেন তিনি। কবিতা থেকে গান লেখার আগ্রহ। গান, কবিতার সঙ্গে 'কৃষ্ণযাত্রা' লিখতে আরম্ভ করেন। প্রথমেই তিনি নিজের দলের জন্য লেখেন "মানভঞ্জন", "দূতি-সংবাদ।" বলা বাহুল্য, নীলকণ্ঠ যে দলটি গড়েছিলেন সেটি সেই গোবিন্দ অধিকারীর দল। দল তৈরি করে স্ব-রচিত 'কৃষ্ণযাত্রা'য় তিনি শুধু বর্ধমান নয়, বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদের মানুষের মন জয় করেছিলেন অনায়াসে। তিনি নিজে দূতীর ভূমিকায় অভিনয় আর গান করে প্রভূত খ্যাতি শুধু পাননি, নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ তাঁকে "গীতরত্ন" উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। তিনি স্বনামধন্য পাঁচালি গায়ক দাশরথি রায়ের ভাবশিষ্যও ছিলেন। আর সেই কারণেই নীলকণ্ঠের কৃষ্ণযাত্রা সেই দাশরথির পাঁচালি প্রভাবে পুষ্ট হয়ে উঠেছিল অনেকটাই।

নীলকণ্ঠ যখন কৃষ্ণযাত্রায় খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন তখন একদিন তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করেন। নীলকণ্ঠের গানেই যেন ঠাকুরের তৃপ্তি। ঠাকুর যখনই শুনতেন

অমুক পাড়ায় নীলকণ্ঠের যাত্রাপালা তখনই বিচলিত হতেন। ছুটে যেতেন সেই আসরে নীলকণ্ঠের গান শুনতে। অনেকদিনই নীলকণ্ঠের গান শুনে ঠাকুরের ভাব সমাধি হয়েছে। সেবার শুনলেন শোভাবাজারের হাটখোলায়, বারোয়ারীতলায় নীলকণ্ঠের গান হবে। আর ঠাকুরকে রাখে কে। যথাসময়ে সদলবলে শ্রীরামকৃষ্ণ গেলেন হাটখোলায়। খবর পেয়ে ছুটে বেরিয়ে এসে নীলকণ্ঠ সর্বাঙ্গে মেখে নিলেন ঠাকুরের পদরেণু। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। এক অতি সাধারণ যাত্রাওয়ালা, পাতকীর কাছে এসেছেন ঠাকুর সেই কথা ভেবেই ভক্তি ভাবে দু' চোখের বারি ধারায় নিজেকে শুদ্ধ করলেন নীলকণ্ঠ। যত গান তিনি ততই ভাবাবেগে আপ্লুত হন মানব দেবতা। গান শুনতে শুনতে আপন খেয়ালে উঠে দাঁড়ালেন ঠাকুর। মনে হলো যেন মাটিতে চন্দ্রোদয় হলো। উঠে দাঁড়াবার সাথে সাথে ভাব সমাধি হলো তাঁর। নীলকণ্ঠ যেন সত্যিই হলেন নীলকণ্ঠ। মুহূর্তের মধ্যে শোভাবাজারবাসীরা ছুটে এলেন কাতারে কাতারে। অপরূপ সেই বিগ্রহ দর্শন করে নিজেদের ধন্য করার বাসনা সবার। যাত্রা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আগেই। শেষ পর্যন্ত নীলকণ্ঠ "রাধাকৃষ্ণ" নাম গানে ঠাকুরের ভাব সমাধি ভঙ্গ করেছিলেন।

ভক্ত নীলকণ্ঠের গানে ঠাকুরের ভাব সমাধি ভঙ্গ হতো বলে নীলকণ্ঠের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল, যিনি চৈতন্য, যিনি গৌরাঙ্গ তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ।

জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে, প্রবল খ্যাতি থাকাকালীনই মুক্তিলাভের আকাঙ্খায় ছুটে গিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুরের পদযুগল স্পর্শ করে তিনি চেয়েছিলেন মুক্তির সন্ধান।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ দিয়েছিলেন, যাত্রাগান না ছাড়ার। বলেছিলেন,—নীলকণ্ঠ, যাত্রা ছেড়োনি—

দল নিয়ে নীলকণ্ঠ গিয়েছিলেন আসাম, সিঙ্গাপুর।

জীবনের শেষ ক'টি বছর নীলকণ্ঠ থাকতেন হেতেমপুরের রাজা রামচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে। মারা যান ১৯১২ সালে।

নীলকণ্ঠের মন্ত্রশিষ্য শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায় গুরুর মহৎ জীবনী প্রকাশ করে বইটির নাম রেখেছিলেন "শ্রীশ্রী নীলকণ্ঠ চরিতামৃত।"

॥ ব্যাঁটরার ঠাকুরদাস দত্ত ॥

রামমোহন দত্তের ছেলে ঠাকুরদাস দত্তের জন্ম ১২০৮ সনে হাওড়া জেলার উত্তর ব্যাঁটরা গ্রামে। ইনি কিছুকাল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে চাকরি করার পর ১৮৩১ সনে সখের যাত্রাদল তৈরি করেন। এই দলের 'বিদ্যাসুন্দর'-এর খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্যাঁটরার উমাচরণ মুখোপাধ্যায় এই দলে মালিনী সেজেছিলেন। ঠাকুরদাস শুধু বিদ্যাসুন্দর নয়, নিজের লেখা 'লক্ষ্মণবর্জন' এবং আরও কিছু পালার অভিনয় করিয়েছিলেন। দলটি মাত্র তিন বছর টিকে ছিল।

ঠাকুরদাস দত্তের বৈশিষ্ট্য হল, একই পালা ভেঙ্গে তিনি বিভিন্ন ভাবে লিখতে পারতেন। তিনি ৪ ভাবে বা পর্যায়ে 'বিদ্যাসুন্দর' পালা রচনা করেছিলেন। ঠাকুরদাস দত্তের লেখা জনপ্রিয় পালার তালিকা এই রকম ঃ হরিশ্চন্দ্র, শ্রীবৎস চিন্তা, নল দময়ন্তী, কলঙ্ক- ভঞ্জন, শ্রীমন্তের শ্মশান, রাবণ বধ, অক্রূর আগমন, দুর্গামঙ্গল, লবকুশের পালা, রামচন্দ্রের দেশাগমন, শিবের বিবাহ, ধ্রুব চরিত্র, পারিজাত হরণ, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ইত্যাদি। ১২৮৩ সনের ২১ বৈশাখ ঠাকুরদাস দত্ত মারা যান।

॥ টাকীর জমিদার বৈকুণ্ঠনাথ রায়চৌধুরী ॥

অর্থ-বৈভব-প্রাচুর্য-বিলাসের মধ্যে জীবন কাটানো এই মানুষটিও সখের 'বিদ্যাসুন্দর' সম্প্রদায় তৈরি করে, 'বিদ্যাসুন্দর' পালায় বেশ নাম করেছিলেন।

॥ রিষড়ার কৈলাসচন্দ্র রায় ॥

তেমনি পয়সাওলা, জমিদার গোছের মানুষ কৈলাসচন্দ্র রায়ও খ্যাতি পেয়েছিলেন 'বিদ্যাসুন্দর' করে।

॥ গজার ভটচাজ্জী ॥

গজার বড়লোক ভটচাজ্জী মশাইও সখের 'বিদ্যাসুন্দর' করেছিলেন অনেকদিন।

॥ কালাচাঁদ পাল ॥

'কৃষ্ণযাত্রা' যখন সব দলে, সব মনে রীতিমত হিল্লোল তুলেছিল, তখন ঢাকা বিক্রমপুরের কালাচাঁদ পাল কৃষ্ণযাত্রার দল তৈরি করে, নিজে রচনা করে খ্যাতিমান হয়েছিলেন।

॥ পীতাম্বর অধিকারীর দল ॥

এ প্রসঙ্গে বিশেষ কিছু জানা যায় না। শুধু জানা যায় "কৃষ্ণযাত্রা" লিখে খুব নাম করেছিলেন তিনি। ছিলেন বর্ধমান জেলার কাটোয়ার লোক।

॥ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ॥

রসিকলাল চক্রবর্তী তখনও জীবিত, অথচ বালক সঙ্গীত সম্প্রদায় দলটির তখন ভগ্ন দশা, এই সময়ে মীরপাড়ার যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সেই ভাঙা দল কিছুদিন চালিয়েছিলেন।

॥ কৃষ্ণচন্দ্র বসাকের মহাকালী সঙ্গীত সম্প্রদায় ॥

রসিকলাল চক্রবর্তীর পাশাপাশি দল। নিতাইপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্মশানে মিলন' পালাটি কৃষ্ণচন্দ্র বসাকের দলে যেমন হয়েছিল, তেমনি রসিকলালের দলেও। কৃষ্ণচন্দ্র প্রসঙ্গে আর বিশেষ কিছু জানা যায়নি।

॥ রামচন্দ্র রায় বীরবর ॥

এই রামচন্দ্র রায় বীরবর ঊনবিংশ শতাব্দীতে বেশ কিছু গীতাভিনয় লিখে খুবই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিশোরীচন্দ্র রায় বীরবরের ছেলে রামচন্দ্র রায় ১৮৪৪ সালে মেদিনীপুরের দাঁতনে জন্মেছিলেন। নিতান্ত ছেলেবেলা থেকেই তাঁর যাত্রার প্রতি তীব্র আকর্ষণ ছিল। পরবর্তীকালে রামচন্দ্র সেই যাত্রা রচনা করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর লেখা অনেক পালার একটি হলো 'রামচন্দ্র গীতাবলী'। রামচন্দ্র রায় বীরবরের মৃত্যু হয় ১৯২১ সালে।

॥ রামকুমার নন্দী ॥

ইনিও মাত্র ১৪ বছর বয়সে 'দাতাকর্ণ' নামে একটি পালা লিখে সেই বয়সেই বেশ প্রশংসা পেয়েছিলেন। ১৮৩৩ সালে বেজুরার শ্রীহট্টে রামকুমারের জন্ম। অল্প বয়সেই রামকুমার অর্থোপার্জনের জন্য শিলচর চলে যান। এখানে থেকে তিনি একদিকে যেমন ইংরেজি শেখেন তেমনি পাশাপাশি সঙ্গীত শিক্ষা ও চর্চা করেন। তাঁর লেখা জনপ্রিয় পালাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নিমাই সন্ন্যাস, উমার আগমন, ভগবতীর জন্ম ও বিবাহ। এছাড়া আরও ৮ খানা পালা ছিল। তিনি পাঁচালি রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এগুলির মধ্যে বিখ্যাত কলঙ্কভঞ্জন, লক্ষ্মী-সরস্বতীর দ্বন্দ্ব, বোধন।

॥ কৃষ্ণকমল গোস্বামী ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে অন্তিমকাল পর্যন্ত এই 'বিদ্যাসুন্দর' প্রাসঙ্গিক সখের যাত্রায় শুধু নয়, 'কৃষ্ণযাত্রা'তেও ব্যাপকভাবে কুরুচি আর অশ্লীলতা প্রসার লাভ করায় তখনকার শিক্ষিত-মার্জিত এবং সুরুচি সম্পন্ন মানুষেরা যাত্রার ব্যাপারে খুবই বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন। আগেই বলেছি, যে সময়ে তদানীন্তন সমাজ কাঠামোটাই এই সব কারণে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হবার মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক সেই সময়েই কৃষ্ণকমলের আবির্ভাব। কৃষ্ণকমল গোস্বামী। কৃষ্ণকমল এই দূষিত রুচির যাত্রার কবল থেকে জনচিত্তকে উদ্ধার করে সৎ ও বিশুদ্ধ ভক্তি রসের যাত্রাগানে জনচিত্ত

প্লাবিত করার বাসনায় কৃষ্ণযাত্রাকে ঢেলে সাজালেন। নতুন রূপ দিলেন তিনি এই যাত্রার। কৃষ্ণকমল তাঁরই 'বিচিত্র বিলাস'-এর ভূমিকায় লিখেছিলেন—"যদিও প্রচলিত অভিনয় (যাত্রা) অনায়াস দৃশ্য, কিন্তু তাহা সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিতান্ত বিরক্তিকর, কারণ অনভিজ্ঞ অভিনেতৃবর্গ সামান্য লোকের প্রীতিপ্রদ রহস্য সাধনের উদ্দেশ্যে প্রবন্ধগত প্রকৃতভাব পরিত্যাগ পূর্বক অসাময়িক অশ্লীল কাব্য প্রয়োগ, নানাপ্রকার কদর্য রঙ্গভঙ্গী ও নিতান্ত অবিধেয় বেশবিন্যাস করিয়া থাকে..." এবার একটু কৃষ্ণকমলের ব্যক্তিজীবনের কথা বলে নেওয়া যাক।

মুরলীধর গোস্বামীর ছেলে কৃষ্ণকমলের জন্ম হয় নদিয়া জেলার ভজন ঘাটের এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে ১৮১০ সনে। বৈদ্যবংশীয় এই কৃষ্ণকমলের রক্তে ছিল অভিনয় নেশা। পূর্বপুরুষদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যের পার্শ্বচর ছিলেন। কৃষ্ণকমলের বাবা ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত। তিনি বৈষ্ণবীয় ভক্তি সংগীত এবং পদাবলী কীর্তনের অসাধারণ গায়ক ছিলেন। প্রথমে বালক কৃষ্ণকমলকে তাঁর বাবা বৃন্দাবনে নিয়ে যান। ছ'বছর বৃন্দাবনে, পরে নদিয়ায় পড়াশোনা করেন। ১৮২৫ সালে বাবা মারা যান। নবদ্বীপ টোলে কৃষ্ণকমল সংস্কৃত শিক্ষা করেন।

ছাত্রাবস্থাতেই সংসারের চরম দরিদ্রতার সঙ্গে যুদ্ধ চালাতে গিয়ে চাকরি খুঁজতে থাকেন। যান ঢাকায়। এখানে পালা রচনায় মন দেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে কৃষ্ণকমল একাধিক পালা লিখে প্রভূত খ্যাতি পান। মূলতঃ কৃষ্ণযাত্রায় তিনি ঢাকায় একটা যুগান্তর এনেছিলেন বলা যেতে পারে। 'স্বপ্ন বিলাস' এই রচয়িতার প্রথম যাত্রার বই। ১৮৩৫ সালে এই 'স্বপ্নবিলাস' ছাপা হয় এবং আশ্চর্যের বিষয় হলো, অতি অল্পদিনের মধ্যে 'স্বপ্নবিলাস' ২০,০০০ কপি বিক্রি হয়।

কৃষ্ণকমল 'স্বপ্নবিলাস' যাত্রায় অনুপ্রাস এনেছিলেন। তাই অনুপ্রাসের পালা শোনার জন্য তখনকার দর্শকরাও পাগল হয়েছিলেন বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। তাঁর পরবর্তী জনপ্রিয় এবং বিখ্যাত পালার তালিকায় আছে—'নন্দহরণ', 'বিচিত্র বিলাস', 'রাই উন্মাদিনী', 'দিব্যোন্মাদ', 'কালীয়দমন', 'ভরত মিলন', 'গন্ধর্ব মিলন', 'নিমাই সন্ন্যাস' ইত্যাদি। 'রাই উন্মাদিনী' তখন আবালবৃদ্ধবণিতার কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিল। ঢাকায় কৃষ্ণকমল 'বড় গোঁসাই' নামে খ্যাত ছিলেন। ১৮৮৮ সালে চুঁচুড়ায় তাঁর মৃত্যু হয়। বাংলায় ছিল ১২৯৪-এর ১২ মাঘ।

কৃষ্ণকমলের কৃষ্ণযাত্রা সম্পর্কে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন 'কৃষ্ণকমল গীতিকাব্য' বইয়ের ভূমিকায় লিখেছিলেন—"কৃষ্ণকমল গোস্বামীর চক্ষে চৈতন্যের জীবনী সর্বদা উজ্জ্বল ছিল। রাধাকৃষ্ণের রূপকছলে তিনি আরাধ্যের জীবন কাহিনী শুনাইয়াছেন।......বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস যে কথা দার্শনিকের ভাষায় লিখিয়াছেন, তাহা কবির হস্তে নবজীবন লাভ করিয়াছে। চৈতন্যের কৃষ্ণ বিরহের করুণ উচ্ছ্বাসে মাথুরের সৃষ্টি, তাঁহার উন্মত্ত প্রলাপে রাই উন্মাদিনী জীবন পাইয়াছে ও স্বপ্নবিলাস সার্থক হইয়াছে। আমরা বলিতে পারি, রাই উন্মাদিনী, বিচিত্র বিলাস, স্বপ্ন বিলাস প্রভৃতি কাব্য প্রবীণ চৈতন্যচরিতামৃত মহীরূহের ফুল ও ফল—"

কৃষ্ণকমল তাঁর পালায় আনলেন গদ্য সংলাপ। তবুও প্রতিটি পালাতেই ছিল কীর্তনাঙ্গের গান। 'ভরতমিলন' পালাও তেমনি, এতে গদ্য সংলাপ বেশি থাকা সত্ত্বেও গানের প্রাধান্য কম ছিল না। তবুও একটি ব্যাপার সত্য তা হলো, কৃষ্ণকমল যে নবজাগরণের স্বপ্ন দেখেছিলেন তা ষোল আনা সার্থক হয়নি। তিনি অনেক চেষ্টাতেও কালীয়দমন যাত্রাকে সম্পূর্ণ নবধারায় রূপায়িত করতে পারেন নি। কৃষ্ণকমল যখন তাঁর যাত্রায় অনুপ্রাস আনলেন তখনই শ্রোতা এবং দর্শকরা চমৎকৃত হলেন। এখানে কৃষ্ণকমলের অনুপ্রাস আশ্রিত সংলাপের কিছুটা নমুনা হাজির করি—। সংলাপ না বলে একে গান বলাই বোধ করি ঠিক।

রাগ/বসন্ত—তিন তাল

"ভাইরে সুবল! ভাইরে সুবল! উপায় কি করি বল
কেবল রিপুবল হইল প্রবল,

কানাই বিনে বৃন্দাবনে   দুর্বলের আর কি আছে বল
পুন কি কালীয়দহে,   বিষজলে প্রাণদহে
কিবা দাবানল দহে,   দহে বৃন্দাবন সকল।
দেখি আর দিনেক দুদিন, যদি বিধি না দেয় সুদিন
তবে আর কেন দিনের দিন. দিন গুণে দিন কাটাই বিফল।"

যাত্রার প্রথম গবেষণা প্রবন্ধ এবং কৃষ্ণকমল গোস্বামী

যাত্রার ওপরে প্রথম গবেষণা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে হলে প্রথমেই আলোচনা করা দরকার শ্রদ্ধেয় নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে। শিশু সাহিত্য সংসদের "বাঙালী চরিতাভিধান" নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রসঙ্গে এক জায়গায় বলছে—"বিদেশ যাত্রার পূর্বে ঢাকায় 'বাল্য-বিবাহ-নিবারণী সভা' স্থাপন ও 'অবলা বান্ধব' পত্রিকায় প্রবন্ধাবলী রচনার মাধ্যমে সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করেন—", এ কথাকে মেনে নিতে হলে নিশিকান্তবাবুর প্রতি অন্যায় করা হবে। কারণ, 'অবলাবান্ধব' পত্রিকায় অনেক প্রবন্ধ অবশ্যই লিখেছিলেন নিশিকান্ত, কিন্তু 'বাল্যবিবাহ নিবারণী সভা' স্থাপনার কৃতিত্ব তাঁর দাদার। অতএব নিশিকান্ত প্রসঙ্গে এই 'চরিতাভিধানের' উক্তি অপ্রয়োজনীয়। সুতরাং আমি যাত্রার ওপরে নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম গবেষণাপত্র—"THE YATRAS"or The popular Dramas of Bengal—থেকে কিছুটা আলোকপাত করি। প্রথমেই জেনে রাখা দরকার, নিশিকান্তবাবু জুরিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. উপাধি পান। পি. এইচ. ডি-র জন্য তাঁর থিসিস ছিল "The Yatras or The Popular Dramas Of Bengal". ১৮৮২ সালে এটি মনোনীত হয়। এবং ১৮৮২ সালেই লণ্ডন থেকে সেই থিসিস প্রকাশিত হয় বই আকারে।

নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়-এর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে "THE YATRAS : or THE POPULAR DRAMAS OF BENGAL" গ্রন্থ থেকে হুবহু তুলে দিলাম ঃ

"NISIKANTA CHATTOPADHYAYA, son of Kasikanta Chattopadhyaya, was born in 1852 (Sravana 7, B.E. 1259). A pleader by profession, and very rich, Kasikanta was an orthodox *Kulina* Brahamana of Paschimpada, a tiny village of Vikrampur Paragana, Dacca.

For two years Nisikanta learnt Sanskrit in traditional Sanskrit *tolas.* One of his Sanskrit tutors was Amarachandra Vidyabhushan of Paschimpada. Later on he went to Dacca, and in 1864 passed the Entrance Examination in the First Division. He was awarded a scholarship. Meanwhile he had married Hemantakumari Devi in 1864 or thereabouts.

Nisikanta's elder brother, Nabakanta Chattopadhyaya (1845-1905), was a prominent Brahma, and a school teacher at Dacca. Nabakanta converted his younger brothers Nisikanta and Sitalakanta into the Brahma faith. Sitalakanta Chattopadhyaya (1856-97) later on became the editor of *The Tribune* of Lahore. Nabakanta was a remarkable man. He initiated a movement against child marriage. He was perhaps the first *Kulina* Brahmana to earn his livelihood by running a shoe-store in Dacca. His proselytizing activities made him quite famous. The three brothers were probably disinherited by Kasikanta.

Nisikanta came to Calcutta and was enrolled as a student of the First Arts class in the Presidency College. Meanwhile the inheritance to the

substantial paternal property was claimed by Syamakanta Chattopadhyaya, the eldest of the brothers, who fortunately solved the dispute by mutual settlement. Nisikanta acquired a sum of two or three thousand rupees. He discontinued his studies in the Presidency College, and, with that sum of money, started for Europe in September 1873. Arriving at Edinburgh, he promptly enrolled as a medical student. But he gave up his medical studies in 1874 and started for Leipzig. He was admitted in the Leipzig University as a student of comparative religion. Here he was short of funds. Devendranath Tagore, Rabindranath's father sent him six hundred rupees. At Leipzig Nisikanta learnt German so well that he could deliver lectures on Indology in that language. He lectured on the Ramayana, the Chronology of the Hindus, the Creation Myths and Buddhist influence on Christianity. The last lecture was so much disliked by the local Christian authorities that they made it extremely difficult for him to express his views candidly in Leipzig. In fact Nisikanta fell a victim to the religious fanaticism which was a result of the contemporary *Kultur Kampf.*

From Leipzig the wandering scholar went to St. Petersburg (Leningrad), where he was appointed a Lecturer in the University of St. Petersburg. Here he was able to get the patronage of some influential Russian nobles. Nisikanta's biographers have averred that even the Tsarevitch was his pupil. But some spies reported that Nisikanta had a link with the Nihilists. Suddenly his bright prospects grew dim. He had to send in his resignation and hurry away to Switzerland. The restless Bengali found a safer haven in the University of Zurich, where he sojourned for the next two years. There he composed his thesis on the Yatras. It was approved in 1882.

It is indeed a pity that Nisikanta did not write a memoir of his travels and experiences in Europe, where a storm was slowly gathering. He must have been in Russia when the Russo-Turkish war borke out in 1877, leading to the conclusion of the Treaty of San Stefano and the Congress of Berlin in 1878. He must have also witnessed the intensification of the Nihilist movement in Russia and the growth of the *Narodniki.*

His work on the Yatras was praised by the examiners. The following is an excerpt from a letter written to him by the Head of the Department of Linguistics, University of Zurich :

> I have the pleasure to announce to you that the Faculty is not only satisfied with the examinations you have so successfully passed, but accords to you the highest distinction it has in its power to do, *summa cum laude.* After ten years of study in Europe you are now bent on going back to your fatherland, and I and my fellow members sincerely wish you all success and prosperity in your future career.

Nisikanta returned to India on March 3, 1883. He was accorded a grand welcome in Calcutta, Dacca, Chittagong, Munsiganj and other places.

He served as a Professor and Principal of several colleges in Hyderabad, Muzaffarpore and Mysore. At Hyderabad, however, he embraced Muhammadanism, and he was ostracized by his relatives and Hindu friends.

His thesis on the Yatras was published in London in 1882 by Trubner & Co. The book was reviewed in the *Bangadarsana* and some other journals of the time. His essays were collected in a volume titled *Indische Essays.* It was published in Zurich.

Nisikanta contributed articles to a monthly Bengali journal titled *Mahapapa Valyavivaha.* It was the organ of the Valya-vivaha-nivarani-sabha (Society for the Prevention of Early Marriage) which had been founded at Dacca by Nabakanta Chattopadhyaya. Some of the Bengali articles of Nisikanta Chattopadhyaya. Some of the Bengali articles of Nisikanta were also published in the *Avala-bandhava,* which was edited by the Brahma social reformer Dwarakanath Gangopadhyaya (1844-98). Nisikanta was a good singer of Brahma devotionals. In Europe he had cultivated English, German and Italian airs.

His sojourn in Hyderabad was very unhappy. His gifted son died just after passing the Entrance examination. He was probably involved in the intrigues of the Nizam's court.

Nisikanta died on February 25, 1910.

The Yatras : or the Popular Dramas of Bengal conists of three parts. One part deals with the antiquity of popular drama in Europe, India, and Bengal. Another part contains a rough sketch of the development of Bengali literature in the nineteenth century. The main thesis deals with the Krishna-yatras composed by Krishnakamal Gosvami (1810-88). Nisikanta did not give any account of the life of this notable Bengali author of the Yatras. The thesis merely refers to his works which are analysed *passim."...*

নিশিকান্তবাবু তাঁর গবেষণার ভূমিকায় কৃষ্ণকমল গোস্বামীর ব্যক্তি জীবন প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ.....

"...He married, and went to Dacca where he lived the greater part of his life. A *kathaka* by profession, he interpreted the *Bhagavata-purana* in speeches and songs. He was a devout Vaishnava for whom money and fame had very little charm. The people of Dacca regarded him as a principal *(bada)* Gosvamin (Cardinal) of the faith. Tarasankar Tarkaratna, a celebrated Professor of Sanskrit College, Calcutta, was one of his friends.

Krishnakamal's first drama was *Nimai-sannyasa.* The date of its publication is not known ; he might have composed it when he was quite young. He composed *Svapnavilasa* in 1842, *Divyonmada Rai Unmadini*

in the same year, and *Vichitravilasa* in 1856. He also wrote *Kaliya-damana, Nimai-Sannyasa, Bharatamilana* and *Gandharva-milana.* He composed songs for the drama *Nanda-vidaya ; Svapnavilasa* was first performed in Ekrampore, Dacca. Very soon it became immensely popular in Eastern Bengal. *Divyonmada/Rai Unmadini* was first staged in the Abdullapur village of Vikrampur Paragana.

Just before his death Krishnakamal came back to Bhajanghat, where he died in 1888."...

নিশিকান্তবাবুর গবেষণার প্রধান দিক......

"A fundamental point in his thesis was that "the Indian drama, like all other dramas, has its origin in cult." This point he sought to prove by an exposition of the influence exerted by Krishna-Siva-Durga worship on the development of folk-drama in India, from the days of Panini to the mid-Victorian age."

নিশিকান্তবাবু সহ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 'গীতগোবিন্দ' প্রসঙ্গ ঃ

Nisikanta regarded Jayadeva's *Gitagovinda* as "a Yatra" or "Miracle play". Macdonell thought that it was a lyrical drama, and "the earliest literary specimen of a primitive type of play that still survives in Bengal." A.B. Keith considered it the earliest specimen of the Yatra. Susilkumar De found in it "a sublimated outcome of the operatic and melodramatic Krisna-yatra." Sukumar Sen describes it as 'Natya-Giti'. But some scholars do not support this view. In Swami Prajnananda's opinion, *Gitagovinda* is but an 'Akhyanakavya'."

॥ পুরাতনী ॥

নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের দীর্ঘ গবেষণার ফসল এই গ্রন্থ যার উৎসর্গ পত্রটি এখানে আগামী প্রজন্মের জন্য হুবহু উপস্থাপন করলাম ঃ

TO MY DEARLY BELOVED SISTER,

SRIMATI SARADASUNDARI DEVI,

THESE PAGES,

CONTAINING SOME OF THE EARLIEST RECOLLECTIONS

OF MY BOYHOOD,

PASSED UNDER HER LOVING EYES,

ARE DEDICATED

WITH THE TENDEREST REGARDS OF HER AFFECTIONATE BROTHER

ZURICH, *January, 1882,*

॥ প্রসঙ্গ ঃ লোকসংস্কৃতি ॥

সারা পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা সর্বত্র আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতির আলাদা একটি ঐতিহ্য আজও স্থানীয় লোকেরা সশ্রদ্ধচিত্তে বহন করে আসছে। আঞ্চলিক বাসিন্দাদের চিত্তবিনোদনের উদ্দেশে এই সব আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতি অর্থাৎ গান-নাচ ইত্যাদি হয়ে থাকে তা নয়। বহু যুগের ওপার থেকে আজও এই লোকসংগীত বা লোকনাট্য পরিবেশিত হয়। এক এক

অঞ্চলে এক এক লোকশিল্প বা লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য! আর এ সবের যেমন আলাদা আলাদা নাম, তেমনি এর উপস্থাপনার রীতিও আলাদা।

যেমন, ছৌ-নাচ, কাঠি নাচ, নাটা নাচ, ঘোড়া নাচ, ফসল কাটা, ফসল তোলার নাচ, ভাদু, টুয়া টুসু, উধোয়া, জারী, ভাওয়াইয়া, বুলবুলি, বাউল, ভাটিয়ালী, সারি, ঝুমুর, ঝাঁপান, নীল গাজন, করম, সাধু, অহিরা, বিহা এসব সঙ্গীত বহুল লোকসংস্কৃতির মধ্যে আবার গান ও সংলাপ মিশ্রিত লোকনাট্য চালু আছে। যেমন রামায়ণ গান, চণ্ডী গান, কৃষ্ণযাত্রা। এ ছাড়াও ফকিরের গান, রামপ্রসাদী, ভাণ্ডাকীর্তন। এ ছাড়া গম্ভীরা—আলকাপ এগুলি অদ্যাবধি আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতি হিসেবে খুবই জনপ্রিয়।

॥ কৃষ্ণযাত্রা ॥

এই পালা জটিলতা মুক্ত খুব ছোট ছোট ঘটনা নিয়ে লেখা। রাধা, কৃষ্ণ, বৃন্দা মূলত এই প্রধান তিনটি চরিত্র উপজীব্য। এতে গান, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা দিয়ে পরিবেশিত হয়।

কৃষ্ণযাত্রায় যেমন দীর্ঘ মহড়ার প্রয়োজন হয় না, তেমনি ঝলমলে পোশাকে-রূপসজ্জাতে পয়সা বেশি খরচ হয় না। এই পালার পূর্ণাঙ্গরূপ আসরে হাজির করার প্রয়োজন হয় না। মুদ্রিত বা অমুদ্রিত পৌরাণিক পালা থেকে খণ্ড খণ্ড অংশ বেছে নিয়েও পালা উপস্থাপিত করা যায়।

এই কৃষ্ণযাত্রা রচনা করেছেন অঘোর চক্রবর্তী, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমূখ পালাকারেরা, তার মধ্যে যাঁর খ্যাতি বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল তিনি হলেন গোবিন্দ অধিকারী।

পল্লীগ্রামে যে সব বিখ্যাত পালাগুলি থেকে 'কৃষ্ণযাত্রা'র মত সাজিয়ে নিয়ে এক সময় পল্লীবাসীদের মন আলোড়িত করা হয়েছিল, সেই পালাগুলি হলো ঃ ননীচোরা, নৌকা-বিলাস, মানভঞ্জন, মাথুর, কৃষ্ণকালী, প্রভাস মিলন, কালীয়দমন, গোষ্ঠবিহার, রামলীলা, সুবল মিলন, 'অক্রুর সংবাদ', ইত্যাদি। এ দেশে এই কৃষ্ণযাত্রা বা চণ্ডীযাত্রাই নয়, হরেক রকম যাত্রার প্রচলন ছিল এক সময়ে। যেমন,—

॥ কুশান যাত্রা ॥ জাগের যাত্রা বা জাগের গান ॥

কুচবিহার জেলার দিনহাটা, মাতাল হাটা, মাথা ভাঙ্গা, ভোগরামগুড়ি, বলরামপুর ইত্যাদি অঞ্চলে যেমন 'কুশান যাত্রা', তেমনি এই জেলার বিভিন্ন গ্রামে জাগের যাত্রা বা "জাগের গান" খুবই বিখ্যাত ও আদরণীয়। রামায়ণ-এর লবকুশকে নিয়ে মূলত 'কুশান যাত্রা'। আঞ্চলিক ভাষায় এই যাত্রার ছড়া বা গানের কথাগুলি লেখা বা পরিবেশিত হয়ে থাকে। স্থানীয় পল্লী সুরে গান গাওয়া হয়। মূল গায়ক সঙ্গে নেন কিছু যন্ত্রীকে আর দোহার। এতে নাচ থাকে। এতে কুচবিহারের নিজস্ব বাদ্যযন্ত্র 'বেনা' বাজানো হয়। এটি তারের যন্ত্র, ছড় দিয়ে বাজানো হয়। এই 'বেনা' ছাড়া কুশান গান হয় না। তেমনি 'কুপা বাঁশি' ছাড়া 'বিষহরির গান'ও হয় না। বাঁশ দিয়ে কুচবিহারের অনেক মানুষ এই বাঁশি তৈরি করেন। কুচবিহারের বিশেষ আদরের জিনিস এই 'কুপা বাঁশি'। বিষহরির গানের বিষয়, বেহুলা লখিন্দর আর মনসার কাহিনী থেকে নেওয়া।

॥ পালাটিয়া যাত্রা ॥

জলপাইগুড়ি আর কুচবিহারের আর এক আঞ্চলিক যাত্রা হলো পালাটিয়া। এর প্রতিপাদ্য বিষয় রূপকথা, কিংবদন্তীর গল্প আর সামাজিক ঘটনা। এতে নাচ-গানের মধ্যে সংলাপও থাকে। প্রতিটি 'পালাটিয়া যাত্রা'র শেষে যে মূল বক্তব্য ফুটে ওঠে তা হলো, অন্যায়ের শাস্তি, ধর্মের জয়-অধর্মের পরাজয়। জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি ও পাহাড়পুরে এই যাত্রা খুবই প্রচলিত। কুচবিহার জেলার দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা আর হলদিবাড়িতে পালাটিয়া যাত্রার খুব প্রচলন। যে পালাটিয়াতে নীতিমূলক কাহিনী থাকে তাকে বলা হয় "মান পালাটিয়া"।

॥ লেটোর যাত্রা ॥

বীরভূম, বর্ধমান ও হাওড়া জেলার বিশেষ কতকগুলি অঞ্চলে এই লেটোর যাত্রা খুবই জনপ্রিয়। গ্রামে মাঝে মাঝে যে সব ছোটখাট ঘটনা ঘটে সেই সব ঘটনাকে নিয়ে তাতে নাচ-গান-কৌতুক মিশিয়ে পরিবেশন করা হয়।

গ্রামের অশিক্ষিত-অতি সাধারণ সম্প্রদায়ের মধ্যে এই লেটোর যাত্রার চাহিদা বলে, এগুলি সাধারণত কোন মেলা বা বাজারে পরিবেশিত হয়। এক সময়ে এ গুলিতে নাচ-গান অশ্লীলতা খুব ছিল, এখন অনেকটা শুধরে নেওয়া হচ্ছে। বছর কয়েক আগে পর্যন্ত হাওড়া জেলার আব্‌দুল মজিদের দল আর বর্ধমান জেলার মেমারি-ভাণ্ডারবাটীর বড়কর্তার দল পশ্চিমবঙ্গের বহু জায়গায় টাকা নিয়ে লেটোর যাত্রা পরিবেশন করে বেড়াত।

॥ খনের গান ॥

উত্তরবঙ্গের রংপুর আর দিনাজপুরের বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রাম বা পল্লীর সাময়িক ঘটনা নিয়ে ছোট ছোট পালা তৈরি হয়, তাকে বলে খনের গান। এ সব পালায় গানের প্রাধান্য বেশি থাকে।

॥ গম্ভীরা ॥

১৯১৮ সালে বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট্ গেজেটিয়ার-মালদা ; থেকে এই 'গম্ভীরা' যে কত প্রাচীন আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতি সে প্রসঙ্গে স্পষ্ট একটা ছবি পাওয়া যায়—

> "As now celebrated in this district, a Shamiana or a hut open On three sides is put up and an image of Siva (Mahadeb) installed, before which there are dancing, Singing, masquarading and general meriment."

বোঝা যাচ্ছে 'গম্ভীরা' মূলত যাকে যাত্রা বলে তা নয়, এটি শিব মাহাত্ম্যমূলক এক ধরনের আঞ্চলিক সঙ্গীত-নৃত্যবহুল অনুষ্ঠান। এখানে যে শিবের কথা বলা হয়েছে তা কিন্তু দেবাদিদেব মহেশ্বর বা শিব নন। ইনি হলেন পল্লীর চাষ-ফসলের দেবতা শিব। অথচ এই শিবের রূপসজ্জা অনেকটা পুরাণের শিবকে মনে রেখেই করা হয়। এই গানের যিনি নায়ক বা হিরো অথবা নেতা তাকে বলা হয় "বালা"। চৈত্র থেকে আরম্ভ করে বৈশাখ পর্যন্ত গম্ভীরা গান হয়। এতে বিভিন্ন দেব-দেবীর রূপসজ্জা নিয়েই গ্রামের উৎসাহী লোকেরা আসরে নামেন। এই গম্ভীরায় ধর্ম, সমাজ আর রাজনীতি প্রতিফলিত হয়। এমন ভাবে গম্ভীরা আসরস্থ হয় যা দেখলে নাটকের অনেক লক্ষণই আছে বোঝা যায়। উত্তরবঙ্গের মালদায় এই গম্ভীরা আজও জনপ্রিয়।

মূলত মালদার আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতির আর এক অঙ্গ। পশ্চিম দিনাজপুরেও 'গম্ভীরা' প্রচলিত। আলকাপ বা আলকাটা কাপ বা ছ্যাঁচড়া।

ভারতচন্দ্র রঙ্গরস অর্থে কাপ (কপটাচারী) শব্দ ব্যবহার করেছেন। আদিরস আর রঙ্গরস ছাড়া আলকাপ হয় না। এটি পাঁচমিশালী নাচ-গান। বীরভূমে এই আলকাপকে বলা হয় 'ছ্যাঁচড়া'। বীরভূম, মুর্শিদাবাদে এই 'আলকাপ' বা 'ছ্যাঁচড়া'র খুব প্রচলন। একক ভাবে কোন দল গাইতে পারে, আবার এক আসরে দুটি দল কবি গানের মত দু'দলে বিভক্ত হয়ে প্রশ্ন আর জবাবের ভিতর দিয়ে এই গান করে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পৌরাণিক বিষয় থাকে। মূলত কৃষ্ণ বিষয়ক আলকাপের জনপ্রিয়তা বেশি। এই আলকাপে 'সঙ্' থাকে। এই 'সঙ' যিনি পরিচালনা করেন তাঁকে বলা হয় 'সঙ্ মাষ্টার'। এতেও নাট্যলক্ষণ দেখা যায়।

॥ টনসার যাত্রা ॥

আমার এই গ্রন্থ রচনার প্রথম পর্বে আমি একবার টনসার কথা শুনেছিলাম শিব ভট্টাচার্যের মুখে। পরবর্তী সময়ে সেই টনসার গানকে জানার অদম্য কৌতূহল থেকেই আবার ফিরে এলাম

টনসার কথায়। 'টনসার যাত্রা' অতি প্রাচীন না হলেও অতি পুরাতন হয়েও এই শতকের পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত এর অস্তিত্ব ছিল। অস্তিত্ব ছিল এই কারণে বলা যায়, আজকের অনেক প্রতিষ্ঠিত যাত্রার মালিক ও অভিনেতা এক সময়ে প্রথম জীবনে 'টনসার যাত্রা' করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

টনসার যাত্রা প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গের এক লোকঅনুষ্ঠান।

রামায়ণের কাহিনী নিয়ে এর অস্তিত্ব। মাঝে মধ্যে যে কৃষ্ণ কাহিনী বা কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাহিনী টনসার উপজীব্য তা অস্বীকার করা যায় না। 'টনসা যাত্রা'র কোন পাণ্ডুলিপি হয় না, অর্থাৎ এটি পালা আকারে লিখে, রিহার্সাল দিয়ে আসরে হাজির করা হয় না। প্রধানতঃ রামায়ণের খুব চলতি অংশ মনে রেখে, তাতে উপস্থিত বুদ্ধি ও চেতনা মত সংলাপ বলে দর্শকদের শোনাতে হয়। অত্যন্ত প্রচলিত ঘটনা নিয়ে টনসা যাত্রা হতো বলে এতে সংলাপ বানিয়ে বানিয়ে তখনই বলে যাওয়ার মধ্যে কোন অসুবিধা বোধ হত না। গান-নাচ এতে থাকেই। হারমোনিয়াম, ঢোল, তবলা, করতাল এই সব যন্ত্র দলের সঙ্গে রাখা হতো। ব্যবহার করা হতো। মাঝে মাঝে বাঁশিও থাকত।

উপস্থাপনার বর্ণনা ঃ মাঝখানে আসর। প্রায় চারদিকে লোক। আসরে বাদ্যযন্ত্র বেশ কিছুক্ষণ বাজার পর আসরে আসবেন চামর হাতে অধিকারী। তিনি বেশ কিছুক্ষণ ধরে বন্দনা গান গেয়ে চলে যাবার পর যাত্রা আরম্ভ হয়। মাঝে মাঝে স্বয়ং অধিকারী একটা থালা হাতে নিয়ে দর্শকদের ভিতর থেকে 'পেলা' চান, আবার অনেক সময় অধিকারী নিজে থালা হাতে না এসে অন্য অভিনেতাকে পাঠান।

এই টনসা যাত্রায় রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, হনুমান যে ফুলের মালা পরত পালা শেষে সেই মালার 'ডাক' হতো। আসলে নিলাম করার মত। যে বেশি ডাক দেবে, সে-ই বেশি পয়সা দিয়ে মালাটি কিনবে। টনসা যাত্রার এই মালা আট আনা থেকে দশ-পনের টাকাতে বিক্রি হতে দেখা যেত। উত্তর কলকাতার মুরারীমোহন দে, নন্দলাল দে, মধ্য কলকাতার দুখীরাম হাজরা, পাথুরেঘাটার শক্তিপদ রায় এঁদের টনসা যাত্রার দল ছিল। এই দল পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বায়না নিয়ে টনসার যাত্রা করত। এই সব বায়না আনার জন্য দালালও ছিল। বায়নার টাকা শিল্পীরা সমভাগে ভাগ করে নিয়ে বাকি অংশ অধিকারীকে দিতেন। অনেক সময় দৈনিক চুক্তিতে শিল্পীরা কাজ করতেন। তখন মাইনের প্রচলন ছিল না। বলা হতো ঠিকে পার্টী।

'টনসা' শব্দের উৎপত্তি প্রসঙ্গে নির্দিষ্ট কোন ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ মেলে না। স্বনামধন্য ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ থেকে দুলাল চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার অনেকেই টনসা যাত্রা করেছিলেন। ফণিবাবুর মতে, অতীতে যাত্রাগান হতো Script ধরে। তার চলতি নাম ছিল "সাট"। এই টনসায় 'তা' ছিল না বলে এটা "আনসাট"। পরবর্তী সময়ে লোকমুখে বিকৃত হতে হতে টনসা। আনসাট, টানসাট, টানসা ইত্যাদি থেকে টনসা বলে ফণিবাবুর ধারণা।

॥ খ্রীষ্টপালা বা খ্রীষ্টযাত্রা ॥

পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গ্রাম্যরীতি আশ্রিত ধর্মভিত্তিক একরকম প্রাচীন নাটক। শুধু কলকাতা নয় গ্রামে-গ্রামান্তরে খৃষ্টান অধ্যুষিত অঞ্চলে এই ধরনের নাট্যাভিনয় এক সময় খুবই প্রচলিত ছিল। প্রধানতঃ চার্চ বা সানডে স্কুলকে কেন্দ্র করে এর প্রচার ছিল। সম্প্রতি আঞ্চলিক যুবকরা নতুন ভাবে ও আঙ্গিকে এই নাটক করে থাকে।

এ দেশে খ্রীষ্টান মিশনারীরা যখন থেকে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে শুরু করেন মূলতঃ তখনই এই খ্রীষ্টযাত্রার উৎপত্তি। অবশ্য অন্য সব যাত্রা বা পালাভিনয়, পালাগান বা গীতাভিনয়ের মত এর ব্যাপকতা আসেনি। বছর কয়েক আগে পর্যন্ত খ্রীষ্টান মিশন স্কুলগুলিতে এই ধরনের যাত্রা হতো। এই পালার বিষয় ছিল যীশুখ্রীষ্টের জীবনের দুটি দিক নির্ভর। প্রথম, তাঁর জন্ম কাহিনী অবলম্বনে

নেটিভিটি প্লে। এতে খ্রীষ্টের জন্ম প্রসঙ্গে দৈববাণী, যোশেফ ও মেরীর পরিচয়, শিশু হত্যা, শিশু যীশুর জন্ম, প্রাচ্যদেশীয় পন্ডিতদের উপস্থিতি, যীশুর মা-বাবার দেশত্যাগ উপস্থাপিত হতো।

এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্ট রূপক কবিতা "শিশুতীর্থ"। দ্বিতীয়, যীশুর ক্রুশারোহণে মৃত্যু এবং পুনরুত্থানকালীন ঘটনা। এটি প্যাশন প্লে।

এ দেশের প্রাচীন লোকনাট্য বা লোকসংস্কৃতির রীতি এই খ্রীষ্টপালাকে প্রভাবিত করেছিল। এগুলি ছিল গীতিবহুল। মরালিটি প্লে বলতে যে পূণ্য চরিত্রের জীবন নাটক বোঝায় এগুলিও ছিল তেমনি। তবে প্রথম প্রকরণ বা অংশ যীশুর জন্মদিনে অর্থাৎ বড়দিনের সময় আর দ্বিতীয় প্রকরণ বা অংশ তাঁর মৃত্যু বা গুডফ্রাইডে উপলক্ষে অভিনীত হতো।—[অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটর্স প্রকাশিত "লোকসংস্কৃতি কোষ" থেকে নেওয়া]।

॥ সংবাদপত্রে সেকালের সখের যাত্রার কথা ॥

১৮২২ সালের ৪ মে তারিখে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার পাতায় কলকাতার ধনী ও শিক্ষিত মানুষের মধ্যে যাত্রা কালচারের যে সংবাদ বেরিয়েছিল তা থেকে প্রমাণিত হয় যে ১৮২২ সাল থেকে কলকাতা তথা গোটা বঙ্গদেশেই এই যাত্রা কালচারের প্রসার ঘটতে শুরু করে। ৪ মে তারিখে সমাচার দর্পণ লিখল ঃ

"কলিকাতার দক্ষিণ ভবানীপুর গ্রামের অনেক ভাগ্যবান বিচক্ষণ লোক একত্র হইয়া 'নল-দময়ন্তীর সং ও হংসদূতের সং ইত্যাদি নানাবিধ সং আইসে এবং নানা প্রকার রাগ-রাগিণী সংযুক্ত গান হয় ও বাদ্য নৃত্য এবং গ্রন্থ মতো পরস্পর কথোপকথনএ অতি চমৎকার ব্যাপার সৃষ্টি হওয়াতে বিস্তর টাকা চাঁদা করিয়া ঐ সুরসিক ব্যক্তিরা ব্যয় করিয়াছেন। ঐ যাত্রা প্রথমে ঐ ভবানীপুরে গঙ্গারাম মুখোপাধ্যায়ের দং বাটীতে গত ২৩শে আষাঢ় শনিবার রাত্রিতে প্রকাশ হইয়াছে—" এই 'নল দময়ন্তী' যাত্রা স্থায়ীত্ব লাভ করেছিল।

* * * * *

১৮২৬ সাল। কলকাতার বাবুরা যখন সখের যাত্রা নিয়ে চারদিকে বেশ মাতামাতি করছিলেন তখনই **মণিপুরের মেয়ে-যাত্রার দল** কলকাতায় এসে একটা ঝড়ের মত সবাইকে মাতিয়ে দিয়ে গেল। যখন যাত্রা দেখা মেয়েদের পক্ষে পাপ-তুল্য ছিল, তখনই আসরে আসরে মেয়েরাই রং মেখে নেমে পড়েছেন, এটা কম বড় খবর নয়। এই যে মণিপুর থেকে আসা 'মেয়ে-যাত্রার দল', যতদূর মনে হয় এইটিই প্রথম! এই প্রসঙ্গে ১৮২৬ সালের ১৯ আগষ্ট, বাংলা ১২৩৩ সনের ৪ ভাদ্র তারিখে 'সমাচার দর্পণ' লিখল ঃ"......মণিপুরের এক সম্প্রদায় যাত্রা-ওয়ালা সম্প্রতি আসিয়াছে। ইহারা এই কলিকাতার মধ্যে কোন ২ স্থানে যাত্রা করিয়াছে কেহ ২ দেখিয়া থাকিবেন। সম্প্রতি ২৯শে শ্রাবণ শনিবার রাত্রিতে কলুটোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত মতিলাল শীলের বৈঠকখানায় ঐ যাত্রা হইয়াছিল—"

"সমাচার দর্পণ" এই নারী সম্প্রদায় প্রসঙ্গে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছিল তার একটা অংশ এখানে তুলে দেওয়া যাক।—

"আশ্চর্য সম্প্রদায় এই স্ত্রীলোকের দল।
স্ত্রীলোকেতে কৃষ্ণ সাজি করয়ে কৌশল।।
ললিতা বিসাখা চিত্রা আর রঙ্গদেবী।
সুদেবী চম্পকলতা তৎ বিদ্যাদেবী।।
ইন্দুরেখা সাজি সবে রামলীলা করে।
পুরুষে বাজয়ে বাদ্য নারী তাল ধরে।।
কৃষ্ণের সহিত রঙ্গ করয়ে রসিকা।

রসিকার রূপ শুন নাহিক নাসিকা।।
গুণবতী দিগের গুণ অতি উচ্চস্বরা।
শুনিলে যে মিষ্টস্বর না যায় পাসরা।।
বাদ্য তালে নৃত্য বটে কিন্তু লম্ফ ঝম্ফ ।।
গান করে জয়দেব মুদ্রা তার কম্প।।"

সমাচার দর্পণের এই মন্তব্য বা সমালোচনা থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ঐ মেয়ে যাত্রার দল 'কৃষ্ণযাত্রা'ই আসরস্থ করত, এবং পাত্র-পাত্রীরা প্রধানতঃ মণিপুরের অধিবাসী, সেই কারণেই মেয়েদের নাকগুলি ছিল বসা। আসরের শেষ সারির শ্রোতা ও দর্শকদের ছাপিয়ে কণ্ঠস্বরকে আরও দূরে পৌঁছে দেবার জন্য যাত্রায় উচ্চস্বর ব্যবহারের প্রথা তখন আরও প্রকট। যাত্রায় যে মোটা দাগের অভিনয় আবহমানকাল থেকে চলে আসছে তার কারণও এটি।

১৮২৭ সাল। এই সময়কালে একদিকে যেমন 'কালীয়দমন', 'নল-দময়ন্তী', 'কৃষ্ণযাত্রা', ইত্যাদি যাত্রার রমরমা অবস্থা চলছে, তেমনি অন্যদিকে আর এক ধরনের যাত্রার আবির্ভাব ঘটেছিল। সেটি হলো, **'রাজা বিক্রমাদিত্যের যাত্রা'**। ১৮২৭ সালে ৫ মে তারিখে 'সমাচার দর্পণ' কাগজে এই 'রাজা বিক্রমাদিত্যের যাত্রা'র চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়। 'সমাচার দর্পণ' লিখছে ঃ "গত ২রা বৈশাখ শনিবার রাত্রিতে শ্রীযুত বাবু জগমোহন মল্লিকের কালু ঘোষের দরুণ বাগান বাড়ীতে 'রাজা বিক্রমাদিত্যের যাত্রা' হইয়াছিল। এ যাত্রার সম্প্রদায় সম্প্রতি প্রস্তুত হইয়াছে। শুনা গিয়াছে যে জোড়াসাঁকো নিবাসী কতকগুলি রসিক গুণী এবং ভদ্রলোকের সন্তান একত্র হইয়া সোয়াক করিয়া এই ব্যাপার করিয়াছেন। চারি পাঁচ স্থানে ইহার আমোদ-প্রমোদ হইয়াছিল......রাজা বিক্রমাদিত্যের অষ্ট সিদ্ধির প্রকরণ যাত্রার সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষায় পুস্তক প্রকাশ আছে। সেই পদ্ধতি মত রাজা অমাত্য লইয়া সভায় আছেন এমতকালে একটা রাক্ষস তিনটি শবের মস্তক হস্তে করিয়া রাজসভায় উপনীত হওত জিজ্ঞাসা করে ইহার মধ্যে উত্তম মধ্যমাধম কহিয়া দেও। রাজা পণ্ডিতবর্গকে তাহার উত্তর করিতে অনুমতি দেন ইত্যাদি। ইহাতে নানা প্রকার সং অতি সুসজ্জিত হইয়া আইসে এবং ব্যক্তি বিশেষের সং আসিয়া প্রথমত নানা রাগ-রাগিনীযুক্ত সুস্বরে গান করে। এই সকল শ্রবণ দর্শন করিয়া তাবৎ লোক হায় হায় ধ্বনি করিয়াছিলেন—"

॥ রাম বসু ॥

এবার রাম বসুর কথা বিস্তারিত বলা দরকার।

১৭৮৬ সালে হাওড়া জেলার শালকেতে রবিলোচন বসুর ছেলে রাম বসুর জন্ম। নিতান্ত ছেলেবেলা থেকেই কবিতা লেখার দিকে রাম বসুর ঝোঁক তীব্র ছিল। প্রথমে তিনি ভবানী বেনে, নীলু ঠাকুর এই সব কবিয়ালদের দলে গান লিখতেন, গান করতেন। পরে নিজেই দল তৈরি করেছিলেন। কৃষ্ণ ও শ্যামা বিষয়ক গান রচনার জন্যই তাঁর খ্যাতি। বিরহের বর্ণনা তাঁর লেখায় অসামান্য হয়ে উঠতো। লহরা রচনাতেও রাম বসুর তুলনা মেলা ভার ছিল। ১৮২৮ সালে রাম বসুর মৃত্যু হয়।

রাম বসুর কথা বলতে গেলে যজ্ঞেশ্বরীর কথা এসে যায়। তেমনি টপ্পা রাজা নিধু বাবুর নামের সঙ্গেও জড়িয়ে ছিল আর একটি নাম, শ্রীমতী ; আবার দাশরথি রায়ের কথা সম্পূর্ণ হয় না, যদি অকাবাই বাদ যায়। বাংলার লোকগাথায় যাঁরা স্মরণীয়, যুগে যুগে দেখা গেছে তাঁদের কর্ম ও সাধন জীবনের প্রেরণা নারী। অথচ এই শ্রীমতী, যজ্ঞেশ্বরী কিংবা অকাবাঈ এঁদের কথা মনে রাখেনি কেউ। ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য ব্যতিক্রম। অসিতবাবু তাঁর একটি বইতে এই তিন রমণীর যে ছবি এঁকেছেন তা তুলনাহীন। আমি ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সূত্র অনুসরণ করে এই

তিন রমণীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেই এখানে তাঁদের ছবি আবার নতুন করে এঁকে দিলাম। তাই রাম বসুর কথা একটু বলতে গিয়ে যজ্ঞেশ্বরীর কথা বলা যাক।

॥ রামবসু ও যজ্ঞেশ্বরী ॥

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে যখন কলকাতায় রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, ডিরোজিও'র শিষ্যানুশিষ্য হিন্দু কলেজের নবীন পড়ুয়ারা মিলে সামাজিক স্তরে নানা ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাচ্ছিলেন তখন এখানে অর্থাৎ কলকাতায় স্ত্রী শিক্ষার কোন আন্দোলনই দানা বেঁধে ওঠেনি। এই সময় কলকাতার সাধারণ সমাজে রাম বসুর দলের কবি গান জমজমাট হয়েছিল। এই সময়ে দু'চার জন মেয়ে কবিয়ালও ছিলেন যাঁরা পুরুষ কবিয়ালদের চাইতে বিন্দুমাত্র কম যেতেন না। এঁদের মধ্যে যজ্ঞেশ্বরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবির দল চালাতে গিয়ে এই যজ্ঞেশ্বরীর সঙ্গে রাম বসুর পরিচয় হয়, পরে ঘনিষ্ঠতা। এই মহিলা কবিয়ালেরও কোন বংশগত পরিচয় পাওয়া যায় না।

যজ্ঞেশ্বরী কবি গানে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। যেমন ছিল তাঁর গায়কী ঢং, মিষ্টি গলা, তেমনি তিনি গান রচনাতেও পারদর্শিনী ছিলেন। যজ্ঞেশ্বরী কেমন করে, কার কাছে কবিগান শিখেছিলেন তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হলো তিনি কবিগান রচনা করতেন প্রথম থেকেই। বিখ্যাত কবিওয়ালা নীলু ঠাকুরের দলে যজ্ঞেশ্বরীর লেখা অনেক গান গীত হতো, রাম বসুও প্রথম জীবনে এই দলে গান বেঁধে দিতেন। মনে হয় সেই সূত্রেই যজ্ঞেশ্বরীর সঙ্গে রাম বসুর পরিচয়। যজ্ঞেশ্বরীর আবির্ভাবের সময়ে এ দেশে কিছুটা স্ত্রী শিক্ষা চালু হয়েছিল। খড়দার "মা-গোঁসাই"রা অর্থাৎ বৈষ্ণবীরা কলকাতার ধনী সমাজে যাতায়াত করতেন এবং তাঁদের বাড়ির মেয়েদের তাঁরা সামান্য লেখাপড়া শেখাতেন। যুগ আরও একটু এগুলে পুরুষ সমাজে ইংরেজি বিদ্যা ও ইংরেজি ভাষার ব্যবহার চলতে আরম্ভ করলে, কোন কোন প্রগতিশীল ও ধনাঢ্য পরিবারে 'মিসি বাবা' বা খৃষ্টান 'ভগিনী'রা যাতায়াত শুরু করেন, তাঁদের মাধ্যমে শহর জীবনে স্ত্রী সমাজে সামান্য হলেও ইংরেজি ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু কবি গানের জটিলতাকে অনুসরণ করে গান লেখার যে কলাকৌশল বা মুন্সিয়ানা তা আয়ত্ব করার মত বিদ্যাবুদ্ধি যে যজ্ঞেশ্বরী কেমন করে পেয়েছিলেন সে প্রসঙ্গে কেউ কোন আলোকপাতে করেছেন কি না জানা যায়নি।

যজ্ঞেশ্বরীর লেখা কিছু কবিগান পুরাতন কবিগান সংগ্রহে পাওয়া যায় মাত্র, কিন্তু গায়িকা বা রচয়িতা প্রসঙ্গে বিস্তারিত কিছু পাওয়া যায় না। যজ্ঞেশ্বরীর অনেক গানের মধ্যে "অনেক দিনের পরে সখা" গানটি রাম বসুর দলে গাওয়া হতো। টপ্পার জনক কবি গোলাম নবী তাঁর অনেক গানে নিজের নাম গোপন করে স্ত্রী শোরির নামে ভণিতা দিতেন।

'শোরি মিঞা' এই ভণিতায় তাঁর বেশির ভাগ টপ্পা জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। 'শোরি' হলেন কবি গোলাম নবীর প্রণয়িনী আর 'মিঞা' হলেন স্বয়ং নবী। এই অনন্ত প্রেমের ধারাটি পরবর্তী সময়ে রাম বসুর কবিগানের ধারায় মিশেছিল তা মনে হয়, যখন দেখি যজ্ঞেশ্বরীর নামে প্রচলিত অনেক গানই রাম বসু কৃত। যা হোক এখানে যজ্ঞেশ্বরীর লেখা গানের নমুনা একটু দিয়ে রাখি ঃ

"কর্মক্রমে আশ্রমে সখা হলে যদি অধিষ্ঠান
হেরে মুখ, গেল দুখ, দুটো কথার কথা বলি প্রাণ।
আমায় বন্দী করে প্রেমে, এখন ক্ষান্ত হলে হে
ক্রমে ক্রমে
দিয়ে জলাঞ্জলি আশ্রমে।।
আমি কুলবতী নারী জাতি বই জানিনে,
এখন অধিনী বলিয়া ফিরে নাই চাও।

ঘরের ধন ফেলে প্রাণ, পরের ধন আগুলে বেড়াও।
নাই কোন ঘর-বাসা, কি বসন্ত কি বরষা
সতীরে করি নিরাশ, অসতীর আশা পুরাও।
রাজ্যে থেকে ভার্য্যের প্রতি কার্যে না কুলাও।।
তোমার মন ছিল বার বাগে, গেল জন্মটাই পোড়া রোগে,
আমার সঙ্গে দেখা দৈবার্থযোগে
কথা কহিছ আমার সনে, মন রয়েছে সেখানে প্রাণ,
মনে কর সখা, পাখা হলে উড়ে যাও—"

যজ্ঞেশ্বরীর পরিচয় পাওয়া যায় না, কিন্তু যজ্ঞেশ্বরী কি এই গানের ভিতর দিয়েই তাঁর আত্মপরিচয় রেখে যেতে চেয়েছিলেন? কী ভীষণ অভিমান এই গানের মধ্যে ঝরেছে তা উপলব্ধি করা কষ্টকর নয়। এমনকি উচ্চকুল কন্যার মনের ধিক্কারও বর্ষিত হয়েছে এর মধ্যে। মনে হয় তৎকালীন কোন গৃহবধূর নির্যাতিত জীবনের বেদনা এখানে উৎসারিত।

যজ্ঞেশ্বরী শুধু গান রচনা করেননি ; তিনি মল্লের বেশে পুরুষ কবিয়ালদেরও কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। এক সময়ে যজ্ঞেশ্বরী নিজের দল তৈরি করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কবিয়াল ভোলা ময়রার লড়াই তো ঐতিহাসিক ঘটনা!

একবার এক আসরে ছিল ভোলা ময়রার সঙ্গে যজ্ঞেশ্বরীর লড়াই। রণাঙ্গনের বহু কীর্তিমান বীর ভোলার সঙ্গে। গানের গালাগালি আর খেউড়ে যজ্ঞেশ্বরীর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী এটাই ছিল সকলের বিশ্বাস। বিশেষ করে কবির লহর আর খেউড়ের মাধ্যমে কাদা ছোড়াছুড়ির বিলাস চলত যেখানে সেখানে যজ্ঞেশ্বরীর মত স্ত্রীলোকের লজ্জা থেকে মুক্তি নেবার সম্ভাবনাই ছিল বেশি।

প্রথমেই যজ্ঞেশ্বরী কোণঠাসা হয়ে পড়লেন এবং বুঝলেন এই কর্দম যমুনায় স্নান করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। পরাজিত হলেন। বিজয়ী ভোলা তাঁকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করার আঘাতে কাবু করে চেয়েছিলেন রাম বসুকে ঘায়েল করতে। নিরুপায় যজ্ঞেশ্বরী ভোলাকে 'মহাদেব' আখ্যা দিয়ে একটু তোয়াজ করেছিলেন। ভোলা ময়রাও তাঁকে "জননী" এবং রাম বসুকে "পিতা" সম্বোধন করে ছড়া ফেঁদে তাঁর সঙ্গে রাম বসুর সম্পর্ক নিয়ে শেষ পর্যন্ত কুৎসিত কুৎসার অবতারণা করেছিলেন। সেই ছড়াটির নমুনা ঃ

"তুমি তো যজ্ঞেশ্বরী সর্ব কার্যে শুভ করি
তোমার ঐ পুরানো এঁড়ে রাম বোস বাপ
যেমনি পিতা তেমনি মাতা ভোলানাথের আশ্রয় দাতা
মা বাপ ঠিক লাগিয়ে দিলে—
এখন মা শুধাই তোরে, কেন বল এই আসরে
ঘন ঘন দিচ্ছ জোরে ডাক।
বুঝি তোমার হয়েছে কাল, বেহায়ার নাই কালাকাল
তাই বাবুদের সভায় এত হাঁক।
তোমার পুত্র ভোলানাথ গুণধর সকল কাজেই অগ্রসর
পঞ্চপিতা সপ্ত মাতা শাস্ত্রে শুনতে পাই
তুমি আমার গাভী মাতা........"

যজ্ঞেশ্বরীকে কিছু বলতে ছাড়েননি ভোলানাথ। যেমন বলেছেন 'গাভী', তেমনি রাম বসুকে জড়িয়ে কুৎসিত ইংগিত করেছেন। এর উত্তরে (উত্তরে বলা সঙ্গত) যজ্ঞেশ্বরী অনেক কথাই বলতে পারতেন, কিন্তু ভোলার মত কুকথায় কণ্ঠ ভরা বিষ নিয়ে তিনি জিততে চাননি।

অনাথকৃষ্ণ দেব তাঁর "বঙ্গের কবিতা"-য় যজ্ঞেশ্বরী প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ "রাম বসুর বিশেষ অনুগৃহীতা কোন রমনী বলিয়া প্রকাশ"।

॥ নিধুবাবু আর শ্রীমতী ॥

নিধুবাবু ছিলেন টপ্পা আর আখড়াই গানের রাজাধিরাজ। এই আমলের কলকাতার সমাজ-জীবনকে নিধুবাবু তাঁর গানের ভিতর দিয়ে অতি সুন্দর করে এঁকে গেছেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় নিধুবাবুর কথা স্পষ্ট করে যতটা লিখেছেন, তার পূর্ণতা এনে দিয়েছেন নিধুবাবুর মেজ ছেলে জয়গোপাল, তাঁর বাবার গীত সংকলন 'গীতরত্ন'-এর ২য় সংস্করণে। এটি প্রকাশিত হয় ১২৬৩ সনে। এই বইতে জয়গোপাল তাঁর বাবার অনেক কথা ব্যক্ত করেছেন অকপটে।

নিধুবাবু টপ্পা গানের প্রবর্তক বলে তাঁকে আধুনিক বাংলা লিরিকেরও আদি পুরুষ বলা যেতে পারে। শোভাবাজারের কাছে একখানা আটচালা ঘরে সন্ধ্যায় নিধুবাবু নিজের লেখা টপ্পা ও অন্যান্য গান নিজে চর্চা করতেন ও ছাত্রদের শেখাতেন। ধনী জমিদারও তাঁর গান শুনতে আসতেন। এই নিধুবাবুর একজন বিদ্যাধরী ছিলেন। নাম শ্রীমতী। শ্রীমতীর কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। ইনি কোন বংশে, কার ঔরসজাত সন্তান, তাঁর মা ও বাবা কে এর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। শ্রীমতী প্রসঙ্গে শুধু বলা যায়, তিনি যখন সবার চোখের সামনে আসেন তখন তিনি ছিলেন পূর্ণ যৌবনবতী ও অসামান্যা রূপসী। শুধু তাই নয়, শ্রীমতী ছিলেন সঙ্গীতে নিপুণা। যতদূর জানা যায় শ্রীমতী নিধুবাবুর সান্নিধ্যে আসার আগে ছিলেন একজন ধনী ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীলা। মহারাজ নন্দকুমারের ছেলে গুরুদাস রায় অপুত্রক ছিলেন বলে তাঁর ভাগ্নে মহারাজ মহানন্দ রায় মাতুলের বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। তিনি মুর্শিদাবাদে দেওয়ান ছিলেন। তিনি ছিলেন ধনকুবের। যে সময়ে কলকাতায় বেশ বড়লোকদের প্রসার ঘটতে আরম্ভ করেছিল, যখন কলকাতায় নানা দিক থেকে বিলাস সামগ্রী আর বিলাসিনীরা পণ্যের মত বিকিয়ে যাচ্ছিল অকাতরে, তখনই এর হাট থেকে মহারাজ মহানন্দ একজন রূপবিলাসিনীকে সংগ্রহ করেন, আর সেই রূপবিলাসিনী হলেন এই শ্রীমতী।

এক সময়ে শ্রীমতীর সঙ্গীত নৈপুণ্য নিধুবাবুকে আকৃষ্ট করে এবং ক্রমে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন। ব্যাপারটা যখন অনেকটা জানাজানি হয়ে গেল তখন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নিধুবাবুর সামনে না হলেও আড়ালে আবডালে অনেকেই নিন্দাবাদ করতেন। ব্যাপারটা মহারাজ মহানন্দ রায় কী ভাবে নিয়েছিলেন তা জানা যায় না। তবে তিনি যেহেতু মুর্শিদাবাদে বেশির ভাগ কাটাতেন, সেই হেতু এই ঘটনাকে নিয়ে এমন কিছু করেননি যা খবর হতে পারে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় বলেছিলেন—"শ্রীমতী নাম্নি এক রূপবতী-গুণবতী বুদ্ধিশালিনী বারাঙ্গানা ছিল, ঐ বারবিলাসিনী রামনিধিবাবুকে অন্তকরণের সহিত ভালবাসিত ও অতিশয় স্নেহ করিত এবং বাবু (অর্থাৎ নিধুবাবু) তাঁহাকে বিস্তর গৌরব ও সম্মান করিতেন।"—সাধারণ মানুষেরা শ্রীমতীর সঙ্গে নিধুবাবুর এই সম্পর্ক নিয়ে কানাকানি-কথা চালাচালি করলেও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কিন্তু নিধুবাবুকে লম্পট বা চরিত্রহীন বলেননি। শ্রীগুপ্ত বলেছেন ঃ "তিনি লম্পট ছিলেন না ; কেবল স্তুতি, বিনয়, স্নেহ এবং নির্মল প্রণয়ের বশ্য ছিলেন। এই প্রযুক্ত তাঁহাকে অতিশয় সাহায্য করিতেন, প্রায় প্রতি রজনীতেই তাহার গৃহে গমন করিতেন এবং কিয়ৎক্ষণ হাস্যপরিহাস, কাব্য আলাপ ও গীতবাদ্য করিয়া আসিতেন, আর সেখানে বসিয়া মনের মধ্যে যখন যেরূপ ভাবের উদয় হইত তৎক্ষণাৎ সুর বদ্ধ করিয়া তাহারই এক এক টপ্পা রচনা করিতেন—" মজার ব্যাপার হলো, এই নিধিরাম একবার দাশরথি রায়কে এক কবির আসরে, গানে গানে অপমান করেছিলেন। অপমানের কারণ ছিল অকাবাঈয়ের সঙ্গে দাশরথির সম্পর্ক এবং অকাবাঈয়ের জন্যই দাশরথি শুধু নিজের বংশের কুলে

কালি লাগাচ্ছিলেন শুধু না, তদানীন্তন সমাজের প্রতিও অশ্রদ্ধা জানাচ্ছিলেন। দাশু রায় বা দাশরথিকে নিধিরামের অপমানের নমুনা কিছুটা দিয়ে রাখি। সেই নিধু আসরে ধরলেন গান—

"শূদ্রের বিয়ের ঘটকালি, করিতে তুমি আজিকালি
যাওয়া আসা অক্ষয়া বাঈজীর বাড়ী।"
"হইয়া ব্রাহ্মণের ছেলে শুদ্ধকুলে কালি দিলে
কবির মুহুরী মাথায় বাঁধা ফোতা।
গায়ত্রী শিবপূজা সন্ধ্যা তোমার কাছে জন্ম বন্ধ্যা।"

* * * *

ভারি চাকরি হাতে কবির চোতা।।
কি বা মুখ কি বা পাগড়ি কবি গাহিতে রাঢ় বাগড়ী
যাও অক্ষয়ের পাছে পাছে।
আমি বটে যেতে শুঁড়ি খাই ভিজে চাল-মুড়ি
বিদ্যা ছড়াও আমারই কাছে।।"

এই লড়াই থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে অকাবাইয়ের আসল নাম অক্ষয়বাই। এবার সেই অক্ষয়বাই আর দাশরথি রায়ের কথা বলি।

॥ দাশরথি রায় আর অকাবাই ॥

দাশরথি ছিলেন পাঁচালি সম্রাট। দাশরথির আগে অবশ্য পাঁচালি গায়ক এবং পালাকার হিসেবে কলকাতায় বেশ পসার জমিয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস। আর গঙ্গাচরণ নস্কর। তবে যেদিন থেকে দাশরথি রায় আসরে অবতীর্ণ হলেন, তারপর থেকেই অনেক প্রতিভা ম্লান হয়ে গেল। এর মূলে দাশরথির প্রতিভা ও দক্ষতা তো ছিলই, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অকাবাইয়ের সঙ্গে দাশরথির প্রেম। দাশরথি আর অকাবাই এক সঙ্গে আসরে অবতীর্ণ হবার অর্থ সবার পরাজয় স্বীকার করে নেওয়া। তা ছাড়া অকাবাইয়ের রূপ আর গায়কি ঢং ছিল অতুলনীয়।

দেবীপ্রসাদ রায়ের ছেলে দাশরথি ১২১২ সনের মাঘ মাসে বর্ধমান জেলার কাটোয়ার পাঁচ মাইল পশ্চিমে বাঁধমুড়া গ্রামে জন্মান। দাশু রায়ের বাল্য ও যৌবনের প্রথম লগ্ন কেটে ছিল মাতুলালয়ে, শীলা গ্রামে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নীল কুঠিতে চাকরি করেন কিছু দিন। এই সময়ে অক্ষয়বাইয়ের সঙ্গে আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা। এই নীল কুঠিতে তখন নিম্ন শ্রেণীর মেয়েরা দিনের বেলায় কাটুনির কাজ করত আর রাত্রে কোম্পানির অভ্যাগতদের মনোরঞ্জন করত। এদের মধ্যে অক্ষয়বাইতিনী একজন। অনেকে মনে করেন চর্মকার শ্রেণী পরিবারে তাঁর জন্ম। যে সব চর্মকার ঢাক-ঢোল বাজায়-তৈরি করে-পল্লীবাসিরা তাদের বলে 'বাইতি'। স্বামী পরিত্যক্তা শ্যামাসুন্দরীর কালোরূপ অনেককেই আকৃষ্ট করত। পরে নীলকুঠির চাকরি ছেড়ে অক্ষয়বাই বা শ্যামাসুন্দরী নিজেই কবির দল তৈরি করেছিলেন। ওদিকে মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ সমাজের স্বাভাবিক জীবন ত্যাগ করে দাশু রায় যোগ দেন অকাবাইয়ের দলে। ঘনিষ্ঠতা হয়। অল্পদিনের মধ্যে তাঁরা স্বামী-স্ত্রীর মত আলাদা বসবাস করতে থাকেন। অবশেষে দাশু রায়কে নিয়ে কুৎসা রটল। লোকনিন্দা গায়ে মাখলেন না দাশরথি। এই ইতর রমণীর সঙ্গে বসবাস করতে করতে মর্যাদা হারালেন। অন্য কবির দলের দলপতিরা আড়ালে খোঁচা দিতে থাকল। তারা গাইতে লাগল—"উনি কুলের গরব করেন নিত্যি শুনে জ্বলে যায় পিত্তি।" তবুও দাশরথি হারিয়ে গেলেন অকার মধ্যে। অকাবাইও বোধ করি নারী জীবনকে ধন্য করার আকাঙ্খায় দাশু রায়কে জড়ালেন গভীর ভাবে।

একবার এক কবির আসরে প্রতিপক্ষ দাশরথিকে অতি কুৎসিতভাবে আক্রমণ করল। দাশরথি কিন্তু তখন সমাজ ছেড়েছেন, পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, স্ত্রীরূপে অকাকেই কাছে

রেখেছেন, তবুও কুলমর্যাদার উত্তাপ তাঁর ছিল বৈ কি। তার জন্যেই দাশরথি জ্বলে উঠলেন এবং তৎক্ষণাৎ অকাবাইকে ত্যাগ করলেন। অকার সব স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেল। কণ্ঠের গানও থেমে গেল চিরকালের জন্য। তাঁর বিদায় দৃশ্যটি 'কচ ও দেবযানী'র মত হুবহু এক না হলেও অনেকটাই এক হয়ে গেল। অকা চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বললেন—'তুমি তোমার ঘর-গৃহস্থালী-আত্মীয় স্বজন নিয়ে থাক, আমাকে আশীর্ব্বাদ কর—'

কাঁদতে কাঁদতে এক এক করে গায়ে যত রূপোর গয়না ছিল সব খুলে দাশুর পায়ের উপর রেখে তিনি প্রণাম করলেন—

এইবার দাশরথির দু'চোখও জলে চিক্ চিক্ করে উঠল। তিনি বললেন–, "অকা-বাড়ি যাবে, না বান্দমুড়ায় যাবে?"

অকা বলল,—'পাতাই হাটের ঘাটে জাহ্নবী নাইতে চললাম—'

দু'জনের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। বিস্মৃতির অতল গহ্বরে হারিয়ে গেল একটি প্রেম, একটি জীবন, একটি যুগের সুর আর গান! হায় হতভাগিনী অকাবাই!

এরপর দাশরথি রায় সংসার পেতেছিলেন। পাঁচালির দল করে খ্যাতির শিখরে পৌঁছেছিলেন। জাহ্নবীর জলরাশির সহস্র তরঙ্গ শুধু নিত্য খুঁজে মরে অকাবাইকে! দাশরথি রায় কৃষ্ণ বিষয়ক পালা গান লিখেছিলেন ৩০টি, রামচন্দ্র বিষয়ক ১০টি, শিব শক্তি বিষয়ক ১০টি এবং সামাজিক বিষয় নিয়ে ৯টি পালাগান, অজস্র পাঁচালি গান লিখেছিলেন। ১২৯৪ সনের ২ কার্তিক দাশরথি রায় মারা যান।

॥ গদাধরের যাত্রাভিনয় (শ্রীরামকৃষ্ণ) ও যাত্রার ভাব নির্ণয় ॥

সেইদিন মাটিতে হয়েছিল চাঁদের উদয়।

আচার্যের গৃহ অঙ্গনে যেদিন চৈতন্যের লীলাভিনয় দেখেছিলেন নগরবাসী সেদিন আকাশের চাঁদ নেমেছিল মাটিতে। নদের চাঁদের কী অপরূপ রূপ! সেই রূপ যাঁরা দেখেছিলেন তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন 'কৃষ্ণ নামে' কৃষ্ণপদে নদের চাঁদের আত্মনিবেদনের মহিমা। আসলে কৃষ্ণপদে আত্মনিবেদন নয়, কলাতন্ত্রের সার্থক রূপ বর্ণনা। স্পষ্ট দেখেছিলেন পালাগানে আছে মানবধর্ম পালনের বীজ। সেই বীজ রোপনের উৎসব পালিত হয়েছিল সেদিন আচার্যের অঙ্গনে। পালাগান সেদিন ছিল উপলক্ষ মাত্র। আসলে ছিল নগরবাসীদের অন্ধকার থেকে আলোয় বেরিয়ে আসার গান। ধর্মান্ধতা থেকে মুক্তি নেবার প্রেরণা। মুক্তি দেবার দীক্ষা দান......

তারপর আবার। বহু যুগের পর।

কামারপুকুরের বালক গদাধরের পালাগানে আত্মপ্রকাশ! পাইন বাড়ির অঙ্গনেও সেদিন নেমে এসেছিল আকাশের চাঁদ। চৈতন্যদেব যে বাসনার বীজ বপন করেছিলেন, তারই অঙ্কুর রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল গদাধরের শিবরূপের মধ্যে। এই শিবরূপই সেদিন বঙ্গদেশের নিজস্ব প্রাণের সম্পদ পালাগানের মধ্যে বোধ হয় সঞ্চারিত করেছিল সঙ্গীত-নৃত্য-নাট্যের সত্যম্-শিবম্-সুন্দরমের মন্ত্র।

যাত্রাকে আপন করে নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের যে কতটা ভালবেসেছিলেন তার হিসাব মেলাবার শক্তি কোথায়? হিসেবে কী ফল লাভ? বরং যাত্রার প্রতি পরমপুরুষের যে গভীর প্রীতি, আজকের স্বার্থপর যাত্রার যে জগত তার পক্ষ থেকে ঠাকুরের সেই যাত্রাপ্রীতিকে প্রণতি জানাবার এই সুবর্ণ সুযোগ। সেই সুযোগ নিতান্ত অবচেতন মনেই ধনাঢ্য সীতানাথ পাইনও নিয়েছিলেন। বোধকরি তিনিও উপলব্ধি করেছিলেন, যাত্রাগানের ভিতর দিয়ে ঈশ্বরের নাম-গানে মোক্ষ লাভ হয়। আর সেই কারণেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজের বাড়ির গা লাগোয়া শিব মন্দির অঙ্গনে প্রতি শিবরাত্রিতে শিব মহিমা বর্ণিত পালাগানের আয়োজন বজায় রেখেছিলেন তিনি। আসলে যতক্ষণ লীলাভিনয়, যতক্ষণ গীতাভিনয় ততক্ষণ ঈশ্বর চিন্তা, মোক্ষ লাভ। পাইনদের বিশেষ করে

সীতানাথ পাইনের সেই মোক্ষ লাভ হয়েছিল সেই দিন, যেদিন পালাগানের আসরে শিবরূপী অভিনেতা বালক গদাধরের সংলাপ বলতে বলতে আত্মসমাহিত রূপ দেখেছিলেন তিনি।

কামারপুকুরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের অতি স্নেহের ভাগনী হেমাঙ্গিনীর বিয়ে হয়েছিল, কামারপুকুর থেকে আড়াই ক্রোশ দূরে উত্তর-পশ্চিমে সিহড় গ্রামের অবস্থাপন্ন অথচ ধার্মিক পরিবারে। ভাগনী জামাইয়ের নামটিও বেশ। কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এই বর্ধিষ্ণু পরিবারে তিথি-নক্ষত্র অনুসারে নানা রকম ভক্তি রসাশ্রিত অনুষ্ঠানের আয়োজন হতো। একবার সেই পরিবার থেকে আমন্ত্রণ এসেছিল 'কৃষ্ণ যাত্রা' আর 'চৈতন্যলীলা' কীর্তন শোনার। সবার আব্দার ছিল 'গদাই' যেন যান সঙ্গে। গদাই গিয়েছিলেন। সেই নামগান মন-প্রাণ উজাড় করে শুনেছিলেন। যেমনটি শুনেছিলেন, ঠিক তেমনটি গেয়ে-নেচে একবার শুনিয়েছিলেন সবাইকে। ক্ষুদিরামের বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। তিনি বালক গদাধর প্রসঙ্গে বুঝেছিলেন, এ এক বিরল প্রতিভা! এমন শ্রুতিধর সংসারে মেলেনি আগে!

তারপর সেই শিবরাত্রির শুভক্ষণ!

শিবরাত্রিতে উপোস করা, শিব-শক্তির ব্রত পালন করা, বিনিদ্র রজনী অতিক্রান্ত করে অন্তরের ভক্তি অর্ঘ্যে শিব-শক্তির বন্দনা করা অন্তত হিন্দুদের একটি চিরাচরিত প্রথা। আর এই তিথিতে নানা অঞ্চলেই নানা আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন। আসলে চিত্ত বিনোদনের মধ্যে রাত্রি জাগরণ। এ ব্যাপারে প্রতি বছরই সীতানাথ পাইনের আলাদা একটা মন ছিল। সীতানাথ ধনী, কিন্তু তিনিও ছিলেন ধর্মপ্রাণ। তাঁর বাড়িতে বারো মাসে তের পার্বন! বারো মাসে তের পার্বণ পালন করা গরীবদের চোখে ধনীর বিলাস। কিন্তু সীতানাথের মধ্যে তেমন কোন ভাব ছিল না। সীতানাথ তাই মাঝে মাঝেই বলতেন, এ সব করি বলে নিজেকে আর পাঁচজন মানুষের মত মানুষ ভাবতে পারি। ব্যক্তিগত সুখ-শান্তি-বিলাস এ সবের কোন অর্থ নেই। আমার সুখের, আমার শান্তির, আমার বিলাসের ভাগ যদি সবার মধ্যে দিতে না পারি তা হলে যে মানব-জীবন ব্যর্থ!

তাই শিবরাত্রিতে বাড়ির সামনে সীতানাথ পাইনদের যে শিব মন্দির সেখানে শিবপুজোর আয়োজন হতো। গ্রামের সবাই আসত পুজো দিতে। পুজো শেষে পাইন বাড়িতে পেট পুরে প্রসাদ পাবার ঢালাও আয়োজন। সেই সঙ্গে পালাগান দেখে মন ভরিয়ে তবেই ঘরে ফেরা। রাতে চাঁদোয়ার নিচে যাত্রাগানের আসর।

সেবারও ঠিক তেমনি। চাঁদোয়া টাঙানো ছিল। গোটা কামারপুকুর সেদিন আনন্দে-খুশিতে ঝলমল করে উঠেছিল। শিবলীলার দল পৌঁছেছে পাইন বাড়ি। আসরের নিচে একে একে গোল হয়ে বসতে শুরু করেছে গ্রামবাসীরা। হঠাৎ জানা গেল অধিকারীর বড় বিপদ! দলে যে বালক নিত্য শিব সাজে, সে হঠাৎ কঠিন অসুখে পড়েছে! শিব সাজা তার পক্ষে অসম্ভব। সীতানাথ পাইন ডেকে পাঠালেন অধিকারীকে। বললেন,—শুনছি আপনি নাকি বলেছেন যাত্রাগান হবে না? এতে যে আমার মান-সম্মান জড়িত! ছেলেটি যখন ব্যামোতে পড়েছে তখন আগে জানালে কোবরেজ ডেকে চাঙ্গা করা যেত! এখন উপায় কী বলুন—

শিবলীলা দলের অধিকারী তখন বলির পাঁঠার মত কাঁপছিলেন। নিতান্ত অপরাধীর মত তিনি বললেন,—আমাদের দলের ছোকরারা মাঝে মাঝে এমন ব্যামোয় পড়ার ভান করে। তারপর যখন গণ্ডা দু'য়েক পয়সা বাড়তি দিই, ছোকরাদের সব ব্যামো সেরে যায়! এই ছোকরার যে তেমন ব্যামো নয় তা আগে বুঝতে পারিনি কত্তা! তাই বলছিলুম, এই গেরামের কোন ছোকরা যদি জোগাড় হয় আমি তাকে শিব সাজিয়ে চালিয়ে দেব—

সীতানাথ হলেন চিন্তিত। আশে-পাশের সবাই বললে একটি নাম, গদাধর। ক্ষুদিরামের ছেলে, রাম চাটুজ্যের ভাই, এ গ্রামের—এমন কি এই পাইন বাড়ির মহিলা মহলে যার অনেক আদর।

অনেকে বললেন, এর আগে গদাই তার বন্ধুদের নিয়ে শিব সেজে আমবাগানের নিচে, পাঠশালার দাওয়ায় অনেকবার শিবলীলা করেছে! একবার তাকে ডাকলে হয়—

তাই হলো। স্বয়ং সীতানাথের অনুরোধে ক্ষুদিরাম কথাটা ছেলের কানে তুলতেই গদাই দু'বাহু উর্ধ্বে তুলে আনন্দে নৃত্য করল। যথা সময়ে সীতানাথ পাইনদের বিশাল গোয়াল ঘরের একদিকে যে সাজঘর হয়েছিল চাদর টাঙিয়ে, সেখানে এল গদাই। বেশকারী গদাইকে শিব সাজালো!

জটাজুটধারী, বিভূতিমণ্ডিত দেহ, ভাবাবেগে আচ্ছন্ন বালক অভিনেতারূপী গদাধরকে ধরে কয়েকজন নিয়ে এলেন আসরের সামনে। ধীর মন্থর গতিতে শিব বেশী গদাধর এসে দাঁড়াল আসরের মধ্যে। মুখে ভাষা নেই। আঁখি পল্লবে কোন স্পন্দন নেই। অভূতপূর্ব ভাবাবেগে আচ্ছন্ন গদাধরের দু'চোখ দিয়ে শুধু নীরবে ঝরে পড়ে অশ্রু। অকস্মাৎ দর্শকদের মধ্যে প্রায় সকলেই সমস্বরে হরিধ্বনি দিলে। হরিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে যাত্রাপালা দেখতে আসা, শিবরাত্রিতে উপবাসী রমণীরা দিলেন উলুধ্বনি। পাইন বাড়ি আর তার আশে পাশের বাড়ি থেকে কুলনারীরা বাজালেন মঙ্গল শঙ্খ......

॥ পালাকার গদাধর ॥

১৮৫০ সাল। রামকুমার চট্টোপাধ্যায় কলকাতার ঝামাপুকুরে খুললেন চতুষ্পাঠী। অন্যদিকে মাকে সাহায্য করার জন্যে মায়ের পাশে থাকল গদাধর। মা যখন রঘুবীরের পুজো করবেন, তখন গদাই মাকে সাহায্য করবে এমন নির্দেশ ছিল দাদা রামকুমারের। সদ্য যুবক হয়েছে গদাধর। মাকে সাহায্য করার চাইতে তার যাত্রাগানে টান বেশি। এক সময়ে খেলার সাথীরা ধরে বসল পালাগানের দল খুলতে। গদাধর তো শুনেই রাজী।

গ্রামের পাঠশালার গা লাগোয়া আমগাছের তলায়, তালপাতার ঝাঁটা তৈরি করে সেই ঝাঁটায় ঝাঁট দিয়ে পালাগানের মহড়ার জায়গা তৈরি হয়ে গেল। স্থায়ী মহড়ার মুক্ত অঙ্গন। বন্ধুরাই স্থির করল গদাই হবে 'মাষ্টার'। গদাই গান গাইবে, পাঠ বলবে। বন্ধুরা হবে দোহার। গদাই স্থির করবে পালাগানের বিষয়। এ ব্যাপারেও তার জুড়ি নেই কামারপুকুরে।

গদাধরের হাতে খাগের কলম। পালা লিখবে গদাই। লিখেও ফেলল ক'খানা। শ্রীরামচন্দ্র আর শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক পালাগান। আসলে রামনাম-কৃষ্ণনামের কথকতা।

দিনকতক আমবাগানে পালাগানের মহড়া চলল। ভাবনায় পড়ল বন্ধুরা, পালা হবে কোথায়? গদাই বলল, মানিক রাজার বাগানে—

তাই হয়েছিল। মানিক রাজার বাগানে গদাধর আর তাঁর সম্প্রদায়ের সংকীর্তন সবাইকে মুগ্ধ করেছিল। একদিন-দু'দিন নয় প্রায় বছর তিনেক ধরে আজ এর বাড়ির উঠানে, কাল তার বাড়ির ঠাকুর দালানে, পরশু কারও আমবাগানে অথবা কোন ভগ্ন মন্দিরের দাওয়ায় বসত গদাধরদের পালাগানের আসর—

- সীতানাথ পাইনের বাড়ির শিব মন্দিরের অঙ্গনে শিবরূপে আসরে অবতীর্ণ হয়ে গদাধর অর্থাৎ যুগাবতার পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, চৈতন্যদেবের শিল্প মানসের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের সূত্রে, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে যাত্রা যে গণমাধ্যম, যাত্রা যে লোকশিক্ষার শক্তিশালী মাধ্যম সেই সত্যের শুভ উদ্বোধন করেছিলেন।
- পালাগান রচনার ক্ষেত্রে পালাকারদের হৃদয় বৃত্তিতে পবিত্রতার ফল্গু ধারা চির প্রবাহিত হোক বোধকরি সেই জন্যেই গদাধরের অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের পালাকার রূপ পরিগ্রহ!
- তালপাতার ঝাঁটা দিয়ে আমগাছের তলা ঝাঁট দিয়ে পালা মহড়ার স্থানে পবিত্রতা রক্ষার ইংগিত।

এ ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণের স্টার থিয়েটারে নাটক দেখা অথবা হাটখোলায় নীলকণ্ঠের পালা শুনতে যাওয়া আসলে যাত্রার প্রতি সর্বস্তরের মানুষের সানন্দ সমর্থনের নীরব আহ্বান!

★ ★ ★ ★ ★ ★

উনবিংশ শতকের সামাজিক-অর্থনৈতিক-শিক্ষা ক্ষেত্রের সর্বস্তরে ইংরেজ শাসক গোষ্ঠী মূলত নিজেদের স্বার্থেই যখন দেশ গড়ার কাজে ব্যাপৃত ছিল, তখন দেশের জাতীয় সংস্কৃতির রক্ষা এবং জনমানসে নবচেতনা জাগরণের ক্ষেত্রে দেশের শিক্ষিত-সচেতন ব্যক্তিরা দুর্বার হয়ে উঠেছিলেন। দেশের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধেই তাঁদের সাংস্কৃতিক চেতনার ক্ষেত্রে আলাদা একটা ভাবমূর্তি যেমন তৈরি হয়েছিল, তেমনি তৈরি করেছিল আলাদা একটা পরিমণ্ডল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই ইংরেজরা যেমন ইংরেজি থিয়েটারকে ভেঙ্গে নতুন এক থিয়েটারের প্রবর্তনা করল, তেমনি পালাগান বা যাত্রাগানের ক্ষেত্রে আলাদা একটা মাত্রা যোগ করার সমষ্টিগত চেষ্টা বা আন্দোলন ক্রমশ দানা বেঁধে উঠতে থাকল। এ প্রসঙ্গে তাই বেলগাছিয়া রাজবাড়ির থিয়েটাব চর্চার কথা এসে যায় অনিবার্য ভাবেই। সুতরাং প্রসঙ্গক্রমে এখানে সেই ইতিবৃত্তের অবতারণা করছি।

১৮৫৮ সালে বেলগাছিয়া রাজবাড়িতে রাজারা সখের থিয়েটার খোলেন। বাড়িতে তৈরি হয় রঙ্গমঞ্চ। পাশাপাশি এই ভাবেই আমাদের দেশের প্রায় সর্বত্রই মঞ্চরীতি নাট্যাভিনয়ের প্রসার ঘটতে থাকে। কিন্তু একটা বড় বাধা বা অন্তরায় ছিল 'খরচ'। মঞ্চরীতির অভিনয়ে খরচ বেশি ; আর এই কারণেই সাধ থাকলেও সখের থিয়েটার গড়া বা থিয়েটার দেখার সাধ্য অনেকের ছিল না।

অথচ তথাকথিত 'যাত্রা' তখনও রুচিশীল হয়ে উঠতে পারেনি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ চিত্তবিনোদনের জন্য সত্যিই নতুন পথের সন্ধান করছিল। তারই ফলশ্রুতি "গীতাভিনয়"। এ এক নতুন যাত্রা। আলাদা একটা ফর্ম। এই 'নতুন যাত্রা' বা ফর্ম নিয়ে আলোচনা করতে হলে অবশ্যই চলে আসে "অপেরা" প্রসঙ্গ।

প্রসঙ্গ ঃ অপেরা

ডঃ অজিতকুমার ঘোষ "অপেরা" প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

"অপেরা সংগীত-প্রধান নাটক। অন্যান্য নাটকে সংগীত থাকিতে পারে, কিন্তু সংগীত সেখানে পীড়াদায়ক নাটকীয় ঘটনার পর মানসিক স্বস্তি ও সমতা বিধান করিবার জন্য, কোনও গূঢ় ভাব প্রকাশ করিবার জন্য অথবা দর্শক দিগকে নিছক আনন্দ দান করিবার জন্যই সন্নিবেশিত হয়। কিন্তু অপেরায় নাট্য ঘটনাটি সংগীতের মাধ্যমে রূপায়িত হয়, সুতরাং সংগীতের উপযোগী করিয়াই সেখানে নাটকের ঘটনা ও চরিত্র পরিকল্পিত ও উপস্থাপিত হয়। তবে অপেরা যখন নাটকেরই একটি বিশিষ্ট বিভাগ, তখন লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, অপেরার সংগীত স্বতন্ত্রভাবে গেয় সংগীতের সমপর্যায়ভুক্ত নয়, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য নাট্যরসের আবেদন দর্শকচিত্তে জাগাইয়া তোলা। অপেরা সংগীত প্রধান হইলেও ইহা রঙ্গমঞ্চে পরিবেশিত হইবার জন্যই লিখিত হয় ; সেই জন্যই ইহার রচনা ও মঞ্চে উপস্থাপন বিষয়ে কেবল শ্রাব্যতার দিকে লক্ষ্য রাখিলেই চলে না। দৃশ্যসজ্জার দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হয়। সেই জন্য দৃশ্যসজ্জা এবং চরিত্রগুলির অঙ্গভঙ্গি ও চোখ মুখের ক্রিয়াদির প্রতি সূক্ষ্মদৃষ্টি রাখা দরকার।

তবে অপেরার জগৎ সাধারণতঃ বাস্তব বন্ধনমুক্ত কল্পনারঞ্জিত জগৎ। সেই জন্য স্বাভাবিক ভাবেই অপেরার অভিনয় সাংকেতিক ও ব্যঞ্জনাধর্মী হইয়া পড়ে।

'অপেরা' নামটি বিদেশী।......উনবিংশ শতাব্দীতে যাত্রা ও নাটকের মাঝামাঝি এক নূতন ধরনের নাট্যাভিনয় প্রচলিত হইল এবং তাহাই গীতাভিনয় নামে আখ্যাত হইল। গীতাভিনয়

অনেকাংশে নাটকেরই অনুরূপ। কিন্তু ইহার অভিনয় ছিল যাত্রাধর্মী।..." গীতাভিনয়ের উদ্ভব সম্বন্ধে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ নভেম্বর তারিখে "সংবাদ-প্রভাকর" লিখেছিল ঃ

॥ যাত্রার ক্রম বিবর্তনে গীতাভিনয়ের ভূমিকা ॥

সংবাদ প্রভাকর-এর মত অনুসারে ঃ—"প্রচলিত যাত্রাগুলির প্রতি যথার্থ সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তিগণের নিদারুণ বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। রঙ্গভূমি করিয়া অভিনয় করা অধিক ব্যয়সাধ্য বিবেচনায় কলিকাতার কয়েকজন শিক্ষিত যুবক সামান্যতঃ তৎপ্রণালীতে গীতাভিনয় প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা প্রদেশের পক্ষে শ্লাঘনীয় অনুষ্ঠান সন্দেহ নাই।"

"যে সব সখের দল গীতাভিনয়ে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভবানীপুরের উমেশচন্দ্র মিত্রের দল, কলিকাতায় আরপুলি গলির দল ও সিমুলিয়ার "সখের যাত্রা কোম্পানি"। সখের দলগুলি সুপরিচিত নাটকগুলিই অতিরিক্ত বহু গান সংযোজন করিয়া গীতাভিনয়ের উপযোগী করিয়া লইত।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে প্রকাশিত অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "শকুন্তলা" বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রথম "অপেরা' বা 'গীতাভিনয়'।...

গীতাভিনয় যাত্রা ও নাটকের মাঝামাঝি রূপ হইলেও সঙ্গীত প্রাধান্যের ফলে ক্রমে গীতাভিনয় ও যাত্রা সমার্থক হইয়া পড়িল। তবে প্রাচীন যাত্রার সহিত গীতাভিনয়ের পার্থক্য এইখানে যে, গীতাভিনয় যাত্রাতে ঘটনার সংহতি দৃঢ়তর এবং সংঘাত তীব্রতর হইয়া উঠিল।..."

এই গীতাভিনয় রচনায়, গীতাভিনয় উপস্থাপনায়, গীতাভিনয় অভিনয়ে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের প্রায় সকলের কথাই আমি আগে বলেছি এবং পরেও বলার চেষ্টা করবো।

একালে যদিও সরাসরি "গীতাভিনয়" নেই কিন্তু সকলেই "অপেরা" শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে ডঃ অজিত ঘোষ আরও বলেছেন ঃ "আধুনিক যাত্রাদলগুলি অনেক ক্ষেত্রে 'অপেরা' নামটি গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু যাত্রার মধ্যেও সঙ্গীত প্রাধান্য বর্তমানে অনেক কমিয়া আসিয়াছে এবং যাত্রাভিনয়ও সংলাপ প্রধান ও নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাতপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে..."

পুনরায় যাত্রার অগ্রগতি এবং ক্রমবিবর্তনের মূলে যাঁদের অবদান অনস্বীকার্য তাঁদের কথায় ফিরে আসি—

॥ চন্দননগরের মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় ॥

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় একটা যাত্রা দল তৈরি করেছিলেন। এই শতকে, প্রয়োগ প্রধান অর্থাৎ নাট্য নির্দেশক বলতে মদনবাবুকে বোঝাত কারণ তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যাত্রা উপস্থাপনার ভিতর দিয়ে নাচ-গান-সুর-যন্ত্র-সংগীত, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির সংস্কার করে নব চেতনার আলো এনেছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত রীতিতে যাত্রা বিশেষ রূপ পেয়েছিল। আলাদা মাত্রা পেয়েছিল। চন্দননগরের অধিবাসী মদনমোহনবাবু হুগলী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।

প্রথমে তিনি সখের দল করেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর দলের জনপ্রিয়তা বেড়ে যাবার জন্য মদনবাবু অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে পেশাদারী যাত্রাদল তৈরি করেন। সম্ভবতঃ ১৮৭০ সালে মদনমোহনের দল পেশাদারী দলে রূপান্তরিত হয়। মতিলাল রায়ের দল তখনও তৈরি হয় নি। মদনবাবু শিক্ষক ছিলেন বলেই তাঁকে সকলে মদনমাষ্টার বলে সম্বোধন করত। কালে কালে মদনবাবুর দলের নামও হয়ে যায় 'মদন মাষ্টারের দল'। তাঁর দলের ঠিকানা ছিল ফরাসডাঙ্গা।

মদনবাবু পালা রচনায় খ্যাতিমান হন। তাঁর লেখা প্রথম পালা 'প্রহ্লাদ চরিত্র' উদ্বোধন হয়েছিল চন্দননগরের বেলেহাটার প্রাচীনতম শিবতলায়। এরপর একে একে বহু পালা এখানেই উদ্বোধন হয়।

এই মদন মাষ্টারের দলে রাজার পোশাক ছিল ঢিলে পায়জামা, কোমরবন্ধ, চাপকান, কাবা বা সাঁচ্চার টুপি। রানীদের জন্য গরদের চেলি অথবা ঢাকাই শাড়ি।

এই সব চরিত্রের সঙ্গে অন্য সব চরিত্রের পোশাকে অনেকটা পার্থক্য রাখা হতো। ইদানীং এই সর্বাধুনিক যুগেও যাত্রার আসরে এ ধরনের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তবে এই পার্থক্য পালা প্রযোজকদের আর্থিক অনটন হেতু নয়, দলের বা পালার নায়ক-নায়িকাদের দাপটের জন্য। যেমন, কিছু কিছু পালায় দেখা যায়, নায়কের প্রাধান্য হেতু নায়কের জন্য সব চাইতে মূল্যবান পোশাকের সেট তৈরি হবে, অথচ অন্যরা হয়তো একই পোশাক পরে একাধিক দৃশ্যে অভিনয় করেন। পোশাকগুলি উৎকৃষ্ট মানের হয় না। উৎকৃষ্ট মানের পোশাক পরে পার্শ্ব চরিত্রাভিনেতা বা পার্শ্বচরিত্রাভিনেত্রী অভিনয় করলে মূল্যবান নায়ক বা নায়িকার মান ক্ষুণ্ণ হবে সেই কারণে উৎকৃষ্ট মানের, একাধিকবার পাল্টে পরার পোশাক প্রযোজকরা দেন না। অবশ্য কয়েকটি বড় ও খ্যাতিমান যাত্রা দলের ক্ষেত্রে এই তথ্য সত্য নয়। যা হোক, কথা হচ্ছিল মদন মাষ্টারকে নিয়ে। আবার তাঁর কথাতেই ফিরে যাওয়া দরকার।

মদন মাষ্টার সংলাপের অংশ বাড়িয়ে গানের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছিলেন। এই সময়ে যাত্রার যে নারী চরিত্রে পুরুষেরাই অভিনয় করতেন তা বলাই বাহুল্য। মদনমোহনবাবু যাত্রায় প্রথম 'জুড়ি'র গান প্রবর্তন করেন।

এই রীতি প্রবর্তিত হওয়ায় যে অভিনেতারা ভাল গান জানতেন না তাঁদের গান এই 'জুড়ি' দিয়ে সেরে নেওয়া হতো এবং তা সু-গীতই হতো। কারণ 'জুড়ি' গায়কদের গলা ছিল ভাল। মদন মাষ্টার পুরুষদের গান বয়স্ক জুড়িদের দিয়ে এবং মেয়েদের গান ছোট জুড়ি'দের দিয়ে গাওয়াতেন। মদন মাষ্টারের সংগীত রীতি প্রথমে মতিলাল রায় ও পরে ব্রজমোহন রায় গ্রহণ করেছিলেন।

অধিকাংশ পালাই মদনবাবুর নিজস্ব। প্রায় সব পালাই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। সেই জনপ্রিয় পালাগুলি হলো, প্রহ্লাদ চরিত্র, ধ্রুব চরিত্র, দুর্গা মঙ্গল, গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী, রাম বনবাস, হরিশ্চন্দ্র। 'বিদ্যাসুন্দর' পালাও হয়েছিল এই দলে। অত্যন্ত দুঃখের খবর, মদন মাষ্টারের কোন পালার হদিশ পাওয়া যায় না, তবে তাঁর কিছু গানের নমুনার সন্ধান মেলে "বাঙ্গালীর গান"-এ। এই মদন মাষ্টার ওরফে মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তাঁর দলটি বেশ কয়েক বছর চালিয়েছিলেন ছেলে নবীন চট্টোপাধ্যায়।

মদন মাষ্টারের দলের সব চাইতে ওস্তাদ বেহালা বাদক মহেশচন্দ্র চক্রবর্তী আর এই দলের একজন শক্তিমান অভিনেতা মদনবাবুর মৃত্যুর পর দল ছেড়ে দিয়ে আলাদা আলাদা দুটি দল তৈরি করেছিলেন। মদনবাবুর মৃত্যুর পর এই দলটি ভেঙে দেবার অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছিল কিন্তু নবীনবাবুর চেষ্টায় দলটি নতুন জীবন পেয়েছিল। নবীনচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী কৈলাসকামিনী দেবী দলের দায়িত্বভার তুলে নিয়েছিলেন। যে সময়ে কোন গৃহবধূর ব্যক্তিগত কোন স্বাধীনতা ছিল না, বরং ঘরের বাইরে পা রাখা যে কালে মেয়েদের পক্ষে ব্যাভিচারিতা, কৈলাসকামিনী দেবী সেই কালেই এগিয়ে এসেছিলেন যাত্রাদল করতে।...

॥ কৈলাসকামিনী দেবী ওরফে বৌমাষ্টার আজও বেঁচে ॥

চন্দননগরে আজও একটি গলির নামের ফলকে যেভাবে পথচারীদের নজর পড়ে, বোধ করি সেই নাম নিয়ে সেই পরিমাণ কৌতুহল কারও নেই। বৌ মাষ্টারের গলি। ব্যস্ত জীবনযাত্রার মধ্যে আজ আর কারও কোন জিজ্ঞাসা নেই এই 'বৌমাষ্টার'কে ঘিরে।

যেমন 'বৌকুণ্ডু'কে নিয়ে ভাববার অবকাশ ক'জনের ছিল? থাক সে সব কথা।

বৌমাষ্টারের কথা বলতে গেলে মদন চাটুজ্যের কথা এসে যায়। যা বলেছি আগেই।

মদন মাষ্টার সম্ভবতঃ মারা যান ১২৮৫ সনে। তার পরেই দল ভেঙ্গে যায়। হয়তো মদনের

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দল ভেঙ্গে যেত না, যদি না মহেশ চক্রবর্তী আর নবীন গুঁই দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে আলাদা-আলাদা ভাবে দল তৈরি করতেন। এই দুই জনেই ছিলেন মদন চাটুজ্যের দলের বাদক। শুধু বাদক বললে ভুল বলা হবে, এঁরা ছিলেন মদনের দক্ষিণ হস্তের সমতুল্য!

মদনের মৃত্যুর পর সেই ভাঙা দলের অর্থাৎ ডোবার মুখ থেকে তরীকে বাঁচিয়ে তার ছেঁড়া পালে তালি দিয়ে নড়বড়ে হালটিকে যিনি শক্ত ভাবে ধরেছিলেন তিনি মদনবাবুর পুত্রবধূ।

যে পুত্রবধূ কোনদিন ঘরের বাইরে পা রাখেননি, যিনি তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় পর্দার বাইরে আসার অধিকার রাখতেন না, সেই মহিলা শ্বশুরের স্মৃতিকে ধরে রাখার তাগিদে শুধু দলের প্রাণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেননি, অল্প সময়ের মধ্যে দলের খ্যাতিও ফিরিয়ে এনেছিলেন ; অবশ্য এর জন্যে মদনবাবুর পুত্রবধূ কৈলাসকামিনী দেবীকে নিরুপায় হয়ে একটি কাজ করতে হয়েছিল, তা হলো দলের নাম পরিবর্তন। তিনি দলের নাম রেখেছিলেন, 'বৌমাষ্টারের দল'। এ সব কথা যিনি এক সময়ে বলেছিলেন, তিনি এই বৌমাষ্টারের গলির এক বাসিন্দা। নাম, বলাইচাঁদ চট্টোপাধ্যায়। সম্ভবত ইনি চাটুজ্যে পরিবারের সংগে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

কৈলাসকামিনী যখন দল তৈরি করলেন তখন সবাই বলতে লাগল বৌমাষ্টারের দল। সেই থেকে দল এই নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করল।

বৌমাষ্টারের দল প্রথম যে পালা প্রকাশ্যে অভিনয় করে চন্দননগরের আপামর জনসাধারণের মন জয় করেছিল, তার নাম 'শ্রীমন্তের মশান'। আর এখান থেকেই চন্দননগরের সংস্কৃতি চেতনা মোড় নেয়। এ দলের জন্য পালা লিখেছিলেন, গোন্দলপাড়া নামারের বাগান অঞ্চলের নিবাসী মধুসূদন নাথ। তাঁর পালার নাম ছিল দণ্ডীপর্ব, হরিশ্চন্দ্র, রামবনবাস আর প্রভাস যজ্ঞ। বলা বাহুল্য, হরিশ্চন্দ্র ও রামবনবাস ছিল মদন চ্যাটার্জীর পালা।

বৌমাষ্টার একটা বড় কাজ করেছিলেন, তা হলো ছেলেদের গানে যে পুরাতন সুরের ধারা বজায় ছিল তা বর্জন করে নতুন সুরের প্রবর্তন করেছিলেন, পরে সেই সুর বৌমাষ্টারের 'মাষ্টারী সুর' নামে খ্যাতি পেয়েছিল!

এই সব নানা কারণে এবং জনজীবনে বৌমাষ্টারের দলের পালা একটা ভূমিকা পালন করায় পরবর্তী সময়ে চন্দননগবের একটি গলির নাম রাখা হয় 'বৌমাষ্টারের গলি'। যে গলিটি আজও এক সাধারণ গৃহবধূর কর্ম নৈপুণ্যের স্মৃতি বহন করে যাচ্ছে।......

বৌমাষ্টারের 'যাত্রাদল' ছাড়া চন্দননগরে যত যাত্রাদল গড়ে উঠেছিল, সেগুলি স্থানীয় মানুষের চিত্তরঞ্জন করত, বাইরে বাইরে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এই দলগুলি সম্ভবত যেত না। সুতরাং কিছু কিছু দলের নাম আর কয়েকজন অধিকারীর নাম পাওয়া যায়। যেমন—অধিকারীদের নাম ঃ যাদু গুঁই, রাধামাধব মুখোপাধ্যায়, রাম বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী রায়, দোয়ারী যুগী, দুর্গাচরণ নিয়োগী, নবীন ঘোষ, সীতানাথ জেলে, কালী হালদার, গয়ারাম কোঙার, লালু আচার্য, সন্ধ্যা বাউরি, দয়ালচন্দ্র।

উমেশ আচার্য যে দল তৈরি করেছিলেন পরে দুর্গাচরণ নিয়োগী সেই দল পরিচালনা করেছিলেন।

বৌমাষ্টারের কথা পরে আরও বলব।

॥ দোগাছিয়ার জমিদার হরিনারায়ণ রায়চৌধুরী ॥

পারুলিয়া গঞ্জের পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত দোগাছিয়ার জমিদার হরিনারায়ণ রায়চৌধুরীর 'সখের যাত্রা' দল ছিল। এই সখের দল মূলত দোগাছিয়া অঞ্চলের মধ্যে পালা গান আসরস্থ করত। তখন এই আসরস্থের নাম ছিল 'গাওনা'। যে মতিলাল রায় আধুনিক যাত্রার জনক হিসেবে চিরস্মরণীয়, সেই মতিবাবুর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল দোগাছিয়ার এই জমিদারের সখের দলে।

শ্রীহংসনারায়ণ ভট্টাচার্যের 'যাত্রাগানে মতিলাল রায়' গ্রন্থ থেকে মতিলাল রায়ের যাত্রায় আত্মপ্রকাশের কথা জানা যায়।...পত্নী বিয়োগের পর মতিলাল রায়ের মানসিক অশান্তি এত গভীর হয় যে, তিনি ৮০ টাকা বেতনের চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই সময় একাকীত্বের যন্ত্রণা থেকে নিজেকে কিছুটা হলেও হাল্কা রাখার জন্য একদিন হরিনারায়ণের যাত্রা দেখতে যান। সেদিন হরিনারায়ণ বা হরির দলে যে পালা হয়েছিল তার নাম যদিও পাওয়া যায় না, তবুও একটি ঘটনা প্রমাণ করে, মতিলালের হৃদয় জয় করেছিল সেই পালা। আসরে দেখা পালাটি অবিস্মরণীয় মেধা শক্তিতে প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছিলেন তিনি। বাড়ি এসে সেই পালাটি লিখেও ফেলেছিলেন। সব কথা শুনে এবং আসরে দেখা পালা মুখস্থ করে এসে লিখে ফেলার প্রতিভা দেখে মতিলাল রায়ের খুল্লতাত হরিচরণ রায় খুব খুশি হন এবং পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে হরিনারায়ণবাবুর কাছে মতিলাল রায়কে পাঠান। মতিলালের অসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তির পরিচয় পেয়ে হরিনারায়ণবাবু তাঁকে নিজের দলে নিয়ে নেন এবং মতিলাল রায়কেই পালা লেখার সুযোগ দেন।

এই দলে মতিবাবুর 'তরণীসেন বধ' ও 'রাম বিদায়' খ্যাতির সঙ্গে অভিনীত হয়। অনেক জায়গায় মতিলাল নিজে অভিনয়ও করেন। তাঁর পালা এবং অভিনয়ে হরিনারায়ণের 'শখের দল' শেষ পর্যন্ত বায়নার দলে রূপান্তরিত হয়। হরিনারায়ণ এক সময়ে মতিলালকে দুই আনা অংশের মালিক করে নেন।

১২৭৯ সনে দিনাজপুরে 'গাওনা' শেষ করে হরিনারায়ণের দল ও মতিলাল যাচ্ছিলেন রংপুরে শো করতে। কিন্তু দুর্ভাগ্য হেতু রংপুরে দল পৌঁছতে পারে না। দলের আরও কয়েকজন মতিলাল রায়কে ভাঙিয়ে নিয়ে যায়। তারই ফলশ্রুতিতে ১২৮০ সনে নবদ্বীপে মতিলাল রায় স্বাধীন ভাবে দল তৈরি করেন।

যা হোক হরিনারায়ণ রায়ের সখের দলে 'তরণীসেন বধ' নেওয়া হয়েছিল, সেই পালা আসরস্থ হয় প্রথম ১২৭৮ সনে চাণ্ডুলির ধনী ব্যক্তি কালিদাস মিত্রের বাড়িতে। দুর্গোৎসবের সময়।

১২৮০ সনে মতিলাল নিজের দল তৈরি করার পর থেকে হরিনারায়ণ রায়ের দলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

এই মতিলালই হলেন আধুনিক যাত্রার জনক। মতিলাল পালা রচনা, উপস্থাপনা, টীমওয়ার্ক ইত্যাদি সর্বস্তরেই একটা বিপ্লব এনেছিলেন বলা যেতে পারে। সমকাল যাত্রার যে ধারা তার অঙ্কুর ছিল মতিলাল রায়ের যাত্রা ভাবনা ও উপস্থাপনার মধ্যে।

॥ আধুনিক যাত্রার জনক মতিলাল রায় ॥

মতিলাল যাত্রায় এনেছিলেন নব জাগরণ। যাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে, যাঁর কলম ধরার পর থেকে গীতাভিনয় সব রকম বিকৃতি থেকে মুক্ত হয়ে এ দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে, এমন কি স্ত্রী-পুরুষ সকলের কাছে প্রিয় হয়ে উঠল। যে গীতাভিনয় গণজাগরণ বা সামাজিক কালচারের গতি ও প্রকৃতি পাল্টে দিল, তারই প্রবক্তা হলেন এই মতিলাল রায় বা মতি রায়। মতিবাবু গীতাভিনয়কে শুধুমাত্র মানুষের মনোরঞ্জনের স্তরে রাখলেন না, এর ভিতর দিয়ে কেমন করে গণশিক্ষার প্রসার ঘটানো যায় তার চরম পরীক্ষা চালিয়ে যাত্রাকে করে তুললেন "লোকশিক্ষার ধারক ও বাহক"।

মতিলাল রায়ের খ্যাতি এক সময়ে ছড়িয়ে পড়ল ভারতব্যাপী। হয়তো অনেকের কাছেই বিশ্বাসযোগ্য নাও হতে পারে যে গোটা বঙ্গদেশে, এমন কি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণ মানুষের কাছে 'দেবতা' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেলেন মতিলাল।

নবদ্বীপে ছিল মতি রায়ের ঘাট। লোক মুখে শুনেছি, সেই ঘাটে স্নান করলে নাকি আজও

পুণ্য লাভ হয়। এই কিংবদন্তীর যাত্রা রাজাকে পরবর্তী কালে এ দেশের সমস্ত যাত্রাকাররাই সরাসরি গুরুপদে বরণ করে নিয়েছিলেন। মতি রায় লাভ করেছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্য।

একবার সর্বজন শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্র সেনের বাড়িতে 'নিমাই সন্ন্যাস' পালা করতে গিয়েছিলেন মতিলাল। এই পালায় শ্রীধরের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তিনি। সেদিন কেশবচন্দ্র সেনের বাড়ির আঙ্গিনায় আর এক অপরূপ দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল, তা হলো উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে স্বয়ং কেশবচন্দ্রের কোলে বসে এক শিশুর মত মতি রায়ের যাত্রা দেখছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি মতি রায়ের যাত্রা দেখে কোল ছেড়ে উঠে এসে মতি রায়কে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। ভাবাবেগে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন ঠাকুর।

এই প্রসঙ্গে 'বঙ্গভাষা'র লেখক' বইতে হরিমোহন এক জায়গায় লিখেছিলেন—

"আবেগময় প্রাণময় মুগ্ধকর ভক্তিরসের প্রবল স্রোতে পরমহংস সমাধিপ্রাপ্ত হইলেন, অনেক পরে মোহ অপগত হইলে রামকৃষ্ণপরমহংস দেব, মতি-মতি বলিয়া স্বয়ং উত্থান পূর্বক রায় মহাশয়কে আলিঙ্গন করিলেন।"

এই চিরস্মরণীয় পালাকার-রূপকারের কথা বিস্তারিত বলা যাক।

তখন রাজশাহী জেলার রাজধানীর অন্তর্গত পুঁটিয়ার এক গণ্ডগ্রাম পীরগাছায় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশের কাশীনাথ রায়, মানিক রায়, রামতনু রায় আর নন্দকুমার রায় সপরিবারে বাস করতেন। এঁদের আদি পুরুষ হলেন মধু মৈত্র। মধু মৈত্র বাস করতেন রাজশাহী জেলার আত্রাই নদীর তীরে 'গুড়নো' গ্রামে। পরবর্তী সময়ে এই পরিবারটি পীরগাছায় চলে আসে। নবাব বাহাদুরের কাছ থেকে পাওয়া 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত। এঁদের কাশ্যপ গোত্র।...

মতি রায়ের বাবার নাম মনোহর রায় আর মা কাশীশ্বরী দেবী। ১২৪৯ সনের ২১ মাঘ, ইংরেজি ১৮৪৩ সালে, বৃহস্পতিবার, শুক্লপক্ষের তৃতীয়ায়, পূর্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্রে সকাল সওয়া ন'টায় মতি রায়ের জন্ম। পুরনো নথিপত্র থেকে জানা যায়, মতিলালের জন্ম মুহূর্তে কয়েকটা অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। তার মধ্যে একটি হলো, যে অঞ্চলে, যে সময়ে কেউ কখনও কোন ষাঁড় দেখেননি, তাঁরা সবাই দেখলেন বাড়ির আঙ্গিনায় একটা বিশালাকায় ষাঁড় এসে বার তিনেক হাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল, এবং চোখের পলকে কোথায় যেন উবে গেল। এ থেকে সকলের ধারণা হয়েছিল, সদ্যজাত মতির জন্ম সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বরের আশীর্বাদ নিয়ে।

মতিলালের লেখাপড়ায় হাতেখড়ি হয় ভাৎশালার পাঠশালায়। তারপর যখন এই পরিবার স্থায়ীভাবে নবদ্বীপে বাস করতে আসেন তখন মতিলাল পড়েছিলেন নবদ্বীপ মিশনারী স্কুলে। এখান থেকেই এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন। আকস্মিকভাবে মারা যান বাবা। সেই সঙ্গে মতিলালের লেখাপড়ায় ছেদ পড়ে। অনেকের মতে জানা যায়, তিনি আরও কিছুদিন পড়েছিলেন কলকাতার ওরিয়েণ্টাল স্কুলে। চিৎপুরে এই স্কুলে মতি রায় পড়েছিলেন বলে পুরাতন নথিপত্রে উল্লেখ আছে। এক সময়ে নবদ্বীপের মাধব চৌধুরীর সাহায্যে নবদ্বীপ মিশনারী স্কুলে, বড় সাহেবের দয়ায় নিচু ক্লাশে, মাসিক ১৫ টাকা মাইনেতে মতি রায় শিক্ষকতা করেছেন প্রথম জীবনে। এর অল্প কয়েক দিনের মধ্যে কলকাতার জোড়াসাঁকো থানায় চাকরি পেয়ে চলে আসেন। মাত্র কয়েকমাস থানার চাকরি করে অবশেষে ভাল সুযোগ পান কলকাতার জি.পি.ও' তে।

ছেলেবেলা থেকে মতি রায় কবিতা লিখতেন। তখন জোড়াসাঁকোর শিবদাস মিত্র ছিলেন ধনী ব্যক্তি, এই মিত্র বাড়িতে মাঝে মাঝেই মতি রায় আসতেন। সেখানেই একদিন 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদক, কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সান্নিধ্য পান তিনি। কবিতা পাঠ করার সুযোগ পান। বালক মতি রায়ের কবিতা শুনে খুবই খুশি হয়েছিলেন সকলে। সেই থেকে মতিলালের কবিতার গুরু হয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

হাওড়ার বালী গ্রামের আশুতোষ লাহিড়ীর বোন মনমোহিনী দেবীর সঙ্গে মতিলালের বিয়ে হয়। মতিলালের দু'বার বিয়ে হয়েছিল। প্রথম স্ত্রীর গর্ভে পাঁচ মেয়ে আর এক ছেলের জন্ম। সেই ছেলের নাম ধর্মদাস। অত্যন্ত দুঃখের খবর হলো পাঁচ মেয়ের মধ্যে পর পর চারটি মেয়েই অসময়ে মারা যায়। ১২৭৩ সনে প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হয়, তখন নাবালক শিশু সন্তানদের দেখাশোনার জন্যই মতিবাবু আবার বিয়ে করেন।

১২৮০ সনে মতিলাল রায় 'নবদ্বীপ বঙ্গীয় গীতাভিনয় সম্প্রদায়' গড়ে তোলেন। মতি রায় শুধু প্রখ্যাত পালাকার, গীতিকার, নব যাত্রার প্রবর্তক নন, তিনি তদানীন্তন সর্ব-স্তরের মানুষের কাছে ছিলেন মহাপুরুষ স্বরূপ।

মতি রায় কতটা মহাপুরুষ বা সিদ্ধপুরুষ ছিলেন তার হিসাব বা ব্যাখ্যা দিতে এখানে বসিনি, তবে এই প্রজন্মে যে মানুষটি কর্মজীবনের সূত্রে নিছক যাত্রাওয়ালা ছাড়া আর কিছুই নন, যাঁকে নিয়ে এ যাবৎকাল বিশেষ কোন কাজ হয়নি, মূল্যায়নের চেষ্টা দেখা যায়নি, যাঁকে আজকের শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের অতি সচেতন মানুষেরা বিন্দুমাত্র নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝবার চেষ্টা করেননি, এক্ষেত্রে সেই মানুষটির কিছুটা মূল্যায়নের চেষ্টা করছি মাত্র। মতিলাল রায়কে কেন্দ্র করে একদা যে অলৌকিক এবং লৌকিক ঘটনা ঘটেছিল এখানে তার কিছুটা ছবি আঁকা যাক ঃ

প্রায় প্রতি বছরই চকদীঘির জমিদার ললিতমোহন সিংহের বাড়িতে যাত্রা করতে যেতেন মতিলাল রায়। একবার তিনি জমিদার ললিতমোহনকে বলেছিলেন, ঈশ্বর নিশ্চয়ই আছেন। ঈশ্বর থাকুন বা না থাকুন এমন একটা শক্তি বা জ্যোতি আছে যা সর্বদা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছে। দুনিয়ায় যা কিছু ঘটছে, যেমন জন্ম-মৃত্যু-ঘটনা-দুর্ঘটনা এ সবের মূলে 'আমি' এটা ঠিক নয়। এই 'অহং' হলো অহঙ্কার। আসলে সব কিছুর মূলে সেই শক্তি বা জ্যোতি অথবা ঈশ্বর! জমিদার ললিতমোহন বলেছিলেন—আপনি তেমন কোন জ্যোতি দেখেছেন? উপলব্ধি করেছেন?

মতি রায় বলেছিলেন, ইচ্ছে করলে, মন দিয়ে চেষ্টা করলে, গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে দেখার চেষ্টা করলে দেখতে পাবেন, উপলব্ধি করতে পারবেন—; কথাগুলি বলে মতিলাল স্বয়ং জমিদারকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রাসাদ সংলগ্ন মন্দিরের সামনে। বলেছিলেন,—কত্তা মশাই, এবার ঐ মন্দিরকে ভাল করে দেখুন, দেখুন দেবালয়ে অধিষ্ঠিতা দেবী প্রতিমা মহামায়াকে। একাগ্রচিত্তে মাকে দেখুন, ছেলে যেমন করে মাকে দেখে ঠিক তেমনি করে, আমার বিশ্বাস আপনি নির্ঘাত উপলব্ধি করবেন, মা আছেন। পার্থিব জীবনে যেমন মা ঠিক তেমনি এই মন্দিরের মা—

ললিতমোহন তাই করেছিলেন। অনেকক্ষণ ধরে মাতৃ প্রতিমার দিকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অকস্মাৎ একটা জ্যোতি খেলা করে গেল! মায়ের ত্রিনয়ন থেকে ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসা এক টুকরো আলোক রশ্মি যেন মুহূর্তে মন্দিরকে উজ্জ্বলতর করে দিয়ে গেল! ললিতমোহন সেই মুহূর্তে মতিলাল রায়কে জড়িয়ে ধরেছিলেন। প্রণাম করেছিলেন। সিদ্ধপুরুষ হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে মতিলাল রায়ের ছেলেরা যখন সম্প্রদায় চালাতেন, তখনও সেই মন্দির অঙ্গনে পালা করতেন।

দশঘরার জমিদার প্রথম জীবনে জমিদার ছিলেন না। শোনা যায় তিনি তালকুঁড়েতে বাস করতেন। পরবর্তীকালে নাকি এই যাত্রাওয়ালা মতিলাল রায়ের আশীর্বাদে দশঘরার জমিদার, জমিদার হন। তখন থেকে দশঘরার জমিদার এবং তাঁর উত্তরসূরীরা মতিলাল রায়কে সিদ্ধপুরুষ হিসেবে মানতেন।

বর্ধমানে যখন কোথাও অনাবৃষ্টি হতো তখন স্থানীয় লোকেরা ছুটে যেত মতিলালের কাছে। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, মতি রায়ের যাত্রা দিলে বৃষ্টি হবেই। আশ্চর্যের বিষয়, তাই হতো। মতি

রায় যাত্রার আসরে নামলেই বৃষ্টি হতো। জয়পুর থেকে আসাম পর্যন্ত মতিলাল রায়ের জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়েছিল।

মানভূমের পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিংহ বাহাদুর বি. এন. রেলওয়ের জয়চণ্ডী পাহাড় স্টেশনের পাশে তাঁর রাজ্য সীমানার মধ্যে মতিলালের নামে এক মেলা পত্তন করেছিলেন। তার নাম ছিল 'মতি মেলা'। এখনো সেখানকার মানুষ তাঁদের সীমিত সাধ্য দিয়েও এই মেলার অস্তিত্ব বজায় রেখেছেন।

এখন যাত্রায় পুরস্কার দেবার এবং পুরস্কার নেবার একটা বড় মাপের প্রতিযোগিতা চলছে। ভিন্ন ভিন্ন নামে পুরস্কার প্রদান করার একাধিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই পুরস্কার দেওয়া ও নেওয়ার মধ্যে একটা অলিখিত এবং গোপনীয় ব্যবসায়িক আর্থিক আদান-প্রদানের ব্যবস্থা পাকা হয়ে আছে। সুতরাং এই পুরস্কার যে কোন ক্ষেত্রেই (শুধু যাত্রায় নয়) প্রকৃত পবিত্র ভূমিকা বা কল্যাণমূলক ভূমিকা পালন করছে তা নয়। কিন্তু মতিলাল রায়ের আমলে মানুষ প্রকৃত অর্থে জহুর যাচাই করে নিতেন। প্রতি ক্ষেত্রে ক্ষমতার লড়াই চলতো। গান-বাজনা-নাটক-যাত্রা এমন কি শিক্ষা ক্ষেত্রের সঠিক কল্যাণের কথা মানুষ মনে রেখে খাঁটি ও শক্তিধর রূপকার বা উপস্থাপকের গলায় পরিয়ে দিতেন প্রশংসার জয়মাল্য। এই ব্যাপারে পরে আরও বিস্তারিত বলবো, এ ক্ষেত্রে শুধু মতি রায়ের গলায় এ দেশের রাজা-মহারাজা-জমিদার এবং পণ্ডিতবর্গের যে স্বতস্ফূর্ত শ্রদ্ধা ও ভালবাসার মালা পরাবার রেওয়াজ ছিল তার কিছুটা নমুনা হাজির করছি।

মহীশূরের রাজপ্রাসাদে মহীশূরের রাজা স্বয়ং মতিলালের গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন মহীশূর রাজ্যের নামাঙ্কিত সোনার মেডেল। ইংরেজ শাসকরাও মতিলালের গুণে মুগ্ধ হয়ে একাধিকবার পুরস্কৃত করেছিল। যেমন বর্ধমানের জেলা জজ টেলার সাহেব যখন বিলেতে ফিরে যান তখন একবার মতিলাল তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাতে "ভীষ্মের শরশয্যা" অভিনয় করেছিলেন। বাঙ্গলা ভাষায় উপস্থাপিত সেই পালা দেখে সাহেব অত্যন্ত খুশি হয়ে "মেমোরিয়াল কমিটি"র পক্ষ থেকে তাঁকে সোনার পদকে সম্মানিত করে যান। এই ধরনের একটা বিশাল তালিকা পরে পেশ করবো।

মতিলাল রায়ের সামাজিক মর্যাদা যা ছিল তা আজকের যাত্রার মালিকদের নেই।

মতিলাল বরাবরই সমস্ত যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ছিলেন, সবার চাইতে মতিলালের বায়না এক টাকা হলেও বেশি ছিল।

মতিলাল যখন যৌবনের দূত তখন থেকে বাড়িতে অন্নদান, দুর্গাপূজা, শ্যামাপূজা যেমন ঘটা করে করতেন, তেমনি যখন যাত্রার আসরে নামতেন তখন দু'তিন ঘণ্টা ধরে একটানা সন্ধ্যা বন্দনা করতেন। মতি রায়ের এই সন্ধ্যাবন্দনার ধারা এখন ছোট-বড়-মাঝারি সমস্ত যাত্রা দলেই অব্যাহত আছে।

প্রতি ভোরেই মতিলাল একটানা এক ঘণ্টা শ্যামাসংগীত গাইতেন। প্রতিদিনের এই সংগীত চর্চা ছিল তাঁর দিনের প্রথম কর্ম।

মতিলাল রায় তাঁর নতুন পালার শুভ উদ্বোধন কার্যটি বরাবরই নবদ্বীপের পোড়ামাতলার চত্বরে সমাধা করতেন। পোড়ামায়ের সামনে যাত্রা প্রথমেই না দেখালে কার্যসিদ্ধ হবে না, মন-বাসনা পূর্ণ হবে না এটাই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। মতিলাল একবার স্বপ্নে দেখেছিলেন আহেরীটোলার শীতলা মাকে। শীতলা মা স্বপ্নে দেখা দিয়ে মতির যাত্রাগান শুনতে চেয়েছিলেন বলেই মতি রায় কুলপী ঘাটে এবং নবদ্বীপের পোড়ামায়ের থানে নতুন পালা খুলবার পর শহর ও শহরতলিতে যাত্রা করতে যেতেন। শুধু তাই নয়, প্রতি বছর যুগনাথতলা, বুড়োশিবতলা, হরি সভা অঙ্গন, বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মন্দির বা বাড়ির অঙ্গনে, কারও কাছ থেকে একটি পয়সাও না নিয়ে যাত্রা করতেন।

বর্ধমান রাজবাড়ি থেকে মতি রায় আর তাঁর সম্প্রদায়ের সবাই খোরাকি বাবদ সর্বমঙ্গলা মায়ের প্রসাদ পেতেন। প্রতি বছরই রাজবাড়ি থেকে সর্বমঙ্গলা মাতৃমূর্তিতে পরানো বেনারসী শাড়ি মতিলালকে শিরোপা হিসেবে দেওয়া হতো।

বর্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ মহাপীঠ ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা দেবীর মন্দিরে দেবীর সামনে মতিবাবু যাত্রা করতেন কিন্তু তার জন্য কোন পারিশ্রমিক নিতেন না।

নবদ্বীপের বাড়িতে প্রতিবছর অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লা নবমী তিথিতে 'রামরাজা'র পুজো করতেন মতিবাবু, বলা বাহুল্য 'রামরাজা'র মাটির প্রতিমা তৈরিও করতেন স্বয়ং মতিলাল। এই পুজোর দিন মতি রায় স্বয়ং যাত্রা আসরে অবতীর্ণ হতেন না, বরং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে 'যাত্রা দল' আনিয়ে যাত্রার আসর বসাতেন। এই সময়ে এই বাড়িকে কেন্দ্র করে একটা বড় মাপের মেলাও বসতো। আজ যে যাত্রা উৎসব বা সম্মেলনের ব্যবস্থা হয় শহর কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের নানা অঞ্চলে, মতি রায়ের আহূত সেই একাধিক বিভিন্ন যাত্রাদলের যাত্রা বোধ করি এই 'যাত্রা উৎসব' বা 'সম্মেলনের' বীজ। মতি রায়ের ব্যক্তিগত এই 'রামরাজা' পুজাকে কেন্দ্র করে যে মেলা বা উৎসব একটু একটু করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, সেই উৎসবের পরিধিও মতি রায় ধীরে ধীরে বাড়িয়ে, নাম রেখেছিলেন 'রামরাজাতলা'। আজকের রামরাজাতলা সেই রামরাজাতলারই স্মৃতি বহন করছে।

পূর্বে বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণ মানুষের অনেক কষ্টের মধ্যে যেটি প্রধান ছিল, সেটি হলো জলকষ্ট। সাধারণ মানুষের সেই কষ্ট দূর করবার জন্য অর্থাৎ জন কল্যাণ হেতু মতিলাল রায় প্রভূত অর্থ ব্যয় করে ভাৎশালা, যশপুর, শ্যামপুর ছাড়া আরও কিছু অঞ্চলে পুকুর কেটে দিয়েছিলেন।

বর্ধমানে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বিদ্যাভ্যাস স্থান বিদ্যানগর। এই বিদ্যানগরে গৌরাঙ্গদেবের যে প্রাচীন মন্দির ছিল মতি রায় বহু অর্থ ব্যয়ে সেই মন্দির সংস্কার করেছিলেন। মূলত শ্রীরায় এই তীর্থের পুনরুদ্ধার করে যে কীর্তি রেখে গেছেন তা কখনই ম্লান হবে না। নবদ্বীপে তীর্থ যাত্রীদের অনেক দুর্ভোগ মতি রায়ের মনকে ভারাক্রান্ত করত, তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, সাধারণ তীর্থ যাত্রীদের জন্য একটি ধর্মশালার প্রয়োজন। অবশেষে সেই ধর্মশালা স্থাপন করেছিলেন তিনি। এখন সারা ভারতে ধর্মশালা স্থাপন ধনবান ব্যক্তিদের বিলাস, কিন্তু এই ভাবনার প্রবর্তক, এই কীর্তি স্থাপনার প্রথম পুরুষ মতিলাল রায়ের সেটা ছিল সাধারণ মানুষের প্রতি মানুষ হয়ে আন্তরিক কল্যাণ কামনা।

মতিলাল রায় তাঁর বাড়িতে দুস্থ ছাত্রদের রেখে, লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার এক পবিত্র ধর্ম পালন করেছেন যেমন, তেমনি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কন্যাদায় গ্রস্ত পিতাদের আর্থিক সাহায্য দান করে মানুষের নৈতিক দায়িত্ব পালন করেছেন।

প্রখ্যাত যাত্রা-অধিকারী নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় একবার মানভূমে যাত্রা করতে গেলে বিপন্ন হন, মতি রায় খবর পেয়েই ছুটে গিয়েছিলেন সেখানে। আজকের যাত্রায় সেই আদর্শ নেই বললেই চলে। সেদিন বন্ধু নীলকণ্ঠকে সাহায্য করে নীলকণ্ঠ যে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী এটা প্রমাণ না করার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মতিলাল। তিনি মানভূম থেকে নীলকণ্ঠকে উদ্ধার করে এনেছিলেন।

মহাকবি গিরীশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন মতি রায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু।

১২৭৮ থেকে ১৩০৯ এই বত্রিশ বছরের মধ্যে কপর্দক শূন্য অবস্থা থেকে মতিলাল রায় পৌঁছে গিয়েছিলেন খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার শীর্ষদেশে। ৩০টির বেশি গীতাভিনয় রচনা করেছিলেন। রচনা করেছিলেন এক হাজারেরও বেশি গান।

মতিলাল রায় যদিও ইতিহাসের পাতায় পালাকার বা গীতাভিনয় রচয়িতা হিসেবে অমর হয়ে

আছেন, তবুও এ কথা সত্য, নাটক বা যাত্রা ক্ষেত্রে প্রথমে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন নাট্যকার হিসেবে। ১২৭৬ সনে মতি রায়ের ছেলে ধর্মদাস রায়ের জন্ম হয়। ধর্মদাসের জন্মের মাস কয়েক পর মতিলালের স্ত্রী মনমোহিনী দেবীর মৃত্যু হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে মতিবাবু জি. পি. ও'র চাকরি ছেড়ে দিয়ে ফিরে যান ভাৎশালায়। ১২৭৮ সনে পারুলিয়ার গঞ্জে হরি রায়ের যাত্রা শুনতে যান মতি রায়। এখানেই পালাকার হরিনারায়ণ রায়ের সঙ্গে মতিবাবুর পরিচয় হয়। এই হরি রায়ের দলে মতি রায়ের নাটক 'তরণীসেন বধ' ও 'রামবিদায়' অভিনীত হয়। এই 'তরণীসেন বধ' নাটক রচনার পিছনে যে ঘটনা ছিল, এখানে তার কথা একটু বলি।

মতিলাল রায় যখন বালীতে ছিলেন তখনই তিনি একদিকে কবিতা আর অন্যদিকে নাটক লেখায় মন দেন। তাঁর সেই লেখার অনুরাগী পাঠক বা শ্রোতা ছিলেন বালীর একজন নাট্যপ্রেমিক। তাঁর অনুরোধ বা প্রেরণায় মতিলাল লেখেন 'তরণীসেন বধ' নাটক। 'প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, এই নাটক বালীর সখের মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল!—মনে রাখতে হবে এই সময়েই কলকাতার শোভাবাজারের জমিদার দেব বাহাদুরের বাড়িতে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং আরও কয়েকজন সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ব্যক্তি যে সখের থিয়েটার করেছিলেন সেখানে তাঁরা মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' মঞ্চস্থ করেন।

মতিলাল যখন কবি বা নাট্যকার হিসেবে কলম তুলে নেন তখন আমাদের দেশে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক পটভূমিকা কেমন ছিল, মতিলালের মনের ওপর তৎকালীন এই পরিস্থিতি বা পরিবেশ অথবা কর্মধারার প্রভাব কতটা আধিপত্য বা বিস্তার লাভ করেছিল, মতিলালের নাট্যকর্মের ভাবনায় এর কতটুকু প্রতিফলন ঘটেছিল সেদিকটার একটু বিশদ ব্যাখ্যা এখানে হাজির করা দরকার।

১২৭৯ সনে দিনাজপুরে পালা শেষ করে রংপুরে গান করতে যাবার সময় হরিনারায়ণের দলের কয়েকজন মতিলালকে ভাঙিয়ে নিয়ে নবদ্বীপে চলে আসেন। তারপর ১২৮০ (ইংরেজি ১৮৭৩) সালে মতিলাল স্বয়ং খোলেন যাত্রা দল। যাঁরা সেদিন মতিলালকে দল তৈরি করার ব্যাপারে সাহায্য সহযোগিতা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন, যন্ত্র শিল্পী রাজকৃষ্ণ দাস, গায়ক রামকৃষ্ণ বৈরাগী, গোবিন্দ বৈরাগী, ওস্তাদজী গোপালচন্দ্র দাস, গোবিন্দ দাস, নীলকণ্ঠ দত্ত আর রত্নমণি কুণ্ডু।

রত্নমণি সেদিন ১০০ টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন মতিলালকে। কিন্তু কে এই রত্নমণি?

স্বয়ং মতিলাল রত্নমণির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লিখেছিলেন,—"আপনার পরহিতসাধন-ব্রতাবলম্বিতা ও উদ্যমশীলতা গুণে উৎসাহিত হইয়া আমি ১২৮০ বঙ্গাব্দের ২৪ অগ্রহায়ণ 'নবদ্বীপ বঙ্গ গীতাভিনয় সম্প্রদায়' সংস্থাপনে সাহসী হই। সেই দিন হইতে আপনি যত্ন, পরিশ্রম ও আনুকূল্য বিষয়ে অনুমাত্র ত্রুটি করা দূরে থাকুক, আশার অতিরিক্তই করিয়াছেন এবং সম্প্রদায়টি যাহাতে দীর্ঘজীবী, জন সমাজে আদরণীয় ও প্রীতিপ্রদ হয় তজ্জন্য এখন পর্যন্তও কায়মনে যত্ন করিতেছেন। এই সম্প্রদায়ের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ও উন্নতি যাহা কিছু হইয়াছে, আপনি তাহার মূলাধার। আপনি নবদ্বীপে হিন্দু বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণের সাহায্যার্থে নিঃস্বার্থভাবে ৮০০০ টাকা এককালীন দান করিয়া বিদ্যোৎসাহিতার ও বদান্যতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু আমার প্রতি যেরূপ দয়া-দাক্ষিণ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষাকৃত মূল্যবান জ্ঞান করি। তজ্জন্য আমি আপনার নিকট চিরঋণী রহিলাম। এ ঋণ অপরিশোধনীয়—কস্মিন্‌কালেও পরিশোধ হইবার নহে।"

সেই রত্নমণি কুণ্ডুর কথা একটু বিস্তারিত বলি :

॥ শিকল ভাঙার গান শুনিয়ে গেছেন মুক্তামণি দাসী ॥

গল্পটা সেখান থেকে শুরু করা যাক। সেই সময় থেকে। নবদ্বীপে একবার একটা 'গেল গেল'

রব উঠেছিল। সমাজে এক সর্বনাশের ঝড় উঠেছিল সেই সময় থেকে। সে ঝড় তুলেছিলেন একজন মহিলা। নাম, মুক্তামণি দাসী। যেহেতু তিনি নবদ্বীপের বর্ধিষ্ণু হিন্দু পরিবারের বধূ ছিলেন সুতরাং নবদ্বীপের মত জায়গায় সেই বধূ একটি যাত্রা দল তৈরি করায় স্বাভাবিকভাবেই এই রব উঠেছিল। সমাজপতিরা সমাজের অকল্যাণ মনে করে সেই মহিলাকে শেষ পর্যন্ত এক ঘরে করেছিলেন।

নবদ্বীপের প্রখ্যাত তিলি ব্যবসায়ী জয়মণি কুণ্ডুর ছিল দুই ছেলে। একজনের নাম, রত্নমণি কুণ্ডু আর অন্যজন হলেন নীলমণি কুণ্ডু। এই জয়মণি কুণ্ডু ছিলেন প্রভূত অর্থের অধিকারী। তখনকার দিনে অবিশ্বাস্য টাকা খরচ করে দুই ছেলের বিয়ে দিয়ে ঘরে পুত্রবধূ এনেছিলেন জয়মণি। রাসের সময় বাড়িতে বিরাট মেলা যেমন বসত, তেমনি জয়মণি কুণ্ডুর রাস হতো খুবই জাঁকজমক-পূর্ণ। লোকে বলত, জয়মণির মেলা। মেলায় নানা উৎসব হতো। বড় বড় যাত্রা দল এসে কয়েকবার এখানে ঘাঁটি ফেলত। পালাগান করত।

এই সময়ে মতিলাল রায়ের খ্যাতি শীর্ষে। মতিলাল রায়ের যাত্রাকে 'মতি রায়ের যাত্রা' বলেই জানত সবাই। এই হেন মতি রায়ের দল বরাবর জয়মণি কুণ্ডুর রাসের মেলায় যাত্রা করত।

জয়মণি কুণ্ডুর মৃত্যুর পর দুই ছেলের ভিতরের সম্পর্কে চিড় ধরে। প্রতি বছর পালা করে রাস উৎসব চলত। যে বছর রত্নমণির পালা, তারপরের বছর নীলমণির। রত্নমণির সঙ্গে মতিলাল রায়ের সম্পর্ক মধুর ছিল। রত্নমণির রাসের সময় মতি রায় যাত্রা করতেন কিন্তু নীলমণির পালা পড়লে মতি রায় যাত্রা করতেন না। আর এই অপমানের জ্বালা সহ্য করতেন মুক্তামণি দাসী। বুঝতে পারতেন জ্ঞাতিদের ষড়যন্ত্র।

নীলমণি কুণ্ডু আকস্মিক মারা যান। স্বামীর মৃত্যুর পর মুক্তামণির মনে জ্ঞাতি বিদ্বেষ প্রবল হয়। যতদিন স্বামী বেঁচে ছিলেন, বাইরের এবং পারিবারিক অনেক অপমান মুখ বুজে সহ্য করেছেন মুক্তামণি। স্বামীর মৃত্যুর পর ছেলেদের মুখ চেয়ে কঠিন-কঠোর হয়েছিলেন তিনি।

এরপর যেবার মুক্তামণি রাসের মেলা আর উৎসব করলেন, সেবার মতিলাল রায়ের কাছে আর্জি পাঠালেন রাসে যাত্রা করার জন্য। কিন্তু মতিলাল প্রত্যাখ্যান করলেন। আসলে তিনি তো রত্নমণির কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ। প্রত্যাখ্যান পেয়ে মুক্তামণি ভিতরে ভিতরে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। এক সময়ে তিনি সমাজের সব বাধা-বিপত্তির গণ্ডি ছিঁড়ে বেরিয়ে এলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন, 'যাত্রা দল' তৈরি করে মতিলালের দম্ভ আর শক্তিকে খর্ব করবেন। ডেকে পাঠালেন জামাই রজনীকে। দল গড়ার সঙ্কল্পের কথাই শুধু শোনালেন না, রজনীকান্তের হাতে তুলে দিলেন প্রভূত অর্থ। শাশুড়ীর নির্দেশমত যাত্রা দল তৈরি হয়ে গেল। এ সব ১২৮৫ সনের কথা। এই যাত্রা দল তৈরির পিছনে মুক্তামণি দাসীর কি ভাবনা ছিল তার পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় মতিলাল রায়ের ছেলে ভূপেন্দ্রনারায়ণের লেখা মতিলাল রায়ের জীবনী বইতে।

বিবরণটি সংক্ষেপে এই রকম ঃ

"মুক্তামণি দাসী বড়ই ঈর্ষাপরায়ণা, দাম্ভিক ও জেদী স্ত্রীলোক ছিলেন।...১২৮৪ কি ৮৫ সালে শান্তিপুরে বড় গোস্বামী পাড়ায় যখন পিতৃদেব নবদ্বীপ হইতে চারিখানি নৌকাযোগে গান করিতে যান, সেই সময় বৌকুণ্ডু রামকৃষ্ণ দাস প্রভৃতিকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া পথিমধ্য হইতে ৩ খানি নৌকার সমস্ত ছেলে, বক্তৃতাকারীগণ ও গায়কদের ভাঙ্গাইয়া লইয়া নবদ্বীপে ফিরাইয়া আনিলেন। পিতৃদেব মাত্র সাজ যন্ত্রাদি এবং রাজকৃষ্ণ দাস, কৈলাশ গুঁই, গোপাল দাস, গোবিন্দ বৈরাগী এবং বেশকারী চাকর লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া মহা বিব্রত হইলেন। বড় গোস্বামীদের পরামর্শে পিতৃদেব সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপে ফিরিয়া নিজে এবং স্থানীয় প্রধান পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ভূবনমোহন শিরোমণি প্রভৃতির দ্বারা বৌকুণ্ডুকে উক্ত যাত্রা দলের লোকজন কয়েকদিনের জন্য

ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বৌকুণ্ডু কাহারও সম্মান রক্ষা করিলেন না। বরং "বৌকুণ্ডুর দল" নামে এক পৃথক যাত্রাদল করিলেন..."

বলা দরকার, যেহেতু মুক্তামণি দাসী কুণ্ডু বাড়ির বধূ ছিলেন সেই হেতু তাঁর দলের নাম হয়েছিল বৌকুণ্ডুর দল। সে যাই হোক, অতি অল্প সময়ের মধ্যে বৌকুণ্ডুর দল চরম খ্যাতি পেয়েছিল বটে, কিন্তু সেই দল পুরুষ শাসিত যুগে বেশি দিন টিকে থাকতে পারেনি। বৌকুণ্ডুর মত একজন সামান্য মহিলা মতিলালের মত বিরাট-বিশাল ব্যক্তিত্বকে অপমান করেছিল ভেবে নিয়ে সেদিন নবদ্বীপবাসী বহু শিক্ষিত এবং অভিজাত পরিবারের মানুষ মুক্তামণির সঙ্গে অসহযোগিতা করেছিলেন। ফল, সেই দল নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।

তাতেও মতিলাল কিন্তু থামেননি। পরবর্তী সময়ে রত্নমণির রাসের মেলায় যাত্রা করতে গিয়ে মতি রায় মুক্তামণিকে কটাক্ষ করে গান বেঁধেছিলেন ঃ

"রাম রতন মণির কৃপায়
কত মুক্তামণি ঠেলি পায়—"

সেই মুক্তামণির পরে অনাহারে মৃত্যু হয়েছিল। যে মহিলা এক সময়ে বিশাল বৈভবের মধ্যে সম্রাজ্ঞীর মত জীবন কাটিয়ে ছিলেন, সেই মহিলার এই বিস্ময়কর পরিণতির জন্য শুধু মতিলাল কিংবা তৎকালীন সমাজকে দোষ দিলে চলবে না, এই মৃত্যুর জন্য তাঁর ছেলেরা সম্পূর্ণ দায়ী। আসলে ছেলেদের উশৃঙ্খলতায় সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন মুক্তামণি। তবুও মুক্তামণি ওরফে বৌকুণ্ডু যাত্রার ইতিহাসের পাতায় বেঁচে থাকবেন, এটাই তাঁর বড় পাওয়া।

এখন যাত্রা উন্নত। যাত্রা সামাজিক স্বীকৃতিতে ধন্য। যাত্রা শিল্পের মর্যাদা পেয়েছে। যাত্রায় এখন নারী পুরুষের সমান উপস্থিতি, তবুও দল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার নজির কম নেই। এর কারণ, যে বৌকুণ্ডু, বৌমাষ্টারের মত মেয়েরা একদা সমাজের সব বাধা নিষেধের গণ্ডি মাড়িয়ে আলোয় এসে স্বামীর স্মৃতিরক্ষায় শুধু নয়, উত্তর কালের মেয়েদের যাত্রা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের দীক্ষায় দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। আজকের যাত্রার আসরে পুরুষের সঙ্গে মেয়েরা সমানভাবে অভিনেত্রী জীবন যাপন করেন।

আবার মতিলাল রায়ের কথায় ফিরে আসি।

১২৪৯ থেকে ১২৮০ অর্থাৎ ইংরেজি ১৮৪৩ থেকে ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত সময়কাল ছিল মতিলালের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার কাল। মতিলাল ছিলেন পরম বৈষ্ণব। বাবা ও মায়ের মতই মতি রায় ছিলেন বিষ্ণু ভক্ত। তাঁর এই ভক্তিভাব বিশেষ করে বিষ্ণু ভক্তি প্রায় রচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

মায়ের প্রতি মতিলালের ছিল নিদারুণ ভক্তি। তাই সবাই বলত—"মাতৃভক্ত"।

মতিলাল তাঁর 'ভরতাগমন' গীতাভিনয় মায়ের নামে উৎসর্গ করেছিলেন। এই উৎসর্গ পত্রে লেখা ছিল ঃ

"—স্নেহময়ী জননি! কোন সুবিজ্ঞ ব্যক্তি জননীকে স্বর্গ অপেক্ষা উচ্চস্থানীয়া বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। আমি বলি, যাঁহার তুলনা নাই, তাঁহাকে অপর বস্তুর সহিত উপমা দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। সূর্য্য খদ্যোত অপেক্ষা দীপ্তিশালী বলিলে কি সূর্য্যের উৎকর্ষতা সম্পাদন হয়? সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের সহিত পৃথকরূপে তুলনা করিলেও যখন একাধারে ত্রিগুণসম্পন্না জননীর তুলনা হয় না, তখন বিষ্ণুর একপাদাচ্ছাদ্য স্বর্গের সহিত তাঁহার উপমা দেওয়া কতদূর সঙ্গত?

জননি! ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের গুণ শাস্ত্র পরম্পরায় শ্রুত হইয়াছি মাত্র, ইহলোকে প্রত্যক্ষ করিবার অধিকার নাই, কিন্তু মা! আপনার গুণ ও কার্য স্বয়ং অনুভব করিয়াছি।

মা! আমি আপনার দীন তনয়, আমি কি দিয়া ঋণমুক্ত হইব? ঋণশোধ দূরে থাকুক এ জন্মে কিছুকালের নিমিত্ত গৃহে থাকিয়া যে আপনার চরণও সেবা করিব, তাহাও এ হতভাগ্যের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। শৈশব ও কৈশোরে বিদ্যাশিক্ষার্থ ও এক্ষণে অর্থোপার্জ্জন জন্য নিয়ত বিদেশে ভ্রমণ করিতে হইতেছে, সুতরাং দু'বার মা মা বলিয়া যে ডাকিব তাহাও ভাগ্যে নাই..."

মতিলাল ছেলেবেলা থেকে নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থেকে লেখাপড়া করতে ভালবাসতেন না বলেই ছাত্র হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল না। কিন্তু বিভিন্ন শাস্ত্র তিনি যে ভাবে অল্পবয়সেই পড়েছিলেন বা চর্চা করতেন তেমন প্রতিভাধর ছাত্রও তখন ছিল না। জ্যোতিষশাস্ত্রে, তন্ত্র ও পুরাণ শাস্ত্রে, ব্যাকরণে এমন কি পার্শীভাষায় তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। বাইবেল, কোরান ছাড়া বৈষ্ণবগ্রন্থ মতিলাল এত পড়েছিলেন যার কোন তুলনা হয় না। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর রীতিমত পাণ্ডিত্য ছিল ; আর এ সব কিছুরই স্ফূরণ ঘটেছিল তাঁর পালায়। তাঁর বহু গীতাভিনয়ে দেব বন্দনা মূলক স্ব-রচিত শ্লোক ছিল।

মতিলাল রায়ের ভণিতাযুক্ত একটি শ্লোকের নমুনা এখানে দেওয়া যাক ঃ

"যস্মিন্নোদয়তে বিকার-তিমিরং চৈতন্যচন্দ্রোদয়াৎ
বিশ্বেষাং প্রকৃতিঃ পরৈব বিমলা যস্য প্রসাদাশ্রিতঃ।
এষ শ্রী পুরুষোত্তমো বিজয়তে নাম্না জগন্নাথ
ভূস্তন্মাহাত্ম্যমবর্ণয়জ্জড়মতিস্তস্য প্রসাদাদিহ।।"

মতিলাল রায় কবি ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় যেমন লিখেছেন অনেক, তেমনি তদানীন্তন একাধিক মাসিক পত্র-পত্রিকায় তিনি লিখেছেন। মতি রায়ের সাহিত্য প্রতিভার কথা, নাট্য জ্ঞানের পর্যালোচনা করেছেন অনেকেই। ভূপেন্দ্রনারায়ণ যেমন মতিলাল প্রসঙ্গে অনেক কথা বলেছিলেন, তেমনি মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মতিলালের শাস্ত্রজ্ঞান সম্পর্কে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন।

কবি নীলকণ্ঠ দত্ত অনেকবারই মতিবাবুর প্রশংসা করেছেন কবিতায় ও গানে। এমন কি মতিলালের রূপ, গুণ ও যাত্রাদলের বর্ণনাও করেছেন কবিতায়! যেমন ঃ

"...বুদ্ধিতে বৃহস্পতি স্বভাবে পশুপতি প্রায়
তাঁর রূপ নিরিখি রতিপতি লজ্জাতে লুকায়।
শুভদিনে শুভক্ষণে সুমাত্রায় করে যাত্রার দল,
ভাল হল মুখ উজ্জ্বল,
আবালবৃদ্ধ লোক সকল গাহনা শুনে হয় বিকল গো,
(আবার স্বঃগুণে কলিকাতা শহর করেছেন দখল)
সাবেক দলের দলপতি দলচাপা সব পড়েছে।।
ভদ্রজাতি যত জনে, আছেন পরম যতনে,
তাঁরা অকৃতী নয় কৃতকর্মা, বিক্রীত হয় স্ব-গুণে,
আমি দলের গুণ বর্ণি কেমনে..."

মতিলাল দক্ষিণ ভারতেও অনেকবার যাত্রা করেছেন। একবার চিত্রকূট পর্বতের কাছে যাত্রা করতে গিয়ে পাহাড়ে উঠতে গিয়ে পড়ে যান, আহত হন। বর্ধমানের প্রখ্যাত মাধব ডাক্তার তাঁর চিকিৎসা করেছিলেন। মতিলাল সেই সময়ে যে সামাজিক মর্যাদা পেয়েছিলেন, তেমন মর্যাদা আজ পর্যন্ত আর কোন যাত্রার মালিক, অভিনেতা পাননি।

মতি রায় ছিলেন স্বভাব কবি। যখন-তখন কবিতা বা গান মুখে মুখে রচনা করার শক্তি তাঁর

প্রবল ছিল। মতিলাল নিজে গায়ক ছিলেন না। তাঁকে যাত্রার আসরে কেউ কোনদিন গান গাইতে দেখেনি। দুই ছেলেও সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন না। তাঁর পালায় গানে সুর দিতেন নেত্য বেহালাদার। মতিবাবুর কাকা হরিচরণ রায়ের জামাই হলেন স্বনামধন্য সুরকার দেবকণ্ঠ বাগচী। দেবকণ্ঠ মতিবাবুর অনেক পালায় সুর দিতেন।

১৩০৯ সনে মতি রায় তাঁর দলের সব দায়-দায়িত্ব ছেলে ধর্মদাসের উপর দিয়ে দেন। মতিবাবুর যাত্রা সম্প্রদায় প্রায় ৬৪ বছর স্থায়িত্ব লাভ করেছিল। মতিবাবুর অনেক শ্রম, অনেক রক্ত দিয়ে গড়ে তোলা যাত্রা দলকে বহুবার ভেঙে ফেলার ষড়যন্ত্র হয়েছিল। এই ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন "বৌকুণ্ডু"। সেই রোমাঞ্চকর ঘটনার কথা আগে কিছুটা উল্লেখ করেছি।

সেই আকস্মিক বিপর্যয়ে মতিলাল যে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিলেন তা নয়, তিনি নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজের কাছ থেকে আশীর্বাদ পেয়ে আবার নতুন করে দল তৈরি করেছিলেন। 'বৌকুণ্ডু'-র এই ঘৃণ্য আচরণে মতিলাল কিন্তু এক নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন, তা হলো নবদ্বীপ-শান্তিপুরের বেশ কয়েকজন অভিজাত বংশীয়, শিক্ষিত যুবক মতিবাবুর দলে এসে যোগ দিয়েছিলেন! এর ফলে মতিলালের খ্যাতি আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

মতিলালের দল আর ভেঙেছিল কি না জানা যায় না। তবে দলের সুশিক্ষিত অভিনেতাবা মাঝে মাঝে সামান্য বেশি টাকা পাবার লোভে দল ছেড়ে অন্যদলে চলে যেতেন, এর জন্য মতিলালকে মাঝে মাঝে বিপন্ন হতে হতো। এই অভিশাপ আজকের যাত্রা জগতের অধিকাংশ মালিক বা প্রযোজকদের বহন করতে হচ্ছে।

আর একবার মতিলাল মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন আপন ভাইপো ব্রজলালের কাছ থেকে। ব্রজলাল রায়। ব্রজলাল ছিলেন মতিলালের বিশ্বস্ত সহকারী। তাঁকে মতিলালই গড়ে তুলেছিলেন নিজের মনের মত করে। কিন্তু পরে বুঝেছিলেন, শিব গড়তে বাঁদর গড়া হয়েছে। একবার যাত্রা করতে যাবার পথে ব্রজলাল মতিবাবুর দলের বেশ কিছু লোক ভাঙিয়ে কেটে পড়েছিলেন। দল আসরে যেতে পারেনি। মতিলাল টেলিগ্রাম করে দুঃসংবাদ জানিয়ে দিয়েছিলেন নায়েক পক্ষকে।

ব্রজলাল সেই লোকজনদের নিয়ে নিমতলা স্ট্রীটে দল তৈরি করেছিলেন, নিজে কিছুটা নাম যশও করেছিলেন, কিন্তু বেশি দিন দল বাঁচাতে পারেননি। যা হোক, মতিলাল যাঁদের নিয়ে দল চালাতেন তাঁদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা পাওয়া যায় না। তবে দল তৈরি করেছিলেন যে দশজন অংশীদারকে নিয়ে, তাঁদের মধ্যে যে পাঁচজনের নাম পাওয়া যায়, তাঁরা হলেন—রাজকৃষ্ণ দাস, গোবিন্দ দাস, গোপাল দাস, নীলকণ্ঠ দত্ত, রামকৃষ্ণ বৈরাগী।

নীলকণ্ঠ দত্ত জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মতিলালের দলে জড়িত ছিলেন। অভিনেতা হিসেবে শক্তিমান ছিলেন, মূলত কুঁজীর ভূমিকায় অর্থাৎ মন্থরা চরিত্রে অভিনয় করে শ্রীদত্ত প্রশংসা পেয়েছিলেন।

প্রথমদিকে দলের ম্যানেজার হন হারাধন মুখোপাধ্যায়। বেশ কয়েকবছর ম্যানেজারি করার পর তিনি মতিলালবাবুর বিষয়-সম্পত্তি দেখা শোনার দায়িত্ব পান, তখন ম্যানেজার নিযুক্ত হন হরিপ্রসন্ন পান। রাজকৃষ্ণ দাস ছিলেন তবলাবাদক। রামকৃষ্ণ দাস ছিলেন গায়ক। আর একজন তবলচী ও পাখোয়াজ বাজিয়ে ছিলেন। তাঁর নাম পাঁচু।

বেহালা বাদক ছিলেন তিন জন। নেত্য, শান্তিপুরের মহেন্দ্র হাড়ি আর নবদ্বীপের নীলকণ্ঠ রাঢ়ী। রাঢ়ী ভদ্রলোক পরে দল ছেড়ে দেন এবং চন্দননগরে গিয়ে বিদ্যাসুন্দরের দল তৈরি করেন। জুড়ি গায়কদের মধ্যে গোবিন্দ ছাড়াও ছিলেন ফণি দুলে। এই ফণি দুলের গলার গান সবাইকে মুগ্ধ

করত। তিনি ছিলেন বর্ধমানের দশঘড়ার বাসিন্দা। রমানাথ বাগ্‌দী আর পাঁচু বাগ্‌দী এঁরা দু'জনে ছিলেন একক গায়ক। এঁরা বেহালার সঙ্গে সুরে সুরে গান গাইতেন। অভিনেতাদের তালিকায় আরও কয়েকজনের নাম পাওয়া যায়। যেমন নবদ্বীপের গৌর বৈরাগী, মহেন্দ্র কোটাল। দৈত্য-দানব ইত্যাদি চরিত্রে মহেন্দ্র কোটালকে যেমন মানাত, তেমনি অভিনয়ও করতেন চুটিয়ে। অর্জুন ঃ হরিপদ পাটনী। রাবণ ঃ নীলমণি বিশ্বাস। এই নীলমণি বিশ্বাস ছিলেন বিশালদেহী। তাঁর চোখ দুটো ছিল খুবই বড় এবং উজ্জ্বল। কৈলাস গুঁই, গোরা কৈবর্ত আর ভজহরি এই তিনজন ছিলেন কৌতুক অভিনেতা। কিঙ্কর নামে এক ভদ্রলোক সাজতেন কৃষ্ণ। তিনি রূপে ও অভিনয় গুণে আসর মাতাতেন! সবার প্রিয় ছিলেন। যোগীন সেন ছিলেন ভীষণ জনপ্রিয় অভিনেতা। তিনি একাই অনেক সময় দু'তিনটি চরিত্রে অভিনয় করতেন। এই যোগীন সেন আর ক্ষেত্র চক্রবর্তী এঁরা মতি রায়ের পর ধর্মদাস তারপর ভূপেন্দ্রনারায়ণ এই তিন পুরুষের দলে অভিনয় করেছেন।

প্রখ্যাত নাট্যকার ও সুরকার দেবকণ্ঠ বাগচীর ছেলে তারকনাথ বাগচী নৃত্যশিক্ষকতায় যেমন তদানীন্তন থিয়েটার জগতে সুবিখ্যাত ছিলেন, তেমনি ছিলেন যাত্রাতেও। এই তারকনাথ মতিলালের জীবনের শেষ দিকে তাঁর দলের নৃত্য শিক্ষক ছিলেন।

১২৫ থেকে ১৩০ জন লোক নিয়ে তৈরি হয়েছিল মতিলাল রায়ের দল, যা অদ্যাবধি আর কোন যাত্রাতে দেখা যায়নি, সম্ভবও ছিল না।

মতিলাল পুরাণ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন যার অজস্র প্রমাণ আছে, তথাপি মতিলাল তাঁর পালাগুলি বিভিন্ন অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের দিয়ে সংশোধন করে নিতেন, এখন যাকে কথায় কথায় বলা হয় 'এডিট' করা। বর্তমানে যাত্রা পালায় যা 'সম্পাদনা' নামে অভিহিত। মতিলালবাবুর পালার সংশোধন করতেন প্রধানত অক্ষয়কুমার সিদ্ধান্ত রত্ন। এই অক্ষয়কুমার ছিলেন ফরিদপুরের অধিবাসী, পরে কলকাতায় এসে কম্বুলিটোলা আর ১৫নং শ্যামবাজার স্ট্রীটে জ্যোতিঃশাস্ত্র ব্যবসা করতেন।

এ ছাড়া কলকাতার সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপক পণ্ডিত শিবনারায়ণ বাচস্পতিও মতিলালের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করে দিয়েছেন অনেকবার।

নবদ্বীপের পণ্ডিত রামরতন ভট্টাচার্য পাণ্ডুলিপি সংশোধন করেছেন, আবার যখন মতিবাবুর এই যাত্রার পাণ্ডুলিপি বই আকারে প্রকাশিত হতে থাকল, তখন তার প্রুফ রিডিং যাঁরা করতেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যাঁদের নাম তাঁরা হলেন, সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগরের পাঁচবেড়িয়ার ক্ষেত্রনাথ হালদার, নবকুমার বসু, আশুতোষ পাল আর রতন ভট্টাচার্য।

নবদ্বীপের পণ্ডিত অহিভূষণ (কাব্যতীর্থ) ভট্টাচার্য "শ্রীক্ষেত্র মাহাত্ম্য" গীতাভিনয়ের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করেছিলেন। মতিলাল রায়ের মৃত্যুর পর প্রকাশিত "যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ" সংশোধন করে দিয়েছিলেন ছেলে ধর্মদাসের অনুরোধে পণ্ডিত শ্যামাচরণ কবিরত্ন। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সর্বজনপ্রিয় প্রকাশক। ইনি মতিলালের অধিকাংশ বই প্রকাশ করেছিলেন।

নবদ্বীপে নিজের বাড়িতে মতিলাল রায় তাঁর দলের প্রতিষ্ঠা দেন। পরে কলকাতায় ২৭নং আহেরীটোলা স্ট্রীটের বাড়িতে দলের গদিঘর তৈরি করেছিলেন। বাড়িটি ছিল তিনতলা প্রাসাদতুল্য। গোটাবাড়ি মাসিক ৫০ টাকায় মতিবাবু ভাড়া নিয়ে দোতলা ও তিনতলায় যাত্রার দল রাখতেন। পালার রিহার্সাল থেকে সবার থাকবার সুব্যবস্থা ছিল এই বাড়িতেই।

মতিলাল রায়ের বেশ কিছু বাঁধা আসর ছিল। আসর বলতে অবশ্যই রাজ-রাজড়া, জমিদারদের বাড়ির অঙ্গন বা বাগানবাড়ি ধরে নিতে হবে। প্রতি বছর যে পালাই মতিলাল করুন

না কেন, এই বাঁধা আসরে গাওনা তাঁকে করতেই হতো। এর মধ্যে বিশেষ ভাবে সে আসরগুলির কথা বলা দরকার সেগুলি হলো ঃ

॥ চকদিঘীর জমিদার ললিতমোহন সিংহরায় ॥

চকদিঘীর ডাকসাইটে জমিদার ললিতমোহন সিংহরায়ের বাগানবাড়িতে বাঁধা বন্দোবস্ত ছিল। মহাপূজার সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী এই চারদিনই ঐ বাগান বাড়িতে মতিলালের যাত্রা হতো! প্রথম তিন দিন আসর বসত রাতে। দশমীর দিন সকাল ১০ কি ১১টার সময় পালা হতো। ওদিকে ভাৎশালার বাড়িতে মতিলাল নিজে ঘটা করে দুর্গাপূজা করতেন বলে, ব্রজলাল থাকতেন বাড়িতে। অষ্টমী আর নবমী এই দু'দিন মতিলালের বদলে ব্রজলাল গান চালাতেন, মতিলাল যেতেন ভাৎশালায়। এই চার রাতের জন্য মতিলাল খোরাকি টাকা পেতেন ১৫০০ টাকা। মনে রাখতে হবে, তখন কোথাও টিকিট সেলের গান হতো না। খোরাকির টাকা আর উপঢৌকনই ছিল দলের আয়! দশমীর দিন জমিদারের পক্ষ থেকে 'পূর্ণপাত্র' দেওয়া হতো মতিলালের হাতে। সেই পূর্ণপাত্রে থাকত নতুন কাপড়, নানাবিধ মশলা আর গিনি। এই 'পূর্ণপাত্র' ছিল মতিলালের সম্মান।

॥ সিয়ারসোল রাজবাড়ি ॥

সরস্বতী পুজোতে যে সমারোহ, যে প্রভূত অর্থব্যয় করতেন বর্ধমান জেলার সিয়ারসোলের রাজা বা রাজ পরিবারের লোকেরা তার আর কোন নজির মেলে না। এক দিনের পুজো অথচ গোটা রাজবাড়ি এবং অনেকটা জায়গা জুড়ে মহা উৎসব চলত তিন দিন। সারাদিন আর সারারাত ধরে চলতো বিভিন্ন গান বাজনা, আনন্দ অনুষ্ঠান। মনোবম মেলা বসত চাবদিকে। এর মধ্যে প্রধান অনুষ্ঠানই ছিল মতি রায়ের যাত্রা। পরপর তিন রাতই হতো যাত্রা। কয়েক হাজার দর্শক সমাগম হতো। একদা যে যাত্রাগান অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট বলে মেয়েদের যাত্রা দেখা পাপ ছিল, সে যাত্রার আসরে শতাধিক নারী ও পুরুষের ঢল নামতো যাত্রা দেখার জন্য। মতিলালই যাত্রাগান বা লোকনাট্যের ক্ষেত্রে প্রথম পুরুষ যিনি দেশে দেশে যাত্রার জয়যাত্রা এনে দিয়েছিলেন সাধারণ, অতি সাধারণ, এমন কি অভিজাত-শিক্ষিত মানুষকে যাত্রা দেখায় উদ্বুদ্ধ করে। সিয়ারসোলের স্থানীয় মানুষেরা তো কাতারে কাতারে আসতই, তা ছাড়া বাঁকুড়ার শত শত মানুষ আসত দামোদর নদী পার হয়ে। সব চাইতে বড় এবং উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, এখন কোলিয়ারী অঞ্চলে যে যাত্রা ব্যবসার রমরমা অবস্থা, মতিলালই বোধ করি তার বীজ বপন করেছিলেন। এই রাজবাড়ির অঙ্গনে তিন দিনের মধ্যে একদিন নির্দিষ্ট ছিল শুধুমাত্র কয়লাখনি অঞ্চলের মজদুরদের জন্য। তাঁদের যাত্রা দেখে আলোয় আলোয় ঘরে ফেরার কথা মনে রেখেই এই নির্দিষ্ট যাত্রার আসর বসত দিনে।

হাজার হাজার দর্শকদের মধ্যে সিয়ারসোল রাজার বন্ধু অন্য রাজারাও আমন্ত্রিত অতিথির আসরে শোভা পেতেন। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য কাশীপুরের মহারাজ। এই রাজবাড়ি থেকে মতিলাল রায় ও তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য খোরাকির টাকা তো দেওয়া হতোই, তা ছাড়া তাঁর প্রতি সম্মান-দক্ষিণা হিসেবে আলাদা দেওয়া হতো ১০০০ টাকা।

॥ মালিয়ারা রাজবাড়ি ॥

বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া থানার অন্তর্গত মালিয়ারার রাজা রাজনারায়ণ চন্দ্রাধুর্য ছিলেন যাত্রা প্রেমী। বিশেষ করে যাত্রা সম্রাট মতিলাল রায়ের প্রতি তাঁর ভালবাসা আর শ্রদ্ধা অফুরন্ত। প্রতি বছর এক রাতের জন্য মতি রায়ের যাত্রা বাঁধা ছিল রাজবাড়িতে। এক রাতের আসরে এলে মতিলালের ক্ষতি হতে পারে সে কথা ভেবেই মালিয়ারা গ্রামের উৎসাহী যুবকরা পরপর আরও দু'রাত অভিনয় করার জন্যে মতিলালকে প্রায় বেঁধে ফেলেছিল, এটা সম্ভব হয়েছিল দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়ের জন্য। ধনাঢ্য-উদার এই মানুষটির নেতৃত্বেই মূলত দু'দিনের এই যাত্রার আসর বসত। এও ছিল স্থায়ী বন্দোবস্ত।

॥ বড়জোড়ায় মতিলাল ॥

মালিয়ারার নাগরিকদের সঙ্গে সমানভাবে পাল্লা দিয়ে বড়জোড়া গ্রামের 'শিবের গাজন' আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতির উদ্যোক্তারাও মতিলালের সঙ্গে স্থায়ী বন্দোবস্ত করে নিয়ে যাত্রা করাতেন।

॥ অণ্ডালের রায়সাহেবের বাড়ি ॥

বর্ধমান জেলার অণ্ডাল গ্রামের বর্ধিষ্ণু, অভিজাত ও ধনাঢ্য ব্যক্তি মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় বাসন্তী পুজোর সময়ে মতিলালের যাত্রার আসর বসাতেন। সেই গান শেষ করে মতিলাল যেতেন অণ্ডাল থানার অন্তর্গত দক্ষিণখণ্ড গ্রামে, সেখানেও প্রতি বছর এক পালা গান হতো তাঁর।

॥ নূতনগঞ্জে মতিলাল ॥

বর্ধমান শহরের নূতনগঞ্জে প্রতি বছর গন্ধেশ্বরী পুজোর সময়ে, বৈশাখী পূর্ণিমায় বরাবরই মতিলাল রায় যাত্রা করতেন। এ ছাড়া আর যাঁদের প্রাসাদে বা আসরে মতিলাল রায়ের যাত্রা হতো তার তালিকা এই রকম ঃ

দশঘবার জমিদার বিপিনকৃষ্ণ রায়ের বাড়িতে, আমলাজোড়ার জমিদারের বাড়িতে যেমন যাত্রা হতো মতিলালের, তেমনি কাশিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ী, কুচবিহারের রাজা, রাজশাহী, পুঁটিয়ার এবং নাটোরের মহারাজা মতিলাল রায়ের যাত্রার আসর বসাতেন যথার্থ শ্রদ্ধা সহকারেই। উত্তরবঙ্গে বলীহার (পাবনা), বেলেটী ও কাঁকিনা (রাজশাহী), ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার জমিদার ও রাজবাড়িতে মতিলাল নতুন যাত্রা আসরস্থ করতেন।

মুক্তাগাছার রাজা জগৎকিশোর রায়চৌধুরী একবার মতিবাবুর দলের "ভীষ্মের শরশয্যা" যাত্রা দেখে এতই খুশি হয়েছিলেন যে নিজের হীরের আংটিটি খুলে মতিলালের আঙুলে পরিয়ে দিয়েছিলেন।

কুচবিহারের রাজার বিয়ে উপলক্ষেও মতিলালের যাত্রা হয়েছিল।

মতিলাল রায়ের দলের অধিকাংশই ছিলেন কৃষিজীবী। পৌষ মাসে ধান কাটার সময় বলে, এই মাসে দলের ছুটি থাকত। মাঘ মাস থেকে মতিলালের অভিযান শুরু হতো। তখনকার দিনে মতিলাল তাঁর অভিনেতা ও কর্মীদের মাইনে দিতেন ১৫ টাকা থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত। গায়ক রমানাথ বাগ্‌দী পেতেন ৮০ টাকা মাইনে।

১৩০৯ সনে ছেলে ধর্মদাসের ওপর দলের সব দায়-দায়িত্বভার তুলে দিয়ে মতিলাল নবদ্বীপের বাড়িতে অবসর জীবন যাপন করেছিলেন।

মতিলাল যখন ধর্মদাসের ওপর সব ছেড়ে দিয়ে অবসর যাপন করছিলেন তখন আর এক বিপত্তি দেখা দিল। ধর্মদাস তাঁর দল নিয়ে গেলেন কুচবিহার রাজবাড়িতে। কিন্তু রাজা ধর্মদাসের যাত্রা প্রত্যাখ্যান করলেন। রাজার বদ্ধমূল ধারণা ছিল, মতির ওপরে এ দেশে আর কোন যাত্রাওয়ালা থাকতে পারে না, সেই মতি যখন দলে নেই তখন যাত্রা শুনেও কোন কাজ নেই। খবর পেয়ে মতিলাল ছুটে গিয়েছিলেন কুচবিহার। এরপর থেকে আরও কয়েক বছর মতিলালকে দলের সঙ্গে থাকতে হতো। তিনি অভিনয় করতেন না।

অনেক প্রিয়জনের অকাল মৃত্যু, চোখ অপারেশন, প্রিয় বন্ধুদের আকস্মিক হারিয়ে যাওয়ার জন্য মতিলালের দেহ ও মন সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়েছিল। তিনি ডবল নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। সুস্থ হলেও এতই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁকে কাশীধামে পাঠানো হয়েছিল। এই কাশীধামেই ১৩১৫ সনের ৪ পৌষ তাঁর মৃত্যু হয়, এবং মণিকর্ণিকায় দাহ করা হয়।

মতিলাল রায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একটা যুগের অবসান হয়ে গেল।

মতিলাল থিয়েটারের অনুকরণে, থিয়েট্রিক্যাল অপেরা পার্টি' তে পৌঁছে দিয়েছিলেন যাত্রাকে, অর্থাৎ আজকের যাত্রায় যে ধারা এসেছে মতিলালই তার প্রবর্তক।

মতিলাল যাত্রাকার বা পালাকার হিসেবে জীবদ্দশাতেই কিংবদন্তী হয়েছিলেন। তাঁর আশ্চর্য এবং বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা আজও কল্পনা করা কষ্টসাধ্য। জীবদ্দশাতেই তাঁর লেখা পালার বিষয়বস্তু অন্য যাত্রার অধিকারীরা চুরি করত, এ দেখে-শুনেও মতিলাল কখনই উত্তেজিত হতেন না। মতিলালের বহু পালা যখন বাজারে জাল হতে থাকল তখনই তিনি এক উপায় উদ্ভাবন করলেন, তাতে এই চৌর্যবৃত্তি কিছুটা রোধ হয়েছিল। এখন যেমন সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিখ্যাত লেখা বা লেখকের নাম জাল হয়, তা রোধ করার জন্য স্বনামধন্য সাহিত্যিক বিমল মিত্র যেমন তাঁর বইতে নিজের ছবি ও স্বাক্ষর ছাপতে থাকেন, শুধু বিমল মিত্র কেন অনেক সাহিত্যিকই এই পথে নিজেকে বাঁচান, তেমনি করেই মতিলালের ছাপা পালায় মতিলাল নিজের ছবি ও মোহর ব্যবহার করতেন। অনেক বই আগেই রেজিস্ট্রী করেও রাখতেন। স্বাক্ষর দিতেন এই ভাবে—Baboo Mutty Lal Roy.

॥ মতিলালের লেখা নাটক আর গীতাভিনয় ও যাত্রাপালার তালিকা ॥

১ম লেখা ঃ তরণীসেন বধ (নাটক)। পরে এটি পালায় রূপান্তরিত হয়।

২য় লেখা ঃ রাম বনবাস বা রাম বিদায়। ১২৮০ সনে লেখা।

৩য় লেখা ঃ কালীয়সর্পদমন।

এরপর ঃ ভরতমিলন, মহালীলা, সীতাহরণ, দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ, বিজয় চণ্ডী, পাণ্ডব নির্বাসন। নিমাই সন্ন্যাস, ভীষ্মের শরশয্যা, রামরাজা, কর্ণবধ, লক্ষ্মণভোজন, ব্রজলীলা, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক, সীতা অন্বেষণ, গয়াসুরের হরিপাদ-পদ্মলাভ, জগন্নাথের মাহাত্ম্য বা ক্ষেত্রধামের মাহাত্ম্য, রাম পরিণয় ও সুবচনী মাহাত্ম্য।

মতিলালের পালার বিষয়বস্তু পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ

(১) রামায়ণ কাহিনী আশ্রিত (২) ভারতকথা অবলম্বন (৩) কৃষ্ণলীলা বিষয়ক (৪) অন্যান্য পুরাণ আশ্রিত (৫) লৌকিক কাহিনী ও ব্রতকথা অবলম্বনে মূলত গীতাভিনয়।

মতিলাল তাঁর গীতাভিনয়ে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে খুবই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। চরিত্রগুলির গুরুত্ব অনুসারে তাদের সংলাপের তারতম্য ঘটিয়েছিলেন। যেমন ঃ মুনিঋষিদের ভাষা খুবই পাণ্ডিত্যপূর্ণ।

দুর্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ, রাম এঁরা সংলাপ বলতেন সংস্কৃত ঘেঁষা। নারী চরিত্ররা অপেক্ষাকৃত সরলভাষায় কথা বলতেন। ধৃতরাষ্ট্র, ভীম, দুঃশাসন, শকুনি এঁদের ভাষা সরল। মন্থরা প্রভৃতি চরিত্রগুলির মুখ দিয়ে মতিলাল পল্লীবাঙলার কথ্যভাষা ব্যবহার করেছিলেন। সম্পূর্ণ কথ্যভাষা বেশি ব্যবহার করেছেন হাস্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।

যাত্রাগানকে সর্বজনপ্রিয় করে তোলার জন্য অনেক নতুন নতুন বিষয় অবতারণা করতেন। জুড়ি গানকে মতিলাল এতই জনপ্রিয় করেছিলেন যে, এই শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত অনেক পালাতেই জুড়ি গানের প্রচলন ছিল।

যাত্রায় বালক বা ছেলের গান সংযুক্ত করে গানের মধ্যেও যে বৈচিত্র্য এনেছিলেন তাকে এই শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত অনেকেই অনেক নামে চিহ্নিত করেছেন। কেউ কেউ বলেন 'সখীর ব্যাজ', কেউ কেউ বলে 'ব্যালে ট্রুপ'। মতিলালের দলে জুড়ি ছিল ৮।১০ জন। ছেলে বা বালকের দলে ২৫।৩০ জন। বেহালা বাজাতেন ঃ ৪।৫ জন। [বলা দরকার, যাত্রায় বেহালার একটা

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, এই বাদ্যযন্ত্রটিরও প্রসার ছিল, কিন্তু বর্তমান যাত্রায় বেহালা প্রায় নিশ্চিহ্ন]।

মতিবাবুর দলে সাজ-পোশাক যেমন ছিল অতি মূল্যবান তেমনি ছিল চিত্তাকর্ষক।

জুড়িরা পাজামার সঙ্গে মখমলের আলখাল্লা পরতেন। এই জামায় থাকত আসলি জরির কাজ আর বড় বড় বোতাম। ছেলেরা পরত মূল্যবান ভেলভেটের তৈরি ও জরি বসানো কোট আর পায়জামা। মাথায় পরত খুব দামি টুপি, তাতে বড় বড় হরফে লেখা থাকত "মতিলাল রায়"।

আসরের রূপ ঃ অনেকটা প্রশস্ত জায়গা জুড়ে তৈরি হত যাত্রার আসর। আসরের চারপাশে গোল হয়ে বসতেন বাদ্যকাররা। বাদ্যকারদের সামনে বসে থাকত ছেলেরা। ছেলেদের সামনে জুড়ি। জুড়ি বা বালকেরা বসে থাকত, প্রয়োজন মত উঠে দাঁড়িয়ে গান করে আবার বসে পড়তো। এই আসরের চারদিকে লোক বসত। একদিকে দর্শকদের ভিতর দিয়ে যাতায়াতের জন্য একটা রাস্তা থাকত।

বাজনার রূপ ঃ প্রথমেই ঢোল বাজানো হতো! এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, যত দূর পর্যন্ত ঢোলের আওয়াজ যাবে ততদূরের লোকেরা যাতে দেরি না করে আসরে জমায়েত হয়, তার জানান দেওয়া। ঢোল থামলে, একসঙ্গে সব বাজনা একটা সুরের ওপর ভিত্তি করে বেজে উঠত। এই বাজনা বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলার পর, সুর বদল হয়ে গিয়ে যখন অন্য সুরে বাজতো তখনই আসরে নাচ আরম্ভ হতো। জন চারেক ছেলে, মেয়েদের মত সেজে এসে নাচত। নাচ শেষ হলেই বিষয় আরম্ভ। এই নাচে অনেক সময় নাচিয়ে মেয়েরূপী ছেলেরা কখনো কাঁখে রাখত ঘড়া অথবা কলসি। কখনও মাথায় থালা নিয়েও নাচত। নাচ শেষ হলে আরম্ভ হতো জুড়ি গান। অপরূপ জুড়ি গানের ভিতর দিয়ে দর্শকদের মনকে আসরের ওপর গভীরভাবে নিবিষ্ট করে নেওয়ার পরই আসরে শুরু হতো গুরু বন্দনা বা দেব বন্দনা এবং বিষয়বস্তুর ধারাভাষণ। তার পরেই নারদ বা অন্য মুনিঋষির নিখুঁত বেশ আর রূপসজ্জায় আবির্ভূত হতেন স্বয়ং মতিলাল।

মতিলালের যাত্রায় নৃত্যের ব্যবহারও ছিল চমকপ্রদ। এই সব নাচের ভিতর দিয়েই শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীভৎস, ভক্তি ইত্যাদি রস এমন জীবন্ত হয়ে উঠত যার নজির আর কোথাও পাওয়া যেত না। মতি রায় এক ধরনের টেবিল নাচের প্রবর্তন করেছিলেন। কয়েকজন চাকর একটা বড় টেবিল আসরে দিয়ে যেত। সেই টেবিলের ওপর পেতে দিয়ে যেত রংবেরঙের চাদর।

টেবিলের চারকোণে নাচিয়েরা (মেয়ে বেশে আবার ছেলেরাও) এমন সুন্দর নাচতেন যা দেখে দর্শকরা অভিভূত হতেন। আট থেকে ন' ঘণ্টা পালা হতো, অথচ সমস্ত দিক থেকে মতি রায় এমন করে পালা উপস্থাপিত করতেন যাতে একজন দর্শক বাইরে যাবার কথা ভাবতেও পারতেন না।

আসরে কোন অভিনেতা যদি কোন কারণে অভিনয়ের সুর কেটে দিতেন, মতি রায় তাকে শাস্তি দিতেন, হয় বেতন কেটে না হয় বসিয়ে দিয়ে। প্রয়োজন বোধে সেই চরিত্রে নিজেই অভিনয় করে দিতেন, অথবা আসরে দাঁড়িয়েই এমন মুনশিয়ানার সঙ্গে পালা এডিট করে দিতেন যা সাধারণ লোকেরা বুঝতে পারত না।

আসরে অধিকাংশ পালার শেষে মতিলাল দেব-দেবীর যুগল মূর্তি দেখাতেন। যেমন রাধা-কৃষ্ণ, হর-পার্বতী ইত্যাদি। এই অভিনেতারা এমন রূপ ও সাজ-সজ্জা করতেন দর্শকরা ভাবত যেন জীবন্ত প্রতিমা। আবার কিছু পালায় বিশেষ করে 'জগন্নাথ মাহাত্ম্য' বা শ্রীক্ষেত্র পালায় কাঠের তৈরি, প্রমাণ মাপের জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার মূর্তি হাজির করে দিতেন। প্রভূত অর্থে এগুলি তৈরি করাতেন মতিলাল।

"হরধনুর্ভঙ্গ" পালার জন্য তৈরি করা হয়েছিল এক বিশাল ধনুক। ধনুকের মাঝখানে একটা খিলান এমনভাবে লাগানো ছিল, যা রামচন্দ্র খুলতেন, মনে হত ধনুকটি ভেঙে গেল। দর্শকরা সেই

কৌশল ধরতে পারত না। ভীষ্মের শরশয্যা একেবারে আসরে দেখাতেন। তীরের মত দেখতে অনেকগুলি লোহার মোটা মোটা তার মানুষপ্রমাণ একটা অর্ধবৃত্তাকার লোহার ফ্রেমের মধ্যে বসানো থাকত। তার উপরে মানুষ শুতে পারে এমন লোহার পাত লাগানো। ভীষ্ম শুয়ে থাকলে মনে হতো শরশয্যায় আছেন।

আরও বিস্ময়কর আঙ্গিক ছিল মতিলালের পালায়। 'পারিজাতহরণ' পালায় সত্যভামার পুণ্যক ব্রত অনুষ্ঠানকালে ধন-রত্নের সঙ্গে কৃষ্ণকে ওজন করার জন্য আসরে সত্যি সত্যি দাঁড়িপাল্লা খাটানো হতো।

মতিলাল রায় তাঁর প্রতিটি পালাকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে দিতে দিতে সম্প্রদায়ের (ব্যানার) খ্যাতিও এমন ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন যার ফলশ্রুতি, মতিলালকে অনুসরণ ও অনুকরণ করে তখন দিকে দিকে যাত্রা সম্প্রদায় গড়ে ওঠার যেন প্রতিযোগিতা এসেছিল।

বেশ কিছু দলের খ্যাতিও দেখে গিয়েছিলেন মতিলাল রায়। সেই দলগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

১। বর্ধমান জেলার কুর সিমলার অহিভূষণ ভট্টাচার্যের দল। ২। আশুতোষ চক্রবর্তীর দল। ৩। কালনার শশী অধিকারীর দল। ৪। প্রসন্ন নিয়োগীর দল। ৫। চন্দন নগরের বৌমাষ্টারের দল ৬। ব্রজ রায়ের দল ৭। সত্যম্বর চাটুজ্জ্যের দল ইত্যাদি।

মতিলাল রায়ের মৃত্যুর পরেই যে দলগুলির জনপ্রিয়তা এবং ব্যবসায়িক সাফল্য এসেছিল তার মোটামুটি তালিকা এই রকম ঃ

১। উমাকান্ত ঘোষালের দল ২। সাঁতরা কোম্পানি ৩। কালনার গণেশ ঘোষের দল ৪। বর্ধমান জেলার আনুখালের ভূষণ দাসের দল। ৫। বর্ধমান জেলার মঞ্জীলার শশী হালদারের দল ৬। কলকাতার ত্রৈলোক্যতারিণীর দল এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নে থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পার্টির জনক মথুরানাথ সাহার দল।

যাত্রা যে ব্যবসার একটা বড় মাধ্যম সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে গিয়েছিলেন মতিলাল রায়। তবে কয়েকটি ব্যাপারে আজকের যাত্রা মালিকদের ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে মতিলাল রায়ের দৃষ্টিকোণের দুস্তর ব্যবধান ছিল। এখনও যা বিদ্যমান।

মতিলাল রায়ের মূল লক্ষ্য ছিল, যাত্রাদলকে একটি মিশনে পরিণত করা। যে মিশনের কাজ হ'ল, পালাগানের ভিতর দিয়ে বঙ্গদেশের সামাজিক চেহারাটিকে তুলে ধরা, অজ্ঞতার অন্ধকার ঘোচানো, গণচেতনা ও লোকশিক্ষার প্রসার। ধর্মান্ধতার অভিশাপ আবার ধর্মহীনতার অভিশাপ, নীতি ও আদর্শচ্যুত বাঙালী তথা ভারতবাসীর সামনে পৌরাণিক-সনাতন রূপকে মূর্ত করা। আত্মবিস্মৃত জাতিকে সনাতন আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা। মতিলাল জীবন দিয়ে বুঝেছিলেন যাত্রা নামক গণমাধ্যমের ভিতর দিয়ে জনগণের চরিত্রগঠন, মানুষ গড়ার কাজ করা সম্ভব।

এখনকার যাত্রা দলের কোন পালার কর্মে-ভাবনায় মতিলালের প্রভাব পড়েনি। এঁদের যাত্রা-কর্ম বা যাত্রা ব্যবসার প্রধান লক্ষ্য হ'ল, মানুষের চিত্তবিনোদন। কল্পনাতীত মুনাফা লুঠে নিজেদের বিলাস-প্রাচুর্যের মধ্যে তাৎক্ষণিক বাঁচিয়ে রাখা। মতিলাল রায়ের সময়ে বা তাঁর মৃত্যুর পরের পালাকারদেরও নৈতিক দায়িত্ববোধ ছিল। তাঁরা পালা রচনায় সম্পূর্ণ মৌলিক হয়ে উঠতেন। হয়তো তখন অনুসরণের প্রবণতা অনেকের মধ্যে ছিল, কিন্তু আজকের অধিকাংশ পালাকারদের মত 'অনুকরণ'-এর প্রবণতা ছিল না। এবার তেমনি কয়েকজন পালাকারের কথা বলে নেওয়া দরকার।

*   *   *   *   *

মতিলাল রায় যতগুলি 'গীতাভিনয় এবং যাত্রাপালা রচনা করেছেন তা আমাদের দেশের

সাহিত্য রত্ন ভান্ডারের অত্যুজ্জ্বল রত্নসম্ভার হিসেবে আদৌ গ্রহণীয় কি না অথবা পালাকর্মগুলি যুগবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কতখানি কালজয়ী তার সঠিক মূল্যায়নের চেষ্টা ইতিপূর্বে যে হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই! কিন্তু বর্তমান দৃষ্টিকোণ থেকে পুরাতন গীতাভিনয় ও পালাকর্ম তো দূরের কথা, সমসাময়িক পালা বা পালা উপস্থাপনা নিয়ে সঠিক মূল্যায়নের কোন চেষ্টাই নেই। আমি যদিও মতিলাল যুগ বা তার পরবর্তী যুগের কোন পালার ওপরে পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনার গুরুদায়িত্ব সম্পাদন করতে আগ্রহী নই, তবুও আগামী দিনের গবেষক-পর্যালোচকদের সুবিধার্থে অতীত ও বর্তমানের গীতাভিনয়, পালাগুলির তালিকা পেশ করছি মাত্র।

কলকাতায় সখের থিয়েটারের সূচনা পর্বে মতিলাল রায়ের নাট্য প্রতিভার অঙ্কুর দেখা দেয়। তিনি লেখেন 'তরণীসেন বধ'। প্রথম এই রচনাটিকে তদানীন্তন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা 'নাটক' হিসেবেই উল্লেখ করেছিলেন।

'প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়' বইতে 'তরণীসেন বধ' রচয়িতা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—"...বাল্যকাল হইতেই ইঁহার বাঙ্গলা রচনায় ঝোঁক ছিল। পোষ্ট অফিসে কার্য্য করিবার কালে একখানি নাটক রচনা করেন।"

উল্লেখ্য, যখন শোভাবাজার রাজবাড়িতে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং আরও কয়েকজন ধনাঢ্য-সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সখের থিয়েটার তৈরি করে মহাসমারোহে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' মঞ্চস্থ করেছিলেন, ঠিক তখনই যুবক মতিলালের কয়েকজন প্রিয় অনুরাগী বালীতে রঙ্গ মঞ্চ তৈরি করে এই 'তরণীসেন বধ' নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন। এখন যেমন থিয়েটারগ্রুপগুলি কল্ শো করে থাকে, তেমনি মতিবাবুর এই প্রথম নাটক অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে বালী-কোন্নগর-কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় অস্থায়ী মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল।

মতিলালের ২য় নাটক ঃ 'রাম বিদায়'। এই দুটি নাটকই দোগাছিয়ার নামকরা যাত্রা অধিকারী হরিনারায়ণ রায়চৌধুরী তাঁর দলে অভিনয় করান। যদিও উক্ত দুটি নাটকই তদানীন্তন নাটকের আদলে সৃষ্ট, তবুও হরিনারায়ণ বহু বহু জায়গায় এমন কি ১২৭৯ সালে দিনাজপুর ও রংপুরে যাত্রার ফর্মে, চারদিক খোলা আসরে আসরস্থ করেছিলেন। এরপর মতিলাল নবদ্বীপে চলে আসেন।

হরিনারায়ণ রায়চৌধুরীর দলে মতিলাল রায়ের 'তরণীসেন বধ' ও 'রাম বিদায়' যে সব জায়গায় অভিনীত হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ—মুর্শিদাবাদ ও রামপুর বোয়ালিয়া (রাজশাহী জেলার অন্তর্গত)। এই বোয়ালিয়াতে ছ'মাস দল ছিল এবং প্রভূত খ্যাতির সঙ্গে আসরস্থ হয়েছিল! এরপর মতিলাল একের পর এক গীতাভিনয় রচনা করেছিলেন।

॥ মতিলাল রায় রচিত পালা ঃ পটভূমিকা রামায়ণ ॥

১। অহল্যা উদ্ধার ২। হরধনুর্ভঙ্গ ৩। রাম বিবাহ ৪। রাম বনবাস (বা রাম বিদায়) ৫। ভরত মিলন (ভরতাগমন) ৬। সীতা হরণ ৭। সীতা অন্বেষণ ৮। তরণীসেন বধ ৯। রাবণ বধ ১০। রামরাজা ১১। লক্ষ্মণ ভোজন ১২। মিত্র মিলন (ভরত ও গুহক মিলন বিষয়ক)।

॥ পটভূমিকা ঃ মহাভারত ॥

১। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ ২। দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ ৩। পাণ্ডব-নির্বাসন ৪। ভীষ্মের শরশয্যা ৫। কর্ণবধ ৬। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক ৭। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ ৮। যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহন। শেষ দুটি পালা ছাড়া সবগুলি বই আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এ ছাড়া আরও কয়েকটি পালার নাম পাওয়া যায় অন্যসূত্রে। যেমন, দ্রৌণিদন্ড এবং মারুতি মিলন (কমলে কৃষ্ণ) ও নহুষ চরিত্র (মহাভারতের নহুষ উপাখ্যান অবলম্বনে)।

॥ পটভূমিকা ঃ কৃষ্ণলীলা ॥

১। ব্রজলীলা ২। কালীয়দমন ৩। নরকাসুর ৪। পারিজাত হরণ।

॥ অন্যান্য পুরাণ কথা অবলম্বনে রচিত ॥

১। গয়াসুরের হরিপাদপদ্মলাভ ২। শ্রীক্ষেত্র মাহাত্ম্য ৩। উমা সংবাদ ৪। দুর্বাসার পারণ বা অম্বরীষের যজ্ঞ।

মতি রায় বা ভূপেন্দ্রনারায়ণ পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে যে সব অভিনেতাদের আমরা পেয়েছি এখানে তাঁদের কথা বলা যাক।

মতিলাল রায়ের যাত্রা দলের অভিনেতাদের তালিকা পাওয়া যায় কিন্তু তাঁদের পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে একথা সত্য, মতিলাল যাঁদের নিয়ে সম্প্রদায় তৈরি করেছিলেন, তাঁরা স্ব স্ব কর্মে অবশ্যই দক্ষ। সেদিক দিয়ে এই অভিনেতারা অবশ্যই মতিলালের শক্তিকে সম্প্রসারিত করেছিলেন আসরে অভিনয় করে। মতিলালের সম্প্রদায়ের অভিনেতাদের তালিকা এই রকম ঃ

১। হরিপদ মণ্ডল ২। আশু চক্রবর্তী ৩। ভূপাল ৪। আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ৫। অশ্বিনী ৬। শরৎ গঙ্গোপাধ্যায় ৭। ক্ষেত্র দাস ৮। ক্ষেত্র চক্রবর্তী ৯। মানদা ১০। বিপিন দাস ১১। হরি কর ১২। বাম ঘোষ ১৩। যোগীন সেন, ১৪। যুগল ১৫। বিপিন দাস ১৬। শরৎ সরকার ১৭। শরৎ ঘোষ ১৮। শিবচরণ দত্ত ১৯। গোপাল ২০। মহেন্দ্র কোটাল ২১। অবিনাশ ২২। ইন্দু ২৩। ধর্মদাস ২৪। শিব দত্ত ২৫। গোপাল মণ্ডল ২৬। গৌর দাস ২৭। ইন্দ্র সরকার ২৮। ননী ২৯। ফণি ৩০। আনন্দ ৩১। হবিবর ৩২। কিঙ্কর চক্রবর্তী ৩৩। দিবাকর ৩৪। কার্তিক ভট্টাচার্য ৩৫। হরি দত্ত ৩৬। অনন্ত ৩৭। চন্ড ৩৮। হরিভূষণ ৩৯। রেণুপদ ৪০। উপেন ৪১। ধনকৃষ্ণ বিশ্বাস ৪২। সত্যকিঙ্কর ৪৩। কৃষ্ণ মোদক ৪৪। জানকী ৪৫। হরিপদ পাটুনী ৪৬। চন্দ্র ৪৭। হরিনাথ ৪৮। যতীন ৪৯। নগেন ৫০। কালিকিঙ্কর ৫১। সত্যকিঙ্কর ৫২। রামরতন তেওয়ারী ৫৩। ভূপেন্দ্র রায় ৫৪। হরি যশ ৫৫। অবিনাশ যশ ৫৬। গদাধর চট্টোপাধ্যায় ৫৭। হাবুল ৫৮। ভূপেন্দ্র ৫৯। গঙ্গেশ ৬০। শিবু ৬১। নিত্য বিশ্বাস ৬২। কালো সত্য ৬৩। ব্রজ ৬৪। ব্রত ৬৫। ব্রজ গাইন ৬৬। নেত্য চন্দ ৬৭। নিবারণ দত্ত ৬৮। রামপ্রসাদ ৬৯। কামিনী ৭০। প্রভাস ৭১। মাখন ৭২। ননী বাগ্‌দী ৭৩। নিতাই বাগ্‌দী ৭৪। ননী সর্দার ৭৫। ভূতনাথ বন্ধু ৭৬। সুরেন ঘোষাল ৭৭। গৌর বৈষ্ণব ৭৮। ননী মণ্ডল ৭৯। সত্য সর্দার ৮০। কৃষ্ণ মোদক ৮১। হলধর মণ্ডল ৮২। বৈদ্যনাথ গাঙ্গুলী ৮৩। উমাপদ শীল ৮৪। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৫। পঞ্চানন ভট ৮৬। লক্ষ্মীকান্ত ৮৭। অনুকূল দাস ৮৮। প্রমথ বাগচী ৮৯। গোপীকৃষ্ণ ৯০। পুলিন গুঁই ৯১। অতুল সেন ৯২। বিজয় মুখুজ্জে ৯৩। রাম মিত্র ৯৪। পণ্ডিত রাম ৯৫। পঞ্চানন পরামাণিক ৯৬। হলধর ভুঁই ৯৭। অধর দত্ত ৯৮। শরৎ পাল ৯৯। নীলমণি চর ১০০। পঞ্চানন ভট্ট ১০১। বিজয় পাল ১০২। গিরিধর ভুঁইমালী ১০৩। অধর দাস ১০৪। হলধর ভুঁইমালী ও আরও অনেকেই (পদবী জানা যায় না)।

মনে রাখা দরকার, এই শতাধিক ব্যক্তি কিন্তু সব সময়ের জন্য মতিলালের সম্প্রদায়ে ছিলেন না। এঁদের মধ্যে অনেকে এই সম্প্রদায়ে এসেছেন, কাজ করেছেন আবার অন্য দলে চলে গেছেন। মতিলালের বহু খ্যাত গীতাভিনয়গুলিতে অংশগ্রহণকারী অভিনেতাদের সামগ্রিক তালিকা এখানে দেওয়া হলো।

মতিলাল রায়ের জীবদ্দশায় আরও অনেকগুলি যাত্রা দলের জন্ম হয়েছিল। কোন দল প্রসঙ্গে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। এই সব দলের পালা ভাবনার মধ্যে বিশেষ কোন বৈচিত্র্য ছিল না বলেই বোধকরি অতীত নথিপত্রে খুবই উপেক্ষিত। এই দলগুলি হলো—গিরীশ চট্টোপাধ্যায়ের দল, ত্রৈলোক্য পালের দল, নারায়ণ দাস, ঘোষের যাত্রাদল, নীলকান্ত দাসের দল।

মতিলালের দুই ছেলেই ছিলেন স্বভাব কবি।

ছোট ছেলে রামপদ শক্তিমান অভিনেতা এবং বাঁশি বাজিয়ে। খুড়তুতো ভাই প্যারীলালও ছিলেন শক্তিমান অভিনেতা।

আর এক ভাই ব্রজলাল শুধু অভিনেতাই ছিলেন না, ছিলেন শক্তিধর পালাকার।

মতিলালের দ্বিতীয় স্ত্রীর ভাই অর্থাৎ শ্যালক দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ছিলেন উৎকৃষ্ট কীর্তনীয়া।

ভগ্নীপতি (খুল্লতাতের জামাতা) দেবকণ্ঠ বাগচী নাট্যকার ও সুরকার হিসেবে খুবই খ্যাতিমান ছিলেন। এই দেবকণ্ঠের ছেলে তারকনাথ নৃত্য শিল্পী ও নৃত্য শিক্ষক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। নীলকণ্ঠ দত্ত ছিলেন পালাকার ও গীতিকার। মতিলালের অতি প্রিয়পাত্র পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য গীতাভিনয় রচনা করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। হরিপ্রসন্ন কবি হিসেবে নাম করেছিলেন। নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ, কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক, পন্ডিত শিবনারায়ণ শিরোমণি বাংলার ভক্তিগীতি ও বাউল সংগীত লেখক ছিলেন মতিলালের প্রিয় পৃষ্ঠপোষক।

মতিলাল যখন মধ্যাহ্ন গগনের সূর্য, মতি প্রতিভায় বঙ্গদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার চিত্ত নাট্যরসসুধায় যখন তৃপ্ত তখন আবার মতিলাল রায়ের প্রতাপ যখন পড়ন্ত সূর্যের মত অথবা সূর্য অস্তের ঠিক অব্যবহিত পরের লগ্নে মতিলালের ঠিক তেমনি অবস্থান পর্বে অনেক নাট্য প্রতিভারই আবির্ভাব ঘটেছিল।

এ ক্ষেত্রে দাশরথি রায়ের কথা প্রথমেই এসে যায়। মতিলাল রায় তাঁর জীবদ্দশায় বহুবার দাশরথি-প্রতিভার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন বার বার। দাশরথি রায়ের অনেক রচনাই মতিলাল রায়ের রচনায় প্রভাব ফেলেছিল, তা তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন।

দাশরথি রায়ের কথা আগে বিস্তারিত বলেছি। এখানে মতিলালের নাট্য প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ন করতে যে কথা বলা উচিত, শুধু মাত্র সেইটুকুর অবতারণা। মনে রাখতে হবে, দাশরথি রায়ের পাঁচালিতে প্রধান ছিল ভক্তিরস। দশরথি রায় রামচন্দ্রকে স্বয়ং ভগবান হিসেবে দেখেছেন। নারদকে দাশরথি ভগবান হিসেবেই তাঁর পাঁচালিতে এঁকেছেন। দাশরথির নারদ-বিষ্ণু ভক্ত। বাইরে কলহপ্রিয়। বিষ্ণুবিদ্বেষীদের শাস্তি দিতে নারদ যেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। মতিলালের যাত্রা এই চরিত্র ধর্মানুসারী। গান ও গদ্য সংলাপের ক্ষেত্রে মতিলাল দাশরথি রায়ের মতই প্রচুর অনুপ্রাস, যমক আর শ্লেষ ব্যবহার করেছেন। দাশরথি রায় যে ৬৪টি পালা রচনা করেছিলেন তার মধ্যে কয়েকটি পালার বিষয়গত ভাবনার সঙ্গে মতি রায়ের পালা ভাবনা মিলে যায়।

মতি রায়ের সমসাময়িক এবং পরবর্তী যাত্রা ভাবনা...

মতিলাল রায়ের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী হিসেবে ছেলে ধর্মদাস এবং ভূপেন্দ্রনারায়ণ পিতার যোগ্য পুত্র হিসেবে অনেকদিন যাবৎ বিভিন্ন পালাকর্মের ভিতর দিয়ে পিতৃস্মৃতি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন, এবং নিজেরাও পালা রচনা, উপস্থাপনায় খ্যাতিমান হয়েছিলেন। তবে মতিলালের কীর্তি অক্ষয় হয়ে আছে মতিলালেরই কর্মসাধনায়। এবার ধর্মদাস ও ভূপেন্দ্রর কথা বলা দরকার।

॥ কুলপীঘাটে ধর্মদাসের যাত্রা ॥

মতিলাল রায়ের বড় ছেলে ধর্মদাস। ধর্মদাসের জন্ম ১৮৬৯ সালে।

ধর্মদাসের জন্মের কিছুদিনের মধ্যে মা মনমোহিনী দেবী কলেরায় মারা যান। মায়ের মৃত্যুর পর ধর্মদাসকে তার মামাবাড়িতে পাঠিয়ে দেন মতিলাল। পারিবারিক কিছু কারণে এবং বেশিমাত্রায় স্নেহ পেয়ে ধর্মদাসের বিদ্যাশিক্ষা বিশেষ হয়নি। পড়েছিলেন ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত। ধর্মদাসের যখন মাত্র তের বছর বয়স তখন ভাংশালার কাছাকাছি চণ্ডীপুরের দুর্গাদেবীর সঙ্গে বিয়ে হয়। দুর্গা দেবীর তখন মাত্র সাত বছর বয়স।

ছেলেবেলা থেকেই ধর্মদাসের মধ্যে ধর্মভাব প্রবল হয়েছিল। শিশুকালে ধর্মদাসের একমাত্র

খেলা ছিল 'পুজো পুজো খেলা'। ধর্মদাস তাঁর কড়চায় লিখে গেছেন, "আমি আমাদের বিদ্যানগরে গৌরাঙ্গবিগ্রহের সেবা করিতাম।' অতি অল্প বয়স থেকেই বাবার মত তাঁরও নাট্যর প্রতি তীব্র আকর্ষণ। অল্প বয়স থেকেই থিয়েটার নিয়ে তিনি মেতে ওঠেন। আর্য থিয়েটারে অভিনয় করতেন। অনেকেই বলে থাকেন, যে নল দময়ন্তী পালায় তিনি অভিনয় করতেন সেই পালা তাঁরই লেখা। ১৮ বছর বয়সে তিনি নিত্যগোপাল ঠাকুরের সান্নিধ্যলাভ করেন। ইনিই জ্ঞানানন্দ অবধূত। এই ঠাকুরের কাছে ধর্মদাস দীক্ষা নেন। এই ঠাকুরের উপদেশ মত ধর্মদাস পালা লেখেন। 'মারুতিমিলন' সেই উপদেশের ফলশ্রুতি। ১৩০৯ সনে মতিলাল রায় ধর্মদাসের ওপর দলের সব দায়-দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। পালারচনায়-অভিনয়ে সব দিক থেকেই ধর্মদাস অতি অল্প সময়ের মধ্যে আশাতীতভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। ধর্মদাস ইতিমধ্যে 'কবচ সংহার' রচনা করে খ্যাতি পান। ধর্মদাস বাবার মত দীর্ঘজীবন লাভ করতে পারেননি। তিনি অল্প বয়সেই অত্যধিক পরিশ্রম আর দুশ্চিন্তার শিকার হয়ে মারা যান।

মতিলাল রায় যে হেতু মা শীতলার স্বপ্নে দেওয়া নির্দেশ মত কুলপী ঘাটে সব পালা খুলতেন সেই হেতু ধর্মদাসও সব পালা কুলপী ঘাটেই খুলতেন।

নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক বাদেও ধর্মদাস তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি হিসেবে প্রচুর সোনার মেডেল এবং টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। এক সময়ে যাত্রা দলের মালিক হন তিন ভাই। লাভের টাকা তিন ভাই ভাগ করে নিতেন, কিন্তু পুরস্কারের যা টাকা তা অল্প সঞ্চয় করতেন। সঞ্চয় করতেন অত্যন্ত বিশ্বাসী-সুপরিচিত ব্যবসায়ী সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। সাতকড়ি ছিলেন কৃষ্ণনগরের লোক। তাঁর ব্যবসা ছিল কলকাতায়। ধর্মদাস তাঁর পুরস্কারের সব টাকা অর্থাৎ সেকালের ১৪ হাজার টাকা জমা রেখেছিলেন সাতকড়ির কাছে। হঠাৎ সাতকড়ির ব্যবসায় লোকসান হয় এবং তাঁকে দেউলিয়া খাতায় নাম লেখাতে হয়, ফলে ধর্মদাসের ১৪ হাজার টাকা নষ্ট হয়। এই ঘটনা ঘটে ১৩২৬ সনের কার্তিক মাসে, আর এই শোকে ৭ পৌষ ধর্মদাসের মৃত্যু হয়।

মতিলালের মত ধর্মদাসও পেয়েছিলেন বহু পুরস্কার আর উপাধি-খেতাব।

তার তালিকা এই রকম ঃ

১।	রাজশাহী থেকে পেয়েছিলেন	আনুষ্ঠানিক উপাধি	=	বাণীকণ্ঠ
২।	নবদ্বীপ হরিসভা থেকে	,, ,,	=	কবিরত্ন
৩।	নবদ্বীপ পন্ডিতমণ্ডলী থেকে	,, ,,	=	কবিশেখর
৪।	বর্ধমানের তেওয়ারীদের বাড়ি থেকে	,, ,,	=	রচনাবিশারদ
৫।	অন্ডালের মহান্ত মহারাজ দিয়েছিলেন	,, ,,	=	ভারতী
৬।	জামালপুর থেকে	অনুষ্ঠানিক উপাধি	=	শ্রীকণ্ঠ
৭।	মহাপ্রভুর গোস্বামীমণ্ডলী দিয়েছিলেন	,, ,,	=	গীতরঞ্জন
৮।	মূলাজোড় ঠাকুর কলেজের পণ্ডিতদের	,, ,,	=	কবিকণ্ঠ
৯।	মেড়াতলা ঠাকুর মণ্ডলী	,, ,,	=	ভাবরত্নাকর
১০।	মানকর কবিরাজ পল্লী থেকে	,, ,,	=	কাব্যকণ্ঠ
১১।	সিংটী শিবপুর সমাজ থেকে	,, ,,	=	কাব্যবিশারদ
১২।	ধান্যকুড়িয়া চতুষ্পাঠী থেকে	,, ,,	=	কাব্যামৃত সুধাকর
১৩।	কৃষ্ণনগরের দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে উপাধি		=	রায়গুণাকর
১৪।	নন্দলাল ঠাকুরের সেবাইত মণ্ডলী	,, ,,	=	বাণীর বরপুত্র
১৫।	মূলাজোড়ের পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যারত্ন	,, ,,	=	কবিভূষণ
১৬।	রাউতা ও নয়াডিয়া থেকে	,, ,,	=	কাব্য সরস্বতী

১৭।	কাইগ্রাম ও পাকুড় রাজধানী	,, ,,	=	কাব্য সরস্বতী
১৮।	জমিদার সতীশচন্দ্র বসু মল্লিক দিয়েছিলেন	,, ,,	=	নটচূড়ামণি
১৯।	রাজবোল হাট সমাজ থেকে	,, ,,	=	ভক্তি রত্নাকর
২০।	রংপুর কুড়িগ্রাম হরিসভা	,, ,,	=	উদ্ভটনিধি
২১।	ময়দা চতুষ্পাঠী থেকে	,, ,,	=	কবি কৌস্তভ
২২।	পাইকপাড়া রাজবাড়ি থেকে	,, ,,	=	কাব্য কমলাসন
২৩।	মানকর কবিরাজ বাড়ি থেকে	,, ,,	=	কাব্যসাগর
২৪।	নবদ্বীপ হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা	,, ,,	=	নাট্যাঙ্গিন
২৫।	ঠাকুর নিত্যগোপালও দিয়েছিলেন	,, ,,	=	বাণীকণ্ঠ

'রায়গুণাকর' উপাধিটি ধর্মদাস সব সময় নামের সঙ্গে ব্যবহার করতেন। এই খ্যাতিমান পালাকার কিন্তু নিজে কলম ধরে পালা লিখতেন না। তিনি বলে যেতেন, লিখে যেতেন কালী ভট্টাচার্য ও হরিপদ মণ্ডল।

॥ ধর্মদাসের রচনার তালিকা ॥

১। শ্রীকৃষ্ণের গুরুদক্ষিণা ২। কবচ সংহার ৩। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা বর্জন ৪। চিন্তার চিন্তামনি লাভ ৫। কুন্তীর শিব সাধনা ৬। দত্তাত্রেয় ৭। প্রভাসে নর নারায়ণ ৮। বৃত্রাসুর বধ (গীতাভিনয়) ৯। জনমেজয়ের সর্প যজ্ঞ ১০। রত্নাকর উদ্ধার ১১। ভাগীরথী মহিমা ১২। মহাবিদ্যাসুন্দর, এই পালাটি ধর্মদাসের শেষ পালা রচনা।

॥ কুলপীঘাটে ভূপেন্দ্রনারায়ণের যাত্রা ॥

মতিলালের আর এক ছেলে ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায়। বাবার অনেক গুণের আধার হয়ে যেমন ধর্মদাস যাত্রার প্রসারে নিজেকে নিঃশেষ করেছিলেন, তেমনি আর এক ছেলে ভূপেন্দ্রনারায়ণ।

ভূপেন্দ্রনারাযণও পালাকার—অভিনেতা হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ যেমন করেছিলেন তেমনি স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক হিসেবেও সকলের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন।

'যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও তাঁহার সম্প্রদায়' বইতে হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য ২৭৬ পাতায় লিখছেন ঃ

"মতি রায়ের যাত্রা" তিন পুরুষের কীর্তিস্তম্ভ,—প্রাচীন যাত্রাগানের সম্পূর্ণ ইতিহাস।

মতি রায়ে আরম্ভ এবং পূর্ণ বিকাশ, ধর্মদাসে স্থিতি,—আর ভূপেন্দ্রে অবসান। ধর্মদাসের পর পৈতৃক যাত্রা দলের ভার তুলে নিলেন মতিলাল রায়ের মধ্যমপুত্র ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায়।"

১২৯১ সনের ১৬ বৈশাখ (১৮৮৫ সাল) ভূপেন্দ্রের জন্ম। শৈশব কাটে, ভাৎশালায়। ১২৯৮ সনে মতিলাল অবশ্য এই ছেলের লেখাপড়ার কথা ভেবেই নবদ্বীপের বাড়িতে বসবাস করতে থাকেন। ভূপেন্দ্র প্রথমে চারচারা পাড়ার প্রাথমিক স্কুলে পড়েন। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ভূপেন্দ্র। অষ্টম শ্রেণীতে তিনি ডবল প্রমোশন পান। ক্লাশ টেনে পড়ার সময়ে একবার বিরাট আনন্দের আতিশয্যে ভূপেন্দ্র বেঞ্চ থেকে পড়ে যাবার ফলে তাঁর মৃগী রোগ হয়, ২।১ বছর পরে বঁড়শের (বেহালা) এক দৈব ওষুধে রোগমুক্তি।

এক সময়ে জাহাজে চামড়া তোলা-নামানো তদারকির কাজ পান কিন্তু সে চাকরি বেশি দিন করেননি তিনি।

মতিলালের একজন অতি প্রিয় ভৃত্য ছিল। নাম জহুরী। সেই জহুরী লাঠি-সড়কি-তরবারি খেলায় ওস্তাদ। এ ব্যাপারে ভূপেন্দ্র অল্প সময়ের মধ্যে তার কাছ থেকে নিজেও পাকা হয়ে ওঠেন। মতিলালের যমজ দুই ছেলে আরও ছিল, কানাই আর বলাই।

তারা দু'জনেই যখন মারা যায় তারপরেই জহুরী চাকরি ছেড়ে চলে যায় দেশে।

ভূপেন্দ্র সেই জহুরীর কাছ থেকে সব বিষয়ে পারদর্শী হয়ে নিজের শরীর গঠনে যেমন মন দিলেন তেমনি পাড়ার যুবকদের নিয়ে তৈরি করলেন 'তারা সমিতি' নামে এক শরীরচর্চার দল। এই সময়ে আমাদের দেশে স্বদেশী বিপ্লবী দলের খুবই প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। স্বয়ং মতিলাল রায়ও স্বদেশী আন্দোলনের অংশীদার ছিলেন বলেই ছেলে ভূপেন্দ্র সেই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। ফলে ছেলেদের শুধু শরীর চর্চাই নয়, লাঠি-সড়কি-তলোয়ার চালানোতেও তাদের পটু করে তুলেছিলেন। জানা যায়, ক্লাব ঘরের দেওয়ালে অনেক তলোয়ার সব সময় ঝোলানো থাকত।

১৩১৪ সনে কলকাতায় তালতলার বর্ধিষ্ণু পরিবারের মেয়ে অসীমাসুন্দরীর সঙ্গে ভূপেন্দ্রের বিয়ে হয়।

১৩১৫ সনে যখন ভূপেন্দ্র সস্ত্রীক কাশী যান তখন পুলিশ তাঁকে বিপ্লবী সন্দেহ করে মতি রায়ের বাড়ির সব কিছু ভেঙে তছনছ করে দেয়। এই সংবাদ তদানীন্তন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। মূলত পুলিশের এই অত্যাচারের যন্ত্রণায় মতিলাল চূড়ান্ত আঘাত পান এবং তারই ফলে মৃত্যু হয়।

১৩২৪ সনে ধর্মদাস যখন অত্যন্ত অসুস্থ হন তখন দলের দায়িত্ব ভার এসে পড়ে ভূপেন্দ্রের ওপর। ধর্মদাসের পর ভূপেন্দ্র ১৯ বছর দল চালিয়েছিলেন। ১৭ বছর ভূপেন্দ্র আর ২ বছর ধর্মদাস।

ধর্মদাস মারা গেলে তাঁর জায়গায় তাঁর ছেলে বিজয় রায় এসে দাঁড়ায় বটে কিন্তু সে কৃষ্ণনগর কোর্টের উকিল, তার পক্ষে যাত্রা ব্যাপারটা বোধ হয় শোভন ছিল না মনে করে সব সম্পর্ক তুলে দেয়। ফলে দলের মালিক শেষ পর্যন্ত থেকে যান ভূপেন্দ্র আর রামপদ।

রামপদ যখন মালিকানা ত্যাগ করলেন তখন মতি রায়ের দল 'নবদ্বীপ বঙ্গ গীতাভিনয়'-এর মালিক থাকেন একমাত্র ভূপেন্দ্র। দল পরিচালকও তিনি। এই সময়ে এই দলে একমাত্র হরিপ্রসন্ন পালই ছিলেন পুরনো এবং বিশ্বাসী লোক। কিন্তু হরিপ্রসন্নকে দিয়ে বিশেষ কাজ করানো যেত না। সে চির অসুস্থ। এক সময়ে হরিপ্রসন্ন মারা গেল। ভূপেন্দ্রনারায়ণ তাই দুঃখ করে লিখেছিলেন ঃ

"...একে একে পিতা ভ্রাতারাও ছেড়ে গেল, সংসারে এখন আমি একা। আমারও আর দল পাকিয়ে বেড়াতে ইচ্ছা নাই। গুরু দায়িত্বভার মাথায় নিয়ে নিজে সামলাতে পারছি না। তাতে কি আর দল জুটিয়ে যাত্রা করি।..."

যাত্রাগানের গতি প্রকৃতি এর মধ্যে অনেকটাই পাল্টেছে।

ধর্মদাসের আমলেই হয়েছে অপেরা পার্টি। প্রায় সব দলই অপেরায় পরিণত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটা খবর পাওয়া যায় যাত্রার পরবর্তীকালের স্মরণীয় অভিনেতা, পালাকার ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদের উক্তি থেকে! ভূপেন্দ্রনারায়ণের সময়ে মানুষ যে আর জুড়ির গান, ছেলের গান চাইছিল না তার প্রমাণ আছে এই উক্তিতে।

হাওড়া ধর্মতলায় ১৩৩২ সনে ভূপেন্দ্রনারায়ণের যাত্রার ব্যাপারে একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। অনুষ্ঠান চলাকালীন জুড়ির গান সম্পর্কে প্রবল আপত্তি উঠেছিল শুধু নয়, স্থানীয় যুবকেরা জুড়িদের হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিয়েছিল—এই ঘটনার পর অবশ্য ভূপেন্দ্রনারায়ণ তাঁর দলকে কোন অবস্থাতেই অপেরা করেননি, কিন্তু তিনি যুগের চাহিদা মেটাতে উড়ে মালি ও মালিনীর নাচ গান, ঘেসেড়া ও ঘেসেড়াণীর নাচ গান, রঙ্গরস, মেথর-মেথরাণীর নাচ গান আমদানি করতে থাকলেন। নাটকীয়তার ওপরে গুরুত্ব আরোপ করা হলো। কথকতা তুলে দেওয়া হলো। বৈচিত্র্য সৃষ্টির তাগিদে পাহাড়ী উপজাতি-অনার্য চরিত্র সৃষ্টি করে তার মুখে হিন্দী-বাংলা ভাষা বসানো হলো। যুদ্ধ বিগ্রহ প্রাধান্য পেল। যাত্রায় আধুনিক ভাবধারার প্রবর্তক হলেন বটে ভূপেন্দ্রনারায়ণ কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর মানসিক দুঃখের সীমা ছিল না।

১৩৪০ সনে মতিলাল রায়ের স্মৃতি, কয়েকযুগের লোকসংস্কৃতির দলিল, ভূপেন্দ্রনারায়ণের অনেক পরিশ্রমে বাঁচিয়ে রাখা 'নবদ্বীপ বঙ্গ গীতাভিনয় সম্প্রদায়'-এর বিলুপ্তি ঘটে।

একবার আগুন ধরে দলের সব পোশাক পুড়ে যায়, তারপরেও অনেক চেষ্টায় দল তৈরি করেছিলেন ভূপেন্দ্রনারায়ণ, কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। ভূপেন্দ্রনারায়ণ একবার যাত্রা করতে গিয়ে উঁচু মাচা থেকে পড়ে যান, তাঁর একটা পা খোঁড়া হয়ে যায়, তারই ফলে তিনি দল চালাতে অক্ষম হন। বাবা-দাদার মত ভূপেন্দ্রনারায়ণও নানা দিক থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সম্মানসূচক উপাধি পেয়েছিলেন ; সেগুলি হলো ঃ

১। প্রথম পালা, বিল্বমঙ্গলঠাকুর অভিনয় করে নবদ্বীপ হরিসভা থেকে পান = কাব্য বিনোদ।

২। ঐ একই পালার জন্য একই জায়গার পণ্ডিত সভা থেকে পেয়েছিলেন = কাব্যকণ্ঠ। এই পণ্ডিতদের পক্ষ থেকে ভূপেন্দ্রনারায়ণকে এই উপাধি দিয়েছিলেন পণ্ডিত শিতিকণ্ঠ বাচষ্পতি।

৩। ভট্টপল্লী পন্ডিত সমাজ থেকে পেয়েছিলেন = গুণাকর

৪। সিংটী শিবপুর থেকে = কবিরত্ন

৫। বর্ধমানের তেওয়ারী বাড়ি থেকে পেয়েছিলেন = কাব্যবিশারদ

৬। মানকর কবিরাজ বাড়ি থেকে পেয়েছিলেন = কাব্যসাগর

৭। রামকৃষ্ণপুর থেকে লাভ করেছিলেন = ভক্তিরত্ন আর ভক্ত্যার্ণব।

১৩৬৩ সনের ৩ শ্রাবণ ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায় মারা যান।

❏ ভূপেন্দ্রনারায়ণ যে পালা বা গীতাভিনয় করেছিলেন তার তালিকা।

১ম রচনা ঃ লীলা শুক বা বিল্বমঙ্গল ঠাকুর।

১৩২৪ সনের ১৯ আশ্বিন কলকাতার কুলপীঘাটে এই পালার প্রথম অভিনয় হয়।

ভূপেন্দ্রনারায়ণের অন্য ৩টি পালা 'তপতী সংবরণ', রাজর্ষি মনোজবের মহামুক্তি, মণিপুর গৌরব ছাপা হয়েছিল। শ্রীশ্রীকিশোর লীলা বা ধনুর্যজ্ঞ পালাকারের ২য় পালা, এটিও কুলপী ঘাটে খোলা হয় ১৩২৫ সনের ৮ আশ্বিন।

৩য় পালা, 'ভানুমতী মিলন' বা 'নিশুম্ভ সংহার' গীতাভিনয়।

৪র্থ পালা, 'মহর্ষি দধীচির আত্মোৎসর্গ'। ১৩২৮ সনে ৬ আশ্বিন কুলপী ঘাটে খোলা হয়।

৫ম পালা, 'শ্রীশ্রী রাধা' বা 'রোষণ মর্ষণ বধ' গীতাভিনয়। ১৩২৯ সনের ২৫ ভাদ্র এ পালাও খোলা হয় কুলপী ঘাটে। 'রাজর্ষি মনোজবের মহামুক্তি' কুলপী ঘাটেই খোলা হয় ১৩৩০ সনের ২৯ ভাদ্র।

লেখেন, 'অন্ধকাসুরবধ' বা 'ভৃঙ্গী উপাখ্যান'। শ্রীশ্রী চণ্ডী উপাখ্যান গীতাভিনয়, যাদবী উপাখ্যান। 'মণিপুর গৌরব' পালাটিও কুলপী ঘাটে খোলা হয়েছিল ১৩৩৩ সনের ১৫ ভাদ্র। শ্রীশ্রীরামলীলাবসান গীতাভিনয়ও খোলা হয় ১৩৩০ সনের ২৯ ভাদ্র ঐ কুলপী ঘাটেই। ভূপেন্দ্রনারায়ণের 'নৃসিংহবতার' কুলপীঘাটে খোলা হয় ১৩৩৫ সনের ১৩ আশ্বিন। 'তপতী সংবরণ' কুলপী ঘাটে খোলা হয় ১৩৩৬ সনের ৬ আশ্বিন।

॥ নিমতলায় ব্রজলাল রায়ের যাত্রা দল ॥

ব্রজলাল রায় ছিলেন মতিলাল রায়ের কাকা হরিচরণ রায়ের ছেলে। মতিলাল অত্যন্ত ভালবাসতেন ভাই ব্রজলালকে। সেই ব্রজলাল কিন্তু এক সময়ে মতিলাল রায়ের দল থেকে লোক ভাঙিয়ে নিয়ে সোজা কলকাতায় চলে আসেন। সম্পূর্ণ আলাদাভাবে নিমতলায় গড়ে তোলেন যাত্রাদল। ১৩০১ সন থেকে ১৩০৫ সনের মধ্যে এটা ঘটেছিল। মতিলাল নারদ চরিত্রে অভিনয়

করে এক সময়ে বিশেষ ভাবে খ্যাতি পেয়েছিলেন, তেমনি ব্রজলালও সেই নারদের ভূমিকা করেই নাম করেন। মতিলালের জীবদ্দশাতেই ব্রজলালের 'কাশীখন্ড' এবং 'জানকীর অগ্নিপরীক্ষা' জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। যাত্রা দলের জন্যই ব্রজলাল নিঃস্ব হয়ে যান। কাশীতে গিয়ে বাস করতে থাকেন। মতিলালের মৃত্যুর পর ব্রজলাল কাশী থেকে ফিরে এসে নবদ্বীপে প্রাচীন রামসীতা মন্দিরে দেব সেবায় জীবনের বাকি দিনগুলো কাটান। ১৩৩০ সনে মারা যান ব্রজলাল।

॥ নীলকন্ঠ দত্ত ॥

সূর্যকান্ত দত্তের ছেলে নীলকন্ঠ জন্মেছিলেন নবদ্বীপে। সূর্যকান্তের কাপড়ের ব্যবসা ছিল নবদ্বীপে, ছেলে নীলকন্ঠ কিন্তু সেই ব্যবসার সঙ্গে নিজেকে জড়াননি কখনও। পরবর্তী সময়ে পালাকার হিসেবে খুব খ্যাতি পেয়েছিলেন। দাতাকর্ণ, ধ্রুব চরিত, হরিশ্চন্দ্রের দানকীর্তি, ব্রজলীলা বর্ণনা, সুধন্যবধ ইত্যাদি পালা রচনার মধ্যে তিনি অমর হয়ে আছেন।

এই নীলকন্ঠ কিন্তু মতিলালের চাইতে বয়সে প্রবীণ। দেখা গেছে, নীলকন্ঠের শেষ দিককার অনেক পালায় মতিলালের রচনার প্রভাব পড়েছিল। যা হোক এবার পার্বতীচরণের কথায় আসা যাক। পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য মতি রায়ের স্নেহভাজন ছিলেন।

॥ পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য ॥

নবদ্বীপের বাসিন্দা। বাড়ি ছিল নবদ্বীপের পোড়া মা তলার কাছে। মতিলালের স্নেহধন্য ছিলেন। স্বয়ং তারকনাথ বাগচীর বক্তব্য থেকে জানা যায়, পার্বতীচরণ গীতাভিনয় লেখার সময়ে বার বার মতিলালের উপদেশ নিতেন। এর ফলে পার্বতীচরণের নাট্যকর্মে মতিলালের প্রভাব ছিল। পার্বতীচরণের 'পারিজাত হরণ (১৩০৭) ; 'শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ' (১৩০৯), 'সুবল মিলন' বা 'অক্রুর সংবাদ' (১৩১৬), 'কর্ণের দান পরীক্ষা' (১৩১১) পালাগুলি মতিলালের প্রভাবপুষ্ট। পার্বতীচরণের ভাষা সরল ছিল বটে কিন্তু ছিল আড়ম্বরপূর্ণ। মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর পদ্য সংলাপ, দীর্ঘ সময় ধরে কৃষ্ণবন্দনা, ছড়া করে সংলাপ বলা, মাঝে মাঝে গদ্য সংলাপে বক্তৃতা নাট্যগুণ ক্ষুন্ন করেছে। পালাকার তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের মুখে হিন্দি সংলাপও দিয়েছিলেন।

॥ মনমোহন বসু ॥

মতিলাল রায় এই পালাকারের লেখনীর আদর্শকে শ্রদ্ধা করতেন! অনেক ক্ষেত্রে মনমোহন বসুর নাট্যভাবনা স্বয়ং মতিলাল রায়ের ওপর প্রভাব ফেলেছিল। মনমোহনবাবুর প্রথম নাটক 'রামাভিষেক' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৭ সালে। মনমোহনের পালার আদর্শই ছিল লোকশিক্ষা। বহু বিবাহের কুফল দেখাবার ব্যাপারে তাঁর নাটক একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বর্তমানে শ্লীল-অশ্লীলতার বিরুদ্ধে প্রায়শই তর্ক-বিতর্ক লেগে থাকে। মনমোহন বসু কিন্তু তাঁর পালার ভিতর দিয়ে বার বার অশ্লীলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। এই আদর্শ পরবর্তী সময়ে মতিলালের পালা কর্মের ওপরে ছাপ ফেলেছিল। তেমনি মনমোহনের শেষ দিকের অনেক পালায় মতিলালের প্রভাব পড়েছিল তাও সত্য। এই মনমোহন প্রসঙ্গে আর একটু বিস্তারিত বলা যাক।

১৮৩১ সালের ১৪ জুলাই দেবনারায়ণ বসুর ছেলে মনমোহন বসুর জন্ম। বড় হন ২৪ পরগণার ছোট জাগুলিয়ার ছোট একটি গ্রামে। জন্মস্থান অবশ্য যশোরের নিশ্চিন্তপুরে। প্রথম কলকাতার হেয়ার স্কুলে, পরে জেনারেল এ্যাসেমব্লীজ ইনস্টিটিউশানে পড়েন। সাংবাদিকতায় মন দেন। ১৮৫২ সালে 'সংবাদ প্রভাকর' এবং ১৮৭২ সালে 'মধ্যস্থ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। নিয়মিত লিখতেন 'সংবাদ প্রভাকর' এবং 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায়। কবি ও নাট্যকার হিসেবে খ্যাতি পান।

মহারাজা রণজিৎ সিংহের জীবনী অবলম্বনে তাঁর লেখা 'দুলীন' বইটি সাড়া ফেলেছিল। হিন্দুমেলার সংগঠক ছিলেন। 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' উপন্যাসে ইংরেজ শোষণের ছবিটি চমৎকার

ফুটিয়েছিলেন। "দিনের দিন সবে দীন, ভারত হয়ে পরাধীন" জাতীয় সংগীত রচনা করে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হন। ১৮৭২ সালে হিন্দু মেলার প্রভাবে ন্যাশনাল থিয়েটারের জন্ম ; এই থিয়েটারে তাঁর অনেক নাটক অভিনীত হয়।

'গীতাভিনয়' রচনার ক্ষেত্রে তিনি অন্যতম পথিকৃৎ। ১৮৬৮ সালের গোড়ায় তাঁর লেখা "রামাভিষেক" নাটকটি ধনাঢ্য গোবিন্দ সরকারের বাড়িতে অভিনীত হয়। অতিরিক্ত সংগীত সংযোজনা করে তিনি 'হরিশচন্দ্র,' 'পার্থ পরাজয়' 'যদু বংশ ধ্বংস', 'রাসলীলা' ইত্যাদি গীতাভিনয় রচনা করেন। তা ছাড়া বাউল-কীর্তন এবং যাত্রাগান রচনা করেও প্রসিদ্ধিলাভ করেন।

॥ রাজকৃষ্ণ রায় ॥

সমকালীন নাট্যকারদের অনেকেরই মত রাজকৃষ্ণ রায়ও মতিলাল রায়ের প্রভাব মুক্ত থাকেননি। এই নাট্যকারের জন্ম ১৮৪৯, মৃত্যু ১৯০৪ সালে। তাঁর প্রতিটি নাটকই যাত্রাপালার ধর্ম পালন করেছে। রামায়ণী কথা অবলম্বনে রাজকৃষ্ণ রায় 'দশরথের মৃগয়া," "হরধনু ভঙ্গ" "রামের বনবাস", "তরণীসেন বধ", "অনলে বিজলী" নাটকগুলি ১৮৮১ থেকে ১৮৮৪ সালের মধ্যে লেখেন। নাটকগুলি মতিলাল রায়ের প্রভাব মুক্ত নয়। মতিলালের মতই রাজকৃষ্ণের নাটকে দেখা যায় গদ্য সংলাপ, অমিত্রাক্ষর ছন্দবদ্ধতা, উপদেশ সূচক বক্তৃতা, লোকশিক্ষামূলক ভাবনার বিকাশ, কথকতা।

॥ এবার রসিকলালের কথা বলি ॥

রসিকলাল চক্রবর্তী। ১২২৭ সনে রসিকলালের জন্ম হয় যশোর জেলার কালীগঞ্জের রায় গ্রামে। বাবার নাম রামরতন চক্রবর্তী। এই রসিকলালই প্রসিদ্ধ বালক সংগীতের স্রষ্টা। প্রথম জীবনে তিনি অনাড়ম্বরে 'নিমাই সন্ন্যাস' পালা নিয়ে আসরে নেমেছিলেন। না ছিল ঝকমকে পোশাক, না ছিল অন্য কোন বাহুল্য। যত বাহুল্য ছিল তাঁর পালা রচনা ও গানে। তিনি সামান্য গৈরিক বসন পরে আসরে নামতেন, তারপর গানে গানে ভরিয়ে দিতেন সবার মন। রসিকলালের দলের নাম ছিল "বালক সঙ্গীত সম্প্রদায়।" অল্প সময়ের মধ্যে এই সম্প্রদায় প্রচন্ড খ্যাতি অর্জন করেছিল। প্রভাস মিলন, কংসবধ খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। "চন্ডেপাগল" নামে একটা প্রহসনধর্মী নাটকে সমাজের তৎকালীন সমস্যা ও ঘটনা তুলে ধরে তিনি রীতিমত কষাঘাত করেছিলেন।

১২৯৪ সনে মায়ের মৃত্যুর পর তিনি হরি গানে মেতে যান, এই দলে 'মায়ের ছেলে' পালাও খ্যাতি পেয়েছিল। রসিকলাল চক্রবর্তী গান বাঁধতে ওস্তাদ ছিলেন। তাঁর গানের নমুনা এই রকম ঃ

"দেখরে জ্ঞান চক্ষু মেলে　　সে কি কালীদহে ডুবার ছেলে।
বিশ্বময়ই শুনি তারে　　বিশ্বময় সবাই বলে
আছে পঞ্চভূতে ব্যাপ্ত কৃষ্ণ অনলে কি জলে স্থলে।....."

মৃত্যুর কয়েকবছর আগে রসিকলাল নিজের বাড়িতে 'রাধারাণী' মূর্তি স্থাপন করছিলেন। ১৩০০ সনে রসিকলালের মৃত্যুর পর তাঁর ভাগ্নে সুরেন্দ্র কিছুদিন দল চালিয়েছিলেন।

॥ অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল ॥

মতিলাল রায়ের কর্মজীবনের শেষ দিকে পালাকার হিসেবে যাঁরা খ্যাতিমান হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল অন্যতম। অন্নদাপ্রসাদ প্রথম দিকে থিয়েটারের জন্য নাটক লিখতেন, পরে লেখেন গীতাভিনয়। তাঁর প্রথম নাটক 'নাগযজ্ঞ' প্রথম অভিনীত হয় বেঙ্গল থিয়েটারে। ১৩০০ সালের কথা। কিছুদিনের মধ্যে উক্ত থিয়েটার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অন্নদাপ্রসাদ ঘোষালের মতানৈক্য ঘটলে তিনি 'জয়দ্রথ' নাটকটি পালাকার অহিভূষণ ভট্টাচার্যের পরামর্শে গীতাভিনয়ে রূপান্তরিত করেন এবং আসরে উপস্থাপিত করেন। অন্নদাপ্রসাদের পরবর্তী গীতাভিনয় পালা 'অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ', 'কার্তবীর্য সংহার', 'কনৌজকুমারী বা সংযুক্তার

চিতারোহণ' ইত্যাদি। জীবনের শেষ অংশে অন্নদাপ্রসাদ তাঁর নাগযজ্ঞ নাটকটিকেও গীতাভিনয়ে রূপান্তরিত করেন। নাম রাখেন 'অমৃতহরণ'।

॥ গিরীশচন্দ্র ঘোষ ॥

মহাকবি গিরীশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন মতিলাল রায়ের সুহৃদ। গিরীশচন্দ্র পৌরাণিক নাট্য রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন মনমোহন বসু, রাজকৃষ্ণ রায়ের ধারা প্রবাহ থেকে। তেমনি মতিলালের রচনার প্রভাবও পড়েছিল তাঁর নাটকে। যেমন, মতিলালের 'রামচন্দ্র' গিরীশ ঘোষের 'রামচন্দ্র'কে প্রভাবিত করেছে। মতিলালের রামচন্দ্র ভক্তের কাছে ভগবান স্বরূপ, রাবণও মূলত রামভক্ত। গিরীশচন্দ্রের 'রামচন্দ্র'ও তাই। গিরীশ যুগেও মতিলালের দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল, সে প্রসঙ্গে এক স্মরণীয় অধ্যায় রচিত হয়ে আছে।

মহাকবি গিরীশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' এবং 'নিমাই সন্ন্যাস' নাটকে মতিলালের 'নিমাই সন্ন্যাস' পালার প্রভাব যথেষ্ট ছিল, এর মূলে ছিল স্মরণীয় একটি কারণ। এই কারণটি ভূপেন্দ্রনারায়ণের একটি লেখা থেকে খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি লিখছেন—"কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাটীতে নিমাই সন্ন্যাস অভিনয়কালে মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ...... নট সম্রাট গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে, গৌরাঙ্গ তথ্য অবগত হইতে পিতৃদেবের নিকট উপদেশ লইতে বলেন, গিরীশচন্দ্রও সেই উপদেশ যথাযথ পালন করিয়াছিলেন।—"

নাটক আরম্ভ করার আগে গিরীশচন্দ্র তাঁর নাটকে কলি, পাপ, ক্রোধ, ভক্তি, বৈরাগ্য ইত্যাদি যে চরিত্রগুলির অবতারণা করতেন, সেগুলি মতিলাল রায়ের ভাবনারই দলিল।

॥ ব্রজমোহন রায় ॥

এই ভাবেই তৎকালীন অনেক নাট্যকারের নাটকে মতিলাল রায়ের পালাশৈলীর প্রভাব অবশ্যই পড়েছিল। পালাকারদের মধ্যে ব্রজমোহন রায়ও বাদ যাননি! ইনি বয়সে মতিলালের বড় ছিলেন। ইনি পালা রচনা এবং মাত্র চার বছর একটি যাত্রাদলও চালিয়েছিলেন। ব্রজমোহনের লেখা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পালা হলো, 'অভিমন্যু বধ', 'রামাভিষেক', 'তারকাসুর বধ', 'সাবিত্রী সত্যবান', 'শতস্কন্ধ রাবণ বধ', 'দানব-বিজয়', 'কংসবধ', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'লক্ষ্মণ বর্জন'। ব্রজমোহনের প্রায় সব রচনার বিশেষ সমালোচনা থেকে দেখা যায়, স্পষ্টতই বলা হয়েছে ঃ

১। 'অভিমন্যু বধ' যাত্রায় পঞ্চম অংকটির প্রয়োজন ছিল না। ২। 'তারকাসুর বধ'-এ ব্রজমোহন মদন ভস্ম, হরপার্বতী পরিণয়-'এর দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন, এতে নাট্যরস গড়ে উঠতে পারেনি। ৩। 'কংসবধ' পালায় কংসের মৃত্যুর পর উগ্রসেন প্রমুখের কারামুক্তি, শিব দুর্গার মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা ইত্যাদি অতিরিক্ত সংযোজন দোষে দুষ্ট।

রামলোচন রায়ের ছেলে ব্রজমোহন রায়ের জন্ম হয়েছিল হুগলী জেলার জিরাটের বলাগড়ের তেঁতুলিয়া গ্রামে ১২৩৮ সনে। ছেলেবেলাতেই ব্রজমোহন তাঁর বাবাকে হারান। সংসারে অভাবের তাড়নায় কিছুদিন চাকরি করেছিলেন। চাকরি করার মধ্যে গান শিখতেন। অল্প দিনের মধ্যে তিনি রাগ সংগীতে পারদর্শী হন। এরই মধ্যে প্রথম চাকরি ছেড়ে মালদায় এক মহাজনের গদিতে মুহুরী, পরে আবগারী বিভাগে নাজিরের কাজ করেন। চাকরির ফাঁকে ফাঁকে প্রথমে পাঁচালি গান লেখেন। ১২৭৯ সনে নিজে যাত্রাদল করেছিলেন। এরপর বহু পালা লেখেন এবং খ্যাতি পান। ব্রজমোহনের সেরা পালাগুলি হলো—রামাভিষেক, তারকাসুর বধ, সাবিত্রী সত্যবান, শতস্কন্ধ রাবণবধ, কংস বধ, লক্ষ্মণের শক্তিসেল, লক্ষ্মণ বর্জন ও আরও অনেক। ব্রজমোহনের পালায়, কাহিনীতে যা ফুটে উঠেছিল তা হলো ঃ বাবুদের কীর্তি, ইয়ংবেঙ্গল আচরণ, কুলিনের কীর্তি, ১২৭৩ সনের ঝড়, দ্বিতীয় ঝড়, রাণীর বর্ণনা, ডিউক আগমন, ইনকাম ট্যাক্স আরও অনেক বিষয় বৈচিত্র্য ছিল। ১২৮৩ সনে ব্রজমোহন মারা যান।

ব্রজমোহন রায়ের পালাগানের যে বৈশিষ্ট্য ছিল তার একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া যাক।

১। সংলাপ ছিল বেশি মাত্রায় দীর্ঘ। সংস্কৃত সাহিত্যে যেমন সন্ধি, সমাস, উপমার বহুল ব্যবহার, ব্রজমোহনের পালাতেও ছিল তারই প্রভাব। নীতির বাণী, দার্শনিকতাও মাঝে মাঝে প্রতিফলিত হয়েছে। ব্রজমোহন তাঁর রচনায় লেখ্য ভাষাই প্রয়োগ করেছেন বেশি।

২। ব্রজমোহন রায় তাঁর সমসাময়িক পালাকার বা তাঁরও আগের পালাকারদের মত পালা আরম্ভের আগে বন্দনা গীত রাখতেন।

৩। পূর্বতন পালাকারদের মত ব্রজমোহনের পালায় পয়ার, ত্রিপদী আর ছড়ার প্রয়োগ ছিল।

৪। ব্রজমোহনের ছড়ারও বৈশিষ্ট্য ছিল! পালায় কিছু কিছু পার্শ্বচরিত্রের, বিশেষ করে যে চরিত্রগুলি প্রাধান্য পেত না, তাদের মুখে গদ্যসংলাপ ইচ্ছাকৃতভাবে না দিয়ে, ছড়া বসিয়ে দিতেন। এই ছড়া দর্শক ও শ্রোতার চিত্ত বিনোদনের জন্য হাস্যরস সৃষ্টিতে সাহায্য করত। এই হাস্যরস প্রয়োগের সঠিক ধর্ম ব্রজমোহন পালন করতেন না। অনেক সিরিয়াস মুহূর্তেও নিতান্ত স্থূল ভাবে ছড়ার প্রয়োগ করেছেন। অভিমন্যু যুদ্ধ করে সমস্ত সৈন্যদের পরাজিত করছে। সেনাপতিরা মারা যাচ্ছে। এই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি দূতের মুখ দিয়ে ছড়ার মাধ্যমে বলিয়েছেন ব্রজমোহন! যেমন ঃ "মহারাজ, বলবো কত, হয়েছি বুদ্ধি হত।
রণে এসে একলা ছেলে, সকল বীরের মাথা খেলে,
দিলে যেন আগুন জ্বেলে, ছেলে নয় সে যমের মতো।"
আরও উপমা ঃ
"বাপ্‌কা বেটা বুঝলাম দেখে, ইঁচড়ে গিয়েছে পেকে"...ইত্যাদি।

৫। অনুপ্রাস প্রয়োগে ভাষা ও সংলাপ এমন কি বিষয়কে অনেক সময় অহেতুক কন্টকিত করেছেন ব্রজমোহন। এখনও অনেক পালাকার পাণ্ডিত্য জাহির করার জন্য অনুপ্রাসের মারাত্মক প্রয়োগ ঘটান।

॥ মহেশচন্দ্র দাস দে ॥

পালাকার মহেশচন্দ্র দাস দে মতিলালের সমসাময়িক পালাকার। ইনি অনেকগুলি পালাই লিখেছিলেন, এই পালাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'সতী', মহীরাবণ বধ, প্রহ্লাদ চরিত্র, তরণীসেন বধ, বিজয় বসন্ত ইত্যাদি। এই পালাগুলির জন চাহিদা থাকলেও, এতে না ছিল কোন নাট্যগুণ, না পাওয়া যেত সাহিত্যগুণ। পাঁচালি প্রভাব ছিল বেশি। মহেশচন্দ্র তাঁর পালায় হিন্দি সংলাপ ব্যবহার করেছিলেন। সেই সংলাপের নমুনাও মেলে খানিকটা ঃ
গিরিরাজ বলছেন—"কে হে তুমি! অতিথি দেখছি যে, এখানে শয়ন করে কেন?
শিব হিন্দিতে উত্তর দিচ্ছেন—মহারাজ! ভুকা (ভুখা নয়) অতিথি হ্যায়—
গিরিরাজ বললেন—কেয়া মাংতা হ্যায়
শিব উত্তর দিলেন—গৌরী কো ভিক্ষা মাংতা হ্যায়।
গিরিরাজ—গৌরী কো ভিক্ষা মাংতা হ্যায়! ...বাহির যাও, ভণ্ড তপস্বী (মুষ্ঠাঘাত)—"
এই হিন্দিও ছিল স্থূল।

॥ বঙ্কুবিহারী সরকার ॥

এই সময়ে আর একজন পালাকারের সন্ধান মেলে, তিনি বঙ্কুবিহারী সরকার। বঙ্কুবাবুর পালা অনেকদিক দিয়েই উৎকৃষ্ট ছিল। ১২৮৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'অভিমন্যু বধ' যাত্রায় ছিল সংক্ষিপ্ত সংলাপ। এতে বঙ্কুবাবু যদি জুড়ির গান না রাখতেন তা হলে উৎকৃষ্ট একটি নাটক হতে পারত। এই পালাতেও সংলাপ ও সংগীতের ক্ষেত্রে মতিলালের প্রভাব ছিল।

॥ অহিভূষণ ভট্টাচার্য ॥

মতিলাল রায়কে সরাসরি অনুকরণ করে যাঁরা পালাকার হিসেবে খ্যাতি পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—অহিভূষণ ভট্টাচার্য। প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলে রাখা দরকার, মতিলাল যখন পালাকার হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তখন তাঁর বহু পালাই চুরি হয়েছিল, তেমনি এই অহিভূষণ ভট্টাচার্যের পালাও কম চুরি হয়নি। ১৩০১ সনে অহিভূষণ লেখেন 'তুলসী লীলা', এই পালা প্রকাশিত হয় ১৩০৪ সনে। ১৩১০ সনে, তাঁর দণ্ডীপর্ব পালার ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এরপর বিরাটপর্ব বা উত্তরা পরিণয়, ব্রজলীলা অবসান, রাই উন্মাদিনী, সুরথ উদ্ধার, রামাশ্বমেধ, ধর্মলীলা ইত্যাদি লীলাভিনয়গুলি প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৩০৮, ১৩১০, ১৩১১, ১৩১৫, ১৩২৪ বঙ্গাব্দে। অহিভূষণের পালার বৈশিষ্ট্য দীর্ঘসংলাপ, সংগীত বাহুল্য, সংগীতে অনুপ্রাস অতিরিক্ত প্রয়োগ, লোকশিক্ষা প্রসার, গদ্য ও পদ্য সংলাপ! অহিভূষণও মতিলালের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি।

যদিও পার্বতীচরণ ভট্টাচার্যের কথা আগেই বলেছি, তবুও স্বীকার করা ভাল, পার্বতীচরণের আবির্ভাব, অহিভূষণের আবির্ভাবের পর। অহিভূষণ ভট্টাচার্য যাত্রার অধিকারী হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

॥ আশুতোষ চক্রবর্তী ॥

মতিলাল রায়ের সমসাময়িক পালাকার হলেন আশুতোষ চক্রবর্তী। নাট্যকার হিসেবেও যথেষ্ট নাম করেছিলেন। আশুতোষ চক্রবর্তীর 'চন্দ্রহাস' পালা প্রকাশিত হয়েছিল ১৩১০ সনে। এই পালায় যেমন ছিল নাট্যগুণ, তেমনি ছিল যাত্রাগুণ, তবুও পালাটি মতিলাল রায়ের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। পালাটির উদ্দেশ্য ছিল, হরিভক্তির প্রসার। জনমানসে হরিভক্তি শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়া। আশুতোষ চক্রবর্তী তাঁর রচনায় নাট্যগুণ যথেষ্ট বাখার জন্য দীর্ঘ সংলাপ বর্জন করেছিলেন। গানের মাত্রাও কম। পালাকার গদ্যে, মিত্রাক্ষর পয়ারে ত্রিপদীতে ও অমিত্রাক্ষর পয়ারে সংলাপ রচনা করেছেন।

॥ ভৈরবচন্দ্র চট্টরাজ ॥

বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের গ্রামের ১২৩৭ সনের চৈত্রমাসে, উদয়নারায়ণ চট্টরাজের ছেলে ভৈরবচন্দ্রের জন্ম। শিউড়ী বঙ্গ বিদ্যালয় ও শিউড়ী জেলা স্কুলে পড়াশোনা করেন। সাপে কাটার চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বহু যাত্রা পালা লিখে বিখ্যাত হন। তাঁর সেরা পালাগুলি হলো ঃ রামবনবাস, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, ভরত মিলাপ, বিজয় বসন্ত, মান, মাথুর, রুক্মিণী হরণ, সুমন্তের মশান, শুভঙ্করী। ১৩১৩ সনের ২৮ মাঘ শিউড়ীতে মারা যান।

॥ শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

ইনিও মতিলালের সমসাময়িক পালাকার।

মতিলাল স্বয়ং এই পালার সমালোচনা করেছিলেন। তিনি স্বয়ং পালাকার শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'চন্দ্রতারা' পালাটির সংশোধনের উপদেশ দেন। এই পালায় মতিলালের 'বিজয়চন্ডী'র প্রভাব পড়েছিল যথেষ্ট।

"দাসীর প্রবোচনায় বিমাতা কর্তৃক সপত্নীপুত্রের" নির্বাসনের ও অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে লেখা হয়েছিল এই গীতাভিনয়। এই পালায় শরৎচন্দ্র যেমন গানের প্রাধান্য দিয়েছিলেন, তেমনি পাঁচালির মত অজস্র ছড়াও ব্যবহার করেছিলেন। এবার হারাধন রায়ের কথা বলি।

॥ হারাধন রায় ॥

হাওড়া জেলার কল্যাণপুরে ১২৭২ সনে হারাধন রায়ের জন্ম হয়। পরবর্তী সময়ে তিনি

হাওড়ার কুলকাশা স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। অল্প বয়স থেকেই তিনি পালা রচনা করতেন। মূলত পৌরাণিক পালায় তাঁর দক্ষতা ছিল। ঘটনাপ্রবাহ এবং সঙ্গীতের প্রাধান্য ছিল তাঁর পালায়। হারাধন বাবুর প্রথম পৌরাণিক পালা 'শাল্ববধ'। এই পালা প্রসন্ন নিয়োগীর দলে অভিনীত হয়েছিল।। তাঁর অন্য পালাগুলি হলো—লক্ষ্মণবর্জন, ধর্মের জয়, তাম্রধ্বজ, মহাশ্বেতা, কাদম্বরী, সুরথ উদ্ধার, নলদময়ন্তী, পার্থ পরীক্ষা, যযাতি, রাম-অবতার।

'ধর্মের জয়' পালাটি গণেশ অপেরা পার্টী'তে অভিনীত হয়। হারাধন রায়ের মৃত্যু হয় ১৩২৬ সনে। **লক্ষ্মণ বর্জন ঃ** কৃত্তিবাসী রামায়ণের উত্তরাকান্ড থেকে নেওয়া। এই পালায় পঁয়ত্রিশটি গান ছিল। শেষ দৃশ্যে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীকে রামসীতার মিলন হিসাবে দেখানো হতো। যাত্রা ব্যালে ছাড়াও হারাধন রায় ৯টি রসই পালায় ফুটিয়ে তুলতেন। **মীরা উদ্ধার ঃ** এটি ঐতিহাসিক পালা। রাজপুত্রবধু মীরার কাহিনী। এখন যাকে ঐতিহাসিক ভক্তিমূলক বলা হয়, শ্রীরায়ের এই পালাও তেমনি। **ধর্মের যুদ্ধ ঃ** মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অষ্টাদশ দিনের কাহিনী। এই পালায় 'দন্ডী' চরিত্রের মুখ দিয়ে অনেক সংস্কৃত শ্লোক বলানো হয়েছে। গণেশ অপেরা পালাটি আসরস্থ করেছিল। **তাম্রধ্বজ ঃ** কাশীরামদাসের মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব থেকে কাহিনী নেওয়া হয়েছে। পালাটি সতীশ মুখোপাধ্যায়ের দলে অভিনীত।

মহাশ্বেতা ঃ তারাশংকর তর্করত্নের 'কাদম্বরী'র কাহিনী অবলম্বনে লেখা।

পণ্ডিত হারাধন রায়ের 'সুরথ উদ্ধার' পালার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩১৪ সনে। ১৩১২ সনে প্রকাশিত 'নল দময়ন্তী', ১৩১৪ সনে 'পার্থ পরীক্ষা', ১৩২০ সনে 'রাম অবতার' খ্যাতি অর্জন করে।

পার্থপরীক্ষা, মীরা উদ্ধার, যোগমায়া, শুক্রাচার্য বা দেবযানী, সুভদ্রাহরণ ইত্যাদি বহু গীতাভিনয় রচনা করেছিলেন হারাধন রায়। তাঁর শেষ পালা 'তাম্রধ্বজ'।

পালাকার হারাধন রায় তাঁর পালায় ভক্তিরস আরোপ করতেন, দীর্ঘ সংলাপ, নীতি উপদেশ ইত্যাদির প্রাধান্য দিতেন। হারাধন রায় তাঁর এই গীতাভিনয়কে নাটক হিসেবে অভিহিত করেছেন। আবার তাঁর অনেক পালাতেই মতিলালের রচনার প্রভাব পড়েছিল তাও তিনি স্বীকার করেছেন। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হয়, মতিলাল রায়ের পাশে অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল, মতিলাল ঘোষ, হারাধন রায় এঁদের গীতাভিনয় বা পালাগান পুরাতনের সমাপ্তি ও নতুনের আবির্ভাব যুগসন্ধিক্ষণের পালা।

হারাধন রায়ের পরই মতিলাল ঘোষের কথা আসে। তাই এখানে তাঁর কথা বলে নেওয়া দরকার।

॥ মতিলাল ঘোষ ॥

মতিলাল ঘোষের পরিচিতি পাওয়া যায় না, তবে তিনি চব্বিশ পরগণা জেলার রাজপুর হরিনাভির বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর অধিকাংশ পালায় গদ্য ও পদ্য ছন্দের সংলাপ ছিল।

১৯০৫ সালে তিনি প্রথম লেখেন 'প্রভাস মিলন'। ১৯১৭ সালে মতিবাবুর 'অভিমন্যুবধ' পালার পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। লেখেন 'সীতার পাতাল প্রবেশ'। এই পালাটি ভান্ডারী অপেরায় অভিনীত হয়েছিল। ১৯০৬ সালে মতিলাল ঘোষের 'বুদ্ধলীলা' ঐতিহাসিক বিষয় অথচ পৌরাণিক ফর্মে লিখেছিলেন। নাট্যকার শ্রীহর্ষ তাঁর 'রত্নাবলী' নাটকে প্রথমেই সূত্রধারের চরিত্র প্রবর্তন করেছিলেন, পরে তাঁরই প্রভাবে আসে মতিলালের সূত্রধার। তাঁর আর এক পালার নাম 'পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ'। এই পালাটি ১৩৩১ সনে অভিনীত হয়।

মতিলাল ঘোষের আরও কিছু পালা হলো— লক্ষ্মণবর্জন (১৩১৩), পরশুরাম (১৩১৭), ধ্রুব (১৩২১) বৃন্দাবনবিহারিণী (১৩২৪), দ্বারাবতী (১৩২৯)।

মতিলাল যাত্রাগানের আঙ্গিক নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তাঁর পালায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মতিলাল রায় পালাকার হিসেবেও যে চরম খ্যাতি পেয়েছিলেন, মতিলাল ঘোষ কিন্তু তা পাননি।

এই সময়ের আর একজন খ্যাতিমান লেখক হলেন হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। ১৩০৩ সন থেকে ১৩৩২ সন পর্যন্ত বহু পালা রচনা করেছিলেন। এখানে হরিপদবাবুর কথা কিছুটা বলে নেওয়া যাক।

॥ হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ॥

১২৭৮ সনে হাওড়া জেলার কল্যাণপুরে হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম।

হুগলীর নর্মাল স্কুলের শিক্ষা শেষ করে কলকাতায় আসেন এবং সংস্কৃত কলেজের টোলবিভাগে পড়াশোনা করেন। ছেলেবেলা থেকেই নাট্যরচনার প্রতি আগ্রহ। পৌরাণিক, ভক্তিমূলক ও ঐতিহাসিক এই তিন শ্রেণীর পালা লিখে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ১৩১০ সনে হরিপদ তাঁর পালার কিছু কিছু গানে থিয়েটারের গানের সুর ব্যবহার করে যাত্রাপালার গানে নতুন সুর আরোপ করেছিলেন। যাত্রায় থিয়েটারের সুর দর্শকদের মোহিত করায় তিনি ১৩১১ সনে লেখেন 'পদ্মিনী' এবং তাতেও থিয়েটারের সুর আরোপ করেন। থিয়েটারের বিখ্যাত সুরকার ভুতনাথ দাসকে হরিপদ বাবু প্রথম যাত্রায় আনেন। এরপরই স্বনামখ্যাত দেবকণ্ঠ বাগচীও যাত্রায় আসেন। এই দুই থিয়েটারের দিক্‌পাল সুরকার যাত্রায় আসার ফলে হরিপদবাবুই প্রথম 'থিয়েটারি সুরের' প্রবর্তক হন।

গিরীশ যুগেই বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে বঙ্গ রীতি-নীতি অনুসারে মঞ্চে নাচ দেখানো হয়। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলিবাবা' (১৮৯৭ খৃঃ) নাটকে নাচ সুপ্রযুক্ত হয়। এই সময়ে থিয়েটারে যে নৃত্যশিল্পীরা উচ্চাসনে ছিলেন তাঁরা হলেন সাতকড়ি গাঙ্গুলী আর নেপালচন্দ্র বসু (ন্যাপা বোস)। হরিপদ একদিন তাঁদেরও যাত্রায় আনলেন এবং নতুন নাচ সংযোজিত হলো, যাকে 'ব্যালে' বলা হতো। এর আগেই ব্যালে ছিল, কিন্তু তা সুপরিচালিত, সুনিয়ন্ত্রিত ছিলনা। হরিপদবাবু তাই করেছিলেন। যাত্রার 'গীতাভিনয়' নাম এই থেকে উঠে গেল।

হরিপদ যাত্রাপালায় প্রথম 'নির্দেশক' নিযুক্ত করেন। থিয়েটার থেকে প্রখ্যাত চুনীলাল দেব ও ক্ষেত্রমোহন মিত্রকে আনিয়ে রিহার্সাল ঘরে বসিয়ে রাখতেন। তাঁরাই অভিনয় শিক্ষা দিতেন। এইভাবে তাঁর 'পদ্মিনী'—প্রথম পালা আসরে উপস্থাপিত হয়েই জনপ্রিয়তা পায়। এই থেকেই যাত্রাকে 'অপেরা' নামে অভিহিত করেন বঙ্গদেশের মানুষেরা।

যদিও হরিপদবাবুর আগে ঐতিহাসিক পালা আসরস্থ হয়েছিল, তবুও হরিপদবাবুর এই ঐতিহাসিক পালা সব দিক দিয়ে সুপ্রযোজিত ছিল। হরিপদবাবুর পালায় আদিরসাত্মক দ্বৈত গান', 'গণের গান' 'একানে বালকের গান', ইত্যাদি ছিল। বাল্মীকি রামায়ণের কাহিনী নিয়ে 'লবন সংহার' পৌরাণিক পালা প্রথম উপস্থাপনার কীর্তি হরিপদবাবুর।

হরিপদর আরও যে পালাগুলি জনপ্রিয় হয়েছিল :

মহীরাবণ : কৃত্তিবাসী রামায়ণের 'লঙ্কাকান্ড' অবলম্বনে লেখা। এতে জুড়ির গান ছিল। গদ্য সংলাপ ব্যবহার করা হয়েছিল।

প্রহ্লাদ চরিত্র : শ্রীমৎ ভাগবতের (বাংলা সংস্করণ) সপ্তম স্কন্ধের ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, অধ্যায় থেকে এর কাহিনী নেওয়া হয়েছিল। এই নাটকে প্রায় ৪০টি ব্যালে ছিল। গানে ব্যবহার করা হয়েছিল গম্ভীর তাল, চৌতাল, সুর ফাঁক, ঝাঁপ ইত্যাদি তাল-লয়। ব্যবহার করা হয়েছিল ঠুম্‌রী ও খেমটা। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই পালাগানের সমালোচনা করেছিলেন।



☐ স্বপনকুমার ।। যাত্রার আসরে যাঁর প্রতাপ কিংবদন্তী।



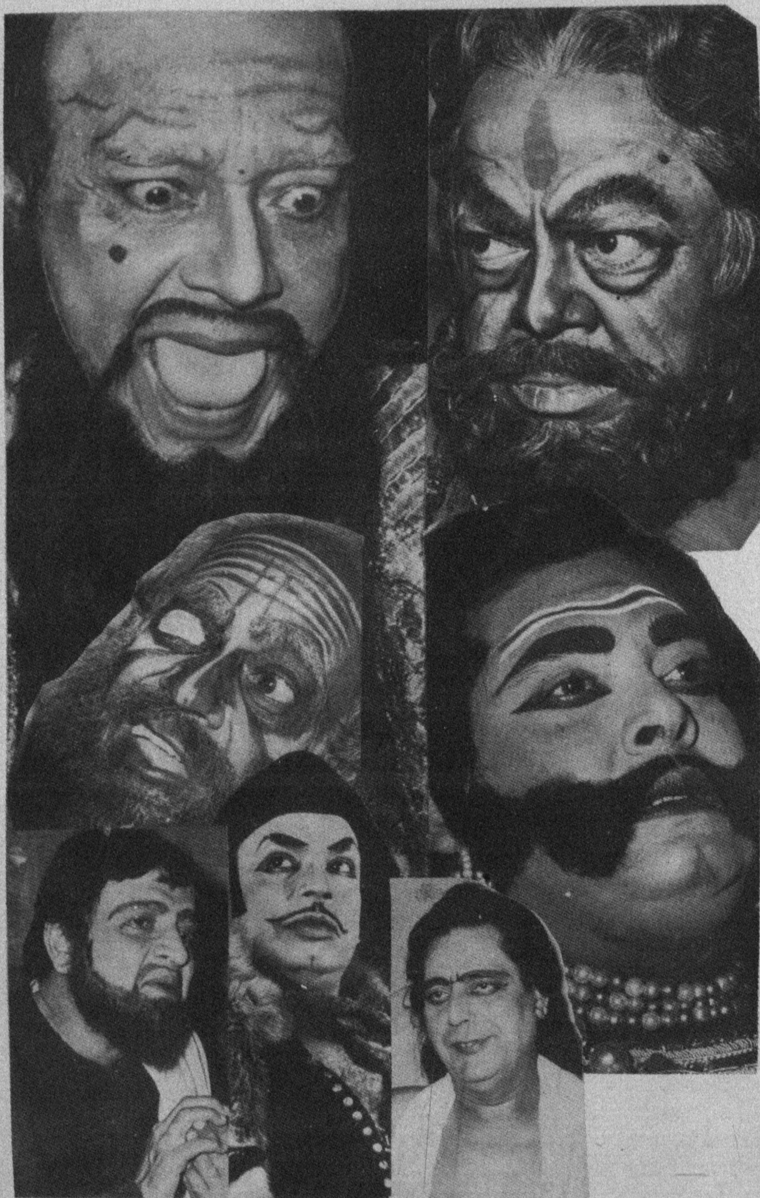
☐ জ্যোৎস্না দত্ত ।। যাত্রা সম্রাজ্ঞী হিসেবে যিনি থাকবেন চির বন্দিতা।



☐ বেলা সরকার ।। যাঁর অভিনয়ই সম্পদ।

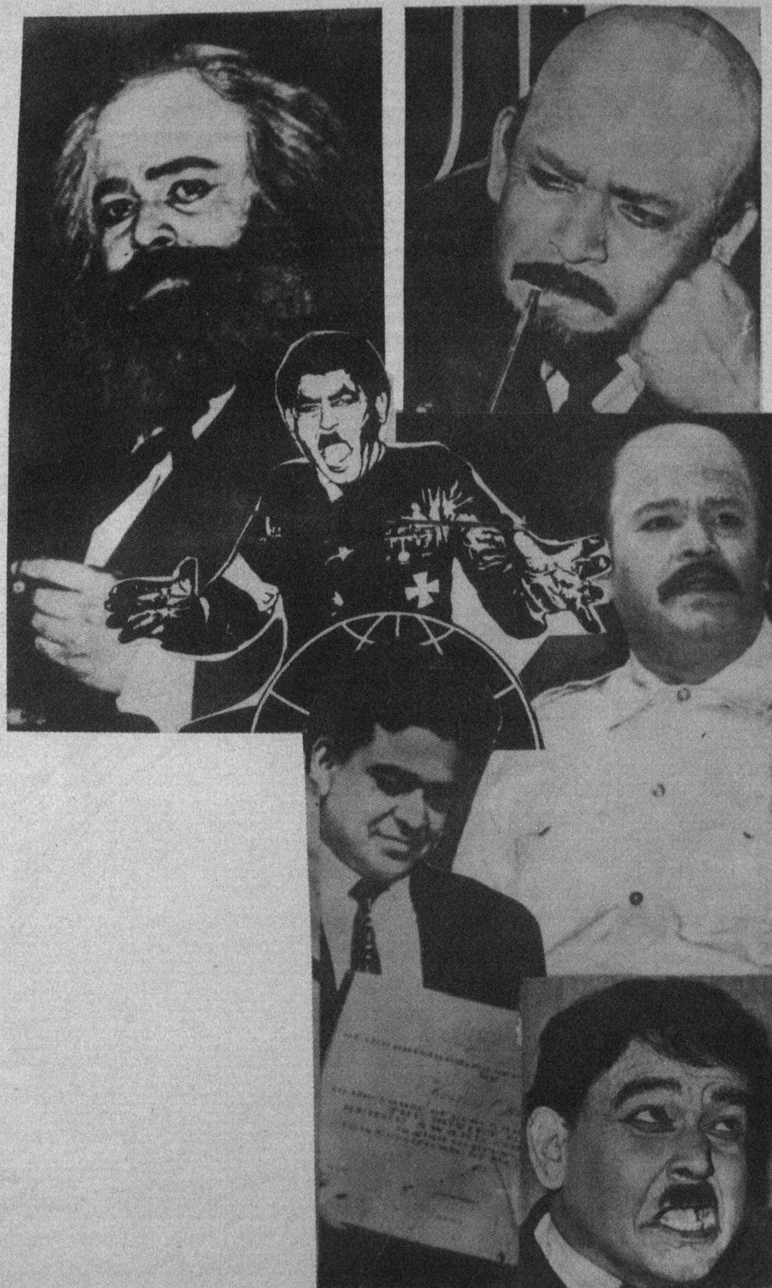


□ বীণা দাশগুপ্তা ।। যাঁর জনপ্রিয়তাই যাঁকে যাত্রালক্ষ্মীতে রূপান্তরিত করেছে।

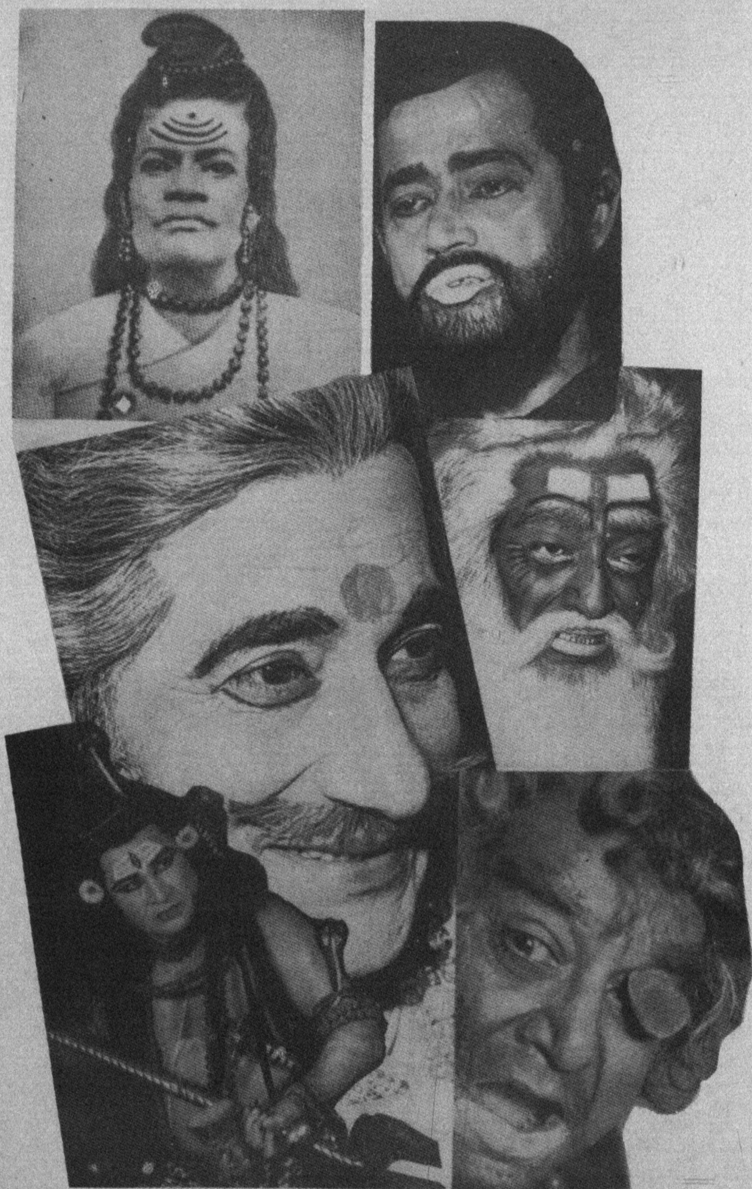


রূপসজ্জায় বিস্ময়কর বিবর্তন

দিলীপ চ্যাটার্জী, অরুণ দাশগুপ্ত, অভয় হালদার, রাখাল সিংহ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবদাস মুখার্জী, ভোলা পাল।



☐ কার্লমার্কস,. লেনিন, স্তালিন, সুভাষ, হিটলার আরও বহু চরিত্র স্রষ্টা শান্তিগোপাল।



☐ বিনোদ ধাড়া (গায়ক অভিনেতা / গুরুদাস ধাড়ার বাবা), পূর্ণেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর লাহিড়ী, শ্যামল ঘোষ, মোহন চ্যাটার্জী, অনাদি চক্রবর্তী।

অলর্ক ঃ মার্কণ্ডেয় পুরাণের কাহিনী থেকে নেওয়া। এ ছাড়া হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়ের আরও উল্লেখযোগ্য পালা হলো রাণী জয়মতী (১৯১৪), বিদুর (১৯১৩) রামনির্বাসন (১৯১৬) জয়লক্ষ্মী (১৯২১), পঞ্চরাত্রি (১৯২৪) জনা ও প্রবীর পতন (১৮৯৫), দাতাকর্ণ (১৩০৪), রুক্মাঙ্গদ রাজার হরিবাসর (১৯০৩) নল দময়ন্তী (১৯০৩) যদুবংশ ধ্বংস, দুর্গাসুর, মুদ্রারাক্ষস অবলম্বনে চাণক্য, তারা, অন্নপূর্ণা, গৌরাঙ্গ, মেঘনাদ, খনা দেবী, কালাপাহাড় ইত্যাদি। ১৩৩৩ সনে মারা যান হরিপদবাবু।

কিছু পালাকারের খ্যাতি যত বৃদ্ধি পেতে থাকল, আমরা পাশাপাশি লক্ষ্য করলাম একটু একটু করে যাত্রাগানের গতি ও প্রকৃতিও পাল্টে যেতে থাকল। মতিলালের সমসাময়িক এই পালাকারেরা যতই শক্তিমান হোন, তাঁরা কোন দিক থেকেই পারলেন না, মতি রায়ের প্রতিভা আর দাপটকে বিন্দুমাত্র খর্ব করতে। সুতরাং এই গীতাভিনয়-লেখকরা ধরলেন অন্য পথ। এর ফলে দেখা দিল **থিয়েট্রিক্যাল অপেরা**। এই থিয়েট্রিক্যাল অপেরার জন্ম ১৩২০ সন থেকে। এই সময়ে অনেক যাত্রা দল পুরাতন রীতিটি একেবারে পরিত্যাগ করেনি। কিছুকালের মধ্যে সেই দলগুলির অস্তিত্ব মুছে গেল। পুরাতন ভাব ও ভাবনা নিয়ে যাঁরা পালা লিখতেন তাঁরা যুগ চাহিদাকে মেনে নিয়ে লেখনীর ধারা পাল্টালেন। এই যুগধর্মী পালা লিখে পরবর্তী সময়ে যাঁরা খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য হলেন—কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্র নন্দী, ভোলানাথ রায় (কাব্যশাস্ত্রী), অতুলকৃষ্ণ বসুমল্লিক, গঙ্গেশকুমার চট্টোপাধ্যায়, অঘোরনাথ কাব্যশাস্ত্রী, রামদুর্লভ কাব্যবিশারদ, নিতাইপদ চট্টোপাধ্যায়, ভবতারণ চট্টোপাধ্যায় আরও অনেকে। এঁদের মধ্যে কেশবচন্দ্র একটু প্রবীণ ছিলেন। এঁদের কথা পরে বিস্তারিত বলা যাবে।

॥ ধনকৃষ্ণ সেন ॥

ইনিও মতিলাল রায়ের সমসাময়িক পালাকার। ইনি ১২৯৯ সনে লেখেন অনুধ্বজের হরিসাধন। পালাটি ১৩১১ সনে প্রকাশিত হয়। সত্যনারায়ণ লীলা, বিল্বমঙ্গল, উমাতারা বা জটিলা, হংসধ্বজের মহামুক্তি, রাবণের মোহমুক্তি, রুক্মাঙ্গদরাজার হরিবাসর, পৃথুরাজার শতাশ্বমেধ যজ্ঞ, পাণ্ডবমিলন, কর্ণবধ ইত্যাদি জনপ্রিয় পালা কত সালে লিখেছিলেন তা সঠিক ভাবে বলা যায় না, তবে এগুলির প্রকাশকাল ছিল মোটামুটিভাবে ১৩১১, ১৩১৪, ১৩১৫ সন।

১২৭১ বঙ্গাব্দে বর্ধমান জেলার খাঁড়-এ রামনারায়ণের ছেলে ধনকৃষ্ণ সেনের জন্ম। বর্ধমান মহারাজার কলেজে পড়াশোনা করেন, পরে মেট্রোপলিটন কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। অল্প বয়স থেকেই তিনি কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন, সেই সূত্রে তাঁর সাহিত্যের আসরে আত্মপ্রকাশ। ১২৯৫ বঙ্গাব্দে 'সুদর্শনের রাজ্যাভিষেক' নামে একটি নাটক লেখেন। ধনকৃষ্ণ সেনের ১৩টি পৌরাণিক নাটকের মধ্যে "শতাশ্বমেধ যজ্ঞ", "কর্ণবধ", 'সতীমালতি' প্রকাশিত হলো। ১৩০৯ সনে তাঁর মৃত্যুর পর আরও ২টি পালা প্রকাশিত হয়েছিল।

মতিলাল রায়ের পালার যে আদর্শ, ধনকৃষ্ণ সেনের পালায় সেই আদর্শই প্রতিফলিত হয়েছে। ধনকৃষ্ণ সেনের সব পালাই ভক্তি রসাশ্রিত। প্রতিটি পালাই 'জনশিক্ষা'র মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। কিছু কিছু পালায় পালাকার কথকতার ধারা নিয়েছিলেন। তিনি গদ্য ও পদ্য সংলাপ ব্যবহার করতেন। তিনি সরল ভাষায় লিখতে পছন্দ করতেন। উমাতারা বা জটিলা পালায় ধনকৃষ্ণ সেন নাট্যগুণ যথেষ্ট আরোপ করেছিলেন, কিন্তু এটি নাটক হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু তাঁর রুক্মাঙ্গদ রাজার হরিবাসর' পালাটি যথার্থ নাট্যগুণে উত্তীর্ণ। এই পালায় ধনকৃষ্ণ সেন 'বিবেক' চরিত্র সৃষ্টি করে প্রশংসা পেয়েছিলেন। বিবেক এখানে শুধু গানে গানে মনের কথা প্রকাশ করেনি। বিবেকের মুখ দিয়ে পালাকার মাঝে মাঝে গদ্য সংলাপও প্রকাশ করেছিলেন।

॥ আরও কিছু যাত্রা দল ॥

মতিলাল রায়ের সমসাময়িক কিছু যাত্রা দল ও অন্য সংবাদ।

॥ দুই পুরুষের দল ॥ এ ক্ষেত্রে একই বংশজাত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত যাত্রা দলের ক্রম বিবর্তনের কথা বলছি না। বলছি, একই পরিবারের দুই ভাইয়ের কথা। ব্রজমোহন রায় আর গোপীমোহন রায়। ব্রজমোহন রক্তাতিশার রোগে মারা যান। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ছোটভাই গোপীমোহন আট বছর দল চালিয়েছিলেন। তখন মতিলাল রায়ের একচ্ছত্র আধিপত্য থাকায় এই দল চালানো সম্ভব হয়নি।

॥ প্রসন্ন নিয়োগীর উত্থান-পতন ॥

মতিলাল রায় তখন জীবিত। এই সময়েই চন্দননগরের ধনী ও অভিজাত প্রসন্ন নিয়োগী যাত্রাদল খুলেছিলেন। সবাই বলত প্রসন্ন নিয়োগীর দল। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রসন্ন নিয়োগী তাঁর ভাই শ্যাম নিয়োগীকে চার আনা অংশের অংশীদার করে নিয়ে যাত্রা দল তৈরি করেন। এই দলের ম্যানেজার ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সতীশ দলে অভিনয়ও করতেন। তাছাড়া রামপদ মুখোপাধ্যায় নামে একজন শক্তিমান অভিনেতা ছিলেন। সতীশের মাস মাইনে ছিল ৩০ টাকা আর রামপদ পেতেন ৩৫ টাকা' পরে মাইনে বেড়ে যায়। সতীশ পেতেন ৪০ ্ আর রামপদ পেতেন ৪৫ টাকা। এই দলে অভিনীত অধিকাংশ পালাই লিখেছিলেন হারাধন রায়। সেই পালার তালিকা এই রকম ঃ

যোগমায়া, মহাশ্বেতা বা কাদম্বরী (১৩১২), নলদময়ন্তী (১৩১২), পার্থ পরীক্ষা, সুরথ উদ্ধার (১৩১৪), মীরা উদ্ধার (১৩১৫), রাম অবতার (১৩২০)। এই দল খুবই খ্যাতি অর্জন করেছিল। খ্যাতির বিড়ম্বনা অনেক' খ্যাতি মানুষকে আরও স্বপ্ন দেখায়। প্রসন্ন বোধ করি সেই স্বপ্ন দেখে খ্যাতির শিখরে পৌঁছবার জন্য যত দলকে বড় করতে থাকলেন ততই দল ঋণগ্রস্ত হলো। যাত্রাদল চালাতে গিয়ে প্রসন্ন নিয়োগী কালনার ধনী ব্যক্তি, বিরাট ব্যবসায়ী গণেশ ঘোষের কাছ থেকে ৮০০০ টাকা ঋণ করেছিলেন। এর ফলশ্রুতি, প্রসন্ন নিয়োগীর দলটি নিয়ে নেন গণেশ ঘোষ।

॥ প্রসন্ন নিয়োগীর ম্যানেজার ও অভিনেতা, সতীশ মুখুজ্জের দল ॥

প্রসন্ন নিয়োগীর দল বিক্রি হয়ে যাবার পর দলের ম্যানেজার ও অভিনেতা সতীশ মুখোপাধ্যায় নিজেই একটা যাত্রাদল তৈরি করেছিলেন। এই সতীশ প্রথম জীবনে রামলাল চাটুজ্জের দলে যাত্রা করতেন, পরে প্রসন্ন নিয়োগীর দলে এসে বিখ্যাত হন। প্রসন্নবাবুর মৃত্যুর পর তিনি নিজেই দল তৈরি করেছিলেন। আহেরীটোলার নাথের বাগানের গোঁসাই গলিতে সতীশ দলের গদি তৈরি করেছিলেন। তিনি অভিনয় করতেন নিজের দলে। অন্য অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন কানাই পাল, ফণি মুখোপাধ্যায়, রাখাল মুখোপাধ্যায়। এই রাখাল ছিলেন বর্ধমানের তেহাটার লোক। এই দলে পুলিন বসু নামে একজন বাদ্যকার ছিলেন, তা ছাড়া দু'জন ভাল গায়ক ছিলেন। একজনের নাম বঙ্কিম অন্যজনের নাম সন্তোষ। দেবকণ্ঠ বাগচী ছিলেন সুরকার। আর নৃত্য শিক্ষক ছিলেন তারক বাগচী। সতীশ মুখোপাধ্যায়ের দলের নাম ছিল 'রামকৃষ্ণ নাট্য সমাজ'। প্রথমদিকে হারাধন রায়ের পালা এই দলে অভিনীত হতো, পরে অন্যান্য পালাকারদের পালা হতো। যে প্রসিদ্ধ পালাগুলি এই দল আসরস্থ করত তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—শিনি চরিত্র, মীরা উদ্ধার, কাদম্বরী, তাম্রধ্বজ, দেবযানী, জয়দেব, শ্মশানে খনা (ভাগ্যদেবী)।

এই দল প্রথম দিকে জুড়ি ও ছেলের দলের গান রাখত, পরে দলটি অপেরা পার্টিতে পরিণত হয়। সতীশবাবু যখন তাঁর দলকে অপেরা পার্টিতে পরিণত করেন তখন তাঁর ভাইপো ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় এই দলে অভিনেতা হিসেবে প্রথম যোগ দেন। এই অপেরা পার্টিতে প্রথম যে

অপেরাধর্মী পালা অভিনীত হয় তার নাম "মধ্যাহ্নে সূর্য্য"। ফণিভূষণবাবুরও অভিনীত প্রথম যাত্রা নাটক। এই ফণিবাবুই হলেন স্বনামধন্য ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ।

হঠাৎ একদিন কলকাতার গদিঘর থেকে যাত্রা দলের সব পোশাক এবং অর্থ চুরি হয়ে যাবার ফলে ৭০ বছরের সতীশবাবুর দেহ ও মন সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। তিনি মারা যান ১৩৫২ সনের আশ্বিনে। এই দল ভেঙে তৈরি হয় আর্য অপেরা।

॥ লোকনাথ ওরফে লোকার যাত্রা ॥

মতিলাল রায়ের সমসাময়িক এই লোকনাথ দাস বা লোকা ধোপা। লোকনাথ ছিলেন সুগায়ক। ১২৮৭ সনে বঙ্গদেশে এই লোকা ধোপার জনপ্রিয়তা খুবই ছিল। কলকাতার হাড়কাটা অঞ্চলে বিখ্যাত ব্যবসায়ী এবং যাত্রার অধিকারী দুর্গাচরণ ঘড়িয়ালের গায়ক ছিলেন লোকনাথ। দুর্গাচরণ মারা গেলে লোকনাথ দলের দায়িত্ব নিয়ে প্রায় একটানা চল্লিশ বছর দলকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। কস্টিউমস্ অর্থাৎ পোশাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে এই দল দর্শকদের মন জয় করেছিল দ্রুত। রাজার পোশাক ঃ ঢিলা পাযজামা, চাপকান, কোমরবন্ধ, মাথায় পাগড়ি। রাজপুত্রের পোশাক প্রায় রাজার মত, তবে পাগড়ির বদলে জরি বসানো টুপি। রানী পরত ঢাকাই শাড়ি, চেলি ইত্যাদি। যে বাড়িতে লোকনাথের দলের ঘর ছিল, সেই বাড়িওয়ালার কাছ থেকে আসল সোনার গয়না চেয়ে লোকনাথ আসরে ব্যবহার করতেন। অভিনয় শেষে আবার গয়না বাড়িওয়ালাকে ফেরৎ দিতেন। এই সময়ে শুধু লোকনাথই নয় বহু সখের দলে এই ভাবে আসল গয়না পরার ব্যবস্থা ছিল। এই ঘটনা থেকে একটা কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো, কী নিদারুণ বিশ্বাস!

লোকনাথ বা লোকা ধোপার দলে যে পালাগুলি অভিনীত হতো তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য 'বিদ্যাসুন্দর', 'নলদময়ন্তী', 'শ্রীমন্তের মশান', 'কলঙ্ক ভঞ্জন' ইত্যাদি।

॥ যাদব বাঁড়ুজ্জের দল ॥

মতিলাল রায়ের খ্যাতি যখন তুঙ্গে তখন চারদিকে যাত্রা দল খোলার যে প্রবল প্রবণতা ছিল তার দৃষ্টান্ত এই যাদব বাঁড়ুজ্জের দল।

॥ পীতাম্বর পাইনের দল ॥

এই দলটিও মতিলাল রায়ের সমসাময়িক। পীতাম্বর পাইনের দলের নাম ছিল 'পাইন কোম্পানির যাত্রা।' ১৩০০ সনে দলটি তৈরি হয় এবং ১৩১২ সন পর্যন্ত বেঁচে ছিল বলে অনেকে মনে করেন। আরও শোনা যায়, পীতাম্বর পাইনরা ছিলেন বর্ধমানের লোক। এই দলে ধনকৃষ্ণ সেনের 'সত্যনারায়ণ লীলা' গীতাভিনয় খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। 'বাঙ্গালীর গান'-এর ৮৬০ পাতায় আছে, পীতাম্বর পাইনের ভণিতাযুক্ত দু'খানা গান।

॥ উমাকান্ত ঘোষাল ॥

মতিলাল রায়কে অনুকরণ করে যাঁরা যাত্রাগান বা যাত্রাদল তৈরি করে নাম ডাক করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হলেন উমাকান্ত ঘোষাল। এখন যেমন যাত্রা দলের অধিকাংশই যাত্রাপালার উদ্বোধনের পরেই এখানে ওখানে কিছু শো করে ছুটে যান উত্তরবঙ্গ-আসামে। এমন কিছু দল আছে যাঁরা আসাম-উত্তরবঙ্গে খুবই জনপ্রিয়, তেমনি উমাকান্ত ঘোষালের দল পূর্ববঙ্গে ছিল জনপ্রিয়। উমাকান্ত নিজে ছিলেন সুশিক্ষিত ও সুকণ্ঠের অধিকারী। নিজেও অভিনয় করতেন। তাঁর দলের পালাগুলির মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল—অহিভূষণের 'সুরথ উদ্ধার', 'তুলসী লীলা,' 'দণ্ডীপর্ব', 'রাই উন্মাদিনী', 'রামাশ্বমেধ'।

॥ ভেঙ্গর ঘোষ ও কালীকান্ত ॥

এঁরা মতিলালের অনুসরণে যাত্রাদল তৈরি করেছিলেন।

॥ ভূষণচন্দ্রের দল ॥

ভূষণচন্দ্র দাসের যখন খুব খ্যাতি তখনও মতিলাল রায় জীবিত। ভূষণ দাস ছিলেন বর্ধমান জেলার কালনা থানার অন্তর্গত অনুখাল গ্রামের লোক। এই গ্রামেরই মানুষ তারিণী পাল ছিলেন যেমন পয়সাওয়ালা তেমনি পালাপ্রেমিক। তিনি একটা সখের দল তৈরি করেছিলেন। ভূষণ দাস এই যাত্রা দলে এসেছিলেন অভিনেতা হয়ে। ইনি ভাল গাইতেন। পরে ভূষণ দাস নিজেই যাত্রার দল তৈরি করেন। দলের গদি তৈরি করেছিলেন নাথের বাগানে। প্রথম জীবনে তিনি জুড়িতে গান করতেন, পরে, একক গায়ক হিসেবে বিখ্যাত হয়েছিলেন। এই দলের পালাকার ছিলেন মতিলাল ঘোষ। তাঁর বুদ্ধলীলা, লক্ষ্মণবর্জ্জন, পরশুরাম, ধ্রুব ইত্যাদি পালাগুলি অভিনীত হয়। এই দলের 'মাতৃপূজা' পালা জনপ্রিয় হয়েছিল। ইংরেজ সরকার এই পালার অভিনয় নিষিদ্ধ করেছিল! এই নিষিদ্ধ করার ব্যাপারটা নথিপত্র সহযোগে দেখিয়েছিলেন চন্দননগরের আইনজীবি নারায়ণচন্দ্র দে।

॥ অভয় দাসের দল ॥

ভূষণ দাসের বাজার যখন গরম তখনই অভয় দাসের 'সঙ্গীত সম্প্রদায়' খুব নাম করেছিল। এই দলে, মতিলাল ঘোষের 'প্রভাস মিলন,' হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবীর পতন বা জনা' 'কালকেতু', 'দাতাকর্ণ' অভিনীত হয়েছিল। এই দলের জনপ্রিয় পালা, যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ ও অভিমন্যুবধ। ১৩২০ সালে অভয়পদ মারা যান।

॥ রামলাল চ্যাটার্জীর যাত্রাদল ॥

প্রসন্ন নিয়োগীরও আগে রামলাল চ্যাটার্জীর দল ছিল। কারণ সতীশ মুখার্জী প্রথম রামলালের দলে পরে প্রসন্ন নিয়োগীর দলে যুক্ত হন। এ থেকে বোঝা যায় ১৩০৫ সন নাগাদ রামলালের দল তৈরি হয়। এই দলে হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'লবন সংহার' অভিনীত হয়।

॥ রাজকুমার ন্যায়রত্নের দল ॥

এই রাজকুমার ন্যায়রত্ন বোধ করি উলুবেড়িয়ার অধিবাসী। কারণ, তিনি যে যাত্রা দল তৈরি করেছিলেন তার নাম ছিল "উলুবেড়িয়া গ্রেট্ বেঙ্গল অপেরা"। রাজকুমার তাঁর দলের নামে 'অপেরা' শব্দটি যদিও ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু পালা উপস্থাপনার মধ্যে 'অপেরা'র ধর্ম বা আধুনিকতার বিশেষ ভূমিকা ছিল না। এই দলে আশুতোষ চক্রবর্তীর 'চন্দ্রহাস' অভিনীত হয়েছিল। এই 'চন্দ্রহাস' গীতাভিনয়ে মতিলালের রচনার প্রভাব ছিল।

॥ প্রসঙ্গ অহিভূষণ ভট্টাচার্য ও সাঁতরা এণ্ড কোম্পানি ॥

মতিলাল রায় প্রসঙ্গে বিস্তারিত বলার পর থেকে যে দলগুলির কথা এখানে বলার চেষ্টা করেছি সেগুলি মূলত মতিলালের কর্মজীবনের শেষ দিকে প্রতিষ্ঠিত। বেশ কিছু দল জনপ্রিয় হয়েছিল, যার অস্তিত্ব বজায় ছিল অনেক বছর। এদেব মধ্যে অহিভূষণ ভট্টাচার্যের দল বা সাঁতরা এণ্ড কোম্পানি একটি। অহিভূষণ তাঁর যাত্রাদলের বাসা বা গদিঘর তৈরি করেছিলেন হরিতকি বাগান লেনে। এঁরা হলেন দুই ভাই। হরিভূষণ আর অহিভূষণ। অহিভূষণের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি দেখা যায় তা হলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এই সময়ে যাত্রাপালার পরিচালকের প্রয়োজন বোধ করেছিলেন তিনি, আর সেই কারণে দলের অধিকারী বলতে যা বোঝায় তাই ছিলেন অহিভূষণ। পালার ডিরেকটর ছিলেন বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য। বিভূতিবাবু তৎকালীন এক পণ্ডিত বংশের ছেলে।

পাইকপাড়ার রাজার সভাপণ্ডিত ও পারিবারিক চিকিৎসক চণ্ডীভূষণ ভট্টাচার্য বেদান্ত শাস্ত্রীর ছেলে বিভূতিভূষণ। বিভূতিবাবু অভিনেতা হিসেবে খুবই শক্তিমান ছিলেন। যা হোক, অহিভূষণ ভট্টাচার্যের অর্থ বিনিয়োগকারী ছিলেন সাঁতরাবাবুরা। পরে যখন অহিভূষণ দল চালাতে অক্ষম হন তখন এই সাঁতরা বাবুরা দলটি নেন এবং নতুন নাম দেন সাঁতরা এণ্ড কোম্পানি। এই সাঁতরা কোম্পানির সঙ্গে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মধুর সম্পর্ক বজায় ছিল অহিভূষণবাবুর। অহিভূষণ যদিও

অধিকারী হিসেবে প্রথমদিকে যাত্রাদল চালাতেন, কিন্তু তিনি ছিলেন পালাকার। তাঁর বেশিরভাগ পালাই নিজেদের দলে অভিনীত হয়েছিল। অহিভূষণের পালার তালিকা এই রকম ঃ বোধনে বিসর্জন, সুরথ উদ্ধার (এই দুটি পালাই প্রকাশিত হয় ১৯০১ সালে)। বোধনে বিসর্জন পালার ভিতর দিয়ে অহিভূষণ প্রকাশ করেছিলেন, তাঁর পালা ভাবনা কতটা আধুনিক, কতটা সমকালীন। তদানীন্তন জমিদাররা মুঠো মুঠো টাকা ছড়িয়ে দুর্গাপুজো করতেন, বাইজি নাচাতেন। অহিভূষণ যেই ব্যাপারটাই প্রহসন হিসেবে লিখেছিলেন। তদানীন্তন শিক্ষিত নব্য যুবক-যুবতীর আচরণে যে উৎকট আধুনিকতা প্রসার লাভ করেছিল, অহিবাবু সরস্বতী আর কার্তিক এই দুই দেব-দেবী চরিত্রের ভিতর দিয়ে তা অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। সরস্বতী গাউন পরেন আর ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে কথা বলেন, কার্তিক কেতাদুরস্ত থাকার জন্য ব্রাশ দিয়ে চুল পাট করতেন, জুতোয় মাখন লাগাতেন! মোদ্দা কথা, স্যাটায়ারিক্যাল নাটক বা পালা জনসমক্ষে তুলে ধরে অহিভূষণ নব চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন।

১৯০৮ সালে অহিভূষণ লিখেছিলেন 'ধর্মলীলা' (গীতাভিনয়)। এর কাহিনীর সূত্র ছিল ঘনরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল' (১৭১১) ও 'জনবসতি' আশ্রিত।

১৯২৯ সালে অহিবাবুর 'বামন ভিক্ষা' (গীতাভিনয়) পালার ৪র্থ সংস্করণ ছাপা হয়েছিল। এ ছাড়া অহিবাবুর আরও কিছু জনপ্রিয় গীতাভিনয় প্রকাশিত হয়েছিল ভট্টাচার্য এন্ড সন্স থেকে, তার মধ্যে রামাশ্বমেধ (১৩১১) ও রাইউন্মাদিনী। রাই উন্মাদিনীর ৩য় সংস্করণ বেরিয়েছিল ১৩২৪ সনে; অহিবাবুর মৃত্যুর পর। ১৩১১ সনে অহিভূষণ কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। কুমারটুলীর কবিরাজ ভগবতীপ্রসাদ সেনের চিকিৎসায় কিছুটা আরোগ্যলাভ করেছিলেন বটে কিন্তু তা বিশেষ স্থায়ী হয়নি। ১৩১৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তিনি মারা যান। কিন্তু সাঁতরা এণ্ড কোম্পানি তখনও ছিল সতেজ। সেই সতেজ অস্তিত্বর একটু বিবরণ এখানে দেওয়া যাক।

১৩০১ সালে অহিবাবুর 'তুলসীলীলা' গীতাভিনয় হয়েছিল সাঁতরা এণ্ড কোম্পানিতে। তা ছাড়া গঙ্গেশকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'পুতনাবধ' (১৩৩৩) অঘোরনাথ চক্রবর্তীর যাজ্ঞসেনী (১৩৩৮) নাটকও এই দলে হয়েছিল।

সাঁতরা কোম্পানির দলে সুকণ্ঠের গায়ক ছিলেন দু'জন, জ্যোতিষচন্দ্র প্রামাণিক আর পূর্ণচন্দ্র ঘটক। শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ধরণীধর চক্রবর্তী ছিলেন শক্তিমান অভিনেতা। সাঁতরা এন্ড কোম্পানি বছর কয়েকের মধ্যে অপেরা পার্টিতে পরিণত হয়েছিল। তখন এখানে "ধর্মলালা" পালায় নৃত্য শিক্ষক ছিলেন তারক বাগচী। হুগলীর জলাপাড়ায় ধনী ব্যবসায়ী মহেন্দ্র সাঁতরার দলই এই সাঁতরা কোম্পানি। এ দলের গদি ঘর বা কার্যালয় ছিল চন্দননগরের ফরাসডাঙ্গায়। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত সাঁতরা কোম্পানির অস্তিত্ব ছিল।

॥ গঙ্গেশকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥

সাঁতরা কোম্পানিতে গঙ্গেশকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পালা হয়েছিল। সুতরাং তাঁর কথা একটু বলে নেওয়া যাক।

গঙ্গেশকুমার ছিলেন বর্ধমানের পিপলং গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর লেখা 'মহিষাসুর', 'রানী ভবানী', 'কৃষ্ণমাতা', 'বাল্মিকী' ইত্যাদি পালা অভিনীত হয়েছিল যথাক্রমে শংকর অপেরা পার্টি, রাধাকৃষ্ণ নাট্য সমাজ অপেরায়।

॥ ফরাসডাঙ্গা হয়ে উঠেছিল সংগীত চর্চার কেন্দ্র ॥

১৮৬০ সালের কথা। গোটা ফরাসডাঙ্গা সংগীত চর্চার বিশেষ কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। চারদিকে যেমন চাহিদা কবিগান, টপ্পা ইত্যাদির, তেমনি চাহিদা যাত্রাগানের। প্রতি সন্ধ্যা আর প্রতি রাতই যেন ফরাসডাঙ্গা মেতে প্লাকত গানে গানে। সুতরাং কলকাতার অধিকাংশ যাত্রাদলের অধিকারীরা

ফরাসডাঙ্গা থেকে দলের বায়না করার জন্য রীতিমত ভীড় করতেন। তা ছাড়া ফরাসডাঙ্গায় এক সময় চিৎপুরের মতই 'যাত্রাদলের পাড়া' হয়েছিল। এখন যেমন মেদিনীপুরে, আরামবাগে, চাকদায় একটি করে যাত্রাবন্দর আছে তেমনি ছিল ফরাসডাঙ্গায়। ফরাসডাঙ্গার দলগুলির মধ্যে যে দলগুলি নানা দিক থেকে জনপ্রিয় ছিল তার কথা বলা দরকার।

॥ ফরাসডাঙ্গায় গোবিন্দ পাঠকের দল ॥

এই গোবিন্দ পাঠক ছিলেন জাজপুরের লোক। ইনি যাত্রাদল করে হরিশ্চন্দ্র, কীচকবধ, পান্ডবের অজ্ঞাতবাস পালা করে খ্যাত হন।

॥ গুরুপ্রসাদ বল্লভ ॥

ইনি ফরাসডাঙ্গারই অধিকারী। চন্ডীযাত্রা'র দল ছিল। চন্ডীযাত্রায় সুনাম অর্জন করেছিলেন। এখানে "গয়াসুরের হরিপাদপদ্মলাভ" পালা জনপ্রিয় হয়েছিল।

শাহনগরের দুর্লভ দাস. সিঙ্গুর পলাশপাই-এর মাধব দাস, মহাকাল পুরের রাইচরণ বেরা—এঁরা 'কৃষ্ণযাত্রা'য় খুব খ্যাত ছিলেন।

॥ যাত্রাগানে মন মজালো নদিয়া—মতি রায়ের উত্তরকাল ॥

কৃষ্ণনগরের খানাকুলের ঈশ্বর চক্রবর্তী, রামময় দাস, রাজনাবায়ণ দাস, মহেশ ঠাকুর, কান্ত তেলি, রঘু তামেলী, বেণীমাধব ডাফিৎ এঁদের যাত্রাও তখন ভাল চলত। বেণীমাধব জাতিতে ময়রা ছিলেন। তাঁর খুবই জনপ্রিয়তা হয়েছিল রাবণবধ ও মানভঞ্জন পালায়।

এই খবরগুলি "ভারত সংস্কৃতির উৎস ধারা" থেকে পাওয়া যায়।

॥ সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়ের নবদ্বীপ বঙ্গ নাট্য সমাজ ॥

সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায় ছিলেন শশী অধিকারীর দলের অভিনেতা। শশীর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই তিনজন অংশীদার নিয়ে দাদার দলকে আবার নতুন করে সাজান। এই তিনজন অংশীদারের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়ের নাম। ইনি আট আনা আর কালনা নিবাসী বিখ্যাত বেহালাবাদক ফকির মল্লিক চার আনা আর স্বয়ং বসন্ত ছিলেন চার আনা অংশের মালিক। কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল অংশীদারদের মধ্যে একটা ফাটল ধরছে। বসন্ত অধিকারী দল ত্যাগ করলেন প্রথম, এরপর ফকির মল্লিকও অংশ ছেড়ে দিলেন, তখন সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায় হলেন একক মালিক। সত্যম্বর দলের নতুন করে নাম রাখেন 'নবদ্বীপ বঙ্গ নাট্য সমাজ"। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হলো, কেউ ঐ নামে দলকে চিনত না, চিনবার চেষ্টাও করত না। সবার মুখে মুখে ফিরত সত্যম্বর চাটুজ্জের দল। এটা ১৯০০ সালের কথা।

সত্যম্বর ছিলেন নবদ্বীপের ব্যাদ্‌রা (বারেন্দ্র) পাড়ার লোক। ১৮৬৬ সালে জন্ম। প্রথম জীবনে কিছুদিন মতিলাল রায়ের দলে অভিনেতা হিসেবে জড়িত ছিলেন। যতদূর জানা যায় সেই তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। এরপর আসেন মথুর সাহা, যষ্ঠী অপেরা এবং শশী অধিকারীর দলে। বেশ সুনামও পেয়েছিলেন। পরে নিজেই দল করেন। এই সময়েও মতিলালের খ্যাতি ছিল চরম শিখরে। অনেক ব্যাপারেই সত্যম্বরবাবু মতিবাবুর যাত্রাকে অনুসরণ করেছেন বটে কিন্তু যাত্রায় নাটকের ধারাকে প্রাধান্য দিয়ে এক নতুন ভাবনার জন্ম দিয়েছিলেন। এই যে অনুসরণ তার সাক্ষ্য বহন করছে, প্রথমেই সত্যম্বর তাঁর দলের নামে "নাট্যসমাজ" যুক্ত করার মধ্যে।

সত্যম্বর নিজে পালাকার ছিলেন না, পান্ডিত্যও ছিল না বেশি কিন্তু অভিনেতা হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল দিকে দিকে। তবে নিজে দল করে মূলত হিরো বলতে যা বোঝায় তা নিজে না থেকে আর একজন অভিনেতাকে বড় আসনে রেখেছিলেন ব্যবসায়িক চিন্তা থেকে। সেই বড় অভিনেতাটি হলেন নীলমণি। নীলকণ্ঠ মাইতিও একজন বড় অভিনেতা ছিলেন এই দলে, তিনি ছিলেন মেদিনীপুরের লোক।

সত্যম্বরবাবু দল তৈরি করেই কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জড়ভরত', 'সপ্তর্ষিসৃজন' 'অংশুমান' ইত্যাদি পালা আসরস্থ করে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সত্যম্বরের যাত্রা "অপেরা পার্টী"তে পরিণত হয়ে যায়।

এরপর থেকে যে সব পালাকাররা খ্যাতিমান ছিলেন তাঁদের অধিকাংশেরই পালা সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায় আসরে নামিয়েছিলেন। এই পালাকাররা হলেন, ভবতারণ চট্টোপাধ্যায়, অঘোরনাথ কাব্যতীর্থ, ভোলানাথ রায়, নিতাইপদ চট্টোপাধ্যায় আরও অনেকে। তাছাড়া রামদুর্লভ কাব্য বিশারদ, পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় এঁদেরও পালা হয়েছিল এই দলে।

লোকসান দিতে দিতে সেকালের অধিকাংশ যাত্রাদলের যে পরিণতি ঠিক সেই পরিণতি হয়েছিল এই দলেরও। শালকিয়ার সেই অনুকূল মুখার্জী যাঁর কাছে শশী অধিকারীর সব কিছু বাঁধা পড়েছিল, বড়বাজারের খেংড়াপট্টীর একচ্ছত্র পোশাক বিক্রেতা সেই অনুকূল মুখার্জীর কাছেই সত্যম্বরবাবুর দেনা হয়েছিল দশ বারো হাজার টাকা। অনুকূল মামলা করে সত্যম্বরবাবুর যাত্রাদলের সব পোশাক ক্রোক করেছিলেন। নবদ্বীপের গজেন মিত্র নামের এক ভদ্রলোকের সহায়তায় সেই মালপত্র আটক করে গুদামজাত করেছিলেন। এরপর দল বন্ধ হয়। দল বন্ধ হবার পরও সত্যম্বরবাবু নিজে দেখা করেছিলেন অনুকূলবাবুর সঙ্গে। অনুরোধ করেছিলেন, নবদ্বীপের বাড়িটা নিয়ে তাঁকে ঋণমুক্ত করতে। তাই করেছিলেন অনুকূল। সত্যম্বরবাবুর বাড়িটা নিয়ে মামলা তুলে নিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায় মারা যান।

* সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়ের আর এক ছেলে শিবরাম চট্টোপাধ্যায় তাঁর বাবার কর্মজীবন ও ভাগ্য বিড়ম্বনার যে তত্ত্ব ও তথ্য রেখে গেছেন তা থেকে এবং বর্ধমান মহারাজের দেবোত্তর এস্টেটের সুপারিন্‌টেন্ডেন্ট শ্রী অমরনাথ মুখোপাধ্যায় (এম. এ. বি. এল) বিবরণ যা দিয়ে গেছেন তার পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমি কোথাও বর্তমান সত্যম্বর অপেরার ভূতপূর্ব কর্ণধার গৌর দাসের সঙ্গে সত্যম্বর বাবুর কোন সম্পর্ক খুঁজে পাইনি। তবে ধরে নেওয়া যেতে পারে, গৌর দাস যখন যাত্রায় আসেন তখন নিতান্ত বালক ছিলেন। ১৩২১ সনে অর্থাৎ সত্যম্বরবাবুর দল তৈরির সময়ে গৌর দাসের বয়স ২১ বছর। ১৩৩৮ সনে সত্যম্বরবাবুর সব কিছু ক্রোক হয়। তখন গৌরবাবুর বয়স ৩৮ বছর। তিনি তখন এমন টাকার মালিক ছিলেন না, যার ক্ষমতায় স্বয়ং সত্যম্বরবাবুকে নামে অধিকারী রেখে নিজেই দলের মালিক হতে পারতেন। এ সব তথ্য ও তত্ত্ব ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা' বইতে দিয়েছেন গৌর দাসের মুখ থেকে শুনে। গৌরবাবু ডঃ ভট্টাচার্যকে আরও বলেছিলেন জানতে পারি—, সত্যম্বরবাবু গৌরবাবুর সেই প্রস্তাবে রাজি হননি বরং সত্যম্বরবাবুর অনুরোধে নাকি গৌরবাবু দলের একমাত্র স্বত্বাধিকারী হন। প্রশ্ন জাগে, সেদিন তা হলে সত্যম্বরবাবুর দুই ছেলে কোথায় ছিলেন?

প্রথম ছেলে শিবরাম চট্টোপাধ্যায় না হয় বাবার দলে যুক্ত ছিলেন না, কিন্তু দ্বিতীয় ছেলে হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় তো সরাসরি বাবার দলের অভিনেতা ও পরিচালক দুই ছিলেন! তাঁরা গৌর দাসের মালিকানার ঘটনাকে প্রকাশ করেননি কোন যুক্তিতে?—এ ক্ষেত্রে এটাই প্রমাণিত হয়, সত্যম্বরবাবু তাঁর বাড়িটি অনুকূলবাবুকে দিয়ে অনুকূলবাবুরই কাছ থেকে ঋণমুক্তির ছাড়পত্র নিয়েও দল চালাতে পারেননি। ছেলেরাও ঋণের বোঝা মাথায় আর চাপাতে চাননি! এই সময়ে গৌর দাস যেভাবে হোক আলাদা ভাবে দল তৈরি করতে চেয়েছিলেন, এবং সত্যম্বর চাটুজ্জের গুড উইলকে কাজে লাগাবার জন্য যে দল তৈরি করেছিলেন তার নাম রেখেছিলেন সত্যম্বর অপেরা।

এ প্রসঙ্গে বিজয় মিত্র তাঁর রেখে যাওয়া স্বহস্তে লিখিত, অপ্রকাশিত আত্মকথায় লিখেছেন— "...সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখনও জীবিত। তাঁরই দল তখন। তখন দলে

আছেন নগেন বোস। নিতাইপদ চট্টোপাধ্যায়ের "শৈশব সাধনা" (ধ্রুব), "সপ্তমাবতার" "অন্যপূর্ণা" (অন্নপূর্ণা) নাটক দলে। গৌরচন্দ্র দাস মহাশয় তখনও অভিনয় করেন। এ দল তখন ছিল ৬৬নং হাটখোলায়। এখন হাটখোলা যেতে বাঁদিকে একটি বাড়ি ভেঙ্গে ইঁটের স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। ওই বাড়িটাই ছিল খেলাত ঘোষের বাড়ি। সতীশ বল নামে একজন ভাল শিল্পী ছিলেন সত্যম্বর চাটুজ্জের দলে। ঐ দল চাটুজ্জে মশাই ছেড়ে দিয়ে আসানসোলে চলে যান। আসানসোল চেলিডাঙ্গায় তখন থাকতেন ওঁর ছেলে। তিনি বার্ণ কোম্পানিতে চাকরি করতেন। সত্যম্বর চাটুজ্জে শেষ জীবনটা ছেলের কাছেই কাটিয়ে দিয়েছেন। গৌরবাবুর শঙ্কর অপেরার দল ওই হাটখোলার বাড়িতেই থাকত। তারপর চাটুজ্জেমশাইকে ধরে সত্যম্বর অপেরা নামে চালাচ্ছিলেন। এখনও সেই নামে চলছে—! সত্যম্বর চাটুজ্জে মহাশয়ের পোষাক পত্র সব অনুকূল বাবুকে দিয়ে দল বন্ধ করে দিলেন।" সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতি বিজড়িত দলের পরবর্তী অধ্যায় সত্যম্বর এবং গৌরদাস। যাঁর কথা পরে আরও বিস্তারিত বলব। মনে রাখতে হবে, মতিলাল রায়ের পর একেবারে সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত নদিয়া জেলার লোকনাট্য চর্চার এক ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এই জেলায় মূলত সৌখিন যাত্রা চর্চাই প্রাধান্য লাভ করে। ষাটের দশকের পর থেকে কলকাতার পেশাদারী যাত্রাদলের কেন্দ্রিয় শক্তির কাছে গ্রামীণ সংগঠনগুলির ভাবনা পাল্টাতে থাকে। তারা অধিকাংশই কলকাতার দল আনিয়ে ব্যবসা কেন্দ্রিক মানসিকতার সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত করেন নাট্যাংশের টাকায় সমৃদ্ধ ও জন কল্যাণমূলক কর্মকান্ড। এর মধ্যে অবশ্য আঞ্চলিক কিছু নতুন যাত্রা দল পেশাদারী মন নিয়ে মরশুমে যাত্রা করে যাত্রা চর্চাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এর মধ্যে চাকদহ এক বিশেষ অঞ্চল।

॥ হরিদাস মন্ডল ॥

হরিদাস মন্ডল লোকপ্রিয় ছিলেন মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে লেখা পালার জন্য। তিনি ছিলেন হুগলী জেলার সিঙ্গুরের বাসিন্দা। তিনি দল নিয়ে ফরাসডাঙ্গায় এসেছিলেন। হরিদাস মন্ডলের 'নারীলীলা' (দণ্ডীপর্ব), 'জম্ভাসুর বধ' পালায় প্রভূত খ্যাতি এসেছিল।

॥ কৃত্তিবাস মন্ডল ॥

ইনিও দল নিয়ে ফরাসডাঙ্গায় এসে বসবাস করতে থাকেন। হুগলী জেলার গোপীনাথপুরের বাসিন্দা ফরাসডাঙ্গায় এসে মহাভারতের বিষয় নিয়ে লেখা পালা গাওনা করে নাম কিনেছিলেন।

খানাকুল কৃষ্ণনগরের পালাকার ছিলেন ঈশ্বর চক্রবর্তী, রামময় দাস, রাজনারায়ণ দাস, মহেশ ঠাকুর, কান্ত তেলি, রঘু তামেলী। এই হুগলীর গোপীনাথপুরের কৃত্তিবাস মন্ডলের 'গয়াসুরের হরিরপাদপদ্মলাভ' পালা জনপ্রিয় হয়েছিল।

॥ চন্দননগরের আরও দল এবং বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জনকল্যাণে যাত্রা ॥

চন্দননগরের কথা আগেই বলেছি, সেই সঙ্গে বলেছি এমন কিছু দল বা তাঁর কর্ণধারের কথা যাঁদের লোকনাট্য বা যাত্রা সাহিত্যের প্রতি সুগভীর প্রীতির জন্যই চন্দননগরের অঞ্চলিক লোকসংস্কৃতির ইতিহাস বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। আজকের আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতির চর্চা বা সাংস্কৃতিক জীবনের ধারা সম্পূর্ণ পাল্টে যাবার জন্য এখন মহকুমা অথবা শহর ও শহরতলির মানুষ হয়তো তাঁদের আঞ্চলিক লোকনাট্য চর্চা বা যাত্রা সাহিত্যের চর্চা প্রসঙ্গে ওয়াকিবহাল নন, কিন্তু অতীতের যা কিছু তার বেদীর ওপরে তৈরি হয় সমকালের প্রতিমা। অথচ অতীতকে না জানার, অতীতকে না খোঁজার, অতীতকে না সমীক্ষা করার প্রবণতা অতি বেশি মাত্রায় প্রকট ; এর ফলশ্রুতিতে হয়ত শিক্ষা-সংস্কৃতি আধুনিক চেতনার রঙে আঁকা সম্ভব হচ্ছে কোথাও-কোথাও, ঠিক পাশাপাশি ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে পুরাতন ঐতিহ্য। ইদানীং জেলা-মহকুমার প্রতিটি শহরে আঞ্চলিক পত্র পত্রিকা প্রকাশের প্রবণতা প্রবল, লিটল্ ম্যাগাজিনের প্রতাপও কম নয়, অথচ

এই সব পত্র পত্রিকাও তার অঞ্চলের যাত্রা বা লোকনাট্য চর্চার ওপরে, স্থানীয় লোকনাট্য বা যাত্রা কর্মীদের ওপরে কোন গবেষণা মূলক কাজ করে না। এটা পরিতাপের বিষয়।

আমি সেই পুরাতন ঐতিহ্যের কথা মনে রেখেই এখানে, এমন কিছু যাত্রা দলের কথা হাজির করছি, যে দলগুলির সঙ্গে জড়িত প্রতিটি মানুষই, আঞ্চলিক জনমানসের চিত্ত বিনোদনের মাধ্যমে আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতির ধারাকে বহন করে নিয়ে এসেছিলেন বহু যুগের ওপার থেকে। তাঁরা হলেন ঃ যাদু গুঁই, রাধামাধব মুখোপাধ্যায়, রাম বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী রায়, দেয়ারী যোগী, দুর্গাচরণ নিয়োগী , নবীন ঘোষ, সীতানাথ জেলে, গয়ারাম কোঙার, লালু আচার্য, সন্ধ্যা বাউরি, দয়ালচন্দ্র। এঁদের যাত্রাদলগুলি ছিল সম্পূর্ণ অপেশাদারী এবং স্ব স্ব অঞ্চলে এঁরা শো করতেন। এঁদের মধ্যে উমেশ আচার্য যে দলটি তৈরি করেছিলেন, পরে সেই দলের পরিচালক হন দুর্গাচরণ নিয়োগী। পরে দলের নাম পাল্টে গিয়ে হয় দুর্গাচরণ নিয়োগীর দল। এই দুর্গাচরণের দলে 'শুম্ভ নিশুম্ভ', 'রাম বনবাস' জনপ্রিয় হয়েছিল।

মহেশ চক্রবর্তীর দলটি মদন মাষ্টারের দল ভেঙ্গে গড়ে উঠেছিল বলে শোনা যায়। পাঁচালিকার রসিকলাল এই দলে অনেক গান বেঁধেছিলেন। এই মহেশ চক্রবর্তী কিন্তু প্রথম জীবনে ছিলেন মদন মাষ্টারের দলের ঢোল বাদক।

॥ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দল ॥

মীরপাড়ার ধনাঢ্য যোগেন্দ্রনাথ রসিকলাল চক্রবর্তীর দল থেকে প্রায় সব লোকজনকে ভাঙিয়ে নিয়ে নিজেই যাত্রা দল তৈরি করেছিলেন। কিন্তু সেই দলের বিস্তারিত খবর জানা যায় না।

॥ নন্দনবাটীর পুনর্মিলন নাট্যসমাজ ও কাশীপুরের নিত্যানন্দ অপেরা ॥

এখানকার শতকরা ৯৫ ভাগ মানুষ কৃষিজীবি। পুঁথিগত শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আর পাঁচটা গ্রামের মতই এ নন্দনবাটীতে। তবুও এখানে মানুষের মনের খোরাকের জন্য কিছু কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। নাটকের চাইতে যাত্রার চাহিদা বেশি। ১৩৮০ সনে এখানে গড়ে ওঠে পুনর্মিলন নাট্যসমাজ। প্রথম বছরেই এই দল নির্মল মুখোপাধ্যায়ের 'গরীব কেন মরে' আসরস্থ করে। নির্দেশক ছিলেন এই অঞ্চলেরই খলনায়ক হিসেবে সুপরিচিত রাজেন্দ্রনাথ পাঁজা। ইনি হুগলী জেলার কাশীপুরের 'নিত্যানন্দ অপেরার' এক নম্বর অভিনেতা ছিলেন। বর্তমানে সেই নিত্যানন্দ অপেরা পোশাক কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে। গ্রামীণ যাত্রা-থিয়েটার এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সাজপোশাক ভাড়া দেয়। শুধু সাজ-পোশাকই নয়, অন্যান্য জেলার বিভিন্ন পোশাক কোম্পানির মতই এই প্রতিষ্ঠান মহিলা শিল্পী, সুরপার্টি ইত্যাদি ভাড়া দিয়ে থাকে। নন্দনবাটীর নাট্য-সমাজ দু'একটি জায়গা থেকে যাত্রা করে পুরস্কার লাভ করেছে। এই নাট্য সমাজেরই দু'একজন অভিনেতা পরবর্তী সময়ে পেশাদার দলে সুযোগ পেয়েছেন।

হুগলীজেলার কাশীপুর গ্রামে লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। এখানকার নিত্যানন্দ অপেরার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নিত্যানন্দ গুছাইত। নিত্যনন্দর মৃত্যুর পর এই অপেরার দায়িত্ব নেন একমাত্র ছেলে কৃষ্ণচন্দ্র গুছাইত। বর্তমানে কৃষ্ণবাবু অপেরা তুলে দিয়ে সাজপোশাকের দোকান করেছেন। অতি প্রাচীন এই অপেরা থেকে, প্রয়াত নিত্যানন্দবাবুর কাছ থেকে অভিনয় ও অন্য অনেক বিষয়ে শিক্ষা নিয়ে অনেক শিল্পীই পরে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। এখন এই প্রতিষ্ঠান তারকেশ্বর রেল স্টেশনের কাছে। গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির কল্যাণে সরকারি সাহায্য একেবারেই পাওয়া যায় না, বিশেষ করে সাজপোশাকের এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাঁচাবার কোন সরকারি উদ্যোগ নেই বলে কৃষ্ণচন্দ্র গুছাইত ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সাজ-পোশাক এবং যাত্রা-থিয়েটারের জন্যে যা কিছু প্রয়োজন হয় তার নতুন কোন কিছুই তৈরি করতে পারছেন না। কলকাতার বড় বড় পেশাদারি

দলের দাপটেও গ্রামীণ দলগুলি প্রায় অচল বলেই পোশাক-সুরপার্টি ভাড়া দেবার ব্যাপারও কমেছে। বহু প্রতিভাময়ী গ্রামীণ মহিলা শিল্পীরাও বেকারত্বের যন্ত্রণা ভোগ করছেন।

॥ কামারকুণ্ডুর গোপাল বাগ ॥

শ্রীরামপুর-তারকেশ্বর রুটের ১২নং বাসে কামারকুণ্ডুতে নেমে কয়েক পা গেলে রামকৃষ্ণ অপেরা। কর্ণধার গোপাল বাগ। গ্রামীণ যাত্রাদল রামকৃষ্ণ অপেরার প্রযোজক হিসেবে ইনি যতটা শক্তিমান, পোশাক কোম্পানির মালিক হিসেবে ততখানি জনপ্রিয়। এই অঞ্চলের অধিকাংশ যাত্রাদলে রামের তীর ধনুক থেকে হিটলারের রিভলভার, সুরকার, যন্ত্রশিল্পী থেকে শক্তিময়ী মহিলাশিল্পী, আধুনিক মেকআপ মেটিরিয়ালস সবই ভাড়া দেন গোপালবাবু। ছেলেবেলা থেকে তিনি এই কাজে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন। আজকের বহু দামি ও নামি মহিলা শিল্পী এই গোপালবাবুর সৃষ্টি। গোপালবাবু বলেছেন ঃ বাংলার লোকসংস্কৃতির গৌরবকে আমরা রক্ত দিয়ে বহন করে চলেছি, অথচ আমাদের প্রতি কলকাতার সংবাদপত্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিদারুণ অবজ্ঞা। আমরা অন্ধকারে পড়ে আছি। শুনেছি বহু ক্লাবকে সরকার টাকা দেয়, সিনেমা তোলার জন্য কোটি কোটি টাকা দেয়, আর গ্রামীণ লোকসংস্কৃতিব যাঁরা ধারক ও বাহক তাঁদের কথা ভাবে না। এই ভাবে কত প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটছে! বহু গ্রামীণ পোশাক কোম্পানি একটা নতুন পোশাক কিনতে পারছে না সামান্য টাকার জন্য। একদিন এ সব বন্ধ হয়ে যাবে!

॥ সিঙ্গুর স্বামীজী সংঘ ॥

এই শৌখিন যাত্রা দলটি কলকাতার প্রথম শ্রেণীর যাত্রাদলের সঙ্গে তুলনীয়। এঁদের ঐতিহাসিক প্রযোজনা 'হিটলার'।

॥ হরিপালের ডাঃ অনন্তপ্রসাদ মুখার্জী ॥

হুগলী জেলার হরিপাল থানার অন্তর্গত বাহিরখন্ডের সুবিখ্যাত ডাক্তার অনন্তপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন যাত্রা প্রেমিক এবং সমালোচক। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে বহু শৌখিন যাত্রাদলের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল বলে জানা যায়।

॥ ধনেখালির স্মরণীয় রাসমেলা এবং যাত্রা ॥

হুগলী জেলার ধনেখালির রাসমেলা চিরস্মরণীয়-ঐতিহাসিক লোকউৎসব। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে গ্রাম-গ্রামান্তরের জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের মধ্যে বয়ে যায় আনন্দের ঝরনাধারা। কেউ মেলায় আসে, কেউ আসে শ্রীরাধাকৃষ্ণের রাসমাহাত্ম্য হৃদয় দিয়ে উপভোগ করতে। কলকাতা এবং জেলার একাধিক যাত্রা অনুষ্ঠান এই রাসমেলার ঐতিহ্য।

॥ আরামবাগের জগদ্ধাত্রী অপেরা ॥

গ্রামীণ যাত্রাদল, তবে শৌখিন নয়। কলকাতার অনেক মধ্য শ্রেণীর পেশাদার দলের তুলনায় অনেক বেশি জনপ্রিয়। যাত্রা মরশুমে এঁদের ব্যবসায়িক সাফল্য আশাতীত হয়। এরই মধ্যে প্রতি সন্ধ্যায় বসে যাত্রার আসর। দূর-দূরান্তরের শৌখিন যাত্রাদল, শিল্পী, কর্মীদের উৎসাহ দানে, যাত্রার সংগে পেশাদার হিসেবে সংশ্লিষ্ট কিছু সুরপার্টী, মহিলা শিল্পী এবং পোশাক পরিচ্ছদ, মেকআপ শিল্পের প্রতিষ্ঠান, প্যান্ডেল ও আলো সরবরাহকারী সংস্থার সামান্যতম হলেও আর্থিক সুরাহা করে দেবার অভিপ্রায়ে এই যাত্রা প্রতিযোগিতার নামে যাত্রা উৎসবকে অবশ্যই ইতিহাসের পাতায় ধরে রাখা অনিবার্য। আর এই উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তোলার জন্য বিশেষভাবে চিহ্নিত ঘনরাজপুরের সিদ্ধেশ্বরী নাট্য সমাজ। এই সংস্থা আয়োজিত 'যাত্রা প্রতিযোগিতার' ঐতিহ্য ধরে রাখার দায়িত্ব হয়তো পরবর্তী সময়ে পালন করবে অন্য অনেক আদর্শ গ্রামীণ যাত্রা দল। ইতিমধ্যে এই প্রতিযোগিতা থেকে পুরস্কার জয় করেছে এমন কিছু শৌখিন যাত্রা দল, শিল্পী, নির্দেশক-তাঁরা হলেন ঃ কুলতেশ্বরী খেয়ালী সংঘ। সুতি পলাসী মথাডাঙ্গা, চীনামোড় চাঁপসরা, মদনমোহন বান্ধব

নাট্য সমাজ, রামকৃষ্ণ অপেরা। আঞ্চলিক শক্তিধর শিল্পী-নির্দেশক ঃ ভোলা নন্দী, পাঁচুগোপাল ঘোষ, গোপালচন্দ্র বাগ, রেবা দত্ত।

॥ গোপাল নগর চৈতালী সংঘ ॥

১৯৮৫ সালে এই সংঘ তৈরি হয়। প্রতিবছর শৌখিন যাত্রা পালা উপহার দিয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষের মনের খোরাক জোগান। এঁরা প্রতিবছর একদিনে সারারাত ধরে শৌখিন যাত্রা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। আশেপাশের অনেক গ্রামের সখের যাত্রাদল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে থাকে। এই সংঘ যাত্রা ছাড়া সামাজিক কল্যাণকর কিছু কাজও করে থাকে।

হুগলী জেলায় বহু শৌখিন যাত্রাদল যেমন আছে, তেমনি আছে বহু সাজপোশাক কোম্পানি। গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই সব প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন যেমন অনস্বীকার্য, তেমনি বহু কারণে গ্রামের অনেক সাস্কৃতিক অনুষ্ঠান কমে যাবার দরুন, এই সব প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলির খুবই বিপন্ন পরিস্থিতি। গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির সার্বিক কল্যাণে সরকারি সাহায্য দান না থাকায় এই ঐতিহ্য বিনষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। হুগলী জেলার আরও কিছু ঐতিহ্যমন্ডিত পোশাক কোম্পানির তালিকা এই রকম ঃ

কামারপুকুর	রামকৃষ্ণ পরিচ্ছদাগার, রূপশ্রী পোশাকালয় / মাইতি পোশাকালয় / রূপায়ণ
তারকেশ্বর	কাশীপুর নিত্যানন্দ অপেরা (পোশাকালয়)। নরেন বাবুর ডেকরেটিং (ইনি যাত্রাদলের প্যান্ডেলে বিখ্যাত)
আরামবাগ	জয়গুরু / মহাশক্তি পোশাকালয় / শ্রীমা পোশাকালয় / সিংহবাহিনী পোশাকালয়
জামালপুর	কালীমাতা পোশাকালয় / অনিন্দিতা / রূপশ্রী নাট্য নিকেতন
শ্রীরামপুর	বিশ্বাস ডেকরেটর্স
মাহেশ	নীলমণি পোশাকালয়

হুগলী জেলার

ক্লাব-সমিতির সামাজিক দায়বদ্ধতা

॥ ইয়ং স্টার ক্লাব ॥

হুগলীর সোমরাবাজারের জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। প্রায় দেড় শতাধিক সদস্যের এই ক্লাবের যাবতীয় কর্মধারা গ্রাম ও জনকল্যাণমূলক ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। সব রকম উন্নয়নমূলক কাজের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা এঁরা সংগ্রহ করেন প্রতি বছর যাত্রানুষ্ঠানের মাধ্যমে। কলকাতার বড়-মাঝারি যাত্রাদলের যাত্রা শো থেকে উপার্জিত অর্থে ইতিমধ্যে এই ক্লাব নিজস্ব পাকা বাড়ি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। একাধিক কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে আর্থিক সাহায্য দিতে পেরেছে, যা অব্যাহত আছে। এ ছাড়া ক্লাবের যাবতীয় খরচের টাকা তোলা হয় যাত্রা থেকে।

॥ কোন্নগর মিলন সংঘ ॥

কোন্নগর ষ্টেশনে নেমে, ষ্টেশনের পূর্বদিকে ব্যস্ত রাস্তাটি ধরে মিনিট সাত-আট হাঁটলেই যে সংস্থাটি আপনি অনায়াসে পেয়ে যাবেন তার নাম "কোন্নগর মিলন সংঘ"। বহুবিধ কাজের মধ্য দিয়ে এই সংস্থাটি আজ কোন্নগরের এক বিরাট সংখ্যক মানুষের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে।

সামান্য তের টাকার ভাড়া ঘরে যে সংস্থার সূত্রপাত হয়েছিল, সে আজ প্রায় দু লক্ষ টাকার সম্পত্তির অধিকারী। ক্লাবের বিরাট জনমুখী প্রকল্পগুলির মূল ভরসা যাত্রা। সংস্থার জন্য জমি কেনা, বাড়ি করা, লাইব্রেরি গড়ে তোলা, পাঠ্য পুস্তক বিতরণ, পুজোর সময় গরীব মানুষদের জামাকাপড় দেওয়া, কম্বল বিতরণ, ইনডোর খেলাধুলার ব্যবস্থা, বিশেষ ভাবে টেবিল টেনিস প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে সংস্থাটি এলাকার বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে আদরণীয়। আর এই বিশাল কর্মকাণ্ডকে সচল রাখতে প্রতি বছর যাত্রার অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এই সংস্থা। ১৯৬৮ সালে হিটলার পালা

দিয়ে যাত্রা শুরু। তারপর প্রায় প্রতি বছরই যাত্রা করানো অব্যাহত। বহু মানুষের অকৃপণ দানে, যাত্রার আর্থিক সাফল্যেই সংস্থার উদ্যোগ পূর্ণতা পেয়েছে। ক্লাবে আছেন বেশ কিছু যাত্রাপ্রেমী মানুষ, পালা বাছাইয়ের ব্যাপারে যাঁরা মূল্যবান মতামত দেন। যাত্রানুষ্ঠান করার জন্য যে শ্রম, জটিলতা, ও ঝুঁকি নিতে হয়, যাত্রার কার্যকারিতার দিকে তাকিয়ে সংঘের কর্মীরা তা হাসিমুখে মেনে নেন। প্রতি বছর নিয়মিত যাত্রা করানোর মধ্য দিয়ে একদল নির্দিষ্ট যাত্রার দর্শকও তৈরি হয়েছে।

তাই যাত্রাই মিলন সংঘর জয়যাত্রার চাবিকাঠি।

॥ মাষ্টারদা স্পোর্টিং ক্লাব ॥

হুগলী জেলার তারকেশ্বর থানার অন্তর্ভুক্ত আখনাপুর গ্রাম। বালিগড়ি বাস স্ট্যান্ড থেকে দুই কিলো মিঃ কাঁচা পথ। গ্রামের একদিকে ফুটবল খেলার ছোট মাঠ। এখানকার অভিজাত মাষ্টারদা স্পোর্টিং ক্লাবের নিজস্ব মাঠ এটি। এই মাঠেই গ্রামীণ এবং ক্লাবের যাবতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এই ক্লাব বিগত কয়েক বছর কলকাতার মাঝারি পেশাদারি যাত্রাদল আনিয়ে যাত্রা করিয়ে, সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে লভ্যাংশের টাকার সঙ্গে লটারির টাকা যুক্ত করে, সেই টাকায় গড়ে তুলেছেন পাকা ক্লাব বিল্ডিং। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে আর্থিক সাহায্য দান, গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ার খরচ বহন ইত্যাদি যাত্রা করানো টাকায় এঁরা সুসম্পাদন করেন। গ্রামীণ সামাজিক কল্যাণে এই ক্লাবের ভূমিকা স্মরণীয়।

॥ মনোহরপুর শিবশক্তি ক্লাব ॥

হুগলী জেলার মনোহরপুরের এই ক্লাবের কিছু তথ্য পাঠিয়েছেন অশোক পাঁজা। প্রাথমিক স্তরে যাত্রা করিয়ে অর্থসংগ্রহ করে এই ক্লাব ইতিমধ্যে প্রাথমিক স্কুল তৈরি, পাঠাগারের উন্নয়ন, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদের কিছু কিছু আর্থিক সাহায্যদান ইত্যাদি সমাজ ও জনকল্যাণ মূলক কাজ করেছে। খরা-বন্যায় বিপন্নদের সাধ্যমত চাল, ডাল, চিঁড়ে-গুড় দেওয়া, দুস্থ ছেলেমেয়েদের জামা-কাপড়, বই দেওয়া, বিভিন্ন আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করা এই ক্লাবের আদর্শ। যাত্রা নায়ক রাজকুমার এই দলকে কিছু টাকা চাঁদা বাবদ দিয়েছেন। যাত্রা করিয়ে তার লভ্যাংশের টাকায় জেলাস্তরে যে সমাজ ও জনকল্যাণমুখি কর্মকান্ড নিত্য চলে হুগলী জেলার এই ক্লাব তার অংশীদার।

॥ অমর সেবা সংঘ (রাইন) ॥

এই ক্লাব বা সংগঠন কলকাতার যাত্রাদল বায়না করে এনে যাত্রা করিয়ে তার লভ্যাংশের টাকায় তৈরি করেছে দাতব্য চিকিৎসালয়, পাঠাগার, প্রাথমিক বিদ্যালয়।

॥ দেউলিয়া হারারাম উচ্চ বিদ্যালয় ॥

এই বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যাত্রা করিয়ে তার লাভের অংশে নিজেদের বিদ্যালয়ের নানা উন্নতি সাধন করেছেন।

॥ কৃষ্ণগঞ্জ এগ্রিল ডিলার্স এ্যাসোসিয়েশন ॥

সভাপতি বিনয়রতন সরকার ও সম্পাদক মনোজকুমার বিশ্বাসের দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায়, এই সংস্থা কলকাতা থেকে পেশাদার দল এনে যাত্রা করান অর্থ সংগ্রহ করার জন্য। এই অর্থে দুস্থ ডিলারদের সাহায্যদান প্রধান উদ্দেশ্য।

॥ নদিয়ার গয়েশপুর, যুবগোষ্ঠী ॥

এই সংগঠন যাত্রা করিয়ে তার লাভের অংশে দুস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের নানাভাবে সাহায্য করে। প্রথম বছরে যাত্রা করিয়ে তার টাকায় ১০৯ জন দুস্থ ছাত্র-ছাত্রীকে ক্লাবের পক্ষ থেকে পড়ার বই দেওয়া হয়েছিল। এই সংগঠনের সভাপতি তরুণকৃষ্ণ চক্রবর্তী, সম্পাদকমন্ডলী ঃ মাধব ঘোষ, সুভাষ ঘোষ, জলধর মজুমদার, সাধন মজুমদার, পরিতোষ চক্রবর্তী, ধীমানেন্দ্রনারায়ণ রায়। এঁরা সকলেই যাত্রাকে ভালবাসেন বলে আজও অক্ষয় ঐতিহ্য।

॥ নদিয়া যুবগোষ্ঠী ॥

সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ জোয়ারদার, সম্পাদক, নকুলচন্দ্র দাস এবং মদনপুরের এই যুবগোষ্ঠীর পক্ষে দুলাল মন্ডল জানিয়েছেন, এঁরা কলকাতার পেশাদার যাত্রাদল আনিয়ে যাত্রা করান দুস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যবই বিতরণ শুধু না, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদের আর্থিক সাহায্য দান করার উদ্দেশ্যে।

॥ চাকদহে যাত্রাপল্লী ॥

চাকদহ রেল ষ্টেশনে পা রাখলেই যেমন বিস্ময় তেমনি নানা কৌতূহল দেখা দেবে। চতুর্দিকে যাত্রাদল এবং যাত্রাপালার পোস্টার ও হরেক রঙের বহু ছোট ছোট ব্যানার নজরে পড়বে। কারণ, চাকদহ রেল ষ্টেশনটি মোটামুটি একটি যাত্রাপল্লী হয়ে উঠেছে। যাত্রাদলগুলির নাম দেখলে মনে হবে, কলকাতা চিৎপুরের যাত্রাপাড়ার একটি মিনি সংস্করণ। প্ল্যাটফর্মের গা লাগোয়া লোহার রেলিং-এর বাইরে ছোট ছোট গদি। গদিতে প্রবেশ করার দ্বার এই লোহার রেলিং থেকে খুলে নেওয়া কিছু কিছু লোহার পাত। এই দলগুলি রীতিমত পেশাদার দল। কলকাতার মত এই দলের মধ্যেও শ্রেণীভাগ আছে। বড়, ছোট, মাঝারি। দলের নামকরণ বৈচিত্র্যপূর্ণ। 'দি' 'নিউ' 'নব' ইত্যাদি বিশেষণ যুক্ত কলকাতার খ্যাতিমান কিছু দলের নাম। দু'একটি নামের ক্ষেত্রে অবশ্যই ব্যতিক্রম আছে। তা ছাড়া এ কথা স্বীকার করতেই হয়, এই সব আঞ্চলিক পেশাদার ছোট ছোট যাত্রা দলগুলির একটি বিশেষ ভূমিকাও আছে। যেমন পালাকার, সুরকার, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ দেওয়া, তেমনি কলাকুশলী-কর্মীদের অন্ন সংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া। চাকদহের এই যাত্রাপল্লীর অনেক শিল্পীই পরবর্তী সময়ে যেমন কলকাতার বৃহত্তম দলে কাজ করার সুযোগ করে নিয়েছেন, তেমনি অনেক মালিক ব্যবসায়ে আরও উন্নতি করার আশায় দলের গদি-ঘর তুলে এনে চিৎপুর পল্লীতে প্রতিষ্ঠাও দিয়েছেন। চাকদহ তথা নদিয়া জেলার সেই সব ছোট যাত্রাদলের তালিকা এখানে তুলে ধরছি, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে নদিয়া জেলার যাত্রাচর্চাকে স্পষ্ট করে তোলার জন্য।

চাকদহ ঃ নিউ ইন্দ্রলোক যাত্রা ইউনিট । মালিক ঃ দুলালচন্দ্র ঘোষ ☐ নিউ চন্দ্রলোক যাত্রা ইউনিট। মালিক ঃ নারায়ণচন্দ্র ঘোষ ☐ নিউ অন্নপূর্ণা যাত্রা ইউনিট ঃ নারায়ণ মজুমদার ও তাপস মজুমদার এই দলের কর্ণধার ☐ বিশ্বভারতী যাত্রা ইউনিট। মালিক ঃ নিরঞ্জন সাহা ☐ পম্পিকা যাত্রা ইউনিট। মালিক ঃ দেবীপ্রসাদ চ্যাটার্জী ও মায়া চ্যাটার্জী। নিউ সাগ্নিক যাত্রা ইউনিট। সমর দাসের দল ☐ অগ্নিবীণা নাট্য সংস্থা। কর্ণধার ঃ অরুণকুমার মন্ডল। আগমনী যাত্রা ইউনিট। বিজয়কুমার ঘোষের দল। ☐ নব যাত্রালোক অপেরা। মালিক ঃ উত্তম ঘোষ। ☐ দেবদূত যাত্রা ইউনিট ঃ প্রযোজক ঃ শীতল নন্দী ☐ চাকদহ নাট্য সমাজ। চাকদহের অতি পুরাতন বনেদি দল।

এ ছাড়া ছোট অথচ জনপ্রিয় দল নিউ অগ্রগামী ☐ গণেশ জননী ☐ নিউ দুর্গা অপেরা ☐ মিত্র সংঘ যাত্রা ইউনিট ☐ যাযাবরী যাত্রা ইউনিট।

হালিশহর ঃ সাগ্নিক যাত্রা ইউনিট। **কল্যাণী ঃ** অন্তরাল যাত্রা ইউনিট। মালিক ঃ রীতা বসু ও মুনমুন ঘোষ।

শিমুরালী ঃ ভারতী নাট্যসমাজ ।। **ফুলিয়া ঃ** স্বপ্না অপেরা।

শঙ্করী অপেরা। কৃষ্ণনগরের এই দল পরে কলকাতায় ওঁ শঙ্করী অপেরা নামে প্রতিষ্ঠিত হয়।

হাসখালি অঞ্চলের শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ অপেরা পার্টি (বগুলা), উদয়ন সংঘ অপেরা পার্টি (ভৈরবচন্দ্রপুর), লক্ষ্মীনারায়ণ অপেরা (বাপুজীনগর), কালীগঞ্জ অঞ্চলের কিশোর সংঘ অপেরা পার্টি (কালীগঞ্জ), নাকাশীপাড়া অঞ্চলের তারকদাস অপেরা (চেচুড়িয়া), কৃষ্ণনগর অঞ্চলের সত্যনারায়ণ যাত্রা পার্টি (রূপদহ), বাহাদুরপুর এস্. ইউ. ক্লাব অপেরা, বিষ্ণুপুর কোহিনুর অপেরা

(বাহাদুরপুর), শান্তিপুর অঞ্চলের ফুলিয়া দেবালয় অপেরা (ফুলিয়া কলোনি), লক্ষ্মীনারায়ণ অপেরা (বাবলা গোবিন্দপুর), তেহাটা অঞ্চলের পল্লীবান্ধব অপেরা (কানাই নগর), নিউ বীণাপাণি অপেরা (পলাশীপাড়া), মাতৃমঙ্গল অপেরা (গোপীনাথপুর), ভবানীপুর প্রগতি সংঘ অপেরা (বক্সীপাড়া), রাণাঘাট অঞ্চলের ষষ্ঠী অপেরা (বীর নগর), নবারুণ সংঘ যাত্রা পার্টী (হুমানি পোতা), জয়কালী অপেরা (ভালুয়াবাড়ি), করিমপুর অঞ্চলের জামশেরপুর অপেরা (বাগচী জামশেরপুর)।

॥ ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ ॥

যেহেতু যাত্রাজগৎ ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদের মত এক বিশাল প্রতিভার অধিকারীকে লাভ করেছে ইতিমধ্যে সেই হেতু এখানে সেই ব্যক্তিত্বের কথা বিস্তারিত বলে নেওয়া দরকার।

হুগলী জেলার চন্ডীতলা থানার গরলগাছা গ্রামে ১৩০০ সনে রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়ের ছেলে ফণিভূষণের জন্ম মামাবাড়িতে।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ কবে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের কাছে বেশ কিছুদিন ছবি আঁকা শিখেছিলেন। গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল থেকে ড্রাফট্সম্যানশিপ পাশ করেন। এরই মধ্যে অর্থাৎ ফণিবাবু যখন প্রথম যৌবনের দূত, তখন কয়েকটি সখের থিয়েটারে দৃশ্যপট এঁকে দেন, এই সূত্রে থিয়েটার প্রসঙ্গে তাঁর প্রীতি গাঢ় হয়। নাট্য রচনায় মন দেন। ১৩১৭ সনে মাত্র ১৭ বছর বয়সে ফণিভূষণ লেখেন যাত্রাপালা 'ক্ষত্রিয় গৌরব'। পালাটি 'হৃষিকেশ সঙ্গীত সম্প্রদায়' আসরস্থ করে খ্যাতি পায়।

বাবা রঘুনাথ মুখোপাধ্যায় নিজে দক্ষ অভিনেতা ছিলেন। বাবার কাছেই মূলত অভিনয় শিক্ষা। হাওড়া-শিবপুরে বটকৃষ্ণ পালের বাড়িতে ছিল সখের যাত্রা ক্লাব। বাবার ইচ্ছায় এবং সাহায্যে যুবক ফণিবাবু সেই সখের যাত্রায় প্রথম অভিনেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এরপর থেকে পালা রচনা এবং অভিনয় দুই-ই পাশাপাশি চলতে থাকে তাঁর।

ফণিভূষণের জ্যেঠামশাই সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তখন 'রামকৃষ্ণ নাট্য সমাজ' নামে যাত্রাদল তৈরি করে যাত্রা ব্যবসা বেশ জমিয়ে নিয়েছিলেন। যুবক ফণির অভিনয় ও পালা রচনার খ্যাতি শুনে জ্যেঠামশাই তাঁকে নিজের দলে ডেকে নেন। মূলত পেশাদার যাত্রায় ফণিভূষণের সেই প্রথম আত্মপ্রকাশ। এখানে পালাও লিখেছেন তিনি। 'পাষাণী'—অহল্যার কাহিনী এই পালার বিষয়।

এরপর থেকে একের পর এক পালা রচনা এবং পাশাপাশি অভিনয় তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দেয়। এক সময়ে ফণিবাবু গণনাট্য সঙ্ঘেও যোগ দেন। ইতিহাস, পুরাণ ও সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যে তাঁর পান্ডিত্য সুবিদিত। ১৯৬৮ সালে ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রথম 'সঙ্গীত নাটক অকাদেমী' পুরস্কারে সম্মানিত হন এবং এই সালের ১৪ ডিসেম্বর 'বাঁশের কেল্লা' পালায় অভিনয় করতে করতে অসুস্থ হন এবং অল্প সময়ের মধ্যে মারা যান। চরিত্রের নামকরণ ঃ ফণিভূষণ তাঁর পালাগানে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য আরোপ করে যেমন যুগধর্মী হয়েছিলেন, তেমনি নামকরণ-এ প্রতীকধর্মী চেতনা আরোপ করেছিলেন। পরবর্তী কালের, বিশেষ করে বর্তমান পালাকাররা তাঁদের পালাগানের চরিত্রের নামকরণে ব্যাপকভাবে ঐ স্টাইল আরোপ করে থাকেন। 'বাসুদেব' পালায় ফণিবাবুর মূল বক্তব্য ছিল, মানুষ মাত্রেই স্বকীয় কর্মফল ভোগ করে। এই মূল কথাটি ফণিবাবু 'কর্মফল' নামে এক গায়ক চরিত্রের মুখ দিয়ে বার বার ব্যক্ত করেছিলেন। পালায় গানের আধিক্য বর্জন করেন ফণিবাবু। তাঁর পালায় বিশেষ করে ১৯২৬ সালে রচিত 'বাসুদেব'-এ মাত্র কুড়িটি গান রেখেছিলেন তিনি। রামানুজ ঃ ১৯২৮ সালে লেখা এই রামায়ণের উত্তরাকান্ডের কাহিনী বিধৃত পৌরাণিক পালা ভান্ডারী অপেরায় অভিনীত হয়েছিল। পালাকার এই পালাকে সংগীত প্রধান বলেছেন কিন্তু ৪০টির বেশি গান আরোপ করেননি। যাত্রাগানে চিরকালই একটা প্রস্তাবনা বা বন্দনা থাকে পালার বিষয়বস্তুর ওপরে প্রথমেই আলোকপাত করার জন্য, ফণিবাবু এখানে সেই প্রথা ভাঙলেন। অ ছাড়া 'ছায়া সীতা' অর্থাৎ সীতার ছায়া হিসেবে একটি চরিত্র তৈরি করেছিলেন, যে

ছায়াসীতা মাঝে মাঝেই রামচন্দ্রের অলক্ষ্যে থাকেন অথচ যেন কত কাছে থেকে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেন।

ফণিভূষণের এই স্টাইলটিও পরবর্তী বহু পালায় বিশেষ করে আজকের অধিকাংশ পালাকার পালায় আরোপ করছেন। **মায়াচক্র ঃ** কাশীরাম দাসের মহাভারতের বনপর্ব থেকে পালাকার কাহিনী আহরণ করেছেন। এই পালাতেও গানের সংখ্যা ছিল ২০। কিন্তু চিত্তবিনোদনের জন্য ফণিবাবু এখানে 'যাত্রাব্যালে' যুক্ত করেছিলেন। ধর্মের জয় এবং অধর্মের পরাজয় এই ছিল পালার মূল সুর।

চন্ডীদাস ঃ চন্ডীদাস ও রজকিনী রামীর প্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে ভক্তিমূলক পালা। পালাটি আর্য অপেরায় অভিনীত। এতে ৩৫ খানা গান ফণিবাবু দিয়েছিলেন যেহেতু পালাটিকে তিনি সঙ্গীতবহুল করতে চেয়েছিলেন। এই পালায় যাত্রা ডুয়েট ছিল। উপরের দুটি পালাই ১৯৩৩ সালে লিখেছিলেন তিনি।

মেদিনী ঃ মহাভারতের শান্তিপর্ব থেকে এর কাহিনী আহরণ করেন। পালাটি নট্ট কোম্পানি আসরস্থ করেছিল। বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে জন্ম নেওয়া মধু আর কৈটভ দৈত্যযুগলের মেদ নিয়ে 'মেদিনী' সৃষ্টি করেন ভগবান, -এই হলো পালার বিষয়গত মূল সুর। পৌরাণিক পালায় প্রধান দু'একটি চরিত্রকে ঠিক রেখে একাধিক কাল্পনিক বা রূপক চরিত্র সৃষ্টির দুঃসাহসিকতা দেখিয়েছেন ফণিবাবু। পালার বিবেক এখানে চরিত্র হয়ে উঠেছে, যার নাম পদ্মনাভ। প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার পালাকার ভোলানাথ রায়ও তাঁর পালায় বিশেষ করে 'নরকাসুর'-এ রূপক চরিত্র এঁকেছিলেন। এঁরা দু'জনেই কিন্তু থিয়েটারের জনপ্রিয়তম নাটক, মহাতাপচন্দ্র ঘোষের 'আত্মদর্শন' রূপক নাটক থেকে প্রভাবিত হয়েছেন। **সাধু তুকারাম ঃ** সাধু তুকারামের জীবনী অবলম্বনে ভক্তিমূলক পালা। নাটকে গানের সংখ্যা প্রায় ৩০। আর্য অপেরায় পালাটি হয়েছিল। **চন্দ্রহাস ঃ** ১৯৪০ সালে রচিত এই পালার বিষয় ফণিবাবু আহরণ করেছিলেন কাশীরাম দাসের মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব থেকে। এই পালাটিও আর্য অপেরা আসরস্থ করেছিল। এই পালায় চব্বিশটি গান ছিল, ব্যালেও ছিল। এ ছাড়া ভাগ্যদেবী (১৯২৪) তর্পণ (১৯২৫), সৈরিন্ধ্রী (১৯২৮), চন্দ্রধর (১৯২৯) কুশধ্বজ (১৯৩০), রূপসাধনা (১৯৩৬) রামকৃষ্ণ (১৯৩৬) , হামির (১৯৩৮) মায়ের দেশ (১৯৩৮) পূর্ণিমা মিলন (১৯৩৮) কবি কালিদাস (১৯৪০) মুচির ছেলে (১৯৪২) ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পালাকীর্তি।

বিংশ শতাব্দীর গণচেতনা এবং যাত্রা পালায় সমাজ সচেতনতা...

"ঘর ছেড়ে আমরা যখন পথ চলি, গৃহদ্বার থেকে মন্দিরদ্বার অথবা দেশ থেকে প্রবাসে যখন যাই তখন তা হয় 'যাত্রা', আর যাত্রা লগ্নে যখন উত্তরণের গান গাই তখন তা হয় 'গান' তাই যাত্রা আর গানের মিলনে 'যাত্রাগানের' জন্ম।

এমন একদিন ছিল যখন এ দেশের সামাজিক চেহারাটি ছিল অপূর্ণ। শিক্ষা-সংস্কৃতিগত চেতনাহীনতা ছিল এর মুখ্য কারণ। আর সেই কারণেই তদানীন্তন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিও ছিল নিতান্ত দীন। আজও তাই শহর-কেন্দ্রিক সভ্যতার একাংশের কাছে এই যাত্রাগান পরিত্যক্ত সংস্কৃতি। অথচ সেই সময়ে যাত্রাগানের ভিতর দিয়ে পুরবাসীদের ধর্মে ও নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার আত্মিক তাগিদ ছিল স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর। পালাকার গোবিন্দ অধিকারী এবং আরও দু'একজন

পালাকারের পালায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তদানীন্তন সমাজ চেতনা। তবুও উনবিংশ শতাব্দীর যাত্রাগান বা পালা যুগ বিকৃতির দোষে মূলত দুষ্ট হয়েই ছিল। ফলে শহর-কেন্দ্রিক মানুষের কাছে থিয়েটার হৃদয়গ্রাহ্য হয়ে উঠেছিল এবং যাত্রাগানের আসর বসেছিল গ্রাম-গঞ্জে। এই সময় মতিলাল রায় যাত্রার দীপ-শিখাটিকে অত্যুজ্জ্বল করে তুলেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর অন্তিমকাল থেকেই এ দেশের মানুষের ভিতরে রাষ্ট্রচেতনার সূচনা। এই সময়কার ইংরেজ শাসনে একদিকে যেমন ভারতের কুটির ও হস্তশিল্পের অবনতি, অন্যদিকে তেমনি দেখা দিয়েছিল কৃষি কর্মের ব্যাপক প্রসার। ইংরেজ সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল মানুষের কর্মসংস্থানের বিকল্প ব্যবস্থায়। তার উপরে এই দেশের মাটির ফসল বিদেশে রপ্তানির ফলে সৃষ্টি হয়েছিল বেকারী। এই বেকারত্ব থেকে শিক্ষার অবনতি। পাশাপাশি স্বৈরতন্ত্রের একচ্ছত্র আধিপত্যে জনবিক্ষোভের জন্ম সমাজের পটপরিবর্তনের স্পষ্ট সূচনা।

১৯০৪ সালে লর্ড কার্জন চাইলেন এ দেশের বিবেকগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে। গর্জে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ শিক্ষাবিদেরা। দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন—ভাঙো, ভেঙে ফেল সাহেবি শিক্ষা-যন্ত্র। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। স্বদেশপ্রেমিক মুকুন্দ দাস উদাত্ত কণ্ঠে গাইলেন নব জাগরণের গান। সেই থেকে যাত্রাগানে ফুটে উঠল সমাজ সচেতনতা। চতুর্দিকে শুরু হলো মানুষের মানুষ গড়ার কাজ। ১৯০৮-এ ইংরেজ সরকারের দমন নীতি, ১৯১০-এ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব, ১৯৩০-এ লবণ আন্দোলন, ১৯৩৯-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৪২-এ সরকার সৃষ্ট কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৫-এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা প্রাপ্তি, তারপর গৃহহারা-সর্বহারা সেই উদ্বাস্তু সমস্যা। অবশেষে স্বাধীনতার পতাকাতলে ১৯৫২ সালে খাদ্য আন্দোলন—প্রকৃতপক্ষে মানুষ গড়ে দিল। সোনা পুড়িয়ে পুড়িয়ে খাঁটি করার মত মানুষ মার খেতে খেতে বোধ করি পেল মানুষের অধিকার। এই সমাজ সচেতনতা স্পষ্ট হয়ে উঠল সর্বক্ষেত্রে।

এরপরই ভারতীয় গণনাট্য সংঘের আবির্ভাব। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' দেখা দিল সমাজ বিপ্লবের পথিকৃৎ রূপে। ঠিক তেমনি কানাইলাল শীলের 'দেশের মাটী' পালাটি যাত্রাপালার ক্ষেত্রে সমাজবিপ্লব সূচনা করল।

এরপর থেকে পালাকারেরা স্বাভাবিকভাবেই হয়ে উঠলেন সমাজ সচেতন। পালাগানে স্পষ্ট হলো শ্রেণী সংগ্রাম। শোষণবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।...

ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ তাই বোধ হয় বলেছিলেন—যাত্রা শুধু আনন্দ বিনোদন নয়—যাত্রার আর এক নাম 'জাগরণ'!"

এ ক্ষেত্রে আরও কিছুটা স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে "বিদ্যাসুন্দর", "কৃষ্ণযাত্রা" ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব ছিল না বটে কিন্তু "প্রতাপাদিত্য", "রাণা প্রতাপ সিংহ", "মেবার পতন", "সিরাজদ্দৌলা", "মীরকশেম", "ছত্রপতি শিবাজী" ইত্যাদি নাটকের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। ঐতিহাসিক চরিত্র বা বিষয়গত এই সব নাটক সাধারণ মানুষের মধ্যে অজানাকে জানাবার দিকটা থাকলেও, মূলত গণ আন্দোলন বা গণজাগরণ-ধর্মী কোন ভূমিকা বিশেষ পালন করেনি। তবে বিংশ শতাব্দীর যুগ চেতনা ও বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন এবং জনমানসে তার প্রতিক্রিয়া মুকুন্দ দাসের নাটকগুলিতে নিদারুণ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

আজকে গণনাট্যের যে সংজ্ঞা, আজকের গণনাট্য আন্দোলনের অন্তর্নিহিত যে উদ্দেশ্য এবং ভাব মূলত সেই সংজ্ঞা বা ভাব যেখানে, সেখানে মুকুন্দ দাসের প্রভাব অনস্বীকার্য। আর একটা সত্যকে অবশ্যই স্বীকার করা দরকার তা হলো ; গণমুখী নাট্য উপস্থাপনার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে গণজাগরণ মূলক ভূমিকা না থাকলেও, বাংলার পালাকার বা লোকনাট্যকারদের গণমুখী পালা

উপস্থাপনার প্রবণতা অবশ্যই ছিল। যেমন, ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর "পঞ্চনদ", "দাক্ষিণাত্য" ; রামদুর্লভ কাব্যশাস্ত্রীর "বাচস্পতি", পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের "টিপু সুলতান", ব্রজেন দে'র "বাঙ্গালী", সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের "মাটির মা", বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের "মাটির প্রেম", পূর্ণচন্দ্র দাসের "শৃঙ্খল মোচন", "নন্দগোপাল রায়চৌধুরীর "আগুন", গৌরচন্দ্র ভড়ের "কয়েদী", "দেবেন নাথের "সাতভাই চম্পা", অনিল চট্টোপাধ্যায়ের "মসনদ" ইত্যাদি পালাগুলি যদিও "ধর্মের জয়-অধর্মের ক্ষয়" স্পষ্ট করে তুলেছে তবুও হিন্দু মুসলমান ঐক্য, স্বদেশ প্রেম ইত্যাদি নিয়ে গণমুখী যাত্রা আন্দোলনের সূচনা করেছিল।

॥ ভারতীয় গণনাট্য সংঘ এবং নবান্ন ॥

১৯৪৩ সালের ২৫ মে বম্বের মারওয়ারী বিদ্যালয় হলে গণনাট্য সংঘের জন্ম। মনে রাখতে হবে, গণনাট্য সংঘ তৈরি হবার আগে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে দেশের সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে এই ধরনের সর্বশক্তিমান সাংস্কৃতিক সংগঠন আর দ্বিতীয়টি ছিল না। থাকা তো দূরের কথা, এই ধরনের সংগঠনই যে গণজাগরণের একমাত্র হাতিয়ার তেমন কোন ভাবনাও ছিল না। ১৮৮৫ সালে জন্ম নেওয়া 'কংগ্রেস সংগঠন' ও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ভারতের সমস্ত ভাষা-ভাষি শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবিদের নিয়ে একই আদর্শে গণনাট্য সংঘের মত সংগঠিত হতে পারেনি। গণনাট্যের শাখা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অতি দ্রুত তৈরি হয়েছিল। এই সংগঠনের প্রথম কার্যকরী কমিটিতে শুধু শিল্পী সাহিত্যিকরাই ছিলেন না, ছিলেন অধ্যাপক, ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সমিতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা। এর আগে ভারতের কোন সাংস্কৃতিক সংস্থায় কৃষক-শ্রমিক প্রতিনিধি ছিল না। গণনাট্য সংঘের কেন্দ্রীয় সংস্থার সাংস্কৃতিক শাখার মাধ্যমে (কালচারাল স্কোয়াড) প্রদেশে এবং আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পরিবেশনের মাধ্যমে এক প্রদেশের, এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য প্রদেশ ও অন্য অঞ্চলের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন তৈরি হলো। গণনাট্যের মাধ্যমে বহু অখ্যাত-লোকশিল্পীরা জাতীয় মঞ্চে উঠে এসেছেন। গ্রাম-গঞ্জের বহু সাহিত্যিক তৈরি করেছে এই গণনাট্য সংঘ। গণনাট্য সংঘের দুরন্ত প্রভাবে দিকে দিকে গড়ে উঠতে পেরেছে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন।

কমরেড মাও-সে-তুং বলেছিলেন—"সৈন্যবাহিনী ছাড়াও আমাদের অবশ্যই চাই এক বিশেষ সাংস্কৃতিক বাহিনী, যে বাহিনী শত্রুকে পরাস্ত করা এবং আমাদের নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করার কাজে অপরিহার্য" ; আর "আমাদের হাতে এমন কি অত্যন্ত সাধারণ ধরনের শিল্প সাহিত্যও যদি না থাকত বিপ্লব হত না। আমরা কোন জয়লাভই করতে পারতাম না।"—

এই মহান উক্তির যথার্থ রূপায়ণ যা হয়েছে, তার মধ্যে ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্যের যৌথ নির্দেশনায় উপস্থাপিত "নবান্ন" নাটক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এই নাটকের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক-বাস্তবতার রীতি স্পষ্ট হয়েছে। এরই ফলশ্রুতি, বাংলা দেশের মাটিতে গণনাট্য আন্দোলন তথা গ্রুপ থিয়েটারের আন্দোলনের ধারা প্রবাহে নাটকের যে আলাদা একটা ভাষা আছে সেই সত্যের জন্ম হয়ে গেল। বাংলার "যাত্রা" এই নাট্য প্রবাহের তীব্রতায় একটু একটু করে তার ঐতিহ্যসৌধ থেকে নামতে শুরু করল। কিছু কিছু পালাকার নকল প্রবণতার দুষ্ট প্রভাব যুক্ত হলেন।

ষাটের দশকের শেষ ভাগ থেকে "যাত্রা" তার যাবতীয় ঐতিহ্য হারাতে থাকল। পরিশেষে মর্যাদাটুকুও হারিয়ে "যাত্রা" হয়ে উঠলো নিছক ব্যবসায়িক পণ্য। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মুনাফা তোলার পণ্য।

॥ বিংশ শতাব্দীর গণচেতনার পর্যালোচনা... ॥

জনগণের মধ্যে রাষ্ট্র চেতনার যে বীজ উনবিংশ শতাব্দীতে রোপিত হয়েছিল, বিংশ

শতাব্দীতে তার মহীরূহ রূপ। উনিশ শতকের শেষ দিকে ইংরেজ সরকারের বিভ্রান্তিকর শাসন ও পরিচালন নীতির জন্য একদিকে যেমন অর্থনৈতিক বিপর্যয় আসতে থাকল, অন্যদিকে এলো কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ, প্লেগ ইত্যাদি দুরারোগ্য ব্যাধি, নৈরাজ্য ইত্যাদি। এর ফলে ইংরেজ সরকারের প্রতি ক্ষোভ ও তীব্র অসন্তোষ মানুষের মনে দানা বাঁধতে থাকল। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বুঝলেন, এই সরকার দেশের খাদ্য এবং বস্ত্রের সমস্যা নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবিত নয়। বরং এ দেশের মানুষের ওপর যতটুকু ক্ষমতা ছিল তাও খর্ব করে দিতে ইংরেজ সরকার যেন বদ্ধ পরিকর। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এবার চুপ করে বসে থাকলেন না। দেশকে নানা বিপর্যয় থেকে বিশেষ করে দেশবাসীর যে নিদারুণ আর্থিক দুরবস্থা, তা দূর করে দেবার সঙ্কল্প নিয়ে স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদনের ব্যাপারে মনযোগী হলেন।

১৮৮৮ সালে আম্মাদের দেশের কৃতি বাঙালীরা মিলিত হয়ে গঠন করলেন "বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি"। তারও অনেক আগে আমাদের দেশমাতৃকার সোনার ছেলেরা 'দেশ-মায়ের' বন্দনায় আত্ম উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁর অত্যুজ্জ্বল প্রমাণ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্"। ১৮৭৬ সালে চুঁচুড়ায় থাকাকালীন বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করলেন এই মন্ত্র সংগীত। ১৮৮২ সালে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর "আনন্দমঠ" উপন্যাসে এই 'মন্ত্র-সংগীত'কে সন্নিবিষ্ট করলেন।

১৯০১ সালে কংগ্রেসের স্বদেশী শিল্পের প্রদর্শনী স্বদেশী উৎপাদনে উৎসাহ দেয়।

১৯০৪ সালে দেশনায়ক, মারাঠি নেতা সখারাম গণেশ দেউস্কর যখন 'শিবাজী উৎসব' পালনের ভিতর দিয়ে স্বদেশ প্রেমের দীক্ষা নেবার প্রেরণা জোগান, তখনই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'শিবাজী উৎসব' বইয়ের ভূমিকায় লেখেন স্বদেশ প্রেমের গান। লর্ড কার্জন এই মহামিলনের গ্রন্থি ছেঁড়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ১৯০৫ সালে মহামতি গোখলে কার্জনকে স্বৈরাচারী বলে বর্ণনা দেন। এরও আগে ১৯০২ সালে সতীশচন্দ্রের সঙ্গে বিনয় সরকার, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীরা হাতে হাত মিলিয়ে 'ডন সোসাইটি' স্থাপন করেছিলেন। এই 'ডন সোসাইটি' তৈরি হয়েছিল মানুষ গড়ার প্রতিজ্ঞা নিয়ে। ১৯০৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হলে শিক্ষা বিস্তারের জন্য সতীশচন্দ্র মুখার্জী ও হীরেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু হয়। বিদেশী শিক্ষা বর্জন করার ডাক দিয়েছিলেন হীরেন্দ্রনাথেরা। বিশ্ববিদ্যালয় ভেঙে ফেলার নামে আসলে ইংরেজ শাসকদের শিক্ষাসংক্রান্ত ষড়যন্ত্রের পাঁচিল ভাঙ্গার কাজে সেদিন এক যোগে ছাত্রদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন—স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, হারানচন্দ্র চাকলাদার, কিশোরীমোহন সেনগুপ্ত, বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, বিনয় সরকার আরও অনেকে। এরপর দিকে দিকে নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার মহাযজ্ঞ শুরু হয়।

১৯০৫ সালে সিমলা থেকে সরকারি ঘোষণা হয়, 'বঙ্গভঙ্গ' মঞ্জুর হয়েছে। এত বছর ধরে এদেশে যে ঐক্য, যে সম্প্রীতি, যে আত্মপ্রত্যয়, যে সংহতি গড়ে উঠছিল, বঙ্গভঙ্গ মঞ্জুর হবার কথা ঘোষিত হওয়া মাত্র সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবার ইংগিত দিল। এই সময়ে বিপিনচন্দ্র পাল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, রাসবিহারী ঘোষ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, অরবিন্দ ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রাজা সুবোধ মল্লিক (বসু), রাজা সূর্যকান্ত আচার্য, রাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, সতীশ মুখার্জী ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জন্য।

সেদিন বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায়, মহামতি গোখলে ও নৌরজী, টহলরাম গঙ্গারামও পিছিয়ে ছিলেন না। সহসা যেন মাতৃপূজায় মেতে উঠল গোটা দেশ। মাতৃপূজার শ্রেষ্ঠ মন্ত্র 'বন্দেমাতরম্' এক যোগে উচ্চারিত হলো লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে। গর্জে উঠল সংবাদপত্র। একের পর এক সংবাদপত্র প্রকাশিত হলো আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে। গানে, কবিতায়, ছড়ায়, তাছাড়া

জনগণের চিত্তবিনোদনের মাধ্যমগুলির অতীত ভূমিকা পাল্টে যেতে থাকল। এমন কি পালাগানের প্যাটার্ন না পাল্টাক, তার ভাষা বদলে যেতে থাকল।

১৯০৬ সাল থেকে বিদেশী দ্রব্য বর্জন করার প্রতিজ্ঞা নিলেন আপামর জনসাধারণ। বিদেশী দ্রব্য রপ্তানীকে প্রতিহত করার জন্য একের পর এক গড়ে উঠতে থাকল কল-কারখানা-মিল ইত্যাদি। এই সালেই জন্ম নিয়েছিল, বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক, ন্যাশানাল বীমা কোম্পানি, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, ন্যাশানাল সোপ ফ্যাকটরী, যশোর চিরুনী কারখানা। মোদ্দা কথা, চিরুনী থেকে ছুরি-কাঁচি, লেখার কালি থেকে কাগজ। রজনীকান্ত সেন লিখলেন ঃ "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়, মাথায় তুলে নেরে ভাই..."

ইংরেজ শাসকরাও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ১৯০৮ সালে কলকাতা, ঢাকা, ময়মনসিং, বরিশাল, ফরিদপুরে গড়ে ওঠা বহু সমিতি, যেমন যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুপ্ত সমিতি, ঢাকায় প্রমথনাথ মিত্রের গুপ্ত সমিতি যার পরিচালক ছিলেন পুলীনবিহারী দাস, সতীশচন্দ্র বসুর গড়া 'অনুশীলন সমিতি', বরিশালের স্বদেশবান্ধব সমিতি, ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি, ময়মনসিংহের সাধনা সমাজ, সুহৃদ সমিতিগুলিকে দেশদ্রোহিতার আখড়া বলে বাতিল করা হয়েছিল। ১৯১০ সালে প্রেস আইন করে যুগান্তর পত্রিকা বন্ধ করে দিল। এরই মধ্যে ১৯০৮ সালে ভারতমায়ের বীর ছেলে 'ক্ষুদিরাম', 'প্রফুল্ল চাকী' সৃষ্টি করলেন আর এক অধ্যায়। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশমাতৃকার মুক্তি চেয়ে ইংরেজ নিশ্চিহ্ন করার প্রতিজ্ঞা বুকে নিয়ে ছুঁড়ে দিলেন কিংসফোর্ডের গাড়ি লক্ষ্য করে মৃত্যুবাণ। ওদিকে আলিপুর বোমা মামলায় অরবিন্দ ঘোষ অভিযুক্ত হলেন।

চারদিকে জ্বলে উঠল আগুন। ১৯১৪ সালে উড়িষ্যায় ধরা পড়েন বাঘাযতীন। ১৯১৯ সালে তৈরি হলো জালিয়ানওয়ালাবাগের ইতিহাস। পাশাপাশি বম্বেতে শ্রমিক ধর্মঘট, আসাম-বেঙ্গল রেল ধর্মঘট যেমন একদিকে শোষণবাদকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইল, অন্যদিকে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটাবার অগ্নি আন্দোলন তীব্রতর হতে লাগল। এর মধ্যে ঢাকায় 'মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠা হবার পর ১৯০৭ সালে ময়মনসিংহে হিন্দু-মুসলমানদের 'খিলাফৎ আন্দোলন', এক যোগে মাতৃমুক্তির দৃঢ় প্রতিজ্ঞার প্রতিষ্ঠা দিল। ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনকে সার্থক করার জন্য এগিয়ে এলেন—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র, মৌলানা আক্রাম খাঁ, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ ছাড়াও ছাত্র-ছাত্রী, আবাল বৃদ্ধ বণিতা। এই সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ লিখলেন 'চরকার গান'। এই আন্দোলন জনগণের মধ্যে রাষ্ট্রচেতনা জাগালে , স্বাধিকার বোধের জন্ম দিল।

১৯৩০ সালে লবন আইন আন্দোলন, ১৯৩৬ সালে সর্বভারতীয় কিষাণ সভা গঠন-দেশ ও দশের গোটা কাঠামো পাল্টে দিল।

১৯৩৯ সালে হিটলার বাধালেন যুদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

আমাদের দেশে, অর্থাৎ ভারতে কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের ঐক্য ভাঙ্গল। ১৯৪০ সালে মহম্মদ জিন্না ভারত ভেঙে ভাগ করে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের সঙ্গে আঁতাত করলেন। ১৯৪১ সালে নেতাজি সুভাষচন্দ্র ভারত থেকে পালালেন। সুভাষচন্দ্র জাপানে গিয়ে গড়ে তুললেন 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি'। ইংরেজ হঠানোর শপথ তখন আর্মিদের বুকে। ১৯৪২ সালে মহাত্মা গান্ধীর "ভারত ছাড়" ডাকে সাড়া দিল কংগ্রেস। 'আগষ্ট প্রস্তাব' পাশ হলো ; শুরু হলো তীব্র আন্দোলন। ১৯৪৩-এ কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ। ম্যালেরিয়া-বসন্তে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু। তারই মধ্যে ভারত মায়ের শৃঙ্খল মুক্তির প্রতিজ্ঞা বুকে নিয়ে, "ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল আর্মি" সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে আসতে লাগলেন ভারতের দিকে নেতাজি সুভাষ।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট লর্ড মাউন্টব্যাটন ভারত ভেঙে চিরদিনের জন্য ভারত ত্যাগ করলেন।

এরপর উদ্বাস্তু সমস্যা।

১৯৫২ সালে খাদ্য আন্দোলন। ১৯৬২ সালে চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণ। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান কর্তৃক ভারত আক্রমণ। বার বার ভারতের গায়ে ছোবল মারার চেষ্টাকে বার বার প্রতিহত করার ভিতর দিয়ে ভারতের শক্তিকে কায়েম করেছে ভারতবাসী। আর সেই সঙ্গে ভারতবাসীর নানা কল্যাণে নিয়োজিত যাবতীয় সংস্কৃতির রূপও বদলেছে!

বিংশ শতাব্দীর যুগচেতনা এবং নানা আন্দোলন বিশেষ করে স্বাদেশিকতার ভাব মূর্তি চারণ কবি মুকুন্দ দাসকে প্রভাবিত করেছে। তাঁর রচনা এবং ভূমিকাভিনয়ে মূর্ত হয়েছে দেশপ্রেম। দশের কল্যাণ কামনা! মুকুন্দ দাস তাঁর রচনা শৈলীকে যাত্রা ফর্মে আসরে উপস্থাপিত করে যাত্রাকে কতটা গণচেতনা জাগরণের মাধ্যম করে তুলেছিলেন তা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একটি বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া ওঠে। কাব্যরস যেটা আসল জিনিষ, সেইটেই অভিনয়ের সাহায্যে ফোয়ারার মতো চারদিকে দর্শকদের পুলকিত চিত্তের উপর ছড়াইয়া পড়ে।...বিলাতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি, তাহা ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ। তাহাকে নড়ানো শক্ত, তাহাকে আপামর সকলের দ্বারের কাছে আনিয়া দেওয়া দুঃসাধ্য, তাহাতে লক্ষ্মীর পেঁচাই সরস্বতীর পদ্মকে প্রায় আছন্ন করিয়া আছে..."

যা হোক, আবার ইতিহাসের পাতায় ফিরে যাই।

এবারে এখানে মুকুন্দ দাসের কথা রেখে একটু মথুর সাহার কথা বলি।

১৩০৬ সনের কথা।

৮২নং কলেজ স্ট্রীটে অভয়চরণ দাস একটা যাত্রা দল তৈরি করেছিলেন। অভয়চরণ মারা গেলে জামাই হন সেই দলের অধিকারী বা মালিক। জামাই অধর দাস এই দল বেশিদিন চালাতে পারেননি। কালীঘাট সাপুর অঞ্চলের এক স্বর্ণকার-ব্যবসায়ী নীলকান্ত দাস টালীগঞ্জের মথুর সাহার সঙ্গে যৌথভাবে অধর দাসের দলটি নেন। দলের নাম রাখেন "সৌদাস থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা কোম্পানি"। মথুরানাথ সাহা ছিলেন ফরিদপুরের লোক। কোলকাতায় এসে টালীগঞ্জে ওঠেন। এরপর অধর দাসের সঙ্গে তাঁর যাত্রা ব্যবসা শুরু। কিছুদিনের মধ্যে অধর দাস দল হস্তান্তর করেন। মথুর সাহা নেন দায়িত্ব। দলের নাম বদলে নাম রাখা হয় "মথুরানাথ সাহার থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পার্টী"।

মথুরানাথ সাহার দলের পালাকার ছিলেন হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর 'ভৃগুচরিত', 'পদ্মিনী' ইত্যাদি পালা এই দলে অভিনীত হয়। এই দলের জন্য মথুরবাবু তদানীন্তন 'বেঙ্গল থিয়েটারের' সুরকার ভুতনাথ দাশকে আনিয়ে গানের সুর দেওয়াতেন। এখন সিনেমা-থিয়েটার থেকে শিল্পীদের আনা যাত্রাদলের মালিকদের একটা বড় রকম জেদ, তারই বীজ পুঁতেছিলেন মথুরানাথ। মথুরানাথ যাত্রায় ব্যবহৃত বাদ্য যন্ত্রের মধ্যে ক্ল্যারিওনেট প্রথম যুক্ত করেন। এর পরবর্তী সময় থেকে ক্ল্যারিওনেট অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এই দলে অভিনীত 'পদ্মিনী' পালার সময় থেকে জুড়ি ও বালকদের গান উঠে যায়। মথুরবাবু 'যাত্রাব্যালে' প্রবর্তন করেন। মথুরবাবুর দলের প্রধান গায়ক ছিলেন বাঁকুড়ার হেমচন্দ্র পান্ডা আর যশোর জেলার পান্তা পাড়ার জ্যোতিষ প্রামাণিক। অভিনেতা যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন নগেন্দ্রনাথ বসু, বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, মন্মথনাথ ঘোষ, মন্মথ গাঙ্গুলী, ভবানীপুরের অহীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বর্ধমান জেলার ক্ষুদপুরী শাঁখারী গ্রামের নলিনী পাল, যিনি নলিনীরাণী হিসেবে খুবই যশ পেয়েছিলেন। নারী চরিত্রে অভিনয় করে আরও একজন খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলেন তিনি হলেন বিনোদচন্দ্র চক্রবর্তী (বিনোদরাণী)।

মথুরবাবুর মৃত্যুর পর দলের দায়িত্ব নিয়েছিলেন মথুরবাবুর পোষ্যপুত্র সুরেন্দ্রনাথ সাহা। ষাটের দশকের গোড়ায় চিৎপুরে মথুর সাহার দলের জরাজীর্ণ সাইনবোর্ড ঝুল ঝুল করত।

চিৎপুর আর নিমতলা ঘাট স্ট্রীটের মুখে যে বাড়িতে তপোবন নাট্য কোম্পানীর গদি ছিল, ঠিক তার বিপরীত দিকের বাড়িতে ছিল মথুর সাহার গদি।

মথুর সাহার দল জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছেছিল তার প্রমাণ স্বরূপ এক সময়ে কলকাতায় যাত্রাপ্রেমিকরা ছড়া বেঁধেছিল বলে জানা যায়। ছড়ার নমুনা এই রকম ঃ

"মথুর সাহার গান শুনবি।
পাঁচসিকে পয়সা দিবি।।

মথুর সাহার দলের বিলুপ্তি ঘটার পিছনে আরও একটা ঘটনার উল্লেখ আছে পুরাতন কাগজপত্রে। ব্যাপারটা এই রকম ঃ

নাটাগড়ের জমিদার সুরেন ব্যানার্জী। সুরেনবাবু ছিলেন খুব আমুদে লোক। প্রতি বৈশাখী পূর্ণিমায় জমিদার খুব ঘটা করে উৎসব করতেন, সেই উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল যাত্রা গানের আসর। একবার মথুর সাহার ম্যানেজার গিয়েছিল সেই আসরে গান গাইবার বায়না করতে। বায়না সে করতে পেরেছিল কি পারেনি তা জানা যায় না বটে, কিন্তু ফেরার সময়ে জমিদারকে লক্ষ্য করে কিছু ব্যাঙ্গোক্তি করেছিল। কানে গিয়েছিল জমিদার সুরেন ব্যানার্জীর। রাগে-উত্তেজনায় ভিতরে ভিতরে ফুটছিলেন তিনি। তারপর এক মাসের মধ্যে জমিদার প্রভুত অর্থ ঢেলে মথুর সাহার দলের সমস্ত লোকজন ভাঙ্গিয়ে নিয়ে তৈরি করেছিলেন "বীণাপাণি অপেরা"। তারপরই মথুরবাবুর দলের বিলুপ্তি ঘটেছিল।

মথুর সাহা একটা টার্নিং পয়েণ্ট।

আজকের যাত্রায় পালা রচনা, উপস্থাপনা, অভিনয় ধারা, শিল্পী সংগ্রহের মানসিকতা, ব্যবসায়িক ভাবনা ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলিতে যে আধুনিকতার প্রাবল্য, মূলত মথুরনাথ সাহা তার সব কিছুরই প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন তাঁর দলে। জনমানসে এক নতুন ধারার প্রবর্তক হিসেবে তাই মথুরনাথ চিরকালই বেঁচে থাকবেন। সেই মথুর সাহার দলের অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যেমন একটা যুগের অবসান, তেমনি আর এক নতুন যুগের সূচনা। তবুও সেই নতুন যুগের আলোয় যাবার আগে একটু তাঁদের কথা বলা দরকার যাঁরা মতিলাল রায়ের জীবন ও কর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে, কেউ বা পরবর্তী সময়ে মথুর সাহার জনপ্রিয়তার প্রভাবে গড়ে তুলেছিলেন যাত্রা দল। যাঁদের যাত্রাদল গড়ে তুলবার পিছনে যত না ছিল ব্যবসায়িক লোভ, তার চাইতে ঢের বেশি ছিল যাত্রা প্রীতি। এঁদের মধ্যে যাঁর কথা প্রথমেই মনে আসে তিনি মহেশ চক্রবর্তী।

॥ মহেশ চক্রবর্তীর যাত্রা ॥

মহেশবাবুর দল দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। যতদিন তিনি দল চালিয়েছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়তা নিয়েই চালিয়েছিলেন। এই দলে একজন নাচিয়ে ছিলেন যাঁর নৃত্য কুশলতায় মুগ্ধ হতেন দর্শরা। তিনি ছিলেন মহিলা।

॥ বেণীমাধবের দল ॥

এই সময়ে হাওড়া জেলার মাকড়দার বেণীমাধব পাত্র একটা যাত্রা দল করেছিলেন। এই দলে ঠাকুরদাস দত্তের 'অক্রূর আগমন' আর 'দুর্গামঙ্গল' অভিনীত হয়েছিল।

॥ নড়াইল মহকুমার গৌর প্রামাণিক ॥

নড়াইল মহকুমার কালনা গ্রামের গৌর প্রামাণিক একটা যাত্রা দল তৈরি করেছিলেন। দলটি অবশ্য বেশি বছর বাঁচেনি, যতদিন বেঁচে ছিল খ্যাতির সঙ্গেই বেঁচে ছিল।

॥ নারায়ণ দাস ॥

নারায়ণ দাস "শুম্ভ নিশুম্ভ" যাত্রা পালায় জনপ্রিয় হয়েছিলেন কিন্তু "রাবণ বধ" পালা হাজির করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। বর্তমানে যাত্রায় যেমন আঙ্গিক বা চমক অথবা যান্ত্রিক কলাকৌশলের প্রাধান্য বেশি, তেমনি নারায়ণ দাস 'রাবণ বধ' পালায় রামচন্দ্রের দুর্গাপুজোর দৃশ্যে দুর্গা প্রতিমা হাজির করে দিতেন, ফলে এই যাত্রার জন চাহিদা বেড়েছিল।

॥ যাত্রার নবজাগরণ এবং মুকুন্দ দাস ॥

১৯৮৬ সালের ২৮ অক্টোবর, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে প্রকাশিত "মুক্তির সংগ্রামে ভারত" গ্রন্থের ৬০ পৃষ্ঠায় মুকুন্দ দাস প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—"মুকুন্দ দাস (১৮৭৮-১৯৩৪) ছিলেন স্বদেশী পর্বের চারণ কবি। তাঁর যাত্রা ও পালাগান সেদিন লক্ষ লক্ষ গ্রাম ও শহরবাসীর অন্তরে সঞ্চারিত করেছিল দেশ প্রেমের উদ্দীপনা।"

মুকুন্দ দাস প্রসঙ্গে এই দলিলে আর কোন কথা বিস্তারিতভাবে না থাকার পিছনে যে কারণ ছিল, তা মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর প্রস্তাবনায় স্পষ্ট হয়ে আছে। শ্রী বসু বলেছেন,—"মুক্তির সংগ্রামে ভারত" শীর্ষক ছবির এ্যালবামটি দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে প্রকাশ করার উদ্যোগ রাজ্য সরকার নিয়েছেন।"...সুতরাং 'বাংলার লোকনাট্যে স্বাদেশিকতা এবং মুকুন্দ দাস' প্রসঙ্গে এই নিছক ছবির অ্যালবামটি যথেষ্ট নয় বলেই আমাকে আরও আলোচনা গ্রন্থের আশ্রয় নিতে হয়েছে, এ স্বাভাবিক। বাংলার যাত্রা ও পালায় জনগণ সমাজের সর্বস্তরে বরাবরই একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে, এই সত্য স্বীকারোক্তি আগামী প্রজন্মের কাছে একটি 'স্বীকৃতি' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

এবার চারণ কবি মুকুন্দ দাস প্রসঙ্গে একটু বিস্তারিত বলা যাক।

১৮৭৮ সালে ঢাকা বিক্রমপুরে বানারী গ্রামে গুরুদয়াল দে'র ছেলে যজ্ঞেশ্বরের জন্ম। ঠাকুর্দা নৌকোর মাঝি। বাবা গুরুদয়াল বরিশালে এক ডেপুটির আদালতে চাকরি করতেন। যেহেতু গুরুদয়ালের কর্মস্থল ছিল বরিশালে সেই হেতু এক সময়ে এই পরিবারটি বরিশালের কাশীপুরে বাস করতে থাকে। ছেলেবেলা থেকে পারিবারিক কারণে যজ্ঞেশ্বরকে বার বার স্কুল বদল করে পড়তে হয়। সেই সূত্রে মুকুন্দদাস ওরফে যজ্ঞেশ্বর বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েন। প্রবেশিকা পরীক্ষা না দিয়েই লেখাপড়ায় ইস্তফা দিতে হয়েছিল। মাঝে মাঝে বাবার মুদিখানা দোকানটি চালাতে হতো তাঁকে। দোকানটি করেছিলেন মুকুন্দবাবুর বাবা। সেই দোকানে বসার পর থেকে মুকুন্দ সঙ্গ দোষে দুষ্ট হন। শোনা যায় তিনি নাকি গুণ্ডামিও করতেন। এরপর একদিন মাত্র ১৯ বছর বয়সে বরিশালের নায়েব নাজির বীরেশ্বর গুপ্তের কীর্তনের দলে যোগ দেন। পরে তিনি নিজে কীর্তনের দল তৈরি করেন। নানা পুজো-পার্বণে, লোক উৎসবে বাইরের অনেক বিখ্যাত কীর্তনের দল কীর্তন গাইতে আসত। এই সময়ে যজ্ঞেশ্বর ওরফে মুকুন্দদাস সেই সব দলের শ্রোতাও হতেন নিয়মিত। এই কীর্তন শোনা আর পাঁচজনের মত ছিল না। যজ্ঞেস্বর অধিকাংশ গানই কাগজে লিখে রাখতেন। পরবর্তীকালে এই সংগ্রহ উপাদান তাঁর 'কীর্তন সঙ্গীত' গ্রন্থের সম্পদ হয়েছিল। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর মতি ও গতি দুই পাল্টে যায়। যজ্ঞেশ্বর রামানন্দস্বামী বা হরিবোলানন্দের মত এক ত্যাগী মানুষ বা সাধকের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। এই দীক্ষার পর তাঁকে 'মুকুন্দ দাস' নামে অভিষিক্ত করেন রামানন্দ। এক সময়ে বরিশাল তথা অবিভক্ত বঙ্গদেশের অন্যতম দেশনেতা অশ্বিনীকুমার দত্তের সান্নিধ্য লাভ করেন যুবক মুকুন্দ। যে মুকুন্দ মুদি দোকান চালায়, যে মুকুন্দ বন্ধুদের নিয়ে গুণ্ডামি করে বেড়ায় সেই মুকুন্দকে অশ্বিনী দত্ত স্বদেশীমন্ত্রে দীক্ষা দেন এবং চারণ কবিতে রূপান্তরিত করেন।

মুকুন্দ দাস যদিও হরিবোলানন্দের কাছে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন, তবুও তাঁর মধ্যে

শ্যাম ও শ্যামার প্রভাব প্রকট ছিল যা তাঁর সাধন-সংগীতে প্রতিফলিত হয়েছিল। বরিশালের কালীবাড়ির পূজারী ভক্ত সোনা ঠাকুরের প্রভাবে মুকুন্দ দাস কালীভক্ত হন, পরবর্তী সময়ে বরিশাল কাশীপুরে তিনি 'আনন্দময়ী' আশ্রম তৈরি করে সেখানে কালী বিগ্রহ স্থাপন করেন।

সেই মন্দিরের সংলগ্ন পুষ্প বাগিচার মুসলমান মালীর জন্য মন্দিরের পাশে মসজিদ গড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। বরিশালের স্বনামখ্যাত কীর্তনীয়া যোগেশ পাল নিজের বাড়িতে কীর্তনের দল করেছিলেন, নিজের বৈঠকখানায় বসাতেন কীর্তনের আসর। সেই আসরে নিত্য যোগ দিতেন মুকুন্দ। মুকুন্দ দাসের মধ্যে যে প্রতিভা এতদিন সুপ্ত ছিল এমনি করেই একটু একটু করে তার চরম বিকাশ ঘটতে থাকল। এবার মুকুন্দ শুরু করলেন গান আর পালাগান লিখতে। 'বরিশাল হিতৈষী' পত্রিকার পক্ষ থেকে তাঁর হাতে কলম তুলে দেওয়া হলো। মুকুন্দ নিয়মিত লিখতে শুরু করলেন। মুকুন্দ দাসের পালাগান এক সময়ে গোটা বরিশালকে মাতিয়ে দিল। দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মুক্তির জন্য যাঁরা আত্মনিবেদন করে প্রত্যক্ষ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তেমনি মানুষেরা শুধু নন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মুকুন্দ দাসের গান শুনে মুগ্ধ হলেন।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তিনি 'স্বদেশী যাত্রাপার্টি' তৈরি করে নেমে পড়েন গণজাগরণের স্বপ্ন নিয়ে আসরে। 'যাত্রা' অর্থাৎ উন্মুক্ত আকাশের নিচে, জনতার বেষ্টনীর মধ্যে দাঁড়িয়ে মহাজীবনের-মানবজীবনের গান গাইলেন তিনি। যাত্রা যে কী বিশাল, কী বৃহৎ গণমাধ্যম, যাত্রার যে আলাদা একটা ভাষা আছে সে কথাটা প্রমাণ করলেন তিনি।

এরপরই তিনি পালা রচনায় হাত দিলেন। রচনা করলেন 'মাতৃপূজা'। সেই পালাগান যুবকদের আন্দোলিত করল। মানুষ জাগল। মানুষ তার অধিকার প্রসঙ্গে সচেতন হলো। দেশাত্মবোধক গান আর স্বদেশী ভাব ও ভাবনায় লেখা যাত্রাগান বিদেশী দ্রব্য বর্জনের মন্ত্র হলো, সে মন্ত্রদীক্ষায় দীক্ষিত হতে থাকল গ্রামের পর গ্রাম। কেঁপে উঠল ইংরেজ শাসক।

১৯০৮ সালে ১০৮ ধারায় মুকুন্দ দাসকে গ্রেফতার করল পুলিশ। জামিনে মুক্তি পেয়েছিলেন তিনি। ভবরঞ্জন মজুমদার সম্পাদিত 'মাতৃপূজা' গীত সংকলনে মুকুন্দদাসের লেখা—"ছিল ধান গোলা ভরা, শ্বেত ইঁদুরে করল সারা" গানটি সংকলিত হবার পরই তাঁকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। জরিমানার টাকা জোগাড় করেন মুকুন্দ দাস পৈতৃক দোকান বিক্রি করে। কারাবাসের সময় মুকুন্দ দাসের পত্নী বিয়োগ হয়।

রক্তমাংসের মানুষ মুকুন্দ দাসের দেহ ও মনের ওপর দিয়ে অত্যাচারী ইংরেজ শাসকদের পৈশাচিক অত্যাচারের রোলার চালান ও ভাগ্যনিয়ন্তার চরম পরীক্ষা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন তাঁর সাধনার পথে অনড়-অবিচল। ১৯২২ সাল থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলন থেকে আইন অমান্য আন্দোলন সর্ব ক্ষেত্রেই মুকুন্দ দাস তীক্ষ্ম তরবারির চাইতেও তীক্ষ্ম হাতিয়ার তাঁর যাত্রাগান নিয়ে এ দেশের মানুষের মনকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এক সময়ে এ দেশের মানুষই তাঁর গলায় পরিয়ে দিয়েছেন শ্রদ্ধা ও ভালবাসার জয়মাল্য স্বরূপ 'চারণ কবি' খেতাব।

মুকুন্দ দাসের পালাগান 'মাতৃপূজা' আর 'পথ' তৎকালীন সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল। তাঁর লেখা 'পল্লীসেবা', 'কর্মক্ষেত্র' পালাগানের মধ্য দিয়েও হিন্দুমুসলমান মৈত্রী, অস্পৃশ্যতা বর্জন, বিদেশী পণ্য বর্জন, স্ত্রী শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষার দিকে আলোকপাত করার মহান প্রয়াস ঘটেছিল। মুকুন্দ দাসের আরও রচনার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'সমাজ', 'ব্রহ্মচারিণী' ইত্যাদি। চারণকবি কণ্ঠে দোলায়িত শত শত মেডেল এবং আরও বহু পুরস্কার-এ দেশের কৃতজ্ঞতার নজির। ১৯৩৪ সালের ১৮ মে, মুকুন্দ দাসের মহাপ্রয়াণ হয়।

শরৎকুমার রায়ের 'মহাত্মা অশ্বিনীকুমার' বইতে দেখি, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে অশ্বিনীকুমার তাঁর সুযোগ্য শিষ্যের হাতে কলম তুলে দিয়ে স্বদেশী যাত্রা লেখায় প্রেরণা

জুগিয়েছিলেন। মুকুন্দ দাস ইংরেজদের শুনিয়ে গেয়ে উঠেছিলেন ঃ

"আর কি দেখাও ভয়?
দেহ তোমার অধীন বটে
মন তো স্বাধীন রয়।
হাত বাঁধবে পা বাঁধবে, ধরে না হয় জেলে দেবে
মন কি ফেরাতে পারবে
এমন শক্তিময়?..."

এক সময়ে মুকুন্দ দাসের স্বদেশী গান শুনে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে একটা লাঠি উপহার দিয়েছিলেন। সেই লাঠির গায়ে খোদাই করা ছিল—

"যে রাখে আমারে তার হয় না বিপদ,
মুকুন্দের সখা আমি মূর্খের ঔষধ।"

মুকুন্দ দাস ছিলেন কর্মযোগী। তবুও কর্মে শক্তি কামনা করে শক্তিদায়িনী শ্যামামায়ের কাছে শ্যামা সংগীতের মাধ্যমে ভিক্ষা চেয়েছেন তিনি। তাঁর রচিত বহু গানই শ্যামা মায়ের বন্দনার ভিতর দিয়ে গণকল্যাণই করেছে।

মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাত্রার বৈশিষ্ট্য ঃ উদ্দীপনাময় গানের সঙ্গে যুক্ত ছিল তেজোদীপ্ত বক্তৃতা। দোহার ব্যবহার। **মুকুন্দ দাসের পোশাক ঃ** গৈরিক বসন, মাথায় পাগড়ি। হাঁটুর অনেক নিচে পর্যন্ত আলখাল্লা। বিদ্যাসাগর চটি। গলায় ঝুলত রূপোর মেডেল।

প্রসঙ্গ ক্রমে বলা দরকার, মুকুন্দ দাস নিজে ভাল গীতিকার ছিলেন তো বটেই তবুও তাঁর "ব্রহ্মচারিণী পল্লীসেবা' পালায় নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের এবং কাজী নজরুল ইসলামের লেখা গান ব্যবহার করা হয়েছিল।

সমাজ।। এই পালা মাত্র ২৪টি দৃশ্যে ভাগ করা। পণ প্রথার কুফল, অনাথ মেথর বালকের শুশ্রূষা, চৈতন্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত করা, মদ্যপান ও বারবণিতা সংস্পর্শে কুফল, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর কৃষ্ণ সেবার কুফল ইত্যাদি প্রতিফলিত হয়েছিল।

পল্লীসেবা।। ১৬টি দৃশ্যে বিভক্ত। প্রস্তাবনা দীর্ঘ বক্তৃতার মাধ্যমে, তারপর পালা আরম্ভ। দেশের কল্যাণ করতে হলে চাই ধর্মগোলা, কৃষক, স্ত্রী এবং বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার। অস্পৃশ্যতাবর্জন, বিদেশীপণ্য বর্জন, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ইত্যাদির ওপরে এই পালা রচিত। গণের গান নিয়ে প্রায় ২৭ খানা গান ছিল এই পালায়। এই পালাতেই আছে পল্লীর কল্যাণে দেশের শিক্ষিত মানুষরা যাতে নজর দেন তারই জন্য পল্লীর ছাত্ররা মিলিতভাবে গান গেয়ে শিক্ষিত সমাজকে জাগিয়ে রাখছে। এটাই পালার বড় অংশ। এই পালায় মুকুন্দ দাস 'শুলভা' চরিত্রের মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যর কথা বলেছেন। তেমনি বলেছেন ১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধীর লবণ আন্দোলনের কথা।

কর্মক্ষেত্র।। এটি ৪ অঙ্কের পালা। এই পালায় প্রায় ২৫ খানা গান ছিল। এই পালার প্রধান চরিত্র এক বাউল। যে বাউলের মুখ দিয়ে মুকুন্দ দাস বলেছেন, দেশের প্রকৃত কর্মক্ষেত্র হচ্ছে পল্লী। সেখানে আদর্শ গৃহস্থ গড়ে তুলতে হবে। পল্লীর উন্নতির জন্যে গৃহশিল্প যেমন চাই, তেমনি দরকার সমবায় ব্যাঙ্ক—সে কথাও এই পালার মাধ্যমে বলেছেন মুকুন্দ দাস। মেয়েদের বিদেশী পণ্য বর্জনের কথাও বলেছেন। বাস্তবে, এই পালা দেখে মেয়েরা কাঁচের চুড়ি, গলার মালা ইত্যাদি তৎক্ষণাৎ খুলে ফেলেছে। এক জায়গায় জড়ো করে নিজেরাই তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। এই পালাতেই মুকুন্দ দাস 'সর্বাধুনিক' একটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। গার্গী নামের মেয়েটি এই পালার প্রধান চরিত্র 'বাউল'-এর মেয়ে। গার্গী আদর্শ শিক্ষয়িত্রী। যে শিক্ষয়িত্রী ঘরে ঘরে ঘুরে আদর্শ গৃহিণী তৈরি করেছে। এর ভিতর দিয়েই মুকুন্দ দাস দেখাতে চেয়েছেন 'নারী জাগরণ'।

মুকুন্দ দাসের আরও কয়েকটি পালাগানের সন্ধান মেলে ; তার মধ্যে অন্যতম হলো—'দাদা' আর 'জয়-পরাজয়'।

॥ সমাজ বিপ্লবের কাণ্ডারী ॥

মূলত কারাবাসের সময়েই মুকুন্দ দাস উপলব্ধি করেন যে, যাত্রাগান ও অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দেশবাসীর চেতনা জাগ্রত করতে হলে, তাঁকে সর্বাগ্রে সমাজের দিকে নজর দিতে হবে।

মুকুন্দ দাস তাঁর পালার বিষয়বস্তুর মধ্যে যে দিকটাকে প্রকট করেছিলেন তা হলো—Collective Farming. Co-operative Banking System. Cottage Industries ছাড়াও স্বনির্ভরতা, শারীরিক শক্তি অর্জন, অস্পৃশ্যতা ও সাম্প্রদায়িকতা বর্জন ইত্যাদি।

শুধু অভিনয় আর গান নয়, নিজের জীবনের আচরণের মধ্য দিয়েও তাঁর জীবন সত্যকে, উপলব্ধ সত্যকে পালন করে গেছেন। মহাত্মা গান্ধীর হরিজন আন্দোলনের প্রায় পাঁচ বছর আগেই তাঁর মাতৃসমা জ্যেঠাইমার মৃত্যুর পর তিনি বরিশাল শহরের ডোম, মুচি, মেথরদের ঘরে ঘরে গিয়ে জোড় হাতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন জ্যাঠাইমার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আসার জন্যে। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁদের খাইয়েছিলেন।

১৯২১ সালে হুগলীতে কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে মুকুন্দ দাসের দেখা হয়। তখন তিনি কবির অনুমতি নিয়ে তাঁর 'পল্লীসেবা' পালায় যুক্ত করেছিলেন একাধিক গান। তার মধ্যে অন্যতম প্রধান গানটি ছিল—

"জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াত খেলছে জুয়া।"

মুকুন্দ দাসকে সমাজ বিপ্লবের অন্যতম কান্ডারী হিসেবে আমি আখ্যায়িত করেছি, কিন্তু তাঁকে "নব নাট্য আন্দোলন-এর প্রবর্তক" বললেও অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য এ দেশের মানুষই তাঁকে এক সময়ে 'যজ্ঞাগুন্ডা', "কীর্ত্তনা যজ্ঞেশ্বর" বলে ডাকত, পরে সেই মানুষই তাঁকে 'চারণ কবি' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

কাহিনীর প্রয়োজনে অশ্বিনীকুমার দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কাজী নজরুলের গান মুকুন্দ দাস তাঁর পালায় ব্যবহার করেছিলেন।

*   *   *   *

মথুর সাহা থেকে সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায় হয়ে আমরা অনেকটা পথ এসেছি। এই দীর্ঘ ইতিবৃত্তে যাত্রা গানের যে বিবর্তন, সেই বিবর্তনের পথেই বাংলার সাহিত্য ভান্ডারে সঞ্চিত হয়েছে পালা সাহিত্য। আর এই পালা সাহিত্যের মাধ্যমে আজকের 'যাত্রাশিল্প'-এর সমৃদ্ধি। এখানে সেই পালা সাহিত্যিকদের কথা বলি ঃ

॥ অঘোরনাথ কাব্যতীর্থ ॥

সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায় যে পালাকারদের সসম্মানে দলে এনে তাঁদের পালা আসরস্থ করে খ্যাতিমান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অঘোরনাথ কাব্যতীর্থের মোট ৪৩টি পালা জনপ্রিয় হয়েছিল। তাঁর প্রতিটি পালাই ছিল পুরাণ আশ্রিত। কয়েকটি বিশিষ্ট পালা হলো—'অনন্ত মাহাত্ম্য' 'সত্যবতী', 'প্রহ্লাদ চরিত্র'।

১২৭৯ সনে যশোর জেলার নড়াল মহকুমার মল্লিকপুর গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। তিনি কলকাতার চিৎপুরে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী স্কুলের হেড পন্ডিত ছিলেন। পরে মল্লিকপুর বিদ্যানিকেতনে চাকরি করেন। ১৩৪৩ সনে তাঁর মৃত্যু হয়।

অঘোরনাথের পালায় যেমন ছিল ঘটনা প্রবাহ, তেমনি ছিল গানের প্রাধান্য। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি গণের গান, একানে বালকের গান, আদিরসাত্মক দ্বৈত সংগীত, যাত্রা ব্যালে, হাস্যরসের প্রাধান্য, তা ছাড়া আরও কিছু নতুন রসের অবতারণা।

১৮৯৮ সালে 'কল্কি অবতার'। অঘোরনাথের প্রথম লেখা ও যাত্রা দলে প্রথম অভিনীত। পালাটি প্রথম অভিনীত হয় বৌকুন্ডুর দলে। ১৩০৯ সালে 'বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী' থেকে প্রকাশিত হয়।

১৯০৩ সালে, মগধ বিজয়, ১৯০৪-এ দাতাকর্ণ, সমুদ্র মন্থন, ১৯১৪ সালে হরিশ্চন্দ্র রচনা করেন।

১৩২৩ সনে লেখেন 'অনন্ত মাহাত্ম্য'। ১৩৪৩ সনে এই বইটির নবম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল এটিও কম বড় কথা নয়। ১৩২৮ সনে লেখেন 'কুরু পরিণাম'। এই নাটকে ছিল পাঁচটি অঙ্ক।

১৩২৯ সনে অঘোরনাথের "চন্দ্রকেতু" শশীভূষণ হাজরার দলে অভিনীত হয়। পাঁচ অঙ্কের এই পালাটি রাজকৃষ্ণ রায়কে উৎসর্গ করেছিলেন অঘোরনাথ। শশীভূষণের দলের নাম ছিল "সন্তোষপুর শান্তি নাট্য সম্প্রদায়"। 'মেবারকুমারী' নামে ঐতিহাসিক নাটকটি ১৩৩০ সনে উপহার দেন। "Annals of Mewar" থেকে নেওয়া কাহিনী। ১৩৩২ সালে ভূষণ দাসের দলে অভিনীত হয় অঘোরনাথের "প্রতিজ্ঞাপালন।" এই পালায় প্রায় ৩৫ খানা গানও লিখেছিলেন তিনি। ১৩৩৩ সনে বীণাপাণি যাত্রা পার্টীতে অভিনীত হয়। এই পালায় অঘোরনাথ যাত্রাব্যালের প্রবর্তন করেন। ১৩৩৬ সনে অঘোরনাথের 'মাতাশ্বমেধ' পালাটিও শশীভূষণ হাজরার দলে অভিনীত হয়েছিল। ১৩৪৩ সনে ভোলানাথ অপেরায় এই পালা অভিনীত হয়। এ ছাড়াও অঘোরনাথের আরও জনপ্রিয় পালা ছিল। যেমন ঃ

অভিমন্যু বধের কাহিনী অবলম্বনে ঃ সপ্তরথী।

সুরথ রাজার দুর্গোৎসব অবলম্বনে ঃ লক্ষবলী।

মনসা মঙ্গলের কাহিনী ভিত্তি করে ঃ বেহুলা, সমুদ্র মন্থন।

এ ছাড়া কংস বধ, রাবণ বধ, 'শ্রীবৎস', বিজয়-বসন্ত অবলম্বনে 'সৎমা', 'অদৃষ্ট', 'চিত্রাঙ্গদা', 'তরণীর যুদ্ধ', 'নহুস উদ্ধার', 'নল-দময়ন্তী', প্রহ্লাদ ইত্যাদি!

ইদানিং জনপ্রিয় পালাকারদের মধ্যে পুরনো জিনিস নতুন করে চালাবার, অর্থাৎ নতুন বোতলে পুরাতন সুরা বিতরণ করার প্রবল প্রবণতা দেখা দিয়েছে। হয় নিজেরা নিজেদেরই কোন জনপ্রিয় পালা চাহিদায় যোগান দিয়ে যাবার জন্য নাম বদলে চালিয়ে দেন, নতুবা অতীতের পালা সাগর থেকে পালারত্ন তুলে এনে নিজের মত করে নিজের নামে বাজারে বিকোন। অর্থনৈতিক চাহিদা বা বিলাস-প্রাচুর্য্যের স্বাদ পূরণ করতে গিয়ে আজকের পালাকারদের মৌলিক রচনার নজির মেলে কম। অথচ এক সময়ে বিষয় নির্বাচন করে নতুন নতুন মৌলিক পালা রচনা এবং পালার ভিতর দিয়ে নব চেতনার প্রসার ঘটাবার প্রবণতাই বেশি ছিল। বর্তমানে এই চরম ব্যস্ততার কালে একজন পালাকার অনায়াসে ন' থেকে দশ খানা পালা লিখে দেবার অর্ডার নেন। কিন্তু অতীতের কোন পালাকারই যত জনপ্রিয়ই হোন, বছরে এক থেকে বড় জোর দুটির বেশি পালা লেখার চেষ্টা করেননি। এক মরশুমে দু'য়ের বেশি পালা লেখাকে তাঁরা খ্যাতির বিড়ম্বনা মনে করতেন। এর ফলে ভান্ডার পূর্ণ হয়েছে নব রত্নে।

অঘোরনাথের পালার বৈশিষ্ট্য ছিল অনেক। তিনি তাঁর পালায় গণের গান, একানে বালকের গান, যাত্রা ব্যালে, আদি রসাত্মক দ্বৈত সংগীত, হাস্যরস সৃষ্টির জন্য বিষয়ের সঙ্গে যোগ নেই এমন চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। দীর্ঘ সংলাপ ছিল অঘোরনাথের পালায়। পালায় কীর্তনাঙ্গের গানও প্রয়োগ করেছেন। দ্বৈত সংগীত গাইবার জন্য ঝাড়ুদার, ঝাড়ুদারনি, ঘেসেড়া-ঘেসেড়ানি এনে দর্শক মন মাতিয়েছেন অঘোরনাথ।

॥ এবার ভোলানাথ রায়ের কথা বলি ॥

ভোলানাথ রায় কাব্যশাস্ত্রী। ১২৯৭ সনে ভোলানাথ রায় বর্ধমান জেলার রায়ান গ্রামে জন্মান। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ফেল করে ভোলানাথ বয়ে যাননি, পল্লীর নানা জনকল্যাণমূলক কাজে নিজেকে সম্পূর্ণ জড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই সময়ে তাঁর চারদিকে যে ভাবে পালাগান আর শহরে থিয়েটার চর্চা শুরু হয়েছিল তার নাগপাশ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা অনেকের পক্ষেই সম্ভব ছিল না। ভোলানাথের ক্ষেত্রেও কথাটা সত্য হয়ে গেল। যেখানে যাত্রা ভোলানাথ ছুটে যেতেন সেখানে। এরই ফলশ্রুতি, ভোলানাথ এক সময়ে কলম তুলে নিলেন। পালা লেখায় মন দিলেন। ১৩২৫ সন অর্থাৎ ১৯১৮ সালের মধ্যেই নাট্য রচনার নৈপুণ্যের জন্য নবদ্বীপ থেকে তাঁকে "কাব্যশাস্ত্রী" ও "ভারতী" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এই মানপত্রে সেদিন যাঁদের স্বাক্ষর উজ্জ্বল হয়ে ছিল, তাঁরা হলেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারের সম্পাদক, অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। ভারতী পত্রিকার সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

ভোলানাথ যাত্রানাট্য রচনায় অনেক নতুন ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। ভোলানাথের আগে যাত্রায় আদিরসাত্মক দ্বৈত সংগীত পরিবেশনের জন্য যেমন বিচিত্র কিছু চরিত্র সৃষ্টি করা হতো, ভোলানাথ তা বর্জন করলেন। ভোলানাথ এমন কিছু চরিত্র সৃষ্টি করলেন যার সঙ্গে বিষয়ের যোগ থাকত। হাস্যরস পরিবেশনায় ভোলানাথ সুস্থ ও সৎ মানসিকতার পরিচয় দিলেন। ভোলানাথের বড় কীর্তি হলো, তিনি নাটকে যে সমস্যার কথা আনতেন তার সমাধানের পথটিও রচনা করতেন।

ভোলানাথের পালায় যত গান থাকত তার অধিকাংশ গানের মধ্যেই স্বাদেশীকতা প্রকাশ পেত। এই স্বাদেশীকতা একটু প্রকট ভাবে ফুটে উঠেছিল তাঁর "জরাসন্ধ" পালায়। এর ফলে ইংরেজ সরকার সেই পালা বাজেয়াপ্ত করেছিল। পরে অবশ্য সংশোধন করার শর্তে পালাটি ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী পরে পুরোপুরি ভাবে থিয়েটারের নাটক লিখতে থাকেন। তাঁর প্রথম নাটক "বামনাবতার" মিনার্ভায় হয়েছিল। নির্দেশক ছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি অভিনয়ও করেছিলেন। তাঁর লেখা আরও কিছু নাটকের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, জাহ্নবী, গঙ্গাবতরণ, ধর্মদ্বন্দ্ব, বৃত্রসংহার। ১৩৩৯ সনে ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর মৃত্যু হয়।

ভোলানাথবাবু তাঁর প্রথম পালা 'কুবলাশ্ব' প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ "সহৃদয় সুধীগণ এই আমার প্রথম উদ্যম—"। ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর 'পৃথিবী' গণেশ অপেরা পার্টীতে প্রথম হয়েছিল তা আগেই বলেছি। কিন্তু এই নাটকটিকে কেন্দ্র করে তিনি যে ইতিহাস রচনা করে গেছেন তা আজকের কেউ হয়তো জানেন না। কী সেই ইতিহাস?

সংবাদপত্রে যাত্রার খবর প্রকাশ আজ আর নতুন কথা নয়, কিন্তু এর প্রবর্তক বোধ করি ভেলানাথ রায় স্বয়ং। গণেশ অপেরা পার্টীতে যখন 'পৃথিবী' অভিনীত হয় তখন ভোলানাথবাবুর পরামর্শে কলকাতার রঙ্গমঞ্চ ভাড়া করে সংবাদপত্রের সম্পাদকদের ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাটক দেখাবার ব্যবস্থা হয়। এই হলো যাত্রার প্রথম প্রিমিয়ার শো বা প্রেস শো!

সম্প্রতি সব দলই প্রায় কলকাতার বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে নতুন যাত্রা পালা উদ্বোধন করে, এমন কি একাধিক শো করে তারপর বায়নার তারিখ অনুসারে ছড়িয়ে পড়ে আসরে আসরে। ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী তার বীজ বপন করেছিলেন। মনমোহন থিয়েটারে 'পৃথিবী'র প্রিমিয়ার শো বা প্রেস শো করে, জনগণের কাছে কাগজের মাধ্যমে পালার প্রচার পৌঁছে দেবার পরই গণেশ অপেরা পার্টীকে আসরে আসরে পাঠিয়েছিলেন।

সেদিনের সেই প্রেস শো-এর খবর প্রকাশিত হয়েছিল অমৃতবাজার পত্রিকায়, ১৯১৭ সালের ১৮ অক্টোবর। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। সেই সংবাদটি ছিল এই রকম ঃ

"Last Tuesday at 5 p.m. the Ganesh Opera Party held a performance of the Grand Mythological Five-act Drama by Babu Bholanath Roy called the "Prithivi" on the Stage of Monomohon Theatre, which was filled up with the highest number of enthusiastic audience—"

পঞ্চনদ।। ভোলানাথ রায়ের এই পালাটিও মনমোহন থিয়েটারে উদ্বোধন হয়। ১৯১৮ সালে। ১৩২৫ সনের ১৬ আশ্বিন। বৃহস্পতিবার।

আদিশূর।। এটিও ১৩২৮ সনে ১৮ আশ্বিন মনমোহনে উদ্বোধন হয়।

দানযজ্ঞ।। **ধর্মযজ্ঞ**।। এই পালা মনমোহনে উদ্বোধন হয় ১৩৩০ সনের ২৪ আশ্বিন।

দাক্ষিণাত্য।। ১৯২৬ সালের পালা।

কৈকেয়ী।। এটিও গণেশ অপেরা পার্টীতে অভিনীত। এটিও প্রথম শো হয় ১৩৩৩ সনের ২০ আশ্বিন, নাট্যমন্দিরে। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী তখন নাট্যমন্দিরের সর্বময় অধিকর্তা।

যজ্ঞাহুতি।। এটি গণেশ অপেরা পার্টীতে অভিনীত। 'নরকাসুর', 'জরাসন্ধ', ও 'বজ্রসৃষ্টি অজাতশত্রু', 'প্রিয়ব্রত', ইত্যাদি নাটকগুলিও ভোলানাথের লেখা। ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী ১৯২৩ সালে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী অবলম্বনে রচনা করেছিলেন "প্রাণে প্রাণে"।

॥ পশুপতি চট্টোপাধ্যায় ॥

প্রখ্যাত পালাকার হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে পশুপতি চট্টোপাধ্যায় হাওড়া জেলার কল্যাণপুরে ১৩০২ সনে জন্মেছিলেন। স্কুলের ছাত্র থাকার সময় থেকেই তাঁর যাত্রার ওপরে বিশেষ প্রীতি। ঐ বয়সেই তিনি যাত্রার দল পরিচালনা করতে থাকেন। সেই সঙ্গে লিখতে থাকেন যাত্রা নাটক। ১৩১৯ সনে অর্থাৎ মাত্র ১৭ বছর বয়সে পশুপতি লেখেন রামায়ণ থেকে আহরণ করা রাবণবধ পর্বাশ্রিত 'অকালবোধন' পালা। পালাটি সাঁতরা এন্ড কোম্পানি আসরস্থ করেছিল। তাঁর পরিচালিত প্রথম যাত্রা দল গৌরাঙ্গ অপেরা। দল চালনার কাজ বেশিদিন করতে পারেননি, পালা রচয়িতা হিসেবে নাম ডাক হবার জন্য। তাঁর অধিকাংশ পালাই পৌরাণিক। তিনি যদিও তাঁর পালায় যুগ চাহিদা মেটাবার জন্য ব্যালে, আদিরসাত্মক দ্বৈত সংগীত ব্যবহার করতেন, তিনি গানের প্রাধান্য দিতেন খুবই কম। পালাকার পশুপতি চট্টোপাধ্যায়কে ১৯৬৫ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাসে ৫০ টাকা পেনসান্ দিত। পশুপতিবাবুর লেখা একাধিক পালার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো, বিজয় বসন্ত, সতী, লায়লা মজনু, বাংলার বিপ্লবী ছেলে ক্ষুদিরাম, কংস, তাপসকুমারী, রক্ত গঙ্গা, শৈশব সাধনা, অভিশপ্ত সিংহাসন।

বিজয় বসন্ত।। প্রচলিত কাহিনী অবলম্বন করা। ৫ অঙ্কের এই পালাটি ষষ্ঠী অপেরা আসরস্থ করে। পালাটির পাঠক সংখ্যাও কম ছিল না, কারণ এর ৫টি সংস্করণ ছাপা হয়েছিল।

সতী।। ১৩৫০ সনে ভাগবতের ৯ম স্কন্ধের ১০ম অধ্যায়ের কাহিনী নিয়ে লেখা। এতে গণের গান ব্যবহার করা হয়েছিল পালার সূচনায়। এই পালায় পশুপতিবাবু সতু, কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা দশ মহাবিদ্যার আবির্ভাবরূপ এবং স্তব ব্যবহার করে সর্বাধুনিক মানের পরিচয় দিয়েছিলেন। পালাটি শ্রীগৌরাঙ্গ অপেরা প্রযোজনা করেছিল।

লায়লা মজনু।। ১৩৫৫ সনে লায়লা মজনুর চিরন্তন প্রেম অবলম্বন করে লেখা হয়। এই পালাটিও শ্রীগৌরাঙ্গ অপেরা আসরস্থ করে।

বাঙ্গলার বিপ্লবী ছেলে ক্ষুদিরাম।। ১৩৫৬ সনে লিখেছিলেন পশুপতিবাবু। ৫ অঙ্কের এই যাত্রা নাটকে বিধৃত হয়েছিল 'কিংসফোর্ড হত্যা'র চেষ্টা।

॥ ভবতারণ চট্টোপাধ্যায় ॥

বর্ধমান জেলার পিপলং-এর এই মানুষটি পালাকার হিসেবে খুবই পরিচিতি পেয়েছিলেন।

তাঁর লেখা 'অজামিল উদ্ধার', 'রুক্মিণীহরণ', 'দেবব্রত', 'দুষ্মন্তকীর্তি', 'শ্রীকৃষ্ণের শাকান্ন ভোজন' ইত্যাদি পালা উল্লেখযোগ্য। তাঁর অধিকাংশ পালা শ্রীচরণ ভাণ্ডারী আসরস্থ করেন।

॥ পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় ॥

বাঁকুড়া জেলার সোনামুখীর মানুষ ইনি। অল্প বয়স থেকে তাঁর নাট্য প্রীতি। নাট্য রচনায় মনমোহন বসুর কাছে তাঁর দীক্ষা। ইনি পৌরাণিক, ভক্তিমূলক এবং ঐতিহাসিক নাটকে খুবই খ্যাতিমান ছিলেন। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি প্রধানতঃ হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী প্রচার করেছিল। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অনেক নাটক তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

পাঁচকড়িবাবুর 'শিবশক্তি' ৫ অঙ্কের পৌরাণিক। ব্যাসদেব মহাভারতের বনপর্বের ১৬৭-১৭৪ অধ্যায় থেকে নেওয়া এর কাহিনী। 'দ্বিজদস্যু' পালাটিও ৫ অঙ্কের পৌরাণিক। এর কাহিনী ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের ষষ্ঠী অধ্যায় থেকে নেওয়া। ১৩৩২ সনে পাঁচকড়িবাবুর লেখা 'জয়মাল্য', এটিও পৌরাণিক। 'নটীর অভিশাপ' এই পালাটিও পৌরাণিক। দুটি পালাই কাশীরাম দাসের মহাভারত থেকে সংগৃহীত। ১৩৩৭ সনে লেখা এই পালাকারের 'চাঁদ সদাগর' শশীভূষণ হাজরার শান্তি অপেরায় অভিনীত হয়। পালাটি ভক্তিমূলক। পাঁচকড়িবাবুর ঐতিহাসিক পালার নাম 'ধর্মপথ'। পালাটি সুরেন্দ্রনাথ সাহার দলে অভিনীত হয়। এই পালাকারের বিখ্যাত ঐতিহাসিক পালার নাম 'টিপু সুলতান'। এ ছাড়া ভান্ডারী অপেরা অভিনীত 'সপ্তরথী', শ্রীগৌরাঙ্গ আদর্শ যাত্রা সঙ্ঘ অভিনীত 'শম্বরাসুর', বীণাপাণি নাট্য সমাজ, শশীভূষণ হাজরার শান্তি অপেরা অভিনীত পালাগুলি হলো যথাক্রমে 'মানিনী সত্যভামা', 'ফুল্লরা কালকেতু', সত্যম্বর অপেরা অভিনীত 'রামপ্রসাদ', 'বেইমানের দেশ', 'ভাস্কর পন্ডিত', বীণাপাণি নাট্যসমাজ অভিনীত 'রাখীবন্ধন' খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

॥ কানাইলাল শীল ॥

১৮৯১ সালে কানাইলালের জন্ম হয় উত্তর কলকাতায়। কানাইলাল শীল ছিলেন একজন প্রকাশক। বই ছাপা এবং বই বিক্রি কানাইলালকে বিভিন্ন বিষয় প্রসঙ্গে যেমন কৌতূহলী করে তোলে, তেমনি নানা বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করার আকাঙ্খা বৃদ্ধি পায়। এরই ফলশ্রুতি, কানাইলাল অল্পদিনের মধ্যে পালাকার হিসেবে খ্যাতিমান হন। কানাই শীল আজ নেই, তবুও তাঁর খ্যাতি আজও যাত্রাপাড়ায় অম্লান। পুস্তক ব্যবসায়ের মাধ্যমে কানাইবাবুর জীবন শুরু, পরে তিনি নাট্যকার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেই জনপ্রিয় নাট্যকার হয়ে ওঠেন। কলকাতার ছেলে কানাইলাল পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক নাট্যরচনার ক্ষেত্রে সমান দক্ষতা দেখান। ১৯৩৬ সালে রয়েল বীণাপাণি অপেরা ও বিলগাঁও নট্ট কোম্পানির পক্ষ থেকে কানাই শীলের প্রথম নাটক 'নিয়তি' আসরস্থ হয়। এরপর বীরপূজা, ব্রহ্মতেজ, দলমাদল, দেশের দাবী, মুক্তির মন্ত্র, মুক্তিতীর্থ, অমরাবতী, রামরাজ্য, চক্রী ইত্যাদি নাটকগুলি জনপ্রিয়তা এনে দেয়।

নাট্য রচনার ক্ষেত্রে কানাই শীলের যে জনপ্রিয়তা তা শুধু যাত্রার আসরেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, রূপালী পর্দাতেও ফুটে উঠেছিল তাঁর স্বীকৃতি।

আই. এন. এ পিকচার্স তাঁর 'মুক্তির মন্ত্র' নাটকটিকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেছিলেন।

কানাইলাল শীলের পালার তালিকা : 'নিয়তি', পালাকারের প্রথম পাঁচ অঙ্কের পৌরাণিক পালা। শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায় থেকে আহরণ করা বিষয়ের ভিত্তিতে লেখা।

বীর পূজা : পালাটি ১৩৪২ সনে প্রকাশিত হয়। ৫ অঙ্কের ধর্মমূলক পালা। এই পালার কয়েকটি বিশেষ চরিত্র হলো, কর্ণসেন, কালু ডোম, মহানন্দ, যমুনা ইত্যাদি। **ব্রহ্মতেজ :** ১৩৪৭ সনের পালা। বাল্মিকী রামায়ণের বালখন্ড থেকে নেওয়া এর মূল কাহিনী। **দলমাদল :** বর্গী আক্রমণের পটভূমিকা। ৫ অঙ্কের ঐতিহাসিক পালা। **দেশের দাবী :** ৫ অঙ্কের সামাজিক পালা।

শোষণ ও অত্যাচার, কালোবাজারি ও মুনাফার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এই পালার অন্যতম প্রধান চরিত্র 'সমীর' যে স্বামী যোগানন্দের আশ্রমের একজন সভ্য, পল্লীর যুবক। জনগণকে বিশেষ করে যাঁরা শোষিত তাঁদের পক্ষে দাঁড়িয়ে জমিদারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবী জানাবার সংগ্রামী চরিত্র।

মুক্তির মন্ত্র ঃ ঐতিহাসিক পালা। প্রায় ২০টি গান। কীভাবে দস্যু হাম্বীর স্বীয় শক্তিবলে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেছিলেন, পরে তিনি কতটা বিষ্ণুভক্ত হন এই হলো পালার পটভূমি।

এই পালার কাহিনী কিছু রদবদল করে আই. এন. এ. পিকচার্সের পক্ষ থেকে চলচ্চিত্রায়িত হয়।

মুক্তি তীর্থ ঃ ভক্তিমূলক পালা। এ ছাড়া কানাই শীলের লেখা অমরাবতী, রামরাজ্য, চক্রী ইত্যাদি পৌরাণিক এবং ধাত্রী পান্না নামের ঐতিহাসিক পালা খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

॥ কুঞ্জবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় ॥

কুঞ্জবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় প্রসঙ্গে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে ১২৮২ সনে তিনি হাওড়া জেলার পাঁচলা বাসুদেবপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। কিছু পৌরাণিক পালা লিখে কুঞ্জবিহারী খ্যাতি পেয়েছিলেন। তাঁর একটি পৌরাণিক পালায় স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল। এই পালাটির জন্য ইংরেজ সরকারের শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল তাঁকে।

কুঞ্জবিহারীর 'মাতৃপূজা' ১৯০৮ সালে ভূষণ দাসের দলে অভিনীত হয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণের শ্রীশ্রীচণ্ডী থেকে এই পালার কাহিনী। এই পালাতেও ইংরেজ সরকারের শ্যেন দৃষ্টি পড়েছিল।

পালাকার এই পালার ভূমিকায় বলেছেন—"প্রকৃতির মর্যাদা অক্ষুন্ন না থাকিলে রাজ্যে নীতি বিরোধ ও প্রজা পীড়ন হয়। ফলে প্রজাগণের মানসিক শক্তির তিরোধান ঘটে।...রাজশক্তির সহিত প্রজাশক্তির বিরোধ ঘটে"।

এই পালার অভিনয় চলাকালীন ইংরেজ সরকার শুধু অভিনয় বন্ধ করেনি, প্রকাশিত বই বাজেয়াপ্ত করেছিল। এই কারণেই কুঞ্জবিহারীকে কিছুকাল বর্ধমানে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হয়েছিল। এই পালায় প্রায় ৪৫ খানা গান ছিল। যাত্রাব্যালে ছিল।

তরণীসেন। ১৯২১ সালে পালাটি লিখিত ও অভিনীত হয়। পালার কাহিনী কৃত্তিবাসী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড থেকে নেওয়া।

এই সময়ে যাত্রাগান থেকে জুড়ির গান প্রায় বিলুপ্ত হচ্ছিল দেখে কুঞ্জবিহারী পালার শেষে জুড়ির গান প্রায় ১৮টি রেখেছিলেন।

প্রতিজ্ঞাপালন।। পালাকার ভূমিকায় লিখেছিলেন—'ইহার ঘটনা কাল সন্ধ্যা হইতে পরদিন অপরাহ্ণ পর্যন্ত—" পাঁচ অঙ্কের পালা। কাশীরাম বিরচিত মহাভারতের 'দ্রোণপর্ব' থেকে নেওয়া। পালাটি কবি নবীনচন্দ্র সেনকে উৎসর্গ করেছিলেন। এতে প্রায় ৪৫টি গান ছিল। এতে কুঞ্জবিহারী বিবেক এনেছিলেন এবং ব্যালে ছিল। বিবেকের নাম 'ভ্রান্তি'। দুর্যোধনকে লক্ষ্য করে ভ্রান্তি গাইল—

"এই পথে এস, কোনো কষ্ট নাই,
বড়ই সরস পথ!
বিলম্ব করো না—চল শীঘ্র,
পূর্ণ কর মনোরথ।..."

পালাটি শশীভূষণ হাজরার দলে খ্যাতির সঙ্গে অভিনীত হয়। কুঞ্জবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় ১৩৫৭ সনে মারা যান।

॥ কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

১২৮৬ সনে চব্বিশ পরগণা জেলার ধেমুয়া গ্রামে কেশবচন্দ্রের জন্ম। কেশবচন্দ্র প্রথম জীবনে ইষ্টার্ন রেলের কর্মী ছিলেন। চাকরিতে থাকার সময়েই কেশবচন্দ্র প্রথম লেখেন পৌরাণিক পালা

'জড় ভরত'। সেটা ১৯০২ সালের কথা। এরপর কেশবচন্দ্র লেখেন 'মহিষাসুর বধ' 'রাণা প্রতাপ'। 'মহিষাসুর বধ' পালাটি বই আকারে প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়ের দলে অভিনীত হয়েছিল। ইংজের সরকারের বিরোধী মনোভাবের নাটক বলে ১৯১০ সালে 'রাণা প্রতাপ' নাটকটিকে ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল। বাজেয়াপ্ত হবার আগে পালাটি অভিনীত হয়েছিল কয়েকটি আসরে।

১৯১২ সালে কেশবচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

কেশবচন্দ্রের লেখা আরও কিছু পালা জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। "সভার যজ্ঞ" পালাটি প্রকাশিত হয়েছিল পালাকারের মৃত্যুর পর। এই সালেই 'সপ্তর্ষি সৃজনে' পালার ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দুটি পালাই সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়ের দলে আসরস্থ হয়েছিল।

কেশবচন্দ্রের পালায় প্রাধান্য পেত, যাত্রাব্যালে, গণের গান, জুড়ির গান। সংলাপ দীর্ঘ হতো। পালার শেষেও দর্শক ও শ্রোতাদের চাহিদার জন্য কয়েকটি গান গেয়ে শোনাবার ব্যবস্থা হতো। অঘোরনাথের মত ইনিও দ্বৈত সংগীত পালায় রাখতেন, এই শিল্পীদ্বয় আদিরসাত্মক গান গাইত।

কেশবচন্দ্রের 'সপ্তর্ষিসৃজন' পালাটি সেবার সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়ের দলে অভিনীত হচ্ছিল, তখন একদিন মহাকবি গিরীশচন্দ্র ঘোষ একটি আসরে বসে সেই পালা দেখে খুশি হন এবং পালাকারকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন! কেশবচন্দ্রের লেখা পালাগুলির বিষয় নির্বাচনে ছিল মুন্সিয়ানা।

সাগর-যজ্ঞ ঃ নবদ্বীপ বঙ্গনাট্য সমাজে অভিনীত হয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ড থেকে বিষয় নির্বাচন করেন।

সপ্তর্ষি সৃজন ঃ এই পালাটিও নবদ্বীপ বঙ্গনাট্য সমাজে হয়েছিল। বাল্মিকী রামায়ণের আদিকান্ডের ৫৭তম ও ৬০তম অধ্যায় থেকে আহরণ করা এর বিষয়। * পরবর্তীকালের সত্যম্বর অপেরার কর্ণধার গৌর দাস এই পালায় অভিনয় করেছিলেন।

॥ ঠাকুরদাস দত্ত ॥

ঠাকুরদাস পালাকার ছিলেন বটে কিন্তু পরে নিজে যাত্রার দলও তৈরি করেছিলেন। ঠাকুরদাস দত্ত হাওড়া জেলার ব্যাঁটরায় ১২০৮ সনে জন্মগ্রহণ করেন। লেখাপড়া শিখেছিলেন। চাকরিও পেয়েছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অফিসে। চাকরি করাকালীন তিনি বেশ কিছু পালাগান লিখেছিলেন। যে পালাগান কালী হালদারের দলে অভিনীত হয়েছিল। চাকরি বেশিদিন করেননি। চাকরি ছেড়ে যাত্রার দল তৈরি করেছিলেন। এই যাত্রার দলও তিনি বছর কয়েক চালিয়ে বন্ধ করে দিয়ে পাঁচালির দল তৈরি করেছিলেন। ১৮৭৬ সালে ঠাকুরদাস মারা যান। জানা যায় ঠাকুরদাস দুর্গাচরণ ঘড়িয়ালের দলে, ঝড়ু দাস এমন কি বোকোর দলেও পালা লিখে দিয়েছিলেন। তাঁর লেখা 'লক্ষ্মণ বর্জন', 'রাবণ বধ', 'রামচন্দ্রের দেশাগমন' পালা খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর', 'হরিশ্চন্দ্র', 'শ্রীবৎস চিন্তা', 'কলঙ্ক ভঞ্জন' পালাগান বা গীতাভিনয়ও খ্যাতি পেয়েছিল। গান রচনাতেও পারদর্শী ছিলেন।

॥ নিতাইপদ চট্টোপাধ্যায় ॥

পালাকার নিতাইপদ চট্টোপাধ্যায় বর্ধমান জেলার সাহানুই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নিতাইপদ ছিলেন প্রধানত অভিনেতা। তিনি শশীভূষণ অধিকারীর গ্র্যাণ্ড অপেরা পার্টিতে অভিনয় করতেন। কিছুদিনের মধ্যে তিনি অভিনয় জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে পালা রচনায় মন দেন। ভক্তিমূলক পৌরাণিক পালায় খুব অল্পদিনের মধ্যে খ্যাতি পান। তিনি আদি রসাশ্রয়ী দ্বৈত গীতি, গণের গান, একানের বালকের গান, কিছু কিছু পালায় জুড়ির গান রেখেছিলেন। তাঁর পালায় পদ্য

সংলাপের সঙ্গে গদ্য সংলাপও ছিল। তাঁর অনেক পালায় ঘটনার বাইরে নিছক হাস্যরস পরিবেশনের জন্য কিছু চরিত্র থাকত।

নিতাইপদ চট্টোপাধ্যায় ১৯২৪ সালে লেখেন **'শ্মশানে মিলন'**। মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী। পাঁচ অঙ্কের এই পালা 'মহাকালী সংগীত সমাজ' ও 'বালক সংগীত সমাজ' করেছিল। প্রায় ৩২ খানা গান ছিল পালায়!

শ্রীবৎস চিন্তা। কাশীরাম দাসের মহাভারতের শ্রীবৎস'র যুদ্ধ এবং শ্রীবৎসের পরাজয়। এই পালা গদাধর ভট্টাচার্যের দলে অভিনীত। পালাকার নিতাইপদ চট্টোপাধ্যায়ের পরবর্তী পালা **'অঞ্জা দেবী'** এবং **'শৈশব সাধনা'**। ১৯২৬ সালে এই দুটি পালার মধ্যে 'শৈশব সাধনা' অভিনীত হয় সত্যম্বর অপেরা এবং 'নবদ্বীপ বঙ্গ-নাট্য সমাজ'-এর আসরে। শৈশব সাধনা, বিষ্ণুপুরাণ থেকে সংগ্রহ করা কাহিনীর পালা আর 'অঞ্জা দেবী' কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে নেওয়া।

সপ্তমাবতার। ১৯২৭ সালে সত্যম্বর অপেরা এবং বিলগাঁ নট্ট কোম্পানিতে অভিনীত হয়। পৌরাণিক পালা। এই পালায় যাত্রা ব্যালে, গণের গান, জেলে-জেলেনির দ্বৈত গান ছিল। ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত এই পালাকারের 'অন্নপূর্ণা', হরিবংশের অন্তর্গত হরিবংশ পর্বের ২৯ অধ্যায় থেকে নেওয়া কাহিনীর পালারূপ। উমানাথ ঘোষালের দলে অভিনীত।

॥ পঙ্কজভূষণ কবিরত্ন ॥

পঙ্কজভূষণ আসলে ফণিভূষণ রায়। যদিও ১৮৮৭ সালে কলকাতার হাতিবাগানে মামা বাড়িতে জন্মান, তবুও তাঁর আদি বাড়ি ছিল বর্ধমান জেলার দিকপাড়া গ্রামে। পঙ্কজভূষণ ছদ্মনাম ধারণ করে যৌবনের প্রথম সন্ধিক্ষণ থেকে জীবনের অনেকগুলি বছর খ্যাতির সঙ্গে যাত্রার আসরে অভিনয় করেছেন, পালা রচনা করেছেন সমান তালে। কিম্বদন্তী নায়ক উত্তমকুমার অভিনয় শিক্ষক হিসেবে পঙ্কজবাবুর কাছে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও অভিনয়ে তালিম নেন ও এক সঙ্গে অভিনয় করেন। তার বিস্তারিত বিবরণ আমার চলচ্চিত্র ইতিহাস 'সোনার দাগ'-এ বলা হয়েছে। ফণিবাবু রয়েল বীণাপাণি অপেরায় পেশাদার অভিনেতা হিসেবে যোগদান করেছিলেন। ১৯৫৪ সালে কালীঘাটে তাঁর মৃত্যু হয়।

তিলোত্তমা।। ১৯৩৪ সালে মহাভারতের আদিপর্ব থেকে বিষয় সুধা আহরণ করে এই পালা রচনা করেছিলেন। পালাটি ভোলানাথ অপেরায় অভিনীত হয়।

মুক্তবাণ।। বাংলায় রূপান্তরিত বিষ্ণুপুরাণ থেকে এর কাহিনী নেওয়া হয়।

এই যাত্রানাটকটি তদানীন্তন তরুণ অপেরায় আসরস্থ হয়েছিল। এই পালায় অত্যাচারী সম্রাট বাণের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো তেজস্বিনী দৈত্যকন্যা উষার চরিত্র আঁকা হয়েছিল।

মহামানব।। এই পালাটিও আসরস্থ করেছিল রয়েল বীণাপাণি। কাশীরাম দাসের মহাভারতের বন পর্বের কাহিনী থেকে নেওয়া ৫ অঙ্কের পালা। এই পালার ভূমিকায় পঙ্কজভূষণ লিখেছিলেন ঃ "মানব যখন ধর্মে, রাজনীতিতে, ন্যায়-দর্শনে, বর্ণাশ্রমে, সর্ববিষয়ে আদর্শ হইয়া উঠেন তখনই তিনি নররূপী নারায়ণ বা মহামানব"।

শান্তনু।। পৌরাণিক পালা। কাশীদাসী মহাভারতের আদিপর্ব থেকে নেওয়া। রয়েল বীণাপাণি অপেরায় অভিনীত।

রক্তাঞ্জলি।। কৃত্তিবাসী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড থেকে সংগ্রহ করা ৫ অঙ্কের যাত্রাপালা। পালাটি তরুণ অপেরা আসরস্থ করেছিল। এ ছাড়া এই পালাকারের 'তিলোত্তমা' ভোলানাথ অপেরা আসরস্থ করে। রয়েল বীণাপাণি আসরস্থ করে 'নারী ঋষি', 'রাণীভবানী', 'দুর্গোৎসবে সমাধি'। নাট্যবীথি যাত্রাপার্টির জন্য 'কৃষ্ণ ভারতী' রচনা করেন।

॥ ভূপতিচরণ স্মৃতিতীর্থ ॥

এই পালাকার দস্যু রত্নাকরের মহাকবিতে রূপান্তর বিষয় নিয়ে প্রথম রচনা করেন 'রত্নাকর'। এই পালাটি সতীশ মুখার্জী তাঁর দলে আসরস্থ করে খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। এ ছাড়া তাঁর 'রাজশ্রী' এবং আর কিছু পালা খ্যাতির সঙ্গে অভিনীত হয় সতীশ মুখার্জীর দলে। ভূপতিচরণের আর একটা স্মরণীয় পালাসৃষ্টি 'তুলসীদাস'।

॥ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ॥

মন্মথবাবু সর্বত্র নামের পাশে লিখতেন বি. এ.। তদানীন্তন সময়ে গ্রাজুয়েট পালাকার বিশেষ ছিলেন না বলেই এটা প্রচার করা হতো। হুগলী জেলার সোমড়ার অধিবাসী ইনি। 'দক্ষিণা' ও 'ভদ্রাপরিণয়' এই দুটি পালা খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। 'দক্ষিণা' আসরস্থ করেছিল বীণাপাণি নাট্য সমাজ।

॥ রাইচরণ সরকার (কবিরঞ্জন) ॥

বরিশালের হয়বতপুরে এক অভিজাত পরিবারের রাইচরণ সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. পাশ করে শিক্ষকতা করতেন। অল্প বয়স থেকেই যাত্রাপালা রচনায় মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছিলেন। এক সময়ে রাইচরণকে এ দেশের পণ্ডিত সমাজ 'কবিরঞ্জন' উপাধি দিয়েছিলেন। রাইচরণ সরকারের পালারচনায় খ্যাতি আসার মূলে ছিল সমসাময়িক আন্দোলন। ছোট সংলাপ রচনায় তিনি নতুন ভাবনার পরিচয় দিয়েছিলেন।

১৯১৫ সালে তাঁর প্রথম পালা 'যোগবল' সকলের প্রশংসা পায়। মেহের কালীবাড়ির সর্বানন্দ ঠাকুরের জীবন, কর্ম ও সাধনার ওপর এই পালা লেখা হয়। ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক আশুতোষ ঘোষ এই পালাটি সংশোধন করে দিয়েছিলেন। রাইচরণ সরকারের বেশ কিছু ছাত্র মাষ্টারমশায়ের এই পালা বই আকারে প্রকাশ করার জন্য চাঁদা তুলে টাকা সাহায্য করেছিলেন।

রাইচরণের দ্বিতীয় পালা 'গন্ধেশ্বরী' ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয়। পালাটি শশী হাজরার দলে প্রথম অভিনীত হয়। এটি পৌরাণিক পালা। মহানন্দীকেশ্বর পুরাণের গন্ধাসুর বধ কাহিনী ছিল এই ৫ অঙ্কের উপজীব্য। এই নাটকে রাইচরণ তাঁর সৃষ্ট অর্চি চরিত্রের মুখ দিয়ে সংস্কৃত স্তব আবৃত্তি করিয়েছিলেন।

১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয় 'পাষণ্ড-দলন'। এটি ৫ অঙ্কের ভক্তিমূলক পালা। পালাটি শশীভূষণ অধিকারীর গ্র্যান্ড অপেরা পার্টি আসরস্থ করে। পালাকার রাগ রাগিণী ও কীর্তনাঙ্গ সুর ব্যবহার করেছিলেন। পালায় 'বিবেক' হয়ে আসর মাতাতেন বৈষ্ণব সাধক নরোত্তম দাসের শিষ্য ভজন দাস।

শ্বেতার্জ্জুন।। কাশীরামের মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব এই ৫ অঙ্কের পৌরাণিক পালার বিষয়। পালাটি শশীভূষণ অধিকারীর গ্র্যান্ড অপেরা পার্টি আসরস্থ করেছিল। এই পালায় প্রায় ৫০ খানা গান ছিল।

এছাড়া রাইচরণের লেখা আরও কিছু জনপ্রিয় পালা হলো ঃ বেদ উদ্ধার। পালাটি গিরীশচন্দ্র ঘোষকে উৎসর্গ করেছিলেন রাইচরণ। প্রথম অভিনীত হয় শশীভূষণ অধিকারীর গ্র্যাণ্ড অপেরা পার্টীতে। ১৯২৫ সালে কবিরঞ্জনের লেখা 'কর্মফল' অভিনীত হয় ষষ্ঠী অপেরায়।

॥ রামদুর্লভ কাব্য বিশারদ ॥

বাঁকুড়া জেলার বেলতায় জন্মেছিলেন রামদুর্লভ। অল্প বয়স থেকেই তিনি পালা রচনায় আকৃষ্ট হন বলেই তাঁর পালায় প্রচলিত ধারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। পরবর্তী সময়ে প্রচলিত ধারা ভেঙে তিনি সাহসী এবং সমসাময়িক হয়ে ওঠেন। যাত্রায় হাস্যরস থাকা বাঞ্ছনীয় বলে এক সময়ে

যে ভাঁড়ামি যাত্রায় ছিল, রামদুর্লভের প্রথম দিকের পালায় তার প্রভাব পড়ে। তবে তাঁর রচনায় ভাষার সরলতা এবং সংগীত ছিল বিশেষ অঙ্গ। ১৯১৮ সালে তিনি প্রথম যে পালা রচনা করেন তার নাম 'পুষ্কলমোচন'। রামদুর্লভ সংস্কৃত অধ্যয়ন কবেছিলেন রামকিঙ্কর তর্করত্নের কাছে। রামদুর্লভের পালায় গণের গান, ব্যালে ও জুড়ির গান প্রাধান্য পেয়েছিল। 'পুষ্কলমোচন' প্রথম গণেশ অপেরায় অভিনীত হয়। রামদুর্লভের পরবর্তী পালাগান 'ভীষ্মবিজয়'। এই পালার অনেকটা অংশ জুড়ে ছিল পরশুরাম ও ভীষ্মের যুদ্ধ। পালাটি যামিনী ভাণ্ডারীর দলে অভিনীত হয়।

১৯২১ সালে রামদুর্লভ লেখেন 'মহারণে রামানুজ'। রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড অধ্যায় থেকে এই পালার বিষয় নির্বাচিত হয়েছে। পালাটি সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়ের দলে অভিনীত হয়েছিল। পালায় গানের প্রাধান্য বেশি ছিল।

বাচস্পতি ঃ ১৯২২ সালে নবদ্বীপ বঙ্গনাট্য সমাজে অভিনীত হয়েছিল। এতেও গণের গান, যাত্রা ব্যালের সঙ্গে প্রায় চল্লিশটি গান সন্নিবেশিত হয়েছিল। অষ্টম শতাব্দীর অদ্বৈতবাদ এবং ষড়-দর্শনের টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের জীবনের শেষ পর্যায় এই পালায় বিধৃত। পালার ভিতর দিয়ে হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন।

রামদুর্লভ রচিত মহামায়া, সহস্রস্কন্ধ রাবণ, ভুবনেশ্বরী, সত্যভামা, পাঞ্চালী, ভার্গব বিজয় নামে আরও কয়েকটি পালা লিখেছিল। **মহামায়া ঃ** বিষ্ণু ভক্ত ঘোরাসুরের অত্যাচারে দেবতারা অতিষ্ঠ, অবশেষে মহামায়া তাঁকে নিধন করেন। পদ্মপুরাণের সৃষ্টি খণ্ডের পঁচাত্তরতম অধ্যায় থেকে এর কাহিনী আহরণ করা হয়েছে।

সহস্রস্কন্ধ রাবণ ঃ ১৯২৬ সালে লেখা। 'অদ্ভুত রামায়ণ'-এর ত্রয়োবিংশ সর্গের কাহিনী থেকে নেওয়া। দধি সমুদ্রের পুষ্কর দ্বীপের অধিপতি সহস্রস্কন্ধ রাবণ হলেন লঙ্কার রাজা রাবণের বড় দাদা। দাদামশাই মাল্যবানের কাছ থেকে লঙ্কা ধ্বংসের কাহিনী শুনে, শূর্পনখার নাক কেটে নেবার প্রতিশোধ নেবার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ এই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই নাটকে সীতাকে আদ্যাশক্তি হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে! এই পালায় জুড়ির গান ছিল। পালাটি যামিনী ভাণ্ডারীর দলে অভিনীত হয়েছিল। **ভুবনেশ্বরী ঃ** কাশীরাম দাসের মহাভারতের বনপর্ব থেকে নেওয়া। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ভক্ত প্রহ্লাদের ভক্তি মন্ত্রে স্ফটিকস্তম্ভে নৃসিংহ মূর্তির আবির্ভাব এই পালার মূল সুর। ভাগবতেও এই বিষয়ের উল্লেখ আছে।

নিউ শঙ্কর অপেরা, ভোলানাথ অপেরায় অভিনীত **সত্যভামা ঃ** ১৯৩০ সালে নাটকটি লেখা হয়। শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী সত্যভামার পরীক্ষা এই পালাগানের কাহিনী। ১৯২৩ সালের 'পাঞ্চালী' এবং ১৯২৬ সালের 'ভার্গব বিজয়' রামদুর্লভকে পালাকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়। পালা দুটি গণেশ অপেরায় অভিনীত হয়েছিল।

॥ সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ॥

যাত্রার পালাকার স্বনামধন্য সৌরীন্দ্রমোহনবাবুর জন্ম ১৯০৭ সালে ২৪ পরগণার বারুইপুর থানার রামনগরের বর্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ পরিবারে। মা কিরণশশী দেবীর কাছেই মূলতঃ শৈশবের শিক্ষা লাভ। বাবা কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় ছেলেকে প্রথম ভর্তি করেন সাউথ সুবার্বণ স্কুলে। এই স্কুলের শিক্ষক যুগান্তর পার্টির সদস্য বিপ্লবী আদিশ্বর ভট্টাচার্যই সৌরীন্দ্রমোহনের দেশাত্মবোধের জন্মদাতা। আকস্মিকভাবে বাবার মৃত্যুর পর সৌরীন্দ্রমোহন ভর্তি হন হরিনাভির অ্যাংলো সংস্কৃত স্কুলে। এখানে আসার পর যুগান্তর দলের বিশিষ্ট সংগঠক সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে স্বাদেশিকতার মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে সরাসরি ছাত্র নেতা হন। অসহযোগ আন্দোলনের শরিক হন। এরই মধ্যে তিনি ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলেজেও পড়েছিলেন কিছুদিন। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলন, সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ হেতু তিনি কলেজের পড়ায় মনোযোগী হতে

পারছিলেন না দেখে, পারিবারিক অভিভাবক ভগ্নীপতি জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পড়ায় বাদ সাধলেন। তারপরই সৌরীন্দ্রমোহন পুরোপুরিভাবে আন্দোলনে ঝাঁপ দেন। চাকরি পান রামনগর মাইনর স্কুলে শিক্ষকতার। এরই মধ্যে একের পর এক কবিতা, শিশুদের মনের মত গল্প, প্রবন্ধ এবং যাত্রাপালাও সমানে লিখে যেতে থাকলেন। সরকারি চাকরি এমন কি পরবর্তী সময়ে গোবিন্দপুর হাইস্কুলের শিক্ষকতাও এক কথায় ছেড়ে দিয়েছিলেন তাঁর আদর্শের পরিপন্থী ব্যবহারের জন্য। সাংসারিক অনটন বাড়তে থাকায় এবং এই পরিমণ্ডল থেকে তাঁকে না সরাতে পারলে সংসার প্রসঙ্গে উদাসীনতা কাটবে না মনে করে তাঁকে পুরুলিয়ায় পোস্ট অফিসে চাকরি দিয়ে পাঠানো হয়। চাকরি করেছিলেন, কিন্তু সরকারি গোলামি করবেন না বলেই এক বছরের মধ্যে কাজে ইস্তফা দিয়ে বারুইপুরে চলে আসেন। আবার চাকরি নিলেন ছাত্র পড়াবার। গোবিন্দপুরের স্কুলে। লিখলেন 'মুকুন্দ রায়' আর 'মোহনলাল' নামে শিশুদের বই। প্রকাশ করলেন 'কাল বৈশাখী' পাক্ষিক পত্রিকা। বারুইপুর অঞ্চলের প্রথম মুদ্রিত পত্রিকা। এই পত্রিকা বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন গোবিন্দপুর হাইস্কুলের কর্তৃপক্ষ। পরিবর্তে সৌরীন্দ্রমোহন শিক্ষকতার চাকরিটাই ত্যাগ করলেন। কিছুদিনের মধ্যে বারুইপুর হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ পেলেন তিনি। এই সময়ে তাঁর কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকল বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়। বন্ধু বসন্ত মাহাতোর বিশেষ পীড়াপীড়িতে সৌরীন্দ্রমোহন পালা লিখলেন। এই সময় ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর খ্যাতি মধ্যাহ্ন গগনে। ব্রজেন্দ্রনাথ দে'র তখন আত্মপ্রকাশ ঘটেছে যাত্রা জগতে। পালা লিখছেন, এরই মধ্যে রামনগরের সুশীল ঘোষ তাঁকে দিয়ে মঞ্চে অভিনয় করালেন প্রতাপাদিত্য নাটকে 'কল্যাণী' চরিত্রে। অভিনয় করালেন দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে এণ্টিগোনস্ চরিত্রে। তারপরই অপরেশচন্দ্রের 'শ্রীকৃষ্ণ' মঞ্চ নাটকের যাত্রারূপে 'দুর্যোধন' হয়ে আসরে নেমেই সকলের হৃদয় জয় করলেন। পালাকার হিসেবে বিখ্যাত হবার পরও অনেক যাত্রাদলের অধিকারীকে বিপদ মুক্ত করার জন্য মাঝে মাঝে নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে আসরে নেমেছেন অভিনেতা হিসেবে। এই ধরনের একটি দলের নাম রঞ্জন অপেরা। কিছুদিনের মধ্যে সৌরীন্দ্রমোহন অভিনেতা জীবন ত্যাগ করলেন। লিখলেন বন্ধু বসন্তর অনুরোধে 'ধর্মবল' পালা। ভাণ্ডারী অপেরায় প্রথম অভিনীত এই পালায় অর্থাৎ পৌরাণিক পালার ভিতর দিয়ে যুগচেতনাকে আধুনিক রীতিতে উপস্থাপনা তাঁর প্রথম কীর্তি। এরপর এই অপেরা দলই তাঁর 'মহিষাসুর' পালা উপহার দেয়। পালাকার হিসেবে প্রথম এসেই যিনি সবার মন জয় করেছিলেন, তিনি হলেন জনপ্রিয়। রঞ্জন অপেরা তাঁর 'আত্মাহুতি' আসরস্থ করে ১৩৪৭ সনে বলিষ্ঠ প্রযোজনার নজির স্থাপন করেছিল। এ ছাড়া 'পলাশীর পরে', 'মীরকাশিম', 'নন্দকুমার', 'মাটির মা', 'চক্রছায়া', 'নূতন জীবন', 'মাটির মানুষ', 'শাপমুক্তি', 'সম্রাট অশোক', 'রাজা রামমোহন' সৌরীন্দ্রমোহনকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দেয়। তাঁর 'রক্তবীজ' পালা তাঁকে লোকশিক্ষক হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। পালার ভিতর দিয়ে লোকশিক্ষার বিস্তার হয় এই সত্যকে তিনি মর্মে মর্মে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমারের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন সৌরীন্দ্রমোহন। যদিও এই সময়কালের মধ্যে নন্দগোপাল রায়চৌধুরী, জিতেন বসাক সুখ্যাত ছিলেন, কিন্তু তাঁরা ছিলেন সৌরীন্দ্রমোহনের অনুগামী। পরবর্তী সময়ের আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন নাথ, কানাই নাথ এঁরা ব্রজেন্দ্রকুমার এবং সৌরীন্দ্রমোহনের দক্ষতার আলোয় উদ্ভাসিত। তরুণ দে তাঁর 'নিঃসঙ্গ পদাতিক ঃ সৌরীন্দ্রমোহন' প্রবন্ধে বলেছেন—"ব্রজেন্দ্রকুমার তাঁর অনেক পালায়, বিশেষ করে জীবনীনাট্যে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন অনেক, ব্রজেন্দ্রকুমার বক্তব্য ঠিক করে কাহিনীকে সেই মত পরিচালনা করতেন। সৌরীন্দ্রমোহন ছিলেন তার বিরোধী। তিনি বক্তব্যের প্রয়োজনে কখনই ইতিহাসকে অতিক্রম করেননি।...ব্রজেন্দ্রকুমার সঙ্গীত ব্যবহারের ক্ষেত্রে অতি সতর্ক ছিলেন। সৌরীন্দ্রমোহনও সতর্ক, কিন্তু সঙ্গীত প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি অনেক সময় সাহসী হয়েছেন। তাঁর

সময়ে তিনি সঙ্গীত রচয়িতা হিসেবে ছিলেন শ্রেষ্ঠ। ব্রজেন্দ্রকুমারের পালার দর্শক নিরন্তর অনাবিল হাস্যরসের অমিয়ধারায় অবগাহন করেছেন। পক্ষান্তরে সৌরীন্দ্রমোহনের হাস্যরস ব্যবহারে সংযম দেখিয়েছে।...ব্রজেন্দ্রকুমার লিখেছেন দু'হাতে, সৌরীন্দ্রমোহন তা করেননি..."

সৌরীন্দ্রমোহন ছাত্রজীবনে ও পরবর্তী সময়ে 'ধূপছায়া', 'কল্লোল', 'আত্মশক্তি', 'সারথি', 'প্রগতি', 'নবশক্তি', 'কালি-কলম', 'সচিত্র শিশির' ইত্যাদি পত্রিকায় নিয়মিত লিখেছেন গল্প-কবিতা। বেতারের জন্য পালা লিখেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলন থেকে এই যুগপ্রবর্তক স্রষ্টাকে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল। সৌরীন্দ্রমোহনের লেখা গানের রেকর্ডও বেরিয়েছে।

এই লোকশিক্ষকের পুত্রেরা হয়েছেন উচ্চশিক্ষিত। সৌরীন্দ্রমোহন আজও সবার মধ্যে আছেন। ক্লাসিক উপন্যাসের পালারূপের প্রথম পথ প্রদর্শক সৌরীন্দ্রবাবু। বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল-এর পালারূপ দিয়েছিলেন এই মহান শিল্পী।

প্রসঙ্গ পালা ঃ মার্কণ্ডেয় পুরাণের শ্রীশ্রীচণ্ডী থেকে 'মহিষাসুর' পালার কাহিনী নেওয়া হয়েছে। ৫ অঙ্কের পালা। পালাটি এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে, এই বইয়ের ৬ষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬০ সালে।

আত্মাহুতি। ১৯৪৭ সালে লেখা। বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশের উনবিংশ অধ্যায় থেকে এর কাহিনী নেওয়া হয়। পালাটি প্রথম রায় অপেরা পরে রঞ্জন অপেরায় অভিনীত হয়। অসবর্ণ বিয়ের সমস্যা এই পালার মূল সুর।

ব্যথার পূজা ঃ পদ্মপুরাণ থেকে আনা এর মূল কাহিনী। রঞ্জন অপেরায় প্রথম আসরস্থ হয়।

পলাশীর পরে।। ৫ অঙ্কের এই ঐতিহাসিক পালাটি রঞ্জন অপেরা প্রথম আসরস্থ করে। বাংলার নবাব মীরকাশেমের সঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সংঘর্ষ, দেশীয় বিশ্বাসঘাতকতায় পরাজয়, নন্দকুমারের দেশপ্রেম এবং বে-আইনিভাবে তাঁর ফাঁসি এই পালার প্রতিপাদ্য বিষয়।

মাটির মা।। ১৩৫৫ সনে ভোলানাথ অপেরায় অভিনীত। ঐতিহাসিক পালা। ভুঁইয়া ভুলুয়ার রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যের সঙ্গে আরাকানের মগরাজ মৌসং ও পর্তুগীজ জলদস্যু সিবাস্টিয়ান গঞ্জালেসের মধ্যে সংঘর্ষ এর মূল কাহিনী।

রক্তবীজ।। ১৩৫৮ সনে এই পৌরাণিক নাটকটি রঞ্জন অপেরা প্রযোজনা করে। হরিবংশ থেকে নেওয়া এর কাহিনী। দেবদানব দ্বন্দ্বের এই পালায় পালাকার দেবতাদের ধনিক আর দানবদের দরিদ্ররূপে দেখিয়েছেন। ধনী আর দরিদ্রের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তাই এতে প্রতিফলিত হয়েছে।

চক্রছায়া।। ১৩৬০ সনে রঞ্জন ও নবরঞ্জন অপেরায় মহাভারত থেকে নেওয়া কাহিনীর এই পালারূপ অভিনীত হয়। এতে জাতিভেদ প্রথার কুফল দেখানো হয়েছে।

নূতন জীবন।। ১৩৬১ সনে ৫ অঙ্কের এই সামাজিক পালাটি জনপ্রিয়তা পায়।

জমিদার দুর্গাশঙ্কর এবং তাঁর নায়েব গোপীনাথ সরকারি কর ফাঁকি দিয়ে, পুলিশকে হাত করে কীভাবে শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে এই পালায় সমাজের সেই ছবিটা দেখানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার তৎকালীন প্রোডাকসন্ অফিসার মন্মথ রায় লোকরঞ্জন শাখার জন্য সৌরীন্দ্রবাবুকে দিয়ে এই নাটকটিকে যাত্রা ফর্মে লেখান।

মাটির মানুষ।। কাশীদাসী মহাভারতের আদিপর্বের তপতী-রাজা সংবরণ-এর কাহিনী।

আজকের একাধিক শ্রেষ্ঠ পালাকারদের কিছু কিছু পালায় যেমন সৌরীন্দ্র আর ব্রজেন দে'র ছায়া প্রকট, তেমনি ছায়াচিত্রের কাহিনীরও প্রভাব স্পষ্ট। অথচ সৌরীনবাবুদের যথার্থ মূল্যায়ন হয়নি।

॥ পালা সম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে ॥

পালা সম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে'র কথা শ্রদ্ধেয় মন্মথ রায়ের কথা দিয়েই শুরু করা যাক।

"...যাত্রা পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে তাঁর জয়যাত্রার মধ্যে অতর্কিতভাবে প্রস্থান করে তাঁর অর্ধশতাব্দীব্যাপী নাট্য রচনায় যবনিকা টেনে দিলেন। আমার অনেক পরে এসে আগেই চলে গেলেন।...তাঁর অমর আত্মার উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি।

...আধুনিক যাত্রার বা যাত্রাপালার গোত্রান্তর ঘটাতে তিনি ছিলেন এক অপরাজেয় কারিগর। যাত্রা গানের প্রচলিত সুদীর্ঘ সংলাপকে স্বাভাবিক সংক্ষিপ্ত ও সরল সংলাপে পরিণত করা ছিল তাঁর অভিনব কীর্তি।...ব্রজেন্দ্রকুমারের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি যাত্রায় কাল্পনিক কাহিনীর চল করেছেন। বহু বিখ্যাত চরিত্রের নব মূল্যায়নের কৃতিত্বও অর্জন করেছেন তিনি। যেমন, কৈকেয়ী, শকুনি, দুর্যোধন, জাহান্দার শাহ, কায়কোবাদ, রিজিয়া। হাস্যরসকে পালার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়ে দেওয়া এবং আদিরসের প্রাবল্য হ্রাস তাঁর আরও দুটি বৈশিষ্ট্য। "মহীয়সী কৈকেয়ী", "সোনাই দীঘি", "বাঙালী", "করুণাসিন্ধু বিদ্যাসাগর" "নটী বিনোদিনী" পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমারের অক্ষয় অবদান।...

...ব্রজেন্দ্রকুমারের সংগে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় পরম সার্থকতা লাভ করে ১৯৭২ সালে, যেদিন আমি "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের" ডি. এল. রায়, রিডারশিপ বক্তৃতামালা "লোকনাট্য যাত্রা" সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র নিবন্ধে ব্রজেন্দ্রকুমারের অবদান সবিশেষ আলোচনা করি।..." ব্রজেন্দ্রকুমারের আকস্মিক মৃত্যুর পর মধু সংলাপী বিধায়ক ভট্টাচার্য বলেছিলেন—"নাট্যজগতের যখন কোন ক্ষতি হয়, তখন মঞ্চ নাট্যই হোক, যাত্রানাট্যই হোক মন সে কথা মানতে চায় না। তখন এই বড় রকমের ক্ষতিকে নাট্য জগতের ক্ষতি বলেই মেনে নিতে হয়। প্রখ্যাত নাট্যকার ব্রজেন্দ্রকুমার দের মৃত্যু সেই রকম একটা ক্ষতি। আমার মতে সে ক্ষতি কোনদিনই পূরণ হবে না। কারণ যাত্রা নাটকে ওই জাতীয় বিন্যাস, ওই রকম মধুর সংলাপ আগে ছিল বলে আমার জানা নেই—"

একেই বোধ হয় বলে প্রকৃত মূল্যায়ন। স্বনামখ্যাত নাট্যকার, চিত্রনাট্যকার, কাহিনীকার বিধায়ক ভট্টাচার্য 'মধুসংলাপী' খেতাব পেয়েও ব্রজেন দে-কে মধুসংলাপ প্রণেতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। শ্রীভট্টাচার্যের আর এক উক্তিও অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে গেছে ; ব্রজেন দে চলে গেছেন চৌদ্দ বছর আগে, এই চৌদ্দ বছরের মধ্যে যাত্রা জগতের চেহারা সম্পূর্ণ পাল্টেছে। বেশ কয়েকজন পালাকার খান কতক বাড়ি তৈরি করেছেন, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স করেছেন, আশাতীত পারিশ্রমিক নিয়ে বছরে ৮। ৯ খানা করে পালা লিখে ফেলার জাদু দেখিয়েছেন, সাইক্লোরামা নামক উড়িষ্যা থেকে আমদানি করা এক দুরন্ত আলোর জাদু পদ্ধতিতে ব্যবসায় সাফল্য এসেছে, কিন্তু ব্রজেন্দ্রকুমার দের শূন্যস্থান পূর্ণ করার মত কোন পালাকারের হদিশ মেলেনি। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এই চৌদ্দ বছরে বেশ কয়েকজন স্বনামধন্য পালাকারের এমন কিছু পালা দেখার সৌভাগ্য যাত্রা দর্শকরা অর্জন করেছে, যে পাণ্ডুলিপিগুলি ব্রজেন দের রচনাশৈলীকেই মনে করিয়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে কিছু তথ্যের অবতারণা করি—

** ১৯৮৫ সালে নট্ট কোম্পানি প্রযোজিত, সত্যপ্রকাশ দত্ত রচিত এবং তরুণ রায় নির্দেশিত* **"বনবিবি চম্পা" আসরস্থ হয়। এই পালাটি ব্রজেন্দ্রকুমার দের জনপ্রিয়তম পালা "সোনাইদীঘি"'র কথা মনে করিয়ে দেয়।**

সোনাইদীঘি'র ৪ পৃষ্ঠায় ব্রজেনবাবুর সংলাপ ঃ 'সোনাই ঃ না না, তুমি যাও কুমার...তুমি রাজকুমার, লোক নিন্দায় তোমার কিছু যায় আসে না,...আমার গায়ে এতটুকু কলঙ্কের কালি লাগলে আমার মামার মাথায় বজ্রাঘাত হবে।'

মনে রাখতে হবে 'সোনাইদীঘি' ব্রজেনবাবু লিখেছিলেন ১৯৬০ সালে। ১৯৮৫ সালে **সত্যপ্রকাশ দত্ত তাঁর 'বনবিবি চম্পা'য় লিখছেন ঃ**

'চম্পা।। চুপ করুন কুমার। আপনি রাজার ছেলে, আপনাকে হয়তো কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু আমার গায়ে কলঙ্কের কালি লাগলে, সে কলঙ্ক ঝামা দিয়ে ঘসলেও উঠবে না—'

আবার দেখা যাক। ব্রজেনবাবু তাঁর সোনাইদীঘি'র ৫ পৃষ্ঠায় লিখছেন ঃ

মাধব বলছে ঃ 'স্বপ্ন নয়, মোহ নয়। শুনে যাও তুমি, হে বিদায়োন্মুখ সূর্য্যদেব, জীবনে মরণে সোনাই আমার স্ত্রী—'

আবার সত্যপ্রকাশ দত্তের 'বন বিবি চম্পা'য় মঙ্গল বলছে ঃ 'আজ আমি বনদেবীকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করছি, জীবনে মরণে চম্পাবতী হবে আমার স্ত্রী—'

সোনাইদীঘি'র ৮৪ পাতায় আমরা পাই, হোসেন বলছে—'বিনা এত্তেলায় কোন্ সাহসে তুমি আমার বিশ্রামাগারে প্রবেশ করেছ?'—ওদিকে 'বনবিবি চম্পার'ও ৭৪ পাতায় হোসেন বলছে—'বিনা এত্তেলায় কোন সাহসে তুমি নবাবের প্রাসাদে প্রবেশ করেছ?'

এ ছাড়া সোনাইদীঘি'র ৮৫, ৮ ইত্যাদি পৃষ্ঠায় ব্রজেনবাবু পাত্র পাত্রীর মুখ দিয়ে যে সংলাপ ব্যবহার করেছেন, বনবিবি চম্পা'র ৭৪, ৭৫, ২০, ২১ পৃষ্ঠায় সত্যবাবুর লেখা সংলাপের রূপ প্রায় একই। এ ছাড়া দুটি পালার বিষয়গত ও চরিত্র সৃষ্টি নিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে 'বন বিবি চম্পা' কতাটা 'সোনাইদীঘি' থেকে প্রভাবিত হয়েছে।

'সোনাইদীঘি'র 'ভাটুক' একটি ডায়নামিক ক্যারেকটার। রাজশক্তির অন্যায় যেখানে ভাটুকের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ সেখানে। ভাবনাকাজীর দুরন্ত-দুর্ধর্ষ লাম্পট্য ও অত্যাচারী ভূমিকারও মূর্তিমান প্রতিবাদ এই ভাটুক। এই 'বনবিবি চম্পা' পালার চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে এরও ইংগিত খুঁজে পাওয়া যাবে।

সোনাইদীঘি' পালার পিসি মল্লিকার মুখ দিয়ে ব্রজেনবাবু মাঝে মাঝেই বলিয়েছেন "গুরু গোবিন্দ গদাধর", ঠিক সেই একই অনুপ্রাস যুক্ত শব্দপ্রবাহ বেরিয়েছে 'বন বিবি চম্পা' পালার পিসিমার মুখ দিয়ে—"গুরু গোবিন্দ গদাধর"—

শুধু তাই নয়, ব্রজেন দের অবিস্মরণীয় পালা 'বাঙালী'র সংলাপের সাদৃশ্য মেলে 'বন বিবি চম্পা'য়। 'বাঙালী' পালায় ব্রজেনবাবুর বিখ্যাত সংলাপ 'সে আগে বাঙালী, তারপর মুসলমান'—, বলা বাহুল্য এই সংলাপ উচ্চারিত হয়েছিল দায়ুদ খাঁ'র মুখে।

'বন বিবি চম্পা' পালায় লতিফ বলে—'আগে বাঙালী, পরে মুসলমান—'

মূল কথা, 'বন বিবি চম্পা' বোধ হয় গড়ে উঠত না, যদি না পালা সম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমারের 'সোনাইদীঘি', 'বাঙালী' আরও কিছু পালা রেডি রেফারেন্স হিসেবে সত্যবাবুর হাতের কাছে না থাকত।

১৯৩৭ সালে ব্রজেন্দ্রকুমার দে লিখেছিলেন 'চন্ড মুকুল'। নট্ট কোম্পানি এই পালাটি প্রযোজনা করেছিল এবং পালাটি আশাতীত ভাবে জনপ্রিয়তা পায়। পরবর্তীকালে, ১৯৭৫ সালে লেখা কানাই নাথের 'আমি মা হতে চাই' পালার সঙ্গে 'চন্ড মুকুল'-এর সাদৃশ্য যথেষ্ট।

এই 'আমি মা হতে চাই' পালার সমালোচনা করেছিলেন 'আনন্দলোক' পৃষ্ঠায় (আনন্দবাজার) স্বয়ং প্রবোধবন্ধু অধিকারী ২২ এপ্রিল '৭৬ তারিখে। এই পালাটিতে নারায়ণ সান্যালের 'মহাকালের মন্দির' উপন্যাস এবং ব্রজেনবাবুর 'চন্ড মুকুল' পালার সাদৃশ্য ছিল সে কথা উল্লেখ করার পরিবর্তে প্রবোধবাবু উল্লেখ করেছিলেন ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর 'বিজয় বসন্ত' এবং ব্রজেন্দ্রনাথ দের 'পরিচয়' পালার নাম। পরিতাপের বিষয়, সত্যের খাতিরে, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সত্য তথ্য রেখে যাবার জন্য বলা দরকার ; প্রবোধবাবু যাত্রাজগতের পিতৃতুল্য সমালোচক হয়েও জানতেন না, ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর 'বিজয় বসন্ত' নামে কোন পালা যেমন ছিল না, তেমনি পালাসম্রাট 'পরিচয়' নামে কোন পালা রচনাই করেননি।

এই পালাসম্রাট বাংলার লোকনাট্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে, পালা সৃষ্টির মাধ্যমে বিবর্তনের চেতনা প্রসারের ক্ষেত্রে, যুগ প্রবর্তনার ক্ষেত্রে কতটা সম্রাট তুল্য ছিলেন, জীবনের ক্ষেত্রে কতটা সৈনিক ছিলেন, শিল্প ক্ষেত্রে তিনি কতটুকু বাস্তব ছিলেন, শৈল্পিক ছিলেন এখানে তার সামগ্রিক মূল্যায়ন হোক।

॥ ব্রজেন্দ্রকুমারের বাল্যকাল ও বাংলার পটভূমি ॥

তখন আকাশে-বাতাসে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার হৃদয়-অলিন্দে ধ্বনিত হচ্ছে 'বন্দে মাতরম'! অত্যাচারী বৃটিশ সরকারের বেতনভুক কর্মীরা প্রকাশ্যে শিক্ষিত মানুষের ওপর একদিকে করছে নির্মম কষাঘাত, অন্যদিকে তখন বরিশালের প্রতিটি মানুষ গাইছে, 'বরিশাল পুণ্যে বিশাল, হলো লাঠির ঘায়ে'।

১৯০৭ সাল। দেশমাতৃকার মুক্তি কামনার আগুন ছড়িয়েছে সর্বত্র। আন্দোলনের চেহারা হয়েছে ভয়ঙ্কর। বিপিনচন্দ্র পাল যখন জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন, বিলেতি পণ্য বর্জন, স্বরাজের অগ্নিমন্ত্র বুকে নিয়ে যশোর, খুলনা থেকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, ওদিকে শিলচর, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট, দিনাজপুর, রংপুর, ভোলা, ঝালকাঠি নারায়ণগঞ্জ মথিত করছেন দৃপ্ত ভাষণে, যখন দিকে দিকে মুক্তি মন্ত্রের দীক্ষা দিচ্ছেন সোনার বাংলার সোনার ছেলেদের, যখন অবিভক্ত বঙ্গদেশের মাটিতে এখানে-ওখানে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসকের বেয়নেটের খোঁচায় দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমুক্তিকামী ছেলেদের বুক দিয়ে রক্ত ঝরছে, তখনও সোনার বাংলার হাটে-মাঠে বাউলের গান, রাখালের গো-চারণ, কৃষ্ণযাত্রার সুর নিত্য বিতরণ করত অমৃতরস ধারা। এই রকম এক সন্ধিক্ষণে ফরিদপুরের গয়ঘর গ্রামের বর্ধিষ্ণু অথচ অতি সাধারণ এক পরিবারে কালুর জন্ম।

হরিকিশোর দে আর ক্ষীরোদাসুন্দরীর ছেলে কালু, কলালক্ষ্মীর বরপুত্র ব্রজেন। বাবা সামান্য চাকরি করার ব্যাপারে ফরিদপুরের বাইরে জীবনের অনেকগুলো বছর কাটিয়েছেন, তাই মা ক্ষীরোদাসুন্দরী একদিকে সংসারে অনটনের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে, অন্যদিকে গৃহবধূর সব দায়িত্ব পালন করে, ছেলেদের লেখাপড়া শেখানোর কাজটি নিখুঁতভাবে চালিয়ে গেছেন। সাত বছরের ছেলে, স্কুলের ছাত্র ব্রজেন গ্রামে যাত্রা দলের পালাগান দেখে পালাকার হবার স্বপ্ন দেখল। কিশোর লেখকের মন আর দোয়াত-কলম জন্মও দিল নাটক। মাষ্টার মশাই সেই নাটক পড়ে বলেও ফেললেন—"তোমরা দেখো একদিন ব্রজেন মস্ত লেখক হবে—"

সে কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হতো না, যদি না বাবা সবাইকে ডেকে ডেকে বলতেন—"কালুর এ নেশা ছাড়বার হলে এ্যাদ্দিনে ছেড়ে যেত—"

যদি না মেজদা দেবেন্দ্রনাথ বলতেন—"আমরা তো মরেই ফুরিয়ে যাব, কিন্তু আমার বিশ্বাস কালু এই নেশার জন্যেই অমর হয়ে থাকবে—"

যদি না মা বলতেন—"সাগরে যখন ঝাঁপ দিয়েছিস মানিক তুলে আনা চাই তোর—"

ব্রজেন দে সেই মানিক তুলে আনতে পেরেছিলেন বোধ করি কয়েকটি বিশেষ কারণে। প্রথমত সংসারে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত মুখে দেবার মত অবস্থা ছিল না, অথচ কী আশ্চর্যভাবে বাবা, মা, দাদা সকলেরই প্রেরণা আর আশীর্বাদ ছিল। দ্বিতীয়ত, সারা দেশজুড়ে তখন মানুষ গড়ার কাজ করছিলেন দেশের মানুষেরা, তার প্রচ্ছন্ন প্রভাব পড়েছিল ব্রজেনের মনের ওপর, তা হলো সাধারণ মানুষেরা মরে গেলে ফুরিয়ে যায়, অসাধারণ যাঁরা তাঁরা বেঁচে থাকেন নিজের কর্মের মধ্যে!

এই সত্যের বেদীতে দাঁড়িয়ে ব্রজেন্দ্রকুমার একদিকে পড়াশোনা চালিয়ে গেলেন, অন্যদিকে নাট্যরচনার সাধনা। এই সাধনার প্রত্যক্ষ দীক্ষাগুরু ছিলেন সেই স্কুলের মাষ্টার মশাই, যিনি পরবর্তীকালের স্বনামধন্য নাট্যকার যোগেশ চৌধুরী।

॥ জীবনের সূচনা পর্ব ॥

এক সময়ে গ্রামের পাঠ চুকিয়ে, দারিদ্রের সঙ্গে পাঞ্জা কষে এই পরিবারটি ভাসতে ভাসতে এসে উঠেছিল বেলেঘাটার এক আস্তানায়। এখানে এসে তাঁর প্রথম সৃষ্টি 'স্বর্ণলঙ্কা'র প্রাণ প্রতিষ্ঠা হলো। বেলেঘাটার বাণী নাট্য সমাজ তার পুরোহিত। প্রথম যাত্রা পালাই এনে দিল যশ। পালার জনপ্রিয়তাই এই অপেশাদার সখের দলকে পেশাদার দলে পরিণত করল। এরই মধ্যে ব্রজেন্দ্রকুমার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম. এ পাশ করলেন। চাকরি পেলেন একটি স্কুলে শিক্ষকতা করার। এই .স্কুল থেকে অনেক শিক্ষককেই পালাতে হয়েছিল কিছু ছাত্রের অভব্য ব্যবহারের শিকার হয়ে। তারা ব্রজেনবাবুকেও ছোবল মারল প্রথম দিনেই, আবার সেই বিষ তারাই শুষে নিয়েছিল ব্রজেনবাবুর ব্যবহারে। এরপরই সুরেন্দ্রচন্দ্রের মত এক কাষ্ঠ ব্যবসায়ীর কন্যার পাণিগ্রহণ করলেন ব্রজেন্দ্রকুমার। এখানেও আর এক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্যে। ব্যবসায়ী পিতার কন্যা নীহারকণা হয়তো স্বামীর পালা লেখার ব্যাপারটাকে সমর্থন করবেন না! ভাবনা মিথ্যে হলো। সহাস্য বদনে নীহারকণা বলেছিলেন,—স্বামীর গৌরব তো স্ত্রীর গৌরব! শ্বশুর মশাই বলেছিলেন, ব্রজেন বিখ্যাত হবে। বলা দরকার, নীহারকণার ডাকনাম ছিল 'হাস্য'। এখানেই বৈচিত্র্য! একটি কবিতার জন্ম হয়ে গেল সেই ফুলশয্যার রাত্রে। লেখক জীবনের প্রতি স্ত্রীর শ্রদ্ধা আছে জেনেই খুশিতে বলেছিলেন—

"তোমার মাঝে আমার কবি ধন্য হল প্রিয়া।
সফল হল সুখের কথা তোমার নামটি নিয়া।।"

এই কবিতার জন্ম থেকেই আর এক ধারার জন্ম। পালা লেখার পাশাপাশি গান লেখার কাজও করে যেতে লাগলেন।

রানী নাট্য সমাজের 'স্বর্ণলঙ্কা'র জনপ্রিয়তায় একদিন ডায়মন্ড লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা-পালাকার কানাইলাল শীল দেখে নিলেন পালা। খুশি হয়ে আলাপ করলেন ব্রজেনবাবুর সঙ্গে। কানাইবাবু তখন শুধু প্রকাশক-পালাকার নন, তখনকার প্রখ্যাত গণেশ অপেরা পার্টির তিনি উপদেষ্টা, বিনিয়োগকারী! কানাইবাবু ব্রজেন দের প্রতিভায় রত্ন পাবার খুশিতে টলমল করলেন। এই সময়ে গণেশ অপেরার বাঁধা পালাকার ছিলেন স্বনামধন্য ভোলানাথ কাব্য শাস্ত্রী! সেই ভোলানাথ বাবু একদিন গণেশ অপেরায় জানিয়ে দিলেন, এবারকার মত অন্য পালাকার নিতে, কারণ তাঁকে 'বাসুকী' নাটক থিয়েটারের জন্য দিতে হবে। এ সবই যেন পূর্ব নির্দ্দিষ্ট! কানাইবাবু এবার ব্রজেনবাবুকে নিয়ে গেলেন গণেশ অপেরায়। পৌরাণিক একটি পালা লেখার নির্দেশ পেলেন। লিখলেন "বজ্রনাভ"। পালা চরম হিট করল। এরপর একদিন গণেশ অপেরার গদিঘরে ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর সান্নিধ্য লাভ করলেন ব্রজেন। ব্রজেনবাবুর দিকে দৃষ্টি ফেলেই ভোলানাথ সবাইকে শুনিয়ে বললেন—"এ ছোকরা একদিন যাত্রায় যুগান্তর আনবে—" সেই উক্তিও সত্য হয়ে গেল!

এই সময়ের মধ্যে বাণী নাট্য সমাজের জন্য ব্রজেনবাবু লিখেছিলেন "ভক্তবিধান" নামে আরও একটি পালা। "বজ্রনাভ" রচনা কাল ১৯৩১। এই সময়ে ব্রজেনবাবু মাষ্টার থেকে হেডমাষ্টারের পদে উত্তীর্ণ হন!

উত্তরণের সূত্র

ব্রজেনবাবু যে যে কারণে যাত্রার উত্তরণ ঘটতে পারেনি তার তালিকা তিনিই রেখে গেছেন তাঁর পুত্র তরুণ দের সঙ্গে এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের মধ্যে। সেই সূত্রতালিকা ঃ ১। যাত্রাপালার বক্তৃতা অতি দীর্ঘ। ২। গানের সংখ্যা খুব বেশি, অপ্রয়োজনেও গান ৩। সখীর গান আরম্ভেই দর্শকদের চোখে মুখে ফোটে বিরক্তির ছাপ, অথচ সখীর গান থাকবেই। ৪। কোরাস, ডুয়েট গান

এবং হাস্যরসের নামে ভাঁড়ামি যা দর্শকরা চাইছেন না বোঝা যেত। ৫। পৌরাণিক পালার প্রাধান্য। অন্য বিষয় নিয়ে পালা ছিল গতানুগতিক। ৬। যাত্রা পালার অনাটকীয়তার দোষ। কমিক চরিত্র বা দ্বৈত সংগীতের সঙ্গে পালার গতির কোন সম্পর্ক থাকত না। পোশাক পরিচ্ছদ অদ্ভুত। রাজা ও প্রজার পোশাক একই ধরনের। সবার মুখেই থাকত এক জাতের ভাষা। তাও নিম্নস্তরের। অতি নাটকীয়তা দোষে দুষ্ট সব পালা। আবার অনেক সংলাপ, ভাষা ছিল পাণ্ডিত্যপূর্ণ ইত্যাদি ইত্যাদি।

পরবর্তী সময়ে ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী এই সংস্কার মুক্তির কাজে হাত দিয়েছিলেন, ব্রজেন্দ্রকুমার তা সম্পূর্ণ করেছেন। প্রথম দিকের অল্প কয়েকখানা পালা দীর্ঘ হয়েছিল ব্রজেনবাবুর। পরবর্তীকালে তিনি যুগের কথা মনে রেখে সময় কমাতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তিন, সাড়ে তিন ঘণ্টার মধ্যে পালাভিনয় শেষ করার ব্যাপারটিও প্রবর্তন করেন। ১৯৩৬ সালে 'চাঁদের মেয়ে' পালায় ছোট ছোট সংলাপ প্রথম ব্যবহার করে সার্থক হলেন পালাকার। এই পালাতেই গ্রুপ এ্যাকটিং প্রবর্তিত হলো। অহেতুক প্যাঁচ পয়জার আর বক্রাকারে সংলাপ আউড়ে ভেজাল অভিনেতারাও যে হাততালি পেত, সেটা বন্ধ হলো। তবে 'গ্রুপ এ্যাকটিং'-এ যে সাফল্য এসেছিল তা সূর্য দত্তেরই আবদান, এ কথা স্বীকার করেছেন ব্রজেনবাবু।

১৯৪৫ সালে 'দেবতার গ্রাস' লেখার সময়ে ব্রজেনবাবু অমিত্রাক্ষর ছন্দ ত্যাগ করে গদ্য সংলাপের ব্যবহার করলেন। পৌরাণিক পালার রূপ গেল পাল্টে। এই পালা থেকে হাস্যরস পরিমার্জন করেন তিনি। চন্দ্রচূড় নামে একটি চরিত্র সৃষ্টি করে তার মুখে সংলাপ বসিয়ে যাত্রায় স্যাটায়ার, উইট, হিউমার কত সুন্দর আসে তা প্রমাণ করলেন।

এই জাতীয় চরিত্রে রূপদান করে পঞ্চু সেন, বিমল লাহিড়ী, স্বপনকুমারেরাও খ্যাতি পেলেন। এক কথায় যাকে বলে সিরিও কমিক, তাই প্রবর্তন করে ব্রজেনবাবু প্রশংসার পাত্র হলেন। এরপর সমকালীন বিষয়ের ভিত্তিতে একের পর এক সামাজিক পালা রচনা করে ব্রজেনবাবু যাত্রায় সামাজিক পালার চাহিদা বাড়ালেন। মনে রাখতে হবে, ব্রজেনবাবু ১৯৬০ সাল থেকে একের পর এক সামাজিক পালা লিখলেও, যাত্রাদলগুলি সামাজিক পালা প্রযোজনা করলেও ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত মূলত সামাজিক পালার জোয়ার আসেনি। ১৯৬৭ সাল থেকে জীবনীমূলক পালার জোয়ার আসে। এর মূলে অবশ্যই বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মাইকেল মধুসূদন' নাটক বা পালার চরম সাফল্যই কাজ করেছে।

॥ পালা সৃষ্টি এবং স্রষ্টার ভাবনা প্রবাহ ॥

ছাত্র ব্রজেনের প্রথম লেখা **"সুপর্ণ শতদল"** (১৯২০), যা যোগেশ চৌধুরী সংশোধন করে দিয়েছিলেন। এটি প্রথম সামাজিক পালা যা এখনও প্রকাশিত হয়নি।

স্বর্ণলঙ্কা।। ১৯২৫ সালের পালা। বাণী নাট্য সমাজ কর্তৃক ১৯২৬ সালে অভিনীত। এই পৌরাণিক পালাকার যুদ্ধ বিরোধী ভাবনার বিকাশ স্পষ্ট করে তুলেছিলেন। ডায়মণ্ড লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়।

রাক্ষসের দেশে।। ১৯২৬ সালের পালা। এখনও অপ্রকাশিত হলেও অভিনীত। পাণ্ডব ও কৌরব পক্ষকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছিলেন ব্রজেনবাবু।

মায়া।। ১৯২৭ সালে লেখা এই পালাটি আজও অভিনীত বা প্রকাশিত নয়। এই পালার মাধ্যমে যুবক ব্রজেন্দ্রকুমার প্রথম পণপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মনের পরিচয় দেন।

বজ্রনাভ।। ১৯৩১ সালের রচনা। '৩২ সালে গণেশ অপেরা পার্টী কর্তৃক অভিনীত। স্বর্ণলতা লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়। পালাকার ব্রজেন্দ্রকুমার এই পালাতে যুদ্ধ বিরোধী বক্তব্য পেশ করেছিলেন।

প্রবীরার্জুন।। ১৯৩২ সালে লেখেন, '৩৩ সালে গণেশ অপেরা পার্টী আসরস্থ করে। পালাটি

ডায়মণ্ড লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়। এই পালার মাধ্যমে পালাকার পাণ্ডবদের সাম্রাজ্যবাদী বলে প্রতিপন্ন করেছেন।

লীলাবসান।। ১৯৩৪ সালে লিখিত ও অভিনীত। গণেশ অপেরা পার্টী এই সালেই পালাটি আসরস্থ করে। এই পালায় পালাকার ধনী ও দরিদ্রের দ্বন্দ্ব এবং শ্রেণী সংগ্রামকে স্পষ্ট করেছেন। পালাকার শ্রীকৃষ্ণকে শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে এঁকেছেন। প্রতিটি বৈষ্ণব মন্দিরে এই পালা নিষিদ্ধ হয়। এই পালার জন্য ব্রজেনবাবু রাজরোষে পড়েন।

চাঁদের মেয়ে।। ১৯৩৬ সালে লেখা এই পালাটি ১৯৩৭ সালে নট্ট কোম্পানি যাত্রা পার্টী আসরস্থ করে। ডায়মণ্ড লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়। পালায় পল্লীগাথা বিধৃত করেন। এতে ছোট ছোট সংলাপ ব্যবহার করেন পালাকার।

রাজর্ষি বা দানবীর।। ১৯৩৭ সালে লেখা ভোলানাথ অপেরা পার্টী এই সালেই পালাটি আসরস্থ করে। ডায়মণ্ড লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে ছ'ঘণ্টার কমে কোন পালা অভিনীত হতো না, সে ক্ষেত্রে এই পালার সময়সীমা করেন তিন ঘণ্টা মাত্র।

যমে-মানুষে।। সম্পূর্ণ হাসির নাটক বা যাত্রা। ১৯৪১ সালে লেখা এবং এই সালেই কার্তিকপুর বয়েজ ক্লাব থেকে অভিনীত। অপ্রকাশিত।

রাজনন্দিনী।। ১৯৪২ সালে রচিত এবং এই সালেই রঞ্জন অপেরা কর্তৃক অভিনীত। ডায়মণ্ড লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত এই পালায় ব্রজেনবাবু অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন। কাল্পনিক পালা। শ্রেণী চেতনা জাগরণের আভাসও ছিল।

মহাযুদ্ধের বলি বা ইনকিলাব জিন্দাবাদ।। ১৯৪৩ সালে লেখা এই পালাটিও কার্তিকপুর বয়েজ ক্লাব আসরস্থ করে। সামাজিক পালা। দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দলিল। বইটি ছাপে নির্মল বুক এজেন্সী।

আকালের দেশ।। ১৯৪৩ সালে রচিত, এই সালেই নট্ট কোম্পানি কর্তৃক অভিনীত। কৃষক বিদ্রোহের পটভূমি। এই পালাটি প্রকাশ করে ইউনাইটেড পাবলিশার্স।

সমাজের বলি।। ১৯৪৪ সালে রচিত, অভিনীত। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা এই পালাটির প্রযোজক ছিল নট্ট কোম্পানি যাত্রা পার্টী। পালাটি ডায়মণ্ড লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া **দেবতার গ্রাস** পালাটিও এই সঙ্গে প্রযোজনা করে নট্ট কোম্পানি। ডায়মণ্ড লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত এই পালার বক্তব্য ছিল, শ্রেণী চেতনা জাগরণ। সম্পূর্ণ গদ্য ছন্দে লেখা পৌরাণিক পালা। ২য় টিও ডায়মণ্ড লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত।

মায়ের ডাক ও নাটক নয়।। ১৯৪৫ সালে লেখা ১ম পালাটি আসরে নামায় নট্ট কোম্পানি, ২য়টি প্রভাস অপেরা। 'মায়ের ডাক' মূলত সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনী অবলম্বনে রূপকধর্মী পালা। যাত্রা পালায় ১ম রবীন্দ্র সঙ্গীত এই পালায় ব্যবহৃত হয়। "অয়ি ভুবনমনোমোহিনী..." গানটি পালাকার প্রয়োগ করেছিলেন। ২য় পালায় রবীন্দ্র কবিতা ব্যবহার করা হয়েছিল। দুটি পালাই ডায়মণ্ড লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়।

শেষ নামাজ ও বাঙালী।। ১৯৪৬ সালে লেখা, আর্য অপেরা পার্টী কর্তৃক অভিনীত। কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত এই দুটি পালার ১মটি ছিল সাম্প্রদায়িকতার বিরূদ্ধে প্রতিবাদ। পালাকার ব্রজেনবাবু "বাংলার মাটি বাংলার জল" গানটি ব্যবহার করেন। ২য় পালাটিও সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী পালা।

রাজ সন্ন্যাসী।। ১৯৪৭ সালে লেখা এই পালাটি বিল্বগ্রাম যাত্রা পার্টী এই সালেই আসরে নামায়। ভাওয়াল সন্ন্যাসীর কাহিনী।

ভারত তীর্থ ; ধরার দেবতা, প্রতিশোধ।। '৪৮ সালে লেখা এই ৩টি পালাই নট্ট কোম্পানি

যাত্রা পার্টী আসরস্থ করে। ১ম পালাটি ফ্যান্টাসি ধর্মী। রবীন্দ্র কবিতা ছিল। ২য় পালাটি মহাত্মা গান্ধীর জীবনী অবলম্বনে রূপকধর্মী। এতেও রবীন্দ্র কবিতা আর নজরুলের "...কারার ঐ লৌহকপাট" গান পালাকার ব্যবহার করেছিলেন। রবীন্দ্র কবিতার ছায়া অবলম্বনে 'প্রতিশোধ' পালাটি লেখেন পালাকার। এতে যুদ্ধ বিরোধী বক্তব্য ছিল।

দাসীপুত্র।। '৪৯ সাল লেখা এই পালা আসরস্থ করে আর্য অপেরা পার্টী। ১৯৫৭ সালে পালাটি বেতারে পরিবেশিত হয়। তারাচাঁদ দাস এণ্ড সনস্ ছিল প্রকাশক।

স্বামীর ঘর।। ১৯৪৯ সালে লিখিত এবং সেই সালেই নিউ প্রভাস অপেরায় অভিনীত। পালার মূল কাহিনী ঃ শোষিত মানুষের সংগ্রাম এবং ক্ষমতা দখলের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সালেই ডায়মণ্ড লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়।

আবার এসো।। ১৯৫০ সালে ব্রজেনবাবু এই পালার ভিতর দিয়ে সৎ পুলিশ অফিসারের চরিত্র এঁকেছেন। অদ্যাবধি অভিনীত হয়নি। অপ্রকাশিত।

শেষ আরতি।। ১৯৫১ সালে নট্টকোম্পানির জন্য লেখেন এবং এই সালেই অভিনীত হয়। মূল কাহিনী ঃ বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুদয় ও বৈদিক ধর্মের আড়ালে থেকে স্বার্থান্বেষীদের অত্যাচার। এই সালেই পালাটি কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়।

গন্ধর্বের মেয়ে।। ১৯৫১ সালে লেখা এবং নট্ট কোম্পানিতে অভিনীত। অচ্ছুৎ এবং অভিজাত শ্রেণীর দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে। কুষ্ঠ রোগ সম্পর্কে আজ যা প্রচার করা হচ্ছে, ব্রজেনবাবু তাই বলেছিলেন। এই পালার সংলাপ অভিনবত্বের দাবী রাখে। ডায়মণ্ড লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয় এই সালেই।

গাঁয়ের মেয়ে।। ১৯৫২ সালে লিখিত, সত্যনারায়ণ অপেরা কর্তৃক অভিনীত। এই সালেই ডায়মণ্ড লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত।

ধর্মের বলি।। ১৯৫২ সালে আর্য অপেরা পার্টীর জন্য লেখা। এই সালেই অভিনীত। নির্মল সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

বিচারক।। ১৯৫৩ সালে নবরঞ্জন অপেরায় অভিনীত। এই সালেই ডায়মণ্ড লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত। বিচার ব্যবস্থার বিরূদ্ধে বক্তব্য। পালাটি অসমিয়া ভাষায় অনূদিত হয় এবং অভিনয় হয়।

লাল পাঞ্জা।। ১৯৫৩ সালে রঙমহল থিয়েটারে নাটক হিসেবে অভিনীত কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত।

পুরুষোত্তম।। ১৯৫৪ সালে নিউ প্রভাস অপেরায় অভিনীত। নির্মল সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত। রাবণ চরিত্রের নবরূপ এবং কুম্ভকর্ণ একটি স্মরণীয় চরিত্র সৃষ্টি।

পরশমণি।। ১৯৫৪ সালে নট্ট কোম্পানির জন্য লেখা, এই সালেই অভিনীত। কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত। নারী জাতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাবার কাহিনী। সামাজিক পালা।

সত্যাশ্রয়ী।। ১৯৫৫ সালে নট্ট কোম্পানির জন্য লেখা ও নট্ট কোম্পানি কর্তৃক অভিনীত। ডায়মণ্ড লাইব্রেরী থেকে এই সালেই প্রকাশিত হয়। যুদ্ধ বিরোধী বক্তব্য এর প্রতিপাদ্য বিষয়।

প্রতিদান, মূক দেবতা।। ১৯৫৬ সালে লেখা এই দুটি পালাই কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী প্রকাশ করে। ১ম পালায় স্বাধীনতার পরবর্তী কালের ভণ্ড রাজনীতিবিদ্‌দের সমালোচনা। ২য় পালায় পালাকার অত্যাচারী জমিদার আর চর্মকার শ্রেণীর সংগ্রাম দেখিয়েছেন।

ভক্তের ডাক ও ভাগ্যের বলি।। ১৯৫৮ সালে লেখা পালা দু'টির ১ম টি নিউ গণেশ ও ২য় টি নিউ রয়েল বীণাপাণি আসরস্থ করে। ১ম টির প্রকাশক ডায়মণ্ড লাইব্রেরী ২য়টি প্রকাশ করে নির্মল সাহিত্য মন্দির।

লোহার জাল।। ১৯৫৯ সালে লেখা ও নট্ট কেম্পানি কর্তৃক অভিনীত। নির্মল সাঃ মঃ থেকে প্রকাশিত।

কাণ্ডারী হুঁশিয়ার, বর্গী এল দেশে, নিষিদ্ধ ফল।। '৬০ সালে লেখা এই ৩টি পালার প্রযোজক যথাক্রমে নিউ রয়েল বীণাপাণি, নব রঞ্জন অপেরা ও ধৃতিশ্রী নাট্য শিল্পম্। ১ম টির প্রকাশক নির্মল সাহিত্য মন্দির, ২য়টির ডায়মণ্ড লাঃ, ৩য় টির প্রকাশক জেনারেল লাইব্রেরী। ১ম পালায় পালাকার আসামের ভাষা সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ ভারতসরকার তথা জহরলাল নেহেরুর সমালোচনা করেছেন। ৩য় পালাটি সম্পূর্ণ সামাজিক। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আন্তরিকতার অভাব থেকেই সন্তানের চরিত্র গঠনে ত্রুটি আসে, এই হলো মূল সুর।

সোনাই দীঘি।। '৬০ সালে লেখা এই পালাটি এই সালেই আসরস্থ করে সত্যম্বর অপেরা। কলকাতা টাউন লাঃ থেকে প্রকাশিত এই পালায় ব্রজেনবাবু উপজীব্য করেছেন পল্লীগাথা।

জীবন যজ্ঞ, সোরাব রুস্তম, কবি চন্দ্রাবতী।। '৬১ সালে লিখিত এই পালা পরিবেশন করে যথাক্রমে ধৃতিশ্রী নাট্য শিল্পম্, অম্বিকা নাট্য কোম্পানি, নিউ রয়েল বীণাপাণি। নিউ রয়েল অবশ্য আসরস্থ করেছিল '৬২ সালে। ৩টি পালারই প্রকাশক কলিঃ টাঃ লাঃ। ১ম পালা রামায়ণ আশ্রিত। এখানে শম্বুক চরিত্রের নব মূল্যায়ন।

২য় পালার মাধ্যমে পালাকার রাজনীতির নেতাদের সৃষ্ট ও পুষ্ট সমাজবিরোধীদের ঘৃণ্য অথচ অসহায় জীবনকে এঁকেছেন।

যাঁদের দেখে না কেউ, প্লাবন, উপেক্ষিতা।। নব রঞ্জন অপেরা, নট্ট কোম্পানি, নাট্য ভারতী কর্তৃক '৬২ সালেই অভিনীত পালা। এই ৩টি পালারই প্রকাশক কলিঃ টাঃ লাঃ।

নাস্তিক, সংগ্রাম ও শান্তি, শয়তানের চর।। '৬৩ সালে লেখা এই পালা ৩টির প্রযোজক নবরঞ্জন (২টি) ও অম্বিকা নাট্য কোম্পানি। প্রকাশক ঃ নির্মল সাঃ মঃ ও কলিঃ টাঃ লাঃ।

ভিক্ষুক ও ডানপিটে, বিল্বমঙ্গল, জনতার মুকুট, ভৈরবের ডাক, রাজদ্রোহী।। এগুলি নর্থল্যাণ্ড হাইস্কুলের ছাত্ররা, নট্টকোম্পানি, অম্বিকা নাট্য কোম্পানি, ভারতী অপেরা, জনতা অপেরা কর্তৃক '৬৬ সালে আসরস্থ হয়। প্রকাশক যথাক্রমে, জেনারেল লাইব্রেরী, কলিঃ টাঃ লাইঃ (২টি) ডায়মণ্ড লাঃ (২টি)।

ভরত বিদায় বা মহীয়সী কৈকেয়ী, মেঘে ঢাকা রবি, মূর্খের পাঁচালী।। '৬৬ সালে লেখা, এই সালেই পরিবেশিত। পরিবেশন করেন যথাক্রমে নট্ট কোম্পানি, তরুণ অপেরা, নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা। ১ম টি নির্মল সাঃ মঃ ও ৩য়টি কঃ টাঃ লাইঃ প্রকাশ করে।

মূর্খের পাঁচালি' পালায় পালাকার পুলিশ বিভাগের দুর্নীতি এবং পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান।

সুলতানা রিজিয়া, দুধ সায়রের দেশে, লৌহ প্রাচীর।। '৬৭ সালে রচিত ১ম ও ২য় পালা পরিবেশন করে নট্ট কোম্পানি। ৩য় পালার পরিবেশক ভারতী অপেরা। ১ম পালার প্রকাশক কলিঃ টাঃ লাইঃ ৩য় পালাটি ছাপেন ডায়মণ্ড লাইব্রেরী। লৌহ প্রাচীর পালায় এক দেব চরিত্রের পুলিশের ছবি এঁকেছেন।

ঝড়ের দোলা, করুণা সিন্ধু বিদ্যাসাগর, রামী চণ্ডীদাস।। '৬৮ সালে লেখা এই পালা ৩টি পরিবেশন করে যথাক্রমে নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা, নট্ট কোম্পানি ও অম্বিকা নাট্য কোম্পানি। প্রকাশক যথাক্রমে শ্রীমা বুক সিন্ডিকেট, মণ্ডল এণ্ড সনস্, নির্মল সাঃ মঃ।

মৃত্যুঞ্জয় সূর্য সেন, শের-ই-তুঘলক, ওভার টাইম, নবীন মাষ্টার, সম্রাট দুর্যোধন।। '৬৯ সালে লেখা এই পালাগুলির প্রযোজক যথাক্রমে ভারতী অপেরা, সাঁঝের আসর, (ওভার টাইম

আসরস্থ হয়নি) আনন্দমঠ যুবক বৃন্দ, সম্রাট দুর্যোধন অভিনীত হয়নি। ১ম পালার প্রকাশক ইউনাইটেড পাবলিশার্স, ৩য় পালা অর্থাৎ ওভার টাইম ছাপেন কলিঃ টাঃ লাঃ এবং নবীন মাষ্টার ছাপেন কলিঃ টাঃ লাঃ।

কৃষ্ণ-শকুনি।। '৭১ সালে লেখা এই পালাটি '৭২ সালে নট্ট কোম্পানির প্রযোজনায় আসরস্থ হয়। অক্ষয় লাইব্রেরী প্রকাশক। শকুনির চরিত্র নতুন ভাবনায় আঁকেন পালাকার।

কলঙ্কিনী রাই।। নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা '৭২ সালে লেখা এই পালাটি '৭২ সালেই আসরস্থ করে। প্রকাশ করে নির্মল বুক এজেন্সী।

নটী বিনোদিনী।। ১৯৭৩ সালে রচিত এবং এই সালেই নট্ট কোম্পানি কর্তৃক অভিনীত ঐ পালার প্রকাশক নির্মল বুক এজেন্সী। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শপথ থেকেই এই পালার জন্ম। এই সালেই নট্ট কোম্পানি ব্রজেনবাবুর 'পাহাড়ের চোখে জল' পালাটিও প্রযোজনা করে। এটির প্রকাশকও নির্মল বুক এজেন্সী।

বিদ্রোহী নজরুল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, ভারত পথিক রামমোহন।। '৭৪ সালে লেখা ১ম পালার পরিবেশক নব অম্বিকা, ২য় পালার পরিবেশক ভারতী অপেরা, ৩য় পালার পরিবেশক নট্ট কোম্পানি। ১ম পালার প্রকাশক নির্মল সাঃ মন্দির। ২য় পালা ছাপেন ইউনাইটেড পাবলিশার্স এবং ৩য় পালা প্রকাশিত হয় "শুভ লিপিকা" নামে একটি পত্রিকায়।

নন্দকুমারের ফাঁসি, কাজীর বিচার, সীতার বনবাস।। '৭৫ সালে লেখা এই পালাগুলি এই সালেই পরিবেশন করে যথাক্রমে নট্ট কোম্পানি, ভারতী অপেরা, মোহন অপেরা। প্রকাশক যথাক্রমে মায়া লাইব্রেরী, অক্ষয় লাইব্রেরী, ইউনাইটেড পাবলিশার্স।

নন্দকুমারের ফাঁসি পালায় পালাকার সুপ্রিম কোর্ট প্রদত্ত তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে রায়ের রূপক বিধৃত করেছেন। কাজীর বিচার পালায় পালাকার ব্রজেনবাবু এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রদত্ত তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর বিপক্ষে রায় উপনীত করেছেন। সীতার বনবাস পালায় রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

পরাজিত মেঘনাদ।। '৭৬ সালে লেখা। এই সালেই মোহন অপেরা পালাটি আসরস্থ করে। পালাকার ব্রজেনবাবু এই পালায় রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রেখেছেন। প্রকাশক ঃ ভৈরব পুস্তকালয়।

পালা সম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দের আরও অনেক পালার সন্ধান পাই, যে গুলির মধ্যে কিছু পালা বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে, বাকি সব গুলি অঅভিনীত ও অপ্রকাশিত।

॥ সাহিত্যিক-প্রাবন্ধিক-গীতিকার ও কবি ব্রজেন্দ্রকুমার ॥

ব্রজেন্দ্রকুমার শুধু পালা রচনায় সিদ্ধহস্ত নন, তাঁর উপরোক্ত বিষয়গুলির ওপরে সমান দখল ছিল। প্রাবন্ধিক ব্রজেন্দ্রকুমারের মধ্যে আমরা এক সৎ এবং নির্ভীক সত্তাকে উপলব্ধি করেছি। প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট এবং সচেতন ভাবেই বলেছেন। যখন যা লিখেছেন তাতে শুধু সাহিত্যের মর্যাদা আরোপ করতে চাননি, সেই সঙ্গে জীবন-শিল্পীর দায়িত্ব পালন করেছেন।

যখন উপন্যাস লিখেছেন তখন কোন আপোস চাননি। যদিও তিনি নিছক উপন্যাস লেখক হয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখেননি তখনও, তবুও উপন্যাস সৃষ্টি করতে বসে সাহিত্যের সংজ্ঞা উপেক্ষা করেননি, তাই তাঁর উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়ে মনে হয়েছে সমকালীন বন্ধু সাহিত্যসেবীর, সাহিত্য বা সাহিত্যিকদের নিয়ামক যাঁরা তাঁরা বড় বেশি আত্মকেন্দ্রিক ; বড় বেশি গোষ্ঠী প্রিয়, বড় বেশি উন্নাসিক অনেক ক্ষেত্রে, এখানেই তাঁদের এক রকম ব্যর্থতা। তাই পরিবেশ-পরিস্থিতি-পটভূমি নির্বাচনে অত্যন্ত সমকালীন হয়েও, চরিত্র অঙ্কনে-শব্দ চয়নে-বিশ্লেষণে-মনস্তত্বের

ব্যাখ্যা প্রদানে সার্থক কথাশিল্পী হয়েও কারও দ্বারস্থ হননি। আপনার মধ্যে আপনি ছিলেন ধ্যানমগ্ন। এ দেশের পালাকারদের ওপর একটা সার্বিক মূল্যায়ন হবার দরকার আছে, এই সত্যটুকু এ দেশের বহু স্বনামখ্যাত পত্রিকা সম্পাদকদের যেখানে মনে আসে না সেখানে পলাকারের প্রবন্ধ বা উপন্যাস প্রকাশ সে তো অসম্ভব। এখানেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে সম্পাদকদের গোষ্ঠীগত জীবনবেদ, যে জীবনবেদ জন্ম দেয় উন্নাসিকতা। এই উন্নাসিকতাই আজকের যাত্রাশিল্পকে শুধু অবমাননাই করেনি, যাত্রাসাহিত্য বা লোকনাট্যের দিকটিকে করেছে উপেক্ষা। এই বিশ্বাস থেকেই ব্রজেনবাবু নিজে যেমন কারও দ্বারস্থ হননি, তেমনি উপেক্ষিতই থেকেছেন। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি এ দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা আর ভালবাসার মালা পরেছেন। স্বার্থপর দুনিয়াকে মনে মনে ঘৃণাই জানিয়েছেন বোধ করি।

॥ যাত্রার অভিনয় ধারা ও ব্রজেন্দ্রকুমার ॥

তিরিশের দশক থেকে এ যাবৎ কাল যাত্রার অভিনয়ে যে ধারা সে প্রসঙ্গে ব্রজেনবাবু অনেকবারই অনেক প্রবন্ধের মাধ্যমে তাঁর মত ও পথের কথা বলে গেছেন। তিরিশের দশকের সূচনা থেকে যাত্রা অভিনয়ে এক বিচিত্র সুরের প্রচলন ছিল। সংক্ষিপ্ত সংলাপের প্রবর্তনের সঙ্গে সেই বিচিত্র ব্যাপারটি একটু একটু করে বর্জিত হতে থাকে। পালাগান অভিনয়ের ধারা কবিগানের চাপান-উতোরের রূপ নিল। সেই থেকে স্বাভাবিক অভিনয় এলো। এ ব্যাপারে সূর্য দত্ত, পঞ্চু সেন, এবং পরে স্বপনকুমার, শান্তিগোপাল, অরুণ দাশগুপ্তের অবদানের কথা বলে গেছেন পালা সম্রাট।

পালাগানে আগে গানই ছিল প্রধান। সবাই গাইত। এরপর জুড়ীর গান যুক্ত হয়। এর রূপ বদলের আভাস নিয়ে এসেছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে অহিভূষণ ভট্টাচার্যের 'সুরথ উদ্ধার' পালার 'দিবোদাস' নামের চরিত্রটি। এই চরিত্রের মুখ দিয়ে পালাকার একটা গান বহুবার-বহু জায়গায় টুকরো করে গাইয়েছিলেন, সেই থেকে বিবেকের জন্ম। অহিবাবুর এই বিবেক ছিল অশরীরী। সে সর্বত্র যেতে পারত। যে বিবেকহীনতাকে খোঁচা দিত, অন্যায় দেখিয়ে দিত, ন্যায়ের পথে নিয়ে যেত। মুকুন্দ দাসের চরিত্র চিত্রণ বিবেকের উচ্চাঙ্গ রূপ। তিনি একক এবং মশাল সদৃশ।

মুকুন্দ দাসের মত সরাসরি বিবেক চরিত্র সৃষ্টি প্রথম করেন ব্রজেনবাবু, সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় তারপর জিতেন বসাক।

পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলন '৭৩ কর্তৃক প্রকাশিত স্মারক পুস্তিকায় জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় এক জায়গায় লিখিত ভাবে বলেছেন, 'রাহুমুক্ত'তে বিবেক প্রথম চরিত্র হয়ে আসে।—এই উক্তি সত্য নয়। সৌরীনবাবু তার 'রক্তবীজ' পালায় এবং ব্রজেনবাবু সমাজের বলি, মায়ের ডাক, চণ্ড মুকুল ইত্যাদি পালায় চল্লিশের দশকের গোড়াতেই বিবেককে চরিত্রে রূপান্তরিত করেছেন।

॥ ব্রজেন্দ্রকুমারের দৃষ্টিকোণ থেকে সমকাল যাত্রা ॥

লোকনাট্যের প্রথম এবং সর্বকালীন ধর্ম হলো, লোকশিক্ষার প্রচার ও প্রসার। সমকালের দোহাই দিয়ে স্বার্থপর, রাজনৈতিক ইজম্ বা হঠাৎ কোন সুপারহিট হিন্দি বায়োস্কোপের গরল, সুদর্শন পাত্রে পরিবেশন করে কর্তব্য সম্পাদন করা নয়। সে দিক থেকে সমকাল যাত্রার সঠিক চরিত্র মূল্যায়ন করে, যথার্থ কিছু ভাল প্রচেষ্টার জন্য অভিনন্দন যোগ্য হবেন তরুণ পালাকার-প্রযোজকদের মধ্যে শান্তিরঞ্জন দে, শম্ভু বাগ, শান্তিগোপাল প্রমুখ। উক্তিটি স্বয়ং পালাসম্রাটের। এর ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে। ব্রজেন্দ্রকুমার স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "সূর্য দত্তের অবসর নেওয়ায়, বড় ফণীবাবু, ছোট ফণীবাবু, পঞ্চু সেন, ভোলা পাল (বড়) চলে যাওয়ায় যাত্রায় নির্দেশকের অভাব হয়েছে। মঞ্চ থেকে যাঁরা যাত্রায় এসেছেন তাঁদের মধ্যে নাট্যকার-শিল্পীরা প্রায় সবাই ফিরে গেছেন। বিধায়ক ভট্টাচার্য কিছুটা সাফল্য লাভ করেছিলেন, মন্মথ রায় সহ সবাই

যাত্রায় ব্যর্থ হয়েছেন। নির্দেশক যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে উৎপল দত্তই সম্ভবতঃ সবচেয়ে জ্ঞানী, মঞ্চ প্রকরণে তাঁর সমকক্ষ শিল্পী খুব কমই আছে, কিন্তু উৎপলীয় যাত্রা-যাত্রার সামগ্রিক স্তরে কোন দাগ ফেলতে পারেনি।"

॥ যাত্রা প্রসঙ্গে সংবাদপত্রের ভূমিকা এবং ব্রজেন্দ্রকুমারের প্রতিক্রিয়া ॥

উনবিংশ শতাব্দীতে, কিছু কিছু তার পরবর্তী সময়ে, বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের আগে, দেশের সংবাদপত্র এবং তাঁদের সম্পাদক বা সম্পাদক মণ্ডলীর সব সময় সামাজিক দায়িত্ব পালনের প্রচণ্ড চেষ্টা ছিল। সেকালের সংবাদপত্রে সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক গতি ও প্রকৃতির সুস্পষ্ট ছবি ফুটে উঠতো। অন্যায়ের প্রতি গর্জে ওঠার মানসিকতা ছিল। সমালোচনায় সততা ছিল। সমকালের সমালোচনা পরবর্তী প্রজন্মের প্রয়োজন মেটাবে একথা মনে রেখেই কাউকে ছেড়ে কথা বলা হতো না। সংবাদপত্রগুলির আলাদা ভাবমূর্তি ছিল বলেই, লোক সংবাদপত্রকেই বিশ্বাস করত, শ্রদ্ধা করত, ভয় করত। যুগ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনে সংবাদপত্রর কর্তৃপক্ষরা অনেক ক্ষেত্রেই সেই আদর্শ থেকে সরে গেলেন। ব্যবসায়িক স্বার্থকে বড় করে দেখতে গিয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিও পাল্টে গেল। বিশেষ করে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের প্রতি সংবাদপত্রের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য তা পাল্টে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে বিভাগীয় সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত স্বার্থ বজায় রাখার মানসিকতা প্রকট হলো। বিজ্ঞাপনের আকৃতি ও প্রকৃতি প্রকৃত পক্ষে সমালোচকদের, কর্তৃপক্ষের নিয়ামক হলো। এর ফলে যারা প্রভূত অর্থ খরচ করে পণ্যের বিজ্ঞাপন দেন, তাদের পণ্যের সঠিক পর্যালোচনা, সমালোচনার ব্যাপারটা হারিয়ে যেতে থাকল। বিশেষ করে সত্তরের দশকের পর থেকে যাত্রাশিল্পের মত একটি জনপ্রিয়, শক্তিশালী গণমাধ্যম একটু একটু করে অর্থের দাপটে সংবাদপত্রের আসরে বসার অধিকার পেল, কিন্তু কোথায় যেন পঙক্তি বিভক্তিকরণ থেকে গেল সেখানে। যাঁরা বিশাল বিশাল বিজ্ঞাপন দিতে পারেন তাঁদের প্রযোজিত যাত্রাপালা প্রসঙ্গে সমালোচকদের প্রশংসার জোয়ার বইল। যাঁরা বিশাল বিশাল বিজ্ঞাপন দিতে অপারগ তারা যতই পালাগানের সর্বস্তরে যত্নবান থাকুন, সংবাদপত্র তাঁদের দিকে ফিরেও তাকাল না। এর ফলে আগামী প্রজন্ম বিশেষ করে যাত্রা শিল্পের সঠিক চেহারা, যাত্রাপালা, বিষয় উপস্থাপনা, অভিনয়, প্রযোজনা প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ অন্ধকারে থেকে যাবে। যা রত্ন হিসেবে গ্রহণ করবে তা কতটা রত্ন তা যাচাই করে দেখার সুযোগ হবে না। যাত্রা ব্যবসা থেকে মুনাফা লুটে নেবার তাগিদে যাত্রার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ প্রযোজকই যেখানে ব্যবসায় ক্ষতির আশঙ্কা মনে করে সঠিক সমালোচনার বিরোধিতায় সোচ্চার, সেখানে যাত্রা হীন-কদর্য এবং অসামাজিক একটি বস্তু, এটি যত বেশি প্রতিপন্ন করা যাবে ততই যাত্রা থেকে তোলা যাবে আশাতীত লাভের অঙ্ক, এই ভাবনার শিকার হলো যাত্রা। যাত্রাকে দাবিয়ে রাখা, তাকে এক ঘরে করে রাখার একটা চাপা ষড়যন্ত্র দেখা দিল। তাই যাত্রা না পেল সাহিত্যের মর্যাদা, না পেল লোকনাট্য বা লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কাণ্ডারীর ন্যায্য শ্রদ্ধা।

সৎ ও সঠিক সমালোচনা, চুলচেরা বিচার ব্যবসার ক্ষতি করতে পারে ভেবে নিয়ে মালিকপক্ষ সাংবাদিকদের অন্যভাবে প্রলুব্ধ করলেন, পালা বা অভিনয় ধারা প্রসঙ্গে কঠোর সমালোচনা করলে, বড় দরের শিল্পী ও পালাকাররা ক্ষোভ প্রকাশ করে মালিকদের ভুল বুঝতে থাকলেন। তাঁরা মনে করলেন এই কঠোর সমালোচনায় মালিকপক্ষের হাত আছে। অগত্যা 'আহা', 'অপূর্ব', 'অসামান্য', 'অতুলনীয়', বিশেষণে সব সমালোচনাই ভরে গেল। এতে প্রকৃত পক্ষে রেকটিফিকেশনের সুযোগ রইল না, ক্লাসিক কলা চুরি হতে থাকল, যাত্রা সর্বদিক দিয়েই কৌলিন্য হারাতে থাকল।

ব্রজেন্দ্রকুমার বলেছেন, যাত্রা প্রসঙ্গে কিছু কিছু লিটল্ ম্যাগাজিনের দৃষ্টি পরিষ্কার। বাংলার

লোকসংস্কৃতির এই অন্যতম শরিকের অস্তিত্ব বজায় থাকতে পারে যদি লিটল ম্যাগের দামাল সম্পাদকরা একটু এ ব্যাপারে দৃষ্টি দেন!

॥ বিদ্রোহী নজরুল পালার কবি মোহিতলাল এবং ব্রজেন্দ্রকুমার ॥

১৯৭৪ সালে লেখা এবং নব অম্বিকা নাট্য কোম্পানির ব্যানারে অভিনীত হওয়া 'বিদ্রোহী নজরুল' পালায় কবি মোহিতলাল মজুমদার একটি বিশিষ্ট চরিত্র হয়ে উঠেছিলেন পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমারের ভাবনা ও কলমে। পালাটি উক্ত মরশুমের শেষ দিকে রবীন্দ্রকাননের যাত্রা উৎসবে আসরস্থ হয়। পরে, এ দেশের কয়েকজন অধ্যাপক এবং কিছু বিদ্বজন কবি মোহিতলালকে পালাকার হেয় করেছেন, বিকৃত করেছেন বলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। এই প্রসঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি পত্র-প্রকাশিত হয়।

"রবীন্দ্রকাননে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলনের শেষ দিনে অভিনীত হল নব অম্বিকা নাট্য কোম্পানিব বিদ্রোহী নজরুল পালা।...নজরুলের একদা গুরুস্থানীয় কবি মোহিতলাল মজুমদার চরিত্রটিকে এই পালায় হাস্যকর চরিত্ররূপে উপস্থিত করা হয়েছে। নজরুল ও মোহিতলালের মধ্যে মধুর সম্পর্ক পরে নষ্ট হয়ে যায়। মোহিতলাল নজরুলকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তিনি প্রায়ই কুপিত হতেন। এ সবই সত্য। কিন্তু এখানে দেখি মোহিতলাল যখনি আসরে আসেন, তখনই দর্শকরা হেসে গড়িয়ে পড়েন। এই চরিত্র কথায় কথায় বলেন—"আমি মোহিতলাল মজুমদার বি. এ"। ক্ষণে ক্ষণে কুপিত হয়ে কাশতে কাশতে বেদম হয়ে পড়েন, গালি দেন, যেখানে সেখানে থুতু ফেলেন এবং নজরুলের পরিচারকও তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা করে। আর আসর শুদ্ধ লোক হেসে ওঠেন। কবি মোহিতলাল চরিত্রের এই বিকৃতি সাধন ও তাঁকে নিয়ে মজা করার অধিকার পালা রচয়িতা ও নির্দেশককে কে দিয়েছে? মোহিতলাল চরিত্রে এইসব হাস্যকর উপাদান তাঁরা কোথায় পেলেন তা জানালে বাধিত হব।" চিঠিটির লেখক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সারির অধ্যাপক ডাঃ অরুণ মুখোপাধ্যায়।

এর দিন দশেক বাদেই প্রকাশিত হল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আর এক অধ্যাপক শিশির দে'র একটি চিঠি—

"যাত্রা জগতে বিকৃতির অভাব নেই ; কিন্তু জীবননাট্য নিয়ে এইরূপ বিকৃতি চোখে পড়েনি। যাত্রায় বিদ্রোহী নজরুল পালায় কবি মোহিতলালের এই বিকৃত চরিত্র অঙ্কনের জন্য পালাকার ব্রজেনবাবুকে জবাবদিহি করা উচিত।...মোহিতলালের ব্যক্তিগত জীবনের সবকিছুই বিকৃত চরিত্র রূপে আসরে উপস্থাপিত করতে পালাকারের কলম কোন লজ্জাবোধ করল না? নিকট অতীতের একজন খ্যাতিমান কবিকে নিয়ে অমন ব্যঙ্গ করা পালা সম্রাটের সাম্রাজ্যের অগ্রগতি বোঝায় না।...মোহিতলালের এই বিকৃত চরিত্র অঙ্কন ছাত্রসমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। যাত্রার আসর জমাতে অনেক অবান্তর কলাকৌশল দরকার হয় এবং সে জন্য যাত্রার পালা সাহিত্যের দরবারে এ পর্যন্ত আসতে পারেনি।" (৩ মার্চ, ১৯৭৫)

এর দিন দশেক বাদে আবার প্রকাশিত হল এ প্রসঙ্গে দুটি পত্র। কবি মোহিতলালের পুত্র অধ্যাপক মনসিজ মজুমদার, যিনি চৈতন্য কলেজের শিক্ষক, লিখলেন, "আমার বাবার জীবনে যদি এমন কোন ঘটনা থাকে এবং তা যদি যথাযথভাবে নাটক জীবনীতে চিত্রিত হয় তবে আমরা তাতে বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হতাম না। কারণ সত্য যত নিষ্ঠুর হোক, যত অপ্রিয় হোক তা প্রকাশ ও প্রত্যক্ষ করাই পৌরুষ। কিন্তু সত্যের বিকৃতি ঘটানোর অধিকার নিশ্চয় কারো নেই।"

এরই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল প্রবোধবন্ধু অধিকারীর পত্র, যাতে তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, "...দুই পত্র লেখক কি শেষ পর্যন্ত পালাটি দেখেছেন?" (১২ মার্চ, ১৯৭৫)

প্রবোধবন্ধুবাবুর পত্রের উত্তরে পূর্বোক্ত ডঃ অরুণ মুখোপাধ্যায় আবার লিখলেন, "প্রবোধবাবু



নট্ট কোম্পানির অন্যতম প্রাণপুরুষ সূর্য দত্ত









□ পালাকার নন্দদুলাল রায় চৌধুরীকে সম্বর্ধনা জানালেন প্রফুল্লকান্তি ঘোষ, অসহায় যাত্রাকর্মীর স্ত্রীর হাতে অর্থ সাহায্য তুলে দেন শম্ভুনাথ মুখার্জী পঃ বঃ যাত্রা. সম্মেলনের পক্ষে। পাশে সম্মেলনের কোষাধ্যক্ষ নীলমণি দে।

প্রবীনতম প্রয়াত কৌতুক অভিনেতা মাখন সমাদ্দারকে সম্বর্ধনা দিলেন শৈলেন মোহান্ত।



☐ কার্লমার্কস (শান্তিগোপাল) দেখতে এসেছিলেন সর্বভারতীয় কম্যুনিষ্ট দলের নেতা পি. সুন্দরাইয়া। পাশে শিব ভট্টাচার্য।



☐ প্রবীন অভিনেতা, অকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জীর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন আজকের প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক সঞ্জয় সিংহ যাত্রা অর্ঘ্য পত্রিকার পক্ষে।



ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, অমিয় ভট্টাচার্য, পঞ্চানন মিত্র, প্রশান্ত ভট্টাচার্য, উৎপলা সেন, সতীনাথ মুখার্জী, অধীর বাগচী, গোপাল মল্লিক








পশুপতি ভট্টাচার্য,
ভি. বালসারা, অজয় দাস,
আনন্দশঙ্কর।
গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়।

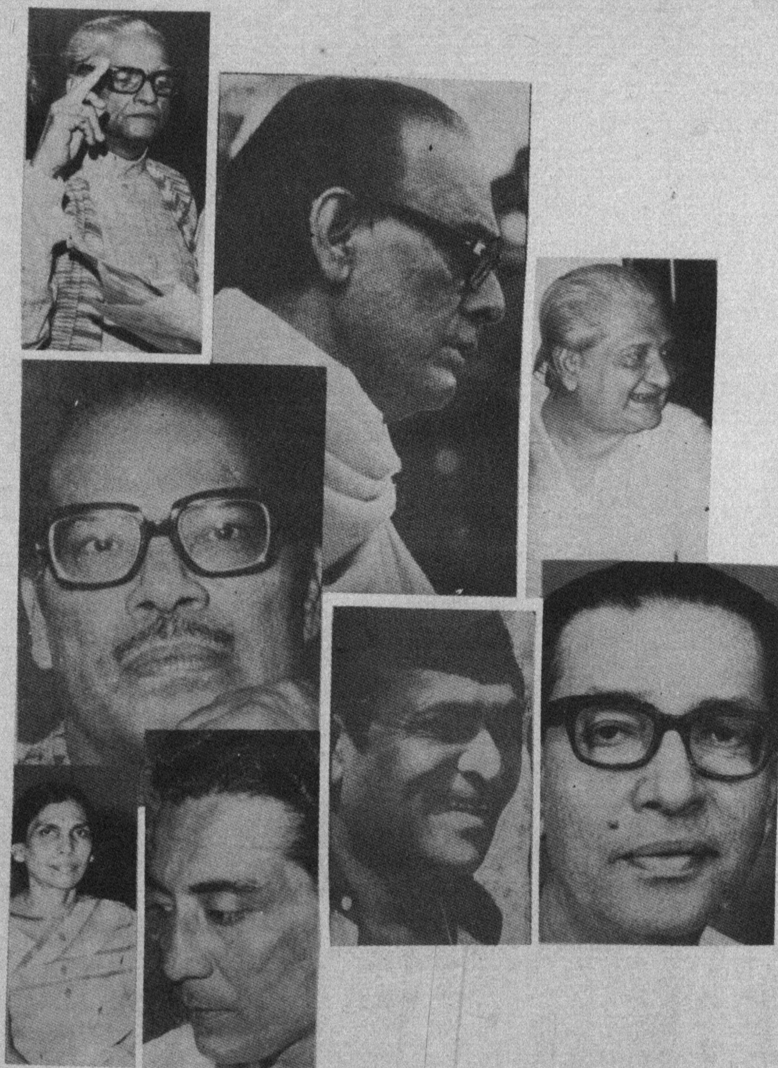
শোভাবাজার গঙ্গার তীরবর্তী নট্ট কোম্পানির প্রাসাদ



নট্ট কোম্পানির কর্ণধার মাখনলাল নট্ট



কোন এক অনুষ্ঠানে মাখনলাল নট্টকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন তিনকড়ি



যাঁদের সুর ও বাণীতে যাত্রা সমৃদ্ধ ঃ □
অনিল বাগচী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, মান্না দে, নীতা সেন, শ্যামল মিত্র, ভুপেন হাজারিকা, রাজেন সরকার।

আমাকে মলাট-পড়া পণ্ডিতদের দলে ফেলবেন না। কোনো বই পুরো না পড়ে বা পুরো অভিনয় না দেখে মত দিই না।"[২] এখানে মনে রাখা দরকার, যে ডঃ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র পরবর্তী কবি সমাজ নামক গবেষণা গ্রন্থের রচয়িতা। ঐ গ্রন্থের দুটি অধ্যায়ে মোহিতলাল ও নজরুল সম্পর্কে তিনি বিশদ আলোচনা করেছেন। তাছাড়া ডঃ মুখোপাধ্যায়ের বিভিন্ন গ্রন্থ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ক্লাশে পড়ানো হয়।

এই সময় অধ্যাপক ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষাল সম্পাদিত আলেখ্য পত্রিকায় "মোহিতলালের স্মৃতিকথা" প্রবন্ধে অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ লিখলেন, "সম্প্রতি বিদ্রোহী নজরুল নামক একটি যাত্রাপালায় মোহিতলালের মৃত্যুর এতকাল পরেও সেই চরিত্র হননের একই প্রয়াস দেখে স্তম্ভিত হয়েছি। নাট্যকার ব্রজেন দের সঙ্গে গ্রীণরুমে আলাপ করে দেখলাম, ভদ্রলোক মোহিতলালের জীবন ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মোহিতলালকে কখনও চোখেও দেখেন নি, সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর বিরোধী শিবিরের লোকও নন। তথাপি নাটকে মোহিতলালকে এমন ভাবে উপস্থিত করেছেন—যাতে তাঁর আদর্শবাদী বলিষ্ঠ সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব ধূলায় লুণ্ঠিত হয়েছে। মনে হয়, অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে একশ্রেণীর স্বার্থান্ধ লোক মোহিতলালের চরিত্র হননের চেষ্টা করছে। এরূপ চরিত্রহনন প্রয়াসকে সংঘবদ্ধভাবে বাধা দেওয়া সুবিবেকী সাহিত্যিক মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করি।" (আলেখ্য/শারদ সংখ্যা/১৩৮২)

এর কিছুকাল আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁর বহু পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত, বলেছিলেন, "মোহিতলালের হাঁপানি কাশির নিত্যনৈমিত্তিক পীড়ন ছিল—একথা বললে ভুল বলা হবে।"

(আনন্দবাজার পত্রিকা ২০ আগস্ট, ১৯৭৫)

পূর্বোল্লিখিত অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, যাঁর বহু পুস্তক রেফারেন্স বই হিসেবে উচ্চ-শ্রেণীর ছাত্রেরা ব্যবহার করে থাকেন, যিনি টলস্টয়ের What is art গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেছেন এবং যিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ, হুগলী মহসিন কলেজ, কারমাইকেল কলেজ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন, আরও বলেছিলেন, "Mohitlal had a robust health."

(অমৃতবাজার পত্রিকা ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪)

পূর্বের ২০ আগস্ট, ১৯৭৫—এই বহু পাঠ্যপুস্তকের প্রণেতা ও কোচবিহার গভর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপক ডঃ ভবতোষ দত্ত বলেছিলেন, (নজরুল মোহিতলালে মনোমালিন্য ঘটে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে) "আমার অভিমত ঐ ধারণা ভিত্তিহীন।" (আনন্দবাজার পত্রিকা)

ঐ তারিখেই ভবতোষবাবু আরও বলেছিলেন, "মোহিতলাল ছিলেন অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ।...কথা বলতেন সুন্দর পরিষ্কার বাংলায়—শাণিত ভাষায়। সেগুলি টুকে নিলে সুন্দর প্রবন্ধ হত।"

অতঃপর বিদ্রোহী নজরুল পালার রূপকার ব্রজেন্দ্রকুমারের বিরুদ্ধে আনীত সুধী বিজ্ঞজনের অভিযোগগুলিকে একত্রিত করা যাক :

১। এ পালার মোহিতলাল হাঁপানি ও কাশির রুগী, তিনি যত্র তত্র থুথু ফেলেন, যা বাস্তবের মোহিতলালের মধ্যে ছিল না।

২। কথায় কথায় "আমি মোহিতলাল মজুমদার, বি এ," বলে আত্মপরিচয় মোহিতলাল এ পালায় দিয়েছেন, বাস্তবে যা কখনও সত্য ছিল না।

৩। নজরুলের পরিচারকও তাঁকে এ পালার মধ্যে ঠাট্টা করেছে যা তথ্যের দিক থেকে ভুল।

৪। মোহিতলালের সঙ্গে নজরুলের কোন বিরোধ বাস্তবে ঘটে নি, যা এ পালায় কল্পনা করে দেখানো হয়েছে।

৫। মোহিতলালের স্বাস্থ্য খুবই খারাপ বলে এ পালায় দেখানো হয়েছে, যা মিথ্যা এবং......

৬। মোহিতলাল এ পালায় কুপিত হয়ে গালি দিচ্ছেন, তাঁর মত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষের মধ্যে যার অস্তিত্ব কখনও টের পাওয়া যায় নি।

প্রথম অভিযোগটি উত্থাপন করেছেন ডঃ অরুণ মুখোপাধ্যায় ; সমর্থন করেছেন ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির দে ও মনসিজ মজুমদার। দ্বিজেন্দ্রলাল নাথও বলেছেন যে, বিদ্রোহী নজরুল পালায় কবি মোহিতলালের চরিত্র বিকৃত করে দেখানো হয়েছে। ওই বিকৃতির নমুনা স্বরূপ তিনি বলেছিলেন, "এতে দেখানো হয়েছে তিনি কাশছেন।" (সত্যযুগ ৬।৯।৭৫) তা ছাড়া ডঃ ভবতোষ দত্ত এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলেন যে, মোহিতলালকে উনি কখনও 'হ্যাক থু' করে থুথু ফেলতে দেখেন নি। (আনন্দবাজার ২০।৮।৭৫)

দ্বিতীয় অভিযোগটিরও উত্থাপনকারী ডঃ মুখোপাধ্যায়। সমর্থক প্রথমত শিশির দে ও মনসিজ মজুমদার। ডঃ ভবতোষ দত্ত "কখনও বলতে শুনেছেন, আমি মোহিতলাল মজুমদার বি এ" প্রশ্নের উত্তরে জানিয়ে ছিলেন, "শুনে হাসি পাচ্ছে। এমন সিরিয়াস প্রকৃতির লোক এভাবে কথা বলবেন।" (আনন্দবাজার ২০।৮।৭৫) দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ মোহিতলাল চরিত্রের (পালার মধ্যেকার) বিকৃতির উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "জানো, আমি মোহিতলাল মজুমদার বি.এ।"[১] অর্থাৎ অরুণবাবুর অভিযোগের তিনিও এক সমর্থক।

তৃতীয় অভিযোগও তুলেছেন ডঃ মুখোপাধ্যায়। সমর্থক হিসেবে শিশির দে এবং মনসিজবাবুকে ধরা যেতে পারে।

চতুর্থ অভিযোগটি তুলেছেন ডঃ ভবতোষ দত্ত। তবে এ ব্যাপারে তাঁর কোন সমর্থক তিনি পান নি।

পঞ্চম অভিযোগটি দ্বিজেন্দ্রলাল নাথের। তিনিও সমর্থকহীন। তবে ডঃ অরুণ মুখোপাধ্যায়, মনসিজ মজুমদারকে তাঁর সমর্থক হিসেবে ধরা যেতে পারে।

ষষ্ঠ অভিযোগটি এনেছিলেন প্রথম চারটি অভিযোগের প্রবক্তা ডঃ অরুণ মুখোপাধ্যায়। ডঃ ভবতোষ দত্ত তাঁর সমর্থক।

এবার দেখা যাক মোহিতলাল তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিছু বলেছেন কিনা। উল্লিখিত ডঃ ভবতোষ দত্ত ও আজহারউদ্দিন খানের যুগ্ম সম্পাদনায় "জিজ্ঞাসা" থেকে এই ঘটনার বছর ছয়েব আগে প্রকাশিত হয়েছিল মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ। সেই গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে মোহিতলাল বিভিন্ন সময়ে লিখছেন ঃ

"নিজে Neurasthenia-রোগী, বর্তমানে মন আরও দুর্বল...Chronic Bronchitis তার উপর Pneumonia..." (পৃষ্ঠা-৩৫)

"নিজে Acute Neurasthenia-য় ভুগিতেছি।" (পৃষ্ঠা-৩৭)

"আমার স্বাস্থ্য বড়ই ভাঙিয়া পড়িতেছে Nervous breakdown স্থায়ী হইয়া উঠিয়াছে। তার উপর gastric trouble, blood pressure প্রভৃতি।" (পৃষ্ঠা-৬৮)

"আমার দেহ ব্যাধি ও জরায় জীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।" (পৃষ্ঠা-৯৭)

"আমার স্বাস্থ্য বড় ভাঙিয়াছে..." (পৃষ্ঠা-১১৮)

"মাঝে Blood pressure ভয়ানক বেড়ে উঠেছিল, একদিন একটা Stroke-এর মতও হয়েছিল।" (পৃষ্ঠা-৩৪)

"আমার স্বাস্থ্য যেরূপ ভাঙিয়াছে তাহাতে আরোগ্য লাভের আশা করি না Chronic Bronchitis এবং Blood pressure-এর কোন চিকিৎসা নেই।" (পৃষ্ঠা-১৫৯-১৬০)

"ইতিমধ্যে কিছুদিন Blood pressure খুব বাড়িয়াছে। তার উপর হাঁপানি কাশির দারুণ আক্রমণে প্রায় শয্যাশায়ী হইয়াছিলাম।" (পৃষ্ঠা-১৬১)

"শরীর ভাঙিয়াছে।" (পৃষ্ঠা-১৭৩)

"মস্তিষ্কের দুর্বলতা বুকে শ্লেষ্মার প্রকোপ এবং পরিশেষে পাকস্থলীর বিকলতা'...এই তিন ব্যাধির মিলিত আক্রমণে আমি ক্রমেই নির্জীব হইয়া পড়িতেছি।" (পৃষ্ঠা-১৭৬)

"হাঁপানি মস্তিষ্কের দুর্বলতা ও পাকস্থলীর পীড়া...এই তিন মারাত্মক ব্যাধিই কখনও একা, কখনও মিলিয়া আমাকে অতিশয় দুর্বল করিয়াছে।" (পৃষ্ঠা-১৭৭)

"অসুবিধা হচ্ছে filaria, আর একবার বছর ৪/৫ আগে হয়েছিল।" (পৃষ্ঠা-১৭৯)

"Nervous breakdown পূর্ব হইতেই হইয়াছিল,...শীতের সঙ্গে আমার পুরানো ব্যাধি—হাঁপানি ও কাশি আরও বাড়িয়াছে। দুই মাস আমি Chronic bronchitis ও Blood pressure-এর চাপে এত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম..." (পৃষ্ঠা-১৮২)

"Blood pressure, Nervous break-down ও হাঁপানি, এই সব আমাকে একেবারে মুমূর্ষ করে ফেলেছে।" (পৃঃ-১৯৩)

"Gastric trouble, পেটে ও বুকে আহারের পর একরকম যন্ত্রণা হয়। আমার Heart বড় দুর্বল।" (পৃষ্ঠা-২০৪)

"আমার Blood pressure এখনও বাড়িয়াই আছে।" (পৃষ্ঠা-২১২)

"অতিরিক্ত Blood pressure ; তার উপর হাঁপানি কাশির নিত্য ও নৈমিত্তিক পীড়ন।" (পৃষ্ঠা-২৩৮)

শ্লেষ্মা ও হাঁপানি বাড়িয়াছে। (পৃষ্ঠা-২৮৮)

তাহলে দেখা যাচ্ছে মোহিতলালের Neurasthenia, Chronic Bronchitis, Nervous breakdown, Gastic trouble, Blood pressure, হাঁপানি, কাশি, শ্লেষ্মার প্রকোপ ছিল। এছাড়া Filaria-ও তাঁকে আক্রমণ করেছিল। একবার Stroke হয়েছিল। Pneumonia-তেও তিনি ভুগেছিলেন। অতএব প্রমাণ হচ্ছে যে মোহিতলাল হাঁপানি- কাশির রুগী ছিলেন। আর শ্লেষ্মা, হাঁপানি, Chronic Bronchitis থাকলে থুথু ফেলা অস্বাভাবিক কি? নবম, দ্বাদশ, চতুর্দশ পঞ্চদশ, অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ উদ্ধৃতিতে হাঁপানি কাশি প্রসঙ্গে অসিতবাবুর বিপরীত কথাই প্রমাণ হচ্ছে। অষ্টাদশ উদ্ধৃতিতে হাঁপানি ও কাশি নিত্য ও নৈমিত্তিক পীড়ন ছিল বলে মোহিতলাল স্বীকার করেছেন। অতএব এ প্রসঙ্গে অরুণবাবু, অসিতবাবু, মনসিজবাবু, শিশিরবাবু, দ্বিজেন্দ্রবাবু মিথ্যা প্রচার করেছেন।

এতগুলো যাঁর রোগ এবং যিনি নিজেই বক্তা দ্বিজেন্দ্রলাল নাথকে লিখেছেন, "আমার স্বাস্থ্য পূর্ববৎ! শরীর ভাঙিয়াছে—বোধহয় আর বেশিদিন টিকিবে না।" (পৃঃ-১৭৩) তাঁর কি করে robust health হতে পারে তা বোঝা খুবই সহজ। অর্থাৎ শ্রীনাথ সুপরিকল্পিতভাবে মিথ্যাভাষণ করেছেন। ফলত পঞ্চম অভিযোগটিও ধোপে টিকল না।

দ্বিতীয় অভিযোগটিকে এবার বিচার করা যাক। ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত "বিদ্রোহী নজরুল" পালার চল্লিশ পৃষ্ঠায় দেখা যাচ্ছে, মোহিতলাল 'আমি' প্রবন্ধটি পাঠ করে শোনাচ্ছেন নলিনী সরকার ও পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে। সে সময়ে—"আমি শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি. এ"—এইভাবে উল্লেখ

করা হয়েছে। মুজাফ্ফর আহমেদের "কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথার" ১২৪ পৃষ্ঠাতে মোহিতলালের "আমি" প্রবন্ধটি ১৩২১ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসের 'মানসী' পত্রিকা থেকে অবিকল ছেপে দেওয়া হয়েছে। তাতেও "আমি" ঠিক ঐভাবে মুদ্রিত আছে বলেই দেখা যাচ্ছে। বিদ্রোহী নজরুল পালার আর কোথাও মোহিতলালের মুখে "আমি মোহিতলাল মজুমদার বি. এ." বসানো হয়নি। প্রবোধবন্ধু অধিকারীর পূর্বোক্ত পত্রেও লেখা ছিল, "পালা প্রযোজনার আগে মূল রচনাটি আমার পড়বার সৌভাগ্য হয়েছিল।...পালায় তিনি (পালাকার) একটি জায়গায় "আমি মোহিতলাল মজুমদার বি. এ উল্লেখ করেছেন।" অভিযোগকারী অরুণ মুখোপাধ্যায়, এর আগেই দেখিয়েছি, মোহিতলাল হাঁপানি কাশির রুগী একথা স্বীকার করেন নি এবং পালাকারকে সেজন্যে আক্রমণ করেছেন। যা প্রমাণ করা হয়েছে সম্পূর্ণ অসত্যের উপরে দাঁড়িয়েই তা করা হয়েছিল। কাজেই এ ক্ষেত্রেও তিনি সত্যনিষ্ঠ তা মেনে না নিলে অন্যায় হয় না। তাই এ অভিযোগটির ক্ষেত্রেও অরুণবাবু, শিশিরবাবু, মনসিজবাবু এবং দ্বিজেন্দ্রবাবুকে অসত্যভাষী ধরে নিচ্ছি।

তৃতীয় অভিযোগটির বিচারে বসে কিছুটা বিস্মিত হতে হয়। কারণ গোটা মুদ্রিত পালার কোথাও চাকর মোহিতলালকে ঠাট্টা করছে,—এমন দেখা যাচ্ছে না। কাজেই এটাকেও সত্য বলে মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। অরুণবাবু, শিশিরবাবু এবং মনসিজবাবু এর আগেই সত্যভ্রষ্ট বলে প্রমাণিত হয়েছেন। অতএব এক্ষেত্রেও তাঁদের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলা যাবে।

চতুর্থটির ক্ষেত্রে প্রবক্তা ডঃ ভবতোষ দত্ত নিজেই মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, "মোহিতলাল নজরুল বিরোধ অতীতের ঘটনা।" (পৃষ্ঠা-৪০) "বিরোধ" শব্দটি 'তিনিই উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ৩৪ পৃষ্ঠা থেকে শুরু করে ৪০ পৃষ্ঠার কিছুটা জুড়ে এই বিরোধসংক্রান্ত ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে মোহিতলালই এক পত্রে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লিখেছিলেন, "নজরুল সম্বন্ধে আমি যে কঠিন মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছি তাহার একাধিক কারণ আছে ; আমার জীবনে ওইটাই প্রথম বড় shok তাহার পরিমাণ বা গভীরতা অন্যে বুঝিবে না।" অচিন্ত্যবাবুর কল্লোল যুগ সম্পর্কে মোহিতলালের এই উক্তি। অচিন্ত্যবাবু কল্লোল যুগের ৫৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "ভাবের ঘরে অবনিবনা হয়ে গেল।" মোহিতলাল লিখেছিলেন, "আপনার কল্লোল যুগ আমাকে একজন দেখাইয়াছিল। আমার সহিত নজরুলের পরিচয় ও তাহার সহিত যে সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছিল তাহার একটা মোটামুটি সত্য বিবরণ আপনিই বোধহয় সর্বপ্রথম প্রকাশ করিলেন।" (মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ, পৃষ্ঠা-২৪৫)। আজহারউদ্দিন খান মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ গ্রন্থের তথ্যপঞ্জিতে লিখেছেন, এই দুই কবির সম্পর্কে বিশদ তথ্য। বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল গ্রন্থে আজহারউদ্দিন খান লিখেছেন, "বিরোধ হলেও কাজীর কবিতা মোহিতলালের প্রিয় ছিল।" ডঃ মুখোপাধ্যায় পূর্বোল্লিখিত পত্রে বলেছেন, "নজরুল মোহিতলাল মধুর সম্পর্ক পরে নষ্ট হয়ে যায়।" কবিপুত্র মনসিজ মজুমদারও বলেছেন, "...এই প্রভাবমুক্তি দুজনের (নজরুল ও মোহিতলাল) বন্ধুতার সম্পর্কেও ছেদ ঘটায়।" (আনন্দবাজার পত্রিকা ১২ই মার্চ, ১৯৭৫)। কাজেই দেখা যাচ্ছে ডঃ ভবতোষ দত্ত যে অভিযোগ তুলেছেন, তার গোড়াতেই গলদ।

ষষ্ঠ অভিযোগের উত্তরে বলা যায় যে, মোহিতলাল সমকালের সাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশীর সম্পর্কে বলেছেন, "এবার আমার শ্রীকান্তকে লইয়া মর্কট নিজের নাক-কান ছিঁড়িয়াছে।" (মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ, পৃষ্ঠা ৩০৫)। বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষার প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে লিখেছেন, "প্রমথ চৌধুরীর মত জ্যাঠামহাশয়কে যখন পাইয়াছ, তখন কায়দা ও চালিয়াতি আরও ভাল রকমেই অভ্যাস হইবে।" (একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৭৪)। অধ্যাপক সুবোধ সেনগুপ্তকে বলেছেন, "সমালোচক hero." (একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৭৩), যাঁরা কোন সময়ে মোহিতলালের বিরূপ সমালোচনা করেছেন, তাঁদের সম্পর্কে বলেছেন, "সম্প্রতি কিছুকাল যাবৎ যেন দৈবের পরিহাসের

মত একদল কুকুর আমার পিছনে লাগিয়াছে ; তাতেও নিস্তার নাই, কে একজন আমার জবানীতে জবাব দিয়াছে তাহাতে সকলের বিশ্বাস আমি ঐ কুকুরের আক্রমণে বিচলিত হইয়াছি ; কুকুরের দল তাহাতে বড় গৌরব বোধ করিতেছে।" (একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১৪৩)। অথবা "আমার পিছনে কুকুর লাগিয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হই নাই—আমাদের দেশে পথেঘাটে চলিতে হইলে অমন অনেক নেড়ীকুত্তার উপদ্রব সহ্য করিতে হয়।" (একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-২৪৩) কিংবা, "শ্মশানে শিয়াল কুকুর থাকে, তারা চিৎকার করে, করিবেই (ঐ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-২৪৭)। কমরেড মুজাফ্ফর আহমেদ তার পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে লিখেছেন, "প্রবাসীর পরিচালকদের নাম উচ্চারিত হলেই তিনি মর্কট, বিটকেল ও আরও নানা রকম অশালীন কথা ব্যবহার করতেন।" (পৃষ্ঠা-১৩৩) এবং "যাঁরা মোহিতলালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন, তাঁরা জানতেন যে কথায় কথায় তিনি মর্কট ও বিটকেল কথা ব্যবহার করতেন।" (পৃ-১৩৪) অতএব এক্ষেত্রেও ডাঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ও ডঃ ভবতোষ দত্ত অসত্য ভাষণ করেছেন।

আরও একটি অভিযোগ অন্যের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে স্ব-রচিত কবিতা শোনাবার প্রবণতা ছিল তাঁর এবং যার ফলে শ্রোতা তাঁকে পাঠরত অবস্থায় একাকী ফেলে পালিয়ে যায়, মোহিতলালের প্রশংসাধন্য কল্লোল যুগ গ্রন্থে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত বলেছেন, "ফুটপাথের ওপর গ্যাস পোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে তিনি (মোহিতলাল) যখন আমাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা কবিতা পড়িয়ে শোনাতেন, তখন আবৃত্তির বিহ্বলতায় তাঁর দুই চোখ বুজে যেত। আমরা কে শুনছি বা না শুনছি, বুঝছি বা না বুঝছি, এটা রাস্তা না বাড়ি, সে সব সম্পূর্ণ, অপ্রাসঙ্গিক ছিল। তিনি যে তচ্চাতচিত্তে আবৃত্তি করতে পারছেন সেইটাই তাঁর বড় কথা...স্থান ও সময়ের সীমাবোধ সম্পর্কে তিনি কিঞ্চিৎ উদাসীন..." (পৃ-৮২)। চলমান জীবন (২য় পর্ব) গ্রন্থে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, "আমি মোহিতবাবুর সঙ্গে আমহার্স্ট স্ট্রীট ধরে দক্ষিণে চলতে লাগলাম, পায়ে হেঁটে চুনাপুকুর যাব। চলতে চলতে আরো দু-একটি কবিতা শোনালেন মোহিতবাবু।

রাজা হৃষীকেশ লাহার বাড়ির উত্তর গায়েই মোহিতবাবুর ডেরা, সেখানে বিদায়ের পালা বেশ খানিকটা বিলম্বিত হল। ল্যাম্প পোস্টের আলোয় দাঁড়িয়ে আরো দুটি কবিতা পড়লেন তিনি।" (পৃষ্ঠা-১০১-১০২) এখানে দেখা যাচ্ছে, স্থান সম্পর্কে অচেতন হয়ে যত্রতত্র মোহিতলাল আবৃত্তি করতেন। কাল সম্পর্কেও তিনি বড় একটা চিন্তা করতেন না।

কমরেড মুজাফ্ফর আহমেদ পূর্বোক্ত গ্রন্থের ১১৭ পৃষ্ঠায় জানিয়েছেন, "মোহিতলাল একদিন তাঁর নব রচিত একটি কবিতা পকেটে নিয়ে আমাদের তালতলা লেনের বাড়িতে এলেন। কবিতাটি তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে বড় রাস্তা পর্যন্ত এসে আমাকে খুব দুঃখের সঙ্গে বললেন, 'দেখুন ট্রেনের পয়সা খরচ করে আমি ব্যারাকপুর থেকে নজরুলকে আমার নতুন লেখা কবিতা শোনাতে এসেছিলাম। কবিতা শুনে সে কোন রকম আনন্দই প্রকাশ করলে না।' ঐ গ্রন্থেরই ১১৫ পৃষ্ঠায় আছে, মুজাফ্ফর আহমেদের আর একটি উক্তি, "আমি অকপটে বলব যে মোহিতলালের আবৃত্তিতে কেউ কি বিরক্ত হতেন না? আমার তো মনে হয় হতেন।" আবার ঐ পুস্তকেরই ১২৩ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, "আজ স্বীকার করতে আমার এতটুকুও লজ্জা নেই যে মোহিতলালের লেখাটি আমি উপভোগ করলাম।"

ব্রজেনবাবুর পুত্র শ্রীতরুণ দের সাহায্য ও সহযোগিতায় উপরোক্ত অংশ বিশেষ।

॥ যাত্রার সেকাল ও একাল এবং ব্রজেন্দ্রকুমার ॥

পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে'র দৃষ্টিকোণ থেকে যাত্রার সেকাল ও একালের একটা ছবির অংশ বিশেষ আঁকা সম্ভব হয়েছে। বাকি অংশের অবতারণার ভিতর দিয়ে ছবি সম্পূর্ণ করার কর্তব্য পালন করি।

ব্রজেন্দ্রকুমার যখন যাত্রায় আসেন তখন যাত্রা-যাত্রা বলে চারদিকে এখন যে রকম হাঁক ডাক তা ছিল না। সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে একটা পারস্পরিক বোঝাপড়া বা সমঝোতা ছিল। ভাল শিল্পীদের সম্মান ছিল। ছিল শ্রদ্ধা, বিশ্বাস আর ভালবাসা পরস্পরের মধ্যে। এখন ও সবের বালাই নেই। উদাহরণ হিসেবে অজস্র কোটেশান ব্যবহার করতে পারি। এ ক্ষেত্রে ব্রজেনবাবুর একটি মন্তব্য হাজির করা যায়। তিনি এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন—"নট্ট কোম্পানীর জন্য আমি 'নটী বিনোদিনী' অর্ধেক লিখে ফেলেছি, হঠাৎ শিল্পীতীর্থ 'রঙ্গনটী বিনোদিনী'র বিজ্ঞাপন দিল, এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য, নট্টর বিজ্ঞাপন আগের দিন প্রকাশিত হয়েছিল—"

এই যে, এক দল একটি কাহিনী ঠিক করলে বা ভাল নামকরণ করে কোন পালার নাম বিজ্ঞাপিত করলে, অন্য দল সেই কাহিনী নির্ভর পালা করে বা নামটি হুবহু নকল করে। এযুগে এটা যাত্রার এক অভিশাপ। আগে বড় বড় অভিনেতায় যাত্রা জগত ঠাসা ছিল, কিন্তু তাদের দাপটে সব চলত না। একালে কিছু হিরো আর হিরোয়িনেরই দাপট। মালিকদের মেরুদণ্ড নেই, জাঁদরেল ম্যানেজারও নেই। হিরো যদি দেখেন কোন পার্শ্ব চরিত্র কোন সংলাপের ওপর হাতে তালি পাচ্ছে, হিরো সেটা পালাকার—নির্দেশককে (যদি নিজে নির্দেশক না হন) কেটে বাদ দিতে বাধ্য করান। হিরো বা হিরোয়িন যতই দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করা চরিত্রে রূপদান করুন, পোশাক-পরিচ্ছদ উচ্চাঙ্গের পরবেনই। দেখাদেখি সহনাঃ ক-সহনায়িকারাও তাই করেন। যাত্রায় আগে কিছু মানুষের মত মানুষ ছিলেন, এখন সেই রকমটি আর পাওয়া যায় না।

এই প্রসঙ্গে ব্রজেনবাবু অসামান্য দুটি-তিনটি উদাহরণ রেখে গেছেন—

"গণেশ অপেরার তখন মালিক গণেশ ঘোষ। একবার সবাইকে মাইনে দেওয়া হচ্ছে। সবার নেওয়া হয়ে গেলে মালিকের চোখে পড়ল একজন শিল্পী কিছু নেয়নি। তিনি বললেন, "তুমি কিছু নিলে না?" শিল্পীটি উত্তর দিলে ; "আমি আগেই সব নিয়ে নিয়েছি।" মালিক বললেন, "তবু তুমি কিছু নাও, না নিলে আমি ভাবব তুমি রাগ করেছ—" সেবার সেই শিল্পীটিকে কিছু টাকা নিতে হয়েছিল।"

আর একটি উদাহরণ এই রকম ঃ—"একবার সুনীল মুখোপাধ্যায় নট্ট কোম্পানীর হারাণ নট্টের কাছ থেকে কিছু টাকা চেয়েছিলেন। হারাণবাবু কিছু টাকা পাঠিয়ে দিলেন। টাকা নিয়ে যে গিয়েছিল সে ফিরে এসে বললে,—"উনি ঘুমুচ্ছেন—" মালিক আবার বললেন—"তুমি আবার যাও, টাকা নিয়ে ওনার পাশে বসে থাকগে, যখন ঘুম ভাঙ্গবে তখন টাকা দেবে—" * এখানে মনে রাখতে হবে, সুনীলবাবু তখন একজন ডাকসাইটে অভিনেতা।

তৃতীয় উদাহরণটি এক ঐতিহাসিক দলিল, ব্রজেন্দ্রবাবু বলেছেন,—"সূর্য দত্ত যখন নট্ট কোম্পানীতে আসেন, তখন চালচুলো কিছুই ছিল না। হঠাৎ একদিন বাড়ি ফিরে সূর্যবাবু দেখলেন, তাঁর জন্য সুন্দর একটি বাড়ি তৈরী হয়ে রয়েছে। সূর্যবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করতেই নট্ট কোম্পানীর তৎকালীন মালিক হারাণ নট্ট বললেন—"আমি করে দিয়েছি—",

সূর্যবাবু বললেন, "এ ধার আমি শুধবো কি করে?"

হারাণবাবু বললেন, "ধারটা আমারই ছিল, একটুখানি শোধ করলাম—"।

॥ গীতিকার ব্রজেন দে ॥

গীতিকার হিসেবে ব্রজেন্দ্রকুমার যতটা খ্যাতিমান তা শুধু তাঁর লেখা গান নাট্য মুহূর্ত সৃষ্টির জন্য। সঠিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গীতিকার ব্রজেন্দ্রকুমারের চাইতে অনেক বেশি শীর্ষস্থানীয় হলেন ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী এবং সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। ব্রজেনবাবু ভাটিয়ালি, পল্লীগীতি, গণসংগীত, কীর্তনাঙ্গের গানের বাণী অসম্ভব ভাল লিখতেন। কিছু হাসির গানও লিখেছেন। ব্রজেনবাবুর আগে গানের বাণীতে তৎসম শব্দের ব্যবহার ছিল, ব্রজেনবাবুও ব্যবহার করেছেন বটে,

তবে তা খুবই কম। ব্রজেনবাবু কৃষ্ণ-শকুনির মত পৌরাণিক পালায়—"ওরে অকূল গাঙের নাইয়া..." বাণী দিয়ে ভাটিয়ালি গাইয়েছেন। তেমনি নটী বিনোদিনীর মুখ দিয়ে পালার সমাপ্তি পর্বে শুনিয়েছেন—

"বাস্তু দেবী প্রণাম নাও,
নবজীবন যাত্রাপথের পথিক আমি
বিদায় দাও..."

পালা লেখা শেষ করে, পালার বিষয় ও চরিত্রের প্রয়োজনে, সঠিক সিচুয়েশান পেলে তবেই গানের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

সোনাইদীঘি'র 'নিশাচর' মূলত গায়ক চরিত্র। এই নিশাচর নিজে নানা ভাবে অত্যাচারিত। এই নিশাচরের বোনকে অপহরণ করেছিল ভাবনাকাজী। সেই 'নিশাচর' যখন দেখল সোনাই অপহৃতা হয়েছে, তখন সে সোনাকে উদ্ধার করার ব্যাপারে গান গেয়ে মাধবকে উত্তেজিত করছে, বলা যায় জাগিয়ে তুলছে—

"আয় দেখি সব কোমর বেঁধে
এক সাথে দিই হাঁক,
দেখি কেমন অত্যাচারীর হয় না
মাথা ফাঁক।"

এই পালায় ভাবনাকাজী যেখানে রাজা প্রতাপরুদ্রকে বন্দী করতে উদ্যত, তখন এই 'নিশাচর' গেয়ে ওঠে ব্রজেনবাবুর বাণীতে—

"ওরে খোদা-ভগবান,
ঘুমিয়ে নেই রাখছে হিসাব,
সামাল কীর্তিমান—!"

এই পালারই ৩য় অঙ্কের ৩য় দৃশ্যে ভাটুক আর মুক্তকেশীকে নিশাচরই গান গেয়ে পথ দেখায়।

নিশাচর গেয়ে চলে ঃ "সইব না আর সইব না,
অপমানের দারুণ বোঝা
মাথা পেতে বইব না..."

তবুও এটাই সত্য..."ধীরে ধীরে ব্রজেন্দ্রকুমারের পালায় সঙ্গীতের পরাজয় সূচিত হয়েছে এবং তা হয়েছে সংলাপের কাছে..."

॥ মানুষ ব্রজেন্দ্রকুমার ॥

পালাসম্রাট মাঝে মাঝে ডায়েরি লিখতেন। কোন বিশেষ ব্যাপার পালা সম্রাটের মনের ওপর দাগ টানলে, তা ডায়েরির পাতায় লিখে নিজেকে হাল্কা করতেন। একবার তিনি লিখেছিলেন,—"লিখব কখন, পড়ব কখন, যদি সর্বক্ষণ এ-ওর-তার হাজার সমস্যার কথা শুনতে হয়? শোনাতেও আপত্তি ছিল না, আমাকে আবার ওরা বিচারকও ঠাওরে বসেছে..."

প্রতিদিন মানুষ ব্রজেন্দ্রকুমার পাড়ার, গ্রামের, স্কুলের শত সহস্র অভিযোগ-অনুযোগ শুনতেন। তাঁর বিধানও মানতেন সবাই। এতে বহু ক্ষতি হয়ে গেলেও, মানুষের এই ভালবাসার কাছে কৃতজ্ঞতাও জানাতেন।

ব্রজেনবাবুর এমন অনেক প্রিয় ছাত্র আছেন, যাঁরা এখনও অকপটে স্বীকার করেন তাঁদের জীবনে তাঁদের 'মাষ্টার মশাই'-এর অবদান। বহু গরীব ছাত্র-ছাত্রীকে নানা দিক দিয়ে সাহায্য করতে

হতো তাঁকে। পারিবারিক ক্ষেত্রেও শুধু নিজের সংসার-স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের সুখের জন্য ভাবতেন না, ভাবতেন অনেক পরমাত্মীয়ের কথা।

॥ পুরস্কৃত, সম্মানিত পালাকার ব্রজেন্দ্রকুমার ॥

পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার লক্ষ লক্ষ মানুষের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসাকে জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার-শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রাপ্তি বলে তৃপ্তি পেয়েছেন। তথাপি তাঁর পুরস্কার ও সম্মান প্রাপ্তির একটি তালিকা এখানে দেওয়া হলো—

১৯২৫ সালে বেলেঘাটা বাণী নাট্য সমাজ তাঁকে প্রথম সংবর্ধনা জানায়। পালাকার-প্রকাশক কানাইলাল শীল '৩৪-এ আনুষ্ঠানিক ভাবে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন। '৩৮ এবং '৪৭ সালে যথাক্রমে পূর্বতন ভোলানাথ অপেরা এবং নট্ট কোম্পানি যাত্রাপার্টী ব্রজেনবাবুর হাতে তুলে দেয় শ্রদ্ধার্ঘ্য। '৫০-এ বিল্বগ্রাম নট্ট কোম্পানি থেকে সম্মানিত হন। জয়পুর দুর্গোৎসব সমিতি '৫৮ সালে মানপত্র সহ শ্রদ্ধা জানায়। সাঁতরাগাছি নাট্য সংস্থা, রবীন্দ্রকানন যাত্রা উৎসব কমিটি, ইছাপুর অনুশীলনী, সত্যম্বর অপেরা, ধৃতিশ্রী নাট্য শিল্পম ১৯৬২ সালে পুষ্প-চন্দনে সম্মানিত করে। ১৯৬৩ সালে ব্রজেনবাবুকে সংবর্ধনা জানায় হাওড়ার সাঁঝের আসর, ব্যারাকপুর কংগ্রেস কমিটি, হাওড়ার নস্করপুর বীণাপাণি নাট্যসমাজ। ব্রজেনবাবুকে পুরস্কারে সম্মানিত করে অম্বিকা নাট্য কোম্পানি, নব যুগ নাট্য সংস্থা ১৯৬৪ সালে। ১৯৬৯ সালে নর্থল্যাণ্ড উচ্চবিদ্যালয়, দিশারী, বাইনান উচ্চ বিদ্যালয়, কার্তিকপুর উচ্চবিদ্যালয় (ফরিদপুর) থেকে পুরস্কৃত ও সংবর্ধিত হন। '৭৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত যাত্রা উৎসব ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে, বিশ্বরূপা থিয়েটারে ব্রজেনবাবুকে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করা হয়। ধৃতিশ্রী অপেরা, সিঙ্গুর পূর্বাঞ্চল বারোয়ারি সমিতি ও মৌসুমী সংঘ যৌথ ভাবে, বর্ধমান লোকো কর্মী সংঘ ১৯৭৪ সালে ব্রজেনবাবুকে সংবর্ধনা জানায়। '৭৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলন রবীন্দ্রকাননের যাত্রা উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে ব্রজেনবাবুকে সংবর্ধনা জানায়। '৭৫-এ প্রতিরূপ ও পলতায় সংবর্ধনা পান।

প্রকাশকরাও পালা সম্রাট ব্রজেন দে-কে সংবর্ধনা জানায়। যেমন, ১৯৫৮ সালে ডায়মণ্ড লাইব্রেরী, টাউন লাইব্রেরী, জেনারেল লাইব্রেরি। '৭৩ সালে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছিল অক্ষয়

১৩৭৪ সনের ৮ আশ্বিন ব্রজেন্দ্রকুমার দে-কে "পালা সম্রাট" উপাধি প্রদান করা হয় আনুষ্ঠানিক ভাবে।

১৯৭৬ সালের ২৬ জানুয়ারী 'অভিনয়' পত্রিকা থেকে পালাসম্রাটকে "লোকনাট্য গুরু" আখ্যা দেওয়া হয়।

॥ ব্রজেন দের মহাপ্রয়াণের পর ॥

১৯৭৬ সাল। নদিয়া জেলার 'বিদ্যুৎ' পত্রিকায় একটি সংবাদ থেকে জানতে পারি, পালা সম্রাট ব্রজেন দে'র মৃত্যুর পর, বহু জেলার সাংস্কৃতিক সংস্থার মত 'ধুবুলিয়া'র 'সুপিরিয়র স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব' ঘরে স্থানীয় 'শিল্পী সংঘ' একটি শোক সভা করে। শোক সভা অনুষ্ঠিত হয় ২৮ মার্চ '৭৬, রবিবার বিকাল চারটায়। শোক সভার বিবরণ ঃ

"উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নট ও নাট্যকার শ্রীহরেন্দ্রনাথ সাহা। বিভিন্ন নাট্য সংস্থা হইতে পালা সম্রাটের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। স্থানীয় বালিকাগণ এই সভায় উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন। পালাসম্রাটের জীবনালেখ্য আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীশচীন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁহাকে যাত্রায় "নব যুগের প্রবর্ত্তক' বলিয়া আখ্যায়িত করেন।

সভাপতি শ্রীযুক্ত সাহা মহাশয় তাঁহার দীর্ঘ ভাষণে বলেন যে, ব্রজেনবাবু শুধু মাত্র নাট্যকারই ছিলেন না ; তিনি সাহিত্যিক, কবি, সমাজ সেবী এবং সর্বোপরি দরদী শিক্ষক ছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে সর্বশ্রী উমেশচন্দ্র সরকার, শম্ভুনাথ ঘোষ, বাদল চক্রবর্তী, চানু দত্ত [illegible] দাস ও মনোরঞ্জন

বিশ্বাস প্রমুখ পরলোকগত নাট্যকারের জীবন স্মৃতি আলোচনা করেন। এই সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয় ঃ—

(১) "শিল্পী সংঘ" নামের পরিবর্তে ব্রজেন্দ্রকুমার স্মৃতি নাট্যসংস্থা রাখা—

(২) পালাসম্রাট—ব্রজেন্দ্রকুমার দে'র একটি স্মৃতিফলক ধুবুলিয়া বাজার এলাকায় স্থাপন করা। সমবেত নাট্যমোদীগণকে অভিনন্দিত করেন শ্রীভক্তকুমার দাস।"

উল্লিখিত অনেকগুলি প্রস্তাবই পরবর্তী সময়ে বাস্তবে রূপায়িত হয়েছিল।

ষাটের দশকের সূচনা এবং যাত্রার রূপ ও ভাষা বদলের ইতিবৃত্ত

১৯৫৯ সালের অন্তিমকাল।

যাত্রাগানের আসরে তখনও মেয়েদের উপস্থিতি তিল পরিমাণ। দু'চারজন যাঁরা ছিলেন তাঁদের তখন একানে দলের মধ্যে গতায়াত। বড়জোর রাজকুমার বা রাজকুমারী। মূলত নারী চরিত্রে পুরুষের একচ্ছত্র আধিপত্য তখনও। যাত্রার ক্রমবিবর্তনের লক্ষ্মী তখন ওঁরা। পুরাতনী যাত্রার ভাবমূর্তির ধারক ও বাহক তখন পুরুষেরাই। এক সময়ে যাত্রার নারী চরিত্রের রূপকারদের কত গল্পই না শুনতাম লোক মুখে। রীতিমত শিহরণ খেলা করে যেত দেহ ও মনে। এমন অনেক পুরুষ ছিলেন, মেক-আপ নেবার পর তাঁদের বাস্তব নারী থেকে আলাদা করা যেত না। অনেক সময় মেক-আপ নেওয়া নারীর রূপ ধনীর ললনাকে, জমিদার প্রাসাদ অভ্যন্তরের বধূর ঈর্ষার কারণ হয়ে যেত। তবে অভিনয়ের অবসরে মেক-আপ নেওয়া নারী যখন বিড়িতে আয়াসভঙ্গিমায় টান দিয়ে যেত তখন কেমন যেন কদর্য, ভাব উপলব্ধি হতো। তখনকার সামাজিক প্রেক্ষাপটের মধ্য থেকে বিড়ি বা সিগারেট টানা নারী রূপ আমরা কল্পনাই করতে পারতাম না। আগে যা কদর্য লাগত, এখন তা স্টাইল। এখন সুন্দরী-শিক্ষিতা একটি নারী যখন ঠোঁটের কোনে সিগারেট ঝুলিয়ে টেলিফোনে কথা বলেন অথবা কম্পিউটারে কাজ করেন, বা ছেলেদের সঙ্গে সমান তালে সিগারেট টেনে আড্ডার আসর মাৎ করে তোলেন তখন তা স্টাইল বা সমকালীন সভ্যতার দর্পণ হয়ে যায়। থাক সে সব কথা।

পঞ্চাশের দশকের অন্তিমকালে 'উল্টোরথ' কর্ণধার প্রসাদ সিংহ যখন যাত্রার সাজা রানীদের বা নারীদের ওপরে শারদ সংখ্যায় একটি বড় মাপের লেখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন, ঠিক তখন থেকেই মূলত যাত্রার সাংবাদিক হিসেবে আমার অভিষেক হয়ে গিয়েছিল। আজকের সুখ্যাত আলোকচিত্রী অলোক মিত্র সেদিন সেই সাজা নারীদের ছবি তুলেছিলেন। তখন পর্যন্ত 'বটতলার বই', 'সাজা রানী' আর কিছু কিছু যাত্রা গদির সামনে ঠেলা বোঝাই "অমুক অপেরা পার্টি" লেখা সাজ পোশাকের বাক্স হামেশাই দেখা যেত চিৎপুরে। দেখা যেত লরিতে ত্রিপল টাঙানো। ত্রিপলের ছাউনির মধ্যে দেখা যেত সেই সব অভিনেতা, পালাকার আর দু'চারজন কর্মীকে যাঁদের সর্বস্ব ত্যাগের ভিতর দিয়ে "যাত্রামাতৃকার" যথার্থ বন্দনার ইতিহাস উজ্জ্বল। এঁদের মধ্যে যাঁর নাম চির অক্ষয় হয়ে থাকার কথা ছিল, অথবা যাঁর নাম অক্ষয় করে রাখার পবিত্র কর্তব্য ছিল এই প্রজন্মের, তিনি শিব ভট্টাচার্য। অন্ধকারে একদিকে নিতান্ত অবহেলায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা যাত্রার সামান্য দু'লাইন সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশিত হলে যাত্রা জাতে উঠতে পারে, এই মন নিয়ে শিব ভট্টাচার্য যেমন নিঃস্বার্থভাবে সংবাদপত্রের দুয়ারে দুয়ারে ধর্ণা দিতেন, তেমনি 'বাংলার প্রাচীনতম লোকসংস্কৃতির অঙ্গ যাত্রা'-কে নিঃস্বার্থভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজনে ইতিহাসের পাতায় ধরে রাখার কাজ করেছেন স্বনামখ্যাত সাংবাদিক কালীশ মুখোপাধ্যায়,

প্রসাদ সিংহ, ধীরেন মল্লিক আরও কেউ কেউ! এখন 'যাত্রা'-র সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছে "রেভিনিউ"। লক্ষ লক্ষ টাকার "বিজ্ঞাপন" লাভের সঙ্গে সম্পৃক্ত 'যাত্রা-র কদর।

১৯৬০ সালের গোড়ায় যাত্রা রথের রশিতে টান পড়েছিল নতুন করে।

কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের বাইরে, একান্ত একঘরে অবস্থায়, নিতান্ত অবহেলিত হয়ে চিৎপুরে গুটি কতক সাঁত সেঁতে, ভ্যাপসা গন্ধ যুক্ত ঘরে বাংলার লোকসংস্কৃতির আদি শরিক "যাত্রা" বোধ করি মুক্তির পথ খুঁজছিল। এখন সেণ্ট্রাল এভিনিউকে যদি কল্লোলিত কলকাতার বুকে একটা স্রোতস্বিনী নদীর সঙ্গে তুলনা করা যায় অথবা সভ্য কলকাতার শিক্ষিত-মার্জিত যাবতীয় সংস্কৃতি চর্চার সীমারেখা হিসেবে ঐ সেণ্ট্রাল এভিনিউকে চিহ্নিত করা যায়, তাহলে অনায়াসেই বলা যায়, পঞ্চাশের দশকের ওপার থেকে ষাটের দশকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত "যাত্রা" এবং যাত্রার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলেই ছিলেন সেই সীমা রেখার বাইরে সম্পূর্ণ নির্বাসিত,। যাত্রা ছিল অচ্ছ্যুত এক লোকসংস্কৃতি! যে লোকসংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক "যাত্রা" রথের মাস্তুলে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল নবজাগরণের ফেস্টুন। সেই ফেস্টুনে লেগেছিল ষাটের দশকের নব চেতনার বাতাস। ঝড় ওঠেনি তখনও।

এই নব চেতনার গান সেদিন এক সঙ্গে হাতে হতে রেখে, মনে মন লাগিয়ে যাঁরা গাইতে শুরু করেছিলেন, "যাত্রারথ"কে যাঁরা অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন হয়তো তাঁদের স্তুতি করেই এই পর্বের সমাপ্তি ঘোষণা করা যেত। কিন্তু ইতিহাসের অনুশাসন কঠোর। ইতিহাস কখনো কল্পনাকে প্রশ্রয় দেয় না। সুতরাং ষাটের দশক থেকে বিগত পঁয়ত্রিশ বছরের যাত্রার যে ইতিহাস, ইতিহাস সৃষ্টির পিছনে যাঁদের সীমাহীন অবদান তাঁদের কথা দিয়েই এই অধ্যায় রচনা অনিবার্য।

ইতিহাসের সন্ধানে

বহু জনের নিশ্চিত ধারণা যাত্রার আজকের এই অগ্রগতির মূলে আনন্দবাজার পত্রিকা এবং আনন্দবাজারের সাংবাদিক প্রয়াত প্রবোধবন্ধু অধিকারীর ভূমিকাই প্রধান ও প্রথম। বিষয়টি অবশ্যই বিতর্কিত। সুতরাং গবেষণামূলক দৃষ্টিকোণ ও মানসিকতায় সত্যসন্ধানের দায়বদ্ধতা থেকে, পূর্বসূরী গবেষক ও ইতিহাসবেত্তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে বিতর্কের যথার্থ উত্তর হাজির করতে পারি।

প্রথমেই বলে রাখা দরকার, প্রাচীন ইতিহাসের পৃষ্ঠা ওল্টালে দেখা যায়, যাত্রার ক্রম বিবর্তনে বরাবরই ছিল এ দেশের অতীত সংবাদপত্র ও পত্র পত্রিকার নিঃস্বার্থ পৃষ্ঠপোষকতা। যাত্রার বিভিন্ন খবর, বিশেষ করে কলকাতার ঘরে ঘরে যে সখের যাত্রার প্রচলন ছিল তার বর্ণনা, এমন কি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশের পবিত্র দায়ভার বহন করেছিলেন অতীত সম্পাদকেরা। সেই সঙ্গে যাত্রার যে ভাঙা-গড়ার দীর্ঘ ইতিহাস, তার মূলেও ছিল যাত্রার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত সর্বস্তরের মানুষের সম্মিলিত প্রয়াস! সেই সঙ্গে ছিল, দেশের প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের যাত্রা বা বাংলার প্রাচীন লোকসংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। তা ছাড়াও এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, আমার দেখা বিগত ছত্রিশ বছরের যে যাত্রা, তার মূলে আনন্দবাজার পত্রিকার ভূমিকা কোন মতেই গৌণ নয়। পাশাপাশি সঠিক তথ্য নির্ভর মন্তব্য এই হতে পারে, ষাটের দশকের সূচনাকাল থেকে যাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সকলেই, বিশেষ করে অধিকাংশ মালিক ও প্রযোজক একমাত্র হয়ে উঠেছিলেন আনন্দবাজার মুখি। ব্যবসায় সাফল্যের চাবিকাঠি হিসেবে আনন্দবাজার পত্রিকার ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, আর সেই কারণেই একমাত্র যাত্রা ব্যবসায়ীদের মতে আনন্দবাজার এক ও অদ্বিতীয় হাতিয়ার। পরবর্তী হাতিয়ার আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের "বিবিধ ভারতী"। এই বিশ্বাস থেকেই আজকের যাত্রাশিল্পের কাছে অন্যান্য দৈনিক সংবাদপত্র ও সাময়িকী অবহেলিত।

আর এই "এক চক্ষু" মানসিকতার জন্য আজও 'যাত্রা সংসার' এমন একটা বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ যাকে অনায়াসেই "এক ঘরে দশা" হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। 'যাত্রা জগৎ' আজ আপাতদৃষ্টিতে যতই আলোকরঞ্জিত হোক ; শিক্ষাগত, আদর্শগত ; শৈল্পিক চেতনাগত দিক থেকে অবশ্যই অন্ধকারে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত। এঁদের সব চাইতে বড় যে দুর্বলতা দিন দিন অন্ধকারের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে, সেগুলির চুল চেরা বিশ্লেষণ না করেও একটা তালিকা পেশ করা যায়। যেমন ঃ

১। যাত্রা নাটক যাঁরা প্রযোজনা করেন সেই যাত্রার প্রযোজক বা মালিক পক্ষের "যাত্রা নাটক" প্রসঙ্গে কোন জ্ঞান বা শিক্ষাগত চেতনা নেই। তাই এই প্রযোজকেরা মূলত 'পালাকার'-এর ওপর নির্ভরশীল। যখন যে পালাকারের একটু নামডাক হয়, এই মালিকপক্ষ তাঁদের স্মরণাপন্ন হন। পালাকারকে দেবতার আসনে বসিয়ে পুজো করেন। তাঁর পালা হিট না করলেই নির্দয় ভাবে ত্যাগ করেন। পালাকাররা যা লিখে দেন সেই পাণ্ডুলিপির পাতা হাতে পেলেই ধন্য হন। পালা প্রসঙ্গে পালাকারের কাছে কোন মতামত পেশ করার মত শিক্ষা বা সাহস এঁদের নেই।

২। একালের মালিকরা প্রথমেই বুক করেন দলের 'টপ' আর্টিস্টকে। এই টপকেই মূলত বসিয়ে দেন দলের মালিকের আসনে! এর ফলে টপের সমস্ত দৌরাত্ম্যপনাকে মেনে নিয়ে তার হাতের পুতুল হয়ে থাকতে হয়! এই মালিকপক্ষ নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য প্রয়োজনের মানুষটির পা ধরতে যেমন দ্বিধা করেন না, তেমনি বিসর্জন দেবার পরও বিরোধী মন্তব্য করতেও বাধে না। এর ফলে যাত্রায় এখনও পর্যন্ত একজন আর একজনের প্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি।

৩। যাত্রা জগতের সঙ্গে জড়িত সকলেই অর্থ উপার্জন ছাড়া আর কোন বিষয়ে নিজেদের কী ভাবে দৈহিক মরণের পরও চিরকালের জন্য বাঁচানো যায় তার সন্ধান করেন না।

৪। এই জগতে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যেমন পাপ-পুণ্যের বিচার হয় না, তেমনি ভাল মানুষের মুখোশ পরা পিশাচের মন্ত্রণায় এই জগতের মানুষেরা অনায়াসেই হত্যা করতে পারেন যাত্রাপ্রতিমার পুরোহিতকে!

৫। এঁরা ঢাউস ঢাউস "বিজ্ঞাপন" দেন সংবাদপত্রে কিন্তু 'বিজ্ঞাপন'-এর যথার্থ ভাষা ও রূপ প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ অজ্ঞ! দপ্তর থেকে লিখে পাঠানো কপি হাজার হাজার টাকার বিনিময়ে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হলেই এঁরা মনে করেন 'বিজ্ঞাপন' করা হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞাপনের রীতি-নীতি-ভাষা ও রূপ প্রসঙ্গে অজ্ঞতাকে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেন না। বিজ্ঞাপনে অজস্র নানান ভুলকে এঁরা হাসি মুখে মেনে নেন! বানান ভুল যে অন্যের দৃষ্টিতে অশিক্ষার প্রচার, বোধ করি এঁরা তা মানতে চান না!

৬। বিবিধ ভারতীর বিজ্ঞাপনে যে মুন্সিয়ানা দেখানো যায় তেমন কোন জ্ঞান এঁদের তৈরি হয়নি আজও।

৭। এঁরা হাজার হাজার টাকার রঙিন ছবি তুলে শো'কেসে লাগান, কিন্তু ছবিটা আদৌ ছবির মত ছবি হয়েছে কিনা তা বুঝে নেবার মানসিকতা রাখেন না!

৮। এঁরা বিজ্ঞাপন সংগ্রাহককে মনে করেন সংবাদপত্রের পিতা, বিজ্ঞাপন সংগ্রাহককে নানা ভাবে তুষ্ট করতে পারলে 'আমার বিজ্ঞাপনটি' সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ভাল জায়গায় ছাপা হবে, টাকা না থাকলে বিজ্ঞাপন সংগ্রাহককে ধরলে ধার মিলবে, সংবাদপত্রে পালার সমালোচনা ও শিল্পীর ছবি ছাপাতে হলে মূল লেখকের চাইতে বিজ্ঞাপন সংগ্রাহককে তুষ্ট করলে সব কাজ হাসিল হয়ে যাবে, এই মানসিকতা থেকে এঁরা সাংবাদিকের অবজ্ঞাই করেন। সম্মান ও গুরুত্ব দেননা।

৯। এঁরা টাকা দিয়ে পুরস্কার কেনেন। কেনা পুরস্কারে হন ভারতশ্রেষ্ঠ শিল্পী।

এই সব দুর্বলতাকে সুচতুর কিছু মানুষ মুন্সিয়ানার সঙ্গে ভাঙিয়ে নিজেদের স্বার্থ গুছিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে যাত্রার মালিকদের নানা দুর্বলতা সরলতায় রূপান্তরিত হয়েছে। আর সেই সরলতাকে কাজে লাগিয়ে বেশ কিছু টপ আর্টিস্ট নিজেদের দাপটকে কায়েম করেছেন। এখানকার অফিস কর্মচারীরা তাঁদের বাধা ধরা কাজের বাইরে বেরিয়ে দলের সার্বিক কল্যাণের কথা ভাবতে পারেন না। এখন যাত্রার গদিকে বলা হয় যাত্রা অফিস। অথচ অফিসের কোন ডেকরাম এখানে নেই। আসলে এখানকার মানুষেরা একটি জিনিসকেই জীবনের একমাত্র সত্য হিসেবে আঁকড়ে ধরেছেন, তা হলো 'টাকা'। 'টাকা' উপার্জনই এখানকার জীবন। তাই এঁদের কারও জীবনে প্রকৃত সামাজিকতার কোন অর্থ নেই। এখানে 'সৌজন্য', 'ভদ্রতা', 'বিবেক', 'মনুষ্যত্ব' শব্দগুলি মৃত। তাই যাত্রার প্রাচীন ঐতিহ্যকে ধরে রাখার চেষ্টা নেই এখানে। 'যাত্রা'র অতীত কীর্তির মূল্যায়নের কোন ব্যবস্থা নেই। আর তাই, 'যাত্রা'-র জন্য যাঁদের জীবন উৎসর্গীকৃত হয়েছে তাঁদের স্মৃতিপূজার কোন আয়োজন নেই! কারও প্রতি কারও বিশ্বাস নেই। ভালবাসা নেই। আর তাই, যাত্রার মানুষেরা যতই প্রাইভেট কার চড়ুন, যতই মার্বেল প্যালেসে বাস করুন, যতই আধুনিক হবার চেষ্টা করুন, যতই রাজনৈতিক পার্টির বড় মাপের কোন মন্ত্রী বা মন্ত্রীর স্তাবকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হোন, যতই দূরদর্শনে যাত্রার ২।৪ জনকে ডেকে পর্দায় তুলে ধরা হোক, আসলে কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে, শিক্ষাগত মাধুর্যের পরিমণ্ডলে 'যাত্রা' আজও এক নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ।

যাক সে কথা। আমি ফিরে যাই সেই পঞ্চাশের দশকের অন্তিম পর্বে বা ষাটের দশকের সূচনায়। ফিরে যাই যাত্রার আজকের যে রূপ, যাত্রার আজকের যে সর্বাধুনিক জীবনযাত্রা তার মূলে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রয়াত সাংবাদিক প্রবোধবন্ধু অধিকারীর অবদান কতটা তার সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্য নির্ভর পর্যালোচনায়।

॥ যাত্রার বর্তমান রূপ ও নাট্যকার কিরণ মৈত্রের প্রতিবেদন ॥

১৯৮৪ সাল। ২৩ অক্‌টোবর। কালীপুজোর দিন সকাল ১০টা নাগাদ বরানগর 'শান্তনীড়' হাউজিং-এর নিচের তলার এক ফ্ল্যাটে কলিং বেল টিপলাম। প্রয়োজনের মানুষটি অর্থাৎ স্বয়ং কিরণ মৈত্র দরজা খুললেন। তারপর অনেক ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথার আদান-প্রদান। প্রশ্ন করলাম, শুনেছি ষাটের দশকের গোড়া থেকে অন্ধকারের যাত্রাকে আলোয় আনার যে চেষ্টা শুরু হয়েছিল তার অংশীদার আপনিও ছিলেন, এ প্রসঙ্গে যদি একটু বিস্তারিত বলেন—, সৌভাগ্যক্রমে সেইদিন কিরণদার ঘরে জমিয়ে আড্ডা দিতে বসেছিলেন যিনি তাঁর সঙ্গে প্রথমেই পরিচয় করিয়ে দিলেন কিরণদা। তাঁকে দেখিয়ে বললেন,—শুধু আমি কেন অনেকেই অংশীদার ছিলেন। ইনিও একজন। তবে আজ পর্যন্ত কোথাও কেউ আমাদের কথা বলেননি। আমরা থিয়েটার নিয়ে জীবন কাটালাম, তার মধ্যে যাত্রার কল্যাণে যেটুকু যা করেছি তার কথা ভুলিনি ও ভোলার নয়। তবে পরবর্তী সময়ে আমাদের কথা মনে রাখেনি কেউ।—কথাগুলো এক টানা বলে যাবার পর কিরণদা স্মৃতি রোমন্থন করলেন। তিনি সেদিন যা বলেছিলেন ঃ

"...আসলে যাত্রার এই লাইম লাইটে আসার মূলে, কোন কিছুর অগ্রগতির মূলে একক কোন মানুষের কৃতিত্ব থাকতে পারে না। এ ক্ষেত্রেও তাই। তবে পরবর্তী সময়ে যত আর্টিকেল পড়েছি, সংবাদ পেয়েছি সেখানে সেই সত্যটা ঢাকা পড়ে গেছে। আমাদের কথা উহ্য থেকেছে। আমরা ও সব নিয়ে মাথা ঘামাইনি। এ কথা স্বীকার করতেই হয়, প্রবোধবাবু অর্থাৎ আমাদের প্রবোধবন্ধু অধিকারী বরাবরই এ সব ব্যাপারে ঝুঁকি নিতে, নেতৃত্ব দিতে ভালবাসতেন। তবে ঠিক যখন থেকে যাত্রাকে আলোয় আনার কাজ আমরা শুরু করি তখন প্রবোধবাবু সম্পূর্ণ নবাগত। এনার্জিটিক। আমরা যখন আমাদের নাট্যভাবনার মধ্যে যাত্রাকে শরিক করি তখন বহুরূপী, লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ,

নান্দীকার, রূপকার, শৌভনিক, নক্ষত্র, আমাদের অভ্যুদয় আরও অনেক সংগঠনের নাট্য আন্দোলন পুরোমাত্রায় চলছিল। এর মধ্যেই একদিকে রাসবিহারী সরকারদের সৃষ্ট "বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ", অন্যদিকে তরুণ রায়ের থিয়েটার সেন্টার, এঁদের নাট্য আন্দোলন ও নাট্য সাহিত্য বিষয়ক আন্দোলন নিয়ে বিরাট কর্মযজ্ঞ চলছিলই। এরই মধ্যে শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক-সাংবাদিক সন্তোষকুমার ঘোষের উৎসাহে (শুনেছি) আনন্দবাজার পত্রিকায় "আনন্দলোক" বিভাগের আত্মপ্রকাশ ঘটে, পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক চর্চার কল্যাণ সাধনে। পৃষ্ঠাটির আত্মপ্রকাশের পরই আমি প্রবোধবন্ধুবাবুর কাছ থেকে একটা চিঠি পাই। উনি আমার একটি ইণ্টারভিউ নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ঐ সময়ে প্রবোধবাবু থাকতেন বরানগরেই। আমিও ওঁর কাছাকাছি থাকতাম। আমরা জানলাম, এক জায়গার মানুষ আমরা! যদিও নিজের কথা বলতে বিশ্রী লাগে তবুও সত্যের খাতিরে বলছি, আমি ঐ সময়টিতে খুবই বিখ্যাত হয়ে পড়েছিলাম, বিশ্বরূপার "সেতু" নাটকের জন্য। বিশ্বরূপার গিরীশ নাট্য উৎসবে আমার "বারো ঘণ্টা" নাটকটি শ্রেষ্ঠ নাটক হিসেবে সম্মানিত হবার জন্যও বটে। তখন আমার জনপ্রিয়তার জন্যই প্রবোধবাবু দিকপালদের ছেড়ে আমার সাক্ষাৎকার নেবার কথা ভেবেছিলেন নিশ্চয়ই। আমিও তেমনি প্রবোধবাবুর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলে আনন্দবাজারের পাতায় মাঝে মধ্যেই 'অভ্যুদয়' উঠে আসবে, 'অভ্যুদয়' লাভবান হবে এমন একটা ভাবনা যে ভাবিনি তা নয়।

যা হোক এই ভাবেই আমরা এক সময়ে পরস্পর পরস্পরের কাছে অনেকটা সহজ হলাম। ঘনিষ্ঠ হলাম।

মাঝে মাঝে জাঁকিয়ে আড্ডা দিতাম। নাটক নিয়ে কত শত আলোচনা করতাম। তারপর ঠিক করলাম, নাট্য আন্দোলনের স্বার্থে একটা জোবদার কিছু করা দরকার। আমাদের তখন বসার—আলোচনা করার মত কোন জায়গা ছিল না। রাতে যে যার বাড়ি ফেরার পথে শ্যামবাজার মোড়ে, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের ওপরে দ্বারিক ঘোষের দোকানের পাশে পবিত্র পাঞ্জাবী হোটেলে দিনের শেষ আড্ডা মেরে যে যার বাড়ি ফিরতাম। ওখানে শেষ চায়ের কাপে চুমুক দিতে কে না আসত তখন? অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র, প্রবোধবন্ধু অধিকারী থেকে অনেকেই আসতেন। কলেজ স্ট্রীটের ওয়াই, এম, সি, এ-তে দীপক রায়ের ঘরে, বরানগরে অমরনাথ ডেকরেটর-এর দোকানে মাঝে মাঝেই আমরা মিলিত হতাম। এই সময়ে আমি, প্রবোধবন্ধুবাবু, সজল ঘটক, জগন্নাথ ভট্টাচার্য, দেবব্রত শূর চৌধুরী, রমেন ঘোষ, রমেন লাহিড়ী, বসন্ত ভট্টাচার্য, সুনীল দত্ত (নাটক প্রকাশক), দীপক রায়, অমরনাথ ডেকরেটিং-এর অমরনাথ শেঠ, দুলেন্দ্র ভৌমিক (এখন সাহিত্যিক, আনন্দলোক সম্পাদক) সবাই মিলে মিটিং করে শেষ পর্যন্ত একটা কমিটি তৈরি করলাম। নাম রাখা হলো "বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনী"। নামকরণটি প্রবোধবাবুর। আরও একজনের কথা অবশ্যই বলা দরকার তিনি নাট্যকার দীপ্তিকুমার শীল। এই দীপ্তিবাবু থাকতেন চিৎপুর অঞ্চলের কোন বর্ধিষ্ণু পাড়ায়। সেই সুবাদে চিৎপুর পাড়ায় যাত্রার কেউ কেউ তাঁকে চিনতেন। জানতেন। ভদ্রলোক সব দিক থেকেই খুবই ভাল বলে সকলেই তাঁকে ভালবাসতেন। এই নবগঠিত "বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনী"-র সম্পাদক করা হয় দীপক রায়কে। আমি কার্যকরী সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হই। আমরা সিদ্ধান্ত নিই, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রতি রবিবার সকালে একটা করে নাটক মঞ্চস্থ করা হবে। মাত্র ১০০/১৫০ টাকা দিলে সব সৌখিন, পেশাদারী গ্রুপ শো করতে পারবে। তবে একটা শর্ত, শো করতে হবে "বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনী"-র ব্যানারে। এই সূত্রে আমরা অর্থাৎ এই সংগঠনী যাবতীয় ট্যাক্স থেকে থিয়েটার-যাত্রাকে মুক্ত করেছিলাম। এর ফলে বহু নাট্য সংস্থা আমাদের সদস্য হন, এবং আমরা প্রায় সব যাত্রাদলের গদিতে গদিতে ঘুরে আমাদের সংগঠনীর সদস্য করেছিলাম। এই যাত্রাদলগুলির অধিকাংশই তখন থেকে দৈনিক সংবাদ পত্রে

বিজ্ঞাপন দিতে শুরু করে। কিছু কিছু দল এর আগেও কাগজে বিজ্ঞাপন দিত। কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে ব্যবসায় যে সুফল সেই বোধ অনেকের মধ্যে আগেই ছিল। আমাদের সংগঠনীর সদস্যপদ নেবার পর থেকে এরা যে পত্রিকায় যে পালার বিজ্ঞাপন দিত তাতে সেই দল যে "বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনী"-র সদস্য তা উল্লেখ করত। যা হোক, আমাদের পরিকল্পনা অনুসারে মিনার্ভায় কয়েকটা নাটক হয় কিন্তু খুবই লোকসান চলে। ইতিমধ্যে আমরা হুমায়ুন কবিরের কাছে আর্থিক সাহায্য চেয়ে অনেক চিঠি-পত্র দিয়েছিলাম। এর ফলে আমরা হুমায়ুন কবিরের সুনজরে অর্থাৎ "গুড বুক"-এ চলে যেতে পেরেছিলাম।

যখন আমরা মিনার্ভায় লোকসান দিচ্ছি তখন একদিন সবাই মিলে আলোচনায় সিদ্ধান্ত নিলাম একটা যাত্রা উৎসব করার। ভাবনার ফসল অচিরেই ফলল। তবে একথা ঠিক, আমি হয়তো পরিশ্রম বেশি করতে পারতাম না। প্রবোধবাবুর ব্যক্তিগত বাধা থাকায় সংগঠনীর কাগজে-কলমে সদস্য না হয়েও তিনি প্রায় হোল টাইমার হয়ে শ্রম দিতেন, পালা পরিচালনায় আমাদের উৎসাহিত করতেন। বলা বাহুল্য তিনিই মূলত ছিলেন পুরোভাগে। শোভাবাজার রাজবাড়িতে সেবার যাত্রা উৎসব হতেই পারত না, যদি না দীপ্তি শীল, রমেন ঘোষ, দুলেন্দ্র ভৌমিক বা অমরনাথ ডেকরেটরের অমরনাথ শেঠ, শেলী সান্যাল, দীপক রায় এমন কি এই ভদ্রলোক (উপস্থিত ভদ্রলোককে দেখিয়ে) অর্থাৎ এই সুশীলবাবু আমাদের পাশে শ্রম দিতেন, সব রকম মদত দিতেন। ইনি হলেন সুশীল দালাল। 'লিথো প্রিন্টিং প্রেস'-এর মালিক—

আমাদের আলোচনার মধ্যে সুশীলবাবু বললেন,—এখন অবশ্য পুরোনো কথা তুলে লাভ নেই, উচিৎও নয়, তবুও সত্যের খাতিরে বলছি, শোভাবাজার রাজবাড়িতে সেই যাত্রা উৎসবের সব পোস্টার আমি ছেপে দিয়েছিলাম, বোধ হয় সব টাকাও পাইনি, তাই ওটাকে আমরা "অরোরা পাবলিসিটি সার্ভিস"-এর পক্ষ থেকে একটা কন্টিবিউশান ধরে নিয়েছিলাম—।

আবার কিরণ মৈত্র বললেন,—এই যাত্রা উৎসবের প্রাথমিক খরচ তোলার জন্য আমরা পঁচিশ-তিরিশ করে টাকা চাঁদা দিয়ে একটা ফাণ্ড তৈরি করেছিলাম। কেউ কেউ বেশিও দিয়েছিলেন। বেশি কারা কারা দিয়েছিলেন এত বছর পর তা সম্পূর্ণ মনে না থাকলেও, বেশ মনে আছে সুধীর মণ্ডলের কথা। এই সুধীরবাবু ছিলেন তরুণ অপেরার আসল মালিক। তিনি বর্তমানে একজন বিখ্যাত প্রকাশক। মণ্ডল এণ্ড সন্স-এর মালিক। যতদূর মনে পড়ছে, তিনি দিয়েছিলেন দেড়শ থেকে দু'শো টাকা। তারও বেশি হতে পারে। এরপর আমরা প্রবোধবাবুকে সামনে রেখে চিৎপুরে যাত্রা মালিকদের কাছে যেতে থাকলাম। এই সময়ে শেলী সান্যাল যে উৎসাহী মহিলা আমাদের মধ্যে ছিলেন তিনি এই উৎসবের প্রাথমিক খরচ বাবদ অনেক টাকাই দিয়েছিলেন বলে আমাদের কেন্দ্রীয় অফিস হয়েছিল তাঁর ফার্ন রোডের বাড়িতে। রেডিও'র অমিয় চট্টোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করলে হয়তো এ প্রসঙ্গে আরও অনেক তথ্য জানা যাবে। যাত্রার মালিকদের নিয়েও আমরা আলোচনা করেছিলাম। বেশ মনে আছে ; যাত্রার সব মালিক ১০১ টাকা করে চাঁদা দিয়ে সংগঠনীর সদস্য হয়েছিলেন। শোভাবাজার রাজবাড়ির যাত্রা উৎসবের যাবতীয় ডেকরেশন করে দিয়েছিলেন অমরনাথ শেঠ। পরন্তু তিনি কিছু চাঁদাও দিয়েছিলেন।

যাত্রা উৎসবে দিল্লী থেকে হুমায়ুন কবির বা তখনকার মন্ত্রী ও বিশিষ্টজনদের আনার ব্যাপারে অবশ্য কারও একক কৃতিত্ব ছিল না। আগেই বলেছি, সংগঠনীর কল্যাণে কিছু অর্থ অনুদান চেয়ে আমরা হুমায়ুনকবিরের সঙ্গে পত্রালাপ করেছিলাম। সেই সূত্রে তাঁকে যাত্রা উৎসবে আনার ব্যাপারটা সহজ হয়েছিল। তিনি অনুষ্ঠানে বিবৃতি দিতে গিয়ে আমাদের সংগঠনীর কথা উল্লেখ করেছিলেন।

কিরণ মৈত্র পরিশেষে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন,—এরপর থেকে অনেক কারণে আমরা আস্তে আস্তে ভেঙ্গে যেতে থাকলাম। এই যাত্রা উৎসবের তিন চারটি দলের জন্য খুবই

দর্শক হয়েছিল, বাকি সব দিন দর্শক সংখ্যা ভাল হয়নি। বেশ মনে আছে, নট্ট কোম্পানির "লোহার জাল" এবং "আর্য অপেরা"-র পালার দিন আশাতীত দর্শক সমাগম হয়েছিল—

উৎসবের চার দিন আগে শোভাবাজার রাজবাড়িতে আমরা অফিস খুলেছিলাম। সেখানে রাতের পর রাত আমরা থেকেছি। যাহোক, এরপর আমরা আর বিশেষভাবে যাত্রা নিয়ে ভাবিনি। সবাই মোটামুটি ভাল চাকরি করতাম, তা ছাড়া নিজেদের গড়া গ্রুপ থিয়েটার তো ছিলই, কিন্তু প্রবোধবাবু কীভাবে থিয়েটারকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য বোধ হয় পাকাপাকিভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, গোয়াবাগান পার্কে সুশীল সিংহের নেতৃত্বে "নাট্যসম্মেলন" অনুষ্ঠিত হবার পর থেকে। এই "নাট্যসম্মেলন"-এও সুশীলবাবু নানা ভাবে সহযোগিতা পেয়েছিলেন প্রবোধবাবুর কাছ থেকে। প্রবোধবাবুও পেয়েছিলেন অনেক কর্তৃত্ব। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে, যাত্রাকে অন্ধকার থেকে আলোয় আনার মূলে যেমন নাটুকে মনের একদল মানুষের, বিশেষ করে নাট্য আন্দোলনের শরিকদের অবদান সর্বাগ্রে ছিল, তেমনি পরবর্তী সময়ে যাত্রার অগ্রগতির জন্য প্রবোধবাবু দিয়েছিলেন অনেক। দুঃখের বিষয় হলো, পরবর্তী সময়ে প্রবোধবাবু অতীতে আমাদের সকলের অবদানকে অস্বীকার করে, নিজেকেই শোভাবাজার রাজবাড়ির যাত্রা উৎসবের একক হোতা হিসেবে চিহ্নিত করে যাবার চেষ্টা করেছিলেন নানা ভাবে—

॥ প্রবোধবন্ধু অধিকারীর স্মৃতি চারণ ॥

১৯৭৫ সালে রবীন্দ্রকাননে আয়োজিত "পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলন" উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক পুস্তিকায়, সাংবাদিক প্রবোধবন্ধু আধিকারী যে স্মৃতিচারণ করেছিলেন তার একটা অংশ এখানে তুলে ধরছি সত্য ইতিহাসের খাতিরে—

"...১৯৫৯-এ আমি যখন যাত্রা পাড়ায় আসি তখন সত্যই যাত্রার মুমূর্ষুকাল। খাওয়া-থাকা ৭৫ টাকা বায়নাতেও গান পাওয়া কঠিন।...১৯৬০ সালে আনন্দবাজার পত্রিকা কর্তৃপক্ষ যাত্রা শিল্পের প্রসারে ব্রতী হন। আমাকে দেওয়া হয় সেই গুরু দায়িত্ব। বহুকাল পরে আবার শুরু হয় দৈনিক সংবাদ পত্রে যাত্রা প্রসঙ্গে আলোচনা, সমালোচনা, সংবাদ প্রকাশ। সত্যম্বর অপেরার 'সোনাইদীঘি'র অভিনয় সমালোচনায় তার পত্তন। তারপরেই বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনীর উৎসব, শোভাবাজার রাজবাড়িতে..."

॥ সত্য ইতিহাসের জন্য তথ্য অনুসন্ধান ॥

প্রবোধবন্ধু অধিকারী যাত্রা ব্যবসার উন্নতির জন্য, যাত্রাকে বৃহত্তম ইণ্ডাস্ট্রিতে রূপান্তরিত করার জন্য, যাত্রাকে পুরোপুরি একটা শিল্পের মর্যাদায় ভূষিত করার জন্য, যাত্রা- জগত থেকে যা কিছু অশিক্ষা তা নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য, সব রকম বৈষম্য ভুলে যাত্রাকে এক মহৎ শিল্পের সিংহাসনে বসাবার জন্যে, নিজেকে যে ভাবে উৎসর্গ করেছিলেন তার নজির মেলা ভার! যাত্রাকে পুরোপুরি একটি শিল্পে রূপান্তরিত করার জন্য, আগামী প্রজন্মের কাছে যাত্রার সঠিক মূল্যায়ন উপস্থাপনার জন্য প্রবোধবাবু যে ঠিক কতটা আত্মত্যাগ করে গেছেন তার বিচারক আমি নই! ইতিহাসের প্রয়োজনে, সঠিক তথ্য উপস্থাপনার দায়বদ্ধতায়, আমি শুধু ১৯৫৯ সালের অন্তিম পর্ব থেকে চিৎপুর যাত্রাপল্লী ও তৎকালীন যাত্রাদল এবং "চিৎপুর কেমন করে অন্ধকার থেকে আলোয় এলো" তার তথ্য ভিত্তিক বর্ণনা উপস্থিত করছি মাত্র। সেই সঙ্গে, যেহেতু আনন্দবাজার পত্রিকার পুরাতন পৃষ্ঠা প্রকৃত ইতিহাসের দলিল হিসেবে চিহ্নিত, সেই হেতু প্রথমেই আমি হাজির করছি, আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম প্রাণপুরুষ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক সর্বজনশ্রদ্ধেয় সন্তোষকুমার ঘোষের স্মৃতিচারণ।

১৯৮৪ সালের আগষ্ট মাসের এক সকালে সন্তোষকুমার ঘোষ সম্পাদিত "একশো কবির কবিতা" সংকলন গ্রন্থের ব্যাপারে, আমি কিছু জরুরি আলোচনা করার জন্য হাজির হই সন্তোষদার

নিউ আলিপুরের ফ্ল্যাটে। দরজা খুলতেই একটু অবাক হলাম। মন ভারাক্রান্ত হলো। কিছুদিন আগেও যা দেখিনি আজ আমার চোখের সামনে তাই! সন্তোষদা আমার ঢোকার পথের ডান দিকে বসে আছেন। গলায় মাফলার জড়ানো। চোখ-মুখের চেহারায় অসুস্থতার ছাপ স্পষ্ট। গলার স্বর ভাঙা ভাঙা! একটা তেজি, দামাল মানুষ যেন হঠাৎ সম্পূর্ণ পরাস্ত। যিনি কথা বলার সুযোগ পেলে শুধু কথা বলে যাবার তৃপ্তি পেতেন, সেই মানুষই আমাকে বসতে বললেন চোখের ইশারায়। আজ যদি আমি না হতাম এবং আমার সঙ্গী তরুণ কবি কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায় যদি না হতো, তা হলে হয়তো দরজা থেকেই ফিরে আসতে হতো। তা ছাড়া সন্তোষদা সম্পাদিত "একশো কবির কবিতা"র জন্য কিছু কবিতায় চোখ বুলিয়ে আজই আমার হাতে তুলে দেবার কথা ছিল। আসলে এমন একটা সংকলনের পরিকল্পনা নিয়ে যখন সন্তোষদার কাছে গিয়েছিলাম আনন্দবাজারে তখন অত্যন্ত ভাল লেগেছিল তাঁর। কিছুক্ষণ তিনতলার চেম্বারে বসিয়ে রেখে, আমাকে সঙ্গে নিয়ে সোজা চলে এসো ছিলেন সেণ্ট্রাল এভিন্যু আর মিশন রো'র মুখে, খাদি গ্রামোদ্যোগের বিপরীতে "বার কাম রেষ্টুরেণ্টে"। ওখানে সন্তোষদা প্রথম ঠিক বন্ধুর মত প্রশ্ন করে জেনেছিলেন, আমি 'চা' ছাড়া কিছু খাইনি কখনো! বহু বছরের পরিচয়। বড় ভালবাসার পাত্রও ছিলাম আমি। তবুও এই প্রথম কোন 'বারে" এই বিরাট মানুষটির বন্ধুর মত আমার প্রথম প্রবেশ! আমার সব কথাই ওঁব জানা ছিল। কত শ্রম আর কত সাধনায আমি একটা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছি তারও ইতিহাস তাঁর জানা। রেষ্টুরেণ্টে বসে তাই স্পষ্ট করে জানতেও চেয়েছিলেন, এই 'কবিতা সংকলন' ছাপার খরচ জুটবে কোথা থেকে! তার উত্তরে কিছুটা সাহায্য পেলে ভাল হয় এমন একটা ইংগিত দিয়েছিলাম। কিন্তু স্পষ্টভাবে কোন আর্থিক সাহায্য চাইবার সাহস পাইনি সেদিন। কবিদের কবিতার জন্য কাউকে প্রণামী দিতে পারবো না, সন্তোষদার প্রণামী দেওয়া সম্ভব নয়, এ সবই ব্যক্ত করেছিলাম ; আরও জানিয়েছিলাম ১০০০ কপি বই হযতো ধার-দেনা করে ছাপা যাবে, তবে কাগজ (ম্যাপলিথো) কীভাবে সংগ্রহ হবে তখনও তা আমার জানা ছিল না, এতটাও শুনিয়ে রেখেছিলাম। কল্যাণ কবিতা সংগ্রহের দায়িত্ব নিয়েছে। এ ব্যাপারে সন্তোষদার সহকারী হিসেবে কল্যাণ উপযুক্ত, তাও আলোচনা হয়েছিল সেই বারে বসে। তারপর মাত্র কিছুদিন সন্তোষদার সঙ্গে কোন যোগাযোগ ছিল না। এরপর সংকলনের স্বার্থে সোজা তাঁর ফ্ল্যাটে চলে যাওয়া। সন্তোষদা বসতে বলে কিছু কথা শুরু করলেন। বুঝতে পারলাম উনি অসুস্থ। কাগজের কথা তুললেন তিনিই, কিন্তু মিথ্যের আশ্রয় নিলাম। বললাম, ও ব্যাপারে কিছু ভাববেন না, ঠিক হয়ে যাবে—

সন্তোষদা গ্রন্থবৃত্তের মধ্যে আমাদের সঙ্গে বসে। আমরা কবিতা সংগ্রহের ফাইলটা নিয়ে উঠে আসতেই চাইছিলাম, কিন্তু আজ যেন আগের তুলনায় একটু বেশি কথা বলতে চাইছেন তিনি। আগেও এ রকম হয়েছে বার কতক। আনন্দবাজার পত্রিকা বাড়ির তিনতলায় নিজের চেম্বারে অনেকদিন অভিব্যক্তির সাইনবোর্ডে "বিশেষ কথা বলার সময় নেই" শব্দগুলি পরপর সাজিয়ে রেখেও শুধু কথাই বলেছেন। যে যেমন মাপের মানুষ তার সঙ্গে সেই মাপের কথা বলা নয়, সবাই তাঁর সম স্তরের, এই আদর্শের ভিত্তিতে কথা বলা। চা খাওয়ানো। আবার ঝুপ করে লোডশেডিং -এর মত হঠাৎ কথা থামিয়ে বলে ওঠা—'যাও এখন'—। এই যে মানুষটির স্বাভাবিক মনের পরিচয়, এদিনও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

এই দিন যেন আরও বেশি সহজ-স্বাভাবিক! মাঝে মাঝে ভাঙা গলার কোথাও থেকে উঠে আসা একটা যন্ত্রণার রেখা ফুটে উঠছিল তাঁর চোখে মুখে। কবিতার সূত্রে কয়েকজন কবির কথা বলতে বলতে, কখনো তিনি তাঁর মনকে নিয়ে গেছেন শান্তিনিকেতনে, কখনও কথা প্রসঙ্গে বলেছেন শ্রীমতী সুচিত্রা সেনের কথা, আবার তারই মধ্যে অতি সহজে এনেছেন খেলাধূলা থেকে যাত্রার আলোচনা। ছেলেবেলায় যাত্রা দেখার স্মৃতিচারণ থেকে প্রবোধবন্ধু অধিকারীকে 'যাত্রাবন্ধু' নাম দেবার

গল্প। 'একশ কবির কবিতা'র কথা রেখে যাত্রা সূত্রে সেই ভাঙা স্বরেই বললেন—"তোমাদের যাত্রাবন্ধু, তোমাদের যাত্রার অধিকারীর কী খবর?"—(আকস্মিক এই প্রশ্নে বিন্দুমাত্র অবাক হইনি। বুঝেছিলাম, আনন্দবাজারের প্রবোধবন্ধুর সঙ্গে তিনতলার সন্তোষকুমার ঘোষের যোগসূত্র কমেছে)।

উত্তর দেবার আগেই, সন্তোষদা আপন খেয়ালে স্মৃতিচারণ শুরু করলেন। —আনন্দবাজার পত্রিকায় 'আনন্দলোক' বিভাগটির জন্মবৃত্তান্ত একটানা বলে গেলেন সন্তোষকুমার ঘোষ। সন্তোষদা বললেন—"আমার ছেলে-মেয়ে তখন খুবই ছোট। সকালে আনন্দবাজার বাড়িতে এলেই ওরা রীতিমত টানাটানি শুরু করে দিত। লক্ষ্য করতাম, আমার ছেলে কাগজ হাতে নিয়েই খুলতো 'খেলাধুলো', আর মেয়ে খুলতো, কালচারাল পাতা। কালচারাল নিউজ পড়তে আগ্রহী! তোমাদের বলি, ষাট সালের গোড়ায় কলকাতা শহর, শহরতলী আর মফঃস্বলে যে পরিমাণ গান-বাজনা-থিয়েটার চর্চা চলত, অফিস ক্লাব, বিভিন্ন স্টাফ রিক্রিয়েশান ক্লাবে যেভাবে নানা আনন্দ অনুষ্ঠান, নাটক করার ধূম পড়েছিল তার একটু আধটু খবর জ্যোতির্ময় অর্থাৎ শুক্রবারের সিনেমা পাতার ইনচার্জ আমাদের জ্যোতির্ময় বসুরায় ছাপত। আমাদের ও ব্যাপারে তখন আলাদাভাবে কিছু ভাবা হয়নি। আমার মেয়ের কালচারাল নিউজ পড়ার আগ্রহ দেখে মাথায় এলো, যদি এই ব্যাপারে সাপ্তাহিক আলাদা একটা বিভাগ খোলা হয়, আলাদা একটা পাতা দেওয়া যায় হয়তো মন্দ হয় না। এতে পত্রিকার চাহিদা আরও বাড়তে পারে। আমি ব্যাপারটা মাথায় নিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই অশোকবাবুর সঙ্গে আলোচনা করি। সিদ্ধান্ত পাকা হয়। তারপরই 'আনন্দলোক' বিভাগ চালু করার ব্যাপারে অফিসিয়াল তোড়জোড় শুরু করি।

এক সময়ে প্রবোধকে আমিই এই বিভাগের জন্য নিয়ে আসি। এর আগে প্রবোধ কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের মধ্যে একটা প্রকাশক সংস্থার, যতদূর মনে পড়ছে বীরেশ্বরের (?) ওখানে জড়িত ছিল। প্রুফ দেখত। ভাল লিখত। কাজ কর্মেও খুব পটু ছিল। প্রবোধের সঙ্গে সাহিত্যিক বিমল করের একটা ভাল সম্পর্ক ছিল। জানিনা আজও সেই সম্পর্ক অটুট আছে কি না! যা হোক, আমি তার দারিদ্র্যের চেহারা দেখেছিলাম। আগে থেকেই মনে মনে স্থির করে রেখেছিলাম, যদি কোন দিন সুযোগ পাই আমি প্রবোধকে টেনে নেব। সেই সুযোগ এলো। আমি ওকে টেনে নিলাম আনন্দবাজারে। 'আনন্দলোক' বিভাগের সৃষ্টি হলো। কয়েক মাসের মধ্যে পাতাটি জমেও গেল। পেশাদারি থিয়েটার বাদে, বাংলা শুধু নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, জেলায় যাঁরা নাটক করত, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করত সে সব খবর যতটা পারা যেত ছাপা হতো। অফিস ক্লাব, বিভিন্ন স্টাফ রিক্রিয়েশান ক্লাব, সভা-সমিতির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্য, নাচ-গান-মূকাভিনয়, ম্যাজিক বা যেদিকে যা নিত্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার খবরা-খবর এই বিভাগে ছাপা হতে থাকল। বহুদিন পর্যন্ত এই চরিত্র বজায় ছিল 'আনন্দলোক'-এর।

আমার মাঝে মাঝেই মনে হতো, প্রবোধ নামের সঙ্গে বন্ধু বিশেষণ বেমানান। যেমন গৌরাঙ্গ নামের সঙ্গে 'কুমার'। যেমন ধর সন্তোষের সঙ্গে 'নাথ'। তাই প্রবোধের একটা ছদ্মনামও দিলাম- 'সূত্রধার'। এ সব নিয়ে একটা বড় লেখার ইচ্ছে ছিল তা আর হয়ে ওঠেনি। যা হোক, প্রবোধ আনন্দবাজার পত্রিকার 'আনন্দলোক'-এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার পর থেকে বেশ দ্রুত বাজারেও অর্থাৎ কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেও ছড়িয়ে পড়তে পেরেছিল। এর মধ্যে প্রবোধ কখন যে চিৎপুরের সঙ্গে, যাত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল এবং কীভাবে তা সম্ভব হয়েছিল তা বলতে পারব না। পরবর্তী সময়ে সেই প্রবোধের চেষ্টাতেই 'আনন্দলোক' বিভাগটি পুরোপুরি 'যাত্রা'র হয়ে গিয়েছিল। এ সব নিয়ে প্রবোধ যদি অথবা অন্য কারও কোন প্রতিবাদ করার থাকে করতে পারে, আমার এই স্মৃতিচারণ তাতে বিন্দুমাত্র দায়ী থাকবে না!—

একবার প্রবোধ আমাকে দিয়ে রবীন্দ্রকাননে (বিডন স্কোয়ার) এক যাত্রা উৎসব উদ্বোধন

করিয়েছিল। তা ছাড়া একবার বোধ হয় আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়, আনন্দবাজার কর্ণধার 'অশোককুমার সরকার'কে ঐ ধরনের যাত্রা উৎসবে সসম্মনে নিয়ে গিয়েছিল। এ সবের মূলে ছিল যাত্রার প্রতি প্রবোধের গভীর প্রীতি সেটাই বুঝেছিলাম। সে বোধ করি চেয়েছিল, কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের অন্যতম অংশীদার যে যাত্রা, সেটুকু প্রমাণ করতে। যা হোক, আমি গিয়েছিলাম প্রধান অতিথি বা সভাপতি যা হোক একটি আসন নাকি অলঙ্কৃত করতে। আমি সেদিন আমার বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রবোধবন্ধুকে বোধ হয় 'যাত্রাবন্ধু' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলাম। সেই থেকে প্রবোধকে সবাই 'যাত্রাবন্ধু' বলতে শুরু করেছিল।"

এই প্রসঙ্গে সন্তোষকুমার ঘোষের একটি রচনা থেকে কিছুটা অংশ তুলে দিচ্ছি ঃ

কালের "যাত্রার" ধ্বনি।। 'যাত্রা শুভ'।—পাঁজির ভাষা ধার করে এই লেখাটা শুধু এই কারণেই লিখছি না যে ১৯৭৪-৭৫ সালে এই যাত্রাশিল্পের আয় ছয় লক্ষ টাকা। এই বিবৃতির ভিত্তি সরকারি খাজাঞ্চিখানার জমা প্রমোদকরের হিসাব। কোন্ তহবিলে কী জমল না জমল তাতে আমার কী? আসলে অনেক-অনেক যাত্রায় 'প্রমোদে ঢালিয়া দিনু কর'। এই ধরনের কোন কানুনই তো চলে না। অতএব যাত্রা ব্যবসার হাল-সালে বেশ কয়েক কোটি টাকা আয় হলেও অবাক হব না।"

প্রসঙ্গত বক্তব্য ঃ এই সমুদয় হিসাবের সূত্র সেই সূত্রধার ; যাঁর লৌকিক নাম প্রবোধবন্ধু অধিকারী। যাত্রার পুনরুজ্জীবনে সেই ষাটের দশক থেকে তাঁর যে ভূমিকা, তাতে তাঁকে 'যাত্রাবন্ধু সর্বাধিকারী' বললেও অত্যুক্তি হয় না। অতএব প্রদত্ত পরিসংখ্যান দিতে ভুলচুক যদি কিছু থাকে, তার পুরোপুরি ডিস্‌ক্রেডিট তাঁর। আর—এই রচনায় ক্রেডিট যদি কিছু জোটে তবে তার সর্বস্বত্ব অবশ্যই আমার।—[পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলন ১৯৭৫, স্মারক পুস্তিকা।]

আনন্দবাজার এবং যাত্রা ঃ একটি সমীক্ষা

১৯৫৯ সালের শেষ পর্ব থেকে এই সমীক্ষা সুসম্পাদিত করতে হলে অবশ্যই এই পর্বের পূর্বাভাষ হাজির করা দরকার। অনেকেই মনে করেন, আবার কেউ কেউ বা আত্মপ্রচারের তাগিদে এ কথাই ব্যক্ত করেছেন,—আজকের যাত্রার যে বিলাসী চেহারা অর্থাৎ আজকের যাত্রার যে রমরমা অবস্থা, যাত্রার মালিকপক্ষের যে সর্বাধুনিক, চমকসর্বস্ব প্রযোজনা ভাবনা, সংবাদপত্রে পদ্ধতিহীন বিশাল বিশাল বিজ্ঞাপন প্রকাশ করার মানসিকতা, এই যে প্রাইভেট কারে, লাকসারী বাসে নায়ক-নায়িকা, শিল্পীদের আসরে যাওয়া, গরুর গাড়ি, লরিতে চেপে আসরে আসরে যাত্রা করতে যাওয়ার যুগকে পিছনে রেখে ঐশ্বর্য আর বিলাসের যুগে যাত্রাকে পৌঁছে দেওয়া, যাত্রার গদিতে গদিতে কুপি জ্বলার যুগ থেকে টাইল আর সানমাইকা দিয়ে গদিকে অফিসে রূপান্তরিত করার যুগে যাত্রাকে পৌঁছে দেওয়া, যাত্রার আসরে উটের আত্মপ্রকাশ থেকে সাইক্লোরামার কাল সৃষ্টি করা—যাত্রার পিছনে নাকি তাঁদেরই নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের ফলশ্রুতি! কিন্তু আমি মনে করি, যাঁরা বার বার এই দাবী করেছেন, যাঁরা মিথ্যা আত্মপ্রচারে যাত্রা শিল্পের পিতা হতে চেয়েছেন তাঁরা বোধ করি জানেন না, পঞ্চাশের দশক বা তার আগে ও পরে চিৎপুরে অন্ধকার-সাঁতসেঁতে গদিঘরে কুপি জ্বালিয়ে বসে থাকা "তৎকালীন অধিকারী"দের অন্ধকার থেকে আলোয় পৌঁছবার মিলিত চেষ্টা বরাবরই ছিল। জনপ্রিয় দৈনিকে বিজ্ঞাপন দিলে ব্যবসায় লাভ হতে পারে, এই জ্ঞান তাঁরা যাত্রাপাড়ায় বহিরাগত কোন ব্যক্তি বা সাংবাদিকের কাছ থেকে লাভ করেন নি।

তাই আমি দেখতে পাচ্ছি, আনন্দবাজার দৈনিকে সাপ্তাহিক "আনন্দলোক" পৃষ্ঠার জন্মের আগে থেকেই, প্রবোধবন্ধু অধিকারীর আনন্দবাজারে চাকরি করার আগে থেকেই, দৈনিকের পৃষ্ঠায়

বিজ্ঞাপন দেবার প্রবণতা ছিল। সেই সূত্রে বলা যায়, যাত্রার সঙ্গে আনন্দবাজারের মেলবন্ধনের পিছনে আনন্দবাজারের মত সংবাদপত্রেরই কৃতিত্ব, এই কৃতিত্বের দাবী কোন অবস্থাতেই কোন সাংবাদিক করতে পারেন না!

এই উক্তির তথ্য ভিত্তিক উদাহরণ ঃ

॥ ১৯৫৯ ॥

মূলত আনন্দবাজার পত্রিকায় 'যাত্রার' বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতে থাকে ১৯৫৯ সাল থেকেই। যাত্রার ব্যবসা নিয়ে যাত্রা জগতে একটি প্রবাদ আছে,—'ষষ্ঠী থেকে জষ্ঠী'! এ কথার তাৎপর্য হলো, যাত্রা ব্যবসার মরশুম চিরকালই শুরু হ'ত দুর্গা ষষ্ঠী থেকে এবং শেষ হতো জৈষ্ঠ্য মাসে! সুতরাং সংবাদপত্রে যাত্রার বিজ্ঞাপন প্রাক্ পূজা লগ্নে প্রকাশিত হওয়াই স্বাভাবিক। আর সেই কারণেই আনন্দবাজারে আমরা যাত্রার বিজ্ঞাপন প্রথম দেখি ১৯৫৯ সালে ১৫ সেপ্টেম্বর! নাথ কোম্পানির বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনের নমুনা ঃ

নাথ কোম্পানী

থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টী

সত্ত্বাধিকারী ঃ শঙ্করলাল সাহা

পৃষ্ঠপোষক ঃ জীবনকৃষ্ণ দাস

— শ্রেষ্ঠাংশে —

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, সত্য পাঠক ; পালান নস্কর, পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়,

ললিত রায়, অমূল্য ভট্টাচার্য মহেন্দ্র বন্দ্যেপাধ্যায়, ক্ষিতীশ রায় (গায়ক)

স্ত্রী চরিত্রে ঃ নিতাই গাঙ্গুলী, মধু দেবনাথ, কানন ঘোষ, বনফুল

প্রতি নাটকের শ্রেষ্ঠাংশে রঙ্গ রঙ্গমঞ্চের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট—?

কলিকাতা অফিস ঃ ৩২৭ আপার চিৎপুর রোড আসানসোল ঃ অনিলবরণ রায় বুকিং এজেন্ট

* এই বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত কানন ঘোষ মহিলা শিল্পী। যদিও ইনি বিখ্যাত নন, তবুও বলা যেতে পারে ইনি পেশাদার যাত্রাদলের প্রবীণ মহিলা শিল্পী। এই বিজ্ঞাপনে পালার নাম ঘোষিত হয়নি।

এই নাথ কোম্পানির ২য় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালের ২ অক্টোবর। এই বিজ্ঞাপন মারফৎ আমরা পাই দুটি পালার নাম। দুইজন স্বনামধন্য লেখকের দুটি পালা। স্বনামধন্য নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্তর 'স্বর্ণযুগ' এবং স্বনামধন্য পালাকার নন্দদুলাল রায়-চৌধুরীর 'আভিজাত্য'। এই তারিখের আগে কোন যাত্রাদলের বিজ্ঞাপন যেমন দেখা যায়নি, তেমনি তৎকালীন থিয়েটারের বড় নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্তের নামও পাওয়া যায়নি যাত্রার আসরে পালাকার হিসেবে। সুতরাং যাত্রায় মহেন্দ্র গুপ্তের আবির্ভাব ঘটে নাথ কোম্পানির আমলে।

১৯৫৯ সালের ২৫ অক্টোবর আনন্দবাজার পত্রিকার বিজ্ঞাপন পাতায় আর একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল। মনে হয়, যাত্রা জগতের দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন নমুনা ঃ

দি ক্যালকাটা অপেরা

রেঃ নং ৩২৯০১ ৩৩১, আপার চিৎপুর রোড। কলিকাতা।

যাত্রাজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ নট

শ্রীফণীভূষণ মতিলাল (ছোট ফণী)

শ্রেষ্ঠ প্রধান নট **প্রভাত বোস** তৎসহ

নিমাই চৌধুরী ও মঞ্জুশ্রী

ব্র্যাঞ্চ অফিস ঃআসানসোল (শান্তি নিবাস বোর্ডিং) আসানসোল বুকিং এজেন্ট ঃ-রজনী ভাণ্ডারী

* মঞ্জুশ্রী নামটি কোন পুরুষের ছদ্মনাম নয়, উনি মহিলা শিল্পী। এসেছিলেন থিয়েটার থেকে। এই তথ্য অনুসন্ধানে জেনেছি। এই তথ্য প্রমাণ করে আগে যাত্রায় মহিলা শিল্পী ছিলেন, গত ৩০ বছরের মধ্যে।

॥ ১৯৬০ সাল ॥

এই সালে সংবাদপত্রে প্রথম যাত্রার বিজ্ঞাপন সত্যম্বর অপেরার। তবে সত্যম্বর অপেরার কর্তৃপক্ষ টাকা খরচ করে কাগজে এই বিজ্ঞাপন দেবার গৌরব বহন করেন না। বিজ্ঞাপনটি আনন্দবাজারে দিয়েছিল করিমগঞ্জের নায়েক। তাই বিজ্ঞাপনটি আরও একটি সত্য প্রকাশ করে, তা হলো আগে একটি আসরে একই দলের একটি পালা অথবা একাধিক পালা ৭ থেকে ১০ দিন পর্যন্ত আসরস্থ হতো। করিমগঞ্জের নায়েকের নাম ছিল, এন. সি. সাহা।

১৯৬০ সালের ১৪ এপ্রিল সত্যম্বর অপেরার কর্তৃপক্ষ প্রথম একটি বিজ্ঞাপন দেন। বিজ্ঞাপনটিতে ২টি পালার নাম ঘোষিত হয়। দুটি পালাই ব্রজেন দে'র লেখা। প্রথম পালার নাম 'সপ্তর্ষি' ও ২য় পালার নাম "সোনাইদীঘি"। এই বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য যা ছিল, এখনও তা আছে উপলব্ধি করা যায়। দু'টি পালার নাম ঘোষণা করে যাত্রা দলের মালিক পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন, কোন নামটি দর্শকিরা পছন্দ করেন। নায়েক পক্ষ কোন নামটি গ্রহণ করেন।

১ জানুয়ারি' ১৯৬০ থেকে ২১ জানুয়ারি ৬০ ঃ আনন্দবাজারে যাত্রা প্রসঙ্গে কোন সংবাদ প্রকাশিত হয়নি। ২২ জানুয়ারি ৬০ তারিখের আনন্দবাজারের বিজ্ঞাপনের পাতায় সত্যম্বর অপেরার ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন দেখতে পাই।

করিমগঞ্জে
কলিকাতার অপ্রতিদ্বন্দ্বী
সত্যম্বর অপেরা
১০ই মাঘ হইতে ৭ দিনের জন্য করিমগঞ্জ টাউনে আসিতেছে
প্রথম রজনী
রাজা লক্ষ্মণ সেন
পূর্ব্ব হইতে টিকিট সংগ্রহ করুন
— প্রযোজক —
এন. সি. সাহা

*** এই বিজ্ঞাপন থেকে পরিস্কার বোঝা যায়, বিজ্ঞাপনটি সত্যম্বর অপেরার কর্তৃপক্ষ দেননি। যাঁরা বায়না করেছিলেন অর্থাৎ করিমগঞ্জের নায়েক এন. সি. সাহা দিয়েছিলেন।**

এই সময়ে সংস্কৃতির পীঠস্থান ছিল কলকাতা। একদিকে যেমন পার্কে পার্কে উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসর বসত, এখানে ওখানে বিচিত্রানুষ্ঠান, তেমনি গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে চলত থিয়েটার চর্চা বা নাট্য আন্দোলন। একদিকে যেমন পেশাদার থিয়েটারে জনস্রোত, বিশ্বরূপায় 'সেতু'র নিত্য হাউসফুল, এক্সট্রা চেয়ার দিয়েও জনস্রোত সামলানো দায়, অন্যদিকে তখন তামাম পশ্চিমবঙ্গকে উদ্বেলিত করে তুলেছিল লিটল্ থিয়েটার গ্রুপের 'অঙ্গার'। এরই মধ্যে বহুরূপী যখন প্রাণবন্ত, যাদু সম্রাট পি. সি. সরকারের দাপট, তখনই চলছিল বিশ্বরূপার রাসবিহারী সরকারদের নানা আন্দোলন। যেমন বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের নাট্য বিষয়ক সেমিনার। তখন এই সাংস্কৃতিক চেতনাকে সদা সজীব রাখার তাগিদে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা ছিল তুলনাহীন। এই ভূমিকার অন্যতম ঐতিহাসিক দলিল হলো, "বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন"। এর বিজ্ঞাপন দেখতে পাই ৪ মার্চ ৬০। বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের এই বিজ্ঞাপনে, অনুষ্ঠান তালিকায় উল্লেখ ছিল—"ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ (বড়) অভিনীত-পরিচালিত 'কুশধ্বজ' যাত্রাভিনয়।"

বিশ্বরূপা থিয়েটারের কর্ণধার দক্ষিণেশ্বর সরকার, রাসবিহারী সরকার তাঁদের এই থিয়েটারের দ্বারোদঘাটন করার পর থেকেই ব্যবসার ক্ষেত্রে, থিয়েটারেও নাট্যসাহিত্যের সামগ্রিক কল্যাণে গঠন করেন 'নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ'। এঁরাই গিরীশ নাট্য গ্রন্থাগার গড়ে তোলার ভিতর দিয়ে এক নতুন অধ্যায় রচনা করেন। বিশ্বরূপার সামনে যে বিস্তৃত ফাঁকা জায়গা ইঁট দিয়ে বাঁধানো ছিল, সেখানে সারিবদ্ধভাবে গাড়ি পার্কিং হতো। এখানে বিশাল প্যাণ্ডেল বেঁধে, কলকাতা এবং ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে নাট্য বিষয়ক ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানিয়ে সেমিনার করতেন। সেই সঙ্গে বিশ্বরূপায় চলত 'গিরীশনাট্য উৎসব'—।

সেই উৎসবের একটি বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল আনন্দবাজারে, ২৫ মার্চ, ১৯৬০। বিজ্ঞাপনের নমুনা ঃ

বিশ্বরূপা

নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা কমিটি আয়োজিত

(গিরীশনাট্য গ্রন্থাগার সাহায্যার্থে)

গিরীশ নাট্য উৎসব

স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ ও প্রখ্যাত নাট্য সংস্থাগুলির সহযোগে ২৬টি শনিবার ব্যাপী বিভিন্ন কালের-রসের ও আঙ্গিকের ২৮টি নাট্যভিনয়ের বৃহত্তম সমারোহের মাধ্যমে

জাতির নাট্য চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিরাটতম অভিযান। নাট্য সংস্কৃতির উন্নয়ন উপলক্ষে জনপ্রিয় শিল্পীগণের স্মরণীয় অবদান

শুভারম্ভ

২৬ শে মার্চ্চ বেলা ২৷৷ টায়

ও তৎপর প্রতি শনিবার (ছুটির দিন বাদে)

বেলা ২৷৷ টায়

স্থান

বিশ্বরূপা

বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের ব্যাপারে আনন্দবাজার পত্রিকা পরোক্ষভাবে যে বড় রকম ভূমিকা পালন করত তা বুঝতে বাকি থাকে না, যখন দেখি, শুক্রবারের 'নাট্যালোক ও চিত্রকথা' বিভাগে সাংবাদিক জ্যোতির্ময় বসু রায় নিয়মিত সিনেমার সমালোচনা, নানাবিধ সাংস্কৃতিক সংবাদ ছবি সহ প্রকাশ করেন। আর এক ঐতিহাসিক প্রমাণ, বিশ্বরূপার নাট্য-সাহিত্য সম্মেলনকে স্বাগত জানিয়ে, ১৪ এপ্রিল ৬০ তারিখে প্রকাশিত পূর্ণ পৃষ্ঠা সাপ্লিমেণ্ট। এই বিশেষ ক্রোড়পত্রের নামকরণ হয়েছিল "বঙ্গনাট্য সাহিত্য সম্মেলন"।

এই ক্রোড়পত্রে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক ছিলেন ঃ ডঃ অজিত ঘোষ ঃ নবনাট্য আন্দোলন। শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ আধুনিক নাট্য চিন্তা ও অভিনয়। শিশিরকুমার ভাদুড়ী ঃ নাট্যশালা প্রসঙ্গে। প্রীতিদেবী মুখোপাধ্যায় ঃ নতুন পথের দিশারী অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। সঞ্জীবকুমার বসু ঃ অমৃতলাল ও নাট্য সাহিত্য। এই তারিখে, এই বিশেষ পাতায় একটি বিশেষ সংবাদ বক্স করে ছাপা হয়েছিল। সংবাদটি এই রকম ঃ

বঙ্গনাট্য সাহিত্য সম্মেলনের

দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন

১৪ই হইতে ১৭ই এপ্রিল।

বিশ্বরূপা অঙ্গনে অনুষ্ঠিত হইতেছে। এতদুপলক্ষ্যে এই বিশেষ পৃষ্ঠাটি প্রকাশিত হইল।

এ দেশের ব্যবসায়ী মহলের আনন্দবাজার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবার চিরকালের প্রবণতা।

ডিজাইনের অসামান্যতা, ক্যাপসানে সাহিত্যের প্রলেপ সব মিলিয়ে এক 'বিজ্ঞাপন সাহিত্যের' ইংগিত থাকে আনন্দবাজারে। এরই মধ্যে ১৯৫৯ সালে পূর্ণ পৃষ্ঠার সিনেমা বিজ্ঞাপনও দেখি। এই অ্যামুজমেণ্ট বিজ্ঞাপনের মধ্যে ১৯৫৯ সাল থেকে যাত্রার বিজ্ঞাপনও নজরে পড়ে। স্বল্পপরিসর জায়গা নিয়ে, টাইপ সেটিং বিজ্ঞাপন যাত্রা জগতের তৎকালীন চেহারা এবং বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গে অজ্ঞানতা প্রকাশ করে। কিন্তু একথা অবধারিত সত্য, গত তিরিশ বছরে যাত্রার যে অগ্রগতি, সামগ্রিক ভাবে যাত্রার যে বিস্তার, তা যাত্রা জগতের মানুষদেরই ভাবনার ফসল! সেখানে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলে ব্যবসায় সাফল্য আসে, এই জ্ঞানের আলো যাত্রা জগতের মানুষেরাই জ্বালিয়েছিলেন। এখানে পরবর্তীকালে অনেকেরই দাবী ভিন্ন। এ প্রসঙ্গে ষাটের দশকের কয়েকটি প্রবন্ধ মিথ্যে ইতিহাস রেখে গেছে।

পঞ্চাশের দশকের শেষ থেকে ষাটের দশকের গোড়ার কালে যাত্রার প্রতি সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদের কতটা শ্রদ্ধা ছিল, অন্যান্য সাংস্কৃতিক দিকগুলির মধ্যে "যাত্রা" কতটা সুযোগ পেত তার একটা ছবি আঁকা যাক!

মনে রাখতে হবে, ১৯৬০ সালের ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত আনন্দবাজারের বিজ্ঞাপন তরঙ্গের মধ্যে দু' একটি যাত্রা দলের সামান্য বিজ্ঞাপন (মালিকদের দেওয়া) ছাপা হয়েছিল বটে, কিন্তু জ্যোতির্ময় বসু রায়ের 'নাট্যলোক ও চিত্রকথা' সাপ্তাহিক বিভাগে যাত্রার ওপরে একটি শব্দও প্রকাশিত হয়নি। আনন্দবাজারে যাত্রার ৩য় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় ১৪ এপ্রিল ৬০।

বিজ্ঞাপনটি এই রকম ঃ

নববর্ষে

সত্যম্বর অপেরা

সমগ্র দেশবাসীকে জানাচ্ছে তার সাদর সম্ভাষণ

নববর্ষের নব আকর্ষণ

সপ্তর্ষি ও

ব্রজেন বাবুর

সোনাই দীঘি

৩৪৭।১নং আপার চিৎপুর রোড। কলিকাতা-৬

"সর্বস্তরের মানুষের শিল্পাগ্রহ" এই শিরোনামে সূত্রধার ছদ্মনামের আড়ালে শ্রীপ্রবোধবন্ধু অধিকারীর একটা বড় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই রচনার মূল বিষয় ছিল, 'পৃষ্ঠাটি কী উদ্দেশ্য নিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকা কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করলেন'। গ্রুপ থিয়েটার, অফিস রিক্রিয়েশান ক্লাবের নাটক, নাচ, গান, ম্যাজিক ইত্যাদির সংবাদও এই সদ্য প্রকাশিত 'আনন্দলোক' পৃষ্ঠায় ছিল। পরিতাপের বিষয় যাত্রা প্রসঙ্গে একটি শব্দও ছিল না।

এরপর ১৫ এপ্রিল থেকে ২৩ জুন ৬০, পর্যন্ত আনন্দবাজারে যাত্রার কোন বিজ্ঞাপন বা কোন সংবাদ প্রকাশিত হয়নি।

১৯৬০ সালের ২৪ জুন।। জ্যোতির্ময় বসু রায়ের 'নাট্যলোক ও চিত্রকথা' পৃষ্ঠায় কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত একটি ছোট্ট নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। সেটি ছিল এই রকম ঃ

"সৌখিন সম্প্রদায়ের নাট্যাভিনয় এবং অন্যান্য
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিবরণ আগামী সপ্তাহ
থেকে শুক্রবার নাট্যলোক ও চিত্রকথা বিভাগের
পরিবর্তে অন্য একদিন বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ
করার ব্যবস্থা হয়েছে।"

শ্রদ্ধেয় সন্তোষকুমার ঘোষের শেষ স্মৃতি কথা (যা আমাকে বলেছিলেন) এই বিজ্ঞাপন বা নোটিশ তার সত্যতা প্রকাশ করল। ১৯৬০ সালের ৩০ জুন বৃহস্পতিবার ঃ "আনন্দলোক" পৃষ্ঠার জন্ম। পৃষ্ঠা নাম্বার ১৩। এই দিন বড় বড় অক্ষরে ছিল প্রবোধবাবুর যাত্রাপাড়ায় প্রথম প্রবেশের একটি 'সার্ভে' মূলক প্রতিবেদন। প্রতিবেদনের হেড লাইন ঃ

"দিনমানেই যেখানে সন্ধ্যা
সেই গলিতেই শোনা
প্রাচীন গৌরব কথা
সূত্রধার"

এই রচনার ভিতর দিয়ে প্রবোধবন্ধু অধিকারী একটি ছবি আঁকতে চেয়েছিলেন তৎকালীন গদি বাড়ি, গদি ঘর আর চিৎপুর যাত্রাপাড়ার। এই লেখায় তিনি স্পষ্ট করে তুলেছিলেন, যাত্রাপাড়ায় তাঁর প্রথম প্রবেশের মানসিকতা, যাত্রাজগত আর সেখানকার মানুষগুলোকে প্রথম দেখার অভিজ্ঞতা! প্রবোধবাবু বা সূত্রধারের প্রথম প্রবেশ আর্য অপেরায়! প্রথম পরিচয় আর্যের মালিকের সঙ্গে! পরিচয় শরৎ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। প্রথম দর্শনে খবরের কাগজের লোক বলে নিজের পরিচয় দিতেই পালাকার শরৎ মুখুজ্যে কী ব্যবহার করেছিলেন তাও তুলে ধরেছিলেন প্রবোধবাবু এই লেখায়। শরৎবাবু কেমন ভাষায় কথা বলেছিলেন তাও তুলে দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছিলেন, তখনকার দিনের যাত্রা আর যাত্রার মানুষগুলো কতটা অন্ধকারে ঢাকা পড়ে আছেন! যা হোক, এই লেখাতেই প্রবোধবাবু নিজেকে যে প্রকাশ করে ফেলেছিলেন তা বোধকরি, তাঁর নিজেরও মনে ছিল না। মনে ছিল না বলেই, পরবর্তী সময়ে বলে গেছেন, '১৯৫৯ সাল থেকে যাত্রার সঙ্গে তাঁর পরিচয়। তিন সপ্তাহ ধরে এই লেখা ধারাবাহিকভাবে লিখেছিলেন। এই লেখার ভিতর দিয়ে তিনি আর্য অপেরার মালিক অতুলকৃষ্ণ বসুমল্লিক আর উপেনবাবুর পরিচয় তুলে দিয়েছিলেন। যাত্রা জগতের চেহারাটা মেলে ধরেছিলেন।

বলা বাহুল্য, এই সময়ে 'নট্ট কোম্পানি', 'সত্যম্বর অপেরা', 'অম্বিকা নাট্য কোম্পানি', 'নিউ রয়েল বীণাপাণি' যাত্রা দল হিসেবে যেমন শীর্ষস্থানে বিরাজ করছিল, তেমনি মাখনলাল নট্ট, গৌরচন্দ্র দাস এঁরা দল মালিক হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতিমান ছিলেন তখনই। অথচ আনন্দবাজারের 'আনন্দলোক' পৃষ্ঠায় এঁদের (নিয়মিত বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়া সত্বেও) কোন দাম দেওয়া হয়নি কেন, এমন একটা প্রশ্ন থেকেই যায়।

১৯৬০, ৭ জুলাই।। 'আনন্দলোক' লোগো পাল্টে ২য় সংখ্যা। এই সংখ্যায় শৌখিন থিয়েটারের ছবি, থিয়েটার প্রসঙ্গ এবং এই পৃষ্ঠাটির জন্মের পরিপ্রেক্ষিতে 'অভিনন্দন পত্র' প্রকাশিত হয়। এই সময়ে বিশ্বরূপার 'সেতু' নাটক বিরাট হৈ-চৈ ফেলেছিল। সেই নাটকের কাহিনীকার (যদিও আমি জানতাম, কিরণবাবুরই নাটক, তবুও নাট্যরূপ বিধায়ক ভট্টাচার্যের বলে বিজ্ঞাপিত হত। বলাবাহুল্য, তখন বিশ্বরূপার পিছনে, বিশ্বরূপার কর্তৃপক্ষদের ফ্ল্যাটেই ছিল বিধায়ক ভট্টাচার্যের সংসার।) কিরণ মৈত্র তখন যথেষ্ট বিখ্যাত। তা ছাড়া তাঁর 'অভ্যুদয়' গোষ্ঠীও বেশ জনপ্রিয়। এই ২য় সংখ্যায় অনেকের মধ্যে শ্রীমৈত্রেরও একটি অভিনন্দন পত্র ছাপা হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এই সময়ে প্রবোধবন্ধু অধিকারী বরানগরের বাসিন্দা। কিরণ মৈত্রও কাছাকছি থাকতেন। তা ছাড়া এই ২য় সংখ্যাতেই ডাঃ সুরেশ সরকার রোডের 'দিশারী' গোষ্ঠীর একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংবাদের বিষয় ছিল, 'নাট্যকারকে পুরস্কৃত করা হবে'। বলা দরকার, রমেন ঘোষ এই 'দিশারী' গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান ছিলেন বা আছেন। এই সংখ্যায় যাত্রার নাম গন্ধ ছিল না।

১৯৬০, ১৪ জুলাই। 'আনন্দলোক'-এর ৩য় সংখ্যা। এতে নাটকের ছবি, নানা রকম সাংস্কৃতিক সংবাদের মধ্যে 'সূত্রধার' ফলাও করে "কিরণ মৈত্রের সাক্ষাতকার" প্রকাশ করেন। মনে

রাখা দরকার, আনন্দবাজারের মত প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রে "আনন্দলোক" পৃষ্ঠাটির গুরুত্ব অপরিসীম। সেই নব প্রকাশিত পৃষ্ঠায়, নব্য সাংস্কৃতিক সাংবাদিক 'সূত্রধার'-এর কাছ থেকে তৎকালীন নাট্য আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে যাঁরা ছিলেন অথবা থিয়েটার জগতের অনেক দিকপাল ব্যক্তিত্বের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাতকার পাওয়া গেল না। এর মূলে, সদ্য-বিখ্যাত ব্যক্তিকে তুলে ধরার মত আদর্শ পত্রিকা কর্তৃপক্ষের, এই সত্য স্পষ্ট, ধরে নিতে পারি। কিন্তু এ প্রশ্নও থেকে যায়, প্রবোধবন্ধুবাবু যদি '৫৯ সাল থেকে যাত্রা জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়ে থাকেন এবং গোড়া থেকেই যাত্রাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকেন, তা হলে সেদিন নবজাতক 'আনন্দলোক' বিভাগে ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ, ব্রজেন দে, ফণি মতিলাল, অথবা সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় কিংবা ঐ আমলের জ্যোৎস্না দত্ত অথবা জীবিত বহু খ্যাতিমানদের একজনেরও সাক্ষাৎকার নিলেন না কেন? হয়তো অনেক যুক্তি ছিল প্রবোধবাবুর। কিন্তু পাল্টা প্রশ্নও ছিল অনেকের—; যাত্রার কথা বাদ দিলে তখন মন্মথ রায়, দেবনারায়ণ গুপ্ত, উৎপল দত্ত, শম্ভু মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, তৃপ্তি মিত্র এবং আরও দিকপালেরা ছিলেন চতুর্দিকে, তাঁদের একজনেরও সাক্ষাৎকার নেওয়া হল না কেন? যদি যুক্তি হয়, প্রবোধবাবু তখন নবাগত সাংবাদিক বলে এই সব দিকপালেদের সাক্ষাৎকার নিতে সাহস পাননি, তা হলে বলবো, আনন্দবাজার যাঁর সহায় তাঁর পক্ষে নাট্য অথবা যাত্রা ক্ষেত্রের সাক্ষাৎকার নেওয়া বরং সহজ ছিল। যদি যুক্তি হয়, কিরণ মৈত্রকে নিয়ে 'সেতু' নাটকের ব্যাপারে তখন কিছু বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল বলেই প্রবোধবাবু তাঁকে হাইলাইট করতে চেয়েছিলেন, তা হলে বলবো কিরণবাবুর মত জনপ্রিয় নাট্যকার বা ঐ স্তরের নাট্যকার তখন আরও অনেকে ছিলেন, তাদের একজনের সাক্ষাৎকার নেওয়া হলো না কেন? যা হোক, আজ প্রবোধবাবু আমাদের মধ্যে নেই, সুতরাং এ সব কথা এখানে স্থগিত রাখলাম। এবার দেখা যাক, এই বিভাগের ৩য় সপ্তাহে কী সংবাদ ছিল—!

এই দিন **রঙবেরঙ** নাট্য সম্প্রদায়ের শিল্পীদের গ্রুপ ছবি ছিল একটা। **ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার** (কলেজ স্ট্রীট শাখা) রিক্রিয়েশান ক্লাবের ৩ জন শিল্পীর সোলো ছবি। যাত্রার কোন নামগন্ধ ছিল না। এরপর ২১ জুলাই ৬০ ৪র্থ সপ্তাহে 'আনন্দলোকে' প্রকাশিত হয় কিরণ মৈত্রের সাক্ষাৎকার। অন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ছবি ছাপার মাত্রা বেড়েছিল। যাত্রার নামগন্ধ ছিল না। ২৮ জুলাই ও ৪ আগস্ট' ৬০ যথাক্রমে ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যায় সব সংবাদ, অনেক ছবি ছিল কিন্তু যাত্রা প্রসঙ্গে একটি শব্দও ছিল না। তবে ৬ষ্ঠ সংখ্যায় একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল "পরবর্তী সংখ্যায় যাত্রা জগতের একজনের সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হবে—"। ৩১ জুলাই বিজ্ঞাপনের পাতায় (সিনেমা ইত্যাদি) নবরঞ্জনের একটি ছোট্ট বিজ্ঞাপন দেখতে পাই। ১১ আগস্ট ৬০। 'আনন্দলোক' বিভাগের পৃষ্ঠায় 'যাত্রা' স্থান পেল। কেমন খবর?— "গিরিশ নাট্য উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ছিল, হাওড়া সমাজের হরিবোলা, ৮ জুলাই মঞ্চস্থ হয় বিশ্বরূপা মঞ্চে।"

বিশ্বরূপার ঐ গিরিশ নাট্য উৎসবে আরও একটি পালা হয়েছিল! "মহাকাল"। অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা। ক্যালকাটা অপেরার পালা। বিশ্বরূপা মঞ্চে। পরিচালক ছিলেন গৌরীশংকর বর্মণ। অভিনয়ে ছিলেন, প্রভাত বোস, জহর সরকার, সুকুমার দত্ত, নিতাই চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, তারাপদ ঘোষ, শিখা বোস, মোহিত বিশ্বাস, শক্তি ভট্টাচার্য, অজিত দাস, মধু বড়াল, মঞ্জরী সেনগুপ্তা, নরেশ কর্মকার, মহেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শঙ্কর ঘোষ লেনের উৎসব মণ্ডপে তরুণ অপেরা একটি পালা করে। সুধীর মণ্ডল প্রযোজক। নারায়ণচন্দ্র দাসের 'চন্দ্রাবাঈ'। শম্ভু মোদকের পরিচালনায়, বৈদ্যনাথ দাসের ব্যবস্থাপনায়। অভিনয়ে ছিলেন : ফণি দত্ত, নির্মল ভট্টাচার্য, দুর্গা দাশ, দুলাল ঘোষ, প্রাণকৃষ্ণ মুখার্জী, বলরাম দাস, দুলাল খাঁ, রবীন্দ্র দে, মাণিক রায়, শম্ভু মোদক, মথুর কাঁড়ার, কাজলরাণী, হাসিরাণী, পরেশনাথ।

৫ ও ১২ আগষ্ট, বিজ্ঞাপনের পাতায় 'অম্বিকার' সব চাইতে বড় বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল।

২৫ আগষ্ট ৬০, সূত্রধারের সেই ধারাবাহিক লেখার শেষাংশ প্রকাশিত হয়, কিন্তু যাত্রার বিন্দুবিসর্গ ছিল না!

২১ সেপ্টেম্বর' ৬০। বিজ্ঞাপন পাতায় সত্যম্বর অপেরার ছোট্ট বিজ্ঞাপন ছিল। যাত্রা প্রসঙ্গে ছিল, পাশপোর্ট সাইজ একটা ছবি এবং সামান্য যাত্রা সংবাদ। এই সব যাত্রার কিছু কিছু ছবির মাপ এবং সংবাদের চরিত্র দেখে এটাই পরিস্কার বোঝা যায়, সূত্রধার তখনও এই 'আনন্দলোক' বিভাগের মাধ্যমে যাত্রা কল্যাণের কোন কর্মযজ্ঞ শুরু করতে সক্ষম হননি।

১৯৬০ সালের ৯ অক্টোবর প্রকাশিত হয় 'নিউ রয়েল বীণাপাণি' অপেরার বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনের নমুনা এই রকম ঃ

নিউ রয়েল বীণাপাণি

প্রোঃ নারান ভট্টাচার্য—কালিপদ সরকার

ব্রাঞ্চ অফিস

অবন্তিকা হোটেল

এবারের নাট্যার্ঘ্য

ব্রজেন দের

ভাগ্যের বলি ● বালির বাঁধ

সৌরীণ বাবুর

মহিষাসুর ● লালা বাঈ ● রঘু ডাকাত

শ্রেষ্ঠাংশে

ভোলানাথ পাল / পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় / বিজয় ভদ্র

পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় / পশুপতি কুণ্ডু (ফিল্ম)

বীণা ঘোষ / নমিতা দাস

রূপকুমার

পরিচালক ঃ শম্ভুনাথ ঘোষ

১৯৬০ সালের শেষ দিকে যাত্রায় মহিলা শিল্পীরা যে পূর্ণমাত্রায় অংশ নিতে শুরু করেছিলেন এই বিজ্ঞাপন তা প্রমাণ করে।

সত্যম্বর অপেরার দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনে যে হেতু পালার নাম 'সোনাইদীঘি' প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু নায়িকা জ্যোৎস্না দত্তের নাম না থাকায়, "সোনাই" শ্রীমতী দত্ত প্রথম তা প্রমাণিত হয় না! অনুসন্ধানে জানা যায়, বীণা ঘোষ-নমিতা দাস যাত্রায় জ্যোৎস্না দেবীর সম সাময়িক। বিজ্ঞাপনে যিনি 'নারাণ' তিনি হলেন নারায়ণ ভট্টাচার্য। অভিনেতা 'রূপকুমার' নারায়ণবাবুর ছদ্ম নাম।

১৯৬০ সালের ৯ অকটোবর সত্যম্বর অপেরার আর একটি প্রকাশিত ছোট বিজ্ঞাপনের নমুনা ঃ

এ বছর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ

সত্যম্বর অপেরা

প্রো ঃ গৌরচন্দ্র দাস

ফোন ঃ ৫৫-১০৫৩

সোনাই দীঘি ● পুষ্পচন্দন

অদ্য শুভ উদ্বোধন।

ব্রাঞ্চ অফিস ঃ তৃপ্তি বোর্ডিং (আসানসোল)

তত্ত্বাবধায়ক ঃ হরিপদ বায়েন

* এই বিজ্ঞাপনেও শ্রীমতী জ্যোৎস্না দত্তের বা অন্য শিল্পীদের নাম প্রকাশিত হয়নি। বিজ্ঞাপনের ভাষা প্রমাণ করে, দল কর্তৃপক্ষ শিল্পীদের প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন না প্রথম দিকে।
* আসানসোলের তৃপ্তি বোর্ডিং-এ এখনও যাত্রাব অনেক মালিক বুকিং অফিস খোলেন। সেই তৃপ্তি বোর্ডিং উদ্বোধন হয় এই সময়ে।
* এই 'সোনাইদীঘি'ব পূর্ব নাম ছিল "জীবন্ত কবর"। যাত্রার পরিভাষায় তাই অরিজিনাল ভাবনাকাজী হলেন গৌর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অরিজিনাল "সোনাই" হলেন তৎকালের অসামান্য সুন্দরী অভিনেত্রী চিত্রা মল্লিক।
* আমি জানতাম এবং আজকের যাত্রার অনেকেরই জানা আছে, পালা সম্রাট ব্রজেন দে'র পুত্র তরুণ দে স্বীকারও করলেন,—এই পালাব প্রচার কার্যে এক ঐতিহাসিক কৃতিত্ব দেখান দল কর্তৃপক্ষ ; তা হলো পুরাতন একশো টাকার নোটের একটি অনুকরণমূলক হ্যাণ্ডবিলে 'সোনাইদীঘি' পালার ঘোষণা লিখে বিমান থেকে ছড়ানো হয়েছিল। স্বয়ং পালা সম্রাট বহু দিন যাবৎ তার নমুনা সংগ্রহে রেখেছিলেন, যা এখন পাওয়া যায়নি। এই অভিনব প্রচার পবিকল্পনা ছাড়াও অনেক নতুনত্ব যাত্রায় এনেছিলেন তৎকালীন পরিচালক হরিপদ বায়েন।

এই একই তারিখে খুব বড় বিজ্ঞাপন দিয়েছিল অম্বিকা নাট্য কোম্পানি। বিজ্ঞাপনের নমুনা ঃ

অম্বিকা নাট্য কোম্পানী

১১৭।১ আপার চিৎপুর রোড। কলিকাতা-৬

দর্শকদের চিত্ত জয় করে চলেছে

সোরাব রুস্তম ● শয়তানের চর ● ছিন্নতার

প্রায়শ্চিত্ত ● সতী তুলসী ● প্রেত মানব

জয়দেব ● প্রতিশোধ

৩রা কার্ত্তিক হইতে আসানসোলে হিন্দ মেডিকেল স্টোর্সে

অভয়পদ বসুর সঙ্গে বুকিং-এর ব্যাপারে যোগাযোগ করুন।

— বিশেষ ঘোষণা —

বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে গত ১লা আশ্বিন সোরাব রুস্তম নাটকটির

অভিনয় সম্পর্কে তৃপ্তি মিত্র, অসিতবরণ, তরুণকুমার,

বিধায়ক ভট্টাচার্যের মতামত নাম সহ ছাপা হয়েছিল।

কালীয়দমন গুহঠাকুরতা ঃ ম্যানেজার

অশ্বিনীকুমার দাস ঃ এ্যাঃ ম্যানেজার

* **যাত্রা দেখে বিখ্যাতজনদের মতামত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রচার করার রেওয়াজ এখনও আছে। কিন্তু 'অম্বিকাই' এ ব্যাপারে পথ প্রদর্শক।**
* **এক সঙ্গে ৮ খানা পালা আসরে নামানোর নজিরও বোধ করি এই। ১৯ অক্টো ৬০ নটবাণী'র একটি বিজ্ঞাপন পাই।**

[১৯৬০ সালের ২৫ ডিসেম্বর ঃ

আনন্দবাজার পত্রিকার সিনেমা-থিয়েটারের বিজ্ঞাপনের পাতায় সত্যম্বর অপেরার একটি বড় বিজ্ঞাপনে আমরা দেখতে পাই—

আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ

অক্লান্ত চেষ্টায়, বহু অর্থ ব্যয়ে কাছাড় জেলায় মাত্র ২টি

আসরে অভিনয় করাইবার জন্য আনাইতেছি

বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র খ্যাত "**সোনাই দীঘি**" সম্প্রদায়

সত্যম্বর অপেরা

১। শিলচর গোল দীঘির মাঠ—২৭ শে পৌষ হইতে ৬ই মাঘ মাত্র ১০ দিনের জন্য

পরিবেশক ঃ সুবিনয় এন্দা

২। করিমগঞ্জ পাবলিক হাইস্কুল প্রাঙ্গণ ঃ ৮ই হইতে ১৭ই মাঘ মাত্র ১০ দিনের জন্য

পরিবেশক ঃ এন. সি সাহা

সর্বত্র উদ্বোধন রজনীতে অভিনয় হইবে ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত **সোনাই দীঘি**

যুগ্মনিবেদক

শ্রীসুবিনয় এন্দা, এন. সি সাহা

* এই বিজ্ঞাপন একটি সত্যই তুলে ধরে, তা হলো এক সময়ে ব্যবসায়িক সাফল্যের জন্য বড় বড় নায়েকপক্ষ বা অর্গানাইজারেরা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতেন, পরবর্তী সময়ে সেই নায়েকপক্ষই যাত্রা প্রতিষ্ঠানের মালিকরা যদি অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা হেতু বিজ্ঞাপন দিতে অক্ষম হন, তা হলে ক্ষুব্ধ হন। এতে প্রমাণিত হয় নায়েকদের বিপথগামী করার মূলে যাত্রার মালিক পক্ষ।
* আরও একটি সত্য প্রমাণ করে এই বিজ্ঞাপন, তা হলো 'সোনাইদীঘি' পালার জনপ্রিয়তা। এই পালার জনপ্রিয়তা এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, সত্যম্বর অপেরা 'সোনাই দীঘি সম্প্রদায়' হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। আরও একটি ব্যাপার বোঝা যায় এই বিজ্ঞাপন থেকে, তা হলো এই দশকে যাত্রা-দর্শক ও নায়েক পক্ষের কাছে শিল্পীদের কোন মূল্য ছিল না। ছিল দলের নাম ও পালাকারের মূল্য।

২৫ ডিসেম্বর ৬০, সত্যম্বর অপেরার বিজ্ঞাপনটি যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। এইভাবেই এক সময়ে ১৯৬০ শেষ হয়ে যায়।

১৯৬১ সাল ও আনন্দলোক-এর ভূমিকা ঃ

এই সালের ৩রা আগষ্ট বৃহস্পতিবারের 'আনন্দলোক' পৃষ্ঠাটি বা তার পরবর্তী সপ্তাহের 'আনন্দলোক' দেখলে সহজেই বোঝা যায়, যাত্রা প্রসঙ্গে তখনও সূত্রধারের বিশেষ প্রীতি জন্মায়নি। তবে পূর্ণ পৃষ্ঠার মধ্যে 'যাত্রার খবর' শিরোনামে সামান্য কিছু জায়গা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এই তারিখে এই যাত্রা বিভাগে মোট ৪টি দলের (খুব নামী নয়) সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। (ক) বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আয়োজিত গিরীশনাট্য উৎসবে বিশ্বরূপা মঞ্চে হাওড়া সমাজের 'হরিবোলা' পালার খবর। (খ) এই মঞ্চে ক্যালকাটা অপেরার 'মহাকাল', তরুণ অপেরার 'চন্দ্রাবাঈ', মারুতি নাট্য সমাজের 'ভক্ত হরিদাস' পালা অভিনয়ের খবর। ১ থেকে ৩ আগষ্ট পর্যন্ত বিজ্ঞাপনের পাতায় কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়নি।

- **১ থেকে ১৪ আগষ্ট পর্যন্ত যাত্রার কোন বিজ্ঞাপন যেমন ছাপা হয়নি কিম্বা যাত্রা কর্তৃপক্ষ যেমন কোন বিজ্ঞাপন দেননি, তেমনি স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিশাল বিশাল সিনেমার বিজ্ঞাপনের মধ্যে টাইপ সেট করে মোট ৬টি দল বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। এই ৬টি দল হলো, তরুণ অপেরা, নিউরয়েল বীণাপাণি অপেরা, নবরঞ্জন অপেরা, নিউ ভান্ডারী অপেরা ও অম্বিকা নাট্য কোম্পানি এবং সত্যম্বর অপেরা।**
- **১৫ আগষ্ট ৬১, আনন্দবাজারের একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক,**

চলচ্চিত্র, নাট্য সব বিষয়ের ওপরে বিভিন্ন প্রাবন্ধিক বা নাট্য ও চলচ্চিত্র ক্ষেত্রের বিশিষ্ট জনদের দিয়ে লেখানো হয়েছিল, কিন্তু "যাত্রা" কাউকে দিয়ে লেখানো হয়নি।

৩০ আগষ্ট ৬০ 'আনন্দলোক' পৃষ্ঠায় 'যাত্রার খবর' বিভাগে মোট ৩টি যাত্রা দলের সামান্যতম খবর প্রকাশিত হয়। যাত্রার ছবি এ পর্যন্ত আর প্রকাশিত হয়নি।

এই সময়ে একমাত্র সত্যম্বর অপেরা ছাড়া আর কোন গদিতে ফোন ছিল না।

কলকাতার দর্শকদের যাত্রা দেখার ব্যাপারে সর্বদা উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা যাত্রা মালিকদের ছিল বলেই, বিশ্বরূপা মঞ্চে, মহাজাতি সদনে যাত্রাপালা মঞ্চস্থ করার রেওয়াজ ১৯৬০ সাল থেকেই ছিল। এ ব্যাপারে যাত্রার মালিকরাই নিজেদের কল্যাণের কথা নিজেরাই চিরকাল ভেবেছেন, সুতরাং তাঁদের এই ভাবনার কোন জনক ছিল না।

বর্ধমান, মেদিনীপুর থেকে উত্তরবঙ্গে, আসামে এক আসরে ৩ থেকে ৭ দিন পর্যন্ত একই দল অভিনয় করত এই সময়ে, সুতরাং যাত্রার দর্শক তৈরির ব্যাপারে যাত্রা দলগুলির ভূমিকা বরাবরই ছিল। তখন অবশ্য এই সব ধারাবাহিক শো'র আলাদা কোন নামকরণ হতো না। ইদানিং অবশ্য এ ধরনের শো হলেই বলা হয়—'অমুক নাইট', 'অমুক দলের যাত্রা উৎসব' ইত্যাদি।

১৯৬১ সালেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাহিনী অবলম্বনে পালা রচনার ভাবনা দেখা দেয়। এরও স্রষ্টা বা রূপকার স্বয়ং ব্রজেন দে। পালাকার ব্রজেন দে কবির 'মস্তকবিক্রয়' কবিতা অবলম্বনে পালা রচনা করেছিলেন, তার নামকরণ হয়েছিল 'প্রতিশোধ'। অম্বিকা নাট্য কোম্পানি সেই পালা বিশ্বরূপায় আসরস্থ করেছিল।

১৭ আগষ্ট ৬১ এই সপ্তাহেও 'আনন্দলোক' বিভাগে 'যাত্রার খবর'-এ মাত্র ৩টি দলের কথা ছিল। সেই সঙ্গে নিউ রয়েলের নায়ক রূপকুমার এবং শম্ভুনাথ মোদক ও শম্ভুনাথ ঘোষের তিনটি ক্ষুত্র ছবি ছাপা হয়।

বিজ্ঞাপনের পাতায় শুধুমাত্র নব অম্বিকার একটা বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল।

২৪ অগাষ্ট ৬১ "আনন্দলোক"-এ মাত্র দুটি দলের সামান্য খবর, সেই সঙ্গে একটি বিশেষ সংবাদ বড় হরফে ছা·া হয়েছিল।

সেই সংবাদের অংশ বিশেষ ছিল এই রকম ঃ

যাত্রার জনপ্রিয়তা

আগামী উৎসব

।। সূত্রধার।।

"দুবছর আগেও অনেক সন্ধ্যায় গদিতে বাতি জ্বলত না। আজ কিন্তু দিনের বেলাতেও যাত্রা পাড়ার গদির দুয়ার খোলা। ইতঃস্তত কলরব। বায়নাদারদের আনাগোনা ; রেটের খুনসুটি। যাত্রা পাড়া আবার পুরনো যৌবন ফিরে পেল। কলকাতার সকল যাত্রাদল এক হয়ে এখন ভাবছেন, এ শহরে যাত্রার জনপ্রিয়তা চাই, চাই দর্শক। উত্তর কলকাতায় তাই একুশদিন ধরে যাত্রা উৎসবের আয়োজন চলছে....."

এই খবর প্রমাণ করে, ১৯৬০ সালের জানুয়ারি মাস থেকেই যাত্রা মালিকদের মনে একটি যাত্রা উৎসবের চাহিদার জন্ম হয়েছিল। বিশ্বরূপায় গিরীশ নাট্য উৎসবের পরিকল্পনায় বিশ্বরূপা মঞ্চে, প্রতি শনিবার পেশাদার-অপেশাদার সব নাট্য ও যাত্রা গোষ্ঠীকে স্বল্প ভাড়ায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিনয় করার সুযোগ দেওয়ায়, যাত্রা দলগুলি তাদের পালা মঞ্চস্থ করে আশাতীত সাফল্য অর্জন করছে দেখে অনেকেই বুঝেছিলেন, পাবলিক স্টেজের বাইরে আরও খোলামেলা

পরিবেশে, একটু ভাল ব্যবস্থা নিতে পারলে যাত্রার দর্শক বৃদ্ধি পেতে পারে। সেই ভাবনার ফলশ্রুতি এই 'যাত্রা উৎসব'।

"বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ" পরিকল্পিত "গিরীশ নাট্য উৎসবে" ১৯৬১ সালেও গ্রুপ থিয়েটারগুলির পাশাপাশি যাত্রাদলগুলি একটানা শো করে যাচ্ছিল বিশ্বরূপায়। প্রমাণ স্বরূপ আনন্দবাজারে প্রকাশিত কিছু সংবাদ এখানে হাজির করি :

২৩ জুলাই ৬১। মারুতি নাট্য সমাজ কর্তৃক অভিনীত 'ভক্ত হরিদাস' পালার খবর ছিল। এই প্রকল্পে ২৪ ও ২৬ জুলাই বিশ্বরূপায় সত্যম্বর অপেরার দু'টি পালা মঞ্চস্থ হয়। পালা দু'টি যথাক্রমে 'সোনাইদীঘি', 'পুষ্প চন্দন'। সোনাই-দীঘিতে যেমন পিসিমা চরিত্রে বিধান হালদার অভিনয় করেছিলেন, তেমনি অভিনয় করেছিলেন জ্যোৎস্না দত্ত।

১০ আগষ্ট ৬১। যাত্রার খবর। "কোলকাতায় যাত্রা গানের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। গত ১৫ দিনে এ শহরে মোট অভিনীত যাত্রা পালার সংখ্যা আট। তার মধ্যে পাঁচটি পালা অভিনীত হয় স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে। বাকি তিনটি ইতঃস্তত।"...৫ আগষ্ট সুপ্রাচীন যাত্রা সংস্থা 'দর্জিপাড়া নাট্য পরিষদ' ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদের "ভক্ত রুইদাস", অভিনয় করে মহাজাতি সদনে। এই সংবাদের শেষে শিল্পীদের তালিকা ছিল।

১৫ আগষ্ট ৬১। আনন্দবাজার যে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে, তাতে কয়েকটি যাত্রাদলের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। যেমন :

১৪তম শুভ স্বাধীনতা দিবসে আজও আপনার ও
দশের আনন্দদানে নিয়োজিত কলিকাতার
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাত্রাপার্টী
তরুণ অপেরা
শ্রেষ্ঠাংশে : নটসম্রাট **ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ**
ও
বাবলি রাণী
প্রখ্যাত হাস্যরসিক : **নবদ্বীপ হালদার**

কোলিয়ারী পরিচালক	১১৩ আপার চিৎপুর রোড
অভয় বসু	কলিকাতা-৬

তরুণ অপেরার এই বিজ্ঞাপন থেকে যে তথ্য পাওয়া যায়, তা হলো সিনেমার পর্দা থেকে অভিনেতা আমদানি তরুণ অপেরার অন্যতম প্রথম কীর্তি। এই ব্যাপারে বহিরাগত কোন বিশেষ ব্যক্তি বা কোন সাংবাদিকের কোন কৃতিত্ব নেই। তা ছাড়া আরও একটি সত্য প্রমাণিত হয় তা হলো, আজকের স্বপনকুমারের ক্ষেত্রে 'নটসম্রাট' খেতাবের যে বিশেষণ যুক্ত হয়, তা একদা যুক্ত হতো ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদের নামের সঙ্গে। আরও একটি তথ্যের সন্ধান মেলে, তা হলো, ১৯৬১ সালেও চিৎপুরের নাম বদল হয়নি।

আনন্দবাজারের উক্ত ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত আরও কিছু বিজ্ঞাপনের নমুনা :

ঝুলন উৎসব উপলক্ষ্যে
নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা
যাত্রাভিনয়ে বিরাট আয়োজন
৬, ৭, ৯ই ভাদ্র (১৩৬৮) রাত্রি ১১ টায়
জিয়াগঞ্জ (নেহালিয়া ভবন) মুর্শিদাবাদ
১১ই, ১২ই ভাদ্র (নবদ্বীপ বাজার) রাত্রি ১০টা

নিউ ভাণ্ডারী অপেরা

১১৭/১ আপার চিৎপুর রোড / কলি-৬

শারদীয়া অর্ঘ্য

শশাঙ্কবাবু প্রণীত

শ্রীশ্রী তারকনাথ

শ্রী ভিক্ষু বিরচিত

ঠাকুর সর্ব্বানন্দ

নারী চরিত্রে

বুলবুল, কানাইরাণী, মদন রাণী ও নবাগত বকুল।

নৃত্যে ঃ কুমারী নমিতা ও মহাদেব

নবরঞ্জন অপেরা

এর নিচে ঠিকানা ছাপা হয়েছিল।

তারপর বিজ্ঞাপনের ভাষা ছিল এই রকম ঃ

ব্রজেন দে

যাদের দেখে না কেউ

সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

জন্মের অভিশাপ

শ্রী ভিক্ষু বিরচিত

বাসব বিদায়

স্ত্রী চরিত্রে তখনও যাত্রার আসর মাতিয়ে রেখেছিলেন পুরুষেরা—স্ত্রী সেজে অভিনয় করতেন, তার প্রমাণ, এই দলে ছিলেন ঃ শতদল রানী / সতীশ রানী / ক্ষিতীশ রানী / ননী / পুষ্প / কাজল।

আগামী ৫ই ভাদ্র হইতে বর্ধমানের রায়গঞ্জে ঝুলন যাত্রা উপলক্ষ্যে ৫ রাত্রি ব্যাপী যাত্রাভিনয়।

অম্বিকা নাট্য কোম্পানী

১১৭/১ আপার চিৎপুর বোড। কলিকাতা-৬

এবারের নবতম শারদীয়া অর্ঘ্য

ব্রজেন দে — নন্দগোপাল রায় চৌধুরী

সতীর ঘাট — **বাংলার বঁধু**

বিঃ দ্রঃ বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে ২১ আগষ্ট সোমবার ৬।। টায় কবিগুরু

রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য কবিতা 'মস্তক বিক্রয়'-এর মূল

আখ্যানের অভিনব নাট্যরূপ

প্রতিশোধ

ব্রজেন দে'র শ্রেষ্ঠ কীর্তি

১৭ আগষ্ট ৬১ ঃ যাত্রার খবর ছিল 'আনন্দলোক"-এর পাতায়। মোট ৩টি দলের খবর। রয়েল বীণাপাণী অপেরা বিশ্বরূপায় আসরস্থ করেছিল "ভাগ্যের বলি", "ধ্বংসের ডাক"। পরিচালক ছিলেন, শম্ভু ঘোষ। স্ত্রী চরিত্রে ঃ বুলবুল (বিনোদ দে), পুতুল রানী (বিধু পাল), কানন ঘোষ (ছোট খোকা)। এ ছাড়া ছিল "আঁকাবাঁকা" গোষ্ঠীর সংবাদ। 'ভাগ্যের বলি' পালার রূপসজ্জায় রূপকুমারের (নারায়ণ ভট্টাচার্য) একটা ছোট্ট ছবি

ছাপা হয়। ইনিই ছিলেন নিউ রয়েলের মালিক। যাত্রার তৎকালীন অভিনেতা শম্ভুনাথ আদক আর তৎকালীন দল পরিচালক শম্ভুনাথ ঘোষেরও ছোট্ট ছবি ছাপা হয়। ছাপা হয় "নব অম্বিকা"র ছোট বিজ্ঞাপন।

২০ আগষ্ট '৬১ ঃ আনন্দবাজারের পাতায় দেখতে পাচ্ছি "নব অম্বিকা" এবং "নিউ রয়েল"-এর বিজ্ঞাপন।

২১ আগষ্ট '৬১ ঃ আজও 'নব অম্বিকা'র ছোট বিজ্ঞাপন।

২২ আগষ্ট '৬১ ঃ এই দিনেও "নব অম্বিকার" ছোট বিজ্ঞাপন।

২৩ আগষ্ট '৬১ ঃ এই দিন মাত্র একটি বিজ্ঞাপন দেখা গেল।

সত্যম্বর অপেরা

কলিকাতা-৬ ফোন ঃ ৫৫-১০৪৩

শারদীয় অর্ঘ্য

ব্রজেন দের **মহুয়া**

দেবেন্দ্র নাথের **যাত্রা হলো শুরু**

বহু প্রত্যাশিত

সোনাই দীঘি * পুষ্প চন্দন * রাজা লক্ষ্মণ সেন *

মাটির মানুষ

২৪ আগষ্ট '৬১। এইদিন আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি বড় খবর প্রকাশিত হয় যাত্রার ওপরে। বড় টাইপে হেড লাইন ছিল এই রকম ঃ

"যাত্রার জনপ্রিয়তা আগামী উৎসব" —সূত্রধার

২৭ আগষ্ট '৬১, রবিবার। তরুণ অপেরা ও নিউ রয়েলের বিজ্ঞাপন ছিল বিজ্ঞাপনের পাতায়।

৩১ আগষ্ট '৬১। এ দিন সত্যম্বর অপেরার ছোট বিজ্ঞাপন ছিল। "এঁরাও লিখেছিলেন "বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনীর সভ্য"।

আনন্দলোকে নব অম্বিকার 'প্রতিশোধ' পালার ২ কলমের একটা ছবি ছিল। ছবিটি তুলেছিলেন অলোক মিত্র। যাত্রার আর কোন খবর ছিল না।

৩ সেপ্টেম্বর '৬১, নিউ রয়েলের ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। এরপর ৭ সেপ্টেম্বর ছাপা হয় ধৃতিশ্রী নাট্য শিল্পমের একটু বড় বিজ্ঞাপন। এই মাসের ৭ তারিখ বৃহস্পতিবার 'আনন্দলোক' পৃষ্ঠায় মাত্র ৩টি দলের সংবাদ প্রকাশিত হয় স্বল্প পরিসরে। সেই দল ৩টি হলো নব অম্বিকা, নিউ রয়েল আর বান্ধব সমাজ। এই সঙ্গে পাশপোর্ট সাইজের একটা ছবি ছাপা হয়েছিল যাত্রা শিল্পী জহর রায়ের।

৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ঃ নব অম্বিকার, ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল। সেই সঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো শুক্রবারের সিনেমা পাতায় বেশ বড় আকারে, বড় হরফে ছাপা হয়েছিল একটি যাত্রা সংবাদ।

সংবাদটি ছিল এই রকম ঃ

নিখিল বঙ্গ যাত্রা উৎসব

"বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনী আয়োজিত 'নিখিল বঙ্গ যাত্রা উৎসব' আগামী ১৬ই সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে। একুশ দিন ব্যাপী এই উৎসবে অংশ নেবেন বিভিন্ন খ্যাতনামা পেশাদার ও অপেশাদার যাত্রা সংস্থা। এতে কুড়িটি পালা অভিনয় ছাড়াও শেষ দিনে, যাত্রা জগতের প্রবীণ ও নবীন শিল্পীদের সমন্বয়ে সম্মিলিত অভিনয় রজনী হিসাবে একটি

পালা অভিনীত হবে। উৎসবের আসর বসবে শোভাবাজার রাজবাড়িতে। প্রতিদিনের সম্মেলন শুরু হবে সন্ধ্যা ৬টা। শেষ হবে রাত্রি দশটা।..."

১০ সেপ্টেম্বর। নিউ রয়েল এবং নট্ট কোম্পানির বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। উপরোক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হবার পর থেকে যে দলই বিজ্ঞাপন দিত, তারাই বিজ্ঞাপনে "বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনের সদস্য" কথাটা ব্যবহার করত। এই তারিখে নব রঞ্জন অপেরা, নব অম্বিকা, আর্য অপেরারও বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল। এই বিজ্ঞাপন সূত্র থেকে আমরা দেখতে পাই "আর্য অপেরায় ফোন এসেছে।" এই নিয়ে ষাটের দশকের গোড়ায় মোট দু'টি দলে ফোন এলো।

যা হোক, নবরঞ্জন অপেরা গিরীশ নাট্য উৎসবে ব্রজেন দে'র "চণ্ডীমঙ্গল" পালা মঞ্চস্থ করেছিল। শিল্পী তালিকায় ছিলেন পঞ্চু সেন, ভোলা পাল (বড়), স্বপনকুমার, তিনকড়ি ভট্টাচার্য, শতদল।

নট্ট কোম্পানি শারদ অর্ঘ্য হিসেবে দুটি পালার নাম ও শিল্পীদের নাম প্রকাশ করে। শিল্পী তালিকায় তখন ছিলেন, সুজিত পাঠক, দেবেন ব্যানার্জী, নির্মল অধিকারী, জহর রায়, হরগোবিন্দ সেন, অচিন্ত্য মৈত্র, সাধন দাশগুপ্ত, প্রফুল্ল দে, সতীশ, আর স্বয়ং সূর্য দত্ত। স্ত্রী চরিত্রে ছিলেন, চপল, ফণি, সুখরঞ্জন, হরিগোপাল। সংগীতে ছিলেন, ক্ষিতীশ, ভুলুয়া। বিজ্ঞাপনে কোন ফোন নাম্বার ছিল না।

১৪ সেপ্টেম্বর। দি ক্যালকাটা অপেরার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। এই সময়ে আসাম, ত্রিপুরা, কাছাড়ে যাত্রা হতো বলে যাত্রা দলগুলিকে একাধিক পালা তৈরি রাখতে হতো। ক্যালকাটা অপেরার ছিল ৮টি পালা। ধর্মের বলি, অভিজাত্য, মহাকাল, কয়েদি, পাঞ্জাব কেশরী, সিরাজদ্দৌলা, বৌ রানীর দেশ, কুলের সাজা। এ দলের শিল্পী তালিকায় তখন ফণি মতিলাল, নটতিলক সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ। পরিচালক ছিলেন গৌরীশঙ্কর বর্মণ, কালীপদ অধিকারী তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। শম্ভুনাথ ঘোষ ও কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন সুকুমার দত্ত। আসাম দিকের বুকিং এজেন্ট ছিলেন বিনয়ভূষণ দাস। কামাখ্যা হোটেলে বুকিং নেওয়া হতো। এই ১৪ তারিখে নিউ রয়েল ও নব রঞ্জনের ছোট্ট বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল বিজ্ঞাপন পাতায়। আর "আনন্দলোক"—পাতায় কয়েকটা অপেশাদার যাত্রা দলের খবর ছিল। যাত্রার কোন ছবি ছাপা হয়নি।

১৮ সেপ্টেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকার ৬নং পাতায় ৩ কলম মাপের একটা ছবি ছাপা হয়েছিল যাত্রার। শোভাবাজার রাজবাড়িতে অনুষ্ঠিত যাত্রা উৎসবের উদ্বোধনের ছবি। ছবিতে তরুণকান্তি ঘোষ সহ আরও কয়েকজন ছিলেন। সেই সঙ্গে নিজস্ব প্রতিনিধির একটা রিপোর্ট ছাপা হয়েছিল। নিজস্ব প্রতিনিধির মূল লেখক সূত্রধার কিনা তা অবশ্য জানি না। রিপোর্টিংটা ছিল এই রকম ঃ

নিখিল বঙ্গ যাত্রা উৎসব

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

"বাঙলার অতীত ঐতিহ্য ও গৌরবময় লোকশিল্প যাত্রা গান।

বস্তুত প্রকৃত গণ নাটক বলতে যা বোঝায়, যাত্রাগান তার আদি উদাহরণ হওয়া সত্ত্বেও কয়েক বছরের দেশগত বিপর্যয়ে এটি প্রায় লুপ্ত হতে বসেছিল ; বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনী এই অতীত ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারের প্রয়াসে চৌদ্দদিন ব্যাপী এক যাত্রা উৎসবের আয়োজন করেছেন।

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর এই আসন্ন উৎসবের উদ্বোধন হল শোভাবাজার রাজবাড়িতে।...

...ফটকে পুলিশ আর সার্জেন্টের ভীড়—মন্ত্রী আসছেন।

দিল্লী থেকে হুমায়ুন কবীর, এ রাজ্যের আছেন তিন জন। খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন আসবেন, আসবেন কৃষিমন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষ, উপমন্ত্রী মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়।

আসছেন, আসছেন করতে করতে গাড়ি এল। এক সঙ্গে অনেক সানাইয়ের সুরে চড়া গমক। ইতঃস্তত দর্শনার্থীর ভীড়। না, প্রফুল্ল সেন শেষ পর্যন্ত আসতে পারেননি। তবে দেহরক্ষী মারফৎ পত্র পাঠিয়েছিলেন। মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়ও এলেন না। কিন্তু তার জন্য অনুষ্ঠান থেমে থাকেনি।

গীতপ্রভা শেলী সান্যালের উদ্বোধন সংগীতের পর সভার কাজ সুরু হল।

প্রথমে অষ্টশতাধিক নাট্যগোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় সংস্থা "বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনীর" সাধারণ সম্পাদক দীপক রায় তাঁদের ৫ম বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। বলেন, আগামী ৫ বছরের মধ্যে দুটি বৃহৎ রঙ্গমঞ্চ তাঁরা প্রতিষ্ঠা করবেন, যার একটি হবে অপেশাদার থিয়েটারের জন্য, অন্যটি আধুনিক যাত্রামঞ্চ।......বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনীর কথা বললেন, নিখিলবঙ্গ যাত্রা উৎসবের উদ্বোধক শ্রীহুমায়ুন কবীরও। তিনি বলেন, এ প্রচেষ্টা ভারতে এই প্রথম এবং অভিনন্দন যোগ্য।......

তরুণকান্তি ঘোষ তাঁর ভাষণে যাত্রাগানের উন্নতি চান।

সাধনা ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ যাত্রা অপেরার নাট্য রঙ্গ প্রসঙ্গে ভাষণ দেন।

ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ যাত্রা উন্নয়নে আনন্দবাজারের দান স্বীকার করেন। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, দেবব্রত সুর চৌধুরী, সংগঠনীর অস্থায়ী কার্যকরী সমিতির সভাপতি ও নাট্যকার কিরণ মৈত্র ভাষণ দেন!..."

শুধুমাত্র সঠিক ইতিহাসের জন্য আমি নাট্যকার কিরণ মৈত্রের সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাতকারের পাশে, প্রবোধবন্ধু অধিকারীর নিজের লেখা থেকে কিছুটা অংশ তুলে দেবার জন্যে আনন্দবাজার পত্রিকার একটির পর একটি পৃষ্ঠা মেলে ধরলাম! এরই পরিপ্রেক্ষিতে স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, শোভাবাজার রাজবাড়িতে অনুষ্ঠিত যাত্রা উৎসবের নেপথ্যে ছিল একাধিক মানুষের শ্রম, ভাবনা আর আর্থিক সহায়তা!

॥ অনুষ্ঠানের আরও বিবরণ ॥

- ২০ সেপ্টেম্বর '৬১। ৩য় বিজ্ঞাপন। অগ্রিম বুকিং চলছে। ছোট্ট আর একটি বিজ্ঞাপন "গিরীশ নাট্য উৎসবে, বিশ্বরূপায় সত্যম্বর অপেরার সোনাই দীঘি।"

- ১৫ সেপ্টেম্বর '৬১ আর্য অপেরা নবরঞ্জন অপেরার বিজ্ঞাপন ছিল। এই ১৫ তারিখে আর যে বড় বিজ্ঞাপনটি সবার নজরে পড়ে সেই বিজ্ঞাপনটি ছিল এই রকম।

আট শতাধিক নাট্য প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় সংস্থা

বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনী

(আয়োজিত)

নিখিলবঙ্গ যাত্রা উৎসব

স্থান : শোভাবাজার রাজবাড়ি, ৩৫ রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা

আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন : ১৬ই সেপ্টেম্বর, সন্ধ্যা ৭-৩০ মিঃ

সংগঠনী সভাপতি	অনুষ্ঠান সভাপতি	উদ্বোধক
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন	শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ	হুমায়ুন কবীর

প্রধান অতিথি : ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ। বিশেষ অতিথি : মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৭ সেপ্টেম্বর '৬১ যাত্রা উৎসবের ২য় বড় বিজ্ঞাপন।

।। যাত্রার পরিবেশে যাত্রা।।

২৩ সেপ্টেঃ শনিবার	২৭ সেপ্টেঃ বুধবার
গণেশ অপেরা ঃ পরিচয়	শিশিরকুমার ইন্স ঃ শ্রীনিমাই সন্ন্যাস
২৪ সেপ্টেঃ রবিবার	২৮ সেপ্টেঃ বৃহঃ
নবরঞ্জন ঃ বর্গী এলো দেশে	তরুণ অপেরা ঃ জালিয়াৎ
২৫ সেপ্টেঃ সোমবার	২৯ সেপ্টেঃ শুক্র
সত্যম্বর ঃ যাত্রা হলো শুরু	নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা ঃ ভাগ্যের বলি
২৬ সেপ্টেঃ মঙ্গলবার	৩০ সেপ্টেঃ শনি
নিউ ভাণ্ডারী ঃ সাধক রামপ্রসাদ	নট্ট কোম্পানী ঃ লোহার জাল
১ অক্টোঃ রবিবার	২ অক্টোঃ সোমবার
ক্যালকাটা অপেরা ঃ ধর্মের বলি	অম্বিকা নাট্য কোম্পানী ঃ শয়তানের চর

"আগামী ২৩শে সেপ্টেম্বর থেকে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত ১৪ দিন ব্যাপী যাত্রা-উৎসব অংশ নেবেন—"

"নট্ট কোম্পানী, নিউ গণেশ অপেরা, সত্যম্বর অপেরা, নবরঞ্জন অপেরা, অম্বিকা নাট্য কোম্পানী, নিউ রয়েল বীণাপাণি, তরুণ অপেরা, নিউ ভাণ্ডারী অপেরা, ক্যালকাটা অপেরা, ধৃতিশ্রী নাট্য শিল্পম্, নাট্য ভারতী এবং অন্যান্য পেশাদার-অপেশাদার দল।

দৈনিক টিকিট ঃ ৬২ নঃ পঃ, ১ ও ২ টাকা। সদস্য হোন—টিকিট সংগ্রহ করুন।

প্রধান কার্যালয় ঃ ৯/৫ ফার্ণ রোড, কলকাতা-২৯"

২১ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর ছোট ছোট অনেক বিজ্ঞাপনই আনন্দবাজারে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আনন্দলোক পাতায় আনন্দবাজারের দৃষ্টি যাত্রার ওপরে তখনও প্রখর ভাবে পড়েনি। শহর ও মফঃস্বলের নানা সাংস্কৃতিক খবরেই ঠাসা ছিল।

এই ভাবে এলো ১৯৬২ সাল।

যাত্রাকে আলোয় আনার জন্য বিশ্বরূপা থিয়েটারের কর্ণধার এবং নাট্য নির্দেশক রাসবিহারী সরকারের যে বিশাল ভূমিকা ছিল তার প্রমাণ ১৯৬০ সালের শেষ ভাগ থেকেই আমরা পাচ্ছিলাম।

স্টেজে যাত্রা দলগুলিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আনা যেমন তাঁর একটি স্মরণীয় কীর্তি, তেমনি যাত্রাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য যাত্রার বিশিষ্ট শিল্পীদের এনে, থিয়েটারের শিল্পীদের সঙ্গে মিলিয়ে নাটক করাও তাঁর অবদান।

শোভাবাজার রাজবাড়িতে যাত্রা উৎসব হয়েছিল তা একক ভাবে কারও কীর্তি নয়। কিন্তু যাত্রাকে আরও বেশি মানুষের কাছে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করার জন্য রাসবিহারী সরকারের দান ভোলার নয়। রাসবিহারী বাবুর বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদও এ ক্ষেত্রে ইতিহাসের পাতায় অক্ষয় হয়ে থাকবে। শোভাবাজারের রাজবাড়িতে যে যাত্রা উৎসব হয়েছিল, রাসবিহারী সরকার সেই উৎসব থেকে একটি ব্যাপারে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তা হলো প্রকাশ্য ময়দানে প্যাণ্ডেল বেঁধে যাত্রা উৎসব করে শহরকেন্দ্রিক সমস্ত মানুষের কাছে যাত্রাকে মর্যাদার আসনে বসানো।

এ ব্যাপারে ১৯৬২ সালের ১ আগষ্ট আনন্দবাজারে প্রকাশিত হলো একটি বড় বিজ্ঞাপন ঃ

"যাত্রা উৎসব

স্থান ঃ বিডন স্কোয়ার।"

পরবর্তী সময়ে যাত্রাকে শহর কলকাতার এবং আসাম—পশ্চিমবঙ্গে এক মর্যাদার

আসনে বসানোর জন্য, আনন্দবাজারের মত শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্রের দেওয়া স্বাধীনতা এবং শক্তিকে মূলধন করে, 'আনন্দলোক' পৃষ্ঠাকে হাতিয়ার করে, প্রবোধবন্ধু অধিকারী ওরফে সূত্রধার অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য যাত্রা জগতকে আনন্দবাজারমুখী করে তোলা, সিনেমা-থিয়েটারের, বিশেষ করে গ্রুপ থিয়েটারের যে সব অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অভিনয়ে যথেষ্ট শক্তিমান হয়েও নিদারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কটে ছিলেন, যাঁরা সিনেমা পাড়ায় এক্‌সট্রার কাজ করতেন, পর্দায় ভালভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা দিতে পারছিলেন না তাঁদের যাত্রায় আনা, যাত্রার বিজ্ঞাপনের রূপ বদল। যাত্রার গদিতে শোকেসে সিনেমা হাউসের মত স্টিল ফটোগ্রাফ সাজিয়ে নায়েকদের আকৃষ্ট করার ভাবনা, প্রবোধবাবুর স্মরণীয় অবদান। পরবর্তী সময়ে, রাণীগঞ্জে রাণীসায়ের মোড়ে যাত্রার স্বনামখ্যাত-প্রবীণ বুকিং এজেন্ট অনিল ভাণ্ডারীর বুকিং ব্যবসার কল্যাণ কামনায় "যাত্রা ভবন" নামে অফিস উদ্বোধনের প্রেরণা জোগানো, সংবাদপত্রে পূর্ণপৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন দেবার পরামর্শ, যাত্রাকে জাতে তোলার জন্যেই হোক বা অন্য কোন আদর্শের জন্য হোক 'দেশ' 'ভূমিলক্ষ্মী', 'আনন্দলোক' ইত্যাদি আনন্দবাজারের একাধিক পত্রিকায় যাত্রার বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য ব্যক্তিগত ভাবনা প্রয়োগ প্রবোধবাবুর কীর্তি। এ সবেরই ফলশ্রুতি, উত্তোরত্তর যাত্রা জগতে বিজ্ঞাপন দেবার প্রতিযোগিতার জন্ম। পরিশেষে সর্বজন শ্রদ্ধেয় সন্তোষকুমার ঘোষের পরিকল্পিত যে সাপ্তাহিক 'আনন্দলোক' পৃষ্ঠার জন্ম হয়েছিল বঙ্গ সংস্কৃতি এবং গোটা পশ্চিমবঙ্গের সৌখিন নাট্যচর্চার কল্যাণ কামনায়, ধীরে ধীরে সেই পৃষ্ঠাটি সম্পূর্ণ 'যাত্রা' পৃষ্ঠায় পরিণত হয়ে যাবার কৃতিত্বও বোধ করি প্রবোধবন্ধুবাবুর।

॥ যাত্রা পানসিতে আধুনিকতার ঝোড়ো বাতাস ॥

ছ'য়ের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে প্রবোধবন্ধু অধিকারী যেমন অনায়াসে যাত্রাজগতের পিতার আসনে বসতে থাকলেন, যত বেশি যাত্রার জাগরণ ঘটতে থাকল, তত বেশি যাত্রা ব্যবসার সর্বস্তরের মানুষের যাত্রা ব্যবসা থেকে মুনাফা লুঠবার, যাত্রা ব্যবসা থেকে যাবতীয় ফয়দা লুঠবার বাসনা তীব্রতর হতে থাকল। সকলের আশ্রয় স্থল হয়ে দাঁড়ালেন প্রবোধবাবু। যাত্রাকে হাতিয়ার করে যাঁর যা বাসনা তাঁরা তাই অকাতরে যেমন পেশ করেন প্রবোধবাবুর কাছে, প্রবোধবাবু সর্ব সিদ্ধিদাতার মত সেই বাসনাপূরণের পথ দেখাতে থাকেন। এরই ভিতর দিয়ে প্রতি বছরের সঙ্গে তাল রেখে প্রবোধবন্ধু অধিকারী হয়ে উঠতে থাকলেন বিতর্কিত পুরুষ!

আবার এরই মধ্যে শ্রেণীভাগও সৃষ্টি হলো। ছোট-মাঝারি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মালিকপক্ষ শুরু করে দিলেন প্রবোধবাবুর বিরোধিতা। একটা বৃহত্তম গোষ্ঠী মনে করতে থাকল, প্রবোধবাবু অর্থ-সম্পদে যথেষ্ট শক্তিমান গুটি কতক যাত্রা মালিকের হাতের পুতুল। তাঁরা যা চান প্রবোধবাবু তাই দেন অকাতরে। এই বৃহত্তম বিরোধী গোষ্ঠী সাংবাদিক প্রবোধবাবুর পৃষ্ঠপোষকতা লাভে সম্পূর্ণ বঞ্চিত, এমন একটা ধারণার জন্ম হয়ে গেল!

সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের জোয়ার, গদি ঘরের আধুনিক চেহারা, শিল্পীদের ছবি সহ বিজ্ঞাপন, দলের টপের জন্য প্রাইভেট কার, যাত্রা দলে প্রাইভেট বাস কেনার হিড়িক, গদিতে গদিতে স্টিল ফটোগ্রাফ প্রদর্শন, দলের 'টপে'র সীমাহীন আর্থিক চাহিদা মেটানো, সিনেমার সঙ্গে টেক্কা দিয়ে পোস্টার ছাপা, টাকার বিনিময়ে "ভারতশ্রেষ্ঠ" অভিনেতা-অভিনেত্রীর পুরস্কার কেনা, সেই পুরস্কারের কথা উল্লেখ করে সংবাদপত্রে ঢাউস বিজ্ঞাপন দিয়ে নায়েকপক্ষকে আকৃষ্ট করা, যাত্রার আসরে সিনেমাটিক চমক সৃষ্টি, ধীরে ধীরে যাত্রা পাড়া থেকে প্রকৃত যাত্রার মানুষদের নির্বাসনে পাঠিয়ে, প্রগতির নামে সস্তা সেন্টিমেন্ট আমদানি, শিল্পীর পরিবের্তে উট, সিংহের প্রতি যাত্রা মালিকদের মর্যাদা দান, স্তাবকতা মূলক সমালোচনা, যাত্রা দলের রেট বৃদ্ধির সহজ পথ যেমন খুলে গেল, তেমনি নায়েক পক্ষের টিকিটের হার বৃদ্ধি বাধ্যতামূলক হলো। গ্রামগঞ্জের সাধারণ, অতি

সাধারণ নায়েকদের হাতে মূল্যবান প্রচার সামগ্রী, ফিল্মে কাজ করে যাওয়া সিনেমা রত্নের প্রলোভন, সাইক্লোরামা নামক চমক, পালার ক্যাসেট পৌঁছে যেতে যেতে শহরের ব্রেনের কাছে তাঁদের সরলতার মৃত্যু ঘটল। এর ফলে পঞ্চাশের দশক বা ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত যাত্রা পাড়ায় যে একান্নবর্তী পরিবারের মত পরিবেশ ছিল, পরস্পর পরস্পরের মধ্যে যে গভীর সৌহার্দ্য ছিল, যে বিবেকময়তা, যে প্রীতি, যে সৌজন্য, ভদ্রতা, কৃতজ্ঞতাবোধ আঠারো আনা জমাট বেঁধে ছিল, সত্তরের দশকের গোড়া থেকে তা ধীরে ধীরে বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে, বর্তমানে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত।

যাত্রা নাটক এবং তার উপস্থাপনা, অভিনয়ের স্তুতিগান, নিছক স্তাবকতাধর্মী সমালোচনার এক নতুন ধারার জোয়ার এলো। যাত্রা দলের শীর্ষস্থানীয় নায়ক অথবা নায়িকার প্রশংসাধর্মী আলোচনা, সাক্ষাতকার, স্তুতিগান, ছবি ইত্যাদি সাংবাদিকরা প্রকাশ করতে বাধ্য এটা যাত্রার মালিক এবং পরোক্ষভাবে ঐ সব নায়ক বা নায়িকার অলিখিত নির্দেশ। আর সাংবাদিকতার আদর্শে, আদর্শ সাংবাদিকতার স্বার্থে, প্রকৃত প্রতিভা, প্রকৃত গুণী কোন পার্শ্ব চরিত্রাভিনেতা বা পার্শ্বচরিত্রাভিনেত্রীকে আলাদাভাবে তুলে ধরা একমাত্র যাত্রা পাড়ায় প্রায় নিষিদ্ধ। পঞ্চাশের দশক থেকে সত্তরের দশকের শেষ পর্যন্ত, যাত্রার মালিকরা এমন কি দলের টপ শিল্পী, প্রকাশ্যে-সরাসরি সাংবাদিকদের এই ধরনের কাজের তীব্র প্রতিবাদ করতেন। মালিকরা বলতেন,—মাঝারি-ছোট আর্টিস্টের কথা অত ফলাও করে লিখলে, তাদের ছবি ছাপলে তারা কি আপনাদের কাগজে টাকা দিয়ে বিজ্ঞাপন দেবে? লাখ টাকা দিয়ে যে আর্টিস্ট পুষছি, তাঁদের ভাঙিয়ে ব্যবসায় লাভ করতে যখন এসেছি মশাই, তখন ও সব আদর্শ ছেড়ে এই টপদের কথা লিখুন, এতে আমাদের ব্যবসার স্বার্থ রক্ষা হবে। টপ আর্টিস্ট খুশি থাকবে। আপনাদের কাগজে বিজ্ঞাপন যাবে।—অনেক সময় টপ আর্টিস্ট, যে যত বড় আর যত আদর্শের সাংবাদিক হোন প্রকাশ্যে তাকে ডেকে হাসি মুখে অপমান করে দিতেন। সরাসরি বলতেন—যে আর্টিস্টের প্রতিভা আর শক্তিকে আপনারা ফুলিয়ে লিখে, ছবি ছেপে প্রকারান্তরে আমাকে অপমান করলেন, মনে রাখবেন তাদের নামে টিকিট সেল হয় না! মনে রাখবেন, যার জলপানির খরচ দিনে তিরিশ টাকা, তার কথা না লিখে যার জলপানি মালিকরা দিনে তিন টাকা দেয় তার কথা লিখলে এ পাড়ায় বেশিদিন আর আপনাকে ঘুরতে হবে না।

দলের মালিক যদি দলের হিরো হন, আর হিরোয়িন যদি সেই মালিক কাম হিরোর রক্ষিতা অথবা প্রেমিকা বা পক্ষপত্নী স্বরূপা হন তা হলে তো কথাই নেই। সেই দল বা দলগুলির সম্পূর্ণভাবে হিরো এবং হিরোয়িন ভজা হতেই হবে সাংবাদিকদের। এর ফলে বহু শিল্পীকে চোখের জল ফেলতে হয়েছে নীরবে। বহু শিল্পীর চোখে যাত্রার সাংবাদিকদের হতে হয়েছে অপরাধী। এর পরবর্তী সময়ে সাংবাদিকদের প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা করা হয়নি। কোন মালিক, ম্যানেজার, শীর্ষস্থানীয় নায়ক-নায়িকা প্রত্যক্ষভাবে কোন সাংবাদিককে হয়তো বোঝাতে যাননি, কার কথা কলমে প্রাধান্য দিতে হবে, কার ছবি সাংবাদিকরা ছাপবেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, যখন এই নীরব পরীক্ষার ধারা এই যাত্রারাজ্যে এসেছে, যখন কোন কোন মালিকই চাপা সুরে বলেছেন—, তেলা মাথায় তেল ঢেলে কী হবে, বরং ছোটদের, প্রকৃত প্রতিভা সম্পন্ন শিল্পীদের তুলে ধরুন মশাই—, তখন কিন্তু যাত্রা পাড়া থেকে প্রকৃত সাংবাদিকরা একে একে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। প্রকৃত আদর্শ মারা গেছে। যাঁরা সংবাদপত্রের সঙ্গে যাত্রাজগতের সম্পর্ক এই মুহূর্তে ধরে রেখেছেন, প্রকৃত অর্থে তাঁদের বেশির ভাগই উচ্চাঙ্গ লেখনীর অধিকারী, কিন্তু প্রকৃত সাংস্কৃতিক সাংবাদিকতায় উৎসর্গীকৃত জীবন নয়। তাঁরা সংবাদপত্রের আদর্শবান কর্মী। বিজ্ঞাপন সংগ্রাহক। অথবা এ্যাড্ভার্টাইজমেন্ট এজেন্ট! দুর্ভাগ্য যাত্রা পাড়ার। আজকের শিক্ষিত-মার্জিত-সচেতন শিল্পী-কলাকুশলী-মালিকপক্ষের। কারণ যাত্রা ব্যবসা থেকে টাকা গোনা আর অহর্নিশি

টাকা বানাবার চিন্তায় মশগুল থেকে, স্বার্থপর-বিবেক ও জ্ঞান বিসর্জিত সকলেই, ধীরে ধীরে সৃষ্টি হওয়া মহাশূন্যতার কারণ কেউ খুঁজতে চাননি: কেউ সঠিক মূল্যায়ন করেন নি, লক্ষ লক্ষ টাকা সংবাদপত্রে ঢেলে দিয়ে অবশেষে কী পেয়েছেন তাঁরা? মূলকথা, চুল চেরা বিচার, গঠনমূলক সমালোচনা, সঠিক প্রতিভা ও গুণীর প্রচার বা স্বীকৃতিই একটা শিল্পের ভাবমূর্তি রচনা করে। অগ্রগতির সহায়ক হয়, এই সাধারণ ভাবনাটুকুও যাত্রার কেউই যাত্রার স্বার্থে নিয়োগ করেননি কখনো। দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মুক্তির ইতিহাস যাঁদের রক্তে লেখা হয়েছিল, পরবর্তী সময়েই স্বাধীনতা ভোগীদের কীর্তির সঙ্গে. আজকের যাত্রা জগতের সকলেরই যাত্রা-প্রীতির তুলনা করা চলে। যাঁদের সর্বত্যাগী ভূমিকায় যুগ যুগান্তর ধরে "যাত্রা মাতৃকার" মূর্তি পূজিত হয়ে আসছিল, মূলত সত্তরের দশকের পর থেকে যাত্রার একমাত্র অর্থলোভী উত্তরাধিকারেরা হয়ে উঠতে থাকলেন সেই ভাবমূর্তি চূর্ণ করার কারিগর।

যাত্রা নাটক এবং তার উপস্থাপনা ও অভিনয়ের স্তুতিগান বা নিছক প্রশংসাধর্মী সমালোচনার ধারা প্রবর্তনের ফলে যাত্রার যা কিছু অন্যায় বা ত্রুটি, তার সংস্কার বা সংশোধনের চেষ্টা হারিয়ে গেল। যাত্রার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেরই, বিশেষ করে প্রভূত অর্থ ব্যয় করে যাঁরা বিজ্ঞাপন দিতে থাকলেন ব্যবসায় অনিবার্য সাফল্য মনে করে তাঁরাই মূলতঃ যাত্রায় চালু করলেন স্টার সিস্টেম। এই স্টার সিস্টেমের সঙ্গে এল নানাবিধ উপকরণ। এর ফলে দলের চাহিদা বৃদ্ধি হতে থাকল। দলের চাহিদা মিটিয়ে ব্যবসায় সাফল্য অনিবার্য করে তোলার জন্য নায়েকপক্ষও দর্শকদের ওপরে চাপিয়ে দিতে থাকলেন টিকিটের হার বৃদ্ধির বোঝা।

এক সময়ে নায়েকপক্ষ অর্থাৎ যাত্রা যাঁরা করান তাঁরা চিৎপুরে যাত্রা দলের গদিতে হাজির হয়ে প্রথমেই জানতে চাইতেন, ভাল বাজিয়ে কে আছেন? অর্থাৎ সেটা ছিল সংগীত আর সঙ্গতের যুগ। বাজিয়েদের নামে তখন দল বায়না হতো। আসরে দর্শক আসত কাতারে কাতারে।

সেই যুগের অবসান হয়ে গেল! এলো রাজা-রানী আর সেনাপতির যুগ। দল বায়না করতে এসে নায়েকপক্ষ প্রথমেই জানতে চাইতেন, পালায় রাজা বা রানী অথবা সেনাপতি কে সাজবেন? আসলে ঐ যুগে এমন কিছু অভিনেতার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল বা অভিনয় দাপট এমন তুঙ্গে উঠেছিল যা বিস্ময়কর! ওঁরা রাজকীয় পোশাক পরে আসরে এলেই বাজিমাৎ হয়ে যেত। তাঁরা যেমন ছিলেন সুপুরুষ তেমনি ছিল তাঁদের উদাত্ত কণ্ঠস্বর।

তারপর আসে পালাকারের যুগ।

সে যুগে এমন কিছু পালাকার এসেছিলেন যাঁদের নামেই পালা বায়না হয়ে যেত। যাঁদের নামে টিকিট বিক্রি হয়ে যেত আশাতীতভাবে।

এরপর এলো নায়ক, নায়িকা আর আঙ্গিকের যুগ।

বলা যেতে পারে সেই যুগটি এখনও বেঁচে আছে। বলা বাহুল্য, থিয়েটার মঞ্চ থেকে অভিনেতা, নৃত্যশিল্পী, সুরকার আমদানি করা যদিও চল্লিশ দশকের শেষ দিক থেকে শুরু হয়েছিল, পঞ্চাশের দশকে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সত্তরের দশক থেকে তার সঙ্গে প্রকট ভাবে যুক্ত হয় সিনেমা আর্টিস্ট আমদানি। এর মধ্যে ধীরে ধীরে প্রাধান্য পেতে থাকে আঙ্গিক। ধীরে ধীরে যাত্রা তার কৌলিন্য হারাতে হারাতে হয়ে উঠতে থাকল চমক সর্বস্ব!

বঙ্গযাত্রার আসরে বেশ কিছুটা আধিপত্য বিস্তার করতে লাগল উড়িষ্যার আলোক জাদু। যার নাম "সাইক্লোরামা", ইত্যাদি। যাত্রার আসরে প্রাধান্য পেতে থাকল সার্কাসের উট, বাঘ, সিংহ, বানর, শিম্পাঞ্জি আরও কত!

এ দেশের মাটিতে একদিকে যত বেশি গণচেতনা জাগরণের কর্মযজ্ঞ চলতে থাকল, বঙ্গ সংস্কৃতির মান উন্নয়নের জন্য যত বেশি নব নব চেতনার উন্মেষ ঘটতে থাকল, দেশের সর্বস্তর

থেকে অশিক্ষা দূরীকরণের কাজ যত বেশি দানা বাঁধতে থাকল, গোটা পৃথিবীর মানুষ যখন বঙ্গ সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির গতি ও প্রকৃতির প্রতি আগ্রহ যুক্ত, যখন সারা দেশময় বঙ্গ সংস্কৃতি ও শিল্পের বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিবাদী আন্দোলনের জোয়ার ঠিক তখনই, আজকের 'যাত্রা' নামক এক বৃহত্তম গণমাধ্যমে কিছু মানুষ দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ধরে সেই যাত্রাকে মর্যাদার আসন থেকে সরিয়ে দিতে বদ্ধ পরিকর। 'যাত্রা' ব্যবসা যে লক্ষ লক্ষ সাধারণ, অতিসাধারণ মানুষের পৃষ্ঠপোষকতায় আজ রমরমা, যাত্রার একালের অধিকাংশ প্রয়োগকর্তারা সেই সাধারণ লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে সরাসরি প্রতারণায় লিপ্ত। যাত্রা পালার রুচিহীন, বিকৃত, সস্তা সেন্টিমেণ্ট যুক্ত 'নামকরণ' আর 'চমক' বিতরণই সেই প্রতারণার নামান্তর! এই সব নানাবিধ কারণে, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের ব্যবসা 'যাত্রা' আজও সর্বজন অভিনন্দিত, সমকালীন সমাজ অঙ্গনের সর্বস্তরে বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত নয়।

এরই মধ্যে যাত্রা জগতের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনের জন্য, মহামিলনের গ্রন্থি রচনার তাগিদে অনেকবারই শক্তিশালী সংগঠন তৈরির চেষ্টা হয়েছিল। যাত্রাশিল্পের সার্বিক কল্যাণের জন্য, যাবতীয় অন্যায় মুক্তির জন্য যেমন যাত্রার সাংবাদিকরা গঠন কবেছিলেন "সাংস্কৃতিক সাংবাদিক সংস্থা, অর্থাৎ সাসাস", তেমনি গড়ে উঠেছিল "যাত্রা শিল্পী সংঘ", "পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সংসদ" "পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলন"। কিন্তু কোন সংগঠনই চিরস্থায়ী হতে পারেনি। পরবর্তী সময়ে গড়ে ওঠা "যাত্রা কর্মী পরিষদ" এবং শিল্পীদের সংগঠন "যাত্রা প্রহরী" এবং "পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলন" অবশ্য আজও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ভিতর দিয়ে বিদ্যমান।

॥ রাসবিহারী সরকার এবং যাত্রা ॥

যাত্রাকে অন্ধকার থেকে আলোয় আনার তাগিদে, যাত্রার জন চাহিদা বৃদ্ধি কামনায়, যাত্রার প্রতি এই শহর কেন্দ্রিক শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য, যাত্রাকে অন্যান্য সংস্কৃত ও শিল্প মাধ্যমের একই পঙক্তিতে শ্রদ্ধার আসনে বসাবার বাসনায়, বিশ্বরূপা থিয়েটারের কর্ণধার রাসবিহারী সরকার প্রথমেই কয়েকজন যাত্রা অভিনেতাকে বিশ্বরূপার নিয়মিত নাটকে অভিনয় করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ষাটের দশকের গোড়ায় শোভাবাজার রাজবাড়ির অঙ্গনে একদিন যে যাত্রার অগ্রগতির বীজ বপন করা হয়েছিল, বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের পক্ষে দক্ষিণেশ্বর সরকার ও রাসবিহারী সরকার সম্মিলিত ভাবে সেই বীজ থেকে অঙ্কুরের উদ্ভব ঘটিয়ে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন রবীন্দ্রকাননে। সেই উৎসবের বৈশিষ্ট্য ছিল ঃ

- বিশিষ্ট যাত্রা শিল্পীদের মানপত্র দান এবং শ্রেষ্ঠ যাত্রা প্রযোজকদের পুরস্কারে সম্মানিত করা।
- যাত্রা প্রযোজনা ও যাত্রা অভিনয় প্রসঙ্গে আলোচনাচক্র। ❑ সর্বাধুনিক বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে যাত্রায় আলোক সম্পাত ❑ যাত্রার প্রচার কর্মে সমকালীন চেতনা প্রয়োগ।

তৎকালীন আলোচনা চক্রে যাত্রার ওপরে বক্তব্য রাখেন নাট্যকার জলধর চট্টোপাধ্যায়, অশোক সেন, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। যাত্রাভিনেতা ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ ও ফণি মতিলালকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে মানপত্রে সম্মানিত করা হয়েছিল। শ্রেষ্ঠ প্রযোজক হিসেবে এই অনুষ্ঠানে সত্যম্বর অপেরার মালিক গৌর দাসকে পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছিল।

বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই অনুষ্ঠানে আলোক নিয়ন্ত্রণ করে যাত্রা জগতে এবং যাত্রা দর্শকদের কাছে তাপস সেন বিশেষ সম্মান পান।

এই অনুষ্ঠানে অভিনয়ের সুবিধার্থে ব্যাপক মাইক্রোফোনের ব্যবহার যাত্রার নতুন দিক্ সৃষ্টি করেছিল। সেই সঙ্গে এ কথাও সত্য, এই মাইক্রোফোনের আবির্ভাব বাংলার প্রাণের সম্পদ যাত্রার পুরাতন ঐতিহ্য বা মাধুর্য বিনষ্ট করল।

ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য তাঁর গবেষণা গ্রন্থে বলেছেন—"...পরিষদের পক্ষ হইতে যাত্রার ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। সাংবাদিকগণও এই প্রচারের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। যাত্রা সম্পর্কে ইহার পূর্বে পত্র-পত্রিকায় এত ব্যাপক প্রচার আর কখনো হয় নাই।—"

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ বাৎসরিক আলোচনা চক্রে যাত্রার উপরে আলোচনার সুযোগ বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে দিত। এবং এই সব আলোচনা চক্রের বক্তা ছিলেন ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, শিব ভট্টাচার্য, ব্রজেন দে, শুদ্ধসত্ত্ব বসু আরও অনেকে।

এই সময়ে যাত্রা মালিকদের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ভাবনা দেখা দিল। যাত্রার উন্নতির জন্য যাঁরা এগিয়ে এসেছেন তাঁরা তো সকলেই এক এক দিকে বিখ্যাত, কিন্তু এঁদের মধ্যে কাদের সঙ্গে পাকাপাকি ভাবে গাঁটছড়া বাঁধলে যাত্রাকে উন্নততর সোপানে নিয়ে যাওয়া যাবে?

১৯৬৩ সালে শোভাবাজার রাজবাড়িতে আবার যাত্রার মালিকদের নিয়ে প্রবোধবাবুরা একমাস ব্যাপী যাত্রা উৎসব করলেন। সেই যাত্রার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল অতীত দিনের বিভিন্ন নামের যাত্রার অংশ গ্রহণ। যাত্রার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল নাটক। তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার'। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৬৪ সালে প্রবোধবাবু বরানগরে একটা যাত্রা উৎসব করান।

ওদিকে বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আর প্রকাশ্যে যাত্রা উৎসব করল না বটে তবে—

"...যাত্রার উন্নতি কল্পে সৌখিন যাত্রা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিযোগিতারও প্রচলন করা হয়। বিশিষ্ট পেশাদার যাত্রা সংস্থাগুলিকে যেমন 'বিশ্বরূপ'ও নাট্য মঞ্চে কয়েকটি অভিনয়ের সুযোগ দেওয়া হয় তেমনি বাৎসরিক নাট্য সম্মেলনেও যাত্রা আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়।—"

১৯৬৪ সালে বরানগরে যাত্রা উৎসব করার পর থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে যাত্রা মালিক বা প্রবোধবন্ধুবাবুদের বিশেষ কোন সাড়া ছিল না। ১৯৭৩ সালে যাত্রার উন্নতিকামনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে "যাত্রা উৎসব" হয়। যাত্রাকে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সরকারি পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় শিল্পী-কলাকুশলীদের হাতে।

ইতিমধ্যে অর্থাৎ ১৯৬৪ সালে প্রবোধবাবুদের বরানগরের যাত্রা উৎসবের পর থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত যাত্রায় যে পরিবর্তন আসে, বা বিবর্তনের ঝড় ওঠে তার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করা যাক—

১৯৬৬ সালের কথা।

অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ষাটের দশকের গোড়া থেকেই বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের অন্যতম সদস্য হিসেবে যেমন যাত্রার নানা উন্নতির জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করে গেছেন, তেমনি যাত্রা প্রসঙ্গে বিভিন্ন আলোচনা চক্রে গঠনমূলক ভাষণ দিয়েছেন। যাত্রার সার্বিক উন্নতির জন্য যাত্রা জগতে যে একটা শক্তিশালী সংগঠন প্রয়োজন সে বিষয়ে সকলকেই বার বার সজাগ করেছেন। অবশেষে তাঁরই প্রেরণায় ও পূর্ণ সহযোগিতায় শিব ভট্টাচার্য ও আরও অনেকে মিলিত ভাবে গড়েন "যাত্রা শিল্পী সঙ্ঘ"।

❏ **সাংবাদিক সম্মেলন**

১৯৬৬ সাল। আনন্দবাজার পত্রিকামুখী যাত্রা মালিকপক্ষ যেমন কিছু কিছু বিজ্ঞাপন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করছিলেন, তেমনি বহু পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত যাত্রা সংবাদ পরিবেশনার প্রবণতাও প্রকট হচ্ছিল। এই সময়ে যাত্রার মালিক পক্ষের সঙ্গে এ দেশের সমস্ত পত্র-পত্রিকার একটা হার্দিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য, ব্যবসায়িক সম্পর্ক সহজ করে তোলার জন্য স্বাধীনতা,

নতুন খবর, দৈনিক বসুমতী, মঞ্চজগৎ, প্রসাদ, নব কল্লোল, অমৃতবাজার, অমৃত এবং যুগান্তর পত্রিকার কর্তৃপক্ষ এক ঘরোয়া সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, অমৃতবাজার সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ, অমৃতবাজার সিনেমা সম্পাদক ও নাট্য সমালোচক নির্মলকুমার ঘোষ (এন.কে.জি), যুগান্তর পত্রিকার সিনেমা সম্পাদক মহেন্দ্র সরকার, যুগান্তর পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিভাগীয় অধিকর্তা রবি বসুমল্লিক, মঞ্চজগৎ সম্পাদক গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ।

১৯৬৭ সাল।

এর পর প্রথমেই যুগান্তর এবং পরে আনন্দবাজার, দৈনিক বসুমতী এই দৈনিকগুলি যাত্রার ওপরে বিশেষ ক্রোড়পত্র বার করে। এই সব ক্রোড়পত্রে বড় বড় বিজ্ঞাপন দেবার জন্য যাত্রা মালিকদের নানা দিক থেকে প্রতি মুহূর্তে সজাগ করে তোলার একটা প্রচণ্ড চেষ্টা চলতে থাকে। বিজ্ঞাপনও প্রকাশিত হয়।

॥ ১৯৬৮ সালের যাত্রা আলোচনা সভা ॥

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ অন্যান্য বছরের মতই এক আলোচনা সভার আয়োজন করেন। সেই আলোচনা সভার সভাপতি হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।

॥ ১৯৬৮ সালে দিল্লীতে যাত্রা / টেলিভিশনে যাত্রা ॥

ইতিমধ্যে স্বাধীনতা পত্রিকার সাংবাদিক কিষাণ দাশগুপ্ত তৈরি করেছিলেন 'নাট্যভারতী থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টি'। এ বছরে এ দলের 'রাজকুমার' পালা নিয়ে সদল বলে কিষাণবাবু দিল্লীর কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে যাত্রা করান এবং তার অংশ বিশেষ দিল্লীর টেলিভিশনে দেখানো হয়!

॥ ১৯৬৮ সালে বিনোদন সংখ্যা অমৃত ॥

অমৃত পত্রিকায় এই সময়ে কালীশ মুখোপাধ্যায় 'বিনোদন সংখ্যা'য় একাধিক লেখকদের দিয়ে যাত্রার ওপরে লেখান। কয়েকজন চিত্র পরিচালকদের দিয়েও যাত্রার ওপরে আলোচনা করা হয়। এই বিনোদনে যাত্রার একাধিক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল।

॥ ১৯৬৮ সালে বিভিন্ন মঞ্চে যাত্রা উৎসব ॥

বিশ্বরূপা, কাশী বিশ্বনাথ, মহাজাতি সদন মঞ্চে 'যাত্রার শিল্পী সংঘ' মনোজ্ঞ উৎসব করে। যাত্রার দুস্থ শিল্পীদের আর্থিক সাহায্য দেবার পরিকল্পনায় এই উৎসব হয়েছিল। 'যুগান্তর' পত্রিকা এই উৎসবের ব্যাপারে শুধু সংবাদ পরিবেশন নয় আরও নানা দিক থেকে সাহায্য করেছিল।

॥ ...য় সংগীত নাটক অকাদেমী পুরস্কার ॥

১৯৬৮ সালে ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদকে (মুখোপাধ্যায়) সংগীত নাটক অকাদেমী পুরস্কারে সম্মানিত করার মধ্য দিয়ে যাত্রা জগতকে সম্মানিত করা হয়।

॥ ১৯৬৯ সালে রবীন্দ্রসদন উৎসব উপসমিতির যাত্রা উৎসব ॥

এই সালে সেপ্টেম্বর মাসে রবীন্দ্রসদন উৎসব উপসমিতি রবীন্দ্রসদনে ষোল দিন ধরে এক বিরাট যাত্রা উৎসব করে শহর কেন্দ্রিক মানুষকে যাত্রা দেখার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

এই উৎসবে যে দলগুলি অংশ নিয়েছিল তাদের নাম ও উপস্থাপিত পালার নাম এই রকম ঃ

তরুণ অপেরা ঃ হিটলার।।
নিউ আর্য অপেরা ঃ রাইফেল।।
জনতা অপেরা ঃ ফাঁসির মঞ্চে।।
ভারতী অপেরা ঃ মৃত্যুঞ্জয় সূর্য সেন।।
শ্রীরাধা নাট্য কোম্পানি ঃ পথের ছেলে।।
মাধবী নাট্য কোম্পানি ঃ আগুন নিয়ে খেলা।।
নবরঞ্জন অপেরা ঃ মাইকেল মধুসূদন।।
সুশীল নাট্য কোম্পানি ঃ রক্তে রাঙ্গা হাঁসুলী ডাঙ্গা।।
নিউ প্রভাস অপেরা ঃ বারুদ।।
নিউ গণেশ অপেরা ঃ মরেও যারা মরে না।।
সত্যম্বর অপেরা ঃ দিগ্বিজয়।।
বৈকুণ্ঠ যাত্রা সমাজ ঃ পতিঘাতিনী সতী।।
অম্বিকা নাট্য কোম্পানি ঃ চণ্ডীতলার মন্দির।।
নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা ঃ এক টুকরো রুটি।।
নাট্যভারতী থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টী ঃ আন্দোলন।।
নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টী ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামনি।।

দর্শকদের অনুরোধে আরও ৪ দিন উৎসব বাড়িয়ে দেওয়া হয়। আর এই ৪ দিনে অংশ গ্রহণকারী দল হলো নট্ট কোম্পানি, তরুণ অপেরা, সত্যম্বর অপেরা, বৈকুণ্ঠ যাত্রা সমাজ।।

॥ ১৯৬৯ সালে যাত্রা অভিনেতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তা ॥

প্রবীণ অভিনেতা সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'অর্ধ শতাব্দীর অভিনয়' এই শিরোনামের ওপর বিশেষ বর্ক্তৃতা দেবার জন্য (extension lecturer) আমন্ত্রণ জানানো হয়। যাত্রা জগতের পক্ষে এও কম বড় সম্মানের ব্যাপার নয়। সুরেন্দ্রনাথ যাত্রা অভিনয় এবং সংগীতের উদাহরণসহ বক্তৃতা দিয়ে যাত্রা অভিনয় ও সংগীতের ধারা বিবর্তনের পরিস্কার ব্যাখ্যা প্রকাশ করেছিলেন সেদিন।

॥ বেতারে যাত্রা ॥

১৯৬৯ সালে ১১ অকটোবর রাত ৮.৪৫ মিঃ। কলকাতা 'ক' বিভাগে প্রবীণ অভিনেতা সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যয়ের সংগে প্রথম একটি সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, স্বয়ং বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন।

॥ যাত্রায় চলচ্চিত্র-নাট্য ক্ষেত্রের সর্বজনশ্রদ্ধেয় অভিনেতার অংশগ্রহণ ॥

যদিও চলচ্চিত্র-নাট্যক্ষেত্র থেকে পঞ্চাশের দশকের শেষভাগে যাত্রার আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন একাধিক শিল্পী, তবুও সর্বজনশ্রদ্ধেয় অভিনেতা-নির্দেশক নরেশচন্দ্র মিত্রের যাত্রায় আত্মপ্রকাশ, যাত্রার গৌরব বৃদ্ধি করেছিল। ১৯৬৮ সালে শ্রী মিত্র পরলোক গমন করেন, মৃত্যুর কিছু দিন আগে তিনি যাত্রায় অভিনয় করেছিলেন।

৮০ বছর বয়সে মৃত্যুর তিন দিন আগে 'সোনাইদীঘি' ও 'বাঙ্গালী' দুটি যাত্রা পালায় (কম্বিনেশান নাইট) আমন্ত্রিত অভিনেতা হিসেবে অভিনয় করে, বোধ করি সর্বস্তরের মানুষকে, শিল্পীদের যাত্রা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধাশীল হবার মন্ত্র শুনিয়ে যান।

॥ ১৯৬৮ সালে যাত্রায় প্রথম স্মারক উৎসব ॥

শিব ভট্টাচার্যের অনুপ্রেরণায় শান্তিগোপাল তরুণ অপেরার 'হিটলার' পালার ১৫০ রজনী স্মারক উৎসবের আয়োজন করেন এবং এই উৎসবে পালাকার-পালানির্দেশক ও শিল্পী-কর্মীদের প্রীতি উপহার দেওয়ার উদার মানসিকতা দেখান। যাত্রার সামগ্রিক উন্নতির এও দৃষ্টান্ত।

॥ ১৯৭২ সালে অভিনেতা সম্মানিত ॥

পশ্চিমবঙ্গ সংগীত-নাটক-নৃত্য আকাদেমী থেকে প্রবীণ অভিনেতা সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে যাত্রার শিল্পী হিসেবে পুরস্কৃত করা হয়। সম্মানিত করা হয়।

॥ ১৯৬৮ সালে যাত্রা লাইব্রেরী ও সত্যম্বরের অবদান ॥

এই বছরেই ছিল সত্যম্বর অপেরার হীরক জয়ন্তী। এই হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে সত্যম্বর অপেরার কর্ণধার শৈলেন মোহান্ত সত্যম্বর অপেরার গদিতে একটি যাত্রা সংক্রান্ত বই ও নথিপত্রের পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এ ব্যাপারে ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। দুঃখের বিষয় সেই লাইব্রেরীতে বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য বই ও ছবি এক সময়ে ছিল। এখন নেই।

যাত্রায় Propman দের জন্য বিশেষ পোশাকের ব্যবস্থা বাংলা যাত্রার অতীতে যেমন ছিল না, বর্তমানেও নেই। অথচ যারা আসরে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে শিল্পীদের পরিত্যক্ত জিনিস-পত্র তুলে আনে, শিল্পীদের প্রয়োজন মত মুহূর্তের মধ্যে জিনিসপত্র এগিয়ে দেয় তারাও একটি পালার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই Propman দের জন্য বিশেষ পোশাকের ব্যবস্থা করে যাত্রার অগ্রগতির অন্যতম শরিক হয় সত্যম্বর অপেরা ১৯৬৮ সালে। এই সালে সত্যম্বর অপেরার 'একটি পয়সা' পালায় Propman দের আলাদা পোশাক দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে এই প্রথা বিলুপ্ত হয়ে যায়, অথচ আজও এর অবশ্যই প্রয়োজন আছে। এই প্রতিষ্ঠানই ১৯৬৯ সালে বাদ্য যন্ত্রীদেরও বিশেষ ধরনের পোশাক পরাত। এ ব্যাপারেও একালে সত্যম্বর অপেরার শৈলেন মোহান্ত পথিকৃৎ।

॥ প্রথম পূর্ণ পৃষ্ঠা যাত্রার বিজ্ঞাপন এবং রঙিন বিজ্ঞাপন দাতা ॥

নট্ট কোম্পানি অনেক ব্যাপারেই পথিকৃত! এই প্রতিষ্ঠানই প্রথম যাত্রায় পূর্ণ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন দেবার পথ প্রদর্শক। বিজ্ঞাপন যে একটা শিল্প মাধ্যম সেটিও যাত্রা জগতে প্রথম প্রমাণ করে এই প্রতিষ্ঠান। আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় যাত্রার প্রথম বিজ্ঞাপন প্রকাশ এই প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্ব। তেমনি ১৯৮৩ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় ও ১৯৮৪ সালে আজকাল, পরিবর্তন ও সুকন্যা পত্রপত্রিকায় রঙিন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে নট্ট কোম্পানি একদিকে যেমন দুঃসাহসের পরিচয় দেয়, অন্যদিকে তেমনি বহু বিতর্কেরও সৃষ্টি হয়।

এই একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান যারা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অকল্পনীয় উচ্চহারে বায়নার বিনিময়ে যাত্রা করার ক্ষমতা প্রথম দেখায়।

॥ চিৎপুরে কেমন করে যাত্রাদল বসল ॥

"কলিকাতার নতুনবাজার ঃ গত শুক্রবারে শ্রীযুত জিন্‌কিন্স লো এন্ড কোম্পানির সাধারণ নীলামঘরে জোসেফ বেরাট্ সাহেবের সম্পত্তি (যাহা টেরিটিবাজারের দক্ষিণে ছিল) ঐ মৃত সাহেবের ত্রষ্টিরদের অনুমতিক্রমে বিক্রয় হওয়াতে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ৫১০০০ একান্ন হাজার টাকাতে ক্রয় করিয়াছেন ঐ বিষয়ের মূল্য পূর্বে দেড় লক্ষ টাকার অধিক হইয়াছিল কিন্তু কলিকাতার প্রধান ২ হৌসসকল দেউলিয়া হওয়াতে এতাবৎ অল্পদামে ক্রয় হইয়াছে। আমরা শুনিতেছি যে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ঐ স্থানে নতুন অট্টালিকাদি প্রস্তুত করিয়া অতি মনোরম এক বাজার করিবেন এস্থান এরূপ হইবেক যে প্রধান ২ সাহেবলোক আপন স্বেচ্ছামতে ইঙ্গলন্ডের ন্যায় বাজার করিতে আসিতে পারিবেন যদিও বাবুর ইহাতে কিছু ব্যয় হইবেক কিন্তু পরে সকল বাজারকে অন্ধ করিয়া এই বাজার দ্বারা বিশেষ লাভ করিতে পারিবেন ইতি।"—সেই নতুনবাজার এই বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে পৌঁছে নিজেই যদিও অন্ধ হয়ে গেছে তবুও এক সময়ে এই চিৎপুরই ছিল বঙ্গসংস্কৃতির পীঠস্থান। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি, প্রসন্ন ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, এই প্রণম্য ব্যক্তিত্বরা এই অঞ্চলের মাটিকে যেমন পবিত্র করেছিলেন, তেমনি এখানকার ঐতিহাসিক মল্লিক বাড়িও শুধু বাঙালীদের গর্ব নয়, চিৎপুরের এক গর্ব।

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ' নাটক রচিত হয়েছিল ১৮৬০ সালে। নীল দর্পণ-এর আখ্যানপত্রে লেখা ছিল "শ্রীরামচন্দ্র ভৌমিক কর্তৃক/বাঙলা যন্ত্রে মুদ্রিত/শকাব্দ ১৭৮২, ২রা আশ্বিন।" নীল দর্পণ প্রকাশিত হবার ১২ বছর পর অর্থাৎ ১৮৮২ সালের ৭ ডিসেম্বর জোড়াসাঁকোর মধুসূদন

সান্যাল মহাশয়ের বহির্বাটিতে মঞ্চ তৈরি করে নীলদর্পণ প্রথম অভিনীত হয়। অভিনয় করেন বাগবাজারের 'ন্যাশনাল থিয়েটার'। সেই প্রথম টিকিট বিক্রি করে নাটক দেখান হয়। এই বাড়িতে সেদিন অভিনয় করতে এসে যাঁরা এই চিৎপুরের অঞ্চলকে পবিত্র করেছিলেন তাঁরা হলেন অর্ধেন্দু মুস্তাফি, অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রলাল বসু। অর্ধেন্দুশেখর এই প্রথম রজনীতে একাই চারটি ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। নীলদর্পণ নাটক থেকেই বাংলাদেশের জাতীয়তাবোধের উন্মোচন। এবং এই বাড়িতে ১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর এই নাটকের অভিনয়ের ভিতর দিয়ে এদেশে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা। ১৯৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর এই মল্লিক বাড়িতেই আজকের জ্ঞানেশ মুখার্জি এবং আরও কয়েকজন নীলদর্পণের শতবর্ষ পালনের ভিতর দিয়ে সাধারণ রঙ্গশালার শতবর্ষ পালন করেছিলেন।

এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যেটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল, এই অঞ্চল নানাদিক থেকে সংস্কৃতি চেতনাবোধে রঞ্জিত ছিল বলেই, আজকের যাত্রার পূর্বসূরীরা যখন থেকে যাত্রাকে শিল্পের মর্যাদা দেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন এই যাত্রার ভবিষ্যৎরূপ কল্পনা করেই বোধকরি তাঁরা এই অঞ্চলেই একে একে গড়ে তুলেছিলেন যাত্রা প্রতিষ্ঠান ; কালে কালে যাত্রাজগৎ বলতে যে অঞ্চল ইতিহাসে স্থান করে নিতে পেরেছে।

আধুনিক যাত্রার প্রবর্তক মতি রায় এক সময়ে জোড়াসাঁকো পুলিস অফিসে কেরানির চাকরি করেছিলেন। মতি রায় তাঁর যাত্রা দলের গদি ঘর খুলেছিলেন ২৭ আহেরীটোলা স্ট্রীটে। বাড়িটা ছিল ৩ তলা। দোতলা আর তিন তলায় থাকত যাত্রার দল। সে বাড়ির ভাড়া ছিল ৫০ টাকা। তাই বোধকরি পরবর্তীকালে উত্তরসূরীরা এই অঞ্চল এবং কালে কালে নতুনবাজার থেকে শোভাবাজার পর্যন্ত গড়ে তুলেছিলেন যাত্রাজগত।

এ ছাড়া আরও একটি তথ্য এখানে হাজির করা যাক :

যে যাত্রা পাড়া নিয়ে আলোচনা করছি, সেই পাড়া চিৎপুরের ঠিক কোথায়, এটা বোঝাতে গিয়ে সবাই বলে থাকেন, নতুন বাজার থেকে শোভাবাজার। এতেও কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার হয় না। বলা উচিত, বটতলা অঞ্চলে যাত্রার সংসার। আবার 'বটতলা' বললেই সব বলা হয় না। প্রশ্ন থাকে, কোন বটতলা? সে ক্ষেত্রে 'বটতলা বই' বললেই অনেকের কাছে অনেকটা পরিষ্কার হতে পারে। বটতলার বই বললেই চিৎপুরের কোন এক অঞ্চলকে বোঝায়। সুতরাং বটতলার পরিধি কতটা ছিল একবার সেদিকে আলোকপাত করেই যথারীতি যাত্রায় ফিরে আসব।

বটতলা নামকরণ এবং চিৎপুরের কতটা অংশকে বটতলা বোঝায় তা নিয়ে নানা গবেষক, ঐতিহাসিকের নানা মত আছে। আচার্য সুকুমার সেন এ বিষয়ে বলেছেন, ..."শোভাবাজার বালাখানা অঞ্চলে একটা বড় বনস্পতি ছিল। সেই বটগাছের শান-বাঁধান তলায় তখনকার পুরবাসীদের অনেক কাজ চলত। বসে বিশ্রাম নেওয়া হত। আড্ডা দেওয়া হত। গান-বাজনা হত। বইয়ের পসরাও বসত। অনুমান হয়, এই বই ছিল বিশ্বনাথ দেবের ছাপা। ইনিই বটতলা অঞ্চলে এবং সেকালের উত্তর কলকাতায় প্রথম ছাপাখানা খুলেছিলেন।...।"

সম্প্রতি এক প্রবন্ধে বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তা হল এই রকম—"সোনাগাছি পেরিয়ে দক্ষিণ দিকে আর একটু এগিয়ে গরানহাটায় হাজির হতে হবে। পথের দিক থেকে এই এগুনোটা একশ গজ হলেও ইতিহাসের দিক থেকে কম নয়। গরানহাটায় আসা মানেই সোনাগাছি পর্বের শেষ দিক ও বাংলা দেশের শিক্ষা-আন্দোলনের প্রথম দিকে এসে পড়া।" শ্রী মুখোপাধ্যায়ের তথ্য থেকে আরও নির্দিষ্টভাবে ধরে নেওয়া যায়, বটতলা অঞ্চল ঠিক কোথায় ছিল।..."১৮৩৪ সালের ২২ মার্চ জর্জ এডওয়ার্ড মল্লিনস সংবাদপত্রে ঘোষণা করেছিলেন যে, বটতলার ওরিয়েন্টাল সেমিনারী থেকে তিনি সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন।" এ থেকে বটতলা বলতে

ঠিক কোন অঞ্চলকে বোঝাচ্ছে তার হদিস পাই। সেই বটতলা প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার দাস 'সমকালীন' (কার্তিক সংখ্যা ১৩৮৪)-এর পাতায় লিখেছেন..."শহর কলকাতার বাবু-রুচির পীঠস্থান বটতলা থেকে শুরু হয়েছিল ছাপাখানার নতুন অধ্যায়। আদি রসাত্মক প্রকাশনার অপবাদটুকু সরিয়ে দিয়ে সংস্কৃতির প্রচারক হিসেবে বটতলার ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। অধুনা সাহিত্য ক্ষেত্রে অচ্ছুৎ 'লাইব্রেরী' নামধারী এই প্রকাশন প্রতিষ্ঠানগুলি একই সঙ্গে বিনোদন আর ধর্মপ্রচারের দায়িত্ব নিয়েছিল। পুরাণ থেকে শুরু করে তন্ত্র-মন্ত্র, জ্যোতিষ, কামশাস্ত্র, ইন্দ্রজাল, শিক্ষা, উপন্যাস, পঞ্জিকা, প্রহসন, পালা, নাটক প্রকাশনার বিষয় তালিকাটি ছোট নয়। বর্তমানে যাত্রাভিনয়ের জনপ্রিয়তা চিৎপুরের বই পাড়াকে বদলে দিয়েছে।"

এ সব তথ্য থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়, আজকের যে চিৎপুরের বনেদি পাড়াগুলো কালচার আর সভ্যতার অন্যতম পীঠস্থান ; আর তাই যাত্রার আদি পুরুষেরা এই অঞ্চলে গড়ে তুলেছিলেন যাত্রার বন্দর। যে বন্দরে একে একে বহু যাত্রা নামক শিল্পের সজ্জিত বজরা নোঙ্গর করেছে।

এই অঞ্চলে যেমন মল্লিকবাড়ি, যতীন্দ্রমোহন বা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাড়িতে নাট্যচর্চার কথা বলেছি, তেমনি এখানে ওরিয়েন্টাল স্কুল থিয়েটারের কথাও কিছুটা বলা দরকার। কারণ, এই বটতলা অঞ্চলে, এই সব ঐতিহাসিক বাড়ি বা প্রতিষ্ঠানের সাংস্কৃতিক চেতনা বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে, এই সংস্কৃতির পীঠস্থানে যাত্রা সংসার পাতার স্বপ্ন দেখেছিলেন যাত্রার আদি পুরুষেরা।

বটতলার ওরিয়েন্টাল সেমিনারী ছিল (এখনও বিদ্যমান) কলকাতার অন্যতম এক প্রধান বিদ্যালয়। ডেভিড হেয়ার একাডেমীর প্রতিদ্বন্দ্বী স্কুল। এ স্কুল এক সময় নাট্যচর্চার একটা বড় ধরনের জায়গা হয়ে উঠেছিল। স্কুলের ছাত্ররা ডেভিড হেয়ার স্কুলের ভিতরে রঙ্গশালাও খুলেছিলেন। এই দেখে পরবর্তী সময়ে ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর ছাত্ররাও স্কুল ভবনের মধ্যে থিয়েটার চর্চা পুরোপুরি শুরু করেছিলেন। এখানে অভিনয় শিক্ষা দিতেন মিঃ ক্লিঙ্গার। ইনি ছিলেন মিসেস এস্থার লীচের সাঁসুসি থিয়েটারের একজন অভিনেতা। এই বাড়িতে নাট্যচর্চার ব্যাপারে ১৮৫৩ সনের ৭ এপ্রিল বেঙ্গল হরকরা লিখল ঃ "আমরা শুনিতে পাইলাম যে, ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর উচ্চ শ্রেণীর ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া আটশত টাকা সংগ্রহ করিয়াছে এবং এই টাকা দ্বারা শেকস্পীয়রের নাটক অভিনয়ের উদ্দেশ্যে একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতেছে।" সেই নাট্যশালার নাম হয়েছিল 'দি ওরিয়েন্টাল থিয়েটার'। ১৮৫৩ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর সেখানে প্রথম অভিনীত হয়েছিল 'ওথেলো'।

তাছাড়া গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চলে যাত্রা জগত গড়ে ওঠার কারণ বোধকরি যাত্রার জন্য জলযান ছিল অপরিহার্য।

কাজেই চিৎপুরের এই অঞ্চলে যাত্রার আদিপুরুষেরা যাত্রার গদি তৈরি করে, সেখান থেকে যাত্রার প্রচার ও প্রসার ভাবনার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে সেই থেকে উত্তরসূরী যাত্রা ব্যবসায়ীরা একটু একটু করে এখানে যাত্রার বন্দর গড়ে তুলেছেন। মূল কথা হল, আজকের যাত্রা জগত সেদিন চতুর্দিকের ইংরেজি থিয়েটার কালচারের কাছে যে পরিমাণে অবজ্ঞেয় কালচার হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল, এই বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে, শিক্ষা-সংস্কৃতির বিবর্তনে—সমকালীন থিয়েটার চর্চাকে, সেই পরিমাণে ব্যবসায়িক শক্তিতে পরাস্ত করে অনেক দ্রুত লয়ে এগিয়ে চলেছে। নাট্যচর্চার যে মূল্যবোধ নাট্য ক্ষেত্রে বিরাজমান, সেখানে যাত্রা চর্চার বিশেষ কোন উপস্থাপনাগত, ভাবনাগত ভূমিকা দেখা না দিলেও, যাত্রার ব্যবসাগত চেহারাটি থিয়েটারের ব্যবসায়িক চেহারার তুলনায় অনেক বেশি মেদ সর্বস্ব হতে পেরেছে।

যা হোক, মতি রায়ের পর মথুর সাহা চিৎপুরকে জাগাতে থাকলেন। তারপর একে একে যাঁরা দলের গদি খুলতে লাগলেন তাঁরা হলেন ঃ

॥ শ্রীচরণ ভাণ্ডারী বা সিমুলিয়া নাট্য সমাজ ॥

এক সময়ে যাদব বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল ভেঙে আরামবাগের পয়সাওলা, বহু ভূ-সম্পত্তির মালিক শ্রীচরণ ভাণ্ডারী একটা যাত্রার দল করেছিলেন প্রথম। সে দলের নাম দিয়েছিলেন 'সিমুলিয়া নাট্য সমাজ'। কলকাতায় সোনা গালাইয়ের ব্যবসাই ছিল তাঁর প্রধান ব্যবসা। যাত্রা দল করেছিলেন সখে। তাঁর এই দলের ম্যানেজারের নাম ছিল, শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়। শ্রীচরণ ভাণ্ডারীর ভাই যামিনী ভাণ্ডারীও আলাদা ভাবে একটা যাত্রা দল করেছিলেন। শ্রীচরণ আহেরীটোলায় করেছিলেন গদি ঘর। তারকনাথ বাগচীর মত সুবিখ্যাত নৃত্য শিক্ষক এই দলেরও নৃত্য শিক্ষক ছিলেন। তখনকার দিনের জনপ্রিয় বেহালাবাজিয়ে শশী অধিকারী ছিলেন এ দলের বেহালা বাদক। জুড়ি ও ছেলের গান শ্রীচরণ ভাণ্ডারীর দলে ছিল বটে কিন্তু সব গানই ছিল অতি প্রাচীন ধাঁচের। ২০/২৫ ছেলে ছিল দলে। মতিলাল রায়ের অনুকরণে শ্রীচরণ ভাণ্ডারীও তাঁর দলের ছেলেদের মাথায় টুপি পরিয়ে সেই টুপিতে লিখে দিতেন "শ্রীচরণ ভাণ্ডারী"। শ্রীচরণের ম্যানেজার শশী মুখোপাধ্যায় দল চালাতে বিশেষ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিতে পারেননি। অগত্যা ছেলে সাধন ভাণ্ডারী দলের দায়িত্ব নেন এবং নাম পাল্টে রাখেন "ভাণ্ডারী অপেরা"। সাধনই দলের প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। এ দলের ১ম পালা অঘোর কাব্যতীর্থের 'সপ্তরথী'। সাধন ভাণ্ডারী এই পালা থেকেই দলকে অপেরা পার্টিতে রূপান্তরিত করেন। কালনার ষোল কুঠুরিতে শ্রীচরণ ভাণ্ডারীর আলাদা একটা ডেরা ছিল। ভাণ্ডারী অপেরার শিল্পী তালিকা ছিল এই রকম ঃ

ডাক্তার অহীন মুখার্জী, ভবতারণ চ্যাটার্জী, সুরেশ মুখার্জী, তুলসী দাস, ক্ষেত্র ব্যানার্জী, অনিন্দ্য মুখার্জী, সুরেন মুখার্জী, শরৎ ঘোষ. ভূপতি পালিত, অতুল শীল, ফটিক ব্যানাজী, হাঁদু বাবু, বিনোদ রানী, শ্যামরানী, জিতেন রানী, বিভূতি রানী। গায়ক ঃ নরেন হালদার, ভূবন পাল, যতীন দাস আরও অনেকে।

॥ গণেশ ঘোষের যাত্রা দল ॥

প্রসন্ন নিয়োগীর বড় সাধের দল গণেশ ঘোষ মাত্র ৮০০০ টাকায় কিনে নিয়ে নিজেই দলের মালিক হয়ে বসলেন। এই গণেশ ঘোষেরা তিন ভাই। গণেশ ঘোষ, কার্তিক ঘোষ, মহেশচন্দ্র ঘোষ।

এঁরা ছিলেন ডাকসাইটে ব্যবসাদার। এঁদের ব্যবসার গদি ছিল কলকাতায়। মূলত চাল, ডাল, পাট এই সবের ব্যবসা। কালনা থেকে নৌকাযোগে সব মাল কলকাতায় চালান দিতেন। আবার কলকাতা থেকে অনেক কিছু চালান দিতেন কালনার বাজারে।

গণেশ ঘোষ টাকা আদায় করেছিলেন প্রসন্ন নিয়োগীর দলটাই কিনে নিয়ে, কিন্তু দল চালাবার সময় কোথায় তাঁর? অগত্যা কী করেন গণেশ ঘোষ! অনেক ভেবে স্থির করলেন একমাত্র মেয়ে সরসীর বিয়ে দিয়ে জামাই আনবেন। করলেনও তাই! কালনার কাছেই ডেরেটোন। সেই গ্রামের ছেলে হরিপদ কুমারের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন। হরিপদকে করলেন দলের ম্যানেজার। প্রথম দিকে হারাধন রায়ের লেখা পালাগুলিই দলে অভিনয় হতো। হারাধন তাঁর 'যোগমায়া' নামের পালাটি গণেশ ঘোষের নামে উৎসর্গ করেছিলেন, তিনি উৎসর্গ পত্রে লিখেছিলেন—"আমার নামের সহিত আপনার নাম চিরসংযোজিত থাকে এই অভিপ্রায়ে সংগুণীত যোগমায়া নাটকখানি আপনাকে স্নেহোপহার স্বরূপ প্রদান করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম—"

গণেশ ঘোষের দলে অভিনীত হারাধন রায়ের 'ধর্মের জয়' পালায় জুড়ির গান ছিল। প্রায় ৬ জন ছিল জুড়ি গায়ক। পরে জুড়ির গান অন্য সব দল থেকে একটু একটু করে উঠে যাচ্ছিল দেখে গণেশ ঘোষের দল থেকেও উঠে যায় এবং অপেরা পার্টিতে পরিণত হয়।

গণেশবাবুও প্রসন্ন নিয়োগীর মত বুঝেছিলেন কাকে লোকসানের জ্বালা বলে। কিন্তু গণেশবাবুর জামাই তাঁর পরিচালন দক্ষতায় একটি সত্যকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন, তা হলো

যাত্রাদলের মেরুদন্ড হলো দলের পরিচালক বা ম্যানেজার। এটি সোজা থাকলে বা এরা বিচক্ষণ হলে দলের চরম বিপর্যয় হয় না। আজকের দিনে অবশ্য এই হরিপদর মত বিচক্ষণ ম্যানেজার বা পরিচালকেরই বড় অভাব। যা হোক, জামাই হরিপদ রাতারাতি যুগের দাবীকে নেমে নিয়ে দলকে আধুনিক পর্যায়ে ফেললেন। তিনি অনুসরণ করলেন মথুর সাহাকে। মনে রাখতে হবে, এই মথুর সাহার দলই এ দেশে প্রথম যাত্রার উপস্থাপনা ও অভিনয় ধারায় এনেছিলেন থিয়েটারের ধারা। তাই থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টি বলতে মথুর সাহার দলই প্রথম। এতে মথুর সাহার সাফল্য চরমে পৌঁছেছিল। হরিপদ তাই তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন। দলের নাম পাল্টে নাম রাখলেন 'গণেশ অপেরা পার্টি'। ভোলানাথ রায়ের প্রথম যাত্রানাটক এই দলে আসরস্থ হলো। তারপরই গণেশ অপেরা পার্টির চরম সাফল্য! ভোলনাথ রায়ের দ্বিতীয় যাত্রানাটক "পৃথিবী" এ দলের ভাগ্য সোনা দিয়ে মুড়ে দিল। সমস্ত ক্ষতি পূরণ হয়ে লাভের মাত্রা বাড়ল। গণেশ ঘোষ এবার জামাইকে দলের মালিক করে দিলেন। ম্যানেজার থেকে হরিপদ হলেন মালিক।

১৩২৫ সনে 'কালচক্র' পালা প্রকাশিত হয়। স্বনামধন্য ভোলানাথ রায় তাঁর নাটকের ভূমিকায় লিখেছেন—"প্রসিদ্ধ গণেশ অপেরা পার্টির সুযোগ্য ম্যানেজার সহৃদয় গুণগ্রাহী শ্রীযুক্ত হরিপদ কুমার মহাশয়ের যত্নে আমার এই নাটকখানি সর্বত্র যশের সহিত অভিনীত"। পালাকার ভোলানাথ রায় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই গণেশ অপেরা পার্টির পালা লেখক ছিলেন। কানা যতীন ছিলেন এই দলের সুরকার। ইনি মেদিনীপুর ঘাটাল গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মেছিলেন। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য, বড় ভোলা পাল ছেলে বেলায় এই দলে প্রথম আসেন।

গণেশ অপেরা পার্টির অন্য শক্তিমান শিল্পীরা হলেন নীলমণি, ঋষি, শিবু।

গণেশবাবুর জীবদ্দশাতেই মেয়ে সরসী মারা যায় আর গণেশ দীর্ঘকাল পক্ষাঘাতে পঙ্গু থেকে পরে মারা যান। হরিপদর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেরা এ দলের অভিনেতা ঋষিপদ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে দল বিক্রি করেন। ঋষিবাবু মাত্র ছ' মাস দল চালিয়েছিলেন। এরপর দলের বিলুপ্তি ঘটে।

॥ পাথুরেঘাটা স্ট্রীটে শশীভূষণ অধিকারীর দল ॥

যতদূর জানা যায় মতি রায়ের দলের এক নাচিয়ে ছিলেন শশীভূষণ অধিকারী। তিনি আলাদা ভাবে দল তৈরি করেছিলেন এবং মতিলাল রায় জীবৎকালে তাঁর জনপ্রিয়তা দেখে গেছেন। শশীভূষণের বাড়ি ছিল বর্ধমানের কালনায়। কালনার পুরাতন হাটে ছিল অভয় বাগদীর যাত্রা দল, সেই দলে খুব অল্প বয়স থেকেই নাচতেন শশী। পরে মতি রায়ের দলে, তারও পর শশীভূষণ আলাদা দল তৈরি করেছিলেন। কালনার চক বাজারে ষোল কুঠুরিতে একটা ঘর ভাড়া করে তিনি যাত্রার গদি তৈরি করেছিলেন, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে সেই দল কালনা থেকে তুলে এনে ৬৮নং পাথুরেঘাটা স্ট্রীটের একটা বাড়িতে বসিয়েছিলেন। প্রায় ১০০ জন লোক নিয়ে গড়ে উঠেছিল তাঁর দল। আট জন জুড়ি, ষোল জন 'ছেলে' থাকতো দলে। শশী অধিকারী নিজে বেহালা বাদক হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। জুড়ি আর ছেলেদের সঙ্গে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বেহালা বাজাতেন।

দৃশ্য পরিবর্তনের ফাঁকে ফাঁকে তিনি অজস্র মেডেল দোলানো জামা গায়ে দিয়েও বেহালা বাজাতেন। পরে এই শশীর বেহালার দুটি রেকর্ডও বেরিয়েছিল বাজারে। এই শশী অধিকারীই যাত্রায় বিবেকের প্রচলন করেন। ভূষণ মালিক, অনকূল মালিক আর বসন্ত মালিক এই তিন ভাই ছিলেন এই দলে, তার মধ্যে বসন্ত মালিকই বিবেকের গান করতেন।

ত্বিষাম্পতি মুখোপাধ্যায় ছিলেন দলের খ্যাতনামা অভিনেতা যাকে আজ হিরো বলা হয়, আর হরিপদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন দলের ম্যানেজার।

এই দলের প্রথম পালা "বৃষকেতু"। ধনকৃষ্ণ সেনের লেখা 'উমা তারা' গীতাভিনয়ও হয়।

মতিলাল ঘোষের বৃন্দাবন বিহার (১৯১৭) আর দ্বারাবতী (১৯২২) নাটক দুটিও এই দলে অভিনীত হয়েছিল। যুগের চাহিদা মেটাতে গিয়ে যদিও শশী অধিকারী যাত্রায় ভীষণ লোকসান দিয়েছিলেন তবুও চাহিদা মিটিয়েছিলেন অনেকটা। শেষপর্যন্ত দলকে অপেরা পার্টিতে রূপান্তর করেছিলেন। এই সময়ে ভবতারণ চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবব্রত', অঘোর কাব্যতীর্থের 'শাস্তি' এবং বহু অর্থব্যয়ে 'প্রতাপাদিত্য' পালা আসরস্থ করেছিলেন। শেষ পালাটি খুব বড় বলে এর প্রোগ্রাম ছিল দেড় পৃষ্ঠা। বৃটিশ সরকার এ পালা বন্ধ করে দেয়, ফলে শশীভূষণের দল মারাত্মক লোকসানে পড়ে।

শশী একদিকে উপার্জন করেছেন হাজার হাজার টাকা, তেমনি দু' হাতে খরচ করেছেন। শেষ পর্যন্ত এত ধার হয়ে পড়ে যার জন্য কালনার বসত বাড়িটি তিনি বাঁধা দেন। বাঁধা রেখেছিলেন এই কলকাতার একজন ব্যবসায়ী, ধনী অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের। এই অনুকূলের প্রধান ব্যবসা ছিল যাত্রা দলের পোশাক ও মেক-আপ মেটিরিয়ালস বিক্রি।

এক সময় ক্ষয় রোগ শশীবাবুকে পঙ্গু করে দেয়। অবশেষে কলকাতার গদি ঘরে পরিবারের সকলকে নিঃস্ব অবস্থায় রেখে মারা যান তিনি। শশী ছিলেন নিঃসন্তান। ভাই বসন্ত অধিকারীও দাদার দল যেমন চালাতে অক্ষম ছিলেন, তেমনি অনুকূল মুখার্জীও বিন্দুমাত্র করুণা দেখাননি। অবশ্য এ সব ঘটনার সাক্ষী এবং বিচারক বোধ করি এমন কেউ ছিলেন অলক্ষ্যে, যাঁর অমোঘ বিধানে শশী অধিকারীর কাছ থেকে পাওনা টাকার পরিবর্তে কেড়ে নেওয়া অনুকূলের সেই বাড়িটা কালনার গঙ্গা সম্পূর্ণ গ্রাস করেছিল।

॥ বিজয় মিত্রের স্মৃতিচারণ ॥

শশীভূষণের কথা বলতে গেলে, তদানীন্তন কালের যাত্রা দলগুলির ভিতর আর বাইরেকার নিখুঁত ছবি তুলে ধরতে গেলে, বিজয়দার কথা আনা বাঞ্ছনীয়। বিজয় মিত্র। কলকাতার চিৎপুরের যাত্রা সংসারে আমার আত্মপ্রকাশের সূচনাপর্বে যাঁরা প্রথমেই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে, প্রতি মুহূর্তে আমাকে পাশে রেখে যাত্রার সমকালীন চেহারার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন তাঁদের মধ্যে শিব ভট্টাচার্যের মতই বিজয় মিত্র একজন। বিজয়দার সঙ্গে আমার যখন পরিচয় হয় তখনই তিনি জীবন সংগ্রামে বিধ্বস্ত এক শীর্ণ সৈনিক। বিজয় মিত্র শেষ জীবনে যাত্রার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর জড়িত থাকা না থাকার ব্যাপারে কারও কোন মাথা ব্যথা ছিলো না। তখনও বিজয়দা বিভিন্ন দলের হয়ে, দু' বেলা দু' মুঠো খাবার পেটে দিয়ে কোনমতে বেঁচে থাকার তাগিদে কিছু কিছু কাজ করে দিতেন। কিন্তু কোন দলেই তাঁর জন্য যেমন পাতা ছিল না সামান্য ভালবাসার আসন, তেমনি শ্রদ্ধা তো দূরের কথা, বিন্দুমাত্র করুণাও ছিল না। অথচ যাত্রার ইতিহাসের জন্য যাত্রার প্রাচীনতম সেবক বিজয় মিত্রের প্রয়োজনই বেশি।

মৃত্যুর কয়েকদিন আগে গণেশ অপেরার গদি ঘরের বারান্দায় এক ফালি বেঞ্চের ওপর বসে খুব কাশছিলেন বিজয়দা। সেই সঙ্গে মারাত্মক হাঁপানির টান। ভয়ঙ্কর শ্বাস কষ্ট। শীতকালের সন্ধ্যা। বিজয়দার গায়ে জামা তো দূরের কথা একটা গেঞ্জিও ছিল না। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ওঁকে দেখে মনে হচ্ছিল, যে কোন মুহূর্তে প্রাণটা বেরিয়ে যেতে পারে। প্রাণটা বেরিয়ে যাওয়াই উচিত, তাহলে একরাশ তৃপ্তি পাবেন তিনি। কী আশ্চর্য। সেই তীব্র কষ্টের মধ্যেই বেঞ্চে বসতে দিলেন আমাকে। নিজেকে অতি কষ্টে সামান্য সামলে নিয়ে, দু' হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে, চোখ জোড়া উর্দ্ধমুখী করে বললেন,—'প্রকাশ আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, ভগবান ওঁর মঙ্গল করুন'—

বিজয়দার অসুস্থতা আরও তীব্র। তারই মধ্যে অনেক কষ্টে বললেন,—'যদি মরি এখানেই মরব'—; তারপর দু'খানা ছোট খাতা আমার হাতে তুলে দিয়ে অতি কষ্টে বলেছিলেন—'এই খাতা দু'খানা রাখুন। আপনার কথা রাখার চেষ্টা করেছিলাম। শেষ করতে পারিনি। লেখাপড়া শিখিনি,

তাই গুছিয়ে লিখতে পারিনি। পড়তেও কষ্ট পাবেন, তবুও পড়বেন। এই নগণ্য এক যাত্রাওলার কথা অনেকটাই পাবেন এই খাতায়!'...এরপর সেই শ্বাস কষ্টের মধ্যেই আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেছিলেন,—'জন্মদাতা বাবার কথা শুনিনি, উপেক্ষা করেছি ছেলেবেলায়, যৌবনে জীবনটাঁকে নিয়ে জুয়া খেলেছি, আর বোধ হয় সময় নেই! এখন যাত্রায় আগের কিছু নেই। প্রকৃত শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তা নেই। এখন যাত্রায় অনেক টাকা। সবার বাড়ি-গাড়ি সব আছে কিন্তু হৃদয় আর বিবেক বলতে যা বোঝায় তা নেই। কাঁচা টাকার মধ্যে বিবেক তলিয়ে গেছে। যেদিন এই যাত্রা জগতের এরা মরবে সেই দিনেই এরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এদের নিকট-আত্মীয়-স্বজনরাও দু' দিনের বেশি মনে রাখবে না—! কিন্তু যদি পারেন যাত্রার ওপরে এমন একটা বই লিখুন যেখানে এরা সবাই বেঁচে থাকতে পারে। আর সেই কারণে আমি কিছুটা রসদ জুগিয়ে গেলাম—'

এর কয়েকদিন পরেই বিজয় মিত্র মারা যান। আমার কাছে সযত্নে রক্ষিত সেই দু'খানা ছোট খাতা একটা দলিল হিসেবে চিহ্নিত! সেই খাতার পাতা থেকে আমি হুবহু কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি—

॥ বিজয় মিত্রের ডায়েরি ॥

বিজয় মিত্র লিখছেন—

ওঁ মা

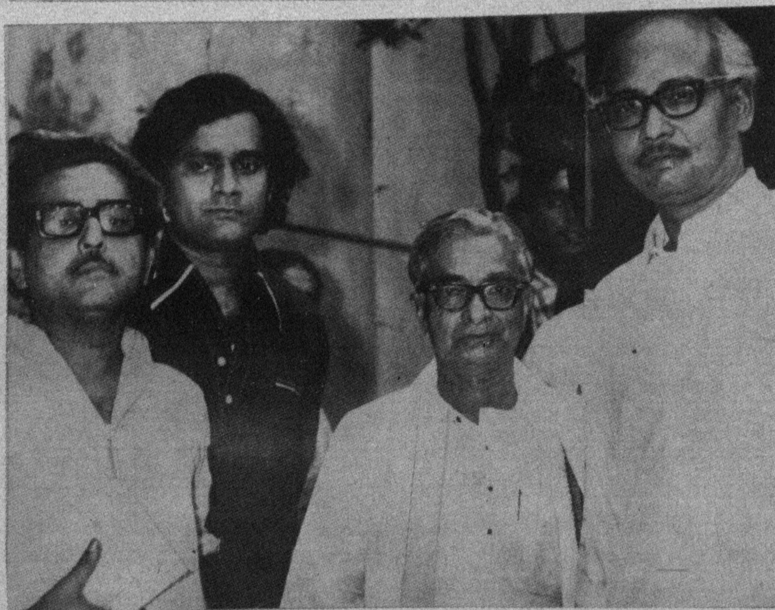
"আমি শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মিত্র, পিতা ঁত্রৈলক্ষীনাথ মিত্র (বোধ হয় ত্রৈলোক্য), আমার যাত্রা লাইনে আসার ইতিহাস আজ থেকে লিখতে সুরু করলাম। বাংলা ৫ই জেষ্ঠ (জ্যৈষ্ঠ হবে) সন ১৩৮৭, ইংরাজী ১১ই মে সন ১৯৮০ সোমবার। আমার ডায়মন্ডহারবার থেকে ৫ মাইল রায় দিঘী (দীঘি) বা ককদীপ (কাকদ্বীপ) বাসে হটুগঞ্জ নেবে (নেমে) একতারা গ্রাম। আমার জন্মস্থান কালিঘাট (কালীঘাট) ঈশ্বর গাঙ্গুলীর লেন। ৪৭/১ ; এখন থেকে ৬৬ বৎসর আগে, এখন লেন থেকে স্ট্রীট হয়েছে। আমার বাবা আলিপুর পুলিশ কোটের (কোর্টের) মুক্তার (মোক্তার) ছিলেন; সে জন্য আমরা কালীঘাটে থাকতাম। ১৬ বৎসর বয়সে আমার মা ঁগঙ্গা লাভ করেন। মা গত হবার পর আমি লেখা পড়া ছেড়ে ৩।৪ বৎসর সখের দলে যাত্রা করা এবং যত সব খারাপ লোকের সঙ্গে মিশতে থাকলাম। বাবার কথা উপেক্ষা করে চলতাম। মাতৃ বিয়োগের পর বাবা আর আমাকে খুব পিড়ন করতেন না।...আমি প্রথম শষ্টি অপেরার (ষষ্ঠী) দলে এক্টিং (এ্যাক্টিং) করার কাজ পেলাম।...

শষ্টি অপেরা শষ্টি বাবুর দল। তাঁর ছেলে নেই, একটি মাত্র মেয়ে। তার বিবাহ দিয়েছেন। জামাই বাড়িতেই থাকেন। নাম বিজয় মাঝি। শষ্টি দাস জাতিতে জেলে। জাহাজের বড় মিস্তিরি। সালকে বাড়ি।"

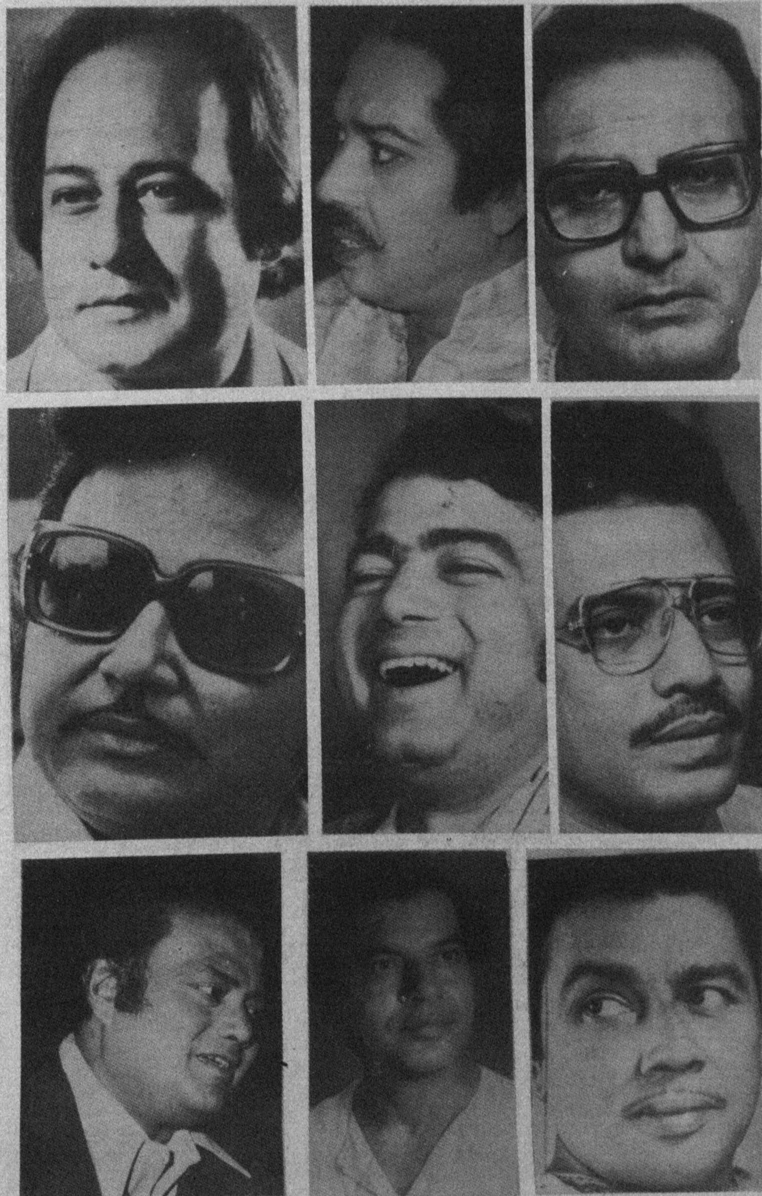
এখন ষষ্ঠী অপেরার কথা যাক। বিজয়দা তাঁর স্মৃতিকথায় শশী অধিকারীর কথা কি লিখেছেন তাই দেখা যাক।—

"...তারপর আমি শশিভূষণ অধিকারীর গ্রেন্ড (গ্র্যান্ড) অপেরায় যাই। এই দল থাকিত পাথুরে ঘাটা খেলাত ঘোষের বাড়ির অপর দিকে। বহু পুরণ দল।...তিনি এতো ভাল বেহালা বাজাতেন, তার জোড়া ছিল না। তিনি পায়ে বেহালার ছড়ি টানতেন। ইংরেজ রাজত্তে (রাজত্বে) লাটভবনে বড়লাট এক ঘণ্টার উপর তাঁর বেহালা শুনেছেন। শেষ বয়সে একটু খিট খিটে হয়ে গেছেন। কোচবিহার তখন সাধিন (স্বাধীন) রাজত্ত (রাজত্ব) তখন কোচবিহারে ভাতের হোটেল ছিল না। সেই সময়ে মদনমোহনের রাসে ৮ দিন যাত্রা হতো। এই রাসে গ্রেন্ড অপেরার বায়না ছিল। দুদিন যাত্রা হবার পর স্টেটের ম্যানেজার বাবুর সাথে অধিকারী মহাশয়ের একটু বচসা হয়। ম্যানেজারবাবু যাত্রা বন্ধ করে দেন আর খাওয়ার জিনিস পত্তরও বন্ধ করে দেন। তখন দলের





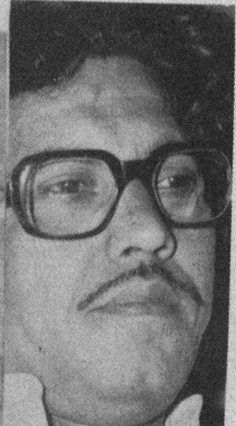
একবার পঞ্চু সেনকে সম্বর্ধনা জানাতে এসেছিলেন তুষারকান্তি ঘোষ, যাত্রা দেখতে এসেছিলেন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।



তিনু বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম সাধুখাঁ, জহর রায়, রাজকুমার, সুখেন্দু মুখার্জী, অঞ্জনকুমার, মুকুল ঘোষ, পালান নস্কর, বাবলু ভট্টাচার্য।

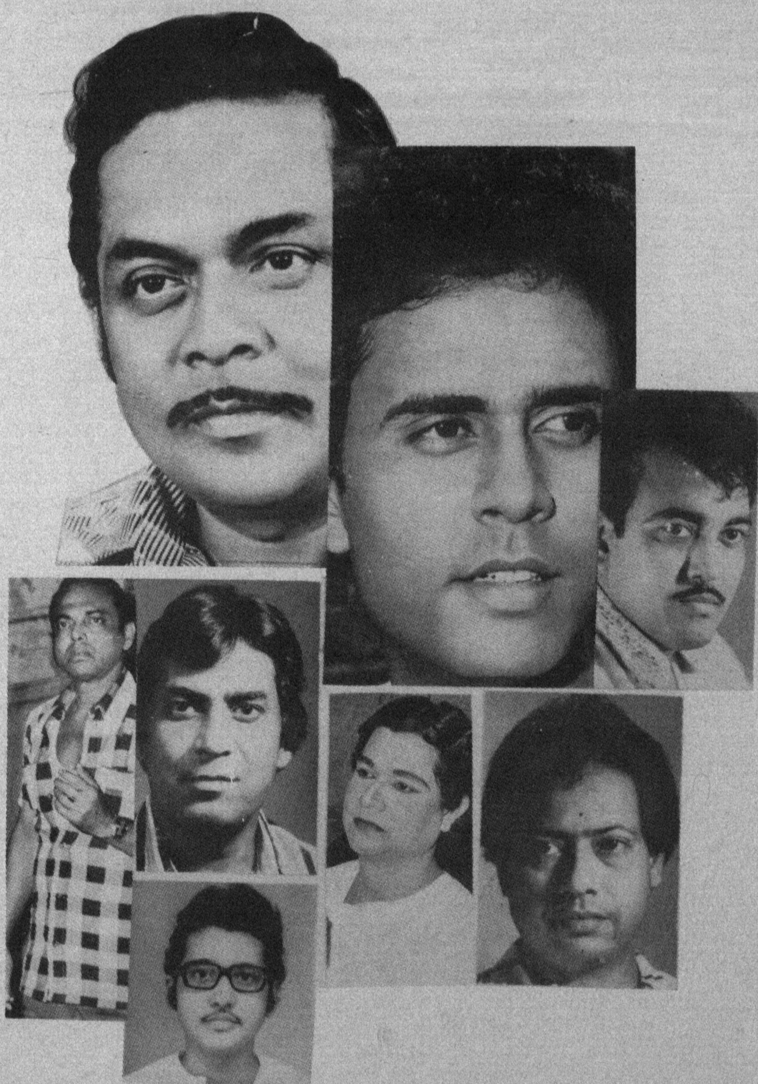




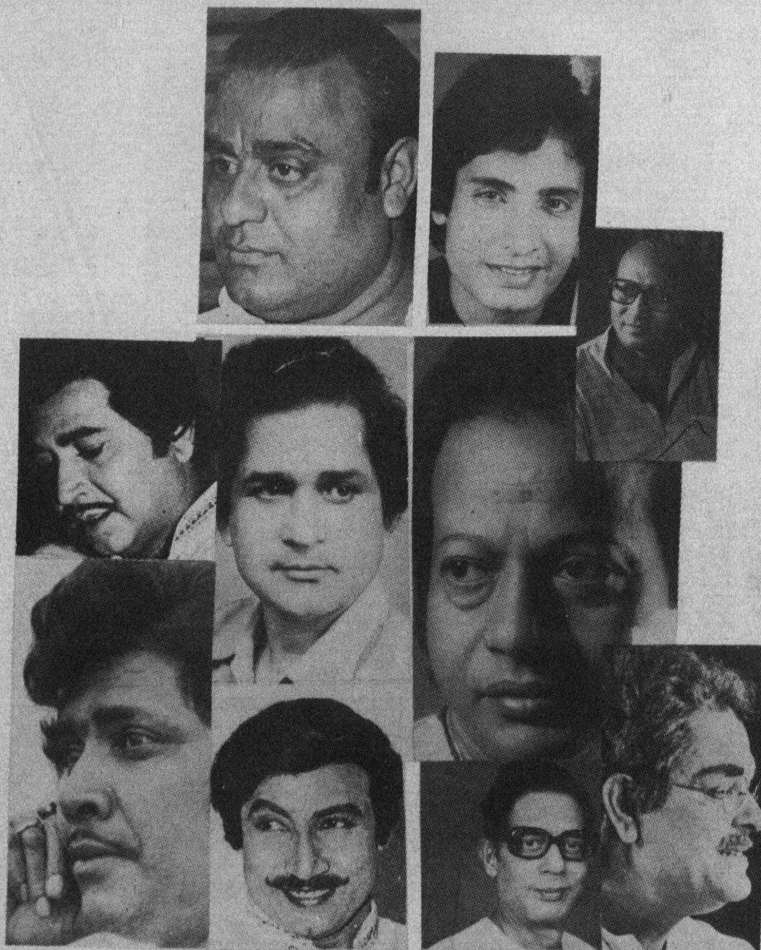




নির্মল মুখার্জী, শেখর গাঙ্গুলী,
পান্না চক্রবর্তী,
অশোককুমার, নিরঞ্জন ঘোষ, অশোক চৌধুরী,
বিমলেন্দু ভট্টাচার্য।



□ সনাতন ঘোষ, সুকমল মুখার্জী, জয়ন্তকুমার, প্রভাত গৌতম, জয়ন্ত দত্ত, মানসকুমার, সমর ব্যানার্জী, প্রবীরকুমার।



মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, উৎপল চ্যাটার্জী, শান্তনু ঘোষ, দেবগোপাল, রাঙা মিশ্র, সুদীপ্ত চ্যাটার্জী, ফণি গাঙ্গুলী, দীপেন চ্যাটার্জী **তপনকুমার**.



আজকের নায়িকা

রুমা দাশগুপ্তা, ছন্দা চ্যাটার্জী, জয়শ্রী মুখার্জী, লতা দেশাই, শিবানী ভট্টাচার্য, সীমা মিত্র, মণিমালা বোস, অঞ্জনা ব্যানার্জী।



□ স্বর্ণালী চৌধুরী, জলি, নমিতা দাস,
বিজলী সরকার, কাকলী চৌধুরী।

লোকজন অধিকারি মশাইকে বললেন, কি করলেন দেখুন, যাত্রা বন্ধ, খোরাকী বন্ধ, এখন না ছাড়লে কোথাও যাওয়া যাবে না। অধিকারি মশাই একটা নাপিত ডাকতে বললেন। নাপিত এলো। ভাল করে নোক (নখ) কাটলেন। আর শিরিস কাগজ দিয়ে নোকগুলি পালিস করে নিলেন। তখন দলে ছিলেন আশু ওস্তাদজী। বাজিয়ে। তিনি অন্ধ। তাকে ডেকে বললেন, বাবা আশু একবার আমার পাশে বসো, আর যুড়ি (জুড়ি) বাজিয়ে এলো। তাদের বললেন, তোমাদের যন্ত্র নিয়ে এস, আশুর তিনটে তবলা, ঢোল, খোল নিয়ে এস। সব যন্ত্র এল। অধিকারি মশাই বললেন, তিনটি বাঁধ। আর ঢোলটা বাঁধ। একটি সাড়ে এগারখানা শুরে (সুরে) বেঁধে নিলেন। আশুবাবুর সাথে মিলিয়ে নিলেন। দলের ম্যানেজারকে বললেন, রাজবাড়ি থেকে লোক এলে ওদের যন্ত্র দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন। আমি আগে চললাম। উনি যন্ত্রটি নিয়ে রাজবাড়ির প্রধান গেট, কোর্টের পাসে (পাশে) একটা পাথর ছিল, সেই পাথরে বসে বেহালাটি বার করেছেন বাজাবার জন্য, দারোয়ান আপত্তি করাতে অধিকারীবাবু তার হাতে ৫টি টাকা ধরে দিলেন। দারোয়ান ৫ টাকা পেয়েই চুপ। উনি আপার পার্টে আলাপ আরম্ভ করলেন। তখন রাজবাড়ির ভিতরে জলসা ঘরে নাচ-গান হচ্ছিল। আধ ঘণ্টার মধ্যে নাচ-গান বন্ধ করে দিয়ে ৮/১০ জন ভদ্রলোক বারান্দায় এসে দেখছে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক বেহালায় আলাপ করছেন। মহারাজ শুনে লোক পাঠিয়ে ওনাকে পেলেসে (প্যালেসে) নিয়ে গেলেন। মহারাজ আবার ওনাকে বাজাতে বললেন।

ঘণ্টা খানেক পরে বললেন, এবার একটু তবলার সঙ্গে বাজান! অধিকারী মশাই বললেন, আমার তো তবলচি নেই—, মহারাজ তখন তবলচি দিলেন। তারা ওস্তাদজীর সঙ্গে বাজাতেই পারলেন না! তখন অধিকারী মশাই বললেন, যদি দুর্গাবাড়িতে লোক পাঠান তা হলে ওখান থেকে যন্ত্র আর বাজিয়ে দুই আসবে, যাকে পাঠাবেন সে যেন বলে, ওস্তাদজী পাঠিয়েছেন—

তখনি একখানি গাড়ি গিয়ে সবাইকে নিয়ে এল। তখন ওস্তাদজী মহারাজকে সব কথা বললেন, ও ম্যানেজারের কাছে ক্ষমা চাইবার ব্যবস্থা করলেন। ম্যানেজার এলে অধিকারী মশাই বললেন, আমি বুড়ো হয়েছি, কি বলেছি আমার মনে নেই, আপনি ক্ষমা করে দিন—।

তারপর আবার বাজাতে আরম্ভ করলেন। সেই বাজনা মহারাণী শুনে মুগ্ধ হলেন। অর্ডার হলো, যতদিন খুশি ওরা যাত্রা করবেন, তবে দল যতদিন থাকবে ততদিন বেহালা শোনাতে হবে!—

শশিভূষণ অধিকারী (শশী) মহাশয়কে দলের লোকজন ওস্তাদজী বলে ডাকতেন। কোচবিহারে সেবার আরও তিন দিন বেশী যাত্রা হয়েছিল। মোট ১১ দিনের টাকাও পেয়েছিলেন। অনেক পুরস্কারও পেয়েছিলেন। এই দলে আমি দুই বৎসর কাজ করেছিলাম। গয়াসুর নাটকে আমি গয়াসুরের ছেলে মহারথি সাজতাম। এই দলে আমি ৫ টাকা মাইনেতে ঢুকেছিলেম ; পরে ৩৫ টাকা হয়েছিল।...”

এরপর বিজয় মিত্র আসেন নিতাই অপেরায়। সত্যম্বর অপেরার কথায় আসার আগে এই দল সম্বন্ধে বিজয়দা যা লিখে গেছেন আমি তার কিছু অংশ পেশ করছি।

...“এই দলের বাসা আর আপিস ছিল গোয়াবাগানে। মালিকের নাম, শ্রীযুক্ত নিতাইপদ দাস!...”

॥ শশী হাজরার শান্তি সম্প্রদায় ॥

বর্ধমান জেলার বলগনা পোষ্ট অফিসের অন্তর্গত মঞ্জিলা, বর্তমান সন্তোষপুরের এই শশী হাজরা 'শান্তি সম্প্রদায়' নামে একটা যাত্রা দল তৈরি করেছিলেন। এঁর যাত্রার ছিল পুরাতন রীতি। পরে অবশ্য দলটি যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলতে গিয়ে অপেরা পার্টীতে পরিণত হয়েছিল। এই শান্তি সম্প্রদায়ের বড় বাজার ছিল পূর্ববঙ্গে। গোটা পূর্ববঙ্গে দলের খ্যাতিও ছিল যথেষ্ট।

একদিন সন্ধ্যায় শশী হাজরা তাঁর বর্ধমানের বাড়িতে, বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন, এমন সময়ে আততায়ীর গুলিতে মারা যান। শশীবাবুর মৃত্যুর বছর খানেক পর, আনুমানিক ১৩৩২ সনে দল বন্ধ হয়।

॥ কৃষ্ণচন্দ্র আদকের 'মহাকালী সঙ্গীত সম্প্রদায়' এবং রসিকচন্দ্র চক্রবর্তীর 'বালক সঙ্গীত সম্প্রদায়' ॥

এই দুটি দলই ১৩২১ সনের আগেই খুব খ্যাতি পেয়েছিল। দুটি দলেই ছিল জুড়ি ও ছেলের গান। দুটি দলই খ্যাতির সঙ্গে আসরস্থ করেছিল নিতাইপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্মশানে মিলন'। পরে দুটি দলই অপেরা পার্টীতে রূপান্তরিত হয়।

বালক সঙ্গীত সম্প্রদায়ের কর্ণধার রসিকচন্দ্রের জন্ম হয় যশোর জেলার কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত রায় গ্রামে ১২৬৩ সনে। রসিকচন্দ্রের বাবার নাম ছিল রামরতন চক্রবর্তী। ১২৯৪ সালে বাবার মৃত্যুর পর রামরতন কয়েকটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে 'হরিগুণ গান' করে বেড়াতে থাকেন। তারপরই জন্ম নেয় 'বালক সঙ্গীত সমাজ'। রসিকচন্দ্র ছিলেন সাধক প্রকৃতিব লোক। গান লেখায় দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। 'প্রভাস মিলন', 'কংস বধ' ইত্যাদি পালা জনপ্রিয় করেছিলেন। 'চন্ডে পাগল' নামে খ্যাত ছিলেন।

॥ গণেশ ঘোষের সমসাময়িক কিছু যাত্রা দল ॥

এই সময়ে আরও কিছু যাত্রা দল ছিল। গিরীশ চট্টোপাধ্যায়ের দল, ত্রৈলোক্য পালের দল, নারায়ণ দাস ঘোষের যাত্রাপার্টি, নীলকান্ত দাসের দল। এই দলগুলি হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের পালা আসরস্থ করত। তবে ত্রৈলোক্য পালের দলে অক্ষয়কুমার চক্রবর্তীর "বাস্তুঘুঘু" নামের একটি প্রহসনধর্মী পালা অভিনীত হয়।

॥ অবিভক্ত বঙ্গদেশ, যাত্রা গানে উদ্বেল বরিশাল ॥

সেকালে অর্থাৎ অবিভক্ত যখন বঙ্গদেশ তখন বরিশাল উদ্বেল হয়ে উঠেছিল যাত্রাগানে। তখন বহু দলের মধ্যে "রায়-দত্ত-সিংহরায়" কোম্পানির খ্যাতি ছিল যথেষ্ট। বরিশালের ঝালকাঠিতে ছিল এই দলের গদি। এই যাত্রা দল অভিনীত জনপ্রিয় পালাগুলি হলো, "পরশুরামের মাতৃহত্যা", "ঘোড়াসুর", "অদৃষ্ট", অহিভূষণের "সুরথ উদ্ধার", ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর "কুবলাশ্ব"। এই বিশাল প্রতিষ্ঠানও এক সময়ে ভেঙে যায়। পাশাপাশি গড়ে ওঠে অনেক দল। যেমন নাগ কোম্পানি, রুদ্র গোস্বামী সিংহ কোম্পানি, গুহরায় কোম্পানি, নাগ সিংহ কোম্পানি ইত্যাদি। দলগুলির নামকরণ থেকে বোঝা যায় নাগ, সিংহ, গুহরায় এঁরাই এক সময়ে মিলিতভাবে গড়ে তুলেছিলেন 'নাগ-দত্ত-সিংহরায়" কোম্পানি।

পরে সবাই আলাদা হয়ে যান। বরিশালের বাদলকাঠির ধনাঢ্য ব্যক্তি মহেন্দ্র সিংহ এবং রজনী নাগ ছিলেন "নাগ-সিংহ" যাত্রা কোম্পানি মালিক।

॥ বরিশালের মেয়েদের দল "লেডি কোম্পানি" ॥

এই লেডি কোম্পানির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মহেন্দ্র সিংহ ও রজনী নাগ।

বরিশালের প্রথম মেয়েদের দল। মেয়েরাই ছিলেন দলের সর্বেসর্বা। অভিনয়ও করতেন মেয়েরা। যদিও মহেন্দ্র সিংহ ও রজনী নাগের চেষ্টায় এই দলের জন্ম, তবুও এর মালিক ছিলেন শ্রীমতী বোকা নামের এক মহিলা।

॥ বরিশালের ঠাকুর কোম্পানি ॥

বরিশালের নলচিটি গ্রামের বাসিন্দা রজনীকান্ত চক্রবর্তী ছিলেন ঠাকুর কোম্পানির অধিকারী। ১৩৩৯ সালে এই যাত্রাদল গড়ে ওঠে। এই দলে প্রথম 'হারমোনিয়াম' যন্ত্রের প্রচলন হয়। যশোর জেলার ঝিকরগাছার ভূষণ দাস যেমন ছিলেন ওস্তাদ হারমোনিয়াম বাজিয়ে, তেমনি ছিলেন ওস্তাদ

গায়ক। এ দলে হারমোনিয়াম বাজনা আর গান দুই করতেন ভূষণ দাস। এ দলে অভিনীত জনপ্রিয় পালার তালিকা এই রকম ঃ "বাণ পরাজয়", "প্রহ্লাদ", "ধ্রুব", হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের "তারা", "রুক্মাঙ্গ দেবের হরিবাসর" ইত্যাদি।

বরিশালের ব্রাহ্মণ তিতনার বাসিন্দা যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় নারী চরিত্রে যখন আসরে অবতীর্ণ হতেন তখন বিস্ময়ের অন্ত থাকত না। মেয়েরা পর্যন্ত বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতেন "যদুরাণী"র, অভিনয় দেখে।

এই ঠাকুর কোম্পানির চার আনা অংশীদার ছিলেন শশী নট্ট। ১৩৪২ সালে 'ঠাকুর কোম্পানি' বন্ধ হয়ে যায়। এই সময়ে গড়ে ওঠে 'মাচরং বৈকুণ্ঠ সঙ্গীত সমাজ'।

॥ পূর্ব বঙ্গের আরও দল এবং গভীর যাত্রাপ্রীতি ॥

বরিশাল। এই বরিশালের প্রতিটি মানুষের কাছে মনের একমাত্র খোরাক হিসেবে 'যাত্রা' এক সময়ে যে কী নিদারুণ ভাবে বিস্তার লাভ করেছিল তা বর্ণনাতীত। শুধু বরিশাল নয়, তৎকালীন গোটা পূর্ববঙ্গে ঠিক শহর কলকাতার মত যাঁর আর্থিক সচ্ছলতা ছিল তিনিই গড়ে তুলতেন একটি করে যাত্রা দল। এঁদের অধিকাংশেরই একমাত্র লক্ষ্য ছিল 'যাত্রা'কে পণ্য হিসেবে বাজারে বিকিয়ে আর্থিক লাভবান হওয়া। একমাত্র বরিশাল নিবাসী ধনাঢ্য বৈকুণ্ঠ নট্ট যাত্রাকে ব্যবসা হিসেবে ব্যবহার করলেও, যাত্রাকে বঙ্গদেশের একমাত্র নিজস্ব সম্পদ মনে রেখে, কী ভাবে তাকে উত্তরণের পথে নেওয়া যায় সেই ভাবনায় অস্থির হতেন। তারই ফলশ্রুতি আজকের নট্ট কোম্পানি। যে নট্ট কোম্পানি অতীত-বর্তমান যাত্রা চর্চার এক শক্ত সেতু। সে সব কথা পরে বিস্তারিত বলবো। এখানে তার আগে পূর্ববঙ্গের আরও কিছু যাত্রা প্রতিষ্ঠান বা যাত্রা প্রেমীর কথা বলি! যেমন বরিশালের মহিলাড়ার গোবিন্দ যুগী, গণেশ উকিল, কেদার ঘোষ, ধুলো উমেশ, ভদ্রকালীর বনমালী ঘোষ, শিবু যোগী, শিবরাম চট্টোপাধ্যায় ওরফে খোঁড়া নন্দ এঁরা শুধু যাত্রা দলই তৈরি করেননি, নিজেরাই সমসাময়িক সামাজিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে বা পৌরাণিক বিষয়ক পালা লিখে বঙ্গদেশের পালা সাহিত্যের ভান্ডারে সাধ্যমত রত্ন যোগান দিয়েছিলেন। এঁদের পালার মূল বাণী ছিল 'পাপের ক্ষয়-পুণ্যের জয়'!

॥ ফরিদপুর ॥

এখানকার চন্দ্রকান্ত অধিকারী / মাদারিপুরের কাশীনাথ ভট্টাচার্য ও গোবিন্দ নট্ট / নড়াইলের কালনা গ্রামের গৌর পরামাণিক যাত্রা দল তৈরি করে, স্বরচিত পালা উপস্থাপনার ভিতর দিয়ে গ্রামীণ অশিক্ষার আর অজ্ঞতার অন্ধকার ঘোচাবার চেষ্টা করতেন।

॥ ময়মনসিংহ ॥

পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহেও একাধিক যাত্রাদল ছিল। গৌরমোহন অধিকারীর ধ্রুব চরিত্র, নিত্য মিলন, নরমেধ যজ্ঞ, মার্কন্ডেয় পুরাণের 'হরিপাদপদ্ম লাভ' পালাগুলি জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। ইন্দ্রমোহন নট্টের মত ওস্তাদ বাজিয়ে ছিলেন গৌরমোহনের দলে।

এই ময়মনসিংহতেই সনাতন লাহিড়ীর দলও মতিলাল রায়ের পালা আসরস্থ করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল।

॥ মাচরং সংগীত সমাজ ও বৈকুণ্ঠ নট্ট ॥

ঠাকুর কোম্পানি উঠে যাবার পরই জন্ম নেয় "মাচরং বৈকুণ্ঠ সংগীত সমাজ"। বরিশালের 'মাচরং' গ্রামের বাসিন্দা বৈকুণ্ঠ নট্ট ঠাকুর কোম্পানির পরই যে যাত্রা দল তৈরি করেছিলেন তার নাম ছিল 'মাচরং বৈকুণ্ঠ সংগীত সমাজ"। এই দলটি পরে "নট্ট কোম্পানি" নমে খ্যাত হয়। এই দলের জন্ম ১৯২৪ সালে। ঠাকুর কোম্পানির চার আনার অংশীদার শশী নট্ট এই 'মাচরং বৈকুণ্ঠ

সংগীত সমাজে'র অংশীদার হন, এবং তাঁর ওপরেই ছিল দল পরিচালনার দায়িত্ব, অর্থাৎ তিনি ছিলেন ম্যানেজার। এই শশী নট্টের প্রধান সহকারী ছিলেন সূর্যকুমার দত্ত।

সূর্য দত্তকে অনায়াসেই 'সব্যসাচী' বলা যেতে পারে। সূর্য দত্ত এক বিরল প্রতিভা। সূর্য দত্ত নিজেই একটা ইনস্‌টিটিউট ছিলেন বলা যেতে পারে। শ্রীদত্ত ছেলেবেলা থেকে জানতেন না এমন কোন কাজ নেই। এমন কোন যন্ত্র ছিল না যে তিনি বাজাতে না জানতেন। নাচে, গানে, অভিনয়ে, বাদ্যযন্ত্রে, অভিনয় শিক্ষাদানে, দল পরিচালনায় (এ্যাডমিনিস্ট্রেশনে দক্ষ) তাঁর মত মানুষ আজ বিরল। সেই সূর্য দত্ত নিতান্ত অল্প বয়সেই যাত্রায় আসেন, তিনি ছিলেন এই দলের একাধারে নৃত্যশিক্ষক, সহ ম্যানেজার।

এই দলের অভিনয় শিক্ষক ছিলেন নকুল দত্ত। বৈকুণ্ঠ নট্ট ছিলেন ওস্তাদ বেহালা বাদক, তাঁর ভাই হারান নট্ট ছিলেন অসামান্য গায়ক, তাঁর জামাই যোগেন্দ্রলাল নট্ট ছিলেন ঢোল, তবলায় অসামান্য। এঁরা স্ব স্ব দক্ষতা এই দলে দেখাতেন। এই দলে অধিকাংশই 'নট্ট' সুতরাং অতি অল্প সময়ের মধ্যে লোকেরা বলতে থাকল "নট্ট কোম্পানি"।

॥ নট্ট কোম্পানির ইতিকথা ॥

প্রাসাদের সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে নিলাম! বলে রাখা ভাল, কলকাতার পুরাতন বহু স্মৃতি বিজড়িত বাড়িগুলির ওপরে 'টেলিগ্রাফ' পত্রিকা একটা বড় রকম সার্ভে করতে গিয়ে নট্ট কোম্পানির এই বাড়ির কথা উল্লেখ করেছিল।

কাঠের সিঁড়িতে জমাট বাঁধা অন্ধকার। এখন ২৪ ঘণ্টা আলো জ্বলে। ৩০ বছর আগে তা জ্বলত না।

সেই মহারাজ নন্দকুমারের আমলের কাঠের সিঁড়ি মাড়িয়ে দোতলায় পৌঁছলে আরও বিস্ময়! প্রশস্ত চাতাল, চারদিকে বিশাল বিশাল ঘর। ওপরের কার্নিশে অপরূপ কারুকার্য, স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন এ বাড়ির পূর্বপুরুষ যাঁরা ছিলেন তাঁদের শৈল্পিক রুচির পরিচয় বহন করছে। সে সব সিমেন্ট খোদাইকরা স্থাপত্য শৈলী, এই দোতলা বাসীদের অর্থাৎ নট্ট কোম্পানির মালিকদের পুরনো ভাড়াটিয়াদের উনুনের ধোঁয়া আর অবহেলায় এখন কদর্যরূপ ধারণ করেছে। খসে খসে পড়েছে সব। অবশিষ্ট যা আছে তা থেকেই আন্দাজ করা যায়, একদা এ বাড়ির কর্তাদের বিলাসী মন কেমন ছিল। এই চাতালের ওপর দিয়ে, ভাড়াটিয়াদের বারান্দা ঘেরা রান্না ঘর, ডাষ্টবিনের পাশ দিয়ে সোজা এগিয়ে গেলে তিনতলার সিঁড়ি। সেই অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে ওঠার পর আলো, বাতাস, সুখ, শান্তির এক অন্য জগত। এই তিনতলায় বর্ধিষ্ণু নট্ট পরিবারের বাস। বাইরের মহলে একদা নট্ট কোম্পানির আলাদা কোন দপ্তর ছিল না। এখন আছে। একটি প্রশস্ত ঘরেই নট্ট কোম্পানির গদি ঘর। এখানেই মাখনলাল নট্টের জীবনের একমাত্র যে প্রেম, যে গভীর ভালবাসা তারই তীর্থক্ষেত্র বলা যায়। মাখনবাবু এখানে বসেন, নায়েকদের সঙ্গে কথা বলেন, বায়না করেন। মাখনবাবুর ঠিক পিছন দিকের জানলাটা খুলে দিলে ঘরে বসে দেখা যায়, ভরা গঙ্গার জোয়ার ভাঁটা খেলা। এ ঘরের পাশে এক টুকরো একটা ঘর, এ ঘরেই প্রতীক্ষা করেন অনেকে। জানলা খুলে দিলে ওপরে আকাশ আর নিচে স্রোতস্বিনী গঙ্গার জলরাশির ওপর কত রংবদলের খেলা নজরে পড়ে! একবার আমি কথায় কথায় মাখনবাবুকে বলেছিলাম, আপনার এই গদি ঘরের নাম 'হাওয়া মহল' থাক। বারো মাসের জন্য প্রকৃতির এই মিষ্টি বাতাস এখানে বাঁধা। পরে উপলব্ধি করেছিলাম, ভিতর মহলের সব ঘরই হাওয়া মহল। মাখনবাবুদের এমন হাওয়া মহল, এমন আকাশ আর প্রসাদের কোল ঘেঁসে বয়ে যাওয়া ভাগীরথীর রূপ আকণ্ঠ পান করার সৌভাগ্যকে হিংসা না করে থাকতে পারে ক'জন? এই তিনতলার ছাদে দাঁড়িয়ে সূর্য উদয় আর অস্তের অপরূপ রূপলীলা দেখা যায়। শোনা যায় গঙ্গার কলতান।

মাখনবাবু বোধ করি এই রূপ-অরূপের অমৃত রসসুধা পান করতে পারেননি কখনও। চরম ব্যস্ততা, চরম দায়িত্ব আর কর্তব্য পালনের মহাপূজার অর্ঘ্য সাজাতে গিয়ে মাখনবাবুকে হয়তো দু'দণ্ড এই ছাদে পার্থিব জীবনের হিসাব মেলাবার জন্য দাঁড়ানো সম্ভব হয়নি। হয়তো মাখনবাবুকে এ বাড়ির অন্দরমহলের বাঁ দিকের দ্বিতীয়-প্রশস্ত-সুসজ্জিত নিজের ঘরের উত্তরের বারান্দায় অনেকদিন বিনিদ্র রজনী কাটাতে হয়। কিংবদন্তীর যাত্রা প্রযোজক মাখন নট্ট ঐতিহ্য-আভিজাত্যের এক ভাসমান টাইটানিক।

নিস্তব্ধ রাত্রে সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন এ তল্লাটে জেগে থাকে গঙ্গার তরঙ্গলহরী। গঙ্গার দু'তীরের অসংখ্য আলো। আকাশ ভরা তারা আর তার মাঝে এই মাখনলাল নট্ট! এই যে জেগে থাকা এর মূলে শুধু রাশি রাশি চিন্তা!

প্রতিমুহূর্তের জন্য এই নট্ট কোম্পানির ঐতিহ্য-মর্যাদা-আভিজাত্য ও কৌলীন্য বজায় রাখার চিন্তা একদিকে, অন্যদিকে যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলতে গিয়ে যাত্রা ব্যবসায় চারদিকে যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতায় বারবার জেতার চিন্তা। এই বিশাল প্রতিষ্ঠান আর প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে বহু মানুষের জীবনের চিন্তা।

অথচ সেদিন সেই ষাটের দশকের গোড়ায় মাখনবাবুর দেহ, মন, চোখ আর কপালের কোথাও এই প্রতিযোগিতার ছাপ দেখিনি।

সূর্য দত্তের কথা উঠতে মাখনবাবু কপালে হাত ঠেকালেন! এটা তাঁর স্বভাব। আজও মাঝে মাঝে পুরনো দিনের শ্রদ্ধেয় কারও কথা উঠলে উনি কপালে হাত ঠেকান, বোধ করি তাঁদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানান তিনি! যাত্রা জগতের সকলের 'গুরুমশাই', কিংবদন্তীর যাত্রা সাধক সূর্য দত্তের কথা কাগজে বেরুবে শুনে মাখনলাল খুশিও হলেন! মাখনবাবু প্রচার বিমুখ ছিলেন তা প্রথম পরিচয়ের দিনেই বুঝেছিলাম অনেকটাই।

॥ নট্ট কোম্পানির উৎস বর্ণনা ॥

মরা মরা জপ থেকে রাম-রাম নাম গানে যে দস্যু রত্নাকরের বাল্মিকীতে রূপান্তর, সেই কাব্য ইতিবৃত্ত একটি সত্যকে চিরস্থায়ী করে দেয়, তা হলো সাধনাতেই সিদ্ধিলাভ। এক সময় বরিশালে যখন লোক মুখে ছড়িয়ে গেল নট্ট-নট্ট, নট্টের দল-নট্টের দল, তখন এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রচারই 'নট্ট কোম্পানি যাত্রাপার্টি'র জন্ম সূচিত করেছিল। পরবর্তীকালে, সমকাল ভাবনায় ধীরে ধীরে 'যাত্রাপার্টি' শব্দের অবলুপ্তি ঘটালো, থাকল শুধু নট্ট কোম্পানি।

'বাংলার লোকনাট্য সমীক্ষা' গবেষণা গ্রন্থে ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য বলেছেন—"প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে চালু দলগুলির মধ্যে ইহার স্থান দ্বিতীয়—", এই উক্তিকে মেনে নেওয়া যায় না। ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, সত্যম্বর চাটুজ্জের সত্যম্বর অপেরা প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে প্রথম তাও বলেছেন। এ ক্ষেত্রে যথার্থ হিসাব কিন্তু অন্য কথা বলে। সত্যম্বর চাটুজ্জের দল সত্যম্বর অপেরা একেবারে গোড়া থেকে গৌর দাস পর্যন্ত কয়েকবার হস্তান্তরিত হয়েছে। গৌর দাসের সঙ্গে সত্যম্বর চাটুজ্জের রক্তের সম্পর্কও ছিল না কোনদিন। অথচ আজকের নট্ট কোম্পানির জন্মলগ্ন থেকে এ যাবৎকাল নট্ট'র বংশের ও রক্তের সম্পর্কের উত্তরাধিকারীই এই প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তা। সেদিন থেকে বিচার করলে বলা যায়, নট্ট কোম্পানিই প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে সুপ্রাচীন।

পাঠক-পাঠিকাদের মনে রাখতে হবে ১৯০৫ সাল থেকে সত্যম্বর অপেরা বহুবার হস্তান্তরিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত ১৯৯০ সালের মধ্যে অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রশ্নে যেখানে সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি করে, সেখানে এই '৯৬ সালেও নট্ট কোম্পানির জয়ের পতাকা এই নট্ট বংশেরই উত্তরাধিকার শ্রীমাখনলাল নট্ট গৌরবের সঙ্গেই উড্ডীন রেখেছেন।

নট্ট কোম্পানি আরও অনেক কারণেই 'প্রথম' তা বলা যেতে পারে।

বহু বছর আগের কথা। কমপক্ষে একশ বছর ত হবেই। পূর্ববঙ্গে অধুনা বাংলাদেশে একটি জনপ্রিয় যাত্রাদল বা প্রতিষ্ঠান ছিল। নাম, নাগ দত্ত সিংহ রায় কোম্পানি। যথা সময়ে সেই প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়ে একাধিক যাত্রা দল তৈরি হয়েছিল। এই সময়ে বরিশালে যে দলটি বা প্রতিষ্ঠানটি বেশ খ্যাতিমান হয়েছিল সেটি হল ঠাকুর কোম্পানির দল। এই ঠাকুর কোম্পানির চার আনা অংশীদার ছিলেন শশী নট্ট। ১৯১২ সালে সেই ঠাকুর কোম্পানির দরজা বন্ধ হয়ে যায়। এই জনপ্রিয় দলটি বন্ধ হয়ে যায় বটে, কিন্তু তখন যাত্রা প্রসঙ্গে অনেকেই উৎসাহিত হয়ে পড়েন। যেমন উৎসাহিত হয়েছিলেন বরিশালের বানুরি পাড়ার মাচরঙ গ্রামের বৈকুণ্ঠ নট্ট। শ্রী নট্ট যাত্রায় উৎসাহিত হয়েই তৈরি করেছিলেন মাচরঙ বৈকুণ্ঠ সংগীত সমাজ। পরবর্তী সময়ে এই প্রতিষ্ঠানটিই নট্ট কোম্পানিতে পরিণত হয় এবং অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় একাধিক দল ভাঙাগড়ার খেলাকে ছাপিয়ে এই নট্ট কোম্পানির খ্যাতি-জনপ্রিয়তা আজও অম্লান। ঠাকুর কোম্পানির চার আনার অংশীদার শশী নট্ট আর সূর্য দত্তই হলেন এই কিংবদন্তী প্রতিষ্ঠানের আদি পুরুষ। শশী নট্ট তাঁর ভাই বৈকুণ্ঠ নট্টের এই দলের শুধু অংশীদারই ছিলেন না, তিনি গোড়া থেকেই দলের ম্যানেজার হিসেবে জড়িয়ে পড়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরিয়ে একটু একটু করে মহীরূহে পরিণত করেছিলেন। তখন যে যুবকটি শশী নট্টের পাশে দাঁড়িয়ে অক্লান্ত পরিশ্রমে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি নিয়ে কাজ করে গিয়েছিলেন তিনি সূর্য দত্ত। সূর্য দত্ত ছিলেন শশীবাবুর প্রধান সহকারী। দলের ভিতর আর বাইরের রাশি রাশি কাজের মধ্যেও সূর্য দত্ত নিজের প্রতিভা আর দক্ষতা বলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন দলের নৃত্যশিক্ষক হিসেবে। পালা নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন নকুল দত্ত। মাচরং বৈকুণ্ঠ সংগীত সমাজ-এর কর্ণধার বৈকুণ্ঠ নট্টর আকস্মিক মৃত্যুর পরই মূলত গড়ে ওঠে নট্ট সংগীত সমাজ বা নট্ট কোম্পানি। পরে এই দলে যোগ দিয়েছিলেন, বৈকুণ্ঠের ভাই হারান নট্ট ও নাতি যোগেন নট্ট।

এ দলের সঙ্গে বৈকুণ্ঠবাবুর সম্পর্ক ছিল মাত্র সাত আট বছরের। তারপরই মারা যান তিনি। এ দলের রিহার্সাল বসত বৈকুণ্ঠ নট্টের বাড়িতে। যখন সময়ের অভাব দেখা দিত কোন কারণে তখন যত্র তত্র রিহার্সাল হত। গানের আসরে যাবার সময় পথে বহু দিন নৌকাতেও পালার রিহার্সাল পর্ব চালিয়ে নেওয়া হত। একবার সেই পুরাতন স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে নট্ট কোম্পানির শিরোমণি, বৃদ্ধ সূর্য দত্ত বলেছিলেন,—জল কাদার দেশ পূর্ববঙ্গ। সুতরাং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে গান গাইতে হলে বেশিরভাগ নৌকায় করে জলপথে যেতে হত। আমরা প্রতি বছর কলকাতায় আসতাম চৈত্র মাসে গাজনের মেলা উপলক্ষে, আষাঢ় মাসে আমরা ফিরে যেতাম পূর্ববঙ্গে। এখন যেমন যুগের সঙ্গে তাল রেখে, সমকাল শিল্পচেতনা বোধে কর্ণধার মাখনলাল নট্ট এই প্রতিষ্ঠানের জয়ধ্বজাটি জনপ্রিয়তার শীর্ষে উড্ডীন রেখেছেন, তেমনি নট্ট কোম্পানির প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যে মানুষটি এর ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করে গিয়েছিলেন তিনি সূর্য দত্ত। সূর্যবাবু ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের এক এবং অদ্বিতীয় কাণ্ডারী। সূর্যবাবু একাধারে করতেন পালা নির্বাচন, শিল্পী সংগ্রহ এবং অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে তিনি ছিলেন কঠিন কঠোর। একবার নট্ট কোম্পানির অঙ্গনে সেদিনের দুই শ্রেষ্ঠতম অভিনেতা ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ (বড় ফণিবাবু) ও প্রভাত বোস এসে দাঁড়িয়েছিলেন পাশাপাশি। এক আকাশে যেমন পাশাপাশি দুটি সূর্য থাকতে পারে না, তেমনি বড় ফণিবাবু আর প্রভাতবাবুর মত দুই কীর্তিমান নটকে একটি দলে আনা কোন যাত্রা প্রযোজকের পক্ষেও সম্ভব ছিল না, অথচ সূর্য দত্ত সেই অসাধ্য সাধন করেছিলেন 'মেদিনী' পালায় দু-জনকে নামিয়ে। সেটা ছিল ১৯৩৬।

এরপর, ১৯৩৭ সালে নট্ট কোম্পানি পাকাপাকি ভাবে উঠে আসে কলকাতার শোভাবাজার

অঞ্চলে হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রীটে। সে বাড়িতে আজও গর্বের সঙ্গে পত্‌পত্‌ করে উড়ছে নট্ট কোম্পানির জয়ের নিশান। ১৩৫৮ সনে মারা যান শশী নট্ট। এই একনিষ্ঠ কর্মী এবং অংশীদারের মৃত্যুর পর প্রতিষ্ঠানের অর্ধ অংশের দায়িত্ব ন্যস্ত হয় ওঁর তিন ছেলের উপর। বাকি অর্ধাংশের দায়িত্ব ক্রমে বর্তালো বৈকুণ্ঠ-কন্যা হেমলতার স্বামী যোগেন্দ্র ও পরবর্তীকালে তাঁদের পুত্র মাখনলাল নট্টের ওপর। ১৩৬০ সন। একদিন যে নট্ট কোম্পানি ছিল অখণ্ড, সেই প্রতিষ্ঠান খণ্ডিত হয়ে গেল। শশীভূষণবাবুর ছেলেরা আলাদা ভাবে গড়ে তুলেছিলেন 'শশীভূষণ নট্ট কোং'। আর বৈকুণ্ঠবাবুর উত্তর সূরীরা পূর্বপুরুষদের স্মৃতিবিজড়িত 'বৈকুণ্ঠ সমাজ' বা নট্ট কোম্পানিকেই একটু একটু করে ভরিয়ে তুলতে থাকলেন অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে।

মাত্র এক বছরের মধ্যে "শশী নট্ট কোং' বন্ধ হয়ে যায় আর পুরুষকারের ভিত্তিতে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে থাকে নট্ট কোম্পানি বা বৈকুণ্ঠ যাত্রা সমাজ। এর মূলে অবশ্য একটি মানুষের আমৃত্যুকাল পর্যন্ত ছিল পরিশ্রম, ভাবনা আর উপদেশ। তিনি সূর্য দত্ত।

১৯৭০ সালে নট্ট কোম্পানি-১ এবং নট্ট কোম্পানি-২ নামে দুটি বিভাগ তৈরি করেছিলেন কর্ণধার মাখন নট্ট। ১নং নট্ট কোম্পানি পুরাতন ঐতিহ্য বহন করে, স্ত্রীলোক শিল্পী ছাড়াই চলেছিল অনেকদিন, পাশাপাশি ২নং নট্ট কোম্পানিতে মাখনবাবু মহিলা শিল্পীদের নিয়ে একের পর এক পালা প্রযোজনা করলেন।

অতীতে যে শিল্পীরা এই প্রতিষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন বা যে শিল্পীরা এই প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হবার পর খ্যাতিমান হয়েছেন, তাঁদের নিখুঁত দীর্ঘ তালিকা পেশ করা সম্ভব নয়। তবুও যাঁদের নাম কোনদিন বিস্মৃত হবার নয় তাঁরা হলেন, সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরেশ মুখোপাধ্যায় (যিনি সেকালে গ্রাজুয়েট অভিনেতা), হরলাল গঙ্গোপাধ্যায়, (তিনি টিম্বল নামে বেশি পরিচিত ছিলেন)। বরিশালের নাকপাড়ার জনার্দন চক্রবর্তী, সুনীল মুখার্জী (যিনি রামু নামে খ্যাত)।

ছোট ফণি অর্থাৎ স্বনামখ্যাত ফণিভূষণ মতিলাল মাত্র ৮ বছর বয়সে এই দলে যোগ দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে হয়েছিলেন ডাকসাইটে অভিনেতা। এই দলে বালক ফণি প্রথমে সখির ব্যাচে পরে একানে দলে কাজ করেন। তারপর স্ত্রী চরিত্র। তৎকালের 'খনা' পালায় ছোট ফণিবাবু 'খনা'র চরিত্রে রূপদান করে যশ লাভ করেছিলেন। পরে এই পালারই 'মিহির' চরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতি পান। প্রতিষ্ঠা পান। নকুল দত্ত'র 'রাজা' দেখার জন্য মানুষ উন্মুখ হয়ে থাকত। সেই নকুলবাবু ফরিদপুরের চালতাতলির দল ছেড়ে এই দলে এসে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। মাত্র ১১ বছর বয়সে ভোলা ভট্টাচার্য এই দলে একানে ছেলের অভিনয় করে পরে যশ লাভ করেছিলেন। বড় ফণিবাবু অর্থাৎ ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ, প্রভাত বসুর মত শিল্পী নট্ট কোম্পানির গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন যথেষ্ট।

কলকাতার যাত্রা দলে যখন মেয়েদের চরিত্রে মেয়েদের অভিনয় বা আবির্ভাব পুরোপুরি শুরু হয়ে গিয়েছেল তখনও পর্যন্ত নট্ট কোম্পানির খ্যাতিকে বিন্দুমাত্র ম্লান হতে দেননি, নারী চরিত্রে অভিনয় করা পুরুষেরা। এক সময়ে রূপ সজ্জায়, অভিনয়ে যাঁরা নট্ট কোম্পানির আসরের পর আসর মাতিয়ে দিতেন, যাঁদের আসরে দেখলে রাজা-মহারাজা-জমিদার থেকে সাধারণ মানুষেরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতেন, তাঁরা হলেন বরিশালের মহিলাড়ারের বিনোদ রানী (বিনোদচন্দ্র দাস), পালং গ্রামের দুর্গারানী (দুর্গামোহন দাস) ফরিদপুরের রেবতীরানী (রেবতীমোহন দে), নলচিটির ক্ষেত্ররানী (ক্ষেত্রবাবু, যিনি গুঁফোরানী নামে জনপ্রিয় ছিলেন)। উপেন কর, বাগের হাটের ধীরা রানী, সুদর্শণ রানী, কমলরানী তা ছাড়া নট্ট কোম্পানি কলকাতায় যখন স্থায়ী হলো, তখন ফণিরানী (ফণি ভট্টাচার্য, পরে পুরুষ চরিত্র করছেন এখনও), বাবলিরানী, হরিগোপাল, শতদলরানী, রাম মাইতি, ক্ষেত্র পাল, চপলরানী (চপল ভাদুড়ী, কেতকী দত্তের ভাই) আরও অনেকে। পুরুষ

শিল্পীর মধ্যে কলকাতায় দল প্রতিষ্ঠা থেকে বহু বছর পর্যন্ত যাঁরা নট্ট কোম্পানির আভিজাত্য-কৌলীন্যকে অভিনয় জাদুতে ধরে রেখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন পঞ্চু সেন, পূর্ণেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয় বসু, স্বপনকুমার, পরেশ ব্যানার্জী, জ্যোৎস্না দত্ত, নির্মল অধিকারী, সুজিৎ পাঠক, দ্বিজু ভাওয়াল, শেখর গাঙ্গুলী, শান্তিগোপাল, নিরঞ্জন ঘোষ, কমল মিত্র, গুরুদাস ধাড়া, দীপক মুখার্জী, শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়, নবকুমার, মনোজকুমার, ঝর্ণা ব্যানার্জী আরও অনেকে। সত্তরের দশক থেকে যে শিল্পীরা নট্ট কোম্পানির সঙ্গে জড়িত থেকে নিজেদের ধন্য করেছেন, আবার অভিনয় চাতুর্যে নট্ট কোম্পানিকে গৌরবান্বিত করেছেন তাঁরা হলেন, দীপেন চ্যাটার্জী, নিমাই কাঞ্জিলাল, দুর্গা দাস, সুদেশকুমার, তরুণকুমার, দেবগোপাল, কৃষ্ণকুমার মন্ডল, কার্তিক রায়, অরুণ বসু, তারা দেবী, ভারতী সিন্‌হা, কৃষ্ণা চ্যাটার্জী, রাখী ভট্টাচার্য, তারারাণী পাল, অসীমকুমার আরও অনেক অনেক শিল্পী। এই তালিকার আরও কিছু স্মরণীয় নাম অরুণ দাশগুপ্ত, বীণা দাশগুপ্তা, রুমা দাশগুপ্তা, বেলা সরকার।

নট্ট কোম্পানির সেরা গায়ক শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, কালীপদ দাস মজুমদার, শ্যামচাঁদ সাঁতরা, গুরুদাস ধাড়া, খোকন বিশ্বাস আরও অনেকে। অতীতের এই কালীপদবাবু 'কালি গাইয়ে' নামে বিখ্যাত হন। শ্যামচাঁদ ছিলেন নবদ্বীপের চৌগাছার লোক। তাঁর গান শুনে সবাই মুগ্ধ হয়ে যেত বলেই এক সময়ে তাঁকে "শ্যামের বাঁশি" বলে ডাকাটা একটা রেওয়াজ হয়েছিল। যুগের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে গিয়ে প্রযোজক মাখনলাল নট্ট সুরকার হিসেবে যাঁদের দলের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন, অনিল বাগচী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, আরও অনেকে। এই সব স্মরণীয় সুরকারদের যাত্রায় আনবার পিছনে প্রযোজক মাখন নট্টের যে মহৎ উদ্দেশ্য ছিল তা হলো, যাত্রার কোন নারী বা পুরুষ শিল্পীদের গানের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র রেওয়াজ করা গলা নয়, এই বরণীয় সুরকারদের কাছ থেকে তালিম নিলে শিল্পীরা বিশেষ করে মহিলা শিল্পীরা নিজেদের তৈরি করার চরম সুযোগ পাবেন।

পালা রচনা ক্ষেত্রে এমন কয়েকজনের নাম পাই যাঁদের নামের একটা প্রচণ্ড চাহিদা যাত্রার দর্শকদের কাছে বরাবরই ছিল। আর সেই চাহিদা মেটাতেই প্রযোজক-কর্ণধার মাখন নট্ট শুধু মহেন্দ্র গুপ্ত নয়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রকে দিয়েও পালা লিখিয়েছিলেন।

চিৎপুরের যাত্রাদলে অতীতেও অনেক খ্যাতিমান চলচ্চিত্র-মঞ্চশিল্পী অভিনয় করেছিলেন, সেই সূত্রে কমল মিত্র, শিপ্রা মিত্র, দ্বিজু ভাওয়াল, দীপক মুখোপাধ্যায়, নবকুমার এবং আরও কিছু চলচ্চিত্র শিল্পীকে নট্টের আসরে এনেছিলেন প্রযোজক মাখন নট্ট, কিন্তু আকস্মিকভাবে যাত্রা জগতে একের পর এক নব্য প্রযোজকদের আবির্ভাব ঘটায়, এবং তাঁদের শুধুমাত্র ব্যবসায়িক স্বার্থরক্ষা করা একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বলেই, মাখনলাল নট্ট যাত্রার আসরে নিয়ে আসেন, বসন্ত চৌধুরী, রবি ঘোষ, দীপঙ্কর দে, সোমা মুখার্জী-এর মত শিল্পীদের।

আলোক সম্পাতে, মঞ্চ আঙ্গিকে নট্ট কোম্পানি একটি যুগের প্রবর্তক। এই প্রতিষ্ঠানের আশির দশকের পর থেকে আলোক সম্পাতে তাপস সেন দাগ রেখে গেছেন। তেমনি কাজ করেছেন সুরেশ দত্ত।

পালা নির্দেশনার ক্ষেত্রে যুগের সঙ্গে তাল রাখতে এই দলে যেমন এসেছেন মহেন্দ্র গুপ্ত, তেমনি তরুণ রায়ও (ধনঞ্জয় বৈরাগী)। তাছাড়া একাধিক পালাকার স্বয়ং পালা নির্দেশনার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন, আজও যা অব্যাহত আছে। যেমন, ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়, নির্মল মুখোপাধ্যায়, সত্যপ্রকাশ দত্ত, আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা স্বরচিত পালার নির্দেশকও ছিলেন। নতুন নতুন পালাকার এনে ঝুঁকি নেওয়া মাখনবাবু অবশেষে নতুন পালাকারদের দক্ষতায় তৃপ্ত হয়েছিলেন। এঁরা হলেন উৎপল রায়, মনতোষ চক্রবর্তী।

একমাত্র নট্ট কোম্পানি বছর কয়েক ধরে রিজার্ভ করা স্টার থিয়েটারে পরে মহাজাতি সদন এবং কলামন্দির-এর মত শহরের সব চাইতে বিলাসবহুল জনপ্রিয় রঙ্গমঞ্চ ভাড়া করে পালার রিহার্সাল চালিয়ে এক ঐতিহাসিক ঘটনার সূত্রপাত করেছে।

১৯২৩ সালের আগে ও পরে অনেকবারই কলকাতায় বা আশে পাশে পালা গেয়ে যেত নট্ট কোম্পানি। নট্ট কোম্পানি যে কিংবদন্তীর প্রতিষ্ঠান তা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গানের বাণীতে, মান্না দে'র কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—"না না না আজ রাতে আর যাত্রা শুনতে যাব না!"...

॥ প্রসঙ্গ ঃ সূর্য দত্ত ॥

হাবড়া কেয়া গ্রামের গাছপালা ঘেরা একটি বাড়িতে এক নমস্য মানুষের দেখা মিলল। তখন প্রায় ৯০ বছর বয়স সূর্য দত্তের। অতীত দিনের সব কথাই তখন হারিয়ে গেছে প্রায়।

বয়স যখন সাত অথবা আট বছর তখনই সূর্য দত্ত বার্ষিক ৩ টাকা পারিশ্রমিকে সিংহ কোম্পানির যাত্রা দলে ঢুকে পড়েছিলেন একানি দলে। বালকদলের সঙ্গে সখীর নাচ দেখানো ছিল তাঁর কাজ। মাঝে মাঝে অধিকারী মশায়ের ফাইফরমাস খাটা।

বরিশালের নলচিতি থানার গৌরীপাশা গ্রামের অম্বিকাচরণ দত্তের ছেলে সূর্য দত্তের জন্ম হয় ১৮৭৩ সালে। সংসারে অভাব ছিল কিন্তু তার চাইতে ঢের বেশি অভিনয়ের নেশা ছিল। ছিল নিজের পায়ে দাঁড়াবার আকাঙ্খা। ছেলেবেলা থেকেই সূর্য দত্তের গলায় সুর ছিল। নানা রকম ভাব-ভঙ্গিমা দেখিয়ে, প্রতিভা বলে নানা রকম বাজনা বাজিয়ে সেই বয়স থেকেই সবার মন জয় করতেন। গায়ের রং শ্যামলা, দেখতে বেশ নাদুস-নুদুস। কিছু দিন সিংহ কোম্পানিতে থাকার পর সূর্য দত্ত আসেন ঠাকুর কোম্পানিতে। তখন ৬-৭ বছর বয়েস। তখনই বৈকুণ্ঠ নট্ট আর শশীভূষণ নট্টের নট্ট কোম্পানি গড়ে তোলার কাজে যুক্ত হন তিনি। মাইনে তখন ২ টাকা। তারপর হয় ৩ টাকা। বরিশালেই। এর পরই নট্ট কোম্পানি উপহার দেয় এক শ্রেষ্ঠ কমেডিয়ান অভিনেতাকে, তিনি সূর্য দত্ত। সেই বালক সূর্য, সেই কিশোর অভিনেতা সূর্য একেবারে প্রথমেই কেশব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ত্রিশঙ্কু' পালায় 'রামরূপ' চরিত্র চিত্রণে প্রথমেই দর্শক মনে গভীর দাগ টেনে দিয়েছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই দল পরিচালনার দায়িত্ব পান সূর্যবাবু। পাকিস্তানে নট্ট কোম্পানির যশ আর খ্যাতি দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়েছিল সূর্যবাবুর দল পরিচালনার দায়িত্ব নেবার পরই। অসামান্য অভিনয়, দক্ষ পরিচালনায় নট্ট কোম্পানির ধ্রুব, পৃথ্বীরাজ, প্রতিশোধ, লোহার জাল পরশমনি ইত্যাদি পালা শুধু আলোড়নই তোলেনি, প্রতিটি পালাই হয়েছিল সুপারহিট। সূর্য দত্ত যে যুগে অভিনেতা হিসেবে মধ্যাহ্ন গগনের সূর্য তখন মেক-আপ নিতে হত খড়ি দিয়ে। সূর্য দত্ত নানা ভাবে চেষ্টা করেছিলেন মেক-আপ মেটিরিয়াল আধুনিকীকরণের। দর্শক কী ধরনের পালা পেলে খুশি হবে, ব্যবসায়িক সাফল্য এনে দেবে তা তিনি এত বেশি বুঝতেন যে প্রত্যেক পালাকারকেই বসতে হতো সূর্য দত্তের সঙ্গে পালা নিয়ে আলোচনা করতে। প্রয়োজন অনুসারে শ্রীদত্তই পালা সংশোধন-সংযোজন করে দিতেন।

সূর্য দত্ত প্রসঙ্গে ছোট ফণিবাবু একবার বলেছিলেন—"ওঁর দোর্দণ্ড প্রতাপের সঙ্গে ছিল স্নেহের রসধারা। অভিনেতাদের প্রতি ছিল তীক্ষ্ম দৃষ্টি, কোমলে-কঠিনে মেশানো এক অদ্ভুত মানুষ ছিলেন সূর্য বাবু। তিনি যখন কমিক অভিনেতা হিসেবে আসরে নামতেন দর্শকের মন মুহূর্তে গলিয়ে দেবার জন্য একটা রসগোল্লা প্রায় ৩০ হাত উপরে ছুঁড়ে দিয়ে হাঁ করে সেই রসগোল্লা মুখে পুরে নিতেন। সূর্য দত্ত নিজেই ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। নট্ট কোম্পানির আর এক নাম সূর্য দত্ত এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না।"

সূর্য দত্ত কথা বলতে বলতে ঝুল ঝুল করা চামড়ার কোটরে বিন্দুর মত দুটো চোখ দিয়ে জলের ধারা নামছিল আর সূর্যবাবু কাঁপা কাঁপা হাতে সেই জল মুছছিলেন। ক্ষীণ স্বরে কথা

বলছিলেন থেমে থেমে। বুঝতে বাকি থাকে না, জীবনের অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত নট্ট কোম্পানির ভাবনা তাঁকে ভর করে রেখেছিল। আমার একটি প্রশ্নের উত্তরে সূর্যবাবু বলেছিলেন,—'লোহার জাল' পালায় নীলমণি ঘটক চরিত্রে তাঁর অভিনয় শ্রেষ্ঠ। সূর্যবাবুর শেষ অভিনয় 'বিদ্যাসাগর' পালায়।

১৯৭৬ সাল সূর্য দত্তকে অকাদেমী পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। ১৯৭৭ সালের ২৩ এপ্রিল হাবড়ার বাসভবনেই ১০৩ বছর বয়সে এই কর্মবীরের মৃত্যু হয়।

সূর্য দত্ত প্রসঙ্গে পালা সম্রাট ব্রজেন দে অনেকবারই অনেক কথা বলেছিলেন। সুযোগ পেলেই 'পালাসম্রাট' অনেক প্রবন্ধের ভিতর দিয়ে অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ নিতে ভুলতেন না। ব্রজেন দে লিখছেন ঃ

"...বস্তুত ত্রিশ দশক পর্যন্ত হাস্যরস বলতে ভাঁড়ামিই ছিল শতকরা নব্বুই ভাগ। যে জন্য যাত্রাকে আজও অবজ্ঞা সইতে হয়। আধুনিক যুগে যাত্রার মার্জিত হাস্যরস পরিবেশনের চেষ্টা হয়েছে। কাজটি বড় সহজ ছিল না। ভাঁড়ামি থেকে Satire, with humour নিয়ে আসা এবং মেঠো আসরে পরিবেশন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল। এ কাজে সব চেয়ে অগ্রণী ছিলেন যাত্রা জগতের গুরুমশাই সূর্য দত্ত। রসের ভান্ডারী এই মানুষটি যখন যে চরিত্রে অভিনয় করেছেন, তখনই সে চরিত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন।...বড় অভিনেতা ত অনেকেই হন, বড় অভিনেতার স্রষ্টা ক'জন হতে পারেন? সূর্যবাবু ছিলেন বহু বিশিষ্ট শিল্পীর উৎসাহদাতা, কোন কোন ক্ষেত্রে জন্মদাতা।

পঞ্চু সেন গণেশ অপেরায় ধুলোখেলা করছিলেন, সূর্যবাবু তাঁকে 'চাঁদের মেয়ে' পালায় ঈশা খাঁ চরিত্রে অভিনয় করালেন। গোটা যাত্রা জগৎ চিনল পঞ্চু সেনকে।...হাল আমলে 'পতিতের ভগবান'-এ বাচ্চা ছেলে বিমলকে দিয়ে দাশরথির চরিত্রে কি অভিনয়টাই তিনি করিয়ে নিয়েছিলেন!...সুজিত পাঠক যেদিন ইসলাম খাঁ, জাহান্দার শাহ সাজলেন সেই দিন জানা গিয়েছিল তাঁর মধ্যে কতখানি প্রতিভা সুপ্ত ছিল। অরুণ দাশগুপ্ত, শেখর গাঙ্গুলী, মনোজকুমারকে প্রধান ভূমিকায় নিযে এসে ছাইচাপা বারুদে অগ্নি সংযোগ করেছিলেন এই সূর্যবাবুই।...অন্যের কথা বাদ দিয়ে আমার কথাই বলি। সংক্ষিপ্ত সংলাপে রচিত পালা (চাঁদের মেয়ে) যখন বহু দলই ফেরৎ দিলে, তখন আমি হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। সূর্যবাবুই 'চাঁদের মেয়ে' পালাকে লোকচক্ষে তুলে ধরেন। 'পতিতের ভগবান' পালায় অতি ক্ষুদ্র 'ভজা' চরিত্রে দু'বার মাত্র আসরে এসে গোটা আসরকে হাসির ফোয়ারায় স্নান করিয়ে দিতেন। এই সূর্যবাবুর "নীলমণি ঘটক", "ভোলানাথ", চরিত্র চিত্রণ কেউ বিস্মৃত হবে না কোনদিন।...নট্ট কোম্পানিতে আমার লেখা যাত্রাপালাগুলি প্রায় সবই যে হিট করত তার মূলে ছিল সুনিপুণ সম্পাদনা ও নির্দেশনা, যে কাজটি একেবারে আধুনিক কালেও করেছেন সূর্য দত্ত। এই গায়ক, বাদক, নর্তক, নির্দেশক, অভিনেতা, গীতিকার, সুরস্রষ্টা, দল পরিচালকের কথা বলতে গেলে রাত ভোর হয়ে যাবে, পাঁচশো পাতাতেও কুলোবে না!..."

১৯৭৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর প্রথম যাত্রা উৎসব বা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান করে। এই অনুষ্ঠান নট্ট কোম্পানির ম্যানেজার সূর্যকুমার দত্তকে সংবর্ধনা জানানো হয়। বিচারকমন্ডলীতে ছিলেন প্রাচীন যাত্রা অভিনেতা সুরেন মুখোপাধ্যায়। আর উপদেষ্টা মণ্ডলীর অন্যতম ছিলেন ব্রজেন্দ্রকুমার দে।

এবার মাখনলাল নট্টকে নিয়ে কিছু বলা দরকার।

আমার সঙ্গে দ্বিতীয় দেখা 'নটী বিনোদিনী' পালা আসরে হাজির হওয়ার সূচনায়। সূর্য দত্তের মৃত্যুর পর মাখনবাবুর সঙ্গে যে দেখা, সেটা ছিল প্রকৃত পক্ষে তৃতীয় সাক্ষাৎকার।

মাখনবাবুর জীবন যাত্রা ছিল বরাবরই সাধারণ। প্রতিমুহূর্তে নট্ট কোম্পানির স্বার্থ রক্ষার চিন্তা ছাড়া ব্যক্তিগত কোন সুখের কথা মনে জাগেনি তাঁর। একমাত্র ইষ্টবেঙ্গলের খেলা থাকলে

মাখনবাবুকে কোন ভাবেই ধরে রাখা যেত না একদিন ; বোধ করি এই মুহূর্তে সেই উম্মাদনাটুকুও বিসর্জিত হয়েছে।

আত্মপ্রচার তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। একবার কারও ওপর কোন দায়িত্ব অর্পণ করলে পারত পক্ষে তার স্বাধীনতায় যেমন হস্তক্ষেপ করতেন না, তেমনি কে কোথায় তাঁকে কতটা বিপথগামী করছে সেদিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকত তাঁর। কোন পুরস্কার, মানপত্র কোন মঞ্চে দাঁড়িয়ে গ্রহণ করার আগ্রহ দেখিনি কখনও। নট্ট কোম্পানির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে চলে যাওয়া অনেক শিল্পী-কর্মীর বাড়িতে আজও বিশেষ বিশেষ ক্ষণে নিজেই চলে যান প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখার বাসনায়। নট্ট কোম্পানি বা প্রযোজক মাখনবাবুর মনে শ্রেষ্ঠত্বের আসন ছিনিয়ে নেবার জেদ বরাবরের। আর সেই জেদে বিজ্ঞাপনের প্রতিযোগিতায়, চলচ্চিত্র থেকে মণি-মাণিক্য এনে আসরে ছেড়ে দেওয়া, বিবিধ ভারতীতে দীর্ঘ সময় ধরে বিজ্ঞাপন প্রচার করা, আকাশবাণী কলকাতার 'ক' বিভাগে, সান্ধ্য সংবাদের আগে বিশেষ বিজ্ঞাপন প্রচার করা, আসরে পালার প্রয়োজনে আলোর প্রয়োগ দেখিয়ে মানুষের মনকে দলিত-মথিত করে দেওয়া, তাপস সেন থেকে বাছাই করা টেকনিসিয়ান আমদানি করে পালায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা, শিল্পীদের কস্‌টিউমস্-এর ক্ষেত্রে দরাজ হাতে ব্যয় করা, পালায় কোন চরিত্রের চাহিদা অনুসারে শত শত টাকার তাজা ফুলের মালা প্রতিটি আসরে সাপ্লাই করা, স্টার থিয়েটার, কলামন্দিরের মত উচ্চাঙ্গের প্রেক্ষাগৃহ মাসের পর মাস ভাড়া নিয়ে পালার রিহার্সাল চালানো, প্রতি মরশুমে শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রীকে দিয়ে কয়েক সহস্র টাকার স্টিল ফটো তোলানো, বিদেশ থেকে কয়েক লক্ষ টাকার আধুনিক ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি আমদানি করা, শিল্পী ও কর্মী এবং সাজসরঞ্জামের জন্য লাকসারী বাসের পিছনে ৫।৬ প্রাইভেট কার জুড়ে 'নট্ট কনভয়' তৈরি করা, শিল্পী-কর্মী এমন কি অতিথি অভ্যাগতদের খাওয়াবার ব্যাপারে উদার চিত্তের পরিচয় দেওয়া, মাখনবাবুর আভিজাত্য। নতুন কিছু করার পরামর্শে অকাতরে অর্থব্যয় করে পরিশেষে কোন কোন পরামর্শদাতাদেরই অকর্মণ্যতার শিকার হয়েছেন তিনি। প্রকাশক হিসেবে মাখনবাবুকে আসরে নামিয়ে দেবার চেষ্টা ছিল কারও কারও। বাজারে বই প্রকাশিত হবার আগে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় বহু অর্থ ঢেলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছিল। মাখনবাবুর মাতৃদেবীর নামে প্রকাশনা সংস্থার নামকরণ থেকে, প্রেস পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে পরামর্শদাতা শেষ পর্যন্ত মূষিক প্রসব করেছিলেন। এর ফলে মাখনবাবুর বিশ্বাসের অপমৃত্যু হয়েছিল। অপচয় হয়েছিল বহুঅর্থ।

তবুও নট্ট কোম্পানি উত্তোরত্তর শ্রেষ্ঠ আসনই লাভ করেছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত প্রথম প্রবর্তিত পুরস্কার, শ্রেষ্ঠ নায়িকার সম্মান প্রথম অর্জন করেছিলেন নট্ট কোম্পানির নায়িকা বীণা দাশগুপ্তা! এ দেশের সংবাদপত্রে কালার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করার রেওয়াজ চালু হতে নট্ট কোম্পানিই প্রথম কালার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করার গৌরব অর্জন করেছিল। স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় দিল্লী এডিশনে পূর্ণ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করার প্রথম গৌরব মাখনবাবুর! মহাজাতি সদনে জনসাধারণের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ঠান্ডা জলের বৃহৎ মেশিন বসানো নট্ট কোম্পানির অবদান, যাত্রা জগতের গৌরব। মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলেও উদার হাতে টাকা দান করে নিজেকে ধন্য করেছেন মাখনবাবু। এছাড়াও আছে অনেক অবদান।

১৯৩৯ সালে বরিশালের মাচরং গ্রামে বর্ধিষ্ণু নট্ট পরিবারে যোগেন্দ্রলাল নট্টের ছেলে মাখনলাল নট্টের জন্ম। মা হেমলতা দেবী। ১৯৪৮ সালে বানুরিপাড়া হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে মাখনবাবু প্রথমে কলকাতার সিটি, কলেজে পরে বঙ্গবাসী কলেজে পড়েন। অসম্ভব মেধাবী ছাত্র হিসেবে মাখনবাবু ছিলেন সকলের প্রিয়। ভাগ্য বিড়ম্বনার জন্য একান্ত বাধ্য হয়ে ১৯৫০ সালে মাখনবাবুকে তাঁদের পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠানের হাল ধরতে হয়। ক্যানসার রোগের শিকার হয়ে বাবা যোগেন্দ্রলালের আকস্মিক মৃত্যুর পর, মাখনবাবুই হন কাণ্ডারী। এই সময়েও সূর্য দত্ত ছিলেন নট্ট

কোম্পানির প্রাণ স্বরূপ, সুতরাং যাত্রাদলের হাল ধরতে সূর্য দত্তের শিক্ষা ও সান্নিধ্য দুই-ই মাখনবাবুর ভিত্ কে শক্ত করেছিল!

১৯৬৯ সালে মাখনবাবু বৈকুণ্ঠ নট্টের স্মৃতিপূজার জন্য তৈরি করেন 'বৈকুণ্ঠ যাত্রা সমাজ'।

নট্ট কোম্পানি নতুন কোন পালা খুললে কলকাতার মত শহরে মাত্র এক থেকে দেড় ঘণ্টার মধ্যে স্টার বা কলামন্দিরে হাউসফুল বোর্ড ঝুলে যাওয়া একটা রেকর্ড যা আজও ভাঙতে পারেনি কেউ।

"মাচরং বৈকুণ্ঠ সঙ্গীত সমাজের" প্রথম ১৪ বছরে অভিনীত পালাগুলির নাম ঃ

শ্রীকৃষ্ণ, শৈশব সাধনা, প্রহ্লাদ চরিত্র, সুরথ উদ্ধার, খনা, দাক্ষিণাত্য, মান্ধাতা, আদিসুর, কুশধ্বজ, মানিকমালা, গীতগোবিন্দ, রক্ততিলক, আকালের দেশ, সমাজের বলি, নাটক নয়, চাঁদের মেয়ে, সাপুড়ের মেয়ে, সংজ্ঞার স্বয়ম্বর, চিতোরলক্ষ্মী, অদৃষ্ট, অনন্ত মাহাত্ম্য, বাচস্পতি, গন্ধেশ্বরী, নরকাসুর, পঞ্চরাত্র, সম্বরাসুর, জগদ্ধাত্রী, গয়াসুর, শ্রীবৎস চিন্তা, লক্ষ্মণ বর্জন, মরু ও-যজ্ঞ, বীরপূজা, বিজয় বসন্ত প্রভৃতি।

১৯৫২ সালে মাখনলাল নট্ট দলের সত্বাধিকারী হবার পর থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত কোন পালাকারের কোন পালা কোন সালে অভিনীত রয়েছে তার তালিকা দেওয়া হলো ঃ

১৯৫২।। গন্ধর্বের মেয়ে ঃ ব্রজেন্দ্রকুমার দে / রাজা সুরথ ঃ অহিভূষণ ভট্টাচার্য / ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ।

১৯৫৩।। প্রতিশোধ ঃ ব্রজেন্দ্রকুমার দে / জয় যাত্রা ঃ জিতেন বসাক।

১৯৫৪।। পরশমণি, কোহিনূর ঃ ব্রজেন্দ্রকুমার দে

১৯৫৫।। কুরুক্ষেত্রের আগে ঃ ব্রজেন্দ্রকুমার দে

১৯৫৬।। শেষ আরতি (রবীন্দ্রনাথের 'পূজারিণী' কাব্য অবলম্বনে) ঃ ব্রজেন্দ্রকুমার দে

১৯৫৭।। সত্যাশ্রয়ী ঃ ব্রজেন্দ্রকুমার দে / রাজা পরীক্ষিৎ ঃ নন্দগোপাল রায়চৌধুরী

১৯৫৮।। প্রায়শ্চিত্ত ঃ নন্দগোপাল রায়চৌধুরী

১৯৫৯।। রাজা দেবীদাস / বাঘিনীর দেশ ঃ ব্রজেন্দ্রকুমার দে

১৯৬০।। লোহার জাল ঃ ব্রজেন্দ্রকুমার দে

১৯৬১।। সম্রাট জাহান্দার শাহ ঃ ব্রজেন্দ্রকুমার দে / কৃষ্ণকালিন্দী ঃ জিতেন বসাক

১৯৬২।। পতিতের ভগবান, প্লাবন ঃ ব্রজেন্দ্রকুমার দে

১৯৬৩।। সোনার ভারত ঃ ব্রজেন্দ্রকুমার দে

১৯৬৪।। চিতোর লক্ষ্মী ঃ ব্রজেন্দ্রকুমার দে

১৯৬৫।। চাঁদবিবি, বিল্বমঙ্গল ঃ ব্রজেন্দ্রকুমার দে

১৯৬৬।। ভারতবিদায় (পরে 'মহীয়সী কৈকেয়ী' নামে অভিনীত), ময়ূর সিংহাসন ঃ ব্রজেন্দ্রকুমার দে

১৯৬৭।। সুলতানা রিজিয়া, দুধসায়রের দেশে ঃ ব্রজেন্দ্রকুমার দে / বন্দিনী ঃ মহেন্দ্র গুপ্ত

১৯৬৮।। বিদ্যাসাগর ঃ ব্রজেন্দ্রকুমার দে / সিংহগড় / দাদাঠাকুর ঃ মহেন্দ্র গুপ্ত

১৯৬৯।। বিন্দুর ছেলে (শরৎ কাহিনীর পালারূপ), ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদামনি ঃ ব্রজেন্দ্রকুমার দে / রাজা কংস ঃ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

১৯৭০।। চন্দ্রনাথ (শরৎ কাহিনীর পালারূপ) ঃ সত্যপ্রকাশ দত্ত / নবাবী পাঞ্জা ঃ দেবেন্দ্রনাথ

১৯৭১।। গঙ্গা থেকে বুড়িগঙ্গা ঃ শান্তিরঞ্জন দে / লালন ফকির ঃ দেবেন্দ্রনাথ

১৯৭২।। আঁধারের মুসাফির / কৃষ্ণ শকুনি ঃ ব্রজেন্দ্রকুমার দে

১৯৭৩।। নটী বিনোদিনী, / পাহাড়ের চোখে জল ঃ ব্রজেন্দ্রকুমার দে

১৯৭৪।। ভারত পথিক রামমোহন ঃ ব্রজেন্দ্রকুমার দে / মা-মাটি-মানুষ ঃ ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় / পান্না বেগম ঃ আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৭৫।। নন্দকুমারের ফাঁসি ঃ ব্রজেন্দ্রকুমার দে / মেহেরুন্নেসা ঃ ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়

[৬ নভেম্বর '৭৬ আনন্দবাজার পত্রিকায় নট্ট কোম্পানি প্রদত্ত পূর্ণ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন থেকে সূত্রধার-এর সংকলন।]

অভিনন্দন ।। নট্ট কোম্পানির বিভিন্ন পালা দেখেছেন এ দেশের স্বনামধন্য সাহিত্যিক, শিল্পী, খেলোয়াড়, বুদ্ধিজীবিরা। এঁদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজনের নাম ঃ কংগ্রেস সভাপতি দেবকান্ত বড়ুয়া, শ্রীমতী বড়ুয়া, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এম. পি. শ্রীমতী মায়া রায়, চিত্র পরিচালক সুশীল মজুমদার, সাহিত্যিক বনফুল, সন্তোষকুমার ঘোষ, প্রাক্তন তথ্যমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, সাংবাদিক মনুজেন্দ্র ভঞ্জ আরও অনেকে।

১৯৭৩ সনে পঃ বঃ সরকার কর্তৃক 'নটী বিনোদিনী' পালা শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা, শ্রেষ্ঠ পালা, শ্রেষ্ঠ নির্দেশনা, শ্রেষ্ঠ অভিনয় ইত্যাদি একাধিক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পায়।

১৯৭৬ সালে 'বিদ্যাসাগর' পঃ বঃ সরকার কর্তৃক শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার পুরস্কার পায়।

• নটী বিনোদিনী' পালার লং প্লেয়িং রেকর্ড প্রকাশিত হলে, প্রযোজক মাখনলাল নট্ট কংগ্রেস সভাপতিকে আনুষ্ঠানিকভাবে রেকর্ড উপহার দেন।

॥ গৌরচন্দ্র দাস ॥

একদিন গ্রাম বাংলার অনেক মায়ের চোখে এই যাত্রা ছিল সর্বগ্রাসী একটা চরিত্র। যাত্রা তার জাদুমন্ত্রে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিত ছোট ছোট ছেলেদের। ঠিক সেই রকমই মাত্র আট-ন' বছর বয়সে এই যাত্রারই সর্বনাশা ভালবাসার হাতছানিতে, এক রকম বাড়ি থেকে পালিয়েই এসেছিলেন গৌর দাস। যোগ দিয়েছিলেন মতিলাল রায়ের দলের ছোকরা সখীর ব্যাচে। এক টানা পাঁচ বছর এই দলে কাটিয়ে যৌবনের প্রথম দূত গৌরদাস নবদ্বীপে গিয়ে হাজির। দেখা করেছিলেন একাধিক নাট্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এবার সত্যম্বরবাবু তাঁকে নারী চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ দেন। গৌর দাস তাঁর সততা, একনিষ্ঠতায় সত্যম্বরবাবুর হৃদয় জয় করে বসেছিলেন। এই সময়ে গৌর দাস ২১ বছরের যুবক। এক সময়ে সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়ের সব কিছু ক্রোক হয়ে যায়। সত্যম্বর অপেরার গুরু দায়িত্ব নেবার পর থেকে ওঁর অভিনয় জীবন ধীরে ধীরে মুছে যায়। নিতান্ত বালক বয়স থেকে যাত্রা দলের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে থাকার জন্য, দল তৈরি ও দল চালানোর ব্যাপারে তিনি যেমন দক্ষ ছিলেন, তেমনি দক্ষ অভিনেতা ছিলেন বলে মনের মত অভিনেতা তৈরি করার ক্ষেত্রে গৌর দাসের ক্ষমতা ছিল প্রবল। তাই আজকের বহু খ্যাতিমান অভিনেতা গৌর দাসের তালিম পেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত। এই গৌর দাসই যাত্রা শিল্পীদের পেনশন দেবার প্রথা চালু করেছিলেন। যদিও পরবর্তী সময়ের যে যাত্রা জগত সেখানকার পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতাবাদে বহু জিনিসের মত এই পেনশন দেবার প্রথাও বিনষ্ট হয়। গৌর দাস যেমন বহু পালাকারের স্রষ্টা, তেমনি বহু পালার ঐতিহাসিক জনপ্রিয়তা অর্জনের পিছনে তাঁর দানই সত্য। যেমন 'সোনাই দীঘি' পালা। যে পালার জনপ্রিয়তার ইতিহাস এ দেশের যাত্রামোদীরা বিস্মৃত হবে না কোন দিনও। গৌর দাস তাঁর জীবদ্দশায় শিক্ষিত জামাতা শৈলেন মোহান্তর ওপরেই সত্যম্বর অপেরা শুধু নয়, তার ঐতিহ্যরক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করে যান।

১৯৮৭ সালে, ৮৭ বছর বয়সে গৌর দাসের স্ত্রী নন্দরাণী দাস মারা যান। নন্দরাণী ছিলেন সত্যম্বর অপেরার প্রাণপুরুষ স্বামী গৌর দাসের অনেক শ্রম, সাধনা আর যাত্রার প্রতি গভীর যে শ্রদ্ধা তার একমাত্র সাক্ষী। গৌর দাস ও নন্দরাণীর কন্যা কমলা মহান্তর স্বামী শৈলেন মহান্ত।

॥ রঞ্জন অপেরা (বর্তমানে নব রঞ্জন অপেরা) এবং তৎকালীন বীরভূমের পটভূমিকা ॥

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর থেকেই মূলত যাত্রা আন্দোলনের জোয়ার আসে! সামাজিক ও কাল্পনিক পালা রচনা ও উপস্থাপনার মহাযজ্ঞের সূত্রপাত পঞ্চাশের দশক থেকে। ১৯৫০ সালে কানাইলাল শীলের "দেশের দাবী" পালাটি গণ আন্দোলনের সূচনা পর্বের প্রথম সামাজিক পালা। এই পালায় কানাইলাল প্রথম শোষণ, পীড়ন, মুনাফাখোর, মজুতদার, কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির পটভূমিকার ইতিবৃত্ত স্পষ্ট করে তোলেন। পালাটি প্রথম আসরস্থ করে 'রঞ্জন অপেরা'। রঞ্জন অপেরা প্রসঙ্গে বিস্তারিত লেখা যাক।

অরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, বীরভূম জেলার নলহাটী থেকে প্রকাশিত 'কোরাস' পত্রিকার বইমেলা সংখ্যায় (জানু) মনিরুল হক বুলবুলের লেখা থেকে এই নবরঞ্জন অপেরা প্রসঙ্গ উল্লেখ করছি—

"...বীরভূমে সম্ভবতঃ যাত্রাপালার সূচনা ১১০০ বঙ্গাব্দে। শিশুরামের শিষ্য পরমানন্দ অধিকারীও ছিলেন বীরভূমের রামবাটীর অধিবাসী। ইনি মারা যান সম্ভবতঃ ১২৩০ বঙ্গাব্দ। কেন্দুলীর নিকট ধরণী গ্রামের কবি স্বর্গত নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়েরও কৃষ্ণ যাত্রার দল ছিল। কালীয়দমন যাত্রায় নীলকণ্ঠ যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। নীলকণ্ঠ জীবিত ছিলেন ১৩১৮ সাল পর্যন্ত। এখান থেকেই বীরভূমের যাত্রাপালা শুরু। এরপর পেশাদার ও সৌখিন সম্প্রদায় কর্তৃক বীরভূমে যাত্রাগান চলে আসছে।...এর মধ্যে হেতেমপুরের রঞ্জন অপেরা সৌখিন সম্প্রদায় হিসেবে যাত্রা শুরু করে।

হেতেমপুরের রাজা কমলানিরঞ্জন চক্রবর্তী ১৩৩২ সনে এই সৌখিন যাত্রাদল তৈরি করেছিলেন। কমলানিরঞ্জন চক্রবর্তীর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে বিশ্বরঞ্জন চক্রবর্তী দল চালান এবং বীরভূমের নামী-দামী ও কলকাতার বিশিষ্ট অভিনেতাদের নিয়ে বিশ্বরঞ্জন 'রঞ্জন অপেরা'কে পেশাদার দলে পরিণত করেছিলেন। রঞ্জন অপেরার প্রথম পালা "মায়াচক্র" ছিল ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদের।

মনিরুল হক বুলবুল বলেছেন—"পেশাদারী হিসেবে প্রথম এই পালা অভিনীত হয় হেতেমপুরে, ১৩৪৩ সালে। সারা বাংলা শিক্ষক সম্মেলন উপলক্ষ্যে। এই সম্মেলন উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালিন মন্ত্রী জনাব ফজলুল হক সাহেব। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন নৃত্যে অমলাশঙ্কর, সাঁতারে প্রফুল্ল ঘোষ, ম্যাজিকে পি. সি. সরকার প্রমুখ।..."

হেতেমপুরে পেশাদার দৃষ্টিকোণ থেকে যখন এই পালাগান ও দলের সাফল্য এল তখনই ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ চাইলেন দলটিকে কলকাতায় নিয়ে যেতে। তাঁরই নির্দেশে ১৯৪৭ সালে রঞ্জন অপেরার সদর দপ্তর খোলা হয়েছিল কলকাতায়। দলে তখন শিল্পী ও কর্মীর সংখ্যা ছিল ৪০-৪৫ জন। তার মধ্যে ৩০-৩৫ জনই ছিলেন বীরভূমের অধিবাসী।

মনিরুলের তথ্য থেকে জানা যায়—"বিভিন্ন সময়ে এই দলে যাঁরা অভিনয় করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—হরেন বিদ (নানু) কেষ্ট ভুঁই (বোলপুর), ফণিভূষণ, ফণিভূষণ মতিলাল, গায়ক বিনোদবিহারী ধাড়া (আজকের গুরুদাস ধাড়ার বাবা), ভোলা পাল, পঞ্চু সেন, পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, মাখন সমাদ্দার। নারী চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করতেন তাঁরা হলেন—হরিপদ রানী, নিতাইরানী, শিবরানী, বলাই মুখার্জী (হেতেমপুর)। রঞ্জন অপেরায় যে পালাগুলি অভিনীত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, 'মায়াচক্র' 'মহিষাসুর', 'পলাশীর পরে', 'প্রবীরার্জ্জুন', 'রাজ নন্দিনী'।"

এই তো কিছুকাল আগেও জীবিকার তাগিদে একটা পানের দোকান করে সেখানে বসে পান বিক্রি করেছেন রঞ্জন অপেরার অবসরপ্রাপ্ত শিল্পী দেবীপ্রসাদ আচার্য। শ্রীআচার্য হেতেমপুরের

বাসিন্দা ছিলেন। দেবীপ্রসাদ তাঁর যাত্রা জীবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে যে সহশিল্পী বন্ধুদের কথা বার বার উল্লেখ করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—ঃ ধীরেন্দ্রনাথ দাস (ইনি মুলত গায়ক ছিলেন। ইনিই অভিনেতা অনুপকুমারের বাবা), বিজন মুখার্জী, অজিত দাস, সরোজ চ্যাটার্জী, ছবিরানী, সত্য অধিকারী, গুরুদাস ধাড়া, বিজয় ভদ্র। রঞ্জন অপেরা ভেঙে যাবার পর দেবীপ্রসাদ বেশ কিছুকাল বিভিন্ন পেশাদার গোষ্ঠীতে অভিনয় করেছিলেন। রঞ্জন অপেরার শেষ অবদান 'চক্রছায়া'ও শেষ বারের মত হয় হেতেমপুরেই।

বিশ্বরঞ্জন চক্রবর্তী মারা যাবার পর রঞ্জন অপেরার দায়িত্বভার তাঁর ছেলে রেবতীরঞ্জন চক্রবর্তী নিতে রাজি না হবার জন্য ১৯৫৪ সালে দল ভেঙে যায়। রঞ্জন অপেরার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল অবিভক্ত বঙ্গদেশের সর্বত্র। যে সব জায়গায় রঞ্জন অপেরা পালা আসরস্থ করে জনমন জয় করেছিল সেই জায়গাগুলি হলো—যশোর, খুলনা, পার্বতীপুর, ঢাকা, রংপুর, বিহার, ঝরিয়া, ধানবাদ, দিনাজপুর, শিলিগুড়ি, আসাম, মুঙ্গের, জামালপুর।

আজকের যাত্রাজগতের অন্যতম এক শক্তিমান শিল্পী অনাদি চক্রবর্তী হেতেমপুরের ছেলে, তাঁর অভিনয় জীবন শুরু হয়েছিল রঞ্জন অপেরা থেকেই!

* ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা' বইতে হেতেমপুরের রাজার নাম "রামরঞ্জন চক্রবর্তী" বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু স্থানীয় বেশ কিছু সংস্কৃতিমনা মানুষ এবং স্বয়ং দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী ও অনাদি চক্রবর্তীর উক্তি থেকে অনায়াসেই বলা যায়, হেতেমপুরের রাজার নাম কমলানিরঞ্জন চক্রবর্তী। ডঃ গৌরীশঙ্কর রঞ্জন অপেরায় অভিনীত আরও কিছু পালার নাম উল্লেখ করেছেন। যথা ঃ কানাইলাল শীলের 'দলমাদল', 'দেশের দাবী', সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'ব্যথার পূজা', 'রক্ত বীজ', 'চক্রছায়া', 'আত্মাহুতি', পূর্ণচন্দ্র দাসের 'স্বপ্ন সাধনা', জিতেন বসাকের 'রক্তের লেখা' ইত্যাদি। এই দলে বিনোদ ধাড়া ছাড়াও আর একজন গায়ক ছিলেন বলে জানা যায়, তিনি হাওড়ার আমতার সত্যবরণ অধিকারী।

যা হোক, রাজাদের উত্তরাধিকারেরা যখন দলের কোন দায়িত্ব নিতে চাইলেন না, তখন শিল্পী কর্মীরা বিশেষ করে পঞ্চু সেন, এবং আরও অনেকে রঞ্জনকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত আর্থিক অনটনের জন্য যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছিল না। এই সময়ে এগিয়ে এলেন জীবনকৃষ্ণ দাস।

॥ নব রঞ্জন অপেরার জন্ম ॥

রঞ্জন অপেরা বন্ধ হয়ে যাবার কিছুদিনের মধ্যে জীবনকৃষ্ণ দাস দলের যাবতীয় এস্টেটপত্র কিনে ১১৭, রবীন্দ্র সরণিতে নতুন করে দল সাজান। দলের গুড উইলকে ধরে রাখার জন্য জীবনকৃষ্ণ দাস নাম রাখেন 'নব রঞ্জন অপেরা'। দলের পরিচালক নিযুক্ত হন শম্ভুনাথ ঘোষ। ইতিমধ্যে অনেকে দল ছেড়েছিলেন, আবার অনেকেই এলেন নতুন করে। যেমন শম্ভু ঘোষ, ছবিরানী, বিনোদ ধাড়া ইত্যাদি। ১৯৪৮ সালে রঞ্জন থেকে নব রঞ্জনে রূপান্তরিত হয় এই দল। সেই রূপান্তরের কাহিনী বিস্তারিত ভাবে প্রথম প্রকাশিত হয় আমারই সম্পাদিত 'আবীর' পত্রিকায় ১৯৬৫ সালের ২০ আগষ্টের 'যাত্রা শিল্প সংখ্যা'য়। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা দরকার, এখন যেমন অনেক পত্র পত্রিকা বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী বা শিল্পের ওপর হামেশাই সাপ্লিমেণ্ট বা ক্রোড়পত্র বা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে থাকেন, যাত্রার ওপরে তেমনি প্রথম ক্রোড়পত্র প্রকাশ করি আমি। এরপর প্রভূত অর্থ ব্যয়ে যাত্রার ওপরে দুটি বিশাল বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে 'প্রসাদ পত্রিকা'।

॥ জীবনকৃষ্ণ দাস ও নব রঞ্জন অপেরা ॥

১৯০৮ সালে উত্তর কলকাতার গোয়াবাগান স্ট্রীটে জীবনকৃষ্ণ দাসের জন্ম। এই পরিবারের কেউ কখনই যাত্রার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। ছিলেন শিল্প রসিক। জীবনবাবুর বাবা স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র

দাস ছিলেন বিখ্যাত বেহালা বাদক। আঙুলে যেন তাঁর জাদু ছিল। যাত্রার আসরে বসে অভিনয় দেখতেন। অভিনয় ভালবাসতেন শরৎবাবু। যাত্রার দল গড়ার স্বপ্ন ছিল না তাঁর।

ছাত্র জীবন বেশি দিনের জন্য এগুতে পারেনি জীবনবাবুর। পড়া ছেড়ে ব্যবসা শুরু করেছিলেন। ব্যবসায় যখন প্রতিষ্ঠিত তখন তাঁকে যাত্রার দল তৈরি করার জন্য উৎসাহিত করেন যাত্রার স্বনামখ্যাত অভিনেতা পঞ্চু সেন ও শরৎ মুখার্জী।

হুগলী জেলার হেতেমপুরের রাজাবাবুদের সখের যাত্রা দল বন্ধ হয়ে গেলে, সেই 'রঞ্জন' অপেরাকে নতুন করে বাঁচাতে, নতুন করে গড়তে পঞ্চুবাবু তখন বদ্ধপরিকর। এই সূত্রে রঙমহল থিয়েটারের শরৎ মুখার্জীর সহযোগিতায় জীবন দাসের সঙ্গে পরিচয় হতে পঞ্চু সেন 'রঞ্জন'কে নতুন করে গড়ার জন্য আর্থিক সাহায্য চাইলেন। জীবনকৃষ্ণ সহজেই এগিয়ে এলেন। গড়লেন কলকাতার চিৎপুরের অন্ধকারাবৃত সেদিনকার যাত্রা পাড়ায় 'নব রঞ্জন অপেরা'। অল্প দিনের মধ্যে 'নব রঞ্জন' ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করল! জীবনকৃষ্ণ দাসও যাত্রা জগতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন গভীরভাবে। যাত্রা পাড়ায় যা হয় তাই হোল। যেহেতু জীবনবাবু যাত্রা ব্যবসায় সুপ্রতিষ্ঠিত, সেই হেতু যাত্রা জগতের বিভিন্ন মানুষ তাঁকে নানা ভাবে কাজে লাগাতে লাগল। বিশেষ করে আর্থিক সাহায্য নিতে থাকলেন অনেকে। এরপর একদিন এই ভাবেই জীবনবাবু জড়িয়ে পড়েছিলেন 'জনতা অপেরা'র সঙ্গে।

জীবনবাবুর ক্লান্ত-কর্মময় জীবন থেকে অবসরের প্রয়োজন বলে অত্যন্ত স্নেহের এবং চরম বিশ্বাসী শম্ভু ঘোষের উপর দলের সব দায়িত্ব তুলে দিলেন। ওদিকে জনতা অপেরার দায়িত্বভার তুলে নিলেন লালমোহন দাস! শম্ভু ঘোষ এই নব রঞ্জনের খ্যাতি ও মর্যাদা চরম বৃদ্ধি করে মারা যান। এই প্রগতিশীল দলটি যাতে পূর্ণ মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে সেই জন্য, খ্যাতিমান অভিনেতা 'তপনকুমার' নবরঞ্জনের নিশান ধরলেন শক্ত করে। আজও সেই নিশান সমান-মর্যাদার সঙ্গে ধরে রেখেছেন!

মনে রাখতে হবে, বীরভূমের 'কোরাস' পত্রিকা রঞ্জন অপেরার অন্তিম প্রসঙ্গে বলেছে—"পার্বতীরঞ্জন চক্রবর্তী দল চালাতে রাজি না হবার জন্য দল বন্ধ হয়ে যায়!" কিন্তু শম্ভুনাথ ঘোষের প্রতিবেদন বলছে—ঃ

"...কুমার রেবতীরঞ্জন ছিলেন 'রঞ্জন'-এর কর্ণধার। সঙ্গে ছিলেন গুণাকর চক্রবর্তী, গৌর ঘোষ, হরিপদ বায়েন প্রমুখ যাত্রা রসিকরা। 'নবরঞ্জন' চলছিল রাজপরিবারের অর্থে। অর্থই একদিন অনর্থের মূল হয়ে দাঁড়াল। নানা অপরাধ আর অন্যায়ের বিষ এসে ঢুকে গেল রঞ্জনে। রাজকুমার দেখলেন, দল চালাতে হলে কয়েকজন হীনমন্য মানুষকে চালাতে হয়। দশ বছর পর বন্ধ করে দিলেন দল। এর মধ্যে মারা গেলেন গুণাকর চক্রবর্তী, গৌর ঘোষ। বেঁচে রইলেন হরিপদ বায়েন। কিন্তু হরিপদবাবু আর রঞ্জন'কে বাঁচাবার চেষ্টা করলেন না। রঞ্জনকে বাঁচাতে এগিয়ে এলেন কয়েকজন শক্তিমান অভিনেতা। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দুটি নাম পঞ্চু সেন ও শরৎ মুখার্জী।"

॥ এবার শম্ভু ঘোষের কথা বলি ॥

খুব ছেলেবেলা থেকেই যাত্রার প্রতি তীব্র আকর্ষণ ছিল শম্ভুবাবুর। চিৎপুরে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে পড়াকালীন অনেকবারই সখের থিয়েটারে অভিনয় করেছিলেন তিনি। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করার আগেই চিৎপুরের স্বনামধন্য অভিনেতা পঞ্চু সেন, সুনীল মুখার্জী, কামাক্ষ্যা চ্যাটার্জীদের সঙ্গে শম্ভু ঘোষের পরিচয় হয়। তাঁদের চেষ্টায় একদিন তিনি মিনার্ভা অপেরা নামে একটি যাত্রা দল তৈরি করেছিলেন। দলটি চালাতে সক্ষম হননি তিনি। তবে এই সূত্রে তাঁর যাত্রা বাজারে পরিচিতি ঘটেছিল। এই মিনার্ভা অপেরার প্রথম পালা ছিল বিনয় মুখার্জীর "মিলন শঙ্খ"।

ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ, ফণিভূষণ মতিলাল (ছোট ফণি)-এর মত দিকপাল শিল্পীরা ছিলেন এই দলে। এই দল বন্ধ হবার পর শম্ভু ঘোষ 'শিবদুর্গা অপেরা' নামে একটি ঠিকে পার্টীতে দু'বছর কাজ করেছিলেন। এই দলে 'পাতালপুরী', 'দস্যু রত্নাকর', 'মুক্তি মঞ্চ', সুনামের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। এই দল ছেড়ে শম্ভুনাথ ঘোষ আসেন সত্যম্বর অপেরায়। এখানে অভিনেতা ও দল ম্যানেজার হিসেবে যুক্ত হয়ে নিজেকে শক্ত করে গড়েছিলেন। দল পরিচালক শম্ভু ঘোষের দক্ষতা অচিরেই ছড়িয়ে পড়ে। শম্ভুবাবুর আমলেই সত্যম্বর অপেরায় আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পালা 'পাষাণের মেয়ে' আসরস্থ হয়। তিন বছর এই দলে থাকার পর শম্ভুবাবু আসেন গণেশ অপেরায়। এখানেও অভিনয় ও দল পরিচালনা করেছিলেন। তারপর নব রঞ্জনে জড়িয়ে পড়া। প্রথম দিকে একটা মরশুম কাজ করে শম্ভু ঘোষ যুক্ত হন নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরার সঙ্গে। এখানেও ক্ষণস্থায়ী হন। এরপর আবার তিনি ফিরে আসেন নব রঞ্জন অপেরায়। এবার কর্ণধার জীবনকৃষ্ণ দাস তাঁর উপরে দলের সব দায়িত্ব অর্পণ করেন।

যুগ বিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে শম্ভু ঘোষ পালা প্রযোজনা করতেন বলেই তাঁর প্রযোজিত পালা বিষয়ের দিক থেকে যেমন নতুন স্বাদ এনে দিত, তেমনি উপস্থাপনার বৈচিত্র্যে প্রত্যেকটি পালা আজও মানুষের মনে দাগ কেটে রেখেছে।

'রঙমহল' থিয়েটার বন্ধ হবার পর অভিনেতা শরৎ চট্টোপাধ্যায়কে শম্ভুবাবু প্রথম যাত্রায় আনলেন। শরৎবাবুকে প্রথম আনা হয় গোষ্ঠ ঘোষের নিউ গণেশ অপেরায়। শম্ভু ঘোষ যখন নিউ রয়েল বীণাপাণির পরিচালক, তখন সেই দলে প্রথম থিয়েটার থেকে নিয়ে আসেন মহেন্দ্র গুপ্তকে। মহেন্দ্র গুপ্তকে দিয়ে শম্ভু ঘোষ করালেন 'টিপুসুলতান', 'কপালকুণ্ডলা'।

দলের ম্যানেজার হিসেবে শম্ভুনাথ ঘোষ একটানা ২০ বছর জড়িত ছিলেন এবং জীবনকৃষ্ণ দাসের মৃত্যুর পর তিনি দলের কর্ণধার হন এবং উত্তরোত্তর নব রঞ্জনকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দেন। আজকের স্বনামখ্যাত স্বপনকুমার, নটসূর্য দিলীপ চ্যাটার্জী আরও অনেক দিক্‌পাল শিল্পী এই নব রঞ্জন থেকেই যেমন খ্যাতি পেয়েছেন, তেমনি চলচ্চিত্র, পেশাদার থিয়েটার থেকে যাত্রার আসরে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তারা ভট্টাচার্য, শরৎ চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্র গুপ্ত, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, রাধারমণ পালকে প্রথম হাজির করান শম্ভুনাথ ঘোষ।

নব রঞ্জন অপেরার দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর থেকে শম্ভুবাবু যত পালা প্রযোজনা করেছিলেন তার অধিকাংশ পালাই সুপারহিট হয়। এ গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—ব্রজেন দে'র 'চণ্ডীমঙ্গল'। 'মাইকেল মধুসূদন', 'বর্গী এল দেশে', 'লায়লা মজনু' 'মহুয়া', গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষের 'রাণী রাসমণি' ইত্যাদি। 'লায়লা মজনু'কে যাত্রাভিশানে রূপান্তরিত করেছিলেন শম্ভু ঘোষ। নির্দেশক ছিলেন শচীন অধিকারী। আসলে চলমান যাত্রা চলচ্চিত্ররূপ এই যাত্রাভিশান।

পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলনের কার্যকরী সভাপতি এবং ১৯৭৬ সালে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করে গেছেন তিনি।

॥ শম্ভুনাথ ঘোষের মৃত্যু ॥

১৯৮০ সালের ১৫ জুলাই যাত্রা ক্ষেত্রের এই নিরলস সাধককর্মীর আকস্মিক মৃত্যু হয় আর. জি. কর হাসপাতালে। তাঁর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুধু চিৎপুরের যাত্রা জগত নয়, গোটা পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, আসাম-ত্রিপুরায় যাঁরা যেখানে যাত্রার সঙ্গে জড়িত আছেন সেখানেই শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রবল বর্ষণের মধ্যে যখন তাঁর মরদেহ আর. জি. কর হাসপাতাল থেকে অগণিত যাত্রাপ্রেমী এবং অনুরাগীরা বহন করে আনছিলেন তখন পথের দু'ধারের মানুষ লক্ষ্য করেছিল যাত্রালোকের এক যাত্রা সাধকের অমৃত যাত্রার বিস্ময়কর মিছিল। চিৎপুরের যাত্রা পরিবারের অঙ্গনে মিছিল পৌঁছলে সব যাত্রা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এবং অন্য প্রিয়জনদের পক্ষ

থেকে শ্রীঘোষের মরদেহে মালা দেওয়া হয়। এরপর নিমতলা মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

১৬ জুলাই বুধবার দুপুর ১টায় নব রঞ্জন অপেরার গদিতে, যাত্রা জগতের এই শক্তিমান প্রযোজকের এবং পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলনের সভাপতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের যুগ্ম সম্পাদক শৈলেন মোহান্ত এই সভা পরিচালনা করেন। তিনি বলেন, শম্ভু ঘোষ ছিলেন যাত্রা শিল্পের প্রধান নেতা ও বন্ধু।

কার্যকরী সভাপতি তিনকড়ি গুছাইত যাত্রা শিল্পে শম্ভু ঘোষের দান নিয়ে আলোচনা করেন। শান্তিগোপাল বলেন, শম্ভুদার যেমন ছিল ব্যক্তিত্ব তেমনি ছিল সকলকে বুকে তুলে নেবার মত মহত্ত্ব!

১৭ জুলাই '৮০ আনন্দবাজার পত্রিকা লিখল—"...একে একে বক্তব্য রাখেন গুরুদাস ধাড়া, শিব ভট্টাচার্য, জীবন মুখার্জী, নিমাই সুর, দিলীপকুমার, মধুশ্রী, অভয় হালদার, অবনী বাগ, জহর রায়, নীরু নাগ, গৌরাঙ্গ ঘোষ, অসীম ঘোষ প্রভৃতি।..."

॥ বীরভূমের যাত্রা প্রেম ॥

অনেক জেলা-মহকুমায় কলকাতার বৃহত্তম যাত্রা দল বায়না করে এনে, সাধারণ মানুষের চিত্তবিনোদনের ব্যাপারটাকে উপলক্ষ করে অর্থ রোজগারের একটা হাতিয়ার হয়েছে যাত্রা। এর ফলে, গ্রামীণ যাত্রা চর্চা বিশেষ কোন ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে পারছে না! বিশেষ কয়েকটি জেলায় কলকাতার পেশাদার দল আনিয়ে, কোন কোন সংগঠন লভ্যাংশের অর্থে অনেক সমাজকল্যাণমূলক কাজ করছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু গ্রামের যাত্রাদলগুলির একটি বিশেষ মাত্রা যোগ করার কোন চেষ্টা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। তা ছাড়া জেলায়-জেলায় সমকাল শিক্ষিত পরিমণ্ডলের কাছে যাত্রা এখনও অবহেলিত। এর ফলে আঞ্চলিক সাপ্তাহিক-মাসিক পত্র-পত্রিকাগুলিও আঞ্চলিক যাত্রা প্রসঙ্গে খুবই উদাসীন। আঞ্চলিক পালাকার যেমন তৈরি হতে পারছে না, তেমনি আঞ্চলিক অতীত প্রতিভার কোন মূল্যায়ন হচ্ছে না। এই যে অনগ্রসরতা এর বড় দৃষ্টান্ত বীরভূম! এখানে আঞ্চলিক লোক সংস্কৃতির ভাবমূর্তিকে ধরে রাখার চেষ্টা থাকলেও, যাত্রার ভাবমূর্তি অবহেলিত। তাই এখানে বীরভূম জেলার কিছু যাত্রা চর্চা কেন্দ্রের নাম উল্লেখ করতে সক্ষম হলেও, যাত্রাকে হাতিয়ার করে বীরভূম জেলায় যে বিশেষ কোন জনকল্যাণ মূলক কাজ বা যাত্রা আন্দোলন হচ্ছে না, অন্য অনেক জেলার তুলনায় তা বলা যেতে পারে। তবে এ কথাও সত্য, শান্তিনিকেতনের কবিতীর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে যে নাট্যচর্চার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্পষ্ট হয়ে আছে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের যাত্রা ভাবনার যে ধারা প্রবাহে আজকের যাত্রা অভিষিক্ত, তারই পরিপ্রেক্ষিতে বীরভূমের সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট নিঃসন্দেহে ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে সমুজ্জ্বল! কবির যাত্রা ভাবনা প্রসঙ্গ আপাতত সযত্নে সরিয়ে রেখে বীরভূমের কিছু সংগঠনের কথা পেশ করি ঃ

শক্তি অপেরা পার্টি (সিউড়ী), বেনেপুকুর যাত্রা (সিউড়ী), কাশীপুর যুব সংঘ যাত্রাপার্টি (সিউড়ী),—লাভপুর অঞ্চলে বাবনা মিলন সংঘ যাত্রা পার্টি (আমেদপুর), নানুর অঞ্চলে বেলগ্রাম পল্লীমঙ্গল যাত্রা পার্টি (সাঁইথিয়া), মালিরাম অপেরা পার্টি (সাঁইথিয়া), বোলপুর অঞ্চলে বোলপুর মহামায়া অপেরা পার্টি (বোলপুর), ইলমবাজার রিক্রিয়েশনাল যাত্রাপার্টি (ইলমবাজার), খয়রাসুল এলাকায় পরসুন্দী রাধিকা সুন্দরী যাত্রাপার্টি (পরসুন্দী), ময়ূরেশ্বর অঞ্চলে ঝলকামহেশ্বর অপেরা (গানুটিয়া), সন্জ পল্লীমঙ্গল সমিতি যাত্রাপার্টি (সন্জ), রামপুরহাটে জেন্দুর কোপামা অপেরা (কর্‌বোনা), কালীপুর ট্রাইবাল্ যাত্রা (বসওয়া), নলহাটি অঞ্চলে দেবগ্রাম যুব সংঘ যাত্রা পার্টি (খিথা), সিমলান্দি স্বদেশী যাত্রা পার্টি (ভদ্রপুর), মুরারাই ব্লক ক্লাব (মুরারাই), জগাই তরুণ সংঘ

যাত্রাপার্টি (রুদ্রনগর—মুরারাই) যাত্রাপালা পরিবেশন করে থাকে। এই সংস্থাগুলি ১৯৬৫—৬৬ আর্থিকবর্ষে সরকারি সাহায্য লাভ করেছে।

॥ নব রঞ্জন অপেরা এবং যাত্রাভিশন ॥

অর্থ-সম্পদে যখন কোন যাত্রা প্রযোজক বিশাল হয়ে ওঠেন তখন তাঁর চারপাশে মুখোশ পরা ভালমানুষের দল জড়ো হয়। সেই সূত্রে অনেকেই অনেক কার্যসিদ্ধ করেন। তারই ফলশ্রুতি, একাধিক যাত্রা প্রযোজকের সিনেমা প্রযোজক হওয়া। হয়েছেন, আবার তিক্ত মানসিকতা নিয়ে যাত্রাতেই ফিরে এসেছেন। যাত্রার স্বনামখ্যাত শম্ভুনাথ ঘোষও তেমনি। তাঁর নব রঞ্জন অপেরার একের পর এক পালা ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করছিল, তার মধ্যে সুপারহিট হলো "লায়লা মজনু"। যথারীতি এক অভিনব প্রস্তাব এলো তাঁর কাছে। সেটি হলো, যাত্রার ইতিহাসে প্রথম "যাত্রাভিশন"। কি ভাবে, কারা শম্ভু ঘোষের কল্যাণে সেদিন প্রস্তাব দিয়েছিলেন জানি না, তবে চিত্র পরিচালক শচীন অধিকারীর তাৎক্ষণিক কপাল খুলেছিল। গোটা পালাটি সিনেমার মত শট ডিভিসন করে, তাতে সম্পাদনা ও সিনেমার অন্যান্য রস ঢেলে তৈরি হয়েছিল যাত্রাভিশন। তার বুকলেটের অংশ বিশেষ এখানে তুলে দিলাম।

বুকলেট প্রচ্ছদে বড় বড় অক্ষরে এবং ডিজাইনে ছাপা হয়েছিল

এই প্রথম যাত্রাভিশন

YATRAVISION

প্রতিমা পিকচার প্রোডাসন্সের বাংলা ছবি।

লায়লা মজনু

প্রচ্ছদে ছাপা হয়েছিল "ছন্দা চ্যাটার্জী ও ইন্দ্র লাহিড়ী"র ছবি।

পরিবেশনা / প্রতিমা মুভিজ।

অনিতা চ্যাটার্জী ও পূর্ণজিৎ চ্যাটার্জী নিবেদিত। প্রযোজনা ☐ প্রতিমা চ্যাটার্জী ☐ কারিগরী উপদেষ্টা ঃ বি. কে. চ্যাটার্জী।

রচনা ও যাত্রা পরিচালনা ☐ শৈলেশ গুহনিয়োগী। চলচ্চিত্রায়ন ☐ শচীন অধিকারী ☐ মূল পরিকল্পনা ও সামগ্রিক পরিচালনা মণি হক্ (অতিথি), সহযোগিতায় ঃ শম্ভুনাথ ঘোষ (প্রযোজক, নব রঞ্জন অপেরা)।

নাম ভূমিকায় ☐ ছন্দা চ্যাটাজী ও ইন্দ্র লাহিড়ী।। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন যাত্রা প্রোডাকসনের সব শিল্পী।

কণ্ঠ সংগীতে ছিলেন ☐ ছন্দা চ্যাটার্জী, ইন্দ্র লাহিড়ী, বঙ্কিম মুখার্জী, অমিতাভ ঘোষ, শক্তি ব্যানার্জী, চিন্ময় বিশ্বাস, বুলা ঘোষ, বিথি কর। কাজী সব্যসাচীর সৌজন্যে নজরুল সংগীতে কণ্ঠ দিয়েছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

চিত্রগ্রহণ ☐ নিমাই রায়।। সম্পাদনা ☐ রমেন ঘোষ।। শব্দ গ্রহণ ইন্দু অধিকারী।। সংগীত গ্রহণ ও পুনঃ শব্দ সংযোজন ঃ জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়।। পরিচয় লিখন ☐ বিরাজ সেনগুপ্ত।। শিল্প নির্দেশনা ☐ বিজয় বোস।। সাজসজ্জা ☐ দানী দাশগুপ্ত।। কেশবিন্যাস ☐ সাত্তার রূপসজ্জা ☐ নিতাই সরকার, অনাথ মুখার্জী ।। প্রধান কর্মসচীব ☐ প্রশান্ত পাট্টাদার ।। ব্যবস্থাপনা ☐ শংকর ঘোষাল। আর. বি. মেহেতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে পরিস্ফুটিত। ডি. এস. সুলতানিয়ার তত্ত্বাবধানে ক্যালকাটা মুভিটোন প্রাঃ লিঃ স্টুডিওতে গৃহীত।

॥ নারায়ণ ভট্টাচার্য এবং নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা ॥

নারায়ণ ভট্টাচার্যের চেহারা ছিল তুলনা হীন। প্রকৃত সুপুরুষ। গায়ের রং ছিল দুধে আলতায় যেন মেশানো। ইনি 'রূপকুমার' নামে বিখ্যাত অভিনেতা ছিলেন জানতাম। তাঁর অভিনয়

দেখিনি ; কিন্তু আবীর পত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখতে গিয়ে জেনেছিলাম, তিনি নিতান্ত ছেলেবেলা থেকে নিজেকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্যে, কম শ্রম করেননি। আমি যখন তাঁর সঙ্গে পরিচিত হই তখনই তিনি অর্থ-সম্পদে সুপ্রতিষ্ঠিত! দেখেছিলাম তরতাজা। দেখেছিলাম তাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপ! দিনের বেলায় তাঁকে দেখেছি ময়াল সাপের মত ; সন্ধ্যা ৭টার পর থেকে তিনি হয়ে যেতেন একেবারে অন্য মানুষ! যাত্রার অগ্রগতি, যাত্রার সার্বিক কল্যাণ, নারায়ণবাবুর যেমন কাম্য ছিল তেমনি যাত্রা গানের উপস্থাপনার মধ্যে তিনি বিশ্বাস করতেন, যত মধু ঢালা যাবে ততই হবে মিষ্টি। যাত্রা ব্যবসায় মুন্সিয়ানার সঙ্গে মুনাফা লুঠতে গেলে কার্পণ্য করা যাবে না। তাই তিনি, যাত্রার ঐতিহ্যের কথা মনে রেখে যেমন মহিলা শিল্পীদের মধ্যে ছবিরানীকে বহুকাল যাবৎ রেখেছিলেন, তেমনি আবার চলচ্চিত্রের নীতিশ মুখোপাধ্যায় থেকে 'পথের পাঁচালি' খ্যাত, সর্বজন শ্রদ্ধেয় কানু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রূপক মজুমদারকে যাত্রার আসরে নামিয়ে আনতে পেরেছিলেন।

নারায়ণবাবুর সঙ্গে যখন আমার পরিচয় আরও গভীর হলো, তখনই আমার অনেক খবরই তিনি নিয়েছিলেন। কানু বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন, রূপক মজুমদারের মত অভিনেতা আর ধনীর দুলালও আমার বন্ধু হয়ে উঠতে পেরেছিল। অতএব নারায়ণবাবুর নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরায় এই দুই শিল্পীর যোগদানের প্রধান পুরোহিত হলাম আমি। নারায়ণবাবু আর তাঁর তখনকার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ, যোগ্য অফিস পরিচালক কমলকৃষ্ণ খাঁকে সঙ্গে নিয়ে আমি পাইকপাড়ায় কানুদার বাড়িতে যাই, রাসবিহারীর মোড় ছাড়িয়ে সাউদার্ন এভিন্যুর বাড়ি থেকে ধনীর দুলাল রূপক মজুমদারের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করি! ওঁরা এসেছিলেন যাত্রায়। টেকেননি বেশি দিন।

নারায়ণবাবুর শোভাবাজার মোড়ের কাছে বিশাল প্রাসাদ গড়ে তোলার কাজ তখন পূর্ণ উদ্যমে চলছিল। কমল খাঁ ছিলেন সেই প্রাসাদ গড়ার তদারকি মাষ্টার।

নারায়ণবাবুর রক্তে ছিল অভিনয় নেশা।

প্রথমতঃ ঠাকুর্দা ছিলেন অভিনেতা, তারপর মেজদাও ছিলেন পাকা অভিনেতা। ধনী পরিবার। বাড়িতে এক সময়ে থিয়েটার চর্চা লেগেই ছিল ; এমন এক পরিবেশে ১৩৩৫ সনে নারায়ণ ভট্টচার্যের জন্ম। মাত্র ১১ বছর বয়সে ফরিদপুরের হিরণ গ্রামের আচার্য বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে বাসন্তীপূজায় সখের থিয়েটারে "অভিমন্যু বধ' নাটকে উত্তরা চরিত্রে অভিনয় করে সবার ভালবাসা কুড়িয়েছিল বালক নারায়ণ।

ভাগ্য বিপর্যয়ে অতি অল্প বয়স থেকেই সংসারে আর্থিক সাহায্য দেবার জন্য অর্থ উপার্জনে নামতে হয় নারায়ণকে। নাবালক বয়সে চালের ব্যবসা, 'ভারত' পত্রিকা বিক্রি, বাগবাজারের মদনমোহন টী কোম্পানিতে প্যাকেটে চা ভরা আর প্যাকেট মোড়া এ সব কাজই করতে হয়েছে তাঁকে, এর ভিতরে নিয়মিত লেখাপড়া চালিয়ে গেছেন তিনি। বাগবাজার হাইস্কুলের ছাত্র ছিলেন নারায়ণ ভট্টাচার্য। ছাত্রাবস্থায় নারায়ণবাবু নেমে পড়েছিলেন মাছের ব্যবসায়। ১৯৫২ সালে বি. এ. পাশ করেন। এরপর ১৯৫৩ সালে বি.টি. পরীক্ষায় ফেল করেন। ইতিমধ্যে সৌখিন ক্লাবে অভিনয় করে নারায়ণবাবু বেশ পরিচিত হয়ে পড়ায় সকলেই তাঁকে অভিনেতা হিসেবে পেশাদার থিয়েটার-যাত্রায় কাজ করার জন্য পীড়াপীড়ি করে ; অবশেষে 'রূপকুমার' ছদ্ম নাম নিয়ে নারায়ণ ভট্টাচার্যর যাত্রায় আত্মপ্রকাশ। তাঁর আত্মপ্রকাশ ১৯৫২ সালে সুকুমার মণ্ডলের রয়েল বীণাপাণি অপেরায়! অল্পদিনের মধ্যে অভিনেতা হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি পান।

॥ নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরার জন্ম কাহিনী ॥

১৯৯২ সালে হুগলী জেলার নাটাগোড় গ্রামের প্রতাপশালী জমিদার সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্ত্রী বীণাপাণি দেবীর নামে নিজের প্রাসাদে প্রতিষ্ঠা করেন বীণাপাণি অপেরা। তখনকার দিনে

নিজের অঞ্চলের কিছু অভিনেতা আর কলকাতা থেকে আনা কিছু অভিনেতাদের দিয়ে প্রাসাদ অঙ্গনে যাত্রাপালা করাতেন সুরেশ ব্যানার্জী।

এ দলে তখন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ছিলেন প্রভাত বোস আর পালা ছিল রাখীবন্ধন। মাঝে মধ্যে এখানে-সেখানেও সখের অভিনয় করে আসত এই প্রতিষ্ঠান। ১৯২৭ সালে সুরেশ ব্যানার্জীর সেই সখের যাত্রা দল বন্ধ হয়ে যায়।

১৯২৮ সালে কলকাতার বেনিয়াটোলার গোষ্ঠবিহারী পাল (সুপরিচিত অভিনেতা ভোলা পালের বাবা) নাথের বাগানে রয়েল বীণাপাণি অপেরা নাম দিয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠান নতুন করে উদ্বোধন করেন। এই নবগঠিত প্রতিষ্ঠানের প্রথম পালা ছিল অঘোরনাথ কাব্যতীর্থের 'কালাপাহাড়' বা 'ধর্ম পথ', ও পরে অভিনীত হয় জয়মাল্য, খনামিহির। এ দলের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ছিলেন নগেন বোস। এ ছাড়া ছিলেন ক্ষেত্র মুখার্জী ও হারাধন ব্যানার্জী। ১৯৬০ সালে নট ও নাট্যকার পঙ্কজভূষণ কবিরত্ন এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হন। ইনিই চলচ্চিত্র জগতে ফণি রায় নামে সুপরিচিত ছিলেন। পঙ্কজভূষণ এ দলে যুগ সন্ধি, দুর্গোৎসবে সমাধি, মহামানব, নিয়তি, নারী-ঋষিতে অভিনয় করেন ও প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি আসে। অন্যান্য শিল্পীরা যাঁরা যুক্ত হন তাঁরা হলেন সত্যেন ঘোষ, ভোলা পাল, কালী রায়, উপেনরানী, কমলরানী আরও অনেকে। দলের পরিচালক ছিলেন ইন্দুভূষণ ঘোষ। ১৯৪১-৪২ সালে গোষ্ঠ পাল দল বন্ধ করেন।

১৯৫০ সালে হালবাগানের সুকুমার মণ্ডল নিজের বাড়িতেই নিউ রয়েল বীণাপাণি নাম দিয়ে নতুন করে দলকে সাজান। ১৯৫১ সালে গৌরীশঙ্কর বর্মণ ও কালীপদ সরকারের কর্তৃত্বাধিনে চিৎপুরে এই দলের গদি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে এ দলের অভিনীত পালাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মাটীর মা, বিদ্রোহী সন্তান ইত্যাদি। ১৯৫২ সালে রূপকুমার নাম নিয়ে নারায়ণ ভট্টাচার্য এই দলে অভিনেতা হিসেবে যুক্ত হন।

১৯৫৫ সালে আর্থিক অনটন হেতু সুকুমারবাবু দল বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেন। তখন কালী সরকার আর গৌরীশঙ্কর বর্মনের অনুরোধে দলটি কেনেন নারায়ণ ভট্টাচার্য। সেই বছর থেকে দলটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৫৮-৫৯ সালে এই দল আসাম ও ডুয়ার্স সফর করে খুবই বিখ্যাত হয়।

১৯৬০ থেকে '৬২ সাল পর্যন্ত শম্ভু ঘোষের পরিচালনাধীনে এই দল চারদিকে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই সময়ে প্রখ্যাত মহেন্দ্র গুপ্ত এ দলে যোগ দেন। ১৯৬৩ সালে নিউ রয়েলের পরিচালনার দায়িত্ব নেন বিজয় মিত্র। সেই সঙ্গে এ দলে আসেন যাত্রার স্বনামধন্য অভিনেতা পঞ্চু সেন। আজকের স্বনামধন্য অভিনেতা-নির্দেশক ও তরুণ অপেরার কর্ণধার শান্তিগোপাল এই সময়ে এ দলের অভিনেতা। নাটক ছিল, ভাগ্যের বলী, লালবাঈ ইত্যাদি। ১৯৬৪-৬৫ সাল থেকে '৬৭ পর্যন্ত গোপেন দেবের পরিচালনায় এই দল আরও জনপ্রিয় হয়। ১৯৬৮-৭০ কমলকৃষ্ণ খাঁ এ দলের পরিচালক ছিলেন।

এই প্রতিষ্ঠান থেকে যাঁরা জনপ্রিয় অভিনেতা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন শান্তিগোপাল ; দেবকুমার, বুলবুল, তরুণকুমার আরও অনেকে। যন্ত্রীদের মধ্যে যাঁরা এই দল থেকেই জনপ্রিয় হন তাঁরা হলেন বিজয় নন্দী, দুলাল নন্দী ও কালিকা।

অনেক বছর থেকে নারায়ণবাবু এই নিউ রয়েল বীণাপাণিকে নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছিলেন শয্যায় শায়িত থেকে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। এর মধ্যেও মাঝে মাঝে নিজের দলকে সুন্দর করে বাঁচাতে চেষ্টাও করেছেন তিনি। নট্ট কোম্পানির দীর্ঘদিনের প্রিয় শিল্পী তরুণকুমার আর রুমা দাশগুপ্তকে ভাঙিয়ে এনে দলকে সাজাতে তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। সেবারেও ব্যবসায় সাফল্য এলো না।

একরাশ দৈহিক যন্ত্রণা নিয়ে এক সময়ে হারিয়ে গেলেন অতীতের রূপকুমার, পরবর্তী সময়ের ডাকসাইটে যাত্রা মালিক নারায়ণ ভট্টাচার্য। যে যাত্রা তাঁকে ঐশ্বর্য দিয়েছিল, জীবন নিয়ে খেলা করে সেই ঐশ্বর্য তাঁর নিশ্চিহ্ন।

॥ গোষ্ঠ ঘোষ ও নিউ গণেশ অপেরা ॥

যাত্রাজগতের এই আর একজন প্রযোজক যিনি সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র।

১৯১৯ সালে মেদিনীপুরের গোপমহল গ্রামে ঁলক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষের ছেলে গোষ্ঠবিহারী ঘোষের জন্ম। বারো তেরো বছর বয়সে কলকাতায় চলে এসে ব্যবসা শুরু করেন গোষ্ঠবাবু। পাশাপাশি সৌখিন থিয়েটারে অভিনয়ও করতেন। চোরবাগানে একটি সৌখিন দলের সভ্য ছিলেন তিনি। এখানে পঁচিশ বছর বয়সে প্রথম 'লীলাবসান' নাটকে বলরামের চরিত্রে অভিনয় করে ও পরে 'রাজলক্ষ্মী' নাটকে রামের চরিত্রে অভিনয় করে সকলের মন জয় করেন। বৈদ্যনাথবাবু নামে গোষ্ঠবাবুর এক বন্ধুর প্রেরণায় ১৩৪৯-৫০ সনে গোষ্ঠবাবু তৈরি করেন যাত্রাদল। তখন একটি গণেশ অপেরা থাকায় তাঁরা তাঁদের দলের নাম দেন নিউ গণেশ অপেরা। প্রথম প্রযোজিত পালা ছিল 'যুগান্তর'। সেদিনকার শিল্পী তালিকায় ছিল ম্যাণ্টা বোস, ফণি গাঙ্গুলী প্রভৃতি।

প্রথম বারেই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা পান। ১৩৭০ সনে কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তির দুর্ব্যবহারে গোষ্ঠবাবু দল বন্ধ করে দেন। আবার বছর দুই পরে দল চালু করে উপহার দেন 'মরেও যারা মরে না' পালা। চরম হিট পালা। এরপর অকালবোধন, শুম্ভ নিশুম্ভ, রাহুগ্রাস, পৃথ্বীরাজ, শিবাজী, আগুন, মসনদ, সৈনিক, বিপ্লব ইত্যাদি পালাগুলির প্রত্যেকটি খ্যাতির সঙ্গে চলার পর অসুস্থ হয়ে পড়াতে দলটি লীজ দেন মোহন চ্যাটার্জীকে। এই সময়ে সাধক বামাক্ষ্যাপা, ভুলি নাই, সন্তান প্রভৃতি পালা অসাধারণ জনপ্রিয়তা পায়। কিন্তু সমস্ত বিশ্বাসকে তখন ভেঙে দেয় অনেকেই। দল প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। তবুও দলকে প্রাণের চাইতেও ভালবাসেন বলেই গোষ্ঠবাবু থেমে থাকেননি, আবার দলকে নতুন সাজে সাজিয়ে চন্দন মিত্র ও গোবর্ধন ঘোষের ওপর সব দায়িত্ব ছেড়ে গড়ে তোলেন নিউ গণেশ অপেরা।

এরপর আরও কয়েকবার এই দলকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল, এমকি গোষ্ঠবাবুর জামাতা প্রকাশবাবুও নিউ গণেশের হাল ধরেছিলেন। কিন্তু একদিন সামান্য একজন দুগ্ধ ব্যবসায়ী হয়েও যে মানুষটি যাত্রাকে ভালবেসে, যাত্রার দল তৈরি করতে এগিয়ে এসেছিলেন নিছক টাকার লোভে নয়, অভিনয় শিল্পের প্রতি চিরজন্মের মত শ্রদ্ধা জানাতে, জামাতারা সেই ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারলেন না।

॥ শৈলেন মোহান্ত ॥

১৯২২ সালে গোপালনগরে জিতেন্দ্রনাথ মোহান্তর ছেলে শৈলেন মোহান্তর জন্ম। বাবার ছিল অভিনয় প্রীতি। একটা সখের দলও ছিল জিতেনবাবুর গোপালনগরে। তাই শৈলেন মোহান্ত স্কুলে যেমন মেধাবী ছাত্র, শখের থিয়েটারে তেমনি ছিলেন সবার প্রিয় অভিনেতা। গোপালনগর হরিপদ ইনস্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে শৈলেনবাবু ভর্তি হন বঙ্গবাসী কলেজে। সেখানে আই-কম পাশ করে ভর্তি হন সিটি কলেজে। উত্তর কলকাতার গ্রোব নার্সারীর মালিক অমর রায়ের চেষ্টায় চাকরি পেলেন লয়েডস্ ব্যাঙ্কে। এরপরই সিটি কলেজ থেকে বি. কম. পাশ করলেন। তারপর ভাগ্যচক্রে অভিনেতা এবং সত্যম্বর অপেরার পূর্বতন কর্ণধার গৌর দাসের কন্যা কমলার সঙ্গে বিবাহ হল শৈলেনবাবুর। চাকরি পেলেন বি.এন. রেলওয়েতে। গৌর দাস অসুস্থ হয়ে জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান সত্যম্বরের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তুলে দিলেন জামাতা শৈলেন মোহান্তর হাতে। আজকের যাত্রাশিল্পের যে উন্নতি তার মূলে শৈলেনবাবুর সহযোগিতা নেহাৎ কম নয়। একাধিক পালাকার, শিল্পী এবং কর্মীদের শৈলেনবাবু সুযোগ ও প্রতিষ্ঠা দেন।

ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের মত এ কালের শীর্ষস্থানিয় পালাকারের প্রতিষ্ঠা বোধ করি সত্যম্বর অপেরায় 'একটি পয়সা'র সার্থক প্রযোজনা গুণে সম্ভব হয়েছিল। শৈলেন মোহান্ত ১৩৭৫ সনে গড়ে তোলেন গৌ চন্দ্র দাসের নামে, "যাত্রার প্রথম পাঠাগার" গৌরচন্দ্র যাত্রা লাইব্রেরী। গোটা যাত্রা জগতের পরস্পর বিরোধী মনোবৃত্তির জন্য এই পাঠাগার উদ্বোধনই হয়েছিল, কিন্তু তাকে বিশেষ মর্যাদা কেউ না দেবার জন্য পাঠাগারটি নিশ্চিহ্ন!

১৯৮০ সালের শেষ দিকে এই কৃতি কর্ণধারের আকস্মিক মৃত্যুতে গোটা যাত্রা জগতে শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। শৈলেনবাবুর মৃত্যুর পর, ১ জানুয়ারি '৮১ তারিখে আনন্দবাজার লিখল ঃ

"রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে নয়, তাঁকে আমি জানি মানব দরদী, সংস্কৃতির চিরবান্ধব এবং জনকল্যাণের কাজে নিয়োজিত মহাপ্রাণ হিসেবে—' ২২ ডিসেম্বর স্টার থিয়েটারে স্বর্গত শৈলেন মোহান্তর শোকসভার সমাপ্তি ভাষণ দেন সভাপতি শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলন আয়োজন করে এই শোকসভার।

শৈলেন মোহান্তর পরম বন্ধু শ্রীকালী চৌধুরী শ্রীমোহান্তর কর্মজীবন, রাজনৈতিক ভাবনা ও শিল্পচিন্তার প্রগতিশীল মনোভাবের কথা ব্যক্ত করেন। ডঃ বিনয় সরকার ও ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য স্বর্গত মানুষটির যাত্রাভাবনার বিষয় আলোচনা করেন। পঃ বঙ্গ যাত্রা সম্মেলনের কার্যকরী সভাপতি তিনকড়ি গুছাইত বলেন, যাত্রার উন্নয়নের জন্য শৈলেন মোহন্তর আপ্রাণ চেষ্টা শিল্পজগতের সকলে চিরকাল মনে রাখবে। নাট্যকার নরেশ চক্রবর্তী স্বরচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনান।

প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন বহু সংস্থার প্রতিনিধি ও ব্যক্তিরা। সভা পরিচালনা করেন গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ।

শৈলেন মোহান্তের মৃত্যুর পর, এই প্রাচীন-ঐতিহ্যমন্ডিত, অভিজাত প্রতিষ্ঠানের নিশান আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে শক্ত করে ধরেছিলেন তাঁর সুযোগ্য কন্যা রেবা মোহান্ত। বহু প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে যুদ্ধ করেও শেষ পর্যন্ত রেবা মোহান্ত সত্যম্বরের জয়ের নিশান কিন্তু ধরে রাখতে সক্ষম হননি।

॥ তরুণ অপেরা এবং শান্তিগোপাল ॥

বাগবাজারের গঙ্গার ধারে বাড়ি। সেই ছোটবেলায় গঙ্গার জেটির উপর বসে আপন মনে আবৃত্তি করতে করতে একদিন যে মানুষটির মন একটা বড় কিছু করার জন্য উদ্বেল হয়ে উঠত, সেই মানুষটির প্রথম তৃপ্তি গ্রুপ থিয়েটারে এসে। শুধু অভিনয় নয়, সেই সঙ্গে হাতে কলমে স্টেজ ক্রাফটসে অম· ঘোষের কাছে শিক্ষালাভ করেও আত্মতৃপ্তি লাভ করেননি তিনি। শ্যামবাজারের 'উদয়াচল' থেকে সোজা যাত্রার আঙ্গিনায় এসে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন তিনি শান্তিগোপাল। লেনিন, স্তালিন, রাজা রামমোহন, নেতাজি, বিবেকানন্দ, স্পার্টাকাস, ওথেলো, কার্লমার্কস প্রভৃতি বিশ্ববন্দিত কালজয়ী মহামানবের চরিত্র চিত্রণে শান্তিগোপালের খ্যাতি। শান্তিগোপাল যাত্রার একমাত্র অভিনেতা যিনি 'সোভিয়েতল্যাণ্ড নেহেরু অ্যাওয়ার্ডে' সম্মানিত হয়ে বিদেশের দরবারে যাত্রার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

শান্তিবাবু যখন যাত্রায় আসেন তখন অতি সহজে তাঁর প্রতিষ্ঠা আসেনি। অনেক বাধা, অনেক অসহযোগিতা, অনেক টীকা-টিপ্পনি দুর্ব্যবহার তাঁর মনকে ক্ষত বিক্ষত করেছিল। তবুও সংগ্রাম থামেনি তাঁর। অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভের সঙ্গে সঙ্গে কর্ণধার হননি তিনি, কর্ণধার হয়েছিলেন যাত্রার তথাকথিত ধারাগুলো পাল্টে ফেলার জন্যে। শান্তিবাবুর লিজ নেওয়া তরুণ অপেরাকে কোন মতেই বিজ্ঞাপন ভিত্তিক দল বলা যাবে না, কারণ ইদানিং যাত্রার বিজ্ঞাপনে যে প্রতিযোগিতা

এসেছে সে এক সর্বনাশা প্রতিযোগিতা। এতে ক্ষতিগ্রস্ত বহু ছোট দল, এতে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাম গঞ্জের অতি সাধারণ হাজার হাজার মানুষ, যাঁরা সামান্য পয়সায় যাত্রা দেখার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, ক্ষতিগ্রস্ত নায়েক পক্ষ যাঁরা বিজ্ঞাপনের খেসারৎ দিচ্ছেন। শান্তিবাবু বলেন,—"আমি টীমওয়ার্ক আর জীবনের জয়গান প্রচারের মত পালা করতে পছন্দ করি।" যাঁরা বলেন শান্তিগোপাল পৌরাণিক পালা প্রসঙ্গে খুবই বিরোধীপন্থী, তাঁদের কাছে শুধু নয়, গোটা পশ্চিমবঙ্গের নাট্য চেতনাকে নাড়া দিয়েছিলেন পৌরাণিক বিষয়ের উপস্থাপনায় এক নতুন মাত্রা যোগ করে। পুরাণ বা ইতিহাসের চরিত্রের সঙ্গে পার্থিব চরিত্রের যোগসূত্র সাংঘাতিকভাবে স্পষ্ট করে তুলেছিলেন 'মহাবীর কর্ণ' পালায়।

১৯৩৪ সালে বাগবাজারের বর্ধিষ্ণু পাল বংশে ফণীন্দ্র পালের ছেলে শান্তিগোপাল ওরফে বীরেন্দ্রনারায়ণ পালের জন্ম। ছেলেবেলায় 'মেবার পতন', 'তাই তো' নাটকে তাঁর হাতে খড়ি। শান্তিগোপালের প্রথম থিয়েটার চর্চা 'ভারতীয় জাতীয় সংস্কৃতি পরিষদ' এবং অমর ঘোষের 'উদয়াচল'-এ। এরপরই শান্তিগোপালের প্রথম নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরায় আত্মপ্রকাশ "বিপ্লবী সন্তান" পালায় 'করালী' চরিত্রে। পরবর্তী 'দস্যু কন্যা' পালায় অভিনয় করার পর 'ভাগ্যের বলি' পালায় নায়ক হন তিনি। এরপর নট্ট কোম্পানিতে যুক্ত হন। 'জাহান্দার শাহ' পালায় অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেন। এরপর আবার নিউ রয়েল, তারপর যুক্ত হন তরুণ অপেরায়।

এবার পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে শান্তিগোপালের অভিনয় প্রতিভা, সাহিত্যানুরাগ, শিল্প চেতনার স্ফূরণ ঘটে। এক সময়ে এই শান্তিবাবু বিষয় নির্বাচনে, রূপসজ্জায়, প্রযোজনার রীতি পরিবর্তনে যাত্রাকে আলাদা মাত্রা দেন। গ্রাম-গঞ্জের হাজার হাজার সাধারণ কৃষিজীবি, শ্রমজীবি, অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত এমন কি শিক্ষিত মানুষের মধ্যে ঐতিহাসিক-স্মরণীয় ব্যক্তিদের পরিচয় ঘটিয়ে অভিনয়ে নবজাগরণ ঘটান! শান্তিগোপাল মন আর মঞ্চ তোলপাড় করে দেন 'হিটলার', 'রাজা রামমোহন', 'লেনিন', 'কার্লমার্কস', 'নেতাজি সুভাষ', 'মহাবীর কর্ণ', 'টিপু সুলতান', 'আট ঘণ্টার লড়াই', ইত্যাদি পালা প্রযোজনায়। টিম ওয়ার্কে এবং নামভূমিকাভিনয়ে! শান্তিগোপাল বহু পুরস্কারে সম্মানিত হন। বহু নতুন শিল্পী তৈরিও করেন! এ ব্যাপারে অধ্যাপক, নাট্য ব্যক্তিত্ব অমর ঘোষের কাছে তিনি কৃতজ্ঞ।

এরিস্টটল বলেছিলেন, প্রকৃত ইতিহাস লেখার চাইতে শিল্প সম্মতভাবে ইতিহাসকে উপস্থাপিত করাই অধিকতর বিজ্ঞান সম্মত ও বাস্তব। কেননা রচনাশৈলী ঘটনার অন্তরে প্রবেশ করতে পারে, অপরপক্ষে ঘটনার বর্ণনা কেবল বিস্তৃত বিবরণ মাত্র।—আমার নিশ্চিত ধারণা, এরিস্টটলের এই ভবনার প্রেরণা থেকেই শান্তিগোপাল তাঁর পালাগুলি উপস্থাপিত করেন, এবং সেই সব পালার জনপ্রিয়তাও সেই কারণে।

যাত্রায় মাইক, টেপরেকর্ডার ব্যবহার যেমন তরুণ অপেরার প্রবর্তনা, তেমনি যাত্রা মঞ্চের দুটি প্যাসেজ, যাত্রায় বিরতি ইত্যাদি প্রবর্তনা অমর ঘোষের সহযোগিতায় শান্তিগোপালের একক কীর্তি। তরুণ অপেরার পূর্ণ দায়িত্ব মাথায় তুলে নেবার পর শান্তিগোপাল প্রথম যে পালার মাধ্যমে তাঁর ভিন্নধর্মী চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন তার নাম 'ঘুম ভাঙ্গার গান'।

শান্তিগোপালের উল্লেখযোগ্য চরিত্রাভিনয়—

ঘুম ভাঙ্গার গান	ঃ	ধীরাজ ভট্টাচার্য
হিটলার	ঃ	হিটলার।।
রাজা রামমোহন	ঃ	রামমোহন।।
লেনিন	ঃ	লেনিন।।
নেপোলিয়ান	ঃ	নেপোলিয়ান।।

রমলা সার্কাস	ঃ	রবিনসন।।
মহেঞ্জোদড়	ঃ	রাজা সম্বর।।
আমি সুভাষ	ঃ	সুভাষচন্দ্র বসু।।
এবার তদন্তের পালা	ঃ	করিতকর্মা।।
ওথেলো	ঃ	ওথেলো।।
কার্ল মার্কস	ঃ	কার্ল মার্কস।।
মাও সে তুং	ঃ	মাও সে তুং।।
বিপ্লব বহ্নি	ঃ	রাসবিহারী বসু।।
সিপাই মিউটিনি	ঃ	নানাসাহেব।।
বিদ্রোহী সন্ন্যাসী	ঃ	স্বামী বিবেকানন্দ।।
ক্রীতদাস	ঃ	স্পার্টাকাস।।
বিপন্ন বসুধা	ঃ	এ্যালেন্দে।।
স্তালিন	ঃ	স্তালিন।।
আট ঘণ্টার লড়াই	ঃ	পার্সনস।।
শত্রু রক্ত যুদ্ধ	ঃ	ডাঃ নর্মান বেথুন।।
আগুন জ্বেলে দিল	ঃ	প্রমিথিউস।।
কালপুরুষ	ঃ	বীরসা মুণ্ডা।।
মহাবীর কর্ণ	ঃ	কর্ণ।।

যাত্রার ইতিহাসে একমাত্র 'হিটলার' পালাই সর্বমোট ২০০০ রজনী অতিক্রম করেছিল। সেই 'হিটলার'-এর প্রথম রজনীর শিল্পী তালিকা এখানে হুবহু তুলে ধরা হলো। ১৩৭৫ সনের ৭ আশ্বিন, মঙ্গলবার বাগবাজারের মদনমোহন ঠাকুর রোডের, মদনমোহন তলায় 'হিটলার' পালার শুভ উদ্বোধন হয়।

হিটলার	...	শ্রীশান্তিগোপাল পাল
গোয়েরিং	...	শ্রীপ্রসেনজিৎ সরকার
ভনবোক	...	শ্রীনরেন দে
আইভ্যান মরিস	...	শ্রীবাবলু চৌধুরী
বুচর	...	শ্রীঅজিত দত্ত
ব্লানষ্টেন	...	শ্রীপ্রণতেশ মুখার্জী
রল্‌ফ্ কেলার	...	শ্রীমহাদেব ঘোষ
ঈভা ব্রাউন	...	মিসেস জ্যোৎস্না ঘোষ
বারবারা	...	মিসেস আরতি দত্ত
স্ট্যালিন	...	শ্রীঅমর ভট্টাচার্য
জুকভ্	...	শ্রীমণি চ্যাটার্জী
পেত্রোস্লাভস্কি	...	শ্রীশিব ভট্টাচার্য
নীষ্টার	...	শ্রীগুণসিন্ধু মণ্ডল
নিকোলাই	...	শ্রীসুদর্শন সেন
মুনিয়া	...	মিসেস সুপর্ণা মণ্ডল
লুসী	...	মিস বর্ণালী ব্যানার্জী

সৈন্যগণ ঃ সর্বশ্রী অবিনাশ রাণা, কানাই রাণা, সুনীল ব্যানার্জী, রাম ভট্টাচার্য, নির্মল ঘোষ।

স্মারক ঃ শ্রীরাম ভট্টাচার্য, যন্ত্র সঙ্গীতে—সর্বশ্রী শম্ভু পাল, কালী পাত্র, কৃষ্ণগোপাল রায়, গঙ্গাহরি ঘোষাল, পরেশ সামন্ত, সন্তোষ ব্যানার্জী, ইত্যাদি।

আলোক ও যান্ত্রিক কৌশলে—শক্তি ব্যানার্জী, সুরারোপ—শ্রীঅজিত বসু (বাদুবাবু) পরিচালনায়—অমর ঘোষ, (অধ্যাপক ঃ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)

* * * * * *

॥ তরুণ অপেরা এবং শান্তিগোপালের প্রতি অভিনন্দন ॥

নাট্যকার মন্মথ রায়ের রচনা থেকে—

"অতি আধুনিক যাত্রা জগতে শান্তিগোপাল একটি ব্যক্তিত্ব ; তরুণ অপেরা একটি বৈশিষ্ট্য। কয়েক বৎসর আগে নাট্যকলাকুশলী বন্ধু শ্রীমান শিব ভট্টাচার্য খুব পীড়াপীড়ি করে আমাকে নিয়ে গেলেন মদনমোহনতলার এক যাত্রার আসরে একটি নতুন পালার প্রাথমিক অভিনয় দেখতে। যাত্রাগান তখন সবেমাত্র পল্লী অঞ্চল থেকে সাহসভরে মহানগরী কলকাতায় অভিযান শুরু করেছে। শিব ভট্টাচার্য পালাটার নাম জানালেন 'হিটলার'। হিটলারের ওপরে যাত্রাগান শুনেই ভেবেছিলাম একটি জগাখিচুড়ী ব্যাপার হবে। আসরে গিয়ে দেখি তেমন লোক সমাগম হয়নি। আমরা যেতেই কিছুক্ষণের মধ্যেই পালা শুরু হল। চমকে গেলাম। আসরে যেন সত্য সত্যই হিটলারকে দেখছি মনে হল। যেমন রূপসজ্জা তেমনি চাল চলন বচন বাচন। অভিনেতার নাম জিজ্ঞাসা করে জানলাম, শান্তিগোপাল। মুগ্ধ হয়ে অভিভূত হয়ে পালাটির আদ্যোপান্ত উপভোগ করলাম। পালাটি শেষ হতেই শিব ভট্টাচার্য আমাকে সাজঘরে নিয়ে গেলেন। হিট্‌লার তখন সাজসজ্জা খুলছেন। বুকে জড়িয়ে ধরলাম তাকে। স্বতস্ফূর্তভাবে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—"কে রে তুই—এতকাল কোথায় লুকিয়েছিলি?" আমার সে যেন একটা আবিষ্কারের আনন্দ। এমনি করেই ঐ তরুণ অপেরাতেই পেয়েছি পালাকার শম্ভু বাগকে। সত্য সত্যই এঁরা বাংলার আনন্দলোকে এক অসাধ্য সাধন করেছেন।"

"আমরা এতকাল দেখেছিলাম যাত্রার পালার বিষয়বস্তু ছিল ধর্মমূলক পৌরাণিক কাহিনী, প্রেম ভক্তিমূলক রাধাকৃষ্ণ এবং পরে এসেছিল ভারত ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী। পরে অবশ্য আমাদের সামাজিক কাহিনী যাত্রার বিষয়বস্তু হয়। যাত্রার বিষয়বস্তুতে রাজনৈতিক ছায়াপাতও হয় বিশেষ করে মুকুন্দ দাসের অবদানে। কিন্তু কোন বিদেশী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পটভূমিকায় সর্বাধুনিক রাজনৈতিক মতবাদের সংঘাতে সমুজ্জ্বল—এমন সব পালা তরুণ অপেরা তথা শান্তিগোপাল প্রথম আমদানি করে একটি নব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছেন। এঁরা শুধু হিট্‌লার নয় স্তালিন, মাও-সে-তুং—কাউকেই বাদ দেননি। স্বদেশের নেতাজী সুভাষকেও এঁরা পালার মধ্যে দিয়ে জীবন্ত করেছেন। আমার ধারণা ছিল এইসব রাজনৈতিক কাহিনী ও ভাবধারা পল্লী বাংলার অশিক্ষিত অথবা অর্ধশিক্ষিত মানুষের কাছে মোটেই আকর্ষণীয় হবে না—বরং দুষ্পাচ্যই হবে। কিন্তু আমার এ ধারণা যে কত ভ্রান্ত তা প্রমাণিত হয়েছে পল্লীবাংলাতে তরুণ অপেরার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা দেখে।

সমস্ত ব্যাপারটা আমি খুব ভাল করে ভেবে দেখেছি। পল্লীবাংলায় এঁদের জনপ্রিয়তার কারণ প্রথমতঃ শান্তিগোপালের অদ্ভুত আশ্চর্য অভিনয়, দ্বিতীয়তঃ শম্ভু বাগ প্রমুখ তরুণ নাট্যকারদের নাট্য রচনা ও উপস্থাপনার কলাকৌশল এবং তরুণ অপেরার সামগ্রিক প্রযোজনা। সবার ওপরে অবশ্য আরেকটি মহা সত্য বিদ্যমান। সেটি হচ্ছে আধুনিককালে পল্লীবাংলার মানুষের মনে রাজনৈতিক সচেতনতাবোধ জাগানো। শান্তিগোপাল যাত্রা পালাগানে এই সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা দেশময় প্রচারে চিরতৎপর থাকুন আমার অন্তিম কামনা রইল।" —বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

"তরুণ অপেরার হিট্‌লার পালার মধ্যে ঘটনার তীব্র ঘাত প্রতিঘাত ও শ্বাসরোধকারী উত্তেজনা সৃষ্টি করতে নাট্যকার সম্পূর্ণ সক্ষম হয়েছেন। একদিকে রাশিয়ার প্রবল জাতীয়তাবাদ এবং অন্যদিকে দুর্ধর্ষ জাতির লৌহনায়ক হিট্‌লারের গভীর ট্রাজেডী নাটকে মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। একরম যুদ্ধ নাটক যাত্রায় দেখেছি বলে মনে হয় না।"

—**ডঃ অজিতকুমার ঘোষ**

"তরুণ অপেরার হিট্‌লার, যাত্রা-নায়ক এবং অভিনয়, নাটকে এবং অভিনয়ে যুগান্তর আনিয়াছে।" —**ডঃ সাধন ভট্টাচার্য**

"যুগোপযোগী পরিবর্তনের মাধ্যমে আমাদের এই প্রচীন লোকশিল্পটি তার হৃত মর্যাদা ফিরে পাক এবং জনজীবনে নূতন আনন্দের খোরাক যোগাক—আমি এই প্রার্থনা করি।"

—**অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়** (পঃ বঃ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী)

"হিটলার নাটকের যাত্রাভিনয় দেখে বিশেষ আনন্দিত হলাম। নাটকটির মঞ্চসজ্জা, রূপসজ্জা, সঙ্গীত, আবহসঙ্গীত, ঘটনাবিন্যাস, অভিনয়, সবই অতি উচ্চাঙ্গের এবং যাত্রাভিনয়ের ক্ষেত্রে নব পথ-প্রদর্শক।"

—**রমা চৌধুরী,** (প্রাক্তন উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)

"শক্তিশালী অভিনব প্রযোজনার ফসল তরুণ অপেরার হিটলার প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।"

—ডঃ **গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য** (অধ্যাপক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)

"যাত্রা শিল্পীগণ বিষয় নির্বাচন এবং আঙ্গিক গঠনের দিক হইতে ইহাকে যুগোপযোগী করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহাতেই বাঙালীর শ্রেষ্ঠ লৌকিক অনুষ্ঠানটি বিনাশের হাত হইতে রক্ষা পাইবে।" —**ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য**

"রুশ জার্মান যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত হিট্‌লার......ভারতে সর্বপ্রথম এই ভয়ানক দুঃসাহসিক নাটকের অভিনয়।" —**বর্ধমান শ্রমিক**

"যাত্রাভিনয়েরও একটা আঙ্গিক আছে এবং তার ব্যাপ্তি ও গতি তার সম্পূর্ণ নিজস্ব। হিট্‌লার যাত্রাভিনয়ে সেই গতি বজায় আছে, এবং একটি জীবনকে শিল্পের রসায়নে সঞ্জীবিত করে তুলে ধরার মধ্যে যে ঐকান্তিক সাধনার রূপ দেখতে পাওয়া গিয়েছে, তা বিস্ময়কর।"

—**ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়** (লালগোলা মহারাজা)

..."লেনিন আমাদের কালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতা যাঁর জীবনী রচনা এবং অভিনয় এক দুরূহ ব্যাপার। তবুও নির্দ্বিধায় বলা যায় তরুণ অপেরা এ বিষয়ে এক বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছে। এই সাফল্যের প্রধান শান্তিগোপাল—" **এ. এস. প্যারান্তিয়েত, [সোভিয়েত ভাইস কনসাল]**

"বিশিষ্ট অভিনেতা শান্তিগোপাল নাটকের শুরু থেকেই দর্শকমনে স্থায়ী স্থান করে নেন। তাঁর গভীর আন্তরিকতা, চরিত্র উপলব্ধি ও তাঁর প্রকাশভঙ্গীতে তিনি অনন্য।...কঠিন মুহূর্তগুলোকে আশ্চর্য অভিনয় প্রতিভায় দীপ্ত করে তোলেন। ভনবোক যখন পরাজয় বার্তা বহন করে এনেছিল, তা শোনার সঙ্গে সঙ্গে হিট্‌লারের যে আকস্মিক হুঙ্কার এবং ক্রমে আত্মপ্রত্যয়ের জন্ম, পরন্তু আদেশ প্রদান—এই মুহূর্ত সৃজনের বুঝি তুলনা হয় না—"

[আনন্দবাজার ঃ ৬ অগ্রহায়ণ ১৩৭৫]

..."হিটলার-এর ভূমিকায় শান্তিগোপালের অভিনয় এ নাটকের প্রধানতম আকর্ষণ, ঐ চরিত্রের উল্লাস এবং উচ্ছ্বাস, আনন্দ এবং বেদনা, উচ্ছলতা এবং উন্মত্ততা শান্তিগোপালের অভিনয়ে সার্থকরূপ পেয়েছে—" **[দেশ ঃ ৩১. ৫. ৬৯]**

"দেখতে দেখতে ক্ষণে ক্ষণে চমকিত হয়েছি—অভিভূত হয়েছি এর নাট্য প্রযোজনা দেখে, আর বেরিয়ে এসেছি এক নতুন সূর্যের আলো দেখতে দেখতে—বাংলার লোকশিল্প যাত্রা তার আপন যাত্রা পথে ঠিকই এগিয়ে যাচ্ছে—যাবে। আর হিট্‌লার হচ্ছে সে যাত্রা পথের নতুন বাঁক। পালাকার শ্রীবাগ অত্যন্ত দরদের সঙ্গে হিট্‌লারকে চিত্রিত করেছেন, ফলে পালার দর্শকের ওই সন্ত্রাস স্রষ্টার প্রতি শুধু ঘৃণাই নয়, সহানুভূতিও দেখা যায়।"

—যুগান্তর

"হিটলার-নাটকে এবং অভিনয় রীতির ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করল।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা

"বিশ্বত্রাস হিট্‌লার এবং সমসাময়িক ঘটনাকে মঞ্চে উপস্থাপনা করাই দুঃসাহসিক ব্যাপার আবার রুশ জার্মান সংঘর্ষের পটভূমিকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা আরও দুঃসাধ্য। এদিক থেকে তরুণ অপেরার নব্যতম অবদান প্রশংসনীয়, এবং বলতে দ্বিধা নেই, এ প্রশংসা ছিল স্বতোৎসারিত।"

—অমৃত

"Young Hitlar as created by Shantigopal has few discernible traces of evil genius……."

The Indian Express/22.5.70

"Tarun Opera's two persentations "Lenin" and "Hitlar" impressed me a great deal primarily became of Shantigopal's charectrisation and his remarkbly wide range of voice……Shantigopal has obviously worked hard to understand the charecter and mannerism of these two men of history. It is for the first time I have seen charecters neatly come to line on the Jatra stage." **[Times of India at 22.5.70]**

"This Pala presents the thrilling story of the tragic end of Hitler."

[Amrita Bazar Patrika]

এ ছাড়াও অধ্যাপক, প্রবন্ধকার অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়), রাধারাণী দেবী, নীহারচন্দ্র রায়, নারায়ণ চৌধুরী, মধু গোস্বামী (কবি / সাংবাদিক গণশক্তি), দৈনিক বসুমতী, কালান্তর, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড (খগেন রায়), স্টেটস্‌ম্যান, বাংলাদেশের আরও বহু বুদ্ধিজীবি এবং সংবাদপত্রর বহু অভিনন্দন পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রক্ষিত আছে।

শান্তিগোপাল তবুও ভাগ্য বিড়ম্বিত! শিব ভট্টাচার্যের মত অভিভাবক, স্ত্রী পূরবী পালের প্রেরণা, চারদিকের বিশ্বাসী কিছু মানুষের সান্নিধ্য হারিয়ে শান্তিগোপাল আজ দেহে সতেজ কিন্তু মনের দিক থেকে মৃত এক সৈনিক।

নব অম্বিকার জন্ম এবং অমিয় বসু ঃ অমিয় বসুর জন্ম ১৯২৬ সালে কলকাতার স্যার গুরুদাস ব্যানার্জী রোডে। বাবা প্রয়াত প্রমথনাথ বসুর আপত্তি সত্ত্বেও থিয়েটারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। দাদা চন্দ্রভূষণ ছিলেন সংগীত রসিক, তিনি উৎসাহ দিতেন ভাইকে। ক্যালকাটা আকাডেমিতে পড়ার সময়ে অমিয় প্রথম 'বন্দীবীর' নাটকে অভিনয় করেন। আঠার বছর বয়সে সি.পি.ডাব্লু.-ডি-তে ইঃ সুপারভাইজারের চাকরি পান। পাশাপাশি সৌখিন থিয়েটারে অভিনয়। অভিনেতা নিমাই চক্রবর্তীর সাহায্যে স্টার অপেরায় 'টিপুসুলতান' পালায় মুসেল আলি চরিত্রে প্রথম আসরে নামেন। তারপর থেকে বিভিন্ন দলে। যুক্ত হন চন্ডী অপেরায়। তারপর নট্ট কোম্পানিতে আসার পর অমিয় বসুর খ্যাতি। এখানে 'দেবতার গ্রাস' পালায় 'শঙ্খচূড়' চরিত্রে অভিনয় করে নায়ক অমিয় বসু প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা হন। দীর্ঘ ন'বছর নট্ট কোম্পনিতে থেকে 'আকালের দেশ', 'সমাজের বলি', 'সিরাজদৌল্লা', 'টিপু সুলতান', 'কোহিনুর', 'প্রতিশোধ' এবং আরও বহু পালায় অভিনয় করে আসর তোলপাড় করেন। অমিয় বসু নট্ট কোম্পানির তখন একটা মেরুদণ্ড বলা যেতে পারে। হঠাৎ

একদিন অমিয় বসু দেখলেন, নট্ট কোম্পানির প্রবীণ অভিনেতা কালীয়দমন গুহঠাকুরতা অত্যন্ত মানসিক আহত হয়েছেন! আহত হবার কারণ ছিল অপ্রীতিকর। সব শুনে অমিয় বসু নট্ট ত্যাগ কবার সিদ্ধান্ত নেন। কালীয়দমনবাবুকে বলেন, আলাদা দল তৈরি করতে হবে। অমিয়বাবু ও কালীয়দমনবাবুর সঙ্গে একযোগে বেরিয়ে আসেন অভিনেতা বিমল লাহিড়ী, মধু ব্যানার্জী, নট্ট কোম্পানির অফিস কর্মী অশ্বিনী দাস।

কয়েকদিনের মধ্যে 'অম্বিকা' প্রতিষ্ঠা করেন। সবাই বলে অমিয় বসুর 'অ', মধু ব্যানার্জীর 'ম', বিমল লাহিড়ীর 'বি', কালীয়দমন গুহঠাকুরতার 'কা' নিয়ে 'অম্বিকা' নামকরণ হয়। ঘটনাটি সত্য নয়। এই নাম রাখেন অমিয়বাবুর গুরুদেব, শক্তিসাধক কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য। তিনি ছিলেন 'মা কালী'র পূজারী। মায়ের আর এক নাম 'অম্বিকা'। তখন একটি যাত্রাদল তৈরি করতে মূলধন পঁচিশ হাজার টাকা প্রয়োজন হত। অগত্যা শেয়ারের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে দল। অমিয় বসু দেন বারো হাজার টাকা, কালীয়দমনবাবু দিয়েছিলেন চার, মধুবাবু তিন, বিমলবাবু তিন এবং অশ্বিনী দাস তাঁর বেয়াই মশায়ের (মেয়ের শ্বশুর) কাছ থেকে তিন হাজার টাকা এনে দিয়েছিলেন। এই মোট পঁচিশ হাজারে দল তৈরি হয়। এরপর একের পর এক পালা উপহার দিয়ে অম্বিকা অচিরেই খ্যাতি পায়। পরে অংশীদারেরা অংশ ত্যাগ করে শুধুমাত্র অভিনেতা হিসেবে থাকেন। অমিয়বাবু হন একক কর্ণধার!

অমিয় বসু অভিনেতা হিসেবে সকলের শ্রদ্ধেয় ছিলেন। তিনি শ্রীরাধা নাট্য কোম্পানি নামে আর একটি দল তৈরি করেছিলেন। জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে 'বিদ্রোহী নজরুল' পালার ব্যাপারে ভীষণ বিতর্কিত ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। এ ব্যাপারে পালাকার ব্রজেন দে প্রসঙ্গে বিস্তারিত বলা হয়েছে। এরপরই অমিয়বাবু মারা যান! ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত অমিয়বাবু 'নব অম্বিকা' চালান এককভাবে।

১৯৭৮ সালে দলের জেঃ ম্যানেজার ও অমিয়বাবুর স্নেহের পাত্র অনিল দাস নব অম্বিকা লীজ নেন অমিয়বাবুর জীবদ্দশায়।

'৭৯-৮০ সালে গণেশ অপেরার মালিক গোষ্ঠ ঘোষের জামাই প্রকাশ ঘোষ নব অম্বিকা লীজ নেন। ১৯৮১ সালে অভিনেতা রাজা ভট্টাচার্য সস্ত্রীক এই দল কিনে নেন।

অমিয় বসু তাঁর জীবদ্দশায় কোম্পানির গুড উইল রক্ষার কথা ভাবতেন, পাওনাদারদের পাওনা টাকা মেটাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হতেন। বর্তমান অনেক মালিকের মত দলের ও পালার যাবতীয় ব্যাপার দলের শীর্ষস্থানীয় শিল্পীর ওপর ছেড়ে দিয়ে অপরাধীর মত থাকতেন না।

॥ নিউ প্রভাস অপেরা / তিনকড়ি ও দীনবন্ধু গুছাইত ॥

এমন একটা সময় ছিল যখন যাত্রায় পৃষ্ঠপোষকতা করতেন বেশ কিছু বিত্তশালী ব্যক্তি। তেমনি একজন বিত্তশালী লোক ছিলেন সন্তোষ দাস। চিৎপুরের গরানহাটার ডাকসাইটে বাড়িয়ালা। শোনা যায় একটি দুটি বা পাঁচ-দশটি নয়, খান ষোল বাড়ির মালিক এই সন্তোষবাবুকে সবাই জানত গরানহাটার জমিদার। যাত্রা খুব ভালবাসতেন সন্তোষবাবু, সেই ভালবাসা থেকে এক সময়ে একটি যাত্রাদল খোলার ইচ্ছে হয় তাঁর। নিছক ব্যবসার জন্য নয়, আসলে এই যাত্রা দল তাঁর বিলাসের অঙ্গ। যে ভাবনা সেই কাজ। সব ঠিক করলেন। চিৎপুর—গরানহাটার মুখে মেসার্স কে. এল. দে যে বাড়িতে, ঐ সময়ে সেই বাড়িরও মালিক ছিলেন সন্তোষবাবু। সুতরাং গদি খোলার অসুবিধে নেই। ঐ বাড়িতে তৈরি হল যাত্রা দল। অনেক ভেবে চিন্তে সন্তোষবাবু দলের নাম রাখলেন প্রভাস। একমাত্র পুত্র প্রভাসের নামে এই যাত্রা দলের নাম হয়, প্রভাস অপেরা। প্রভাস ছিলেন অসামান্য বেহালা বাজিয়ে। আজও তিনি বেঁচে আছেন হয়তো কোথাও।

বাংলা ১৩২১ সনে সন্তোষ দাসের এই দল প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন থেকে একটানা ৪৬/৪৭ বছর সেই দলকে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন সন্তোষবাবু। এই দীর্ঘ সময়ে প্রভাস পালা প্রযোজনা

এবং উপস্থাপনার জন্য চরম খ্যাতি অর্জন করেছিল। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পালা হল, 'দেশের ডাক', 'চন্দ্রশেখর', 'স্বামীর ঘর', 'পুরুষোত্তম', 'শিবাজী' ইত্যাদি। অনাথবন্ধু রায় এবং বিজয় মিত্র এই দুই অভিজ্ঞ ম্যানেজার ছিলেন এই দলের অনেক ভরসা।

দিনে দিনে সন্তোষবাবু এই যাত্রা প্রতিষ্ঠানের জন্য হারিয়েছিলেন অনেকগুলো বাড়ি, উৎসাহ, তারপর একদিন শারীরিক অসুস্থতার জন্য দল বিক্রি করে দেন রাম সিং-এর কাছে। রাম সিং অবশ্য এই নামেই এই দলকে চালিয়েছিলেন মাত্র দুই বছর আর তিন বছর প্রতিষ্ঠানের দরজায় তালা ঝুলিয়ে রেখেছিলেন।

ইতিমধ্যে রমেন বসু মল্লিক "নিউ প্রভাস" নাম দিয়ে একটি দল খোলেন। দীনবন্ধু গুছাইতের নানা সাহায্যে! রাম সিং অসন্তুষ্ট হলে সকলের বড়দা, দীনবন্ধুর দাদা তিনকড়ি গুছাইতের মধ্যস্থতায় এবং আর্থিক সহায়তায় রাম সিং দলটি তিনকড়িবাবুর কাছে বিক্রি করেন। বড়দা দলের মালিক করে দেন দীনবন্ধুকে।

॥ তিনকড়ি গুছাইত ॥

হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার নিমডাঙ্গী গ্রামের ছেলে তিনকড়ি গুছাইতের জন্ম ১৩২৫ সনে। ১৩৪১ সনে বাবার মৃত্যুর পর সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ে কাঁধে। মাত্র ১৬ বছর বয়সে ১টি টাকার ভেলায় চেপে চলে আসেন কলকাতায়। ছাতা তৈরির কারখানা থেকে মার্কেণ্টাইল প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে, পরে দশ বছর এ প্রেস ও প্রেসে কাজ করে, ১৩৬৩ সনে গড়ে তোলেন ছাপাখানা চিৎপুরে। নাম সিস্‌কো প্রিণ্টার্স। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, উদয় অস্ত শ্রম দিয়ে প্রেস চালাতে থাকেন।

তিনকড়িবাবু বাইরের অনেক কিছু ছাপাতেন তার সঙ্গে ছাপতে থাকলেন যাত্রার হ্যান্ডবিল, যাত্রার প্রোগ্রাম! এরই ভিতর দিয়ে একটু একটু করে যাত্রা জগতের কেউ না হয়েও, সকলেরই আপনজন হয়ে উঠলেন তিনকড়িবাবু। তিনকড়িবাবুর অন্য চার ভাইয়ের মধ্যে যুবক দীনুকে তখন পাশে টেনে নিয়েছেন। সিস্‌কো প্রিণ্টার্সে দীনু দাদার পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করে যায়। মাঝে মধ্যে যাত্রা দেখে। এই যাত্রা দেখার মধ্যে ছেলেবেলার দিনগুলোর ছবি যেন স্পষ্ট দেখতে পায় দীনবন্ধু। ছেলেবেলায় দেশের শীতলা নাট্য সমিতির অনেক থিয়েটারে সখের অভিনয় সে করেছে। আরামবাগ মহকুমার নিমডাঙ্গা গ্রামে, বড়দা তিনকড়ি গুছাইত এবং গ্রামের আরও অনেকে মিলে মিশে এই সখের থিয়েটারের দল তৈরি করেছিলেন! 'সুরেন্দ্রনাথ গুছাইতের চতুর্থ ছেলে দীনবন্ধুর জন্ম ১৩৩৬ সনে ঐ নিমডাঙ্গায়। ১৯৪৯ সালে ম্যাট্রিক পাশ করার পর দীনবন্ধুর সেই সখের থিয়েটার অনেকটা মাটি হয়ে যায়। দীনবন্ধু চলে আসেন কলকাতায়। জয়পুরিয়া কলেজে কমার্সের ছাত্র হয়ে পড়াশোনার ভিতরে এই ছাপাখানায় দাদার পাশে এসে দাঁড়াতে হয় তাঁকে।

মাঝে মাঝে দীনবন্ধুর কানে আসত, যাত্রা লাভজনক ব্যবসা! কথাটা এক সময়ে দাদার কানে তুলে দিল সে। কানে এল, বেশ খ্যাতি থাকা সত্ত্বেও প্রভাস অপেরার দরজায় তালা। তিনকড়ি গুছাইত বড়দাদা হয়ে দীনবন্ধুর থিয়েটার যাত্রার প্রতি যে ভালবাসা তার হদিশ রাখতেন বলেই এক সময়ে রাম সিং-এর কাছ থেকে প্রভাস অপেরা নামটি ও তার গুডউইলটুকু কিনে নিয়ে তুলে দিলেন ভায়ের হাতে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার, রাম সিং-এর বাড়িতে এক সময় ভাড়া থাকতেন তিনকড়িবাবু। আর দীনবন্ধুকে যাত্রার ব্যাপারে মন্ত্রণাদাতা তখন রমেন বসু মল্লিক।

১৩৭৩ সনে দুর্গা ষষ্ঠীতে বাগবাজারের মদনমোহনতলার ঠাকুর বাড়িতে যাত্রা জগতের তদানীন্তন ধারা অনুসারে পালা খুললেন দীনবন্ধু—'কবরের কান্না'। প্রতিষ্ঠানের নামের আগে

বসিয়ে দিলেন একটি মাত্র শব্দ—'নিউ'। সেই থেকে নিউ প্রভাস অপেরার যাত্রা শুরু। সঙ্গে ছিল আরও পালা, বাঁচতে দাও', 'ঠাকুর নরোত্তম', আর 'ফুটপাত'। দলের নায়ক হলেন তৎকালীন খ্যাতিমান শিল্পী বিজন মুখার্জী।

১৩৩৪ সন। দলের টপ আর্টিস্ট হয়ে এলেন পান্না চক্রবর্তী। সেবারে জনপ্রিয়তা পেল 'মরণ সংকেত', 'গুপ্ত রহস্য'। এর মধ্যে, বলা যেতে পারে একেবারে গোড়াপত্তনে তিনকড়ি গুছাইত আর দীনবন্ধু গুছাইত যে মানুষটিকে সঙ্গে নিয়েছিলেন তিনি রমেন বসুমল্লিক। দিন যত যায় এই তিনটি মানুষ তত বেশি নতুনত্বের সন্ধানে দিশাহারা হয়ে পড়েন। তারই ফলশ্রুতি, যুগের সঙ্গে তাল রেখে এ দলে প্রথম এঁরা আমদানি করলেন যুদ্ধের দৃশ্যে আধুনিক মারণাস্ত্র। আর সেই সঙ্গে আনলেন আলোর চমক। এ সবের কৃতিত্ব অবশ্যই 'অজাত শত্রু'র। ১৩৭৫ সনে এঁদের 'পাগল ঠাকুর' পালা সারা পশ্চিমবঙ্গে ভক্তিরসের বন্যা এনে দিয়েছিল। এ পালাতে অজাতশত্রু প্রথম প্রবর্তন করলেন 'যাত্রা স্কোপ', অর্থাৎ আসর অন্ধকার করে দিয়ে সেই গাঢ় অন্ধকারে বায়স্কোপের মত ফুটে উঠল কালী মূর্তি। ১৩৭৬ সনে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে এঁরা আসরস্থ করলেন 'জ্বলন্ত বারুদ', 'রক্তে রোয়া ধান'। তারপর একে একে 'আমি মুজিব বলছি', 'ভগৎ সিং', 'হো-চি-মিন', 'ভিয়েতনাম', 'শিরি ফরহাদ' এই প্রতিষ্ঠানের ভিতকে শুধু শক্ত করেনি, সেই সঙ্গে চিরস্মরণীয় করেছে এর অভিযান। তিনকড়ি ও দীনবন্ধুবাবুর এই প্রতিষ্ঠান চলচ্চিত্র পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার কুণাল মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় বিশ্ববন্দিত সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন' (কাহিনী ঃ উপেন্দ্রকিশোর) যাত্রার আসরে হাজির করে শুধু না, শ্রীরায় সুরারোপিত গান ব্যবহার করে এক নতুন ইতিহাস রচনা করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত যাত্রা উৎসবে আসরস্থ 'হো-চি-মিন' পালা দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ জীবনী মূলক পালা হিসেবে পুরস্কৃত হয়।

অনেক নতুন নাট্য প্রতিভা, গ্রুপ থিয়েটারের কয়েকজন বিশিষ্ট নাট্যকারকে যাত্রায় এনে যাত্রা নাটকের সার্বিক কল্যাণের দিকটা ভেবেছিলেন তিনকড়িবাবু। তিনকড়িবাবু যাত্রা জগতে 'বড়দা' নামে খ্যাত।

যাত্রার সমকালীন অগ্রগতির অন্যতম পুরোধা, একাধিক সংগঠনের স্রষ্টা-সভাপতি তিনকড়িবাবুর পরবর্তী সময়ে 'যাত্রালোক' প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পিছনে ছিল রমেন বসুমল্লিকের প্রেরণা। তিনকড়িবাবু 'পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সংসদ'-এর সভাপতি হিসেবে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে 'বিনয়-বাদল-দীনেশ', বাংলা যাত্রা দেখার পরিপ্রেক্ষিতে সংসদের পক্ষে মানপত্র প্রদান করে নিজেকে ধন্য করেন। ১৯৭৩ সালের ১৫ অক্টোবর মহাজাতি সদনে আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্দিরা গান্ধীর হাতে শ্রীগুছাইত কর্তৃক প্রদত্ত মানপত্রটি ছিল এই রকম ঃ

মহান ভারতের মহিমময়ী নেত্রী, মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

মহোদয়া সমীপেষু—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাম্প্রতিক আনুকূল্যে পশ্চিমবঙ্গের এক মৃতপ্রায় লোকশিল্প পেয়েছে প্রাণ—সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে এই প্রাচীন লোকশিল্প-আর আজকের এই যাত্রানুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সংসদকে ধন্য করেছে।

হে মহিয়সী!

আপনার অনমনীয় দৃঢ়তা ভারতকে দিয়েছে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ—আপনার উদাত্ত কণ্ঠ প্রাণসঞ্চার করেছে সারা ভারতবাসীর মধ্যে, সারা দেশবাসী আজ নিজেদের ধন্য মনে করছে আপনাকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে। সেই সঙ্গে আমরাও আশান্বিত হয়ে থাকছি আপনার আনুকূল্যের

আশায়। আমরা আশা করবো আপনার হস্তক্ষেপ নতুন প্রাণের সঞ্চার করবে এই মৃতপ্রায় লোকশিল্পে।

নমস্কারান্ত-ইতি

১১৭, রবীন্দ্র সরণী "পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সংসদ"

কলিকাতা-৬

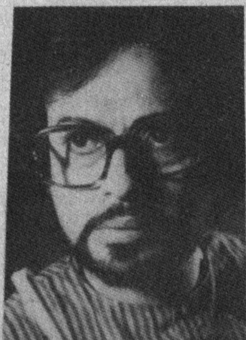
১৫।১০।৭৩

বয়ঃ বৃদ্ধি, বিশ্বাসহীনতা, পারিবারিক ক্ষেত্রের চিরন্তন খেলা, অসুস্থতা এবং আকস্মিক মৃত্যু একে একে নিশ্চিহ্ন করেছে তিনকড়িবাবুকে। দীনবন্ধু গেছেন হারিয়ে। হৃদয় দিয়ে গড়া "সিস্‌কো প্রিন্টার্স"কে বাঁচিয়ে রেখেছে বড়দার যোগ্য পুত্র।

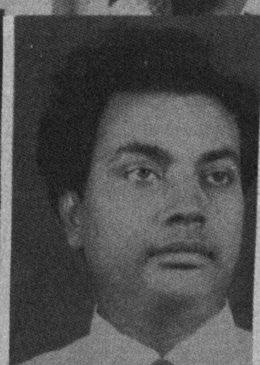
॥ আর্য অপেরা ॥

'শশীভূষণ হাজরার দল'-এর মালিক শশীবাবুকে ডাকাতরা খুন করার পর তাঁর দুই ছেলে দল বন্ধ করে দিলে। সেই দলের সব লোকজন, পোশাক পরিচ্ছদ নিয়ে অতুলকৃষ্ণ বসুমল্লিক তৈরি করেন আর্য অপেরা। এই অতুলবাবু বজবজ জুটমিলের বড়বাবু ছিলেন। অতুলবাবুর ছিল দুই ছেলে। এক ছেলে নিরঞ্জন বসুমল্লিক বাবার মৃত্যুর পর উক্ত জুটমিলে বাবার পোস্টে চাকরি করতেন। ছোট ছেলে সুরঞ্জন ছিলেন ইস্টার্ন রেলের গার্ড। পালাকার হিসেবে অতুলকৃষ্ণের খ্যাতি ছিল। আগের অনেক দলেই অতুলবাবুর পালা অভিনীত হত। নিজের দলের জন্য তিনি লেখেন 'পুণ্যবল'। যাত্রার ইতিহাসে যা কখনই হয়নি, এই দলে তাই একদিন হলো। অভিনেতা এবং ফাইফরমাস খাটা যুবক বিজয় মিত্র একদিন একটা ক্যান্টিন্ খুললেন। এই দলের ম্যানেজার ছিলেন হেমচন্দ্র মণ্ডল। হেমবাবুর মত দক্ষ, বিচক্ষণ ম্যানেজার তখন খুব কমই ছিল। তাঁর দল চালাবার পদ্ধতি ছিল আর পাঁচজনের শেখার মত। বিজয় মিত্র তাঁর কাছেই ম্যানেজারি শিখেছিলেন। সেই বাড়িটাতে পরে হয় অম্বিকা নাট্য কোম্পানি, অলিম্পিক অপেরা। ১৯৫৯ সালে আর্য অপেরার গদি হয় উল্টো দিকে কালী লিথো প্রেসের ওপরে। তখন অতুলবাবুর দল পরিচালক ছিলেন শিব মুখার্জী। তৎকালীন একজন বড় অভিনেতা হিসেবেও শিববাবুর খ্যাতি ছিল। এই আর্য অপেরা এক সময়ে যাত্রা জগতের হাইকোর্ট ছিল (এক সময়ে কোন বিষয়ে যাত্রা পাড়ার কারও কোন অভিযোগ থাকলে অতুলবাবুর পরামর্শে তার মীমাংসা হতো)! পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে অতুলকৃষ্ণ বসুমল্লিক যখন অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল হতে থাকলেন তখন অভিনেতা, দল পরিচালক শিব মুখার্জী দলের সর্বময় কর্তার মত কাজ করতেন। অতুলবাবুকে সব দিক দিয়ে সাহায্য করতেন। এই দলের শেষ দিকে অনেক জাঁদরেল শিল্পীদের মধ্যে যাঁদের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন দাশু রায়, অজিত দাস, শিব ভট্টাচার্য, গোপাল চট্টোপাধ্যায়। এঁরা একটা গ্রুপ হয়ে গিয়েছিলেন। যে সময়ে আর্য অপেরার রানীদুর্গাবতী, রামপ্রসাদ, ধর্মেরবলি, বাঙ্গালী ইত্যাদি ব্যবসায়িক চরম সাফল্য এনে দিয়েছিল, সেই সময়ে এই দলের সঙ্গে ম্যানেজার ও অভিনেতা হিসেবে যুক্ত হয়েছিলেন রাজেন মণ্ডল। আসাম-ডুয়ার্সের বুকিং এজেন্ট তখন মুকুল বোস। এই সময়ে অতুলবাবুকে শিব মুখার্জীর মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য মাঝে মাঝে দিতেন নারায়ণবাবু। যা হোক, আবার আসামে আর্য অপেরার মত এক অভিজাত প্রতিষ্ঠানের ভাঙন শুরু হয়ে গেল। এক দল স্বার্থান্বেষী মানুষ দলের অস্থি পর্যন্ত খাবার জন্য তৎপর। নানা দিক দিয়ে প্রতিরোধ আর প্রতিবাদ করতে গিয়ে রাজেন মণ্ডল বারবার পরাজিত হতে থাকলেন। এদিকে অতুলবাবু অসুস্থ, অন্যদিকে শিববাবুও কমজোরি। রাজেনবাবুরা দল নিয়ে চলে এলেন সর্বশেষ আপার আসামে টিসু গার্ডেনে দু' পালা যাত্রা করে, সোজা শিলিগুড়িতে। শিলিগুড়ি থেকে দল কলকাতায় ফিরিয়ে এনে এক স্মরণীয় কীর্তি স্থাপন করে ছিলেন রাজেন মণ্ডল।





মনোজ মিত্র, প্রশান্ত পাল, সুবীর চ্যাটার্জী, তপন গাঙ্গুলী, তরুণকুমার, অরুণ মুখার্জী, তাপসকুমার, মনোজকুমার, শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়।

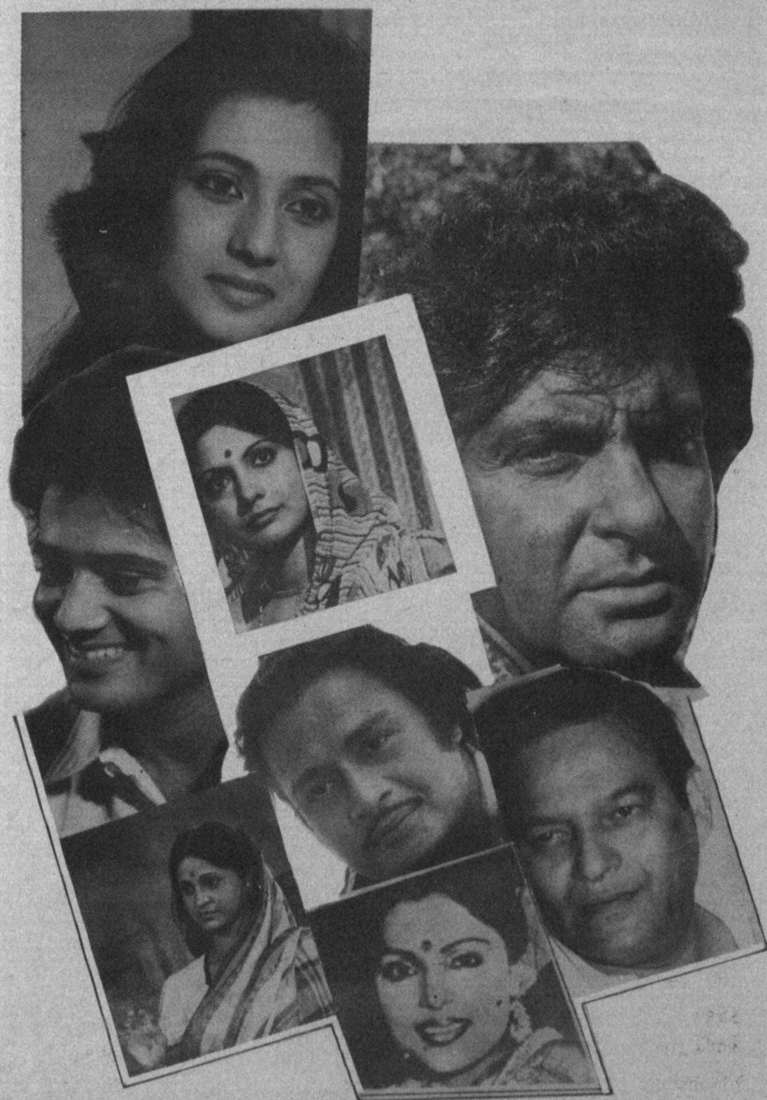


□ সঞ্চিত মুখার্জী, শর্মিলা পাল, স্মিতা পাঠক·

কাজল মুখার্জী, শিলা সেন, জুঁই কুণ্ডু।



☐ লীনা চক্রবর্তী, মধুশ্রী দেবী, কৃষ্ণা চক্রবর্তী, সুদেষ্ণা রায়, মিনতি দাস, শর্মিষ্ঠা গাঙ্গুলী, মীনাকুমারী, সাহানা বোস, শ্যামলী ভট্টাচার্য।



□ মুনমুন সেন, সুমিত্রা মুখার্জী, জর্জ বেকার, তাপস পাল, শুভেন্দু চ্যাটার্জী, অলোকা গাঙ্গুলী, পাপিয়া অধিকারী, নিমু ভৌমিক।

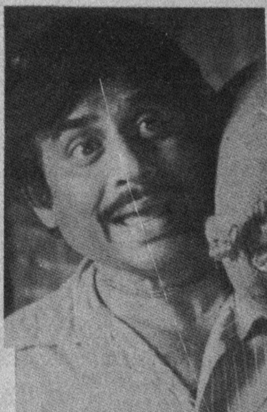




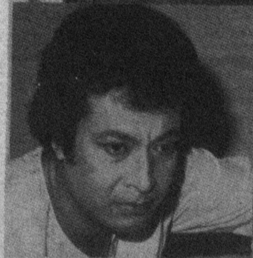
সংবাদ চিত্র ☐

১৯৭৩। পঃ বঃ সরকার কর্তৃক রবীন্দ্র সদনে আয়োজিত যাত্রা সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন পঃ বঃ যাত্রা সংসদের সভাপতি তিনকড়ি গুছাইত সহঃ সভাপতি কিষাণ দাশগুপ্ত।

পালাকার, নির্দেশক, অভিনেতা দুলাল চট্টোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে যাত্রা দেখতে এসেছিলেন ডঃ রমা চৌধুরী. তখন তিনি ছিলেন রবীন্দ্র ভারতীর উপাচার্য।





সিনেমা থেকে যাত্রায় □

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (পালা রচনা/নির্দেশনা/অভিনয়), অনুপকুমার, তরুণকুমার, দীপঙ্কর দে, সন্তু মুখার্জী, রবি ঘোষ, উজ্জ্বল সেনগুপ্ত, দিলীপ রায়, ভিক্টর ব্যানার্জী।








সুপ্রিয়াদেবী, সাবিত্রী চ্যাটার্জী, বাসন্তী চ্যাটার্জী,
সন্ধ্যা রায়, অনামিকা সাহা,
শ্রীলা মজুমদার।

এরপর রাজেনবাবু চলে যান অন্য দলে। অতুলকৃষ্ণ বসুমল্লিকের স্বপ্ন দিয়ে, অর্থ দিয়ে, শ্রম দিয়ে গড়া, যাত্রা জগতের হাইকোর্ট হিসেবে আখ্যায়িত যে আর্য অপেরা, তার চূড়া ধ্বসে গেল। ধীরে ধীরে খসে পড়তে থাকল অস্তিত্বের-ঐতিহ্যের পলস্তারা। আর্য বন্ধ হলো। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন অতুলকৃষ্ণ বসুমল্লিক।

॥ গোপাল চ্যাটার্জী এবং নিউ আর্য অপেরা ॥

প্রথম জীবনে অভিনয় করতেন চুটিয়ে। যেমন দীর্ঘদেহী, তেমনি ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর। অভিনয় করতেন হেতেমপুরের রাজাদের রঞ্জন অপেরায়। ১৯৪৯ সালে গোপাল চট্টোপাধ্যায় প্রথম অবতীর্ণ হন 'রূপনগরের মেয়ে" পালায়। প্রথম অভিনয়েই সকলের মন জয় করেন। এরপর একটানা দীর্ঘ কয়েকবছর তাঁর অভিনয় জীবন। অভিনয় করেন নিউ গণেশ অপেরার 'জয় সিংহ', আদি আর্য অপেরার 'দাসীপুত্র', 'বাঙ্গালী' 'রামপ্রসাদ' পালায়। রামপ্রসাদে নরহরি চরিত্রটি তাঁর অভিনয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। এরপর 'দোষী কে' পালায় বিশিষ্ট চরিত্র যুধিষ্ঠির বিশ্বাসকে দক্ষ অভিনয়ে এমন একটা মাত্রা যোগ করেছিলেন যে বাংলার অতীত যাত্রা দর্শকরা চিরকাল মনে রেখেছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গোপালবাবু দল গড়ার স্বপ্ন দেখেন এবং আর্য অপেরাকে 'নিউ আর্য অপেরা' নামে চিৎপুরে সোনাগাছির গা লাগোয়া এ্যালেন মার্কেটের মধ্যে একটি ঘরে প্রতিষ্ঠা দেন। এই দলকে অবশ্য গোপালবাবু দীর্ঘস্থায়ী করতে পারেননি।

নিউ আর্য অপেরার পক্ষ থেকে গোপালবাবু সত্যপ্রকাশ দত্তের 'বিষ নায়ক', ব্রজেন দে'র 'বাঙ্গালী', বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'ভক্ত ভৈরব', 'গিরীশচন্দ্র', উৎপল দত্তের 'রাইফেল' শান্তিরঞ্জন দে'র 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র' আসরে হাজির করে দলকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন প্রথম দিকে।

॥ ভারতী অপেরা / কালিপদ ঘোষ ॥

খুব ছোটবেলায় বাবা-মাকে হারিয়ে কালিপদ ঘোষ অতি বিপন্ন পরিস্থিতির মধ্যে পড়েন। অশ্বিনীকুমার ঘোষের ছেলে, হুগলীর আরামবাগ মহকুমার ভাদুর গ্রামে জন্মে বাজুয়া হাইস্কুলে ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়ার পর লেখাপড়া স্থগিত হয়ে গেল। অবস্থার দুর্বিপাকে পড়ে ১৩৫২ সনে যাত্রার সঙ্গে যুক্ত হন কিশোর শিল্পী হিসেবে। পেট চালাবার তাগিদে ভাসতে ভাসতে যখন এসে উঠেছিলেন অনুকূল মণ্ডলের যাত্রা দলে, অনুকূলবাবু তাঁকে দলে নিয়েছিলেন ছোট চরিত্রে অভিনয়ের জন্য। দলের মালিক ছাড়া প্রায় সকলেরই কাছ থেকে অনেক নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। কিছুদিন অনুকূলবাবুর দলে কাটিয়ে, কালিপদবাবু যোগ দেন ফ্রেণ্ডস্ অপেরায়। কর্মকর্তাদের সুনজরে পড়ে অল্প সময়ের মধ্যে অভিনয়ের সঙ্গে দলের ম্যানেজারের চাকরি পান তিনি। কৌতুক অভিনেতা হিসেবে যাত্রা জগতে বেশ পরিচিতি লাভ করেন। এখানে জানকী মেন্দার সঙ্গে পরিচিত হন। তারপর কালিপদবাবু চলে আসেন রঘুনাথ অপেরায়।

১৯৬৪ সালে কানাই নায়েক ও অভিনেতা ননী ভট্টের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠা করেন ভারতী অপেরা আরামবাগে। ১৯৬৬ সালে কলকাতার শোভাবাজারে দল আনার পর, সত্যম্বর অপেরার মালিক গৌর দাস, বিখ্যাত ব্যবস্থাপক হরিপদ বায়েন, বিজয় মিত্র প্রভৃতির সাহায্যে এবং বিশিষ্ট ম্যানেজার শম্ভু ঘোষ ও নিরাপদ দাসের সহযোগিতায় ভারতী অপেরাকে প্রতিষ্ঠা দিতে সক্ষম হন কালিপদ ঘোষ। ১৯৬৬ সালে চিৎপুরে (এখন যেখানে) ভারতীর গদি স্থায়ীভাবে তৈরি হয়। ভারতী অপেরার প্রকৃত খ্যাতি 'সূর্য সেন' পালা প্রযোজনার পর। প্রতিটি পালাকে ব্যবসায়িক সাফল্য দিতে কালিবাবু একে একে পালার প্রয়োজনে নিয়ে আসেন তাপস সেন, সবিতাব্রত দত্ত, জ্ঞানেশ মুখার্জী, অভিজিৎ ব্যানার্জী, রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, বীরু মুখার্জীর মত শিল্পী-সুরকার-আলোকশিল্পীদের। দলের বীজ বপন থেকে যিনি দলের সব দিকে সজাগ দৃষ্টি আজও রেখেছেন তিনি জানকী মেন্দা। সুস্থ নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে ভারতী অপেরার দান অনস্বীকার্য।

প্রথম দিকে রামপদ পাত্রের সহযোগিতা ছিল যথেষ্ট। সহেযোগিতা করেছিলেন নটসূর্য দিলীপ চ্যাটার্জী, পান্না চক্রবর্তী, চিত্রা মল্লিক আরও অনেকে। মধ্যকালীন সময়ে স্বপনকুমার, স্বপ্নাকুমারী এবং পরবর্তী সময়ে বীণা দাশগুপ্তার সহযোগিতা স্মরণীয়।

শিশুশিল্পী থেকে সহকারী ম্যানেজার, তারপর ম্যানেজার থেকে মালিক হবার দীর্ঘ পথে অজস্র কাঁটা মাড়িয়ে দেহ-মনকে ক্ষত-বিক্ষত করে আজ কালিপদবাবু জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছেও দলের সুনাম ও শ্রীবৃদ্ধি অক্ষুণ্ন রেখেছেন। সংসার জীবনেও সুপ্রতিষ্ঠিত। কালিপদবাবুর গৌরব তাঁর পাঁচ ছেলে-মেয়ের জন্য। বড় ছেলে W.B.C.S. পাশ করে সেলস্ ট্যাক্স অফিসার। তৃতীয় ছেলে আমেরিকায় বিজ্ঞানে পি. এইচ. ডি করছেন। অন্যেরা পড়ছেন। মেয়েরা সুখের সংসার রচনা করেছেন।

॥ সত্যনারায়ণ অপেরা / কালিপদ দাস ॥

দাশরথি দাসের ছেলে কালিপদর জন্ম নদীয়া জেলার মতিয়ারী গ্রামে। মামা বাড়িতে জন্ম। দেশের পাঠশালায় হাতে খড়ি। কালিপদ যখন দশ বছরের ছেলে তখনই পিতৃহারা হন। নিদারুণ দারিদ্র্যের জন্য এক সময়ে কালিপদকে ধড়া গলায় দোরে দোরে সাহায্য চাইতেও হয়েছে। এমত অবস্থায় লেখাপড়া না শেখায় আজ প্রতিষ্ঠিত কালিবাবুর ব্যথা অনেক। ধড়া গলায় আজ যদি কেউ তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে আসে, তার মধ্যে নিজের অল্প বয়সের সেই ছবিটা দেখতে পান তিনি। সব চাইতে ভয়ঙ্কর হলো, এক বছরের মধ্যে দুই ভাই, বাবা, মা এবং এক বোনের মৃত্যু নীরবে দেখেছেন তিনি। তাই ছেলেবেলাটা মূলতঃ ঠাকুমাকেই বাবা-মায়ের মত পেয়েছিলেন। সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল ছিল না বলেই ধনী মামাদের এই ভাগ্নেকে ধড়া গলায় দ্বারে দ্বারে ঘুরে সাহায্য চাইতে হয়েছিল। এই জীবনটাই পরবর্তী সময়ে কালিপদবাবুকে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ দেয়। এক সময়ে মিলিটারীদের মাথার টুপির লোহার চেন কারখানায় কাজ করেন। পিতলের বাসন তৈরির কাজ জানতেন কালিপদ। শিখেছিলেন সিমলার কাঁসারিপাড়ায়। পরে কিছুদিন নিজে বাসন তৈরির কাজ করেন। যখন প্লাস্টিকের পেনের উদ্ভব হয় তখন কালিপদ সেই পেন এবং পরে প্লাস্টিকের খেলনা কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাতে বিক্রি করে কোন মতে জীবনকে টিকিয়ে রেখেছিলেন। ভাগ্য তাঁকে টেনে আনে যাত্রায়। এখন যেটা নব অম্বিকার গদি ঘর ওখানে এক সময়ে ছিল শিবদূর্গা অপেরা। ঠিকে পার্টী। এটিই কলকাতার প্রথম ঠিকে পার্টী। এই দলের মালিক ছিলেন অবাঙালী গঙ্গাচরণ। রোজ আট আনা পারিশ্রমিকে কালিপদ এখানে ২ বছর কাজ করেছিলেন। এখানে 'ধ্বংসের দেবতা' পালায় দেবর্ষি চরিত্রে এবং 'আগুনের শিখা' পালায় রূপদান করেন। এরই মধ্যে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এক সময়ে কালিবাবু নিজেই দল তৈরির কাজে নেমে পড়েন। এখান থেকে-ওখান থেকে সামান্য অর্থ যখনই পান, তখনই একটা বাক্স, এক সেট পোশাক কিনে কিনে নিজেকে তিল করে গড়তে থাকলেন। গেলেন গোয়াবাগানের বাণীশ্রী অপেরায়। ওখানে নিজে অভিনয়ে যোগ দিলেন। আর নিজের পোশাক ভাড়া দিলেন। ১ বছর এ ভাবে চলার পর কালিবাবু চোরবাগানে তৈরি করলেন ঠিকে পার্টীর যাত্রা দল। যে ঘরে দল খোলার সুযোগ পেলেন, এক সময়ে সেখানে ছিল সুধীর মণ্ডলের তরুণ অপেরা। কালিপদ দলের নাম রেখেছিলেন প্রথমে ভারতী অপেরা। রেজিস্ট্রী ছিল না। এই সময়ে আরামবাগের ভারতী অপেরা কলকাতায় এলে, শম্ভু মোদক কালিপদকে দলের নাম পাল্টাতে বলায় কালিপদ নাম রাখলেন 'সত্য নারায়ণ অপেরা'। নব অম্বিকার বাড়িতে এক ফালি ঘরে সেই দলের গদি তৈরি করলেন। নিজে রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, মাইলের পর মাইল হেঁটে হেঁটে কালিপদ বিভিন্ন জায়গা থেকে বায়না জোগাড় করতেন। এক সময়ে তাঁর শ্রম, সাধনা সার্থক হলো। বলা বাহুল্য এই সময়ে 'নবযুগ সংসদ' নামেও একটা

ঠিকে দল ছিল, তাতে যুক্ত ছিলেন অরুণ দাশগুপ্ত-বীণা দাশগুপ্তা। আজ কালিপদবাবু শুধু প্রতিষ্ঠিত নন, তিনি পুত্রদেরও প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। তাঁর ছেলেদের মধ্যে দিলীপ দাস এখন যোগ্য উত্তরাধিকারী! কালিপদবাবু বলেন, লোভের বশবর্তী হয়ে আমি মুনাফার পিছনে ছুটিনি, আমি রাতারাতি ধনী হতে চাইনি, আমি কোনদিন কাউকে ঠকিয়ে নিজেকে সাজাতে চাইনি বলেই একটি একটি করে কুঁড়ি কুড়িয়ে মালা গেঁথেছি। বড় ছেলে প্রদীপকে তৈরি করে দিয়েছি আর একটি দল, লক্ষ্মীনারায়ণ অপেরা। আজ দুটি দলই পেশাদার দলের মধ্যে অন্যতম বিখ্যাত দল। সম্প্রতি কালিপদবাবু নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরার কর্ণধার হয়েছেন।

৷৷ নীলমণি দে এবং লোকনাট্য ৷৷

আজকের অন্যতম জনপ্রিয় যাত্রা প্রতিষ্ঠান লোকনাট্যর সত্ত্বাধিকারী নীলমণি দে-র জন্ম ১৩৩৭ সনের ২৮ মাঘ। ছেলেবেলা থেকেই যাত্রাভিনয়ের প্রতি বিশেষ একটা আকর্ষণ ছিল তাঁর।

অভিনেতা হিসেবে নয়, যাত্রা প্রযোজক হিসেবে যাত্রা দল গড়া বাস্তব করে তুলতে চাইলেন নীলমণিবাবু। সাহায্য চাইলেন প্রখ্যাত অভিনেতা পঞ্চু সেনের কাছ থেকে। সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন পঞ্চু সেন। এই সময়ে গৌর অধিকারী ছিলেন জয়দুর্গা অপেরায়। অর্থাভাবে দলটি তখন বিপন্ন। গৌরবাবু এই দলটি বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন। এক সময়ে পঞ্চু সেন শুনলেন গৌরের কথা। কথাটা পৌঁছে গেল নীলমণি দে'র কাছে। নীলমণি দলের হাল ধরলেন বটে কিন্তু জয়দুর্গা অপেরার গদিতে নীলমণি দে লোকনাট্যর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন। এক সময়ে ঘর বদল করলেন। প্রগতিধর্মী মন নিয়ে দল সাজালেন। শুরু করলেন একের পর এক নাট্য প্রযোজনা। সমকাল চেতনার সঙ্গে তাল রেখে নীলমণিবাবু শুধু মাত্র থিয়েটারের স্বনামধন্যা কেতকী দত্তকে আনলেন না, গ্রুপ থিয়েটারের তরুণ-শিক্ষিত-মার্জিত অভিনেতাদেরও আনলেন। ব্যানারের গুডউইল তৈরি তাঁর লক্ষ্য হলো। জোর দিলেন টীমওয়ার্কের ওপর। যাত্রা নাটকে আজকের সমাজ চেতনার বাস্তবরূপকে তুলে ধরলেন উৎপল দত্তের সঙ্গে হাত মিলিয়ে। পত্র-পত্রিকায় যাত্রার বিজ্ঞাপন শিল্পেও বিবর্তন আনলেন তিনি। ব্যক্তিগত জীবনে নীলমণি দে লৌহ ব্যবসায়ী, কিন্তু মনের রাজত্বে তিনি সম্পূর্ণ শিল্পী, তাই বোধ করি আজ নীলমণিবাবু অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রযোজক।

এ দলের প্রথম দিকের উল্লেখযোগ্য পালা ছিল 'একটি পয়সা', 'মুকুন্দ দাস', 'রামপ্রসাদ'। পালাগুলি প্রযোজকের কার্পণ্যহীনতার জন্য প্রশংসা পেল, কিন্তু ব্যবসায়িক সাফল্য পেল না। এবার আরও প্রগতিশীল পালা 'মানুষের রঙ' উপহার দিলেন বটে কিন্তু হঠাৎ সেই সময়কার শিল্পীরা অসহযোগিতা করতে থাকলেন। দলটি যেন ভেঙে যাবার মুখে। তবুও নীলমণি দে ভেঙে পড়লেন না। এরপর সুধাংশু মণ্ডল এবং আরও কয়েকজনের সহযোগিতায় আবার নতুন করে দল তৈরি করলেন নীলমণিবাবু। আসরে হাজির করলেন উৎপল দত্তের 'দিল্লী চলো'! যাত্রার দর্শককুল পুরোপুরি উৎপলীয় ধারার স্বাদ পেল। কম্পোজিশান, অভিনয় ধারা, সাজ-পোশাকের সঠিক নির্বাচন, আবহসংগীতের নতুন ধারার সঙ্গে পরিচিত হলেন দর্শকেরা। এরপর নীলমণি দে প্রতিষ্ঠিত লোকনাট্যের একের পর এক পালার সাফল্যে যাত্রাজগত চমকে উঠল। ইতিমধ্যে দর্শকেরা পালাকার ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের পালা রচনার কী নিদারুণ শক্তি, তার পরিচয় পেয়েছে। নীলমণি এবার ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়কে বাণিজ্যের লক্ষ্মী হিসেবে ধরে রাখলেন লোকনাট্যে। এই দলের 'জয় বাংলা', বিধায়ক ভট্টাচার্যের বিদ্যাসুন্দর, সন্ন্যাসীর তরবারি, গণদেবতা ইত্যাদি পালাগুলি যাত্রার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

যাত্রা শিল্পের সার্বিক কল্যাণের জন্য সংগঠন ধর্মী যত আন্দোলন হয়েছে, সেখানে নীলমণিবাবু বরাবরই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। যাত্রা সংসদ এবং পরে যাত্রা সম্মেলনের কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব নিয়েছেন অনেকবার। সম্পূর্ণ টীমওয়ার্ক ও ব্যানারের গুডউইল নির্ভর

'লোকনাট্য' প্রগতিবাদী প্রতিষ্ঠান হলেও শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে শ্রীদে'র এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ডি. মুখার্জী।

॥ গণনাট্য, নটসূর্য দিলীপ চট্টোপাধ্যায় এবং উত্তরাধিকার সন্দীপ ॥

মঞ্চে অভিনেতার প্রথম যে কটি শর্ত পালন করতে হয় তার মধ্যে চেহারা, কণ্ঠস্বর এবং অভিব্যক্তি ও উচ্চারণ। দিলীপবাবুর বোধ হয় এর অধিক কিছু ছিল বলে তাঁকে বিশ্বরূপা থিয়েটার থেকে বিদ্বজনেরা 'নটসূর্য' আখ্যা দিয়েছিলেন। বিতর্ক উঠেছিল অনেক। একই আকাশে দুই সূর্য যেমন পাশাপাশি উঠতে পারে না, তেমনি রঙ্গমঞ্চে দুই সূর্য থাকতে পারে না। সুতরাং 'নটসূর্য' আখ্যায়িত অহীন্দ্র চৌধুরীর পাশে নটসূর্য দিলীপ চট্টোপাধ্যায় অসম্ভব! বিতর্ক টেঁকেনি। আকাশে দুই সূর্য না উঠলেও, অভিনয়ের ক্ষেত্রে বার বার উদিত হয়েছে অনেক সূর্য! সেদিক থেকে যাত্রার ক্ষেত্রে দিলীপবাবু তপ্ত সূর্য। বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছিল সেইদিন, যেদিন ব্রজেন্দ্রকুমার দে'র অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'সোনাইদীঘি' পালায় দিলীপবাবু 'ভাবনা কাজী' চরিত্রটিকে অমর করেছিলেন। যাত্রার এক দুর্লভ শক্তিধর অভিনেতা দিলীপ চ্যাটার্জী, যিনি পেশাদারী অভিনেতা জীবনের ৪৩টি বছর খ্যাতি ও দাপটের সঙ্গে কাটিয়ে ১৯৯১ সালের, মাঝামাঝি সময় থেকে সসম্মানে অবসর নিয়েছেন।

হুগলী জেলায় এক প্রতাপশালী-অভিজাত জমিদার বংশে, রণজিৎকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে দিলীপ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯২৫ সালে। আঞ্চলিক সখের থিয়েটার বা যাত্রার দর্শক হতেন বটে রাশভারি রণজিৎবাবু, কিন্তু থিয়েটার-যাত্রার নটদের মোটেই ভাল চোখে দেখতেন না। বাড়ির বড় ছেলে দিলীপের সেই ভয় ছিল, কিন্তু তারই মধ্যে পুরাতন ধ্যান-ধারনার যে বেড়াজাল ছিল, তা তিনি একে একে ছিঁড়ে ফেলে প্রগতিবাদী মন নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। গ্রামের যেখানেই থিয়েটার, দিলীপবাবুও সেখানে। একবার লুকিয়ে অভিনয় করেন 'অন্নপূর্ণা নাট্য সমাজ'-এর 'রাজ্যশ্রী' নাটকে।

১৯৪১ সালে পিতৃবিয়োগ। বাবাকে হারিয়ে সংসারের হালধরার দায়িত্ব এসে পড়ে দিলীপবাবুর ওপর! অবশ্য জমিদারি বলতে সব কিছুই চলে গেলেও দিলীপবাবুর অংশে প্রাসাদতুল্য বাড়ি, বাড়ির গা লাগোয়া পুকুর ইত্যাদি স্থাবর-অস্থাবর কিছু ছিল। আজও যার ভগ্ন রেখার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়নি! যা হোক, দিলীপবাবুর চাকরি জীবন শুরু হলো। ১৯৪২ সালে তিনি বদলি হন মুরাদনগরে। এই যাবার মূলে ছিল কাকাদের তিরস্কার, বদনাম দেওয়া। সুতরাং দিলীপবাবু আরও চার ভাই বোন আর মাকে নিয়ে অনিশ্চিতের পথে ভেসে গেলেন। যা হোক, কর্মজীবনে এক অবাঙালী উর্ধ্বতন কর্মীর সঙ্গে মনোমালিন্যর জন্য দিলীপবাবু কাজ ছাড়লেন। চলে এলেন কলকাতায়। আবার বেকার জীবন। এবার সামান্য মূলধন সংগ্রহ করে ব্যবসা শুরু করলেন। কর্মীদের শত্রুতায় ব্যবসা নষ্ট হলো।

অগত্যা বেছে নিলেন যাত্রা জীবন। অতিকষ্টে সংগ্রহ করলেন 'নব রঞ্জন অপেরা'য় অভিনয় করার কাজ। ব্রজেন দে'র 'সতীতীর্থ' পালায় সামান্য একটা চরিত্রে প্রথম অবতীর্ণ হলেন। এরপর যুক্ত হন 'সত্যম্বর অপেরা'য়। ধ্রুব এবং আরও কিছু পালায় চুটিয়ে অভিনয় করলেন। 'মাটির মানুষ' পালার মধ্যমণি খ্যাতিমান অভিনেতা গুরুপদ ঘোষ অসুস্থ হওয়ায় তাঁর স্থলে রূপদান করলেন দিলীপবাবু। যাত্রা দর্শক নতুন ধারার অভিনয়ে মুগ্ধ হলেন। দিলীপবাবুর অভিনেতা জীবন পাকা হয়ে গেল! তারপর যখন সুধীর মণ্ডলের তরুণ অপেরার সব দায়িত্ব নিয়ে শান্তিগোপাল নতুন করে দল গড়লেন, সেদিন দিলীপ চ্যাটার্জী গেলেন তরুণে। খ্যাতি পেলেন। এরপর আরও কিছু দল, কিছু পালার পর অভিনেতা জীবনের চরম প্রতিষ্ঠা এল সত্যম্বর অপেরার 'ভাবনা কাজী' রূপদানের পর। একের পর এক দলের একাধিক পালায়, ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে রূপদান করে দিলীপবাবু যাত্রা

জগতে এক অসামান্য নজির সৃষ্টি করলেন। বিশ্বরূপা থিয়েটারে নিয়মিত অভিনয় করে সেখানেও তিনি দক্ষতার নজির রাখলেন। এরপর ১৯৭৭ সালে দিলীপবাবু 'শ্রীমা অপেরা' নামে একটি যাত্রা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, সঙ্গে রাখেন তাঁর শ্বশুর মশাই যোগেশ মুখোপাধ্যায়কে। দলের মালিক রইলেন, দলের পালার নায়কও রইলেন দিলীপবাবু, প্রযোজক যোগেশবাবু।

এই সময়ে শ্রীমতী কনকলতা শ্রীমা নাট্য কোম্পানি নামে একটি যাত্রা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য, দিলীপবাবু নতুন করে দলের নাম রাখেন গণনাট্য। যাত্রা দলের নামকরণে একটা বৈচিত্র্য এলো। প্রতিটি পালাই পেতে থাকল ব্যবসায়িক সাফল্য। দিলীপবাবু বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ থেকে পেয়েছিলেন 'নটসূর্য' খেতাব। এক সময়ে দিলীপবাবুর অভিনয়ের স্টাইল গেল পাল্টে। সবাই বলতে লাগল 'নটসূর্য স্টাইল'। এই স্টাইল বা দিলীপ ঘরানার অভিনয়ের জন্য যে পালাগুলি সুপারহিট করল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'পঙ্গপাল', 'রক্তের পাপ', 'মুঘল-ই-আজম', 'দাদাঠাকুর', 'অগ্নি সংকেত', 'তাজমহল', 'সিরাজদ্দৌলা', 'বিশ্ববন্দিত বিবেকানন্দ' ইত্যাদি।

যাত্রা জগতের এই দিক্‌পাল শিল্পী প্রবাসী বাঙালী মহলেও শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পেয়েছেন যথেষ্ট। ১৯৮৬ সালে নটসূর্য তাঁর শিক্ষিত, মার্জিত, সুদর্শন পুত্র সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়কে আনুষ্ঠানিক ভাবে, হাত ধরে নিয়ে এসে গণনাট্যের কর্ণধারের আসনে শুধু বসালেন না, সেই সঙ্গে পুত্রকে অভিনেতা হিসেবে আপন আসনে সংস্থাপন করলেন! তারপর ১৯৯১ সালে যাত্রা জীবন থেকে সসম্মানে অবসর নিলেন।

রাশভারি দিলীপবাবু সব ব্যাপারে যে গুডউইল তৈরি করেছিলেন, পুত্র সন্দীপ চ্যাটার্জী দলের মালিক হয়ে, নায়ক হয়ে বছর কয়েক চালিয়ে সেই গুডউইল ধরে রাখতে পারেন নি। গণনাট্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল ১৯৯৬ তে।

॥ দুলাল চট্টোপাধ্যায় এবং তপোবন নাট্য কোম্পানি ॥

ঘূর্ণায়মান মঞ্চের ডেমনেস্ট্রেশন চলছিল।

কয়েকটা টুকরো টুকরো ভারি কাঠের পাটাতন জুড়ে জুড়ে চোখের সামনে নিমেষে বিশাল গোলাকৃতি একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়ে গেল। কয়েক ফুট লম্বা, মোটা প্যাঁচ কাটা একটি লৌহ দণ্ডের সঙ্গে সেই বিশাল প্ল্যাটফর্মটি মোটা মোটা স্ক্রু দিয়ে আটকে দেওয়া হল। একটি স্তর তৈরি হবার পর ঠিক তেমনি গোলাকৃতি আর একটি স্তর তৈরি হয়ে গেল! এই দ্বি-স্তর গোলাকৃতি প্ল্যাটফর্মটি প্রথম স্তর অপেক্ষা অনেকটা ছোট।

আমি অবাক বিস্ময়ে সেই কারিগরি কর্মকাণ্ড দেখছিলাম। দেখছিলেন দুলালবাবু। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই প্ল্যাটফর্ম এক আসর থেকে অন্য আসরে বহন করে নিয়ে যাবার এবং এটি অভিনয় শেষে দ্রুত খুলে নেবার ব্যবস্থা কি?

দুলালবাবু বললেন, এই কয়েক টন ওজনের প্ল্যাটফর্মটি দেখলেন তা বহু অংশে বিভক্ত, এগুলি ফিট করতে কয়েক শত মোটা মোটা নাট বল্টু আছে, জনাপাঁচেক কলাকুশলী আছে। এই রিভলভিং স্টেজ মাত্র চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে ফিট করে দেবে—ডবল রিভলভিং, ভিন্নমুখী ভাবে ঘোরান হবে, নাটকের যেখানে যেখানে ঘোরাবার দরকার তখন ঘুরবে। যতক্ষণ না ঘোরান হবে ততক্ষণ দর্শকরা কিন্তু বুঝতে পারবেন না তাদের সামনে কোন গোলাকৃতি স্টেজ আছে। অভিনয় শেষে মুহূর্তের মধ্যে টুকরো টুকরো অংশ খুলে ফেলে ম্যাটাডোরে করে এক আসর থেকে অন্য আসরে পাঠান হবে।

প্রশ্ন ঃ নাটকে এই সব সস্তা স্টান্ট লাগিয়ে আপনি আপনার প্রযোজক ক্ষমতার অপব্যবহার করলেন কেন? পৌরাণিক পালা রচনা, উপস্থাপনায় আপনার আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল বলে আপনি 'পুরাণ রত্ন' উপাধি পেয়েছেন, সেই আপনিও এই সস্তা স্টান্ট যাত্রায় আনলেন?

দুলালবাবু নিজেকে সহজ করে নিয়ে বললেন,—না কোন অবস্থাতেই এটি সস্তা স্টান্ট নয়, বরং বলতে পারেন সম্প্রতি আমরা যেসব দর্শকদের হতাশ করেছিলাম, তাদেরও খুশি করার এ এক চমৎকার উপায়। আপনারা জানেন, একদিন অধিকাংশ যাত্রার আসর হত মাঝখানে, বৃত্তাকারে বসত দর্শক। এখন অধিকাংশ আসরের মূলত তিন দিকে দর্শক, তার উপরে অতীত ধারা অনুসারে ঘুরে ফিরে পজিশন পালটে পালটে অভিনয় হয় না, সুতরাং সব দর্শক, অনেক সময় অনেক জরুরি এবং হৃদয়গ্রাহী অভিনয়ের অংশ বা অভিব্যক্তি দেখতে পান না, মাইকের চোঙার ভিতর দিয়ে সংলাপ শুনে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। প্রথমত সেই ব্যাপারটাকে সহজ করার জন্যে আমার মাথায় এই পরিকল্পনা আসে। এখন চতুর্দিকের দর্শক বিশেষ বিশেষ জরুরী দৃশ্যগুলি দেখতে পাচ্ছেন, সেই সঙ্গে আমার নাটকের কয়েকটি দৃশ্যের জন্যেও এই রিভলভিং স্টেজের প্রয়োজন ছিল।

প্রশ্ন : দুলালবাবু, আপনার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান তপোবন নাট্য কোম্পানি আজ যথেষ্ট জনপ্রিয়, এই জনপ্রিয়তার কারণ কি আপনি স্বয়ং অভিনয় করেন বলে? যদি কোনদিন আপনি অবসর নেন সেদিন কি আপনার দলের এই খ্যাতি অক্ষুণ্ণ থাকবে?

উত্তর : আমাদের পালা প্রযোজনা বা উপস্থাপনার যে বৈশিষ্ট্য, অভিনেতা জীবন থেকে সরে গিয়ে যদি নাট্যকার এবং নির্দেশক বা প্রযোজক হিসেবে কাজ করি আমার ত মনে হয় দলের চাহিদা বিন্দুমাত্র হ্রাস পাবে না। একমাত্র আমার পালায় যে বৈশিষ্ট্য থাকে সেটিই হল, নাট্যশাস্ত্রের প্রথম নির্দেশ! বহু যাত্রাপালা আছে যেগুলি লেখা হয় শিল্পীদের দেখে। ধরুন আপনার একটি দল আছে, আপনি বিশিষ্ট কয়েকজন আর্টিষ্টকে ধরে রেখেছেন, আর্টিষ্ট বেশ নামী বলে আপনি কোন মরশুমে তাঁদের ছাড়ছেন না, তখন আপনি ত সেই আর্টিস্ট দেখিয়ে পালাকারকে বলবেন পালা লিখে দিতে? পালাকারও তখন সেই শিল্পীদের মধ্যে কে কেমন দেখতে, কে কি ধরনের রোল থাকলে ভাল অভিনয় করতে পারবেন সেই সব ভাবনা মাথায় নিয়ে সাবজেক্ট ভাববেন ও লিখে দেবেন ; এটাই হল আজকের চেহারা। কিন্তু নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশ তা নয়। নাটক বা পালা লেখা হবে এবং তার প্রয়োজন অনুসারে শিল্পী সংগ্রহ করতে হবে, তবেই পালার চরিত্রগুলি আইডেন্টিফায়েড হবে! আমি সেই নির্দেশ মেনে প্রথমে নাটক লিখি পরে শিল্পী সংগ্রহ করি।

প্রশ্ন : আপনি 'পুরাণ রত্ন' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। বোলপুরের প্রায় বারো জন বিদগ্ধ পণ্ডিত আপনাকে এই উপাধিতে কেন প্রকাশ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে ভূষিত করেছেন, তার সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেন?

উত্তর : পারি। প্রথমেই বলে রাখি বাংলাদেশে নাট্যক্ষেত্রে একদা, সে প্রায় চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর আগে এই ধরনের উপাধি দান অনুষ্ঠান কয়েক বার হয়েছিল। ভাটপাড়ার মহাপণ্ডিত সমাজ সে যুগে অনেক বিচার করে নাটকের ক্ষেত্রে যাঁকে যোগ্য বলে মনে করতেন তাঁকে আনুষ্ঠানিক উপাধি দান করতেন। যেমন নির্মলেন্দু লাহিড়ী মশাইকে 'বাণীবিনোদ' উপাধি, ফণিভূষণবাবুকে 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। যাত্রা জগতে অদ্যাবধি তেমনিভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে কেউ কোন উপাধিতে ভূষিত হন নি। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বোলপুরের এই পণ্ডিতমণ্ডলী আমার উপর নজর রেখে, আমাকে বিচার করে 'চাণক্য' রচনার জন্যে এই উপাধি দিয়েছেন। ১৯৮২ সনের ১৩ সেপ্টেম্বর মহাজাতি সদনে। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। আমার প্রতিটি পালায় শাস্ত্র ক্ষুণ্ণ হয় না, ইতিহাস গৌণ হয়ে—কল্পনা মুখ্য হয় না। যেমন আমার 'চাণক্য' পালা নব্বই শতাংশ ইতিহাস আশ্রিত। তথ্য ভিত্তিক। যা শ্রদ্ধেয় শিশিরকুমার ভাদুড়ীর 'চাণক্য'-তেও ছিল না। অভিনয়ের ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে তুলনা করার ধৃষ্টতা আমার নেই, কিন্তু পালা রচনায় তথ্য প্রয়োগ যে আমার তুলনায় অনেক বেশি দুর্বল এবং চর্বিত চর্বণ হিসেবে

চিহ্নিত হয়েছিল তা বলতে পারি। এই বিচার পণ্ডিতমণ্ডলী করেছিলেন বলেই বোধকরি 'পুরাণ রত্ন' উপাধিতে আমাকে প্রকাশ্যে ধন্য করে গেছেন।

প্রশ্ন : পৌরাণিক পালা রচনা করতে যে পাণ্ডিত্য প্রয়োজন হয় অনেকেই মনে করেন আপনার সেই পাণ্ডিত্য আছে। শাস্ত্র অধ্যয়নের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ, ঋক্‌বেদ-স্যামবেদ উপনিষদের যাবতীয় গল্প সংগ্রহ করে পড়া বা পড়ে হৃদয়ঙ্গম করা, গীতা-চণ্ডী, মহাভারত-এর অভ্যন্তরীণ ভাবরসামৃত আহরণ না করলে, ইতিহাস প্রসঙ্গে ওয়াকিবহাল না হলে সার্থক স্রষ্টা হওয়া যায় না ; আপনি কিন্তু অনেকাংশে সে দাবী করতে পারেন, সংস্কৃত সাহিত্য এবং শ্লোক আপনার কণ্ঠস্থ। এই যে একটা বিরাট দিক আপনার এর জন্য আপনার বংশ পরিচয় বা বংশধারার কোন ভূমিকা আছে বলে মনে করেন?

যাত্রা জগতের প্রসিদ্ধ নট, নাট্যকার, অভিনেতা, প্রযোজক দুলাল চট্টোপাধ্যায় এবার বেশ গর্বের সঙ্গে আত্মপরিচয় দিলেন। প্রপিতামহ শ্রীমন্ত তর্কালঙ্কার। মাতামহ অক্ষয়কুমার স্মৃতিতীর্থ। নড়াইল জমিদারদের ঘরোয়া পণ্ডিত ছিলেন মাতামহ। নিজস্ব টোল ছিল তাঁর। সেই টোলেই দুলালবাবুর মাতামহ অক্ষয়কুমার স্মৃতিতীর্থের সঙ্গে অনেক দিন অধ্যাপনা করেছিলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের 'কথামৃত' রচয়িতা সর্বজন শ্রদ্ধেয় শ্রীম।

সেই পণ্ডিত বংশের বংশধর হয়ে জন্মাবার যে সৌভাগ্য দুলালবাবুর, সেই সৌভাগ্যের জন্যই নিতান্ত শিশুকাল থেকেই সংস্কৃত কাব্য, রামায়ণ-মহাভারত-গীতা-চণ্ডী-র প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ অনুরাগ। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুরাগ বা ভাষা বিন্যাস, ভাষা তাৎপর্য, অভ্যন্তরীণ ভাবরসামৃত সেবনের আকাঙক্ষা। শেষ পর্যন্ত সেই ভাবরসামৃত আহরণ করে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত কাটিয়ে যাবার ব্রত নিয়েছেন।

১৯৬০ সালে দুলালবাবুর যাত্রা ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ। প্রথম আত্মপ্রকাশ 'ভারতীয় রূপনাট্যমে'। পরবর্তী সময়ে সম্ভবত সত্তর দশকে যখন পৌরাণিক-ঐতিহাসিক পালার চর্বিত চর্বণ নিয়ে যাত্রার দিনগত পাপক্ষয় চলছিল, যখন আধুনিকতার নামে পৌরাণিক-ঐতিহাসিক পালার ভাবমূর্তি ভেঙে পড়ছিল, সেই সন্ধিক্ষণে দুলালবাবু গড়ে তোলেন তপোবন। একে একে চণ্ডীমঙ্গল, অকালবোধন, তরণীসেন বধ, ভক্ত হরিদাস, মহারাজা হরিশচন্দ্র, জননী যোগমায়া প্রভৃতি পালা উপহার দিয়ে সেই ক্ষয়িষ্ণু নাট্যচেতনা, নাট্যভাবনা—পালাভাবনার চাপে ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনাময় ভাবমূর্তির সংস্কার করেছিলেন দুলালবাবু।

আর এই জন্যে এক সময়ে চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে চূড়ান্ত সংগ্রাম করতে হয়েছিল তাঁকে। পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে রামায়ণ গান গেয়ে, থালা নিয়ে দান তুলে নিজের এবং আরও অনেকগুলো পরিবারের ভাবনা ভাবতেন। সেই সংগ্রামের ফলশ্রুতি এই প্রতিষ্ঠান।

বহু পুরস্কারে সম্মানিত, যাত্রা থেকেই ঐশ্বর্যের মুখ দেখেছিলেন, দুই ভাইকে বহু বছর নিজের সঙ্গে রেখে উপযুক্ত কর্মী তৈরি করেছিলেন। পাপ ও পুণ্যের কতটা সৃষ্টিকর্তা দুলালবাবু তা একমাত্র তিনিই জানেন। তবে তপোবন, যোগামায়ার মত দুটি দলই আজ নিশ্চিহ্ন। ভাইরা আলাদা। ঐশ্বর্য বলতে দুলালবাবুর কন্যারা। একমাত্র ছেলে নীলকমল শিক্ষিত হয়েও বর্তমানে যাত্রা পাড়াতেই হোটেল মালিক। নেপথ্যে দুলালবাবুর শক্তি।

॥ আনন্দলোক / হৃষিকেশ মিত্র ॥

এই দলটি চিৎপুরে গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটা বড় ধরনের সাড়া ফেলেছিল। প্রথমত সংস্কৃতি চেতনা, আভিজাত্য, কৌলিন্য ইত্যাদি খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে মানুষের ব্যবহারে, চলনে-বলনে। হৃষিকেশবাবু ওরফে চন্দন মিত্রর সেটা ছিল বরাবরই। চন্দনবাবু এক সময়ে ভাল কবিতা-গান লিখতেন, একটা প্রকাশনা সংস্থারও জন্ম দিয়েছিলেন। এ থেকে বোঝা যায়, তাঁর ভিতরে

বরাবরই একটা শিল্প চেতনা ছিল। এরপর তিনি পেশাদার যাত্রায় অভিনয় করেছেন। অভিনয় ছেড়ে যাত্রা দলে ম্যানেজারী করেছেন। যাত্রার আদ্যোপান্ত দেখেছেন। যাত্রা দলের মালিক হয়েছেন। তিনি বুঝেছিলেন, যাত্রা হলো শো বিজনেস। এই শো বিজনেসে টিকে থাকতে হলে, গ্রাম-গঞ্জের নায়েকদের আকৃষ্ট করতে হলে চাই সব কিছুতেই চমক ও ঝকঝকে ব্যাপার, অর্থাৎ আগে দর্শনধারী পিছে গুণ বিচারী। সুতরাং হৃষিকেশবাবু দলের নামটি দিলেন অত্যন্ত আধুনিক। আনন্দবাজারের জনপ্রিয়তম সিনেমা পত্রিকা আনন্দলোক যখন রমরম করছিল, তখনই হৃষিবাবু দলের নাম রাখলেন 'আনন্দলোক'। যাত্রার ব্যাপারটা মূলত আনন্দলোক সেটা যেমন বজায় রইল, তেমনি কাউকে নকলও করা হলো না। সাইনবোর্ডটি লেখাতে বহু অর্থ ব্যয় করলেন। সাইনবোর্ড একবার যার নজরে পড়বে সে গদিতে ঢুকবেই তেমনি সাইনবোর্ড। গদিকে মুড়ে দিলেন সাদা সানমাইকায়। হরেক রঙ ব্যবহার করলে যে শিল্পসম্মত হয় না তা প্রমাণ করলেন। কাগজে বিজ্ঞাপন ছাড়লেন আধুনিকতম ডিজাইনে। তারপর একে একে এল কিছু পালা। প্রযোজনা করলেন যা বহু শক্তিশালী নাট্যব্যক্তিত্ব বা প্রযোজকরা আগে ভাবতে পারেননি, গোটা যাত্রা জগত চিন্তাও করতে পারেনি।

প্রযোজক-কর্ণধার হৃষিকেশ ওরফে চন্দন মিত্র শেষ চাকরি করেন গণেশ অপেরায়। গণেশ অপেরার দক্ষ পরিচালক ছিলেন। 'আনন্দলোক' যাত্রা শুরু করেছিল 'মায়ামৃগ' পালা দিয়ে। পঃ বঃ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ আয়োজিত যাত্রা উৎসব প্রতিযোগিতায় সামাজিক বিভাগে, শ্রেষ্ঠ সামাজিক পালায় পুরস্কার জয় করে এই পালা। এরপর "শাঁখা দিওনা ভেঙে" ও "পাণ্ডব বিজয়" আসরস্থ করেন। হিট হয় পালা। তারপর "হেলেন অব ট্রয়'-এর মত বিষয়কে যাত্রার আসরে তুলে দিয়ে বাংলা যাত্রায় এক ঐতিহাসিক মাত্রা যোগ করলেন। পালাকার-নির্দেশক অসিত বসুর সঙ্গে চন্দন মিত্র আলোচনা করে, প্রভূত অর্থ ব্যয় করে, বিশাল কাঠের ঘোড়া আসরে তুলে যাত্রাকে এক স্মরণীয় স্তরে পৌঁছে দিলেন। বিদেশী বিষয়কে যাত্রার আসরে এনে প্রযোজক চন্দন মিত্র যাত্রার একঘেয়েমি যুগের অবসান ঘটালেন। কম্পোজিশানে যাত্রার নির্দেশকদের নতুন কিছু করার প্রেরণা দিল। আবার প্রভূত অর্থে উপহার দিলেন 'আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ'। অভিনয়, টিমওয়ার্ক, আলোক নিয়ন্ত্রণ এবং প্রদীপ থেকে দৈত্য প্রকাশে বিশ্ববন্দিত জাদুকর পি. সি. সরকারের যাত্রায় আত্মপ্রকাশ হৃষিকেশবাবুর অবদান। এ ছাড়াও প্রযোজক হৃষিকেশ মিত্র ওরফে চন্দন মিত্র যাত্রাকে সমকালীন করার জন্য এমন অনেক কীর্তি স্থাপন করেছেন যা ইতিহাস হয়ে থাকবে, যার মধ্যে 'জুলিয়াস সিজর' প্রযোজনার দুঃসাহস।

'আনন্দলোক'-এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে জনকেরই কর্মের ফসল হিসেবে। জন্মেছি যখন তখন দাগ রেখে যাব, এই ভাবনার মানুষ শেষ পর্যন্ত জীবনকে নিয়ে জুয়া খেললেন। হারালেন সব। পঙ্গুত্ব তাঁকে গ্রাস করল।

ষাটের দশকের আগে ও পরের দল সমীক্ষা

এর কিছু আগে ও পরে এমন বহু যাত্রা দল বা অপেরা পার্টির জন্ম হয়েছিল যার মালিক-পক্ষ এই ব্যবসা থেকে মুনাফা লুঠবার মানসিকতা দেখাননি। এখন যেমন গোটা পৃথিবীটা মানুষের কাছে ছোট হয়ে গেছে, তেমনি একটা জেলার সঙ্গে অন্য জেলার, একটা প্রত্যন্ত গ্রামের সঙ্গে শহরের দূরত্ব প্রায় বিন্দুর মত হয়েছে। যানবাহন বা যোগাযোগ ব্যবস্থার এই স্মরণীয় অগ্রগতির সঙ্গে গোটা দেশের সর্বত্র, সাধারণ—অসাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে হরেক রকম চিত্তবিনোদনের উপকরণ। কিন্তু বছর কয়েক আগে পর্যন্ত গ্রাম-গ্রামান্তরের মানুষের কাছে আঞ্চলিক

কিছু উৎসব, মেলা-পার্বন ইত্যাদি ছিল চিত্ত বিনোদনের একমাত্র অর্ঘ্য। সিনেমা সর্বত্র পৌঁছতে পারত না। বাংলা থিয়েটারের কল শো তখন কল্পনাও করা যেত না। গ্রাম-গ্রামান্তরে বড় বড় সংগীত সম্মেলন, জাদু প্রদর্শনী ইত্যাদির প্রশ্নই ওঠে না। এই সময়ে গ্রাম-গ্রামান্তরে, হাটে-মাঠে একমাত্র ভালবাসার ধন ছিল যাত্রা। সেই সূত্রে গ্রামে গ্রামে তৈরি হয়েছিল যাত্রা গানের দল। আর ছিল কবি গান, তরজা, কীর্তন এবং কথকতার দল। এক শ্রেণীর মানুষ গ্রাম-গ্রামান্তরে মাইলের পর মাইল হেঁটে, তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে, খাল-বিল উপেক্ষা করে বিভিন্ন কমিটি বা ক্লাব থেকে বিভিন্ন দলের বায়না করে যেমন সংসার চালাতো, তেমনি শহর-শহরতলির যাত্রাকে পৌঁছে দিত গ্রামে। এর ফলে সব দলের অধিকারী বা দলের সঙ্গে জড়িত সকলেরই প্রতিটি কাজের মধ্যে থাকত চরম আন্তরিকতা। বিষয় নির্বাচন, উপস্থাপনা, অভিনয়, সংগীতে আপামর দর্শক যাতে তৃপ্ত হন, সেই সঙ্গে যাত্রা পালার মধ্য দিয়ে যাতে নিরক্ষরকে জ্ঞানী করা যায়, সব ব্যাপারে যাতে অজ্ঞতার অন্ধকারে চাপা পড়ে থাকা দেশ-কাল মানুষদের সচেতন করা যায় সেদিকে মালিক আর শিল্পী-পালাকারদের সর্বদা সজাগ থাকতে হতো। এর ফলে এক একটি সম্প্রদায় হয়ে উঠত যেন এক একটি একান্নবর্তী পরিবারের মত। অভিনয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক একটা মন থাকত বলে তৈরি হতো একাধিক শক্তিমান শিল্পী। যাত্রায় ফুটিয়ে তোলা হতো হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী, ধর্মনিরপেক্ষতা।

পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে সত্তরের গোড়া থেকে যাত্রা-তরীর পালে যতই নব জাগরণের বাতাস লাগতে শুরু করল, সামাজিক প্রেক্ষাপট ততই রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে রূপান্তরিত হতে থাকল। গণতান্ত্রিকতার সঠিক তাৎপর্য বা গুরুত্ব যাদের বোঝানো হলো না, সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে একদল সম্পূর্ণ পেশাদারি যাত্রাওয়ালা যাত্রাকে সরাসরি এমন একটা পণ্যে রূপান্তরিত করার চেষ্টায় মেতে উঠল, যার প্রভাবে যাত্রা তার রূপ ও ভাষা বদলাতে থাকল। এল আদর্শহীনতার যাত্রা। যাত্রার মালিকপক্ষ যতবেশি চিত্তবিনোদনের শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে যাত্রাকে উগ্র আধুনিক রাংতায় মোড়ার কাজে মরিয়া হয়েছেন, সমকালীন করে তোলার জন্য উচ্চ সুদে টাকা ধার করে যত উগ্র সাজে সজ্জিত করেছেন যাত্রাকে, তত বেশি যাত্রা হয়েছে ঐতিহ্য আর আদর্শচ্যুত। প্রোডাকসন কস্ট যত বেশি বেড়েছে, দলের বায়নার হার তত বৃদ্ধি পেয়েছে। নায়েক পক্ষ বাধ্য হয়েছেন টিকিটের হার বৃদ্ধি করতে। চমকে-জাদুতে-ঠমকে গ্রামগঞ্জের ঘাম ঝরানো মানুষ আকৃষ্ট হয়েছে যত বেশি, ততই আপাতদৃষ্টিতে সকলেরই ধারণা হয়েছে, যাত্রা হলো টাকা বানাবার কল। সেই লোভে যাত্রা জগতে নতুন নতুন যাত্রাদলের জন্মের হারও যে পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিক সেই পরিমাণেই মৃত্যুই হার বেড়েছে। লাভবান হয়েছে কলকাতার চিৎপুর অঞ্চলের প্রাচীন বাড়িগুলির মালিকরা। আকাশ ছোঁয়া টাকায় বহু ঘর, বহু গ্যারেজ, বহু দোকান ঘর পর্যন্ত বিকিয়ে গেছে যাত্রা মালিকদের কাছে। লাভবান হয়েছেন দলের শীর্ষস্থানীয় হিরো-হিরোয়িনরা। এক শ্রেণীর বহিরাগত মানুষ। ঐতিহাসিক আর পৌরাণিক পালাকে গলা টিপে মেরে ফেলায় কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলের খেংরাপট্টীর বহু যুগের পোশাক ব্যবসায়ীরা চরম সর্বনাশের মধ্যে তলিয়ে গেছেন। বহু মানুষ সর্বসান্ত হয়েছে আকস্মিক ভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া দলগুলির জন্য।

কতিপয় পালাকার আর শীর্ষস্থানীয় শিল্পীদের ভাগ্য সোনা দিয়ে মুড়ে গেছে আর মালিক বা প্রযোজকেরা ব্যক্তিত্ব হারিয়ে হয়েছেন তাঁদের হাতের পুতুল। এর ফলে পালা মৌলিকত্ব হারিয়েছে। বহু পালাকারের মাথায় ঢুকে গেছে ভি. ডি. ও। সিনেমার বিশেষ করে হিন্দি সিনেমার অনেক কাহিনীর প্রভাব পড়েছে পালায়। অতীত পালাকারদের লেখা পালা খোল নলচে পাল্টে গিয়ে নতুন নামে উঠে এসেছে আসরে। এই সব বিচিত্র কারণে একে একে বহু দলের দুয়ার বন্ধ হয়েছে, অনেক মালিক মৃত্যুর ভিতর দিয়ে মুক্তি নিয়েছেন। অনেক প্রযোজক বছর কয়েকের মধ্যে

মুনাফা লুঠে ঘরে ফিরে গেছেন। যাঁরা সমতা বজায় রাখতে পেরেছেন, একটা ব্যালেন্স রেখে চলতে পেরেছেন তাঁরাই টিকে আছেন আজও।

চল্লিশের দশকের শেষ থেকে নব্বই-এর দশকের সূচনা পর্যন্ত সময় কালের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাওয়া দলগুলি এবং নতুন করে সাজতে পারে এমন কিছু কিছু দলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দিয়ে রাখি।

শ্রীশ্রী শিবদুর্গা অপেরা □ এই দলটির মালিক ছিলেন শ্রীধরচন্দ্র মণ্ডল ও মোঃ আহম্মদ শেখ। এই দলের গৌরচন্দ্র ভড়ের "গরীবের মেয়ে" সফল হয়েছিল। **দি ভান্ডারী অপেরা** □ শ্রীচরণ ভাণ্ডারীর পর একটা 'দি' বসিয়ে এই দলের মালিক হন ননীগোপাল মণ্ডল। এর লেসি ছিলেন প্রবোধকুমার হালদার। বছর ২।৩-এর মধ্যে লেসি পাল্টে গেল। লেসি হলেন শম্ভুনাথ মোদক। লেসি প্রবোধবাবু চলে গেলেন পৃষ্ঠপোষকতায়। মালিক রইলেন ননীবাবু। নন্দগোপাল রায়চৌধুরীর "সোনার সংসার", দর্শক মন জয় করেছিল। নাট্য পরিচালক ছিলেন পালান নস্কর ও ফণি দত্ত। সুরকার ছিলেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত। **গুরুদাসী নাট্যম** □ তিমিরকুমার প্রামাণিক ছিলেন মালিক। এই দলে প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের "মসনদ কার" অভিনীত হয়। **ভারতীয় রূপ নাট্যম** □ এটি অমর ভট্টাচার্যের দল ছিল। অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়ের "নাগিন কন্যা" পালা অভিনীত হয়। অমিয় ভট্টাচার্য ছিলেন সুরকার। ম্যানেজার ও পরিচালক ছিলেন যথাক্রমে অনিল রায় ও শৈলেন পাল। এই দলের ব্রজেন দে'র "বিজয় বসন্ত" জনপ্রিয় হয়। পরে পরিচালক হন গোপেন দেব। **নব নাথ কোম্পানি** □ এ দলের মালিক ছিলেন সত্যদুলাল হাটি ও সুশীলকুমার দাস। পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, হরেকৃষ্ণ হাটি ও গৌরহরি সামন্ত। নির্মল মুখোপাধ্যায়ের ৫ অঙ্কের ঐতিহাসিক পালা "কান্নার কূলে" জনপ্রিয়তা পায়। নাট্য পরিচালক ছিলেন গৌর বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরকার, মণি ব্যানার্জী। ম্যানেজার ও পরিচালক ছিলেন যথাক্রমে কানাইলাল হাজরা ও শম্ভু মোদক। **নব নারায়ণ অপেরা** □ মালিক ছিলেন নারায়ণচন্দ্র ঘোষ। ম্যানেজার ও পরিচালক ছিলেন গৌর পাল ও মন্মথ মজুমদার। প্রসাদ ভট্টাচার্যের "মসনদ কার" অভিনীত হয়। ব্রজেন দের "গীতগোবিন্দ", ধর্মমূলক ঐতিহাসিক পালা এঁরা যখন আসরস্থ করেন তখন পরিচালক, সৌরেন রায়। **নাগ কোম্পানি** □ তখন এই দলের মালিক ছিলেন শিবু নাগ। এঁদের "বাগদী ডাকাত" তখন হিট করেছিল। অনিলকুমার দাসের পালা। কাল্পনিক। ম্যানেজার ছিলেন জগদীশ দে। সুরকার, রাজ্যেশ্বর নন্দী। **শতরূপা যাত্রা প্রতিষ্ঠান** □ বি. এন. মজুমদারের দল। এই দলের "চুয়াচন্দন" ঐতিহাসিক পালাটি লিখেছিলেন ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়। নাট্য পরিচালক ছিলেন নির্মলকুমার ভট্টাচার্য। কার্যাধক্ষ ও পরিচালক ছিলেন প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুধীরকুমার ঘোষ। **রিক্তা নাট্য কোম্পানি** □ এঁদের প্রোগ্রামে মালিক তারাপদ সামন্তের নাম খুব ছোট টাইপে ছাপা ছিল, পরিচালকের নাম কাশীনাথ পাল ছিল বড় টাইপে। কানাইলাল নাথের "মাটির প্রদীপ" ছিল অভিনীত পালা। ম্যানেজার ও বুকিং ম্যানেজার ছিলেন যথাক্রমে কেশব দাস ও সুকুমার দত্ত। **কুণ্ডু নাট্য কোম্পানি** □ এটি ছিল তারকনাথ কুণ্ডুর দল। দেবেন্দ্রনাথ নাথের "মৃত্যু বাসর" পালা জনপ্রিয় হয়েছিল। নাট্য পরিচালক ছিলেন বিজন মুখার্জী। সুরকার রাজ্যেশ্বর নন্দী। দলের ম্যানেজার তখন রাজেন মণ্ডল। পরিচালক উপেন অধিকারী। যুগ্ম পরিচালক পরিতোষ ধাড়া। **শ্রীদুর্গা অপেরা** □ নাগের শিবু নাগ আর নারায়ণচন্দ্র নন্দী দু'জনে মালিক। দেবেন্দ্রনাথ নাথের "সাতভাই চম্পা" ছিল এঁদের জনপ্রিয় পালা। সুরকার, শ্রীদেব, রাজ্যেশ্বর নন্দী। পরিচালক জগদীশচন্দ্র দে। **ষ্টার অপেরা** □ সন্তোষকুমার ব্যানার্জীর দল। এ দলে অভিনীত হয়েছিল সাধন দে রচিত "মায়ামৃগ"। ঐতিহাসিক। সুরকার ছিলেন গোপাল চক্রবর্তী। ম্যানেজার ও কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন বিষ্ণু মজুমদার আর মদন ভট্টাচার্য। **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অপেরা** □ দলটি তৈরি করেছিলেন মুরারীমোহন পাল। ম্যানেজার ছিলেন রমেন

চ্যাটার্জী। এই মুরারীবাবুই ছিলেন সুরকার। পঙ্কজকুমার রায়ের পৌরাণিক "তারকাসুর বধ" পঙ্কজবাবুরই পরিচালনায় জনপ্রিয় হয়েছিল। **বাণী অপেরা** □ এটি ছিল গোঁসাই দাস সাহার দল। এঁদের দলের প্রধান গদিঘর ছিল কালীঘাট রোডে। প্রায় ১০টি পালা সব সময়ের জন্য প্রস্তুত থাকত এই দলে। **দেশশ্রী থিয়েটার** □ গরানহাটায় ছিল এই দল। বড় বড় অভিনেতাই এই দলে কাজ করেছেন। দলের সেক্রেটারী, বিজনেস ম্যানেজার, ব্যবস্থাপক ছিলেন যথাক্রমে হিমাংশু চৌধুরী, জগদীশ দে, সত্য পাঠক। **রূপমহল থিয়েটার** □ মূলত শক্তিমান অভিনেতা শরৎ চট্টোপাধ্যায় দলটি তৈরি করেছিলেন। **নব চলন্তিকা** □ সুবলচন্দ্র নিয়োগীর দল। গোরাচাঁদ বসু রোডে ছিল গদি। তখনকার দিনের আর একজন প্রখ্যাত অভিনেতা গণেশ গোস্বামী ছিলেন এ দলের নাট্য পরিচালক। বুকিং ম্যানেজার তখন শুকদেব মুখার্জী। **ভারতী নাট্য সমাজ** □ বিডন স্ট্রীটে ছিল গদি। দুলাল দত্তের দল। ব্যবস্থাপক ছিলেন সত্য পাঠক। **ভ্যারাইটিস ডান্স এন্ড অপেরা পার্টি** □ **অভিজাত বীণাপাণি চলন্তিকা ঃ** এ দুটি ছিল মথুরামোহন হিতৈষীর দল। চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে ছিল গদি। এ দলের সুরকার ছিলেন অজিত বসু ও কার্তিক দে। ম্যানেজার ছিলেন, হেমেন্দ্র ভট্টাচার্য। ফণি সরখেল ছিলেন বুকিং এজেন্ট। **চলন্তিকা অপেরা** □ দলটি তৈরি করেছিলেন রামনাথ সিং। এই দলের হ্যাণ্ডবিলে লেখা ছিল—

"রঙ্গমঞ্চ বা চলচ্চিত্র আজ নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নূতনতর পথে এগিয়ে চলেছে। যাত্রা জগতেরও এমনি একটা পরিবর্তন আবশ্যক। নূতন রক্তধারার অভাবে যাত্রা অভিনয় আজ নির্জ্জীব ও মৃতপ্রায়। সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে এর গলদগুলি অপসারণ কর্ত্তে না পার্লে বাংলায় এই লোক হিতকর নিজস্ব শিল্পটির নিকট ভবিষ্যতে বিলুপ্তির আশঙ্কা আছে—"

নিউ ভোলানাথ অপেরা □ কেবলচন্দ্র দাসের দল। হেড অফিস ছিল দুর্গারচণ মিত্র স্ট্রীটে। ম্যানেজার ছিলেন তারাপদ সেন, পরিচালক ছিলেন, যতীন চক্রবর্তী। আগে যিনি যাত্রার আসরে যতীনরানী হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। **গোপাল জিউ নাট্য সঙ্ঘ** □ রামকৃষ্ণ বাগচী লেনে এর অফিস ছিল। এই দলের "নদের নিমাই"পালার যশ হয়েছিল। এঁরা হ্যাণ্ডবিলে তৎকালে সাধারণ মানুষের মনে মহাপ্রভুর লীলামৃত পৌঁছে দেবার জন্য লিখতেন—"নদের দুলাল কে? কোথায় তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল?"—আরও লেখা হয়েছিল—"বাঙ্গালীর কোন পূণ্যবলে তিনি নর দেহ ধারণ করিয়া বাঙ্গলায় অবতীর্ণ হইয়া আত্মহারা বাঙ্গালীকে মিলনের মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়া ভাগবৎ প্রেম বিলাইয়া তাহার শুষ্ক জীবন-নদে ভক্তির বন্যা বহাইয়া দিয়াছিলেন—" **আমাদের থিয়েটার** □ কৌতুক সম্রাট রঞ্জিত রায়ের তৈরি। এটি মূলত থিয়েটারের দল হলেও আসরে যাত্রা করত।

চারের দশকের অন্তিম কাল থেকে ছ'য়ের দশকের সূচনা কালের মধ্যে এই দলগুলি জন্মেছে, ব্যবসায়িক সাফল্য পেয়েছে কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। কিছু কিছু যাত্রাদল বা ব্যানার হাত বা মালিকানা বদলাতে বদলাতে বেশ কয়েক বছর টিকে ছিল। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হয়, এই দলগুলি এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল যা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। যেমন ঃ

□ এক সময়ে এক একটি দল ৫ থেকে ১২ খানা পালা সব সময়ে প্রস্তুত রাখত। বিশেষ করে ঐতিহাসিক, পৌরাণিক পালার তখন চাহিদা ছিল প্রকট বলেই এক সঙ্গে একাধিক ঐ ধরনের পালা করতে রয়াল ড্রেসের প্রয়োজন মেটাতে ঝুঁকি নিতে হতো প্রযোজকদের। কৃষ্ণের পোশাক হয়তো পরানো হতো সাজাহানকে। এর মধ্যে যেমন বহু ঐতিহাসিক পালার নামকরণ করা হতো সামাজিক পালার মত করে। আবার বহু পালাকার সরাসরি সামাজিক পালা না বলে বলতেন কল্পনাশ্রিত পালা।

❑ বহু শিল্পীর জন্ম হয়েছিল এই যুগসন্ধিক্ষণে। যাঁদের অভিনয় মাধুর্যে দর্শকরা সংলাপের

মধ্য দিয়েই উপলব্ধি করতেন রাত-দিন, স্থান-কাল, ঝড়-ঝঞ্ঝা, তরঙ্গসঙ্কুল নদী অথবা রাজদরবার থেকে নিকষ কালো অন্ধকার কারাগার।

❑ অতীতে থিয়েটারের শিল্পীরা যেতেন চলচ্চিত্রে তাই চলচ্চিত্র ক্ষেত্রের বিজ্ঞাপনে দিকপাল শিল্পীদের অমুক থিয়েটার থেকে আনা হয়েছে এমন প্রচার চালিয়ে প্রযোজকরা গৌরব বোধ করত। এখন যাত্রা জগত চলচ্চিত্র ক্ষেত্র থেকে ফিল্ম স্টার এনে নিজেদের গৌরবান্বিত করেন। সকলের ধারণা, যাত্রায় ফিল্ম স্টার আমদানির রেওয়াজ এসেছে ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে, সত্তরের দশক থেকে তা একটু একটু করে প্রকট হয়েছে। আসলে চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের এবং চলচ্চিত্রের তৎকালীন ডাকসাইটে বহু অভিনেতা-অভিনেত্রী যাত্রার আসর মাতিয়েছেন। যথা অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, ম্যালকম, মহেন্দ্র গুপ্ত, রঞ্জিৎ রায়, নবদ্বীপ হালদার, নৃপতি চ্যাটার্জী, ফিরোজবালা, জহর রায় আরও অনেকে। তেমনি যাত্রাভিনয়ে দোর্দণ্ড প্রতাপ দেখিয়েছেন ঐ সময়ে বড় ফণি, ছোট ফণি, শরৎ চট্টোপাধ্যায়, সুনীল মুখার্জী (রামু), শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিত চক্রবর্তী, গণেশ গোস্বামী, পঞ্চু সেন আরও অনেকে।

❑ অতীতে থিয়েটার আর সিনেমা থেকে অভিনেতা আনিয়ে ব্যবসায়িক সাফল্যের জন্য যে চেষ্টা ছিল "নট্ট কোম্পানি '-র হ্যান্ডবিল তার প্রমাণ। প্রমাণ, ভূতপূর্ব বীণাপাণি ও চলন্তিকা ভেঙে গড়ে ওঠা "ক্যালকাটা অপেরা"র হ্যাণ্ডবিল।

আমি এখানে "নট্ট কোম্পানি"-র হ্যাণ্ডবিলের নমুনা তুলে দিলাম ঃ

কলিকাতার চিত্র ও মঞ্চের শ্রেষ্ঠ শিল্পীসঙ্ঘ লইয়া

"নট্ট কোম্পানী"

আজ আপনাদের মনরঞ্জনার্থ আপনাদের অভিবাদন জানাইতে

আসিয়াছেন। আপনাদের সহানুভূতি আমরা কামনা করি।

স্থান ঃ—পিকচার প্যালেস। সোমবার ৩১শে মে রাত্রি ৯।। ঘটিকায়

সাজাহান

তৎসহ

হীরণচন্দ্র নট্টর তবলা লহরা, পরদিন মঙ্গলবার রাত্রি ৯।। ঘটিকায়

মিশর কুমারী রূপদান করিবেন

বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট শ্রীশরৎ চট্টোপাধ্যায় (রংমহল) অনল রায় (ফিল্ম), নন্দ ঘোষাল, বিনয় ভট্টাচার্য (মিনার্ভা) গোপাল ভট্টাচার্য (ষ্টার), বলাই গরাই, নলিন বাগ (ষ্টার) রবিন দত্ত, অমূল্য নন্দি, শ্রীপ্রতুল ব্যানার্জী, ছবি চক্রবর্তী শ্রীমতী ঊষারাণী, সীতারাম, অনাথ মুখোপাধ্যায় আরও অনেকে। রিজার্ভ—১০্ প্রথম শ্রেণী—৫্ দ্বিতীয়—৩্ তৃতীয় শ্রেণী—২্ ৪র্থ শ্রেণী—১্ মহিলা—১্ **হ্যাণ্ডবিলটি ছেপেছিল খুলনার সালেহা প্রিন্টিং হাউস।**

❑ ক্যালকাটা অপেরার হ্যাণ্ডবিল নমুনা ঃ

ক্যালকাটা অপেরা

[এই শত ছিন্ন হ্যাণ্ডবিলের যে অংশটুকু সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে শুধু সেইটুকু তুলে ধরা হলো] গণেশ গোস্বামী, বঙ্কিম দত্ত (মিনার্ভা) সুশীল ঘোষ (ষ্টার), সুধীন মজুমদার, শান্তি ভট্টাচার্য, প্রতুল, ঊষারাণী, লক্ষ্মী দেবী, সরসী ঘোষ, বীণা দাশগুপ্তা ছবি চক্রবর্তী, সন্ধ্যারাণী।

ষাট থেকে আশির দশের মধ্যে গড়ে ওঠা দলগুলির ভিতর নৃত্যশিল্পী ও নৃত্যশিক্ষক বাদলকুমারের সহায়তায় তৈরি হওয়া ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের ক্যালকাটা নাট্যবিথী ছিল মেয়েদের নিয়ে তৈরি দল। আসামে তখন যাত্রার বাজার ছিল বিশাল। কলকাতার প্রায় সব দলই

আসাম এবং উত্তরবঙ্গে ছুটে যেত। ক্ষেত্রবাবুরাও গিয়েছিলেন দল নিয়ে। শেষ পর্যন্ত ভাষাবিদ্বেষের শিকার হয়ে, বঙ্গাল খেদা আন্দোলনে সর্বস্বান্ত হয়ে ফিরে আসেন ক্ষেত্রবাবুরা। অবশেষে নানা বিভেদের মধ্যেও সহৃদয় কিছু মানুষ যে এক সময়ে যাত্রাপাড়ায় ছিল, তার প্রমাণ মিলেছিল, যখন তিনকড়ি গুছাইত, নাট্যকার শম্ভু বাগ, বিজয়কৃষ্ণ মিত্ররা মিলে দলটিকে আবার নতুন করে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। এঁরা সেবার আসরস্থ করেছিলেন নীল নিশান, ঝড়ের দোলা পালা। দলটি কিন্তু বেশিদিন বাঁচতে পারেনি।

ক্যালকাটা অপেরা দলটি গড়েছিলেন হরিপদ দাস। গদি ঘর ছিল গরানহাটায়। মাত্র কয়েকবছর পর দলের মালিক হন ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ তবে হরিপদবাবু সঙ্গে ছিলেন। তখন ক্যালকাটা অপেরার আগে বসানো হয় "নিউ"।

এখানে **ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের** কথা একটু বলে রাখি। নৃত্যশিল্পের প্রতি ছেলেবেলা থেকেই গভীর শ্রদ্ধা ছিল বলেই এক সময়ে যাত্রার আসরে নৃত্যশিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। বছর কয়েক পর দল গড়েন। দল গড়ার এবং সর্বস্বান্ত হবার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আগেই দিয়েছি। শুধু নৃত্যশিল্পী বাদল রায় নয়, নাট্যকার নন্দদুলাল রায়চৌধুরীকেও পাশে নিয়েছিলেন ক্ষেত্রবাবু। এই ক্ষেত্রবাবু নৃত্যনাট্যের মাধ্যমে আসরে "অস্পৃশ্যতা বর্জন"-এর পথ দেখান। ক্ষেত্রবাবু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নানা ভাবে যুদ্ধ করেও চরম ক্ষতির ক্ষত সারিয়ে নতুন করে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেননি।

রঙ্গভারতী। পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীটে শিশুদের নিয়ে তৈরি হয়েছিল শিশু বিদ্যাভবন। শিশুদের নানাভাবে গড়ে তোলার মধ্যেই তৎকালীন সেক্রেটারী, পরবর্তী সময়ে কর্ণধার শিশিরকুমার সাহা শিশু বিদ্যাভবনের শাখা হিসেবে তৈরি করেন 'রঙ্গভারতী'। উদ্দেশ্য ছিল ছোট ছেলেমেয়েদের গান-নাচ-অভিনয় শেখানো। এই উদ্দেশ্যের প্রথম সার্থক রূপ "কবি চন্দ্রাবতী"। যে পালা দেখে স্বয়ং স্বপনবুড়ো নিজে হাতে ক্ষুদে শিল্পীদের দিয়েছিলেন মানপত্র। এরপর ছোট-বড় শিল্পীদের নিয়ে ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে তৈরি হয় এই দল। এঁদের প্রশংসিত পালা "রক্তে রাঙ্গা মাটি", "ভোর হয়ে এল", "সমাধির পরে" ইত্যাদি। সত্তরের দশকে এই দলের "বিদ্রোহী সন্তান", "হাতিয়ার", "ফিরিয়ে দাও আঠারো বছর", "শহীদ লহ প্রণাম", "খুন রাঙ্গা রাত্রি", "মৃত্যু দিয়ে কিনলাম" প্রতিটি পালাই খ্যাতি পায়। শিশুরা বড় হয়। আবার নতুনরা আসে। এই আদর্শে পেশাদারী দল চালানো কষ্টকর হয়। তা ছাড়া আরও অনেক কারণে বন্ধ হয় রঙ্গভারতী।

দি ক্যালকাটা মিলনবিথী অপেরা । তারকচন্দ্র পালের কথা, তাঁর অভিনয়ের স্মৃতি গোটা যাত্রাপাড়ায় নিশ্চিহ্ন। অথচ আজকের যাত্রা ব্যবসায়ীরা জানেন না, তাঁরা যে মাটিতে দাঁড়িয়ে আছেন, যে মাটির ফসল তাঁরা ঘরে তুলছেন, তারকবাবুদের শ্রম-ঘাম-রক্ত-মাংসের-অস্তিত্বের সারে সেই মাটি এত উর্বর। ১৪ বছর বয়সে তারক পাল দারিদ্র্যের একরাশ জ্বালা নিয়ে পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে আশ্রয় পেলেন চিৎপুরের যাত্রাদলে। ছোট থেকে অনেক বড় কাজ, সঙ্গে অভিনয় করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা দিলেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় পূর্ণেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুনজরে পড়লেন। তাঁরই সহযোগিতায় তারকবাবু প্রথমে ৬নং মনিরুদ্দিন লেনে তৈরি করলেন এই দল। এ দলের প্রথম পালা "রাজা হরিশ্চন্দ্র" প্রথমেই হল সুপার হিট। এরপর আসরস্থ হয় "আত্মাহুতি", "হলদিঘাট", "মহিষাসুর", "বিদর্ভ নন্দিনী"। ব্যবসায়িক সাফল্য এল চরম, বিনা চমকে। বিনা ফিল্মস্টারে। এই দলের কোন পালা কখনই ব্যবসায়িক ব্যর্থতা আনেনি। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে তারক পাল হারিয়ে গেলেন। বন্ধ হলো দলের দুয়ার।

মিনু জুলু ভ্যারাইটিস। ফণি বাগচীর দলে ১।। টাকা আর কুড়ুন মাষ্টারের দলে ২ টাকা

রোজে যমুনাপ্রসাদের নৃত্যভঙ্গিমা অনুকরণ করে যে শান্তিকুমার দে এক সময়ে ভাই তাপসকুমার দে-কে নিয়ে, মেয়েদের দল হিসেবে এই দল গড়েছিলেন, পরবর্তীতে সেই শান্তি দলকে নিছক মেয়েদের নাচের দল হিসেবে চিহ্নিত করেন নি। একটি স্থায়ী অপেরা পার্টি করেছিলেন। দলটি টেকেনি বেশি দিন।

নব চিত্তরঞ্জন অপেরা। এই দলটি প্রভূত অর্থ ঢেলেই তৈরি হয়েছিল। কিন্তু বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। সাহানা বোস ছিলেন নায়িকা। শক্তি ভট্টাচার্য নায়ক। পরে বেরিয়ে গিয়ে ওঁরা নিজেরা একটি দল তৈরি করেন।

সান্ধ্যবাসর এবং **প্রভাত অপেরা** । এই দুটি দলেরই প্রযোজক ছিলেন বংশী চক্রবর্তী। দুটি দলই বেশিদিন বাঁচেনি।

আরও দলের তালিকা ঃ

❑ **নব যুগ নাট্য কোম্পানি ঃ** এই দলের উপদেষ্টা ছিলেন কবি-সাহিত্যিক-আইনজ্ঞ সুধীর বেরা। পরিচালক ছিলেন স্বপনকুমার মণ্ডল। ❑ **বলাকা যাত্রা সমাজ ঃ** প্রধান উপদেষ্টা সুনীল সরকার। প্রযোজক ছিলেন রঞ্জন মণ্ডল ও মীনাক্ষী চক্রবর্তী। ❑ **ন্যাশনাল ভ্যারাইটিজ ঃ** দলটি ছিল মুকুল বসুর। এই দলে এই সময়ে রানী উর্বশী নামের একজন মহিলা ছিলেন যিনি কোলিয়ারী অঞ্চলের দর্শকদের প্রিয় ছিলেন। ❑ **রামকৃষ্ণ অপেরা ঃ** কাশীনাথ শীল ছিলেন মালিক। ম্যানেজার ছিলেন, অসীম মুখার্জী। এই সময়ে নারায়ণ সান্যাল নামে একজন এসেছিলেন যিনি পালা রচনা, সুর ও নির্দেশনায় যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। ❑ **নিউ শঙ্করী অপেরা ঃ** দলটি গড়েছিলেন পালাকার-নির্দেশক-অভিনেতা এম. নস্কর ও তাঁর অভিনেত্রী স্ত্রী গীতা নস্কর। একমাত্র পরিচালক ছিলেন, সন্তোষ মজুমদার। ❑ **অন্তরাল যাত্রা ইউনিট ঃ** এটি কল্যাণীর দল, কিছুদিন কলকাতায় এসেছিল। ❑ **শ্রীদুর্গা অপেরা ঃ** এটি প্রধানত মেদিনীপুরের দল। কলকাতায় স্থায়ী গদি তৈরি করে গোষ্ঠবিহারী ঘোড়ুই, অধরচন্দ্র ঘোড়ুই যাত্রা ব্যবসায় পুরোপুরি মন দিয়েছিলেন। ❑ **যোগমায়া অপেরা ঃ** এটি তৈরি করেন তপোবন নাট্য কোম্পানির কর্ণধার, পালাকার-নির্দেশক-অভিনেতা দুলাল চট্টোপাধ্যায়। এই দলের সর্বাধিনায়ক ছিলেন দুলালবাবুর ভাই জহর রায়। অফিস ইনচার্জ ছিলেন মাধব রায় ❑ **ওঁ ভোলানাথ অপেরা ঃ** এটি প্রাচীন একটি দলের নাম, পরবর্তীকালে এটি গড়েছিলেন শম্ভু সিন্‌হা। শম্ভুবাবু নিজেই নির্দেশক-প্রধান অভিনেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেই মানুষের মন জয় করেন। তাঁর প্রতিটি পালাই আর্থিক সাফল্য এনেছিল বটে, কিন্তু আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁর ভাই অশোক সিন্‌হা দলের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এ দলের সর্বাধিনায়ক ছিলেন বিমান ঘোষ। এই সময়কাল পর্যন্ত বাবলু ভট্টাচার্য নায়ক হিসেবে একটা বিশেষ জায়গায় ছিলেন। ❑ **জননাট্য এবং রবীন হাজরা ঃ** আখরার ছেলে রবীন হাজরা যাত্রা ব্যবসায় নেমেছিলেন এই দলটি গড়ে। ইনি নিজে মালিক হবার আগে কিছু কিছু দলে অর্থ বিনিয়োগ করতেন। ❑ **শঙ্করী অপেরা ঃ** এই দলটি গড়ে তুলেছিলেন নন্দবাবু কৃষ্ণনগরে। সুদর্শন এবং মেডিকেল স্টোর্সের সঙ্গে জড়িত থাকা এই মানুষটি পরে চিৎপুরে সাজানো গদি আর প্রায় স্থায়ী নায়িকা নিয়ে জমিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলেন। লাভের গুড় পিঁপড়ে খেয়ে যাবার যে রোগ যাত্রায় আছে, সেখানে যাঁদের চিত্ত একটু শক্ত এবং সমতা বজায় রেখে চলার দক্ষতা থাকে তাঁরা টিকে থাকেন, যাঁদের থাকে না তাঁরা তলিয়ে যান। নায়ক-নির্দেশক নন্দকুমারের আপাতত সেই পরিণতি। উনি আবার দল গড়তে, নায়ক হতে আসবেন কিনা এখন তার খবর নেই। এ দলের এক সময়ের পরিচালক ছিলেন বিষ্ণুপদ বসু। দলটির কর্ণধার ও নায়ক নন্দকুমার ছিলেন ঘোরতর সংসারী এবং হৃদয়বান, তবুও যে প্রবাদবাক্যটি মানলে তাঁর ভরাডুবি হতো না তা হলো "যাহা কিছু চক চক করে তাহা সোনা নহে"। সোনা কি না যাচাই করার ব্যক্তিত্বের অভাব ছিল তাঁর।

বঙ্গীয় মহিলা যাত্রা সমাজ ঃ এটি ছিল সম্পূর্ণ মহিলাদের যাত্রা দল। "পুতলীবাঈ", "বিবি মর্জিনা", "সোনাইদীঘি" ইত্যাদি পালা আসরস্থ করে দলটি যখন জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল, ঠিক তখনই অভ্যন্তরীণ গোলযোগ এবং নানা অসহযোগিতার জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

যুগ যাত্রা ঃ দলটি গড়ে ওঠার নেপথ্যে যাঁর অবদান অনস্বীকার্য তিনি মধু বড়াল। এক সময়ে নারী চরিত্রে অভিনয় করে যে মধুবাবু মধুরানী হয়েছিলেন, পরবর্তীকালে যে মধু বড়াল খ্যাতির সঙ্গে বিভিন্ন যাত্রা প্রতিষ্ঠানে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চাকরি করেছিলেন দল বা প্রতিষ্ঠান পরিচালক হয়ে অথবা সর্বাধিনায়ক হয়ে, সেই মধু বড়ালের সৃষ্ট এই প্রতিষ্ঠান, মূলত নানা অসহযোগিতার জন্য ভরা মরশুমেই বন্ধ হয়। শ্রীবড়াল নানা দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হন। এই দলে জনৈক চলচ্চিত্র অভিনেতার বিশ্বাসঘাতকতাই ছিল দলের অকাল মৃত্যুর কারণ। যুগ যাত্রায় ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের "মীনাবাজার", প্রসাদ ভট্টাচার্যের "জীবন সঙ্গিনী" ও "আগ্নেয়গিরি" জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। যুগ যাত্রার পালা নির্দেশক ছিলেন মোহিত বিশ্বাস।

শিল্পমহল ঃ সুনীল প্রামাণিক নামে একজন ব্যবসায়ী যাত্রা জগতের কয়েকজন অভিজ্ঞ ভদ্রলোকের ওপর বিশ্বাস রেখে এসেছিলেন যাত্রা ব্যবসায়। সুনীলবাবুর স্বপ্ন ছিল যাত্রা ব্যবসা থেকে যেমন টাকা বানানো তেমনি একটা আদর্শও ছিল। আদর্শ হলো, একটা চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠান করে যাওয়া। একাধিক বড় বড় শিল্পী এই দলে কাজ করেছিলেন। এই দলের জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন অভয় সাহা। সুনীলবাবু বেশি দিন দল চালাতে পারেননি। পরে এই দলের দায়িত্বভার নেন অভয়বাবু। তিনিও দলটি চালাতে অক্ষম হন, এমন কি ঋণে ঋণে বিপন্ন হয়ে অকস্মাৎ মারা যান।

নট নারায়ণ অপেরা ঃ পালাকার প্রসাদ ভট্টাচার্য দলটি তৈরি করেছিলেন। দলটি অচিরেই বন্ধ হয়।

কোহিনূর অপেরা ঃ আলোক সম্পাতে, ইনটিরিয়র ডেকরেশনে প্রতিষ্ঠা পাওয়া অনিলবাবু নামে একজন এই দল গঠনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। বেহিসাবী কার্যকলাপ, নানা বিশ্বাস হীনতা এবং মুনাফার লোভে সাইক্লোরামার অনুকরণে ব্যর্থতা, ইত্যাদিতে দলটি বন্ধ হয়ে যায়!

ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে যাত্রা জগত পাল্টাতে শুরু করল।

সত্তরের দশকের সূচনা থেকে একদিকে যেমন চড়া সুদে অর্থ বিনিয়োগকারীদের অনুপ্রবেশ যাত্রা পাড়ায় বৃদ্ধি পেতে থাকল, তেমনি যাত্রার মালিকদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল প্রতিযোগিতা মূলক মানসিকতা প্রদর্শন। সিনেমায় পরিবেশক ও প্রযোজনা দপ্তরগুলো সানমাইকা ইত্যাদিতে ইন্‌টিরিয়র ডেকরেশনে ইতিমধ্যেই যে বিস্ময়কর শৈল্পিক চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছিল, যাত্রার মালিকরা সেইভাবে ঘরগুলোকে গদি থেকে অফিসে রূপান্তর করতে থাকলেন। কেউ কেউ বা শিল্পের প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে, গ্রাম-গঞ্জের নায়েক পক্ষের কাছে গদির মূল্য বোঝাতে গিয়ে মাংসের দোকানের মত গদি ঘরের দেওয়ালে বসালেন টাইলস্‌। বড় বড় শিল্পীদের এবং দু'একজন পালাকারের কপাল সোনা দিয়ে বাঁধাই হতে থাকল। আলোর জাদু এলো, টেপ রেকর্ড এলো, মাইক আর মাইক্রোফোনের প্রাধান্য দেখা দিতে থাকল। সংবাদপত্র এই ব্যবসার মধ্যে অর্থনৈতিক রসের স্বাদ পেল। বিজ্ঞাপন, পোষ্টার, হ্যান্ডবিল ইত্যাদির রূপ ও ভাবা বদলাতে শুরু করল। দেখা দিল জনপ্রিয় দৈনিকের পৃষ্ঠায় প্রভূত অর্থের বিনিময়ে পূর্ণ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন প্রকাশের রেওয়াজ। নায়েক পক্ষকে আকৃষ্ট করার জন্য সিনেমা পরিবেশক প্রতিষ্ঠানের মত যাত্রার গদিতে গদিতে বসতে থাকল শো বোর্ড। সেই বোর্ডে সাজানো হতে থাকল পালার নায়ক-নায়িকা এবং বিভিন্ন দৃশ্যের আলোক চিত্র। আশির দশকের মাঝামাঝি অথবা প্রথম দিক থেকে সাদা কালো ছবি বিসর্জন দিয়ে এলো রঙিন ছবির সমারোহ। নতুন ছবি মুক্তির আগে সিনেমা হলে যে ভাবে ছবি শো বোর্ড দিয়ে

সাজানো হয় প্রভৃত অর্থে, যাত্রার গদিও ঠিক সেই ভাবে শো বোর্ডে সজ্জিত হলো। যে যাত্রা জগতে একজন মাত্র আলোকচিত্রীর একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল, সেই আলোকচিত্রীর অর্থনৈতিক ভাগ্যকাঠামোর স্মরণীয় রূপের জৌলুষে একে একে অনেক আলোকচিত্রীর আবির্ভাব ঘটল। স্বল্প সময়ের ভিতর তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সহজেই ভাগ্য পাল্টাতে পারলেন। যাত্রার সার্বিক কল্যাণে তৈরি হলো একাধিক সংগঠন। প্রসঙ্গ ক্রমে এখানে একটি পত্রাংশ তুলে ধরছি, যে পত্রটি জিয়াগঞ্জের লোঢ়াপার্কস্থিত "শ্রীপৎ সিং কলেজ"-এর বাংলা বিভাগীয় অধ্যাপক ডঃ শ্যামল রায়ের লেখা। পত্রাংশটি বোধ করি উপরোক্ত পর্যালোচনার যথার্থতা প্রমাণ করবে—

"গ্রাম বাংলার নিজস্ব বিনোদন মাধ্যম তথা লোক শিক্ষার অন্যতম হাতিয়ার যাত্রাগানের কয়েক শতাব্দী ব্যাপি ঐতিহ্য যখন প্রায় বিলুপ্তির পথে, শহুরে সিনেমা ও নাটকের থাবায় যখন যাত্রা জগতের নাভিশ্বাস উঠছে, এমনই এক সন্ধিক্ষণে, ১৯৬১-৬২ সালে শোভাবাজার রাজবাড়িতে অনুষ্ঠিত যাত্রা উৎসবের আয়োজনে যাত্রা জগতে যেন পুনঃ প্রাণ প্রতিষ্ঠা হলো।...১৯৭৩ সালে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রতিযোগিতা মূলক যাত্রা উৎসব এবং সরকারি দাক্ষিণ্যে "প্রমোদকর মুক্তি" যাত্রার পালে যেন নতুনকালের হাওয়া লাগিয়ে দিল। জনসাধারণ সেদিন সরকারি সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে মনের কোণে আকাঙ্খার বীজ বপন করে ভেবেছিলেন, কলকাতার যাত্রা বোধ হয় গ্রামের মানুষের কাছে সহজলভ্য হয়ে উঠবে। কিন্তু হলো সম্পূর্ণ বিপরীত!

প্রমোদকর মুক্তির সুযোগে চিৎপুরের গদির মালিকরা মহাজাতি সদন সহ নানা মঞ্চে উচ্চ মূল্যে যাত্রা পালা পরিবেশন করে মুনাফা লুঠতে থাকলেন। যাত্রার আঙ্গিকগত পরিবর্তন দ্রুত ঘটতে থাকল।...বাহ্যিক আড়ম্বরের দোহাই দিয়ে নায়েকদের কাছ থেকে বহুগুণ চড়া দর আদায় করার কর্মযজ্ঞ শুরু করলেন চিৎপুরের মহাজনরা।...যাত্রা হয়ে উঠল গ্রাম বাংলার মানুষকে শোষণের হাতিয়ার......"

যা হোক, এখানে এমন কিছু দলের কথা বিস্তারিত বলবো, যে গুলি যাত্রার ইতিহাসে জায়গা করে নেবার মত কোন না কোন উল্লেখযোগ্য কাজের স্মৃতি বহন করছে। যেমন ঃ

॥ নাট্যভারতী / সাংবাদিক কিষাণ দাশগুপ্ত ॥

কিষাণ দাশগুপ্তের জন্ম ১৯১৭ সালের ৪ জানুয়ারি। ১৯২৯ সাল থেকে অনুশীলন পার্টীর সঙ্গে যুক্ত হন। মাত্র ১৩ বছর বয়স থেকে কিষাণবাবু রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ঐ বয়সেই রাজনৈতিক বন্দী হন তিনি। অথচ ছেলেবেলা থেকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত হন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হয়ে ওঠেন শিল্পী, সাংবাদিক, সাহিত্যিক। কমল দাশগুপ্ত ছদ্মনামে কিষাণবাবু চিৎপুরের যাত্রা সাংবাদিকতা শুরু করেন স্বাধীনতা পত্রিকায়। যাত্রা সাংবাদিকতা থেকে কিষাণবাবু যাত্রা শিল্পের বা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হন। 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সাংবাদিক ছিলেন কিষাণবাবু।

স্বনামধন্য পালাকার-অভিনেতা শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজস্ব দল 'নাট্যভারতী'র দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যাত্রার দল বাঁচলে হাজার হাজার মানুষ বাঁচবে এই সত্যকে বিশ্বাস করতেন কিষাণবাবু। যাত্রা শিল্পে একতা না থাকায় অনেক সমস্যা ছিল, সেই সমস্যা অন্ততঃ কিছুটা যাতে লাঘব হয় তার জন্য কিষাণবাবু উদ্‌যোগী হয়ে প্রথম গঠন করেন "পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সংসদ"। নাট্যভারতীকে নিয়ে দিল্লীর প্রবাসী বাঙালী শুধু নয়, সব ভাষাভাষি মানুষের কাছে গিয়েছিলেন। ওখানে পালা আসরস্থ করে বাংলা যাত্রার গৌরব রচনা করেন। দিল্লী দূরদর্শনে যাত্রা প্রথম প্রদর্শিত হবার মূলে ছিলেন কিষাণবাবু। সেই মানুষটি ১৯৭৩ সালের ১৭ নভেম্বর রাত ১০টা-৫৫ মিনিটে আকস্মিকভাবে মারা যান।

যাত্রার সম্রাট অভিনেতা স্বপনকুমারকে সম্বর্ধনা জানাবার পরিকল্পনা অনেকদিন আগে থেকে করে রেখেছিলেন কিষাণবাবু। বরাহনগর "পাঁচুগোপাল স্মৃতি পাঠাগার" আয়োজিত যাত্রার আসরে এই মহৎ অনুষ্ঠান হবে তাও স্থির ছিল, কিন্তু তার আগেই হারিয়ে যান কিষাণ দাশগুপ্ত।

॥ প্রদীপ অপেরা ॥

সাংবাদিক কিষাণ দাশগুপ্তের আকস্মিক মৃত্যুর পর নাট্যভারতীকে বাঁচিয়ে রাখার, তাঁর ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করে রাখার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন প্রদীপ দেবনাথ। এই প্রদীপ দেবনাথ যদিও আদি নিবাস সূত্রে নোয়াখালির ছেলে, তবুও তিনি নবদ্বীপের রাণী হাটের প্রদীপ। অল্প বয়স থেকেই প্রদীপ রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং দীর্ঘকাল পার্টি করেছেন। এরপর তিনি যাত্রার সঙ্গে যুক্ত হন। কিছুদিন 'নবরূপ' চালিয়েছিলেন। কিছুদিন 'এপিক' অপেরা চালিয়ে, মাধবী নাট্য কোম্পানিতে চাকরি করেছেন। সেই সূত্রে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন কিষাণবাবুর সঙ্গে। নাট্যভারতীর দায়িত্ব নিয়ে, নটসম্রাট স্বপনকুমার ও স্বপ্নাকুমারীর সহযোগিতায় একাধিক পালা প্রযোজনা করে প্রদীপ দেবনাথ নাট্যভারতীর দৌলতে অল্প সময়ের মধ্যে অর্থ-সম্পদে মহীরূহ হন। এই প্রদীপ 'স্বপনকুমার নাইট'-এর আয়োজক ছিলেন। কিষাণ দাশগুপ্ত প্রবর্তিত 'পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সংসদ'-এর সংগঠক সম্পাদক হন তিনি। সেই প্রদীপ যখন প্রভূত অর্থের অধিকারী হন তখন যাত্রাপাড়ার ধর্ম পালন করেন 'নাট্যভারতী'র নামকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে। এরপর জন্ম দেন "প্রদীপ অপেরা"। এখানেও তাঁর ভাগ্য খোলে যেমন, তেমনি যাত্রা ধর্মে ধীরে ধীরে পতনের দিকে যান। এক সময়ে প্রদীপ অপেরাও বন্ধ হয়। প্রদীপ দেবনাথ নামক একটি আদর্শ, প্রদীপ দেবনাথ নামক একটি ভাগ্যবান মানুষ নিজেই নিজের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করে দেন। এই প্রদীপ ভবিষ্যতে যদি আবার যাত্রাপাড়ায় এসে নিজেকে প্রতিষ্ঠা দেন তাতেও তাঁর অতীত ইতিহাস বিন্দুমাত্র শ্বেত-শুভ্র হবে না।

॥ বেলা ঘোষ / মাধবী নাট্য কোম্পানি এবং জয়গোবিন্দবাবু ॥

দুটি সন্তানকে ভাল করে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে, তাদের মানুষ করার জন্য মা হয়ে বেলা ঘোষ নিয়েছিলেন নার্সের কাজ। কাজ করে যা আয় হত তাতে দু'বেলা ভাল করে পেট ভরত না, তাই একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে শুধু তাঁকে কাজই করে যেতে হত। হঠাৎ নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে একটু ভাল করে বাঁচার আলো দেখলেন তিনি। সুযোগ পেলেন চলচ্চিত্রে।

প্রথমে 'বউঠাকুরাণীর হাট' পরে 'মনের ময়ূর' এবং আরও কয়েকখানা ছবিতে অভিনয় করলেন তিনি। কিন্তু দুটি ছেলেকে নিয়ে চলতে গেলে এটুকুও যথেষ্ট নয় তা প্রমাণিত হয়ে গেল। থিয়েটার সিনেমা লাইনটা জানা হল কিন্তু টিকে থাকা হল না। এবার আবার সেই নার্সের কাজ।

হঠাৎ একদিন নাট্যভারতীর ম্যানেজার অভয় সাহা পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে বেলাদেবীকে নিয়ে আসেন যাত্রায়। বেলাদেবী যুক্ত হন নাট্যভারতীতে। 'গাঁয়ের মেয়ে', 'মায়াজাল' এবং আরও কিছু পালায় অভিনয় করে বেলা ঘোষ প্রমাণ করলেন বাস্তবানুগ অভিনয় করার ক্ষেত্রে তিনি অসামান্যা।

কিছুদিন পর যুক্ত হলেন অম্বিকা নাট্য কোম্পানিতে। 'সাবিত্রীবাঈ' নাটকে তাঁর প্রাণবন্ত অভিনয় এবং গান শুনে মুগ্ধ হলেন হাজার হাজার যাত্রা দর্শক। গান শিখেছিলেন তিনি সন্তোষ দাসের কাছে।

তারপর বেলা ঘোষ একে একে অভিনয় করলেন ভারতী, রূপনাট্যম, নবরঞ্জন অপেরা, নিউ রয়েল বীণাপাণি আর প্রভাস অপেরায়। কয়েক বছরের মধ্যে বেলা ঘোষ হলেন যাত্রাজগতে প্রথম সারির অভিনেত্রী। এমন সময় রমেন বসুমল্লিক তাঁকে দল গড়ার স্বপ্ন দেখালেন। বেলা ঘোষ পিছিয়ে গেলেন না। দল গড়লেন। নাম রাখলেন—মাধবী নাট্য কোম্পানি। প্রথম বছরেই পরাজয়। কোন পালাই পয়সা দিতে পারল না। মন ভেঙে গেল বেলা ঘোষের।

এবার এলেন জীবনকৃষ্ণ মুখার্জী। আবার নতুন করে দল গড়ার ব্যাপারে বেলা দেবীকে তিনি উৎসাহ দিলেন। অর্থ ভাণ্ডার তখন শূন্য। জীবনবাবু নিয়ে এলেন জয়গোবিন্দ রায়চৌধুরীকে। জয়বাবু দিলেন আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি। নতুন সাজে সাজল মাধবী নাট্য কোম্পানি। শুরু হল জয়যাত্রা। গায়িকা-অভিনেত্রী বেলা ঘোষ আসরে আসরে তাঁর অভিনয় জাদুতে মাতিয়ে তুললেন দর্শক সমাজকে।

১৯৬৪ সাল। নতুন রূপে নতুন ভঙ্গিমায় মাধবী আবার সজাগ হয়ে উঠল। মৃতপ্রায় প্রতিষ্ঠানের তখন এক নতুন উদ্দীপনা। যাত্রা জগতের প্রথিতযশা অভিনেতা ননী ভট্টকে নিয়ে মাধবীর যাত্রা হল শুরু। নতুন নাটক নেওয়া হল। প্রসাদ ভট্টাচার্য লিখলেন 'কাঁকনতলার মেয়ে'। ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ লিখলেন 'ব্রহ্মনারায়ণ'। প্রসাদবাবুর 'রিক্সাওয়ালা' নিয়ে বেলা ঘোষ আর জয়বাবুর যুগ্ম প্রচেষ্টা এগিয়ে চলল আসরের দিকে। মেণ্টা বসু ও ননী ভট্টের নির্দেশনায় পালার পর পালা আসরে উপস্থাপিত হলো। প্রথম বছরে ব্যবসা ভাল হল না, কিন্তু ভেঙে পড়লেন না জয়গোবিন্দবাবু। বেলা দেবীও নিজেকে শক্ত রাখলেন। এল ১৯৬৯। নতুন বক্তব্য নিয়ে প্রসাদ ভট্টাচার্যের 'রক্ত দিয়ে কিনলাম' আর 'আগুন নিয়ে খেলা' পালার সঙ্গে ছোট্ট নাটক 'মণিপুর গৌরব' আসরে নামালেন ওঁরা। এই বছরে এঁদের স্বপ্ন ও অভিযান অনেকটা সার্থক হলো। দলের খ্যাতিও ছড়ালো।

এই হেন শিল্পীর আর্থিক সচ্ছলতা এলো না। এক খ্যাতিমান অভিনেতাও বেলাকে মিথ্যা ভালবাসার আগুনে পুড়িয়ে সরে গেলেন। ক্যান্সারে আক্রান্ত হলেন এই শক্তিময়ী শিল্পী। কিন্তু যাত্রা জগতের একমাত্র মাখনলাল নট্ট ছাড়া আর কেউই খুঁজল না বেলাকে। বেলা হারিয়ে গেলেন নীরবে।

এবার একটু জয়গোবিন্দবাবুর কথা বিস্তারিত বলা যাক।

রাধাগোবিন্দ রায়চৌধুরীর ছেলে জয়গোবিন্দবাবুর জন্ম সোনার চামচ মুখে নিয়ে ১৯২৫ সালে। রাধাগোবিন্দবাবু শুধু সংগীতজ্ঞ ছিলেন না, ছিলেন যাত্রা অনুরাগী। নানা খেলায় ছিলেন পটু। কালের বিবর্তনের সঙ্গে জমিদারি বিলুপ্ত হলেও রাধাগোবিন্দবাবুর জমিদারি মেজাজটা থেকে গেল। দেশের বাড়িতে "ভোলানাথ অপেরা' নামে সখের যাত্রা দল তৈরি করেছিলেন। সেই থেকে লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে জয়বাবুর যাত্রাপ্রীতি গাঢ় হতে থাকল। অথচ অভিনেতা হবার স্বপ্ন দেখলেন না তিনি। সরস্বতী ইনস্‌টিটিউশান থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে, ভর্তি হন সিটি কলেজে। বছর খানেক পর যান ফরিদপুরে। ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আই, এস, সি ও বি, এস, সি, পাশ করেন। কলকাতায় এসে হার্ডওয়ারের ব্যবসা শুরু করেন। ১৯৪৭ সালের দাঙ্গায় ব্যবসা নষ্ট হয়। এরপর হন ইনসিওরেন্সের এজেন্ট। এই কর্মজীবন দীর্ঘস্থায়ী হয়। সংগীত প্রীতি থেকেই জয়বাবু যুক্ত হন সদারঙ সংগীত সম্মেলনের সঙ্গে। ১৯৬১ সালে তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনের সহঃ সম্পাদক হন। ১৯৬৫ সালে সাংবাদিক কিষাণ দাশগুপ্তের সঙ্গে আসেন যাত্রাজগতে। নাট্যভারতীতে। কিষাণবাবু পি, দাশগুপ্ত নামে কিনলেন নাট্যভারতী। জয়বাবু দিলেন অর্থ সাহায্য পরপর তিন বছর। এক সময়ে ঐ সঙ্গ ত্যাগ করেন জয়গোবিন্দবাবু। এরপরই জীবন মুখার্জীর সঙ্গে এলেন শক্তিময়ী অভিনেত্রী বেলা ঘোষ তাঁর মাধবী নাট্য কোম্পানিকে বাঁচাবার আর্জি নিয়ে। জয়বাবু দিলেন অর্থ সাহায্য। জয়বাবু এক সময়ে নট্ট কোম্পানির কর্ণধার মাখনলাল নট্টের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে যান।

॥ অনামিকা / দিলীপকুমার এবং মধুশ্রী ॥

১৯৩৫ সালে দর্জিপাড়ায় নিতান্ত দরিদ্র পরিবারে হেমন্ত চ্যাটার্জীর ছেলে দিলীপ চ্যাটার্জী ওরফে দিলীপকুমারের জন্ম। ১৪ বছর বয়সে ঘর ছাড়া দিলীপ মূলত বড় হন অভিনেতা অজিত

দাসের বাড়িতে। কিছুদিন চাকরি করেন রেন্ট কন্ট্রোল অফিসে। কিছুদিনের মধ্যে চাকরি চলে যায়। আবার দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ। এমন কি ভিক্ষা করতেও হয়েছে তাঁকে, একথা গৌরবের সঙ্গে বলেছেন পরবর্তী সময়ের সুখ্যাত অভিনেতা, যাত্রাদলের মালিক, দিলীপকুমার। ১৯৫১ সালে দিলীপ প্রথম আসেন সুষেন দাসের সরস্বতী অপেরায়। এরপর ২ টাকা রোজে দিলীপ হন নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরার সাজঘরের লোক অর্থাৎ ড্রেসার। পরে বিভিন্ন দলে ঘুরে চাকরি পান সত্যম্বর অপেরায়। কিছুদিন পরে অম্বিকা নাট্য কোম্পানিতে। এরপর আবার যখন ঘুরে আসেন রয়েলে তখন স্বনামধন্য পঞ্চু সেনের সুনজরে পড়েন দিলীপ। উল্লেখযোগ্য অভিনয়ের সুযোগ পান "ভাগ্যের বলি" পালায়। জনতা অপেরায় "দোষী কে" পালায় বিষ্ণু চরিত্রে অভিনয় করে জনপ্রিয়তা পান। খ্যাতি পান নবরঞ্জন অপেরায় এসে। দিলীপকুমারের অভিনয় বিখ্যাত হয় মাধবী নাট্য কোম্পানির "রিক্সাওয়ালা". নাট্যভারতীর "বাঁচার লড়াই" পালায়। "বাঁচার লড়াই" পালা নির্দেশনা তাঁর প্রথম। যুক্ত হন "তপোবন নাট্য কোম্পানি"র জন্মলগ্নে। পরিশেষে গড়ে তোলেন 'অনামিকা যাত্রা ইউনিট'। এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পিছনে ছিল স্ত্রী অভিনেত্রী মধুশ্রী দেবীর পূর্ণ সহযোগিতা। এর মধ্যে দিলীপ বার কতক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। অভিনয় করেন পাবলিক স্টেজে। চিরস্মরণীয় ছবি বিশ্বাসের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন দিলীপ। এবার একটু মধুশ্রী দেবীর কথা বলা যাক।

১৯৪৬ সাল। নাগপুরে গজধর সিং-এর মেয়ে মধুশ্রীর (?) জন্ম। মতান্তরে পাঞ্জাবের জলন্ধরের মেয়ে। শৈশবেই বাংলায় আসেন। আসেন কলকাতায়। হীরালাল ও পরে শক্তি রায়ের কাছে নাচ শেখেন। থাকতেন জামসেদপুরে। ওখানকার ক্লাস টেনের ছাত্রী আসেন দর্জিপাড়ায়। পরিচিত হন নাট্যকার-অভিনেতা ধ্রুব পালের সঙ্গে। শ্রীপালই তাঁকে বাংলা ভাষায় মুখর করেন। বাংলা আয়ত্তে এলে প্রথম অভিনয় করেন দর্জিপাড়ার ফ্রেন্ডস ক্লাবের "রাখী কি লাজ" নাটকে। এর আগে মুনলাইট স্টেজে মধুশ্রী নৃত্য পরিবেশন করে প্রশংসিত হন।

মধুশ্রীর প্রথম বাংলা নাটক "ডার্করুম"। নাটকটি ছিল জহর রায়ের পরিচালনাধীনে রঙমহলে অভিনীত নাটক। 'ঝঙ্কার' নামে একটি হিন্দি নাটকে অভিনয় করে সুখ্যাতি পান। এরপর মূলত রাজেন সাহার ইচ্ছায় ও সহযোগিতায় নবরঞ্জন অপেরায় প্রথম আসেন মধুশ্রী। 'মাইকেল মধুসূদন' পালায় অভিনয় করেই খ্যাতি পান। আসেন মাধবী নাট্য কোম্পানিতে। 'নিহত গোলাপ' পালায় অভিনয় করে মধুশ্রী জয় করেন সোনার মেডেল। "আদর্শ হিন্দু হোটেল" পালায় পদ্ম ঝি'-এর চরিত্রে অভিনয় করে বিখ্যাত হন। এরই মধ্যে দিলীপকুমারের সঙ্গে ঘর বাঁধেন তিনি। দু'জনে গাড়ে তোলেন 'অনামিকা যাত্রা ইউনিট'। ইতিহাসকে স্বীকার করতে হলে যেমন মানতে হবে মধুশ্রীর প্রতিভা বিকাশের প্রথম প্রেরণা ধ্রুব পাল, তেমনি তাঁর বোধনে পঞ্চু সেনের দান অপরিসীম, আর মধুশ্রীর অভিনেত্রী প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা যেমন করেন স্বপনকুমার, তদ্রূপ তাঁর স্থায়ী প্রতিষ্ঠা হয় দিলীপকুমারের আন্তরিক ভালবাসায়। সেই দিলীপকুমারের আকস্মিক মৃত্যুতে অনামিকার দুয়ার বন্ধ হয়ে গেল।

॥ শ্রীমা নাট্য কোম্পানি, নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায় এবং কনকলতা ॥

১৯৬৪ সালে অভিনেতা নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায় তাঁর নাচে-গানে-অভিনয়ে অনন্যা স্ত্রী কনকলতাকে নিয়ে গড়ে তোলেন এই যাত্রার দল। জন্ম লগ্ন থেকে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এঁরা দলকে বছর কয়েক বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। এ দলের আশাতীত প্রশংসা ছড়িয়ে পড়েছিল প্রথম প্রথম। স্বনামধন্য নাট্যকার-অভিনেতা মহেন্দ্র গুপ্তের 'রাক্ষসী পদ্মা', 'তৃষ্ণা' এ দলের ব্যবসায়িক সাফল্য অনেকটাই এনে দিয়েছিল। এ দলের 'প্রেম পূজারী', 'শতাব্দীর ইঙ্গিত' পালাগুলি ছিল চলনসই।

দলের প্রতিষ্ঠাতা নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায় প্রসঙ্গে কিছুটা বলা যাক।

১৯২৯ সালে বসিরহাটের ট্যাটরা গ্রামের সুরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীর প্রথম ছেলে নন্দদুলালের জন্ম। ছেলেবেলা থেকে অভিনয়ের প্রতি আকর্ষণ। স্কুল-কলেজের ছাত্র জীবনে বেশ কিছু নাটকে অভিনয় করেছিলেন। বি. এ. থার্ড ইয়ারের ছাত্র যখন তখন পড়াশোনায় ইস্তফা দিয়ে নন্দদুলালবাবু পাকিস্তানে চলে যান। এরপর অনেক বছর পার হয়ে যায়। ১৯৬০ সালে নন্দদুলাল প্রথম 'ভারতী রূপ নাট্যম্'-এ পেশাদারী অভিনেতা হিসেবে যুক্ত হন। প্রথম দিকে তাঁর অভিনীত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পালা হলো, 'বাংলার বধূ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'রাজ সন্ন্যাসী' ইত্যাদি। এরপর 'নবযুগ নাট্য সংসদে' ম্যানেজার ও অভিনেতা হিসেবে যুক্ত হন। এই দলে তিন বছর ছিলেন নন্দবাবু। ১৯৬৪ সালে ধীরেন সাহার সাহায্যে, স্ত্রী কনকলতাকে নিয়ে গড়ে তোলেন 'শ্রীমা নাট্য কোম্পানি'। প্রসঙ্গ ক্রমে বলা দরকার, দল গড়ার বছর কয়েক আগে অভিনেত্রী কনকলতাকে বিয়ে করেন। খ্যাতিমান প্রযোজক, অভিনেতা মোহন চ্যাটার্জী এই দুলালবাবুর ভাই। ১৯৪০ সালে কলকাতার আহেরীটোলায় ভবতারণ ঘোষের মেয়ে কনকলতার জন্ম। ছোট বেলা থেকেই থিয়েটার করা আর গান গাওয়ার প্রতি ছিল সহজাত আকর্ষণ। মেয়েকে গান আর নাচ শেখাতে বাবা কার্পণ্য করেননি। ছোটবেলায় সখের থিয়েটার-যাত্রায় বারকতক অভিনয় করে নিজেকে তৈরি করেছিলেন। 'চন্দ্রহাস' নাটকে ছোট চন্দ্রা চরিত্রে কনকলতার প্রথম অভিনয়।

কনকলতার বয়স যখন মাত্র ন'বছর তখন পিতৃবিয়োগ হয়। সংসারে নেমে আসে তীব্র আর্থিক সংকট। সুতরাং রোজগারের পথ নিলেন তিনি। সুযোগ পেলেন মিনার্ভা মঞ্চে বালিকা দলে নাচ-গানে অংশ নেবার। পরে এই মিনার্ভাতেই হিন্দি "কৃষ্ণসুধাময়ী" নাটকে রুক্মিণী চরিত্রে অভিনয় করেন। প্রশংসা পান 'কিন্নরী', 'আত্মদর্শন' নাটকে অভিনয় করে। এরপর কনকলতা আসেন ষ্টার থিয়েটারে। থিয়েটারে থাকাকালীন কনকলতা 'মহাপ্রস্থানের পথে' ছবিতে সুযোগ পান। পরে 'বিচারক', 'নীলদর্পণ' 'অনন্যা' ছবিতেও অংশ নেন।

প্রথম যাত্রায় অভিনয় করেন নবযুগ নাট্য সংসদের 'নাচমহল' পালার ইরাবতী চরিত্রে। নবযুগ থেকে শ্রীমা নাট্য কোম্পানি। আসলে এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কাণ্ডারীও হন কনকলতা। ১৯৬৪ সালে স্বামী নন্দদুলাল চ্যাটার্জীর সঙ্গে দলটি গড়েন তিনি। এখানে বৈকুণ্ঠের উইল, খুনী, ওমর খৈয়াম, তৃষ্ণা, রক্ত স্নাত দিল্লী, রাক্ষসী পদ্মা ইত্যাদি পালায় নাচে-গানে সবাইকে মুগ্ধ করেন। এক সময় এই দল চালাতে গিয়ে ভাবনা ও শ্রম বেড়ে যায়। দল বন্ধ হয়। অভিনয় জগতকে ভালবাসতে গিয়ে বাড়ি, গাড়ি, সঞ্চিত অর্থ, সোনা-দানা সবই খোয়াতে হয় তাঁকে। ১৯৭৬ সালের পর থেকে রয়েল বীণাপাণি, মোহন অপেরা, তপোবন, নিউ প্রভাস, তরুণ অপেরা, অগ্রগামী, শিল্পীতীর্থ, গণবাণী, তারা মা অপেরা, সারদাময়ী, উর্বশী অপেরা ইত্যাদি প্রায় সবগুলি বড় দলে অভিনয় করেন। যাত্রার আসরে নিখুঁতভাবে রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করার প্রথম কৃতিত্ব কনকলতার। কনক কত্থক নৃত্যে তালিম নেন যমুনা পাণ্ডের কাছে। গানের শিক্ষক দুর্গা সেন, পঞ্চানন মিত্র। প্রথম জীবনে গান শেখেন কৃষ্ণচন্দ্র দে'র কাছে। এইচ. এম. ভি, হিন্দুস্থান থেকে কনক দেবীর গানের রেকর্ড বেরিয়েছিল। মোহন অপেরার কর্ণাধার-অভিনেতা মোহন চ্যাটার্জী হলেন কনকলতার আপন দেবর। অভিনেতা স্বামীর মৃত্যু, ভাগ্যের পরিহাসে আজ কনকলতার মত শিল্পীও ম্লান।

॥ মুক্ত অঙ্গন / নির্মল মুখোপাধ্যায় ॥

কেউ কেউ পালাকার নির্মল মুখোপাধ্যায়কে 'শরৎ-নির্মল' আখ্যা দিয়ে নির্মলবাবুর নাট্য কর্মের দিকটা কত জোরালো তা বোঝাতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং পালাকারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—"ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট নয়। আমি শরৎকালের মত নির্মল, না শরৎ সাহিত্য উপজীব্য করে আমি নির্মল হয়েছি, না আমি নির্মল মুখার্জী শরৎচন্দ্রের মত লিখি,

এর কোনটাই আমি নিজেই বুঝতে পারি না।" তবে নির্মলবাবুর পালা কর্মে শরৎচন্দ্রের প্রভাব আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পূর্ববঙ্গ থেকে সর্বহারা হয়ে যখন পথে নেমেছিলেন নির্মলবাবু, তখন তাঁর মনে হয়েছিল, জীবনের মূল্য কমে গেল! মানুষের দাম কমে গেল। চারদিকে সর্বহারার কান্না, দু'মুঠো ভাতের জন্য হাহাকার, ক্যাম্পে ক্যাম্পে মানুষের ওপরে মানুষের সহাবস্থান, আজ উল্টোডাঙ্গা, পরে বাঁকুড়া, তারপর চন্দনগর ইত্যাদি জায়গায় ফুটবলের মত চালান দেওয়া জীবন থেকেই নির্মলবাবুর নাটক লেখার ইচ্ছের জন্ম। যখন জীবনের একমাত্র আরাধ্যা দেবী, অনাহারী মাকে সঙ্গে নিয়ে অনাহারের যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন, তখন তাঁর অভিনেতা জীবনের পত্তন।

খুলনা জেলার বাগেরহাট সাব ডিভিশনের সন্তোষপুর গ্রামের সন্তান নির্মল নিজেকে বাঁচাবার জন্যে, মাকে বাঁচাবার তাগিদে কলকাতায় এসে এমন কোন কাজ নেই যা করেননি। ছুতোর মিস্ত্রীর সহকারী থেকে ছবি আঁকা অনেক প্রতিভাই ছিল তাঁর। চন্দননগরে থাকার সময়ে আর্ট কলেজেও ঢুকেছিলেন শুধু না, সরকারি বৃত্তিও পেয়েছিলেন বলে জানা যায়। পেট চালাবার জন্য বেশ কিছুদিন সাইন বোর্ড লেখার কাজও তাঁকে করতে হয়েছিল। চন্দননগর থাকাকালিন নানা যন্ত্রণা থেকে মানসিক শান্তি খোঁজার জন্য তিনি প্রথম যে নাটক রচনা করেন তা আসরস্থ করেছিল চন্দননগর মিলন নাট্য সংস্থা। এক সময়ে ত্রিবেণীতে কেশরাম রেওন কোম্পানিতে চাকরি করেন। কোম্পানিতে স্ট্রাইক হলে নির্মলবাবু বেছে নেন যাত্রা জীবন। এই সময়ে 'নটবাণী অপেরা'র অভিনেতা পাঁচুগোপাল মুখার্জী মাসিক ৬০ টাকা বেতনে নির্মল মুখার্জীকে পেশাদার অভিনেতা করেন। এরপর ভারতী অপেরায়। তারপর যান অমর ব্যানার্জীর রূপনাট্যম্'-এ। এখানে অভিনেতা শুধু না, পালাকার হন। লেখেন 'কান্নার কূলে'। সর্বহারা, গৃহহারাদের নিয়ে লেখা নাটক। ৫০০ টাকা পারিশ্রমিক ধার্য হয়েছিল, পেয়েছিলেন ২০০ টাকা। এরপর নির্মলবাবু যান শান্তিপুরে। ওখানকার 'অন্নপূর্ণা অপেরা'র পালাকার, নির্দেশক ও অভিনেতা নির্মল পান খ্যাতি। এই অপেরার জন্য লেখা ৩টি পালাই হিট হয় তাঁর। নির্মলবাবুর প্রতিটি যাত্রা নাটক ব্যবসায়িক সাফল্য পায় সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের বাস্তব ছবি আঁকা হয় বলে। ঐতিহাসিক ও ভক্তিমূলক পৌরাণিক পালা রচনাতেও নির্মলবাবু সিদ্ধহস্ত। এক সময়ে আসাম-ডুয়ার্সে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক পালার অসামান্য চাহিদা ছিল। নির্মলবাবুর 'এক মুঠো অন্ন' বিষয়ের দিক থেকে যাত্রার আসরে এক গণজাগরণ ঘটিয়েছিল। শতাধিক মৌলিক পালার রচয়িতা নির্মল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি', বিমল মিত্রে 'কড়ি দিয়ে কিনলাম', নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'লালুভুলু' কাহিনীর পালারূপেও অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নির্মল মুখোপাধ্যায়ের অগণিত সফল পালার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'মৌন সন্তান', 'প্রেমের সমাধি তীরে', 'মরমী বধূ', 'মা হলো বন্দী', 'কালো সিঁদুর', নট্ট কোম্পানির 'নিশিপুরের বৌ'।

স্বনামধন্য অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুশীল নাট্য কোম্পানি লিজ নেন ১৯৮১ সালে। ৬ বছর এই প্রতিষ্ঠানটি চালান কর্ণধার হিসেবে। এখানে 'মা যদি মন্দ হয়', 'স্ত্রীর পত্র', 'পিতাপুত্র', 'মা হল বন্দী', 'কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী' পালা ব্যবসায়িক সাফল্য এনে দেয়। এরপর মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে, প্রতিষ্ঠানের প্রবীণ কর্মী সন্তোষ বসুর (একদা যিনি ছিলেন সন্তোষরানী) সহযোগিতায় পুত্র পুলক আর তিলক মুখোপাধ্যায়ের জন্য গড়ে দেন 'মুক্ত অঙ্গন', যে প্রতিষ্ঠানটি সব দিক দিয়েই প্রতিষ্ঠিত। নির্মল মুখোপাধ্যায় 'মুক্ত অঙ্গন'-এর প্রাণপুরুষ হিসেবে যাত্রার ইতিহাসে কত যুগ বাঁচবেন জানি না, কিন্তু পালাকার নির্মল মুখোপাধ্যায়ের অবদান বিস্মৃত হবে না যাত্রার আগামী প্রজন্ম।

॥ মোহন অপেরা, মোহন চ্যাটার্জী এবং উত্তরাধিকারী উৎপল চ্যাটার্জী ॥

১৩৩৯ সালে বসিরহাটে ট্যাঁটরায় সুরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীর ছেলে মোহন চ্যাটার্জীর জন্ম। ছাত্রাবস্থায় টাইফয়েড হওয়ায় লেখাপড়ায় মেধাবী হয়েও লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়ে মোহনবাবু শুরু করেন ব্যবসা। নানা ধরনের ব্যবসা করার পর শুরু করেন শৌখিন অভিনয়। অপ্রত্যাশিতভাবে অনুকূল ঠাকুরের "ধৃতিশ্রী নাট্যশিল্পম" দলে অভিনয় করার সুযোগ পান।

প্রথমে ডুপলিকেট হিসেবে কিছুদিন যুক্ত থাকার পর নদের নিমাই, নিষিদ্ধ ফল ও আরও সাত আটটি পালায় অভিনয় করে কোচবিহার ও আসাম অঞ্চলে খ্যাতিমান নট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন।

এরপর রয়েল বীণাপাণিতে 'বীর অভিমন্যু' পালায় শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে অভিনয় করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যে কোন কারণে এরপর যাত্রা ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। পরে আবার ফিরে আসেন নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরায়। সঙ্গে আনেন মিতা চ্যাটার্জীকে। যিনি পরবর্তীকালে যাত্রাজগতে একজন নামী শিল্পী। অল্পদিনের মধ্যে দু'জনেই অভিনয় জগতে প্রতিষ্ঠিত হন।

১৩৭৭ সনে বন্ধু ধীরেন ঘোষ ও সত্যম্বরের কর্ণধার শৈলেন মোহান্তর কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নিয়ে শ্রীমা অপেরার দীনতা সরিয়ে সেই প্রতিষ্ঠানকে চালাতে থাকেন। ১৩৭৮ সনে গণেশ অপেরা লীজ নেন। সাধক বামাক্ষ্যাপা, ভুলি নাই, ঘুমন্ত পৃথিবী, সন্তান, হাটেবাজারে, ইত্যাদি পালাগুলি মোহনবাবুর অভিনয় ও সার্থক পরিচালন ক্ষমতায় চরম খ্যাতি অর্জন করে। যাত্রাজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবেও স্বীকৃতি পান মোহনবাবু।

অবশেষে মধু বড়াল ও আনন্দময় ব্যানার্জীর পূর্ণ সহযোগিতায় মোহন চ্যাটার্জী গড়ে তুললেন মোহন অপেরা।

মোহন অপেরাকে পৌরাণিক পালার প্রথম শ্রেণীর দল হিসেবে চিহ্নিত করে তোলার জন্য একদিকে যেমন পালাকার আনন্দময়ের পালাভাবনা কাজ করেছে, তেমনি সেই পালা উপস্থাপনার ক্ষেত্রে মোহনবাবুর কার্পণ্যহীন প্রযোজনাও কাজ করেছে। এই দলের অধিকাংশ পৌরাণিক পালা হয়েছে সুপারহিট। যাত্রা মোহনবাবুকে দিয়েছে অনেক। অবশেষে মোহন চ্যাটার্জী চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত হন। চিত্র সম্রাজ্ঞী সুচিত্রা সেনকে নিয়ে মোহন চ্যাটার্জী প্রযোজনা করেছিলেন 'প্রণয় পাশা'। আরও একটি ছবি করেছিলেন। সিনেমায় অভিনয়ও করেছেন মোহনবাবু, মিতা চ্যাটার্জী। কিন্তু সিনেমা জগৎকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি তিনি। এরই মধ্যে তৈরি করেছেন 'তারা মা অপেরা'। চলচ্চিত্রের স্বনামধন্য শিল্পী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে, ম্যানেজার শংকর কোলের সহযোগিতায় এই দলকে দ্রুত প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। তলায় তলায় তৈরি করেছেন যোগ্য উত্তরাধিকারী। সুদর্শন পুত্র উৎপল চ্যাটার্জীকে গ্রুপ থিয়েটারে পাঠিয়ে অভিনয়ে শিক্ষিত করেছেন। মোহন চট্টোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ অভিনয় ও শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার জন্য সরকারি-বেসরকারি পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন অনেকবার।

॥ সুধীন মুখার্জী / সুশীল নাট্য কোম্পানি ॥

শক্তিমান অভিনেতা সুশীল মুখোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যুর পর সুধীন মুখার্জী প্রমুখ বেশ কয়েকজন অনুরাগী এবং নাট্যপ্রেমী সুশীলবাবুর (ফলি) স্মৃতি রক্ষার্থে শ্যামপুকুরে তৈরি করেন সুশীল নাট্যম। বেশ কয়েকটি নাটকও মঞ্চস্থ করেছিলেন। চার বছর পর, ১৯৬৮ সালে এই 'নাট্যম্' পেশাদারী যাত্রা দলে রূপান্তরিত হয়। নাম পাল্টে নাম রাখা হয় 'সুশীল নাট্য কোম্পানি'। এ দলের প্রযোজক ও পালা নির্দেশক ছিলেন সুধীন মুখার্জী। সুশীল নাট্য কোম্পানির 'রক্তে রাঙ্গা হাঁসুলী ডাঙ্গা' পালা যথেষ্ট ব্যবসায়িক সাফল্য এনেছিল। পালার প্রধান চরিত্রে যাত্রার আসরে অবতীর্ণ

হয়েছিলেন স্বনামধন্য-কৌতুক সম্রাট ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। তা ছাড়া ছিলেন নির্মল ভট্টাচার্য, সুনীত মুখোপাধ্যায়, থিয়েটারের সুপরিচিতা ইরা চক্রবর্তী।

এ দল হ্যান্ডবিলে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে যাঁদের নাম প্রকাশ করে করেছিল, তাঁরা হলেন ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, শ্রদ্ধেয় নাট্যকার মন্মথ রায়, চিত্র নায়ক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। এ দলের আর একটি সুপারহিট পালা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সরলা' (স্বর্ণলতা)। এই পালাতেও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছিলেন স্বনামখ্যাত অভিনেতা প্রেমাংশু বসু।

এক সময়ে দলটি বিভিন্ন দিকে দিয়ে বিপন্ন হয়। সেই সময়ে সুধীন মুখার্জীর আবেদনে সাড়া দিয়ে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় দলের মেরুদণ্ড হন! 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ' ইত্যাদি যাত্রার আসরে হাজির করে ভানুবাবু দর্শক মন তোলপাড় করেছিলেন।

॥ ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় / সুশীল নাট্য কোম্পানি এবং মুক্ত মঞ্চ ॥

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় কত বড় মাপের অভিনেতা, কত সাবলীল অথচ দুরন্ত কৌতুক শিল্পী সে কথা সকলেরই জানা। সেই ভানুবাবু সিনেমা, থিয়েটার, রেডিও, রেকর্ড, ক্যাসেট ইত্যাদি সমস্ত মাধ্যম থেকে অতুলনীয় অভিনয় ও কৌতুক রস বিতরণের ভিতর দিয়ে যে ভাবে মানুষের মনকে রাশি রাশি তৃপ্তিতে ভরিয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি জীবনের শেষ দিকে এ দেশের যাত্রার আসরগুলোকে তাঁর অনুপম অভিনয় মাধুর্যে মথিত করে গিয়েছেন। নিজে অন্যের দলে অভিনয় করলে প্রভূত অর্থ পেতেন, কিন্তু যাত্রাকে সমস্ত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হতো না বলেই তিনি নিজে যাত্রাদল লীজ নিয়ে পুরোপুরি ব্যবসায়ী হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। শিল্পী জীবনের ব্রত তিনি এই ভাবেই পালন করেছিলেন। তিনি যাত্রায় এসে যাত্রার ভিতরকার অনেক কদর্য চোহারাও পাল্টে দিয়েছিলেন অনেকটাই। যাত্রার সাধারণ কর্মীদের সঙ্গে এই স্বনামধন্য কৌতুক সম্রাট ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় মিশতেন, ব্যবহার করতেন বন্ধুর মত!

১৯২৩ সালে ২৬ আগষ্ট ঁজীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঁসুনীতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে সাম্যময়ের জন্ম ঢাকায়। এই সাম্যময় পরবর্তী কালে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। বাবা ঢাকার নবাবের সদর মোক্তার ছিলেন, মা ছিলেন সরকারি শিক্ষা বিভাগের কর্মী। ঢাকার গ্রেগরিস স্কুল থেকে ১৯৩৮ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন, ১৯৪০ সালে ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করে ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হন। '৪১ সালে কলকাতায় আসেন। ১২ বছর বয়স থেকেই ভানুবাবু স্বদেশী আন্দোলনের শরিক। বিপ্লবী বিনয় বসু, দীনেশ গুপ্ত, কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত, রমেশ আচার্যের সান্নিধ্য লাভ করেন। বিশ্বনাথ মুখার্জীর নেতৃত্বে ছাত্র আন্দোলন করেন। '৪৬ সালে অনন্ত সিংহের সংস্পর্শে আসেন। '৪১ সালে কলকাতায় এসেই চাকরি পান আয়রণ ষ্টিল কণ্ট্রোল অফিসে। ১৯৫৬ সালে চাকরি ছেড়ে পুরোপুরি অভিনয় জীবনে গ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম ছবি 'জাগরণ'। '৪৬ সালে ২৬ ফেব্রুয়ারি ছিল তাঁর প্রথম ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবার তারিখ। তিন শতাধিক ছবির শিল্পী ভানুবাবু 'কাঞ্চনমূল্য' নামে একটি ছবি প্রযোজনা করেন! ১৯৪৯ সালে উত্তর সারথি ও ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘে যুক্ত হন। 'নতুন ইহুদী' নাটকে অবিস্মরণীয় অভিনয় করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি 'অভিরূপ' সংস্থার সংগে জড়িত ছিলেন। এই সংস্থার পক্ষে ভানুবাবু নির্দেশিত ও অভিনীত 'লাল দীঘির দিনরাত্রি' এক অসামান্য অবদান। ১৯৫১ সালে রঙমহলে 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' নাটকে তিনি প্রথম পেশাদার মঞ্চে অবতীর্ণ হন। পরে ষ্টার থিয়েটারে ষোল বছর ছিলেন। রঙ্গনা থিয়েটারে মহান শিল্পীর নির্দেশিত-অভিনীত 'জয় মা কালী বোডিং' ৫০০ রজনী অতিক্রম করে খ্যাতির সঙ্গে। ১৯৬৮ সালে যাত্রায় যোগ দেন। 'দেবলাদেবী' পালায় আলি খাঁ চরিত্রে তাঁর প্রথম আসরে অভিনয়। '৭০ সালে তিনি সুশীল নাট্য কোম্পানি লীজ নেন। '৭৪ সালে 'মুক্তমঞ্চ' নামে নিজেই দল করেন।

'মুক্ত মঞ্চ' দলের মালিক হিসেবে ভানুবাবুর দুই যোগ্য পুত্র পিনাকী ও গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় চিহ্নিত হন। পালার সুর রচনার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত পালন করেছেন ভানু জায়া নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ দলের শ্রীযুক্ত আলিবাবা, ভৈরব মন্ত্র, যমালয়ে জীবন্ত মানুষ, বৈকুণ্ঠের উইল আসর তোলপাড় করে। সর্বাধিনায়ক ছিলেন সুধীন মুখার্জী। আলোকশিল্পী ছিলেন শ্রীসুকুমার।

যাত্রায় হাসির নাটক কোনদিনও হতো না, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় সেই শূন্যতা চরম সাফল্যের সঙ্গে পূর্ণ করে গেছেন। তাঁর যাত্রা এতই জনপ্রিয় হয় যে কখনও কখনও একই আসরে একই রাতে একই পালা তাঁকে তিনবার আসরস্থ করতে হয়। এই রেকর্ড অদ্যাবধি কোন দলই ভাঙতে পারেনি! তেমনি যাত্রা জগতও যাত্রার সম্মানে ভানুবাবুর মত শিল্পীর কোন স্মৃতি ধরে রাখেনি। পরে এই সুশীল নাট্য কোম্পানি লীজ নিয়েছিলেন শিবানী ভট্টাচার্য ও রাজা ভট্টাচার্য।

॥ রমেন বসুমল্লিক এবং যাত্রালোক ॥

রমেন বসুমল্লিক যখন তাজা ছিলেন, যাত্রা জগতের সঙ্গে যখন তাঁর একাত্মতা গড়ে ওঠেনি তখন তিনি জীবনের অনেকগুলি দিন কাটিয়েছিলেন সাংস্কৃতিক সাংবাদিকতায়। একটি নিজস্ব কাগজও ছিল তাঁর। এরই সুবাদে রমেনবাবুর পরিচিতির পরিধি বিস্তৃত ছিল।

যাত্রা ক্ষেত্রে প্রবেশের মুহূর্ত থেকে নিউ প্রভাস অপেরার তিনকড়ি গুছাইতের সঙ্গে, অল্প দিনের মধ্যে তিনকড়িবাবুর গোটা পরিবারের সঙ্গে রমেনবাবুর সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল পরমাত্মীয়ের মত। তিনকড়িবাবুর সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি নিজের কর্মদক্ষতা, নিজের দৃঢ়তায় যাত্রা জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে আলাদা একটা আসন তৈরি করে নিয়েছিলেন।

যাত্রায় এখন যে আলোক সম্পাতের প্রবণতা এর মূলে রমেনবাবুর ভাবনাকে স্বীকার করতেই হয়। যাত্রায় এ সবের কোন বালাই যখন ছিল না তখন। 'অজাতশত্রু' নাম নিয়ে রমেন বসুমল্লিক ডালডার টিনে বাল্ব বসিয়ে যেমন আলোক সম্পাতের ভূমিকাকে জাগিয়ে তুলেছিলেন, তেমনি যাত্রার আসরে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের নিখুঁত ভূমিকা পালন করেছিলেন। গীতিকার হিসেবেও তিনি পরিচিত ছিলেন। নিউ প্রভাস অপেরা ১৯৬৯ সালে যাত্রায় আলোর চমক আনেন। বৈদ্যুতিক আলোর মাধ্যমে জীবন্ত মানুষ দগ্ধ করা ছাড়াও অনেক কাজই করেছিলেন রমেন বসুমল্লিক।

বছর কয়েক হয়েছে 'যাত্রালোক' প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টিকর্তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম প্রধান। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হয়ে দলকে কিভাবে দাঁড় করাতে হয়, জনপ্রিয় করতে হয় তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মাত্র ৫৮ বয়সে এই কর্মী, প্রযোজকের মৃত্যু হয়।

॥ শ্রীনাথ নট্ট কোম্পানি (বিল্বগ্রাম) ॥

ব্যবসায়ী বীরেন্দ্রকুমার নট্ট ১৯৭৬-৭৭ সালে চিৎপুর যাত্রা পাড়ায় নতুনভাবে এই দলটি প্রতিষ্ঠা করার সঙ্গে একটি বড় ধরনের বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। এমন কি মাখনলাল নট্টের সঙ্গে পরোক্ষ বিরোধ দেখা দেয়। দলটি গড়ে ওঠার মুহূর্ত থেকে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল ঠিকই, আবার দ্রুত এর দুয়ার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই দল এবং বীরেন নট্ট প্রসঙ্গে তখন একরাশ কৌতূহল ও প্রশ্ন ছিল সকলের মনে, তেমনি এই দলটিকে কেন্দ্র করে পুরাতন ইতিহাসের মাটি খুঁড়লে অনেক রত্নের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। শ্রীনাথ নট্ট কোম্পানি যেহেতু বিল্বগ্রামের পুরাতন স্মৃতির প্রচার নতুবা আরও অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল কলকাতায়, সেই হেতু প্রথমে বিল্বগ্রাম নট্ট কোম্পানিকে সূত্র করে শ্রীনাথ নট্ট কোম্পানির ইতিবৃত্ত রচনা বাঞ্ছনীয়।

বিল্বগ্রাম নট্ট কোম্পানি প্রসঙ্গে ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য তাঁর বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষায় বলেছেন ঃ

"বরিশাল জিলার বিল্বগ্রামে এই সংস্থার প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার মালিক ছিলেন কালীচরণ নট্ট। গ্রামের নামানুসারে ইহার নামকরণ করা হয়। এই দলে অঘোরচন্দ্রের 'মহালক্ষ্মী', পঙ্কজভূষণের

'মহামানব', নিতাইপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'সপ্তমাবতার', কানাইলাল শীলের 'নিয়তি', বিনয়কৃষ্ণের 'পণমুক্তি', ভোলানাথের 'ধনুর্যজ্ঞ', জিতেন্দ্রনাথ বসাকের 'কাজলগড়' ইত্যাদি পালা অভিনীত হয়। সংস্থার প্রধান প্রধান অভিনেতা ছিলেন ভোলানাথ ভট্টাচার্য (নৌহাটা, যশোহর), অমূল্য গাঙ্গুলী (ঢাকা)। দলের বিরাজমোহন সেন (বরিশাল) ও শচীন মুখোপাধ্যায় (জয়পুর-যশোহর) পরিচিত অভিনেতা ছিলেন। সংস্থার নৃত্যশিল্পী বিভোর বসুর খুব খ্যাতি ছিল। স্ত্রী ভূমিকায় রাখালরাণী (রাখালচন্দ্র দাস—বরিশাল) জনপ্রিয় অভিনেতা ছিলেন।"

এই বিল্বগ্রাম নট্ট কোম্পানির কর্ণধার কালীচরণ নট্ট'র অধ্যায় শেষ হবার পর, কালীচরণ-এর সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক সূত্রে শ্রীনাথ নট্ট দলের অস্তিত্বকে ধরে রাখার জন্যে পরবর্তী সময়ে দলটি চালান এবং খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দেন। এক সময়ে শ্রীনাথ নট্ট বীরপূজা, ধর্মবল, পলাশীর পরে, আকালের দেশ, মহিষাসুর বধ, স্বামীর ঘর, চন্দ্রহাস আরও বহু পালা উপহার দেন। ১৯৩৩ সালে শ্রীনাথের এই প্রচেষ্টার সঙ্গে, অভিনয়ে ও আরও অনেক বিষয়ে যাঁরা সহযোগিতা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, কালীয়দমন গুহঠাকুরতা, ভোলানাথ ভট্টাচার্য, সুনীল মুখার্জী (রাম ভাই), মনীন্দ্র নন্দী, প্রভাত বোস, বিরাজ সেন, ফণিভূষণ মতিলাল (ছোট ফণি), বাগের হাটের ধীরেশ রানী প্রমুখ। এ ছাড়াও অভিনয়ের জন্য শ্রীনাথ নট্টের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন, সুদর্শন সেন, প্রবীণ অভিনেতা নরেন দে, অশ্বিনী দাস, অরুণ দাস, অগ্রগামীর মালিক দীনেশ নন্দী, স্বনামধন্যা জ্যোৎস্না দত্ত। পরবর্তী সময়ে শ্রীনাথ নট্টের ব্যবসায়ী পুত্র বীরেন নট্ট পিতৃস্মৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য দলের নতুন নাম 'শ্রীনাথ নট্ট কোম্পানি' রেখে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে, ব্যবসায়িক মন নিয়ে যাত্রা পাড়ায় দল প্রতিষ্ঠা করেই, যেভাবে এক ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন, বীরেন নট্টের লিখিত প্রতিবেদন থেকে তা জানা যাবে! আসলে এই সময়ে নট্ট কোম্পানি এবং সদ্যজাত শ্রীনাথ নট্ট কোম্পানির মধ্যে একটা চাপা লড়াই শুরু হয়েছিল। এই লড়াইকে কেন্দ্র করে যাত্রা পাড়ায় দু'টি পরস্পর বিরোধী গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল। শ্রীনাথ নট্ট কোম্পানির পক্ষে যুগান্তর থেকে প্রসাদ অর্থাৎ দৈনিক থেকে মাসিক-সাপ্তাহিক প্রায় সব পত্র-পত্রিকার সাংবাদিক অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতে, যাত্রা জগতে দু' তিন জনের স্বৈরাচারী মনোবৃত্তিকে ভেঙে দেবার জন্য 'সাংস্কৃতির সাংবাদিক সংস্থা'র জন্ম দিয়েছিলেন। অন্য দিকে নট্ট কোম্পানির পক্ষে মাখনলাল নট্ট এবং প্রবোধবন্ধু অধিকারীর দোর্দণ্ড প্রতাপে জন্ম নেওয়া একটা গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল। সেদিনকার সেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণ স্পষ্ট হয়ে আছে বীরেন নট্টের প্রতিবেদনে ঃ

যুগান্তর পত্রিকার ১২. ১০. ৭৭ তারিখে প্রকাশিত এক বিশেষ বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায় বীরেন্দ্রকুমার নট্ট লিখলেন ঃ

"যেহেতু ৫। ৭ বৎসর পূর্বেও যাত্রাপার্টির বিজ্ঞাপন খবরের কাগজে ও রেডিওতে দেবার প্রতিযোগিতা ছিল না এবং সিনেমার দিকে বেশী আকর্ষণ ছিল, সেই হেতু ঘটনাগুলি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকিত।

বর্তমানে আমার পিতা শ্রীনাথ নট্টের স্মৃতিরক্ষার জন্য, পূর্বের নামের সহিত "শ্রীনাথ" যোগ করে "শ্রীনাথ নট্ট কোম্পানি বিল্বগ্রাম" করা হইয়াছে।

এই বিল্বগ্রাম নট্ট কোম্পানির পূর্বের সুখ্যাতি সম্বন্ধে যদি কাহারও অজানা থাকে তবে বয়স্কদের সঙ্গে এই দল সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই পূর্ব ইতিহাস জানিতে পারিবেন। আমরা সেই পূর্ব ঐতিহ্যকে বজায় রাখার চেষ্টা করিয়াছি। কোন কোন স্বার্থপর ব্যক্তি আমার এই যাত্রাপার্টির পুনরায় চালু করাকে সহ্য করিতে না পারিয়া পয়সা ও প্রতিপত্তির জোরে বিভিন্ন অপচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছেন। (কলিকাতার কোন একটি নাম করা দৈনিক সংবাদ প্রতিষ্ঠানও অন্যায়ভাবে এই অপচেষ্টাকে সমর্থন করে আমাদের বিজ্ঞাপন নেওয়া বন্ধ করিয়াছে)। আমাদের খবরাখবর রাখিবার

জন্য আগ্রহী পক্ষগণ যুগান্তর ও সত্যযুগ পত্রিকা সর্বদা লক্ষ্য করুন। এই ইতিহাসকে বিকৃত বা চাপা দেওয়ার চেষ্টার নায়ককে কালীদাসের গাছ কাটার গল্পের নায়কের সহিত তুলনা করা চলে।

সুতরাং মিথ্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, সত্য ঘটনা প্রকাশ করার জন্য আপনাদের সাহায্য প্রার্থনা করি।"

এরপর প্রতিবাদের ঝড় উঠলো। 'সাংস্কৃতিক সাংবাদিক সংস্থা'র সঙ্গে যুক্ত অধিকাংশ দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকার সাংবাদিকরা একটি নতুন প্রতিষ্ঠানের সর্বনাশ সাধনে যারা তৎপর তাদের বিরুদ্ধে লিখিত প্রতিবাদে গর্জে উঠলেন। আজকের স্বনামখ্যাত চিত্র পরিচালক, লেখক অঞ্জন চৌধুরীর 'চুমকী' পত্রিকার পক্ষ থেকে অরুণ চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন ঃ

"...শ্রীনাথ নট্ট কোম্পানী যাত্রা পাড়ায় আজ একটি বলিষ্ঠ নাম। বলিষ্ঠ বলছি এই কারণে তথাকথিত বলিষ্ঠ দল হিসাবে পরিচিত একটি কোম্পানী নির্লজ্জের মত শ্রীনাথের সঙ্গে সম্মুখ সমরে নামছে।...

শুনেছি যাত্রা সম্মেলনের সভ্যপদও নাকি শ্রীনাথ নট্ট কোম্পানীকে দেওয়া হয় নি অথচ সভ্যপদ পাওয়ার মত সকল রকম যোগ্যতাই উক্ত কোম্পানীর আছে।..."

তীব্র প্রতিবাদে সেদিন মুখর হয়েছিল "যুগান্তর", মাসিক "প্রসাদ", "তুলি", "নতুন খবর", "নবকল্লোল", "বাংলা সিনে এ্যাডভান্স", ইত্যাদি পত্রিকা। কিন্তু দুঃখের বিষয় বীরেন নট্ট শত যুদ্ধ চালিয়ে এবং আইন আদালতে গিয়ে, "পৃথিবীর পাঠশালা", "লক্ষ হীরা", "শয়তানের দরবার" ইত্যাদি পালা প্রযোজনায় খ্যাতি এনেও শেষ পর্যন্ত কোন আদর্শই ধরে রাখতে পারেননি। বছর কয়েকের মধ্যে তিনি দল বন্ধ করেন।

॥ শিল্পীতীর্থ এবং বৈদ্যনাথ শীল ॥

এই দলটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শান্তিপুরের বৈদ্যনাথ শীল।

যাত্রা কি, যাত্রার ইতিহাস কাকে বলে এ সব জেনে, যাত্রার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে যাত্রা ব্যবসা করতে বৈদ্যনাথ শীলের যাত্রাপাড়ায় আগমন ঘটেনি। যাত্রা ব্যবসা যখন তুঙ্গে, অন্যের আর্থিক সাফল্য দেখে, অনেক দিন দেখে-ভেবে তাঁতের ব্যবসার সঙ্গে শুরু করেন যাত্রা ব্যবসা। অতি অল্প সময়ের মধ্যে যাত্রা ব্যবসায় সাফল্য অর্জনের সঙ্গে খুলে ফেলেন সার্কাস দল। বৈদ্যনাথবাবুর শুধু টাকা বানাবার আকাঙ্খাই প্রমাণ করে এই ব্যবসা আন্দোলন।

১৯৩১ সালে খুলনা জেলার কুলতলার কৃষ্ণভূষণ শীলের এই ছেলের জন্ম। মাত্র ১২ বছর বয়সে বৈদ্যনাথ তাঁর বাবার সঙ্গে মনোমালিন্য করে ঘর ছাড়েন। সোজা চলে আসেন শান্তিপুরে। আশ্রয় পান পঞ্চানন দত্তের বাড়িতে। তাঁতের কাপড়ের সোনার কাজ ছিল শ্রীদত্তের। বৈদ্যনাথ সেই কাজে কয়েক বছরের মধ্যে পাকা হয়ে ওঠেন। লেখা পড়া বিশেষ না জানা বৈদ্যনাথ মনের জোরে বসান তাঁত। কাপড় তৈরি করেন আর বিক্রি করেন হাওড়া হাটে। কয়েক বছরের মধ্যেই ব্যবসায় সাফল্য। তারপরই অভিনেতা গোপাল গুপ্ত আর পালাকার-অভিনেতা-নির্দেশক নির্মল মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে তৈরি করেন শিল্পীতীর্থ। দলের পরিচালক হিসেবে পেলেন দীনেশ নন্দীকে। শ্রীনন্দী যাত্রা জগতে অসম্ভব পরিচিত, সৎ এবং বিশ্বাসী জেনেই তাঁর ওপর দলের সব দায়িত্ব তুলে দিলেন বৈদ্যনাথ। দীনেশ এই দলে নিয়ে আসেন যাত্রা সম্রাজ্ঞী জ্যোৎস্না দত্ত ও গুরুদাস ধাড়াকে। বছর কয়েকের মধ্যে ব্যবসায় চরম সাফল্য। দীনেশের উপরে সব ছেড়ে বৈদ্যনাথ তৈরি করলেন সাকার্স দল। শান্তিপুরে গড়ে তুললেন প্রাসাদ। জ্যোৎস্না দত্তকে শিল্পীতীর্থের পক্ষ থেকে যে সম্বর্ধনা দিয়েছিলেন বৈদ্যনাথ শীল আর দীনেশ তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। হঠাৎ একদিন দুই বন্ধুর মধ্যে ধরল চরম ফাটল। দীনেশ নন্দী খুললেন নতুন দল। দল পরিচালক থেকে দীনেশ হলেন দলের মালিক। বৈদ্যনাথ অগত্যা যাত্রা ব্যবসা থেকে যা কিছু নেবার নিয়ে, বীতস্পৃহ হয়ে, সার্কাস দলের

চরম লোকসান মাথায় নিয়ে, বহু মানুষের আসল চেহারা চিনে ফিরে গেলেন শান্তিপুরে। নিজের কাপড়ের ব্যবসায়। বৈদ্যনাথবাবুর ব্যবহারে মুগ্ধ যাত্রা জগতের সকলে এটাই তাঁর কৃতিত্ব।

॥ নব শিল্পীতীর্থ ॥

এর পর শিল্পীতীর্থের নামের সঙ্গে 'নব' যুক্ত করে সেই একই গদি ঘরে চলচ্চিত্র অভিনেতা উজ্জ্বল সেনগুপ্ত, মীনাক্ষী দে, প্রমুখ কিছুদিন বাঁচিয়ে রেখেছিলেন দলটিকে।

॥ অগ্রগামী / দীনেশ নন্দী ॥

১৯৩৩ সালে নোয়াখালির পূর্বাপুর গ্রামে নক্ষত্রকুমার নন্দীর ছেলে দীনেশ নন্দীর জন্ম। বাবা ছিলেন নাটক প্রিয়, এবং বাড়িতে নানা পূজা পার্বণে, রাসে যে পালাগান হতো সেই সব দেখে অভিনয়ের প্রতি ঝোঁক হয় তাঁর। আদি ভোলানাথ অপেরা একবার দেশে পালা গাইতে গিয়ে দীনেশের অভিনয় দেখে খুশি হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে লেখা-পড়া নাম মাত্র শিখে কলকাতায় এসে উক্ত অপেরা দলের 'চন্দ্রহাস' পালায় এক বালক চরিত্রে প্রথম অভিনয় করেন। এই সময়ে এখানে জ্যোৎস্না দত্তের আবির্ভাব। প্রায় আট বছর এই দলে, বিল্বগ্রাম নট্ট কোম্পানিতে দু'বছর, জয়দুর্গা অপেরায় দু'বছর, তারপর ধৃতিশ্রী নাট্য শিল্পমে পাঁচ বছর, ও বাসন্তী অপেরায় এক বছর কাটিয়ে নবযুগ নাট্য সংসদে যুক্ত হন। এই দলের মালিক অনিলবাবু এই শিল্পীর ওপর ম্যানেজারির দায়িত্ব অর্পণ করেন। এই সময়ে অভিনয়ও চালিয়ে যেতেন দীনেশ। নারী চরিত্রে দীনেশ নন্দীর অভিনয়ই এক সময়ে দীনেশকে দীনেশরানীতে রূপান্তরিত করে। তারপর ধীরে ধীরে অভিনয় থেকে অবসর নেন। যুক্ত হন অভিনেত্রী কনকলতা প্রতিষ্ঠিত শ্রীমা নাট্য কোম্পানির ম্যানেজার হিসেবে। এখানে পাঁচ বছর কাটিয়ে দীনেশ যুক্ত হন আর্য অপেরার সঙ্গে। তারপর শ্রীমা অপেরায়। দল পরিচালক বা জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে দীনেশ নন্দীর যখন অনেক যশ ঠিক তখন তিনি এক তাঁত ব্যবসায়ী বৈদ্যনাথ শীলের সঙ্গে পরিচিত হন। দীনেশ নন্দীর সহযোগিতায় বৈদ্যনাথ শীল তাঁর দলকে শান্তিপুর থেকে চিৎপুর যাত্রাপাড়ায় নিয়ে আসেন। জ্যোৎস্না দত্তের খ্যাতি তখন তুঙ্গে। জ্যোৎস্না-গুরুদাস ধাড়া জুটি তখন যাত্রার আসরের কোহিনূর। পূর্ববন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে দীনেশবাবু এই দলে নিয়ে আসেন এঁদের। এই দলের একের পর এক পালা যখন যাত্রা সম্রাজ্ঞী জ্যোৎস্না দত্ত এবং অসামান্য গায়ক গুরুদাস ধাড়ার অভিনয়ে-গানে ব্যবসায়িক সাফল্যে চরমে পৌঁছলো, যখন দীনেশবাবু তাঁর সর্ব শক্তি দিয়ে দলকে দাঁড় করালেন, তখন দলে ভাঙন দেখা দিল। দীনেশবাবু এরপর নিজেই তৈরি করেন 'অগ্রগামী' যাত্রা প্রতিষ্ঠান।

এই সময়ে নট্ট কোম্পানির চরম সাফল্যের আকাশের উজ্জ্বলতম তারকা অরুণ দাশগুপ্ত-বীণা দাশগুপ্তা। এই স্বামী-স্ত্রী জুটি তখন নট্ট কোম্পানির মেরুদণ্ড। এই প্রখ্যাত জুটি, নট্ট কোম্পানির শিরোমণি শিল্পীদ্বয় এলেন দীনেশবাবুর অগ্রগামীতে। এরপর থেকে দীনেশ নন্দীর সাফল্যের অধ্যায় রচিত হতে থাকল। অতি সাধারণ অবস্থার ভিতর থেকে আসা দীনেশ নন্দীর ভাগ্য সোনা দিয়ে বাঁধা হতে থাকল। অকস্মাৎ শক্তিমান অভিনেতা ও নির্দেশক অরুণ দাশগুপ্তের মৃত্যু হয়। তারপর থেকে অগ্রগামীতে বীণা দেবী হন একাই একশ। পালা নির্দেশনার দায়িত্বভার বীণা দেবীই গ্রহণ করেন। এই দল থেকেই তাঁকে 'যাত্রালক্ষ্মী' বিশেষণে ভূষিত করা হয়। অরুণবাবু ও বীণাদেবীর অতি প্রিয়, প্রায় দিন রাতের সহচর, গোকুলে বাড়তে থাকা তরুণ পালাকার সুনীল চৌধুরীর ভাগ্য দুয়ার উন্মুক্ত হয়। অগ্রগামীর স্থায়ী পালাকার হবার যোগ্যতা একেবারে প্রথমেই অর্জন করেন সুনীলবাবু পালা রচনার গুণে। একের পর এক পালা সুপারহীট। এই ভাবে কয়েক বছর কাটার পর, যাত্রালক্ষ্মী অগ্রগামী ছেড়ে চলে যান। কোম্পানির ঐতিহ্য মণ্ডিত মঞ্চের ওপর তিল তিল করে তিলোত্তমা হওয়া বেলা সরকার নট্ট ছেড়ে চলে এলেন অগ্রগামীতে। এই রত্নের দৌলতেও অগ্রগামীর সাফল্যের ভাণ্ডার উপচে পড়ল। অগ্রগামী যাত্রা জগতের এক শ্রেষ্ঠ

প্রতিষ্ঠানের সম্মান পেয়েছিল একেবারে গোড়াপত্তন থেকে। যাত্রা থেকে প্রাচুর্যের স্বাদ পেয়েছেন। যাত্রা থেকে ঐশ্বর্য পেয়েছেন। মিষ্টভাষী, স্বল্পভাষী দীনেশ নন্দী যাত্রা জগতের বহু পুরাতন প্রেমিক হয়েও যাত্রার কোন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকেন না। দীনেশবাবু যাত্রার কোন সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামান না। দীনেশবাবু সাতেও থাকেন না, পাঁচেও থাকেন না। দীনেশ নন্দী যে একজন খাঁটি যাত্রা পণ্যের ব্যাপারী তা জন্ম জন্মান্তরের জন্য লেখা থাকবে যাত্রার ইতিহাসে। কিন্তু যাত্রার বহু জনের মত মরেও কিভাবে বেঁচে থাকা যায় সে পথের সন্ধান তিনি করেননি কখনও। তবে জীবনের সব স্বাদই তিনি নিয়েছেন। মৃত্যুর পর আজীবনের তীর্থ যে যাত্রা, সেখানে সকলের মধ্যে চির অমর হয়ে থেকে যাবার জন্যে বিশেষ কোন অবদান রেখে যাবার সময় পাননি তিনি।

॥ জনতা অপেরা এবং গণেশ রায় ॥

এই দলটি প্রসঙ্গে একটু বিস্তারিত বলা প্রয়োজন। প্রয়োজন এই কারণে, এ দলের অলিখিত মালিক গণেশ রায় এবং ঘোষিত প্রযোজক শ্যামল চক্রবর্তী দলটিকে কামধেনুতে রূপান্তরিত করেছিলেন। সেই সঙ্গে অনেক ইতিহাসেরও সাক্ষী।

উত্তর কলকাতার বাসিন্দা লালমোহন দাস, প্রবীণ ব্যবস্থাপক গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই যাত্রা দল প্রতিষ্ঠা করেন। জীবনকৃষ্ণ দাস এর পিছনে না থাকলে হয়তো এই দলটি অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা পেত না। ব্রজেন দে'র 'দোষী কে' পালা দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের জয়যাত্রা শুরু হয়। এরপর ব্রজেনবাবুর 'মাটির কান্না', আনন্দময়ের 'যুগের দাবী', 'ফাঁসির মঞ্চে', 'সম্রাট আলেকজেন্দার', কানাই নাথের 'সৈনিক ধর হাতিয়ার', সত্যপ্রকাশ দত্তের 'তামসী', 'অঙ্গার', প্রসাদ ভট্টাচার্যের 'অশান্ত ঘূর্ণি' এই দলটিকে প্রতিষ্ঠা দেয়।

পরে দলটি কিনে নেন গণেশ রায়। এই গণেশ রায় প্রথম জীবনে যাত্রা-থিয়েটারের কেউ ছিলেন না। প্রথমে ছিলেন ছাত্র, পরে চাকুরে। ভাগ্য তাঁকে এক সময়ে টেনে আনে যাত্রা পাড়ায়। সূত্র, আর্থিক লেন দেন।

নারায়ণচন্দ্র রায়ের ছেলে গণেশ রায়ের জন্ম ১৯৪৩ সালে বাগবাজারে। প্রথমে সরস্বতী স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে, মহারাজা শ্রীশচন্দ্র কলেজে ইণ্টারমিডিয়েট পড়াকালীন, জে. কে. কটন মিলস-এ চাকরি পান। এ কাজ তিনি বেশি দিন করেননি। পরে আবার চাকরি পান। এই চাকরি জীবনের সঙ্গে যাত্রার ব্যবসা শুরু হয়। শহর থেকে দূরে, বামাক্ষ্যাপা, ফেরারী আসামী, উপহার, লগ্ন চলে যায়, বিদ্রোহী সুকান্ত, মহাকবি কালিদাস, নদের নিমাই, শের আফগান এবং আরও বহু পালা উপহার দেন।

নট সম্রাট স্বপনকুমারকে নিয়ে এই দল ব্যবসায়িক সাফল্যের শিখরে পৌঁছয়। তপনকুমার-এর মত শক্তিমান নায়ক এই দলের সেই ব্যবসায়িক সাফল্যের নিশান ধরে রেখেছিলেন। জনতা অপেরা দুটি বিশেষ কারণে ইতিহাসের পাতায় বেঁচে থাকবে। একটি কারণ, বোম্বাই-এর বর্ধিষ্ণু এবং সুপ্রাচীন "বোম্বাই দুর্গা বাড়ি সমিতি'র আমন্ত্রণে বোম্বাইয়ের সব চাইতে বিলাসবহুল 'সম্মুখানন্দ হলে' পালাভিনয় করে 'বাংলা যাত্রা'-র স্বাদ পুরোপুরি বিলিয়ে এসেছিলেন প্রবাসী বাঙালী মহলে। এই সময়ে নায়ক ছিলেন তপনকুমার।

বোম্বাই দুর্গাবাড়িতে অংশ গ্রহণ করে সেদিন জনতা অপেরা এবং তার শিল্পীরা যে গৌরব অর্জন করেছিলেন তার মূলে ছিলাম স্বয়ং আমি। এই গ্রন্থের রচয়িতা। আমার সেদিন একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, কলকাতার যাত্রাকে প্রবাসী বাঙালী মহলে ছড়িয়ে দেওয়া। বম্বে দুর্গাবাড়ির কয়েকযুগের সভাপতি, বর্ধিষ্ণু বাঙালী শ্রদ্ধেয় সঞ্জীবন বন্দ্যোপাধ্যায় আমার ঘনিষ্ঠ। তাঁরই আন্তরিক ইচ্ছায় তিন দিন ব্যাপী যাত্রা উৎসব হয়েছিল বম্বে সম্মুখানন্দ হলে। দল-নির্বাচন এবং তাঁদের পাঠানোর সব দায়িত্বভার আমার ওপর ন্যস্ত ছিল। আমি প্রথমে ভারতী অপেরা এবং নট-

সম্রাট স্বপনকুমারকে পাঠাবার ব্যবস্থা পাকা করি। স্বপনকুমার ও স্বপ্নাকুমারীকে বিমানে পাঠাবার সিদ্ধান্ত পাকা করে বিমানের টিকিট পর্যন্ত প্রস্তুত রাখি। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ বোম্বাই যাত্রার মাত্র কয়েকদিন আগে স্বপ্নাকুমারীর আকস্মিক মৃত্যু হয়। বাতিল হয় ভারতী অপেরা। এরপর আমি "জনতা"কে এই গৌরব জয়ের সুযোগ দিই। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটি সম্পূর্ণ কামরায় ডবলজার্নি-সিংগল্ ফেয়ারের অনুমোদন বার করা থেকে প্রায় ৫০। ৬০ জনের টিকিট কাটা সব কাজই করি। দল যথা দিনে বোম্বাই যায়। এবং যথারীতি অনুষ্ঠান করে। কতটা খ্যাতি অর্জন করতে পেরেছিল তা বিস্তারিত জানা যায়নি। তবে অভিযোগ, বর্ধিষ্ণু দুর্গাবাড়ি সমিতির শিক্ষিত-মার্জিত এবং অভিজাত পরিবেশে কলকাতার এই যাত্রা কোম্পানি রেখে এসেছিল "যাত্রাওয়ালা" মানসিকতা। এই সময়ে অনেকের ধারণা হয়েছিল, জনতা অপেরা হয়তো আমার মত একজন সাধারণ লোকের প্রতি, একজন সাংস্কৃতিক সাংবাদিকের প্রতি সর্বদিক দিয়ে উদারতা দেখিয়েছে! এই ইতিহাস রচনার সূত্রে সেই উদারতার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই দলের মালিকপক্ষ বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা তো দূরের কথা, উদয়-অস্ত যে শ্রম দিয়েছিলাম তার জন্যে একটি পয়সাও পারিশ্রমিক, এমন কি বিভিন্ন দিকে ছোটাছুটির জন্য কোন অর্থ দেবার মানসিকতা দেখায়নি। ভাল মানুষকে ঠকানো, দুর্বল মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা, কাজের সময়ে পদলেহন করা যে জগতের অন্ততঃ বারো আনা ধর্ম, সেই ধর্ম এঁরাও পালন করেছিলেন যথারীতি। দল নিয়ে বোম্বাই যাত্রার সমস্ত কাজ উদ্ধার করার পর, বোম্বাই যাত্রার দু'দিন আগে আনন্দবাজার পত্রিকায় যে বৃহৎ বিজ্ঞাপন এই মালিক পক্ষ দিয়েছিলেন সেখানে সৌজন্য দেখাতে আমার নামটি পর্যন্ত দেননি। অথচ মৌখিক শর্ত ছিল "গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষের সৌজন্যে বোম্বাই যাত্রা" এই ধরনের স্বীকৃতি দিতে হবে। তা এঁরা দেননি। বলেছিলেন "ভুল হয়ে গেছে"। আসলে বিজ্ঞাপনে আমার নাম দিয়ে আনন্দবাজারের সাংবাদিক প্রবোধবন্ধুকে চটাতে চাননি এঁরা। তার আর এক সর্বনাশা নজির হাজির করি ঃ

॥ যাত্রায় কিংবদন্তীর নায়ক উত্তমকুমার ॥

সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে যাত্রা জগতে প্রবোধবন্ধু অধিকারী ছিলেন প্রায় সকলের এমনকি গোটা যাত্রা জগতের পিতা স্বরূপ। দল গড়া থেকে শিল্পী নির্বাচন, পালা নির্বাচন থেকে পালা উদ্বোধন সমস্ত কাজের নেপথ্যে প্রবোধবন্ধু ছিলেন সকলের কুলপুরোহিতের মত। ছোট ছোট শিল্পী এবং দলের অনেক মালিকের প্রচণ্ড ক্ষোভও জমা ছিল। প্রবোধবাবুর সেদিনকার সেই দাপট এমন একটা সীমায় পৌঁছেছিল, যা দেখে প্রবোধবাবুকে দূর থেকে যাঁরা সত্যিই ভালবাসতেন তাঁরা রীতিমত ভীত হয়ে পড়েছিলেন। সকলেরই আশংকা ছিল, যে কোন মুহূর্তে প্রবোধবাবুর এই প্রতাপের প্রাসাদ ভেঙে পড়বে। অনেকে মনে করতে শুরু করলেন, প্রবোধবন্ধু যাত্রার সার্বিক কল্যাণে যতটা আত্ম উৎসর্গ করেছেন, তার চাইতে অনেক বেশি নিজের পায়ের তলার মাটি হারিয়ে ফেলতে বসেছেন। আসলে প্রবোধবাবু যে দৈনিক সংবাদপত্রে একটা বড় মাপের সিংহাসনে বসে আছেন, এটি যেমন বাজারে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি আনন্দবাজারের মত একমাত্র শক্তিশালী সংবাদপত্রের সামান্য মদত পেলে যাত্রা ব্যবসায় মুনাফা পাওয়া যাবে এই সত্যটা মাথায় রেখে বড় বড় পয়সাওয়ালা যাত্রা মালিক থেকে থিয়েটার-যাত্রার সর্বস্তরের অধিকাংশ মানুষ সেই প্রবোধবাবুর উপরে নির্ভর করতেন। স্বনামে অনেক কাজ করা বাধা ছিল বলে, নেপথ্যে 'পরমপিতা'র ভূমিকা পালন করতে থাকলেন প্রবোধবাবু। প্রবোধবাবুর বাড়ির পরিবেশে সকাল থেকে যেমন মিনি যাত্রা পাড়া তৈরি হয়ে গেল, তেমনি আনন্দবাজার অফিসে যে ঘরে প্রবোধবাবু বসতেন, সেই ঘরে তখন আরও ৩ জন প্রখ্যাত সাংবাদিকও বসতেন। এক টেবিলে মনুজেন্দ্র ভঞ্জ, আর এক টেবিলে সেবাব্রত গুপ্ত, অন্য টেবিলে জ্যোতির্ময় বসু রায়। জ্যোতির্ময়বাবু কিছুদিনের মধ্যে চলে গেলেন

প্রায় সর্বত্যাগী মনটুকুকে সম্বল করে। এরপর রইলেন মনুজেন্দ্রবাবু, সেবাব্রত গুপ্ত। এই ঘরে প্রবোধবাবুর কাছে যাত্রার মালিকদের ভিড় ধীরে ধীরে বাড়তে থাকল। যাত্রায় অভিনেতা-অভিনেত্রী হতে চাওয়া গ্রুপ থিয়েটারের শক্তিমান অনেকে তখন প্রবোধবাবুর দ্বারস্থ। যাত্রার বড় বড় মালিক উপদেশ নেবার জন্য জমায়েত। পালাকাররা পালার পাণ্ডুলিপি নিয়ে সুযোগের প্রত্যাশায়। নতুন দল তৈরি করার বাসনা নিয়ে টাকার বান্ডিল ব্যাগে নিয়ে অধিষ্ঠিত কিছু মানুষ। সে সব অন্য ইতিহাস। এই দাপটের সময়ে যাত্রা পাড়ায় নিত্য ঘোরা অনেক পত্র-পত্রিকার সাংবাদিকরা উপলব্ধি করতে পারলেন, কোথায় যেন তাঁদের প্রতি যোগ্য সম্মানটুকুও দিচ্ছে না বেশ কিছু বড় দলের মালিক। নানা বৈষম্যমূলক আচরণ। এর থেকে একটা বিচ্ছিন্নতাবাদ দেখা দিল যাত্রায়। আমিও গোড়া থেকে আলাদা শিবির রচনা করেছি তখন। এই সময়ে প্রবোধবাবু কথায় কথায় যাত্রায় এনে দিতে পারতেন আকাশের তারা! একবার বাজারে রটে গেল, অমুক দলে এবার আসছেন 'বিশ্বজিৎ'! আর বিশ্বজিৎকে যাত্রায় আনার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছেন প্রবোধবাবু! এই ভাবে সর্ব দিক দিয়ে প্রবোধবাবু বিতর্কিত হয়ে উঠতে থাকলেন। প্রবোধবাবুকে খুশি করার একটা চাপা প্রতিযোগিতাও চলতে থাকল। আমি স্পষ্ট যা বুঝেছিলাম, প্রবোধদা কেন তা বুঝতে পারছিলেন না জানি না। আমি বুঝেছিলাম, প্রবোধদার প্রকৃত বন্ধু কেউ নেই! এঁরা আসলে "গড়" করছে তাঁর চেয়ারকে!

যা হোক '৭৯ সালের গোড়ার দিকে জনতা অপেরার ম্যানেজার সবুজ সরকার (বহু বছর সে নিরুদ্দেশ) আমাকে উত্যক্ত করতে শুরু করল। আমি 'প্রসাদ' পত্রিকায় তখন ধারাবাহিক লিখছি উত্তমকুমারের জীবনী। ধুরন্ধর যাত্রা ব্যবসায়ী বা যাত্রাওয়ালা জনতা অপেরার মালিকপক্ষ ম্যানেজার সবুজ সরকারকে আমার পিছনে লাগিয়ে দিল। ওদের ইচ্ছা, যাত্রার সঙ্গে উত্তমকুমারের নামটা আমি জড়িয়ে দিই। আমারও একটা জেদ চেপে বসল। ওঁরা চান, আগামী মরশুমের পালায় 'উত্তমকুমার পালা নির্দেশক', শুধু এইটুকু অনুমতি এনে দিতে হবে। এর জন্য উত্তমবাবু যে টাকা চাইবেন তাই দিতে ওরা প্রস্তুত। আমিও চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিলাম। এক সময়ে উত্তমদাকে অনেকটা রাজী করলাম। মালিক পক্ষ তখনও নেপথ্যে। সবুজ সরকারকে নিয়ে গেলাম দাদার কাছে। ময়রা স্ট্রীটের ড্রইংরুমে দাদার মুখোমুখি বসে মূল্যবান কাপে চা খেয়ে যাত্রাওয়ালা, গ্রামের ছেলে সবুজের জীবনটা ধন্য হয়ে গেছে বারবার স্বীকারও করল। এরপর আমার নারকেলডাঙ্গা নর্থ রোডের ছোট্ট ফ্ল্যাটে ঝকঝকে প্রাইভেট করে জনতার মালিক গণেশ রায়ের বড়দা, নায়ক তপনকুমার এঁদের ঘন ঘন যাতায়াত শুরু হয়ে গেল! কাজ হাসিল হলো এক সময়ে। ওঁরা চেয়েছিলেন নির্দেশক হিসেবে উত্তমদার নামটা ব্যবহার করতে। আমি উত্তমদাকে অনুনয় করে বলেছিলাম, সুরকারও আপনি। তাছাড়া নামটা শুধু দিলে চলবে না, ময়রা স্ট্রীটেই বার কতক রিহার্সাল ফেলতে হবে, এটা ছিল উত্তমদারই উক্তি। পালার বিষয় নির্বাচনের দায়িত্বও শেষ পর্যন্ত তিনি নিয়ে, আমাকে পাঠিয়েছিলেন জ্যোতি সিনেমার পাশে জনপ্রিয় লেখক ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের কাছে ভাল গল্পের জন্য। গিয়েছিলাম। উত্তমদা যাত্রার জন্য কাহিনী চান শুনে নীহারবাবুও রাজী হলেন। সব জল্পনা কল্পনার অবসান। একদিন উত্তমদা আমাকে বললেন, "অমুকদিন মালিকদের নিয়ে সকালে এস। এগ্রিমেন্টটা লিখে এনো। আমি সই করে দেব"। দীর্ঘ এই অভিযানে জনতা অপেরার মালিক পক্ষ, স্বয়ং নায়ক তপনকুমার আমার কাছে সম্পূর্ণ গোপন করে গেলেন, উত্তমদার সঙ্গে আমি কতটা এগিয়েছি তার নিত্য দিনের রিপোর্ট তাঁরা পৌঁছে দিচ্ছেন প্রবোধবাবুর নিমতলা ঘাট স্ট্রীটের বাড়িতে। বঁড়শিতে এই বিশাল রুইটি গাঁথা হলেই প্রথমে ব্যবসায়িক স্বার্থে প্রয়োজন প্রবোধবাবুকে। আনন্দবাজার যদি এই ঐতিহাসিক ঘটনার খবর ফলাও করে ছেপে দেয় তাহলে জনতার গদিতে নায়েকদের ঢল নামবেই। সুতরাং প্রবোধবাবুর সঙ্গে এ ব্যাপারে নিত্য

যোগাযোগ রাখার ব্যাপারটা তাঁরা আমার কাছে গোপন করে গেলেন। প্রবোধদাকে লাইম লাইটে আনলে ব্যাপারটা কেঁচে যাবে, আমি রেগে যাব, উত্তমদাকে বলে দিলে তিনি সরে যাবেন, এটা মাথায় রেখে 'জনতা' আমার সঙ্গে নীরবে রাজনৈতিক মনোভাবের পরিচয় দিয়ে গেল! যা হোক, যথাদিনে যাত্রার মালিক পক্ষকে নিয়ে ময়রা স্ট্রীটে গেলাম। তার আগের দিন তপনকুমারের দমদমের বাড়িতে সন্ধ্যায় গিয়ে "আমার লেখা, আমারই হাতের লেখা" শর্ত পত্রটি দলের নায়ক হিসেবে তপনকে পড়িয়ে নিলাম। শর্ত পড়ে তপন অনুরোধ জানালেন, "এই শর্তের মধ্যে তাঁর নামটা কোন ভাবে দিয়ে দিতে! এই শর্তপত্রের যে কপি আমাদের থাকবে সেটি আমরা বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করব!" অনুরোধ রাখলাম! সেই শর্ত পত্রে যুক্ত করলাম "যাত্রার মহানায়ক তপনকুমারের আমন্ত্রণে"। পুনরায় সেই শর্ত পত্রটি আমি নতুন করে, সুন্দর ভাবে লিখলাম।

১৮ মার্চ '৮০। আগের দিন ভিতরের যে স্টাডি রুমে বসে কথা হয়েছিল আবার সেই স্টাডি রুম। আমি, তপনবাবু, জনতার মালিকদের জামাইবাবু ওরফে প্রযোজক শ্যামল চক্রবর্তী এবং জনতার আরও ক'জন। আমাদের সামনে চিত্রাকাশের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক উত্তমকুমার।

কালো কালিতে লেখা সেই চিঠির তিনটি কপি মেলে ধরলাম দাদার সামনে। পড়লেন তিনি। তারপর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় সেই তিনটি কপিতেই স্বাক্ষর করলেন। স্বাক্ষর করলেন আমারই পেনে, কারণ আমি বরাবরই কালো কালিতে লিখি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, উত্তমদার পারিশ্রমিকের অগ্রিম বাবদ জনতার জামাইবাবু পনের হাজার টাকার একটা বাণ্ডিল দিলেন উত্তমদার হতে। সেই টাকার বাণ্ডিল দাদা তুলে দিলেন বেণুদির হাতে। তারপরই হাসতে হাসতে বেণুদি (সুপ্রিয়া দেবী) বললেন, শেষ পর্যন্ত হলো?—আমি বললাম, আজ একটা ইতিহাস তৈরি হলো বেণুদি। (এই সময়ে সুপ্রিয়া দেবী হয়তো স্বপ্নেও ভাবেন নি, একদিন তিনিও আসবেন যাত্রায়।) দাদাকে প্রণাম করে নেমে এলাম। মনে মনে পরিকল্পনা করেছিলাম, আমি নিজে এই সংবাদ ছড়িয়ে দেব প্রত্যেক সংবাদপত্রে গিয়ে। কিন্তু তা হলো না—

১৯ মার্চ '৮০। আনন্দবাজারের প্রথম পৃষ্ঠায় সেই স্মরণীয় ঘটনাটির সংবাদ পরিবেশিত হল। (আর অন্য কোন কাগজে নয়।) আমার পরিকল্পনাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে একমাত্র আনন্দবাজারের পাঠকরা পড়লেন সেই সংবাদ।

আমি "মর্মান্তিক" খুশি হলাম। একরাশ খুশি। হঠাৎ মনে এলো কবিগুরুর উক্তি—

'রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহা ধূমধাম—
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি
মূর্তি ভাবে আমি দেব হাসে অন্তর্যামী ।।'

এরপরের ইতিহাস মর্মান্তিক। উত্তমদাকে বলেছিলাম, রথের দিন আপনাকে রাতের দিকে চিৎপুরে জনতার গদিতে নিয়ে যাব। দাদা বলেছিলেন, যাব। তারপর সব শেষ। রথের আগেই মারা গেলেন উত্তমকুমার। আমার শ্রম, নিষ্ঠা, পবিত্রতাকে লুঠ করে যারা প্রতারণা করেছে বোধ হয় মৃত্যু দিয়ে তার প্রতিবাদ করে গেলেন মহান উত্তমকুমার।

বিঃ দ্রঃ আনন্দবাজারের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সেই ঐতিহাসিক ঘটনার সংবাদ শ্রদ্ধেয় প্রবোধবাবু এমন সাহিত্য রসে ভিজিয়ে পরিবেশন করেছিলেন, যা পড়ে আপামর পাঠকসমাজ বুঝেছিল, ওটা প্রবোধবাবুর কীর্তি।

বোম্বাই দুর্গাবাড়ি সমিতির শ্রদ্ধেয় সভাপতি এবং আমাদের কাকাবাবু শ্রীসঞ্জীবন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫. ৯. ৮০ তারিখে একটি পত্রে জানাচ্ছেন ঃ

প্রীতিভাজনেষু,

আমার পত্রগুলি-বিশেষতঃ ৪. ৯. ৮০ ও ৩. ৯. ৮০ তারিখের পাইয়া থাকিবে...আমরা তিনটি English Paper, Times Of India, Indian Express, Press Journal-এ 11th Sept. যে Advt. দিয়াছি তাহার Cutting এই সঙ্গে পাঠাইলাম..."

বিজ্ঞাপনের নমুনা এখানে হাজির করলাম :

A TRIBUTE TO
UTTAM KUMAR

To pay homage to the memory of Uttam Kumar, Bombay Durga Bari Samiti presents a Jatra Festival commencing with "Jivan Sangini", the first and only Jatra play directed by the Mahanayak Uttam Kumar and cordially invites you to attend in large numbers befitting the occasion.

শীততাপ নিয়ন্ত্রিত সম্মুখানন্দ হলে কলিকাতার শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয়ে

জনতা অপেরার

৩ দিনের যাত্রা উৎসব ৬ই হইতে ৮ই অক্টোবর ১৯৮০

প্রতিদিন রাত্রি ৭-৩০ মিঃ

মহানায়ক উত্তমকুমার নির্দেশিত ও সুরারোপিত

সামাজিক : জীবন সঙ্গিনী পৌরাণিক : কর্ণ কুন্তী কৃষ্ণা ঐতিহাসিক : জলদস্যু

প্রধান ভূমিকায় যাত্রার মহানায়ক তপনকুমার

বিঃ দ্রঃ-"সিজন কার্ড" ৫০ টাকা (দুই জনের জন্য)

সীমিত আসন থাকায় এখনই বম্বে দূর্গা বাড়ী সমিতির অফিস হইতে কার্ড সংগ্রহ করুন

(Phone : 297593)

প্রতিদিনের প্রবেশ হার ১৫৲ ১০৲ ৭৲ ৫৲ ও ৩৲

প্রবেশ পত্র পাওয়া যাবে "হলে" ও সমিতির অফিসে ২৬ শে সেপ্টেম্বর ১৯৮০ হইতে

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা দরকার, এই সূত্রে অভিজাত বম্বে দুর্গাবাড়ি সমিতির সক্রিয় অনেক সদস্য জনতা অপেরার কর্তৃপক্ষের ব্যবহার এবং একাধিক অপ্রীতিকর কাজের জন্য যে অসন্তুষ্ট তাও স্পষ্টতই জানিয়েছিলেন। আজও নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে জনতা অপেরা বেঁচে আছে মাথা উঁচু করে। রবি রায় দলের অন্যতম কর্ণধার।

॥ নব রঞ্জন এবং তপনকুমার ॥

বরিশালের গাঁড়ুরিয়া গ্রামের ললিতমোহন ব্যানার্জীর একমাত্র ছেলে খুব ছোটবেলায়, কাঁঠাল পাতার মুকুট মাথায় পরে, বাঁশ কঞ্চির তলোয়ার হাতে নিয়ে রাজা সাজা তপনকুমার, আজ তাঁর যাত্রা সাম্রাজ্যে সত্যিই এক সুখী আর তৃপ্ত সম্রাট। পাতার মুকুট থেকে জরি-চুমকির মুকুট মাথায় দিয়ে যে তপনকুমার তাঁর দৃপ্ত অভিনয়ে করতালি কুড়িয়ে কুড়িয়ে প্রতিষ্ঠার ভিতকে শক্ত করেছেন, যে তপনকুমারকে একদা টিনসার যাত্রা থেকে অনেক ঘাম ঝরিয়ে পেটের অন্ন জোগাড় করতে হয়েছে, সেই তপনকুমার জরি-চুমকি অথবা টিনসার যুগ পিছনে ফেলে, ধুতি-পাঞ্জাবি, প্যান্ট বা চোগা পরে কখনও পড়তি জমিদার, কখনও আদর্শ অধ্যাপক, কখনও রেঞ্জার সাহেব, কখনও অর্থনৈতিক-সামাজিক অবক্ষয়ের শিকারে বিপন্ন নায়ক হয়ে এখন খ্যাতি, চরম প্রতিষ্ঠা আর অর্থের কৌলীন্যের ত্রিমুকুট শিরধার্য করে যাত্রার মহানায়কের আসনে অধিষ্ঠিত। অত্যন্ত দীন অবস্থা আর সীমাহীন সংগ্রামের ভিতর দিয়ে আজকের যাত্রার মহানায়ক প্রথম পেশাদারি যাত্রা দল 'ভোলনাথ অপেরা'-য় অভিনয় করার সুযোগ পান। তপনবাবুর প্রথম অভিনীত পেশাদার পালা 'মাতৃদ্রোহী'।

এই পালার 'কুন্দন' চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েই প্রশংসা পান। এরপর আসেন সত্যম্বর অপেরায়। চরম সুপারহিট 'সোনাইদীঘি' পালায় মাধব চরিত্রে অসামান্য অভিনয়ের ভিতর দিয়ে নায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান। তারপর থেকে শুধু এগিয়ে যাওয়া। গণেশ, নাট্যভারতী, রয়েল বীণাপাণি, জনতা ইত্যাদি বড় বড় দলে চরম খ্যাতি নিয়ে অভিনয় করেছেন। হয়েছেন মহানায়ক। মহানায়ক উত্তমকুমারের প্রিয় এই অভিনেতা অবশেষে বহু মানুষের কথা ভেবে, উত্তরাধিকারদের জন্য স্থায়ী কিছু রেখে যাবার তাগিদে নিজে দল গড়ার ঝুঁকি নেন। জীবনকৃষ্ণ দাসের বিধবা স্ত্রীর কাছ থেকে শোনা যায় ২৬ হাজার টাকায় নবরঞ্জন অপেরা লীজ নিয়ে তপনকুমার নব রঞ্জনের নতুন করে জীবন দান করেন। যে সময়ে যাত্রায় জীব-জন্তু, ম্যাজিক-সার্কাস-সিনেমা তারকার ঢল নামিয়ে তাৎক্ষণিক মুনাফা তোলার জোয়ার, সেই সময়ে শক্তিমান এই শিল্পী তাঁর স্মরণীয় অভিনয় ক্ষমতায়, সার্থক নির্দেশনায়, অতীতের হারিয়ে যাওয়া পালাকার কানাই নাথের পালায় দক্ষ সম্পাদনার রস ঢেলে, একাই একশো হয়ে, একের পর এক পালাকে সুপারহিট করিয়ে প্রমাণ করেছেন, চমকে একটা শিল্প দীর্ঘস্থায়ী হয় না। 'নাট্যভারতীর' 'মা ও ছেলে' পালার মানবেন্দ্র, সত্যম্বরের 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' পালার জেঃ ডায়ার চরিত্রে তপনকুমারের অভিনয় মানুষ ভুলবে না কোনদিন। যাত্রার প্রবীণ এবং মূল্যবান কর্মী, সংগঠক হরিপদ বায়েনের কাছে কৃতজ্ঞ তপনকুমার। উত্তমকুমার প্রতিষ্ঠিত "শিল্পীসংসদের" সহ-সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করে যাত্রার গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। কর্মে, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত এই সদাহাস্যময়, নিরহঙ্কারী নায়ক বর্তমানে সমস্ত ব্যবসার যোগ্য উত্তরাধিকার দিয়েছেন একমাত্র ছেলে শংকরকে। কন্যাকে সুপাত্রে তুলে দিয়েছেন। পুত্রবধূ বরণ করে ঘরে তুলেছেন। আরও একটি দলের জন্ম দিয়েছেন ১৯৯৬ সালে। অফুরন্ত কর্মের মধ্যে 'দাদু' ডাক শুনে এখন তৃপ্ত মহানায়ক তপনকুমার।

* বছরে বছরে দলের জন্ম আর মৃত্যুর হার যাত্রা জগতে একটা মারাত্মক ব্যাধির মত। সুতরাং এর তালিকাবৃদ্ধি করে ইতিহাসে অমর করে রাখার ভাবনা স্থগিত রইল। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা দরকার, এরই মধ্যে এমন কিছু দলের নামে যাত্রা ব্যবসা কেউ কেউ করেছেন, যে নামগুলি খুবই বিখ্যাত। কিন্তু সেই দলের সঙ্গে আসল মালিক পক্ষের ব্যবসায়িক সম্পর্ক নেই। সান্ত্বনা এই, স্মরণীয় নামগুলি জনমানসে সজীব। যথা "সত্যম্বর অপেরা", "মাধবী নাট্য কোং", "রয়েল বীণাপাণি অপেরা" ইত্যাদি।

॥ গীতাঞ্জলি অপেরা / জ্যোৎস্না দত্ত এবং গুরুদাস ধাড়া ॥

সেদিন সত্যিই সম্রাজ্ঞীর মত দেখাচ্ছিল তাঁকে, যাঁকে সবাই বলেন যাত্রা জগতের 'যাত্রা সম্রাজ্ঞী'। তিনি শ্রীমতী জ্যোৎস্না দত্ত। তাঁর মাথায় ছিল বেশ কয়েক ভরির রূপোর মুকুট। পরনে ছিল বেনারসি। দু'হাতে ছিল সোনার কাঁকন। কপালে ছিল চন্দন বিন্দু। বুকের ওপর লুটিয়ে ছিল রাশি রাশি গোলাপ দিয়ে গাঁথা মালা। অপরূপ গালিচার ওপরে বসেছিলেন জ্যোৎস্না দত্ত। অনেক অনেক ফুলের মধ্যে প্রায় চার দশকের এই আশ্চর্য ক্ষমতাময়ী শিল্পী জ্যোৎস্না দেবীকে মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, অষ্টাদশী কন্যা যেন বিয়ের রাতে ফুলের বাসরে। আবার পরক্ষণেই মনে হচ্ছিল, যেন কোন রাজকন্যার অভিষেক উৎসব।

অভিষেক নয়, সেদিন শিল্পীতীর্থ যাত্রা প্রতিষ্ঠানের শিল্পী-কর্মীদের আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে, শোভাবাজারের রিহার্সাল রুমে ঠিক এমনি সাজান বাসরে, জ্যোৎস্না দত্তের ছিল এই রূপ।

অভিনেত্রী জীবনে এই ধরনের অজস্র পুরস্কার, সংবর্ধনা, মানপত্র পেয়েছেন যাত্রা সম্রাজ্ঞী। এক সাক্ষাৎকারে শ্রীমতী দত্ত বলেছিলেন,—

"আমি জানি, যাত্রায় এক সময়ে পুরুষ শিল্পীরা মেয়েদের চরিত্রে অভিনয় করতেন। বহু শিল্পী

এক সময়ে আসল নামটি হারিয়ে ফেলেছিলেন স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয় করে। এক সময়ে সেই ধারার পরিবর্তন আনতে চাইলেন সেদিনের যাত্রার কিছু কিছু মালিক। আমি সেই ধারার একেবারে গোড়ার দিককার সাক্ষ্য বহন করছি, কারণ আমাকে আর ঝর্ণাকে দিয়েই সেই ধারার প্রবর্তন হয়েছিল—আমি প্রথম টেপ ফ্রক পরে যাত্রা করতে আসি।"

প্রশ্ন করি ঃ যতদূর জানি আপনি যাত্রা জগতে প্রথম মহিলা শিল্পী, এটা কি সত্য?

জ্যোৎস্না দেবী ঃ "আমারও তাই জানা আছে। আমি যখন যাত্রায় আসি তখন স্ত্রী চরিত্রে পুরুষেরা অভিনয় করতেন। কোন দলে মেয়েরা কাজ করতেন না বলেই জানি, সেদিক থেকে তাই ধরতে পারেন। আমার পরেই এসেছিল ঝর্ণা। ঝর্ণা দাস। পূর্ববঙ্গের দল ভোলানাথ অপেরার মালিকের মেয়ে। সত্যি কথা বলতে কি, এখন আমরা মেয়েরা অভিনয় করি, গান গাই ঠিকই, কিন্তু তখন স্ত্রী চরিত্রে যে পুরুষেরা অভিনয় করতেন, গান গাইতেন তার কাছে আমরা অনেক ম্লান।"

বরিশাল জেলার ভোলা শহরের আইনজীবী সুরেন্দ্রচন্দ্র দত্তের কনিষ্ঠা কন্যা এই জ্যোৎস্না দত্তের জন্ম ভোলা শহরে ১৯৪৮ সালে। ওঁরা তিন ভাই-তিন বোন। জ্যোৎস্না দত্তের যখন বছর পাঁচ-ছ'য় বয়স তখন ওঁরা চলে আসেন কলকাতায়। আশ্রয় পান নিঃসন্তান যোগেশ নট্টের বাসায়।

যোগেশবাবু যেমন গাইতেন, তেমনি ঢোল বাজাতেন অসাধারণ।

কলকাতায় এসে নিদারুণ দৈন্যের মধ্যে পড়তে হয় ওঁদের। অগত্যা যোগেশ নট্ট ছয় বড় জোর সাড়ে ছয় বছরের শিশুকন্যা জ্যোৎস্নাকে নিয়ে যেতেন থিয়েটার-যাত্রায়।

'যে বয়সে মেয়েরা পুতুল খেলা করে সেই বয়স থেকে আমার জীবন নিয়ে খেলা শুরু হয়ে গেল—' কথাটা বলতে শ্রীমতী দত্তের কণ্ঠস্বর কাঁপেনি।

যখন যাদবপুরে বিজয়গড় কলোনির ক'জন মিলে গড়ে তুলেছিলেন একটা যাত্রাদল তখন যোগেশ নট্টের পরিচিত প্রফুল্ল দাস ছিলেন সেখানে। ওঁরা তৈরি করেছিলেন মুক্তকেশী অপেরা। জ্যোৎস্নাকে ওঁরা নিলেন সেই দলে। তখন বয়স খুব বেশি হলে সাত। এখানে 'চাষার ছেলে' পালায় সন্ধ্যার চরিত্রে অভিনয় করেন জ্যোৎস্না। যেদিন অভিনয় থাকত সেদিন পেতেন পাঁচ' ছয় টাকা। ঠিকে দল। তারপর চলে আসেন বিপিনবিহারী জ্যোতিষ শাস্ত্রীর ঠিকে দল চণ্ডী অপেরায়। এখানে ৩ বছর কাটিয়ে পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ভোলানাথ অপেরা। "এমনি করে ভাসতে ভাসতে কখন যে আমার বয়স বেড়েছিল আমি জানি না। ইতিমধ্যে তখনকার বিখ্যাত সুরকার মহেন্দ্র দত্তের স্নেহ পেয়েছি। তাঁর কাছ থেকে গানে তালিম নিতাম। সেই মাষ্টার মশাইয়ের একান্ত চেষ্টায় এক সময়ে কাজ পেলাম সত্যম্বর অপেরায়। তখন সে দলের মালিক গৌরদাস।"

প্রশ্ন করি ঃ এই সময়ে যাত্রার পরিবেশ কেমন ছিল, আপনার চারদিকের মানুষেরা?

উত্তর ঃ "আপনি ভাল তো জগৎ ভাল, তেমনি ছিল। অত্যন্ত ভাল মানুষ যেমন ছিলেন তেমনি খারাপ মানুষেরও অভাব ছিল না। ওই সময়ে কারা দাপটের সঙ্গে বিরাজ করতেন জানেন? বিরাজ করতেন—বড় ফণিবাবু, ছোট ফণিবাবু, ভোলানাথ ভট্টাচার্য, সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জী, প্রফুল্ল সেন, পূর্ণেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, নিতাই গাঙ্গুলী (নিতাইরানী), মুকুল বোস (মুকুলরানী), ছবিবাবু (ছবিরানী) গোপাল মিত্র (গোপালরানী), অমিয় বসু, বিমল লাহিড়ী, সুনীল মুখার্জী, মাখন সমাদ্দার, মহেন্দ্র দত্ত, পঞ্চু সেন, রাজ্যেশ্বর নন্দী আরও অনেকে।"

প্রশ্ন ঃ আপনি নাচ শিখেছিলেন কার কাছে—?

উত্তর ঃ "প্রকৃতপক্ষে আমার সর্ব বিষয়ের গুরু হলেন প্রখ্যাত হীরালাল ব্যানার্জী। তাঁর মত নৃত্য শিক্ষক এবং মানুষ আমি এযাবৎকাল বেশি দেখিনি—"

প্রশ্ন ঃ আপনার পরিচিতি আসে কোন পালায় এবং খ্যাতি পান কোন পালায়?

উত্তর ঃ 'ছিন্নশির' পালায় কাঁকনবাই চরিত্রে অভিনয় করে আমি পরিচিতি পাই যথেষ্ট, খ্যাতি

পাই ‘সোনাইদীঘি’ পালায় ‘সোনাই’ চরিত্রে অভিনয় করে। কত শত রজনী যে এই চরিত্রে অভিনয় করেছি তার সঠিক হিসেব দিতে পারব না। যাত্রায় ‘সোনাইদীঘি’ আর ‘বাঙালী’ পালার জনপ্রিয়তার রেকর্ড আজ পর্যন্ত অন্য কোন পালা ভেঙে দিতে পারেনি।”

জ্যোৎস্না দত্ত বলেন, ‘সোনাই দীঘি’র Long Playing Record হবার সময় আমাকে বাদ দেবার কথা ওঠে, তখন H. M. V.-তে ছিলেন পবিত্র মিত্র। ব্রজেনবাবু বলেছিলেন, আমার ‘সোনাইদীঘি’তে যদি জ্যোৎস্না না থাকে তা হলে সেই সোনাইদীঘিতেই থাক।

প্রশ্ন ঃ আপনি নাট্য নির্দেশনার ক্ষেত্রেও প্রথম মহিলা নির্দেশিকা, কিন্তু কেন এই দায়িত্ব নিয়েছেন?

উত্তর ঃ “নিজেকে আরো জানবার জন্যে—, তাছাড়া রিস্‌ক তো নিয়েছি সেই শিশু বয়স থেকে। নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করার জন্য সাদামাটা কোন নাটক আমি নিইনি, নিয়েছি ‘বৈজুবাওরা’, সেখানেও কি বিরাট রিস্‌ক বলুন—সাকসেস্‌ফুল হয়েছি কিনা তা দর্শকরাই বলবেন—”

প্রশ্ন ঃ আপনি বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন, সবচেয়ে বড় পুরস্কার কি পেলেন?

উত্তর ঃ “প্রথমতঃ দর্শকদের ভালবাসা কুড়িয়ে এতদূর এসেছি এটাই বড় পুরস্কার। আর দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছিলাম একুশ-বাইশ বছরে একবার। তখন আমাদের রাষ্ট্রপতি শ্রদ্ধেয় নীলম সঞ্জীব রেড্ডী ছিলেন আসামের শিক্ষামন্ত্রী। আমরা তখন করিমগঞ্জে শো করতে গেছি। সেখানে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে একাধিক সিন নিয়ে পর পর অভিনয়ে আমি নানা সুরের এবং ঢং-এর গান গেয়েছিলাম, নেচেছিলাম। শ্রদ্ধেয় শিক্ষামন্ত্রী সেই অনুষ্ঠানে এসেছিলেন পাঁচ মিনিটের জন্য—কিন্তু থেকেছিলেন এক ঘণ্টা। উনি আমাকে সেদিন প্রকাশ্যে যে প্রশংসা আর আশীর্বাদ দিয়েছিলেন তা ভোলার নয়। সেটাই আমার প্রথম সরকারি পুরস্কার।”

‘ছিন্নশির’ পালার কাঁকনবাই, ‘সোনাইদীঘি’র সোনাই, ‘মহুয়া’র মহুয়া চরিত্রে জ্যোৎস্না দত্ত যে কী অসামান্য অভিনয় করেছিলেন তা বর্ণনাতীত। তেমনি ‘আনারকলি’, ‘জীবন্ত পাপ’, ‘মাইকেল মধুসূদন’, ‘বিনয়-বাদল-দীনেশ’, ‘বৌঠাকুরাণীর হাট’, ‘মুঘল মসনদ’, ‘বৈজুবাওরা’ ইত্যাদি পালায় তাঁর অভিনয়ের বিকল্প আজও মেলেনি। সেই জ্যোৎস্না দত্তকেও ‘শিল্পীতীর্থ’ থেকে এক রাশ অসম্মানের শিকার হতে হয়ে ছিল। অবশেষে নিজেই গড়েছিলেন ‘গীতাঞ্জলি অপেরা’। জীবনের দীর্ঘ সময়ের সাথী, গৃহবন্ধু প্রখ্যাত গায়ক অভিনেতা গুরুদাস ধাড়াকে সঙ্গে নিয়ে গড়ে তোলা এই প্রতিষ্ঠান সূচনাতেই বাজিমাৎ করেছিল।

থিয়েটারে যেমন ‘সরযূবালা দেবী’কে প্রায় সবাই ‘মা’ বলে ডাকতেন, যাত্রা জগতে তেমনি কেউ কেউ জ্যোৎস্নাকেও ‘মা’ বলে সম্বোধন করেন। বেতারে, দূরদর্শনে শ্রীমতী দত্তের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। শিল্পীদের সংগঠন ‘যাত্রা প্রহরী’র সভানেত্রী হয়েছেন তিনি। কিন্তু যথার্থ মূল্যায়ন হয়নি আজও তাঁর। যাত্রা জগতের বাইরে যে বৃহত্তম বুদ্ধিজীবী মহল, বঙ্গ সংস্কৃতির ধারক ও বাহকদের পৃথিবী, বামপন্থী রাজ্যের যে সরকার অথবা সরকারের যে মহৎ সাংস্কৃতিক দপ্তর অথবা নাট্য অকাদেমী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান সেখানে, এমন কি সংবাদপত্রেও এই অভিনেত্রীর বিশেষ কোন স্বীকৃতি নেই। কানন দেবীর পড়তি সময়ে যদি কোন চলচ্চিত্রকার ভাবতেন কানন দেবীকে কোন ছবিতে নেবেন, আমি হলফ করে বলতে পারি, সেই চলচ্চিত্রকার কানন দেবীর বিন্দুমাত্র গ্লামার না থাকা সত্ত্বেও, তাঁকে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর মর্যাদাই দিতেন প্রচারে, ব্যবহারে। জ্যোৎস্না দত্ত এখনও অভিনয় করেন। নানা বেহিসেবি কারণে গীতাঞ্জলি বন্ধ হয়ে গেল। দীর্ঘ জীবনের সাথী গুরুদাস ধাড়া গুরুতর অসুস্থ হলে শ্রীমতী দত্ত তাঁর উদয়-অস্ত সেবা দিয়ে, শ্রম দিয়ে প্রভূত অর্থ দিয়ে বাঁচাবার চেষ্টা করেও পারলেন না বাঁচাতে। মারা গেলেন গুরুদাস। ঋণগ্রস্ত যাত্রা সম্রাজ্ঞী কিন্তু

অবসর নিতে পারলেন না। বাঁচার তাগিদে তিনি যাত্রা করছেন ঠিকই, কিন্তু প্রচারে এবং অন্যান্য ব্যবহারিক দিক থেকে যথার্থ মর্যাদা তাঁকে দেওয়াও হয় না। তবে অভিনেতা মনোজ মিত্র (যাত্রার) গীতাঞ্জলি অপেরার ঘরটি অর্থের বিনিময়ে শ্রীমতী দত্তের কাছ থেকে নিয়ে যাত্রা ব্যবসা করেছেন বটে কিন্তু জ্যোৎস্না দত্তের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাতে ভোলেননি। আজও গদি ঘর থেকে গীতাঞ্জলির সাইন বোর্ড নামিয়ে ফেলেননি। গুরুদাস-জ্যোৎস্না জুটির বিরাট ছবি এই মুহূর্ত পর্যন্ত সযত্নে রক্ষিত আছে গদিতে। তরুণ প্রযোজক প্রদীপ দাস এই মহান শিল্পীর প্রতি যথার্থ মর্যাদা দান করে, ১৯৯৬ সনে নিয়েছেন তাঁর "লক্ষ্মীনারায়ণ অপেরায়"। প্রদীপ হলেন সুখ্যাত যাত্রা প্রযোজক কালীপদ দাসের পুত্র।

॥ সত্তর ও আশি দশকের আরও দল ॥

এই দশকে আমরা এমন আরও দল পাই যেগুলির জন্ম হয়েছিল ২। ৪ বছর আগেই, কিন্তু বাঁচেনি বেশি দিন। অকাল মৃত্যু হয়েছে এমন দলের তালিকা এই রকম ঃ "বাসন্তী অপেরা", "শ্রীরাধা অপেরা", "শ্রীরঙ্গ নাট্য কোম্পানি", "ভার্গব অপেরা", "সুশীল অপেরা" আরও অনেক। এই তালিকার সঙ্গে আরও এমন কিছু দলের কথা যুক্ত করা হলো, যেগুলি হয় বন্ধ হয়েছে, না হয় হাত পাল্টে, আজও বেঁচে আছে অথবা না বাঁচার মত করেই ব্যানারটি জেগে আছে। এর মধ্যে কিছু দলের কথা একটু বিস্তারিত বলা দরকার, যেগুলি নানা দিক থেকে কিছু না কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনার সাক্ষী। যেমন ঃ

॥ শ্রীমা অপেরা ॥

নটসূর্য দিলীপ চট্টোপাধ্যায় গড়েছিলেন এই দল। যাত্রা দলে যা যা রাখলে ব্যবসায়িক সাফল্য আসা সহজ তার সব কিছুই রেখেছিলেন দিলীপবাবু। আজকের নায়ক সন্দীপের নামেই ছিল এই দল। প্রযোজক হিসেবে ছিলেন দিলীপবাবুর শ্বশুরমশাই শ্রীযোগেশ মুখোপাধ্যায়। এই সময়ে আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় দু'জনেই জনপ্রিয় পালাকার। তাঁদের পালা ছিল। প্রখ্যাত লোকসংগীত শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরীকে এনেছিলেন সুরকার হিসেবে। ব্যবসায় সাফল্য এসেছিল। কিন্তু অল্প কয়েক বছরের মধ্যে দিলীপবাবু এই দল বন্ধ করেন, তৈরি করেন তিনি গণনাট্য। এর কারণ, কনকলতা এবং তার স্বামী নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায় তখন তৈরি করেন শ্রীমা নাট্য কোম্পানি। দিলীপবাবু তাই দলের নামই পাল্টে দিলেন।

॥ মাধবী নাট্য কোম্পানি ॥

সুশীল দাস নামে একটি যুবক চিৎপুরে এসেছিলেন যাত্রা ব্যবসা করতে, পাশাপাশি পালা প্রযোজনার মাধ্যমে একটা মহৎ কাজও করতে চেয়েছিলেন। যাত্রা পাড়ায় তখন তিনকড়ি গুছাইত 'বড়দা' হিসেবে বিরাট প্রতাপশালী, অন্যদিকে প্রদীপ দেবনাথ তখন যাত্রা দলের মালিক হিসেব মুঠো মুঠো টাকা পকেটে পুরে চলেছেন। সুতরাং সুশীল দাস বিশ্বাস করে তাঁদের হাত ধরেছিলেন। তখন তিনকড়িবাবুর হাতটা ধরে সুশীলবাবু যদিও বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলেন কিন্তু প্রদীপ দেবনাথের হাতটা ছিল নড়বড়ে তা সুশীলবাবু বুঝেছিলেন কিছুদিনের মধ্যে। সুজিত পাঠকের মত প্রতাপশালী অভিনেতা-নির্দেশক এসেছিলেন এই দলে। সুশীলবাবু মোট ৪টি পালা প্রযোজনার ঝুঁকি নিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম পালা ছিল কবিগুরুর "কাবুলিওয়ালা"। বিশ্বভারতী থেকে নাকি অনুমতিও আনা হয়েছিল। পালার জন্য অনিল বাগচীর সুযোগ্য পুত্র অলক বাগচী অনেকগুলি রবীন্দ্রসংগীত তৈরি করেছিলেন। কিন্তু মাত্র কয়েকটি শো-এর পর দলই বন্ধ হল। সর্বস্বান্ত হয়ে ফিরে যান তিনি।

॥ জননাট্য অপেরা ॥

রবীন হাজরা এবং মালতী হাজরার অনেক স্বপ্নে গড়া দল। দলটি বেশি দিন চলতে পারেনি।

॥ প্রকাশচন্দ্র ঘোষ / রাজেন মণ্ডল ॥

অম্বিকা নাট্য কোম্পানির প্রাণপুরুষ অমিয় বসুর মৃত্যুর পর এই দলটি নিয়েছিলেন গোষ্ঠ ঘোষের জামাই প্রকাশ ঘোষ, রাজেন মণ্ডলকে সঙ্গে নিয়ে। দলটি বেশি দিন চালানো তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তেমনি বেশি দিন চলেনি অম্বিকা নাট্য কোম্পানির সঙ্গে এক টানা অনেক বছর জড়িয়ে থাকা, যাত্রাকর্মী হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করা অনিল দাসের গড়া দলটি। তেমনি অল্প সময়ের মধ্যে বন্ধ হয় ওঁ স্বপন অপেরা।

বিশ্বরূপ অপেরা ছিল রমেন পালিতের দল। রমেন পালিত ছিলেন একজন দক্ষ যাত্রা কর্মী। নিউ প্রভাস অপেরা সহ একাধিক প্রতিষ্ঠানের জেনারেল ম্যানেজার পদে কাজ শিখে এক সময়ে বড় রকম ঝুঁকি নিয়ে নিজেই তৈরি করেছিলেন এই যাত্রা দল। অনেকের পূর্ণ সহযোগিতা যেমন পেয়েছিলেন, তেমনি পেয়েছিলেন নটসম্রাট স্বপনকুমারের সহযোগিতা। এই ভাবেই দলটি চলতে চলতে একটা ইতিহাসের জন্ম দিয়েছিলেন রমেন পালিত। নায়েক পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে নটসম্রাটকে উড়োজাহাজে চাপিয়ে যাত্রা করিয়ে এনেছিলেন। এর জন্য আলাদা হেলিপ্যাডও তৈরি হয়েছিল। এরপর রমেন পালিত অনুপকুমারকেও যাত্রায় প্রথম আনিয়েছিলেন। আশাতীত খরচের জন্য ব্যবসায় ক্ষতি হলেও, রমেন ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে আজও যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন।

॥ সাহানা যাত্রা ইউনিট ॥

যাত্রা জগতে একদা যে অভিনেতারা শ্রদ্ধেয় ছিলেন তাঁর মধ্যে শক্তি ভট্টাচার্য একজন। শক্তিবাবুর মত উচ্চারণ, কণ্ঠস্বর প্রক্ষেপণে পরিমিতি বোধ, তাঁর মত অভিব্যক্তি অনেক অভিনেতার ছিল না, তেমনি শ্রীভট্টাচার্যের শিল্পীজায়া সাহানা বোসকে একদা বলা হতো 'কোকিল কণ্ঠী'। সাহানা অভিনয়ে যেমন অসামান্যা, তেমনি ছিলেন কণ্ঠসংগীতে অনন্যা। যাত্রার এই জুটি যখন খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছুলেন, তখন স্বপ্ন দেখলেন, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে গড়ে তুলবেন একটি যাত্রা দল। তাই করেছিলেন। আসরস্থ করেছিলেন, সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত, বিশ্বজিৎ পুরকায়স্থর সমুদ্র মন্থন ইত্যাদি। শক্তি ভট্টাচার্য, সাহানা বসু ছাড়া দিলীপ ব্যানার্জী, পবিত্র ঘোষ, সুব্রত ব্যানার্জী, ব্রজগোপাল দে, নিতাই দে, নন্দিতা দে, মিতালী ব্যানার্জী, কল্যাণী রায়, প্রমুখ শিল্পীরা ছিলেন দলে। দলটি বাঁচেনি বেশিদিন। নিজেদের অবিমৃশ্যকারিতা, কর্মীদের বিশ্বাসঘাতকতা শক্তি-সাহানাকে প্রায় নিঃস্ব-রিক্ত করেছিল।

॥ স্বনামখ্যাত সাংবাদিক রবি বসুর যাত্রা দল ॥

সাহিত্য-সংস্কৃতি মূলক পত্র-পত্রিকা জগতে একদা যে রবি বসুর নামটি বহুল প্রচারিত ছিল, যে উল্টোরথের একচ্ছত্র দাপট ছিল বাজারে, সেই উল্টোরথের কর্ণধার স্বনামধন্য প্রসাদ সিংহ এবং গিরীন্দ্র সিংহের দক্ষিণ হস্ত বলতে যে রবি বসু সাহিত্য ও শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ছিলেন সকলেরই প্রিয়, তারও অনেক আগে যে রবি বসু ছিলেন সুধাংশু বক্সীর 'রূপাঞ্জলি' পত্রিকার অন্যতম বন্ধু-কর্মী ; পরবর্তী সময়ে যে রবি বসু 'সাতরঙ' ইত্যাদি মাসিক পত্রিকার সম্পাদনায় বাজারে রীতিমত হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিলেন, প্রসাদ সিংহের মৃত্যুর পর গিরীন্দ্র সিংহ যখন রবি বসুর হাত ধরে মাসিক 'প্রসাদ' পত্রিকার জন্ম দিয়েছিলেন, (মাসিক-সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকা সম্পাদনায় রবি বসুর হস্তক্ষেপ মানেই পত্রিকার খ্যাতি নিশ্চিত এমন একটা ধারণা সকলের ছিল), যে রবি বসুর পত্র-পত্রিকা সংক্রান্তজ্ঞান—সাহিত্য চেতনা—মুদ্রণ বিষয়ক অভিজ্ঞতা, ভাবে ও ভাবনার গভীরতা ছিল তুলনা হীন, যে রবি বসু অল্প লিখলেও যতটুকু লিখতেন চমৎকার লিখতেন, বিষয় নির্বাচনে বৈচিত্র্য আনতেন, যে রবি বসু আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম অভিজাত 'দেশ' সাপ্তাহিকের কর্মী হিসেবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিজের কর্মদক্ষতার পরিচয় রেখেছিলেন, (ভাল বেতন পেতেন, সম্মান পেতেন), সেই রবি বসু জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত এখানেও সেই বেতন-

খ্যাতিকে সরিয়ে রেখে একদিন চিৎপুরে খুলে বসলেন একটা যাত্রা দল। একজন অবসরপ্রাপ্ত কমাণ্ডার ভদ্রলোকের আর্থিক সহায়তায় রবি বসু যাত্রার গদি ঘর তৈরি করার সময় থেকেই রীতিমত হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিলেন। সিনেমা-থিয়েটারের কিছু অভিনেতা, আর চিৎপুরের টপ হিরো অশোককুমার, আরও অনেক শিল্পীদের নিয়ে দল গঠন করেছিলেন রবি বসু। সুযোগ্য পুত্র অশোক বসুর উপর (বর্তমানে যে অশোক "বর্তমান" পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত, অনেকদিন যাত্রা সাংবাদিকতা করেছেন কলেজ ষ্ট্রীট পত্রিকায়, যে অশোক সকলেরই অতি প্রিয় হতে পেরেছেন আপন দক্ষতায়) দলের-অফিসের দায়িত্ব অর্পণ করে যথা সময়ে, মরশুমের সূচনায় বাস ভর্ত্তি শিল্পী-কর্মীদের নিয়ে শুভ যাত্রাও করেছিলেন আসরের উদ্দেশে। সেই রবি বসু কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেননি। একটা মরশুম সম্পূর্ণ করতে পারেননি। এক বিপর্যয়ের মধ্যে দলের অস্তিত্ব যখন বিপন্ন, শিল্পী কর্মীরা যখন বিপন্ন তখন রবি বসু যাত্রাপাড়ায় বিতর্কিত হয়ে পড়েন। দল নিশ্চিহ্ন হয়। চিৎপুর বলে, এই দলের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার ইতিহাস দলের মালিক পক্ষই রচনা করেছিলেন।

এই দশকে যাত্রার আসরে সার্কাসের মত জীব-জন্তু প্রদর্শনের বড় মাপের পথ প্রদর্শক মূলত "**কলিকাতা যাত্রা সমাজ**"। যাত্রার আসরে কিছু কিছু পৌরাণিক চরিত্রের সঠিক উপস্থাপনার জন্য 'সাপ' ইত্যাদি অতীতে ব্যবহার করা হতো। এই দশকে তা আরও প্রকট হয়ে উঠতে থাকল, উপরোক্ত অপেরা দলের "মরুতীর্থ হিংলাজ" পালা থেকে। এই পালায় আসরে হাজির করা হলো বিশালকায় 'উট'। এই প্রতিষ্ঠানের মূলত জনক ছিলেন পালাকার-অভিনেতা বীর সেন। শ্রীসেন দলের নামকরণে যেমন শৈল্পিক ভাবনার প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন, তেমনি পালার বিষয় নির্বাচনে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছিলেন। আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকায় যখন দল চালাতে অক্ষম হন তখন এগিয়ে আসেন রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্রের প্রবীণ অভিনেতা মিহির ভট্টাচার্যের পুত্র পাহাড়ী ভট্টাচার্য। শিক্ষিত-মার্জিত-অত্যন্ত ধারালো চকচকে যুবক, 'নান্দীকার'-এর প্রাণপুরুষ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে গড়া, 'নান্দীকার'-এর অভিনেতা পাহাড়ী প্রভূত অর্থ নিয়ে হয়েছিলেন "কলিকাতা যাত্রা সমাজ"-এর কর্ণধার। যে জগতকে পাহাড়ী একদম জানতেন না, সে যাত্রা-অরণ্যের গভীরে কত বিষাক্ত কীট আছে তার পরিমাপ না করেই পাহাড়ী উপদেষ্টা হিসেবে এমন একজনের হাত প্রথমেই ধরলেন যে হাতটিতে লাগানো ছিল স্বার্থপরতার তেল। ধরলেই ধরা যাবে না। হলো তাই। পাহাড়ী একেবারে সূচনাতেই সেখান থেকে খসে পড়লেন। হারলেন না। জেদ তাঁকে পেয়ে বসল। গ্রুপ থিয়েটারের অন্যতম নাট্য ব্যক্তিত্ব শ্যামল ঘোষকে পাহাড়ী নিয়ে এলেন যথার্থ পালারূপকার ও নির্দেশক হিসেবে। নিয়ে এলেন চমক হিসেবে সিনেমা-সুন্দরী লোলিতা চ্যাটার্জীকে। দলকে রাতারাতি চমকে বিখ্যাত করে মুনাফার লোভে আমদানি করলেন উট। বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে দিলেন মুঠো মুঠো! কেঁপে উঠল যাত্রা জগৎ! ব্যবসায় নিশ্চিত সাফল্য মনে করে ছুটে এলেন নায়েক দল। সবার মুখে ধনাঢ্য প্রযোজক হিসেবে পাহাড়ীর নাম! অতি দ্রুত তিনি হলেন বহু বিতর্কের শিকার। স্বল্প সময়ের মধ্যে সেই চক-চকে পাহাড়ী ভট্টাচার্য তলায় তলায় যাত্রার নিকৃষ্ট কিছু ছাঁচে ঢেলে দিয়ে নিজেকে রূপান্তরিত করলেন তথাকথিত যাত্রাওয়ালায়! একটু একটু করে ক্ষয় হতে থাকল এই মার্জিত যুবকের যা কিছু ঐশ্বর্য। অচিরেই তিনি হারালেন সব কিছু। দল বন্ধ হলো। অসময়ে হারিয়ে গেলেন পাহাড়ী। আসলে জীবনকে নিয়ে জুয়া খেলে গেলেন তিনি।

যাত্রাকে ভালবেসে নয়, যাত্রার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে নয়, যাত্রা থেকে আশাতীত অর্থ, যশ, প্রাচুর্য দু'হাত ভরে তুলে নেবার সুযোগ পেয়ে, জীবনে অর্থই সব এই ভাবনা থেকে একদা সাহিত্য-চলচ্চিত্র-নাট্য তথা বঙ্গসংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপরিচিত মানুষ নিমাই সুর পালা উপস্থাপনা, বিষয় নির্বাচন এবং পালার নামকরণ থেকে শুরু করে প্রচার কর্মে যথার্থ শৈল্পিক চেতনার দৃষ্টান্ত রেখে চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন "গন্ধর্ব" অপেরা। কিন্তু দলের অস্তিত্ব চিরস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী হলো

না। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল 'গন্ধর্ব' অপেরা। গন্ধর্বের প্রাণ প্রতিমা ছন্দা চ্যাটার্জী আবার শুরু করলেন বিভিন্ন দলে অভিনয়। ছন্দা দেবীর স্বামী নিমাই সুর বেছে নিলেন যাত্রা সাংবাদিক জীবন।

সর্বজন শ্রদ্ধেয় উৎপল দত্তের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিমায় যাত্রা প্রযোজক নীরু নাগের একটা ছবি শোভা পেত "নাগ কোম্পানি" আর "গণবাণী"-র গদিতে! ছবিটা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করত। দল বায়না করতে আসা নায়েকদের ছবিটা দেখিয়ে দু'টি দলের ম্যানেজাররা বলতেন—আমাদের নীরুবাবুর সঙ্গে উনি উৎপল দত্ত। এখন সেই দল দু'টির নাম যাত্রা পাড়ায় থাকলেও, প্রত্যক্ষভাবে দাপটিয়া প্রযোজক নীরু নাগ জড়িত নেই। ঠিক যখন চারদিকে একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ছিল, যাত্রা ব্যবসাটা হলো 'কামধেনু', কুইক রিটার্ন, তখনই ব্যবসায়ী নীরু নাগ যাত্রাপাড়ার কারও সঙ্গে পরামর্শ করে, ঢুকে পড়েছিলেন যাত্রাপাড়ায়! প্রথমে যাত্রায় অর্থবিনিয়োগকারী হিসেবে। পরে দুই দুটি দল গড়েছিলেন তিনি। ব্যবসায় চরম সাফল্যও এনেছিলেন। তথাকথিত পালা প্রযোজনায় বিশ্বাস করতেন না নীরুবাবু। তিনি জানতেন সত্যিকারের সৎ পালাই ব্যবসায় সাফল্য এনে দিতে পারে।

আর তাই নীরুবাবু উৎপল দত্তকে আশ্রয় করেছিলেন। শক্তিমান শিল্পীদের সঙ্গে নিয়েছিলেন। প্রভূত অর্থের বিনিময়ে উৎপলবাবু ছাড়া যাত্রার দিকপাল পালাকারদেরও বাদ দেননি। অল্পভাষী, রোগা ছিপছিপে, তারকেশ্বরে বাঁকে জল নিয়ে প্রতি বছর সন্ন্যাস নেওয়া নীরু নাগ সত্যিই যাত্রাজগতে সাফল্যের আলোড়ন তুলেছিলেন। তাঁর প্রযোজিত উৎপল দত্তের "সাদা পোশাক" পালা একটি প্রগতিধর্মী প্রযোজনার ইতিহাস! প্রভূত অর্থ উপার্জন করা নীরু নাগ এক সময়ে "ভাণ্ডারী অপেরা"-র দায়িত্বও নিয়েছিলেন। হঠাৎ একদিন সেই নীরুবাবু সরে গেলেন যাত্রা থেকে! ভাগ্যের লিখন তাঁকেও মেনে নিতে হয়েছিল!

নীরুবাবু যাত্রা থেকে মুনাফা পেয়েছেন যত, ঠিক সেই ভাবে যাত্রার ইতিহাসে অমর হয়ে থাকার মত কোন কাজেরই জন্ম দিয়ে যেতে পারেননি। যাত্রাকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করার মানসিকতাও তাঁর ছিল না।

এক সময়ে শুধু দল নয়, নিজেকেও নিশ্চিহ্ন করে দিলেন অর্থবান, বিলাসী ফটিক মাইতি। একদা এক কোল্ড স্টোরেজের মালিক, আরও অনেক ব্যবসার ব্যবসায়ী যাত্রা থেকে মুনাফা লুঠ করার জন্য চিৎপুরে এসে, অত্যন্ত প্রগতিশীল নাম রেখে "রাণার যাত্রা ইউনিট"কে গড়েছিলেন। অল্পকালের মধ্যে সেই প্রতিষ্ঠানকে হস্তান্তরিত করে আসল মালিক ফিরে গেলেন কোল্ড স্টোরেজে। মালিক হলেন ফটিক মাইতি। বেশ চলছিল রাণার। ক্রমশঃ লোভের মাত্রাও বাড়তে থাকল। এক সময়ে চলচ্চিত্রের স্বনামধন্যা নায়িকা, অত্যন্ত দামী অভিনেত্রী সুপ্রিয়া দেবীকে নিয়েও রাণার চালালেন। তারপর একদিন প্রভাতী সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় মালিক-প্রযোজক ফটিক মাইতির মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হলো। বড় মর্মান্তিক মৃত্যু। নিষিদ্ধপল্লীতে আত্মহত্যা! অর্থের অনটনে শ্রীমাইতির এই পরিণতি! স্বল্প সময়ের মধ্যে রাণার যাত্রা ইউনিট হলো নিশ্চিহ্ন!

॥ শিবাণী ও রাজা ভট্টাচার্য ॥

রূপে-গুণে, অভিনয়ে, নাচে ও গানে এই যুগল যাত্রায় এসেই আলাদা একটা আসন তৈরি করে নিয়েছিলেন। বছর কয়েকের মধ্যে এঁদের অর্থের চাহিদা বাড়ল। লীজ নিলেন পুরাতন সুশীল নাট্য কোম্পানি, নব অম্বিকা। খ্যাতি ও সাফল্য এসেছিল। গড়েছিলেন নাট্য কোম্পানি। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। রাজা আত্মহত্যা করলেন। শিবাণী এখন অভিনয় করছেন বিভিন্ন দলে।

॥ শিউকুমার কেডিয়া / পুষ্পাঞ্জলি অপেরা ॥

যাত্রা ব্যবসায় সরাসরি মাড়োয়াড়ীদের প্রবেশাধিকার ছিল না। শিউকুমার কেডিয়া সেই অধিকার অর্জন করেছিলেন। দুর্গাপ্রসাদ কেডিয়ার ছেলে, ৯নং খিলাৎ ঘোষ লেনের বাসিন্দা

শিউকুমারের বাংলাভাষার প্রতি আলাদা একটা আনুগত্য ছিল। তিনি বিভিন্ন দলে সুদে টাকা খাটাতে খাটাতে এক সময়ে হারানো টাকা তোলার তাগিদে গড়েন এই দল। দলের সাফল্যের জন্য চমকও এনেছিলেন, শেষ পর্যন্ত সব হারিয়ে শিউকুমার ফিরে যান।

॥ পার্থ সেনগুপ্ত / বর্ণ পরিচয় ॥

শহর ও শহরতলি তথা বহু জেলার সাংস্কৃতিক-শিক্ষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে পার্থ সেনগুপ্ত একটি বিশেষ নাম। একটি স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব বলা যেতে পারে। পার্থবাবুর মত সংগঠক দুর্লভ। একদা তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতায় গড়ে ওঠা "সাক্ষরতা প্রকাশনী" প্রকাশনা জগতে রীতিমত ঝড় তুলেছিল, আজও সেই প্রতিষ্ঠান আপন মহিমায় উজ্জ্বল। মাস্ কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে পার্থবাবু এমন ব্যক্তিত্ব, যিনি বহু স্মরণীয় ব্যক্তিদের সান্নিধ্য লাভের ভিতর দিয়ে, প্রশাসনিক বিভিন্ন স্তরের সহযোগিতায়, সম্মিলিতভাবে এক সময়ে "বর্ণ পরিচয়" নামে মাস কমিউনিকেশন বা সাক্ষরতা প্রকল্পের প্রসারের ক্ষেত্রে বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়েছিলেন। এক সময়ে প্রকল্পের সার্থক রূপদান, প্রসার বৃদ্ধি, প্রচার ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলিকে মজবুত করতে, অর্থ সংগ্রহের তাগিদে, যাত্রাপাড়ায় গড়ে তুলেছিলেন "বর্ণ পরিচয়" নামে একটি অপেরা পার্টি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১২৫ তম জন্মবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে দলের জন্ম হয়েছিল। উদ্দেশ্য আরও বৃহৎ ও মহৎ হয়তো ছিল, কিন্তু অভিজ্ঞতা, যাত্রা পাড়ার পোড়খাওয়া কিছু মানুষের স্বার্থপর অসহযোগিতায় বেশি দিন টিকে থাকতে পারেনি। প্রভূত অর্থ এবং আসবাবপত্র বিনষ্ট করে, যাত্রা ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহু জনের অভিশাপ কুড়িয়ে অবশেষে "বর্ণ পরিচয়" যাত্রা দল বন্ধ হয়। এঁরা চৈতন্য মহাপ্রভুর পাঁচশত জন্মজয়ন্তী এবং ইন্দিরা গান্ধীর জীবনবেদ অবলম্বনেও পালা আসরস্থ করেছিলেন। তেমনি প্রযোজনা করেছিলেন "চরকার গান"।

॥ শিবু পাল ॥

শিক্ষিত, মার্জিত, অভিজাত এবং মর্যাদা সম্পন্ন যাত্রা মালিক বিরল ; আর সেই কারণেই যাত্রা ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়া শিবু পাল অতি দ্রুত যাত্রা জগতে সকলেরই ঘনিষ্ঠ পাত্র হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। শ্রীমতী উমা দে এবং তাঁর স্বামী অমর দে'র প্রতিষ্ঠিত মঞ্জরী অপেরা। বহু হাত ঘুরে অবশেষে আসে শিবু পালের কাছে। শিক্ষিত-মার্জিত-স্বল্পভাষী শিবু পাল নতুন করে মঞ্জরী অপেরার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ব্যবসায় চরম সাফল্য না পেলেও যাত্রার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে শ্রীপাল হয়ে গিয়েছিলেন পুরোপুরি যাত্রা মানসিকতার লোক। বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মধ্যে নিজেকে রেখেও শিবু পাল যাত্রার টপ শিল্পীর ওপর সব দায়িত্বভার ছেড়ে দিয়ে, আর পাঁচজন প্রযোজকের মতই হয়েছিলেন পুরোপুরি যাত্রা মাইন্ডেড। কিছু নতুন শিল্পীকে নায়ক বা নায়িকার আসনে বসিয়ে যেমন ব্যবসায় ঝুঁকি নিয়েছিলেন তিনি, তেমনি আজকের এমন দু'একজন টপ শিল্পীর নাম করা যায় যাঁরা প্রকৃত পক্ষে শিবু পালের জন্যই খ্যাতিমান হয়েছেন। পরবর্তী সময়ে যাত্রার স্বাভাবিক চরিত্রের অবদানে শিবু পাল তাঁদের কৃতজ্ঞতা বোধের নজির কিন্তু পাননি। ব্যতিক্রম শুধু 'নটজাগরণী' প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার, শক্তিমান অভিনেতা-নির্দেশক প্রশান্তকুমার। যখন বিপন্ন প্রযোজক শিবু পাল, যখন বিশ্বাস করে প্রায় সর্বস্বান্ত শিবু পাল, তখন তাঁরই দল থেকে প্রখ্যাত হওয়া কোন নায়কই এগিয়ে আসেননি শ্রীপালের পাশে। সেদিন যিনি শিবু পালের মত প্রযোজককে বিপন্ন দশা থেকে ক্ষণিকের জন্য হলেও বাঁচাতে এগিয়ে এসেছিলেন তিনি প্রশান্তকুমার।

শিবু পাল পরে আরও একটি দল গড়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে অকৃতদার এই মানুষটি হারিয়ে যান। শিবু পালের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি কোন কাগজেই।

॥ সারদাময়ী অপেরা ॥

প্রতিষ্ঠানের মালিক ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ রাউৎ ও প্রফুল্লকুমার রাউৎ। বাগনানের সদ্ধ্যাইল গ্রামের অধিবাসী। অল্প বয়স থেকে বীরেন পোস্তায় গুপ্ত ব্রাদার্সে এবং পরে আরও অনেক মিষ্টান্নের দোকানে কাজ শিখে নিজেরাই মিষ্টির ব্যবসা চালু করেন। বর্তমানে একাধিক দোকান। দোকানগুলির নামের মত এঁরা যাত্রা ব্যবসায় এসে দলেরও নাম রাখেন সারদাময়ী অপেরা। মিষ্টির দোকানে চাকরি করার সময়ে বীরেন চিৎপুরে এসেছিলেন যাত্রার অভিনেতা হতে। বেশিদিন থাকেননি। বছর কয়েক পর আদি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা পেয়ে বিমল সাউ এবং নিখিল চক্রবর্তীর সহযোগিতায় চিৎপুরে যাত্রা দল তৈরি করেন। দলটি জমেও উঠেছিল। বীরেন রাউতের এবং তাঁর ভাই প্রফুল্ল রাউতের ব্যবহারে সকলে খুবই খুশিও ছিলেন। চিৎপুরের নানা অপ্রীতিকর পরিস্থিতিকে মেনে না নিতে পেরে এবং বীরেনবাবুর অসুস্থতার জন্য দল অচিরেই বন্ধ হয়।

॥ দিগ্বিজয়ী অপেরা ॥

এই দলের প্রতিষ্ঠাতা কার্তিক সামন্ত। শ্রীসামন্ত মেদিনীপুরের অধিবাসী। যাত্রা দল গড়ে তোলার আগে, গ্রাম বা অঞ্চলের নায়েক হিসেবে কলকাতার যাত্রাদল বায়না করে নিয়ে গিয়ে যাত্রা করাতেন। তারপর এক সময়ে যাত্রা দল তৈরি করেন। অল্প বয়স থেকে কার্তিক অত্যন্ত বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও তীক্ষ্ণ মস্তিষ্কের অধিকারী ছিলেন। তিনি এক সময়ে উড়িষ্যা যাত্রার ব্যাপারেও কিছুদিন যুক্ত থেকে উড়িষ্যা-যাত্রার বিস্ময়কর আলোর খেলা থেকে রস আহরণ করে, পরবর্তী সময়ে নিজের দলের পালায় সেই আলোর খেলা যুক্ত করেন সুপরিকল্পিতভাবে। এই আলোর জাদুর একটি চমৎকার নামকরণ তিনি করেন, সাইক্লোরামা। আশির দশকে যাত্রা জগতে এই 'সাইক্লোরামা' এমন জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, যা দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে যাত্রা জগতে অধিকাংশ দল মালিক এই সাইক্লোরামা আমদানি করে ব্যবসায় লাভ করতে থাকেন, কিন্তু সাইক্লোরামা প্রবর্তক হিসেবে কার্তিক সামন্ত অল্প কয়েক বছরের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। ইনি আরও একটি দল তৈরি করেছিলেন, কিন্তু সেই দল শ্রী সামন্ত বন্ধ করে দেন। এই সাইক্লোরামা পদ্ধতির জন্য মূল আসর এবং আসর সংলগ্ন একটি আলাদা মঞ্চের পাশে আরও একটি আসরের প্রয়োজন হয়। এই ভাবে পালা বা দলের আরও জাঁকজমকের জন্য আরও মঞ্চ পাশাপাশি তৈরি করা চলে। কার্তিক সামন্তর এই সাইক্লোরামা পদ্ধতির প্রয়োগে চরম সাফল্য অন্য প্রযোজকদের মনে একটা লোভের জন্ম দিল। সেই লোভ থেকে এলো প্রতিযোগিত। এই প্রতিযোগিতা থেকেই এলো একাধিক মঞ্চ তৈরির প্রবণতা। আলোর সেই জাদুর কেউ নাম রাখলেন সুপার সাইক্লোরামা, কেউ আরও চমক প্রমাণ করার জন্য ঘোষণা করলেন 'কম্‌পিউটারাইজড্ সাইক্লোরামা' ইত্যাদি! এতেও অনেকে থামলেন না, যুক্ত করলেন আরও চমক। আলোর জাদুর সঙ্গে কেউ যাত্রা পালায় আনলেন সার্কাসের পোষা সিংহ, বাঘ, বানর ইত্যাদি। কিন্তু এ কথা সত্য এই শতকের, এই দশকের এই আলোর জাদু প্রয়োগের সার্থক প্রয়োগকর্তা কার্তিক সামন্তর নাম যাত্রার ইতিহাসে বেঁচে থাকবে। ১৯৯৬ সালে আরও একটি দল তৈরি করেছেন।

॥ নিউ অলিম্পিক অপেরা ॥

দলটির কর্ণধার পীযূষ বিশ্বাস। বয়সে তরুণ। অতি অল্প বয়স থেকে শ্রী বিশ্বাস যাত্রা জগতের সঙ্গে জড়িত ছিলেন একজন যাত্রা কর্মী হিসেবে। অনেক বছর ধরেই শ্রীবিশ্বাস যাত্রা প্রযোজক শিবু পালের বীজ নেওয়া 'মঞ্জরী অপেরা'র পরিচালক হিসেবে কাজ করে এই কর্মে কতটা দক্ষ তার পরিচয় দেন। পীযূষবাবু মিষ্ট ও স্বল্প ভাষী। তাঁর প্রতিষ্ঠা বা যাত্রা দল তৈরির পিছনে অবশ্যই শিবু পালের পরোক্ষ অবদান আর শ্রীবিশ্বাসের নিজস্ব মিষ্টি ব্যবহার একমাত্র মূলধন ছিল। পীযূষ নিউ অলিম্পিক অপেরা তৈরি করার আগে এস. পি. অপেরা নামে একটি প্রতিষ্ঠানের

সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন প্রযোজক শিবু পালেরই অনুরোধে। সেখান থেকে কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করার পর যুগান্তর পত্রিকার বিজ্ঞাপন সংগ্রাহক ও যাত্রা সাংবাদিক বন্ধু সমর দাসের সহযোগিতায় তৈরি করেন এই প্রতিষ্ঠান। সাইক্লোরামা ও পাঁচটি মঞ্চে এক সঙ্গে অভিনয়ের সার্থক পরিকল্পনার জন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে দলের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লেও, অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকে কয়েক বছর পুরোপুরি সংগ্রামের ভিত্তিতে তিনি দলকে সজীব ও সতেজ রেখেছিলেন। প্রযোজক শ্রীবিশ্বাস পালার প্রয়োজনে, বিষয়ের বাস্তব উপস্থাপনার জন্যে সাইক্লোরামার প্রয়োগ বিশ্বাস করেন। আলোর জাদুর প্রাধান্য কিন্তু মূল নাটকের ভাবমূর্তিকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ করে না। পীযূষ অবশ্য শেষ পর্যন্ত দলটিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেননি।

॥ উর্বশী অপেরা ॥

দলটিকে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন তরুণ যাত্রা প্রযোজক এবং দক্ষ অভিনেতা প্রবীরকুমার। প্রবীর এক সময়ে প্রকাশনা ব্যবসাও করেছেন। ওয়ানওয়াল থিয়েটার হিসেবে উর্বশী অপেরাকে শুধু বাঁচাননি, এই ব্যানারে একাধিক ওয়ানওয়াল থিয়েটার প্রতিষ্ঠানের বায়না করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের একাধিক পালা বিষয়ে-উপস্থাপনায় জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও বহু জনের বিশ্বাসঘাতকতায় ব্যবসায় সাফল্য আসেনি। কিন্তু প্রবীরের "খল নায়ক" ওয়ানওয়াল প্রোডাকসনের জনপ্রিয়তা আজও অম্লান।

॥ নটজাগরণী এবং প্রশান্তকুমারের অবদান ॥

নিতান্ত ছেলেবেলা থেকেই যাত্রাকে গভীরভাবে ভালবাসতেন প্রশান্তকুমার। সেই ভালবাসা থেকেই যাত্রার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। আসলে যাত্রার অতীত ইতিহাস, যাত্রা শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বহু প্রণম্য অভিনেতা, পালাকারদের যাত্রার জন্য গোটা জীবন উৎসর্গ করে যাওয়া, বিশেষ করে নটসম্রাট স্বপনকুমারের অভিনয় ধারা ও খ্যাতি প্রশান্তকুমারকে আকৃষ্ট করে। এক সময়ে গ্রুপ থিয়েটারের নাট্য আন্দোলনের ধারাও প্রশান্তকে যাত্রাদল করার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করে। প্রশান্তকুমার যাত্রা থেকে মুনাফা লুঠবার কথা স্বপ্নেও ভাবেননি। তিনি চেয়েছিলেন যাত্রা আন্দোলন। সৎ যাত্রা পালায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে। তিনি ভাল শিল্পী-সুরকার-কর্মী তৈরি করার স্বপ্ন দেখে গড়েছিলেন "নটজাগরণী" ওঁদের ট্যাংরার বাড়িতে। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত চন্দ্রপুর গ্রামের বর্ধিষ্ণু, ধনাঢ্য ঁসতীশচন্দ্র কুমার-এর ছেলে প্রশান্ত জন্মভূমির সূত্রে দেশের কিছু ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে, চলচ্চিত্র অভিনেতা সন্তোষ দাশের ছেলে, আলোকচিত্রী শংকর দাশ আর অসম্ভব ভাল গায়ক প্রণব ভট্টাচার্যকে সাথী করে গড়ে তোলা এই দলকে পরে নিয়ে আসেন ৪/১ রামকানাই অধিকারী লেনে (১২)। ৮ বছর সেখানে কাটিয়ে প্রশান্ত এই প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে আসেন তাঁরই কলেজ স্ট্রীটের বাড়িতে। কয়েকবছর চিৎপুরে যাত্রা পাড়ায় গদিও চালিয়েছিলেন। যাত্রাপাড়ার তৎকালীন বহু মালিকের অসহযোগিতার জন্য তিনি নিজের বাড়িতেই নিয়ে আসেন দলকে। প্রশান্তকুমার একাধিক শিল্পী যেমন তৈরি করতে পেরেছেন, তেমনি এমন বহু ছেলে-মেয়েদের পেয়েছেন যাঁরা পুরোপুরি যাত্রাকে শ্রদ্ধা করেন। যাত্রার চমক, যাত্রা থেকে মুনাফা লুঠবার মানসিকতা, ঢাউস ঢাউস বিজ্ঞাপনের প্রতিযোগিতায় নিজেকে জড়াতে চাননি বলে "নটজাগরণী" যেমন চিৎপুরের দল হতে পারেনি, তেমনি নিজেও পুরোপুরি যাত্রাওয়ালা হয়ে ওঠেননি। দলটি শ্রদ্ধার সঙ্গে বেঁচে আছে, মরশুমে কিছু শো করে। প্রশান্তকুমার ইতিমধ্যে এক বছরের জন্য মঞ্জরী অপেরায় নায়ক হিসেবেও কাজ করেছেন। প্রশান্তকুমার যাত্রা ভাবনার মধ্যেও সাধ্যমত সমাজসেবা যেমন করেছেন, তেমনি মানুষের বিপদে পাশে গিয়ে দাঁড়ানো তাঁর স্বভাব। যাত্রা শিল্পের প্রকৃত পূজারী যাঁরা তাঁদের প্রতি, সাংবাদিকদের প্রতি প্রকৃত সম্মান প্রদান মৌখিক না করে নটজাগরণীর ব্যানারে আনুষ্ঠানিকভাবে করে থাকেন মাঝে মাঝেই।

অভিনয়ে, নির্দেশনায়, গানে দক্ষ এই অভিনেতা ব্যক্তি জীবনে মানব পূজায় বিশ্বাসী বলে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

মেডিকেল কলেজের বিপরীতে নিজের বাড়িতে এই যাত্রা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ঘরে অভিনেতা প্রশান্তর পাওয়া একাধিক পুরস্কার ও মানপত্রের মধ্যে আছে মানবিক ধর্ম পালনের নজির। ফটোগ্রাফার শংকর-এর আকস্মিক মৃত্যুর পর বাঁধিয়ে রাখা ছবিটা, গোটা যাত্রা জগতের সামনে এক প্রত্যক্ষ সাংস্কৃতিক চেতনার নিদর্শন। শংকর ছিলেন এই যাত্রা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রেমিক, যাঁকে ভুলতে দেননি প্রশান্তকুমার।

॥ গৌরাঙ্গ অপেরা / অনুমতি ঘরামি ॥

বছর ১৬। ১৮ আগে দঃ ২৪ পরগণার বাসন্তী থানার বাসন্ত গ্রামে "নিউ তরুণ অপেরা" নাম দিয়ে একটি দল তৈরি করে ব্যবসা আর যাত্রাকে ভালবাসা দুই চালাতেন অনুমতি ঘরামি। পরে সেই নাম মুছে কলকাতায় এসে গৌরাঙ্গ অপেরা নাম দিয়ে নতুন করে ব্যবসা শুরু করেছিলেন '৮৬ সাল থেকে। চৈতন্য মহাপ্রভুর পাঁচশত জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে এঁদের নতুন দলের যাত্রা শুরু হয়। পালার নাম ছিল "প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য"। অনুমতি ঘরামির ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যের সঙ্গে ছিল নিজের গ্রামের অন্ধকারে পড়ে থাকা শক্তিমান শিল্পীদের আলোয় আনা। এই দলের সর্বাধিনায়ক ছিলেন, মৌলুদ ঘরামি।

॥ অপ্সরা অপেরা ॥

এক সময়ে চলচ্চিত্রের স্বনামখ্যাত অভিনেত্রী যিনি 'যাত্রা'কে অশ্রদ্ধা না করলেও যাত্রার ব্যাপারে মাথা ঘামাতেন না, সেই সুপ্রিয়া চৌধুরী যাত্রায় বিনিয়োগ অর্থের কুইক রিটার্ন ব্যাপারটাকে সহজে বিশ্বাস করলেন! সিনেমা পর্দার জনপ্রিয়তম অভিনেত্রী সুপ্রিয়া বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে দাপটের সঙ্গে অভিনয় চালিয়ে যেতে যেতে প্রথমে যাত্রার আসরে এলেন প্রভূত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শুধুমাত্র অভিনয় করতে। মহানায়ক উত্তমকুমারের জীবদ্দশায় যাঁদের ময়রা স্ট্রীটের বাড়ির ছায়া পর্যন্ত স্পর্শ করার ক্ষমতা ছিল না, পাবলিক স্টেজে অভিনয়ের সূত্রে তাঁদের চিনে, কাছে টেনে নিলেন। যাঁদের বিশ্বাস করতেন, ভালবাসতেন, এমন দু'একজনের প্ররোচনা সুপ্রিয়া দেবীকে নিয়ে এসেছিল যাত্রায়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে যখন সুপ্রিয়া দেবী তাঁর বিচক্ষণতা দিয়ে বুঝলেন, সেই বিশ্বাসের পাত্র বা পাত্রেরা তাঁকে ভাঙিয়ে স্বার্থসিদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর, তখন তাঁর সেই সর্বকালীন জেদ তীব্র হলো। যাত্রা থেকে সহজেই মুনাফা লুঠে নেওয়া যায় এমন ধারণাও ছিল তাঁর। সুতরাং নিজেকে প্রকাশ্যে না এনে, তাঁরই পরমাত্মীয়া ঋদ্ধি চট্টোপাধ্যায়কে সামনে রেখে সুপ্রিয়া দেবী গড়ে তুললেন অপ্সরা অপেরা। দলের শ্রেষ্ঠ আসনে থেকে অর্থাৎ পালার নায়িকা হিসেবে নিজেকে যুক্ত রেখে সুপ্রিয়া এগিয়ে যেতে থাকলেন দ্রুত গতিতে। পাশাপাশি স্বল্প সময়ের মধ্যে দলের অভ্যন্তরে নদীর ভাঙনের মত একটু একটু করে ভাঙন ধরতে শুরু করল। দেখা দিল সর্বনাশা ফাটল। বিচক্ষণ সুপ্রিয়া অবধারিত ধ্বসে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আশঙ্কায়, বিশ্বাস হীনতার আশঙ্কায় গড়ে তোলা "অপ্সরা অপেরার"-র গন্ডি থেকে সরে এলেন। মাত্র কয়েকটা বছরের মধ্যে যাত্রার চমকে সাফল্য, বিশ্বাসে বাজিমাৎ, বেহিসেবি খেয়ালীপনা, প্রতিযোগিতামূলক গতিতে জয় অনিবার্য মনে করে শিক্ষিত, অভিজাত মহিলা প্রযোজক শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় যত বেগবতী হতে থাকলেন, যাত্রাপালা থেকে ব্যবসায় সাফল্যের সঠিক চাবিটা কী তার সন্ধান করলেন না। এর ফলে বন্ধ হলো "অপ্সরা অপেরা"-র দুয়ার। যাত্রা পাড়ার ছাঁচে তৈরি হবার কৃতিত্বটুকু সম্বল করে সুপ্রিয়া দেবীর আদরের 'বৌমা', বিশ্বাসের পাত্রী ঋর্ধি দেবী ঘরে ফিরে গেলেন। কিন্তু সুপ্রিয়া দেবী বেঁচে রইলেন যাত্রা জগতে সসম্মানে।

॥ শিল্পীলোক ॥

অসম্ভব কৃতী পুরুষ হিসেবে যাত্রা পাড়ার ইতিহাসে যে ক'জনের নাম অমর হয়ে থাকবে তার মধ্যে সুভাষ চ্যাটার্জী একজন। নব রঞ্জন অপেরার প্রাণপুরুষ শম্ভুনাথ ঘোষের হাতে গড়া বললে হয়তো ঠিক বলা যায়। সেই সুভাষবাবু বছর কয়েক নব রঞ্জন অপেরায় কাজ শিখেই অতি অল্প বয়সেই নিজেই মালিক হবার ঝুঁকি নিলেন। জন্ম দিলেন শিল্পীলোক। ভাগ্যবান এবং পরিশ্রমী সুভাষ অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর দলকে নিয়ে গেলেন শীর্ষস্থানে। তলায় তলায় কিন্তু তিনি নিজের দেশের শহর অঞ্চলে গড়ে তুলতে থাকলেন "হোটেল", হয়তো অন্যান্য ব্যবসা। সেখানে যখন তাঁর ভাগ্যলক্ষ্মী স্থায়ী হয়ে বসলেন, তখনই প্রায় রাতারাতি নিজের সন্তানের গলা টিপে মারার মতই গড়ে তোলা এবং প্রচণ্ড গুডউইল থাকা তাজা যাত্রা দলটি বন্ধ করে দিয়ে ফিরে গেলেন যাত্রা ব্যবসার টাকায় গড়ে তোলা নতুন হোটেল ব্যবসায়!

॥ শিল্পী বন্দনা, বসুন্ধরা এবং ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ॥

সুরার ব্যবসা থেকে সুরের জগতে প্রবেশ করেই যিনি "এলাম এবং জয় করলাম" মনে করতেই পারেন তিনি ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। ১৯৮৮ সালে যমজ সন্তান প্রসব করার মত ডি. মুখার্জী এক সঙ্গে ২টি দলের জনক হয়েই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন যাত্রা পাড়ায়। শিবপ্রসাদ মুখার্জীর যে ছেলের বাসনা ছিল ডাক্তার হবার, ডাক্তার মানে মানুষের কাছে ভগবান হবার ভাগ্য তাঁকে সে সুযোগ না দিয়ে অন্য জগতে এনে মানুষের ভগবানই করেছে। শ্রী মুখোপাধ্যায়ের মুখ থেকে শোনা, ১৯৮২ সালে আইন পাশ, তার মধ্যে আবার চার্টার্ড এবং কস্টিং দুই বিষয়ে পড়াশোনা করে কিছুদিন চাকরি করেছিলেন। যিনি লোকের চাকরি দেবেন তিনি চাকরি করবেন এটা ভাগ্যদেবতাও মানতে পারেননি। অগত্যা ব্যবসা করেছেন। সুরার ব্যবসায় এমন সাফল্য যে কিছুদিনের মধ্যে চিত্র প্রযোজনায় হাত দিয়ে তৈরি করেছিলেন "রক্তজবা"। তারপর সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রা মহলের মানুষের কাছে ইনি ভগবান তুল্য। দু'টো দলকে প্রতিষ্ঠা দিতে ঘোমটার বালাই রাখেননি। সবাই যখন যাত্রায় ফিল্মস্টারের বিরোধী ধনঞ্জয়বাবু তখন ব্যবসার খাতিরে ফিল্মস্টার আমদানিতে হলেন সেরা। এ ব্যাপারে মুখে বিরোধী থাকলেও কাজে ফিল্মস্টার প্রীতি প্রায় সব মালিকের, তাই ধনঞ্জয় সেখানে কোন কম্প্রোমাইজ করেননি। তলায় তলায় যে কত দলকে সাহায্য করেছেন, কত পেশাদার নাটক প্রযোজনা করেছেন বা করছেন তার হিসেব নেই। সেই ধনঞ্জয় অবশেষে 'লোকনাট্য'র মত ঐতিহ্য মণ্ডিত দলকে নিশ্চিহ্ন হতে দেননি। পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলনের সভাপতির আসনও অলঙ্কৃত করেছেন।

মরার পরও মানুষ কীভাবে বাঁচে, ব্যস্ত প্রযোজক ধনঞ্জয় তার সন্ধান করার সময় পাননি এখনও!

॥ সমকালীন পালাকার ॥

পঞ্চাশের দশকের আগে থেকে আশির দশকের অন্তিমকাল পর্যন্ত যাত্রার মালিক পক্ষের ভিতর "জনপ্রিয়", "বক্স", "লোক চাইছে" এই সব শব্দগুলি বা বিশ্বাসের আলাদা একটা গণ্ডি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে অভিনেতা-অভিনেত্রী, সুরকার বা যন্ত্রী- সঙ্ঘের ব্যাপারটা যদি উহ্য রাখি, তা হলে বলা যায় যাত্রা-গণ্ডির বাইরে থেকে পালাকার বা নাট্যকারদের আমদানি প্রায় ছিলই না। এ কথাও স্বীকার করতেই হবে, বাইরের জগত থেকে তুড়ি মেরে মেরে পালাকার আমদানির কথা মালিকপক্ষের মাথায় না আসার কারণই ছিল তৎকালীন পালাকাররা। পঞ্চাশের দশকের আগে থেকে ষাটের দশকের প্রায় অন্তিমকাল পর্যন্ত এমন কয়েকজন পালাকার যাত্রাকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত বিরাজ করছিলেন যাঁদের পালা রচনার দক্ষতাকে খর্ব করার মত কলম খোঁজার কোন তাগিদই ছিল না যাত্রা পাড়ায়। এমন কিছু পালাকারের কথা আগেই বলেছি। ১৯৭০

থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে যাত্রার সর্বাঙ্গে আধুনিকতার বা সমকালীন চেতনার অনুপ্রবেশ, সর্বস্তরে প্রতিযোগিতার ফাটল দেখা দিতে থাকল। যত বেশি ফাঁক ফোঁকর তৈরি হতে থাকল, তত বেশি যাত্রার এতকালের নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে বহিরাগতের অনুপ্রবেশ অবাধ হতে থাকল। স্বীকার করতেই হয়, ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে যাত্রার যে ধারা ভাঙতে শুরু করেছিল সত্তরের দশক থেকে তা প্রকট হতে হতে যাত্রার রূপ, যাত্রার ভাষা সব কিছুই একটা বিশেষ মাত্রা পেল। অতীতের ঘোষ পাড়া, বোস পাড়ার পাশে এই মুহূর্তে গড়ে ওঠা মাল্টিস্টোরেড বিল্ডিং-এর ভিতরকার যে ফারাক বা যে রূপ, আজকের যাত্রার অভ্যন্তরীণ সব কিছুই ঠিক সেই ভাবে পাল্টাতে থাকল। দুস্তর ফারাক দেখা দিল যাত্রাপালার বিষয়ে, যাত্রাপালায় নামকরণে, সংলাপে, চরিত্র-চিত্রণে, অভিনয়ে এবং প্রযোজনায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, যাত্রা আজ যতই উন্নতশির হোক, যাত্রার লক্ষ লক্ষ দর্শক কিন্তু নতশির সেই অতীত স্রষ্টাদের স্মরণীয় কীর্তির স্মৃতি নিয়ে। পঞ্চাশের দশকের অন্তিম সময় থেকে ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে যাঁদের পালা রচনায়, উপস্থাপনায় যাত্রা আজও সমৃদ্ধ হয়ে আছে তাঁদের মধ্যে এমন কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করছি, যাঁরা নাট্য ক্ষেত্রে এবং চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে দিকপাল হয়েও পালা রচনায় সিদ্ধ হস্ত ছিলেন অথচ পুরোপুরি পালাকার হয়ে উঠতে চাননি। এঁরা হলেন, অবনী মুখোপাধ্যায়, অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়, গৌর শী, জলধর চট্টোপাধ্যায়, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, ভোলানাথ ভট্টাচার্য, পঙ্কজভূষণ, মন্মথ রায়, শচীন সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, রমাপতি বসু আরও অনেকে।

যাটের দশক পর্যন্ত এক একটি দলে যেখানে কমতে কমতেও ৪। ৫টি পালা প্রস্তুত থাকত, ষাটের দশকের মাঝামাঝি বা সত্তর দশকের সূচনা থেকে তাও কমতে শুরু করল। আশির দশক থেকে চালু হলো দুটি করে পালা প্রযোজনা। এই দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে অধিকাংশ বড় যাত্রা দল একটি করে পালা প্রযোজনার রীতি চালু করলেন। এর ফলে যাঁদের ওপরে এই ব্যবসা পুরোপুরি নির্ভরশীল সেই দর্শককুলের ব্যক্তিগত পছন্দ আর অপছন্দ বলতে কিছু থাকল না। শুধু মাত্র চিত্তবিনোদনের ব্যাপারটাই প্রধান হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে ট্রেডিশনাল যাত্রা মুছে গেল। চরম সমকালীন করতে গিয়ে যাত্রা হয়ে উঠতে থাকল পেশাদার রঙ্গমঞ্চের প্রযোজনা আর সিনেমার সংমিশ্রণগত একটা মাধ্যম। সেই জাঁকজমকপূর্ণ ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক পালা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এক সময়ে যখন সামাজিক পালার প্রাবল্য ছিল না, সেখানে সামাজিক পালারই প্রাবল্য দেখা দিল। সমাজ চিত্রকে তুলে ধরার নামে হাটে-মাঠের সরল মানুষের মনের খোরাকে মেশানো হলো ক্যাবারে, ডিস্‌কো, বম্বে ফাইট। বিষয়ের প্রয়োজনের অজুহাতে যাত্রায় টপ আর্টিস্টের আসনে সসম্মানে বসতে থাকল উট, বাঘ, সিংহ, বানর, শিম্পাঞ্জী থেকে অনেক জানোয়ার। এই দীর্ঘ সময়কালের মধ্যেই আবার কোন কোন যাত্রা মালিক যাত্রার ক্রমবিবর্তনের পথ ধরেই আমন্ত্রণ জানালেন সেই সব স্মরণীয় নাট্যকার বা নাট্যপণ্ডিতদের, যাঁরা যাত্রাকে প্রকৃত গণমাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করার মহাযজ্ঞ শুরু করলেন। যে আসরে পরিবেশিত হতে থাকল মুনাফার জন্য সুরা আবার সেই আসরেই এলো জাগরণের অমৃতভাণ্ডার। এলেন অমর ঘোষ, অরুণ রায়, অসিত বসু, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, কিরণ মৈত্র, কুণাল মুখার্জী, কমলেশ ব্যানার্জী, গণেশ মুখোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ, চণ্ডী মুখোপাধ্যায়, জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু রায়, তপেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, নিকুঞ্জ চক্রবর্তী, অধ্যাপক নরেশ চক্রবর্তী, সুনীল চৌধুরী, বীরু মুখোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ পুরকায়স্থ, মানস দত্তগুপ্ত, রমেন লাহিড়ী, রণজিৎ চট্টোপাধ্যায়, রতন ঘোষ, শ্যামাকান্ত দাস, শ্যামল ঘোষ, শৈলেশ গুহনিয়োগী, সমীর মজুমদার, হারু রায়, বরুণ দাশগুপ্ত, সুশ্যামল শর্মা, সবুজ পাতা, সূর্য সাথী, আরও অনেকে। এঁদের মধ্যে উৎপল দত্ত, অমর ঘোষ, শৈলেশ গুহনিয়োগী, রমেন

লাহিড়ী, অসিত বসু, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল ঘোষ প্রমুখের অবদান প্রসঙ্গে গভীর মূল্যায়ন প্রয়োজন ছিল। এঁদের মধ্যে আজ অনেকেই নীরবে প্রস্থান করেছেন যাত্রাপাড়া থেকে। উৎপল দত্তের মত নাট্য বিষয়ক মহান ব্যক্তিত্ব অবশ্য মাটির পৃথিবীর সব দেনা-পাওনা মিটিয়ে অন্য লোক বা অমৃতলোকের বাসিন্দা। উপরোক্ত তালিকার মধ্যে এখনও এমন দু'একজন আছেন যাঁরা নির্মল মুখার্জী, ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল চৌধুরী, জ্যোতির্ময় দে বিশ্বাস, মত পুরোপুরি যাত্রার হোল টাইমার পালাকার হিসেবে চিহ্নিত হতে পারেননি। এর মধ্যে ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় পালাকারদের পালাকার হিসেবে সম্মান ও প্রতিষ্ঠার শিখরে। পরিতাপের বিষয়, যাত্রা সম্রাট ব্রজেন দে'র পুত্র তরুণ দে এবং ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র মেঘনাদ গঙ্গোপাধ্যায় হাতে কলম তুলে নিয়েও ওঁদের সৃষ্টির যথার্থ ধারক ও বাহক হয়ে উঠতে পারেননি।

আশির দশকের মাঝামাঝি বা প্রায় শেষ পর্ব থেকে নব্বই দশকের গোড়ার দিকে যাত্রা পেয়েছে এমন কয়েকজন পালাকার যাঁদের পালা রচনায় যে মুন্সীয়ানা আছে সে বিষয়ে যাত্রার দর্শক মহল আপাততঃ বিশ্বাসী। এঁদের মধ্যে অনল চক্রবর্তী, উৎপল রায়, মনতোষ চক্রবর্তী, সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আজকের যাত্রা চমকে-ঠমকে-আঙ্গিকে এমন কি নামে ও ভাষায় যতই তার সনাতন ভাবমূর্তি হারাক তবুও এই যাত্রা থেকেই পুথিগত বিদ্যার বাইরে সুশিক্ষিত হয়েছে লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর বা সদ্য সাক্ষর মানুষ। যাত্রার আসরে যেমন চৈতন্য থেকে মুকুন্দ দাস, লালন ফকির থেকে লেনিন-এর জীবন ও কর্ম এবং সংগ্রামের রূপ প্রসঙ্গে মানুষ জ্ঞানী হয়েছে, তেমনি হিন্দু-মুসলমান রাজত্ব কাল থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অমৃতপুত্রদের আত্মবলিদানের ইতিবৃত্ত জেনেছে। শোষণবাদের চেহারা থেকে মানব কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত মানবজীবনের স্বাদ পেয়েছে মানুষ এই যাত্রাপালা থেকেই। বলতে দ্বিধা নেই, আজকের যে যাত্রা প্রযোজকেরা শুধুমাত্র মুনাফা লুঠবার প্রক্রিয়া আবিষ্কারে প্রতি মুহূর্তে ভাবিত, সচেষ্ট; সেই যাত্রারই বহু প্রযোজকের নিরলস সাধনায়, আদর্শে, সীমাহীন ঝুঁকি নেবার মানসিকতায়, শৈল্পিক চেতনায়, এ দেশের গ্রাম-গ্রামান্তরের খেটে খাওয়া মানুষের দল যেমন চিনেছে "কাস্তে-হাতুড়ি-তারা", উপলব্ধি করেছে প্রতীক চিহ্নের যথার্থ মর্মবাণী, তেমনি আয়ত্তেও এনেছে প্রতিবাদের ভাষা। যেমন জেনেছে 'রক্তে রাঙানো নিশানের জন্ম ইতিহাস তেমনি "যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই" এই শ্লোগানের শরিক হয়েছে তারা। অথচ মুনাফার রত্নে শোভিত প্রযোজকদের কাছে, আদর্শ বিতরণের জন্য, ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসের জন্য, বড় ম্লান হয়ে গেছে সেই যাত্রা প্রেমিকের দল। এমন কি এ কালের বামপন্থী প্রশাসনের কাছেও মূল্যহীন সেই গণজাগরণের অন্যতম শরিক রূপকারেরা।

যখন গ্রাম-গ্রামান্তরের মানুষ যাত্রাই তাঁদের একমাত্র চিত্তবিনোদনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করলেন তখন এমন কয়েকজন পালাকারদের আমরা পেলাম যাঁরা সাহিত্যের অমৃতকুম্ভ থেকে আহরণ করলেন সাহিত্য অমৃত। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, শৈলজানন্দ, বনফুল, সমরেশ বসু থেকে বিমল মিত্রের কাহিনীর পালারূপ দিলেন। এ ব্যাপারে নির্মল মুখোপাধ্যায়, ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের অবদান অনস্বীকার্য।

তিরিশ বা চল্লিশের দশকে আমরা এমন আরও কিছু লোকনাট্য রচয়িতাদের পেয়েছি, যাঁদের বিষয় নির্বাচন, রচনা মাধুর্য, সংলাপ, চরিত্র সৃষ্টি বাংলার লোকনাট্যকে সমৃদ্ধ করেছে। যাঁদের বিষয় উপস্থাপনার রীতি, পদ্ধতি এবং পরিকাঠামো মূলত পরবর্তী পালাকারদের রচনা রীতিকে সমকালীন হতে সাহায্য করেছে। এখানে তাঁদের কথা বলা দরকার। যেমন ঃ

বিনয়কৃষ্ণ মুখার্জী ঃ

১৯০২ সালে হুগলী জেলার পাকড়ি গ্রামে বিনয়কৃষ্ণ মুখার্জীর জন্ম।

নিতান্ত অল্প বয়স থেকে বিনয়বাবু শিক্ষকতা শুরু করেন এবং আদর্শ শিক্ষক হিসেবে ১৯৬৪ সালে সরকারি পুরস্কারে সম্মানিত হন। এ যুগের যা কিছু অন্যায়, যা কিছু পাপ, যতটুকু অপরাধ আর অস্থিরতা তার সব কিছুকেই বিনয়কৃষ্ণ তাঁর নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন জনমানসের সামনে।

বাংলার ১৩৫০ সনে রচিত প্রথম নাটকেই বিনয়কৃষ্ণের নাট্যরচনার ক্ষমতা স্পষ্ট হয়ে যায়। বিনয়কৃষ্ণের প্রথম রচিত পালা "রক্ত কমল"। সত্যম্বর অপেরা অভিনীত এই পালার জনপ্রিয়তাই নাট্যকারকে ভবিষ্যতের নাট্যকার হবার প্রেরণা দেয়। তাই উপহার দেন 'সংগ্রাম'। এই নাটকটি নট্ট কোম্পানি আসরস্থ করে দিকে দিকে। ১৩৫০ সনে নাট্যকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ১৩৫৫ সনের মধ্যেই যাত্রাজগতে একজন প্রথম সারির নাট্যকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই বছরই সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত বিনয়বাবুর 'মাটির প্রেম' নাটকটি প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা পায়।

১৩৫৭ সনে বীণাপাণি অপেরায় অভিনীত 'বেইমান' নাটকটি যে আলোড়ন তুলেছিল তা আজও সকলের মনে রেখাপাত করে আছে।

১৩৫৮ থেকে ১৩৭০ পর্যন্ত বিনয়কৃষ্ণ ভুলের কাজল, রক্তপূজা, মায়ের ছেলে, পণমুক্তি, ত্রিধারা, হিন্দু-মুসলমান, রক্ততর্পণ, ভারত নারী, দর্পহারী, মারাঠা মোগল প্রভৃতি নাটকগুলি উপহার দিয়ে প্রমাণ করে দেন যে তিনি প্রথম সারির নাট্যকার।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, আকস্মিক অসুস্থ হয়ে ১৯৪৬ সালে মৃত্যু হয় বিনয়কৃষ্ণর। যাত্রাজগৎ হারায় একজন প্রতিশ্রুতিবান নাট্যকারকে।

বিনয়কৃষ্ণের **'রক্ত কমল'** (১৩৫০) ৫ অঙ্কের। হরিবংশের হরিবংশ পর্ব এই পালার কাহিনীর সূত্র। গণেশ অপেরায় অভিনীত হয়। ১৩৫২ সনে প্রকাশিত হয় এই পালাকারের 'সংগ্রাম'। শ্রীমদ্ভাগবতের ৮ম স্কন্ধের ৩য় ও ৪র্থ এবং ৫ম অধ্যায় থেকে এর মূল কাহিনী সংগৃহীত। এই পালায় পালাকার সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এর প্রমাণ, দৈত্যরাজ চণ্ডাসুরের মুখ দিয়ে তিনি বলিয়েছেন—

"সেই হেতু এই অভিযান
চাই বিশ্বে সাম্যের প্রতিষ্ঠা—"

মাটির প্রেম ঃ ৫ম অঙ্কের ঐতিহাসিক এই পালাটি সত্যম্বর অপেরা আসরস্থ করে। এই পালায় পালাকার 'দেশপ্রেম'কে বড় করে তুলেছিলেন। ১৩৫৭ সনে পালাটি প্রকাশিত হয়। বল্লভপুর-এর রাজা শিলাদিত্য ও জন-দ্বন্দ্ব নিয়ে এই নাটক 'বেইমান'। ১৩৫৭ সনে এই নাটকটিও প্রকাশিত হয়। বীণাপাণি অপেরায় অভিনীত হয়।

বীরাঙ্গনা ঃ চণ্ডী অপেরায় অভিনীত এই ৫ অঙ্কের ঐতিহাসিক পালাটি খুবই প্রশংসিত হয়।

কালযবন ঃ ১৩৬০ সনে প্রকাশিত এই পালার বিষয় পালাকার সংগ্রহ করেছিলেন হরিবংশের বিষ্ণুপর্ব থেকে। ৫ অঙ্কের এই পৌরাণিক পালাটি আসরস্থ করে নিউ নারায়ণ অপেরা।

ভুলের কাজল ঃ ১৩৭০ সনে প্রকাশিত এই পালাটি চণ্ডী অপেরায় অভিনীত হয়। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কথাও নাটকে বিশেষভাবে বলা হয়েছে। চাষীরাই যে দেশের প্রকৃত বন্ধু বিনয়কৃষ্ণবাবু সেই কথাটাই স্পষ্ট করে বলেছিলেন।

এই পালার ৩য় অঙ্কের ৩য় দৃশ্যে পালাকারের 'চাষী' উত্তরণ প্রসঙ্গ আছে। বিনয়কৃষ্ণের 'মায়ের ছেলে', 'পণ মুক্তি', 'ত্রিধারা', 'হিন্দু-মুসলমান', 'রক্ত তর্পণ', 'ভারত নারী', 'দর্পহারী', 'মারাঠা মোগল', খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

নন্দগোপাল রায়চৌধুরী ঃ

১৯১২ সালে কলকাতার নারকেলডাঙ্গা অঞ্চলে জন্ম হয় নন্দবাবুর। থাকতেন হাওড়ার কাছে

শিবপুরে। ওখানেই পড়াশোনা করতেন তিনি। ১৯৩১ সালে যুবক নন্দগোপাল ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অপরাধে জেলে যান চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনকারী পলাতক বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে এই অভিযোগে। পরে অপরাধী প্রমাণিত না হওয়ার জন্য মুক্তি পান। এরপর শুরু হয় চাকরি জীবন। চাকরি বেশিদিন ভাগ্যে সইল না। রাজদ্রোহী ভেবে সেই জার্মান কোম্পানি নন্দগোপালবাবুকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে। অর্থের অভাবে শেষ পর্যন্ত নন্দবাবু যাত্রার অভিনেতা হতে চাইলেন। পঙ্কজভূষণ রায়ের কাছে অভিনয়ের তালিম নিতে থাকলেন। শেষে আসরে অবতীর্ণ হলেন অভিনেতা রূপে। বহু স্ত্রী চরিত্রেও অভিনয় করে নন্দগোপাল প্রশংসা লাভ করেছিলেন। এর ফাঁকে ফাঁকে নাট্য রচনার চেষ্টা ছিল। শিশুপাল বধের কাহিনী অবলম্বন করে ১৯৪৭ সালে একটি নাটক লেখেন তিনি। নাম দেন 'যুগনেতা'। ১৯৬৪ সালে আকাশবাণী পল্লীমঙ্গল আসরে উক্ত নাটকটি 'শিশুপাল বধ' নামেই অভিনীত হয়। ইতিমধ্যে যাত্রাজগত থেকে অনুরোধ আসে নাটক লেখার। প্রথমে 'কবির কল্পনা' নামে ষ্টার অপেরার জন্য এবং পরে 'আগুন' নামে একটি ঐতিহাসিক নাটক লেখেন। ডাক আসে সত্যম্বর অপেরা থেকে। নন্দবাবু লিখলেন 'আলোর ডাক'। অসাধারণ সাফল্য এনে দিল এই নাটক। এরপর ১৯৬৪ সালে সাফল্যের সঙ্গে তরুণ অপেরা আরম্ভ করলেন নন্দবাবুর 'শহীদ বীর' নাটক। অত্যন্ত জনপ্রিয়তা পায়।

নন্দগোপাল রায়চৌধুরীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক হল, 'মিলন সেতু', 'সন্ধিপূজা', 'বিপ্লবী বাঙালী', 'স্বাধীনতার বলি', 'বন্দীর ছেলে', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'যাদব বিজয়', ' সাধক কমলাকান্ত' প্রভৃতি। 'কবির কল্পনা'। রামায়ণ থেকে আহরণ করা বিষয় নিয়ে এই ৫ অঙ্কের পালাটি লেখা। প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে। শম্বুক হত্যার জন্য শ্রীরামচন্দ্র দায়ী, রামচন্দ্র অনুতপ্ত এটি দেখিয়েছিলেন পালাকার। জীবনের শেষ লগ্নে পৌঁছে এক দুর্ঘটনায় একটি পা হারালেন তিনি। একটা পা কাজ করে না, তবু নন্দবাবু চুপচাপ বসে থাকেন না কোথাও। কল্যাণী অপেরা ছাড়াও আরও কয়েকটি দলে অফিস ম্যানেজার বা পরিদর্শক হিসেবে কাজ করেছেন। প্রায় প্রতিদিন যাত্রাপাড়ায় আসা এবং সবার শারীরিক কুশল সংবাদ নেওয়া, এবং কেউ কোথাও অসুস্থ হয়ে থাকলে তার পাশে বসে সান্ত্বনার কথা শোনানোই ছিল নাট্যকার নন্দগোপালবাবুর প্রধান কাজ।

এই বড়মাপের মানুষটি, পালাকার হিসেবেও খুব বড় মাপের হওয়া সত্বেও দারিদ্র্যের নির্দয় পেষণে জীবনের বাকি দিনগুলি কাটান। সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েও সামান্য অর্থ সাহায্য পাননি তিনি।

আগুন ঃ ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত ৫ অঙ্কের ঐতিহাসিক। এই পালায় 'নারায়ণ ভট্ট' চরিত্রটি এক চারণ কবির, যে গানে গানে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলে।

আলোর ডাক ঃ ১৩৬০ সনে প্রকাশিত ৫ অঙ্কের এই পালার কাহিনী সংগ্রহ করা হয়েছে বিষ্ণু পুরাণের প্রথম অংশের একাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায় থেকে।

শহীদবীর ঃ ১৩৬৪ সনে প্রকাশিত, তরুণ অপেরা কর্তৃক অভিনীত এই ৫ অঙ্কের পালাটি কাল্পনিক। এই পালায় মাত্র ষোল খানা গান ছিল। এই পালাটি দেশাত্মবোধক।

মিলন সেতু ঃ ৫ অঙ্কের এই পালাটি কাল্পনিক। নাট্যভারতী অভিনীত এই পালায় হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী ফুটিয়ে তোলা হয়।

সন্ধি পূজা ঃ ১৩৭০ সনে প্রকাশিত এই পালাটি ভক্তিমূলক, ৫ অঙ্কের। পালাটি প্রথমে 'মাতৃদ্রোহী' নামে নিউ ভোলনাথ অপেরায় অভিনীত হয়, পরে 'সন্ধিপূজা' নামে জনতা অপেরায় অভিনীত হয়। এ ছাড়া, নন্দবাবুর 'বিপ্লবী বাঙ্গালী (১৩৫৮), 'বন্দীর ছেলে' (১৩৬৩), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৩৬৪) পালাগুলি জনপ্রিয়তা পায়।

জিতেন বসাক :

১৯১৭ সালে ময়মনসিংহ জেলার জামালপুরে জন্ম নাট্যকার জিতেন বসাকের। সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্ম হয়নি বলেই বোধ করি ছেলেবেলা থেকেই একটা কিছু গড়ে তোলার অত্যুগ্র আকাঙ্খায় মানুষটা ছটফট করতেন দিন রাত। ১৯৩৫ সালে বসাকবাবু ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপরই তিনি 'যশোহর সাহিত্য সঙ্ঘের'—'সাহিত্য সরস্বতী' উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সংসার চালাবার জন্য আই. এ. পড়তে পড়তেই কাজের চেষ্টায় বেরিয়ে পড়েছিলেন জিতেনবাবু। একদিকে অর্থের তাগিদ, অন্যদিকে সৃষ্টির নেশায় যেন দিশেহারা তিনি। এমন সময় শুরু হল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। চলে গেলেন কোচবিহার। এখানে ফতে মামুদ বেসিক স্কুলে চাকরি পেলেন শিক্ষকতার। এখানেই আই. এ. পাশ করে বি-টিও পড়েন তিনি।

ছোটবেলা থেকেই গান-বাজনা আর সাহিত্যে প্রীতি ছিল জিতেনবাবুর। পূর্ববঙ্গে সৌখিন যাত্রায় যেমন একদিকে অভিনয় করতেন তেমন অন্যদিকে নাটকও লিখতেন। জিতেনবাবুর প্রথম নাটক 'মানুষ' সেখানেই প্রথম আসরস্থ হয়। তারপর অবশ্য নব রঞ্জন অপেরা পুনরায় এই পালাটি আসরস্থ করে। আজ পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশখানা নাটকের জনক এই নাট্যকারকে কবি ও পণ্ডিত অবলাকান্ত মজুমদার 'সাহিত্য সরস্বতী' উপাধিতে ভূষিত করেন।

পূর্ববঙ্গের নব প্রভাত, রঞ্জন অপেরা, সত্যম্বর অপেরা, নব রঞ্জন অপেরা, আর্য অপেরা, নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা, নিউ গণেশ অপেরা এবং প্রায় প্রতিটি দলের জন্য পালা রচনা করে নাট্যকার হিসেবে যাত্রাপাড়ায় জনপ্রিয় হয়ে আছেন জিতেন বসাক। জিতেনবাবুর উল্লেখযোগ্য পালাগুলির মধ্যে আছে সিপাহী বিদ্রোহ, রক্তে লেখা, অগ্নিপরীক্ষা, দ্বিতীয় পানিপথ, দুর্গেশনন্দিনী, জীবন্ত পাপ, মীরাবাই, আনন্দমঠ, কংস, লালবাই, পাপ ও পাপী, মহারাত্র, অষ্টভূজা, সূর্যলগ্ন, আমরা কোথায়—প্রভৃতি।

মানুষ : ১৩৫৪ সনে প্রকাশিত এই পালায় সমসাময়িক নানা সমস্যার কথা বলা হয়েছে। পালাটির ৮ম সংস্করণ ছাপা হয়েছিল জনপ্রিয়তার জন্য।

বিদ্রোহী বাঙ্গালী : ১৩৫৮ সনে ৫ অঙ্কের এই পালাটি দেশাত্মবোধক। 'নব প্রভাত অপেরা' অভিনীত এই পালায় পালাকার জিতেন বসাক মূলত নেতাজি সুভাষচন্দ্রের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনীকে অবলম্বন করেছিলেন। তবে 'নেতাজি' নাম ব্যবহার করেননি পালাকার। এই নায়কের নামকরণ করেছিলেন সর্বদমন।

কাজল গড় : ১৩৬০ সনে প্রকাশিত, বিল্বগ্রাম নট্ট কোম্পানি কর্তৃক অভিনীত এই পালায় গানের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৩টি। অস্পৃশ্যতা বর্জন এবং অস্পৃশ্যতা ব্যাখ্যা এই পালার উপজীব্য।

জয়যাত্রা : ১৩৬৪ সনে প্রকাশিত এই পালার কাহিনী গড়ে উঠেছিল এক আদর্শবান শিক্ষকের মহত্বের ওপর। নট্ট কোম্পানি প্রযোজিত এই পালায় পালাকার বলেছেন—"অবহেলিত শিক্ষক সমাজ অমৃত দান করে, পরিবর্তে নিজে পান করেন বিষ। সেই বিষপানকারী শিক্ষক, আভিজাত্যের অহঙ্কারে মত্ত রাজার চাইতেও ভয়ঙ্কর হয়—" রাজা স্বদেশে পূজিত, বিদ্বান সর্বত্র বন্দিত—চাণক্যের এই উক্তি এই পালার মূল সুর।

দ্বিতীয় পানিপথ : ১৩৭০ সনে প্রকাশিত এই পালাটি সত্যম্বর অপেরা আসরস্থ করে। এতেও পালাকার হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও স্বদেশ-প্রেমকে বড় করে দেখিয়েছেন। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত দ্বিতীয় পাণিপথ যুদ্ধের পটভূমিকা।

ডাকিনীর চর : ১৩৭১ সনে প্রকাশিত, নট্ট কোম্পানি অভিনীত এই পালা ৫ অঙ্কের।

'সিপাহী বিদ্রোহ' (১৩৫৭), 'সম্রাট অশোক' (১৩৬৫), 'লালবাঈ' (১৩৩৭), 'কৃষ্ণ কালিন্দী

(১৩৬৮), 'শম্বরাসুর' (১৩৬৯), ইত্যাদি বেশ কিছু মঞ্চ নাটক রচনা করেছিলেন। ১৩৬২ ও ১৩৬৫ সনে জিতেন বসাক বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'আনন্দমঠ'-এর পালারূপ দেন।

॥ আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

পিতামহ পুঁথি লিখতেন। মামারা ছিলেন সংগীতরসিক এবং সংগীতজ্ঞ। মামাতো দাদা শিবকালী চট্টোপাধ্যায় ছিলেন স্বনামধন্য অভিনেতা। মামা বাড়ির এক শৈল্পিক পরিবেশে ১৩২৯ সনে নগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর ছেলে আনন্দময় ব্যানার্জীর জন্ম। হুগলীর গোপালপুরে। রক্তে তাই বোধহয় আনন্দর ছিল অভিনয় নেশা। ১৩৩৮ সনে শিয়াখালা বেণীমাধব স্কুলে থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে ওয়েস্টমিনিস্টার স্টোর্সে চাকরি গ্রহণ করেন। প্রায় চৌদ্দ বছর ছিলেন সেই প্রতিষ্ঠানে। এরই পাশাপাশি গোপালপুরে বান্ধব নাট্য সমাজে গোপাল দাসের সাহায্যে ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদের কাছে অভিনয় শেখেন এবং 'রত্নেশ্বর' নাটকে অভিনেতা হিসেবে প্রথম অবতীর্ণ হন।

সৌখিন অভিনেতা রূপে অভিনয় করতে করতে ১৯৪৭ সালে সত্যম্বর অপেরায় তাঁর প্রথম রচিত পালা 'পাষাণের মেয়ে' আসরস্থ হয়। এরপর ১৯৫৩ সালে চাকরি ছেড়ে গণেশ অপেরায় স্থায়ীভাবে অভিনেতা এবং নাট্যকার হিসেবে যুক্ত হন।

সেই থেকে প্রায় চৌত্রিশ বছর সুনামের সঙ্গে নাট্য রচনা করেছেন তিনি। প্রায় ৭৫টি নাটকের জনক আনন্দময় ৫০টি পালায় কাজ করে পাকা অভিনেতা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছেন।

১৯০৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং আরও কয়েক জায়গা থেকে শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসেবে পুরস্কৃত আনন্দময়ের চরমতম খ্যাতি পাওয়া নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শিবাজী, রানী ভবানী, ভুলি নাই, পরিচয়, বিপ্লবী অরবিন্দ প্রভৃতি। নাট্য নির্দেশক হিসেবেও আনন্দ ব্যানার্জীর মূল্য কম নয়। মোহন অপেরার 'হরপার্বতী' এবং 'বন্দী'র নাট্যকার এবং অভিনেতা আনন্দময় জীবন শেষ করেন লক্ষ্মীনারায়ণ অপেরায়।

পালাকার আনন্দময় অনেক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। আনন্দময়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পালা প্রসঙ্গে বলি।

পৃথ্বীরাজ ঃ ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত এই ৫ অঙ্কের ঐতিহাসিক যাত্রা নাটকটি নিউ গণেশ অপেরা আসরস্থ করে। দিল্লীর সম্রাট পৃথ্বীরাজ চৌহানের বিরুদ্ধে গজনিপতি মহম্মদ ঘোরির যুদ্ধ লিপ্সা এবং পৃথ্বীরাজ শ্বশুর জয়চাঁদের বিশ্বাসঘাতকতা সত্বেও তরাইনের যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরির পরাজয়, কিন্তু ২য় বারের যুদ্ধে স্বয়ং জয়চাঁদের বিশ্বাসঘাতকতায় পৃথ্বীরাজের মৃত্যু, এই হলো পালার মূল বিষয়।

এই পালায় পালাকার পতিপ্রেম, দেশাত্ববোধ বিশেষভাবে এঁকেছেন।

শিবাজী ঃ ১৯৫০ সালে প্রকাশিত, নিউ গণেশ অপেরা কর্তৃক আসরস্থ, ৫ অঙ্কের এই ঐতিহাসিক পালায় শিবাজীর উত্থান পর্বই বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এতে গানের সংখ্যা ছিল ১৮।

যুগের দাবী ঃ জনতা অপেরা পরিবেশিত এই কাল্পনিক পালাটি ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয়। পণপ্রথার বিরুদ্ধে পালাকারের তীব্র প্রতিবাদ এই পালা। এই পালায় ১১টি গান সহ, ব্যালে নাচ ছিল। এই পালার 'ভারতী' চরিত্র পালাকারের জনশিক্ষা প্রসারের এক মহান হাতিয়ার। মেয়েরা যদি প্রকৃত শিক্ষিতা হন, স্বনির্ভর হন তা হলে নিজেরা আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে চলতে সক্ষম হবেন, এই কথাই বলেছেন পালাকার 'ভারতী' চরিত্রের মাধ্যমে।

এ ছাড়া আনন্দময়ের ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত 'মরেও যাঁরা মরে না', সাঁওতাল বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত। পালাটি নিউ গণেশ অপেরা আসরস্থ করে। খেলাঘর, সত্যের জয়, পরিচয়,

ফাঁসির মঞ্চে, ইত্যাদির সঙ্গে আরও অনেক পৌরাণিক পালা মোহন অপেরা থেকে নট্ট কোম্পানি সসম্মানে আসরস্থ করে।

॥ প্রসাদ ভট্টাচার্য ॥

১৯৩০ সালে চব্বিশ পরগণার শাসন গ্রামে ললিতমোহন ভট্টাচার্যের ছেলে প্রসাদ ভট্টাচার্যের জন্ম এক দীন পরিবেশে। লেখাপড়ায় মেধাবী হয়েও অর্থের অভাবে বেশি পড়াশোনা হয়নি। প্রসাদবাবুর থিয়েটার করা ছিল নেশা আর নাট্যকার হওয়া ছিল স্বপ্ন। 'ব্যথার পূজা' নাটকে গ্রামের এক দলে অভিনয় করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন প্রসাদবাবু। এরপর অর্থের অভাব থেকে মুক্তি পাবার জন্যই প্রসাদবাবু চলে আসেন সত্যম্বর অপেরায় অভিনেতা হতে। 'শক্তিপূজা' পালায় পেশাদারি অভিনেতা হিসেবে প্রথম অভিনয় করেন। এখানে আট বছর থাকার পর যাত্রা ছেড়ে আবার ফিরে যান এবং এক পাঠশালার শিক্ষক হন। আবার ফেরেন যাত্রায়। একে একে যুক্ত হন ভাণ্ডারী, প্রভাস এবং আরও কয়েকটি দলে। অভিনেতা দিলীপ চ্যাটার্জীর সাহায্যে কালু রায়ের অপেরায় প্রথম পালাকার রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। সেই প্রথম নাটকের নাম 'মসনদ কার'। ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়। কারাগারে বন্দীরা এই পালায় গণের গান গেয়েছিল, সেখান থেকেই পালা আরম্ভ। এতে ব্যালে সহ প্রায় ১৮ খানা গান ছিল। এই নাটক তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। কিন্তু ভেঙে পড়েননি প্রসাদবাবু। দৃঢ় মনোবল নিয়ে পনের দিনের মধ্যে লিখলেন 'প্রথম পানিপথ'। ক্যালকাটা মিলন বীথি প্রযোজিত এই পালায় প্রসাদবাবু রাজপুত পুর নারীদের দিয়ে প্রথম দেশাত্মবোধক গণের গান গাইয়েছিলেন। ব্যালে নাচ ছিল। অসাধারণ জনপ্রিয়তা এবং প্রতিষ্ঠা এল এই নাটকে। এরপর একের পর এক লিখলেন 'রিক্তা নদীর ধারে', 'বাঁশের কেল্লা', 'রিক্‌সাওয়ালা' 'নাগরদোলা', 'রক্তমাখা প্রভাত', 'লাল রাজপথ, 'হেডমাষ্টার', 'রক্ত দিয়ে কিনলাম' 'সম্রাট স্কন্দগুপ্ত', 'রামায়ণের আগে', 'সূর্যতোরণ' প্রভৃতি।

ইনি, 'নটনারায়ণ' নামে একটি যাত্রা দল তৈরি করেছিলেন। এ দলের প্রথম পালা ছিল, 'মায়ের পায়ে রক্ত জবা'। নটসূর্য দিলীপ চ্যাটার্জী ও তাঁর পুত্রের গণনাট্য নিয়মিত ভাবে প্রসাদ ভট্টাচার্যের পালা আসরস্থ করত। 'বিশ্ববন্দিত বিবেকানন্দ' প্রসাদবাবুর এক অনবদ্য সৃষ্টি নব্বই দশকে।

॥ সত্যপ্রকাশ দত্ত ॥

বাংলাদেশের খুলনা জেলায় জন্মেছিলেন। বর্তমানে গোবরডাঙ্গার কাছে মসলন্দপুরে এক মনোরম পরিবেশে থেকে নাট্যকার জীবনের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর, সাংসারিক অনটন থেকে পরিবারের সকলকে সামান্য হলেও বাঁচাবার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রথম অভিনেতা হিসেবে যাত্রা দলে যোগ দেন। সেই জীবনের সঙ্গে শুরু করেন পালা রচনা। তারপর এক সময়ে অভিনয় জীবন থেকে সরে দাঁড়িয়ে শুধু পালাকার জীবনকে প্রতিষ্ঠা দিতে হন বদ্ধপরিকর। তাঁর প্রথম রচিত ঐতিহাসিক পালার নাম 'অগ্নিবাসর', যেটি ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়। বহু নতুন পালাকারের প্রতিভা জাগরণের মূলে যে তরুণ অপেরা, সেই তরুণ অপেরা প্রযোজিত, সত্যপ্রকাশবাবুর 'পঞ্চ নদীর তীরে' সত্যবাবুকে প্রতিষ্ঠা দেয়। খ্যাতি এনে দেয় জনতা অপেরা প্রযোজিত তামসী, অঙ্গার। এরপর তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। 'বঙ্গবন্ধু মুজিবর' তাঁর অনেক শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যে একটি। আজকের যাত্রা জগতের অনেক বিখ্যাত দলই সত্যবাবুর পালা প্রযোজনা করেছে। তার মধ্যে নট্ট কোম্পানি একটি শ্রেষ্ঠ নাম। সত্যপ্রকাশ আজও স্ব ক্ষেত্রে সমুজ্জ্বল। অতীত ও বর্তমানের সেতু বলতে যে ক'জন পালাকার আজও বিদ্যমান তার মধ্যে সত্যপ্রকাশ দত্ত একজন।

অভিনেতা হিসেবেও সত্যবাবু সে খুবই দক্ষ ছিলেন তার প্রমাণ এ দেশের যাত্রা আসরগুলিতে বার বার প্রমাণিত হয়েছে।

॥ বিধায়ক ভট্টাচার্য ॥

মধু সংলাপী বলতে যে সাহিত্যিক-চিত্রনাট্যকার-নাট্যকারের নাম স্পষ্ট হয়ে যায়, তিনি বিধায়ক ভট্টাচার্য। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ এবং চলচ্চিত্রের এই স্বনামধন্য নাট্যকারের পালা রচনারও খ্যাতি ছিল যথেষ্ট। নবরঞ্জন অপেরার 'মাইকেল', এক স্মরণীয় সৃষ্টি। এই পালার নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে স্বপনকুমার আজও 'মাইকেল' হিসেবে সকলের মনে উজ্জ্বল। তা ছাড়া এই সংস্থার জন্য বিধায়কবাবু রচনা করেন "রাষ্ট্র বিপ্লব"। নিউ আর্য অপেরা প্রযোজনা করে বিধায়কবাবুর 'ভক্ত ভৈরব', 'গিরীশচন্দ্র' ইত্যাদি।

১৯৬৭ সালে মাইকেল, ভক্ত ভৈরব, গিরীশচন্দ্র, ১৯৬৮ সালে রাষ্ট্রবিপ্লব যাত্রা জগতে নতুন মাত্রার পালা হিসেবে চিহ্নিত হয়।

লোকনাট্য প্রযোজিত বিধায়কবাবুর 'বিদ্যাসুন্দর' ১৯৭২ সালে সাড়া ফেলেছিল। এই সর্বজন শ্রদ্ধেয় নাট্যকার ও চিত্রনাট্যকারের সৃজন ধর্মী কর্মকাণ্ডের অনেক পর্যালোচনা ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়।

॥ উৎপল দত্ত ॥

এ দেশের নাট্য ক্ষেত্রে উৎপল দত্তের অবদান প্রসঙ্গে বিশেষ পর্যালোচনা এ ক্ষেত্রে অনিবার্য। এমন কি যাত্রা ক্ষেত্রে শ্রীদত্তের অবদান এবং যাত্রা প্রসঙ্গে তাঁর চিরন্তন প্রীতি প্রসঙ্গে আলোকপাত অবশ্যই প্রয়োজন বলে মনে করি। 'অপেরা' প্রসঙ্গে উৎপলবাবুর জ্ঞান এবং নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা বহু যুগ ধরেই চলে আসছিল। উৎপলবাবুর নাট্যভাবনার মধ্যে শ্রেণীভাগ এবং উৎপলীয় চেতনার মৌলিকত্ব কত বিশাল সে প্রসঙ্গে অনেক বিতর্কের নজির ছড়ানো থাকলেও, এ কথা স্বীকার করতেই হয়, অভিনয়াংশে উৎপলীয় চেতনার মৌলিকত্ব বিশেষ ভাবে চিহ্নিত। বিশেষ করে যাত্রা ক্ষেত্রে উৎপলবাবুর স্ফুলিং বা অভিনয় ধারা, সমকাল যাত্রার উপস্থাপনা ও প্রয়োগরীতি এক নব চেতনাতরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল। সরাসরি পেশাদার যাত্রা জগতে শ্রীদত্তের আত্মপ্রকাশের এক নতুন মাত্রা যোগে আজকের যাত্রা হয়েছিল বিশেষভাবে উপকৃত ও সমৃদ্ধ।

১৯৬৮ সালে উৎপলবাবুর 'রাইফেল', '৬৯-এ 'জালিয়ানওয়ালাবাগ, '৭০ সালে 'নীল রক্ত' প্রযোজনা করে যথাক্রমে আর্য অপেরা, সত্যম্বর অপেরা এবং ভারতী অপেরা। শ্রেণী সচেতন লেখক, খেটে খাওয়া মানুষের লেখক, অর্থে-সম্পদে-খ্যাতিতে স্মরণীয় লেখক, লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা, নির্দেশক 'রাইফেল'-এ পঞ্চু সেনকে মনের মধ্যে রেখে সৃষ্টি করলেন রহমৎ আলি নামে একটি চরিত্র। রহমৎ আলি কৃষক নেতা। বিপ্লবী। বিশেষ চরিত্র সৃষ্টিতে, বিশেষ করে এই ধরনের চরিত্র সৃষ্টিতে দক্ষ, শ্রীদত্তের মতই পঞ্চু সেন। সুতরাং দুই শক্তির মহামিলনে যাত্রা জগতে এক স্মরণীয় অধ্যায় তৈরি হলো! আর্য অপেরায় পালাকার ও নির্দেশক হিসেবে উৎপলবাবুর প্রথম আত্মপ্রকাশ, সুতরাং কিছু অভিজ্ঞতা তো লাভ হবেই। সেই অভিজ্ঞতার কথা উৎপলবাবুর স্ত্রী, উৎপলবাবুর গাইড এণ্ড ফিল্‌সফার, উচ্চাঙ্গের অভিনেত্রী শোভা সেনের রচনা থেকে তুলে ধরছি ঃ

"প্রথম দিনের অভিনয়ের কথা মনে আছে। চারিদিকে বিশৃংখলতা চূড়ান্ত। একা পঞ্চু সেন মূলধন। আর কিছুর দরকার নেই। আমরা এ ধরনের কাজ করতে অভ্যস্ত নই। পোশাক-আশাক, প্রায় কিছুই ঠিক মত হয়নি। কোনো টাকাই খরচ না করে কি ভাবে পালা নামানো যায় তার আপ্রাণ প্রয়াস। সকালে ষ্টেজ রিহার্সেলের সময় এ নিয়ে গোলমাল হয় আর উৎপল বাড়ি চলে আসে। সন্ধ্যে বেলা যাবার কোনো উৎসাহই সে পাচ্ছে না। আমাদের দলে পরিচালকের প্রতিটি নির্দেশ

অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়। এ কোথায় এসে পড়লাম রে বাবা! বৃটিশ অফিসার, থানার সেপাই কারুরই পোশাক, জুতো কিছুই তো মিলছে না! যাক্ কোনো রকমে জোড়াতালি দিয়ে তো নাটক শুরু হোল। উৎপলকেও অনেক বুঝিয়ে নিয়ে গেলাম।

খানিকক্ষণ দেখার পর নাটক জমতে শুরু করলো। দর্শক সবাক বিস্ময়ে দেখছে। যাত্রা সম্রাট যেন আস্তে আস্তে যাত্রার জাদুকর বনে গেলেন। সত্যিই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম রহমতের ভূমিকা দেখে। পুরো নাটকে পরিচালকের কৃতিত্বটুকু আছে নিশ্চয় আর আছে পঞ্চু সেনের অপূর্ব অভিনয়। জমে গেল নাটক।"

এরপর শৈলেন মোহান্ত প্রযোজিত, সত্যম্বর অপেরা পরিবেশিত, উৎপলবাবুর দ্বিতীয় পালা 'জালিয়ানওয়ালাবাগ"-এর অভিজ্ঞতার কথাও শোভাদেবীর লেখা থেকে তুলে ধরছি...

"পালা নির্বাচিত হোল "জালিয়ানওয়ালা-বাগ।" উৎপলের শুরু হোল পড়া। প্রতিটি নাটক লেখার আগের প্রস্তুতি পর্বই হচ্ছে আসল। প্রচুর বই পড়া, লাইব্রেরী যাওয়া ইত্যাদি কাজে তখন মানুষটা ডুবে থাকে। লিখতে লাগল পনেরো ষোল দিন। নাটক পড়া হোল সকলের সামনে। প্রত্যেকে এক বাক্যে ভূয়সী প্রশংসা করলেন। এই নাটকেই আমরা নতুন সংগীত প্রতিভা, প্রশান্ত ভট্টাচার্যের সংস্পর্শে আসি। সত্যিই ছেলেটির ক্ষমতা অসীম। কি অপূর্ব সুরই না দিয়েছিল।

একটা পার্থক্য উপলব্ধি করেছিলাম এখানে। নিউ আর্য অপেরায় ছিলেন একা পঞ্চু সেন। তার পরের শিল্পীদের মান ছিল অনেক নিচুতে। এখানে কিন্তু তা নয়। অনেক ভাল শিল্পীরাই ছিলেন। ভোলা পালের অপূর্ব বাচনভঙ্গী, রাখালের কণ্ঠস্বর, জয়শ্রী ও শিবদাসের অভিনয় প্রতিভা, মাখন সমাদ্দারের হাসাবার ক্ষমতা সত্যিই প্রশংসানীয়ই। উৎপলও এতগুলি ভাল শিল্পী পেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে নাটক পরিচালনা করতে লাগল।

কিন্তু এখানেও শৈলেনবাবু অন্য সব কিছু পরিচালকের চাহিদা অনুযায়ী জোগালেন, শুধু পোশাকের বেলায় কিছু ত্রুটি রয়ে গেল। গতানুগতিক নিয়মেই এতদিন চলে এসেছে। যেমন, সাহেব হলেই লাল পোশাক হবে এই ছিল ধারণা। অথচ যাত্রায় দৃশ্যসজ্জা নেই, আলোর খেলা নেই। মূলধন শুধু কয়েকটা অভিনেতার অভিনয় আর পোশাক। সেই পোশাক যদি একটু যত্ন করে ইতিহাসকে অনুসরণ করে তৈরি করা যায় তবে কত সুন্দরই না হয়। যাক্, শেষ মুহূর্তে তাড়াহুড়ো করে কোন রকমে মিনার্ভায় প্রথম অভিনয় হোলো। মেয়েদের পোশাকই গায়ে ঠিক লাগেনি, তাছাড়া মোটামুটি ঠিকই ছিল।"

এরপর '৭০ সালেই উৎপলবাবু ভারতী অপেরার 'নীল রক্তের' সঙ্গে লিখলেন লোকনাট্যের জন্য 'দিল্লী চলো'। ১৯৭১ সালে অত্যন্ত দাপটের প্রযোজক, লোকনাট্যের মালিক নীলমণি দে'র অনুরোধে উৎপলবাবু একমাত্র এই দলেরই জন্য লিখলেন দুটি পালা। 'জয় বাংলা' ও 'সমুদ্র শাসন'। ১৯৭২ সালে লিখলেন 'সন্ন্যাসীর তরবারি', ১৯৭৩ সালে 'ঝড়'। পালাগুলি লোকনাট্যের প্রযোজনা। 'ঝড়' ছিল 'ডিরোজিও'র জীবন ও কর্ম নিয়ে লেখা। এরপর আরও অনেক পালাই রচনা করেছিলেন তিনি। রচনা করেছিলেন নীরু নাগের গণবাণীতে 'সাদা পোশাক', কালীপদ ঘোষের ভারতী অপেরার জন্যে 'স্বাধীনতার ফাঁকি'। আরও অনেক।

আমেরিকার নাট্যবিষয়ক পত্রিকায় বঙ্গদেশের "জুড়ী গান" প্রসঙ্গে লিখেছিলেন উৎপলবাবু। তার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল "অভিনয়", ১৯৭৩ সালের নভেঃ-ডিসেম্বর সংখ্যায়। উৎপলবাবু যদিও যাত্রা পালায় ক্যাবারে, ডিস্কোর আমদানি চাননি, নিজেও এ সবে বিশ্বাসী ছিলেন না, কিন্তু যে সময়ে যে দলে তাঁর পালা আসরস্থ হয়েছে, দেখা গেছে সেই দলে অন্য পালায় ক্যাবারে অথবা ডিস্কো এসেছে। উৎপলবাবু তার প্রতিবাদ যেমন করেন নি, তেমনি নিজের কাজটুকু ছাড়া যাত্রার

সার্বিক কল্যাণের ব্যাপারটা নিয়েও ভাবেননি। এ প্রসঙ্গে নারায়ণ চৌধুরী পরিস্কার করে অনেক কথা বলেছেন তাঁরই সম্পাদিত "সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি" পুস্তকে।

শ্রী দত্ত'র আত্মপ্রকাশের সময়ে গ্রুপ থিয়েটার এবং পাড়ার সৌখিন ক্লাব থেকে অনেক শিক্ষিত-মার্জিত অভিনেতা-অভিনেত্রী যেমন এসেছিলেন, তেমনি যাত্রা জগতের অনেক শক্তিমান শিল্পীরাও ছিলেন। এঁরা অনেকেই উৎপলবাবুর কাছে নতুন করে তালিম নিয়ে অভিনয় প্রসঙ্গে একটা আদর্শগত, একটা ভাব ও চেতনাগত অভিনয় ধারায় নিজেদের আরও পাকা করে তোলার সুযোগ পেলেন।

যাত্রাপালায় বিশেষ করে ঐতিহাসিক পালায় যে চরিত্র বা বিষয় উৎপলবাবু আনলেন, সেখানে সস্তা সেন্টিমেন্ট আর ইতিহাস বিকৃত করে মোটা দাগের চরিত্র সৃষ্টিকে সমূলে নিধন করলেন। উৎপলবাবু পালা লেখার পর সেই পালা সমস্ত শিল্পীদের বসিয়ে শোনাতেন। যাত্রায় যা বর্তমানে কোন পালাকারই সে সুযোগ পান না। পেতে চান না। যে দিন থেকে উৎপল দত্ত যাত্রা থেকে কলম তুলে নিয়েছিলেন ঠিক সেদিন থেকে যাত্রা ফিরে গেছে তার ধারায়। উৎপলবাবুর যাত্রা পাড়ায় শ্রেষ্ঠ অবদান হলো, তাঁর হাতে গড়া কয়েকজন আজ যাত্রা জগতে পালাকার, নির্দেশক, অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

॥ শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

প্রখ্যাত ব্যবসায়ী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯০৭ সালে। উত্তর কলকাতার টাউন স্কুলে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়ে বাবার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হন। বাবার মৃত্যুর পর ব্যবসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে হয় তাঁকে। এরই মধ্যে পাড়ার একাধিক সৌখিন দলে অভিনয় করেন। ২০। ২২ বছর বয়সে আসেন পেশাদার যাত্রায়। ১৯২৮ সালের শেষ দিকে প্রথমে যুক্ত হন মথুর সাহার দলে ; তারপর আর্য অপেরা এবং ভাণ্ডারী অপেরায়। মথুরানাথ সাহার দলে অভিনেতা হিসেবে যোগ দেন, ভাণ্ডারী অপেরায় এসে অভিনয়ের সঙ্গে নাট্য রচনা শুরু করেন।

ভাণ্ডারীর পর শশাঙ্কবাবু আসেন সত্যম্বর অপেরায়। প্রায় ছয়-সাত বছর সত্যম্বরে অভিনয় করেছেন এবং এ দলের প্রায় সব পালাই তাঁর লেখা। সত্যম্বরের পর নিজেই তৈরি করেন নাট্যভারতী। শশাঙ্কবাবুর বহু পালার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'নবাব সিরাজদ্দৌলা', 'রাজা সীতারাম', 'শক্তিপূজা', 'অসবর্ণা', 'দক্ষযজ্ঞ', 'পলাশীর প্রয়াশ্চিত্ত', 'মীরকাশেমের স্বপ্ন', 'ব্রহ্মবাণ', 'প্রেত মানব', 'ক্ষুদিরাম', 'উদয় আলো'।

শশাঙ্কবাবুর ক্ষুদিরাম রঙমহল রঙ্গমঞ্চে নিয়মিত অভিনীত হতো। ১৯৬৮ সালের ৫ অকটোবর সন্ধ্যায় ধানবাদে মারা যান শশাঙ্কশেখর।

॥ ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

প্রয়াত গোকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কুন্তলাদেবীর ছেলে, প্রখ্যাত নাট্যকার ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯১৭ সালের ৩০ নভেম্বর, কলকাতায়। কেশব এ্যাকাডেমি থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে, সিটি কলেজ ও যাদবপুর কলেজ আর ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড টেকনোলজিতে পড়াশোনা করেন। কিন্তু ভাগ্য ও ইচ্ছা তাঁকে নিয়ে আসে থিয়েটারে। ১৯৪৪ সালে রঙমহলে তাঁরই লেখা গীতিনাট্য "শেষ বসন্ত" অভিনীত হয়। পরিচালনা ও প্রধান ভূমিকায় ছিলেন স্বয়ং ছবিবাবু। এরপর রঙমহল, মিনার্ভা, ষ্টার, রঙ্গনা, মুক্ত অঙ্গনে ছবিবাবুর নাটক অভিনীত হয়। ১৯৫২ সালে মিনার্ভা থিয়েটারে তাঁর "কেরাণীর জীবন" আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই কাহিনী ১৯৫৩ সালে মুভি টেকনিক সোসাইটি লিঃ কর্তৃক চিত্রায়িত হয়। বেতার কেন্দ্র থেকে "কেরাণীর জীবন" নাটকটিই 'কেরাণীর সংসার' নামে প্রচারিত হয়। বাংলাদেশের স্বনামধন্য অভিনেতাদের অনেকেই এই নাটকে কেরাণীর চরিত্রে রূপদান করেন। এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত পাঠ্য হিসেবে চিহ্নিত। ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চোর'

নাটকটিও রঙ্গমঞ্চের জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই 'চোর' পরে 'বাবুয়া' নামে চিত্রায়িত হয়।

'চোর' নাটকটি 'সুইডেনে' অভিনীত হয়েছিল। মুচি, স্ট্রীট বেগার, জেলে ডিঙ্গি ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু কর্তৃক লিখিত ভাবে প্রশংসিত হয়। 'ওমর খৈয়াম', 'কলকাতার মেয়ে', 'বিশালাক্ষীর মন্দির' (ঐতিহাসিক), নবাব আলিবর্দ্দী, বঙ্গবন্ধুর ডাক, শততম রজনী, প্রতুলের বিয়ে (সমরেশ বসুর কাহিনীর নাট্যরূপ) ছবিবাবুর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। 'জেলে ডিঙ্গি' নাটকে তখনকার নবাগত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নায়ক হয়েছিলেন। নির্দেশক ছিলেন স্বয়ং ছবিবাবু।

ছবিবাবুর যাত্রা নাটক 'ফুটপাথ', 'জ্বলন্ত বারুদ', 'সিরাজের কান্না', নিউ প্রভাস অপেরা প্রযোজনা করে। নিউ রয়েলে অভিনীত হয় 'সিঁদুর রাঙ্গা মেয়ে'। শ্রদ্ধাঞ্জলি অপেরার গৌরমোহন ঘোষ প্রযোজনা করেন 'পূজারিণীর প্রেম'। নির্দেশক ছিলেন ছবিবাবু স্বয়ং। ১৯৩৮ সালে ছবিবাবুর গানের বই "গানের বলাকা" প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে দু'লাইন কবিতা লিখে দিয়ে লেখকের প্রতি গভীর আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন। এই লেখকের দু'টি কৌতুকী 'এপ্রিল ফুল' ও 'কামড়ে দেবে' রেকর্ড প্রকাশিত হয়। কাজী নজরুল ইসলাম তখন এইচ. এম. ভি'র কর্ণধার ছিলেন। ছবিবাবুর অভিনয় শিক্ষাগুরু শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

॥ অমর ঘোষ ॥

নট, নাট্যকার, নির্দেশক এবং মঞ্চের প্রয়োগবিদ ও মঞ্চ স্থপতি অমর ঘোষের জন্ম ১৯২৩ সালের ২৭ মার্চ উড়িষ্যার পুরী শহরে। কর্মজীবনে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়াপত্তনের দিন থেকে এক টানা ৩৩ বছর মঞ্চ বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে কাজ করে বর্তমানে অবসর নিয়েছেন। বাংলা যাত্রার আধুনিকীকরণের পথিকৃৎ হিসেবে শ্রীঘোষ নাট্য ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন। যাত্রার আসরে প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য দু'টি আলাদা পথের প্রবর্তনা, যাত্রার অডিটোরিয়ামের আলো নিভিয়ে কাজ করা, যাত্রায় যথার্থ বিরতির জন্য কয়েক মিনিট যাত্রা বন্ধ রাখা, টেপ রেকর্ড ব্যবহার, আসরে রস্টাম ব্যবহার, আসরে অতীতে পোশাকের বাক্সের ওপরে চাদর চাপা দিয়ে প্রয়োজনে যে আসন তৈরি হতো তার পরিবর্তে আঙ্গিক হিসেবে চেয়ার ব্যবহার, ঘুরে ঘুরে যাত্রা করার যুগ থেকে কম্পোজিশনের মাধ্যমে অভিনয়ের রীতি প্রবর্তন অমর ঘোষের স্মরণীয় অবদান। যাত্রাপালার নির্দেশক হিসেবে তাঁর স্মরণীয় সৃষ্টি রমলা সাকার্স, ওয়ারেন হেস্টিংস, আমি সুভাষ, এবার তদন্তের পালা, ওথেলো, হ্যামলেট, জয় মা তারা, রাণী শিরোমণি, তিন কন্যা ইত্যাদি।

শ্রীঘোষ রচিত এবং পরিচালিত ও সারকারিণায় উপস্থাপিত "তুষার যুগ আসছে" ভারতে পেশাদারী মঞ্চে নিয়মিত এরিণা অভিনয়ের পথ দেখায়। মঞ্চের নেপথ্য বিজ্ঞানের ওপরে লেখা "পট দীপ ধ্বনি" এবং সহজে কীভাবে আলোক সম্পাত করা যায় তার উপরে শ্রী ঘোষের লেখা "আলোকন" প্রশংসিত গ্রন্থ। রাজ্যের সংগীত নাটক অকাদেমী, সিনে এ্যাডভান্স, থিয়েটার সেণ্টার, দিশারী, উত্তমকুমার, প্রমথেশ বড়ুয়া, ঋত্বিক ঘটক ইত্যাদি পুরস্কারে সম্মানিত হন।

বর্তমানে সম্পূর্ণ নতুন অথচ শক্তিধর বহু ছেলে মেয়েদের তৈরি করে, সারকারিণা মঞ্চে "মমি" নাটক মঞ্চস্থ করে পেশাদারী থিয়েটারের তথাকথিত প্রথা ভেঙেছেন। বহু শিল্পী ও কর্মীদের গড়েছেন যেমন, তেমনি আজকের শান্তিগোপালও শ্রীঘোষের তৈরি বলা যেতে পারেই।

॥ শান্তিরঞ্জন দে ॥

নাট্যকার হিসাবে শান্তিরঞ্জন দে'র নাম আজ যাত্রা পাড়ায় সুপরিচিত। ১৩৩৪ সনে যদুনাথ দে'র ছেলে শান্তিরঞ্জন-এর জন্ম কলকাতায়। তাঁর প্রথম পালার নাম 'ভারত মিলন'। এরপর তিনি যাত্রাপাড়ায় যুক্ত হন শ্রীমা নাট্য কোম্পানিতে প্রথম পেশাদার পালাকার হয়ে। পেশাদার যাত্রায়

শান্তিবাবুর প্রথম পালা 'ওমর খৈয়াম'। শান্তিবাবুর কয়েকটি বিশেষ পালা হলো, 'রাজা', 'নূরজাহান', 'রাক্ষসী পদ্মা', 'টাকা আনা পাই', 'নেতাজী সুভাষ বসু', 'প্রেম পুজারী' ইত্যাদি।

শান্তিবাবুর ঐতিহাসিক পালা 'গঙ্গা থেকে বুড়ি গঙ্গা' নট্ট কোম্পানি আসরস্থ করে। নাট্যভারতী, ভোলানাথ অপেরা প্রযোজনা করে যথাক্রমে মাতৃপূজা, নরকাসুর। 'মেঘনা নদীর তীরে' শান্তিবাবুর আর একটি অসামান্য পালাকীর্তি। সহকারী চিত্র পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন। পালাকার জীবনের মধ্যেও তিনি প্রাচী সিনেমার গা লাগোয়া, ইস্টার্ণ টকীজ বিল্ডিং-এ বি. পি. প্রোডাকসনে চাকরি করতেন।

॥ শম্ভু বাগ ॥

প্রখ্যাত নাট্যকার শম্ভু বাগের জন্ম ১৯৪৯ সালের ১৭ জুলাই বর্ধমান জেলার অখ্যাত গ্রাম কারকবেড়িয়ায়। শৈশব থেকে দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করেই নিজেকে খাঁটি করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন শম্ভু। লেখাপড়ায় ভালই ছিলেন শম্ভু বাগ, তাই কলেজে ছাত্র এবং বেয়ারা দুটি চরিত্র নিয়েই লেখাপড়া চালিয়ে বি. এ. পাশ করে বি.টি পড়েছেন।

সামান্য একটা খড়ের ঘর ছাড়া শম্ভু বাগদের কিছুই ছিল না, তাই সংসারের এই অনটনই তাঁকে নাট্য রচনায় অনুপ্রাণিত করে। তাঁর প্রথম নাটক রচিত হয় ১৯৬০ সালে। নাম—'দুঃখে যাদের জীবন গড়া'।

এরপর ১৯৬৬ সালে তিনি 'যাত্রাজগৎ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। পাশাপাশি নাট্য রচনাও চলতে থাকে তাঁর। ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত 'ঘুম ভাঙ্গার গান' পালা লেখার পর পালাটি প্রথমে বর্ধমান নবনাট্য আন্দোলন গ্রুপ মঞ্চস্থ করে, তারপরই তিনি তরুণ অপেরায় এই পালার মাধ্যমে পেশাদারি পালাকার হিসেবে যুক্ত হন। গণজাগরণ মূলক, শোষণবাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ সূচক এই পালা প্রথমেই শম্ভু বাগকে প্রতিষ্ঠা এনে দেয়! আসলে এক নতুন যুগ সন্ধিক্ষণে মানুষের হৃদয়ের নাটক এটি। এই পালার সংগ্রামী-বিদ্রোহী চরিত্র ধীরাজের মুখ দিয়ে একাধিক রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তি করিয়েছিলেন শম্ভুবাবু। রবীন্দ্র কবিতার আবৃত্তি যাত্রার চরিত্রের মুখে এই প্রথম ধ্বনিত হয়। এরপর তরুণ অপেরার 'হিটলার' শম্ভুবাবুর স্মরণীয় কীর্তি। এই পালার প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা হলেন তরুণ অপেরার কর্ণধার-নায়ক শান্তিগোপাল। এই পালায় টেপ রেকর্ডারে শব্দ নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার, অর্থাৎ আধুনিক নাট্য উপস্থাপনায় যাত্রার আসরে এই পালা এক বিপ্লব, যার মূলে নাট্যক্ষেত্রের অন্যতম ব্যক্তিত্ব, সারকারিণা থিয়েটারের স্রষ্টা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য বিভাগীয় প্রশিক্ষক, পশ্চিমবঙ্গের এবং অন্য প্রদেশের একাধিক 'থিয়েটার'-এর আধুনিক রূপকার অমর ঘোষ। শম্ভু বাগের 'লেনিন' সামগ্রিকভাবে 'সোভিয়েত দেশ নেহেরু পুরস্কার' জয় করে, বিশ্বের দরবারে বাংলা যাত্রার গৌরব প্রতিষ্ঠিত করে। এ ছাড়া 'মহেঞ্জদড়ো' এবং আরও অনেক পালার এই পালাকার ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন।

এরপর শম্ভু বাগের ডাক আসতে থাকে বিভিন্ন নাট্য সংস্থা থেকে। লোকনাট্য সংস্থার 'রক্তাক্ত আফ্রিকা', ক্যালকাটা নাট্যবীথি অপেরার 'কাঞ্চী কাবেরী' নাটকও তাঁরই লেখা। নানা দিক থেকে উচ্চসম্মানে সম্মানিত শম্ভু বাগ কিন্তু আজকের যাত্রা জগতের অন্যতম ব্যস্ত নাট্যকারদের সঙ্গে ছুটে চলতে পারেননি!

॥ ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় ॥

১৩৪১ সালে বর্ধমান জেলার মুলা গ্রামে অ মৃতলাল গাঙ্গুলীর ছেলে ভৈরব গাঙ্গুলীর জন্ম অতি সাধারণ, দরিদ্র পরিবারে। দাদা প্রফুল্ল গাঙ্গুলী ছিলেন সাহিত্য রসিক, সেই সূত্রেই বোধকরি ভৈরব ছেলেবেলা থেকেই সাহিত্যে অনুরাগী ছিলেন।

হাইস্কুল বা কলেজের বিদ্যা ভৈরববাবুর নেই, কিন্তু যখন তিনি মাত্র তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীর

ছাত্র তখনই সেই বালক বয়সেই কবিতা-গল্প লেখার প্রতি ঝোঁক ছিল। সংসারের চরম দারিদ্র্যই ভৈরববাবুর লেখাপড়ার অন্তরায় ছিল। অল্প বয়স থেকেই ভৈরব অর্থ রোজগারে নেমে পড়েন। কিন্তু প্রতিভা বলে ভৈরব যৌবনের প্রথম সন্ধিক্ষণেই নাট্যকার হিসেবে নিজের অঞ্চলে অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এক সময়ে কিছু পাণ্ডুলিপি নিয়ে সোজা চলে আসেন যাত্রা পাড়ায়। গ্রামে যাত্রা চর্চা ছিল যথেষ্ট, তা ছাড়া পেশাদার যাত্রা দলের অভিনয় হতো অনেক। সেই পালা দেখে-দেখে পালাকার হবার পথ রচনা করেন তিনি। যাত্রাপাড়ায় ঘুরে ঘুরে যখন তিনি ক্লান্ত, সেই সময় তরুণ অপেরা ভৈরববাবুকে প্রথম সুযোগ দেন। তাঁর প্রথম পালা 'চুয়াচন্দন' ১৯৬৩ সালে প্রথম অভিনীত হয়। পারিশ্রমিক ভাগ্যে জোটেনি বলা চলে। এর পরের বছর শ্রীমা নাট্য কোম্পানির 'নাচমহল' পালা লিখে ভৈরব সামান্য পরিচিতি পান। এরপর সত্যম্বর অপেরার কর্ণধার শৈলেন মোহান্ত এই নবাগতকে চিৎপুরের গদিঘরে থাকার সুযোগ দেন এবং এই দলের জন্য লেখেন 'একটি পয়সা' পালা। এই পালাতেই ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় পান প্রশংসা এবং অনেকটাই প্রতিষ্ঠা।

১৯৬৬ সালে সত্যম্বর অপেরা আর প্রভাস অপেরার জন্য ভৈরববাবু লেখেন যথাক্রমে 'পদধ্বনি' আর 'রক্তে রোয়া ধান'। মূলত গৌর দাস, মোহিত বিশ্বাস এবং তিনকড়ি গুছাইতের আন্তরিক সহযোগিতায় ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় অতি দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকেন। ১৯৭০ সালে নিউ প্রভাস অপেরা প্রযোজিত 'নিহত গোলাপ', লোকনাট্য প্রযোজিত 'পাঁচ পয়সার পৃথিবী' ভৈরববাবুকে অনেকটাই প্রতিষ্ঠ দেয়। '৭০-এর দশকে যে ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় দু'টি পালা রচনা করে প্রতিষ্ঠা পাবার ইংগিত পান, '৯০-এর দশকে সেই পালাকার প্রায় আট-থেকে ন'টি পালার জনক হিসেবে ওঠেন শিখরে। সেই সঙ্গে বিশেষ কয়েকটি বড় দলের জন্য স্বরচিত পালার নির্দেশনার সঙ্গে সুর রচনারও দায়িত্ব পালন করছেন। পাওনার অতিরিক্ত পারিশ্রমিক পালাকাররা বর্তমানে যা পাচ্ছেন, বলা যেতে পারে ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় তার পথিকৃত। '৮০-র দশক থেকেই পালাকার ভৈরব যাত্রাপাড়ার একমাত্র শিরোমণি। এর মূলে তাঁর একের পর এক পালার চরম ব্যবসায়িক সাফল্য! এই সাফল্যই তাঁকে মরশুমে প্রায় ডজন খানেক পালা লেখা এবং একাধিক পালার নির্দেশনার দায়িত্বভার নেবার দুঃসাহসের জন্ম দেয়। যে কয়েকটি অবদানের জন্য পালাকার ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় ইতিহাসে বেঁচে থাকবেন, তার সংক্ষিপ্ত তালিকা এই রকম ঃ (ক) একটি পালা লিখে তিনি যা পারিশ্রমিক পান, বোধ করি প্রাতঃস্মরণীয় কোন নাট্যকার, পালাকার বা কথা সাহিত্যিক তা কল্পনাও করেননি কখনো। (খ) টপ নায়ক-নায়িকার পরিবর্তে ভৈরববাবুর ছবি প্রভূত অর্থ খরচ করে প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন হিসেবে প্রকাশ করলে পালার বায়না হয়, এই দৃষ্টান্ত রাখতে পেরেছেন ভৈরব, যার প্রভাবে আরও দু'একজন পালাকারও তাঁদের পালা সাফল্য অর্জন করায় সেই একই সম্মান পেয়েছেন। (গ) ভৈরববাবুর পালায় দীর্ঘ সংলাপ জটিল সাহিত্যের বেড়াজাল সৃষ্টি করে গ্রামীণ দর্শকদের কাছে পাণ্ডিত্যের চমক হয়ে উঠতে পেরেছে। (ঘ) ভৈরববাবুর কোরিওগ্রাফ বা গ্রাঞ্জার দক্ষতারই নজির (ঙ) নিজের লেখা পালার বিষয়, চরিত্র এবং সংলাপ নিজেরই একাধিক পালায় স্পষ্ট হয়েছে বারবার। (চ) ভৈরববাবুর অধিকাংশ পালাই চরিত্র নির্ভর, বিষয় দানা বাঁধতে বা পরিণতিতে পৌঁছতে পারেনি। (ছ) পালাকার-নির্দেশক ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় সব্যসাচী হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কোন পালারই পূর্ণ পাণ্ডুলিপি যেমন কোন মালিকই পাননি মহড়ার আগে, তেমনই মালিক ও বৃহত্তম শিল্পীগোষ্ঠী প্রকাশ্যে কখনই ভৈরববাবুর সমালোচনা করেননি।

শিল্পী গোষ্ঠীরা যতই শক্তিশালী হোন, যতই ন্যায্য পাওনার অতিরিক্ত পারিশ্রমিক পান, ভৈরববাবুর মত দিকপাল পালাকার-নির্দেশকের দেওয়া পাঠ, দম দেওয়া পুতুলের মত, নিষ্ঠার সঙ্গে (নিজের কাজে কোন ফাঁকি না দিয়ে) সেই পাঠ বা চরিত্র, আসরে তুলে দেন। পালায় কোন

ত্রুটি পেলেও তাঁরা দিকপাল পালাকারের দৃষ্টি গোচর করেন না। এর মূলে এঁদের অনেকেরই একটা চাপা ভয় থাকে। তা হলো, দিকপাল পালাকার বা মালিক যদি বিন্দুমাত্র কারও প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তা হলে বাজারে করে খাওয়া মুস্কিল হতে পারে। সুতরাং আজকের যাত্রা ক্ষেত্রে ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় উল্লিখিত কারণগুলির জন্য দিকপাল পালাকার ও নির্দেশক।

পালাকার ও নির্দেশক হিসেবে চরম খ্যাতি অর্জনের পর অনেকের যেমন অনেক প্রতিভার স্ফূরণ ঘটে, তেমনি ভৈরববাবুও আশির দশকের শেষ ভাগ থেকে সুরকার হিসেবেও আলাদা আসন তৈরি করেছেন। ভৈরববাবু একাধিক শিল্পী তৈরি করেছেন, যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সুপ্রতিষ্ঠিত। ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম দিকের আরও কিছু বলিষ্ঠ পালার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, 'সাহারার কান্না', 'অশ্রু দিয়ে লেখা', 'কি পেলাম', 'কান্না ঘাম রক্ত' ইত্যাদি। যে পালাগুলির রচনা ও উপস্থাপনাগত মাধুর্যে ও শক্তিতে 'ভৈরববাবুর পালাকার জীবন স্বর্ণ খচিত', সেই পালাগুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হলো ঃ 'সম্রাট অন্ধকাসুর', 'তাজমহল', 'অজগর', 'পঙ্গপাল', 'ময়নামতীর মাঠ, পতিতার ভগবান, 'এক পয়সার মা', 'সাত টাকার সন্তান', 'পাঁচ কাঠার কিষানী', 'মা-মাটি মানুষ', 'পাল্কী চলে রে' ইত্যাদি ইত্যাদি। পালাকার ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় অনেক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যাত্রায়, তার মধ্যে তাঁর আত্মীয়া শ্রীমতী তৃপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়কে পালা রচনা, বিষয় ভাবনা, নির্দেশনায় সহযোগী করে তুলেছেন, যা যাত্রার পাঁচশত বছরের ইতিহাসে এক নতুন দৃষ্টান্ত। নিজের পুত্র মেঘদূত গঙ্গোপাধ্যায়কে যাত্রা পাড়ার পালাকার করতে চেষ্টার ত্রুটি করেননি। 'ভৈরব অপেরা' নামে একটি যাত্রাদল তৈরি করেছেন যা ইতিপূর্বে কোন কিংবদন্তীর পালাকাররা স্বপ্নেও ভাবেননি। পরবর্তী সময়ের শ্রী গাঙ্গুলী তাঁর অন্য আরও দুই পুত্র দেবদূত ও রাজদূত গঙ্গোপাধ্যায়কে গড়ে দিয়েছেন দুটি দল। 'যুগান্তর' আর 'আনন্দবাজার' দল দুটির নাম। সুর রচনায় দেবদূত পারদর্শী হতে পেরেছেন। 'পদধ্বনি' এবং 'কান্না-ঘাম-রক্ত' পালাকে বামপন্থী সাংবাদিক কল্পতরু সেনগুপ্ত 'প্রগতিবাদী পালা' বলেছেন। কংগ্রেস আমল থেকে বামপন্থী আমলে একাধিকবার সরকারি পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন ভৈরব। যাত্রার সার্বিক কল্যাণ, নানা সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে যখনই কোন দলগত ভাবে আন্দোলন হয়েছে, তখনই ভৈরববাবু নিজেকে তার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। ছেলেবেলা থেকে ভৈরব ভাল কবিতা লিখতেন, যার স্ফূরণ ঘটেনি।

॥ পূর্ণচন্দ্র দাস ॥

পালাকার পূর্ণচন্দ্র দাসের জন্ম কলকাতায় ১৩১০ সনে। ১৯৪০ সাল থেকে পূর্ণচন্দ্র পালাকার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। যদিও পৌরাণিক, ভক্তিমূলক, ঐতিহাসিক পালা পূর্ণচন্দ্র অনেক লিখেছেন, কিন্তু তাঁর সামাজিক পালাগুলিতে যেহেতু বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকের সামাজিক প্রেক্ষাপট স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, সেই হেতু তিনি সামাজিক পালায় খ্যাতি পেয়েছিলেন। পূর্ণবাবুর জনপ্রিয় পালাগুলি হলো ঃ

মাটির মায়া ঃ পাঁচ অঙ্কের ঐতিহাসিক পালা। রাণা রায়মল্লের ছেলে পৃথ্বীরাজ কর্তৃক চিতোরের সিংহাসন অধিকার এবং পাঠানদের কবল থেকে বন্দী তারাবাইক উদ্ধার করার কাহিনী। এতে সখীর নাচ সহ ষোলটি গান আছে।

সতীর সাধনা ঃ পাঁচ অঙ্কের পৌরাণিক পালা। সাবিত্রী-সত্যবান কাহিনী অবলম্বনে লেখা। পালাটি ক্যালকাটা অপেরায় অভিনীত হয় প্রথম। এতেও সখীর ব্যালের সঙ্গে পনের খানা গান ছিল। এই কাহিনীকে পূর্ণচন্দ্র নতুন ভাবনায় রূপান্তর করেন। পালার সুর ছিল, জাতিভেদ প্রথা নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। শৃঙ্খল মোচন ঃ পাঁচ অঙ্কের সামাজিক পালা। এই পালায় পালাকার তৎকালীন সমাজ চিত্র তুলে ধরেছিলেন। পটভূমিকা জমিদারি প্রথা। দুর্নীতি, চোরাকারবার, শ্রমিক-

মজদুর সমস্যা এবং সমস্যা সমাধানের জন্য বিদ্রোহের প্রয়োজন এমন মতবাদ পেশ করেছিলেন পালাকার। এতে হিন্দু মুসলমানের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেন।

স্বপ্ন সাধনা ঃ রঞ্জন অপেরায় অভিনীত, পাঁচ অঙ্কের এই দেশাত্মবোধক পালার বিষয় ছিল, নেতাজি সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের বৃটিশের বিরূদ্ধে যুদ্ধের পটভূমিকা। পনের-ষোলটি গান ছিল এই পালায়।

এ ছাড়া দক্ষ মঞ্চ সংক্রান্ত বিষয় নির্ভর 'ধ্বংসের দেবতা', রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডের কাহিনী অবলম্বনে লেখা 'নরদানব', 'চিতোর গৌরব', সম্রাট অশোকের অহিংসার ওপর ভিত্তি করে লেখা 'অহিংসা', কালকেতুর কাহিনী নিয়ে লেখা 'মা', কার্তিকের জন্ম ও স্বর্গ অবরোধকারী তারকাসুর বধের কাহিনী নিয়ে লেখা 'নবশক্তি' এবং 'অভিমন্যু' ইত্যাদি।

॥ সত্যব্রত মুখার্জী ॥

নোয়াখালির প্রখ্যাত কবি ˚মহিমাচরণ ত্রিবেদীর পৌত্র এবং স্বনামখ্যাত ˚যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ছেলে, প্রখ্যাত পালাকার ও কবি এই সত্যব্রত মুখার্জী। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর ছিল নাটকের নেশা। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সত্যব্রত সৌখিন থিয়েটারে অভিনয়ের সঙ্গে নাট্য রচনা শুরু করেন। তাঁর প্রথম পালা 'যাযাবর'। পেশাদার প্রখ্যাত দল গণেশ অপেরা পালাটি আসরস্থ করে। তাঁর খ্যাতি সুশীল নাট্য কোম্পানির 'রক্তে রাঙা হাঁসুলী ডাঙ্গা' পালা লিখে। এরপর আরও খ্যাতি পায় রূপশ্রী নাট্য কোম্পানিতে সতীদাহর পটভূমিকায় লেখা 'শেকল ছেঁড়ার গান'।

॥ গৌরচন্দ্র ভড় ॥

১৩২৪ সনে হুগলী জেলার ধনেখালির সোমেশপুরে এই পালাকারের জন্ম। গ্রামের প্রাথমিক স্কুলে পড়াশোনা করে তাঁতের কাজ শুরু করেন প্রথমে। ছেলেবেলা থেকে গ্রামীণ সখের দলের এবং বাইরে থেকে আসা দলের যাত্রা দেখে দেখে অবসর সময়ে পালা লেখার চেষ্টা করতে করতে এক সময়ে পালাকার হন। তিনি বেশির ভাগ ঐতিহাসিক পালা লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। মনের ভাব এবং সংলাপ তিনি কাগজে খুব ভালভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন, ইতিহাসকে বিকৃত করে পাণ্ডিত্য ফলাতে চাননি কখনো, তাই অতি অল্প সময়ের মধ্যে খ্যাতি পেয়েছিলেন। অত্যাচারী হুণ সম্রাট মিহিরকুলের সঙ্গে মালবরাজপুত্র যশোবর্ধনের সংগ্রাম বিষয় ভিত্তিক শ্রীভড়ের পালা 'কয়েদী'। এই পালায় সখীদের ব্যালে সহ প্রায় ১৯ খানা গান ছিল। পালাকার ভড়ের ঐতিহাসিক বনাম কাল্পনিক 'গরীবের মেয়ে', পৌরাণিক পালা 'মানুষের ঠাকুর', 'তাসের ঘর', 'অগ্নিসংস্কার', 'সোনার গাঁ', 'রাজতিলক', 'সাহেব বিবি গোলাম' ইত্যাদি পালা খ্যাতি পায়। ষাটের দশকে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প ব্যবসা ছিল তুঙ্গে, এবং এই সময়ে কিংবদন্তীর নায়ক উত্তমকুমারও মধ্যাহ্ন গগনের সূর্য। সেই উত্তমকুমার অভিনীত কিছু জনপ্রিয়তম ছবির নাম এই পালাকারকে প্রভাবিত করেছিল।

॥ অনিলাভ চট্টোপাধ্যায় ॥

১৯২৫ সালে পাটনায় জন্ম। তাঁর পৈত্রিক ভিটে, ২৪ পরগণা জেলার রাজারহাট-কাশীপুর। অনিলাভ চট্টোপাধ্যায় প্রথম দিকে চিত্র ও মঞ্চ সাংবাদিকতা করতেন। তাঁর সম্পাদিত 'রঙ্গালয়' নামে একটি পত্রিকা ছিল। 'রঘু ডাকাত' তাঁর প্রথম লেখা যাত্রাপালা। পেশাদার দলের প্রথম পালা 'দস্যু কন্যা'। পালাটি নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা পরিবেশন করে। মগ কর্তৃক মণিপুর আক্রমণের কাহিনী অবলম্বনে লেখা। 'প্রিজনার্স অব জেন্দা'র ছায়া অবলম্বনে 'সিংহগড়', 'নটীর প্রেম', উড়িয়া গ্রন্থ কাঞ্চি-কাবেরী অবলম্বনে 'মানুষের ভগবান' ইত্যাদি পালাকারের জনপ্রিয় পালা। অনিলাভবাবু মৃত্যুর পূর্বে জনপ্রিয় 'উল্টোরথ' পত্রিকায় নিয়মিত যাতায়াত করতেন। ১৯৬৬ সালে আকস্মিকভাবে তাঁর মৃত্যু হয়।

॥ কানাইলাল নাথ ॥

১৯২৮ সালে ২৪ পরগণার বনগাঁর পূর্বপাড়ায় পালাকার কানাইলাল নাথের জন্ম। শুধু পালাকার হিসেবে নয়, নানাবিধ সামাজিক কল্যাণমূলক, সাংগঠনিক কাজ ইত্যাদির জন্য কানাইবাবু অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাঁর সাজানো সংসারে সর্ব দিক থেকেই সুখ বিরাজমান। ছেলেরা সুপ্রতিষ্ঠিত। আর এই সবের মূলে ছিল কানাইবাবুর অকল্পনীয় সংগ্রাম। ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়ে তাঁকে কর্মজীবনে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। মাত্র ১৬ বছর বয়সে সাধারণ এক চাকুরে কানাই বেছে নেন এক গৌরবের পথ। হতে চান সাহিত্যের কারবারি। এক সময় স্ত্রীভূমিকা বর্জিত একটা হাসির নাটিকা লিখে ফেলেন। নাম রাখেন 'ভূতুড়ে কাণ্ড'। এরপর তাঁর সাহস বাড়ল। এবার লিখলেন পূর্ণাঙ্গ যাত্রাপালা 'আত্মদান'। পালাটি সানন্দে আসরস্থ করেছিল 'বনগ্রাম বান্ধব নাট্য সমাজ'। পালাটি প্রশংসা পেল। কানাইবাবু এবার ষোল আনা আত্মনিয়োগ করলেন পালা সাহিত্য সাধনায়। প্রথম দিকে ঐতিহাসিক পালায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার নেপথ্যে ছিল, ঐতিহাসিক বিষয়ের সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণের অসামান্য দক্ষতা। এই খ্যাতিলাভের আর একটা কারণ ছিল, চূড়ান্ত চাহিদা থাকা সত্ত্বেও একটি মরশুমে অর্থের লোভে বহু পালা লেখেননি কখনো। আজও তাঁর চাহিদা যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও মহানায়ক তপনকুমারের অনুরোধে একমাত্র তাঁর নব রঞ্জন অপেরার জন্যে বছরে একটি পালা রচনা করেন। সামাজিক পালা। প্রতি বছরই তাঁর পালা নানা কারণে চরম সাফল্য অর্জন করে। একাধিক পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

কানাই নাথের প্রখ্যাত পালাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ঃ—

'কবরের কান্না' ঃ পালাটি ইতিহাস আশ্রিত কিন্তু কল্পনা মিশ্রিত এক চরম সফল পালা। এই পালা জাহাঙ্গীর এবং মেহেরুন্নিসা দুটি প্রধান চরিত্রের উপর তৈরি। 'মাটির প্রদীপ', আর্য অপেরায় অভিনীত পাঁচ অঙ্কেব কাল্পনিক পালা। উপস্থাপনায় নতুনত্ব ছিল। পালায় সখীর নাচ সহ এগার খানা গান ছিল। বিশেষ করে বিবেক চরিত্রের গান তৎকালীন দর্শকদের অভিভূত করেছিল। 'কে কাঁদে'। এটিও পাঁচ অঙ্কের কাল্পনিক পালা। সত্যম্বর অপেরা নিবেদিত এই পালায় বারোটি গান ছিল। কানাই নাথের অন্য ব্যবসায়িক সাফল্য এনে দেওয়া পালা হলো 'আহ্বান', 'রক্তে রাঙা মাটি', 'আমি কে', 'সৈনিক ধরো হাতিয়ার', 'মা ও ছেলে', 'চণ্ডীতলার মন্দির', 'আগুন নিয়ে খেলা', 'শহর থেকে দূরে', 'সংগ্রাম' ইত্যাদি। সম্প্রতি সুপারহিট পালা 'প্রেম আছে প্রিয়া নেই'। এই পালাগুলিতে আজকের সামাজিক প্রেক্ষাপটের যা কিছু অন্যায়, পাপ, বিবেকহীনতা তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

॥ দেবেন্দ্রনাথ নাথ ॥

১৩২৩ সনে ২৪ পরগণার বসিরহাটে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলের ছাত্র যখন তখন দেবেনবাবু গান নিয়ে মেতে ওঠেন। গান শিখতেন। গান গাইতেন। কিন্তু বছর কয়েক পর থেকে দেবেনবাবু যাত্রাপালা রচনায় মন দেন। প্রথমেই তিনি ইতিহাস আশ্রিত অথচ কাল্পনিক প্রসঙ্গ ভাবেন। অন্য পালাকারদের মত তাঁর পালাতেও পুণ্যের জয় আর পাপের ক্ষয়, হিন্দু মুসলমান ঐক্য স্পষ্ট। দেবেনবাবুর প্রখ্যাত পালাগুলি হলো,—'যাত্রা হল শুরু', পাঁচ অঙ্কের এই পালা পরিবেশন করে সত্যম্বর অপেরা। এতেও সখীর নাচ ছিল, কিন্তু গান কমতে কমতে এসে দশটিতে দাঁড়ায়। 'দেশকে উন্নত করতে হলে কলকারখানার সঙ্গে সাহিত্য-ললিতকলাকেও উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে, সাহিত্য ললিতকলার মর্যাদা রক্ষা করতে হলে স্রষ্টা-শিল্পীকে বাঁচবার পূর্ণ সুযোগ বা অধিকার দিতে হবে'—, এই হলো পালার মূল সুর। পালার সব্যসাচী চরিত্রের মুখ দিয়ে এই সংলাপ প্রকাশ করে নিজের নাট্য চেতনা ও সমাজ চেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন। 'সাতভাই চম্পা', এই পাঁচ অঙ্কের ঐতিহাসিক পালা ক্যালকাটা অপেরায় অভিনীত হয়। 'মাটির প্রেম', এটিও ঐতিহাসিক পালা। রাজা শিলাদিত্যের সূর্যকুণ্ড গো রক্তে অপবিত্র করবার ঘটনা। 'বাপ্পাদিত্য', এই পালাটি আর্য

অপেরা ও কুণ্ডু নাট্য কোম্পানি আসরস্থ করে। এর মূল কাহিনী অবনীন্দ্রনাথের 'রাজকাহিনী' থেকে নেওয়া। এ ছাড়া দেবেনবাবুর আরও কিছু বিখ্যাত পালা 'রক্ত সন্ধ্যা', 'কবি কৃত্তিবাস', 'ভিয়েতনাম', 'পেশোয়া বাজীরাও' ইত্যাদি।

॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥

স্বনামধন্য সাহিত্যিক ও চিত্র পরিচালক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ষাটের দশকের শেষ দিকে নব রঞ্জন অপেরার জন্য লেখেন 'রক্ত লেখা' পালা। যমজ ভাই নিয়ে পালা। শৈলজাবাবুরই চলচ্চিত্রে রূপায়িত 'বন্দী' কাহিনীর পালারূপ।

॥ নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ॥

নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী নাট্যকার হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। গ্রামাফোন কোম্পানি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার নাট্যকার হিসেবে দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। পালাকার হিসেবে তিনি বহু বছর যাত্রার সঙ্গে যুক্ত থাকেননি বটে, তবে লেখনীর শক্তিতে অল্প সময়ের মধ্যে খুবই খ্যাতিমান হয়েছিলেন। নাট্যভারতী থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টী, সত্যম্বর অপেরা, নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা নরেশবাবুর 'বিনয়-বাদল-দীনেশ', 'সিপাহী বিদ্রোহ', 'বিষ্ণুপ্রিয়া' প্রযোজনা করে। নাট্যভারতীর 'বিনয়-বাদল-দীনেশ' দিল্লীর প্রবাসী বাঙালী মহলে, এবং সর্বত্র আশাতীত সাড়া ফেলেছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই যাত্রাপালা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। নিউ রয়েলের 'বিষ্ণুপ্রিয়া' চরম সাফল্য এনেছিল, তারারাণী পাল এই পালা থেকেই জীবনে প্রতিষ্ঠা পান।

॥ সুনীল দত্ত ॥

পালাকার হিসেবে যাত্রা পাড়ায় এসেই একটি পালাতেই খ্যাতি লাভ করেও বহু পালাকারের মত ইনিও বেশিদিন যাত্রায় টিকে থাকতে পারেননি। সুনীলবাবুর 'বারুদ' ১৯৬৯ সালে নিউ রয়েল বীণাপাণি আসরস্থ করে ও জনপ্রিয়তা পায়।

॥ যাত্রা এবং মহেন্দ্র গুপ্ত ॥

জরা যেমন কোনদিন মহেন্দ্রবাবুকে দুর্বল করতে পারেনি, তেমনি অনেক ঘাত-প্রতিঘাত, অন্যায় ও নির্লজ্জ স্বার্থপরতা তাঁকে দমিয়ে দিতেও পারেনি। একবার বসিরহাটে ছিল কম্বিনেশান নাইট। বাসে যাবার সময় মহেন্দ্রবাবু হাসতে হাসতে বলেছিলেন, জীবনে কোন বিপদে অথবা কোন অমানবিক আচরণের শিকার হয়েও চিত্তকে কখনই দুর্বল করিনি বলেই মনের দিক থেকে তরুণের মত বেঁচে আছি। আমি যখন এক বাক্স নাটকের নাট্যকার তখন এমন দিনও গেছে যখন বৃহস্পতিবারে বাড়িতে লক্ষ্মী-পুজোর জন্য আমার স্ত্রীর হাতে বাতাসা কিনে আনার এক আনা পয়সা দিতে পারিনি।

জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত ষ্টার থিয়েটারেই সসম্মানে কেটেছে তাঁর। মাঝখানে অনেকগুলি বছর অবশ্য সেই ষ্টার থিয়েটারের ঝুল বারান্দার নিচ দিয়ে হাঁটেননি তিনি। হাতিবাগান বাজারের উপরে মহেন্দ্রবাবুর নিজের গড়া সপ্তপর্ণা নাট্যগোষ্ঠীর ঘরে বসে এক সময়ে এ সব গল্প করেছিলেন তিনি। বুঝেছিলাম এসব কথা বলে নিজের মনটাকে হালকা করতেন। বলতেন, ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে যাবার সময় ষ্টারের ঝুল বারান্দার কাছ বরাবর পৌঁছে ফুট ছেড়ে পথে নামতাম, তারপর ষ্টার পেরিয়ে গিয়ে আবার ফুটে উঠতাম, এখনও তাই করি।

এক সময়ে ষ্টার হস্তান্তরিত হয়ে গেল। রণজিৎমল কাঙ্কারিয়া আবার মহেন্দ্রবাবুকে নিয়ে এলেন ষ্টারে। আলোচনা-সমালোচনার ঝড় উঠল। অনেকেই যখন বললেন রণজিৎমল আসলে টাকা দিয়ে এই খ্যাতিমান মানুষটিকে এনে সম্মানের আসনে বসিয়ে নিজেকে নাট্য নির্দেশক হিসেবে জাহির করতে চেয়েছেন, তখন ষ্টারের ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে মহেন্দ্র গুপ্ত আগের

মতই হাসতে হাসতে বলেছিলেন, এ সব কথা যারা বলছে তার একবারও কেন ভাবছে না, একজন অবাঙালি হয়ে রণজিতের কী অসাধারণ বাঙালিয়ানা, কী অসাধারণ বাঙালি প্রীতি।

মহেন্দ্র গুপ্তের বাসনা ছিল তাঁর ঘরানার প্রকৃত উত্তরাধিকার হিসেবে রণজিৎকে মনের মত করে গড়ে রেখে যাওয়া, এটাও সত্য। আসলে একটা যন্ত্রণা তাঁর ছিল। মহেন্দ্র ঘরানা ধরে রাখার মত প্রকৃত কাউকে রেখে না যাবার যন্ত্রণা। মহেন্দ্র গুপ্তের সেই যন্ত্রণার খবর রাখতেন আর একজন। তিনি নট্ট কোম্পানির কর্ণধার, প্রযোজক মাখনলাল নট্ট। এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি বললেন, যাত্রায় আসার পর তিনি একাধিক অভিনেতাকে স্বাভাবিক, ন্যায় সঙ্গত অভিনয় রীতিতে তৈরি করতে চেষ্টা করেছিলেন অনেক, পরিশ্রম করেছিলেন, কিন্তু তিনি যতটা ভেবেছিলেন কার্যত তা ঘটেনি, এটা তাঁর একটা যন্ত্রণা বৈকি।

মহেন্দ্র গুপ্ত একটানা না হলেও চার বছর জড়িয়ে ছিলেন নট্ট কোম্পানিতে। আর মাখনবাবু প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী ছিলেন তাঁর। যাত্রায় মহেন্দ্র গুপ্তের আবির্ভাব ঘটেছিল এক মানবিক ধর্ম থেকে। একবার চলতি মরশুমে নট্ট কোম্পানির সেবারের একজন শীর্ষস্থানীয় অভিনেতা হঠাৎ দলত্যাগ করায় মাখনবাবু খানিকটা বিপদে পড়েছিলেন। এই সময়ে সব কথা শুনে মহেন্দ্রবাবু সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করে দিতে সম্মতি জানিয়েছিলেন ব্যক্তিগত স্বার্থ ভুলে, শুধুমাত্র একজন প্রযোজককে বিপদমুক্ত করার তাগিদে। একজন যাত্রার মালিক বা প্রযোজকের প্রতি মহেন্দ্র গুপ্তের মত খ্যাতিমান ব্যক্তির যে কী অসাধারণ প্রীতি তার নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন মাখনবাবু। মাখনলাল নট্ট সানন্দে স্বীকার করেছিলেন, মহেন্দ্র গুপ্তের আবির্ভাবে যাত্রার পালা উপস্থাপনা ও অভিনয় ধারার পরিবর্তন ঘটেছিল। তাঁর অভিনয় আজও বহু লোকের মনে দাগ রেখে দিয়েছে।

'মহিয়সী কৈকেয়ী' পালায় রাজা দশরথ, 'সুলতানা রিজিয়া'তে রিজিয়ার দাদা বাহারাম, 'বন্দিনী' পালায় (দেবলা দেবী নাটকের নতুন নাম) খিজির খাঁ অথবা 'করুণাসিন্ধু বিদ্যাসাগর'-এর মাইকেল, 'সিংহগড়' পালার ঔরংজেব, 'দাদাঠাকুর' পালায় দাদাঠাকুর বা 'চন্দ্রনাথ'-এ কৈলাস খুড়ো চরিত্রে মহেন্দ্র গুপ্তের অবিস্মরণীয় অভিনয় যাত্রার প্রবীণ দর্শকরা এখনও ভুলতে পারেননি। যেমন ভুলতে পারেননি বাটানগর নিউ ল্যাণ্ডের বহু মানুষ মহেন্দ্রবাবুর মাইকেল। যখন তিনি—"টাকা টাকা টাকা, এভরি হয়ার দ্য কোয়েশ্চেন অব্ মানি, আঃ হা! গৌরদাস বসাক? দি গ্রেট ডেপুটি ম্যাজিসট্রেট"।—কথাগুলো বলতেন, দর্শকরাও তাঁর অভিনয়ে অভিভূত হয়ে যেতেন। আবার যখন তিনি সংলাপ আর অভিব্যক্তির ভিতর দিয়ে লঙ্কার ঐশ্বর্যের ডেসক্রিপশান বা লঙ্কার রূপ বর্ণনা করতেন যাত্রা দর্শকরা যেন চোখের সামনে সেই লঙ্কাকে স্পষ্ট দেখতে পেত—, কত বড় অভিনেতা হলে যে এটা হয় তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। এ সব স্মৃতিচারণ মাখনবাবুর।

মহেন্দ্র গুপ্ত নিজেই বলতেন, নাট্য জগতে নাট্যকার—অভিনেতা হিসেবে আমার যত খ্যাতি তার চাইতে অনেক বেশি খ্যাতি আমার নাট্য সম্পাদনার। পালাকার ব্রজেন দে এই উক্তি মনে-প্রাণে স্বীকার করেছিলেন। যেবার ব্রজেনবাবু 'করুণাসিন্ধু বিদ্যাসাগর' লিখেছিলেন মহেন্দ্রবাবু সেই পালার নির্দেশনার কাজ শুরু করেই, পালায় মাইকেল আর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্র না পেয়ে সবিনয়ে সেই পালার এই ত্রুটি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। ব্রজেনবাবু সেই ত্রুটি মেনে নিয়েছিলেন, পরে পাণ্ডুলিপিতে ঐ দুটি চরিত্র সংযুক্ত করেও খুশি হতে পারেননি। মহেন্দ্র গুপ্ত শেষ পর্যন্ত মাখনবাবুকে বলেছিলেন, তাঁর লেখা বই 'মাইকেল' জোগাড় করতে। তাই হয়েছিল। পাতার পর পাতা বাদ দিয়ে মহেন্দ্রবাবু সেই পাণ্ডুলিপিতে অসাধারণ মুন্সিয়ানায় যুক্ত করেছিলেন সেই চরিত্র। ব্রজেনবাবু দেখে বুঝতে পারেননি আলাদা নাট্যকারের হস্তক্ষেপ আছে নাটকে।

জাত অভিনেতাদের ভিতরে অভিনয় বাদে এমন কিছু গুণ, মানবিক ধর্ম, আচরণ সৌন্দর্য্য

থাকে যা নিজে থেকে প্রকাশ পায়, প্রকাশ করতে হয় না। মহেন্দ্র গুপ্ত ছিলেন সেই জাতের। দলের অতি সাধারণ একটি কর্মীকেও তিনি সব সময় 'আপনি' বলে কথা বলতেন, যা যাত্রায় বিরল। এ সব কথাও মাখনবাবুর।

ব্যক্তি হিসেবে মহেন্দ্রবাবু যত প্রৌঢ়ত্বের দিকে এগিয়েছেন ততই তিনি মনের দিক থেকে হয়েছেন তরুণ। যত বেশি খ্যাতিমান হয়েছেন ততই তিনি নিজেকে রেখেছিলেন সহজ-সাবলীল। মানুষ প্রতিষ্ঠা পেলে এক ধরনের অহঙ্কার মনে বাসা বাঁধে, মহেন্দ্রবাবু ছিলেন ঠিক তার বিপরীত। তাই বোধ করি আজকের অনেক খ্যাতিমান অভিনেতা তাঁরই সাহায্যে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

মহেন্দ্র গুপ্ত যদিও অনেকদিন ধরেই নানা অসুস্থতার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, তবুও কোন অবস্থাই তাঁকে পঙ্গু করে দিতে পারেনি। তাঁকে অবশেষে জয় করল মৃত্যু। গত ১১ নভেমবর '৮৪ নীরবে বিদায় নিলেন।

পরিতাপের বিষয়, শক্তিমান নাট্যকার, উচ্চশিক্ষিত-মার্জিত-অভিজাত এই মানুষটির যথার্থ মূল্যায়ন হয়নি আজও।

॥ মধু গোস্বামী ॥

কলেজ জীবন থেকে যিনি রাজনীতি করছেন, দরিদ্রতাকে উপেক্ষা করে যিনি কবিতা-নাটক লিখেছেন অনেক, যিনি শ্রমিক আন্দোলনে বারবার সক্রিয় অংশ নিয়ে, শ্রমিক ও সংগ্রামী মানুষের মনের কাছে পৌঁছেও ব্যক্তি সুখের কথা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেননি, যিনি বিভিন্ন সংবাদপত্রে সাংস্কৃতিক সাংবাদিকতার সূত্রে 'তরুণ অপেরা'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে, শিব ভট্টাচার্যের এবং শান্তিগোপালের পাশে থেকেছেন বহু বছর, যিনি তরুণ অপেরা'র একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে কোম্পানির স্বার্থে শ্রম করেছেন অনেক, যিনি তরুণ অপেরার ব্যানারে 'আট ঘণ্টার লড়াই' পালা লিখে রীতিমত হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিলেন, যিনি আরও অনেক সার্থক পালার রচয়িতা, যাত্রা জগত সেই মধু গোস্বামীকে ভাল পালার জন্য অনুপ্রাণিত করেনি। মধু গোস্বামীও যাত্রার মালিকদের দুয়ারে দুয়ারে একটি পালার জন্য কোনদিনও ঘুরে বেড়াননি। যাত্রার সাম্প্রতিক অবনতিতে তিনি ব্যথিত হয়েও 'গণশক্তি' পত্রিকার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে নীরবে সরে গেছেন যাত্রা থেকে।

॥ রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় ॥

যে কটি জিনিস থাকলে কোন অবস্থাতেই আজকের দুনিয়ায় সমাদর পাওয়া যায় না, কোন অবস্থাতেই চরম প্রতিষ্ঠা বা স্বীকৃতি পাওয়া যায় না, ঠিক সেইগুলো আছে রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে। কাটোয়ার ছেলে, কাটোয়া কলেজের অধ্যাপক রঞ্জিত তাঁর সংসারে আক্ষরিক অর্থে এত সুখী যে, সুখের ঘরে কাঁটা দিয়ে কলকাতায় গোপনে আর একটা সংসার পাতার ভিতর দিয়ে পাণ্ডুলিপি নিয়ে চিৎপুরের পালাকার হবার মত মানসিকতা নেই বলেই একাধিক পালা রচনা করেও নির্বাসনে। বর্ধমান জেলার গোবর্ধনপুর গ্রামের অভিজাত-শিক্ষিত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের এই ছেলে বর্ধমানের এস. কে. ইনস্টিটিউট থেকে স্কুল ফাইনাল, পরে হুগলীর ইটাচোনা কাটোয়া কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কাটোয়া কলেজ থেকে যথাক্রমে পি. উ, বাংলায় অনার্স সহ বি. এ. বাংলায় এম. এ. এবং বি. টি পাশ করে অধ্যাপনা জীবন নিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত। যে জগতে দু'চারজন ছাড়া প্রায় সকলেই বিনা বিদ্যায় পালারচনায় খ্যাতির শিখরে, সেই জগতে উচ্চশিক্ষিত, মনের ও চরিত্রের দিক থেকে পবিত্র, মৌলিক রচনায় বিশ্বাসী রঞ্জিত কেন কল্কে পাবেন? পাননি, অথচ ছেলেবেলা থেকে সেদিকে তীব্র আকর্ষণ ছিল বলে যাত্রার প্রেমিক বিখ্যাত ডাক্তার অজিত মুখার্জীর সাহায্যে যখন 'সুন্দর বনের সুন্দরী' পালা 'যুগযাত্রা' প্রতিষ্ঠান নিয়েছিল, পালাকার হিসেবে রঞ্জিতের নাম বিজ্ঞাপিত করেছিল অথচ আসরস্থ করেনি তখন তিনি ভেঙ্গে ও পড়েননি। কিন্তু

সত্যম্বরের কর্ণধার শৈলেন মোহান্ত যখন তাঁর "মহুয়া সুন্দরী" প্রযোজনা করেন তখন রঞ্জিত যাত্রার প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় পুনরায় লেখেন মুক্তধারার জন্য 'বিদ্রেহী বেদুইন্'। ৭ দিন মহড়ার পর বাতিল হয় পালা। আবার সেই শ্রদ্ধা জাগিয়ে দেন গন্ধর্ব অপেরার শিক্ষিত প্রযোজক নিমাই সুর শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি' রঞ্জিতকে দিয়ে পালারূপ করিয়ে।

এরপর "রাজদূত" অপেরার পক্ষে অভিনেতা রাজকুমার রঞ্জিতের "নল দময়ন্তী" আসরস্থ করেন। ১৯৯৩-এ শ্রেষ্ঠ পালাকার হিসেবে পুরস্কারও পান। তবুও তিনি অনাদৃত চিৎপুরে।

॥ নিকুঞ্জ চক্রবর্তী ॥

সাতপাটি দেবেন্দ্র চতুষ্পাঠী টোলের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত বংশের অন্যতম প্রধান পুরুষ বিধুভূষণ চক্রবর্তীর ছেলে পালাকার নিকুঞ্জ চক্রবর্তী। নিকুঞ্জ সেই পরিবারের ছেলে যে পরিবারে আজও কমপক্ষে ৭/৮ টি দুস্থ ছেলে থাকেন এবং পড়াশোনা করেন। নিকুঞ্জর দাদা রতনচন্দ্র চক্রবর্তী। যিনি সংস্কৃত সাহিত্যে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ করেছিলেন। নিকুঞ্জ সেই পরিবারের ছেলে, যে পরিবারের পুরাতন উৎসব বলতে রথযাত্রা, চতুর্দশীতে কালীপূজা, চৈত্রে গাজনের মেলা আজও অম্লান।

নিকুঞ্জ সাতপাটি হাইস্কুল থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ করার পর রেডিও সার্ভিসিং পড়েন।

ছেলেবেলা থেকেই নিকুঞ্জ যাত্রাকে ভালবেসেছিলেন যাত্রা দেখে। বাড়িতে ছিল শীতলা ক্লাব আর পাঠাগার। রথ, উল্টোরথ, দুর্গাপুজো ইত্যাদিতে বাবা-দাদারা সখের যাত্রা করতেন। সেই সূত্রে একবার 'বিদর্ভ-নন্দিনী'তে ছোট কৃষ্ণের চরিত্রে বালক নিকুঞ্জের প্রথম রূপদান। শীতলা ক্লাবের জন্যই তিনি প্রথম লিখেছিলেন চণ্ডীমঙ্গল অবলম্বনে 'দেবী দশভূজা'। এরপর অভয় সাহা ও হারাধন নন্দীর সহায়তায় ২৪ বছর বয়সে ক্যালকাটা অপেরার জন্য তাঁর সেই পালাটি পুনর্লিখন করেন। সেটাই ওঁর প্রথম পেশাদার অপেরার পালা। এই অপেরায় তাঁর দ্বিতীয় পালা 'রক্তের রঙ নীল'।

স্থানীয় একাধিক যাত্রাদলের জন্য তিনি যে পালাগুলি লেখেন, তার মধ্যে বিখ্যাত হয় মেঘদূত অপেরার 'কর্ণ-কুন্তী-কৃষ্ণ', জয়জয়ন্তী অপেরার 'অসুস্থ পৃথিবী', শিল্পীসঙ্ঘের 'চুয়াড় বিদ্রোহ' ও 'রাণা শিরোমণি', শীতলা ক্লাবের 'কুমারী জননী'। এরই মধ্যে প্রখ্যাত পণ্ডিত অবিনাশ ভট্টাচার্যের কন্যাকে বিবাহ করেন। নিজের বাড়িতে নতুন করে গড়ে তোলেন পাঠাগার।

দীর্ঘ বিরতির পর নিকুঞ্জ আবার ফিরে আসেন কলকাতার চিৎপুরে যাত্রা পাড়ায়। জগৎজয়ী অপেরার জন্য লেখেন 'ধর্মের পূজারী', দিগ্বিজয়ীর জন্য লেখেন 'অভিমানী কর্ণ'। আবার জগৎজয়ীর জন্য 'কালা বাদশা'।

সত্যনারায়ণ অপেরার 'কৃষ্ণার্জ্জুন', যা প্রথম রঙীন যাত্রাপালা হিসেবে দূরদর্শনে দেখান হয়। নিকুঞ্জ লিখেছেন জনতা অপেরার 'অসতীর সন্তান'। মেদিনীপুরের বঙ্গদীপ অপেরার হয়েও নিকুঞ্জকে পালা রচনা করতে হয়েছে।

॥ শৈলেশ গুহনিয়োগী ॥

ইনি গ্রুপ থিয়েটার ক্ষেত্রে পিক্‌লু নিয়োগী নামে খ্যাত। চাকরি জীবনের মধ্যে নিজের গড়া ক্লাবের জন্য একাঙ্ক থেকে পূর্ণাঙ্গ অনেক নাটক লিখেছেন। একাধিক নাটক জনপ্রিয়তাও পেয়েছিল। যাত্রায় প্রবেশ করে, অপেরা ধর্মী নাট্য নির্দেশনায় এবং পালা রচনায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে খুবই খ্যাতিমান হন। নিজের গ্রুপে করা বেশ কিছু নাটক পরে যাত্রা ফর্মে আসরে দিয়ে জনপ্রিয়তা পান। ইনি নিজস্ব একটা ইউনিট নিয়েই যাত্রায় কাজ করেছেন। এখনও যাত্রায় কাজ করছেন।

॥ যাত্রার স্মরণীয় রূপকার এবং উত্তরসূরী ॥

পঞ্চাশের দশকের সূচনা থেকে যাঁদের তীক্ষ্ণ এবং আঙ্গিক অভিনয় মাধুর্যে বার বার যাত্রাপালা ও যাত্রাগানের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হয়েছে, যাঁদের অভিনয় ধারার ক্রমবিবর্তনে আজকের যাত্রাভিনয় সমকালীন ধারায় উদ্ভাসিত হবার প্রেরণা পেয়েছে, যাত্রাগান একটি শিল্পের

মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে পেরেছে, যাঁদের উদাত্ত কণ্ঠস্বর, যাঁদের স্বচ্ছ উচ্চারণ, যাঁদের সংলাপ প্রক্ষেপণ ও অভিব্যক্তির কারুকার্য, যাঁদের বিচিত্র এক সুরেলা অভিনয় একটি ধারার ধারক ও বাহক হয়ে সমালোচিত এবং সমাদৃতও বটে, যাঁদের সংলাপ প্রক্ষেপণে ও আঙ্গিক অভিনয়ের তীক্ষ্ণতায় ডে-লাইটের আলো বা একাধিক হ্যাজাকের আলোয় এমন কি পরবর্তী সময়ে কিছুকাল বৈদ্যুতিক আলোক মঞ্জিলে বসে থাকা দর্শকসমাজ অমাবস্যার অন্ধকার, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নারাত, মহাসমুদ্রের উত্তাল-উন্মত্ততা, স্থাপত্য শৈলীর নিখুঁত বর্ণনা, বনবাসের নিখুঁত ছবি, যুদ্ধক্ষেত্রের বিভীষিকা, কারাগারের যন্ত্রণা, রাজসভার প্রেক্ষাপটের বাস্তব উপলব্ধিতে তৃপ্ত হতেন, বিস্ময়ে হতবাক হতেন, আনন্দে মুখর হতেন, যা বিজ্ঞান সভ্যতার চরম পৃষ্ঠপোষকতাতেও, অর্থাৎ আলো, মাইক, টেপ রেকর্ডের দোর্দণ্ড প্রতাপেও, নানা চমকেও ষোল আনা সম্ভব হয় না, সেই রূপকারদের, সেই বিবেককুলের কথা, তাঁদের অবদানের পর্যালোচনা করা সম্ভব নয়। এর কারণ যাত্রার প্রতি তৎকালীন পণ্ডিত সমাজ থেকে রূপকারদের পরমাত্মীয়দের এমন কি স্বয়ং রূপকারদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। একটু সহজ করে বলা যায়, চলচ্চিত্র বা থিয়েটার ক্ষেত্রের বহু অতীত খুঁজে পাওয়া যায় বহু সংরক্ষণবাদী মানুষের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা আর প্রীতির জন্য। চলচ্চিত্র বা রঙ্গমঞ্চের এমন অনেকের সন্ধান পাই, যাঁরা নিজেরাই নিজেদের স্বার্থে অথবা পারিবারিক গৌরবের স্বার্থে কর্মজীবনের যাবতীয় নথি-পত্র-সংবাদ-ছবি সযত্নে রক্ষা করেছেন স্মৃতির অ্যালবামে। যেমন বাংলা সিনেমার জনক ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ডি.জি) একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! ঠিক সেইভাবেই নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর জীবন-কর্ম ও সাধনার বিশাল সংগ্রহশালা আমাদের গৌরব। তেমনি গর্বিত, যখন দেখি বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের ক্ষেত্রে এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব অমর ঘোষ সযত্নে রক্ষা করেছেন দীর্ঘ কর্মজীবনের যাবতীয় সংবাদ, ছবি, নথি-পত্র! ঠিক যে দৃষ্টিকোণ থেকে আজ চলচ্চিত্রের বৃহত্তম সংগ্রহশালা তৈরি হতে পেরেছে বা গবেষণাধর্মী মানসিকতায় চলচ্চিত্রের আর্কাইভ নানা দিকে তৈরি করার মহাযজ্ঞ চলছে, ঠিক সেই দৃষ্টিকোণ থেকে যাত্রা আজ সম্পূর্ণ অবহেলিত।

এ ক্ষেত্রে অবশ্য যাত্রা ক্ষেত্রের বর্তমানের এমন দুই শিল্পীর কথা জানি, যাঁদের একান্ত প্রীতিতে, নিতান্ত সাধনায় তৈরি হয়েছে এমন একটি স্মৃতির অ্যালবাম যা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এঁরা হলেন আজকের যাত্রা জগতের দুই রূপকার। স্বক্ষেত্রে স্বনামধন্য যাত্রাসূর্য অসীমকুমার এবং যাত্রা থেকে অবসর নেওয়া শক্তিময়ী অভিনেত্রী সীমা বোস। তবুও পুরাতন হ্যাণ্ডবিল আর নানা নথিপত্র থেকে এমন কিছু স্মরণীয়-শক্তিধর রূপকারের তালিকা এখানে প্রকাশ করলাম যাঁদের অভিনয়ের কথা আজও লোকমুখে শোনা যায়। পরিতাপের বিষয় এই তালিকাভুক্ত রূপকারদের মধ্যে বহুজনেরই সংক্ষিপ্ত জীবনী হাজির করা সম্ভব হয়নি, তেমনি নিঃশব্দে-নীরবে হারিয়ে গেছেন অনেকেই। এই তালিকায় আবার এমন কিছু নাম আমরা পেয়েছি যাঁরা পরবর্তী সময়ে শীর্ষস্থানেও পৌঁছতে পেরেছিলেন। এখানে এমন বহু নামের উল্লেখ নেই যাঁরা যাত্রায় বিভিন্ন পার্শ্বচরিত্রে রূপদান করেছিলেন বটে কিন্তু বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেননি! তবুও ইতিহাসের পাতায় অমর করে রাখার চেষ্টা করেছি বহু নাম অন্ততঃ তাঁদের বংশধরেরা বা পরবর্তী প্রজন্ম যেন বিস্মৃত না হয়! আবার এমন অনেক রূপকার আছেন যাঁদের জীবন ও কর্মের কথা এই গ্রন্থে বিস্তারিত বলা হয়েছে। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে নবুই দশকের সূচনাকালের মধ্যে যে রূপকারদের যাত্রার আসরে উজ্জ্বল হতে দেখা গেছে তাঁদের তালিকা যতটা সম্ভব এখানে রাখা গেল। মনে রাখতে হবে এই তালিকার বহু শিল্পী আজ আর যেমন নেই, তেমনি এমন বহু শিল্পী আছেন যাঁরা বেঁচে থেকেও সকলের মনের আড়ালে। এরই মধ্যে এমন কিছু শিল্পী আছেন যাঁরা স্বক্ষেত্রে এখনও উজ্জ্বল। তালিকাটি এই রকম ঃ

অমিয় বসু, অমর ভট্টাচার্য, অরুণ দাশগুপ্ত, অমর দত্ত, অজিত দত্ত, অসিত বসু,

অজিত মুখার্জী, অনিল রায়, অজিত সাহা, অশোক চক্রবর্তী, অনিল ঘোষ, অনাদি চক্রবর্তী অভয় হালদার, অজিত দাস, অমূল্য বোস, অনিলা দেবী, অনিমা দাশগুপ্ত, অরুণা গোস্বামী, অনন্যা নাগ, অঞ্জনা ভট্টাচার্য, অঞ্জনা ব্যানার্জী, আঙুর নট্ট, আরতি মান্না, ইন্দ্রাণী বিশ্বাস, ইন্দিরা দে, ইরা চক্রবর্তী, উষারাণী, কানু বন্দ্যোপাধ্যায় (চিত্র), কুমার বিশ্বনাথ, কুমার স্বপন, কুমার অভিনন্দন, কমল মিত্র (চিত্র), কালী মান্না, কনকলতা, কালী ব্যানার্জী (চিত্র), কাজল চৌধুরী, কল্পনা নায়েক, কমলকুমার ঘোষ, কল্যাণী ভট্টাচার্য, কেতকী দত্ত (চিত্র ও মঞ্চ), খোকন বিশ্বাস। গৌতম সাধুখাঁ, গণেশ গোস্বামী, গোঁসাই দাস সাহা, গোপাল ভট্টাচার্য, গুরুদাস মিত্র, গুরুদাস ধাড়া, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (চিত্র), গীতশ্রী দাস, গুণসিন্ধু মণ্ডল, গোপাল দে, গীতা ঘোষ, গীতা জানা, গোপী দে, চিত্তশঙ্কর, ছবি ব্যানার্জী, চিত্রা মল্লিক, চৈতালী গোস্বামী, চণ্ডী হাম্বির, চণ্ডীদাস কেশ, ছবি রায়, ছন্দা চ্যাটার্জী, জীবনকৃষ্ণ মণ্ডল, জ্যোৎস্না দত্ত, জলি ব্যানার্জী, জয়দেব গোস্বামী, জহর রায়, তারক কাঞ্জিলাল, তারাদেবী, তারক দাস (মটর), তারক প্রামাণিক, তারারানী পাল, তুহিনা, তপতী ভট্টাচার্য, তপনকুমার, দীপক মুখার্জী (চিত্র), দিলীপ চ্যাটার্জী (নটসূর্য), দেবকুমার, দেবগোপাল, ধীমান চক্রবর্তী, নির্মল ভট্টাচার্য, নির্মল মুখার্জী, নলিনী বাগ, নারায়ণ ঘোষাল, ননী ভট্ট, নিতাই দাস, নিরঞ্জন ঘোষ, নন্দ ঘোষাল, নন্দকুমার (আগের), নরেন দে, পূর্ণেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশান্ত সরকার, পালান নস্কর, পান্নালাল ভট্টাচার্য, পান্না চক্রবর্তী, প্রণয়রঞ্জন সাহা, পুণ্য দাস, পঞ্চানন ব্যানার্জী, পীতম পাল, পুতুল দত্ত, প্রফুল্ল গোস্বামী, প্রভাত মিত্র, পূর্ণিমা দেবী, পিউ সিন্‌হা, ফণি রায়, ফণি গাঙ্গুলী, ফণি নস্কর, ফটিক দত্ত, ফিরোজাবালা, বীরেন চ্যাটার্জী (চিত্র), বিভূতি পাণ্ডে, বঙ্কিম দত্ত, বিনয় ভট্টাচার্য, বিনয় গাঙ্গুলী, বঙ্কিম মুখার্জী, বিজন মুখার্জী, বীণা ঘোষ, বেলা সরকার (বড়), বেলা ঘোষ, বেলা সরকার, বিদিশা মহান্তী, বলাই হালদার, বিপ্লব মুখার্জী, বিপ্লব সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব ঘোষ, বর্ণালী ব্যানার্জী, বীণা দাশগুপ্ত, বাণী ভট্ট, বিষ্ণু ঘোষ, বন্দনাদেবী, বিনোদ ধাড়া, বিমলেন্দু ভট্টাচার্য, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (চিত্র), ভূপেন চক্রবর্তী, ভারতী সিন্‌হা, ভারতী ব্যানার্জী, ভোলা পাল (বড়), ভোলা পাল, ভারতী দেবী, মঞ্জুশ্রী ব্যানার্জী, মুরারী দত্ত, মাখন রায়, মাখন সমাদ্দার, মধু মল্লিক, মায়া ব্যানার্জী, মায়া পাল, মীনাকুমারী, মিতা চ্যাটার্জী, মীণাক্ষি দে, মিনতি দাস, মহুয়া চ্যাটার্জী, মদনকুমার, মধু ব্যানার্জী, মীরা গুপ্ত, মেনকা দেবী, মনোজ মিত্র, মিতা তালুকদার, মুকুন্দ মণ্ডল, মনোজ দাস, মুরারীমোহন দত্ত, মহেন্দ্র গুপ্ত, মহেন্দ্র ব্যানার্জী, মিনতি মুখার্জী, মীরা বসু, মহাদেব দাস (চিত্র), রূপক মজুমদার, রূপকুমার (নারায়ণ ভট্টাচার্য), রাজেন সাহা, রবীন চক্রবর্তী, রঞ্জিত সরকার, রেবা বসু, রবি ঘোষ (চিত্র), রাখাল সিংহ, রাধারমণ পাল, রীতা দত্ত, রাঙা মিশ্র, রতন সাহা, ললিত চক্রবর্তী, লোলিতা চ্যাটার্জী (চিত্র), লীনা চক্রবর্তী, শরৎ চট্টোপাধ্যায়, শম্ভু দাস, শ্যামলী মজুমদার, শ্যামলকুমার, শ্যামল দাস, শক্তি গাঙ্গুলী, শিব ভট্টাচার্য, শিবদাস মুখার্জী, শান্তিগোপাল, শ্যামসুন্দর গোস্বামী, শুক্লা কর্মকার, শৈলেন ঘোষ, শৈলেন চক্রবর্তী, শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবশঙ্কর দাস, শিশুরঞ্জন রুদ্র, শেখর গাঙ্গুলী, শর্মিষ্ঠা গাঙ্গুলী, সুভাষ ভৌমিক, সুজাতা বোস, সোমা মুখার্জী (চিত্র), সন্ধ্যা রায় (চিত্র), শ্যামল ঘোষ, সীমা দে, সুব্রত বসু, সাহানা বোস, সন্ধ্যা কর্মকার, সুখেন্দু মুখার্জী, সুধীন মুখার্জী, সুধীর ধাড়া (ভজা), গরানহাটার সন্তোষ দাস, সনৎ বসু (মেন্টা), সুশীল গাঙ্গুলী (ফেলী), সুনীল মুখার্জী (রামু), সুশীল ঘোষ, সুনীত মুখার্জী, সুখেন্দু মুখার্জী, স্বপনকুমার (নট সম্রাট), সুবীরকুমার, সুজিত পাঠক, সুবীর চ্যাটার্জী, সমর গাঙ্গুলী, সুদেশকুমার, সুপর্ণ মণ্ডল, সাধন বৈদ্য, সত্য রায়, সনৎ গোস্বামী, সমর ব্যানার্জী, সঞ্চয়িতা, সঞ্চিতা, সুদেষ্ণা রায়, স্মিতা পাঠক, সুধা সরকার, সঞ্জীবকুমার, স্বর্ণালী ঘোষ, সীমা চ্যাটার্জী, হিরণ বসুমল্লিক, হারু ঘোষ, হীরালাল ব্যানার্জী, হিমাংশু রায়, হিমাংশু চৌধুরী, ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, ক্ষিতিশ রায়, জ্ঞানময় মিত্র আরও অনেকে।

এবার এমন কয়েকজন শিল্পীর কথা বিস্তারিত বলি যাঁদের অভিনয় মাধুর্য পরবর্তী রূপকারদের অনুপ্রাণিত করেছিল।

॥ সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সুরেশ মাষ্টার) ॥

১৮৮৪ সালে ফরিদপুরের লোনসিংহ গ্রামের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। সুরেশচন্দ্র আই. এ. পড়তে পড়তে মোক্তারি পাশ করেন। মোক্তারি পাশ করলেন বটে কিন্তু হলেন সহকারী হেডমাষ্টার ফরিদপুরের উপসী ইংরেজি স্কুলে। এই সময়ে তিনি সখের থিয়েটার করতেন। কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর তিনি 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ স্টীম নেভিগেশন'-এ চাকরি নিয়ে যান রেঙ্গুনে। এই চাকরিও বেশি দিন করলেন না সুরেশবাবু। কলকাতায় চাকরি করতে শুরু করেন। এবার প্রসন্নকুমার ঠাকুরের স্টেটে'র চাকরি। সুরেশচন্দ্র একজায়গায় বেশিদিন চাকরি করেননি কোন মানসিক অস্থিরতার জন্য নয়। তাঁর ছিল অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব। আর ছিল অভিনয়ে তীব্র আকর্ষণ। সেই সুযোগ এলো তাঁর। প্রসন্ন ঠাকুরের চাকরি ছেড়ে সুরেশচন্দ্র 'ক্রাউন থিয়েটারে' যুক্ত হন সসম্মানে। এই থিয়েটারের অন্যতম পরিচালক ও অভিনেতা হয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন ঢাকায়। এই থিয়েটারে এসেই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি প্রশংসিত হন। এরপর ১৯২৩ সালে সুরেশচন্দ্র স্থায়ীভাবে পেশাদার যাত্রায় যুক্ত হন। 'নবদ্বীপ সাহার দলে' হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'জয়লক্ষ্মী' পালায় বলাদিত্য চরিত্রে অভিনয় করেই খ্যাতিমান হন। সুরেশচন্দ্রর অভিনয়ে যেমন জাদু ছিল, তেমনি ন্যাট্য নির্দেশক বা শিক্ষক হিসেবে ছিলেন দক্ষ। আর এই কারণেই তিনি 'সুরেশ মাষ্টার' হিসেবে খ্যাতি পান। মতিলাল রায় বা মুকুন্দ দাসের প্রতিভার পর বিংশ শতাব্দীর কয়েক দশকের মধ্যে সুরেশচন্দ্রের মত প্রতিভার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়নি। শুধু বাংলা নয়, ইংরেজি ভাষাতেও সুরেশচন্দ্র সংলাপ বলতেন। 'নবদ্বীপ সাহার দল', 'ঘোষালের দল', পাষাণময়ী অপেরা, নট্ট কোম্পানি যাত্রাপার্টী, সত্যম্বর অপেরা, ভোলানাথ অপেরায় দোর্দণ্ড প্রতাপের সঙ্গে সুরেশবাবু পালার নির্দেশনা ও অভিনয় করে এক সময়ে নিজেই 'জাতীয় আনন্দ প্রতিষ্ঠান' নামে যাত্রা দল তৈরি করেন।

এই দলের পরিচালক নিযুক্ত হন সুরেশচন্দ্রের ভাইপো, ফরিদপুরের পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়। 'বিন্ধ্যাবলি' পালার অনুহ্লাদ, 'লক্ষ বলি'র বিরথ, 'আদিসূর' পালার আদিসূর, 'দাক্ষিণাত্য'র মহম্মদ তুঘলক ; 'তর্পণ' পালার কর্ণ, 'বঙ্গে বর্গী'তে ভাস্কর পণ্ডিত, 'রাখি বন্ধন', 'ছগনলাল', 'সপ্তমাবতার',-এর রাবণ প্রভৃতি চরিত্রে অভিনয় করে সুরেশচন্দ্র নব্যধারার অভিনয়কে প্রতিষ্ঠা দিয়ে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার স্বীকৃতি পান। ১৯৩৬ সালে ঢাকা মিড্ফোর্ট হাসপাতালে মারা যান!

॥ হরলাল গাঙ্গুলী (টিম্বল) ॥

১২৯৪ সনে বরিশাল জেলার অন্তর্গত কাশীপুর গ্রামে জন্মেছিলেন অবিভক্ত বঙ্গদেশের এই খ্যাতিমান অভিনেতা।

ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে হরলাল চাকরি জীবন শুরু করেন বরিশালের পটুয়াখালি সিভিল কোর্টে। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর অভিনয়ের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ছিল। মাঝে মাঝে বিভিন্ন জায়গায় সৌখিন থিয়েটারের অভিনয় করে প্রশংসা পেয়েছিলেন। এই সুনামই তাঁকে যাত্রায় এনে দেয়। তিনি প্রথমেই নট্ট কোম্পানিতে পেশাদার অভিনেতা হিসেবে যুক্ত হন। যাত্রা জগতে তিনি 'টিম্বল' নামে খ্যাত ছিলেন। অমুক পালায় টিম্বল আছে জানতে পারলে দর্শক সমাগম আশাতীত হতো। বহু দলে অভিনেতা এবং নাট্য শিক্ষক হিসেবে হরলালবাবু খ্যাতিমান ছিলেন। 'আদিসূর' পালার তক্ষশীল, 'শৈশব সাধনা' পালার উত্তানপাদ, 'সংমা'র জয়সেন, 'সপ্তমাবতার'-এর বিভীষণ, 'পণমুক্তি'র কাশ্যপ চরিত্রগুলিতে হরলাল গাঙ্গুলীর অভিনয় এক বিশেষ কীর্তি হিসেবে চিহ্নিত। ১৯৬৫ সালে যখন চিৎপুরের যাত্রাপাড়া রমরম করছিল তখন অতীত-বর্তমানের এই অভিনয় ধারার সূত্র ছিন্ন হয় নীরবে।

॥ বিজয়কৃষ্ণ মিত্র ॥

একটা মাইল স্টোন! রক্তমাংসে গড়া একটা মাইল স্টোন! যার ওপর দিয়ে জীবনের বাহান্নটি বছর (অভিনয়ের) ধরে কত সর্বনাশা ঝড় বয়ে গিয়েছিল। কত আঘাত আছড়ে পড়েছিল। তবুও জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত বিজয়কৃষ্ণ তাঁর যাত্রা প্রেমের পথ ও মত ছেড়ে একদিনও আলাদা থাকেননি। কালীঘাটের এক উকিলবাবুর ছেলে কিশোর বয়সে ঘর ছেড়ে হয়েছিল ষষ্ঠী অপেরার সখীর দলের সখী। তারপর মথুর সাহার থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টীতে। এরপর বিজয়কৃষ্ণ অভিনয় করেন ভোলা পালের রয়েল বীণাপাণিতে এখানে ন'বছর কাটিয়ে নদীয়ার বিখ্যাত ব্রজেন দাসের 'বসাদি অপেরা'য় যান। অভিনয়ে সবাইকে মাতিয়ে দিয়ে তিনি যুক্ত হন হেতেমপুরের রাজাদের 'রঞ্জন অপেরা'য়। এরপর আর্য অপেরা, গণেশ অপেরা হয়ে প্রায় সব দলে খ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করেন। অভিনয় করেন ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ, জ্যোৎস্না দত্তের বিপরীতে। প্রখ্যাত দল পরিচালক হরিপদ বায়েনের বন্ধু হয়ে কলকাতায় রঞ্জনের নব প্রতিষ্ঠায় যোগ দেন। এই সময়ে চলচ্চিত্রের গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে যাত্রায় আনেন বিজয়কৃষ্ণ। এরপর বেছে নেন অভিনয় জীবন ছেড়ে দল পরিচালনা। বুকিং এজেন্সির কাজ। তারপর একদিন নীরবে হারিয়ে যান। যাত্রার ইনি ছিলেন এক জীবন্ত ইতিহাস।

পুথিগত বিদ্যা ছিল না বলে প্রকৃত বিদ্যার মূল্য তিনি জানতেন বলেই, জীবদ্দশায় প্রায় অধিকাংশ মালিকদের জনশিক্ষামূলক পালা প্রযোজনার জন্য বার বার উপদেশ দিতেন। বার বার বলতেন, আমাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য কিছু করুন। কাঁপা কাঁপা হাতে, সম্পূর্ণ ভুল বানানে ২ খানা বড় খাতায় নিজের জীবন স্মৃতি লিখেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, যদি পারেন যত্ন করে রেখে দেবেন গৌরাঙ্গবাবু কোন দিন কাজে লাগতে পারে।

॥ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥

১২৭০ সনে বর্ধমান জেলার বাগনাপাড়ায় এক বর্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ পরিবারে স্বনামধন্য অভিনেতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্ম। প্রথমে প্রসন্ন নিয়োগী ও পরে গণেশ অপেরা পার্টীতে অভিনেতা ও নাট্য শিক্ষক বা নির্দেশক হিসেবে আশাতীত খ্যাতি পাবার পর নিজেই রামকৃষ্ণ নাট্য সমিতি নামে একটা যাত্রাদল তৈরি করেছিলেন। প্রথম বয়সে সতীশচন্দ্র নারী চরিত্রে রূপদান করে খুবই প্রশংসা পান, পরবর্তী সময়ে পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেছিলেন। 'দেবযানী' পালায় কচ, 'শিবি রাজা'র শিবি, 'শ্মশান' পালার তেজচন্দ্র, 'কল্যাণী'র চন্দ্রকেতু চরিত্রে তাঁর নতুন ধারার যে অভিনয়, তা চিরস্মরণীয়। ১৯৫১ সালে এই শিল্পীর মহাপ্রয়াণ ঘটে।

॥ সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ॥

১২৯৬ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথের জন্ম। মিলিটারীতে যোগ দিয়ে ইনি মূলত কর্মজীবন শুরু করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেন, এই সময়ে এই কর্ম সূত্রে কবি নজরুল ইসলাম, অভিনেতা বিশ্বনাথ ভাদুড়ী ও ভূমেন রায়ের সঙ্গে মধ্য এশিয়ায় কাটান। এই হেন মানুষটির অভিনয়ের প্রতি আকর্ষণ ছেলেবেলা থেকে। ইংরেজি ১৯০৩ সালে গিরিশচন্দ্র ঘোষের সান্নিধ্যে থেকে তাঁরই 'ধ্রুব' নাটকে ধ্রুব চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসা পান। এতে বালক সুরেন্দ্রর গলার গান গিরিশচন্দ্রকে মুগ্ধ করে। প্রকৃত পক্ষে সুরেন্দ্রনাথের প্রথম নাট্য শিক্ষক রসরাজ অমৃতলাল বসু। পরে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার। বিভিন্ন রঙ্গালয়ে অভিনয় করা কালীন, দরিদ্রতার জন্য যাত্রায় যোগদান করেন। মথুর সাহার থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টীতে একের পর এক বহু পালায় রূপদান করে তিনি খ্যাতিমান হন। এরপর যে দলগুলিতে তিনি সসম্মানে অভিনয় করেন সেই দলগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : ভাণ্ডারী অপেরা, গণেশ, আর্য, সত্যম্বর, ভোলানাথ অপেরা, নট্ট কোম্পানি, বীণাপাণি নাট্য সমাজ। মাসিক বসুমতী পত্রিকায় সুরেন্দ্রনাথ আত্মস্মৃতি লিখেছিলেন।

১৯৬৯ সালে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে স্বয়ং বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সুরেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকার প্রচার করেন রাত ৮.৪৫ মিনিটে। সাক্ষাৎকার নেন, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। এই সালেই বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আয়োজিত নাট্য সম্মেলনের প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করে বিবর্তন ধর্মী অভিনয় ও গানের ফলিত উদাহরণ সহ ভাষণ দিয়ে সম্মানিত হন।

আবার এই সালেই রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একস্‌টেনশান লেকচারের জন্য অতিথি বক্তা হিসেবে সম্মান লাভ করেন।

১৯৭২ সালে সুরেন্দ্রনাথ অকাদেমী পুরস্কারে সম্মানিত হলে, যাত্রা শিল্পী সঙঘ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ থেকে শিল্পীকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। ১৯৭৩-এ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যাত্রা উৎসবের প্রথম বর্ষের বিচারক মণ্ডলীর সভাপতিপদে আসীন হন। ১৯৭৭ সালে কলকাতা দূরদর্শন থেকে সুরেন্দ্রনাথের অভিনয়-বক্তৃতা প্রচার করা হয়।

এই মহান শিল্পীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা জগতের অতীত ও বর্তমানের গ্রন্থি ছিন্ন হয়।

॥ ফণিভূষণ মতিলাল (ছোট ফণি) ॥

১৩১১ সন। বড়িষার শশীভূষণ মতিলালের ঘরে ফণিভূষণ মতিলালের জন্ম। যাত্রার 'যুবরাজ' বলতে এক কথায় যিনি চিহ্নিত হতেন বা আজও অনেকেই যাঁকে সেই ভাবে জানেন, সেই ফণি মতিলালের অভিনেতা জীবনের স্রষ্টা হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। এই 'যুবরাজ' জন্মেছিলেন এক রাশ দরিদ্রতার মধ্যে। ১৩১৮ সনে বাবার মৃত্যু হলে ফণি আর তাঁর অন্য ভাইবোনদের নিয়ে চরম বিপন্ন হন মা। টাকার অভাবের জন্য শেষ পর্যন্ত ছোট ফণির বৃত্তি পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। এই সময়ে নিকট আত্মীয়া উমাশশী দেবী ফণিকে ধর্মপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। তারপর আবার পড়াশোনা শুরু করেন বটে কিন্তু পড়ায় মন বসাতে পারেন না। এই সময়ে উমাশশী দেবীর দাদা হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ছিলেন ভূষণ দাসের কর্মকর্তা। হরিপ্রসন্ন একবার শুনেছিলেন বালক ফণির আবৃত্তি। চমৎকার গলা। অসামান্য উচ্চারণ। সেই সূত্রে ভূষণ দাসের দলের 'ধ্রুব' আসরস্থ হয়েছিল নিমতলার কাঠগোলায়। অভিনয় করে বালক ফণি সাত-সাতটা রূপোর মেডেল জয় করে নিয়েছিল। সেই থেকে চুয়ান্নটি বছর ফণিভূষণ মতিলাল সসম্মানে অধিষ্ঠিত ছিলেন যাত্রার সিংহাসনে।

ভূষণ দাসের দল ছেড়ে ছোট ফণি আসেন শ্রীচরণ ভাণ্ডারীর দলে। সেখান থেকে আসেন গদাধর ভট্টাচার্যের দলে। যখন শশী নট্ট ছিলেন নট্ট কোম্পানির কর্ণধার তখন ছোট ফণি আসেন সেই দলে। এখানে 'খনা' পালায় প্রথমে 'খনা' চরিত্রে অভিনয় করতেন চুটিয়ে। যে অভিনয়ের দাপটে ম্লান হয়ে যেত 'মিহির' চরিত্রের অভিনয়। এই সময়ে তাঁর মসিক মাইনে ছিল ছাব্বিশ টাকা। ফণিকে পূর্ববঙ্গে সবাই 'ফণ্যা বা ফণিয়া' বলে ডাকত। এক সময়ে যাত্রার দর্শকদের দাবীতে নট্ট কোম্পানির মালিকপক্ষ ছোট ফণিকে খনার পরিবর্তে মিহির চরিত্রে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। বারো বছর অর্থাৎ একটা যুগ ফণিভূষণ মতিলাল নট্টতে কাটিয়ে সুরেন ব্যানার্জীর বীণাপাণি নাট্য সমাজ হয়ে চলে আসেন শশী হাজরার দলে। এখানে বিখ্যাত অভিনেতা শরৎ পাল ষড়যন্ত্র করে ছোট ফণির দাপট খর্ব করতে চেয়েছিলেন। পরে অভিনয় মাধুর্যে তার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন ফণি মতিলাল। ফণিবাবু যখন গণেশ অপেরায় এবং খ্যাতিমান তখন গণেশ অপেরা থেকে মাইনে পেতেন ১০০ টাকা। এর পরই নট্ট কোম্পানি যখন তাঁকে ১৩০ টাকা বেতনে নিল, তখন তাঁর উল্লাসের সীমা ছিল না। যা হোক, বহু বহু পালার নায়ক ছোট ফণির 'সিরাজ' ইতিহাস মনে রেখেছে। এ ছাড়া মীরকাশেম, চরিত্রাভিনয় ভুলবে না কেউ, যেমন ভোলেনি 'প্রবীরার্জুন' 'লীলাবসান', 'রামানুজ' পালার অভিনয়। ছোট ফণিবাবুর অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে যাত্রার দর্শককুল

'নটসম্রাট' বলেই মেনে নিয়েছিলেন। যাত্রার ইতিহাসে অভিনেতা ফণিভূষণ মতিলালের (ছোট ফণি) নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকলেও, এ কথাও স্পষ্ট হয়ে থাকবে, যাত্রার সঙ্গে যাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সম্পর্ক ছিল, এ যুগের যাত্রার স্বার্থপর ভূমিকার শিকার হয়ে একরাশ হাহাকারের যন্ত্রণা নিয়ে তাঁকে হারিয়ে যেতে হয়েছে। ছোট ফণিবাবুর শেষ অভিনয় নাট্যভারতীর 'উপেক্ষিতা' পালার ভীষ্ম চরিত্রে।

॥ ষষ্ঠীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

ষষ্ঠীচরণকে সবাই বলতেন বাঁড়ুজ্জে মশাই। যাত্রা জগতে ষষ্ঠীবাবু আর সুনীলবাবু অর্থাৎ রামবাবুর মত বাচন ভঙ্গী, উচ্চারণ দক্ষতা তখনকার দিনে কারও ছিল না। যেমন ছিলেন সুপুরুষ তেমনি ছিলেন ফর্সা। সাহেবের মত দেখতে এই মানুষটি যে কতটা শক্তিমান অভিনেতা ছিলেন তার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে নট্ট কোম্পানির বর্তমান কর্ণধার মাখনবাবু বলেছিলেন—"একবার বাঁড়ুজ্জে মশাই ভিলেন সেজেছিলেন "মানিকমালা" পালায়, তাঁর চরিত্রের নাম ছিল জগ রায়। 'চাঁদের মেয়ে' পালায় সাজতেন এনায়েৎ খাঁ। সে কী দুর্ধর্ষ অভিনয়! একবার রংপুর ডিষ্ট্রিকট্ বোর্ডে গান। অনেক বড় বড় অফিসাররা যাত্রা দেখতে এসেছিলেন। ইংরেজ আমল। একজন সাহেব সেদিন তাঁর পোষা কুকুর নিয়ে এসেছিলেন যাত্রা দেখতে। প্রায় শেষ দৃশ্যে বাঁড়ুজ্জে মশাই এমন অভিনয় করছিলেন যে দর্শকদের রক্ত পর্যন্ত তপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। এই জগ রায় তাঁর বোনের সঙ্গে সম্রাটের বিয়ে দিয়েছিলেন, সম্রাটের কাছ থেকে ভবিষ্যতে সব ছিনিয়ে নেবেন এই উদ্দেশ্যে। এবার শেষ দৃশ্যে তিনি ভয়াল-ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছেন, এমন সময় দর্শক সাহেবের কুকুরটা সাহেবের হাতে বক্‌লেসে বাঁধা থাকা সত্ত্বেও আচমকা ছুটে গিয়ে আসরে উঠে ষষ্ঠীবাবুকে কামড়ে ধরেছিল। কুকুরটা পর্যন্ত ঐ চরিত্র দেখতে দেখতে বুঝতে পেরেছিল ঐ চরিত্রটা মানে ঐ লোকটা খারাপ-বদমাশ। বাঁড়ুজ্জে মশাইয়ের গায়ে মোটা ধরনের পোষাক ছিল তাই রক্ষে! কুকুরটা দাঁত বসাতে পারেনি—"

এই কিংবদন্তীর যাত্রা শিল্পীদের সীমাহীন শ্রম, একাগ্রতা এবং যাত্রার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ, যাত্রার উত্তরসূরিদের পথ হয়েছে সরল, দারিদ্র্যের তীব্র যন্ত্রণায় মৃত্যু দিয়ে এঁরা একালের রূপকারদের পার্থিব জীবনে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার পথ রচনা করে গেছেন।

॥ মাখন সমাদ্দার ॥

যাত্রা জগতের এক বরণীয় শিল্পী মাখন সমাদ্দার। কৌতুক অভিনেতা হিসেবে তাঁর তুল্য কৌতুক অভিনেতা আর দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। বিখ্যাত কৌতুক অভিনেতা হয়তো অনেকেই ছিলেন, কিন্তু মাখন সমাদ্দার হতে পারেননি কেউই। কি যৌবনে-কি-প্রৌঢ় বয়সকালে মাখনবাবু পাতার পর পাতা সংলাপ আউড়ে, বিকৃত অঙ্গভঙ্গি করে কখনই কাতুকুতু দিয়ে দর্শকদের হাসাবার চেষ্টা করেননি, তিনি দর্শকদের হাসাতেন চোখ-ভ্রূ-আর হাতের নানা মুদ্রায়। প্রায় ৫০০ পালায় ৫০০ চরিত্রে রূপদান করেছিলেন এই বরণীয় শিল্পী। তিনি ৮৬ বছরেও তাজা-তরুণের মত অভিনয় করেছিলেন। শেষ-কয়েক বছর যুক্ত ছিলেন জনতা অপেরায়। রূপদান করেছিলেন 'মেয়ে নয় মনসা' এবং 'রাজবাড়ির রাধা' পালায়। ১৯৮৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই শিল্পীকে অকাদেমী পুরস্কারে সম্মানিত করে। সাংস্কৃতিক সাংবাদিক সংস্থার পক্ষ থেকেও এই শিল্পীকে সম্মানিত করা হয়েছিল প্রেস ক্লাব তাঁবুতে। ১৯৮৭ সালের ২১ এপ্রিল এই শিল্পীর মৃত্যু হয়।

॥ দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

বিদ্যাসাগর কলেজে বি. এস-সি পড়বার সময় থেকেই অভিনয় জীবনের সূত্রপাত দেবেনবাবুর। কর্মজীবনে রেলের চাকরি আর পেশাদারী মঞ্চে অভিনয় একই সঙ্গে চলত। শ্রীরঙ্গম থেকে শুরু করে ষ্টার, রঙমহল, বিশ্বরূপা ও মিনার্ভা—কোন মঞ্চেই তাঁর অভিনয় বাদ পড়েনি। সে যুগের বহু বাঘা বাঘা অভিনেতাদের সঙ্গে পিতাপুত্র, মহানিশা, কালিন্দী, মহারাজ

নন্দকুমার, দিল্লী চলো, সমুদ্রগুপ্ত ইত্যাদি বহু নাটকে অভিনয় করে এই সুদর্শন অভিনেতা দর্শক মহলের সাদর অভ্যর্থনা কুড়িয়েছিলেন।

ছায়াছবির জগতেও তিনি প্রিয়া, ভিন্‌দেশের মেয়ে, বাবলা, জন্মতিথি, বিদ্যাসাগর, অন্নপূর্ণার মন্দির, কাঁচের স্বর্গ, সূর্যতোরণ, এরা কারা এবং সাড়ে চুয়াত্তর প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় করেন।

১৯৫৮ সালে যাত্রাজগতে আর্য অপেরার 'কবরের কান্না' পালায় প্রথম অভিনয় করেন। এরপর থেকে তিনি সুখ্যাতির সঙ্গে নট্ট, নিউ রয়েল বীণাপাণি, তরুণ, সুশীল নাট্য, জনতা, মাধবী নাট্য, সত্যম্বর, নাট্যভারতী প্রভৃতি অনেক দলেই অভিনয় করেছেন। কেবলমাত্র অভিনয়ই নয়, নির্দেশক রূপে তিনি তাঁর পারদর্শিতার পরিচয় রেখেছেন ঘুম ভাঙার গান, রক্তে রাঙা হাঁসুলীডাঙ্গা, সুলতান মামুদ, নকল রাজা, জোর বরাত, সরল হুকার প্রভৃতি পালায়।

চিত্র, মঞ্চ ও বেতার খ্যাত বাষট্টি বছরের এই অভিনেতা অভিনয়ের সঙ্গে নাট্য নির্দেশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন শ্রীদুর্গা অপেরায়।

তারপর আরও বহু দলে বহু ভূমিকায় অভিনয় করে একদিন নীরবে হারিয়ে গেলেন তিনি।

॥ মনোরঞ্জন চক্রবর্তী ॥

উত্তর কলকাতার হরিতকি বাগানে মনোরঞ্জনবাবুর জন্ম হয় ১৯২৬ সালের ২ জানুয়ারি। প্রথম জীবনে আর সকলের মতই সৌখিন নাট্য সম্প্রদায়ে দু-একটি নাটকে অভিনয় করার পর মনোরঞ্জনবাবু উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন সিকদার বাগান সংগীত সমাজ প্রযোজিত 'ঠাকুর রামকৃষ্ণ' নাটকে তোতাপুরীর বিশিষ্ট ভূমিকায়।

এর কিছুদিন পরে মনোরঞ্জনবাবু নবযুগ নাট্য সংসদ গড়ে সতীর ঘাট কালনদীর চরে ইত্যাদি পালায় অভিনয় করে সকলের প্রশংসা লাভ করেন। ১৯৬০-৬২ সালে যাত্রাজগতে মনোরঞ্জনবাবুর প্রথম পদক্ষেপ তরুণ অপেরায়। তাঁর অভিনীত পালাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য শহীদ বীর, বাঙ্গালীর দাবী এবং প্রহ্লাদ। তারপর কুণ্ডু নাট্য কোম্পানির তালিকায় আছে এ দেশ কাদের, রামায়ণের আগে ইত্যাদি নাটক। সত্যম্বর অপেরায় 'একটি পয়সা' নাটকে মনোরঞ্জনবাবুর অভিনয় অসামান্য সাফল্য লাভ করে। এরপর মাধবী নাট্য কোম্পানিতে প্রথম নট ও নাট্য পরিচালকের দ্বৈত দায়িত্ব নেন। এখানে তাঁর অভিনীত এবং পরিচালিত 'রক্ত দিয়ে কিনলাম' ও 'আগুন নিয়ে খেলা' দর্শক সমাজে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি পায়। লোকনাট্যের 'অভিশপ্ত ছিয়াত্তর' নাটকে মহারাজ নন্দকুমারের ভূমিকায় মনোরঞ্জনবাবুর অভিনয় তাঁর খ্যাতির পরিধিকে প্রশস্ততর করে।

নিউ গণেশ অপেরায় তাঁর নির্দেশিত পালা 'নীল আকাশের নিচে'। প্রায় সব দলেই সসম্মানে অভিনয় করেছেন এই শিল্পী।

॥ ফণি গাঙ্গুলী ॥

যাত্রাজগতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের সারিতে এখনও যিনি নিজের শিল্পীসত্তাকে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছেন তিনি নটভাস্কর ফণি গাঙ্গুলী।

এই শিল্পীর জন্মস্থান যশোর। বিপিনবিহারী জ্যোতিঃশাস্ত্রীর সহযোগিতায় আদি চণ্ডী অপেরায় যোগদান করে শিল্পীজীবন শুরু করেন। এই সংস্থায় তিন বছরে তিনি শ্রীবৎসচিন্তা, চাষার ছেলে, আকালের দেশ, সমাজের বলি, যুবনেতা প্রভৃতি পালায় সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। এরপর নটবাহিনী অপেরার মহাচক্রে মহামায়া এবং সিরাজদ্দৌলা পালায় অভিনয় করেন। আর্য অপেরায় দীর্ঘ সাত বছরে ধর্মের বলি, সাধক রামপ্রসাদ প্রভৃতি পালায় ফণিবাবুর উচ্চমানের অভিনয় দলের সুনাম বাড়ায়। এরপর নাট্যভারতীতে উপেক্ষিতা, মা ও ছেলে এবং অভিশপ্ত মসনদ ; ক্যালকাটা অপেরায় বিপ্লবী কানাই, সীমান্তের বলি এবং লোকনাট্যের 'অভিশপ্ত ছিয়াত্তরে' ওয়ারেন হেস্টিংসের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

॥ গোপাল চট্টোপাধ্যায় ॥

১৯২৪ সালে বলরাম দে স্ট্রীটে অভিনেতা ও নির্দেশক গোপাল চ্যাটার্জীর জন্ম। গোপালবাবুর বয়স যখন মাত্র চার বছর সেই সময়ে বাবা আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। তাই মামার বাড়িতে মানুষ হন গোপালবাবু।

একদিকে লেখাপড়া আর তারই ফাঁকে ফাঁকে জোড়াসাঁকো ক্লাবের নাটকে অভিনয়ের মধ্যে মন্মথ পালের কাছে অভিনয় শিখতেন।

রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউটে 'পুরাণ ভকত' নাটকে অভিনয় করে সকলের প্রিয় হয়ে পড়েন। এরপর মিনার্ভা থিয়েটারে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়িয়ে দীর্ঘদিন অভিনয় করার পর প্রখ্যাত বাঁশি-বাদক গোপাল ঘোষের সহযোগিতায় যুক্ত হন আর্য অপেরায়। এখানে দেবদাস, ভক্ত হরিদাস, দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি পালায় অসাধারণ অভিনয় করেন তিনি। এরপর নিউ রয়েল বীণাপাণি, গণেশ এবং পরে নিউ গণেশ অপেরায় যুক্ত হয়ে শিবাজী, পৃথ্বীরাজ, রঘুবীর, দেবী চৌধুরাণী, মহীপাল, সম্রাট নাদিরশা প্রভৃতি পালায় অভিনয় করে বলিষ্ঠ অভিনেতার মর্যাদা পান।

১৯৭০ সালে নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরায় গোপালবাবুর সুষ্ঠু নির্দেশনায় ও অভিনয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে 'ক্ষুধিত ড্রাগন' এবং 'রাধার নিয়তি' পালা।

॥ সুজিত পাঠক ॥

১৯৩০ সালে কলকাতার রাজাবাজার অঞ্চলে উমাপদ পাঠকের ছেলে সুজিত পাঠকের জন্ম। প্রথম জীবনে বাটা সু কোম্পানিতে একটি সম্মানীয় পদে চাকরি করতেন সুজিতবাবু।

১৯৪২ সালে প্রফুল্ল সেনের সহযোগিতায় সৌখিন যাত্রা অভিনেতা হিসেবে 'মুক্তি যজ্ঞ' নাটকে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন তিনি।

১৯৫২ অথবা '৫৩ সালে সুজিতবাবু আর্য অপেরায় স্থায়ীভাবে যোগ দেন। তারপর কিছুদিন ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানে অভিনয় করে যুক্ত হন গণেশ অপেরায় এবং 'শিবাজী' পালায় অসাধারণ অভিনয় করে সকলের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার স্বীকৃতি আদায় করেন।

তারপর দীর্ঘ সাতবছর নট্ট কোম্পানিতে খ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করার পর দলবদলের পালায় চণ্ডী, সত্যম্বর, রঞ্জন, তরুণ, জনতা, শ্রীরাধা, ভারতী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে চণ্ডমুকুল, চন্দ্রশেখর, সমাজের বলি, দেবীদাস, সূর্য সেন, নীল রক্ত, বাঘা যতীন, আবুল হাসান, সম্রাট জাহাঙ্গীর, নীহাররঞ্জন গুপ্তের উল্কা, মায়ামৃগ ইত্যাদি পালাগুলি সুজিত পাঠকের অভিনয়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

বিশ্বরূপা থিয়েটারে 'কর্ণার্জুন' পালায় অর্জুনের চরিত্রে ধারাবাহিক অভিনয় করেন সুজিতবাবু। কেবলমাত্র অভিনেতা হিসাবেই নয়, নাট্য নির্দেশক হিসাবেও সুজিতবাবুর খ্যাতি অনস্বীকার্য।

মাধবী নাট্য কোম্পানির কাবুলিওয়ালা, কবরের নীচে, লাল পাথর, নহ মাতা নহ কন্যা পালায় অভিনয় করে এমন একটি আসন পাকা করেছিলেন তিনি যা তাঁর অবর্তমানে সেই শূন্যস্থান আর কারও পূরণ করা সম্ভব হবে না।

॥ পূর্ণেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

১৯১৪ সালে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে পূর্ণেন্দুশেখরের জন্ম যদিও এলাহাবাদে তবু হরিতকি বাগানে নিজের বাড়িতেই তাঁর শৈশবকাল কাটে। এ. ভি. স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করার আগে থেকেই থিয়েটারকে ভালবাসতেন তিনি। এই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন স্বনামখ্যাত নাট্যকার রসরাজ অমৃতলাল বসু। শ্রীবসুর কাছে আবৃত্তি শিখেছিলেন যুবক পূর্ণেন্দু। তৎকালের প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্নেহের ভাইয়ের মধ্যে অভিনয়ের রস আছে মনে করে

এক সময়ে নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরার তৎকালীন ম্যানেজার ইন্দু ঘোষের কাছে নিয়ে যান। সেখানে 'মহামানব' পালায় প্রথম অভিনয় করেন পূর্ণেন্দুবাবু। এরপর প্রখ্যাত অভিনেতা পঞ্চু সেন আদি গণেশ অপেরায় তাঁকে নিয়ে আসেন। 'বঙ্গবীর' পালায় অসাধারণ অভিনয় করেন তিনি।

প্রায় ৫০ বছর ধরে একটানা খ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করেই আজ সাধারণ মানুষের দেওয়া "আচার্য" শ্রদ্ধাঞ্জলিতে তিনি সম্মানিত। প্রায় ২৫০ পালায় অভিনয় করেছেন পূর্ণেন্দুশেখর। এই দীর্ঘ অভিনয় জীবনে যদিও তিনি বেসরকারি বহু মহল থেকে বহু পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন, কিন্তু সরকারি মহল এই মহান সংগ্রামী রূপকার প্রসঙ্গে থেকেছে উদাসীন।

পালা নির্দেশক হিসেবেও আলাদা একটা শ্রদ্ধার আসন পেয়েছিলেন তিনি। আজকের যাত্রা ক্ষেত্রের প্রায় সকলেই পূর্ণেন্দুবাবুকে "মাষ্টার মশাই" হিসেবেই শ্রদ্ধা করেন। তাঁর পরিচালিত ও অভিনীত "পাগলা ঠাকুর" সুপারহিট হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্রে এ যাবৎ যাঁরা অভিনয় করে স্মরণীয় হয়ে আছেন, তাঁদের বহু জনেরই মতে পূর্ণেন্দুশেখরের "রামকৃষ্ণ" আলাদা একটা ডাইমেনশান তৈরি করতে পেরেছে। পূর্ণেন্দুবাবুর অভিনয় জীবনের আর এক স্মরণীয় সৃষ্টি "নবাব সিরাজ"। পূর্ণেন্দুবাবুর অভিনয়ে তালিম দাদার মতই ছোট ফণিবাবুর কাছেও। পূর্ণেন্দুশেখরের অভিনয় ধারার মধ্যে দুটি জিনিসই হয়েছিল প্রধান। প্রথমত, বিভিন্ন চরিত্রেই অভিনয় করেছেন তিনি। দ্বিতীয়ত তাঁর অভিনয় কখনই অভিনয় হয়ে উঠত না। তিনি, সাধারণ মানুষ ব্যবহারিক জীবনে যে ভাবে কথা বলে, হাঁটে-চলে সেই ভাবেই আসরে কাজ করেছেন চিরকাল। চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছিলেন পূর্ণেন্দুশেখর। "আদর্শ হিন্দু হোটেল"-এর সেলুলয়েড সেই অভিনয়ের স্মৃতি ধরে রেখেছে। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের অনন্য অভিনয়ে মূর্ত হয়ে আছে 'মাদার ইন্ডিয়া', 'ডাকহরকরা' ইত্যাদি পালা।

পূর্ণেন্দুবাবুর আবির্ভাবকালে যখন যাত্রা অভিনয়ের পুরাতন ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল, তখনই তিনি তাঁর অভিনয় ধারা পাল্টে দিয়ে নতুন রীতির সূচনা করেছিলেন। পাঁচ জন ঘরে-বাইরে যেমন করে কথা বলে, পূর্ণেন্দুবাবু প্রথম থেকেই সেই অভিনয় করে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হন। পুরাতন স্মৃতি রোমন্থন করে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,—"বাইশ বছর বয়সে যাত্রায এসেছিলাম। আট থেকে ন'বছর একটানা আসরের পর আসরে মাইলের পর মাইল হেঁটে, গরুর গাড়িতে ঝাঁকুনি খেতে খেতে গিয়ে অভিনয় করেছি। সর্বাঙ্গে টনটনে ব্যথা নিয়ে অভিনয় করেছি। স্বর প্রক্ষেপণ, অভিব্যক্তি, উচ্চারণ দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করেছি। মাইক-টাইক ছিল না, অথচ কয়েক হাজার দর্শকের শেষ লোকটি পর্যন্ত অভিনয় উপভোগ করেছেন। গ্রীষ্মের খর তাপে পুড়তে পুড়তে আসরে পৌঁছেছি যথা সময়ে। ঠিক সময়ে আসরে হাজির হয়েছি বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে। আমাদের আমলে আমরা দলে যখন থাকতাম একান্নবর্তী পরিবারের মত থাকতাম। এইভাবেই বাগ্‌দেবীর যাত্রা নামের পাদুকা মাথায় করে আমরাই সর্বাধুনিক যুগের আলোয় পৌঁছে দিয়েছি।" পূর্ণেন্দুবাবু আরও বলেন, "যাত্রার গর্ভ থেকেই যে থিয়েটারের ও সিনেমার জন্ম, বর্তমানে সেই থিয়েটার আর সিনেমার করুণায় যাত্রার বেঁচে থাকা চলছে। এ সব না যাত্রা-না থিয়েটার-না সিনেমা-না ম্যাজিক। এর যে কোন একটাকে পুরোপুরি ভাবে যদি যাত্রায় লাগানো হতো, তা হলেও বুঝতাম একটা কিছু হচ্ছে। যাত্রা নামে এখন যা চলছে সে যদি এখনও স্বতন্ত্র না হয় বাঁচবে না—"

যে পূর্ণেন্দুবাবু এক সময়ে মনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সীমাহীন সুরাপানে অভ্যস্ত ছিলেন, পরবর্তী সময়ে যুগ বিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে, যাত্রা জগত ও যাত্রা দলগুলির মধ্যে চিরস্থায়ী ডিসিপ্লিন ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য সেই সুরা বর্জন করে যেমন চরিত্রিক দৃঢ়তার নজির রাখেন, তেমনি তিনি যে পুরোদস্তুর বাঙালি সেই গৌরব বহন করেছেন সারাজীবন ধরে। পূর্ণেন্দুশেখরের নানা স্তরে আত্মত্যাগও স্মরণীয়।

দেশের সর্বস্তরের উন্নতির সঙ্গে কলকাতার সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের উন্নতি যেমন হয়েছে, তেমনি কোথায় যেন আজকের সংস্কৃতির ধারক বাহকেরা, অনায়াসে হয়ে পড়েছেন আত্মকেন্দ্রিক। এ দেশের দূরদর্শনের কল্যাণে এক শ্রেণীর মানুষ যত কর্মযজ্ঞই করুন, এ দেশের এমন কিছু মানুষ আজও অন্ধকারে পড়ে আছেন যাঁদের প্রতি কোন কর্তব্যের দায়বদ্ধতা তাঁদের নেই। তা যদি থাকত, হলে জ্যোৎস্না দত্ত, পূর্ণেন্দুশেখর, স্বপনকুমারকে চিরকালের জন্য বাঁচিয়ে রাখার কোন পথও তৈরি করে দিতেন।

॥ শিব ভট্টাচার্য ॥

নানা কারণে যে মানুষটিকে বা যে শিল্পীকে চল্লিশের দশকের পরের প্রজন্ম ভুলবে না কোনদিন, তিনি শিব ভট্টাচার্য। কৌতুক এবং সিরিয়াস চরিত্রের অভিনয়ে শিববাবু এমন এক মাত্রা যোগ করেছিলেন যার বিকল্প পরবর্তী সময়ে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি! যাত্রা শিল্পের সার্বিক কল্যাণের জন্য তাঁর যে সংগ্রাম, সেই দৃষ্টান্ত ব্যক্তিগতভাবে আর কেউ করেছেন বলে জানা যায় না। যাত্রা প্রতিষ্ঠানের বিশেষ করে যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয় সেই প্রতিষ্ঠানের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করার যে মানসিকতা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শিব ভট্টাচার্য দেখিয়ে গেছেন, তেমনি মানসিকতা আর কারও আছে বলে অদ্যাবধি জানা যায়নি। তাই আজও সকলে মনে করেন, 'তরুণ অপেরা' এবং শান্তিগোপালের জীবনের এক এবং অদ্বিতীয় আপনজন ছিলেন শিব ভট্টাচার্য। শিব ভট্টাচার্যের প্রথম পরিচয়, তিনি ছিলেন জাত অভিনেতা। তাঁর দ্বিতীয় পরিচয়, তিনি ছিলেন যাত্রা মাতৃকার খাঁটি পূজারী! এই হেন মানুষটির জন্ম হয়েছিল ধর্মতলা স্ট্রীটে মামা বাড়িতে। ১৯৪৭ সালে শিববাবু প্রথম পেশাদার যাত্রায় যোগ দেন। প্রথম দিকে তাঁর অভিনীত 'মায়ের দেশ', 'ভগুল', 'চন্দ্রহাস', 'কপিল' পালা খুবই জনপ্রিয় হয়। মাঝে রঙমহলে যুক্ত হন তৎকালীন কর্ণধার ও অভিনেতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতায়। পরে আবার ফিরে আসেন যাত্রায়। নবরঞ্জন অপেরায় 'বিচারক' ও 'ভক্ত হরিদাস' পালায় এবং নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরার 'কবি চন্দ্রাবতী' পালায়, গণেশ অপেরার 'পরিচয়' ও 'প্রতাপাদিত্য' পালায় অতুলনীয় অভিনয় করে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হন। এরপর যোগ দেন তরুণ অপেরায়। এই প্রতিষ্ঠানের 'নেপোলিয়ান বোনাপার্ট', 'রমলা সার্কাস', ইত্যাদিতে অভিনয় করে দর্শকমন মাতিয়ে, অভিনয় জীবন থেকে অবসর নিয়ে, তরুণ অপেরা এবং শান্তিগোপালের সার্বিক কল্যাণের জন্য নিজেকে চিরকালের মত জড়িয়ে ফেলেন এখানে।

শিব ভট্টাচার্যের লেখা বহু যাত্রা প্রবন্ধ একত্রিত করলে একটি উল্লেখযোগ্য সংকলন গ্রন্থ তৈরি হতে পারে। এই শিল্পী ও মহান কর্মী শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর পাশে প্রখ্যাত ড্রিমল্যাণ্ড নার্সিংহোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শিববাবুকে সুস্থ করে তোলার জন্য সেদিন ড্রিমল্যাণ্ডের কর্ণধার-ডাক্তার সুধীর ঘোষ এবং অন্য ডাক্তারদের শ্রমের অন্ত ছিল না।

শিব ভট্টাচার্যের মৃত্যুর তারিখ ছিল ৫ আগষ্ট ১৯৮১। মৃত্যুর খবর যেমন বেতারে বলা হয়েছিল তেমনি সব পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি ছিল এই রকম ঃ

"...শোক সভায় স্মৃতি চারণ করলেন অনেকেই। যাত্রা জগতের নানা বিভাগের লোক। রঙ্গমঞ্চ থেকে কেন শিব ভট্টাচার্য যাত্রায় এলেন, গণেশ অপেরা থেকে যাত্রা শুরু করে আর্য অপেরা, রঞ্জন অপেরা, রয়েল বীণাপাণি হয়ে তরুণ অপেরাকে নব পর্যায়ে রূপান্তরিত করার নানা ঘটনার সঙ্গে তরুণ অপেরার অগ্রগতির ইতিহাসে তাঁর সক্রিয় ভূমিকার প্রসঙ্গেও এখানে আলোচিত হলো। সভায় সমাপ্তি ভাষণ দেন সভাপতি শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র ব্যানারজি। প্রধান অথিথির আসনে ছিলেন ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। শিব স্মৃতি তর্পণ করেন কিরণ মৈত্র, নরেশ চক্রবর্তী নিমাই সুর,

অনাদি চক্রবর্তী, গৌরাঙ্গ ঘোষ, তরুণ দে, বিমান ঘোষ, হারু রায়, গৌতম সাধুখাঁ, অমিতাভ মৈত্র, নৌশাদ মল্লিক প্রভৃতি।"

॥ ভোলা পাল ॥

১৩১১ সালে উত্তর কলকাতার পাল পরিবারে 'বড় ভোলা' নামে সর্বজন পরিচিত এই অভিনেতা জন্মগ্রহণ করেন।

লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে থিয়েটার ও যাত্রায় অভিনয় করতেন তিনি। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর শ্রীপালের কর্মজীবন শুরু হয় বি. কে. পাল কোম্পানিতে। ১৯৩৬ সাল থেকে যাত্রাজগতের সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েন।

ভোলা পালের পিতা গোষ্ঠবিহারী পালের অভিনয় অনুরাগ ছিল অসীম। ১৯৩৬ সালে তিনি বীণাপাণি অপেরা নামে নিজেই একটি দল তৈরি করেন। নেপথ্যে পুত্রই হলেন এই দলের মূল স্বত্বাধিকারী। পরে রয়েল বীণাপাণিতে নবাগত অভিনেতা হিসেবে প্রথম অবতীর্ণ হন। এই দলের 'নারী ঋষি ও নিয়তি'তে সুঅভিনয়ের গুণে প্রতিভাবান অভিনেতা হিসেবে স্বীকৃতি পেলেন যাত্রাজগতে। প্রায় পঞ্চাশ বছরের অভিনয় জীবনে দল বদলের পালায় কত দলেই না তিনি অভিনয় করলেন।

ভোলা পাল অভিনীত পালার সংখ্যা প্রায় তিনশোর ওপর। বড় ফণিবাবুর সঙ্গে 'বাঙ্গালী' পালায় ভোলা পালের মুনিব খাঁর ভূমিকা আর ছোট ফণিবাবুর সঙ্গে 'মহিষাসুর' যাত্রায় নাম ভূমিকায় তাঁর অমর অভিনয় নির্দ্বিধায় এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

কেবল যাত্রা মঞ্চই নয় ছায়াছবিতেও অভিনয় করেছেন তিনি। রাজমোহনের বৌ, বিপ্লবী ক্ষুদিরাম, কাবুলিওয়ালা, মহাকবি কৃত্তিবাস, জননী তারই উজ্জ্বল প্রমাণ হিসেবে চিহ্নিত।

॥ পঞ্চু সেন ॥

তখন বালক, অথচ পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারেনি। পড়বার সামর্থ্যও নেই, সুতরাং মা গেলেন খুব কাছাকাছি বাড়ির বাসিন্দা, স্বনামধন্য অভিনেতা দানীবাবুর কাছে। ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে উপদেশ চাইলেন। দানীবাবু কী বুঝেছিলেন কে জানে। বলেছিলেন, তুমি কিছু ভেবো না মা, তোমার ছেলে একদিন খুব বড় অভিনেতা হবে। ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যে হয়নি। সেদিনকার বালক পঞ্চু, পরবর্তীকালের স্বনামখ্যাত অভিনেতা পঞ্চু সেন। ১৩১৮ সনের ২৮ মাঘ, নগেন্দ্রনাথ সেনের ছেলে পঞ্চু সেনের জন্ম বাগবাজার অঞ্চলে। দানীবাবুকে 'দাদু' বলে ডাকত বালক পঞ্চু। অভিনয়ে প্রথম তালিম দেন দানীবাবু। পরে অবিনাশ গাঙ্গুলীর শিক্ষকতায় পঞ্চু সেনের অভিনয় অঙ্গনে প্রবেশ। পাড়ার সৌখিন থিয়েটারে 'চর মঙ্গল' নাটকে প্রথম আত্মপ্রকাশ। মাত্র বাইশ বছর বয়সে পেশাদার অভিনয় জীবনের সূচনা, ষ্টার অপেরায়। 'বাসুদেব' ও 'কর্ণার্জ্জুন' পালায় অভিনয় করেই দর্শকমন জয় করেন। এরপর একের পর এক যাত্রা দল থেকে তাঁর আমন্ত্রণ। নাট্যবীথি, গণেশ, নট্ট, রঞ্জন, ক্যালকাটা, প্রভাস, নাট্যভারতীতে অভিনয় করার সঙ্গে সঙ্গে খ্যাতির বিস্তার। কর্ণার্জ্জুন, একলব্য, রক্তসিন্ধু, বাঙ্গালী, চাঁদের মেয়ে, সাজাহান, রাইফেল, বিনয়-বাদল-দীনেশ প্রভৃতি পালায় অবিস্মরণীয় অভিনয় করেন। অভিনয় করেন 'যাযাবর' 'কা তব কান্তা', 'জননী' চলচ্চিত্রে।

পঞ্চুবাবু অনেক ব্যাপারেই গণেশ গোস্বামীর কাছে ঋণী। তা ছাড়া গর্বের সঙ্গে অনেকবারই বলেছেন,—"ছোট ফণিবাবু আমার অন্যতম অভিনয় শিক্ষক।" বলতে, বড় ফণিবাবু আর সূর্য দত্ত'র কাছে আমার অভিনেতা জীবন কৃতজ্ঞ!" পালাসম্রাট ব্রজেন দে এই শক্তিমান অভিনেতার, যাত্রার আধুনিক অভিনয়ের অন্যতম প্রবক্তা পঞ্চু সেনকে "অভিনয় জাদুকর" উপাধি দানে সম্মানিত করেন। বহু যাত্রা প্রতিষ্ঠানের শুভ সূচনার পুরোহিত এই পঞ্চু সেন।

১৯৭১ সালে এই মহৎ অভিনেতার আকস্মিক মহাপ্রয়াণ ঘটে। প্রসঙ্গ ক্রমে পালাসম্রাট

ব্রজেন দে বারবারই বলতেন,—"রাজনীতির জগতে যেমন চন্দ্রগুপ্তের ছিলেন চাণক্য, তেমনি যাত্রা জগতে আমার ছিলেন পঞ্চু সেন—"

যাত্রায় সংক্ষিপ্ত সংলাপ, হিউমার, আবেগ বর্জিত অভিনয়, রবীন্দ্র নাট্যের উপস্থাপনা যাত্রার আসরে, মূলত পঞ্চু সেনের অবদান। মহাজাতি সদনে এক কম্‌বিনেশন নাইটে 'সোনাইদীঘি' পালায় 'ভাটুক' চরিত্রে অভিনয় করে মন আর মঞ্চ তোলপাড় করে দিয়ে দু'দিন পরে মারা যান। ১৯৩৭ সালে নট্ট কোম্পানি প্রযেজিত ব্রজেন দে'র সংক্ষিপ্ত সংলাপ ব্যবহৃত 'চাঁদের মেয়ে' পালার ঈশা খাঁ চরিত্রে অভিনয় করে পঞ্চু সেন নতুন অভিনয় ধারার প্রবর্তন করেন। কৌতুক অভিনয়ের ক্ষেত্রেও পঞ্চু সেন ছিলেন অসামান্য, প্রমাণ ব্রজেনবাবুর 'দেবতার গ্রাস' পালার 'চন্দ্রচূড়' চরিত্র। পালাটি নট্ট কোম্পানি ১৯৪৪ সালে প্রযোজনা করে।

রঞ্জন অপেরার নব জন্ম, লোকনাট্য'র সৃষ্টি, স্বনামধন্য নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তকে যাত্রায় আনা, স্বপনকুমারের অভিনেতা প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা, উৎপল দত্তের যাত্রা পালাকার জীবনের অনুপ্রেরণা এ সব কিছুরই উজ্জ্বল স্মৃতি পঞ্চু সেন!

॥ পান্না চক্রবর্তী ॥

সবাই যাঁকে পান্নাবাবু নামে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছেন, সেই পান্নালাল চক্রবর্তীর মত তেজোদীপ্ত অভিনেতার জন্ম হুগলী জেলার আঁটপুর গ্রামে ১৩৪০ সনে। মাত্র এগার বছর বয়সে বাবা বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী মারা যান। যে ছেলে নিতান্ত ছোটবেলা থেকে ভাল গাইত, যার অভিনয়ের প্রতি ঝোঁক ছিল, বাবার মৃত্যুতে সেই বালক মন আহত হলো। সংসারের অনেকটা ভার এসে পড়ল তাঁর ওপর। একদিন প্রখ্যাত দল ম্যানেজার কমলকৃষ্ণ খাঁর সহযেগিতায় পান্নালাল সত্যম্বর অপেরায় গাইয়ে হিসেবে যুক্ত হবার সুযোগ পান। প্রথম রূপদান করেন 'বামাক্ষ্যাপা' পালায় সর্বানন্দ চরিত্রে। পরে নাম ভূমিকায় গানে ও অভিনয়ে দর্শক চিত্ত জয় করেন অনায়াস ভঙ্গিমায়। গায়ক হিসেবে পান্না চক্রবর্তী এমন শক্তিশালী ছিলেন যে তখনকার দিনের গায়ক অভিনেতারা রীতিমত ঈর্ষা করতেন। এর ফলে পান্না গান ছেড়ে শুধু অভিনেতা। এ ব্যাপারে সর্বজন শ্রদ্ধেয় গুরুপদ দাশ অনুপ্রাণিত করেন। পান্নাবাবুর প্রকৃত অভিনয় শিক্ষক ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ। পান্নাবাবু প্রথম নায়ক হিসেবে অবতীর্ণ হন গণেশ অপেরার 'পরিচয়' ও 'প্রতাপাদিত্য' পালায়। জীবনকৃষ্ণ দাশের অনুরোধে তারপর পান্নাবাবু নব রঞ্জনের নায়ক। 'বিধিলিপি', 'বর্গী এলো দেশে' পালায় দুর্ধর্ষ অভিনয় করেন। পঞ্চু সেন এবং বড় ভোলা পালের সহযোগিতা পেয়ে অভিনয়ের সঙ্গে নির্দেশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তরুণ অপেরায় অভিনয় করার পর পান্নাবাবু ভারতী অপেরার নায়ক ও নির্দেশক হন। পান্নাবাবু নির্দেশিত প্রথম পালা ভারতীর 'ভৈরবের ডাক'। এরপর 'বিসর্জ্জন'। জনতা অপেরায় 'ফাঁসির মঞ্চ' পালায় পান্নাবাবু যাত্রার আসরে, প্রকাশ্যে একজনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে নতুন আঙ্গিকের প্রবর্তন করেন। পান্না চক্রবর্তী যাত্রা জগতের প্রায় সব দলে খ্যাতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিনয় করেছেন। আজও করছেন। 'সম্রাট আলেকজেণ্ডার' পান্নাবাবুর জীবনের শ্রেষ্ঠ চরিত্রগুলির একটি।

॥ ননী ভট্ট ॥

কবিরাজ দুর্গাদাস ভট্টের ছেলে, স্বনামধন্য অভিনেতা ননী ভট্টের জন্ম কলকাতার আমহার্স্টি স্ট্রীটে। নির্মলচন্দ্র দাশের সহযোগিতায় ২৮ বছর বয়সে স্কট লেনের ভূষণ দাশের 'অমরাবতী নাট্য সমাজ'-এ ননী ভট্ট অভিনেতা হিসেবে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। এই দলে অভিনয় করতেন বটে কিন্তু ক্ষুধা মেটাবার মত পয়সা পেতেন না তিনি। অগত্যা একদিন ৩ টাকা রোজে ননী ভট্ট চলে আসেন শিবদুর্গা অপেরায়। বিনয় মুখার্জীর 'পাতালপুরী' পালায় নায়করূপে অবতীর্ণ হন। ছ'বছর জড়িত ছিলেন এই দলে। ১৯৪৫ সালে ননী ভট্ট ক্যালকাটা মিলন বীথির নায়ক হন। দু'বছর পর

১৯৪৭-৪৮ সালে ননীবাবু আসেন নট্ট কোম্পানিতে। 'চাঁদের মেয়ে' পালায় ঈশা খাঁ চরিত্রে দুর্দান্ত অভিনয় করে প্রতিষ্ঠা পান। ১৯৭০ সালে ননীবাবু নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরায় সত্যপ্রকাশ দত্তের 'ক্ষুধিত ড্রাগন' এবং চণ্ডী ব্যানার্জীর 'রাধার নিয়তি' পালায় অসামান্য অভিনয় করেন। পরে আরও কয়েকটি দলে অভিনয় করে, নীরবে চলে যান অন্তরালে।

॥ অনাদি চক্রবর্তী ॥

জন্ম হেতেমপুরে। সেখানকার সখের দলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজপরিবারের সবই। সেই রঞ্জন অপেরার "দেশের দাবী" নাটকে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। পরে এই দল নাম বদলে হল নব রঞ্জন অপেরা। অনাদিও একের পর এক নাটকে অভিনয় করলেন। দল পরিবর্তনের সঙ্গে অভিনীত নাটকের সংখ্যাও বাড়তে লাগল। সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখে অভিনয় করে চলেছেন আজও। যাত্রাশিল্পী বলতে যাত্রাশিল্পে এখনও যে কজন স্বমহিমায় উজ্জ্বল তাঁদের মধ্যে অনাদি চক্রবর্তী এখনও তাজা যুবক। উৎপল দত্তের স্ফুলিং অনাদিকে আরও শক্তিমান করেছে। এমন কোন দল নেই যেখানে তিনি খ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করেননি। অনেক পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

॥ বিজন মুখার্জী ॥

ইণ্টারমিডিয়েট পড়তে পড়তে নাট্যজগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ শুরু হয়েছিল বিজনের। থিয়েটার পাড়ায় ঘোরাঘুরি করতে করতে শিশিরবাবুর ভাই তারা ভাদুড়ীকে ধরে শিশির ভাদুড়ীর শিষ্যত্ব লাভ করেছিলেন।

শ্রীরঙ্গমের শিল্পী হয়ে বিজন মুখার্জীর প্রথম মঞ্চাবতরণ। এরপর গেলেন প্রথমে ষ্টারে পরে রঙমহলে। ষ্টারের তৎকালিন অভিনেতা বিপিন গুপ্ত ষ্টার ছেড়ে বোম্বে পাড়ি দিলে বিজনকে আবার ফিরে আসতে হল ষ্টারে। এই সময়ে ছবির জগতেও আনাগোনা করে অভিনয় করেন 'মৌচাকে ঢিল' আর 'বন্দেমাতরম' ছবিতে।

হঠাৎ একদিন বিজনকে চিৎপুরের যাত্রাপাড়ায় দেখা গেল। আদি রঞ্জন অপেরার 'চক্রছায়া'র অর্জুনের ভূমিকায় নামলেন বিজন মুখার্জী। যাত্রাজগতে এই ভাবেই শুরু তাঁর শুভযাত্রা। তারপর আর পাঁচজন শিল্পীব মতই বিজন মুখার্জীও গত পঁচিশ বছরের শিল্পীজীবনে দল বদলের পালায় ঘুরেছেন আর্য, গণেশ, রয়েল বীণাপাণি, নবরঞ্জন, কুণ্ডু, প্রভাস, লোকনাট্য, ভারতী ইত্যাদি বহু দলে। কেবলমাত্র অভিনয়ই নয়, দল পরিচালনা এবং পালা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণেও তিনি পিছিয়ে থাকেননি।

ইদানিং লোকনাট্য প্রযোজিত 'জয় বাংলা' ও 'দিল্লী চলো'য় তাঁর সার্থক অভিনয় ভোলবার নয়। কমলা অপেরার শিল্পী হয়ে 'বিপ্রদাস' পালায় প্রধান ভূমিকায় অসামান্য হন। অভিনেতা হিসেবে বিজনবাবু যতটা শ্রদ্ধার ছিলেন, মানুষ হিসেবে তাঁকে নিয়ে বিতর্কের শেষ ছিল না!

॥ নির্মল অধিকারী ॥

১৩২৯ সালের কার্তিক মাসে রংপুরের পঞ্চগড়ে ৺সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী ও ৺নন্দরাণী দেবীর ছেলে নির্মল অধিকারীর জন্ম। মাত্র দেড় বছর বয়সে বাবা মারা যান। মামা ৺ললিতমোহন রায়ের বাড়িতে একমাত্র ছেলেকে নিয়ে বিধবা মা চলে আসেন। এই মামা মারা যান যখন নির্মলবাবুর বয়স মাত্র চার বছর। মামা বাড়ির অবস্থা ছিল মোটামুটি সচ্ছল। আড়ংঘাটার এম. ই. স্কুলে প্রথম হাতে খড়ি। এখানে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে রাণাঘাটে লালগোপাল হাইস্কুলে ভর্তি হন। এখান থেকেই ম্যাট্রিক পাশ করেন। দরিদ্রতার জন্য চাকরির খোঁজ। চাকরি পান ইছাপুর মেটাল এণ্ড স্টীল ফ্যাকটরীতে। এরপর বিবাহিত জীবন। কিছুদিনের মধ্যে যাত্রা জগতের শ্রদ্ধেয় অভিনেতা শরৎ মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে নির্মলবাবু আসেন তৎকালীন আর্য অপেরায়। মালিক ছিলেন অতুল বসুমল্লিক। এখানে বেশ কয়েকবছর থাকার পর সুযোগ পান নট্ট কোম্পানিতে। বলা বাহুল্য,

নির্মলবাবুর প্রথম অভিনয় মামা বাড়ির কাছে নাট্যমহল-এ। তা ছাড়া এই পরিবারে অভিনয়ের রেওয়াজ ছিল। দাদামশাই-এর যাত্রাদল ছিল বলে শুনেছিলেন নির্মলবাবু।

নির্মলবাবু আর্য অপেরায় এসেই অভিনয় করেছিলেন বাঙ্গালী ও দাসীপুত্র পালায়। আর্যের পর আসেন নব রঞ্জন অপেরায়। ওখান থেকে ক্যালকাটা অপেরা, প্রভাস অপেরায় অভিনয় করেন। প্রভাসের মালিক ছিলেন গরানহাটার সন্তোষ দাস। নট্ট কোম্পানিতে ছিলেন ১১ বছর। আসেন ভারতী অপেরায়। এক বছর পর আবার নট্ট কোম্পানিতে। নট্টর পর আসেন লোকনাট্যে। এখানে উৎপল দত্তের ঘরানায় অভিনয় করেন সীমান্ত, তুরুপের তাস, মুক্তি দীক্ষা পালায়। লোকনাট্যে থাকার সময় মাতৃ বিয়োগ হয়। পরবর্তী সময়ে নিউ প্রভাস অপেরায় কাজ করাকালীন স্ত্রী বিয়োগ হয়। গণবাণী, মুক্তধারা আরও অনেক দলে অভিনয় করে খ্যাতি পান! এই প্রবীণ শক্তিমান অভিনেতার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার দিলেন না কিছুই এটা নির্মলবাবুর মনকে খুবই আহত করেছিল।

॥ অভয় হালদার ॥

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ হালদারের ছেলে অভয় হালদারের জন্ম ১৩৩৩ সনের ১৩ অগ্রহায়ণ। আদি নিবাস, হুগলী জেলার তাঁবা গ্রাম। কিশোর বয়স থেকে বাংলা এবং ইংরেজি কবিতা আবৃত্তির ঝোঁক ছিল বেশি। বাবা ছিলেন টেলিগ্রাফ চেক অফিসের কেরাণী, পরে হিসাব রক্ষক, কিন্তু ছেলে অভয়ের ছিল কেরাণী জীবনের প্রতি অনীহা। প্রথম দিকে চাকরি করেছেন, কিন্তু কোন চাকরিতেই নিজেকে স্থায়ী করার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেননি। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েই এক পবিত্র খেয়ালে মেতে ওঠেন। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশীদার হন। ১৯৪৩ সালে অভয় ছিলেন গান এণ্ড শেল ফ্যাক্টরীর কর্মী, লেবার ইউনিয়নের বিশেষ সদস্য। এই সালে যখন অল ইণ্ডিয়া অর্ডিন্যান্স স্ট্রাইক হয়, অভয়বাবু আরও কয়েকজনের সঙ্গে বন্দী হন। এরপর থেকে বিভিন্ন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে থাকেন। এই সময়ে লক্ষ্মীকান্ত দাস নামে এক ভদ্রলোক একটি ঠিকে যাত্রা দলে নিয়ে যান, সুদর্শন, সুপুরুষ অভয় হালদারেকে। দলের নাম বীণাপাণি অপেরা। আলাপ হয় আজকের সর্বজন শ্রদ্ধেয় অভিনেতা নটশেখর পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। যাত্রার অভিনয়ের ব্যাপারে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে নানা দিক থেকেই সাহায্য করতেন। ১৯৪৮ সালে আসেন নিউ নারায়ণ অপেরায়। এখানেও সহৃদয় স্বনামধন্য অভিনেতা পূর্ণেন্দুবাবুর সাহায্যে অভয়বাবু পরিণত অভিনেতা হন। এই দলে পঙ্কজভূষণ কবিরত্নের (চলচ্চিত্রের ফণি রায়) 'রক্তাঞ্জলি' পালায় জটায়ু চরিত্রে, পরে এই পালারই লক্ষ্মণ চরিত্রে রূপদান করেন অভয়বাবু।

১৯৪৮ থেকে '৮৮ সাল পর্যন্ত মোট ১৩টি দলে ৬০টি চরিত্র খ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করে-স্বনামখ্যাত হন। প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। খল নায়ক বলতে অভয় হালদার এক বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছিলেন। অভিনয় জীবনে নানা আসর থেকে বহু পুরস্কারে সম্মানিত হন। আনন্দলোক পরিবেশিত, অরুণ রায় পরিচালিত 'মায়ামৃগ' পালায় বিভূতি চরিত্রে অভিনয় করে পঃ সরকারের পুরস্কার পান। অভয় হালদারের জীবনের উল্লেখযোগ্য অভিনয় প্রায় সব পালায় ছিল, তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য উৎপল দত্তর 'ফেরারী ফৌজ', অরুণ রায়ের 'মায়ামৃগ', সমীর মজুমদারের 'মানুষের অধিকার', বছর কয়েক হলো অভয়বাবু বিভিন্ন দলের 'পরিচালক' হিসেবে কাজ করে চলেছেন।

॥ রাখাল সিংহ ॥

আসরে যাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের দেহ-মনের ওপর দিয়ে একটা শিহরণ খেলা করে যায়, উত্তেজনা বা ষড়যন্ত্রের দৃশ্যে যাঁর বিস্ময়কর এবং সুন্দর দুটি চোখের মণি কাঁপে, অস্থির হয় এবং সেই চোখের কাজে বা অভিব্যক্তিতে আসর তোলপাড় করা হাততালি পড়ে তিনি রাখাল

সিংহ। কংস অথবা রাবণ, পরশুরাম কিংবা সৈফুদ্দীন কিচলু আসলে দেখতে কেমন ছিলেন এই জিজ্ঞাসা যাঁদের মনে, যাত্রার আসরে রাখাল সিংহকে দেখলে তাঁরা অনায়াসে খুঁজে পাবেন জিজ্ঞাসার উত্তর।

বাংলার মাটিতে জন্ম নেওয়া এক দুর্ধর্ষ অভিনেতা যেমন রাখাল, তেমনি পুরুষ সিংহ বলতে অন্ততঃ বাঙালি মহলে রাখাল সিংহ অবশ্যই গৌরবের ধন। বর্ধমানের আলমগঞ্জের বর্ধিষ্ণু-ধনাঢ্য সিংহ রায় পরিবারে সুরেন্দ্র সিংহের ছেলে রাখালের জন্ম ১৩৫২ সনের ১০ কার্তিক। প্রাইমারী স্কুলের পর ১৯৬১ সালে আলমগঞ্জ কলেজিয়েট স্কুল থেকে স্কুল ফাইনাল, তারপর ১৯৬৫ সালে বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে গ্রাজুয়েট হওয়া রাখালের ছেলেবেলা থেকে অভিনয় করে পাড়া আর স্কুলের সবার মন মাতানো ছিল নেশা। মাত্র আড়াই বছর বয়সে মা আর এগার বছর বয়সে বাবাকে হারিয়েও লেখাপড়ার মধ্যে স্কুলে 'কেদার রায়' একাঙ্ক নাটকে ঈশা খাঁ, পাড়ার বড়দের সঙ্গে 'কোহিনুর' নাটকে একানে ছেলের কাজ করেন। ছেলেবেলায় ব্রজেন দে'র 'ধর্মের বলি' পালায় 'বান্দা' হয়ে প্রথম আসর থেকে জয় করেন প্রশংসা। এরপর বোলপুরের ঠিকে পার্টি শ্রীদুর্গা অপেরায় (শান্তিনিকেতন) রাখালবাবুকে নিয়ে যান পালাকার শম্ভু বাগ আরও অনেকে। আজকের প্রখ্যাত পালাকার ভৈরব গাঙ্গুলীর ভগ্নিপতি মনোরঞ্জনবাবু ছিলেন রাখালবাবুর প্রাইভেট টিউটর, সেই সূত্রে ভৈরববাবুর সঙ্গে পরিচয় থাকায় তিনিই রাখালকে প্রথম নিয়ে যান সত্যম্বর অপেরায়। এই দলের "জালিয়ানওয়ালাবাগ" পালায় সৈফুদ্দীন কিচলুর চরিত্রে পেশাদার পালায় উৎপল দত্তের শিক্ষায় প্রথম অভিনয়। মন্মথ রায়ের 'দিগ্বীজয়' পালায় স্বনামধন্য সন্তোষ সিংহের নির্দেশনায় অভিনয় করে খ্যাতি পান। এবার রাখাল সিংহের জীবন রথের চাকা গতি পায়। উৎপল দত্ত এই শক্তিমান শিল্পীকে লোকনাট্যের জয়বাংলা, (ইকবাল হোসেন), কালিন্দী (মিঃ মুখার্জী) পালায় কাজে লাগান। 'কালিন্দী' রিহার্সালে মাঝে মাঝে আসতেন কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সেই সূত্রে তাঁর সান্নিধ্যলাভ করেন রাখাল। এরপর একে একে অনেক দলে খ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করেন। তার মধ্যে ভারতী অপেরায় ৪ বছর কাটান। এই ভারতী অপেরাই রাখাল সিংহকে টপ আর্টিস্টের মর্যাদা দেয় প্রথম। 'কংস', 'সম্রাট আলাউদ্দীন', চরিত্রে অভিনয় করে রাখাল বিখ্যাত হয়ে পড়েন। তারপর যুগযাত্রা, গণেশ অপেরা, সত্যনারায়ণ অপেরা, নাগ কোম্পানি, নটরাজ, আবার সত্যনারায়ণ, রাজদূত, দিগ্বীজয়ী, যাত্রামঞ্চ, আবার দিগ্বীজয়ী দলে চরম খ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করেন বিগত কয়েক বছরে। অভিনেতা জীবনের মধ্যে নিয়মিত চালিয়ে যেতে থাকেন সাহিত্য চর্চা। পালাকার হন রাখাল সিংহ। লেখেন 'রেশমী বেগম' (মাধবী নাট্য কোম্পানি), 'প্রতিহিংসা' (নবযুগ), 'রক্তে রাঙ্গা সিঁথি' (আগেকার নিউ তরুণ অপেরা), 'ভাঙ্গনের তীরে' (লোকশিল্পী)। কলেজ জীবন থেকে স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হতো রাখাল সিংহের গল্প-কবিতা। এরমধ্যে একাধিক উপন্যাস রচনা করেছেন এই ব্যস্ত ও বিখ্যাত শিল্পী। শ্রীসিংহের "কালিনী কন্যা" প্রথম ছিল গল্প, পরে অভিনেত্রী ও রাখালবাবুর গুণগ্রাহী শিবানী ভট্টাচার্যের অনুপ্রেরণায় উপন্যাসে রূপান্তরিত হয়। প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস "কে কার আপন" (উৎসর্গ করেন শিবানী ভট্টাচার্যর নামে) ২য় উপন্যাস "কে বলে আমি নাই"। আরও কয়েকটি যন্ত্রস্থ। কর্মে ও জীবনে চরম প্রতিষ্ঠিত এই অভিনেতা কলকাতায় এসে যাত্রা অঙ্গনে প্রবেশ করার আগে সংসার পেতেছিলেন। স্ত্রী গৌরী সিংহ ছিলেন শিল্পী। রাখালের সংসার ছবির মত সাজানো, যেখানে উপযুক্ত দুটি পুত্র আর দুটি পুত্রবধূ নিয়ে ওঁরা সুখী।

॥ মোহিত বিশ্বাস ॥

বাবা যখন মারা যান মোহিত বিশ্বাসকে এক বিপন্ন পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়াতে হয়। চরম দরিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করতে হয় তাঁকে। একটা ছোট খাট কাজ পান। সেই সঙ্গে মনের শান্তি

খোঁজার তাগিদে পাড়ার সৌখিন যাত্রা দলে অভিনয় করতেন। এই সময়ে শুরু হয় ২য় বিশ্বযুদ্ধ। আতঙ্কে কলকাতার অনেকেই, এমন কি পেশাদার যাত্রা দলের অনেক অভিনেতা চিৎপুর ছেড়ে ঘরে ফিরে যান। সেটা ১৯৪১ সাল। তখন মোহিতবাবু একটি দলে যোগ দেন। পুরোপুরিভাবে পেশাদার দলে যোগ দেন ১৯৪৩ সালে রায় অপেরায়। মোহিতবাবু তখন যাত্রার ভিতর দিয়ে বৃটিশ খেদাও আন্দোলন করেছেন। এই সময়ে কলকাতায় যাত্রা দলের সংখ্যা ছিল প্রায় পঁচিশটি। এই সময় মোহিতবাবুরা দল বেঁধে বেডিং-বাক্স প্যাঁটরা নিয়ে ট্রেনে চেপে যাত্রা করতে যেতেন এক জেলা থেকে অন্য জেলায়। ট্রেন থেকে নেমে গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, নৌকা অথবা লরীতে চেপে দূর দূরান্তরে যাত্রা করতে যেতেন। ১৯৬৩-৬৪ সালে নট্ট কোম্পানি প্রথম প্রাইভেট বাস চালু করেছিল দলের জন্য। সেই থেকে একে একে অন্য দলে। ১০। ১২টি করে পালা তৈরি থাকত। কমপক্ষে তিন রাত যাত্রা হতো এক আসরে। বিভিন্ন রাজবাড়িতে, পুজো বা নানা উৎসবে সাত রাত্রি পর্যন্ত যাত্রা হতো। তখন ছিল খোরাকি বায়না। অর্থাৎ বায়নাকারীরা খোরাকি দেবে আর ১০০ থেকে ২০০ টাকা দেবে এক রাতের অভিনয়ের জন্য। প্রায় ৭ ঘণ্টার পালা হতো তখন। '৫০ সালে এক ঘণ্টা কমে হলো ৬ ঘণ্টার পালা। '৬০ সালের পর পালা অভিনয়ের সময় দাঁড়াল ৪ ঘণ্টা। মোহিতবাবুর সময় কালে যাত্রার অন্যতম অঙ্গ ছিল সখীর নাচ। দল মালিকের সঙ্গে অন্য সকলের সম্পর্ক ছিল পরম আত্মীয়ের মত। মোহিত বিশ্বাস বলেছিলেন—"আগে যাত্রায় ন'টি রসের ব্যবহার থাকত। আজকের পালায় তা মেলে না।"

১৯৪৭ সালে নব শক্তি অপেরার "ক্ষুদিরামের ফাঁসি" পালায় অভিনয় করে সাড়া ফেলেছিলেন মোহিতবাবু। তারপর 'বিদ্রোহী সন্তান' পালায় রৌদ্রাসুর, 'জরাসন্ধ বধ' পালায় কাল যবন, 'ভক্ত হরিদাস'-এ গোরাই কাজী, 'শুম্ভ নিশুম্ভ' পালায় রক্তবীজ, মহেন্দ্র গুপ্তের 'পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিং এবং 'ধর্মের বলি' (মুর্শিদকুলি খাঁ), দেবী চৌধুরাণী (তিতুমীর), ইত্যাদি চরিত্রে এবং পালায় অতুলনীয় অভিনয় করে মোহিত বিশ্বাস খ্যাতিমান হন। ১৯৬৭-৬৮ সালে 'রিক্সাওয়ালা' পালায় সার্থক নির্দেশনার জন্য মোহিতবাবু প্রশংসা পান। মোহিতবাবুর পুত্র সন্দীপন বিশ্বাস বর্তমানে সাংবাদিকতা নিয়ে আছেন।

॥ স্বপনকুমার ॥

ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদের পর যাত্রায় আরও সমকাল অভিনয় ধারা যিনি আনলেন, তিনিই স্বপনকুমার। ১৯৬৯ সালে যাত্রায় দ্বৈত চরিত্র উপস্থাপন করে 'রক্তলেখা' পালার মাধ্যমে যিনি যাত্রায় এক নতুন মাত্রা আরোপ করলেন তিনি স্বপনকুমার।

পালা গানে শরৎচন্দ্র এবং তারাশঙ্করের কাহিনী নির্বাচনে স্বপনকুমারই ছিলেন অগ্রণী। ১৯৭০-৭১ এবং '৭২ সালে তাঁর নির্বাচিত পালা যথাক্রমে 'দেবদাস', 'পথের দাবী' এবং 'সপ্তপদী'। এ ছাড়া ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত যতগুলি যাত্রা নাটক তিনি পরিচালনা করেছেন, অভিনয় করেছেন, তার সবগুলিই যাত্রার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। নাটকগুলি যথাক্রমে অগ্নিবাসর, তামসী, রাজদ্রোহী, মাইকেল মধুসূদন, নতুন প্রভাত, রক্তলেখা এবং বাঘিনী।

তাই অনায়াসে বলতে পারা যায়, স্বপনকুমার যাত্রাজগতের বিস্ময়। বহু বছর ধরে এই নামটি নিয়ে যাত্রায় অনেক সত্য অনেক মিথ্যা লোকমুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্বীকার করতে হবে, স্বপনকুমার ছাড়া এই দীর্ঘ সময়কালের মধ্যে রোমান্টিক নায়কের চরিত্রে অভিনয় করা আর কোন অভিনেতার পক্ষেই সম্ভব হয়নি। রোমান্টিক চরিত্রে স্বপনকুমার প্রারম্ভে যা ছিলেন, আজও তাই। ওখানে উনি অনন্য, অসাধারণ, অপরাজেয়।

১৯৩৩ সালে স্বপনকুমারের জন্ম, বাগুইআটীর এক রেল কোয়ার্টারে। পিতা স্বর্গত অবনীমোহন মুখোপাধ্যায় ছিলেন রেলের গার্ড। চার ভাই, তিন বোন। বড়দা স্বর্গত প্রভাত

মুখোপাধ্যায়ের কাছে স্বপনকুমারের অভিনয়-জীবনের হাতে খড়ি। তখন উনি নবম শ্রেণীর ছাত্র। প্রথম নাটক 'কেদার রায়', চরিত্র কার্ভালো। প্রথম চরিত্রই হিট, পুরস্কার পেয়েছিলেন স্বর্ণপদক।

১৯৫০ সাল। স্বপনবাবু তখন সিটি কলেজে, বি. কম পড়ছেন। সেই সময় ওঁর পিতৃ বিয়োগ ঘটে। বড় তিন ভাই তখন অন্যত্র। স্বভাবতই স্বপনকুমারের উপর সংসারের সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়ে। সামান্য টিউশনি সম্বল করে তখন তাঁকে সংসার চালাতে হয়।

১৯৫১ সাল। স্বপনকুমার একদিন ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে অভিনয় করছেন। নাটক 'শেষ রক্ষা'। চরিত্র গদাই। এইখানেই ওঁর পরিচয় স্বর্গীয় সৌরেন কুণ্ডু এবং স্বর্গীয় পঞ্চু সেনের সঙ্গে। তারপরই স্বপনের নিয়মিত অভিনয় জীবনের সূচনা।

স্বপনকুমারের নাম কিন্তু স্বপন নয়, সনৎকুমার মুখোপাধ্যায়। বাড়িতে মা ডাকতেন 'স্বপন' বলে। পঞ্চু সেনের ওই নামটাই পছন্দ। তারপর থেকেই সনৎকুমার স্বপনকুমারে রূপান্তরিত হলেন।

১৯৫১ সালে স্বপনকুমার প্রথম এলেন অতুলকৃষ্ণ বসুমল্লিকের আর্য অপেরায়। সে বছর দলের নাটক 'বাঙ্গালী', স্বপনকুমার করলেন নাসির খাঁ। যাত্রায় প্রথম আবির্ভাবেই স্বপনকুমার সমগ্র যাত্রামোদীর সুখ্যাতি কেড়ে নিলেন।

১৯৫২ সালে স্বপনকুমার এলেন স্বর্গীয় জীবনকৃষ্ণ দাসের নব রঞ্জন অপেরায়। এখানেই তিনি আরও বেশি স্বীকৃতি পেলেন। সকলে একবাক্যে স্বীকার করলেন, ছোট ফণিবাবু বা পঞ্চু সেন অপেক্ষা এই তরুণ অভিনেতাটি কোন অংশে কম নন। পর পর তিন বছর বিশেষ যশের সঙ্গে নব রঞ্জন অপেরায় অভিনয় করে স্বপনকুমার ১৯৫৫ সালে যোগ দিলেন নট্ট কোম্পানিতে। পরের বছর উনি এলেন চণ্ডী অপেরায়। এর পর ১৯৫৭ এবং '৫৮ সালে স্বপনকুমার যথাক্রমে সত্যম্বর অপেরা এবং নট্ট কোম্পানিতে যোগ দেন। ১৯৫৯ সালে পুনরায় নব রঞ্জন অপেরায় এলেন। স্বপনকুমার ক্রমান্বয়ে তিন বছর ওই দলের সঙ্গেই যুক্ত থাকেন।

১৯৬২-তে আর্য অপেরা এবং '৬৩-তে নট্ট কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত থেকে পরের বছর স্বপনকুমারের আহ্বান এল জনতা অপেরা থেকে। এবার আর শুধু অভিনেতা নয়, নাট্য পরিচালনার সকল দায়িত্ব তাঁর হাতে তুলে দিলেন দলের সত্ত্বাধিকারী স্বর্গত জীবনকৃষ্ণ দাস এবং দল পরিচালক শ্রীশম্ভু ঘোষ। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত জনতা অপেরায় থেকে তাঁর নাট্য পরিচালনায় সৃষ্টি হলো যাত্রার এক নতুন দিগন্ত। জনতা তখন যশের তুঙ্গে। জনতা ছেড়ে ১৯৬৭ সালে স্বপনকুমার এলেন নব রঞ্জন অপেরায়। সে বছরের নাটক 'মাইকেল মধুসূদন। এই মাইকেলই তাঁর অভিনেতা জীবনকে সোনা দিয়ে মুড়ে দিল। সম্রাটের আসন ছিনিয়ে নিলেন তিনি।

১৯৭০-৭১ সালে স্বপনকুমার যোগ দিলেন নিউ আর্য অপেরায়। ১৯৭২ সালে স্বপনকুমার নিজেই একটি দল প্রতিষ্ঠা করলেন। ওঁর নামেই নাম হলো—স্বপন অপেরা। তারাশঙ্করের 'সপ্তপদী' এবং গৌরকিশোর ঘোষের 'সাগিনা মাহাতো' ও দলে হিট, হিট, সুপার হিট। পয়সাও এল বেশ কিছু। কিন্তু ভাগ্য ওঁর সঙ্গে ছলনা করল। শেষে স্বপনবাবুর অতি নিকট আত্মীয়ের বিরোধিতায় স্বপন অপেরা বন্ধ করে দিয়ে রিক্ত নিঃস্ব অবস্থায় উনি পশ্চিমবঙ্গ পরিত্যাগ করে এখানে-ওখানে পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন। কোন যাত্রা দলের সত্ত্বাধিকারী বা পরিচালকই সে সময় তাঁর পাশে এসে দাঁড়াতে সাহস করলেন না। সকলের মুখেই একটি প্রশ্ন ঃ স্বপনকুমারের মত শিল্পী কী শেষে অনাহারে মারা যাবেন? প্রতিভার কী অপমৃত্যু ঘটবে?

রাখে হরি, মারে কে? এই প্রবাদটিই সেদিন সত্য হল। ঠিক হরির মতই স্বপনকুমারের প্রাণ-মান বাঁচাতে এগিয়ে এলেন নাট্য ভারতীর সত্ত্বাধিকারী স্বর্গত কিষাণ দাশগুপ্ত।

১৯৭৩ সালে স্বপনকুমার সত্ত্বাধিকারীর আসন থেকে নেমে এসে আবার নাট্য পরিচালক ও

অভিনেতা হিসাবে যোগ দিলেন নাট্য ভারতীতে। সাক্ষাৎকারে স্বপনবাবু বলেছেন, "কিষাণবাবু আমার জন্য যা করেছেন, তা কোন এক পিতা শুধু তার পুত্রের জন্যই এতটা করতে পারেন।"

কিষাণবাবুর নাট্য ভারতীয় সুযোগ্য দল পরিচালক প্রদীপ দেবনাথ এবার সব দায়ভার নিয়ে স্বপনবাবুর স্মরণাপন্ন হলেন। স্বপনবাবু কিষাণ দাশগুপ্তের স্মৃতিকে বাঁচাবার জন্য সাড়া দিলেন। প্রদীপ দেবনাথের প্রথম সাজানো নাট্যভারতী স্বপনকুমারের একক দাপটে একেবারে সোনা দিয়ে মুড়ে গেল। অভিনয়-জীবনের চল্লিশটি বছর অতিক্রম করে গেল, কিন্তু যাত্রা জগতে স্বপনকুমারের একচ্ছত্র নায়কের ভূমিকায় কোথাও বিন্দুমাত্র টোল পড়েনি। স্বপনকুমার একাই একাধিক দলের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার মধ্যে জনতা অপেরা, ভারতী অপেরা, বিশ্বরূপ অপেরা এ সব দলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

স্বপনকুমারের মূল্যায়ন এ দশের বিদগ্ধ জনেরা বার বারই করেছেন। স্বনামখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায় তাঁর দীর্ঘ অভিনয় শিল্প ক্ষেত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে স্বপনকে দেখেছেন এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রম হিসেবে!

মাইকেল স্রষ্টা স্বপনকুমার প্রসঙ্গে মধুসংলাপী বিধায়ক ভট্টাচার্য বলেছিলেন,—"যাত্রায় মাইকেল! তুমি এবার ডুববে স্বপন!...যাত্রা যারা শোনে, তারা ক'টা লোক জানে মেঘনাদ বধের কথা? এখনও সময় আছে। এখনও নিবৃত্ত হও। নইলে, স্বপনকুমার এইবার তোমার পতন আরম্ভ হলো!—উপরোক্ত কথাগুলি কত লোক যে স্বপনকে বলেছেন তার শেষ নেই।...আমি উৎসাহ দিয়েছি। তার ফলে সকলের সব কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে 'মাইকেল মধুসূদন' বাংলা দেশের হৃদয় জয় করলেন। নব রঞ্জন অপেরা জয় যুক্ত হলো, আর্থিক সাফল্য ঘটল..." সুসাহিত্যিক বিমল মিত্রও, বিধায়ক ভট্টাচার্যের মত চমকে উঠেছিলেন, স্বপনকুমার তাঁর 'স্ত্রী' উপন্যাস আসরে উপস্থাপিত করবেন শুনে। তিনিও যথেষ্ট সংশয় বোধ করেছিলেন। পরে 'স্ত্রী' পালাভিনয়ে স্বপনকুমারের অতুলনীয় অভিনয় দেখে বলেছিলেন—"...স্বাধীনতা উত্তর যুগে গণ-চেতনা বিকাশ লাভ করবার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা শিল্পকে অভিজাত্যের স্তরে পৌঁছে দিতে যিনি ছিলেন পুরোধা তাঁর নাম—স্বপনকুমার..."।

আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক প্রবোধবন্ধু অধিকারী বলেছেন—"...অদূর ভবিষ্যতের যাত্রাগান সম্পর্কে স্বপনকুমার খুব আশাবাদী হতে পারছেন না..."

সুলেখক, 'আনন্দলোক' জনপ্রিয় পত্রিকার সম্পাদক দুলেন্দ্র ভৌমিক খুবই ঘনিষ্ঠ এই শিল্পী প্রসঙ্গে বলেছেন—"...যাত্রা বলতে বুঝি ধর্মীয় বা ঐতিহাসিক কোন কাহিনীর মোটা দাগের নাট্যরূপ, চিৎকার করা অভিনয় এবং নাটকীয় মুহূর্তে অসম্ভব বাড়াবাড়ি। আমার সেই সংকীর্ণ ধারণাকে এক রাত্রেই যিনি ভেঙ্গে দিলেন, প্রতি মুহূর্তে আমাকে রোমাঞ্চিত করলেন, সেই অভিনেতার নাম স্বপনকুমার। যাত্রায় যে এমন স্বাভাবিক অভিনয় করা সম্ভব, কণ্ঠস্বরের এমন নিপুণ নিয়ন্ত্রণ যে যাত্রার আসরেও চালু হয়ে গেছে সেই সত্যটা প্রথম জেনেছিলাম স্বপনকুমারের অভিনয় দেখে..."

বিশ্ববন্দিত পি. সি. সরকার জুনিয়ার যখন স্বপনকুমার প্রসঙ্গে কলম ধরেন, তখন অবাক হই এই ভেবে, এত ব্যস্ততার মধ্যে এ কেমন করে সম্ভব! বেধ করি এটা সব বিখ্যাত জনেরই বিখ্যাত হয়ে ওঠার একটা স্বাভাবিক অংশ। ভালো লাগে, উপভোগ করি যখন বিশ্ববন্দিত এই মানুষটি স্বপনকুমার প্রসঙ্গে বলেন—"...মঞ্চমায়ার রূপকথা রাজ্যের চিরকুমার নায়ক স্বপনকুমারের সঙ্গে আমার অনেকদিনের হৃদ্যতা। কতোদিনের ভালোবাসা, তাঁর অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে ঘুমের মধ্যেও কতবার হাততালি দিয়েছি...ভেবেছিলাম—ভদ্রলোক কি আসলে একজন জাদুকর! হ্যাঁ জাদুকর। অভিনয়ের জাদুকর, সাফল্যের জাদুকর। চির নবীন, চিরদিনের জাদুকর..."

যাত্রার আর এক খ্যাতিমান স্রষ্টা শান্তিগোপাল বলেছেন—"স্বপনদা আমার শ্রদ্ধার।...স্বপনকুমারকে আমার প্রিয়জনের একজন মনে করি। তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনয় 'মাইকেল মধুসূদন'।..."

সুপ্রিয়া দেবীর মত অভিনেত্রী এক জায়গায় বলেছেন, "...আমি যেমন ওঁকে (উত্তমকুমার) 'নগর দর্পণে' ছবির কাজের সময় বলেছিলাম, তুমি সারা ছবিতে শর্ট দিয়েছ একটা। সেটা হলো শেষ দৃশ্যে। তেমনি 'ভাঙ্গাগড়া' নাটক দেখে স্বপনকে গ্রীণরুমে গিয়ে বলেছিলাম, গোটা নাটকে তুমি সিন করেছ একটা, ওই ভাইকে টাকা দেওয়ার জায়গা। উঃ একই সিনে, একই বিষয়ে স্বপন আমার মত একজন অভিনেত্রীকে এই হাসাচ্ছে, এই কাঁদাচ্ছে! আমার মনের অনুভূতির তারগুলোর নিয়ন্ত্রণের লাগাম তখন আর যেন আমার হাতে নেই।

স্বপনকুমার কর্মজীবনে যে মাপের মেজাজী হয়ে উঠেছিলেন, ঠিক সে ভাবেই তাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপে অনেক সময় পরিচালিত অনেক দল। মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্বপনই তা হস্তগত করেছে..."

স্বপনকুমারের মেজাজ প্রসঙ্গে অনেক গল্প আছে ছড়ানো, যেগুলি গল্প হলেও সত্যি। যাত্রায় স্বপনকুমারের বিলাস যেন স্বর্গের ইন্দ্রকেও হার মানায় এমন মত পোষণ করেন তাঁরা, যাঁরা স্বপনবাবুকে নিয়ে কাজ করেছেন বহু বছর ধরে। এর মধ্যে এমন অনেক গল্পও আছে যা এই বিরাট মাপের শিল্পীর মর্যাদাকে বাড়িয়ে দেবে না। এরোপ্লেনে চড়ে নদী পারের গানে যাওয়া স্বপনবাবুর জীবনের ইতিহাস রচনা। মূল কথা ব্যক্তি স্বপনকুমারের চাইতে অনেক বেশি শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত থাকবেন শিল্পী স্বপনকুমার এই অভিমত বহু জনের। দুই পুত্রের জন্য গর্বিত স্বপন, গাড়িয়াহাটের মেঘমল্লার প্রাসাদের আকাশের কাছাকাছি এক নয়, দুটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে এখন অবসর জীবন যাপন করছেন।

॥ অরুণ দাশগুপ্ত ॥

১৯২৮ সালে কলকাতার কুমারটুলী অঞ্চলে এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে অরুণ দাশগুপ্তের জন্ম। বাগবাজার হাই স্কুল থেকে ১৯৪৫ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে অরুণবাবু ভর্তি হন মণীন্দ্র কলেজে। কলেজে পড়তে পড়তে, পাড়ায় সৌখিন ক্লাব তরুণ মিলন সঙঘের বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করতে করতে 'রমা' নাটকে অভিনয় করে পুরস্কার পান। ফলে থিয়েটার নেশা হয়ে দাঁড়ায় অরুণবাবুর। জীবন গোস্বামী আর গণেশ গোঁসাইয়ের অনুপ্রেরণায় আসেন যাত্রায় এবং 'উত্তরা' পালায় অভিনয় করে যথেষ্ট সুনাম পান।

মাঝে মাঝেই সৌখিন দলের নাটক পরিচালনা করতেন তিনি। এমনি করে একদিন ভারতীয় রূপনাট্যমে 'কবি বিদ্যাপতি' এবং আরও কয়েকটি পালায় অভিনয় করে নবযুগ অপেরায় এসে থিয়েটারকে পেশা করলেন তিনি। ১৯৬৪ সালে আসেন নট্ট কোম্পানিতে। এখানে তিনি চাঁদবিবি, বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি পালার প্রধান চরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতি পান।

মাঝে শ্রীমা আর জনতায় অভিনয় করে ১৯৬৭ সালে আবার নট্ট কোম্পানির 'বিদ্যাসাগর' পালার নাম ভূমিকায় ও 'সিংহগড়' পালায় শিবাজী চরিত্রে অভিনয় করে পান চরম প্রতিষ্ঠা। সেই থেকে অরুণবাবু নট্ট কোম্পানির সঙ্গে সসম্মানে জড়িয়ে পড়েন পরিচালক ও প্রধান অভিনেতা রূপে। ইতিমধ্যে ১৯৭৩ সালে দিশারী পুরস্কার পান শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসাবে। ভারত পথিক রামমোহন, গন্নাবেগম ইত্যাদি বহু পালাই অরুণবাবুর অভিনয়ে মূর্ত হয়েছিল। তাঁর অভিনীত এবং নির্দেশিত নট্ট কোম্পানির "মা মাটি মানুষ" থেকে "নটী বিনোদিনী"-র মত বহু পালাই নট্ট কোম্পানির সওদাগরের তরী সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়েছিল। এর মূলে তাঁর স্ত্রী বীণা দাশগুপ্তের অভিনয়ও এক অবদান বলা যায়। পরবর্তী সময়ে অগ্রগামী'র ব্যবসায়িক সাফল্যও এসেছিল এই শক্তিশালী রূপকার ও প্রয়োগ প্রধানের সঙ্গে শক্তিময়ী জায়া বীণার উজাড় করা দক্ষ অভিনয়ে।

অরুণ দাশগুপ্তের গড়া অনেক শিল্পী আজ যেমন প্রতিষ্ঠিত তেমনি তিনি পালাকার সুনীল চৌধুরীরও প্রাণ প্রতিষ্ঠার পুরোহিত। অরুণবাবুর আকস্মিক মৃত্যু হয়।

॥ অসীমকুমার ॥

১৯৬৪ সালে প্রথম 'শতরূপা' নামে একটি যাত্রাদলে এই শক্তিমান শিল্পীর আত্মপ্রকাশ। এরপর নাট্যভারতী, শ্রীমা, নাট্য কোং, শ্রীরাধা নাট্য কোম্পানি, অম্বিকা নাট্য কোং, নিউ গণেশ অপেরা, শিল্পীতীর্থ, অগ্রগামী, মোহন অপেরায় প্রতাপের সঙ্গে অভিনয় করে খ্যাতিমান হয়ে, যুক্ত হন নট্ট কোম্পানির সঙ্গে। শিল্পীতীর্থের 'বিবি আনন্দময়ী'র জমিদার রবিশংকর, মোহন অপেরার 'সতী তুলসী' পালার শঙ্খচূড়, 'বরণীয়া বধূ' পালার দাদু চরিত্রে অভিনয় করে বিভিন্ন পুরস্কার প্রদান পান। অসীমবাবুর অভিনয় জীবনের শ্রেষ্ঠ পালাগুলির মধ্যে বিনয়-বাদল-দীনেশ, ভুলি নাই, মাদার ইণ্ডিয়া, ধর্ম সিংহাসন, নিশিপুরের বৌ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ৩২ বছরের যাত্রা জীবনে প্রায় ২৬০টি বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন। ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩২ বছরের যাত্রা জীবনে একদিনও রিহার্সালে অনুপস্থিত থাকেননি এটাই অসীমবাবু রচিত একমাত্র ইতিহাস নয়, '৭৩-৭৪ সালে নিউ গণেশ অপেরায় ৪টি পালার বিভিন্ন চরিত্রে ২৬৩টি শো, জ্যোতির্ময় দে বিশ্বাসের 'মামলা জিতে মা হয়েছি' পালায় এক টানা ২০০ নাইট অভিনয় করা, বিগত ৩০ বছরে ৩ জন শ্রেষ্ঠতমা নায়িকার সঙ্গে অভিনয় যথা, বীণা দাশগুপ্তের সঙ্গে "জাত সঁপেছি কৃষ্ণ পায়ে", বেলা সরকারের সঙ্গে "জীবনবাবু নমস্কার" ও "বাবুগো সিঁদুরের দাম অনেক" আবার গণেশ মুখোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় বিজন থিয়েটারে, বীণা দাশগুপ্ত অভিনীত "নটী বিনোদিনী" নাটকে এক টানা ৪ মাস 'গিরীশ' চরিত্রে অভিনয়। অসীমকুমারের তৃতীয় নায়িকা, তাঁরই পরম শ্রদ্ধেয়া জ্যোৎস্না দত্ত। বাড়িতে অভিনয় জীবনের যাবতীয় নথি (দু' লাইনের সংবাদ থেকে বিজ্ঞাপন-পোষ্টার এবং গ্রন্থপঞ্জি) স্ত্রী সীমার সঙ্গে মিলে-মিশে সযত্নে রক্ষা করা অসীমকুমারের একটা ইতিহাসকে ধরে রাখার বিস্ময়কর নজির। ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদের কাছে নাট্য শিক্ষা নেওয়া অসীমকুমার নিজেই আঙ্গিক অভিনয়ের অর্থাৎ মোটা দাগের অভিনয়ের ধারা বর্জন করে শুরু করেন সাবলীল অভিনয়। দূরদর্শনে দেখানো 'রামী চণ্ডীদাস', 'বিবি করুণাময়ী' যাত্রায় অভিনয় করেন অসীমকুমার, তা ছাড়া প্রমোদ গাঙ্গুলীর টেলি ফিল্ম "সন্তান"-এ নায়িকা শ্রীলার সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন তিনি।

১৯৯৬ সালের ইলেকশান পর্বে বামপন্থী (সি. পি. এম) আদর্শে ডঃ শম্ভুনাথ চক্রবর্তীর "চেতনা" নামক পথ-নাটিকায় বীণা দাশগুপ্তের সঙ্গে অভিনয় করেন অসীম। ১৯৭৬ সালে অসীমকুমার অভিনীত "বিবি আনন্দময়ী"র লং প্লেইং রেকর্ড প্রকাশ করে এইচ. এম. ভি। এ ছাড়া "জীবনবাবু নমস্কার", "বাবুগো সিঁদুরের দাম অনেক", "ওগো মাটির ঘরে মা আসছে", "শাঁখা দিয়ে কিনলাম", "কুমারী নিরুদ্দেশ" পালার ক্যাসেটে বন্দী আছে অসীমকুমারের দুরন্ত অভিনয়। বহু পুরস্কারে সম্মানিত অসীমকুমার সম্প্রতি "যাত্রাসূর্য" উপাধি প্রাপ্ত হয়েছেন।

॥ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৩৩ সালে। বাবার চাকরির জন্য ছোটবেলায় কুলটি, রামনগর, চাসনালা, ইত্যাদি বিভিন্ন কোলিয়ারিতে ঘুরেছেন। এই কোলিয়ারিতে থাকতেই তাঁর মধ্যে পরবর্তী জীবনের চারা অঙ্কুরিত হয়। অবশ্য ছোটবেলার অভিজ্ঞতা প্রত্যেক মানুষেরই মনের গঠনের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে, তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে। কিন্তু চল্লিশের দশকে যাঁরা ছিলেন কিশোর, তাঁদের ছেলেবেলা যে অন্যান্যদের তুলনায় একটু আলাদা, সে কথা বিনা দ্বিধায় বলা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মৃতি অজিতেশের জীবনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অনেকবারই তিনি আমাকে বলেছেন, "আমার জীবনে যা কিছু গণ্ডগোলের সূচনা, সেটা ঐ থেকে।

১৯৪২ সালে ঝালদায় থাকতাম। সে সময় প্রথম মিলিটারি দেখি—ব্রিটিশ, অ্যামেরিকান আর নিগ্রো। এদিকে আবার তখন করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে আন্দোলন চলছে। স্কুলে স্ট্রাইক, আমিও যোগ দিয়েছি। মাষ্টাররা বলছেন, প্রভুর বিরুদ্ধে আন্দোলন, ছিঃ ছিঃ! ভয়ঙ্কর নিদারুণ সে অনিশ্চয়তা!" এই অভিজ্ঞতার সূত্র ধরেই অজিতেশ পরে হ্যারল্ড পিণ্টারের 'তেত্রিশতম জন্মদিবস' নাটকটি করেন। একটি সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে একবার আমাকে বলেছিলেন, 'বিচ্ছিন্নতাবোধের বিরুদ্ধে অনেকে এত কথা বলেন। আমাদের দেশে সে রকম যুদ্ধ কখনও বাধেনি, কিন্তু তাতেই আমরা এতটা বিচ্ছিন্ন বোধ করছি। কিন্তু পশ্চিমী দেশগুলির কথা ভাব। যুদ্ধের মধ্যেই ত তাদের দিনের পর দিন কেটেছে!

সে সময়ই তিনটি জিনিস আমাকে আকর্ষণ করতে থাকে—ফুটবল, রাজনীতি আর থিয়েটার', ...বলেছিলেন অজিতেশ। ১৯৪৭ সালে তিনি আর. সি. পি. আই-এ যোগ দেন। এরপর ১৯৪৯ সালে ম্যাট্রিক পাশ করার পর কুলটি থেকে আসানসোলে কলেজ করতে আসেন। সে সময় 'সুভাষিস্ট ফরোয়ার্ড ব্লকের' সঙ্গে যোগাযোগ হয়।—'তখন অনেকে দল ছাড়ল। আমিও ছাড়লাম।' কথাগুলি বলেছিলেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে তিনি দমদম লোকাল কমিটি, প্রভিন্সিয়াল কালচারাল কমিটির সদস্য হন। এরপর কমিউনিস্টদের সংস্পর্শে আসেন। ১৯৫১ থেকে পরের টানা ১৩ বছর ধরে কমিউনিস্ট পার্টি করেছেন অজিতেশ। "এক সময় ডিসাইড করেছিলাম যে পার্টিই করব, আর কিছু করব না। হোল টাইমার হয়ে যাব। বাগুইহাটিতে হিন্দু বিদ্যাপীঠ স্কুলে মাষ্টারি করতাম" এ পর্যন্ত বলে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে গলা ছেড়ে হো হো করে হেসে উঠেছিলেন অজিতেশ। বললেন, 'কালচার টালচার করার কথা ছিল না, হতও বোধহয় তাই। কিন্তু ১৯৬৪ সালে, পার্টি ভাগ হবার আগে, রাজনীতি ছেড়ে দিলাম।"

মজা করে একথা বললেও, পার্টি ছাড়ার আগেই কিন্তু অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 'নান্দীকার' গঠন করেন—১৯৬০ সালে। তবে ১৯৬৫ সাল থেকেই 'নান্দীকার'-এর আসল জয়যাত্রা শুরু।

এর পরের ঘটনা ত নাট্যপ্রেমী মাত্রই জানেন। বাংলা নাটকে একটা নতুন ঘরানার প্রবর্তন করলেন অজিতেশ। এর আগেও বাংলা মঞ্চে বিদেশী নাটক সফলভাবে অভিনীত হলেও, 'নন্দীকার'-এর মাধ্যমেই বাঙালি দর্শকের সঙ্গে পশ্চিমী নাট্যকারদের একটা হৃদয়ের বন্ধন স্থাপিত হল। নির্দেশনা, অভিনয়, মঞ্চসজ্জা, প্রয়োগ-নৈপুণ্য—এক কথায় সামগ্রিক প্রযোজনাগতভাবে বাংলা নাটকের একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন অজিতেশ। 'তিন পয়সার পালা', 'শের আফগান', 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী', 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র', 'বীতংস', 'ভালমানুষ'—একের পর এক বিদ্যুৎ ঝলকের মত নতুন নাটক উপহার দিয়ে গেলেন তিনি। ১৯৭৭ সালে 'নান্দীকার'-এর সঙ্গে বিচ্ছেদ হবার পর নতুন দল গড়লেন 'নান্দীমুখ'। মঞ্চস্থ করলেন টলস্টয়ের 'পাপ পুণ্য' ও হ্যারল্ড পিণ্টারের 'তেত্রিশতম জন্মদিবস'। শেষোক্ত নাটকটির জন্য ১৯৮২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কারও পেয়েছিলেন। সর্বভারতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি আগেই এসেছিল ১৯৭৬ সালে, সংগীত নাটক অকাদেমি পুরস্কারের মাধ্যমে। '৮২-তে পঃ বঃ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত "শ্রেষ্ঠ নির্দেশক"-এর পুরস্কার ও সম্মান পান। বিদেশী নাটক মঞ্চস্থ করার পাশাপাশি সময় পেলেই মৌলিক নাটকও লিখে গেছেন অজিতেশ—'সাঁওতাল বিদ্রোহ', 'সেতুবন্ধন', 'হে সময় উত্তাল সময়' এবং আরও কয়েকটি। চিত্রনাট্য করেছেন চারটি ছবির—'নতুন পাতা', 'বনজ্যোৎস্না', 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' এবং 'কলকাতা ৭১'-এর শেষ অংশ 'প্রতিদিন প্রতিরাত'-এর। কয়েক দিনের মধ্যে 'যখন যেমন ভাবনা' নামে একটি প্রবন্ধের বই এবং 'সংরক্ত চিত্রমালা' নামে একটি কাব্যগ্রন্থও প্রকাশিত হবার কথা ছিল।

নবরূপা পত্রিকার সম্পাদক গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ নবরূপার শারদ সংখ্যায় অজিতেশবাবুর

একটি উপন্যাস প্রকাশ করেন। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে উপন্যাস লেখানো বা উপন্যাস লেখা সেই প্রথম, সেই শেষ। 'মুক্ত অঙ্গন' পুড়ে যাবার পর গৌরাঙ্গপ্রসাদ তাঁর থিয়েটার পত্রিকা "মঞ্চ জগৎ"-এর বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে, দক্ষিণ কলকাতা পরিক্রমার মাধ্যমে সেই পত্রিকা বিক্রির সমুদয় অর্থ যখন মুক্ত অঙ্গন পুনর্নির্মানের জন্য দান করেন, তখন অনেকের সঙ্গে 'মঞ্চজগৎ' বিক্রি করেছিলেন অজিতেশবাবু।

এছাড়া বিভিন্ন নাটকে তাঁর লেখা ১০০ টি গান নিয়েও একটি বই প্রকাশ করার ইচ্ছে ছিল অজিতেশের। নাটক লেখা, অনুবাদ, অভিনয়, নির্দেশনার সঙ্গে সঙ্গে ফিল্মেও অভিনয় করে গেছেন তিনি। ষাট দশকের মাঝামাঝি 'ছুটি' ছবিতে তাঁর প্রথম অভিনয়। তারপর 'হাটে বাজারে', 'সাগিনা মাহাতো', ইত্যাদি বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন।

শিল্পীর বিশ্রাম নেই—কথাটা বোধ হয় ভুল। বছর কয়েক আগে প্রদীপ দেবনাথের প্রদীপ অপেরায় যোগ দেন তিনি। পালা নির্মাণ করেন 'রাবণ'। সম্পাদনা, নির্দেশনা ও অভিনয় করেন। 'রাবণ'-এর নতুন ফর্ম, যাত্রা জগত নিতে পারেনি। কিন্তু দু'সিজন করার পরই যাত্রার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। যাত্রা ছাড়া খুব একটা সহজ ছিল না, কারণ যাত্রায় তাঁর সম্মান দক্ষিণার অঙ্কটি খুব একটা কম ছিল না। এরপরে আবার গণবাণী ও আরও কয়েকটি দলে অভিনেতা হিসেবে আসর তোলপাড় করেছিলেন। তাঁর 'হাটেবাজারে', 'সাগিনা মাহাতো' যাত্রার দর্শক ভুলবে না কোনদিন। তা সত্বেও টাকার মোহ ত্যাগ করে যেভাবে অবলীলায় যাত্রা ছেড়েছিলেন, তাতে তাঁর স্বাধীন, স্বাভাবিক মনের পরিচয় মেলে। যাত্রা ছাড়ার পর বেশির ভাগ সময় বাড়িতেই থাকতেন অজিতেশ। অনেকেরই অভিযোগ ছিল, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় শিল্পের জগত থেকে নিজেকে ক্রমশঃ গুটিয়ে নিচ্ছিলেন!

গৌরাঙ্গপ্রসাদ অজিতেশবাবুকে সাংবাদিক করার সূত্রে তাঁর সম্পাদিত নবরূপা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন, স্বনামখ্যাত দেবনারায়ণ গুপ্তের সাক্ষাৎকার যা অজিতেশবাবুর নেওয়া ও লেখা।

॥ অশোককুমার ॥

অধুনা বাংলাদেশের যশোরে ছিল অশোককুমার ওরফে অশোক ভট্টাচার্যের আদি নিবাস, কিন্তু অশোকের জন্ম এই কলকাতার মাটিতে। জন্মেছিলেন এমন এক পরিবেশের মধ্যে যেখানে ছিল নানা শিল্প চর্চা, আলাদা একটা কৃষ্টি। বাবা রমণীকান্ত ভট্টাচার্য ছিলেন শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষকমণ্ডলীর একজন। সেটা রসরাজ অমৃতলাল বসুর সময়। অমৃতলাল বসু এই স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

পরবর্তী সময়ে এই স্কুল থেকে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় পাস করে বেরিয়েছিলেন। বি. এ. পাশ করেন মনীন্দ্র কলেজ থেকে ১৯৬৯ সালে। স্কুলে এবং কলেজে পড়ার সময় থেকেই সুদর্শন অশোক মাঝে মাঝেই সখের থিয়েটারে অভিনয় করতেন, সুযোগ পেলেই কলম ধরে লিখতে বসতেন প্রধানত কবিতা।

ময়দানে যখন মুক্তমেলা বসত, তখন সেই কবিতা ও কবিদের আসরে মাঝে মাঝেই দেখা যেত অশোককে। এক প্রশ্নের উত্তরে অশোক বললেন, "সমরেশ বসু, সুনীল গাঙ্গুলী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, তুষার রায় এঁদের মধ্যে অনেক সময় স্বরচিত কবিতা পড়তেন তিনি। 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর কিছু কবিতা ছাপাও হয়েছিল। অশোক বললেন, ভারতীতে প্রথম যে কবিতা লিখি ওটার প্রেরণা পেয়েছিলাম তুষারের কথায়। তুষার মাঝে মাঝে বলত—"মৃত্যুকে জানতে চাই"।

কবিতার পাশাপাশি কিছু নাটকও লিখেছিলেন অশোক। এখন সময় পেলেই গল্প লেখেন। সব চাইতে বড় কনসেপশান ছিল পাবলিসিটি লে-আউটের ব্যাপারে। এক সময়ে ইনটেলেক্ট আর্ট

নামে একটা বিজ্ঞাপন এজেন্সিও তৈরি করেছিলেন। একবার ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনা করতে গিয়েছিলেন সত্যম্বর অপেরার কর্ণধার শৈলেন মোহান্তর সঙ্গে। প্রথম দর্শনেই শৈলেনবাবুর স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। অশোককুমার হলেন যাত্রার অভিনেতা। প্রথম বছর 'আঁধারে আলো' পালায় প্রথম যাত্রার আসরে গিয়ে দাঁড়ান। তারপর আসেন নব অম্বিকায়। সেখানে 'রক্তাক্ত প্রজাপতি' পালায় অভিনয় করার পর থেকেই জনপ্রিয় হন। প্রখ্যাত আনন্দলোক আর আনন্দমেলা দলে অভিনয় করেন। তবে আর্থিক এবং জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আসেনি। ভাগ্য বিপর্যয় চলেছিল। আরও বেশি হল যখন সাংবাদিক রবি বসুর তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠা দলে আসেন। নতুন তৈরি সেই দল মাত্র কটা শো করেই বন্ধ হবার পরই লোকনাট্য দলের কর্ণধার নীলমণি দে-র আমন্ত্রণ। যুক্ত হন লোকনাট্যে। এরপর একে একে বহু দলের নায়ক হন তিনি।

॥ শ্যামল ঘোষ ॥

স্বর্গত মনমোহন ঘোষের ছেলে শ্যামল ঘোষ নাট্য আন্দোলনের অন্যতম শরিক। ভারতীয় গণনাট্যের সঙ্গে তিনি গোড়া থেকেই জড়িত ছিলেন।

১৯৩৩ সনের এপ্রিল মাসে, অধুনা বাংলাদেশের খুলনা জেলার দৌলতপুরে শ্যামল ঘোষের জন্ম। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে শ্যামলবাবু বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন। ১৯৪৯ সনে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের (I.P.T.A) দক্ষিণ কলকাতার 'সঞ্চারি' শাখায় যোগ দেন। এখানে 'ঢেউ', 'বিচার' তখন অভিনীত হয়। এই সময়ে রিহার্সাল হতো সুইনহো স্ট্রীটে নাটোরের মহারাজার বাড়িতে।

১৯৫৭ সালে শ্রীঘোষ গন্ধর্ব নাট্য গোষ্ঠীতে আসেন। এখানে ২০। ৩০ জন শিল্পী ছিলেন, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন স্বপ্না দেব (প্রতিক্ষণ পত্রিকা সম্পাদিকা), নিমাই বসু, অধ্যাপক গৌতম সান্যাল, পৃথ্বীশ গাঙ্গুলী (ইনি সাহিত্যিক ও কবি নজরুলের বন্ধু পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের ছেলে, বাটার প্রধান শিল্প নির্দেশক), মনোজ মিত্র আরও অনেকে। এখানে তখন হয়েছে 'সূর্যলগ্ন'। এর অনুবাদ, নির্দেশক ও অভিনয়ের দায়িত্ব পালন করেন শ্যামলবাবু। শ্যামলবাবু অভিনীত-নির্দেশিত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হলো—'দলিল' / রচনা ঃ ঋত্বিক ঘটক। 'থানা থেকে আসছি' নাটক ঃ অজিত গাঙ্গুলী। বলবন্ত গার্গীর 'অঙ্কুর', অনুবাদ ঃ শ্যামল ঘোষ। মন্মথ রায়ের 'অমৃত অতীত'। মনোজ মিত্রের ঃ 'মোরগের ডাক' ইত্যাদি।

১৯৬৪ সালের ২৩ এপ্রিল শ্যামলবাবুরা 'নক্ষত্র' প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে মনোজ মিত্রের 'নীলকণ্ঠের বিষ', শ্যামল ঘোষের 'সন্ধ্যার রঙ', মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'মৃত্যু সংবাদ' প্রভৃতি নাটক খুবই খ্যাতি পায়। মোহিতবাবুর নাটকটি এ্যাবসার্ড ড্রামা হিসেবে আলাদা একটা মাত্রা যোগ করেছিল থিয়েটারে। ১৯৭৫ সালে শ্যামল ঘোষ যাত্রায় আসেন। এই সময়ে ধাপে ধাপে আর্থিক সংকটে পড়েন শ্রীঘোষ। প্রথম আসেন শিল্পভারতীতে। শ্যামলবাবুরই 'সূর্য আলো দাও' এবং প্রসাদ ভট্টাচার্যের 'আমি যারে চাই' এখানে অভিনীত হয়। নির্দেশক ও অভিনেতা ছিলেন শ্রী ঘোষ। '৭৬ সালে আসেন 'কলিকাতা যাত্রা সমাজ'-এ। এখানে 'মরুতীর্থ হিংলাজ', অমর ঘোষের 'হ্যামলেট', সত্যপ্রকাশ দত্তের 'বহ্নিশিখা' পালার নির্দেশক ও অভিনেতা হিসেবে কাজ করেন। '৭৮ সালে আনন্দলোকের 'আলাদীন ও আশ্চর্য প্রদীপ' অসিত বসু ও শ্রীঘোষ যৌথভাবে পরিচালনা করেন। পালা ঃ অসিত বসু। অভিনয়েও ছিলেন শ্যামলবাবু। ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত একের পর এক অধিকাংশ বিখ্যাত দলের পালায় উল্লেখযোগ্য চরিত্রে, তাঁর উল্লেখযোগ্য অভিনয় স্মরণীয় হয়ে আছে। বেশির ভাগ পালার নির্দেশনার দায়িত্ব তিনিই পালন করেন। সমীর মজুমদার, মোহন চ্যাটার্জী, শান্তিগোপালের নির্দেশনায় যথাক্রমে জয় জগন্নাথ, রত্নদীপ, পাতাল ভৈরবী ও মহী রাবণ বধ, রবীন হুড পালায় অভিনয় করেন। দক্ষিণারঞ্জন বসুর বীজ নেওয়া সুশীল নাট্য কোম্পানির

'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর পালারূপ দিয়েছিলেন শ্যামলবাবু। তিনকন্যা (King Lear-এর) অনুবাদ করেন অমর ঘোষ। 'তিতাসের' জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের পুরস্কার পান শ্রেষ্ঠ নির্দেশক ও অভিনেতা হিসেবে।

এই দীর্ঘ নাট্য জীবনের মধ্যে আরও অনেক কাজই করেছেন শ্যামল ঘোষ। 'বাংলার যাত্রাগান বা সূর্য দত্ত', আঙুরবালা, কমলা ঝরিয়া, ইন্দুবালার ওপরে তথ্যচিত্র তৈরি শ্যামলবাবুর আর এক শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এক সময়ে কিছুদিন 'নাভানা' প্রকাশন সংস্থায় চাকরি করেছেন। স্ত্রী সরকারি দপ্তরের কর্মী। স্ত্রী, একমাত্র কন্যা নিয়ে শ্যামলবাবুর সাজানো সংসার।

॥ সমীর লাহিড়ী ॥

এই স্বনামখ্যাত অভিনেতার জন্ম ফরিদপুর জেলার কনকদ্বীপ গ্রামে ১৯২৪ সালে। সমীরবাবুর অভিনয় শিক্ষা নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর কাছে। শিশিরকুমার নির্দেশিত কয়েকটি নাটকে অভিনয়ও করেছিলেন সমীর লাহিড়ী। পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার নাটক বিভাগে যোগদান করেন। এই সময়েই লোকরঞ্জনের অধিকাংশ নাটকে অভিনয় করা ছাড়াও, থিয়েটার গিল্ডের 'যদুবংশ', 'উত্তরের ব্যালকনি' প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিলেন।

১৯৭৬ সালে সমীরবাবু যাত্রায় যোগদান করেন। প্রথমে নিউ প্রভাস অপেরা পরে যাত্রালোক, আর্য অপেরা এবং মৃত্যুর দিন পর্যন্ত লোকনাট্য-এর বহু পালায় অভিনয় করে তিনি খ্যাতিমান হয়েছিলেন। ১৯৭৬ সালে নিউ প্রভাসের হো-চি-মিন পালার নামভূমিকায় অভিনয় করে পুরস্কৃত হন। ১৯৭৭ সালেও তাই। ১৯৮০ সালে 'মেজদিদি' পালায় শরৎ ডাক্তারের চরিত্রে অভিনয় করে সম্মানিত হন।

সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর', পূর্ণেন্দু পত্রীর 'স্বপ্ন নিয়ে' এবং আরও কিছু ছবিতে অভিনয় করেন। ১৯৮২ সালের ২২ মার্চ, রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ বর্ধমানের সিমলাগড়ের কাছে এক পথ দুর্ঘটনায় এই শক্তিমান অভিনেতা নিহত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। এই দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে বিস্তারিত সংবাদ সমস্ত দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

২৪ মার্চ '৮২ তারিখে "আজকাল" পত্রিকা লিখছে, "...ঐ দুর্ঘটনায় অভিনেত্রী বর্ণালী ব্যানার্জীও গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। প্রয়াত শ্রী লাহিড়ী, বর্ণালী ব্যানার্জী ও আরও কয়েকজন একটি গাড়ি করে বর্ধমানের বাগরায় যাচ্ছিলেন লোকনাট্যের শো করতে। গাড়িটি বেশ জোরেই যাচ্ছিল। সিমলাগড় লেভেল ক্রসিং-এর কাছে হঠাৎ একটি দাঁড়িয়ে থাকা লরীর পাশ কাটাতে গিয়ে ড্রাইভার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরীর পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। সামনের সিটে বসে ছিলেন শ্রী লাহিড়ী। বুকে ও মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। ...সমীর লাহিড়ীর এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে মঙ্গলবার যাত্রা জগতে শোকের ছায়া নামে। বিকালে মরদেহ পাইকপাড়ার বাড়িতে আনা হলে বহু বিশিষ্ট শিল্পী শ্রদ্ধা জানাতে সমবেত হন। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ছন্দা চ্যাটার্জী, লোকনাট্যের কর্ণধার নীলমণি দে, আরও অনেকে পুষ্প মাল্য অর্পণ করেন। নিমতলা মহাশ্মশানে শিল্পীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়..."।

এরপর পাইকপাড়া এম. আই. জি হাউসিং এস্টেটে ১ এপ্রিল '৮২ এই শিল্পীর পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

"আজকাল" পত্রিকার সাংবাদিক, "যাত্রা", "থিয়েটার", "চলচ্চিত্র", ইত্যাদি একাধিক বিভাগীয় প্রধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, শৌনক লাহিড়ী হলেন সমীর লাহিড়ীর পুত্র।

॥ নীলোৎপল দে ॥

উৎকোচ নেব না, একদল ঘোরতর অপরাধী রক্তমাংসের মানুষ, তাকে পিটিয়ে ক্ষত বিক্ষত

করতে মন সায় দেবে না, পুলিশের উর্দি পরেও ভিতরে ভিতরে মন গান গাইবে, এমন পুলিশ আজ আর বেশি দেখা যায় না। এমন একটা সময় এসেছিল যখন থিয়েটার, সিনেমা আর যাত্রা তেমন পুলিশ পেয়েছিল ৩টি। এই ৩ জনই শেষ পর্যন্ত পুলিশ থাকতে (জাঁদরেল অফিসার) পারেননি। শ্যামল ঘোষাল, তিনি তো নিজে সিনেমার নায়ক হয়েছেন, পরবর্তী সময়ে দূরদর্শনের জন্য বেশ কিছু ছবি করেছেন এবং স্বকন্যাকে সিনেমা নামক পাত্রের হাতে অর্পণ করেছেন। কন্যাও এখন যথেষ্ট প্রশংসিত শিল্পী। নাম ঃ চৈতি ঘোষাল। এর মধ্যে আর একজন সুনিলেশ ভট্টাচার্য। ইনি অনেক ছবিতে যেমন কাজ করেছেন তেমনি যাত্রাও করেছেন কিছু। সিনেমা করেছেন, তবে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের ক্ষেত্রে আর থিয়েটার-যাত্রার ক্ষেত্রে যে নামটি চিরস্থায়ী হয়ে গেছে, অভিনেতা-নির্দেশক এবং নাট্যকার হিসেবে, তিনি নীলোৎপল দে।

১৯২৮ সালের ১৬ অক্টোবর আগ্রার কাছাকাছি টুণ্ডলা শহরে যে নীলোৎপলের জন্ম, তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা লখনউ-এর St. Agues's Loreto Day School-এ। ম্যাট্রিক পাশ করেন শাজাহনপুর গভর্ণমেন্ট হাইস্কুল থেকে। ১৯৫০ সালে কানপুর Dav College থেকে গ্র্যাজুয়েশান করে শুরু করেন কর্মজীবন। ১৯৫১ সালের ১০ মে, কলকাতা পুলিশের জাঁদরেল সার্জেন্ট নীলোৎপলের থিয়েটার মহলে পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৩২ সালে পাড়ার সখের মঞ্চে সার্জেন্ট শ্রীদের "কণ্ঠহার" নাটকে প্রথম অভিনেতা জীবনের সূচনা। সার্জেন্ট নীলোৎপল ফাঁক ফোকর পেলেই তারপর থেকে চালিয়ে যান অভিনয়। তৈরি করেন "অনামী" নামে এক নাট্য গোষ্ঠী। অপরাধীর পিছনে, নগর রক্ষার দায়িত্বের ব্যাপারে ছুটে বেড়ানো সুপুরুষ সেই পুলিশটি সন্ধ্যায় মেতে যান মানুষগড়ার কারিগরের কাজ নিয়ে। আবার এরই মধ্যে কলম খুলে লিখে ফেলেন—'উৎসব', 'দিশারী', 'প্রতিচ্ছবি', 'পিপাসা', 'অভিনেত্রী', 'অমর হ্যানিম্যান', 'লালকুঠি', 'কালকেউটের বিষ', 'সুর সম্রাট' ইত্যাদি নাটক। দিয়ে চলেন পালারূপ। নির্দেশনার ডাক প্রত্যাখ্যান করেন না। যখন বিশ্ববন্দিত সত্যজিৎ রায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে অভিনয় করে আসেন 'চারুলতা' আর 'চিড়িয়াখানা'য়। অবাক হন সকলে যখন দেখা যায়, চাকরি, সংসার, স্বামীর কর্তব্য, স্নেহের কন্যাদের প্রতি পিতার দায়বদ্ধতার মধ্যে 'অনামী'র নাট্য আন্দোলনকে নিয়মিত চালিয়েও, একাধিক চলচ্চিত্রে রূপদান করেও, বহু নাটকের জন্ম দিয়েও অতৃপ্ত বাসনায় ছুটে যান যাত্রা পাড়ায় এই একই মানুষ। যেখানে যান, যা করেন তা হৃদয় দিয়ে করেন বলেই ১৯৭৫-এ 'জব চার্নক' পালায় তাঁর অভিনীত চরিত্র সার্থক হয়। চাকরি থেকে অবসর নেবার পর তাই মন মরা হয়ে ঘরের কোণে পড়ে থাকার প্রশ্নই ওঠেনি কখনও তাঁর জীবনে। অভিনয় করেছেন ভৈরব অপেরা, বিশ্বরূপ, গিরীশ অপেরায়। রূপদান করেছেন 'শ্রেয়সী' নাটকে। উত্তমকুমার, স্বপনকুমার, থেকে ইতিমধ্যে নায়িকার আসনে অধিষ্ঠিতা কন্যা তাপসী রায়চৌধুরীর সঙ্গে-সিনেমা-থিয়েটারে নীলোৎপল হয়েছেন প্রশংসিত রূপকার। 'যাত্রা দল'ও তৈরি করেছিলেন তিনি। বিশ্বাসের পাত্রগুলো বিষময় জেনে সেই ভুল থেকে সরিয়ে নিয়েছেন নিজেকে। বর্তমানে 'অনামী'কে বাঁচিয়ে রেখে নীলোৎপল দে বিজন থিয়েটারে ত্রিদিব ঘোষের নির্দেশনায় নিয়মিত রূপদান করছেন 'গৃহদাহ' নাটক।

॥ শ্যামল সেন ॥

বরিশাল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ইঞ্জিনীয়ার যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ছেলে শ্যামল সেন জন্মান ১৯৪৭ সালে। এঁদের আদি বাড়ি যদিও ঢাকায়, শৈশব কেটেছে বরিশাল শহরে। ছেলেবেলায় খেলার ছলে ভাইবোন আর পাশের বাড়ির বন্ধুদের নিয়ে শ্যামলের প্রথম অভিনয় কবিগুরুর 'ডাক-ঘরে'। '৪৮ সালে শ্যামলরা আসেন কলকাতায়। এখানে এসে মণিমেলায় যোগ দিয়ে 'বারা মানুষ নয়' মজার নাটকে নেংটি ইঁদুরের চরিত্রে অভিনয় করে ঐ বয়সেই পুরস্কার নেন অহীন্দ্র চৌধুরীর হাত থেকে। কলেজের ছাত্র যখন তখন শ্যামল অনেক সখের থিয়েটার করেছেন। এই ভাবেই

একদিন আলাপ হয় রবি ঘোষ এবং সত্য ব্যানার্জীর সঙ্গে। তাঁরা ওঁকে নিয়ে আসেন লিটল্ থিয়েটার গ্রুপে। সেটা ছিল ১৯৫৩ সাল। এখানে ছিলেন '৬২ পর্যন্ত। এখানে উৎপল দত্তের কাছে মূলতঃ শ্যামল সেনের নাট্য শিক্ষা। ম্যাকবেথ-নাটকে ডাইনি চরিত্র রূপায়ণ শ্যামলের বড় কাজ। 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সাহায্যার্থে তখন এই নাটকটি নানা জায়গায় শো হতো। উৎপল দত্ত এ যাবৎ নাট্যকর্মে উপযুক্ত করে যে ক'জন যোগ্য ছাত্রকে তৈরি করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্যামল সেন একজন। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সান্নিধ্যে এসেছিলেন, এসেছিলেন শম্ভু মিত্রের সান্নিধ্যে। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন শ্যামল সেনের শ্রদ্ধার। তাঁর 'থানা থেকে আসছি' নাটকে অভিনয় করেছেন শ্যামল সেন। শ্রী সেন এক সময়ে বুঝেছিলেন, গ্রুপ থিয়েটার পথ হারিয়েছে, 'বাবু' হয়ে পড়ছে।

১৯৬২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখায় ১৩ বছর চাকরি করেছেন। এরপর শ্যামল 'চলাচল' গোষ্ঠীতে হঠাৎ নবাব, ঠগ নাটকে অভিনয় করেছেন। '৭৫ সালে কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে 'অঘটন', মিনার্ভায় 'প্রজাপতি', রামমোহন মঞ্চে 'থানা থেকে আসছি' নাটকে অভিনয় করেন। নিজে তৈরি করেন 'থিয়েটার গিল্ড'। এখানে তাঁর নির্দেশিত ও অভিনীত 'যদুবংশ', 'ভালোমানুষের মেয়ে', 'উত্তরের ব্যালকনি', 'সমাজ দর্পণ', 'গৃহদাহ' জনপ্রিয় হয়।

শ্যামল সেন আসেন যাত্রায়। লোকনাট্যের ব্যানারে তাঁর নির্দেশিত 'গণদেবতা', 'বনপলাশীর পদাবলী', 'দেবী মালিনী', 'চিড়িতনের বিবি', খুবই জনপ্রিয় হয়। যাত্রার প্রথা অনুসারে তিনি আসেন আর্য অপেরায়। অভিনেতা ও নির্দেশক হন। এখানে 'গরীবের মেয়ে' পালায় অভিনয় করাকালীন কোচবিহারের দিনহাটায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। সকলের আন্তরিক চেষ্টায়, নিউ থিয়েটার্স গোষ্ঠীর পূর্ণ সহযোগিতায় অনেকটাই সুস্থ তিনি।

শ্যামল সেনের স্ত্রী অভিনেত্রী চিত্রা সেন। বি. কমের ছাত্র এঁদের ছেলে কৌশিক সেন দূরদর্শনের অভিনেতা। শ্যামলবাবু নিজেও দূরদর্শনের জন্য এক সিরিয়ালের চিত্রনাট্য করার ভাবনায় আছেন! যাত্রা তো থাকছেই।

॥ শক্তি মুখার্জী ॥

যাত্রার একজন বিশিষ্ট নির্দেশক ও অভিনেতা শক্তি মুখার্জী নিতান্ত ছেলেবেলা থেকেই যাত্রাকে ভালবাসতেন। পরবর্তী কালে যখন এই যাত্রার সঙ্গে কর্মসূত্রে জড়িত হন তখন যাত্রা হয়েছে এমন আধুনিক যা শক্তিবাবুর কাছে ছিল আসল যাত্রার জাত হারানো দশা। তবুও রোজগারের স্থল বলে যুগের সঙ্গে তাল রেখে তাঁকে যাত্রার নির্দেশনার কাজ করতে হতো। প্রায় ৫০। ৫৫টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করে, মাঝে মাঝে দূরদর্শনের ক্যাজুয়াল শিল্পী হিসেবে কাজ করেও শক্তিবাবুকে যাত্রায় আসতে হয়েছিল টাকার জন্য।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের শততম জন্মবর্ষে তাঁরই পূর্বপুরুষদের পাঁচশত বৎসর পূর্বের ইতিহাস আশ্রিত "কুশারী পরিবার" পালার নির্দেশক ও অভিনেতা হিসেবে কাজ করে শক্তিবাবু গর্বিত। ১৯৭৯ সালে মঞ্জরী অপেরার 'এরাও মানুষ' পালা নির্দেশক ও অভিনেতা হিসেবে শক্তিবাবুর পেশাদার যাত্রা কর্মজীবন শুরু। শক্তিবাবু দীর্ঘ কয়েক বছর যাত্রার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত থেকে যা উপলব্ধি করেছিলেন, ব্যক্ত করেছিলেন, তা হলো ঃ "যাত্রা লোকশিক্ষার একটা মাধ্যম। বহু পরিবারের জীবন, অথচ বামফ্রণ্ট সরকারের কাছে এই জগৎটা বড় অবহেলার জগৎ।"

শক্তি মুখার্জী ১৯৬৪ সালে গিরীশ নাট্য (অপেরা) প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে দুর্গাদাস স্মৃতি পুরস্কার, শ্রেষ্ঠ প্রযোজক হিসেবে গিরীশ স্মৃতি পুরস্কার ও নির্দেশক হিসেবে সার্টিফিকেট অব মেরিট পান। এ ছাড়াও সম্মানিত হন একাধিক পুরস্কারে।

॥ ভবানী সরকার ॥

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস. সি পাশ করার পরই সরাসরি চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে

জড়িয়ে পড়েন সহকারী চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে এ. কে. ডি. প্রোডাকসনে। "মায়াজাল", "জবানবন্দী" ছবিতে সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন। তারপরই ১৩৭৬ সালে হঠাৎ যাত্রায় যুক্ত হন অভিনেতা হিসেবে। প্রথম যুক্ত হন ক্ষেত্রনাথ চ্যাটার্জীর ক্যালকাটা নাট্যবীথি অপেরায়। এ দলের "সাধক কমলাকান্ত", "ভাবীকাল", "কাঞ্চী-কাবেরী" পালায় অভিনয় করে সূচনাতেই খ্যাতি পান। হঠাৎ ক্ষেত্রবাবু দল চালাতে পারবেন না বলে জানালেন। হুগলী জেলার বৈঁচীগ্রামে যাত্রা করতে দল পৌঁছলে ক্ষেত্রবাবু ওখানেই দল চালাবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। ভবানী সরকার তখন ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে একটা রফা করলেন। দলের দায়িত্ব নিলেন। সে বছর ভবানীবাবু দল চালালেন। এরপর সুখেন্দুবিকাশ রায়ের সহযোগিতায় ভবানী সরকার যুক্ত হন গণেশ অপেরায়। কিছুদিন পর গণেশ বন্ধ হওয়াতে ভবানীবাবু আসেন "নাট্যভারতী"তে। সে বছর ওঁদের চলছিল পঞ্চু সেন নির্দেশিত অভিনীত "বিনয়-বাদল-দীনেশ"। এই চলমান পালাতেই সুপতির ভূমিকায় অভিনয় করেন। এরপর "মীনা ভ্যারাইটীজ", "আর্য অপেরা", "নিউ প্রভাস অপেরা", "রয়েল বীণাপাণি অপেরা"য় অভিনয় করেন। চিৎপুরের বিভিন্ন দলের (একমাত্র নিউ প্রভাস ছাড়া) বিকৃত মানসিকতা, সীমাহীন দুর্ব্যবহার থেকে ভবানীবাবু তাঁর অভিনেত্রী স্ত্রী কল্পনা দেবীকে নিয়ে চলে যান বালুরঘাটে। ওখানকার "বাসন্তী অপেরা"য় যোগ দেন। সেখানে পরিচয় হয় বীণাপাণি নাট্য কোম্পানীর পরিচালক মুকুল বোসের সঙ্গে এবং যুক্ত হলেন সেই দলে।

১৩৮৩ সনে আবার যুক্ত হন নাট্যভারতীতে। এই সময়ে নাট্যভারতীর মালিক ছিলেন প্রদীপ দেবনাথ। আজও ভবানীবাবুর মত শিক্ষিত, মার্জিত, অভিজাত শিল্পী তাঁর কর্মজীবন নিয়েই আছেন।

॥ রাজকুমার ॥

কলকাতার সুবিখ্যাত স্বর্ণ ব্যবসায়ী বি. সরকার-এর বংশধর। বাবা, নারায়ণচন্দ্র সরকার। ভারত বিখ্যাত সেতারবাদক রতনলাল সরকার এবং পিয়ানো বাদক কানাইলাল সরকার হলেন রাজকুমারের জ্যেঠামশাই। এই সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবারের ছেলে রাজকুমার প্রথম হিন্দু স্কুলে পরে তীর্থপতিতে পড়েন। ছাত্রাবস্থায় সুব্রত সেনশর্মা প্রথম রাজকুমারকে শৌভনিকে আনেন। এখানে স্টেজ ক্র্যাফট প্রসঙ্গে প্রাথমিক কাজ করার পর যুক্ত হন দক্ষিণ পরিষদে। প্রথম 'গৃহ প্রবেশ' নাটকে অভিনয় করেন। পরে আই. পি. টি. এ'র সঞ্চারী শাখায় যুক্ত হন এবং 'রাহু মুক্ত' নাটকে অভিনয় করেন। এরপরই যাত্রায় জড়িয়ে পড়া। প্রথম সুযোগ পান সত্যম্বর অপেরায়। ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে প্রথম যাত্রাভিনয়ে তালিম নিয়ে অভিনয় করেন 'একটি পয়সা' পালায়। পরে 'জালিয়ানওয়ালাবাগ', 'শহর থেকে দূরে', 'পদধ্বনি', 'সিপাহী বিদ্রোহ' ইত্যাদি পালায় অভিনয় করে প্রশংসা পান। অরুণ রায় রচিত 'আমি মুজিব বলছি' পালার নামভূমিকায় অভিনয় করে খ্যাতি পান। স্বয়ং মুজিবর রহমান সেই পালা দেখে সিল্ক থান উপহার দেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনার পর রাজকুমার কয়েক বছর অবসরে ছিলেন। রাজকুমার আবার ফিরে আসেন নিউ রয়েলে। এরপর তাঁর অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন' পালায় শুন্ডি রাজা, মেঘনাদ বধ পালায় 'মেঘনাদ', রাজদূত অপেরার 'বৌমা বাড়ি ফেরেনি' পালায় নায়ক রাজকুমারের জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয়।

॥ গোপাল হালদার ॥

১৩৫৩ সনে ধনী সত্যরঞ্জন হালদারের ছেলে, অভিনেতা গোপাল হালদারের জন্ম দঃ ২৪ পরগণার বারুইপুরের ধাপাগাছিতে। কল্যাণপুর হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। আসল নাম তরুণগোপাল, পরে যাত্রার নায়ক হয়ে তরুণ বাদ দেন। প্রথম আসেন শুভশক্তি দলে। প্রথম অভিনয় করেন 'গাঁয়ের মেয়ে', 'এ দেশ কাদের' পালায়। তাঁর অভিনয় ক্ষমতা ছড়িয়ে পড়ে

অচিরেই। এরপর অধিকাংশ দলে সরাসরি নায়ক হয়েছেন। গোপাল হালদারের বলিষ্ঠ অভিনয়ের সাক্ষী হয়ে আছে নিউ রয়েলের 'ঝড়ের দোলা', তপোবনের 'চণ্ডীমঙ্গল' ও 'বিশ্বাসঘাতক', নব রঞ্জন অপেরার 'ফেরারী ফৌজ', ভারতী অপেরার 'কাজীর বিচার', অগ্রগামীর 'কালো তলোয়ার', কলিকাতা যাত্রা সমাজের 'তিন পয়সার পালা', শিল্পীতীর্থের 'নটী লক্ষহীরা' ইত্যাদি। অভিনয় করেন গণবাণী, ভাণ্ডারী অপেরা, নাগ কোম্পানি ইত্যাদিতে।

গোপালবাবু যাত্রা দল তৈরি করেছিলেন। নাম রেখেছিলেন শ্রীগোপাল নাট্য কোম্পানি। দলটি বেশিদিন বাঁচেনি। যাত্রার নানা রসে নিজেকে সিক্ত করেছিলেন। খলনায়ক চরিত্রে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল!

তারপর একদিন নিঃশব্দে হারিয়ে গেলেন!

॥ রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

১৯৩৩ সালের ৫ আগষ্ট খড়দহে রবীনবাবুর জন্ম। এরপর ওঁরা বারাসাতে চলে আসেন। দক্ষিণ পাড়ায়। ছেলেবেলা থেকেই যাত্রার প্রতি গভীর প্রীতি। ছাত্রাবস্থা থেকেই বারাসাত ইভ্নিং ক্লাবের সঙ্গে জড়িত। এই ক্লাব নিয়মিত যাত্রা, নাটক মঞ্চস্থ করত। রবীনবাবু এখানে প্রথম ব্রজেন দে'র 'চাষার ছেলে' পালায় শ্যামাপদ চ্যাটার্জীর নির্দেশনায় অভিনয় করেন। এরপর সুভাষ ক্লাবে ডাঃ নির্মল পালের নির্দেশনায় অনেক নাটকে অভিনয় করেছেন। ডাঃ জ্যোতি চ্যাটার্জী, কৃষ্ণগোপাল চক্রবর্তীও দারুণ অভিনয় করতেন এই ক্লাবেই। বারাসাত গভঃ হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে, সিটি কলেজে কমার্স নিয়ে পড়তে পড়তে রবীনবাবু ১৯৫২ সালে মিনার্ভা থিয়েটারে নিয়মিত অভিনয় করার সুযোগ পান। তখন মহেন্দ্র গুপ্ত, গীতশ্রী দেবী ছিলেন মিনার্ভায়। সেই সময়ে সিনেমার পর্দায় অভিনয় করার সুযোগ আসে। ক্ষুধিত পাষাণ, হাঁসুলি বাঁকের উপকথা, সুভাষচন্দ্র, সব্যসাচী, বহ্নিশিখা, দুটি মন, সন্ন্যাসী রাজা, পক্ষীরাজ, চারণ কবি, মহাবিপ্লবী অরবিন্দ ইত্যাদি অনেক ছবিতে অভিনয় করেন তিনি। পাশাপাশি মঞ্চে ও যাত্রায় অভিনয় চলতে থাকে। এটাই তাঁর পেশা হয়ে দাঁড়ায়। শিশিরকুমার ভাদুড়ী, তৃপ্তি মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য থেকে ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ, ওদিকে উত্তমকুমার, রাণীবালা, ইন্দুবালা, মলিনা দেবী থেকে কমল মিত্র, সরযূবালা প্রায় সব দিকপালদের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। 'মহা উদ্বোধন'-এ রবীনবাবুর অভিনয় দেখে হেতেমপুরের মহারানী এবং সুসাহিত্যিক জরাসন্ধের স্ত্রী প্রশংসা করেন। রবীনবাবুর অভিনেতা জীবনে বাবা ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ পাথেয় হয়েছিল। খল চরিত্রে রবীনবাবু অসামান্য অভিনেতা।

॥ মনোজ মিত্র ॥

যাত্রা জগতের এক তুলনাহীন গায়ক-নায়ক এই মনোজ মিত্রের রক্তে আছে সুর আর সংগীতের ধারাপ্রবাহ। শ্যামবাজারের ধনাঢ্য-বর্ধিষ্ণু স্বনামধন্য মোহনলাল মিত্রের (যাঁর নামে রাস্তা এবং শ্যামবাজার মোড়ে ঘড়িওয়ালা প্রাসাদ) ভাইপো রঘুদয়াল মিত্রের ছেলে মনোজের জন্ম ১৯৫৮ সালে কলকাতায়। বরানগর ভিক্টোরিয়া হাইস্কুল থেকে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে, মনীন্দ্র কলেজে ১ম বর্ষের পর '৭৬ সালে বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি. এস. সি. পাশ করে, ক্যালকাটা টেকনিক্যাল কলেজ থেকে ২ বছরের কোর্স শেষ করে ক্যালকাটা ইলেট্রিক সাপ্লাই-এ কণ্ট্রোল চার্জম্যান-এ কণ্ট্রোল চার্জম্যান হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। শিক্ষা জীবনের পাশাপাশি সংগীত চর্চা ছিল মনোজের একমাত্র কাজ। শ্যামবাজার মিত্তির বাড়ির উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত আসর, লঘু সংগীতের আসর মনোজকে সংগীত শিল্পী হতে অনুপ্রাণিত করত। এরই মধ্যে এলো থিয়েটারের নেশা। একদিকে উচ্চাঙ্গ সংগীতে তালিম নেন রবীন্দ্রভারতীর অধ্যাপক প্রতাপ রায়ের কাছ থেকে, আধুনিক-ভজন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে, রতন দত্তের কাছে ধ্রুপদ, আবার পাশাপাশি ক্যালকাটা আর্ট থিয়েটারের সঙ্গে জড়িয়ে থেকে অভিনয় চলতে থাকে। প্রখ্যাত দীপিকা ব্যানার্জীর

নির্দেশনায় অভিনয়। মনোজের গানের গলায় মুগ্ধ হন দর্শক। সাংবাদিক প্রবোধবন্ধু অধিকারী মুগ্ধ হয়ে মনোজকে যাত্রায় আনায় মরিয়া হন। মনোজ মিত্র প্রথম আসেন প্রিন্স অপেরায়। তারপরই রাজা ও শিবানী ভট্টাচার্যের নাট্য কোম্পানির 'ফুলেশ্বরী' পালায় অভিনয় ও গানে মনোজ অবিস্মরণীয় দক্ষতার পরিচয় দেন! এবং রাতারাতি প্রতিষ্ঠা পান। এরপর মঞ্জরী অপেরার 'সাতপাকে বাঁধা' ইত্যাদিতে চরম খ্যাতি পান। মনোজ এক সময়ে TRINKUS HOTEL-এ মাইকেল নামে গান গেয়ে আসর মাতাতেন। মেগাফোন থেকে মানসকুমারের সুরে তাঁর রেকর্ড প্রকাশিত হয়। বেতারে বি. হাই আর্টিস্ট মনোজ 'হরি বোলোনা' ছবিতে নেপথ্য কণ্ঠ সংগীত পরিবেশন করেন। পরবর্তী সময়ে যাত্রার অভিনেতা জীবনের চাইতে একটু বেশিমাত্রায় সাংগঠনিক কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন। শক্তিময়ী অভিনেত্রী রাখী হালদার এই প্রতিভাধর নায়ক-গায়ককে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করার পর যাত্রা থেকে সম্পূর্ণ অবসর নিয়েছেন। যাত্রা সম্রাজ্ঞী জ্যোৎস্না দত্তের বহু স্মৃতি বিজড়িত গীতাঞ্জলি অপেরার গদিঘরটি যখন নানা ভাবে বিপন্ন হচ্ছিল, মনোজ মিত্র ঠিক তখনই ভাইয়ের মত জ্যোৎস্নার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। যাত্রা সম্রাজ্ঞীর মানসিক বিপন্ন অবস্থার সময়ে মনোজ 'রঙ্গভারতী' নামে একটি ছোট দল তৈরি করে, দিদিকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা ব্যবসা করেছিলেন। খ্যাতি যেমন মনোজকে অহঙ্কারী করেনি, কিছু অখ্যাতি তাঁকে স্পর্শও করেনি। মনোজ মিত্রের গানের মূল্যায়ন অনিবার্য ছিল। তবুও মনোজ হারেননি কোথাও, গান ও সদালাপ তাঁর চরিত্রের গুণ, তবুও মনোজ কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেকের কাছে দুর্বোধ্য।

॥ মনোজকুমার ॥

১৯৩৮ সালে ফরিদপুরের ভালা গ্রামে জন্ম। বাবা বেণীমাধব সরকার। বড় হয়ে সোদপুর হাইস্কুলে পড়ার সময় থেকেই অভিনয় জীবন শুরু। প্রথম প্রত্যাবর্তন নামে একটি নাটকে অভিনয় করেন। সূর্য দত্তর কালে মাখন নট্টর সহায়তায় নট্ট কোম্পানিতে আসেন। এরপর আবার অভিনয়ে বিরতি। ন্যাশনাল টোবাকো কোম্পানিতে কিছুদিন চাকরি করেন কিন্তু আবার ফিরে আসেন নট্ট কোম্পানিতে। পাঁচ বছর পর নাট্যভারতী, আবার নট্ট, লোকনাট্য, ভারতী অপেরা প্রভৃতি দলে ঘুরে ফিরে অভিনয় চলতে থাকে। অভিনয় করেন শ্রীনাথ নট্ট কোম্পানির (বিল্বগ্রাম) 'পৃথিবীর পাঠশালা'য়। এক ট্যাক্সি ড্রাইভারের চরিত্রে মনোজকুমারের অভিনয় আজও কেউ বিস্মৃত হয়নি। শেখর গাঙ্গুলী যখন যাত্রাদল তৈরি করেছিলেন, তখন মনোজকুমার ছিলেন সে দলের অন্যতম প্রধান শিল্পী। তপনকুমারের নব রঞ্জন অপেরা এবং আরও অনেক দলে চরম খ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করেছেন বটে, কিন্তু ভাগ্য দোষে মনোজকুমার সুপ্রতিষ্ঠা পাননি!

॥ শেখর গাঙ্গুলী ॥

যাত্রা জগতে যে ক'জন নায়কের নামে একটি দল চলে, দর্শকরা হাউসফুল দেন তেমনি নায়ক শেখর গাঙ্গুলী। এই সুঠাম-দীর্ঘাদেহী নায়কের জন্ম বহরমপুরে। ছেলেবেলা থেকে যাত্রা-থিয়েটারের প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণ ছিল। তাই গ্রামীণ সৌখিন দলে অভিনয় করার ফাঁকে ফাঁকে বহরমপুরের একটি সিনেমা হাউসে টিকিট দেখে দর্শকদের আসনে বসাবার চাকরি করতেন। একদিন ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো। যাত্রা জগতের পিতৃস্থানীয় অভিনেতা পঞ্চু সেন বহরমপুরে যাত্রা করতে গিয়ে আবিষ্কার করেন শেখরকে। তারপর পঞ্চু সেন ও নীতিশ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় শেখর অভিনয় করার সুযোগ পান যাত্রা জগতের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান নট্ট কোম্পানিতে। এখানে 'চাঁদের মেয়ে', 'নীলকুঠি', 'বিল্বমঙ্গল', 'চাঁদ বিবি' পালায় অভিনয় করেই খ্যাত। তারপরই যাত্রা জগতের ধর্মে তিনি চলে আসেন আর্য অপেরায়। 'গিরীশচন্দ্র' পালায় শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্রে অভিনয় করেন। লোকনাট্যের প্রযোজনায় উৎপল দত্তের কাছে প্রকৃত নাট্যশিক্ষা ও অভিনয় প্রসঙ্গে পুরোপুরি তালিম নিয়ে অভিনয় করেন 'দিল্লী চলো' পালায়। শেখর সুর্দান্ত অভিনেতা হিসেবে

প্রতিষ্ঠা পান। চরম খ্যাতি পান পরবর্তী কালে নট্ট কোম্পানির "গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম" এবং আরও অনেক পালায়।

শেখর একদিন জড়িয়ে পড়লেন নায়িকা শর্মিষ্ঠার ভাগ্যের সঙ্গে। প্রাচুর্যের শিখরে উঠলেন! নিজেরা যাত্রার দল করলেন, এর মধ্যে স্থায়িত্ব পেল না অনেক কিছু। দল বন্ধ হলো। খ্যাতি অখ্যাতি অঙ্গের ভূষণ করেও শেখর আজও যাত্রায় 'টপ' শিল্পী হয়েই আছেন।

॥ অমর বোস ॥

ঢাকার বিখ্যাত কুস্তিগীর অমূল্যরতন বোসের ছেলে অমর বোসের জন্ম ১৯৩১ সালের ১৭ নভেম্বর ঢাকায় গান্ডারিয়ায়। বালীগঞ্জ সত্যভামা হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক, আশুতোষ কলেজ থেকে আই. এস. সি পরে আই. টি. আই থেকে পাশ করে চাকরি জীবন। ছাত্রাবস্থা থেকে অমর বোস রাজনীতি করতেন। ১৯৫৯ সালে গণনাট্য সঙ্ঘের সভ্য হন। সাউথ স্কোয়াডে তখন অতুল ভট্টাচার্য, জয়ন্ত ভট্টাচার্য, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়। জয়ন্ত ভট্টাচার্যের কাছেই অমর বসুর অভিনয় শিক্ষা। সঞ্চারী নাট্য গোষ্ঠীর অভিনেতা-সম্পাদক ছিলেন! নির্মল ঘোষ তখন রাজ্য সম্পাদক এবং অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সহ সভাপতি। নির্মলবাবু স্টেজ ছেড়ে গেলেন সিনেমা লাইনে, অজিতেশবাবু গড়লেন নান্দীকার। সুব্রত সেনশর্মার নেতৃত্বে আবার আই. পি. টি. এ. জেগে ওঠে। তখন ছিলেন শিশির সেন, বাসুদেব বোস, রুনু ঘোষ, জয়ন্ত ভট্টাচার্য। ১৯৬৪ থেকে '৭৬ পর্যন্ত অমর বোস যুক্ত ছিলেন। '৭৬ সালে গণনাট্য ছেড়ে অভিনয়ে সুযোগ পান নট্ট কোম্পানিতে। এখানে 'বিদ্যাসাগর' ও 'মেহেরুন্নেসা' পালায় কাজ করলেন। ভাল লাগল না। যাত্রা ছেড়ে দিলেন। এক বছর বাদে '৭৮ সালে শান্তিগোপাল সুযোগ দিলেন তরুণ অপেরায়। স্তালিন, আটঘণ্টার লড়াই, আগুণ জ্বেলে দিল ও শত্রু রক্ত যুদ্ধ পালায় অভিনয় করে, ৩ বছর কাটিয়ে, আসেন 'বর্ণ পরিচয়'-এ। অমর ঘোষের নির্দেশনায় আলোর পিপাসা, সমীর মজুমদারের রানী শিরোমণি আরও বহু পালায় রূপদান করেন। অজিত গাঙ্গুলী, মানস দত্তগুপ্ত, ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল চৌধুরী, প্রমুখ শক্তিমান পালাকার-নির্দেশকের কাছে কাজ করে খ্যাতি পান। অমরবাবুর স্ত্রী শেলি বোস ছিলেন রবীন্দ্রসদনের কর্মী, তিনি ক্যান্সারে মারা যান। অমর বোস একজন সংগ্রামী মানুষ বলেই, যাত্রা জীবনের সংগ্রাম ও সংগ্রাম ধর্মী যাত্রায় অভিনয় করতে দক্ষ।

॥ দেবগোপাল ॥

বিষ্ণুপদ ব্যানার্জীর ছেলে দেবগোপাল ব্যানার্জীর জন্ম কলকাতার পাথুরেঘাটা স্ট্রীটে। বয়স বাড়ার পর থেকেই বেলেঘাটার বাড়িতে দেবগোপালের জীবন গড়ে ওঠে। বেলেঘাটার বাড়ির ছাদে থিয়েটার-থিয়েটার খেলা থেকেই দেবগোপালের অভিনেতা জীবনের সূচনা। দেশবন্ধু হাইস্কুল থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ করে গুরুদাস কলেজে প্রবেশ তারপর থেকে অভিনেতা দেবগোপালের জন্ম। পাড়ার ক্লাবে 'দুই মহল' নাটকের সুবীর চরিত্রে অভিনয় করে বেশ খ্যাতি পান। কৌতুক অভিনেতা, কৌতুক শিল্পী অনু দত্তের সহযোগিতা একেবারে গোড়া থেকেই ছিল। নাটকে নিজেকে তৈরি করার জন্য দেবগোপাল 'চেনামহল'-এ অনেকদিন জড়িয়ে ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর নাট্য শিক্ষক ছিলেন রণজিৎ দত্ত। পরে কেতকী দত্তের 'নান্দনিক'-এ জড়ান। কেতকী দত্তের সহযোগিতায় এণ্টনী কবিয়াল নাটকে মাঝে মাঝে জন্ হয়েছেন দেবগোপাল। ছেলেবেলা থেকে বেড়াবার হবি দেবগোপালের। কেতকী দত্তের সঙ্গে সুপরিচয় সূত্রে একদিন দেবগোপাল জানতে পারলেন, যাত্রায় অভিনয় করলে খুব বেড়ানো যায়। '৬৯ সালে লোকনাট্যের জন্ম হয়। কেতকী দত্ত তখন লোকনাট্যে। এখানে এক বছর বিভিন্ন পালায় অভিনয় করার পর নট্ট কোম্পানির কর্ণধার মাখনলাল নট্ট দেবকে 'বেগম-আসমান-তারা' পালায় অভিনয় করার সুযোগ দেন। প্রথম নায়ক হন এখানে। 'কৃষ্ণ শকুনি' পালায় বীণা দাশগুপ্তা হন উত্তরা, দেবগোপাল হন

অভিমন্যু। বিদ্যাসাগর-এ মাইকেল, ক্ষুধিত হারেম-এ মালেক কাফের এবং আরও বহু পালায় সুনামের সঙ্গে অভিনয় করেন। বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে নায়িকা বেলা সরকারের সঙ্গে। এক সময়ে এই জুটি চলে আসেন অগ্রগামীতে। এখানেও কয়েকবছর খ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করেন। ১৩৯৬ সনে জুটি ভেঙে যায়! তবুও দেবগোপাল অভিনয় শক্তিতে উজ্জ্বল!

॥ মধু ব্যানার্জী ॥

শ্রীচরণ ভাণ্ডারী অপেরার "শাপমুক্তি" পালায় দূতের ভূমিকায় প্রথম অভিনয় করেন। সেটা ছিল ১৩৪০ সন। এক সময়ে ফণি মতিলালের অসুস্থতা বা অন্য কারণে বিকল্প হিসেবে অভিনয় করেছিলেন। মধুবাবু প্রথম "মহিষাসুর" পালায় পূর্ণাঙ্গ চরিত্রে অভিনয় করেন। এরপর মধুবাবু "রায় অপেরা", "প্রভাস অপেরা", "গণেশ অপেরা"য় অভিনয় করে যুক্ত হন কালিকা থিয়েটারে। এখানে শাহজাদা, খেলাঘর, বিষ্ণুশর্মা নাটকে খ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করেন। তারপর আবার মধুবাবু চলে আসেন গৌর দাসের "সত্যম্বর অপেরা"য়। এখানে "রাজা সীতারাম", "শক্তিপূজা" পালায় খ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করেন। তারপর একে একে নট্ট কোম্পানি, অম্বিকা নাট্য কোম্পানি (এর আংশিক সত্বাধিকারীও হন), 'ভারতীয় রূপনাট্যম', 'রঞ্জন অপেরা', 'নিউ রয়েল বীণাপাণি', 'নিউ প্রভাস' ইত্যাদি দলে খ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করেন যথাক্রমে "কোহিনুর", "আহ্বান", "দেশের ডাক", "অভিশপ্ত চম্বল" পালায়। ১৩৭৪ সনে বেলা ঘোষের সঙ্গে মধুবাবু চলে আসেন মাধবী নাট্য কোম্পানিতে। এই দলে 'রিক্সাওয়ালা', 'হেডমাষ্টার', 'রক্তে রাঙা চম্বল' সুপার হীট হলেও দলের অন্যতম মালিক দলকে 'লীজ' দিয়ে আবার অন্যদলে চাকরি করতে যান।

আবার অভিনয় করেন 'ভোলানাথ অপেরা', 'নিউ প্রভাস অপেরা', 'অনামিকা যাত্রা ইউনিটে'। ১৩৮৪ সনে পুনরায় অম্বিকা নাট্য কোম্পানিতে চলে আসেন। এই পর্যন্ত তাঁর স্মরণীয় অভিনয় "সম্রাট শঙ্খচূড়", "নারী নাগিনী", "বিদ্রোহী নজরুল", "বিশে ডাকাত"-পালায়।

॥ সুজনকুমার ॥

১৯৬৪ সালে চাটরা হাইস্কুল থেকে হায়ার সেকেণ্ডারী এবং ১৯৬৮-তে বাগহাট কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করা, সংগীত দরদী ও চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভীমচরণ রায়ের ছেলে সুজন বিশেষ করে যাত্রাকে ভালবেসেই যাত্রাকে পাথেয় করেছিলেন। নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরার তৎকালীন ম্যানেজার কমলকৃষ্ণ খাঁ'-এর চেষ্টায় তাঁর যাত্রায় আসা এবং দলের ম্যানেজারি থেকে অভিনেতার জীবনে প্রবেশ।

১৯৭৩ সালে সুশীল নাট্য কোম্পানির পালায় অভিনয় করার পর থেকে সুজন দল বদল শুরু করেন। একে একে আসেন অগ্রগামী ('৭৪), মঞ্জরী অপেরা ('৮৭) লোকনাট্য, ভারতী ইত্যাদি আরও বহু দলে। লাল কেল্লা, চিড়িতনের বিবি, উল্কা, কুরবাণী, শ্রীমতী বেগম, মায়ের আঁচল, শের আফগান, বিদ্যাসুন্দর, হীরাঝিলের কান্না, কচ দেবযানী, কালো মেয়ের কান্না, নয়ন ভরা জল ইত্যাদি পালার সহ নায়কের চরিত্রে অভিনয় করে কৃতিত্ব দেখান। ইতিমধ্যে আরও অনেক দলেই যশের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। যাত্রার অন্যতম নায়িকা লীনা চক্রবর্তী এই দক্ষ শিল্পীর স্ত্রী বলেই বোধ হয় দু'জনে দু'জনার জয়ে খুশিতে ভরে থাকেন। ওঁদের একমাত্র পুত্র রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র বলে ওঁদের আরও তৃপ্তি।

॥ বীণা দাশগুপ্ত ॥

ইতিহাসের পাতায় চিরজন্মের মত বেঁচে থাকা 'নটী বিনোদিনী'কে যিনি বাস্তবে টেনে এনে জীবন্ত করেছিলেন, যিনি 'তারাসুন্দরী'র জীবন পালায় অবিস্মরণীয় অভিনয় মাধুর্যে 'তারাসুন্দরী'কে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, 'মীরার বঁধুয়া' পালায় মীরা হয়ে যিনি অভিনয় আর সংগীতের রসধারায় দর্শক চিত্তকে বিমোহিত করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর যাত্রা

শিল্পীদের সম্মান জানাতে, মূল্যায়ন করতে যে পুরস্কারের প্রবর্তন করেছিলেন, প্রথম বারেই সেই পুরস্কার যিনি ছিনিয়ে নিয়ে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিতা হয়েছিলেন, তিনি বীণা দাশগুপ্ত। ১৯৪৬ সালে ফরিদপুরের মাদারি গ্রামে রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মেয়ে বীণার জন্ম। বালিকা বয়স থেকেই অভিনয়ের প্রতি গভীর ভালবাসা ছিল তাঁর। এই ভালবাসা থেকেই একদিন হালতুর মেয়ে যাত্রার দল 'শ্রীকৃষ্ণ অপেরা'য় জড়িয়ে পড়েন। নিতান্ত সখে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ 'ভক্ত ধ্রুব' ও 'জয়দেব' পালায়। দু'বছর এই দলে থাকার পর আবার তাঁর ছাত্রী জীবন চলতে থাকে। সংসারে আর্থিক অনটন বীণার লেখাপড়ায় বাদ সাধে। বাধ্য করে নটী জীবন নিতে। বিখ্যাত বেহালা বাদক দীপেন চক্রবর্তীর আন্তরিক ইচ্ছা ও চেষ্টায় বীণা আসেন যাত্রায়। 'সোনাইদীঘি'র পরবর্তী পর্যায়ে এবং 'বর্গী এল দেশে' পালায় সামান্য অর্থের বিনিময়ে অভিনয় করেই বাজি মাৎ করেন। পান পুরস্কার। এরপর মুরারি মণ্ডলের সাহায্যে বীণার পুরোপুরিভাবে যাত্রায় জড়িয়ে পড়া। নবরূপ নাট্য কোম্পানির 'নাচ মহল' 'সিরাজদ্দৌলা' পালায় নেচে-গেয়ে-অভিনয় করে মাতিয়ে দিলেন সবার মন। এরপর দমদমের বীণাপাণি নাট্য কোম্পানি, নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরায় চুটিয়ে অভিনয় করলেন। সুযোগ পেলেন নট্ট কোম্পানির দুই নম্বর দল বৈকুণ্ঠ যাত্রা সমাজ-এ। পরে নট্ট কোম্পানিতে একের পর এক পালায় অসামান্য অভিনয় করে প্রথম শ্রেণীর নায়িকার আসন ছিনিয়ে নেন। চরম প্রতিষ্ঠা পান 'নটী বিনোদিনী' পালায় 'বিনোদিনী' চরিত্রে অভিনয় করে। পালাকার ব্রজেন্দ্রকুমার দের মানস-কন্যা বীণা শুধু নিজেকে প্রতিষ্ঠা দিলেন না, সেই সঙ্গে নট্ট কোম্পানির ব্যবসায়িক চরম সাফল্য এনে দিলেন 'যাত্রালক্ষ্মী' হয়ে! পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রথম প্রবর্তিত শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মান পেলেন তিনি। সম্মান পেলেন পূর্বভারত সংস্কৃতি সম্মেলনের পক্ষ থেকে।

শক্তিমান অভিনেতা ও নির্দেশক অরুণ দাশগুপ্তের শৈল্পিক মন থেকে অনেক শ্রম, অনেক সাধনা দিয়ে গড়ে তোলা শিল্পী বীণা এক সময়ে হলেন অরুণ জায়া। নট্ট কোম্পানির গন্নাবেগম, ভারতপথিক রামমোহন, মা মাটি মানুষ ইত্যাদি পালায় অভিনয় করে বীণা যখন খ্যাতির মধ্যাহ্ন গগনে তখনই নট্ট কোম্পানি থেকে বিদায় নিতে হল এই লক্ষ্মীকে। বীণা এলেন দীনেশ নন্দীর অগ্রগামীতে। প্রকৃতপক্ষে 'যাত্রালক্ষ্মী' খেতাব প্রাপ্তি এখান থেকেই। এখানে একের পর এক পালা যখন অরুণ দাশগুপ্ত ও বীণা দাশগুপ্তর আত্মপ্রকাশে হিট হতে থাকে তখনই আকস্মিকভাবে মারা যান অরুণ দাশগুপ্ত।

স্বামীর মৃত্যুর কয়েকদিনের মধ্যে অগ্রগামীর সঙ্গে জড়িত প্রায় ৬০। ৬৫ জনের স্বার্থে, অগ্রগামীর কল্যাণ কামনায় নিজের শিল্পীসত্তাকে বাঁচিয়ে রাখতে বীণা হন দলনেত্রী। অভিনয়ের সঙ্গে পালা নির্দেশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দীর্ঘ কয়েক বছর এই দলে থাকার পর আবার বীণার আসন টলল। এলেন ভারতী অপেরায়। এখানেও বীণা সম্মান ও খ্যাতির আসনে অধিষ্ঠিতা! ইতিমধ্যে বীণা দাশগুপ্ত অনেকবারই বিশেষ বিশেষ কারণে দূরদর্শনের পর্দায় এসেছেন। বেতারে প্রচারিত হয়েছে তাঁর সাক্ষাৎকার। সম্প্রতি শিল্পীদের তৈরি 'যাত্রা প্রহরী' সংগঠনের সম্পাদিকা তিনি। বামপন্থী মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর স্নেহের বীণা ভোট যুদ্ধে শ্রীচক্রবর্তীর পক্ষে দুটি ইলেকশানে সরাসরি পথ-নাটিকা নিয়ে যুদ্ধের শরিক হয়েছেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং আরও কিছু জায়গায় বীণা যাত্রা প্রসঙ্গে আলোচনায় অংশ নিয়েছেন। পুত্রের বিয়ে দিয়ে পুত্রবধূ এনেছেন। সামাজিক অনেক দায়বদ্ধতা সম্পাদন করেছেন। লবণ হ্রদের অর্থ-সম্পদে রসসিক্ত মাটির বুকে বীণার সর্বাধুনিক স্থাপত্য শৈলীর নির্দশনরূপে মাথা উঁচু করে থাকা প্রাসাদ শীর্ষে বিশালকায় সিমেণ্ট নির্মিত বীণাটি বোধ করি বীণার শ্রম আর সাধনার প্রতীক।

॥ ছন্দা চ্যাটার্জী ॥

খাম থেকে অনেকগুলো ছবি বার করে এগিয়ে দিলেন ছন্দা।

গভীর অরণ্যে প্রাসাদোপম অট্টালিকা। ছবির দিকে তাকালে গায়ের ভিতর ছম্ ছম্ করে। পোড়ো বাড়ি। মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা থানার অধীনস্থ বসনছড়া গ্রামের বর্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ পরিবারের বিস্ময়কর স্মৃতি। ছবির পিছনে লেখা—'আমাদের বসত বাড়ি'। দ্বিতীয় ছবি, জমিদার সোমনাথ চাটুজ্জের দোলমঞ্চ। তৃতীয় ছবির পিছনে লেখা, 'নীলকুঠী'। ছন্দা বললেন এটাও আমাদের বাড়ি। ওয়াটসন অ্যান্ড কোম্পানি একসময় এই বাড়িটিকে 'নীলকুঠী' তৈরি করেছিল।—চতুর্থ, পঞ্চম ছবিটি যথাক্রমে রাধাকান্তের মন্দির আর চাটুজ্জেদের পুকুরপাড়ে শিব মন্দির আর তার পোড়ামাটির দ্বারপাল। সবই আজ পরিত্যক্ত। মেদিনীপুরের বসনছড়া গ্রামে এসব এখন টুরিস্টদের কাছে চোখে দেখার সামগ্রী মাত্র! এই বংশরক্তের উত্তরাধিকার শেষ পুরুষ রামনারায়ণ চ্যাটার্জীর মেয়ে ছন্দার এখন একমাত্র পরিচয় নটী।

ছন্দার জন্ম মাতুলালয়ে। চারু মার্কেটে মামাবাড়ি। এখানেও নিদারুণ কনট্রাস্ট। মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনার বসনছড়া গ্রামে প্রতাপশালী জমিদার, ঠাকুরদা সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে আজকের প্রজন্ম যদি বুর্জোয়া আখ্যা দেয়, তাহলে ছন্দার দাদামশাইকে বলতে পারি প্রগতিবাদী গণবাদী পুরুষ। এই চারু মার্কেটের মামাবাড়িতে একদা আসতেন কমরেড শিবদাস ঘোষ, সুবোধ ঘোষ প্রমুখ মানুষেরা। এই বাড়িতেই একদা তাপস সেন এবং আরও অনেক গণশিল্পী গণসংস্কৃতি মনোভাবাপন্ন মানুষ পরম আত্মীয়ের মত ছিলেন। সেই সূত্রে তাপস সেন হলেন ছন্দার মামা। ছন্দা যখন নিতান্ত বালিকা, তখন থেকেই বড় অদ্ভুত ভাবে ওর ভিতর সেই শিল্প চেতনার জন্ম হয়েছিল। কিশোরী ছন্দা ভীষণ ভাল নাচত। ওর নাচ দেখে দাদামশাই শচীন্দ্রনাথ এবং মামারা বুঝেছিলেন যদি অনুশীলনের সুযোগ দেওয়া যায় তা হলে এ মেয়ে একদিন বড় হবেই। ছন্দার মা-ও তাই বিশ্বাস করতেন বলে পাঁচ বছরের মেয়ে ছন্দাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিয়েছিলেন গীতবিতানে। ওখানে ভারত নাট্যম, কথাকলি নৃত্য শিক্ষা শুরু হয়েছিল প্রখ্যাত গোপাল পিল্লাই-এর কাছে। এরপর রাম সিং-এর কাছে ছন্দার কথক শেখা। ১৯৬৫ সালে অল ইন্ডিয়া মিউজিক কলেজ থেকে এক সঙ্গে 'নৃত্যপ্রভা' ও 'গীতপ্রভা' ডিপ্লোমা নিয়ে সসম্মানে বেরিয়ে এসেছিলেন ছন্দা চ্যাটার্জী। নৃত্যের পাশে পাশে রূপচাঁদ চক্রবর্তীর কাছে সংগীতের তালিম নিয়ে ভিতকে শক্ত করেছিলেন ছন্দা। আশ্চর্য এক প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল তারপর থেকে। রূপচাঁদবাবুর কাছে যেমন উচ্চাঙ্গ, তেমনি সন্তোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে সর্বভারতীয় সংগীত, আবার কিছুদিন অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে রবীন্দ্রসংগীত এবং নির্মলেন্দু চৌধুরীর কাছে লোকসংগীতে তালিম নিয়ে নিজেকে তৈরি করার ফাঁকে ফাঁকে ছন্দার লেখাপড়াও চলছিল সমান গতিতে।

তবে থিয়েটারের প্রতি আকর্ষণ সেই শৈশব থেকে। যখন ছন্দার বয়স বছর পাঁচ-ছয় তখন প্রথম তাঁর মঞ্চের সঙ্গে মিতালি! 'মহেশ' নাটকে ছন্দা হয়েছিল আমিনা। আর গফুর অর্থাৎ আমিনার বাবা হয়েছিলেন স্বদেশ মাঝি। আজ সেই বালিকা ছন্দার বিরাট বিরাট পোস্টার পড়ে সর্বত্র—বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের এক অসামান্য শিল্পী। তেমনি স্বদেশ মাঝিও স্বনামে ধন্য। স্বদেশবাবু হয়েছিলেন এম. এল. এ।

—আপনার এল টি জি-তে এসেই কোন নাটকে অভিনয় করতে হয়েছিল? আপনি কি একেবারে নায়িকা হয়েই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন মঞ্চে?

ছন্দা হাসলেন। বললেন—"এখানেও কনট্রাস্ট। নায়িকা তো দূরের কথা—উল্লেখ করার মত চরিত্র ছিল না। নাটক—'তিতাস একটি নদীর নাম'। একটি ভিড়ের দৃশ্যে অনেকের মধ্যে আমি—"

সেই থেকে ছন্দা চ্যাটার্জীর গতি অব্যাহত। এল. টি. জি. যত নাটক করেছে তার অধিকাংশ নাটকের শিল্পী। ফেরারী ফৌজ, অঙ্গার, ওথেলো, রোমিও জুলিয়েট আরও বহু নাটক। ছন্দা দেবীর স্বামী সংগ্রামী গণশিল্পী—একদা আই পি টি এ-র অন্যতম শরিক-নাট্যকার-অভিনেতা-

সংগঠক নিমাই শূর পাঁচ-ছ খানা মোটা খাতায় ছন্দার সেই বালিকা বয়স থেকে এ পর্যন্ত যত কথা কাগজে বেরিয়েছে শিউলি কুড়োবার মত একটি একটি করে সব—সব সংবাদ কুড়িয়ে সযত্নে রক্ষা করেছেন। যখন ছন্দাদের নিদারুণ অনটন (অথচ ছন্দা পরিবারের একমাত্র কন্যা) তখন অনটন থাকলেও কন্যার সুখ কামনা করে না এমন অভিভাবক ক-জন আছেন। ছন্দার বেলাতেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। মা ভেবেছিলেন ছন্দার মত রূপসী—ছন্দার মত গুণবতী মেয়েকে উপঢৌকন দিয়ে একটি জামাতা লাভে কর্তব্য শেষ। ছন্দার বাঁচার নাকি সেই একটি পথ! কিন্তু ছন্দা ঠিক করেছিলেন, আত্মহত্যার মধ্যেই তাঁর মুক্তি নেওয়া শ্রেয়। দিশেহারা হয়ে ছন্দা ছুটে গিয়েছিলেন নিমাইয়ের কাছে। সেই মুহূর্তে ছন্দাকে গ্রহণ করেছিলেন তিনি। তখন ছন্দার অভিনয় জীবনের অনেকটা পথ পার হয়ে গেছে। উৎপল দত্তের গড়া ছন্দা তখন অনেকটা শক্ত। প্রণম্য নাট্যকার-গণশিল্পী বিজন ভট্টাচার্যের মানস কন্যায় তখন রূপান্তরিত ছন্দা। বিজনবাবুর 'দেবী গর্জন', নাটকে-রূপদান করে ছন্দা তখন অসামান্যা।

আপনি প্রফেশনাল থিয়েটারে কবে থেকে জড়িয়ে পড়লেন?—ছন্দার উত্তর, 'মূলত সেই বন্দী জীবনের পর থেকে। বোধহয় ১৯৬৫ সালে উৎপলদা অ্যারেস্ট হয়েছিলেন—'

—আপনি গ্রুপ থিয়েটার, বহু অ্যামেচার ক্লাবে অভিনয় করেছেন—পাবলিক স্টেজে এলেন কবে?

"পি. এল. টি-তে 'টিনের তলোয়ার' নাটকে উৎপলদা আমাকে চরম প্রতিষ্ঠা দেন! মাত্র ১৩ বছর বয়সে আমি 'টিনের তলোয়ার'-এ অভিনয় করতে আরম্ভ করি—যখনই কিছুদিন ফাঁকা থাকতাম সে ফাঁকে উৎপলদা ওই নাটক নামতেন—আমি যখন অভিনয় করতে পারতাম না 'টিনের তলোয়ার' বন্ধ থাকত। ১৯৭১ সালে জহরদা—জহর রায় আমাকে রঙমহলে 'সুবর্ণ গোলক' নাটকে প্রথম প্রফেশনাল থিয়েটারে প্রতিষ্ঠা দেন! জহরদার দান কম নয় আমার জীবনে! ১৯৭২ সালে 'তথাস্তু' নাটকে বহু রাত অভিনয় করি! ১৯৭৫ সালে অসীম চক্রবর্তীর 'বারবধূ' নাটক যখন ৭০০ রজনী—তখন এক নিদারুণ বিপদে পড়েন অসীমবাবু ; আমি তখন তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে ৯০০ রজনী পর্যন্ত কেতকী দত্তের অনুপস্থিতিতে অভিনয় করি। তারপর এক সময় চলে আসি যাত্রায়! সেই থেকে যাত্রার সঙ্গে—যাত্রার প্রতিটি মানুষের সঙ্গে—যাত্রা শিল্পের সঙ্গে আমি জড়িয়ে আছি। অবসর সময়ে নানা মিডিয়ামে কাজ করতে হয়। দূরদর্শন-বেতার ছাড়াও চলচ্চিত্র আছে।"

আপনার প্রথম ছবি?—উত্তর, "হরিসাধন দাশগুপ্তের 'একই অঙ্গে এত রূপ'। দ্বিতীয় ছবি, যাত্রা ভিশন—'লায়লা মজনু'। তৃতীয় ছবি, 'সাতভাই চম্পা'। আরও অনেক।"

"—১৩৯০ সনে দলবদলের জোয়ারে ভাসতে ভাসতে এসে উঠলাম গন্ধর্ব-তে। একটু দুষ্টুমির হাসি হেসে বললেন—স্বামীর আশ্রয়ে!"

জিজ্ঞাসা—, এর অর্থ কি?

ছন্দা বললেন, "গন্ধর্ব অপেরাটি মশাই আমার স্বামীর অস্তিত্ব।"

সেই অস্তিত্ব এখন বিলুপ্ত। কিন্তু অভিনয়ে ভাঁটা পড়েনি ছন্দার। নিমাই সুর বিভিন্ন কর্মের মধ্যে কাটিয়ে অবশেষে হয়েছেন যাত্রা সাংবাদিক। বহু স্বপ্ন আর বহু বাসনায় অতৃপ্ত ছন্দা তাঁর বহু জনের জন্য সাংসারিক দায়বদ্ধতার কাছে ভাগ্যলিখনে শুধু তৃপ্ত। সংসারে তিনি এক সার্থক মা আবার তিনি আসরে চরম সার্থক এক অভিনেত্রী। কর্মের মধ্যেই ছন্দা যে অমর হয়ে থাকবেন তাতে সন্দেহ নেই।

॥ মীনাক্ষী দে ॥

সবাই ডাকত মীনা বলে। বাবা-মা ভাই-বোনেদের মুখে মুখে ফিরত মিনু। "যখন আমার এক

বছর বয়স তখন একদিন আকস্মিকভাবে হারিয়ে যান বাবা। পাঁচ পাঁচটি সন্তানকে বুকে নিয়ে, তাদের বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে মিনুর বিধবা মা হলেন দিশেহারা।

"আমার যখন মাত্র ৯ বছর বয়স তখন আমার কাজে নেমে পড়া। মা আমাদের যে কী নিদারুণ কষ্টে মানুষ করতে চেয়েছিলেন তার বর্ণনা দিতে আমি অক্ষম। জানেন, এই যে আমি, এই যে যাত্রার নায়িকা আমি, এই যে আমি যাকে সবাই যাত্রার মক্ষীরানী বলে সম্বোধন করে, এই যে আমার রূপ, এই যে আমার কণ্ঠস্বর যাকে সবাই মূল্য দিয়ে থাকে, সে আমার মায়ের বিন্দু বিন্দু বুকের রক্তে গড়া। তাই আমি ভুলতে পারি না আমার মায়ের এ বাড়ি ও বাড়িতে কাজ করে আমাদের বাঁচিয়ে রাখার সেই ক্লান্ত-ভঙ্গুর চেহারাকে। মাকে কিছুটা শান্তি দেবার জন্য, শতছিদ্র সংসারে কিছুটা সাহায্য করার তাগিদে আমি নানা জায়গায় বাচ্চা ছেলে-মেয়ে সেজে কাজ করতাম।"

এইভাবে কাটছিল মিনুর। একদিন এক জায়গায় অভিনয় করতে গিয়ে আলাপ মধু বড়ালের সঙ্গে। মধু বড়াল এক সময়ে যাত্রা জগতের খুব বড় শিল্পী ছিলেন।

মধু রানী নামের অন্তরালে এই মধু বড়াল। তারপর যুগ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রালোকের বিবর্তন এসেছে।

জনতা অপেরার সর্বাধিনায়ক বা জেনারেল ম্যানেজারের আসনে তখন অধিষ্ঠিত আছেন মধু বড়াল। মীনাক্ষী বা মিনুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল মধুর মায়া মৈত্রের মাধ্যমে।

তারপর ঐ মধু বড়াল মিনুকে নিয়ে আসেন যাত্রায়। সরাসরি তাঁকে তুলে দেন যাত্রা জগতের বিশিষ্ট মানুষ, প্রযোজক শৈলেন মোহান্তের হাতে। শৈলেনবাবু মিনুকে শুধু আশ্রয় দেন নি, সুযোগ দেন তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' পালায়। নাম পাল্টে নাম রাখেন মীনাক্ষী।

"—হ্যাঁ। চারশ টাকায় জীবন শুরু হয়েছিল সত্যম্বরে। এক টানা নয়-দশ বছর ছিলাম শৈলেনদার সান্নিধ্যে, স্নেহচ্ছায়ায়। আমার আজ যে প্রতিষ্ঠা, যে খ্যাতি তা মূলত লাভ করেছি সত্যম্বর অপেরায় থাকাকালীন। আমি যাত্রার দর্শক সমাজে পরিচিত হয়েছি বলতে পারেন প্রথম পালা থেকেই, তবে যাকে বলে সুপরিচিতি তা পাই 'খনা'-র ঝিনুক চরিত্রে অভিনয় করে। আমার খ্যাতি আসে সত্যম্বরের 'একদিন রাত্রে' আর চন্দন মিত্রের আনন্দলোকের 'হেলেন অব ট্রয়' পালায় অভিনয় করে।

১৩৯০ সনে মীনাক্ষি আসেন লোকনাট্যে। দক্ষ বাজিগরের মত মীনাক্ষী তাঁর দুর্দান্ত অভিনয় জাদুতে বাজিমাৎ করেন। মীনাক্ষী অল্প সময়ের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়া নায়িকা হন। আজও অটুট সেই আসন।

॥ বর্ণালী ব্যানার্জী ॥

নদীয়া জেলার দাদুপুরের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ে বর্ণালীর জন্ম। দারিদ্র্যের জ্বালায় শতছিদ্র সংসারে ভাগ্যবিধাতার বিচারে যার কপালে যে কাজের দায় লেখা হয় তা খণ্ডন করে কার সাধ্য! তাই বোধ করি সেদিন রূপবতী বর্ণালীকে আসতে হয়েছিল যাত্রা পাড়ায়। বরণ করে নিতে হয়েছিল অভিনেত্রী জীবন।

বছর দশেক বয়সে এক যাত্রাপালায় একানি ও পরে এক নর্তকী চরিত্রে অভিনয় করে নিজেকে তৈরি করেছিলেন। গ্রামের একটি দলে 'সোনাইদীঘি' এবং 'সতীর ঘাট' পালায় অভিনয় করে যৎসামান্য যা আয় করতেন তাতেই সংসার চলত কোন মতে। এরপর বাবার হাত ধরে বর্ণালী আসেন চিৎপুরের প্রখ্যাত দল তরুণ অপেরায় কাণ্ডারী শান্তিগোপালের কাছে। শান্তিগোপাল তরুণ অপেরায় তাঁকে অভিনয় করার সুযোগ দেন। এই সময়ে বাগবাজারের বর্ধিষ্ণু এই পাল বাড়িতে বর্ণালী থাকেন এ বাড়িরই মেয়ের মত। নাচে-গানে-অভিনয়ে প্রথম থেকেই বর্ণালী আসর মাতান।

রক্তের নেশা, ঘুম ভাঙ্গার গান প্রভৃতি পালায় বর্ণালীর অভিনয় প্রশংসা পায়। দর্শকরা স্তম্ভিত হন 'হিটলার' পালায় 'লুসি' চরিত্রে এবং পরে 'লেনিন' পালায় শামার দৃপ্ত চরিত্রে বর্ণালীর অতুলনীয় অভিনয় দেখে। চরম খ্যাতির সঙ্গে বর্ণালী অভিনয় করেন রামমোহন, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, রমলা সার্কাস ইত্যাদি পালায়। এক সময়ে এই তরুণ অপেরার এক অভিনেতা অনুপকুমারের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়! বর্ণালী দলত্যাগ করেন। আসেন লোকনাট্য-এ। এখানে দীর্ঘ কয়েক বছর জড়িত ছিলেন বর্ণালী। প্রতিটি পালায় তাঁর প্রাণবন্ত অভিনয় এ দেশের মানুষ ভুলবে না কোনদিন! এবার এলেন নিউ প্রভাস অপেরায়। এখানে থাকাকালিন এক গাড়ি দুর্ঘটনায় বর্ণালী আহত হন। সুস্থ হয়ে, নানা ভাবে তিনি নতুন করে নিজেকে সাজান। বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। যাত্রার আর এক অভিনেতা খোকন ব্যানার্জীর সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিবাহসূত্রে আবদ্ধা হন! এরপর একের পর এক দলে অভিনয় করেন। তপোবন নাট্য কোম্পানির কর্ণধার-পালাকার-নির্দেশক দুলাল চট্টোপাধ্যায়ের পালাতেও খ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করেছেন তিনি। কালীপদ দাসের লক্ষ্মীনারায়ণ অপেরা ছাড়াও আরও অনেক প্রথম শ্রেণীর দলের নায়িকা হয়েছেন বর্ণালী।

॥ অঞ্জনা ব্যানার্জী ॥

যাত্রার নায়িকাদের মধ্যে অঞ্জনা ব্যানার্জী একজন। ব্রজগোপাল ব্যানার্জীর মেয়ে অঞ্জনার জন্ম ১৯৫৫ সালের ১৩ জুলাই। এই শিল্পী প্রথম আসেন আর্য অপেরায়। এরপর অঞ্জনা একের পর এক অনেক প্রথম শ্রেণীর যাত্রা প্রতিষ্ঠানের পালায় অভিনয়ে দক্ষতা দেখিয়ে নিজের আসনটি পাকা করেন। এই দলগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, লোকনাট্য, ভারতী অপেরা, মৃন্ময়ী অপেরা, নিউ গণেশ অপেরা, আনন্দলোক, নিউ প্রভাস অপেরা, গণবাণী, আনন্দতীর্থ, লোকরঞ্জন, পুষ্পাঞ্জলি ইত্যাদি। অঞ্জনা অভিনীত সুপারহিট পালাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—হেলেন অফ ট্রয়, পলাতক, জানোয়ার, সন্ন্যাসীর তরবারি, বাঘাযতীন, সম্রাট আলউদ্দীন, কাজীর বিচার, ডাইনী, পাগলা রাজা, খোঁড়া বাদশা, কালা শে'র, চেঙ্গিস খাঁ, বণিক বাড়ির বৌ, মানস কন্যা আরও অনেক পালা।

অঞ্জনা ব্যানার্জীর গানের গলা তারিফ করার মত। সুরকার বড় প্রশান্ত ভট্টাচার্যের কাছে মূলত তাঁর গান শেখা।

॥ তারারানী পাল ॥

মাত্র সাত বছর বয়সে যাত্রা অভিনেত্রী সরলাদেবীর জন্য সখের যাত্রায় আসেন তারারানী। চিৎপুরের এক অঞ্চলে এই শক্তিময়ী শিল্পীর জন্ম। সরলা মাসি তারাকে শ্রীবিদ্যানিকেতনে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ান। অভিনেত্রী মীরা দেবীর ছেলে দেবু আগের ক্যালকাটা অপেরায় নিয়ে আসে তারাকে। এই দলে 'ধর্মের বলি' পালায় কীর্তিনারায়ণ চরিত্রে তারার প্রথম আত্মপ্রকাশ। অভিনয় শেখাতেন সরলামাসী। এরপর শ্রীদুর্গা অপেরা, সন্তোষ ব্যানার্জীর ষ্টার অপেরায় কাজ করার পর তারার বিয়ে হয়ে যায়। বছর কয়েক পর দল ম্যানেজার কমল খাঁ নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরায় আবার তারারানীকে ফিরিয়ে আনেন। এই দলে 'বিষ্ণুপ্রিয়া' পালায় 'বিষ্ণুপ্রিয়া' চরিত্রে তারারানী আবিস্মরণীয় অভিনয় করে গোটা যাত্রা জগতে আলোড়ন তোলেন। যেমন করেন অভিনয়, তেমনি গানে গানে মাতান আসরের পর আসর। গানে প্রথম তালিম দেন গোপাল চক্রবর্তী।

বিজয় নন্দী ও অমিয় ভট্টাচার্যের কাছে নড়া বাঁধেন। এরপরই তারারানী পান প্রতিষ্ঠা। অভিনয় করেন সব ক'টি দলে নায়িকা হিসেবে। রঞ্জন, ভোলানাথ, অগ্রগামী, শিল্পীমহল, তপোবন, নাগ, যাত্রালোক, তারা মা অপেরায় খ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করে তারারানী নট্ট কোম্পানিতে যোগ দেন। নট্ট কোম্পানির মত অভিজাত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দলের নায়িকা 'ধর্মসিংহাসন', 'নিশিপুরের বৌ', 'পাল্কী চলে রে', এবং আরও অনেক পালায় চরম খ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করেছেন। ধর্মসিংহাসন'

পালায় 'মা কালী'র বেশ ধারণ করে তারা যেন জীবন্ত তারা হতেন! এমন বিস্ময়কর রূপসজ্জা বোধ করি নাট্য জগতে ইতিমধ্যে ঘটেনি, ভবিষ্যতেও ঘটবে বলে মনে হয় না। যাত্রার দিকপাল বহু শিল্পী ছাড়াও সর্বজন শ্রদ্ধেয় অভিনেতা বসন্ত চৌধুরী, রবি ঘোষ, দীপঙ্কর দে আরও অনেকের সঙ্গে অভিনয় করেছেন তারা। অকস্মাৎ এই উজ্জ্বল তারাটি নিভে যায়।

॥ মিতা চ্যাটার্জী ॥

১৩৩৮ সালে সুখ্যাত রামায়ণ গায়ক কালীপদ চক্রবর্তীর মেয়ে নমিতা চক্রবর্তীর জন্ম বসিরহাটের সাঁইপালা গ্রামে।

পূর্ণচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী নমিতা গানের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়ে দেবেন নাথের কাছে গান শিখতে থাকেন। গানের পাশাপাশি অভিনয় প্রীতিও কম ছিল না। ফলে মাঝে মাঝেই পাড়ার এবং অন্যান্য কয়েকটি সৌখিন সম্প্রদায়ে সখের অভিনয় করতেন।

বেদবাণী নাট্য সমাজের 'নদের নিমাই' পালায় বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত্রে অভিনয় করে যখন নমিতা সকলের মনে রেখাপাত করেছিলেন ঠিক তখনই অভিনেতা মোহন চ্যাটার্জীর ঘরণী হন এবং মোহনবাবু স্ত্রীর শিল্পী মনটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নিজেই নিয়ে আসেন নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরায়। 'বীর অভিমন্যু' পালায় উত্তরা চরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতি পান। প্রতিষ্ঠা পান যাত্রাজগতে। তারপর থেকে সুনামের সঙ্গে অভিনয় করেছেন নমিতা ওরফে মিতা চ্যাটার্জী। দু' একটি চলচ্চিত্রেও কাজ করেছিলেন মিতা।

কিছুদিন রোগ ভোগের পর মারা যান তিনি।

॥ বেলা সরকার ॥

আজকের যাত্রায় নামমাত্র যে ক'জন শিক্ষিতা, উচ্চাঙ্গের অভিনেত্রী আছেন বেলা সরকার নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে অন্যতমা। পাঁচ বছর বয়সে বাবা আর আট বছর বয়সে মাকে হারান বেলা। সেই বালিকা বয়স থেকেই বেলা দারিদ্র্যের ভয়ঙ্কর রূপ দেখেছিলেন। নবম শ্রেণীতে পড়তে পড়তে বেলঘরিয়ার মামা বাড়ির আশ্রয় তাঁকে ছাড়তে হয়। বড়দা খুশিলাল চক্রবর্তী ইছাপুর রাইফেল ফ্যাকটরীতে কাজ করার সময় এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় না পড়লে হয়তো মামা বাড়ি ছেড়ে ইছাপুরে মাসতুতো দাদার আশ্রয়ে থাকতে হতো না। ভাগ্য বিড়ম্বিতা বেলার একদিন বিয়ে হয়ে গেল, মাসতুতো দাদার বন্ধু, মার্চেণ্ট নেভিতে কর্মচারী সুকুমারের সঙ্গে। সুকুমার সরকার। সুকুমার ইছাপুরেই ঘর বাঁধলেন বেলাকে নিয়ে। দুঃখ যাঁর ভাগ্য লিখন, সুখ তার সইবে কেন? সুকুমার আর নেভিতে না ফিরে একটা কারখানায় চাকরি নিলেন। প্রথম অন্তঃসত্ত্বা বেলার তখন দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ চলছে। এই সময়ে সুকুমার আর তাঁর বন্ধুরা বেলাকে থিয়েটার করতে বলেন। ওখানে নাকি বাঁচার পথ আছে। বেলার প্রাথমিক অভিনয় জীবনের সূচনা বারাকপুরে শ্রীনাট্যম্-এ। এখানে প্রথম 'রজনী গন্ধা' এবং তারপরই 'ময়ূরমহল' নাটকে আত্মপ্রকাশ করেন।

এই সময়ে ভাটপাড়ার মীরা গোস্বামীকে সবাই বলত এ্যামেচার কুইন। তিনি বেলাকে স্নেহ করতেন। তাঁর হাত ধরেই একসময়ে বিভিন্ন ক্লাবে অভিনয় শুরু করেন বেলা। এই সময়ে একদিন বহুরূপীর ব্রজ চক্রবর্তীর সঙ্গে হঠাৎ আলাপ। ব্রজবাবুর ভাটপাড়ায় একটি গ্রুপ ছিল। থিয়েটার গ্রুপ। নাম পাঞ্চজন্য। এখানে কবিগুরুর 'চিরকুমার সভা'য় বেলাকে দিয়ে অভিনয় করালেন বটে, কিন্তু মেয়েটির মধ্যে বড় অভিনেত্রী হবার লক্ষণ ছিল বলেই ব্রজবাবুই তাঁকে অভিনয়ে তালিম দিলেন। রাজা ওয়াদিপাউস, চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি নাটকের ভিতর দিয়ে প্রকৃত শিক্ষা গুরুর কর্তব্য সম্পাদন করলেন ব্রজবাবু। ব্রজবাবু আপোশ চাইতেন না। চাইতেন বিদ্রোহের ভিতর দিয়ে জীবন প্রসঙ্গে বিদ্রোহী হতে। তেমনি শিক্ষাই দিয়েছিলেন বেলা সরকারকে। একদিকে মূলত বেকার স্বামী, অন্যদিকে এ্যাকসিডেণ্টে পঙ্গু দাদা, যাকে বেলার 'মা' রূপটাকে ক্যানভাসে বিবর্ণ হতে দিলেন

না ব্রজ। 'দশ চক্র', মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'বাইরের দরজা', 'বানরের হাড়' ইত্যাদি অনেক জটিল এবং একালের চরম পরীক্ষা-নীরিক্ষা মূলক নাটকে অভিনয় করে বেলা শেষ পর্যন্ত নিজেকে এক চেতনাময়ী শিল্পী সত্তায় অভিষিক্ত করলেন। কন্যার জন্ম দিলেন বেলা। এবার জীবনের মূল্য গেল বেড়ে। মেয়েকে বাঁচাতে, মেয়েকে গড়ে তুলতে বেলা আবার অভিনয় চালিয়ে গেলেন। এই সময়ে সৌমেন ঠাকুর বেলাকে নিয়ে গেলেন পার্থপ্রতিম চৌধুরীর 'সুন্দরম্'-এ। এখানে '৬৩ সালে পার্থপ্রতিমের 'ফিংগার প্রিন্ট' ছাড়াও আরও অনেক নাটকে অভিনয় করে প্রমাণ করলেন, তিনি শক্তিময়ী অভিনেত্রী। এই প্রসঙ্গে বেলা কৃতজ্ঞতা জানালেন সুন্দরমের প্রাণপুরুষ, নাট্যকার, নির্দেশক এবং চলচ্চিত্র পরিচালক পার্থপ্রতিম চৌধুরীর উদ্দেশ্যে। বেলার অভিনেত্রী জীবনে নাট্যকার, নির্দেশক, অভিনেতা ও অধ্যাপক মনোজ মিত্রের দানও কম নয়, তা স্বীকার করলেন। সুন্দরমে থাকার সময়ে বেলা পার্থপ্রতিম চৌধুরী নির্দেশিত, বিমল করের 'যদুবংশ' ছবিতে অভিনয় করেন। এই সময়ে অনেক অফিস ক্লাবে যাত্রা-নাটকের অভিনয় হতো। স্নেহ করতেন পালা সম্রাট। তাঁরই উৎসাহে ও সহযোগিতায় এই সময়ে বীণা দাশগুপ্তর সঙ্গে তাঁকে নিত্য যোগাযোগ রাখতে হয়েছিল, অবশ্য নট্ট কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি মত। কানাই মল্লিক ছিলেন নট্টর প্রম্পটার। তিনি নানা দিক দিয়ে সাহায্য করতেন বেলাকে। একদিন সৌভাগ্যের দুয়ার গেল খুলে। নট্ট কোম্পানির নায়িকা হলেন বেলা সরকার। চরম খ্যাতি পেলেন। বছর কয়েক নট্ট কোম্পানিতে থাকার পর বেলা এলেন অগ্রগামীতে। এখানেও তিনি রইলেন দলের মধ্যমণি হয়ে। তারপর অনেক দল, অনেক পালায় নায়িকা বেলা বইতে থাকলেন গঙ্গার মত, আর তার স্রোতে কতই না অবাঞ্ছিত স্মৃতি গেল ভেসে।

॥ লীনা চক্রবর্তী ॥

যাত্রা জগতের অন্যতম শক্তিময়ী নায়িকা লীনা চক্রবর্তীর বাবা, প্রয়াত দেবীদাস চক্রবর্তী ছিলেন ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলের প্রসিদ্ধ সংগীত শিল্পী। তাঁর চোখের মণি এই কন্যা বেহালার রুক্মিণী মডেল হাইস্কুল থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ করে ভর্তি হন ডায়মণ্ডহারবার ফকিরচাঁদ কলেজে। পি. ইউ পাশ করে বি. এ. পড়তে পড়তে বেছে নেন অভিনয় জীবন। অভিনয়ে প্রথম আত্মপ্রকাশ বালিকা বয়সে। কাকা প্রয়াত মানিক পালের কাছে লীনার অভিনয় শিক্ষা। 'মাটির ঘর' ও 'দুই কন্যা' নাটকে লীনার প্রথম অভিনয়। বড় জামাইবাবু অমর গাঙ্গুলী, যিনি বেহালার অহীন্দ্র মঞ্চের প্রবক্তা, তিনি লীনাকে জাতীয় নাট্যশালা নির্মাণ প্রকল্পে অভিনীত নাটকে অভিনয় করিয়েছিলেন। সেই নাটকে সরযূবালাদেবী, জ্ঞানেশ মুখার্জী, অনুপকুমার, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, কেতকী দত্ত, গীতশ্রী দেবীর সঙ্গে লীনা অভিনয় করে প্রশংসা পান। এরপর গোপেন দেবের সহযোগিতায় জনতা অপেরায় লীনার প্রথম আত্মপ্রকাশ। তারপর মঞ্জরী অপেরা, যাত্রালোক, লোকনাট্য, আর্য অপেরা, নিউ প্রভাস, ভারতী অপেরা, উর্বশী অপেরা এবং আর কিছু দলে খ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করেন। নাচে-গানে অতুলনীয় নায়িকা যে ক'জন যাত্রা পাড়ায় আছেন তার মধ্যে লীনা চক্রবর্তী অন্যতম। লীনা নাচে খুবই দক্ষ এবং এই নাচ শিখেছেন মেজদির কাছে। গানের শিক্ষক মূলত বাবা। 'হীরাঝিলের কান্না' পালায় অভিনয় করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছেন। লীনার স্বামী অভিনেতা সুজনকুমার।

ভারতীর 'কালো' মেয়ে কান্না' পালার নায়িকা লীনাকে ভোলা যাবে না কোন দিন।

॥ লতা অধিকারী ॥

পাঁকে পদ্ম ফুটতে কেউ দেখেছেন কি না লতা জানেন না, শুধু নিজের কথা বলতে গিয়ে তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়ায়। তিনি নিজেকে পাঁকে ফোটা পদ্ম মনে করেন। রূপসী লতার জন্ম হয়েছিল এমন দরিদ্রতার মধ্যে যার জন্যে কয়েক বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে নিজেকে আর মা

বাসন্ত দেবীকে বাঁচাতে হয়েছিল তাঁকে। ঝিয়ের কাজের মধ্যে সংগ্রাম আছে, সেই সংগ্রামী মেয়েকে একদিন পালাকার দেবেন নাথ বসিরহাটের অপেশাদার সাজ-পোশাক কোম্পানি 'হিন্দুস্থান সাজঘরে' নিয়ে আসেন। লতার রূপ যেমন ছিল, তেমনি ছিল মিষ্টি কণ্ঠস্বর। এই 'সাজঘর' সুর পার্টি, মহিলা শিল্পী সাপ্লাই করত সখের যাত্রা দলে। সেই সূত্রে হাসনাবাদের একটি দলে 'মাটির মা' পালায় প্রথম অভিনয় করে বাজিমাৎ করলেন। এরপর দেবেনবাবু লতাকে নিয়ে এলেন স্বনামধন্য অমিয় বসুর শ্রীরাধা নাট্য কোম্পানিতে। 'সূর্যমহল' পালায় 'বনফুল' চরিত্রে তোলপাড় করা অভিনয় করে আসামের ধুলিয়াজান থেকে নিয়ে এলেন স্বর্ণ পদক। এসব জয়ের কথা কলকাতার দামী অভিনেতা-অভিনেত্রী হলে কিছু কিছু পত্র-পত্রিকায় ছাপা হলেও লতাদের কথা লেখে না কেউ, এমন অভিযোগ সব শিল্পী-কর্মীদের মত লতারও। পরে লতা অধিকারী আর্য অপেরায় উৎপল দত্তের পালায় ও নির্দেশনায় কাজ করে নিজেকে যথার্থ শিল্পী করলেন। যাত্রা জগতের প্রণম্য শিল্পী পঞ্চু সেন এই লতাকে সর্ব দিক দিয়ে এত স্নেহ দিয়েছিলেন, যার ঋণ কোনদিন পরিশোধ করতে পারবেন না লতা। লতা এখনো গ্রামীণ যাত্রাদলগুলির স্বার্থে কাজ করছেন, প্রভূত পারিশ্রমিকের লোভে কলকাতার পোশাদার দলের মোহ তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি।

॥ স্বপ্নাকুমারী ॥

প্রাচুর্য শুধু নয়, এক অভিজাত বর্ধিষ্ণু পরিবারে ১৯৪৯ সালে স্বপ্নার জন্ম। বাবা মণিমোহন ব্যানার্জী আদরের মেয়েকে শিক্ষায় দীক্ষায় মনের মত করে গড়ে তুলতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেননি।

ব্যাপটিস্ট গার্লস স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী, সুদর্শনা স্বপ্না তাই মাঝে মাঝে পাড়ায় আবৃত্তি শোনাতেন। সখের থিয়েটার করতেন। সমবয়সী মেয়েদের নিয়ে একটা সখের দলও গড়েছিলেন ওরা। 'বিসর্জন' পালার অপর্ণা চরিত্রে স্বপ্নার অভিনয় দেখে বিধায়ক ভট্টাচার্যের ঐকান্তিক অনুপ্রেরণায় স্বপ্না একটু একটু করে মিশে যেতে থাকলেন থিয়েটারের সঙ্গে। সংসারে প্রায় সকলের, বিশেষ করে বাবার অমত থাকা সত্ত্বেও স্বপ্না অভিনয় করতে থাকলেন এখানে-ওখানে-সেখানে। বিভিন্ন অফিস ক্লাবে। থিয়েটারের নেশায় গেলেন মেতে। বিবাহ হয়েছিল স্বপ্নার কিন্তু তা স্বপ্নের মত হয়ে গেল একদিন। পরে যাত্রাজগতের ম্যাটিনি আইডল স্বপনকুমার স্বপ্নার অভিনয় দেখে ওঁর বাড়ি থেকে অনুমতি নিয়ে স্বপ্নাকে হাজির করেন আসরে। প্রথম আত্মপ্রকাশেই স্বপ্নার খ্যাতি হল। 'সপ্তপদী' পালায় অভিনয় করে স্বর্ণপদক পেলেন স্বপ্নাকুমারী। এরপর নাট্যভারতীর 'বাঘিনী' ও 'দেনা-পাওনা' পালায় অভিনয় করে বিভিন্ন আসর থেকে জয় করে নিয়ে এলেন নানা পুরস্কার। বার্নপুরে হলেন 'ষোড়শী' চরিত্রের জন্য শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী।

যে স্বপ্না প্রভূত বিলাস আর প্রাচুর্যের মধ্যে সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন বিনা পরিশ্রমে, সেই স্বপ্না রাতের পর রাত এক আসর থেকে আর এক আসরে ছুটে যেতেন থিয়েটারের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে।

স্বপ্নাকুমারী নাট্যভারতীর শিল্পী যখন তখন তাঁর রূপ ও অভিনয় শো বিজনেসের ক্ষেত্রে বিশেষ মর্যাদা পেয়েছিল। এরই মধ্যে এক সময়ে নটসম্রাট স্বপনকুমারের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই দোর্দণ্ড প্রতাপশালী নায়ককে বড় বেশি ভালবেসে ফেলেছিলেন বলে কোন কিছুকেই স্বপ্নাকুমারী ভয় পাননি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। স্বপনবাবুর মত শক্তিমান নায়কের পাশে স্বপ্নাকুমারীর দাপটের অভিনয় যেমন মন আর মঞ্চ তোলপাড় করত, তেমনি স্বপ্না স্বপনবাবুর অভিনয় জীবনের ২৫ বছর পালন করে তাঁর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দিয়েছিলেন। প্রদীপ দেবনাথের নাট্যভারতী, প্রদীপ অপেরা, জনতা অপেরা, ভারতী অপেরায় বহু পালায় স্বপ্না অসামান্য অভিনয়ের নজীর রেখেছিলেন। এরপর একদিন স্বপনবাবুর দক্ষিণ-

কলকাতার মেঘমল্লার-এর ফ্ল্যাটে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান। স্বপ্নার মৃত্যুর পর স্বপনবাবু তাঁর ফ্ল্যাটে স্বপ্না দেবীর একটি মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

॥ ছবি রায় ॥

বিলাস আর প্রাচুর্যের মধ্যেই ১৩৪৫ সনে বনগাঁয় বীরেন্দ্রনাথ রায়ের মেয়ে ছবি রায়ের জন্ম। ভাগ্যচক্রে একদিন পারিবারিক স্বার্থের এক চরম সংঘাতের শিকার হয়ে অত্যন্ত সাধারণ অবস্থার মধ্যে এসে দাঁড়াতে হয় ছবি রায়কে। সংসারের অনেকটা দায়িত্বই তাই অতি অল্পবয়সেই তুলে নিতে হয়েছিল তাঁকে। যে ছবি সখে গান শিখেছিলেন, সেই ছবিকেই গান শিখিয়ে অর্থ রোজগার করতে হয়েছিল। তাতেও যখন অনটন ভাল করে ঘোচানো গেল না তখন ছবি রায় বেছে নিয়েছিলেন অভিনয় জীবন।

ছবি রায় যখন অভিনয় করে মোটামুটি পরিচিত হয়ে উঠেছেন তখন একদিন অম্বিকা নাট্য কোম্পানির একজন অংশীদার কালীয়দমন গুহঠাকুরতা ছবি রায়কে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে এলেন অম্বিকাতে। ছবি রায় জড়িয়ে পড়লেন যাত্রাজগতে। একের পর এক নাটকে খ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করলেন তিনি। প্রায়শ্চিত্ত, প্রতিশোধ, দেবতার গ্রাস, কোহিনূর, শয়তানের চর প্রভৃতি পালায় অভিনয় করে পেলেন চরম প্রতিষ্ঠা। 'শয়তানের চর' পালার টগর চরিত্রে অভিনয় করে ছবি রায় নানা দিক থেকে পেয়েছিলেন নানা পুরস্কার।

অভিনয়ই ছবি রায়ের প্রাণ তার প্রমাণ তিনি রেখেছেন বরাবর।

একবার আসরে ছবি রায় অভিনয় করতে করতে জানতে পারলেন তাঁর বাবা মারা গেছেন। টেলিগ্রাম এসেছে। সবাই সেদিন বলেছিলেন অভিনয় বন্ধ রাখতে। ছবি রায় তা করেন নি। অমিয় বসুর মৃত্যুর পর এই শক্তিময়ী শিল্পী বিভিন্ন দলে অভিনয় করেছেন। এই মুহূর্তে তিনি রোগ শয্যায় মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। যাত্রা জগতের একজনও তাঁর খবর নিতে যান না এটাই তাঁর চরম অভিমান। এই গ্রন্থ প্রকাশের আগেই হয়তো নিঃশব্দে চলে যাবেন তিনি।

॥ ফিরোজাবালা ॥

১৯২৪ সালে কলকাতার ভৈরব বিশ্বাস লেনে ফিরোজাবালার জন্ম। 'শ্রীগৌরাঙ্গ' নাটকে বালিকা ফিরোজা প্রথম ষ্টার থিয়েটারে অভিনয় করেন। ষ্টার থিয়েটারে একটানা অনেক বছর থাকার পর বালিকা ফিরোজ হন, ফিরোজাবালা। এরপরই সুযোগ পান রঙমহল থিয়েটারে। ইতিমধ্যে অভিনয়ে প্রশংসা পেয়েছিলেন। এরপর পদ্মা দেবীর সহযোগিতায় এই অভিনেত্রী আসেন নব চলন্তিকা নাট্য কোম্পানিতে। এখানে 'সীতা', 'দেবলাদেবী', 'মিশরকুমারী' প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করেন। ফিরোজাবালা অভিনীত 'নাহারিণ' চরিত্র দর্শকদের হৃদয় জয় করে। এরপর নাট্য ভারতীতে আসেন শিল্পী। এখানে 'নবাব সিরাজদ্দৌলা' পালায় ঘসেটি বেগম, এবং 'উপেক্ষিতা' পালায় 'অম্বর' চরিত্রে অভিনয় করে ফিরোজাবালা খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছন। তারপর আসেন তরুণ অপেরায়। এখানে 'রক্তের নেশা' পালায় চুটিয়ে অভিনয় করেন বটে, কিন্তু এখানে থাকা হয়নি। পরের বছর ফিরোজাবালা আসেন শ্রীরাধা নাট্য কোম্পানিতে। এরপর নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরার 'এক টুকরো রুটি' পালায় অভিনয় করে আলোড়ন তুলেছিলেন। এলেন 'লোকনাট্য'-এ। 'অভিশপ্ত ছিয়াত্তর' পালায় অভিনয় করে সকলের শ্রদ্ধা পান। তারপর নব রঞ্জন অপেরা সহ বহু দলে অভিনয় করেন।

ফিরোজাবালার অভিনয়ে যাত্রাভিনয়ের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়।

॥ অঞ্জলি ভট্টাচার্য ॥

আন্দুলের মৌড়িগ্রামে ১৩৪২ সনে প্রিয়নাথ চক্রবর্তীর কন্যা অঞ্জলির জন্ম। অভিনেত্রী জীবনে প্রবেশ করার আগে নীলরতন সরকার হাসপাতালের নার্স ছিলেন অঞ্জলি দেবী। একদিন

অপ্রত্যাশিতভাবে যাত্রার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন তিনি। যুক্ত হন প্রথম লক্ষ্মীনারায়ণ অপেরায়। শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্য ভারতীতে কমলেকামিনীতে সুযোগ দেন অঞ্জলি দেবীকে। শুধু নারী নয়, পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন তিনি। পূর্ণেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'সিরাজদ্দৌলা' পালায় ওয়াটস্ চরিত্রে অঞ্জলি দেবীর অভিনয়ে চমকে উঠেছিলেন সেদিনকার দর্শককুল। নাট্য ভারতীর একাধিক পালায় অভিনয় করার পর তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে যাত্রাপাড়ার বিখ্যাত দীনেশঠাকুরের (রান্নার ঠাকুর) সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। সত্যম্বর অপেরার 'সোনাইদীঘি' পালায় মুক্তকেশী চরিত্রে অসামান্য অভিনয় করেন। তারপর যে দলগুলিতে অঞ্জলি দেবী খ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তরুণ অপেরা (জালিয়াৎ), নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা (অভিমন্যু) ইত্যাদি। শ্যামপদ দত্ত ও অভিনেত্রী রুবী দত্তের কল্যাণী অপেরায় নন্দদুলাল রায়চৌধুরীর' 'দেবী চৌধুরাণী', 'রাণী দুর্গাবতী', গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ রচিত 'রাণী রাসমণি' ইত্যাদি পালায় অতুলনীয় অভিনয় করেছিলেন তিনি।

এরপর একদিন যাত্রাদল গড়ার স্বপ্ন নিয়ে লিজ নেন 'ভারতীয় রূপ নাট্যম্ সংস্থা'। এই দলকে স্থায়ী করার জন্য নিজেকে নিঃশেষ করেছিলেন, কিন্তু কয়েকজনের বেইমানিতে বছর ঘুরতে না ঘুরতে দল বন্ধ হয়ে গেল। ঋণের বোঝা চাপল তাঁর মাথায়। শেষ পর্যন্ত উত্তরপাড়ার বাড়ি, সোনাদানা সব বিক্রি করে পথে নামলেন। আবার অভিনয় জীবন শুরু করেন তিনি। 'চুমকী' পত্রিকা ১৩৮৪ সনের পূজা সংখ্যায় লিখল—"তারপর নিউ রয়েল, সুশীল নাট্য (তখন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল) ইত্যাদি অন্যান্য অনেক দলে অভিনয় করে চলে গেলেন জয় বাংলা।...ওখানে ১৮টি পালায় রূপদান করে, বাংলাদেশের দীপালি অপেরায় যোগ দেন। ফিরে এসে যোগ দেন মঞ্জরী অপেরায়।...তারপর বীণাপাণি নাট্য কোম্পানি।...ডিমাপুর কালীবাড়ি ও বিষ্ণুপুরের আসর দুটিতে দলের জনৈকের মন্তব্য এবং অভিনেতার অকথ্য ভাষা ও অন্যায় জুলুমের জন্য মরশুম শেষ না করে দলত্যাগ করেন তিনি। এতগুলি বছরের অভিজ্ঞতায় অঞ্জলি দেবী বুঝেছেন যে মোটা "বাবু" না থাকলে যাত্রার চাকরিতে উন্নতি করা যায় না। রূপ-যৌবন বিকোতে না পারলে স্থায়ী চাকরি হয় না। তিনি নিজের চোখে দেখেছেন অনেক নির্যাতন। এই নির্যাতনের সাক্ষী হিসেবে তিনি নাম করলেন মিনতি মুখার্জী ও ধীরা পালের"...যাত্রার ভিতরকার এই চেহারাই যাত্রার প্রকৃত অগ্রগতির অন্তরায়।

আজ অঞ্জলি দেবীর মত শক্তিময়ী অভিনেত্রীর প্রদীপ্ত শিখা ম্লান। একমাত্র মেয়ে বুলা আর নাতনি-নাত জামাই নিয়ে বেঁচে আছেন। অভিনেতা, নির্দেশক, পালাকার অমিতাভ ঘোষ তাঁর জামাতা।

॥ চিত্রা মল্লিক ॥

সৌভাগ্য বশতঃ প্রথমেই চলচ্চিত্রে অভিনয় করার সুযোগ পান। সুযোগ পান 'নিষিদ্ধ ফল' ছবিতে। চলচ্চিত্র শিল্পের সুবিশাল ইতিহাস গ্রন্থ "সোনার দাগ"-এ চিত্রা দেবী প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। যা হোক, এরপর দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'কণ্ঠহার' ছবিতে অভিনয় করেন। এর মধ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধা হন। কিন্তু অভিনয় জীবন থেকে সরে যাবার প্রশ্ন ওঠেনি। চিত্রা মল্লিক অভিনীত উল্লেখযোগ্য ছবিগুলি হলো : কচি সংসদ, মালা বদল, ঠিকাদার, শর্মিষ্ঠা, প্রিয় বান্ধবী ইত্যাদি। এর পাশাপাশি চিত্রা মল্লিক এ্যামেচার ক্লাবে একের পর এক নাটকের প্রধান নারী চরিত্রে অভিনয় করে রীতিমত ঝড় তুলতে থাকলেন। এবার এলেন যাত্রায়। শ্রীদুর্গা অপেরায় তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। 'সম্রাট অশোক' পালায় অভিনয় করে সুনাম পেলেন। তারপর বেশ কিছু দিন অবসর যাপন করে শিল্পী আবার এলেন নবযুগ নাট্য সংসদে। তিন বছরে একটানা অভিনয়

করার পর চিত্রা আসেন সত্যম্বর অপেরায়। এখানে পরবর্তী সময়ে 'সোনাইদীঘি' পালায় অভিনয় করলেন। ব্রজেন দের প্রথম "সোনাই" চিত্রা। পেলেন প্রতিষ্ঠা। এরপর নব রঞ্জন অপেরার 'ভুলের মাশুল' পালায় অসামান্য অভিনয় করলেন। পরবর্তী সময়ে তরুণ অপেরা, ভারতী অপেরা, নিউ প্রভাস অপেরা, অগ্রগামী, জনতা অপেরা, নাগ কোম্পানি এবং আরও অনেক দলে, অনেক চরিত্রে অভিনয় করে চিত্রা দেবী খ্যাতি পান। জনতা অপেরার 'ফাঁসীর মঞ্চ' পালায় রূপদান করে রীতিমত হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছিলেন। অনেক পুরস্কার ও মানপত্রে এই শিল্পীকে সম্মানিত করা হয়। ওঁর আকস্মিক মৃত্যুতে যাত্রা জগৎ এক অভিজাত মাতৃরূপ হারাল।

যাত্রার স্বনামধন্য অভিনেতা-নির্দেশক পান্না চক্রবর্তীর সঙ্গে চিত্রা দেবীর এক মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, এর ফলে যাত্রায় পান্না-চিত্রা এক স্মরণীয় জুটি হিসেবে চিহ্নিত হয়।

॥ সাহানা বসু ॥

সাহানা বসু খিদিরপুরে থাকতেন। স্কুলে পড়ার সময় থেকে সাহানা সখের থিয়েটারে অভিনয় করতে করতে নিজেকে তৈরি করেছিলেন। তারপর বিভিন্ন এ্যামেচার ক্লাবে বহু নাটকে অভিনয় করে সাহানা যখন বেশ শক্তিময়ী হন তখনই সুযোগ পান সত্যম্বর অপেরায়। কর্ণধার শৈলেন মহান্ত তাঁকে 'সোনাইদীঘি' পালায় সুযোগ দেন এবং সাহানা সকলের মন জয় করেন। যে 'সোনাইদীঘি'র সোনাই চরিত্রে জ্যোৎস্না দত্ত অভিনয় করে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেছিলেন, সেই চরিত্রেই সাহানা বসুও অভিনয় করে শুধু খ্যাতি পাননি, শ্রীমতী দত্তের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। এরপর ভিন্ন স্বাদের একাধিক পালায় ভিন্ন স্বাদের চরিত্রে রূপদান করে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা পান। তাঁর অভিনীত 'দীপ আজও জ্বলে', 'কে কাঁদে', 'অভিশপ্ত রাজপুরী' ইত্যাদি পালার যথাক্রমে আসমান, মাধবী, সুনীতি চরিত্র অসামান্য হয়েছিল।

জনতা অপেরার 'তামসী' পালায় 'সীতা', 'রাজদ্রোহী'তে, তুফানী, 'যুগের দাবী' পালায় মলি চরিত্রে অভিনয় করে সাহানা প্রথম শ্রেণীর নায়িকাদের মধ্যে একজন হন। পুনরায় সত্যম্বর অপেরার 'জালিয়ানওয়ালাবাগ', 'পদধ্বনি', 'শহর থেকে দূরে', 'দিগ্বিজয়' পালায় অভিনয় করেন। যাত্রা জগতের শক্তিমান অভিনেতা ও নির্দেশক শক্তি ভট্টাচার্য হলেন সাহানাদেবীর স্বামী। সাহানা বসুর গানের গলা এতই মিষ্টি ছিল যে এক সময়ে সবাই বলতেন কোকিলকণ্ঠী।

॥ সীমা বোস ॥

ব্যক্তি হিসেবে সীমা বোস অর্থের লোভে, প্রাচুর্যের আকাঙ্খায়, বিবেক বর্জন করে একের পর এক সিঁড়ি মাড়িয়ে শুধু উপরে উঠতে উঠতে মহাশূন্যে পৌঁছতে চাননি। অভিনয় জীবনে এসেছিলেন, ধীরে ধীরে খ্যাতি অর্জন করে, শ্রদ্ধার আসনটি আয়ত্বে এনেই সেই জীবনের ওপরে ছেদ টেনে দিয়ে, সোজা এসে বসলেন স্বামীর ঘরে, গৃহলক্ষ্মী হয়ে। যাত্রার খ্যাতিমান অভিনেতা, সম্প্রতি যাত্রাসূর্য উপাধিপ্রাপ্ত স্বামী অসীমকুমারের খ্যাতিই এখন তাঁর একমাত্র ভূষণ। অলঙ্কার, এই পরিবারের বধূ। রংপুরের সীতানাথ সরকারের মেয়ে বড় হয়েছিলেন নদিয়া জেলার গাংনাপুরে। ওখানকার সখের থিয়েটারে অভিনয়ের প্রথম পাঠ নেওয়া। এরপর 'শতরূপা'য় ভৈরব গাঙ্গুলীর প্রথম পালা 'চুয়াচন্দন'-এ সীমার প্রথম পেশাদারী অভিনয়, জীবনের সূচনা। ভাগ্য লিখনে অভিনয় জীবনের গোড়া থেকেই অসীমকুমারের সঙ্গে পরিচয়। ১৯৬৬ সালে সৎ-সভ্য যুবক-অভিনেতা অসীমকুমারের সঙ্গে সীমার 'নাট্যভারতী'তে প্রবেশ। প্রথম জীবনে এক বছরে ৬ খানা পালার মধ্যে ৩টিতে নায়িকা এবং ৩টিতে সহ নায়িকা হয়ে কাজ করেই প্রশংসা পান। 'রঙ্গিনী চম্পাবতী' পালায় লক্ষ্মীমণি চরিত্রে অভিনয় করে এক বছরে শ্রেষ্ঠ নায়িকা, শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব চরিত্রাভিনেত্রীর পুরস্কার পান। শ্রীমা নাট্য কোম্পানির 'বৈকুণ্ঠের উইল' পালায় মনোরমা আর সাধক তুকারাম পালায় পিয়ারীবাঈ চরিত্রে অসামান্য অভিনয় করে খ্যাতির শীর্ষে যান। শ্রীমা নাট্য কোম্পানি, শ্রীরাধা নাট্য কোং,

অম্বিকা নাট্য কোং, নিউ গণেশ অপেরা, শিল্পীতীর্থ, অগ্রগামী, মোহন অপেরায় অভিনয় জীবনের মধ্যেই ১৩৮০ সনের ১৮ শ্রাবণ অসীমকুমারে সঙ্গে সাত পাকে বাধা পড়েন সীমা। তারপর আরও বছর কয়েক অভিনয় জীবন। প্রাতঃ স্মরণীয় ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদের সঙ্গে অভিনয় করার স্মৃতি যেমন ভুলতে পারেন না তিনি, তেমনি যাত্রা সম্রাজ্ঞী জ্যোৎস্না দত্তের কাছে অভিনয় শিক্ষা আর মায়ের মত ভালবাসা ও স্নেহ পেয়ে ধন্য হবার কৃতজ্ঞতা বোধ তাঁকে যেমন মহৎ করেছে তেমনি স্বনামধন্যা কনকলতার কাছে অনেক শিক্ষার মধ্যে নৃত্য শিক্ষার জন্যও তিনি নিজেকে গর্বিত মনে করেন। ১৯৮৫ সালের ১৮ জুন তপন থিয়েটারে "ভুলি নাই" নাটকে শেষ অভিনয় করে, অভিনেত্রী জীবন থেকে সসম্মানে অবসর নেন।

॥ ছবি চ্যাটার্জী ॥

কলকাতার উল্টোডাঙ্গা অঞ্চলে পঞ্চানন চ্যাটার্জীর মেয়ে ছবি চ্যাটার্জীর জন্ম। নিতান্ত বালিকা বয়স থেকেই থিয়েটারের প্রতি ছবি চ্যাটার্জীর ঝোঁক। বাবা পঞ্চানন চ্যাটার্জী একজন দক্ষ অভিনেতা এবং বাবার অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় ছবি চ্যাটার্জীর অভিনেত্রী জীবন শুরু। প্রথমে নানা সৌখিন দলে অভিনয় করে অভিজ্ঞতা অর্জনের পর বাবার সঙ্গেই ছবি চ্যাটার্জী যাত্রাপাড়ায় চলে আসেন এবং পেশাদার শিল্পী হিসেবে সুযোগ পান তরুণ অপেরায়। 'শেষ অঞ্জলি' পালায় প্রথম অভিনয় করেই সুনাম অর্জন করেন। এরপর তরুণ অপেরার 'ঘুম ভাঙ্গার গান', 'মেঘে ঢাকা রবি' এবং ভারতী অপেরার 'সূর্য সেন', 'গরীব কেন মরে', 'দাবী' পালায় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখান। দাবী পালার এক বোবা চরিত্রে ছবি চ্যাটার্জীর অভিনয় আজও সবার মনে দাগ কেটে আছে।

॥ শিখা বসু ॥

প্রখ্যাত নৃত্যবিদ বিভোর বসুর মেয়ে এই শিখা বসু।

একদিকে বাবা ছিলেন নৃত্যবিদ, অন্যদিকে শিখা বসুর জামাইবাবু হাস্যরসিক স্বর্গত নবদ্বীপ হালদার। সেই সূত্র থেকেই শিখা বসুর রক্তে থিয়েটারের নেশা। সম্ভবত নবযুগ নাট্য কোম্পানিতে নিতান্ত বালিকা বয়সে শিখা বসুর যাত্রার আসরে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। একানি বালক চরিত্রে শিখার প্রথম অভিনয় জীবন শুরু, সে প্রায় পনেরো ষোল বছর বয়সে। আজ শিখা বসু তাঁর নিজস্ব প্রতিভা-বলে নায়িকা। 'কবি' পালায় ঠাকুরঝি চরিত্রে অনন্যসাধারণ অভিনয় করে শিখা বসু সকলের মন জয় করেন। ইনি সুশীল নাট্য কোম্পানির 'মা যদি মন্দ হয়', 'প্রিয়ার সমাধি পাশে' প্রভৃতি পালায় অভিনয় করে যথেষ্ট খ্যাতি পান।

॥ মৌসুমী চ্যাটার্জী ॥

অমৃতলাল চ্যাটার্জীর মেয়ে মৌসুমী চ্যাটার্জীর জন্ম পশ্চিমবঙ্গে।

ছেলেবেলা থেকে লেখাপড়ায় ঝোঁক ছিল বেশি তাই অনেক কষ্ট করেও মেয়েকে তৈরি করতে চেয়েছিলেন বাড়ির সকলেই। স্কুল ফাইনাল পাশ করে সকলের মুখ রক্ষা করলেও শেষ পর্যন্ত নিদারুণ অনটন হেতু মৌসুমীকে অভিনয় জীবনে চলে আসতে হয়েছিল। ১৯৬৬ সালে সুযোগ পেলেন সত্যম্বর অপেরায়। পেশাদার অভিনেত্রী হিসেবে 'একটি পয়সা' পালায় প্রথম অবতীর্ণ হয়েই পেলেন পরিচিতি।

পরের বছর 'পদধ্বনি' পালায় অভিনয় করে পেলেন খ্যাতি। এরপর দল বদলের পালা। মৌসুমী একে একে অভিনয় করলেন নব রঞ্জন অপেরায়, তারপর ভারতী অপেরাতে। ইতিমধ্যে বারকতক বেতারেও অভিনয় করেছেন ইনি। আজও খ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করে চলেছেন মৌসুমী চ্যাটার্জী। মোহন অপেরার 'বন্দী', 'হরপার্বতী' এবং 'রাজা শিবসিংহ' পালায় অসামান্য অভিনয় করেছিলেন।

॥ শ্যামলী মজুমদার (ভট্টাচার্য) ॥

রংপুর জেলার সৈয়দপুরে জন্ম শ্যামলী মজুমদারের।

অভিনয়ের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি সেই ছেলেবেলা থেকে। স্কুলে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝেই সখের থিয়েটারে অভিনয় করতেন শ্যামলী। এরপর ভাগ্য রথের চাকা এসে থামল যাত্রাশিল্প জগতের এক প্রান্তে।

পরিচিতা হন সহজেই। যাত্রার আসরে অভিনেত্রী হিসেবে শ্যামলী অল্পদিনের মধ্যেই যে ভাবে নিজেকে বিস্তার করেন তার পিছনে অভিনেতা দিলীপ চ্যাটার্জীর দান অনস্বীকার্য। নিজের কন্যার মত শ্যামলীকে অভিনয়ের শিক্ষায় গড়ে তোলেন তিনি।

'লৌহপ্রাচীর' এবং 'অকূল গাঙের মাঝি' পালায় পেশাদার অভিনেত্রী হিসেবে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেই প্রচুর খ্যাতি পান শিল্পী। এরপর খ্যাতি পান 'সোনাইদীঘি' পালায়। অল্পদিনের মধ্যে যাত্রাপাড়ায় জনপ্রিয় হয়ে চলে আসেন শ্রীমা নাট্য কোম্পানিতে। তারপর নবরঞ্জন অপেরা। পরে প্রায় অধিকাংশ দলেই সুনামের সঙ্গে অভিনয় করেছেন শ্যামলী মজুমদার। শ্রীমা অপেরার 'দাদাঠাকুর', 'অগ্নি সংকেত' এবং 'দস্যু রত্নাকর' পালায় অভিনয় করে শ্যামলী সকলের প্রশংসা অর্জন করেন।

॥ শর্মিলা পাল ॥

বিধবা মা আর দুই ভাইকে বাঁচাতে শর্মিলার অভিনেত্রী জীবন। আসলে ভাগ্য বিড়ম্বনা। তা না হলে যে শর্মিলা এক সময়ে সরস্বতী বালিকা বিদ্যালয়ে ক্লাস নাইনেব ছাত্রী তখন তাদের সংসার তরীটা কেন ডুবে যাবে। বাঁচার তাগিদে অগত্যা অভিনেত্রী জীবন। বনি কাকার হাত ধরে মিনার্ভায়। সেখান থেকে নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরায়। সেই দলের মালিক তখন নারায়ণ ভট্টাচার্য ওরফে রূপকুমার নামের অভিনেতা। তখনও নিউ রয়েলে নারী চরিত্রে অভিনয় করতেন পুরুষরা, যেমন ক্ষেত্ররানী, জনার্দন রানী, পুতুল রানীরা। মেয়ে ছিলেন একজন। শর্মিলা হন দ্বিতীয় মহিলা। "ভাগ্যের বলি" পালায় গর্গ নামে একটি বালক চরিত্রে মাস মাইনে পঞ্চাশ টাকায় প্রথম শর্মিলার আত্মপ্রকাশ।

এরপর "বীর অভিমন্যু" পালায় হন সীতা। তারপর দল ম্যানেজার তারা মিত্র শর্মিলাকে নিয়ে যান কুণ্ডু নাট্য কোম্পানিতে। সামান্য মাইনে, তা থেকেও তারা মিত্র কিছু ভাগ বসাতেন। একদিন তারা মিত্রের মুখোশটা খসে গেল। শর্মিলা সরে এলেন। সুযোগ পেলেন কনকলতা ও দুলাল চ্যাটার্জীর শ্রীমা নাট্য কোম্পানিতে। এখানে অভিনয় শিক্ষা পান অরুণ দাশগুপ্তের কাছে। নাচ শিখলেন কনকলতার কাছে। গান শিখলেন গোপাল মল্লিকের কাছে। তৈরি হলেন শর্মিলা। লোকনাট্য তখন সবে জন্মেছে। পরের বছরেই শর্মিলা গেলেন সেই দলে। উৎপল দত্তের শিক্ষা ও নির্দেশনায় "জয় বাংলা" "কালিন্দী" পালায় অভিনয় করে প্রশংসা পান। খ্যাতি পান কয়েকবছর পর সেই নিউ রয়েলের "সতী না অসতী" পালায় অভিনয় করে। শ্রীমা নাট্য কোম্পানি থেকে বেরিয়ে এক বছরের জন্য প্রতাপ মঞ্চে 'বারবধূ' নাটকে কেতকী দত্তের লতার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। পরে রামমোহন মঞ্চে নিয়মিত অভিনয় করেন। রমেন বসুমল্লিক ও রাজেন মিত্রের লিজ. নেওয়া "যাত্রালোক"-এ "কুলি" "বেহেস্তের ফুল" পালার নায়িকা হিসেবে প্রশংসা পান। চরম খ্যাতি পান তরুণ অপেরায় এসে। এরপর থেকে শর্মিলার শুধু এগিয়ে চলা।

॥ জ্যোৎস্না দেবনাথ ॥

মঞ্চ আর পর্দায় অভিনয় এবং নৃত্যে একদিন বেশ ভালভাবেই নিজেকে পরিচিত করে তুললেও সেখান থেকে যে অর্থ আসত তাতে সংসারের অনটন ঘুচত না বলেই জ্যোৎস্না দেবনাথ একদিন অনিল বসুর সহযোগিতায় এসেছিলেন যাত্রায়। নবযুগ নাট্য কোম্পানিতে জ্যোৎস্নার প্রথম

আত্মপ্রকাশ। এরপর নবরূপ, শ্রীমা, শ্রীরাধায় অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেছিলেন জ্যোৎস্না দেবনাথ।

নাট্যভারতীর 'বিনয়-বাদল-দীনেশ' পালায় অভিনয় করে প্রতিষ্ঠা পান শিল্পী। তারপর যুক্ত হন মাধবী নাট্য কোম্পানিতে।

জ্যোৎস্না দেবনাথের 'নিষ্কৃতি'র বড় বৌ, 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'র বড় রানী, 'লীলাবসান'-এর লক্ষ্মণা, 'নফর' পালার কালী বৌ যাত্রাজগতে স্মরণীয় অভিনয়ে মূর্ত। চলচ্চিত্রে অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেছিলেন জ্যোৎস্না দেবনাথ।

চলচ্চিত্রে অভাগীর স্বর্গ, মাকড়সার জাল প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় শুধু নয়, সাধনা বসু, অতীনলাল, আশা বসুর পরিচালনাধীনে একক বা গ্রুপ নৃত্যেও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন জ্যোৎস্না।

জ্যোৎস্না নবযুগ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

তারপর অনেক পালা! অনেক খ্যাতি! অনেক স্মৃতির আবর্জনা বুকে নিয়ে অবশেষে সবার চোখ আর মনেব আড়ালে চলে যাওয়ার অনেক যন্ত্রণা!

॥ কল্যাণী ভট্টাচার্য ॥

বাবার নাম ৺সুধন্যকুমার দাস। ১৯৪৫ সালে শোভাবাজারে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে ভাগ্য বিড়ম্বনায় জড়িয়ে, পরে অভিনয়কে পেশা হিসাবে নিতে বাধ্য হন। এই সময়ে তিনি গোবিন্দ গাঙ্গুলীর কাছে অভিনয় শিক্ষা লাভ করেন এবং কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' নাটকে আমিনার ভূমিকায় অভিনয় করে প্রচুর প্রশংসা পান। পরে নটবাণী ও ভোলানাথ অপেরা হয়ে মহেন্দ্র দত্তর মধ্যস্থতায় সত্যম্বর অপেরাতে যোগ দেন। এই সময়ে তিনি 'ধ্রুব' নাটকে সুরুচি এবং 'সোনাইদীঘি' নাটকে কেতকী চবিত্রে রূপদান করে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। সত্যম্বর অপেরাতে থাকাকালীন ১৯৬৩ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ব্যক্তিগত ভাবে যাত্রাজগতের ৺গৌর দাস, ৺হরিপদ বায়েন, ৺গুরুপদ ঘোষ, মহেন্দ্র দত্ত ও সুবল অধিকারীর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। সত্যম্বর ছাড়ার পর তিনি অম্বিকা নাট্য কোম্পানি, তরুণ অপেরা, ভারতী অপেরা, নিউ প্রভাস অপেরা, সুশীল নাট্য কোম্পানি, নিউ আর্য অপেরা, নিউ রয়েল বীণাপাণি প্রভৃতি দলে বিশেষ খ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করেন।

নিউ প্রভাস অপেরাতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন। পালার নাম—অমানুষ, মহাসতী তুলসী, চাবুক।

॥ ইন্দিরা দে ॥

কলকাতার রাসবিহারী অঞ্চলে ইন্দিরা দে-র জন্ম। শৈশবেই পিতা কেশবদাস দে'র কাছে প্রেরণা পান সংগীত চর্চার। ইন্দিরা দে-র উচ্চাঙ্গ সংগীতে প্রথম পাঠ শুরু হয় অনাথ বসুর কাছে, তারপর রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল, ভজন, পল্লীগীতি, আধুনিক গানে শিক্ষালাভ করেন সুকুমার মিত্র ও গীতালি সেনগুপ্তর কাছে।

কোন এক দুর্ঘটনায় নাট্যমঞ্চে এসে উঠলেন ইন্দিরা দে চিত্রাভিনেত্রী পদ্মা দেবী ও গীতালি সেনগুপ্তর সহযোগিতায়। প্রথম নাটক সলিল সেনের 'প্রতিমা', রঙমহল মঞ্চে। দীর্ঘ ছ'বছর ইন্দিরা দে রঙমহলের নিয়মিত শিল্পী ছিলেন। 'সুবর্ণগোলক' নাটকের সময় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মত বিরোধ হওয়ায় রঙমহল ছাড়তে বাধ্য হন। মঞ্চে তিনি ছায়ানায়িকা, আমি মন্ত্রী হব, বাক্স বদল, সেইম সাইড, নহবত, উত্তরণ, টাকার রং কালো, আদর্শ হিন্দু হোটেল প্রভৃতি বহু নাটকে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন। এছাড়া কয়েকটি ছায়াছবিতেও অভিনয় করেন। এরপর বান্ধবী বেলা রায়ের সহযোগিতায় আসেন যাত্রার আসরে। চৌরঙ্গী, জাহান্দার শাহ পালায় নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন। অভিনয় করেছেন মাধবী নাট্য কোম্পানিতে কাবুলিওয়ালা, কবরের নীচে পালায়।

॥ কল্যাণী ঘোষ ॥

কল্যাণী ঘোষের অভিনেত্রী জীবনের কাহিনী বলতে গেলে প্রথমেই চলে আসে ওঁর স্বামী সুজয় ঘোষের নাম। শান্তিনিকেতনের ছাত্র সুজয় এক সময় লেখাপড়ার সঙ্গে সমান তালে নাটক আর গান নিয়ে প্রচুর সময় কাটিয়েছেন। পরবর্তী জীবনে নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যর ক্যালকাটা ক্লাবের সঙ্গেও ওঁর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাঁরই উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় কল্যাণীর চিত্রজগতে যোগদান।

১৯৫৯ সালে চিত্র প্রযোজক প্রাণলাল ভোরা তাঁকে প্রথম রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র জন্য মনোনীত করেন কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনাটি বানচাল হয়ে যায়। অবশ্য কিছুদিন পর ১৯৬১ সালে সেই প্রাণলাল ভোরারই 'নেকলেশ' ছবিতে কল্যাণী ঘোষকে দর্শকরা প্রথম দেখলেন উত্তমকুমারের ছোট বোনের ভূমিকায়।

এরপর তপতী ঘোষের সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথের কাহিনী 'কঙ্কাল' অবলম্বনে 'সন্ধ্যারাগ' ছবিতে অভিনয় করলেন। তারপর ক্রমে ক্রমে কল্যাণীর অভিনীত ছবির তালিকায় যোগ হল—ছায়াসূর্য, হাসি শুধু হাসি নয়, মহালগ্ন, আরও অনেক ছবি। এরই মধ্যে শ্রীমতি ঘোষ আসেন যাত্রা জগতে। একাধিক দলে একের পর এক পালায় খ্যাতির সঙ্গে অভিনয়ও করেছিলেন তিনি।

* * * * * *

আজ যাত্রা ব্যবসা যে ভাবে প্রসার লাভ করেছে, এই ব্যবসার বিশাল-বিস্তৃত পরিধি তত বেশি সঙ্কুচিত হয়েছে। যাত্রা যত বেশি কস্টলি চিত্ত বিনোদন মাধ্যম হয়ে উঠেছে, তত বেশি এর মরশুম অর্থাৎ সিজন হয়েছে ছোট। আপাতদৃষ্টিতে আজকের যাত্রা ব্যবসাকে দূর থেকে যতই অমৃতের পূর্ণ কুম্ভ মনে হোক, আসলে বিষ কুম্ভ। এর অভ্যন্তরে জরাজীর্ণ অস্তিত্বের রূপ। আজকের যাত্রা নানা দিক থেকে যতটা বিপন্ন, তার মূলে অজস্র কারণের মধ্যে প্রধান সমালোচনা বিরোধী মানসিকতা। যাত্রাপাড়ায় গ্রুপ থিয়েটার বা সিনেমার অভিনেত্রীরা যতই শ্রেষ্ঠ আসন পান, এ কথা স্বীকার করতেই হবে, যাত্রার জন্যে পুরোপুরি তৈরি শিল্পীদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারেননি কেউই। স্থায়ী চাহিদাও তৈরি করতে পারেননি অনেকেই। যে একক নামে লক্ষ লক্ষ মানুষ টিকিট কাটেন, তেমন নাম একে একে হাজির করলে দেখা যাবে, যাত্রার জন্য উৎসর্গীকৃত নামই নজরে পড়বে বেশি। একমাত্র সন্তু মুখোপাধ্যায় ছাড়া সিনেমা পর্দার আর কোন শিল্পী পুরোপুরি যাত্রার হয়ে উঠতে পারেননি। বা পুরোপুরি যাত্রার হতে চাননি। অবশ্য অর্থ-সম্পদের জন্য গোটা জীবনটা সিনেমায় উৎসর্গ করলে সন্তুবাবু যা পেতেন যাত্রা তার অনেক বেশি দিয়েছে। সন্তু ছাড়া এখন সিনেমা পর্দার যে ক'জন বড় মাপের শিল্পী যাত্রায় কয়েক বছর কাজ করছেন তাঁরা সকলেই যে কোন মুহূর্তে দর্শক দ্বারা অথবা বিভিন্ন অঞ্চলের দর্শক সমাজের প্রতিনিধিদের বা নায়েকদের অভিমত অনুসারে পরিত্যক্ত হতে পারেন। একটি ব্যাপারে বাংলার প্রাচীনতম লোকসংস্কৃতির শরিক যাত্রা, যে একালের দৃষ্টিকোণ থেকে অভিনয়ে, নাচে, গানে, আঙ্গিকে, নির্দেশনায়, আলো-সুর-মেক-আপে সর্বাধুনিক চেহারা নিতে পেরেছে, তার মূলে বহিরাগত বহু চাপা পড়ে থাকা প্রতিভার সম্মিলিত প্রচেষ্টা। সকলের মধ্যেই উচ্চাঙ্গের কাজ করার প্রবণতাই আজকের যাত্রাকে সবিশেষ উন্নত করেছে। এমন বহু শিল্পী যাত্রার আসরে এসেছেন যাঁরা এক একটি সম্পদ। পাশাপাশি যাত্রার অভ্যন্তরীণ যে পরিকাঠামো, অর্থনৈতিক যে প্রেক্ষাপটের চিরস্থায়ী রূপ তার সঙ্গে নিজেদের বিবেক বর্জন করে জড়িয়ে রাখতে পারেননি অনেকেই। এর ফলে যাত্রার রত্নভাণ্ডার হয়েছে দুর্বল।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়কাল থেকে আশির দশকের সূচনাকাল পর্যন্ত যাত্রায় যে রূপকারদের আবির্ভাব ঘটেছিল, যাঁদের প্রবল নাট্য জ্ঞান, শৈল্পিক চেতনা, প্রয়োগ সচেতনতা, নাট্য

আন্দোলনের তাৎপর্য প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে অগ্রণী ভূমিকা ছিল এক সময়ে, সেই তাঁদের যাত্রায় আসা এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে আপন দক্ষতায় আলাদা আসন তৈরি করে নেওয়া এবং এখনও খ্যাতির সঙ্গে যাত্রার পরিভাষায় টপ আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করে যাওয়া শিল্পীরা হলেন ঃ অশোককুমার, অসিত বসু (বর্তমানে অবসর নিয়েছেন) বেলা সরকার, ইন্দ্র লাহিড়ী, ছন্দা চ্যাটার্জী, তপন ভট্টাচার্য (গায়ক-নায়ক), বিমলেন্দু ভট্টাচার্য (গায়ক-নায়ক), মনোজ মিত্র (গায়ক-নায়ক), ত্রিদিব ঘোষ, অরুণ মুখার্জী (গায়ক-নায়ক), শ্যামসুন্দর গোস্বামী (গায়ক-নায়ক), সুবীরকুমার (গায়ক-নায়ক), সুবীর চ্যাটার্জী (গায়ক-নায়ক), অঞ্জনকুমার, মীনাক্ষী দে, উজ্জ্বল সেনগুপ্ত, রুমা দাশগুপ্ত, অসীমকুমার (যাত্রা সূর্য), বর্ণালী ব্যানার্জী, লীনা চক্রবর্তী এবং আরও কেউ কেউ।

একটি শক্তিশালী টীমের ওপরে ভিত্তি করে একটি বড় দল তৈরি করা এবং ব্যবসায়িক সাফল্য অনিবার্য হতে পারে এমন গ্যারাণ্টি যাঁদের দক্ষ অভিনয়ের ভিতর দিয়ে দর্শকরা পেয়েছেন, নায়েক পক্ষ যে নামগুলি পেলে দল বায়না করতে দ্বিধা করেন না, তেমনি শিল্পীরা হলেন ঃ অনিতেশ ভট্টাচার্য, অমিতাভ ঘোষ, অনুপকুমার, অতীনকুমার, অতুল ভট্টাচার্য, (প্রয়াত) অরুণ বোস, অশোক চৌধুরী, অসিতকুমার, অমূল্য নট্ট, অশোক পাত্র, অতীশ সামন্তরায়, অনিল ভট্টাচার্য, অনিল মণ্ডল, অপূর্ব ঘোষ, অমল গায়েন, অণিমা মণ্ডল, অভিজিৎ সরকার, অসীম ভট্টাচার্য, অশোক গাঙ্গুলী, অন্নপূর্ণা মুখার্জী, অনিতা সরকার, অঞ্জনা ব্যানার্জী, অর্পিতা ভট্টাচার্য, অপর্ণা পাত্র, আঁখি মুখার্জী, আরতি গোস্বামী, আরতি মুখার্জী, আশুতোষ মিত্র, ইরা সেন, ইন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, উদিতকুমার, উৎপল চ্যাটার্জী, উদয়ভানু দাস ; কুমার বিশ্বজিৎ, কুমার ইন্দ্রনীল, কুমার ইন্দ্রজিৎ, কুমার শক্তি দত্ত, কুমার দেব, কুমার স্বপন, কুমার শংকর, কুমার সব্যসাচী, কুমার মিঠুন, কুমার অরিন্দম, কৃষ্ণকুমার, কৃষ্ণেন্দু কুণ্ডু, কবিতা কর, কল্যাণ ব্যানার্জী, কল্লোল চক্রবর্তী, কৃষ্ণ মাজি, কুমার গৌতম, কল্যাণ মুখার্জী (গায়ক-নায়ক), কমলেন্দু মুখার্জী, কৌশিক মাইতি, কানাই মল্লিক, কাশীনাথ দাস, কেষ্ট দাস, কার্তিক বাগ, কানাইকুমার, খিলি গোস্বামী, গৌতম সাধুখাঁ, গুণসিন্ধু মণ্ডল, গোরা ব্যানার্জী, গৌতমকুমার, গৌর ব্যানার্জী, গুরু পাল, গোপাল মারিক ; গীতাঞ্জলি ব্যানার্জী, গৌর মালাকার, গীতা নাগ, গীতা মিত্র, গীতশ্রী ভট্টাচার্য, চণ্ডীদাস কেশ, চন্দনকুমার, চিত্ত ঘোষ, চাঁদু চক্রবর্তী, চাঁদুকুমার, চন্দ্রাণী সাধু, চম্পা হালদার, চন্দ্রাণী মুখার্জী, ছবি তালুকদার, জলদকুমার, জয়ন্তকুমার, জয়দেব গাঙ্গুলী, জয়দেব দাস, জয়ন্ত ঘোষ, জয়শ্রী মুখার্জী, জয়শ্রী রায়, জুঁই কুণ্ডু, জলি ব্যানার্জী, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, ঝুমুর বিশ্বাস, ঝুমা মুখার্জী, ঝর্ণা সাহা, ডলি বোস, ঢাকার কালী, তিনু বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন সরকার, তপন দাস, তারক ব্যানার্জী, তুষার ব্যানার্জী, তুষার পাল, তাপসকুমার, তপন গাঙ্গুলী, তাপস দেব, তামসকুমার, তাপস চ্যাটার্জী, তপেন মণ্ডল, তাপসী বোস, তনুশ্রী ঘোষ, তপতী ভট্টাচার্য, তাপসী রায় চৌধুরী, তরুণ হালদার, দীপেন চ্যাটার্জী, দেবগোপাল, দীপক ব্যানার্জী, দেবব্রত দে বিশ্বাস, (গায়ক), দেবাশিস ঘোষ, দীপঙ্কর দাস, দিব্যেন্দু চ্যাটার্জী, দেবু চক্রবর্তী, দেবকুমার চক্রবর্তী, দুলাল বাউল, দীপালি মিত্র, দেবশ্রী মুখার্জী, দীপিকা দাস, ধীমান চক্রবর্তী, নন্দকুমার, নমিতা বিশ্বাস, নীলোৎপল দে, নিতাই ধর, নীলকান্ত ব্যানার্জী, নীলিমা খাটুয়া, প্রভাত গৌতম, পূর্ণেন্দু মুখার্জী, পুষ্পেন্দু মুখার্জী, প্রণব চক্রবর্তী, প্রভাত চ্যাটার্জী, প্রশান্ত সরকার, প্রদীপ সেনগুপ্ত, প্রদীপ রুদ্র, পিতম পাল, প্রভাস চ্যাটার্জী, প্রসাদ ব্যানার্জী, প্রবীরকুমার, প্রবীর দাস, পরিতোষ মণ্ডল, পি. রাজেন, পশুপতি ঘোষ, প্রদীপ চন্দ, প্রতিমা ব্যানার্জী, প্রশান্ত পাল (গায়ক-নায়ক), পিউ সিনহা, পদ্মিনী, পলি ব্যানার্জী, বুলা ঘোষ, বিশ্বজিৎ চৌধুরী, বিশ্বনাথ সামন্ত, বীর সেন, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ দে, বিনয় গোস্বামী, বাবলু বর্মণ, বাসুদেব হালদার, বাবলু ভট্টাচার্য, বাবলু চৌধুরী,

বিদিশা মহান্তী, বীণা সাহা, বীথিকা বাগচী, বিজলী সরকার, ভাস্কর মল্লিক, মুকুল ঘোষ, মানিক চক্রবর্তী, মানিক পাত্র, মিলনকুমার, মণিরাজ ব্যানার্জী, মলয় দত্ত, মহাদেব ঘোষ, মহিম হালদার, মানিক বোস, মধু ভট্টাচার্য, মহুয়া ঘোষ, মণিমালা ভট্টাচার্য, মালবিকা ব্যানার্জী, মিতা মুখার্জী, মোনালিসা, মালা ব্যানার্জী, মেনকা ব্যানার্জী, মিতা তালুকদার, মমি ব্যানার্জী, মৌসুমী ব্যানার্জী, মৌসুমী ঘোষ, মুকুলিকা দাশগুপ্ত, মণিকা সাহা, মৌমিতা ব্যানার্জী, মাধবী দত্ত, মীরা দে, মধুছন্দা, মল্লিকা চ্যাটার্জী, মঞ্জু ক্ষেত্রী, মিঠু গাঙ্গুলী, মিনতি দাস, মীনা চক্রবর্তী, মহুয়া চ্যাটার্জী, মীনাকুমারী, মনোজ দাস, যূথিকা দাস, রঞ্জিত সরকার, রাঙা মিশ্র, রঞ্জিত ঘোষ, রাজা বোস, রমেন ভাদুড়ী, রতন দাস, রূপকুমার, রাজেশ ভট্টাচার্য, রুবি দত্ত, রেখা বোস, রাখি হালদার, রেবা মুখার্জী, রীতা সেন, রাণু পাহাড়ী, রবীন মণ্ডল, রতন বসু, রাজেন দাস, রতন গোস্বামী, রতন চক্রবর্তী, রামকুমার, রাজকুমার, রুম্পা রুদ্র, রীতা অধিকারী, রীণা থৈ, রূপা মুখার্জী, রঞ্জনা ব্যানার্জী, রেখা মেহেতা, রীণা রায়, রোমী ব্যানার্জী, রীণা মুখার্জী, রত্নামঞ্জরী দত্ত, লীনা চক্রবর্তী, লক্ষ্মী হালদার, লক্ষ্মী ব্যানার্জী, লক্ষ্মী ভট্টাচার্য, লতা দেশাই, লক্ষ্মণ দেববর্মণ, ললিত চৌধুরী, শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির চ্যাটার্জী, শান্তনু ঘোষ, শ্যামাপ্রসাদ ব্যানার্জী, শোভা দাস, শৈলেন চক্রবর্তী, শক্তি চ্যাটার্জী, শংকর ভট্টাচার্য, শচীন হালদার, শ্যামল মুখার্জী, শচীন গোস্বামী, শ্যামলকুমার পাল, শুক্লা ভট্টাচার্য, শংকর পাল, শর্মিষ্ঠা গাঙ্গুলী, শ্যামলী ভট্টাচার্য, শিবানী ভট্টাচার্য, শিউলি দাস, শিবানী গায়েন, শিখা বোস, শিপ্রা মহান্তী, শ্রাবণী মণ্ডল, শান্তা ভট্টাচার্য, শান্তি শীল, শিখা ভট্টাচার্য, শিউলী ভট্টাচার্য, শিখা বোস, সনাতন ঘোষ, সুকমল মুখার্জী, স্বদেশকুমার, সুদেশকুমার, সমর ব্যানার্জী, সলিল চক্রবর্তী, সুবিমল আদক, সুদীপ্ত বসু, স্বরূপকুমার, সমীর বিশ্বাস, সুখেন্দু মুখার্জী, সুদীপ্ত চ্যাটার্জী, সন্দীপ চ্যাটার্জী, সুবীর চ্যাটার্জী, (নায়ক-গায়ক), সুবীরকুমার (নায়ক-গায়ক), সুব্রত বসু, সীমা বোস, সুভাষ ভৌমিক, সীমা চ্যাটার্জী, সিতাংশু ধাড়া, সীমা সরকার, সুদীপ্ত চ্যাটার্জী, সোমনাথ মুখার্জী, সৌমিত্র পাল, সুলতা বিশ্বাস, সোমাশ্রী ঘোষ, সুজনকুমার, সুবীর মুখার্জী, স্বপন পাণ্ডা, সরোজ বিশ্বাস, সঞ্জীবকুমার, সঞ্জীব ঘোষ, সুশীল সিন্‌হা, সব্যসাচী পাল, স্বপন ঘোষ, সুনীল সমাদ্দার, সুজয় কর, স্বপনকুমার (ছোট), সূর্য ঘোষ, স্মিতা পাঠক, সন্ধ্যা রায় (ছোট), সীমা সরকার, সুপর্ণা ঘোষ, সুস্মিতা ভট্টাচার্য, সান্ত্বনা পাঠক, সোমা ঘোষ, সঞ্চয়িতা চ্যাটার্জী, সঞ্চিতা মুখার্জী, স্বপ্না সেন, সীমা রায়, সাহানা বোস, সোমা বসু, সবিতা দে, সন্ধ্যা ব্যানার্জী, সোনালী গোস্বামী, সুস্মিতা ব্যানার্জী, সঙ্গীতা সরকার, সুজাতা বোস, সীমা মিত্র, সাগরিকা, সঞ্চালি সেনগুপ্ত, সুকন্যা মল্লিক, সাধনা দাস, সাহানা রায় চৌধুরী, স্বপ্না দে, সুদেষ্ণা রায়, সুতপা সেনগুপ্ত, হাসি সরকার, হারু ঘোষ, হারু পাল, হিমাদ্রী ব্যানার্জী।

সেই সঙ্গে যাত্রার অগ্রগতি অব্যাহত রাখা এবং যাত্রা ব্যবসা থেকে মাত্রাতিরিক্ত মুনাফা লাভের প্রত্যাশায়, সিনেমা ও পেশাদার থিয়েটার থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রী আমদানি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই পর্বে আমরা যাঁদের পেয়েছিলাম বা অদ্যাবধি যাঁরা যাত্রার সঙ্গে জড়িত আছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ঃ ফণি রায় (ইনি পঙ্কজভূষণ নামে যাত্রার বিখ্যাত পালাকারও বটে), নীতিশ মুখার্জী, মিহির ভট্টাচার্য, মহেন্দ্র গুপ্ত, ম্যালকম, কমল মিত্র, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক মুখার্জী, ধীরেন দাস (অনুপকুমারের বাবা), জহর রায়, দ্বিজু ভাওয়াল, নবকুমার, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তমাল লাহিড়ী, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, মিণ্টু চক্রবর্তী, কেতকী দত্ত, অজিতেশ ব্যানার্জী, রুবি দত্ত, শ্যামল ঘোষাল, রূপক মজুমদার, শ্যামল ঘোষ, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, লোলিতা চ্যাটার্জী, বীরেন চ্যাটার্জী, তরুণকুমার, কল্যাণী ঘোষ, মঞ্জু দে, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস মিত্র, বসন্ত চৌধুরী, সোমা মুখার্জী, দিলীপ রায়, দেবরাজ রায়, রবি ঘোষ, দীপঙ্কর দে,

অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, বাসন্তী চ্যাটার্জী, উজ্জ্বল সেনগুপ্ত, সন্তু মুখার্জী, অনুপকুমার, সুপ্রিয়া দেবী, অলকা গাঙ্গুলী, সুলতা চৌধুরী, সন্ধ্যা রায়, আরও অনেকে।

উপরোক্ত তালিকাভুক্ত শিল্পীর মধ্যে যেমন (চলচ্চিত্রকে বাদ রেখে) অনেকে যাত্রায় এসেছিলেন একেবারে 'টপ' হয়ে, যদিও তার সংখ্যা কম, তেমনি অনেকে অভিনয় ক্ষমতায় ধীরে ধীরে কিছু মধ্যম শ্রেণী বা নতুন দলের 'টপ' হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে এর মধ্যে অনেকেই আবার বাঁচার তাগিদে বৃহত্তম দলের রত্ন সম্ভারের মধ্যে একটি রত্ন হয়েছিলেন। মহিলা শিল্পীদের ক্ষেত্রে সেই একই কথা বলা চলে। এই মুহূর্তে অনুসন্ধান চালালে দেখা যাবে, এই তালিকাভুক্ত শিল্পীদের মধ্যে আজ আর যাত্রা করছেন না এমন আছেন অনেকেই। কেউ কেউ একাধিক তিক্ত অভিজ্ঞতা আর যাত্রার ফাঁক ফোঁকরে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে থাকা জাত কেউটে আর বিষাক্ত কীটের দংশনে একরাশ গরল সম্বল করে ঘরে ফিরেছেন, কেউ কেউ বড় অসময়ে অহেতুক মারা গেছেন। অত্যন্ত চালাক-চতুর-বিচক্ষণ কিছু শিল্পী আছেন যাঁরা পাঁকে নেমেছেন কিন্তু গায়ে পাঁক মাখেননি মুন্সিয়ানার সঙ্গে। স্নান করেছেন কিন্তু বেণী ভেজাননি, তাই যাত্রায় বছর কয়েক কাজ করার মধ্যেই টাকা-ঐশ্বর্য যদি ভাগ্য হয় সেই ভাগ্যকে সোনা দিয়ে মুড়ে নিয়েছেন। এক সময়ে যাত্রার মালিকরা (এখনও কিছু আছেন) যাত্রা ব্যবসার জন্যে একের পর এক বাড়ি-জমি-ব্যবসা বন্ধক দিয়ে সর্বস্বান্ত হতেন, দিকপাল শিল্পীরা হতেন ভিখারী, এখন প্রথমেই কিছু কিছু টপে পৌঁছনো শিল্পী হন ভিখারী থেকে রাজা। পালাকারদের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা বলা যায়। আর সর্বকালে, সর্ব ক্ষেত্রে যাঁরা শুধু মরার জন্যই কাজ করেন তাঁরা স্মরণীয় কর্মের ভিতর দিয়ে শুধু মরণ কেনেন। এই ধরনের শিল্পী-যন্ত্রী-কর্মীর সংখ্যাও এখানে বহু।

মরেও বেঁচে থাকা যায় এই দর্শনের ব্যাপারটা মাথায় রেখে কর্ম করে যাবার মত মানুষ যাত্রা জগতে নেই বললেও চলে। যে ক'জন মালিক বা শিল্পী আছেন বা ছিলেন তাঁরা যাত্রা ব্যবসায় এসে মহত্ত্ব দেখিয়ে মরেও চিরকালের জন্য 'বাঁচার জগতে' বেঁচে নেই, আসলে মহত্ত্বটা তাঁদের রক্তের গৌরব। তাই সর্বস্বান্ত হয়েও কিন্তু মানুষের মধ্যেই বেঁচে থাকবেন তাঁরা। যেমন মতিলাল রায় বা তাঁরও আগে গোবিন্দ অধিকারীদের মৃত্যু হয়নি আজও। এঁরা যাত্রা করেই জমিদারি কিনেছিলেন আবার জমিদারির টাকাতেই মানুষের কল্যাণে আত্মোৎসর্গও করেছিলেন। তেমনি যাত্রার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে অথবা সিনেমা থেকে আসা দিকপাল শিল্পীদের মধ্যে যা কখনই পায়নি কেউ, চলচ্চিত্র আর রঙ্গমঞ্চের হাসির সম্রাট ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় তাই দিয়ে গেছেন তাঁর কয়েক বছরের যাত্রা জীবনে। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর জীবদ্দশাতে যাঁরাই কাজ করেছেন, জড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে আজও যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের কাছ থেকে জানা যায়, ভানুবাবু মানুষ ছিলেন না, ছিলেন মানুষের ভগবান। ভানুবাবুর মুখটা যতটা পাতলা ছিল, মানুষটা হাসির সম্রাট হয়েও যতটা রাশভারি ছিলেন, হৃদয়টা ছিল ততটাই কোমল। এ প্রসঙ্গে একাধিক উদাহরণ হাজির করলে হয়তো অন্যায় হবে না, কারণ ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তমকুমার নিজেদের প্রচারের জন্যে তো উদারতা দেখাননি, তাই মাত্র একটি উদাহরণ রাখা যাক এখানে। সুশীল মুখার্জী ছিলেন বড় মাপের অভিনেতা। ফেলিদা বললে এক কথায় সুশীলবাবুকে বোঝাতো। সেই সুশীলবাবু একটা দল তৈরি করেছিলেন কয়েকজনের উৎসাহে, পরামর্শে। কয়েক বছর পর সেই সুশীল নাট্য কোম্পানিতে চলচ্চিত্রের ডাকসাইটে অভিনেতা হিসেবে অনেকের অনুরোধে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্ত হয়েছিলেন যাত্রায় অভিনয় করতে, সেই সঙ্গে যাত্রায় হাসির নাটকের মূল্য কতখানি, বিনা চমকে পাল্লা আর তার অভিনয় যে যাত্রার ঐশ্বর্য হতে পারে তা দেখিয়ে দেবার জন্যে। যাত্রাভিনয়ের ধারা পুরোপুরি পাল্টে দিতে পারলে যাত্রার সার্বিক কল্যাণ সম্ভব এই সব মাথায় রেখে, যাত্রা দলে এসে কিছুদিনের মধ্যে উপলব্ধি করেছিলেন, যাত্রা দলের ভিতরকার

চেহারা। এখানে বড় আর্টিস্টের খোরাকি-জলপানির তুলনায় ছোটদের এবং কর্মীদের খোরাকি জলপানির টাকা নগণ্য। এ ছাড়া অনেক কিছু! হঠাৎ একদিন জানা গেল, সুশীলবাবু অর্থাৎ ফেলিদা মদ্যপ অবস্থায় চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে মারা গেছেন। এখানে আজও অনেকের ধারণা, সুশীলবাবুকে কে বা কারা ট্রেন থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে মেরেছিল। যা হোক, সুশীলবাবুর গোটা পরিবার হলো বিপন্ন। ছেলেকে নিয়ে তাঁর স্ত্রী এক সর্বনাশা অবস্থার মধ্যে দাঁড়ালেন। কিন্তু ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিপন্ন পরিবারটিকে বাঁচাতে। বাঁচিয়েছিলেন। পুরো একটা পরিবারের সম্পূর্ণ ভার নিয়েছিলেন! তা ছাড়া, একবার একটি জায়গায় ছিল "যমালয়ে জীবন্ত মানুষ" পালার অভিনয়। ডবল শো। সেই শো দেখার জন্য মানুষের ঐতিহাসিক ঢল নেমেছিল। ২টি শোর জন্য প্যান্ডেল খুলে দিয়েও মুক্তি পাননি ভানুবাবু। জনতার দাবী উঠেছিল ৩য় শো করতে হবে। ডি. এম. এসে অনুরোধ জানিয়ে বলেছিলেন, আমাদের বাঁচান। আর একটা শো করুন, তা না হলে এই জনসমুদ্র ঠেকানো যাবে না। চারদিকে আগুন লেগে যাবে। পুরো টাকা দেওয়া হবে। সবাইকে খাওয়ানো হবে! শো করেছিলেন ভানুবাবু। সেদিন প্রায় শেষ রাতে দুধ আর মিষ্টি সকলের খাবার পরও যে পরিমাণে নষ্ট হয়েছিল তা কল্পনাও করা যাবে না!

শো শেষে ভালমানুষ সাজার জন্য ম্যানেজার বলেছিলেন—ডবল শো বাবদ সবাইকে খোরাকি-জলপানির টাকা দিলেই চলবে! ভানুবাবু ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছিলেন—ক্যান্, টাকাটা কি আপনার বাপের টাকা! ভানুবাবুই জোর করে ৩টি শোর খোরাকি-জলপানি, দিতে বাধ্য করেছিলেন সবাইকে। এই ধরনের বহু ব্যক্তিগত অবদান আছে অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

আবার এই ধরনের বড় বড় যাত্রা শিল্পীদের বিবেক বর্জিত ব্যবহারের জন্যই আজকের যাত্রা হয়েছে বিপন্ন, তেমনি নিজেদের অভিনয় জীবনের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পথটি তাঁরা নিজেরাই রচনা করেছেন। যাত্রা নামক একটি কামধেনু থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঐশ্বর্য গুছিয়ে নেবার একমাত্র উদ্দেশ্য থেকেই বাংলার প্রাচীনতম লোকসংস্কৃতির একমাত্র শরিক যাত্রার এই অবক্ষয় সৃষ্টি করেছেন অনেকে। বিবেকহীনতা-প্রেমহীনতায় প্রকৃত পক্ষে আজকের যাত্রা দিশাহারা।

যাত্রার কিংবদন্তীর নায়ক নটসম্রাট স্বপনকুমারের বিলাসী মেজাজের অনেক কাহিনী যেমন ছড়ানো, তেমনি যাত্রার ছোট ফণি অর্থাৎ ফণিভূষণ মতিলালেরও বিলাসী দাপট কম ছিল না। তখনকার দিনে পালকী চেপে আসরে অভিনয় করতে নিয়ে আসাই ছিল শিল্পীর প্রতি অধিকারীদের সর্বোচ্চ সম্মান দান। ছোট ফণিবাবু সেই পালকী চড়েই অনেকবার গিয়েছিলেন আসরে। ফণিবাবুকে যা-ই খেতে দেওয়া হোক তার মধ্যে মোটা মাগুর মাছের ঝোল পরিবেশন করাটা ছিল তখনকার মালিকদের বাধ্যতামূলক। নটসম্রাটের ক্ষেত্রেও তাই। এমন অনেক জায়গা আছে, যেখানে মাগুর মাছ মিলতে নাও পারে বলে হাঁড়িতে মাগুর জিইয়ে রেখে নিয়ে যেতে হয়েছে নটসম্রাট স্বপনকুমারের জন্য, বাদশাহী খাবারের সঙ্গে ওটা অনিবার্য ছিল বলে। এ সব কথা শোনা যায় অনেক মালিক-কর্মীদের মুখে। আরও এমন অনেক কাহিনী, যা প্রকাশে অভিনেতা স্বপনকুমারের সম্মান বৃদ্ধি হবে না। আসলে টুকরো টুকরো হৃদয়হীনতার নজিরে, আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতার দৃষ্টান্তে, বিবেকহীনতা, স্বার্থপরতার প্রাবল্যে আজকের যাত্রাজগত কিছু শিল্পীকে পুরোপুরি শ্রদ্ধার আসনে বসাতে পারেনি। যা হোক, আবার ক'জন শিল্পীর কথায় আসি।

॥ কানু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

বাংলার এই সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রবীণ অভিনেতা, বিশ্ববন্দিত সত্যজিৎ রায়ের ছবি "পথের পাঁচালি"-তে বিভূতিভূষণের অমর সৃষ্টি হরিহর চরিত্রে অতুলনীয় অভিনয় করে হয়েছিলেন বিশ্বপরিচিত। সেই বিশ্ববন্দিত মহান রূপকারের শেষ জীবনের দারিদ্র্য জর্জরিত টালার এক চিলতে

ঘরের খবর যখন কেউ রাখত না, তখন শীর্ণকায় শরীর নিয়ে, বার্ধক্যে নুইয়ে পড়া দেহটাকে টানতে টানতে, দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন সংগ্রহের তাগিদে সহৃদয় কিছু অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের আমন্ত্রণে নাটকের নির্দেশনার কাজ করতে যেতেন কানুবাবু, কালেভদ্রে কোন থিয়েটারে বা সিনেমায় অভিনয় করার সামান্য কাজটুকু সেরে ক্লান্ত-বিধ্বস্ত-অবসন্ন মন নিয়ে আবার ঘরে ফিরতেন, তেমনি একটি সময়ে যাত্রায় গেলে অনেক টাকা পাওয়া যায় সেই খবরের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদকের কাছে যাত্রায় অভিনয় করতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন কানুদা।

যাত্রা-জীবনের ধকল, যাত্রার মালিকদের চরিত্র বিশ্লেষণ করা সত্ত্বেও কানু বন্দ্যোপাধ্যায় নিতান্ত ছেলেমানুষের মত জেদ ধরে বসলেন। বিস্মিত হলাম মনের জোর দেখে। খবর পৌঁছে দিলাম নিউ রয়েল বীণাপাণির কর্ণধার, তখনকার ডাকসাইটে মালিক আর মালিকের দক্ষিণ হস্ত, ডাকসাইটে ম্যানেজার কমল খাঁকে। খবরটা কানে যেতেই, আকাশের একটা চাঁদ খসে পড়েছে টালায়, সবার আগে ছুটে গিয়ে ওটা নিতে পারলে বাজি মাৎ এমন মনে হলো! পথের পাঁচালি'র কানু বন্দ্যোপাধ্যায় যাত্রার আসছেন জানতে পারলেই নায়েকরা মোটা বায়নায় দল নেবেন সেই লোভে তৎক্ষণাৎ আমাকে নিয়ে মালিক নারায়ণ ভট্টাচার্য আর কমল খাঁ এলেন কানুবাবুর টালার ঘরে। কথা, আলোচনার পর নারায়ণবাবু বলেছিলেন—"আমার বাবাকে যে সেবা করতে পারিনি, আপনাকে দলে পেলে সেই সেবা করে ছেলের কাজ করবো!"—কানুদা কথা দিয়েছিলেন। কত টাকা পেয়েছিলেন তিনি জানি না। দীর্ঘ দিন রিহার্সাল দিয়েছিলেন। পৌঁছেছিলেন যাত্রার আসরে। অভিনয় করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়লে নারায়ণবাবু কথা রেখেছিলেন। অবহেলা করেননি। সসম্মানে পৌঁছে দিয়েছিলেন বাড়ি। কানু বন্দ্যোপাধ্যায় যাত্রায় গিয়ে পাননি কিছু, তবে তাঁর যাত্রায় যাওয়া যাত্রাকে একটা বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিল।

এবার কয়েকজন গায়ক অভিনেতার কথা বলি, যাঁদের স্মরণীয় কণ্ঠস্বরই ছিল যাত্রা আসরের অমূল্য সম্পদ।

॥ বিনোদ ধাড়া ॥

সালটা বোধহয় হবে ১৯০১। মেদিনীপুর জেলার বগুড়া কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন এই বরণীয় শিল্পী। শৈশব থেকেই সংগীতের প্রতি অনুরাগ দেখে বিনোদের পিতা পূর্ণচন্দ্র পুত্রকে গান শেখাতে শুরু করেন। বছর দশ বারো বয়েসে বাঘা ওস্তাদ জমিরুদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছে নাড়া বাঁধেন বিনোদ। পরে আরো কিছু তালিম নিয়েছিলেন দৌলতরাম ও সতীশ ঘোষের কাছে।

যাত্রা জগতে মথুর সা'র দলে গায়ক হিসেবে বিনোদের শিল্পীজীবনের শুরু। যথারীতি খ্যাতি এল ওঁর জীবনে রাতারাতি। কিন্তু তবুও মন ভরে না। গাইয়ে থেকে হলেন অভিনেতা। তাতে মন আরও খারাপ হয়ে গেল। মনে প্রাণে চান তিনি গাইয়ে হতে, গান বিসর্জন দিয়ে শুধু অভিনয় করে কি হবে। সুতরাং মনে চিন্তা তখন দল ছাড়বার। এমন সময় ঘটল এক অঘটন। মথুর সা'র দল তখন 'রাম নির্বাসন পালা' গাইছে। অভিনয় করবেন প্রখ্যাত গায়ক হেম পাণ্ডা। কিন্তু তিনি অনিবার্য কারণে উপস্থিত হতে পারলেন না। সাহস করে এগিয়ে এসে ঐ ভূমিকার দায়িত্ব নিলেন বিনোদ ধাড়া। দরাজ কণ্ঠের সুরলহরীতে আসরে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল।

শুরু হল বিনোদের জয়যাত্রা। মথুর সা'র দল ছেড়ে তিনি যোগ দিলেন গ্র্যাণ্ড বীণাপাণিতে। ওখান থেকে ভাণ্ডারী অপেরায় এসে নিলেন এক নতুন ভূমিকা। সুরকার হলেন 'মুক্তি' নাটকের। এরপর বিনোদ ধাড়ার শিল্পী জীবনে হল অনেক দল বদল, যেমন রায় অপেরা, ভোলানাথ অপেরা, আর্য অপেরা, রত্তন অপেরা ইত্যাদি। শেষোক্ত দলটিতে থাকাকালীন 'পলাশীর পর' নাটকে দরবেশ চরিত্রে তিনি অযুত মানুষের প্রশংসা কুড়িয়ে ছিলেন। উপরোক্ত দলগুলি ছাড়াও শিবদুর্গা,

গণেশ, প্রভাস, সত্যনারায়ণ, রয়েল, বীণাপাণি, নারায়ণ, হেম, নট্ট, আর্য, সত্যম্বরে বিভিন্ন সময়ে যুক্ত ছিলেন।

শেষ জীবনে রয়েল বীণাপাণির প্রধান গায়কের ভূমিকা ছিল বিনোদবাবুর। চোখে দেখতে পেতেন না, কিন্তু তবুও তাঁর নিস্তার ছিল না। জনপ্রিয়তার মাশুল দিতে তাঁকে লোকের হাত ধরে আসরে এসে গান গাইতে হত।

১৯৬৩ সালে যাত্রাজগতে এক বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি করে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন বিনোদ ধাড়া।

যাত্রার আসরে উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রবর্তনা শ্রীধাড়ার। বিনোদ ধাড়ার আলাদা একটি ঘরানা তৈরি হয়েছিল, যা ছেলে গুরুদাস ধাড়া উত্তরাধিকার সূত্রে বহুদিন ধরে রেখেছিলেন। বিনোদ ধাড়ার মর্মরমূর্তি গড়বেতায় স্থাপিত হয়েছে আঞ্চলিক সি. পি. এম পন্থী মানুষের উৎসাহে।

॥ ভক্ত মল্লিক ॥

আজকের যাত্রায় যে ক'জন বিবেক আপন প্রতিভায় ভাস্বর ভক্ত মল্লিক তাদের অন্যতম। নদীয়া জেলার মুড়াগাছায় ১৯৪৩ সালে মন্মথ মল্লিকের ছেলে ভক্ত মল্লিকের জন্ম। ঠাকুরদা ছিলেন সংগীত রসিক। তাই বোধহয় ছেলেবেলা থেকেই গানের প্রতি আকৃষ্ট হন ভক্ত মল্লিক। স্কুলে পড়তে পড়তেই প্রভাতকুসুম পাঠকের কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীতে তালিম নেন।

শুধু প্রভাতবাবুই নন, ক্ষুদিরাম মাস্টারও গান শিখিয়েছিলেন ভক্ত মল্লিককে।

এমনি ভাবেই একদিন গান নিয়ে মেতে গিয়ে অভিমন্যু মাহাতোর সাহায্যে ভক্ত মল্লিক আসেন মাহাতোর দল অন্নপূর্ণা অপেরায়।

'গরীবের মেয়ে' পালায় বিবেকরূপে আসরে এসে প্রথম পালাতেই সকলের মন জয় করেন। এখানে তিন বছর কাটাবার পর সুযোগ্য ম্যানেজার অভয় সাহার অনুরোধে ভক্তবাবু জড়িয়ে পড়েন নাট্যভারতীতে। 'হে অতীত কথা কও' পালায় গানে ও অভিনয়ে সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। এরপর চলে আসেন সত্যম্বর অপেরায়। এখানে 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' ও 'সিপাহী বিদ্রোহ' পালায় অসাধারণ অভিনয় করে সম্মানিত হন।

তারপর আসেন মাধবী নাট্য কোম্পানিতে এবং পরে নাট্যভারতীতে। ভক্ত মল্লিক নাট্যভারতীর নিশিপদ্ম, সিরাজদ্দৌলা পালায় বিবেকরূপে অভিবাদন জানান।

॥ তারা ভট্টাচার্য ॥

যাত্রার আসরে কৌতুক অভিনেতা হিসাবে যে ক'জন অভিনেতার নাম শীর্ষস্থানে তাঁদের মধ্যে অন্যতম তারা ভট্টাচার্য।

১৯২২ সালে যশোর জেলায় মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের ছেলে তারা ভট্টাচার্যের জন্ম। মাত্র তেরো বছর বয়সে বাবাকে হারিয়ে কলকাতায় চলে আসেন তারা ভট্টাচার্য। ১৯৪১ সালে বাটা কোম্পানিতে ফোরম্যানের চাকরি গ্রহণ করেন, এর চার বছর পর মহাবীর টিম্বার ইলেকট্রিক কোম্পানিতে ম্যানেজারের পদ পান তারাবাবু। অভিনয়ের নেশা ছিল ছেলেবেলা থেকেই। তাই চাকরি জীবনের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে অভিনয় করতেন।

এমনি করে একদিন অভিনয় করার সুযোগ পেলেন রূপালী পর্দায়। আদর্শ হিন্দু হোটেল, অপরাধ, ও আমার দেশের মাটি, রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় করলেন। এরপর ১৯৫৪ সালে ভাণ্ডারী অপেরায় পাকাপাকি ভাবে যুক্ত হয়ে নেমে পড়লেন যাত্রার আসরে। প্রথম নাটক 'স্বাধীনতার বলি'তে অসাধারণ অভিনয় করে প্রচুর সুখ্যাতি পেলেন। তারপর একের পর এক পালায় রূপদান করে তারা ভট্টাচার্য হলেন প্রখ্যাত কৌতুক-নট। ১৯৬৪ সালে যুক্ত হলেন তরুণ অপেরার সঙ্গে। মাত্র কয়েক বছর পর চলে আসেন রঞ্জন অপেরায়। দুর্গাদাস, আনারকলি, ভুলের

মাশুল প্রভৃতি পালায় অভিনয় করে পূর্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখেন। তারপর দল বদল করে চলে আসেন নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরায়। মূর্খের পাঁচালি পালায় তারাবাবুর অনন্য অভিনয় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

॥ বলাই হালদার ॥

হরিচরণ হালদারের ছেলে বলাই হালদার ১৩৩১ সালে কৃষ্ণনগরের মালোপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন।

অভাবের তাড়নায় মাত্র তেরো বছর বয়সে এক হারমোনিয়ামের দোকানে চাকরি পান এবং নিজের উৎসাহেই হারমোনিয়াম বাজাতে শেখেন।

এরপর দেনার দায়ে বাস্তুহারা হয়ে চলে আসেন শান্তিপুরে এবং প্রাণহরি হালদারের কাছে গানে তালিম নেন বলাই। প্রায় ৩০/৩২ বছর আগে প্রভাস অপেরায় 'ধর্মবিপ্লব' পালায় বলাই হালদারের পাকাপাকিভাবে অভিনয় জীবন শুরু। এরপর নিউ গণেশ অপেরা, জনতা অপেরা, সত্যম্বর অপেরায় বিবেক চরিত্রে অভিনয় করে প্রথম শ্রেণীর বিবেক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যান। ভারতী অপেরার 'মৃত্যুঞ্জয় সূর্য সেন', 'গরীব কেন মরে' পালায় অভিনয় করে প্রচুর খ্যাতি পান। বলাই হালদার আজকের যাত্রাজগতে বিবেক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত শিল্পী।

॥ ক্ষিতীশ রায় ॥

১৯২৯ সালে বরিশালের দীঘিরজান গ্রামে ক্ষিতীশ রায়ের জন্ম। বাবা বিষ্ণুচরণ রায় শুধু নন, মাও ভাল গান গাইতেন। তাই বালক বয়স থেকেই গান নিয়ে মেতে উঠেছিলেন ক্ষিতীশ। নন্দ সরকার ও পরে নিশি এবং বিজয়ের মত বিখ্যাত কবি গাইয়েদের সঙ্গে কবিগান গেয়ে বেশ পরিচিত হয়ে ওঠেন ক্ষিতীশ রায়। সুযোগ পান বরিশালে নট্ট কোম্পানিতে। 'চন্দ্রমুকুল' পালায় চাবুক চরিত্রে জীবনে প্রথম বিবেকের ভূমিকায় অভিনয় ও গান গেয়ে স্বর্ণপদক জয় করেন। দেশ ছেড়ে চলে আসার পর বেশ কিছুদিন রিফিউজি জীবন কাটিয়ে নানা ঘাত প্রতিঘাতে জর্জরিত এই শিল্পী আবার সুযোগ পেলেন নট্ট কোম্পানিতে। নট্ট তখন কলকাতায়। এখানে তিন বছর বিভিন্ন পালায় অভিনয় করে প্রচণ্ড খ্যাতি নিয়েই বেরিয়ে পড়েন অন্য দলের ডাকে।

চণ্ডী অপেরায় 'সমাজের বলি' পালায় ধনাই চরিত্রে অভিনয় করে একদিন ধনাই মাঝি নামেই খ্যাত হয়ে পড়েছিলেন ইনি। প্রায় শতাধিক পালায় জনপ্রিয় এই বিবেক রেডিওতে 'দেবীদাস' পালায় অভিনয় করেছেন। ধানবাদের যাত্রা প্রতিযোগিতা এবং আরও বহু জায়গা থেকে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সম্মান পেয়েছেন। জয় করেছেন অগণিত পুরস্কার ক্ষিতীশবাবু।

॥ গুরুদাস ধাড়া ॥

প্রখ্যাত গায়ক অভিনেতা বিনোদ ধাড়ার ছেলে গুরুদাস ধাড়া ১৯৩৭ সালে বগুড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রক্তে ছিল সংগীত আর অভিনয় নেশা।

মামা রামচন্দ্র ধাড়ার সহযোগিতায় চৌদ্দ বছর বয়সে হেম অপেরায় যুক্ত হন গুরুদাসবাবু। এরপর নিউ গণেশ অপেরার 'বঙ্গবীর' পালায় সুমিত্র চরিত্রে অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেন। এরপর প্রথমে রঞ্জন ও পরে নব রঞ্জন অপেরা, নিউ গণেশ অপেরায় খ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করেন। 'জীবন্ত পাপ' পালায় ক্ষ্যাপা বাউলের চরিত্রে উদাত্ত কণ্ঠে গান আর অভিনয়ে সকলের মন জয় করেন। 'মাইকেল মধুসূদন' পালায় নয়ন গোঁসাই গুরুদাসবাবুর আর এক শ্রেষ্ঠ অভিনীত চরিত্র।

'কৃষ্ণ নামের মালা গেঁথে গলায় পরেছি' এবং 'বাবুজী আপনে মেহেরবান' গান আজও দর্শক মনে ভেসে আছে। বিদ্যাসাগর, সিংহগড়, ফাঁসীর মঞ্চ, বিনয়-বাদল-দীনেশ, বাঁচার লড়াই গুরুদাসবাবুর অভিনয়ে ও গানে আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। নট্ট কোম্পানি, জনতা অপেরা, নাট্যভারতী শুধু নয় শিল্পীতীর্থ, চন্দ্রলোক, গীতাঞ্জলি অপেরার কথাও স্মৃতির পাতায় অক্ষয় হয়ে

থাকবে। যাত্রা সম্রাজ্ঞী জ্যোৎস্না দত্তের অভিনয় আর সংগীত এবং ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া এই শিল্পীর কৃতজ্ঞতা বোধ ছিল অন্তরে। স্মরণীয় শিল্পী বিনোদ ধাড়ার সংগীত ঘরানার একমাত্র ধারক, উত্তরাধিকারী গুরুদাসের প্রতিভাকে বাঁচিয়ে রাখতে জ্যোৎস্না দিয়েছিলেন গভীর বন্ধুত্ব। জীবনের শেষ পর্বে অসুস্থ গুরুদাসকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টার মধ্যে, পরিশেষে শ্রীধাড়ার পারলৌকিক ক্রিয়া সুসম্পাদনে জ্যোৎস্নার মানবী ধর্মের প্রকাশ, সে এক অন্য ইতিহাস! হৃদয় উৎসারিত কর্তব্যের ইতিহাস!

এবার তাঁদের কথা বলি যাঁদের অতুলনীয় চরিত্র চিত্রণে যাত্রাগান বা পালাগানের ঐতিহ্য ছিল মহিমামণ্ডিত। এঁরা হলেন পুরুষরানী। এই পুরুষরানীদের অবদানই বাংলার লোকসংস্কৃতির অন্যতম শরিক যাত্রাগানের সনাতন ভাবমূর্তির ঐতিহ্যকে আজও জনমানসে অম্লান রেখেছে।...

॥ যাত্রা গানের রানী ॥

অতি প্রাচীনকাল থেকে বিশেষ করে চৈতন্য সময়কাল থেকেই বাংলার লোকনাট্যের যথার্থ উদ্ভব, উপস্থাপনায় সার্থক মননশীলতার প্রকাশ, এবং বোধকরি নারী সমাজের অন্ধকার মুক্তি আর সামাজিক কুসংস্কারের শিকল ছিঁড়ে পুরুষের পাশে নারীর আসন সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করার ইংগিত ছিল নারী চরিত্রে নারীদেরই অভিনয়ে অংশ নেবার সামান্যতম প্রয়াসেও! কিন্তু সামাজিক প্রেক্ষাপটে অশিক্ষা-একরোখা পুরুষ শাসিত লৌহকঠিন পরিমণ্ডলে তৎকালীন সভ্যতার নামে হিংস্র সভ্যতার শিকার যে নারী সমাজ, তাকে মুক্তির স্বাদ নিতে হয়েছিল অনেক পরে। সে সব অন্য ইতিহাস! তবুও পুরাতন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়ে নিলে যেমন বিস্মিত হতে হয় একাধিক নারী শক্তির বিস্ময়কর জাগরণের ইতিবৃত্তে, তেমনি অবাক হতে হয় প্রাচীনকালে যেখানে ঘরের বাইরে এসে খেউড় কিংবা কবিগান, কৃষ্ণযাত্রা অথবা গীতাভিনয় দেখা যে বিধানে মেয়েদের 'ব্যাভিচারের' তুল্য, সেখানেও দেখা যায় ক্ষতবিক্ষত দেহে-মনে মেয়েদের শিকলভাঙার চেষ্টা। দেখা যায়, একাধিক 'মেয়ে যাত্রার' দল। পেয়ে যাই মুক্তামণি দাসী, কৈলাস কামিনী, ত্রৈলোক্য তারিণী বা সরসীর মত মেয়েদের। যাঁরা গৃহকোণ থেকে বেরিয়ে এসে রং মেখে প্রয়োজনে আসরে নেমেছেন অভিনেত্রী হিসেবে, প্রয়োজনে হাল ধরেছেন স্বামী অথবা শ্বশুর কিংবা ভাই-দাদার অনেক শ্রমে গড়া যাত্রা দলের!

তবুও এ দেশের মাটিতে লোকনাট্যের দ্রুত বিস্তার লাভের সঙ্গে নারী চরিত্রে নারীদের দিয়ে অভিনয় করানোয় ছিল বাস্তব অসুবিধা। তাই পালাকারদের সৃষ্ট নারী চরিত্রের জন্য যুগ যুগ ধরে পুরুষেরাই রূপ বদল করে এই পুরাতন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হয়েছেন। পালকী বেহারাদের মত এক গ্রাম থেকে অন্য দূর গ্রামে নব বধূকে নতুন জীবনের আলোয় পৌঁছে দেবার মতই, ঐ পুরুষ-রানীরা বহু যুগের ওপার থেকে বাংলার প্রাচীনতম লোকসংস্কৃতির অন্যতম অংশীদার 'যাত্রা'কে পৌঁছে দিয়েছেন একালের তথাকথিত সভ্যতার আলোক-মঞ্জিলে!

এখন কোন নারী চরিত্রে কোন পুরুষ রূপদান করলে সমকাল সভ্যতার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে তাকে জর্জরিত হতে হয়, এখন বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের চরিত্র সৃষ্টি করে অনেক সাহিত্যিক এক শ্রেণীর রসবিস্তারে সাহিত্যকর্মে বাহবা কুড়িয়ে নেন, এখনও অনেকে যাত্রার এই রানীদের স্মৃতি মনে করে কৌতুক বোধ করেন, বহু কথাশিল্পী-দেশনেতা বারবণিতাদের মূল্যায়নে যত গৌরব বোধ করেন, ঠিক সেই দৃষ্টিকোণ থেকে যাত্রার পুরুষ-নারীদের তো দূরের কথা, যাত্রার কোন অভিনেত্রীর মূল্যায়নে ব্রতী হন না! অথচ এঁদের অসামান্য গুণের অজস্র নজিরে বাংলার লোকনাট্যের ঐতিহ্য সমৃদ্ধ হয়েছে। নারী চরিত্রে রূপদান করে এ দেশের বহু পুরুষ যে বিস্ময়কর প্রতিভা ও দক্ষতার নজির রেখে গেছেন, বোধ করি বহু অভিনেত্রী শত চেষ্টাতেও সেই নজির সৃষ্টি করতে পারেননি। এই পুরুষ-রানীদের নিয়ে এ দেশে এমন সব কিংবদন্তীর কাহিনী সৃষ্টি হয়েছে

যা সংগ্রহ করলে এক দুর্লভ কাহিনীসম্ভার তৈরি হতে পারে। এক সময়ে বিভিন্ন যাত্রার আসরে চলমান পালা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যেত। অনুসন্ধানে পাওয়া যেত কিড্ন্যাপের রোমহর্ষক কাহিনী। জমিদারের লেঠেলরা জমিদারের নির্দেশে মেক-আপ ঘর থেকে সুন্দরী নায়িকাকে লুঠ করত। পালা বন্ধ হতো মাঝ পথে অথবা শেষ মুহূর্তে। অনেক সময়, আসরে গাওনার পর অন্য আসরের জন্য নৌকা ছাড়া দায় হতো, নায়িকাকে রেখে যেত হবে এমন আস্ফালনে! কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য আবার সব ঠিক হয়ে যেত যখন জমিদারের লোকেরা বুঝতে পারত, যাত্রা নায়িকা একজন সাজা রানী! অতীতে একটি দল একাধিক পালা হাজির করত একই আসরে অনেকদিন থেকে। এর মধ্যে সাজা রানীদের কপালে জুটত অনেক ক্ষমতাবান ব্যক্তির ইতরজনিত ব্যবহার। আবার আলাদা পুরস্কারেও সম্মানিত হতেন তাঁরা। এই পুরুষ-রানীদের মধ্যে যাঁরা খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেছিলেন তাঁদের তালিকায় কিছু নাম আজ আর পাওয়া যায় না। যত নাম সংগ্রহ করতে পেরেছি তার তালিকা এই রকম ঃ দুর্গারানী, রেবতীরানী, ক্ষেত্ররানী (ক্ষেত্র পাল), সুলক্ষণারানী, শিবুরানী, কমল রানী, যতীন রানী, রাখাল রানী, ছবি রানী, বাবলি রানী, চপল রানী, মধু রানী, শতদল রানী, ক্ষিতিশ রানী, শিশির রানী, বনফুল, ফণি রানী, উপেন রানী, নিতাই রানী, বিনোদ রানী, বিভূতি রানী, রঞ্জন রানী, সুবল রানী, হরিপদ রানী, হরিগোপাল রানী, পুতুল রানী, মৃত্যুঞ্জয় রানী, ২য় ফণি রানী, কাঞ্চন রানী, ভ্রমর, ধীরা রানী, বিমল রানী, যদু রানী, সুব্রত রানী, টগর, প্রজাপতি, দীনেশ রানী, সন্তোষ রানী, জনার্দন রানী ইত্যাদি ইত্যাদি।

গ্রামে-গঞ্জে আজও এমন প্রবীণ যাত্রা দর্শক আছেন যাঁরা বয়সের ভার উপেক্ষা করে নাতি কিংবা গ্রামের কোন বয়স্ক লোকের কাঁধে ভর দিয়ে যেখানে যাত্রা হয় সেখানেই ছুটে যান যাত্রা দেখতে, এমন অনেক মানুষের সন্ধান পেয়েছিলাম যাঁদের আশি বছর বয়স পার হয়ে গেছে অথচ এই সময়কালের মধ্যে সিনেমা দেখেননি একটিও, বড় ফণিবাবু থেকে শতদল রানীর অনেক সংলাপ মুখস্থ বলে যেতে পারেন, এমন সব মানুষেরা এই নব্যযুগের দু'একজন অভিনেত্রীর অভিনয়ে খুবই খুশি হলেও স্পষ্ট করে বলে থাকেন, 'অমুক রানীর একস্‌প্রেশান আজও ভুলতে পারি না, অথচ তাঁরা ছিলেন পুরুষ! তেমনি পালাও আর হবে না, তেমনি অভিনয়ও আর দেখতে পাবে না কেউ।'

এই সব রানীদের কথা যতটা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তা বিস্তারিত বলার আগে, কয়েকজন পুরুষ-রানীর জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু কিছু স্মরণীয় ঘটনার বর্ণনা পেশ করার লোভ সামলাতে পারছি না! মনে রাখতে হবে, সেই প্রাচীনকাল থেকে যাঁরা বাংলার লোকনাট্যের ঐতিহ্যের ধারা বহন করে এসেছেন, আজ তাঁদের মধ্যে অনেকেই হারিয়ে গেছেন নীরবে। যাঁরা বেঁচে আছেন আজকের বিলাস-প্রাচুর্যের বর্ণময় যাত্রা জীবনের বাইরে, তাঁদের অধিকাংশ সপরিবারে ধুঁকছেন দারিদ্র্যের জ্বালায়। কিছু পুরুষ-রানী আছেন যাঁরা আজকের চিৎপুরের বিভিন্ন যাত্রা প্রতিষ্ঠানের সাধারণ কর্মী মাত্র। দু' একজন আছেন যাঁরা পারিবারিক ক্ষেত্রে প্রিয়জনদের সঙ্গে আর পাঁচজন সাধারণ সুখী মানুষের মত দিন যাপন করছেন। এই পুরুষ-রানীদের জীবনের কিছু কিছু স্মরণীয় ঘটনার স্মৃতিচারণ আজকের অথবা আগামী প্রজন্মের কাছে বিশ্বাসের মর্যাদা হয়তো পাবে না, কিন্তু স্মৃতিচারণার মর্যাদা রক্ষার্থে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এর উল্লেখ অনিবার্য মনে করি।

॥ রেবতী রানী ॥

এই মানুষটিকে নট্ট কোম্পানির বর্তমান কর্ণধার মাখনলাল নট্ট বরাবরই রেবতী কাকা হিসেবে সম্বোধন করতেন। একটানা ৪৫ থেকে ৫০ বছর নট্ট কোম্পানির শিল্পী ছিলেন বেরতীবাবু। ফরিদপুরের ছেলে ছিলেন তিনি। রেবতীবাবু এই প্রতিষ্ঠানের বহু পালায় নারী চরিত্রে রূপ দিয়ে রেবতীরানী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিছু কিছু পুরুষ চরিত্রে তাঁর অভিনয় সকলের

মনেই রেখাপাত করেছিল। রেবতীরানী শেষ অভিনয় করেন নট্ট কোম্পানির 'আকালের দেশ' পালায়। এই পালার সুকণ্ঠ চরিত্রের 'মা' তাঁর অভিনয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

১৯৭১-৭২ সাল পর্যন্ত তিনি অভিনয় করার পর অবসর জীবন যাপন করতেন টালীগঞ্জে ; এখানেই তিনি মারা যান। রেবতীরানী অভিনীত উল্লেখযোগ্য পালার মধ্যে ছিল, 'চন্দ্রনাথ', 'লালন ফকির', 'গঙ্গা থেকে বুড়ি গঙ্গা' ইত্যাদি।

প্রখ্যাত অভিনেতা সুনীল মুখার্জী (রামুবাবু) যদি কখনও বুঝতেন আসর জমছে না তা হলে সাজঘরে এসে বলতেন, 'রেবতীবাবু সুর টানুন'— ; অর্থাৎ আরও সুরেলা করে বলার ব্যাপারটা এই সময়কাল পর্যন্ত খুবই চালু ছিল। বেরতীবাবু ওরফে রেবতীরানীর ছিল উদাত্ত কণ্ঠস্বর।

॥ উপেন রানী (উপেন কর) ॥

চব্বিশ পরগণা জেলার নলুয়াহাট গ্রামে উপেনবাবুর জন্ম। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে তিনি গণেশ অপেরায় যোগ দেন। এ দলে প্রথম ব্যালে ট্রুপে নাচার সুযোগ পান। এরপর 'কালচক্র' পালায় প্রথম স্ত্রী চরিত্রে রূপদান করেন। অতীতের স্মৃতিচারণ করতে করতে উপেনবাবু বলেছিলেন,—'আমি যখন যাত্রায় আসি তখন আমার মাইনে ছিল পাঁচ টাকা। দিনে একবেলা ভাত খেতে পেতাম আর রাতে খাবারের জন্য বরাদ্দ ছিল মাত্র সাত পয়সা, তখন সেই পয়সা থেকে কিছু জমাতেও পারতাম—'

তারপর 'বিন্ধ্যাবতী' পালায় রাজকন্যা পুষ্পের চরিত্রে অভিনয় করে উপেনবাবু উপেনরানী হিসেবে সবার স্বীকৃতি পান। পরে 'আদিসুর', 'নরকাসুর', 'কৈকেয়ী', 'জগদ্ধাত্রী' ইত্যাদি পালায় যথাক্রমে আদিসুরের কন্যা, নরকাসুরের স্ত্রী, কৈকেয়ী, প্রতিমা ইত্যাদি স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করে প্রভূত খ্যাতি পান। উপেনবাবু তদানীন্তন প্রায় সব দলেই অভিনয় করেছিলেন। এই দলগুলির মধ্যে অন্যতম হলো, গণেশ অপেরা, বীণাপাণি, ভাণ্ডারী, আর্য, কমল অপেরায় বছরের পর বছর ধরে অভিনয় করে অবশেষে ক্যালকাটা অপেরায়। এই দলের গদিতেই প্রায় ৭৯ বছরে উপেনবাবু মারা যান।

॥ যতীন চক্রবর্তী ওরফে যতীন রানী ॥

যতীনবাবুর অভিনয় জীবন একটু অগোছাল ভাবে শুরু হয়েছিল। অল্প বয়সে হাঁপানি রোগ তাঁকে আঁকড়ে ধরে। ডাক্তারের বিধান, দেশ ভ্রমণে নিরাময় সম্ভব। সেই সূত্রে মেদিনীপুর জেলার পাশকুঁড়ার রঘুনাথবাড়ি হাইস্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যুবক যতীন নেমে পড়েন স্বদেশী যাত্রার আসরে। মেদিনীপুরে তখন স্বদেশী আন্দোলনের আগুন জ্বলছে এখানে ওখানে। স্বদেশী যাত্রা যে হেতু ইংরেজদের অসহ্য সেই হেতু বার কতক যতীনবাবুকে কারাবাস করতে হয়।

১৯৩৯-৪০ সালে যাত্রা জগতের পরিচিত মানুষ উপেন পাণ্ডা যতীনবাবুকে কলকাতার পেশাদার দল গণেশ অপেরায় নিয়ে আসেন। তারপর অতুল বসুমল্লিকের আর্য অপেরায়। এরপর রঞ্জন অপেরা, নট্ট কোম্পানি, রয়েল বীণাপাণি, শ্রীচরণ ভাণ্ডারীর ভাণ্ডারী অপেরায় খ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করেন। শেষের দিকে আবার নট্ট কোম্পানিতে ফিরে যান। যতীন চক্রবর্তী বা যতীন রানীর অভিনীত চরিত্রগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো : দেবী জগদ্ধাত্রী পালায় জগদ্ধাত্রী। চাঁদ সদাগর-এ মা মনসা ; ভীষ্ম'তে গঙ্গা ইত্যাদি। পূর্ববঙ্গে নট্ট কোম্পানিকে যে পালা প্রথম প্রতিষ্ঠা দেয় সেই 'চাঁদের মেয়ে' পালার 'চাঁদের' চরিত্রে যতীনরানীর অভিনয় চিরস্মরণীয়। সমসাময়িক যে শিল্পীদের সঙ্গে যতীনবাবু বা যতীনরানী অভিনয় করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন, হরিপদ বায়েন, উপেন অধিকারী, ফণি ভট্টাচার্য, ক্ষিতীশ বিশ্বাস, পালাকার নন্দগোপাল রায়চৌধুরী যাঁরা একদা হরিপদ রানী, উপেন রানী, ফণি রানী, নন্দ রানী হিসেবে খ্যাত ছিলেন।

যাত্রা জীবনের পাশাপাশি মিনার্ভা, মনমোহন থিয়েটারে দানীবাবুদের সঙ্গেও যতীনবাবু অভিনয় করেছেন পুরুষ চরিত্রে। অনেক বিস্ময়কর ঘটনা একদিন ঘটে যেত এই সব সাজা রাণীদের নিয়ে। যতীন রানীর জীবনেও তেমনি ঘটেছিল। যতীন রানীর অভিনয়ে দর্শক শুধু তৃপ্ত হতেন না। দেবী' চরিত্রে যখন অভিনয় করতেন দর্শকরা গভীর শ্রদ্ধা জানাতো। তেমনি এক ঘটনা ঘটেছিল আর্য অপেরায় থাকাকালীন। সেবার আর্য অপেরার 'চাঁদ সদাগর' পালায় 'মা মনসা' চরিত্রে অভিনয় করার পর ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েন। গভীর ঘুমে যখন তিনি আচ্ছন্ন, তখন আর্য অপেরা নারাজোলের রাজবাড়ির আসর ত্যাগ করে চলে যায় মেদিনীপুরের রাস বাড়িতে। পরের দিন সেই রাসমঞ্চে অভিনয়। যথা সময়ে ঘুম ভাঙার পর যতীনবাবু দেখলেন তিনি একলা পড়ে আছেন রাজবাড়িতে। সবাই চলে গেছে অনেকক্ষণ। অথচ সেই দিনই মেদিনীপুরের রাসমঞ্চে অভিনয়। সব শোনার পর রাজকর্মীরা রাজার আদেশ মতে হাতিতে চড়িয়ে যতীনবাবুকে পৌঁছে দিয়েছিল রাসমঞ্চে।

১৯৫৮-৫৯ সালে যতীনবাবু অভিনয় থেকে অবসর নিয়ে দলের গদিতে দল পরিচালনার কাজ করেন। যতীনবাবু শেষ অভিনয়, 'সিরাজদ্দৌলা' পালায় সিরাজের মাসি ঘসেটিবেগমের চরিত্রে। শ্রীচরণ ভাণ্ডারীর ভাণ্ডারী অপেরার মালিক যখন ননীগোপাল মণ্ডল তখন যতীনবাবু হন দল পরিচালক। ননীবাবুর মৃত্যুর পর ভাণ্ডারীর কর্ণধার হন যতীনবাবু।

মৃত্যুর আগের দিন কলকাতার রিজেন্ট পার্কে এম, নস্করের "শূন্য বাসরে বধূ" পালা আরম্ভ করে দিয়ে অসুস্থ শরীর নিয়ে বাড়ি ফেরেন যতীনবাবু। সেটা ১৯৭৫ সালের ১০ অকটোবর। পরের দিন ভোর রাত্রে তাঁর মৃত্যু হয়।

শোভাবাজার রাজবাড়িতে প্রথম পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা উৎসবে (১৯৬৩) যতীন চক্রবর্তীকে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল। হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল মানপত্র। সেটাই যতীনবাবুর প্রথম ও শেষ মূল্যায়ন বোধ হয়।

॥ ছবি রানী ॥

নারী লুঠ, নারী হরণ ইত্যাদি ব্যাপারগুলো টাকা লুঠ-সোনা লুঠের মত হামেশাই হয়ে থাকে। ব্যাপারটা চলেও আসছে যুগ যুগান্তর থেকে। রাবণ থেকে শুরু করে এ দেশের রাজা মহারাজারা বৃহত্তম স্বার্থে, ব্যক্তিগত স্বার্থে হামেশাই নারী হরণ বা নারী লুঠের যেমন ইতিহাস তৈরি করেছেন, তেমনি ডাকসাইটে জমিদার থেকে আজকের মস্তানদের নারী হরণ বা মেয়ে ছিনতাই কাহিনী কতই না জানা যায়। বাড়ির অন্দরমহল থেকে, বিয়ের বাসর থেকে, পুকুর ঘাট থেকে শুরু করে, স্কুল-কলেজের গেট থেকে মেয়ে অপহরণের কাহিনী আমরা জানি। কিন্তু 'যাত্রার আসর থেকে পছন্দসই নায়িকাকে হরণ করে নিয়ে গেলে তার ভাগ্যে যে কী ফলভোগ থাকত তা কল্পনা করলেই শিউরে উঠতে হয়। দূর অতীতে যে ক'বার যাত্রার আসর থেকে নায়িকা লুঠ হয়েছিল সেই সংবাদে কিন্তু কারও মনে বিশেষ কোন চাঞ্চল্য জাগত না। এমন কি দলের অভিনেতা-কর্মীদের মধ্যেও না। বড়জোর একটা দুশ্চিন্তার রেখা পড়ত সবার মুখে-চোখে। রাত-বিরেতে ছবিকে অথবা শতদলকে লুঠ করে নিয়ে গেল, একটু পরেই হয়তো ভুল বুঝতে পেরে ছেড়েও দেবে, কিন্তু বেচারা আসবে কি করে ফিরে। সুতরাং যাত্রার অধিকারীর সঙ্গে জনা কতক হ্যারিকেন অথবা হ্যাজাক আর লাঠি নিয়ে বেরিয়েছেন খুঁজতে। ধকল সইতে হয়েছে কিছুটা। ছবি বা শতদলরানী কিন্তু ফিরেছেন যাত্রা দলে অক্ষত অবস্থায়। এই লুঠের মূলে এক দল মানুষের বিকৃত মানসিকতা। কদর্য পৌরুষের দম্ভ। সুন্দরী মেয়ে মাত্রেই ভোগের সামগ্রী, এই হলো অত্যাচারী রক্তধারার বিলাস। আর তার শিকার হয়েছেন একাধিকবার অতীত যাত্রার সাজা রানীরা। ছবিরানী তার মধ্যে একজন।

ছবিরাণী এক সময়ে 'যাত্রার এলিজাবেথ' আখ্যা পেয়েছিলেন। ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, মেকআপ নেওয়া শ্যামাপদ রায় কী নিদারুণ সুন্দরী হয়ে উঠতেন একদা!

ছবিরাণী ওরফে শ্যামাপদ রায়ের আদি বাড়ি ঢাকা জেলার কলাপোতা গ্রামে। ১৩৩৩ সনে ঁবেণীমাধব রায়ের ছেলে শ্যামাপদর জন্ম অবশ্য দেওঘরে। বেণীমাধব ছিলেন দেওঘর পোস্ট অফিসের পোস্ট মাষ্টার। মাত্র ছ'মাস বয়সে শ্যামাপদ বাবাকে হারান। বাবার মৃত্যুর পর পরিবারের সকলের সঙ্গে শ্যামাপদ কলকাতায় চলে আসেন। মা ক্ষীরোদাবালা অবশ্য ভিটের মায়া ত্যাগ করতে পারেননি। ঢাকাতেই থাকতেন তিনি। কয়েক বছর পর কালাজ্বরে মায়ের মৃত্যু হয়।

চার বোন আর তিন ভায়ের মধ্যে শ্যামাপদ ছোট। সংসারে নিদারুণ অনটন, তারই মধ্যে অনেক কষ্টে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে রোজগারের তাগিদে আশ্রয় নিয়েছিলেন বড় দিদির বাড়িতে। শ্যামাপদের হাব-ভাবে কিছুটা মহিলা সুলভ লক্ষণ ছিল। কণ্ঠস্বর মিষ্টি ছিল। মেয়েদের মত সাজলে অনেক মেয়েরাই ঈর্ষান্বিত হত। সেই সুযোগের অপব্যবহার না করে মাত্র ১৪ বছর বয়সে শ্যামাপদ চাকরির খোঁজ করতে করতে চলে আসেন চিৎপুরে যাত্রা পাড়ায়। সুযোগ পেয়েছিলেন সত্যম্বর অপেরায়। শান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যদুপতি' পালায় প্রথম অভিনয় করার সুযোগ পান। নায়ক ছিলেন শান্তিময়ের দাদা শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্যামাপদ পেলেন উক্ত পালায় 'সুলোচনা' চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ। সেই সঙ্গে চলতি মরশুমের আর একটি পালা 'চণ্ডীমঙ্গল'-এও অভিনয় করেন। শ্যামাপদ রূপান্তরিত হন ছবিরানীতে।

পনের টাকা মাইনেতে ছবিরানীর অভিনয় জীবন শুরু। টিফিনের জন্য পেতেন ছ'পয়সা। পরে এই ছবিরানী মাইনে পেতেন ২৪০০ টাকা।

সব দলেই অভিনয় করেছেন ছবিরানী। আদি রঞ্জন অপেরার 'রাজনন্দিনী' পালায় রাজনন্দিনী, জনতা অপেরার 'দোষীকে' পালায় মা, গণেশ অপেরার একটি পালায় রাজেশ্বরী, 'দেবী চৌধুরাণী', প্রফুল্ল এবং 'বলয়গ্রাস' পালায় মন্দিরা, রয়েল বীণাপাণি অপেরার 'সুখের পাঁচালি' পালায় অন্নদা (মা) ; নট্ট কোম্পানির 'কোহিনূর' পালায় কোহিনূর, 'দেবীদাস' পালায় অঞ্জনা (পুত্রবধূ) ইত্যাদি চরিত্রে অবিস্মরণীয় অভিনয় করেছেন। এ ছাড়া আর্য অপেরার 'বাঙ্গালী' পালার নায়িকা 'আসমান' চরিত্রে ছবিরানী স্মরণীয় অভিনয় করেছেন। নটসম্রাট স্বপনকুমার ছিলেন এই পালার নায়ক নাসির। স্বপনকুমারের সেই প্রথম আত্মপ্রকাশ।

শুধু নারী চরিত্র নয়, নব রঞ্জন অপেরার 'ভক্ত হরিদাস' পালায় শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত্রে অভিনয় করে চরম খ্যাতি পান। এই সময় দর্শক সমাজ তাঁকে "সোনার গৌর" বিশেষণে আখ্যায়িত করেন। ছবিরানীকে গৌরাঙ্গ চরিত্রে অভিনয় করান এই দলের ম্যানেজার শম্ভুনাথ ঘোষ। ১৩৮১ সনে জনতার 'নদের নিমাই' পালায় ছবিরানীর শেষ অভিনয়।

১৩৬০ সালে নট্ট কোম্পানিতে থাকাকালীন শ্যামাপদ রায় ওরফে ছবিরানী বিয়ে করেন। দুই ছেলে, এক মেয়ে এবং স্ত্রীকে নিয়ে বেলুড় শান্তিনগরে ছিল ছবিরানীর সাজানো সংসার। তখন তিনি স্টেনলেস স্টীলের বাসনপত্রের ব্যবসায়ী। বেলুড় স্টেশনের কাছেই তাঁর দোকান। যে ছবিরানীর অভিনয়ে কয়েক লক্ষ মানুষের মন খুশিতে ভরে যেত, যে ছবিরানীরা এক প্রাচীনতম লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যকে বহন করে এক নতুন যুগের দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন, সেই শিল্পীদের, বিশেষ করে ছবিরানীর কোন মূল্যায়ন হয়নি।

॥ সন্তোষ রানী ॥

১৩৩৯ সালে ফরিদপুরের মাদারিপুর সাবডিভিশনের শিবচর থানার আর্য দত্ত পাড়ার বাসিন্দা ঁকরুণাকান্ত বসুর ছেলে সন্তোষ বসুর জন্ম। ছেলেবেলা থেকে চরম দরিদ্রতার সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে,

শেষ পর্যন্ত বাঁচার তাগিদে কলকাতায় আসেন তিনি। এখানে যেমন-তেমন একটা চাকরির জন্য মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছেন। এক সময়ে ভাগ্য তাঁকে টেনে আনে যাত্রাপল্লীতে। এখানে আর্য অপেরার গদিতে ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদের সাক্ষাত পান। আগে লোকমুখে এই স্বনামখ্যাত মানুষটির কথা শুনেছিলেন। দেখা মাত্রেই যেমন তেমন একটা কাজ চেয়ে বসেন। ফণিবাবুর নির্দেশে, দলের ম্যানেজার হেম মণ্ডল সন্তোষবাবুকে কাজ দিলেন। ফণিবাবু তখন এই দলের সম্মানীয় অভিনেতা। তাঁরই নির্দেশে পাঠ লেখা, পাণ্ডুলিপি কপি করা, অভিনেতাদের ফাইফরমাস খাটার কাজে লাগলেন যুবক সন্তোষ।

অল্পদিনের মধ্যে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো। বাগবাজারের এক আসরে অভিনীত হবে "রানী চণ্ডীদাস"। রানী ধোপানীর চরিত্রে যে ভদ্রলোক অভিনয় করতেন, তিনি না এসে পৌঁছতে সন্তোষবাবুকে সেই চরিত্রে বাধ্য হয়ে অভিনয় করতে হয়েছিল। এর মূলে ছিলেন হারমোনিয়াম বাদক প্রাণকৃষ্ণবাবু। অভিনয় শেষ হবার পর সন্তোষবাবুর প্রতি খুশি হন সকলে। বেতন বেড়ে যায়। কিছুদিন যাত্রায় থেকে, নিজেকে কিছুটা তৈরি করার পর আবার যাত্রা ছেড়ে তাঁকে ফিরে যেতে হয় দেশের বাড়িতে। ১৯৪৮ সালে আবার সন্তোষবাবু কলকাতায় এসে যাত্রা দলে চাকরির খোঁজ করতে থাকেন। এই সময় উপেনবাবুর চেষ্টায় (উপেনরানী হিসেবে খ্যাত) চাকরি পান সতীশ বেরার নারায়ণ অপেরায়। এখানে চাকরি করেন বটে কিন্তু পারিশ্রমিক ঠিক মত না পাবার জন্যে যখন দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ঠিক তখনই নিউ গণেশের মালিক গোষ্ঠ ঘোষ তাঁকে চাকরি দিলেন। এই সময়ে সন্তোষবাবু সপরিবারে প্রফুল্ল নগরের ১১০ নং প্লটে দিন যাপন করছিলেন! এই দলে একটানা দশ বছর চাকরি করেছেন সন্তোষ বসু। অনেক কাজের মধ্যে নারী চরিত্রে অভিনয় করতে করতে এক সময়ে সন্তোষরানী হিসেবে সুনাম করেন। সন্তোষবাবু অভিনীত চরিত্র ও পালার তালিকা ঃ সারথি ও কারামুক্ত (১৩৫৮) ; এই দুটি পালায় যথাক্রমে দ্রৌপদী ও এক শ্রমিক স্ত্রী। পৃথ্বীরাজ (১৩৫৯)-এ মেধা চরিত্রে রূপদান করে খ্যাতি পান। শিবাজী (১৩৬০) ; এই পালায় প্রথমে লক্ষ্মীবাই ও পরে শিবাজীর মায়ের চরিত্র। ১৩৬২ সনে নাথ কোম্পানির সঙ্গে সন্তোষবাবু যান পাকিস্তানে এবং '৬৪ সনে 'শুম্ভ-নিশুম্ভ' পালায় মহারানী চরিত্রে রূপদান করে প্রভূত খ্যাতি পান। এরপর ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদের 'মুচির ছেলে', সুর কোম্পানিতে ব্রজেন দের 'রাহুর গ্রাস' নাদির শাহ ইত্যাদি পালায় প্রধান নারী চরিত্রে অভিনয় করেন। তাছাড়া নন্দদুলাল রায় চৌধুরীর 'পরিচয়' (রাজমাতা চরিত্র), ফণিভূষণের 'নাগপঞ্চমী' (দেবী মনসা), 'অকাল বোধন' ইত্যাদি পালায় অভিনয় করেন। ১৩৬৮ সনে নব রঞ্জন অপেরার সর্বেসর্বা শম্ভুনাথ ঘোষ, সন্তোষবাবুকে চাকরি থেকে জবাব দেন, যাত্রা দলে নারী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য মহিলারা আসছেন বলে। আবার সন্তোষবাবুকে দ্ররিদ্র্যের মধ্যে পড়তে হয়। কাঁকিনাড়ার ঘরে তখন নাবালক সন্তানদের মুখে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত তুলে দেবার সামর্থ্য নেই। আকস্মিকভাবে দেখা হয় শক্তিমান অভিনেতা বিমল লাহিড়ীর সঙ্গে। তাঁর আন্তরিকতায় নব অম্বিকার কর্ণধার ও স্বনামখ্যাত অমিয় বসুর করুণায় চাকরি পান সন্তোষবাবু। পরে ২ বছর নব অম্বিকার ২নং দল শ্রীরাধা নাট্য কোম্পানিতে কাজ করেন। ১৩৭৬ সনে, প্রখ্যাত কৌতুক অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় সুশীল নাট্য কোম্পানি লিজ নেন এবং সন্তোষ বসুকে কাছে টেনে নেন। ১৩৮০ পর্যন্ত এই দলে সসম্মানে চাকরি করেন। ১৩৮১ সনে স্বনামখ্যাত পালাকার, অভিনেতা নির্মল মুখোপাধ্যায় ঐ দল লিজ নেন, সেই থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সন্তোষবাবু ছিলেন নির্মলবাবুর পাশে, বলা যায় নির্মলবাবুই ছিলেন সন্তোষবাবুর পাশে। ইতিমধ্যে সুশীল নাট্য কোম্পানি ত্যাগ করে নির্মলবাবু গড়েছেন সম্পূর্ণ নিজের দল 'মুক্ত অঙ্গন', বলাবাহুল্য এই দল গড়ে ওঠার পিছনে সন্তোষবাবুর শ্রমও কম ছিল না। এই দলে সন্তোষবাবুর এক পুত্র সুভাষ বসুও কাজ করেছেন।

॥ শতদল ॥

সেবার যাত্রা ছিল সোনামুড়ায়।

সোনামুড়া তখন ছিল বর্ডার লাইন। সেখানে যাত্রা শেষে সব শিল্পীরা যখন চটঘেরা গ্রীনরুমে মুখ থেকে রং কিংবা পোশাক পাল্টাতে ব্যস্ত, ঠিক তখন একটা জীপ গাড়ি এসে দাঁড়াল। বেশ কিছু লোক গাড়িতে। ওদের পরনে ছিল পুলিশের ইউনিফর্ম। গাড়ি থেকে ওরা নেমে সরাসরি ঢুকে গেল গ্রীনরুমে। শতদল রানী তখন বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, ড্রেসার শতদল রানীর বুক থেকে বক্ষাবরণী খুলতে ব্যস্ত। শতদল দেখলেন লোকগুলি বেশ ত্রস্তে এগিয়ে আসতে আসতে থমকে দাঁড়িয়ে লজ্জায় মুখটা ঘুরিয়ে নিল।

শতদল রানী ব্যাপারটা বুঝতে পেরে একটু হেসে ড্রেসারকে বললেন, কারা দেখ ত, ওদের আসতে বল।

ড্রেসার নির্দেশ পালন করল। লোকগুলি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ওরা জানতে চাইল, একটু আগে আপনাদের মধ্যে যিনি টিয়ার পাঠটা করেছেন তিনি কোথায়?

টিয়ার মাথায়, পিঠের ওপর ছড়িয়ে থাকা একরাশ ঘন কালো চুল তখন নেই, ছোট ছোট করে ছাঁটা সাধারণ চুল, কিন্তু পরনে শাড়ি, বুকে নারকেল মালার ঠুলি ; সে এক বিচিত্র বেশ! যেন অর্ধনারীশ্বর!

শতদল বলেছিলেন—আমি, আমিই টিয়া। লোকগুলির মধ্যে একজন মুখ খুলেছিল, আপনাকে স্যার ডেকেছেন—

শতদল বলেছিলেন, স্যার কে?

ওরা বললেন, এখানকার এস. ডি. ও

শতদল রানী এবার অনেকটা সঙ্কুচিত হলেন, একটা জিজ্ঞাসা তাঁকে পেয়ে বসল—এস. ডি. ও-র তলব কেন!

সে জিজ্ঞাসার উত্তর ওরা দিতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত যে হেতু এস ডি ও-র তলব সেই হেতু মেকআপ তুলে, শাড়ি ছেড়ে ধুতি পরে শতদল ওদের সঙ্গ নিলেন।

সরাসরি এস. ডি. ও-র বাংলো। শতদল বাংলোয় যেতে মহামান্য এস. ডি. ও বলেছিলেন,—আমি যা বলেছি এখন দেখছি তা মিলল না, সুতরাং এই আমার কড়কড়ে একশ টাকা উপহার।

আসলে স্থানীয় মাঠে 'চণ্ডীমঙ্গল' পালায় নায়িকা টিয়াকে দেখে এস. ডি. ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বাজি ধরেছিলেন। এস. ডি. ও বলেছিলেন টিয়া চরিত্রে যে অভিনয় করেছে সে মহিলা শিল্পী, কিন্তু তাঁর স্ত্রী বলেছিলেন, সে পুরুষ। শতদলকে একেবারে হাতের মুঠোয় পেয়ে বিস্ময়ে শুধু হতবাকই হননি, ডেকে পাঠিয়েছিলেন স্ত্রীকে। আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন শতদলের সঙ্গে। তারপর একশ টাকা বাজিতে হেরে গিয়েছিলেন।

এমন ধরনের অজস্র স্মৃতি নিয়ে আজও শতদল রানী ওরফে সুনীলকুমার মাইতি বেঁচে আছেন এই সর্বাধুনিক যাত্রা সংসারে। হাওড়া জেলার বাগনানের খালোড় গ্রামের অতি সাধারণ মানুষ গণেশচন্দ্র মাইতির ছেলে সুনীল। পুরোপুরি জ্ঞান লাভের আগেই হারিয়ে ফেলেন তাঁর বাবা-মাকে। ভাগ্যবিড়ম্বিত সুনীলকে তাই অতি অল্প বয়সে বেছে নিতে হয় জীবন ধারণের পথ। পঞ্চাশের দশক তখন পুরোপুরি যাত্রায় পুরুষের নারী চরিত্রে অভিনয়ের যুগ। এ যুগের জ্যোৎস্না দত্ত, ছন্দা চ্যাটার্জী, বীণা দাশগুপ্ত, বেলা সরকার, প্রমুখ ডাকসাইটে মহিলা শিল্পীদের মত তখন যাত্রায় সন্তোষ রানী, উপেন রানী, নিতাই রানী, ছবি রানীদের যুগ, তার মধ্যে ননীবাবুর মিনার্ভা অপেরায় বেশ কিছুটা তালিম নিয়ে, পরে সুকুমার মণ্ডলের রয়েল বীণাপাণি অপেরায় এসে যে

সুনীল মাইতি শতদল রানীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন সেই শতদল একটানা বহুদিন দাপটের সঙ্গে বহু পালার নায়িকা চরিত্রে রূপদান করে, যাত্রার একটি যুগকে ধরে রেখেছিলেন।

শতদল রানীর প্রথম পেশাদার অভিনয় অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়ের 'রঘু ডাকাত' পালায় সুজাতা চরিত্রে।

এই পালায় নামভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন সে যুগের আশ্চর্য রকমের সুদর্শন নট রূপকুমার। রূপকুমার সে যুগে শুধু সুদর্শন নট ছিলেন না, ছিলেন প্রকৃত খ্যাতিমান। আজকের নিউ রয়েল বীণাপানি অপেরার কর্ণধার নারায়ণ ভট্টাচার্যই ছিলেন এই রূপকুমার। রূপকুমারই তাঁর নাম রেখেছিলেন শতদল। সুনীল মাইতি রং চড়ালেই শতদলের মত হয়ে যেত বলেই রূপকুমার বোধকরি তাঁর নাম রেখেছিলেন শতদল। যাত্রা জগতের দিক্‌পাল অভিনেতাদের সঙ্গে কখনও কুমারী কন্যা, কখনও প্রেমিকা, কখনও বধূ আবার কখনও মাতা চরিত্রে রূপদান করতে হয়েছিল শতদলকে। এই দিক্‌পাল অভিনেতাদের মধ্যে যাঁদের নাম আজকের সুনীল মাইতির স্মরণে আছে তাঁরা হলেন গুরুপদ ঘোষ, সিধু গাঙ্গুলী, সুধীর মুখার্জি, পঞ্চু সেন, ভোলা পাল, আজকের নটসম্রাট স্বপনকুমার, পান্না চক্রবর্তী, তিনকড়ি চক্রবর্তী, গোপাল চট্টোপাধ্যায়, নটসূর্য দিলীপ চট্টোপাধ্যায় এমনকি মহেন্দ্র গুপ্ত। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি সুনাম পান কোন পালায়?

শতদল ওরফে সুনীল মাইতি বলেছিলেন, নবরঞ্জন অপেরার 'চণ্ডীমঙ্গল' পালায় আজকের নটসম্রাট স্বপনকুমারের নায়িকা হিসেবে ব্রজেন দে'র আঁকা টিয়া চরিত্রে অভিনয় করার পরই আমার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল। নবরঞ্জন অপেরার 'বর্গী এল দেশে' পালায় মেহের চরিত্রে অভিনয় করে আমি বহু পুরস্কার পেয়েছিলাম ; সেই পালায় আমার নায়ক ছিলেন এমন দুজন শিল্পী যাঁরা আজ চরম খ্যাতিমান, তাঁরা হলেন স্বপনকুমার আর পান্না চক্রবর্তী। শতদলরানী অভিনীত পালা এবং চরিত্রগুলি হল, সুজাতা (রঘু ডাকাত), সুভদ্রা (সুভদ্রা হরণ), আরতি (বিদ্রোহী সন্তান), টিয়া (চণ্ডীমঙ্গল), মিনতি (খোলাঘর), সুমতি (যাদের দেখে না কেউ), সরযূর মা (চন্দ্রনাথ), রহিমা (লালন ফকির), পিসিমা (বিন্দুর ছেলে) আরও অনেক।

শতদল যে দলগুলিতে অভিনয় করেছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ; মিনার্ভা অপেরা, রয়েল বীণাপাণি, নিউ রয়েল বীণাপাণি, জীবনকৃষ্ণ দাসের নবরঞ্জন অপেরা, অনুকূল ঠাকুরের দল ধীতিশ্রী নাট্য শিল্পম্‌, গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের নিউ আর্য অপেরা, কালীপদ ঘোষের ভারতী অপেরা, মাখনলাল নট্টের নট্ট কোম্পানি।

গন্ধর্ব অপেরার ম্যানেজার সুনীল মাইতি, একদার নায়িকা, আজকের পরিত্যক্ত অধ্যায়, শতদল রোজ হিসেবে ২ টাকা মাইনেতে যে জীবন শুরু করেছিলেন ১৯৬২-৬৩ সালে সেই জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল নিউ রয়েলের 'জীবন মরণ' পালায়!

শতদলরানীকে কথা দিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় সূর্য দত্ত আর মাখনদা (নট্টের কর্ণধার আর অভিভাবক) যাত্রায় মহিলাদের আসার যতই পদধ্বনি শোনা যাক, আমরা ঐতিহ্য বজায় রাখব, সুতরাং ভয় নেই! কিন্তু কালের বিবর্তনে ওঁরা কথা রাখতে পারেন নি। "এক সর্বনাশা পরিস্থিতি যখন আমার অস্তিত্বটুকুকে গ্রাস করতে আসছিল, তখন আমার প্রথম জীবনের নায়ক রূপকুমার, আমার পরবর্তী জীবনের ধারক নারায়ণ ভট্টাচার্য আমাকে টেনে নিলেন তাঁর দল নিউ রয়েলে, বললেন, আর হাল ধরে রাখা যাবে না সুনীল, বিবর্তনের ঝড় আসছে—তোমার নৌকা ডুববেই, সুতরাং এখন থেকে সামাল হও—যতক্ষণ পার অভিনয় কর, সেই সঙ্গে শিখে নাও ম্যানেজারীর কাজটা ; জীবন মরণ পালায় অভিনয় করছি হঠাৎ ঝড় এসে সব ওলটপালট করে দিল। তারপর থেকে এই ভাবে চলছি! এক টুকরো মোচার খোলার মত ভাসতে ভাসতে চলছে এই জীবন।" আরও একটা স্মরণীয় ঘটনা আছে শতদল ওরফে সুনীল মাইতির জীবনে। যে ঘটনাটি এখানে

উল্লেখ না করলে এক যাত্রা শিল্পীর সঠিক মূল্যায়ন হবে না। হাওড়া জেলার বাগনানে শতদল একবার অভিনয় করছিলেন আসরে। অভিনয় দেখে একটু বেশি মাত্রায় মুগ্ধ হওয়া একজন বিশিষ্ট মহিলা এলেন গ্রীনরুমে আলাপ করতে। এসেছিলেন নায়িকার অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে অভিনন্দন জানাতে। যখন মহিলার সঙ্গে শতদলের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো, যখন ভদ্রমহিলা জানতে পারলেন শতদল পুরুষ তখন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বলেছিলেন—ম্যানিলার বাঙালি মহলে আপনার কথা বলব—; মহিলা ম্যানিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপিকা। এখানে বোধ করি এসেছিলেন আত্মীয়তা সূত্রে বাগনানের কোন বাড়িতে। এখন শতদল চিৎপুরের একজন দল ম্যানেজার।

॥ ক্ষিতীশ রানী ॥

আসল নাম ক্ষিতীশ বিশ্বাস। ইনিও বর্তমানে আর পাঁচজন যাত্রা কর্মীর মত যাত্রা দলে জড়িত। কিন্তু এক সময়ে এই ক্ষিতীশ রানীর অভিনয় জাদুতে যাত্রার আসরগুলো সত্যিই মেতে উঠত। ক্ষিতীশবাবু পুরুষের পোষাক বদলে যখনই নারীর রূপসজ্জায় নিজেকে সাজাতেন তখন সর্বদিক দিয়ে তিনি হয়ে উঠতেন নারী। মাত্র ষোল বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগী হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছিলেন বাঁচার তাগিদে। যেন তেন একটা চাকরি জোগাড় করে নেওয়া ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। এইভাবে একদিন বেথুয়াডেহারীতে এক সন্ধ্যায় রয়েল বীণাপাণির যাত্রা দেখতে গিয়ে তৎকালীন ম্যানেজার বিজয় মিত্রের সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি দলের সঙ্গে ক্ষিতীশকে নিয়ে আসেন কলকাতায়। হঠাৎ দল ভেঙে যাবার জন্য বিজয় মিত্র তাঁকে নিয়ে যান মাষ্টারমশাই, ডাকসাইটে অভিনেতা শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। কিছুদিন শশাঙ্কবাবুর কাছে অভিনয়ে তালিম নেন ক্ষিতীশ। এরপর সুযোগ পান অভিনয়ে। 'শক্তিপূজা' পালায় কুমারী বৈশালিনী চরিত্রে প্রথম অভিনয় করার সুযোগ পান। এরপর সত্যম্বর অপেরার 'পাষাণের মেয়ে' পালায় গৌরীর ভূমিকায় অভিনয় করে সবাইকে মুগ্ধ করেন। বিশেষ করে পঞ্চকোটের মহারাজা শঙ্করী মহারাজ তাঁর অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে একটি ছবি তুলে সেই ছবি টাঙিয়ে রেখেছিলেন প্রাসাদে। গৌরীপুরের রাজা প্রকৃতীশ বড়ুয়া ক্ষিতীশের অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে উপহার দিয়েছিলেন 'সোনার মেডেল'। শুধু তাই নয়, রাজবাড়ির বাগানে হাতির পিঠে চড়িয়ে বিশেষ অতিথির সম্মান দিয়েছিলেন।

॥ চপল রানী ॥

স্বনামধন্য অভিনেতা তারাকুমার ভাদুড়ী ও স্বনামধন্যা অভিনেত্রী প্রভা দেবীর ছেলে এই চপলরানী ওরফে চপলকুমার ভাদুড়ী। আজকের শক্তিময়ী শিল্পী কেতকী দত্তের ভাই এই চপল ছেলে বেলা থেকেই বাড়ির পরিবেশের প্রভাবেই হোক, রক্তের টানেই হোক নাচ-গান এবং অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। ছেলেবেলায় মায়ের শাড়ি পরে, মাথায় গামছা দিয়ে মেয়ে সাজার খেলা ছিল তাঁর। মা প্রভা দেবীর অভিনয়ই চপলকে অভিনয় জীবনে চলে আসার প্রেরণা জোগাত। এই সময়ে ওঁদের বড় জামাইবাবু চাকরি করতেন ইস্টার্ন রেলে। স্টাফ রিক্রিয়েশান ক্লাবের 'আলিবাবা' নাটকে 'মর্জিনা' চরিত্রে সেই জামাইবাবু এবং অন্যেরা ভালবেসে চপলের প্রথম অভিনয় জীবনের সূচনা করেন। এরপর চাকরিও পেয়েছিলেন। দু'বছর পর ছাঁটাই হবার জন্য চপল এ্যামেচারে অভিনয় করতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে ভূমেন রায়ের স্ত্রী রেণুবালা সুখের ছেলে সুব্রত আর এই বাড়িতেই থাকতেন বনফুল এবং বিমল। এঁরা স্ত্রী চরিত্রে খুব পরিচিত শিল্পী হয়ে উঠেছিলেন। সেই সূত্রে বনফুলের সহযোগিতায় চপল সুযোগ পান নট্ট কোম্পানিতে নারী চরিত্রে অভিনয়ের। এই দলের 'রাজা দেবীদাস' পালায় অঞ্জনার চরিত্রে প্রথম চপলের আত্মপ্রকাশ। সম্ভবতঃ নট্ট কোম্পানির পুরুষ-রানী যুগের অবসান চপলের শেষ অভিনয় দিয়ে। জীবনে অনেক পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। পূজা অর্চনায় চপলের বরাবরই মন ছিল। সেই সূত্রে তিনি অভিনয় জীবন থেকে সরে গিয়েছেন বলা যায়।

॥ ফণি রানী ॥

১৩৩০ সনের ৭ আশ্বিন, হুগলী জেলার কোন্নগরে ফণি রানী ওরফে ফণি ভট্টাচার্য জন্মান। নারী চরিত্রে ছেদ টানেন ১৩৭০ সনে নট্ট কোম্পানিতে থাকাকালীন। বর্তমানে ফণিবাবু পুরুষ চরিত্রে রূপদান করে খ্যাতি বজায় রেখেছেন। ফণিবাবুর বাবা উত্থানপদ ভট্টাচার্য ছিলেন কোন্নগরে ধন্বন্তরি কবিরাজ। মরা-বাঁচার দিনক্ষণ অনায়াসেই বলে দিতে পারতেন। এই বর্ধিষ্ণু পরিবারের দশম সন্তান ফণিবাবু, বড়দার (কোন্নগর হাই স্কুলের শিক্ষক) প্রেরণায় অভিনয়কে পাথেয় করেন। ক্লাশ নাইনে পড়তে পড়তে ফণিবাবু চাকরিতে ঢোকেন। স'ওয়ালেসের স্টোর কীপারের চাকরি করতে করতে চিৎপুর যাত্রাপাড়ায় ঘুরে বেড়াতেন। একদিন তাঁকে অভিনয় করার সুযোগ দেন সত্যম্বর অপেরার কর্ণধার গৌর দাস। ফণিবাবু প্রথম অভিনয় করার সুযোগ পান শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'দক্ষযজ্ঞ' পালায় 'শচীর মা' এবং 'কমলে কামিনী' পালায় 'চণ্ডী' চরিত্রে। আসরে অবতীর্ণ হয়েই সাজা নারী ফণি রানীর খ্যাতি লাভ। সত্যম্বর অপেরার পর প্রভাস অপেরার 'চন্দ্রশেখর'-এ ম্যালকমের সঙ্গে অভিনয় করেন। এরপর গণেশ অপেরার 'পৃথ্বীরাজ'-এ 'মেঘা' চরিত্রে অভিনয় করে ফণি রানী জনপ্রিয়তার শিখরে যান। ওঁর অভিনয় দেখে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন—"এ চরিত্র original"। ষ্টার থিয়েটারে যুক্ত ইন্দুবালা বলেছিলেন—"কোন নারী বোধ হয় এ ভাবে রূপ দিতে পারবে না"। তারপর আর্য অপেরার পালা, জিতেন বসাক রচিত, নীতিশ মুখার্জী অভিনীত 'কংস' পালায় 'মায়ের' চরিত্রে অভিনয় করে ফণিবাবু আসেন নট্ট কোম্পানিতে। নট্ট কোম্পানির তৎকালীন ম্যানেজার বা সর্বেসর্বা সূর্য দত্ত মশাই ফণিরানীকে নট্টতে সুযোগ দেন। অভিনয় করেন ব্রজেন দে রচিত 'দেবীদাস' পালায়। নির্মল অধিকারী হয়েছিলেন রাজা আর 'সর্বজয়া' হন ফণি রানী। অসামান্য ফণি রানীকে আগরতলার রাজা নিজে হাতে মানপত্র তুলে দিয়েছিলেন। 'মেজ বৌ' চরিত্রে ছিলেন চপল রানী (চপল ভাদুড়ী), সুজিত পাঠক ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের পরবর্তী ভরত বিদায় (মহুয়া), বিদ্যাসাগর (ভগবতী) বিন্দুর ছেলে (অন্নপূর্ণা), সিরাজদ্দৌলা (ঘসেটিবেগম) ইত্যাদি পালা ও চরিত্রে যথাক্রমে অরুণ দাশগুপ্ত, মহেন্দ্র গুপ্ত, কমল মিত্র, সরোজকুমার দের মত শক্তিমান শিল্পীদের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। রবীন্দ্রসদনে বিন্দুর ছেলের অন্নপূর্ণাকে দেখে কানন দেবী-মলিনা দেবী বলেছিলেন—"আমরা অভিভূত"। বিকাশ রায় মুগ্ধ হয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। শান্তিনিকেতনে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু সম্পূর্ণ পালা দেখে (৭ পৌষ) প্রশংসা করেছিলেন। ফণি রানী মেয়েদের মত নাক ছিদ্র করে যেমন 'নাকছাবি' পরতেন তেমনি কানে ছিদ্র করে পরতেন দুল। ৩২ ভরির আসল সোনার গয়না পরে ফণি রানী আসরে নামতেন। 'আমি রীতিমত সাধনা করেছি'—কথাটা ফণিবাবু বললেন। চলনে-বলনে কোন কৃত্রিমতা ছিল না। অনেক সময় দর্শদের মধ্যে বাজি ধরা হতো ফণি আসল না সাজা রমণী। ১৩৭০ সালে নারী চরিত্র বর্জন করে ফণি ভট্টাচার্য পুরুষ চরিত্রে রূপদান করতে থাকেন। চরম সাফল্য আসে 'ডুমনীতলার মেয়ে' পালার পাগলাবাবা ও কৌতুক চরিত্র তিনকড়ি, দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করে। এ ছাড়া প্রসাদ ভট্টাচার্যের "মায়ের পায়ে রক্ত জবা" পালায় ভণ্ড বগলা ও 'স্বামী না আসামী' পালায় ভিলেন বনবিহারী চরিত্রে রূপদান করে পূর্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। নিঃসন্তান ফণি রানী আর পাঁচজন উপেক্ষিত যাত্রা শিল্পীর মত আজও উপেক্ষিত হয়ে আছেন। তবে দূরদর্শন দীর্ঘ সময়ের এক সাক্ষাৎকার ধরে রেখেছে সেটাই সান্ত্বনা।

॥ মৃত্যুঞ্জয় রানী ॥

আসল নাম মৃত্যুঞ্জয় পাণ্ডা। ১৩৩২ সনে মেদিনীপুরের বাগনানে (পোঃ গোপীনাথপুর) পূর্ণচন্দ্র পাণ্ডার ছেলে মৃত্যুঞ্জয়ের জন্ম। মৃতুঞ্জয়ের রক্তে ছিল অভিনয়ের নেশা। বাবা ছিলেন দেশের যাত্রাদলের শিল্পী। বহু পালায় নারী চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। সেই সূত্রে মাত্র ১০ বছর

বয়সেই মৃত্যুঞ্জয়ের যাত্রায় আসা। এর মূলে ছিল দরিদ্রতা। গ্রামের স্কুলে ক্লাশ সেভেন পর্যন্ত পড়ে তাঁকে কাজে নামতে হয়। প্রায় ১৬ মাইল দূরে রাধামণি বাজার থেকে সুতো কিনে এনে গ্রামের বাজারে বিক্রি করার কাজ করতে হতো তাঁকে। এরই মধ্যে গ্রামের লোহিত অপেরা, শ্রীচরণ ভাণ্ডারী অপেরাতে জুড়ির দলে কাজ করতে থাকেন বালক মৃত্যুঞ্জয়। ভিত্ শক্ত হতে থাকে। বাবার উৎসাহ ও শিক্ষা মূলত মৃত্যুঞ্জয়ের সম্পদ। ভাল নাচতে পারতেন তিনি। তখন যাত্রা গানে নারী চরিত্রে ছেলেরাই অভিনয় করতেন। এক সময়ে পেশাদার যাত্রায় চলে আসেন। প্রথম জীবনে সত্যম্বর অপেরার পালা শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শক্তিপূজা'য় 'চণ্ডী', অসবর্ণা পালায় 'জাম্ববতীর মা' ইত্যাদি চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসা পান। এরপর চণ্ডী অপেরায় ২ বছর, কাঁথির ভার্গব অপেরায় ২ বছর, হুগলীর সিঙ্গুরের কালু রায় অপেরায় ৪ বছর কাজ করে যুক্ত হন সাংবাদিক কিষাণ দাশগুপ্তের নাট্যভারতীতে। তারপর নিউ আর্য অপেরা, অম্বিকা নাট্য কোম্পানিতে অফিসের কাজের সঙ্গে অভিনয় জীবন চলে তাঁর। এরপর মৃত্যুঞ্জয় দল ম্যানেজারি করেন বহু দলে, তার মধ্যে জনতা অপেরা (৩ বছর) কাজ করে, আর্য অপেরার অফিস ইন চার্জ হন। তারপর অনামিকায়। অনামিকায় ১ বছর কাজ করার পর মৃত্যুঞ্জয় আসেন গন্ধর্ব অপেরায়। এই শেষোক্ত দলে ৩ বছর থাকার পর দুলাল চট্টোপাধ্যায়ের তপোবন নাট্য কোম্পানিতে সসম্মানে ২ বছর কাজ করেন। মৃত্যুঞ্জয় অভিনীত বহু চরিত্রের মধ্যে 'রাজা লক্ষ্মণ সেন' পালায় অভিনয় করার সময় চিত্তশুদ্ধির জন্য মৃত্যুঞ্জয় নিয়মিত নিরামিষ খেয়েছেন! এই হেন মানুষটি যিনি যাত্রার জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন তাঁকেও অনেক অপমান, অনেক লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে। অনামিকা'র মালিক-অভিনেত্রী মধুশ্রী দেবী নিজে শিল্পী হয়ে একদিন এই মানুষটিকে যেভাবে আঘাত করেছেন তা ভুলতে পারেন না মৃত্যুঞ্জয়! যাত্রা এত আধুনিক সভ্যতার মধ্যে থেকেও সর্বস্তরে সম্মান না পাবার কারণ হয়তো অনেক পাপ! অতীতের মৃত্যুঞ্জয় রানী, পরবর্তীকালে অফিস ম্যানেজার মৃতুঞ্জয় পাণ্ডাকে মাঝে মাঝে কষ্ট দিত। মৃত্যুঞ্জয় "বলতেন, অতীতে যাত্রায় বহু দেবতা ছিলেন। গরীব অথচ উদার দেবতা! আজকের যাত্রায় তার অভাব।"

॥ মধু বড়াল বা মধু রানী ॥

পুরুষ হয়েও মহিলা চরিত্রে অভিনয় করে যে ক'জন সুপরিচিত হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে মধু বড়াল অন্যতম। অতীতের মনমোহন থিয়েটারের ম্যানেজার মাণিকলাল বড়ালের ছেলে মধু বড়ালের জন্ম দর্জিপাড়ায় ১৯৩২ সালে। ছেলেবেলা থেকেই থিয়েটারের নেশায় পাগল, তাই বিদ্যাভবনের ছাত্র হয়েও লেখাপড়া বেশি হয়নি। হাওড়ার কৃষ্ণাশ্রী মঞ্চে 'টিপু সুলতান' পালায় প্রথম অভিনয় করেন। এরপর নিজেরাই শুকতারা নাট্যসমাজ গড়ে নিয়মিত অভিনয় করতেন। 'বসুধারা' পালায় বিজয়া চরিত্রে অভিনয় করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এরপর জড়িয়ে পড়েন চোরবাগানের ঠিকে দল হিসেবে চিহ্নিত তরুণ অপেরায়। এখানে কিছুদিন কয়েকটি পালায় মহিলা চরিত্রে অভিনয় করে মধু বড়াল প্রথমে আদি ভোলানাথ ও পরে যুক্ত হন সত্যম্বর অপেরায়। এই প্রতিষ্ঠানে ছয় বছরে রায়বাঘিনী, ধূলার স্বর্গ, সোনাইদীঘি ইত্যাদি পালায় মহিলা চরিত্রে যশের সঙ্গে অভিনয় করেন।

এরপর আরও কয়েকবার দল পরিবর্তন করে শৈলেনবাবুর সহযোগিতায় ম্যানেজারি পান সত্যম্বরের। এখানে অভিনেতা মোহন চ্যাটার্জীর সঙ্গে আলাপ। সেই সূত্রে ১৩৮১ সনে মধু বড়াল মোহনবাবুর দক্ষিণ হস্ত হিসেবে জড়িয়ে পড়েন নবগঠিত মোহন অপেরায়। এই কর্মজীবনে দীর্ঘকাল থেকে মধু বড়াল নিজে যাত্রা দল গঠন করেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন যুগযাত্রা।

॥ জনার্দন রানী ॥

আসল নাম জনার্দন নন্দী। যাত্রার বিখ্যাত গায়ক রাইমোহন দেবনন্দীর এই ছেলের জন্ম

বরিশালের আগলপাশায়। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে জন্ম। পাঁচ বছর বয়সে মাতৃহারা জনার্দন আর তাঁর ছোটভাই ও দুটি বোন বাবার স্নেহছায়ায় গড়ে উঠেছিলেন। খুব ছেলে বেলা থেকেই জনার্দনের ভাল গানের গলা হয়তো পিতৃরক্ত সূত্রে প্রাপ্ত। বাবা তাই শুধু এই ছেলেকে শিক্ষাই দেন না, নিজে সঙ্গে করে বালক জনার্দনকে নিয়ে যান মুকুন্দ দাসের কাছে। শ্রীদাস তাঁর একানে দলে শিশু চরিত্রে অভিনয়ের জন্য সুযোগ দেন। এই সময়ে মাঝে মাঝে ইংরেজ পুলিশের অত্যাচার হতো। দলে রেড্ হতো। এক বছর মুকুন্দ দাসের সান্নিধ্যে থাকার পর ঐ কারণেই জনার্দন ফিরে আসেন। তারপর ৫ বছর বাবার সঙ্গেই কৃষ্ণ যাত্রা, রাম যাত্রা, রয়েনি গান (মনসার জন্ম থেকে বেহুলা লখীন্দর) গেয়ে চলে তাঁর। সুযোগ পান বরিশালের লেডি কোম্পানিতে। প্রকৃতপক্ষে এখানে তৎকালীন স্বনামধন্য অভিনেতা গণেশ গোঁসাই বালক জনার্দনকে অভিনয়ে শিক্ষা দেন। ১৩৪৭-এ অর্থাৎ ১৯৪০-সালে মহেন্দ্র মাষ্টারের ভোলানাথ অপেরায় বালক চরিত্রে একাধিক পালায় অভিনয় করেন। সরষে বাড়িতে অভিনয় চলাকালীন দলের ওপর রেড্ হয়। এরপর একজন প্রাক্তন মিলিটারীম্যানের পরামর্শে 'মিলিটারী ডান্স পার্টী'তে ঢুকে পড়ে এই দল। জনার্দন তখন ক্যাম্পে ক্যাম্পে দলের সঙ্গে গেয়ে-নেচে ফেরেন। হিরোসিমায় বোম পড়ার তোড়জোড় চলছে জেনে দল বন্ধ হয়। এরপর প্রভাত দে'র (ইনি শক্তিমান অভিনেতা দানীবাবুর মেক-আপ ম্যান কাম প্রম্পটার ছিলেন) প্রভাত অপেরায় সুযোগ পান। মাইনে তখন ২৫ টাকা। কিন্তু অভিনয় শেখার জন্য ৫ টাকা কম পেতেন বালক জনার্দন। এরপর ডানকুনির বঙ্কিমবাবুর গণেশ অপেরায় আসেন প্রখ্যাত অভিনেতা বড় ফণি গাঙ্গুলীর সহযোগিতায়। এখানে ১ বছর থেকে দেশে ফেরেন। তারপর আবার চণ্ডী অপেরায়। চণ্ডী অপেরার মালিক ছিলেন বিপিন জ্যোতিষশাস্ত্রী, যাঁর নবগ্রহ পঞ্জিকা বিখ্যাত। কুমারটুলিতে যাঁর নবগ্রহ মন্দির। প্রসঙ্গ ক্রমে জনার্দন জানালেন—এই দলেই জ্যোৎস্না দত্তের প্রথম আবির্ভাব। জ্যোৎস্নার আগে এমন একজন মহিলা শিল্পী ছিলেন যিনি তৎকালে দল তৈরি করেন। ইনি হলেন বীণা ঘোষ। স্বনামধন্য কৌতুক শিল্পী রঞ্জিত রায়ের ছাত্রী—

বছর কাটেনি। জনার্দন অভিনয়ের সুযোগ পান অতুলকৃষ্ণ বসুমল্লিকের আর্য অপেরায়। দলের ম্যানেজার তখন কালিপদ বিশ্বাস। এখানে মাইনে কমে গেল। ৬০ টাকার জনার্দন হলেন ৩০ টাকার। কিন্তু এখানে জনার্দন 'মায়ের দেশ' পালায় কঙ্কাবতী চরিত্রে অভিনয় করেই বিখ্যাত হন। ওঁর বাবা তখন আর্যতে জুড়ি বাজাতেন। আর্যতে থাকাকালীনই মারা যান। বাবার মৃত্যুর পর বিভিন্ন দল ঘুরে আর্যে এসে 'রামপ্রসাদ' পালায় "কালী" রূপে অবতীর্ণ হয়ে আসাম-বিহার এমনকি দিল্লীতেও চরম প্রশংসা পান। যখন আরামবাগে ভারতী অপেরার জন্ম জনার্দন সুযোগ পান সেখানে। এই ভারতীর মালিক কালিপদ ঘোষ ছিলেন আরামবাগের রায় কোম্পানির ম্যানেজার। প্রকৃতপক্ষে কালিবাবুকে দল করতে অনুপ্রাণিত করেন ননী ভট্ট, জনার্দন, রবীন মজুমদার। জানকী মেন্দা তখন জানকী রানী। রাম পাত্রের আর্থিক সহায়তায় ভারতী তৈরি হয়। পরে আরামবাগের ভারতী আসে শোভাবাজারে সেই সময়ে নিতান্ত দুস্থ অবস্থার মধ্যে বিয়ের ব্যবস্থা পাকা হয় জনার্দনের। বিয়ে করেন সান্ত্বনা দেবনন্দীকে (বেলা)। হারান নট্টের ছোট মেয়ের সঙ্গে জনার্দনের স্ত্রী বেলার বড়দার বিয়ে হয়। সেই সূত্রে শরৎ নন্দীর ঘটকালিতে এই বিয়ের দিন ক্ষণ যখন স্থির, এমনি একটা দিন কালিপদ ঘোষ আর তাঁর ফিনানসিয়ার রাম পাত্র আসেন জনার্দনের কাছে। দলে তাঁকে নেবেন, ২ হাজার টাকা অগ্রিম দেবেন কথা হয়। তারপরই হরিগোপাল রানী নট্ট কোম্পানি ছাড়ায় কালিবাবুরা তাঁকে নেন, জনার্দন বাদ। আকাশ ভেঙে পড়ে মাথায়। বিয়ের পর মর্মান্তিক বিপন্ন হন জনার্দন। এমন কি বিয়ের পর ৭।৮ মাস তাঁকে গৃহহারা থাকতে হয়। তারপর থেকে যুদ্ধ আর যুদ্ধ। ২০।২৫ বছর একটানা নারী চরিত্রে অভিনয় করেন। নট্ট কোম্পানির 'বিদ্যাসাগর' পালায় দিনমনি চরিত্রে জনার্দনের শেষ নারী সাজা। প্রথম পুরুষ চরিত্রে অবতীর্ণ হন নিউ রয়েলের

"বিষ্ণুপ্রিয়া" পালায় হরিদাসের চরিত্রে। রেডিওতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র প্রথম নিউ রয়েলের "রক্তে রাঙ্গা মাটি" ব্রডকাস্ট করেন। অভিনয় আর গান গেয়েছিলেন জনার্দন। ১৩৬১ সনে, অর্থাৎ ১৯৫৪ সালে জনার্দন নন্দী ওরফে জনার্দন রানী নিজে যাত্রা দল তৈরি করেছিলেন। স্বয়ং শিশিরকুমার ভাদুড়ী সেই দলের নামকরণ করেন শ্রীনাট্য নিকেতন। সাংসদ মাননীয় হীরেন মুখার্জী এই দল নিজে রেজিস্টার্ড করে দেন। আইডেনটিটি কার্ড, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, মেডিক্যাল সব কিছু পালার শিল্পী ও কর্মীদের জন্য থাকবে সেই আদর্শ দেখাতে গিয়ে তাঁর সর্বনাশ হয়। সর্বজন শ্রদ্ধেয়া কেতকী দত্ত '৯৬ সনে কলকাতা দূরদর্শনের ফিল্মে আধ ঘণ্টার সাক্ষাৎকার-স্মৃতিচারণ মূলক অনুষ্ঠানে ধরে রাখেন ফণি রানী (ফণি ভট্টাচার্য), সত্য পাঠক আর জনার্দনকে। যদিও দুই ছেলে আর এক মেয়ে নিয়ে সস্ত্রীক ভাল আছেন এই শিল্পী, তবুও এখনও যাত্রার চাকরি থাক বা না থাক শীতলার গান গেয়ে বেড়ান। এক টুকরো ঘরে দিন চলে যায়।...এই জনার্দন রানীকে নিয়েও অনেক রসালো ঘটনা ঘটেছে এক সময়ে!

॥ টগর রানী ॥

যাত্রার আসরে নারী চরিত্রে অভিনয় করে যাঁরা একদিন আশাতীত খ্যাতিলাভ করেছিলেন, যাঁরা যাত্রার পুরাতন ধারা ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসেবে মূলত যাত্রার জন্যই জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কালিপদ মণ্ডল একজন। যিনি টগর রানী হিসেবে খ্যাতিও পেয়েছিলেন যথেষ্ট। এই সব ডাকসাইটে নারী চরিত্রাভিনেতারা পুরাতন যাত্রাকে নতুন যুগের দুয়ারে পৌঁছে দিয়ে প্রকৃতপক্ষে দুয়োরানী হয়ে যাবার পর, নব্যকালের রানীরা বোধ করি সেই সাজা রানীদের অবদানের কথা কোনদিন স্মরণ করেননি। সেই পুরাতন ঐতিহ্যের প্রতি আজ আর কারও বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নিবেদিত হয় না। হবে না জেনেই টগর রানীদের কোন ব্যথা নেই। ভাবনা নেই। ভাবনা শুধু বাঁচার। সেই বাঁচার তাগিদে ওঁরা শুধু বেঁচে আছেন। কালিপদ মণ্ডল ওরফে টগর রানী ১৩৮৬ সনে পশ্চিম দিনাজপুরের জেলাশাসকের হাত থেকে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার গ্রহণ করেছিলেন যাত্রা উৎসবের আসরে, সেই তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যাত্রাগানের দালালি করেছেন দীর্ঘ কয়েক বছর। বায়না করিয়ে কমিশন পাওয়াকে যাত্রার পরিভাষায় বলে দালালি। কিশোরীমোহন মণ্ডলের ছেলে কালীপদের জন্ম ১৩৪৬ সনের ৯ শ্রাবণ বাংলাদেশের পূর্ব দিনাজপুরের চড়কাই দুর্গাপুর গ্রামে। লেখাপড়া করেছিলেন অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত।

গ্রামের সখের যাত্রা দলে "বন্দীর ছেলে" পালায় প্রথম অভিনয়। প্রথম চরিত্র, রাজনন্দিনী। ভাল নাচতে পারতেন তিনি। শিখেছিলেন গ্রামের রমণীমোহন সরকার আর সূর্য সাহার কাছে।

পুরনো আর্য অপেরায় প্রথম পেশাদার শিল্পী হিসেবে যোগদান করে "সতীর স্বর্গ" এবং "ধর্মের বলি" পালায় যথাক্রমে সতী ও দৌলতউন্নেসা চরিত্রে অভিনয় করেন। অভিনয় করেছেন নারী চরিত্রে অতুলকৃষ্ণ বসুমল্লিকের আর্য অপেরা, কুণ্ডু কোম্পানি, রয়েল বীণাপাণি, নটবাণী, চিত্তরঞ্জন অপেরা, তপোবন নাট্য কোং-এ।

॥ রাখাল রানী ॥

"প্রসঙ্গ যাঁকে নিয়ে, তিনি "রাখাল রানী", যাত্রা জগতের প্রবাদপুরুষ রাখালচন্দ্র দাস। যাঁর "অভিনয় দেখার জন্য গ্রাম গ্রামান্তর থেকে মেঠো মানুষেরা পেট্রোম্যাক্সের আলোয় পতঙ্গের মত এসে ভিড় করেছে—যাঁর সামান্য হাসিতে পুরুষের বুকের রক্ত উদ্দাম হয়ে উঠেছে, বাঙলার যাত্রা যাঁকে ছাড়া সম্পূর্ণ নয়—"

মাত্র ১৭ বছর বয়স থেকে ৪৩ বছর বয়স পর্যন্ত একটানা খ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন রাখালবাবু। যখনই যাত্রার জাহাজ মাস্তুলে নতুন হওয়া লাগতে শুরু করে রাখালবাবু স্বেচ্ছায় অবসর নিয়েছিলেন, আর ফেরেননি যাত্রায় নতুন কোন রূপ নিয়ে। রাখাল রানীর অভিনয় দেখে

দর্শকরা তাঁকে যেমন মালায় মালায় ভরিয়ে দিয়েছিল, তেমনি বহু পুরুষ বিকৃতির প্রভাবে, আসল নারী ভেবে অনেকবারই লোভের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল স্পর্শ করার আকাঙ্খায়। উঃ চব্বিশ পরগণার ইছাপুরে রাখাল রানীর স্মৃতি পূজা নিয়মিত করেন, তাঁর স্ত্রী লাবণ্যপ্রভা, পুত্র বাবুলাল।

॥ বাবলি রানী ॥

এক সময়ে, বাবলি রানী যদি দিনের বেলায় রূপ বদলে নিউমার্কেটে আর পাঁচজন বড়লোকের বা বড় বাড়ির বৌদের সঙ্গে গা লাগিয়ে মার্কেটিং করতেন, অথবা কোন অফিসে টেলিফোন অপারেটর হয়ে বসতেন বোধকরি পাশের সহকারী অথবা বড়বাড়ির বৌদের ঈর্ষাকাতর চোখের দৃষ্টিতে তাঁর হাসিই পেত! মেয়ে সেজে প্রকৃতীশ হাসলে অনেক মেয়ের হাসি ম্লান হতো একদিন। মেয়ে সেজে কোন পালায় প্রেম করলে দর্শকদের মধ্যে অনেক পুরুষের বিকৃত মানসিকতার প্রকাশ ঘটত! এমনি অবিশ্বাস্য হয়ে উঠত প্রকৃতীশ ভট্টাচার্য ওরফে বাবলিরানীর মেকআপ নেওয়া রূপ! বাবলিরানী যে পালায়, দর্শকের ঢল নামত সেই আসরে। যেমন নামত ছবিরানীর ক্ষেত্রে। আরও অনেকের ক্ষেত্রে। প্রখ্যাত অভিনেতা বড় ভোলা পাল তাঁকে যাত্রায় এনেছিলেন। সত্যম্বর অপেরার 'চাঁদের আলো' পালায় মঞ্জরী চরিত্রে প্রথম অবতীর্ণ হয়ে মানুষের মন জয় করেন। তারপর থেকে বহু পালার বহু নারী চরিত্র তাঁর অভিনয়ে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরার 'রঘু ডাকাত' পালার সুজাতা, তরুণ অপেরার 'জালিয়াত' পালায় কাদম্বিনী, নট্ট কোম্পানির 'প্রতিশোধ' পালার চামেলী চরিত্রে তাঁর অভিনয় আজও বহু প্রবীণের যৌবনের যাত্রা দেখার স্মৃতিতে উজ্জ্বল। জনতা অপেরার 'দোষী কে' পালায় 'মল্লিকা' বাবলিরানীর স্মরণীয় চরিত্র চিত্রণ। যুবতী থেকে প্রৌঢ়া সব চরিত্রে বাবলিরানীর অভিনয় স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

টাটার বিষ্ণুপুরে নট্ট কোম্পানির 'প্রতিশোধ' পালায় চামেলী দেখে দর্শকদের মধ্য থেকে তাঁকে সোনার মেডেলে সম্মানিত করা হয়েছিল। বারাকপুরে কটন মিলে 'জালিয়াত' পালায় স্মরণীয় অভিনয় করার জন্য নগদ টাকা ও মানপত্রে বাবলিকে সম্মানিত করা হয়েছিল। বাবলি বলেছিলেন, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বনগাঁর শ্রীপল্লীর এক দরিদ্র শিক্ষকের দেওয়া ও লেখা ছোট্ট মানপত্র—

খিদিরপুরের ওয়াটগঞ্জে একবার বাবলিরানীকে নিয়ে একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। রয়েল বীণাপাণির 'রাঠোর বিপ্লব' পালায় অভিনয়ের আগে প্রকৃতীশ ভট্টাচার্য যখন মেকআপ নিয়ে বাবলিরানী হয়ে উঠেছিলেন, তখন স্থানীয় থানার ও. সি. তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করে ছিলেন, মেয়েটি আসল না নকল নিয়ে। শো শেষে ও. সি. সদলবলে মেকআপ রুমে এসে বিস্মিত হন এবং বাবলিকে একশ টাকা দিয়ে অভিনন্দন জানান।

॥ হরিপদ রানী ॥

যাতেই হাত দিয়েছেন তাই সোনা হয়েছে এক সময়ে। যার সঙ্গে একবার কথা বলেছেন বা মিশেছেন তারই শ্রদ্ধা আর ভালবাসা পেয়েছেন। মোদ্দা কথা, যাত্রা জগতে দ্বিতীয় হরিপদ বায়েনের জন্ম হয়নি আজও। আসরের রানী থেকে ডাকসাইটে দল ম্যানেজার, পরিচালক হিসেবে হরিপদ বায়েনের মৃত্যু হবে না কোনদিন। মেদিনীপুরের গড়বেতার কাঁকড়াশোল গ্রামে এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে হরিপদ বায়েনের জন্ম। অতি অল্প বয়সে বাড়ির বড় ছেলে বলে সংসারের জোয়াল নিতে হয় কাঁধে। একদা গড়বেতার সুখ্যাত উচ্চাঙ্গ সংগীত গায়ক হরিপদ মল্লিক নিজে যাত্রা করতেন না, কিন্তু বালক হরিপদ বায়েনের দরিদ্রতা দেখে তাঁকে নিয়ে যান সন্ধীপুরের রাঘব সরকারের কাছে। রাঘব সরকারের সখের দলে একানে বালকের কাজ পান। এরপর হরিপদ বায়েন আসেন মথুর সাহার দলে। ওখানেও একানে দলে নেচে-গেয়ে সামান্য যা আয় করতেন পাঠাতেন ঘরে। ওখান থেকে হরিপদ যান শ্রীচরণ ভাণ্ডারীর দলে। ২।৩ বছর কাটিয়ে সোজা চলে যান

হেতেমপুরের রাজবাড়ির রঞ্জন অপেরায়। ওখানে হরিপদ বায়েন, নারী চরিত্রে রূপ দিয়ে অল্প দিনের মধ্যে হরিপদ রানীতে রূপান্তরিত হন। কয়েক বছরের মধ্যে খ্যাতি পান। নারী চরিত্রে রূপদানের সঙ্গে ম্যানেজারের আসন পান। আসেন অতুলকৃষ্ণ বসুর আর্য অপেরায়। অভিনয় করেন নট্ট কোম্পানিতে। কয়েক বছর চরম খ্যাতির সঙ্গে কাজ করে হরিপদ বায়েন হন সত্যম্বর অপেরার পরিচালক। এরপর কিষাণ দাশগুপ্ত নাট্যভারতী তৈরি করেন হরিপদ বায়েনকে পাশে নিয়ে।

যে হরিপদ বায়েনের নাম আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে লোকমুখে ঘুরে বেড়ায়, সেই মানুষটি সীমাহীন শ্রম, সাধনায় ঘর সাজিয়েছিলেন। তিন ভাইদের সঙ্গে নিয়ে মাঝে মাঝে দেশের বাড়িতে এক তৃপ্তির মধ্যে কাটাতেন। লেখাপড়া জানতেন না বলে একমাত্র ছেলেকে শিক্ষিত করেছিলেন। হরিপদবাবুর চিঠিতে দল বায়না হতো। নায়েকদের হরিপদ বায়েন ব্যবসার লক্ষ্মী মনে করতেন বলে যে যত্ন করতেন তা আজ ইতিহাস! সেই হরিপদবাবু দুর্ভাগ্যের শিকার হলেন শেষ জীবনে।

তখন যাত্রা পাড়ার পিতা স্বরূপ প্রবোধবন্ধু অধিকারী হরিপদবাবুকে দল গড়তে নানা ভাবে উৎসাহ দিলেন। চরম বিশ্বাসী বন্ধু পেয়ে হরিপদবাবু গড়লেন 'এপিক অপেরা'। কয়েক মাসের মধ্যে হরিপদ হলেন চরম ঋণগ্রস্ত! দলও ভাল চলল না। দেশের বাড়িতে গিয়ে গলায় দড়ি লাগিয়ে মারা গেলেন হরিপদ। একটা ইতিহাস শেষ হয়ে গেল। এখন তাঁর পুত্র অধ্যাপক।

॥ উপেন রানী ॥

যাত্রা ইতিহাসে ইনি সেই উপেনরানী। "জাহ্নবী" পালায় তরলা বেশ্যার চরিত্রে অভিনয় করে তিনি প্রশংসা পান।

যাত্রা থেকে পুরুষরানীদের বিসর্জ্জন দেওয়া হচ্ছে শুনেই উপেনবাবু ক্যালকাটা অপেরার ম্যানেজার হয়েছিলেন ১৯৬৮ সালের আগেই। তখন তাঁর ছিয়াত্তর বছর বয়স।

২৪ পরগণার মথুরাপুর থানার অন্তর্গত নলুয়াহাট গ্রামে তাঁর জন্ম। ১৪ বছর বয়সে প্রথম যোগ দেন গণেশ অপেরায়। এই দলে সখীর ব্যাচে তিনি নাচতেন, গাইতেন। প্রথম অভিনয় করেন ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর "কালচক্র" পালায়। ৫ টাকা মাইনে আর একবেলা খাওয়া। রাতে খাওয়ার জন্য সাত পয়সা বরাদ্দ ছিল তাঁর জন্য। "বিন্ধ্যাবলি" পালায় বলিরাজের কন্যা রাজকুমারী "পুষ্প" চরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতি পান। এরপর "আদিসুর" পালায় আদিসুরের কন্যা "লক্ষ্মী", "নরকাসুর" পালায় নরকের স্ত্রী "স্বর্গ", "কৈকেয়ী" পালায় "কৈকেয়ী", "জগদ্ধাত্রী" পালায় "প্রতিমা" ইত্যাদি চরিত্রে উপেনরানীর অভিনয় স্মরণীয় হয়।

গণেশ অপেরার পর বীণাপাণি অপেরা, ভাণ্ডারী অপেরা, আর্য অপেরা, কমল অপেরা এবং আরও বহু দলে অভিনয় করে উপেনরানী মানুষের মনের খোরাক পৌঁছে দিয়েও কিন্তু শেষ জীবনে প্রায় অনাহারেই মারা যান। ক্যালকাটা অপেরার গদিতে।

॥ শ্রীরামকৃষ্ণ অপেরা এবং বেলা সরকারের চিকিৎসা ॥

সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক স্বার্থ সিদ্ধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে যখন নতুন নতুন যাত্রা দল গড়ে ওঠার হিড়িক চলছিল, ঠিক তখন জন্ম নেওয়া শ্রীরামকৃষ্ণ অপেরা বিশেষ স্থায়িত্ব লাভ করেনি বটে, কিন্তু এই দলের স্রষ্টারা যে শুধুমাত্র মুনাফা লুঠতে চাননি, একটি বিশেষ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেই আদর্শ বা মানবিক ধর্ম পালন তাঁরা করেছিলেন, যাত্রা জগতের শক্তিময়ী অভিনেত্রী, যাত্রা শিল্পের সম্পদ স্বরূপা শিল্পী বেলা সরকারকে (বড়) ক্যানসারের করাল থাবা থেকে মুক্ত করে আনার জন্য তাঁরা বা এই প্রতিষ্ঠান এক সাহায্য রজনী উদ্‌যাপন করেছিলেন ১৯৮০ সালের ৮ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টায় সারকারিণা মঞ্চে। এই সাহায্য রজনীতে অভিনীত হয়েছিল 'সোনার চাবুক'। এই দলের কর্ণধারদের দল গড়ার পিছনে গোড়া থেকেই আদর্শ প্রতিষ্ঠার

মানসিকতা ছিল। এখানে ওঁদের সেই আদর্শের কথা তুলে ধরা যাক। শ্রীরামকৃষ্ণ অপেরার কর্ণধার, পালাকার ও অভিনেতা এম, নস্কর-এর প্রতিবেদন ঃ

"সেই ছোটবেলায় যখন বাবা, মা, ঠাকুমার সঙ্গে কেষ্ট যাত্রা শুনতে যেতাম, তখন থেকেই যাত্রা করার ও পালা লেখার স্বপ্ন দেখতাম আর ভগবানকে জানাতাম, হে প্রভু, তুমি আমার বাহুতে শক্তি দাও যেন আমি নাটক লিখতে পারি। বুকে বল দাও, যেন শিল্পী হতে পারি। হৃদয়ে ভক্তি দাও যেন শিল্পকে, সংস্থাকে ভালবাসতে পারি। আমার বিবেক অটুট রাখ, যেন শিল্পীর আদর্শ থেকে বঞ্চিত না হই। সেটা একদিন স্বার্থক হল। একদিন কিছু যাত্রা পাগল এক জায়গায় জড়ো হলাম। এবং 'মিলন তীর্থ' নামে একটি নাটক লিখলাম, প্রশংসার সঙ্গে অভিনয় করলাম। বিগত ১৩ই জুলাই ১৯৬৯ সালে ইউনিভারসিটি ইনস্‌টিটিউট মঞ্চে।

অবশেষে শ্রীকাশীনাথ শীল মহাশয়ের আর্থিক সহায়তায় আমরা শিল্পী মন নিয়ে ছোট বড় বর্ণবৈশম্যের ভেদাভেদ ভুলে এই "শ্রীরামকৃষ্ণ অপেরা" সংস্থাকে গড়ে তুলেছিলাম।" ক্যান্সারে আক্রান্ত শক্তিময়ী শিল্পীকে সাহায্য করার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেননি এস. নস্কর।

এই সাহায্য রজনীকে সার্থক করতে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের কাছে চির কৃতজ্ঞ শ্রীনস্কর।

উক্ত সাহায্য রজনী উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকায় স্বপনকুমার পুততৃণ্ড বলেছিলেন ঃ

'আজকের এই অনুষ্ঠান পরিকল্পনা করতে গিয়ে যাঁর কথা, যাঁর অভিনয়ের কথা মানস পটে ফুটে ওঠে সেই শিল্পী শ্রীমতি বেলা সরকার আজ মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে চলেছেন। শিল্পীর শিল্প চেতনা দিয়ে জীবনের সাধনা দিয়ে, বহু কৃচ্ছ্রসাধনের পর দর্শকবৃন্দকে সারা জীবন আনন্দ, হাসি, কান্নায় উদ্বেলিত করে তোলেন শিল্পী। কিন্তু সেই শিল্পীর মনের অবস্থার কথা ক'জন চিন্তা করেন, সে বিষয় যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। সেই সত্যকে আজ উপলব্ধি করে এর প্রতিকার-ব্যবস্থা গড়ে তোলার আন্দোলন শিল্পী মহলের সাথে সাথে দর্শক বৃন্দের গ্রহণ করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। আজ বেলা সরকারের সাহায্য-কল্পে এই অনুষ্ঠানই হোক শিল্পী-জগতের প্রথম পদক্ষেপ।

আমি শ্রীরামকৃষ্ণ অপেরার শিল্পীমণ্ডলীর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই। যাঁরা বিনা পারিশ্রমিকে একজন দুস্থ শিল্পীর সাহায্যে আজকের অভিনয়ে নিজেদের নিয়োজিত করছেন কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের। শ্রীকাশীনাথ শীল মহাশয়কে ধন্যবাদ যিনি কোনরূপ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য ছাড়াই তাঁর দলকে এক কথায় আজকের অনুষ্ঠানে নিয়োজিত করেছেন। প্রবোধবাবুর কাছে যে উৎসাহ পেয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করার ধৃষ্টতা আমার নাই। মহান শিল্পী ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎসাহ আমাকে অভিভূত করেছে। শ্রীমতী সবযূ দেবী আজকের অনুষ্ঠানে যোগদান করে তাঁর শিল্পীমনের যে উদারতা দেখিয়েছেন তা ভবিষ্যতে সমগ্র শিল্পী সমাজকে একতাবদ্ধ করতে সাহায্য করবে বলে আমি আশা করি। এবং সর্বশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই সুধী দর্শক মণ্ডলীকে যাঁরা ভবিষ্যতে শিল্পীর দুর্দিনে আজকের মতন তাঁদের সাহায্যের হাত প্রসারিত করে এগিয়ে আসবেন।'

এই সাহায্য রজনীতে আসরস্থ এম. নস্কর রচিত ও নির্দেশিত 'সোনার চাবুক'-এর শিল্পী তালিকা ছিল এই রকম ঃ

অভিনয়ে ছিলেন সর্বশ্রী মোহিত বিশ্বাস, কুমার বিশ্বজিৎ, স্বপন ঘোষ, এম. নস্কর, মাধব দাস, সত্যেন বাগ, তারক দাস, নেপাল সেন, আশিসকুমার, কল্যাণ রায়, মনোরঞ্জন পাল, গোপাল রক্ষিত, রীণা সরকার, ইলা দাস, বিজলী রায়চৌধুরী, শীলা সরকার, গীতা নস্কর।

॥ আর্য অপেরা এবং গোরাচাঁদ রায় ॥

যে যুগে লজ্জা, সঙ্কোচ, আলস্য কয়েক লক্ষ যুবকের মেরুদণ্ডকে ভেঙে দিচ্ছে, যে যুগে শ্রম, সাধনা, নিষ্ঠার অভাবে, আত্মবিশ্বাসের অভাবে, বেকারত্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হতে পারছে না

বাঙালি, অলস কথাটাকে সত্য করে তুলছে তাদের কাছে, আগামী প্রজন্মের কাছে এর বিপরীতধর্মী এক বাঙালীর কথা হাজির করা দরকার। আজকের যাত্রা জগতের অন্যতম প্রথম শ্রেণীর দল "আর্য অপেরা"-র কর্ণধার গোরাচাঁদ রায় সেই দৃষ্টান্ত। কাননচন্দ্র রায়ের ছেলে, কলকাতার গরানহাটায় জন্ম নেওয়া, চিৎপুরের বিখ্যাত ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে মাত্র ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়া গোরাচাঁদ ৮ বছর বয়স থেকে ভাগ্যবিড়ম্বিত। সৎ মায়ের অত্যাচারের শিকার, বাবার স্নেহ থেকে বিতাড়িত হয়ে যখন পথের ছেলের মত কাটাতো, যখন রবীন্দ্রকাননের পার্কের বেঞ্চে রাত কাটাতো তখন কতবারই পুলিশ তাকে নিয়ে গেছে থানায়। এক মুঠো ভাতের জন্য চিৎপুর আর বিডন স্ট্রীটের মোড়ের কাছে হিন্দুস্থানীর খাবারের দোকানে যে গোরাকে নগণ্য কাজ করতে হয়েছে, যে গোরাকে ভদ্রবাড়িতে চাকরের কাজ করতে গিয়ে ঘড়ি চুরির অপবাদ মাথায় নিতে হয়েছিল, সেই গোরাচাঁদকে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় দিয়েছিল ধসা। তখন যাত্রা দলে ঠেলাগাড়ির যুগ। ধসা ছিল তেমনি যাত্রাদলের ঠেলাওয়ালা। গোরাচাঁদ সেই থেকে ঠেলার যুগ শেষ হওয়া পর্যন্ত ধসার সঙ্গে ঠেলা চালিয়ে নিজেকে পুরো যুবক করল। তারপর শুরু করল যাত্রাদলের চাকরের জীবন। কয়েক বছর কাটল, এলো লরী-বাসের যুগ! কাঙালী নামের একজন তখন যাত্রায় লরী বাস ভাড়া দেবার কাজ জমিয়েছে। গোরাচাঁদের সব বোঝার মত বয়সও হয়েছে, অবশেষে গোরাচাঁদও শুরু করে সেই কাজ। ধীরে ধীরে ভাগ্য দেবতা হলেন সুপ্রসন্ন। গোরার তখন বড় হবার স্বাদ তীব্র। যাত্রাদলের মালিক হবার স্বপ্ন দেখল। তারপর একদিন ১৪ বছরের ওপর বন্ধ থাকা 'আর্য অপেরা'র মালিক অতুলকৃষ্ণ বসুমল্লিকের অনুমতি নিয়ে আর্য অপেরার নবজন্ম দিলেন গোরাচাঁদ ১৩৮৬ সনে। পুরাতন জীবন গোরাবাবুর গৌরব। গোরাবাবু কিন্তু অশিক্ষিত হলেও কোথায় যেন তাঁর একটা শৈল্পিক চেতনা ছিল, যা তাঁর গদি সাজানো, শিল্পী নির্বাচন ও পালা নির্বাচনের মধ্যে প্রথমেই প্রকাশ পেয়েছিল। গোরাচাঁদের প্রথম প্রযোজনা তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "নাগিনী কন্যার কাহিনী"। গোরাচাঁদের আর্য অপেরায় চিত্র পরিচালক পার্থপ্রতিম চৌধুরীর প্রথম আবির্ভাব। প্রথম পালার শিল্পী ছন্দা চ্যাটার্জী, সমীর লাহিড়ী, শ্যামল ঘোষ আরও অনেকে। এখন আর্য অপেরার মালিকের নেপথ্য সহযোগিতায় বকলমে আরও দু'টি দল, উমা অপেরা ও নিউ গণবাণী। উমা হলেন গোরাচাঁদের জায়া, শক্তি ও প্রেরণা। ক্যালকাটা অপেরার মালিক হরিপদ দাসের কন্যা হলেন উমা দেবী।

॥ শিবদাস মুখার্জী ॥

কিছু ওষুধের মত শিবদাস মুখার্জীর অভিনয় ও হাসি পেটেন্ট হয়ে গেছে। শিবদাসের হাসির সঙ্গে মানানসই অভিব্যক্তি দেখার জন্যও দর্শকরা টিকিট কাটে। এই অভিনেতার প্রথম আত্মপ্রকাশ অমিয় বসুর নব অম্বিকায়। এ দলের "ঝান্সীর রাণী" পালায় এক ভয়ঙ্কর কমাণ্ডারের চরিত্রে শিববাবুর প্রথম অভিনয় দেখে কেঁপে উঠেছিল দর্শক। এরপর সত্যম্বর অপেরার 'একটি পয়সা', লোকনাট্যের 'সীমান্ত' পালায় স্মরণীয় অভিনয় করেন। যাত্রায় আসার আগে চাকরিও করেছেন কিছুকাল। শিবদাস মুখার্জী অভিনীত বহু পালা আর্থিক সাফল্য পায়, তার মধ্যে "পাগলা রাজা", "সমুদ্র শাসন", "মুক্তি দীক্ষা", "খোঁড়া বাদশা", "চেঙ্গিস খাঁ" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

॥ শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

অশ্বিনী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে শ্রীনাথ ইনস্‌টিটিউশান থেকে স্কুল ফাইনাল, বিবেকানন্দ কলেজ থেকে বি. এস. সি (অনার্স) পাশ করেই শিক্ষকের চাকরি পান সাহাপুর মথুরানাথ বিদ্যাপীঠে। ছেলেবেলা থেকে থিয়েটারের তীব্র আকর্ষণ থেকেই শিক্ষক জীবন বেশিদিন বাঁচেনি। এই স্কুলেরই শিক্ষক, সাহিত্যিক বরেন গঙ্গোপাধ্যায় একদিন আলাপ করিয়ে দেন সুরকার দেবাশিস

দাশগুপ্তের সঙ্গে। সেই সূত্রে শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে যুক্ত হন "চতুরঙ্গের" সঙ্গে, পরে অসীম চক্রবর্তী তাঁর "বারবধূ" নাটকে অভিনয় করার সুযোগ দেন। এরপর জহর রায়ের সাহায্যে রঙমহল মঞ্চে 'অনন্যা' নাটকে, রামমোহন মঞ্চে "রক্ত নদীর ধারা" নাটকে অভিনয় করেন। অভিনয় করেন আরতি ভট্টাচার্য ও নিমু ভৌমিকের গ্রুপে। তারপর শম্ভু আসেন যাত্রায়। প্রথমেই "পৃথিবীর পাঠশালা" পালায় অভিনয় করে প্রশংসা পান। এরপর আর থামেননি শম্ভু! একাধিক দলে নায়ক হয়ে কাজ করতে করতে সুযোগ পান নট্ট কোম্পনিতে। এখানে একাধিক পালায় অভিনয় করেন। খ্যাতিমান হন বসন্ত চৌধুরীর সঙ্গে "ধর্ম সিংহাসন" ও "পাল্কী চলে রে" পালায় অভিনয় করে। আজও এই শিক্ষিত, মার্জিত, সংসারের সুখি মানুষটি অভিনয় জীবন সতেজ রেখেছেন।

॥ বিমল লাহিড়ী ॥

প্রখ্যাত নট ও নাট্যপরিচালক বিমল লাহিড়ীর জন্ম হালিশহরে। বাবা অমূল্যকুমার লাহিড়ীর নিতান্ত অমতেই বিমলবাবু এসেছিলেন অভিনয় জগতে। শিশির ভাদুড়ীর অভিনয় দেখে অভিনয়কে ভালবেসেছিলেন বিমলবাবু। কলেজে পড়াকালীন সেই শিশিরবাবুর অভিনয় দেখতে গিয়ে তাঁর কাছেই অভিনেতা হবার বাসনা প্রকাশ করেন এবং তাঁর কাছ থেকেই তালিম নিয়ে 'বিজয়া' নাটকে অভিনয় করার সুযোগ পান।

মাসতুতো ভাই ছিলেন অভিনেতা। তিনিই বিমলবাবুকে নিয়ে আসেন যাত্রা পাড়ায়। কমলা অপেরার সঙ্গে যুক্ত হয়ে অভিনয়ে, গানে এবং পুরুষোচিত চেহারায় সকলের মন জয় করেন। তারপর আদি গণেশ অপেরায় এসে 'লীলাবসান' পালায় অভিনয় করে প্রভূত যশ পান। এরপর পরেশ রায়ের আমন্ত্রণে আর্য অপেরায় এসে একটানা পাঁচ ছয় বছর প্রতিটি নাটকে দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেন। মাঝে বিমলবাবু কিছুদিন ভাণ্ডারী অপেরা এবং প্রভাত অপেরায় কাটিয়ে ১৯৪২ সালে যোগ দেন নেভিতে।

১৯৪৬ সালে বিমলবাবু আবার যাত্রায় ফিরে আসেন। যোগ দেন নবভারত অপেরায়। এমনি করে একের পর এক দলে যোগ দিয়ে বিমলবাবু পরশমণি, প্রতিশোধ, প্রেত মানব, ভিক্ষুরাজ, বঘুবংশ, সোহ্‌রাব রুস্তম, শয়তানের চর, বাংলার বধূ, সতীর ঘাট, চণ্ডীতলার মন্দির, জিঘাংসা, লৌহমানব প্রভৃতি নাটিকে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। বিমল লাহিড়ী অভিনয় করেছেন নব অম্বিকার বিদ্রোহী নজরুল, সাত পাকে বাঁধা প্রভৃতি পালায়।

॥ বিনোদকুমার ॥

যাত্রার কয়েক দশকের শিল্পী ইনি। ভালভাবে গান শেখার জন্য মাত্র ১১টি টাকা সম্বল করে, বিনোদ একদিন তাঁর জন্মস্থান ময়মনসিংহের সুসঙ্গ দুর্গাপুর গ্রাম ছেড়ে, সবার অজান্তে চলে এসেছিল কলকাতায়। বিনোদ যখন পথে পথে ঘুরছে ঠিক তখন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল এমন একজন মানুষের, যিনি বিনোদের জীবনে স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তিনি স্বনামধন্য অভিনেতা সুনীল মুখার্জী (রামুবাবু)। অনেকদিন আগে ময়মনসিংহের এক যাত্রার আসরে এই হৃদয়বান বিরাট মাপের শিল্পীর সঙ্গে একবার পরিচয় হয়েছিল বিনোদের। কলকাতার পথ থেকে তিনিই শেষে বিনোদকে নিয়ে গেলেন চিৎপুরে। বিনোদের একটা চাকরি জুটে গেল রয়েল বীণাপাণিতে। দর্শকদের সামনে বিনোদ প্রথম হাজির হন 'লালবাই' পালায়। যাত্রায় তখন অনেক পুরুষকেই নারী ভূমিকায় অভিনয় করতে হত। বিনোদের স্থান হল তাদেরই দলে। লালবাই পালায় বিনোদকে নাম ভূমিকায় নামতে হল বুলবুলরাণী ছদ্মনামে। বিনোদের এই নামকরণ তখন করে দিয়েছিলেন রয়েল বীণাপাণির মালিক নারায়ণ ভট্টাচার্য। এক আধ বছর নয় ১৯৫৬ থেকে '৬৮ প্রায় বারো বছর বিভিন্ন দলের বিভিন্ন পালায় এই ছদ্মনামেই কেটে গেল বিনোদের অভিনয় জীবন। এ সময় যে সব পালায় বুলবুলরানীর অভিনয় ও গানের খুব কদর হয়েছিল তাদের তালিকায় উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে

রয়েলের ভাগ্যের বলি, কপালকুণ্ডলা, কবি চন্দ্রাবতী, নট্ট কোম্পানির বিল্বমঙ্গল, চাঁদবিবি, পতিতের ভগবান প্রভৃতি।

১৯৬৮-তে দল বদলের সঙ্গে সঙ্গে আবার পুরোনো নামে অভিনয় করতে শুরু করলেন শিল্পী। শ্রীমা নাট্য কোম্পানিতে এসে বিনোদকুমার 'রাক্ষসী পদ্মা' নাটকে গায়ক অভিনেতার ভূমিকা পেল। এরপর বিনোদ অভিনয় করেছিলেন জনতা অপেরার, 'ফাঁসীর মঞ্চে' নাটকে। বিনোদকুমার নবরঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

॥ অনল চক্রবর্তী ॥

বেহালা সরশুনা অঞ্চলে এমন একটি পরিবারে এমন এক পরিবেশে অভিনেতা, পালাকার অনলের জন্ম, যেখানে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শৈল্পিক চেতনা প্রবাহ এখনও অব্যাহত। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রত্যক্ষ স্বাদ পাওয়া, ইতিহাসের অধ্যাপক হিসেবে শ্রদ্ধার আসনে কর্মজীবনের মুহূর্তগুলো কাটিয়ে দেবার মধ্যে গৌরব বোধ করা মানুষ অরুণ চক্রবর্তী যাঁর বাবা, বামপন্থী আন্দোলনের শরিক হয়ে গণজাগরণের সংগীত যাঁর মায়ের কণ্ঠে ধ্বনিত, তাঁদের ছেলে অনল, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের অন্যতম শক্তিমান অভিনেতা অতুল চক্রবর্তীর ভাইপো অনল একটা দাগ রেখে যাবে বৈ কি! অনল যখন বাংলা সাহিত্যে বি. এ. অনার্সের ছাত্র, তখনই সাহিত্য রচনায় তাঁর ছিল সহজাত অধিকার, আর তাই কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত তাঁকে অনুপ্রাণিত করেন। তারও আগে, খুব ছেলেবেলায় বাবার কাছ থেকে তালিম নিয়ে স্কুলে "ডাকঘর" নাটকে অভিনয় করে বালক অনল মাৎ করেছিল সবার মন। এরপর, মাধ্যমিক পরীক্ষার আগেই বাবার বন্ধু শান্তি বিশ্বাসের উৎসাহে, তাঁরই হাত ধরে সদ্য যুবক অনলের ষ্টার থিয়েটারে (সকালে) 'পরিবর্তন' নাটকে প্রথম আত্মপ্রকাশ। পড়াশোনার মধ্যে নিত্য চলে সাহিত্য চর্চা, নাট্যরচনা ও অভিনয়ের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলা। আসেন শক্তিমান অভিনেতা, নির্দেশক, নাট্যকার বরুণ দাশগুপ্তের 'চালচিত্র' গ্রুপে। অভিনয় করে সকলের প্রিয় হন। এই গ্রুপের জন্যই অনল লেখেন 'অন্ধগলি'। এই নাটকের নির্দেশনা ছিল রুমা দাশগুপ্তের। এরপর 'স্বর্ণভিলা' নাটকের নির্দেশিকা রুমার সঙ্গে অনল নায়ক! ইতিমধ্যে অনেক নাটক, অনেক অভিনয়, অনেক স্বপ্ন নিয়ে অনেকটা পথ চলে আসা। তেমনি রুমার মুখে হাসি, কাজে বিরামহীন শ্রম, সৃষ্টির নেশা কিন্তু মনের স্তরে একরাশ একাকীত্বের যন্ত্রণা। বরুণবাবুর আকস্মিক মৃত্যুর পর দুটো শৈল্পিক মন এক সাথে চলতে চলতে এক সময়ে মিলেমিশে একাকার। ইতিমধ্যে রুমা এলো যাত্রায়। অনল ষ্টারে, মহেন্দ্র গুপ্তের "সম্রাট"-এ। তারপর অনলের ভাগ্য অনলকে নিয়ে এলো 'যাত্রালোক'-এর আসরে। সুদর্শন, শিক্ষিত, মার্জিত, অভিনয়ে তোখড় অনলের যাত্রা জীবনের পুরোহিত হলেন অভিনেতা অনাদি চক্রবর্তী এবং পালাকার, নির্দেশক, অভিনেতা অমিতাভ ঘোষ। তারপর থেকে অভিনেতা অনলের গতি শ্লথ হয়নি। তেমনি প্রতি মুহূর্তে রুমার প্রেম আর প্রেরণা অনলকে আরও সজীব করল। দুটো মন আর দুটো জীবনও মিশে গেল একদিন। রুমার খ্যাতি দুর্বার হলো। অনল অভিনয়ের সঙ্গে "দরদী মায়ের ফাঁসি", "বোবা বধূর ফুলশয্যা", "স্বামী হত্যার প্রতিশোধ", "মায়ের সিঁদুর ফিরিয়ে দাও" ইত্যাদি পালা রচনায় হলেন খ্যাতিমান!

অনল রুমা আর রুমা অনল সব খ্যাতির ঊর্ধ্বে, একজন আর একজনের পরিপূরক।

॥ সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় ॥

স্বনামধন্য বিজন ভট্টাচার্যের কাছে মূলত সুদীপ্তর অভিনয় জীবনের ভিত্ তৈরি হয়। তাঁরই পরামর্শে দারিদ্র্য ঘোচাতে, যশোর জেলার অভয়াগ্রামের সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে সুদীপ্তর যাত্রা জীবন শুরু। হাবীবপুর হাইস্কুল থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ করার মধ্যেই সুদীপ্ত বাড়ির পরিবেশে, নিজের আকাঙ্খায় সখের থিয়েটার করে বেশ পাকা হয়ে উঠেছিলেন। বাবা ছিলেন সাহিত্য সেবী।

যাত্রার স্বনামধন্য দুলাল চট্টোপাধ্যায় এবং নন্দদুলাল গোস্বামী ওঁর মামা। বিজন ভট্টাচার্যের নিজস্ব গ্রুপ "কবচ কুণ্ডল"-এ "কৃষ্ণপক্ষ" নাটকে বিজনবাবুর নির্দেশনায় অভিনয় করে অল্প বয়সেই প্রশংসা পান। ১৩৮২ সনে প্রথম সত্যম্বর অপেরায় ১ বছর অভিনয় করে সুদীপ্ত সুযোগ পান সুদীপ্তর প্রথম নাট্যশিক্ষক দুলাল চট্টোপাধ্যায়ের তপোবনে-এ। ২ বছর পর সুদীপ্ত অভিনয়ের সুযোগ পান, শিক্ষার সুযোগ পান অগ্রগামীতে অরুণ দাশগুপ্তের কাছে। বীণা দাশগুপ্তের সঙ্গে অভিনয় করেন "মীরার বঁধুয়া", "দেবী", "হরেকৃষ্ণ হরে রাম" পালায়। প্রতিষ্ঠা পান। এরপর সুনীল চৌধুরী রচিত ও নির্দেশিত "ওগো বিষ্ণু প্রিয়া", "নটী তারাসুন্দরী" পরে বীণা দাশগুপ্তর নির্দেশনায় "সতী চিত্রাঙ্গদা", "কৃষ্ণদাসী পদ্মা", "ব্রজের বাঁশরি", "মধু বৃন্দাবনে" "যৌবনে যোগিনী" পালায় অভিনয় করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা দেন। এরপর ভারতী অপেরা থেকে আরও প্রখ্যাত দলে কাজ করছেন সুদীপ্ত।

॥ দেবকুমার ব্যানার্জী ॥

ইনি গায়ক-অভিনেতা। ননীগোপাল ব্যানার্জীর ছেলে দেবকুমার ব্যানার্জীর জন্ম ১৯৪১ সালের ১৫ এপ্রিল, যশোর জেলার কেশবপুর গ্রামে। ১৯৫৭ সালে নাথ কোম্পানিতে প্রথম অভিনয় করার সুযোগ পান। এরপর রয়েল বীণাপাণি অপেরা থেকে বহু দলে খ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করেন। তাঁর অভিনীত শ্রেষ্ঠ পালাগুলি হলো, বীর অভিমন্যু, 'ভৈরবের ডাক', 'পলাতক', 'হেলেন অফ ট্রয়' আরও অনেক। ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ, পঞ্চু সেন, পূর্ণেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ দিকপাল শিল্পীদের সঙ্গে অভিনয় করেছেন।

॥ জহর রায় ॥

নিজের অভিনয় দক্ষতায় জহর রায় আজ নিজেকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। মন্মথ রায়ের ছেলে জহরের জন্ম বাংলাদেশের রংপুরে। মেকআপ ম্যান মাখন বোসের সাহায্যে জহর রায় প্রথম অভিনয়ের সুযোগ পান সত্যম্বর অপেরায়। তারপর থেকে প্রায় সব প্রথম শ্রেণীর যাত্রা দলে সুনামের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। এই দলগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ঃ নট্ট কোম্পানি, শ্রীরাধা নাট্য কোম্পানি, নব রঞ্জন অপেরা, নিমাই শূরের গন্ধর্ব অপেরা, ভারতী অপেরা, তপোবন নাট্য কোম্পানি, অগ্রগামী ইত্যাদি। "মাষ্টারদা" পালায় জহর রায়ের অভিনয় বিশেষ প্রশংসা পায়। জহর রায় আজও সুনামের সঙ্গে অভিনয় করছেন।

॥ সুব্রত বসু ॥

সত্যচরণ বসুর ছেলে সুব্রত বসু অল্প বয়স থেকেই চমৎকার গানের গলা আর অভিনয় ক্ষমতা নিয়েই যাত্রায় এসেছিলেন। ওঁর অভিনয়ের ভিত্ তৈরি হয়েছিল নাট্যপরিষদ গ্রুপ থেকে। কিছুদিন ষ্টার থিয়েটারে অভিনয় করেছিলেন পেশাদারী শিল্পীর মত। এরপর সুব্রত প্রথম সুযোগ পান প্রদীপ অপেরার রত্নাকর গিরীশচন্দ্র পালায়। তারপর থেকে এই শিল্পী সুপারহিট অনেক পালায় গান আর অভিনয় করেছেন। সেগুলি হলো—চন্দ্রলোকের "শাপমোচন", "নীলাচলে মহাপ্রভু", নব অম্বিকার "ডিস্কো ডান্সার" "বেইমান"। দিলীপ ঘটকের ছাত্র সুব্রত বসু যাত্রা সম্রাজ্ঞী জ্যোৎস্না দত্তের সান্নিধ্যে এসে তাঁর গীতাঞ্জলি অপেরার একাধিক পালায় একদিকে গুরুদাস ধাড়া অন্যদিকে জ্যোৎস্না দত্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গানে ও অভিনয়ে নিজের স্বকীয়তা বজায় রাখতে পেরেছেন।

॥ অনিল রায় ॥

যশোর জেলার, নড়াইল সাব ডিঃ-এর আকাইপুরের শরৎচন্দ্র রায়ের ছেলে অনিল রায়ের জন্ম। ১৯৪৪ সালে সাহাজাদপুর স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে বিদ্যাসাগর কলেজে পড়েন। বি. এ. পরীক্ষা না দিয়ে চাকরি জীবনে প্রবেশ করেন। একাধিক জায়গায় চাকরি করার জীবনে "কেন্দ্রী"

নামে গ্রুপ থিয়েটারের ক্লাব তৈরি করেন। শান্তি চক্রবর্তীর সাহায্যে অনিলবাবু প্রথম কাবেরী মুখার্জীর ওঁ স্বপন অপেরায় পালাকার হিসেবে যোগ দেন। পালা রচনার সঙ্গে যাত্রা দলের ম্যানেজার হন। দুলাল চট্টোপাধ্যায়ের 'তপোবন'-এ অনিলবাবু প্রথম অফিস ম্যানেজার হন। এরপর আনন্দলোক, শ্রীনাথ নাট্য কোম্পানি, নটরাজ অপেরা (ডাঃ সুধীর ঘোষের দল বলে কথিত) ইত্যাদিতে ম্যানেজারী করেন। প্রদীপ দেবনাথ "নাট্যভারতী" নেবার পর যে বছর অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম যাত্রায় আসেন সেই বছর অনিলবাবু হন অফিস ম্যানেজার। এরপর নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির দল, পার্থ সেনগুপ্তের চেষ্টায় গড়ে ওঠা 'বর্ণপরিচয়', এস. আলমের প্রিন্স অপেরা, অরুণ দাশগুপ্তের অভিযাত্রিক, কেডিয়ার পুষ্পাঞ্জলি, শ্রীনাথ নট্ট ইত্যাদিতে কাজ করেন। বাণীরূপা যাত্রা গোষ্ঠীর জন্য পরপর একাধিক পালা লেখেন। যথা—নকল রাজা (রত্নদীপের পালারূপ), কালো গোলাপ, ফুলন দেবী, মায়ামৃগ, দেবদাস (পালারূপ)। শ্রীরঙ্গম (ওয়ান ওয়াল) অনিলবাবুর ফুলনদেবী আসরস্থ করে।

এছাড়া লালবাই (নাট রূপ), চৌরঙ্গী (নাট্যরূপ), বারো ঘর এক উঠান (নাট্যরূপ) আরও বহু পালারূপ দেন। যাত্রা জগতে সৎ-শিক্ষিত মানুষের পেটে অন্ন নেই এই সত্যের দৃষ্টান্ত অনিল রায় এক সময়ে কিছুদিন পার্থ সেনগুপ্তের সাক্ষরতা প্রকাশনীতে কাজ করতে করতে মারা যান।

॥ সুনীল চৌধুরী ॥

বর্ধমানের ক্ষীরোদ গ্রামের ছেলে সুনীল। ৫১ পীঠের এক পীঠ এই গ্রাম। এখানে আছে সুগন্ধা দেবীর মন্দির। বৈশাখে মেলা বসে। ছেলেবেলায় ঐ মেলার মধ্যে কতবার ইচ্ছা করে হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে। '৭০-'৭১ সালে গ্রামের স্কুল থেকে হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করে কলকাতায় পড়তে আসেন সুনীল। এখানে বঙ্গবাসী কলেজে পড়াকালীন সুনীল নাটক লেখার ব্যাপারে খুবই উৎসাহ বোধ করতেন। 'এক্ষণ' পত্রিকার সৌরভ ঘটক আর সুনীল মাঝে মাঝে সাহিত্য চিন্তায় মেতে যেতেন। একটি সাহিত্য পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন। সেই পত্রিকার বিজ্ঞাপন সংগ্রহের সূত্রে সুনীলের যাত্রা পাড়া দর্শন। লোকনাট্যের গদিতে ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের সান্নিধ্য লাভ। এরপর ভৈরববাবুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়া।

সিটি কলেজে পড়ার সময় সুনীল একটা নাটকের ক্লাব গড়েছিলেন। নাম 'হেমলক'। এই গ্রুপের জন্য লেখা তাঁর প্রথম দুটি নাটক হলো 'সে ত আসছেই' এবং 'উনবিংশ প্রেম'। বঙ্গবাসীতে পড়ার সময় যোগযোগ হয় নান্দীকারের রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের সঙ্গে। নান্দীকারের 'চক্র' নাটকে রুদ্রবাবুর সরকারী নির্দেশক ছিলেন সুনীল, '৮৪ সনের 'আজকাল' থেকে জানা যায়।

১৯৭৯ সালে অগ্রগামীতে সুনীলের ১ম পালা 'রঙ্গী চম্পাবতী' অভিনীত হয়। পালার বিজ্ঞাপনে সেই প্রথম ছাপা হয় সুনীলের নাম। ভৈরববাবু যখন নট্ট কোম্পানির পালাকার তখন তাঁর জন্যেই অভিনেতা-নির্দেশক অরুণ দাশগুপ্তের সান্নিধ্য লাভ করেন। অভিনেত্রী বীণা দাশগুপ্ত সুনীলের পালা ও প্রতিভার অন্যতম গুণগ্রাহী। সুনীল যাত্রা পাড়ায় অতি অল্প বয়সে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করেন বীণার সহযোগিতা ও আপন দক্ষতায়। বর্তমানে তিনটি দলের মালিক এই সুনীল অভিনেতা হিসেবে অন্য দলে কাজও করেছেন।

॥ কালিদাস আচার্য ॥

সত্যনারায়ণ আচার্যের ছেলে। খুলনা জেলার বানিয়া খামারে জন্ম।

১৯৬০ সালে বনগাঁ হাইস্কুল থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ করার পর কলেজ পাঠ শেষ করেন দীনবন্ধু কলেজে। তারপর শিক্ষকতা জীবন শুরু। ছেলেবেলা থেকে সাহিত্যের প্রতি তীব্র আকর্ষণের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার প্রবণতা ছিল। তাই কালিদাসবাবু ছাত্র গড়ার মধ্যে একদিন

গড়েছিলেন গ্রহরাজের মন্দির। তাঁরই মধ্যে একাধিক পালা রচনা করেছেন। লাইটম্যান পরেশ ভঞ্জ কালিদাসবাবুকে সত্যম্বর অপেরায় আনেন এবং সেখানেই প্রথম লেখেন "মা ছিন্নমস্তা"। এরপর সত্যনারায়ণ অপেরা, বিশ্বরূপ অপেরা এবং আরও কিছু দলের জন্য রচনা করেন যথাক্রমে 'দেবী সিংহবাহিনী' (রাখাল সিংহ অভিনীত), মহাকাল (পান্না চক্রবর্তী) এছাড়া সমুদ্র মন্থন, মহিষাসুর বধ ইত্যাদি অনেক পালা।

॥ রুমা দাশগুপ্ত ॥

আজকের যাত্রায় যে ক'জন অভিনেত্রীর একক নামে দর্শকরা টাকা দিয়ে যাত্রা দেখেন তার মধ্যে অবশ্যই রুমা দাশগুপ্ত একটি নাম। রুমা দেবী জীবন শিল্পী। তাঁর পরিচিতিতে সাহিত্যের বিনা প্রলেপে বোধ হয় ছবিটা সঠিক আঁকা যাবে না, তাই তাঁরই পাঠানো সংক্ষিপ্ত বায়োডাটা এখানে হুবহু তুলে দিলাম।

জন্ম ফরিদপুর জেলা, মাদারিপুর মহকুমা (যদিও এখন জেলা)। বাবা ৺নিশিকান্ত ঘোষ (আইনজীবী, সংগীত প্রেমী)। মা ৺স্নেহলতা ঘোষ (সংগীত প্রেমী)। ভ্রাতা ঃ ছয় দাদা। ভগ্নি ঃ পাঁচ দিদি। আমিই কনিষ্ঠ। বড়দা ঃ রিটায়ার্ড গেজেটেড ক্লাস ওয়ান অফিসার (কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিনয় করেছেন)। বড় বৌদি ঃ দার্জিলিঙ লরেটো কনভেণ্টের টিচার। মেজদা ঃ রিটায়ার্ড আই. পি. এস অফিসার। মেজ বৌদি ইনটিরিয়ার ডেকরেশনে দারুণ দক্ষ। সেজদা ঃ পোস্ট মাষ্টার (কলেজে আবৃত্তি-অভিনয় করেছেন)। সেজ বৌদি, ন'বৌদি, বড়দি, মেজদি, সেজদি, ন'দি, ছোড়দি সকলেই হাউজ ওয়াইফ। প্রত্যেকে ভাল গান জানে। বড়দি ঃ সেতার বাজান। ন'দা ঃ ডাক্তার। সোনা দা ঃ শিল্পী। ছোড়দা ঃ ব্যবসায়ী (অভিনেতা ছিলেন)। এই ছোড়দার অভিনয় আমাকে অনুপ্রাণিত করে। পড়াশোনা ঃ ডোনাভান গভঃ গার্লস হাইস্কুল। ক্লাস X। বিবাহ ঃ ১৯ ফেব্রুয়ারি '১৯৭৫। স্বামী ৺বরুণ দাশগুপ্ত। সন্তান ঃ একমাত্র মেয়ে কস্তুরি দাশগুপ্ত (মাধ্যমিক লেটার মার্কস, '৯৭-এ উচ্চ মাধ্যমিক দেবে) স্বামীর মৃত্যু ঃ ১৯৮৯ সালের ১৯ অকটোবর। হার্ট এ্যাটাকে। দ্বিতীয় বিবাহ ঃ ১১ মে ১৯৯৫। স্বামী, অনল চক্রবর্তী (অভিনেতা, গায়ক, নাট্যকার)।

যে বয়সে মেয়েরা এক্কা-দোক্কা খেলা করে সেই বয়সে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী রুমা পাঠ্যবইয়ের "ইমাম" নাটকটি নিজের নির্দেশনায় ঘর আর পাড়ার ছেলে মেয়েদের দিয়ে অভিনয় করিয়ে বৈঠকখানার ঘরে মঞ্চস্থ করেছিল। ক্লাশ নাইনে উঠে সেই একইভাবে মঞ্চস্থ করে রবীন্দ্রনাথের "বলাই"। এরপর কলকাতায় এসে পাড়ার বড়দের ক্লাবে সলিল সেনের 'সন্ন্যাসী' নাটকে রুমার প্রথম অভিনয় থিয়েটার সেণ্টারে। সেখান থেকে "চতুরঙ্গ" গ্রুপের জনক, শক্তিমান নট-নাট্যকার বরুণ দাশগুপ্তের সান্নিধ্য লাভ। রুমার মধ্যে তেজোদীপ্ত অভিনেত্রীর লক্ষণ ছিল বলেই বরুণবাবুর এই আবিষ্কার! বাড়িতে অনুনয়-বিনয়ের পর অনুমতি লাভ। ১৯৭৪ সালে 'চতুরঙ্গ' পেশাদার গ্রুপের দৃষ্টিকোণ থেকে রঙ্গনায় মঞ্চস্থ করে "বদন চাঁদের বজ্জাতি"। ৮৪ বছরের এক বৃদ্ধার চরিত্রে বরুণবাবুর গড়া শিল্পী রুমার আত্মপ্রকাশ। তারপরই এই গ্রুপের সঙ্গে রুমা যান বম্বে। রবীন্দ্রনাথের 'সে', 'জলছবি', শরৎচন্দ্রের 'মহেশ', অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের "বদন চাঁদের বজ্জাতি" নাটকে অভিনয় করে প্রবাসী বাঙালিদের কাছে রুমা হন অসামান্যা! উল্লেখ্য, প্রাথমিক স্তরে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে রুমার সেজ বৌদি ছিলেন সঙ্গী। বম্বে থেকে ফেরার পর ঃ

রুমা নিজেই লিখছেন—"হঠাৎ একদিন বরুণবাবুর বাড়িতে গিয়ে দেখি তিনি খুব অসুস্থ! বাড়িতে একটি মাত্র কাজের লোক! সেও বাড়ি নেই। এর আগেই 'মা' মারা গেছেন। আমি ডাক্তারবাবুকে বাড়িতে এনে ওনার চিকিৎসা করছি। ডাক্তার চলে যাবার পর বরুণবাবু অশ্রুসিক্ত চোখে আমাকে বললেন, "রুমা, আমার কেউ নেই!"—বাড়ি ফিরে এসে সারারাত ভাবলাম। পরের দিন ভোরবেলায় ওঁর বাড়ি গিয়ে বললাম—"বরুণদা, আপনি আমাকে বিয়ে করবেন?'—তিনি

আমাকে বোঝালেন! বললেন,—তুমি আমার মেয়ের বয়সী, তোমাকে বিয়ে করে তো আমি হাতে চাঁদ পাবো, কিন্তু তুমি কি পাবে?—"

বরুণবাবুর একটা কথাই বারবার হন্ট করেছে—"রুমা আমার কেউ নেই—" অগত্যা বাড়ির বাধা ভেঙে, স্বনামখ্যাত নাট্যকার অজিত গঙ্গোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে কালীঘাটে গিয়ে বরুণবাবুকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন রুমা। তারপর রেজিস্ট্রী। তারপর শুধু অভিনয় আর অভিনয়। "বাবু", "দশমিক", "কঞ্চি", "ডাউন ট্রেন", "জলছবি", "নবদূর্বাদল শ্যাম", "চরিত্রহীন" আরও অনেক নাটক, অনেক চরিত্র চিত্রণ। মঞ্চে আর আসরে অল্প সময়ের মধ্যে খ্যাতির আসনে বসলেন তিনি। সাংবাদিক প্রবোধবন্ধু অধিকারী অনেকের মত রুমাকেও এনেছিলেন যাত্রায়। প্রথমেই নট্ট কোম্পানি। এখানে ক্ষুধিত হারেম, শ্রীচরণেষু মা, কাগজের ফুল, গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম, রাত্রির তপস্যা, কুবেরের পাশা থেকে পরে আরও অনেক দলে চরম খ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করেন।

রুমার অভিনয়ে এ যাবৎ অতি সফল পালার তালিকা ঃ কৃষ্ণপুত্র শাম্ব, আসল নকল, প্রণয় পিপাসা, কাঁটার বাসর, রক্তের ডাক, সতীর অকাল মৃত্যু, রাজলক্ষ্মী, ময়লা মানুষ, সাদা সিঁথির বধূ, শ্মশান হলো বাসর, ঘরের লক্ষ্মী কাঁদছে, বাবুর ঘরে বেদেনী, অগ্নি সাক্ষী সিঁদুর, ঠিকানা জেলখানা, আমি স্বামী বিক্রি করলাম, দরদী মায়ের ফাঁসি, স্বামী হত্যার প্রতিশোধ ইত্যাদি। আসরের প্রতিভা স্বীকৃতি পেল দূরদর্শনে। বহুবার, বহুভাবে টি, ভি'তে কাজ করেছেন তিনি। তাঁর অভিনয়ে মূর্ত হয়েছে 'মদন হাজির', 'খেলা', 'বশীকরণ', 'রথের রশি', 'সন্ন্যাসী', 'নবদূর্বাদল শ্যাম', 'ডাউন ট্রেন', 'অশরীরী', তা ছাড়া দূরদর্শনে রুমা দাশগুপ্তই প্রথম মহিলা শিল্পী যিনি পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করে সার্থক. করেছেন "সে"।

১৪০৩ সনে রুমা প্রথম 'মুক্ত মঞ্জরী' অপেরার পালায় নির্দেশক হন। একদিকে বরুণ দাশগুপ্ত অন্যদিকে ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর শিক্ষাগুরু। প্রাক্তন মন্ত্রী অজিত পাঁজার পক্ষ থেকে পুরস্কৃত হন তিনি, তা ছাড়া পঃ বঃ সরকারের পক্ষ থেকে পুরস্কার পান। এ ছাড়া একাধিক পুরস্কার পেয়েছেন রুমা দাশগুপ্ত। চিরকৃতজ্ঞ তিনি সাংবাদিক প্রবোধবন্ধু অধিকারী, পালাকার নির্দেশক ভৈরব গাঙ্গুলীর কাছে।

॥ বিজলী দে ॥

মধ্য কলকাতার রাজচন্দ্র সেন লেনে হরিবল্লভ দে'র কন্যা বিজলী দের জন্ম। কলকাতা কর্পোরেশনের কর্মী হরিবল্লভবাবু চার সন্তান রেখে হঠাৎ মারা যান। বিজলী তখন কিশোরী। স্বামীকে হারিয়ে খুবই বিপন্ন অবস্থার মধ্যে পড়ে যায় বিজলী দে'র সংসার। এর মধ্যে ১৯৭৩ সালে স্কুল ফাইন্যাল এবং ১৯৭৪ সালে মাধ্যমিক পাশ করে বিজলী নাচ-গানে তালিম নেন। Art Displsy Dance and Music School থেকে ডিপ্লোমা নিয়ে ঐ সালেই, ঐ স্কুলেই শিক্ষকতা শুরু করেন।

এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েন সিনেমায়। "মৌচাক, ব্রজবুলি, দম্পতি, শঙ্খবিষ, ভোলাময়রা, কবিতা, কিতনে পাস কিতনে দূর ইত্যাদি ছবিতে পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করেন। ১৯৭৯ সালে যাত্রায় যোগদান। প্রথম আসেন "চন্দ্রলোক অপেরা"-য়। এরপর নিউ প্রভাস অপেরায় অভিনয় করেন। বিবাহ্ করেন অভিনেতা প্রশান্ত সরকারকে।

এরপর যে দলগুলিতে খ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করেছেন সেগুলি হলো, লোকনাট্য, অগ্রগামী, গণনাট্য, জনতা অপেরা, রাণার যাত্রা ইউনিট, বঙ্গলোক, গীতাঞ্জলি, রাজদূত এবং নটনারায়ণ অপেরা।

॥ মধুছন্দা ॥

মধুছন্দার যাত্রার অভিনেত্রী জীবনের সূচনা ১৯৬৫ সালে। তারও আগে সৌখিন যাত্রা দলে

"আজকাল" পালায় লতা চরিত্রে মাত্র ১৪ বছরের মধুছন্দার প্রথম আত্মপ্রকাশ। এরপর পেশাদার যাত্রায় প্রথম অভিনয় করেন নাট্যভারতীতে 'মা ও ছেলে' পালায় তাপসী চরিত্রে। তখন নায়ক ছিলেন তপনকুমার। নাচে, গানে, অভিনয়ে দক্ষ এই অভিনেত্রী আর থামেননি কখনও। ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ, ফণিভূষণ মতিলাল, প্রভাত বোস, ইন্দুবাবু, সুনীল মুখার্জী (রামু), গোপাল চ্যাটার্জী, নটসূর্য দিলীপ চ্যাটার্জী, পান্না চক্রবর্তী, রাখাল সিংহ, পশুপতি ঘোষ থেকে সন্দীপ চ্যাটার্জীর সঙ্গে অভিনয় করেছেন ইনি। শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়কে শিক্ষাগুরু হিসেবে পেয়ে নিজেকে গড়েছিলেন তিনি। আনারকলি, হে অতীত কথা কও, সিরাজদ্দৌলা, সেলাম দিল্লীর মসনদ ইত্যাদি বহু পালা তাঁর অভিনয়ে সমৃদ্ধ। পুরস্কার পেয়েছেন অনেক।

॥ সুর-সংগীত-সংগত ॥

পালা সম্রাট ব্রজেন দে'র একটি রচনা এখানে পুনঃ প্রকাশ করে এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত বিবরণ দেব। ব্রজেনবাবু লিখছেন ঃ

'ষাট বছর ধরে পদ্মা-ভাগীরথীতে কত জল বয়ে গেছে। আমার মন থেকে যাত্রার সে রূপ কিন্তু মুছে যায় নি। শীতের সন্ধ্যে বেলা গাঁয়ের বাজারের আসরে আজকের এই দিগ্বিজয়ী নট্ট কোম্পানি তার প্রথম বছরের পালা জুড়ে দিলে, গানের শেষে যখন বাড়ি এলাম তখন মা উঠোনে গোবরছড়া দিচ্ছেন। কি মধুর রাজকুমারের সেই গান,—"আমার প্রাণের হরি প্রাণে প্রাণে গেঁথে রেখেছি!" তারও আগে নাগ দত্তের দলে আর এক রাজপুত্র হাজার হাজার শ্রোতার মনে দোলা দিয়ে গিয়েছিল,—"কোথায় থাক চিনি না ক'—তবু তোমায় ভালবাসি।" সে সব গানের কথা মনে হলে আজও চোখ দুটো জলে ভরে যায়। সেই কালী গাইয়ে, শ্যাম বাগদীর মন মাতানো সুরের ঝঙ্কার, সেই দাক্ষিণাত্যের বাণী ও সপ্তরথীর উত্তরার পাগলকরা গান চিরদিনের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেছে। আট ঘণ্টা যাত্রাভিনয় দেখেও যার ক্লান্তি আসত না, আজ তিনঘণ্টা অভিনয়ও তার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায়। তিনঘণ্টাও এখন অভিনয় হয় না, পৌনে তিন ঘণ্টা পালা আর পনের মিনিট নাচ।...

১৯৬১ সাল পর্যন্ত যাত্রায় অনেক শুভ সংযোজন হয়েছে, একথা অনস্বীকার্য। এসেছে ঐতিহাসিক নাটকের প্লাবন, এসেছে বিশুদ্ধ সামাজিক পালা, short dialogue, humour. ভাঁড়ামিবর্জিত পালার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত কমিক চরিত্র আমদানি হয়েছে, অনাবশ্যক সখীর গান ও দ্বৈত সংগীত উঠে গেছে, বিবেক তার অশরীরী সত্তা ত্যাগ করে মাটিতে নেমে এসেছে, ভাষায় প্রাঞ্জল ও চরিত্রানুগ বৈচিত্র্য এসেছে। তার পরেই এল যাত্রার পিছু হটার পালা।...

আগেকার দিনে প্রত্যেক দলে অন্ততঃ একটি একানে ছেলে থাকত। আজ আর নেই। কেন নেই জানেন? একানে ছেলের কিন্নরকণ্ঠ তিন চার বছর সতেজ থাকত, তারপর আর তাতে ততটা ধার থাকত না। তাকেই তখন আস্তে আস্তে বিবেকের পদে তুলে নেওয়া হত। এমনি করেই কালী গাইয়ে, বিনোদ ধাড়া তৈরি হত। এঁরাও সারা জীবন যাত্রার সেবা করার সুযোগ পেত। কোন কোন ছেলে বউরাণীতে উন্নীত হত। আজ তৈরি বৌরাণীরাই যাত্রায় আসছেন, promotion-এর প্রশ্নই ওঠে না। বিবেকরা আসছেন মঞ্চ-রেডিও-সিনেমা থেকে। তিন চার বছরের জন্যে কোন্ বাপ-মা তাঁদের কচি ছেলেকে যাত্রার দুর্ভোগ ভুগতে কেন পাঠাবেন বলুন?...

শিল্পীর অভিনয়ের অনেক উৎকর্ষ হয়েছে, একথা সত্য। কিন্তু গান কই? গাইবার লোক কই? গানের মর্ম বোঝবার মত নির্দেশক কই, নির্দেশককে কিছু বলবার মত অধিকারীর হিম্মৎ কই? যাত্রার পালা লেখে একজন, গান লেখে আর একজন—যিনি পালাটি পড়ে দেখেন নি। সুর দিতে আসে সিনেমার লোক, আলো ফেলতে আসেন ভীম সেন। পালা যদি ফেল করে,—সুরকার, গীতিকার, নির্দেশক, কেউ পাপের ভাগী হবে না,—ধরবি ত ধর ওই বেড়ে ব্যাটাকে ধর্।

আলোর আয়ু ফুরিয়েছে, রাজনীতিরও যাত্রাজগতে নাভিশ্বাস উঠেছে ; কিন্তু মাইক আর নড়বে না, গুঁপো নারীদের আর দেখা মিলবে না। তবু যাত্রাকে তার গঙ্গাযাত্রার পথ থেকে এখনও ফেরানো যায়, যদি অধিকারীরা সাবধান হন। অকারণ rate-এর আকাশছোঁয়া গতি বন্ধ করুন, সিনেমা-থিয়েটারের শিল্পীদের মোহ ত্যাগ করুন, পালার মধ্যে সিনেমার গান পরিবেশন বন্ধ করুন, অন্ততঃ দু' পালার কম কোথাও বায়না নেবেন না, সর্দার-অভিনেতার উপর নির্দেশনার ভার দেবেন না ; তৈরি নাটকের যাত্রারূপ অভিনয় করবেন না, বছরে একখানা নাটক ভাল করে খুলবেন, আর গদীতে বসে নায়েকের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করবেন।

যাত্রার জনপ্রিয়তায় উল্লসিত হয়ে যাঁরা ভাবছেন সবটুকু কৃতিত্ব তাঁদেরই, তাঁরা যেন মনে রাখেন অধিকারী-শিল্পী-দর্শক-লেখক-সুরকার-সজ্জাকর—যাত্রার জনপ্রিয়তার মূলে এঁদের কারও অবদান কম নয়। এও মনে রাখতে হবে যে অধিকারীর হাত থেকে সব ক্ষমতাই যদি শিল্পীদের হাতে চলে যায়, তাহলে যাত্রার গঙ্গাযাত্রা রোধ করার সাধ্য শিবেরও নেই।"...

যাত্রাগানের সনাতন রূপের সঙ্গে আধুনিক যাত্রা ধারার মিশ্রণ ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠতে থাকে মথুর সাহা থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টির গোড়াপত্তন থেকে। যাত্রাগানের ব্যবসায়িক সাফল্য নিশ্চিত করার আকাঙ্খায় একদিকে যেমন পালার বিষয় পরিবর্তন, প্রযোজনা ও উপস্থাপনা এবং অভিনয় ধারায় বিজ্ঞান সম্মত, পদ্ধতিগত, শৈল্পিক ভাবনা প্রয়োগের ব্যাপারে তৎকালীন অধিকারীরা একটু একটু করে সচেতন হতে থাকলেন, অন্যদিকে বিবর্তিত যুগের বা সমকালীন চাহিদা মেটাতে যাত্রার নব্য মালিকপক্ষ, পালাকারেরা পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর পালা বজায় রেখে, সামাজিক বিষয় উপস্থাপনার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালনে সজাগ হতে থাকলেন। পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত পালানাট্যের বিশেষ অঙ্গ হয়ে রইল সংগীত, যন্ত্র মূর্চ্ছনা এবং নৃত্য। এরই মধ্যে যাত্রার পুরাতন ধারার অভিনয় রীতি বদলানো, সময় সংক্ষেপ ইত্যাদি ভাবনা প্রবাহের বিকাশ লাভ ঘটতে থাকল। সামান্য কয়েকজন মহিলা অভিনেত্রীর আত্মপ্রকাশ ইতিমধ্যে ঘটল বটে কিন্তু নারী চরিত্রে পুরুষের আত্মপ্রকাশ রইল অব্যাহত। প্রতি দলে, প্রতিটি পালার প্রধান অঙ্গ ছিল সখীদের নাচ। যুগ্ম নৃত্যেরও প্রাধান্য ছিল। বোধকরি এই কারণেই পঞ্চাশের দশক এবং তারপরের কয়েক বছরের মধ্যে নির্দেশকের বিশেষ প্রাধান্য না থাকলেও নৃত্য শিক্ষক এবং সুর-মাষ্টারদের প্রাধান্য অবশ্যই ছিল। যন্ত্র মূর্চ্ছনা যাত্রাগানের ছিল অন্যতম প্রধান অঙ্গ। সুতরাং যন্ত্রীদের কদর ছিল বেশি। এই সময়ে পালাগানে বিবেক চরিত্রের যে প্রাধান্য ছিল তা পালাগান দেখতে বসলে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যেত। সুর মাষ্টারদের কদর ছিল, মর্যাদা ছিল। স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষতা দেখাবার জন্য আশ্চর্য রকমের প্রতিযোগিতা ছিল। প্রতিযোগিতা ছিল বলেই যাত্রাকে মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধা করতেন সকলেই। এই কারণেই এমন অনেক বাদ্যযন্ত্রী, গায়ক-অভিনেতা তৈরি হয়েছিলেন যাঁদের সাধনা ও কর্মের কথা ইতিহাস ভুলবে না কোনদিন।

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রতিভার নজির রাখতে প্রথমেই যে শশীভূষণ অধিকারীর কথা আসে, তাঁর কথা আগেই বলেছি।

এ ছাড়া নট্ট কোম্পানির পালা আসরে শুরু হবার আগে হারান নট্টের লহরা শোনার জন্যে মানুষ ব্যাকুল হতো। বহু নাম হয়তো বলা যায়, কিন্তু দু' একটি নামের উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে, এক সময়ে যাত্রায় গায়কদের মূল্য ছিল কতটা। যেমন কালী গাইয়ের গান একবার শুনলে লোক খুশি হত না। চলমান পালা বন্ধ করে আবার কালী গাইয়ের গান থেকে পালা শুরু করতে হতো অনেক জায়গায়। তেমনি ছিলেন বিনোদ ধাড়া। যে দলে বিনোদ ধাড়া থাকবেন সে দলে বিনোদ ধাড়ার গান ছাড়া আর কিছু চাইতেন না দর্শক। বেহালা বাদন না থাকলে যাত্রা গান হতো না। এই বেহালার বিসর্জন হয়ে গেছে এখন।

এই সূত্র পঞ্চু পালের কথা অনায়াসেই এসে যায়। পুরো নাম **পঞ্চানন পাল**। সবাই পঞ্চু বলে ডাকত তাই পঞ্চু পাল নামে খ্যাত হয়ে যান। এমন ক্লারিওনেট বাজিয়ে আজও জন্মায়নি যাত্রা জগতে। ছেলেবেলা থেকেই পঞ্চু পাল নানা রকম যন্ত্র নিজেই বাজাবার চেষ্টা করতে করতে, কারও কাছ থেকে কখনই কোন তালিম না নিয়ে ওস্তাদ বাজিয়ে হয়ে ওঠেন। একেবারে প্রথম দিকে পঞ্চু পাল বাঁশের বাঁশি বাজাতেন। পরবর্তী সময়ে পঞ্চু পালের বাঁশি শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত মানুষ। অল্প বয়সে সখের থিয়েটারে এই বাঁশি বাঁজিয়ে পঞ্চু পাল যে কত বারই ফুলের মালা গলায় পরেছিলেন তার হিসেব নেই। যাত্রায় প্রথম আসেন রয়েল বীণাপাণিতে। এসেই আসর মাতিয়ে দিয়েছিলেন সংগতে। একাধিক যন্ত্রবাদনে ওস্তাদ হয়ে ওঠেন। আমতার দত্ত পাড়ার অতি সাধারণ এই মানুষটি গোটা বঙ্গদেশে সম্রাট বাজিয়ে আখ্যা পেয়েছিলেন।

যদিও এখন আর এমন শিল্পী পাওয়া যায় না, তবুও খোকা মল্লিকের নাম যাত্রার দর্শক মহল ভুলবে না কোনদিন। খোকা মল্লিকও একাই একাধিক যন্ত্র বাদনে ওস্তাদ হয়েছিলেন। তাঁর সানাই বাদন এক অতুলনীয় সৃষ্টি। খোকা মল্লিক বর্তমানে নিজেকে বাজিয়ে জীবন থেকে অনেকটাই সরিয়ে এনেছেন। যা হোক, বেহালার মত বীণা-তানপুরা-সেতার-একতারা ইত্যাদি তারের যন্ত্রও যাত্রার আসর থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পরিবর্তে 'ক্যাসিও', 'ইয়ামা' ইত্যাদি বৈদ্যুতিক যন্ত্র যাত্রাকে তার সনাতন ঐতিহ্য থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

এখন সব দলেই মেয়ে-পুরুষ গান গায়। কয়েক জনের রীতিমত সাধা গলা। কেউ কেউ বিচিত্রানুষ্ঠানে, হোটেলে, এমন কি সিনেমায় প্লে ব্যাক সামান্য হলেও করে যাত্রায় এসেছেন। এঁদের নামের পাশে গায়ক-নায়ক লিখে প্রচারও হয়! কিন্তু রেডিও, দূরদর্শন, ক্যাসেটের প্রাবল্যে অগণিত গায়ক-গায়িকার বন্যায় এইসব গায়ক-গায়িকা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের যাত্রার বাইরে কোন মূল্য নেই। যাত্রার ক্ষেত্রে তখনকার মত হয়তো ভাল লাগে এঁদের গান, কিন্তু মনে দাগ টেনে দেয় না!

এবার এমন কয়েকজন যাত্রার সুরকারের কথা বলি যাঁদের সুর রচনায় যাত্রার ঐতিহ্য বজায় ছিল দীর্ঘকাল। যেমন ঃ

॥ রাজ্যেশ্বর নন্দী ॥

যাত্রাজগতের প্রবীণতম সুরকার রাজ্যেশ্বর নন্দী ১৯০৪ সালে ফরিদপুরের গোপালপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবার নাম ৺আদিনাথ নন্দী। বাবা ছিলেন সংগীত সাধক এবং দাদা ৺রসরাজ নন্দীও ছিলেন সংগীত-ওস্তাদ। তাই ছেলেবেলা থেকেই গান নিয়ে মেতে গিয়েছিলেন রাজ্যেশ্বর। প্রথমে দাদার কাছে ও পরে কৈলাস নন্দীর কাছে সংগীতে তালিম নেন। আঠারো বছর বয়সে রাজ্যেশ্বর নন্দী কলকাতায় এসে গান শিখিয়ে পেট চালাতে থাকেন। পরবর্তীকালে কাশী, বৃন্দাবন, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি জায়গায় সংগীত শিক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। কাশীতে এবং বরিশালে সুরেশ গাঙ্গুলী মশাই ওঁকে সংগীত স্কুল করে দেন। এরপর ভাগ্যচক্রে জড়িয়ে পড়েন নট্ট কোম্পানির সুরকার হিসাবে আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। প্রথম 'সম্বর্তক' এবং 'চাঁদের মেয়ে' পালায় সুর দিয়ে খ্যাতি পান। তারপর স্থায়ী ভাবে নট্ট কোম্পানির প্রায় শতাধিক পালায় খ্যাতির সঙ্গে সুর দেন।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আজ পর্যন্ত প্রায় সাত আট'শ পালার সুরকার এই রাজ্যেশ্বর নন্দী নানা দিক থেকে অভিনন্দিত হয়েছেন। একবার বাঁশি বাজিয়ে শিলঙে ছোটলাটের কাছ থেকেও সম্মানিত হয়েছিলেন।

॥ মহেন্দ্র দত্ত ॥

১৩৫৭ সনের বৈশাখ মাসে বর্ধমানের মাহাতো গ্রামে এই প্রথিতযশা সুরকারের জন্ম। বাবার নাম ৺নগেন্দ্রনাথ দত্ত। গ্রামের পাঠশালায় হাতেখড়ি আর কলকাতায় শ্যামাচরণ ইনস্টিটিউটে লেখাপড়ার অবসান। গানের প্রতি ছেলেবেলা থেকেই প্রগাঢ় প্রীতি থাকায় মহেন্দ্রবাবুর লেখাপড়া

বেশিদূর হয়নি। প্রথমে সতীশ ঘোষের কাছে উচ্চাঙ্গ, পরে ভোলানাথ দাস ও নবদ্বীপের নবদ্বীপ বাবাজীর কাছে কীর্তন শিখে সংগীত শিক্ষার ভিতকে শক্ত করেছিলেন মহেন্দ্রবাবু। তখনকার দিনে নট্ট কোম্পানির কাশী নট্ট ছিলেন প্রখ্যাত তবলাবাদক। তিনি মহেন্দ্রবাবুকে নট্ট কোম্পানিতে প্রথম সুরকারের সুযোগ দেন। "সম্বত" পালায় ১৩৩২ সালে প্রথম সুরারোপ করেন মহেন্দ্রবাবু। এরপর নবগ্রহ পঞ্জিকার রচয়িতা বিপিনবিহারী জ্যোতিঃশাস্ত্রীর চণ্ডী অপেরায় যুক্ত হন। এক নাগাড়ে চোদ্দ বছর এই প্রতিষ্ঠানে সুরকার হিসেবে কাজ করে আলোড়ন তুলেছিলেন তিনি যাত্রাজগতে।

প্রায় আটচল্লিশ বছর ধরে যাত্রাজগতে সম্মানের সঙ্গে সুর রচনার কর্তব্য সম্পাদনা করেছেন মহেন্দ্র দত্ত। দুই শত পালার সুরকার মহেন্দ্রবাবু ছিলেন সুললিত কণ্ঠেরও অধিকারী। ১৩৩৩ সনে হিজ মাস্টার্স থেকে মহেন্দ্রবাবুর দুটি রেকর্ড প্রকাশিত হয়। একটি গানের সুরকার ছিলেন স্বয়ং নজরুল ইসলাম, অন্য গানটির সুরকার ছিলেন তুলসী লাহিড়ী স্বয়ং। বেতারেও গান গেয়েছিলেন মহেন্দ্র দত্ত।

নানা দিক থেকে নানা পুরস্কারে ভূষিত এই সুরকারকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও সম্মানিত করেছেন। মহেন্দ্র দত্ত চিরকালের সর্বজনের মাষ্টার মশাই।

জীবনের শেষ দিকে মহেন্দ্রনাথ, সর্বত্র লিখতেন—"সঙ্গীতাচার্য সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য, দুস্থ, অবসরপ্রাপ্ত ছাত্র বিশেষ শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত"।

মৃত্যুর ক'দিন আগে মহেন্দ্র দত্ত আমাকে (এই গ্রন্থের লেখক) একটি পত্র দিয়েছিলেন। এখানে সেই পত্র বা আত্মসমীক্ষা হুবহু তুলে ধরছি ঃ

"...আজ এই বৃদ্ধ বয়সে আমি প্রায় প্রত্যেকটি যাত্রা দলে গিয়েছি, প্রত্যেক মালিকের কাছে বলেছি আমার দুঃসময়ের কথা, ভেবেছিলাম ওরা আমায় মনে রেখেছে, যেমন আজও আমি ওদের ভুলতে পারি না। কিন্তু সব ভুল, তারা বুঝল আমার দুঃসময়ের প্রয়োজনের চাইতে, তাদের আমোদ-প্রমোদের মূল্য বেশি, তাই তারা উদাসীন রয়ে গেল।

আমি ১৩৩৬ সাল থেকে যাত্রা জগতের সহিত জড়িত থেকে একান্তভাবে কাজ করেছি, বড় বড় বিখ্যাত সব দলের পালায় সুর দিয়েছি কিন্তু তারা কেন আজ নীরব? আর সত্যকারের মানসিকতা যাদের মধ্যে তারা আমার সাহায্যকল্পে একটি বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন তাও সত্য, তাই আমি ভগবানের কাছে তাদের মঙ্গল কামনা করি। এরা কেউ যাত্রা জগতের লোক ছিলেন না। তাই যাত্রা জগতের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ, তাদের মধ্যেও তো অনেকে শিক্ষিত, তবে তারা এই ব্যবহার করে কি শিক্ষা আর মনুষ্যত্বের পরিচয় দিলেন? তারা যেন এই মন ত্যাগ করেন।

আবার বলি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে আমি ১৩৮০ সালে শ্রেষ্ঠ সুরকারের সম্মান পেয়েছিলাম ইডেন উদ্যানে। তাই ভেবেছিলাম তাঁরা হয়তো নিশ্চয়ই দুস্থদের সাহায্য দিবার কাজ পরিচালনা করিতেছেন, যেটা তাঁরা পূর্বে ঘোষণা করেছিলেন। তাই তাঁদের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন আমার মত এই রূপ দুস্থদের জন্য একটি সংস্থা নির্মাণ করিয়া শীঘ্রই যাত্রার গরীবদের সাহায্য করিবার চেষ্টা করেন, ইহাতে উপযুক্ত সময়েই দুঃস্থদের প্রয়োজন মিটিবে। তবুও আমি স্বীকার অবশ্যই করিব, যাঁরা আমার জন্য অন্ততঃ সাধ্য মত চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁরা হলেন, মান্যবর সুহৃদ রুদ্র, প্রবোধবন্ধু অধিকারী, পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা উৎসব সমিতির সভ্যবৃন্দ মিলিয়া পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলনের পক্ষ থেকে আমায় সম্মানপত্র ও পাঁচশত টাকা পুরস্কার হিসেবে দিয়াছিলেন। এই সম্মেলনটিকে তারা যেন বাঁচিয়ে রাখেন।" মহেন্দ্রনাথ দত্ত।

॥ অমিয় ভট্টাচার্য ॥

১৩১৪ সালে ফরিদপুরে মাতুলালয়ে অমিয় ভট্টাচার্যের জন্ম। যাত্রা জগতের স্মরণীয়

নাট্যকার অঘোর কাব্যতীর্থ ছিলেন অমিয়বাবুর জ্যাঠামশাই। সেই সূত্রেই বোধ করি অভিনয় আর সংগীতের প্রতি প্রীতির জন্ম। এই জ্যাঠামশাই তাঁকে নানা ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। অবশেষে একদিন তবলা শিখতে শুরু করলেন প্রতাপ ভট্টাচার্যের কাছে। পাশাপাশি গান শেখাও চলতে থাকল গিরিজাবাবুর কাছে। পিসতুতো ভাই প্রখ্যাত নাট্যকার জলধর চট্টোপাধ্যায়। তাঁর দু'খানা গানে একদিন খেয়াল বশতঃ সুরারোপ করেন অমিয়বাবু। গোপালীবালার গাওয়া সেই গানের রেকর্ডও বেরিয়ে গেল একদিন হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানি থেকে। এর পাশাপাশি তালিম নিতে থাকলেন সতীর্থ তারাপদ চক্রবর্তী, বাম্মু মিঞা, জসিমুদ্দিন খাঁ ও বাদল খাঁ সাহেবের কাছে। একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে হিমাংশু দত্তের সহযোগিতায় হিন্দুস্থানের ট্রেনার নিযুক্ত হলেন অমিয়বাবু। সুযোগ পেলেন জীবন সঙ্গিনী, নন্দিনী, বনমালীর প্রেম প্রভৃতি ছবির সুর রচনায়।

১৯৩৯ সালে ঢাকা বেতারের স্টাফ আর্টিস্ট হিসেবে যুক্ত হন। এরপর গণেশ গোস্বামী অমিয়বাবুকে পূর্ববঙ্গের বিল্বমঙ্গল নট্ট কোম্পানিতে নিয়ে আসেন। প্রথম সুর দেন 'টিপু সুলতান' পালায়। অল্পদিনেই যাত্রাজগতে অমিয়বাবুর খ্যাতি গেল ছড়িয়ে। এরপর ডাক এল প্রভাত অপেরা, প্রভাস অপেরা, প্রভৃতি দল থেকে। অমিয়বাবুর সুরারোপিত স্বামীর ঘর, মায়ের ডাক, চন্দ্রশেখর, রূপের নেশা, পুরুষোত্তম, কর্মবীর প্রভৃতি পালা তদানীন্তন কালে আলোড়ন তুলেছিল। ১৯৪৪ সালের পালা 'স্বামীর ঘর'। এ সময়ে যাত্রা দলে সখীর গানের বিরাট রেওয়াজ ছিল। ব্রজেনবাবুর স্বামীর ঘরেও ছিল ১৩/২০টি সখীর নাচ-গান। অমিয়বাবু প্রথম সেই সখীদের ঘুঙুর তুলে দিয়ে আবহ সংগীতের মাধ্যমে ঘুঙুরের শূন্যস্থান পূর্ণ করেন। আজ পর্যন্ত প্রায় ছয় শত সাঁইত্রিশটি পালায় সুরকার হিসেবে লব্ধপ্রতিষ্ঠ এই সুরকারের সুর সত্যম্বর অপেরার 'সোনাইদীঘি' রেকর্ডে জীবন্ত হয়ে আছে। এরপর বহু দলের বহু পালার সুরের জাদুকরকে বাঁচতে দেয়নি সুরা।

॥ পঞ্চানন মিত্র ॥

১৩২৮ সনে কলকাতার নেবুতলায় গোপালচন্দ্র মিত্রের ছেলে পঞ্চানন মিত্রের জন্ম। বউবাজার হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করার আগে থেকেই সংগীতের প্রতি ঝুঁকে পড়েন বেশি মাত্রায়। বন্ধু বৈদ্যনাথ পালের বাড়িতে তবলায় তালিম নিয়ে শীতল ব্যানার্জীর কাছে ব্যাঞ্জো শিখতে থাকেন। এমনি করে একদিন সরোদও শিখেছিলেন তিনি। বাবার মৃত্যুর পর অর্থের তাগিদে পঞ্চাননবাবু গায়ত্রী রায়-জ্যোতিকণা রায়ের নাচের দলেই সংগীত পরিচালক হিসেবে যুক্ত হন।

সরকারি প্রচার প্রয়োজনে দলের সঙ্গে লাহোরের জলন্ধরেও যেতে হয়েছিল পঞ্চানন মিত্রকে। তারপর লাহোরেই পণ্ডিত অমরনাথের সহকারী হিসেবে ওখানকার চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। এর বছর দুই বাদে দাঙ্গা বাধার জন্য পঞ্চাননবাবু আবার কলকাতায় চলে এসে সুযোগ পান এখানকার চলচ্চিত্র জগতে। সংগীত পরিচালক হিসেবে কাজ করেন প্রথম 'ভিন্ দেশের মেয়ে' ছবিতে। এরপর মেজজামাই, জালিয়াৎ, বীর হাম্বীর এবং আরও কতকগুলি ছবিতে সুর রচনা তাঁর। অপ্রত্যাশিত ভাবে ছাত্রী কনকলতার অনুপ্রেরণায় যাত্রা জগতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। প্রথমে গণেশ অপেরায় 'সৈনিক' পালায়, পরে কনকলতার শ্রীমা অপেরার প্রতিটি পালায় খ্যাতির সঙ্গে সুর দেন। তারপর প্রতি বছরই প্রায় প্রতিটি দলেই সুরকার হিসেবে কাজ করেন। সুরকার হিসেবে পঞ্চানন মিত্র দীর্ঘকাল নট্ট কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন। এরপর শ্রীমিত্র অধিকাংশ দলেই সুরকার হিসেবে কাজ করেছেন, এখনো করছেন।

পঞ্চাননবাবুর সুরারোপিত যাত্রাপালাগুলির মধ্যে মাইকেল মধুসূদন, বাঁশের কেল্লা, গঙ্গা থেকে বুড়ি গঙ্গা, বেগম আসমানতারা উল্লেখযোগ্য।

যাত্রার আসরে সরোদ বাজানো শ্রীমিত্রের কীর্তি। পঞ্চাননবাবুর সরাসরি ছাত্র : সত্য সাহা (বাংলা দেশের সুরকার), খোকন বিশ্বাস, গুরুদাস ধাড়া, সুধা বারিক, পৃথ্বীশ রায়।

॥ অজিতকৃষ্ণ বসু (বাদুবাবু) ॥

সুরকার হিসেবে যাত্রাজগতে অজিতকৃষ্ণ বসু (বাদুবাবু) সর্বজন পরিচিত। বাগবাজারের পশুপতি বোস পরিবারের দেবেন্দ্রনাথ বসুর পুত্র অজিতের জন্ম ১৯২১ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর। ছোটবেলা থেকেই সুকণ্ঠের অধিকারী অজিতকৃষ্ণ গানের তালিম শুরু করেন বছর পনেরো বয়েসে হীরেন ঘটকের কাছে। এরপর ভবানীপ্রসাদ মিশ্রও ওঁকে শেখালেন উচ্চাঙ্গ সংগীত।

সুরকার দুর্গা সেনের সহকারী হিসেবে অজিত বসুর কর্মজীবনের শুরু। শুকতারা, রাসপূর্ণিমা, ব্রাহ্মণ কন্যা প্রভৃতি 'ছবিতে দুর্গা সেনের সঙ্গে কাজ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন তিনি। স্বাধীনভাবে সুরকার রূপে শ্রীবসুর প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটল ১৯৪৮ সালে 'নিরক্ষর' ছবিতে। ১৯৬৮ সালে অভিনেতা সুজিত পাঠক ওঁকে যাত্রার সুরকার রূপে নিয়ে আসেন। তরুণ অপেরায় ওঁর সুরারোপিত প্রথম পালা 'মেঘে ঢাকা রবি'। এরপর শম্ভু বাগের ঘুম ভাঙ্গার গান, হিটলার, লেনিন, আমি সুভাষ, রাজা রামমোহন, নেপোলিয়ন, রমলা সার্কাস প্রভৃতি পালায় সুর করে প্রভৃত খ্যাতি অর্জন করেন অজিতবাবু। বছর চার পাঁচ পর ১৯৭৩ সালে নবারুণে যোগ দিলেন।

বাদুবাবু সুরারোপিত মোট পালার সংখ্যা পঞ্চাশের কাছাকাছি। এর মধ্যে উপরোক্ত পালাগুলি ছাড়াও গণদেবতা, জন্মের অভিশাপ, রক্তাক্ত আফ্রিকা, বিপ্লবী ভিয়েতনাম, ভাস্কো-ডা-গামা, ঘুমন্ত পৃথিবী, ক্রুশবিদ্ধ যীশু, মহাসতী তুলসী প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

॥ পশুপতি ভট্টাচার্য ॥

ঁকালীকুমার ভট্টাচার্যের ছেলে পশুপতি ভট্টাচার্য ১৯২১ সালে কলকাতার কুমারটুলী অঞ্চলে জন্মান। বাবা এবং মামারা ছিলেন সংগীতরসিক। ফলে ছেলেবেলা থেকেই গানকে ভালবাসতেন পশুপতি। সারদাচরণ এরিয়ান থেকে ১৯৩৯ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে যদিও কলেজে ঢোকেন পশুপতি তবুও গানের জন্য বেশিদূর পড়াশোনা হয় না। প্রথমে ঁকালীপদ চক্রবর্তী পরে জীবন উপাধ্যায়ের কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীতে তালিম নেন। যুদ্ধের সময়ে পশুপতি চলে যান ঢাকায়। সেখানে ছাত্রছাত্রীদের গান শিখিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এই সময়ে সুযোগ পান ঢাকা রেডিওতে। প্রায় চার বছর নিয়মিত ভাবে সংগীত পরিবেশন করে আবার কলকাতায় ফিরে আসেন এবং গান শেখাতে থাকেন। ১৯৫৭ সালে রঙমহলে 'দুর্গাদাস' নাটকে হেমচন্দ্র রায়ের পরিচালনায় একবার অভিনয়ও করেছিলেন। ১৯৭১ সালে যাত্রায় সুরকার হিসেবে জড়িয়ে পড়েন নিউ প্রভাস অপেরায়। 'ভক্ত কবির' পালায় সতেরটি পালায় সুর দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। সেই থেকে পশুপতিবাবুর যাত্রা জগতে প্রতিষ্ঠা। বছরে চার থেকে ছ'খানা পালার সুর তাঁকে দিতে হয়েছে। যাত্রা জগতের প্রখ্যাত গায়ক-নায়ক তপন ভট্টাচার্য পশুপতিবাবুর যোগ্য পুত্র, আর আজকের সব চাইতে জনপ্রিয়, বলা যেতে পারে বিশ্বখ্যাত সংগীত শিল্পী-সুরকার কুমার শানু হলেন পশুপতিবাবুর সংগীত ঘরানার গৌরবময় ধারক। শানু পশুপতিবাবুর আর এক পুত্র রত্ন। এই '৯৬ সালেই পশুপতিবাবুর সুরে সর্ব প্রথম তাঁর পুত্র শানুর গায়ো গানের একটি ক্যাসেট সংকলন প্রকাশিত হয়েছে ও জনপ্রিয় হয়েছে।

॥ প্রশান্ত ভট্টাচার্য (বড়) ॥

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের যাত্রার গান বা সুর পরিবর্তনে যাঁরা দুঃসাহসিক ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তাঁদের তালিকায় নিঃসন্দেহে অন্যতম প্রশান্ত ভট্টাচার্য। ১৯৬৯-এর এক সন্ধ্যায় প্রশান্ত প্রথম চিৎপুরের যাত্রা পাড়ায় হাজির হয়েছিলেন বন্ধু শ্যামল দত্তর সহায়তায়। মাধবী নাট্য কোম্পানিতে 'আগুন নিয়ে খেলা' পালাগানের সুর-রচনার দায়িত্ব নিয়ে যাত্রাজগতে প্রশান্তর শুভযাত্রা শুরু হল। যাত্রায় জড়িয়ে পড়ার পিছনে প্রশান্তর এক চমৎকার ঘটনা ঘটবার স্মৃতি আছে। মাধবী নাট্য কোম্পানির ঘরে বসে এক সময়ে গান শোনাতে শোনাতে লোক জমিয়ে দিয়েছিলেন।

সেখানে গান শুনেছিলেন যাত্রা জগতের বড় অভিনেতা ভোলা পাল। সেই ভোলা পালই প্রশান্তকে নিয়ে যান গণেশ অপেরায়। মালিক গোষ্ঠ ঘোষ ভোলাবাবুর কথায় প্রশান্তকে সুরকার হিসেবে গ্রহণ করেন। ঐ বছরেই সত্যম্বর অপেরার 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' সুর করার আমন্ত্রণ পেলেন প্রশান্ত। জালিয়ানওয়ালাবাগের পালাকার ও পরিচালক ছিলেন উৎপল দত্ত। সুরকারের ভূমিকায় এই তরুণকে অচিরেই কাজে লাগালেন শ্রীদত্ত পি. এল. টির বিভিন্ন প্রযোজনায়।

লোকনাট্যের 'দিল্লী চলো', 'সমুদ্রশাসন' (উৎপল দত্ত), ভৈরব গাঙ্গুলীর 'পাঁচ পয়সার পৃথিবী', সত্যম্বর অপেরার 'সিপাহী বিদ্রোহ', নট্ট কোম্পানির 'নবাবী পাঞ্জা', ও মাধবীর 'মার্ডার' পালায় প্রশান্তর সুরসৃষ্টি শুধুমাত্র দর্শক সমাজের মন কাড়ল না সমালোচকদের অকুণ্ঠ প্রশংসাতেও অভিনন্দিত হল। ১৯৭১। প্রশান্তর সুরসৃষ্টিতে স্মরণীয় হয়ে রইল লোকনাট্যের 'জয় বাংলা', সত্যম্বরের 'কান্না ঘাম রক্ত', 'সতী কঙ্কাবতী', নট্টর 'লালন ফকির', আর্য অপেরার 'লৌহকপাট', নাট্যভারতীর 'মানুষ নিয়ে খেলা'। ১৯৭২-এ প্রশান্তর সুর সংযোজনার তালিকায় যোগ হল লোকনাট্যের 'সন্ন্যাসীর তরবারী', 'জানোয়ার', নট্টর 'আঁধারের মুসাফির' ও গণেশ অপেরার 'ভুলি নাই' প্রভৃতি। ১৯৭৩-এ সুরকারের ভূমিকায় প্রশান্তকে পাওয়া গেল লোকনাট্যের 'ঝড়' ও 'অপরাধ', সত্যম্বরের 'খনা' ও 'রাত্রি রমণী', গণেশ অপেরার 'সন্তান' ও হাটে বাজারে' এবং তরুণ অপেরার 'কাল-মার্কস' পালায়। সুরসৃষ্টির কৃতিত্ব স্বরূপ প্রশান্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত যাত্রা উৎসবে বিচারকদের রায়ে শ্রেষ্ঠ সুরকারের সম্মানে ভূষিত হলেন।

কলকাতায় জন্ম হলেও সুরকার গীতিকার ও সুগায়ক প্রশান্ত ভট্টাচার্যর শৈশব কেটেছে পুরুলিয়ায়। বাবা খগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য খ্যাতিমান চিকিৎসাবিদ হয়েও সংগীতচর্চা করতেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় প্রশান্তর সংগীত জীবনের শুরু। কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে কিছুকাল পড়বার পর প্রশান্ত বম্বে পাড়ি দেন। ওখানে একদিকে হাফিজ আহমেদের কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালিম অপর দিকে বম্বের আকাশবাণীতে নিয়মিত শিল্পী হিসেবে যোগ দেন। বম্বেতে 'রাজনীতি' ছবিতে প্রথম নেপথ্য কণ্ঠ দান করেন আশা ভোঁসলের সঙ্গে একটি দ্বৈত সংগীতে। এরপর আরও কয়েকটি ছবিতেও কণ্ঠ দেন।

১৯৬১ সালে কলকাতায় এসে গ্রামোফোন কোম্পানির ট্রেনারের ভূমিকা গ্রহণ করেন শিল্পী। মিণ্টু ঘোষের কথা ও প্রশান্তর সুরে সে বছর রেকর্ড করেন গায়ত্রী বসু। পরের বছর কলম্বিয়া থেকে নিজের সুরে গান রেকর্ডবদ্ধ করেন প্রশান্ত ভট্টাচার্য। এরপর সুরকার ও গীতিকারের ভূমিকায় প্রশান্তকে পাওয়া যায় নিতাই গোস্বামী, উৎপলা গোস্বামী, প্রতিমা ব্যানার্জী প্রমুখ শিল্পীদের গানের সুর রচনায়।

বাংলা ছবিতে প্রশান্তর প্রথম কণ্ঠ শোনা যায় 'বনজ্যোৎস্না'তে। মৃণাল সেন পরিচালিত 'কোরাস' ছবিতে সুরকারের ভূমিকা নেন তিনি। তারপর অনেকগুলি পালায় গানের সুরসৃষ্টির জন্যে চুক্তিবদ্ধ হন শ্রীভট্টাচার্য। এই তালিকায় বিশেষ উল্লেখ্য নবরঞ্জন অপেরার 'মাও-সে-তুঙ' ও 'সবুজের অভিযান'।

সুরকার প্রশান্তবাবু এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, "যাত্রায় এ্যাপিয়ার কনসার্ট, ব্যাক গ্রাউণ্ড মিউজিক, গানের সুর প্রসঙ্গে আমাকে প্রথম প্রথম খুবই ভাবিয়ে তুলতো বলেই, একটা বড় রকম পরিবর্তন এনে দিতে পেরেছিলাম। শুরুর কনসার্টের বিশেষ কোন চরিত্র ছিল না, যে যা পারতেন তাই বাজাতেন, আমি সেই টাইটেল মিউজিকের আলাদা একটা চরিত্র এনেছিলাম প্রথমেই। নাটকের বিষয়বস্তু এই টাইটেল মিউজিকের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করি।" আরও অনেক নতুনত্ব এনেছিলেন সুরকার প্রশান্ত ভট্টাচার্য, তার মধ্যে বিশেষ ভাবে যা উল্লেখ করার মত তা হলো, অতীতে অনেক পালায়, ধরা যাক আব্দুলের কোন আসরে দুঃখের সিনে এক রকম ব্যাকগ্রাউণ্ড

মিউজিক বাজত, সেই দৃশ্য যখন্ বজবজের কোন আসরে তখন অন্য রকম ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক বাজানো হতো। বজবজে যা বাজলো হয়তো কোচবিহারে তা বাজল না, এই স্থূল ব্যাপারটা প্রশান্ত ভট্টাচার্য নিশ্চিহ্ন করে দেন প্রথমেই। প্রশান্ত ভট্টাচার্য আরও বলেছিলেন, যাত্রায় অনেক অসুবিধা অনেক কম্প্রোমাইজের ভিতর দিয়ে কাজ করতে হয়। আজকের যাত্রা উইণ্ড মিউজিকের ওপর (ফুঁ দিয়ে বাজানো) নির্ভরশীল, তারের যন্ত্র নেই বলা চলে, যাত্রা সুরের এটা বড় অন্তরায়। যাত্রার বহু শিল্পী প্রশান্তবাবুর তৈরি।

॥ প্রশান্ত ভট্টাচার্য ॥

যাত্রায় আর একজন সুরকার যিনি কাজ করেছেন অল্প কিন্তু সব কাজেই এনেছেন বৈচিত্র্য। তিনিও প্রশান্ত ভট্টাচার্য। এক জগতে একই নামের দু'জন বলে শুধু না, ইনি আগের প্রশান্ত ভট্টাচার্যের অনেক পরে যাত্রায় যোগদান করায় শুধু প্রশান্ত ভট্টাচার্য। প্রথম জন বড় প্রশান্ত ভট্টাচার্য, দ্বিতীয় জন শুধু প্রশান্ত ভট্টাচার্য। ১৯৪৩ সালে ২৬ জুলাই শক্তিকণ্ঠ ভট্টাচার্যের ছেলে প্রশান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম কলকাতার শিয়ালদা অঞ্চলে। শিশুকাল থেকেই সংগীতের প্রতি আকর্ষণ ছিল বোধ হয় বংশ রক্তের প্রভাবে। প্রশান্তর ঠাকুর্দা রজনীকান্ত ভট্টাচার্য ছিলেন সংগীতজ্ঞ। যা হোক, মডার্ণ হিস্ট্রিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ পাশ করার পাশাপাশি প্রশান্ত ওয়ার্ধা ইউনিভার্সিটি থেকে হিন্দিতে স্নাতক হন। যাত্রায় সুরকার হিসেবে প্রথম যুক্ত হন নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা ও নাট্যভারতীর সঙ্গে। তরুণ অপেরার একাধিক পালায় সুর রচনা করে প্রশান্ত খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর সুরারোপিত কয়েকটি প্রখ্যাত পালা হলো লেনিন, স্তালিন, বিপন্ন বসুধা, হিটলার ইত্যাদি। প্রশান্ত মূলতঃ গায়ক। প্রথম রেকর্ড প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে মেগাফোন থেকে। প্রায় ৩০ খানা রেকর্ড তাঁর প্রকাশিত হয়। তামিল ভাষার ছবি 'কর্ম কা ফল'-এ সুর দেন তিনি। পঃ বঃ সরকার প্রযোজিত 'অধিনায়ক'-এর সুরকার প্রশান্ত। আজকের যাত্রা জগতে প্রতিভা আর দক্ষতার মূল্য কম বলেই প্রশান্ত যাত্রায় বেশি এগুতে পারেননি।

॥ শিবেশ বিশ্বাস ॥

যাত্রা দর্শকদের পছন্দের সঙ্গে সমানভাবে তাল রেখে সুরকার শিবেশ বিশ্বাস তাঁর কম্পোজিশানের স্টাইল পরিবর্তন করেছেন, গতি বৃদ্ধি, তাল আশ্রিত অথচ সহজ পদ্ধতিতে, যে কোন মানুষ যাতে সহজে বুঝতে পারে বা গাইতে পারে সেদিকে মন রেখেই সুর রচনা করেন তিনি। ১৯৫৫ সালের ১৯ ডিসেম্বর, কলকাতায় জন্ম নেওয়া এই সুরকার প্রথম শিক্ষা নেন মিঃ এন. ফার্নান্ডেজের কাছে। যাত্রায় সুরকার হিসেবে প্রথম আসেন লোকনাট্যে। তারপর একাধিক দলে সুর দেন। শিবেশ বিশ্বাসের সুরারোপিত হিট পালা "হানাবাড়ির কান্না"। এছাড়া তাঁর সুরারোপিত কয়েকটি পালার নাম, মা আমার মাটি আমার, শ্রীমতী ভয়ঙ্করী, গান্ধারী জননী, বিমাতা কৈকেয়ী, ভিখারী ঈশ্বর, মহাভারতের মা, ভগবানবাবু আরও।

॥ সুধীর বসু ॥

যে সুধীর বসুকে কলকাতার চিৎপুর থেকে চাকদার যাত্রা মহলের বহু মালিক কখনও ১০ টাকা কখনো ৫০ টাকা আবার কখনো শূন্য টাকায় বহু পালার সুরকার হিসেবে কাজে লাগিয়ে স্বার্থ সিদ্ধ করতেন, যে সুধীরবাবু সংসারের তীব্র দারিদ্র্যের যন্ত্রণা থেকে যেন-তেন ভাবে একটু মুক্তির জন্য বহু দলের পালা 'বায়না' করে দিয়ে নামমাত্র দালালি পেয়েই তৃপ্ত হতেন, যে সুধীরবাবু বহু যাত্রা দলের মালিকের, একাধিক নেতা গোছের মানুষের এক ডাকে ছুটে গিয়ে পাশে দাঁড়াতেন, কোন অনুষ্ঠানে, কোন যাত্রা পালার উদ্বোধনের সভাপতি-প্রধান অতিথি-সাংবাদিক জড়ো করে দেবার নির্দেশ পেয়েই জড়ো করে দিতেন, যে সুধীর বসু 'দর্পণ', 'নতুন খবর' এবং আর কিছু পত্র-পত্রিকায় যাত্রার মানুষদের কথা লিখতেন, একাধিক পুরস্কার বিতরণী কোম্পানি তাদের নীতি ও

বার্ষিক সিদ্ধান্তের সাফল্যের জন্য গোপনে যে সহজ-সরল সুধীর বসুকে এজেন্ট হিসেবে ব্যবহার করতেন, জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যে সুধীর বসু এই সব পুরস্কার এবং সেই পুরস্কার প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঘৃণা করতে শিখেছিলেন, এইচ. এম. ভি'র সুখ্যাত ক্ষিতীশ বসুর মত সংগীত বিশারদ বা গবেষক যে সুধীর বসুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সেই সুধীরবাবু কবে, কখন, কোথায়, কীভাবে একরাশ ব্যর্থতার গ্লানি বুকে নিয়ে হারিয়ে গিয়েছিলেন তার খবর রাখত না কেউ।

১৫ মে, ১৯৮৮ সালে 'যাত্রা অর্ঘ্য' পত্রিকাই এই মৃত্যুর খবর প্রকাশ করেছিল।

॥ স্বপন পাকড়াশী ॥

যাত্রার নবীন সুরকারদের মধ্যে প্রশংসার জায়গাটি অল্প সময়ের মধ্যে করে নিতে পেরেছেন এই সুরকার। ১৯৫১ সালের ১২ নভেম্বর, কলকাতায় ডাঃ দ্বিজেন্দ্রলাল পাকড়াশীর এই ছেলের জন্ম। সিটি কলেজ অফ কমার্স থেকে গ্রাজুয়েট হয়ে আসার মধ্যেই স্বপন সংগীত চর্চায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে জড়িয়ে রেখেছিলেন। অভিনেতা সৈকত পাকড়াশী, সুরকার স্বপন পাকড়াশী, এই ব্যাপারটা অবশ্যই একটা পারিবারিক ঘরানার ছবি আঁকে। স্বপন প্রগ্রেসিভ কালচারাল গ্রুপ তৈরি করে যেমন একক সংগীত পরিবেশন করেন তেমনি নৃত্যনাট্যেও প্রশংসিত। গ্রুপ থিয়েটারে সুর দিতেন। সেখান থেকে যাত্রার অভিনেতা তপন গাঙ্গুলী ওঁকে আনেন যাত্রায়। প্রথম যাত্রালোক, পরে নব অম্বিকা, নাট্য কোম্পানি, রাজদূত, যাত্রাভারতী, মঞ্জরী অপেরা, গণনাট্য, অলিম্পিক অপেরার পালায় সুর সংযোজন করেন।

* * * * * *

যাত্রায় যত বেশি গুড় ঢালার রেওয়াজ এসেছে, ব্যবসা তত বেশি মিষ্টি হয়েছে। যত বেশি মিষ্টি হয়েছে তত বেশি যাত্রা বায়না করে নিয়ে গিয়ে মরশুমী ব্যবসা যাঁরা করেন সেই নায়েকদের টিকিটের হার বৃদ্ধি করা সহজ হয়েছে। যুগ পাল্টে যাচ্ছে, সুতরাং যুগের চাহিদা মেটাবার জিগির তুলে যাত্রার মালিকপক্ষ গ্রাম-গঞ্জের লক্ষ লক্ষ সাধারণ, অতি সাধারণ মানুষের মন নিয়ে খেলা করেছেন। আমরা যাঁরা বিলেত-আমেরিকা অথবা দিল্লী-বোম্বাই দেখিনি তাদের কাছে ওগুলোর যেমন তীব্র আকর্ষণ আছে, আমরা যেমন বিলিতি চমকে মজি, বিদেশ থেকে একটা ডিগ্রি যেন তেন উপায়ে আনতে পারলে সেই গাঁয়ের যোগীকে ভিক্ষা দিই, ঠিক তেমনি গ্রাম-গ্রামান্তরের মাটির গন্ধ মাখা মানুষগুলো, রোদে-পোড়া, জলে ভেজা মানুষগুলো যাঁরা এখনও কলকাতা দেখেননি অথবা কলকাতার জিনিস জানতে পারলে হুমড়ি খেয়ে পড়েন সহজ-সরল মন নিয়ে, তাঁদের সব চাইতে দুর্বল সেই জায়গাটাকে জয় করার কাজ যাত্রার মালিকরা চালিয়ে আসছেন বহু যুগ ধরে। এক সময়ে তাই যাত্রার হ্যাণ্ডবিলে কিছু কিছু শিল্পীর নামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হতো "ষ্টার", "মিনার্ভা", "রঙ্গমহল"। পরবর্তী সময়ে চালু হলো "ফিল্ম" শব্দটি জুড়ে দেওয়া। এরপর এলো "চিত্র-মঞ্চ-বেতার খ্যাত", তারও পর অর্থাৎ এখন জুড়ে দেওয়া হয় "চিত্র-মঞ্চ-বেতার ও দূরদর্শন খ্যাত"। এখনও পর্যন্ত সন্তু মুখোপাধ্যায়, ভিক্টর ব্যানার্জী, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে অনেক নামকরা ফিল্ম ষ্টারের নামের সঙ্গে যুক্ত করা হয় "ফিল্ম" বা "বিদেশ প্রত্যাগত চিত্রতারকা"! এ সবই ঐ সাধারণ, অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত লক্ষ লক্ষ মানুষের দুর্বল জায়গাটিকে খোঁচা দিয়ে ব্যবসায় সাফল্য আনার ঝোঁক। সিনেমার সর্বস্তরের প্রভাব প্রকট হয়েছে যাত্রায় ঠিক এই দৃষ্টিকোণ থেকে।

যাত্রায় বেহালার যেমন অপমৃত্যু ঘটিয়ে চমকের হাত ধরে এসেছে সিন্থেসাইজার, ইলেকট্রিক গিটার, 'বিবেক' লজ্জায় গা ঢাকা দিয়েছে বলে যেমন গায়ক-নায়ক অন্য ফর্মে, তেমনি গ্রাম-গঞ্জের সহজ সরল মানুষের পকেট থেকে, আঁচলের খুঁট থেকে, লক্ষ্মীর ঝাঁপি থেকে শেষ টাকা টুকু তুলে আনবার জন্যেই যাত্রায় সিনেমা থেকে আনা হয়েছে স্বনামধন্য সুরকারদের। অনেক ক্ষেত্রে সুবিখ্যাত সুরকার-কণ্ঠশিল্পীকে টুকরো টুকরো করে কেটে আসরে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়

বলে, তাঁদের কণ্ঠ বা যন্ত্র মূর্চ্ছনার টেপ আসরে বাজাবার আগে, বিজ্ঞাপনের মুন্সিয়ানায় প্রচার করে দেওয়া হয়েছে "অমুক আসছেন মন মাতাতে"। অবশ্য গানের গলা আছে, অথচ সুর-তাল-লয় প্রসঙ্গে অজ্ঞ শিল্পীরা যে এতে উপকৃতই হয়েছে একথা মানতেই হবে। যা হোক, এ যাবৎকাল যে সব স্বনামখ্যাত সুরকার, নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী, যন্ত্রী ফিল্ম থেকে এসে যাত্রা পালায় নিজেদের যুক্ত করেছেন তাঁরা হলেন ঃ অনিল বাগচী, অমল মুখোপাধ্যায়, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় দাস, অহীন ঘোষ, আনন্দশঙ্কর, কার্তিককুমার-বসন্তকুমার, কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গা সেন, নীতা সেন, মান্না দে, রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, পশুপতি ভট্টাচার্য, ভি. বালসারা, রাজেন সরকার, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, সাগর সেন, শ্যামল মিত্র, চণ্ডীদাস বসু, রঘুনাথ দাশ, হাবুল দাস, শুভ জোয়ারদার, নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুহৃদ মিত্র, মনীন্দ্র ব্যানার্জী, দুলাল নন্দী, দিলীপ চক্রবর্তী, লক্ষ্মণ দাস, চন্দন শঙ্কর, শৈলেশ রায়, হাবুল দাস, ভূপেন হাজারিকা, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, অনল চ্যাটার্জী, অনুপ জালোটা, রঘুনাথ দাস, রবীন্দ্র জৈন, কল্যাণ সেন বরাট, নেপাল দাস, নির্মলেন্দু চৌধুরী, কালিপদ সেন, জগন্নাথ ধর, প্রভাত ব্যানার্জী, দেবাশিস দাশগুপ্ত আরও অনেকে।

এরই মধ্যে অনিল বাগচীর পুত্রদ্বয় অলক বাগচী, অধীর বাগচী, রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় এঁরাও সুরকার হিসেবে কাজ করেছেন, কেউ কেউ করছেন। ঠিক সেইভাবে যাত্রা গানের বাণী প্রসঙ্গ এসে যায়।

এক সময়ে অধিকাংশ পালাকারই লিখতেন গানের বাণী। স্বনামধন্য ব্রজেন দে তাঁর গানের বাণীতে নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন। ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় ছেলেবেলা থেকে কবিতা রচনা করতেন, সুতরাং গানের বাণীতে তাঁর আলাদা মাধুর্য ছিল। কিন্তু যাত্রার মালিকরা সে ব্যাপারটাও বাদ দিলেন না। তাঁরা যাত্রায় আমদানি করলেন স্বনামধন্য গীতিকারদের। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীলবরণ, উজ্জ্বল বিশ্বাস, বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য, শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র ঘোষ আরও অনেকে। উপরোক্ত তালিকার সকলের ওপর বিস্তারিত লেখার দায়িত্ব আগামী প্রজন্মের কোন যাত্রাপ্রেমী অবশ্যই নেবেন আশা করা যায়।

॥ যন্ত্রী সংঘ ॥

যাত্রার পালা যদি হয় একটি মানবদেহ, তা হলে অভিনয় তার হৃদযন্ত্র। অভিনয় যদি হৃদযন্ত্র তা হলে সেই যাত্রার যন্ত্র মূর্চ্ছনা অবশ্যই এমন একটি অঙ্গ যা পঙ্গু হলে যাত্রা অর্থহীন। সুতরাং যাত্রায় যন্ত্রীসংঘের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। যাঁদের সম্মিলিত যন্ত্র মূর্চ্ছনায় একযোগে জেলার পর জেলা, মহকুমার প্রতিটি শহর ও শহরতলি, গ্রাম-গ্রামান্তর প্রতি সন্ধ্যায় মুখর হয়ে ওঠে, যাঁদের অনবদ্য বাদ্য বাদনে আকাশ-বাতাস, কুঁড়ে-ইমারৎ এক সাথে খুশিতে দুলে ওঠে, যে যন্ত্রশিল্পীদের সম্মিলিত যন্ত্র আহ্বানে মানুষ হয় ঘর ছাড়া, মন হয় উচাটন, হৃদয় ময়ূরের মত নেচে ওঠে সেই শিল্পীদের মনে রাখে না কেউ। যাঁদের বাঁশের বাঁশি মন মাতাল করে, যাঁদের বেহালার সুর উদাস করে, যাঁদের হারমোনিয়ামের সুর হিল্লোল তোলে, যাঁদের তবলা-খোল-কানাড়া উপলব্ধির গোড়া ধরে নাড়া দেয়, যাঁদের ক্ল্যারিওনেট, কর্ণেট, এ্যালর্থন, পিয়ানো অ্যাকোর্ডিয়ান শিহরণ এনে দেয়, সেই শিল্পীরা সরকারি, বেসরকারি বা কোন শিক্ষাকেন্দ্র থেকে কোনভাবেই সমাদৃত, পুরস্কৃত বা সম্মানিত নন। গ্রামগঞ্জ থেকে এসে যাত্রার মরশুমে দলের সঙ্গে থেকে গ্রাম-গঞ্জের লক্ষ মানুষের চিত্তবিনোদন করেন অথচ ওঁদের চিত্তে থাকে অবজ্ঞা আর অবহেলার ক্ষত। আমি হয়তো প্রতিটি শিল্পীর নামের তালিকা পূর্ণ করতে পারিনি, কিন্তু যাঁদের অন্ততঃ নামটুকু ইতিহাসের পাতায় চিরজন্মের মত ধরে রাখার চেষ্টা করলাম, মনে রাখতে হবে এঁদের প্রায় শতকরা ৯৮ জন আসেন বিভিন্ন জেলার দুর দূরান্তরের গ্রাম থেকে। যাত্রা মরশুমের কয়েক মাস ঘর ছেড়ে-সব ছেড়ে

যাযাবর জীবন যাপন করেন। মাঝে-মাঝে এবং মরশুম শেষে ঘরে ফিরে গিয়ে কেউ ক্ষেত খামারে কাজ করেন, কেউ বা যুক্ত থাকেন বিভিন্ন কাজে।

এঁদের মধ্যে এমন বহু শিল্পী আছেন যাঁরা পূর্বপুরুষদের প্রতিভা আর দক্ষতার উত্তরাধিকারী। যিনি কোন বিষয়ে হয়তো ওস্তাদ বাজিয়ে, অনুসন্ধানে জানা যাবে, তিনি হয়তো শেখেননি কারও কাছে, প্রতিভা গুণে ওস্তাদ হয়েছেন।

আবার কেউ কেউ তালিম নিয়েছেন গ্রাম-গঞ্জের সাজঘরে। কারও শিক্ষা পূর্বপুরুষের কাছে। এঁদের মধ্যে এমন বহু জন আছেন যাঁরা এক যোগে একাধিক বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারেন। ৩০।৪০টি তবলা পাশাপাশি রেখে লহরায় শিহরণ জাগাতে পারেন!

মনে রাখতে হবে, এঁদের মধ্যে নানাভাবে অনেককেই হারিয়েছে যাত্রা জগত। সেই যন্ত্র-শিল্পীদের একটি তালিকা এখানে দেওয়া হলো। সেই সঙ্গে জানিয়ে রাখা ভাল, যাত্রার বিস্ময়কর বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার আসর থেকে বিদায় নিয়েছে এমন অনেক যন্ত্র যা শোনার জন্য একদা দর্শকরা হতেন ব্যাকুল। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় বেহালার কথা।

হারিয়ে গেছে সেই খোলবাদ্য। প্রায় নেই সেই তার সানাই। তবুও যা আছে এবং যার আবির্ভাব ঘটেছে তা হলো, হারমোনিয়াম, কর্নেট, জুড়ি (এক সময় এঁরা মন্দিরা বাজাতেন, এখন প্রায় উঠে গেছে), তবলা, খোল, ক্ল্যারিওনেট, বাঁশের বাঁশি ইত্যাদি। এসেছে ইউনিভক্স, ক্যাসিও, ইলেকট্রিক গীটার, ইয়ামাহা, জাজ সেট, সিন্‌থেসাইজার ইত্যাদি। তার জন্য যাত্রার সঙ্গে জড়িয়ে আছেন কয়েকশত শিল্পী। এঁদের অধিকাংশই বিভিন্ন জেলার মানুষ। অধিকাংশ শিল্পীই বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী। অথচ এঁদের কারও বিশেষ স্বীকৃতি নেই।

এই ইতিহাসের পাতায় সেই সব শিল্পীর প্রতিভা ও দক্ষতার ওপরে আলাদা ভাবে যেমন কোন আলোচনা, পর্যালোচনা সম্ভব হলো না, তেমনি সকলের পরিচয় দানের ভিতর দিয়ে মূল্যায়নও সম্ভব নয়। শুধু মাত্র নামের তালিকা পেশ করা হলো। কিন্তু কারা কোন যন্ত্রটি বাজান তা আলাদা করেও উল্লেখ সম্ভব হয়নি। শিল্পী তালিকা এই রকম ঃ অনাদি মাইতি, অসীম মুখার্জী, অনিল মাইতি, অরিন্দম বিষয়ী, অনিল মাজি, অশোক মল্লিক, অনুকূল দাশ, অশোক চক্রবর্তী, অসিতবরণ পাল, অর্জুন পাখিরা, অতনু বেরা, অনিল পাল, অরূপ মল্লিক, অজয় ভুঁইঞা, অমল রায় চৌধুরী, অমলেন্দু নাইয়া, অমূল্য পুরকায়েত, অনুপ মল্লিক, অসিতকুমার, অজিত দাস, অধীর হালদার, অজিত হালদার, অশোক নাথ, অশোক রায়, অনিল বৈরাগী, অজিত বিশ্বাস (পাগলা), অদ্বৈত শেঠ, অমল দাস, অজিত বোস, অবিনাশ সরদার, আশা নট্ট, আস্তিক হালদার, আনন্দ রায়, আবুল মল্লিক, ইয়াকুব আলি, উদয়ন বিশ্বাস, উদয় মাজি, উত্তম ঘড়ুই, কৃষ্ণকুমার, কমল মুখার্জী, কৃষ্ণপদ রায়, কৃষ্ণপ্রসাদ মাইতি, কৃষ্ণ সাঁতরা, কৃষ্ণপ্রসাদ মণ্ডল, কৃষ্ণচন্দ্র রায়, কৃষ্ণপ্রসাদ গারু, কমলকৃষ্ণ জানা, কেষ্ট দত্ত, কেশব গিরি, কালী নন্দী, কালীপদ সরকার, কানাই জানা, কাশেম আলি, কালীপদ সাঁতরা, কালীপদ মণ্ডল, কালোবরণ বেরা, কানাই মাল, কাজল দাস, কানাই সরদার, কার্তিক সামন্ত, কার্তিক দে, (ইনি যন্ত্রীদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত ছিলেন, রেলের চাকরি ছেড়ে যাত্রায় বাজাতে আসেন), খোকা মল্লিক, খোকন দাস, খুরসেদ আলি, গয়ারাম পণ্ডা, গঙ্গাধর পোদ্দার, গণেশ মান্না, গোরাচাঁদ সামন্ত, গোপাল বেরা, গোপাল দাস, গোপাল চক্রবর্তী, গৌরাঙ্গ দাস, গৌতম নন্দী, গৌর সামন্ত, গৌরাঙ্গ মাইতি, গৌর বৈদ্য, ঘনশ্যাম পাইক, চিত্ত নট্ট, চিত্তরঞ্জন দলুই, চণ্ডী দাস, চিত্তরঞ্জন দাস, চন্দন প্রধান, চন্দন ভৌমিক, জয়দেব মুখার্জী, জয়দেব সামন্ত, জহর পাণ্ডা, জটা দাস, তপন দাস, তপন সাউ, তপন নট্ট, তপন মুখার্জী, তপন মেন্দা, তাপস মল্লিক, তারক নট্ট, তুকারাম হালদার, তাপস রায়, তিনকড়ি হালদার, দুর্গাপদ হালদার, দীনবন্ধু বর্মণ, দেবকুমার বেরা, দেবেন নন্দী, দুলাল রায়, দিবাকর ঘরামি, দিলীপ দত্ত, ধীরেন নট্ট, ধৃতিকিশোর

মণ্ডল, নন্দ মাইতি, নরেন্দ্রনাথ পাইক, নয়ন কিশোর, নকুল, নকুল ঘড়ুই, নরেন দাস, নরেন ঘড়ুই, নারায়ণ মণ্ডল, লাল্টু, নারায়ণ নন্দী, নারান মল্লিক, নাড়ু গোপাল, নেপাল দাস, নেপাল কর্মকার, নেপাল মল্লিক, নিরঞ্জন অধিকারী, নিমাই নস্কর, নিরঞ্জন মল্লিক, নিমাই পাত্র, নিমাই নট্ট, নূপুর দাস, ননীগোপাল নট্ট, পঞ্চু পাল, পঞ্চানন হালদার, পঙ্কজ মান্না, পরিতোষ নট্ট, পরেশ পুরকায়েত, পরমেশ্বর মণ্ডল, পাঁচুগোপাল হালদার, পার্বতী দাস, পালান দাস, পার্থসারথি মাইতি, প্রশান্ত বিশ্বাস, প্রবীর পাকড়ে, প্রফুল্ল মিদ্যা, প্রশান্ত দাস, প্রফুল্ল হাজরা, প্রফুল্ল মান্না, পূর্ণেন্দুবিকাশ বেরা, পুলিন, বরেন দাস, বলরাম নস্কর, বলাই নট্ট, বলাই দাস, বলরাম বেরা, বংশী দত্ত, বরুণ দাস, বংশী দাস, বসন্ত দাস, বাদল নস্কর, বাবলু সেনগুপ্ত, বাসুদেব দত্ত, বাদল বর্মণ, বাবলু মাজি, বাবুরাম হালদার, বিদ্যুৎ বৈদ্য, বিশ্বনাথ দে, বিশ্বজিৎ হালদার, বিকাশ চুনাতি, বিদ্যুত দাস, বিকাশ পুরকায়েত, বিজয় নন্দী, বৈদ্যনাথ জানা, ভরতচন্দ্র মণ্ডল, ভক্তি গায়েন, ভজন গায়েন, ভানু দাস, ভূপেন হালদার, মনোজ ঘোষ, মণ্টু পলোবা, মনোরঞ্জন প্রামাণিক, মটর দাস, মুক্তিপদ, মদন, মহাদেব মণ্ডল, মদন পুরকাইত, মনোরঞ্জন পাত্র, মহিম সামন্ত, মনোজ মিত্র, মৃত্যুন, মদন সর্দার, মদন মুণ্ডা, মথুর দত্ত, মনোরঞ্জন বারিক, মহাদেব মাইতি, মানিক বেরা, মাধব ধাড়া, মাধব দাস, মান্যবর হালদার, মুক্তি বাগ, যুগল মিত্র, যুগল মণ্ডল, যুধিষ্ঠির নন্দী (বিরাট ঢোলে তিনি হাত দিলেই যেন মেঘের গর্জন হতো), রঞ্জু দত্ত, রতন হালদার, রতন নট্ট, রমাকান্ত মান্না, রবীন রায়, রঞ্জিৎ মিদ্যা, রঞ্জন মণ্ডল, রতন প্রধান, রতন মণ্ডল, রবীন্দ্রনাথ নাইয়া, রঞ্জন জানা, রতন পাত্র, রতন মালিক, রবি দাস, রবীন দাস, রামচন্দ্র মাইতি, রাধেশ্যাম নন্দী, রাধাকান্ত নন্দী (স্বনামধন্য তবলচি), রাম নট্ট, লক্ষ্মণ নট্ট, লক্ষ্মী বাগ, লক্ষ্মণ নন্দী, লালমোহন প্রধান, শম্ভুনাথ খাড়া, শঙ্কর কুণ্ডু, শঙ্কর মণ্ডল, শঙ্কর নট্ট, শরৎবাবু, শশাঙ্ক মণ্ডল, শীতল দত্ত (নেচু মাষ্টার), শ্রীবাস মাইতি, শ্রীপতি পাত্র, শান্তিরঞ্জন মণ্ডল, সত্যনারায়ণ কয়াল, সমীর মুখার্জী, সমর ঘোষ, সণ্টু রায়, স্বপন দাস, স্বপন জানা, স্বপন মাইতি, স্বপন, সৃষ্টিধর মাইতি, সৌরেন মাইতি, সুনীল হালদার, সুনীল ঘোষ, সুশীল ঘোষ, সুনীল অধিকারী, সুরেশ দাস, সুবোধ মজুমদার, সুধীর বারুই, সুকুমার ঘোষ, সুশান্ত মাইতি, সুভাষ মণ্ডল, সুকুমার কারক, সুকুমার সামন্ত, সুখরঞ্জন, সাধন হালদার, শেখ বুলবুল, শেখ বাদল মণ্ডল, হারাণ নট্ট (অবিস্মরণীয় বাদ্যযন্ত্র শিল্পী, ইনি এক সঙ্গে একাধিক যন্ত্র বাজাতে পারদর্শী ছিলেন।) হরিপদ দাস, হিরন্ময় বিশ্বাস, হলধর বাগ, হরেন হালদার, হিমাংশু গাঁইত, হিমাংশু ধাড়া, হরেকৃষ্ণ জানা, ষড়ানন তেওয়ারি, ক্ষুদিরাম মাইতি।

* ইউনিভক্স প্রথম বাজে "আনন্দলোক" যাত্রা প্রতিষ্ঠানে। পি. সি. সরকারের গ্রুপ থেকে রবীন সিন্‌হা এসেছিলেন যিনি বাজাতেন শোনা যায়, তখন পারিশ্রমিক হিসেবে পেতেন প্রতিদিন ৪০ টাকা, জলপানি ৫ টাকা।
* ক্যাসিও প্রথম হেমাঙ্গ বিশ্বাস চালু করেন নিউ প্রভাসের "হো-চিন মিন" পালায়।
* ইয়ামাহা, প্রথম বাজান যাত্রায় পার্থ মাইতি।

৷৷ পার্থসারথি ভট্টাচার্য ৷৷

আজকের যাত্রায় নৃত্যশিক্ষক পার্থসারথির খ্যাতি সুবিদিত। কমলাপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের ছেলে পার্থসারথির জন্ম ১৯৫৬ সালের ৬ আগষ্ট। বাগবাজার। সিঁথি রামকৃষ্ণ সংঘ স্কুল থেকে পাশ করে মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। পার্থর মা পার্থর সাংস্কৃতিক জীবনের মহাগুরু। সুতরাং বাইরের গুরুর কাছ থেকে নৃত্য শিক্ষা করতে হয়নি তাঁকে। পার্থর সব বিষয়ে প্রথম শিক্ষা মায়ের কাছে। এই মা একদা নাম করা শিল্পী ছিলেন বেতারে। ১৩৯২ সনে নব অম্বিকা নাট্য কোম্পানির 'সাহী সুলতানা' পালার ৩নং দৃশ্যের একটি নৃত্য কম্পোজ করতে নির্দিষ্ট নৃত্য শিক্ষক না পারায় সুরকার স্বপন পাকড়াশী পার্থসারথিকে নিয়ে আসেন। সেই প্রথম কম্পোজড্ ভালোই খ্যাতি পান।

এরপরই পার্থ সুযোগ পান নট্ট কোম্পানিতে। ওখানে নৃত্য শিক্ষক হিসেবে মুন্সিয়ানার সঙ্গে কাজ করতে করতে জনপ্রিয় হন। একে একে প্রায় সব বড় দলেই কাজ করেছেন। পরে স্বনামধন্য শম্ভু ভট্টাচার্য, পিনাকী রায়, থাঙ্কমণি কুট্টির কাছে নাচ শিখেছিলেন। বাংলা ঢোল, অভিনয়, ক্যারাটেতেও পার্থ দক্ষ। বাংলা থিয়েটারে নৃত্য শিক্ষকের কাজ করেছেন।

॥ নৃত্য শিক্ষক চিত্তশঙ্কর ॥

১৯২৫ সালে ফরিদপুরের মাদারিপুর সাবডিভিশনের কবিরাজপুর গ্রামে মামা বাড়িতে জন্ম। মাত্র ১৩ বছর বয়সে বাবার মৃত্যু। সংসারের চাপে চাকরির খোঁজে নামতে হয় তাঁকে। এর মধ্যে অবশ্য প্রথমে কবিরাজপুর মাইনর স্কুল, পরে কবিরাজপুর এম. ই. স্কুল থেকে কালামির্দ্দা হাইস্কুলের ছাত্র চিত্তশঙ্কর কিন্তু ছেলেবেলা থেকে গান আর নাচে মামা বাড়িতে তালিম নিয়েছিলেন। অভিনয় করেন 'প্রাণের দাবী'তে প্রথম। 'সিরাজের স্বপ্ন' নাটকে ছোট সিরাজ হন তিনি। বৈশাখ মাসে গ্রামে হতো "কাইলের কাজ", শিব-কালী সেজে নাচ। এতে পার্বতীও নাচতেন। তারপর ১৩৫০ সালে চলে আসেন কলকাতায়। ঐ সময়ে নট্ট কোম্পানির গাইয়ে জীবন ভট্টাচার্য ছিলেন চিত্তবাবুর মামা। তাঁর জন্যে আর একজন জ্ঞাতি মামার সঙ্গে যোগাযোগ হয়। তিনি ছিলেন টেক্সম্যাকো কোম্পানির বেয়ারা। সেই সূত্রে সেখানে 'সিন্ধু গোলক' নাটকের ডান্স গ্রুপের সঙ্গে পরিচয় হয়। তাঁরা চিত্তশঙ্করকে আসতে বলেন বঙ্গীয় কমলালয়ে। ওখানে এসে বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী কিরীট রায়ের কাছে নাচে তালিম নেন। এরপর চিত্তশঙ্কর ভর্তি হন আই. এম. সি'তে। ওরা প্রথম পাঠায় বিষ্ণুপুরে রাইফেল ট্রেনিং-এ। সিভিলিয়ান মিলিটারি সেণ্টার ক্যাম্পের ক্যান্টিন ম্যানেজারের সহযোগিতায় তৈরি করেছিলেন ছোট ছেলেদের নিয়ে ডান্স গ্রুপ। তৈরি করেছিলেন নৃত্যনাট্য "লাস্ট হান্টিং ডান্স"। তারপর পাঠানো হয় কাটনী। 'জুলুমকাস্' ডান্স ড্রামার কর্ণেল ডেকে জানতে চান চিত্ত অন্য কিছুতে যেতে চায় কিনা। চিত্তশঙ্কর জানান—চাই। তখন ওঁকে পাঠানো হয় "ফৈজি দিলখুস পার্টী"-তে। কার্তিক নায়ার ছিলেন মহম্মদ আলির পার্টীর নৃত্য শিক্ষক। মণি বর্ধনের গ্রুপের নৃত্য শিক্ষক তখন কেনেথকুমার। নট্ট থেকে প্রহ্লাদ দাস এসে 'ফৈজি দিলখুস' পার্টীতে যুক্ত হয়েছিলেলেন। চিত্তশঙ্কর কার্তিক নায়ারের সঙ্গে থেকে 'কিরাতার্জ্জুন', 'মদনভস্ম', 'জটায়ুবধ'-এ কাজ করেছিলেন। পরে সব ছেড়ে চলে আসেন কলকাতায়। যুক্ত হন ষ্টার অপেরায়। ওখানে তখন অমিয় বসু, সুধীর বসু, নিমাই চিত্রকর ছিলেন। ঠিকের দল। মা ; তিন টাকা পারিশ্রমিকে কাজ পান চিত্তশঙ্কর। একক নৃত্যে সবার মন জয় করলেন। তারপর উনি যুক্ত হন বড় খোকা, কচে, শৈলেন আর মুরারী পালের সঙ্গে। মুরারী পাল তখন মেয়ে সেজে নাচতেন। সেই মুরারী পালের সঙ্গে চিত্তশঙ্কর শুরু করলেন ডুয়েট ডান্স। এঁরা 'মহিষাসুর বধ' ডান্স ড্রামা করে খ্যাতি পান। সেই সঙ্গে চিত্তশঙ্কর গিরি বাড়িউলির মেয়ে পুষ্পিতা ঘোষ বাইজিকে নাচ শেখাতেন। সঙ্গে তবলা বাজাতেন রাধাকান্ত নন্দী। ঐ সময়ে নতুন বাজারের ওপরে থাকতেন স্বনামধন্য গোপীকিষাণের ঠাকুরদা শুকদেব মিশ্র। ওঁর ৩ মেয়ে সিতারা, অলকানন্দা, তারা। ছেলে চৌবে মহারাজ। তারা হলেন গোপীকিষণের মা। এই সময়ে স্টার থিয়েটারের শিল্পী শেফালী, চামেলি নাচ শিখতেন চিত্তবাবুর কাছে। প্রতি শুক্রবার শুকদেব বসাতেন মাইফিল। সেই সূত্রে শেফালি, চামেলি, বেবী, মেরীদের নিয়ে যেতেন সেখানে চিত্তবাবু। চৌবে মহারাজ ছিলেন চিত্তবাবুর বন্ধুর মত, তাঁর কাছে কত্থকও শিখতেন। ৭ থেকে ৯টা পর্যন্ত মাইফিল চলত। নাচের রেওয়াজের পর ১ সের দুধ খেতেন চিত্তশঙ্কর। এর মধ্যে ঠিকে পার্টীতে গীতা ভৌমিককে নিয়ে ৫ দিনের জন্য "পৃথ্বীরাজ" বইতে নাচবার জন্য যান বহরমপুর। যুগ্ম নৃত্য ছিল বইতে।

এরপর শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় যখন নাট্যভারতী খোলেন, তখন ১০৫ জন নাচিয়ে নিয়ে চিত্তবাবু যুক্ত হন। এখানে দুটো ব্যালে গ্রুপ ছিল। ছোট ব্যালে গ্রুপে নাচত বেবী, বুলা। বেবী হলো

প্রিন্সের বৌ। বুলা হলো বেবীর বোন। বড় ব্যালেতে নাচত মীরা মুখার্জী, ধীরা মুখার্জী, সন্ধ্যা দাস। মীরা আর ধীরা দুই বোন। আসামের বিখ্যাত বুকিং এজেন্ট শুকদেব মুখার্জীর স্ত্রী হন মীরা। ধীরা জড়িয়ে পড়েন বিখ্যাত বাজিয়ে পঞ্চু পালের সঙ্গে। নাট্যভারতীর মত ঠিকে দলের ১৫ দিনের যাত্রা করতে গিয়ে দেড় মাস যাত্রা হয়েছিল সেবার।

চিত্তশঙ্কর প্রথম যাত্রায় কাড়া-নাকড়া প্রবর্তন করেন 'মহিষাসুর বধ' পালায়। বাজাতেন প্রফুল্ল হাজরা। এবার চিত্তবাবু একদিকে টিউশনী করেন, অন্য দিকে তৈরি করেন ডান্স পার্টী। পার্টীতে ছিলেন শেফালি, চামেলি, বেবী, ছায়া, মালা (তখন খুব ছোট), লক্ষ্মণ হাজরা আর শেফালি দে। ইনি এসেছিলেন সাধনা বসুর গ্রুপ থেকে। ইনি শৈলেন ঘোষের স্ত্রী। এবার মাস মাইনেতে চিত্তশঙ্কর যুক্ত হন আর্য অপেরায়। ১৫০ টাকা মাইনে। এক টাকা চার আনা খোরাকি-জলপানি। এখানে চিত্তশঙ্কর প্রথম নৃত্য পরিচালক। এখানে 'রামপ্রসাদ' সুপারহিট হয়। অভিনয় করেছিলেন নিতাইরানী, পুতুলরানী, তারা ভট্টাচার্য, ছোট ফণি, মন্মথ চ্যাটার্জী আরও অনেকে। এরপর চিত্তশঙ্কর নট্ট কোম্পানির 'রাজা দেবীদাস' পালার নাচ কম্পোজার হন।

তারপর কিষাণ দাশগুপ্তের নাট্যভারতীতে কাজ করেন এবং প্রথম পুরস্কার পান। এর মধ্যে পূরবী সঙ্গীতায়নে যুক্ত হন। হন চন্ডীগড়ের বিচারক মণ্ডলীর একজন।

আই. ও. সি কর্মচারী ক্লাবের নাচ-গান শেখার বিভাগে প্রায় ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে যেমন চিত্তবাবু নাচ শেখান, তেমনি ফার্টিলাইজার অফিসার ক্লাব এবং কর্মচারী ক্লাবেরও ট্রেনার হন তিনি। পূরবী সঙ্গীতায়নের শাখা সি. পি. টি যার অনেক ছাত্র-ছাত্রী চিত্তশঙ্করবাবুর শিক্ষায় গ্রাজুয়েট হয়েছেন। দীর্ঘকাল যাত্রা দলে নৃত্যশিক্ষকতা করার পর চিত্তবাবু অবসর গ্রহণ করেন।

॥ যাঁদের কথা বলেনা কেউ ॥

এই পর্বে এমন কিছু মানুষের কথা এখানে তুলে ধরা হলো, যাঁদের বর্ণনাতীত শ্রম, নিষ্ঠা এবং মুন্সিয়ানার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে এই বৃহত্তম ব্যবসায়িক জগৎ। এঁরা যাত্রা কর্মী বলেই খ্যাত। যাত্রায় যখন 'অধিকারী' আমল, তখন ভিতরের কাজ কর্ম করার জন্য যারা নিযুক্ত থাকত, তারা যাত্রায় 'ছোকরা' নামে পরিচিত ছিলেন। যাত্রা বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে "ছোকরারা" সেই অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পেরেছে। এখন এক একটি খেতাবের অধিকারী হয়েছেন কর্মীরা। অধিকাংশ কর্মী এখন কিছু না কিছু শিক্ষিত। সচেতন। এই খেতাবগুলির বা বিশেষণের তালিকা থেকে এটাও বুঝে নেওয়া সম্ভব হয়, কে উর্ধ্বতন আর অধস্তন কর্মী। এই খেতাবগুলির মধ্যে কিছু কিছু আবার অত্যন্ত ভারী প্রকৃতির। এ থেকে ঐ ভারী প্রকৃতির খেতাবই প্রমাণ করে কর্মীটি যাত্রা প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত কতটা গুরুত্বের অধিকারী। যেমন "ফিল্ড মার্শাল", "সংযোজক", 'সর্বাধিনায়ক" ইত্যাদি। তাছাড়া খেতাবগুলির তালিকা হলো ঃ জেনারেল ম্যানেজার, অফিস ইনচার্জ, দল পরিচালক, পরিচালক, ম্যানেজার ইত্যাদি। এঁদের শিক্ষাগত মান বলতে যেটি প্রথম ও প্রধান সেটি হলো সততা ও শ্রমদানে অকৃপণ। তার মধ্যে বাংলায় চিঠিপত্র, চুক্তিপত্র এবং খেরো খাতায় হিসাব লেখার মত পুঁথিগত বিদ্যা থাকলেই চলে। আর আছে অভিজ্ঞতা ও নায়েক মহলে পরিচিতির দাম। এরও উপরে পৌঁছুতে পারেন সেই কর্মী, যিনি প্রতিষ্ঠানের বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়াতে পারবেন, নিজের সততা দিয়ে, পরিচিতি দিয়ে, বাজার থেকে সুদে টাকা এনে দিয়ে। এই ব্যবসাটা প্রশাসনিক দপ্তরগুলোর মত। মন্ত্রী পাল্টায়, মন্ত্রী যায়-আসে কিন্তু আমলা বা কর্মী পাল্টায়না। যাত্রাও তেমনি। নতুন নতুন দল তৈরি হয়, কত মালিক-প্রযোজক আসেন আবার [illegible], কিন্তু যাত্রার কর্মীরা থাকেন যাত্রাতেই। সুতরাং বহু প্রযোজক আছেন যাঁরা দল গড়ার সম[illegible]ষ্টা করেন তেমনি পুরাতন, পরিচিত, অভিজ্ঞ কর্মীদের প্রথম থেকেই সঙ্গে নিতে। অত্যন্ত সুখে[illegible]র্থা, এই কর্মীদের মধ্যে প্রতি মুহূর্তে বড় হবার, নিজেকে সব দিক থেকে উপযুক্ত করে তোলার একটা চেষ্টা থাকে। এই চেষ্টা

আর ব্যবসার গতি-প্রকৃতির জন্য এই কর্মীরা একমাত্র নিজেদের সংসারের চিন্তাটুকু ছাড়া ব্যক্তিজীবনে সব রকম আলোর বাইরে গোটা জীবনটাই কাটিয়ে দিতে দিতে প্রায় অন্য গ্রহের মানুষ হয়ে যান। সকালে চোখের পাতা মেলার পর থেকে রাত আটটা, চাইকি গোটা রাতটাই কাটিয়ে দেন যাত্রা কর্মে, যাত্রা ভাবনায়। এঁদের পৃথিবী বলতে বোঝায় যাত্রা আর যাত্রার পরিমণ্ডল। এঁরা বছরে বার কতক দু'চার দিনের জন্য দেশের বাড়িতে যান, প্রিয়জনের সুখটুকু দেখেন আর কীভাবে ঘর-বাড়ির চেহারাটুকু পাল্টানো যায় বা ক্ষেত-জমি বাড়ানো যায় শুধু সেইটুকুর দিকে তীক্ষ্ম খেয়াল রাখেন মাত্র। এক সময়ে এঁদের বলা হতো "কূপ মণ্ডুক"। বছর কয়েক হলো এই কর্মীরা সম্মিলিতভাবে যাত্রার সার্বিক কল্যাণের কথাটা মাথায় রেখে, নিজেদের অস্তিত্বের চিরস্থায়ী মর্যাদা রক্ষার জন্য সচেতন হতে শিখেছেন। আন্দোলনমুখী হয়েছে এঁদের ভাবনা। সেই ভাবনা থেকেই এঁরা তৈরি করেছেন পাকা-পোক্ত সংগঠন। নাম "যাত্রাকর্মী সংসদ"।

যাত্রা এমনই একটা জগত যেখানকার অন্ততঃ চোদ্দ আনা কর্মী জেলান্তরের বাসিন্দা! এই কর্মীদের ওপরে এই বৃহত্তম ব্যবসা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল অথচ সামাজিক স্বীকৃতি এঁদের থাকলেও কলকাতার শিল্প-সংস্কৃতি এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রের দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তাদের কোন স্বীকৃতি নেই। এঁদের কথা বলে না কেউ! কিন্তু ইতিহাস তাঁদের উপেক্ষা করতে পারে না। পারে না বলেই এই ইতিহাসের পাতায় তাঁদের নামের তালিকাকে চির অমর করে রাখা হলো। সেই সঙ্গে এমন কয়েকজনের কথা বিস্তারিত বলা হলো যাঁদের কর্ম-প্রবীণত্বকে অস্বীকার করা যাবে না।

॥ অজিত বিশ্বাস ॥

১৩৩৫ সনে খুলনা জেলার সাতক্ষিরা মহকুমার নগরঘাটা গ্রামে অশোকলাল বিশ্বাসের ছেলে অজিত বিশ্বাসের জন্ম। অজিতবাবুর ভাষায়, স্কুলের দশ ক্লাস পর্যন্ত পড়ে ব্যবসা আরম্ভ করি। কলকাতায় এসে শিয়ালদার ভেনাস হোটেল চালান। কিছুদিনের মধ্যে ভাগ্য পরিহাসে অত্যন্ত সংকটে পড়েন। মাথা গোঁজার মত বাড়ি বিক্রি হয়ে যায়। অতি বিপাকে পড়তে হয় তাঁকে। অনেক চেষ্টার পর ১৩৮৭ সনে অজিতবাবু বৈদ্যনাথ শীলের 'শিল্পীতীর্থ' যাত্রা দলের অফিস ইনচার্জ হন। এই তাঁর প্রথম যাত্রা জগতে প্রবেশ। এক টানা ৭ বছর ছিলেন শিল্পীতীর্থে। এরপর কল্পলোক ছাড়া আরও অপেরার জেঃ ম্যানেজার হন। এক পুত্র আর পাঁচ কন্যা এবং স্ত্রীকে নিয়ে অজিতবাবুর সাজানো সংসার।

॥ অবনী বাগ ॥

১৩৩৮ সনের ২ কার্তিক হাওড়া জেলার রায়চকের পাঁথিয়াগটী গ্রামে অবনী বাগের জন্ম। অবনী যখন প্রথম যৌবনের দূত তখন, মাত্র বছর বত্রিশ বয়সে স্বনামধন্য অভিনেতা সুনীল মুখার্জীর (রামুবাবু) সহযোগিতায় প্রবেশ করেন পেশাদার যাত্রা দলে। কালু রায়ের দল। সেই কালু রায় অপেরায় অভিনয়ের সুযোগ পান। এই দলের ৩টি পালা, যথাক্রমে ব্রজেন দে'র 'সোনাইদীঘি' ও 'বাঙ্গালী' এবং মহেন্দ্র গুপ্তের 'টিপুসুলতান' পালায় অংশ নেন। সোনাইদীঘি পালার নায়িকা প্রয়াত বেলা সরকারের বিপরীতে নায়ক মাধবের চরিত্রে অভিনয় করে অভিনন্দিত হন অবনী। এই দলেও ভাবনাকাজীর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন দিলীপ চট্টোপাধ্যায়। এখানে বলে রাখা দরকার, 'সোনাইদীঘি' প্রথমে সত্যম্বর অপেরায় সুপার হিট হয় এবং একটি যুগের সৃষ্টি করে। পরে এই পালাই কালু রায় অপেরায় খ্যাতির সঙ্গে অভিনীত হয়। এরপর অভিনেতা অবনী আসেন শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্যভারতীতে। এখানে শশাঙ্কবাবুর 'নবাব সিরাজদ্দৌলা', ব্রজেন দে'র 'উপেক্ষিতা' এবং নন্দগোপাল রায় চৌধুরীর 'মিলন সেতু' পালায় নায়কের চরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতি পান। এরপর একে একে কাশীনাথ পালের (কাঙালী) পরিচালনাধীন ভাণ্ডারী অপেরা, রিক্তা নাট্য কোম্পানি, নব আর্য অপেরা, জনতা অপেরা, নবরঞ্জন অপেরা, নিউ আর্য অপেরা,

ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের বহু সুপারহিট পালায় অবনী বাগ অভিনেতা হিসেবে কতখানি শক্তিমান তার দৃষ্টান্ত রাখেন। ১৩৭৮ সনে গোপাল চট্টোপাধ্যায় যখন নিউ আর্য অপেরার মালিক, তখন উৎপল দত্তের 'রাইফেল' পালাটি যুগান্তর সৃষ্টি করেছিল। আর একটি ব্যাপারেও এই দলের নাম ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে থাকবে। সেটি হলো 'বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান' জীবনীপালা পরিবেশনা। পালাটি বাংলাদেশের একাধিক আসরে অভিনীত হয়। নাম ভূমিকায় রূপদান করেন নটসম্রাট স্বপনকুমার। অবনীবাবু এই পালায় যশের সঙ্গে অভিনয় করেন।

এর পরের বছরে জীবনকৃষ্ণ দাসের নবরঞ্জন অপেরায় অবনী অভিনয়ের সঙ্গে অফিসিয়াল কাজ করার সুযোগ পান। এই দলের পরিচালক স্বনামধন্য শম্ভুনাথ ঘোষ অবনী বাগকে অভিনেতা কাম ম্যানেজার হিসেবে প্রথম প্রতিষ্ঠা দেন।

প্রদীপ অপেরা' গড়ে ওঠে অবনীবাবু, প্রদীপ দেবনাথ এবং সনৎ মুখার্জীর (পুটাই) মিলিত চেষ্টায়। ১৩৮৩ সনে আবার অবনীবাবু ফিরে আসেন নব রঞ্জন অপেরার 'লায়লা মজনু' পালায়, ১৩৮৪তে 'মহুয়া', ১৩৮৫তে বিমল মিত্রের কাহিনীর পালারূপ 'সাহেব বিবি গোলাম', ইত্যাদি অনেক সুপার হিট পালায় অবনীবাবু খ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করেন।

১৩৮৭ সনে সুশীল করাতির সাহায্যে 'রাজধানী যাত্রা ইউনিট' লীজ নেন অবনীবাবু। ১৩৮৮ সালে অগ্রগামীর কর্ণধার দীনেশ নন্দী অবনীবাবুকে কাছে টেনে নেন। সেই থেকে অবনীবাবু এই দলেই আছেন কর্মী হিসেবে। সংসার জীবনে যেমন সুখী, তেমনি কর্ম জীবনেও শত ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে থেকে অসুখী নন। বই পড়া অবনীবাবুর হবি। ছড়া ও কবিতা লেখার মনটিও তাঁর আছে।

অবনীবাবুর আর একটি বিস্ময়কর হবি হলো কলম সংগ্রহ।

৷৷ অনিল দাস ৷৷

বরিশাল নলচিঠির ভরতকাটি গ্রামের এক পাঠশালার পণ্ডিত শরৎচন্দ্র দাসের ছেলে অনিল দাসের জন্ম ১৩৪২ সনের ৩ আষাঢ়। ৩ মাইল দূরে শেখরকাঠি গ্রামে সাত বছর বয়সে দাদার কর্মস্থল বানুরিপাড়া গ্রামে চলে আসেন। ১৯৫৩ সালে এখানকার হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে বরিশালের চাখের কলেজ থেকে (ফজলুল হকের কলেজ) ১৯৫৭ সালে বি. কম পাশ করেন। ইতিমধ্যে মা মারা যান। অনিলবাবু নিদারুণ অসুস্থ হন। এই সময়ে ওঁদের বাড়ির পাশে থাকতেন কালীয়দমন গুহঠাকুরতা। অনিলবাবুর দাদা কার্তিকচন্দ্র দাসের বন্ধু। কালীয়দমনবাবু তখন নট্ট কোম্পানির ডাকসাইটে অভিনেতা। সেই কালীয়বাবুর বড় ছেলে অনিলবাবুকে নিয়ে আসেন কলকাতায় চিকিৎসার জন্য। সেটা ১৯৫৭ সাল। অনিলবাবু থাকতেন হাবড়ায় বোনের বাড়িতে। এখানে অনেকটা সুস্থ হন তিনি। চাকরি পান এল. ডি. ক্লার্ক হিসেবে স্টেট ট্রান্সপোর্টে, বেলঘরিয়া ডিপোতে। ২ বছর চাকরি করলেন। ইতিমধ্যে কলকাতায় নট্ট কোম্পানি বেশ জমিয়ে চলছিল। তখন নট্ট কোম্পানির শিল্পীতালিকায় যে ক'জন দোর্দণ্ড শিল্পী ছিলেন তাঁদের মধ্যে অমিয় বসু, কালীয়দমন গুহঠাকুরতা, মধু ব্যানার্জী, বিমল লাহিড়ী। অশ্বিনী দাস ছিলেন ম্যানেজার। একদিন কালীয়দমনবাবু নট্ট কোম্পানির কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে দুর্ব্যবহার পেয়ে চরম আঘাত পান। তখন কালীয়দমনবাবু প্রৌঢ়। এই ঘটনায় উপরোক্ত ডাকসাইটে শিল্পীরা এবং অশ্বিনীবাবু নট্ট ত্যাগ করেন। রাতারাতি অমিয়বাবু ছুটে যান তাঁর গুরুদেব কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্যের কাছে। কৃষ্ণকান্তবাবু ছিলেন শক্তি পূজারী। অমিয়বাবুর অনুরোধে গুরুদেব মা কালীর এক নাম "অম্বিকা" নামে যাত্রাদল করার অনুমতি বা পরামর্শ দেন। যা হোক 'অম্বিকা নাট্য কোম্পানি' তৈরি হলে কালীয়দমনবাবুর পরামর্শে অমিয় বসু তাঁদের দলের এক কর্মী হিসেবে নিযুক্ত করেন অনিল দাসকে। সেটা ১৯৫৮ সাল। চার বছর পর অমিয় বসু আর একটি সিস্টার কনসার্ন তৈরি করেন।

নাম রাখেন শ্রীরাধা নাট্য কোম্পানি। অনিলবাবুর ওপরে শ্রীরাধার অনেক দায়িত্ব অর্পণ করা হলো। কিছুদিন পর সুধীর ঘোষকে এই দলের ম্যানেজার করা হয়, অম্বিকার জেঃ ম্যানেজার থাকেন অনিলবাবু। ৮ বছর পর অম্বিকার পূর্ণ মালিক হন অমিয়বাবু, ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত অমিয়বাবু অম্বিকা চালান।

ইতিমধ্যে তিনি ১৯৬৯ সালে বনগাঁয়ে শো করতে গিয়ে একজন ক্ল্যারিয়নেট শিল্পীর মধ্যস্থতায় পুত্রবৎ ম্যানেজার অনিল দাসের বিয়ে দেন। শিল্পী নমিতা দাস তাঁর স্ত্রী। '৭৯ সালে অনিল দাস 'যুববাণী' নামে একটি দল তৈরি করেন। প্রযোজনা করেন 'দেবী কল্যাণেশ্বরী'। দল চালাতে অক্ষম হন। বেরিয়ে পড়েন বাইরের দলে চাকরি করতে। সত্যম্বর অপেরা, কলিকাতা যাত্রা সমাজ, নাগ ও গণবাণী, চন্দ্রলোক, জনতা, নিউ বিশ্বরূপ, লোকশিল্প, গণবীণা যাত্রা প্রতিষ্ঠানে সসম্মানে চাকরি করেছেন, জেঃ ম্যানেজার হয়ে। অতীতে জেনারেল ম্যানেজারদের স্বাধীনতা ছিল। তাই অনিলবাবু পেরেছিলেন শৈলেন মোহান্তের মত ডাকসাইটে মালিকের সংশয় কাটিয়ে পিকলু নিয়োগীকে নিয়োগ করে সত্যম্বর অপেরায় অপেরাধর্মী পালা 'একদিন রাত্রে' আসরস্থ করে হৈ চৈ ফেলে দিতে!

॥ আনন্দ চক্রবর্তী ॥

ছেলেবেলা থেকেই অভিনয়ের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ছিল। সেই আকর্ষণ থেকেই অভিনয় এবং স্টেজ ক্র্যাফ্টস সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ নেবার জন্যেই একদিন আসানসোলের ছেলে আনন্দ কলকাতায় এসে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়দের 'নান্দীকার'-এর সভ্য হন। ১৯৭১ থেকে '৭৪ সাল পর্যন্ত এখানে থেকে নিজেকে তৈরি করেন তিনি। 'তিন পয়সার পালা', 'আন্টিগোনে', 'শাহিসংবাদ', 'নটী বিনোদিনী', 'ভালমানুষ' ইত্যাদি নাটকে অভিনয় করেছেন। এই গ্রুপের আর একজন সদস্য, থিয়েটার-সিনেমার স্বনামধন্য অভিনেতা মিহির ভট্টাচার্যের ছেলে পাহাড়ী ভট্টাচার্য যখন প্রভূত অর্থ ব্যয়ে 'কলিকাতা যাত্রা সমাজ' তৈরি করেন, আনন্দ চলে আসেন সেখানে।

১৯৫২ সালের ২৭ অকটোবর ভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর ছেলে আনন্দের আসানসোলে জন্ম। তারপর লেখাপড়ার পাঠ অতি অল্প সময়ের মধ্যে চুকিয়ে দিয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। কলিকাতা যাত্রা সমাজের-এর পর বলাকা যাত্রা সমাজ, রঙ্গভূমি দলে অভিনেতা হিসেবে কাজ করেছেন। ৩ বছর কলিকাতা যাত্রা সমাজের সঙ্গে থাকার পর '৮৬ সনে আর্য অপেরা, '৮৮ সনে অম্বিকা নাট্য কোম্পানি, '৯২ সনে মৃণ্ময়ী অপেরা এবং আবার আর্য অপেরা ও কয়েকটি দলে ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছেন। মৃণ্ময়ী অপেরার 'মানস কন্যা' পালায় অভিনয় করে শ্রেষ্ঠ সহ অভিনেতা হিসেবে পুরস্কার লাভ করেন। আজও আনন্দ কাজের মধ্যে আছেন। আনন্দ চক্রবর্তীর সম্পদ হলো—হাতের লেখা!

॥ দীপক ভট্টাচার্য ॥

কলেজে ঢোকার আগে থেকেই দীপক নিজেকে কম্যুনিস্ট ভাবতে গৌরব বোধ করতেন বলেই, মেদিনীপুরের বড়শাহড়ার মাল পাড়া বিবেকানন্দ শিক্ষা নিকেতন থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ করে সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র জীবনে প্রবেশ করে, বামপন্থী নানা আন্দোলনের শরিক হন। সি.পি.এম আদর্শ থেকেই তরুণ দীপক আঞ্চলিক কমিটির সদস্য হিসেবে জড়িত হতে পেরেছিলেন। ১৯৬০ সালের ১ আগষ্ট, মেদিনীপুর অন্তর্গত বড়শাহড়ে শক্তিপদ ভট্টাচার্যের দরিদ্রের সংসারে এই দীপকের জন্ম। নিজের অঞ্চলের বামপন্থী নানা কর্মযজ্ঞের মধ্যে থেকেও সখের থিয়েটারে মাঝে মধ্যে অভিনয় করতে গিয়ে অভিনেতা হবার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তা ছাড়া ছেঁড়া সংসারে অর্থ যোগান দেবার ইচ্ছেটাও প্রকট ছিল, তাই একদিন সোজা দীপক চলে যান মেদিনীপুরের দল তারা মা অপেরায়। ভাগ্য প্রসন্ন হয়। অভিনেতার বদলে ম্যানেজারী বিভাগে

কাজ করার সুযোগ পেলেন দীপক। কিছু দিনের মধ্যে ওখানকার একজন অভিনেতার সহযোগিতায় দীপক আসেন কলকাতার রাণার যাত্রা ইউনিটে। এখানে কিছুদিন কাজ করার ফাঁকে দীপক পান অতীতের বিখ্যাত শিল্পী মধুরানী ওরফে পরবর্তী সময়ে সুখ্যাত পরিচালক মধু বড়ালের সান্নিধ্য। শ্রীবড়াল অত্যন্ত স্নেহ করতেন, যাত্রা জগতে কী ভাবে থাকলে, কাজ করলে সুনামের সঙ্গে টিকে থাকা যায় তার উপদেশ দিতেন। এরপর দীপক আবার ফিরে যান মেদিনীপুর। কিছু দিন কাটিয়ে আবার কলকাতায় এসে যুক্ত হন শান্তিগোপালের তরুণ অপেরায়। এখানে একটানা ৬ বছর কাজ করে নিজেকে তৈরি করেন। তারপর আসেন নব রঞ্জন অপেরায়। বিগত ৬।৭ বছর এ দলের গুরুত্বপূর্ণ কর্মী হিসেবে জড়িয়ে আছেন। দীপকের আর একটা গৌরব, ব্যক্তিগত সততা। এ প্রসঙ্গে তাঁর প্রকাশ্য অভিমত,—'আমি জানি যতদিন সৎ থাকবো ততদিন অর্থে-প্রাচুর্যে আমি বড় হতে পারব না। আর সেটাই হবে আমার তৃপ্তি যে আমি সারাজীবন "সৎ-এর মর্যাদা" পেয়েছি।' নব রঞ্জনে আসার পর প্রতিমুহূর্তে নানা কারণে তাঁর ভিতরকার সি.পি.এম আদর্শ খোঁচা দিয়েছে। তারপর এক সময়ে যাত্রার সর্বস্তরের কর্মীদের স্বার্থরক্ষার জন্য, সার্বিক কল্যাণের জন্য, মালিকপক্ষের সঙ্গে বিন্দুমাত্র সংগ্রামে লিপ্ত না হয়ে, মালিকপক্ষের স্বার্থক্ষুণ্ণ না করে কীভাবে কাজ করা যায় সেই ভাবনা থেকে প্রয়াত দল ম্যানেজার তারকের ওরফে সকলের 'হুলোর' সঙ্গে হাত মিলিয়ে, অনেককে সংগঠিত করে এক সময়ে তৈরি করেন "যাত্রা কর্মী সংসদ"।

এরপর চণ্ডী দাস ও আর কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে স্থায়ী আন্দোলনের জন্য ভোট পদ্ধতি চালু করেন। নতুন করে নানা অসুবিধার জন্য তৈরি হয় "পরিষদ"। পরে ট্রেড ইউনিয়ন আইন সিদ্ধ হবার জন্য 'পরিষদ'-এর বদলে তৈরি হয় "কলিকাতা যাত্রা কর্মী ইউনিয়ন"। দীপক ট্রেজারার পদে অধিষ্ঠিত হন পরপর ভোটে। দীপকবাবুর ইচ্ছা এই ইউনিয়নকে সি.আই.টি.উ অন্তর্ভুক্ত করা। কর্মীদের সর্ব ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার যেদিন আসবে সেদিনই দীপকবাবুর সার্থক হবে কর্মী জীবন।

॥ চিত্ত বসু ॥

যশোর জেলার নড়াইল সাব ডিভিশনের কাটাখোল গ্রামে বর্ধিষ্ণু বসু পরিবারে শান্তিরঞ্জন বসুর ছেলে চিত্ত বসুর জন্ম ১৯৫৫ সালে। শান্তিবাবু ছিলেন পেশায় দলিল লেখক। সংসারে আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না। দেশ ছেড়ে চলে আসার পরও বাবা ছেলেদের মানুষ করার ব্যাপারে কোন ত্রুটি করেননি, তবুও অর্থনৈতিক সাহায্য বাড়িতে দরকার ছিল। তাই বেড়াচাঁপার দেউলিয়া উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেই চাকরিতে নিজেকে জড়ান চিত্ত। ভোলানাথ অপেরার দল পরিচালক গোপেন দেব চিত্তকে প্রথম প্রম্পটার এবং সহকারী ম্যানেজারের সুযোগ দেন ১৯৭২-৭৩ সালে। ভোলানাথ অপেরায় এক টানা ৭ বছর থাকার পর আসেন গণেশ অপেরায়। এখানে ৩ বছর অফিস ম্যানেজার ছিলেন তিনি। পরে বিশ্বরূপ যাত্রা সংস্থার জেঃ ম্যানেজার হন। পরে আবার গণেশ অপেরায় ১ বছর কাজ করার পর চিত্ত আসেন অপ্সরায়। তারপর শিল্পীস্বর্গে। আজও তিনি স্বকর্মে যুক্ত আছেন ভারতী অপেরায়। চিত্ত বসু যাঁদের সান্নিধ্যে থেকে কাজ করেছেন, যাঁদের মধ্যে প্রকৃত উদার চিত্তের প্রকাশ দেখেছেন তাঁরা হলেন, পালাকার-অভিনেতা নির্মল মুখোপাধ্যায়। মূলত এই নির্মলবাবুর কাছেই চিত্তর হাতেখড়ি এবং রাখাল সিংহ, পান্না চক্রবর্তী, সুপ্রিয়া দেবী, কুমার ইন্দ্রনীল, কবিতা চক্রবর্তী, শিখা বোস, স্বর্ণালী ঘোষ আরও অনেকে কাছে চিত্ত কৃতজ্ঞ। মা, বাবা, ভাই, বোন সবাইকে নিয়ে চিত্ত বসুর সাজানো সংসার।

॥ চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥

নদিয়া জেলার শান্তিপুরের চাঁপাতলা গ্রামে সত্যরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে, চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৩৩৬ সনে। ইনি চিৎপুর যাত্রা জগতে চারু চ্যাটার্জী নামে খ্যাত। স্কুলের ছাত্র

চারু প্রথম কৃষ্ণ যাত্রায় নিমাই চরিত্রে সখের অভিনয় করেন। ১৯৪৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার পর চারুবাবুদের আর্থিক সংকট চরমে পৌঁছয়। চাকরির জন্য অনেক চেষ্টা চালিয়ে অবশেষে অভিনয় জীবন বেছে নেন। প্রথম অন্নপূর্ণা অপেরায় 'গরীবের মেয়ে' পালায় অভিনয় করে প্রশংসা পান। এরপর কমলকৃষ্ণ খাঁ চারুবাবুকে নিয়ে আসেন ধৃতিশ্রী নাট্য শিল্পম্-এ। তারপর ভাণ্ডারী অপেরা, নট্ট কোম্পানি, নিউ রয়েল বীণাপাণি, ভারতীয় রূপ নাট্যম্ ইত্যাদি প্রখ্যাত দলে স্বনামধন্য শিল্পী ফণিভূষণ, যতীন চক্রবর্তী, ক্ষেত্র চাটুজ্জে প্রমুখের সঙ্গে অভিনয় করেন। এরপর মাস মাইনেতে কাজ না করতে পারলে সংসার চালানো মুস্কিল ভেবে যাত্রা দলে ম্যানেজারীর চাকরি নেন। প্রখ্যাত ম্যানেজার কমলকৃষ্ণ খাঁ চারুবাবুকে এ ব্যাপারে তালিম দেন। ১৯৭২ সালে ক্যালকাটা নাট্য কোম্পানি নামে যাত্রাদল তৈরি করেন এবং অচিরেই দল লোকসান দিয়ে বন্ধ হয়। তারপর যুগযাত্রা, মোহন অপেরা, লোকরঙ্গ, গণনাট্য ইত্যাদি প্রখ্যাত দলে ম্যানেজার হন। বর্তমানে এই কর্মেই নিযুক্ত আছেন।

॥ ঝণ্টু দাস ॥

নিতান্ত ছেলেবেলায় ঝণ্টু দেশ ছেড়ে যাত্রায় চলে আসেন। মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলের কাপাস এড়িয়া গ্রামের এক অতি সাধারণ পরিবারে ১৩৪৭ সনের ১ বৈশাখ ঝণ্টুর জন্ম। বাবা অমলেন্দু দাস। চাষবাস ছিল তাঁর জীবিকা। এরই মধ্যে ঝণ্টু ম্যাট্রিক পাশ করেছেন। কোন চাকরি স্থলেই নিজেকে বেশিদিন মানিয়ে রাখতে পারেননি। চলে আসেন যাত্রা জগতে। কৌতুক অভিনেতা হিসেবে কয়েকটি পালায় অভিনয়ও করেন। দর্শকদের কাছ থেকে প্রশংসা পেয়েছেন যথেষ্ট। ঝণ্টুর স্মরণীয় অভিনয় 'সিরাজের বেগম' পালায় তক্‌দির খাঁ চরিত্রে। কয়েক বছরের মধ্যে ঝণ্টু যাত্রা দলের ম্যানেজার হন। ক্যালকাটা অপেরা, ভাণ্ডারী অপেরা, আর্য অপেরা, নব অম্বিকা নাট্য কোম্পানি, চিত্তরঞ্জন অপেরা, বর্ণপরিচয়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুশীল নাট্য কোম্পানি, নব রঞ্জন অপেরা, রয়েল বীণাপাণি, শিল্পীলোক ইত্যাদি দলে দল পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন, এখনও করছেন। ঝণ্টু দাসের স্ত্রী বুলারানী দাস অভিনেত্রী হিসেবে যাত্রা জগতে সুপ্রতিষ্ঠিতা।

॥ রাজেন মণ্ডল ॥

প্রবীন এই যাত্রা কর্মীর জন্ম ১৩২৪ সনের ৩০ আশ্বিন।

ডায়মণ্ডহারবার থানার অন্তর্গত "রেখা" গ্রামে গগনচন্দ্র মণ্ডলের জীর্ণ-দীর্ণ ঘরে রাজেন জন্মেও এম.ই. স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছিলেন। স্কলারশিপ পাওয়া রাজেন ১৯৩৭ সালে বারুইপুর মাধ্যমিক হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেই চাকরি জীবন শুরু করেন।

১ম দেওয়ানী আদালতে, ২য় বন্দেলের রায়ের এস্টেটে, ৩য় আলিপুর ক্রিমিন্যাল কোর্টে, ৪র্থ রেশনিং ডিপার্টমেন্টে, ৫ম ইস্টার্ণ রেলে চাকরি করতে করতে আসেন যাত্রা দলে। তবে চাকরি করতে করতে নিজেই ক্লাব তৈরি করেছিলেন। সখের যাত্রায় অভিনয় করতেন। প্রথম অভিনয় করেন সীতাকুণ্ডু পঞ্চানন নাট্য সংস্থায়। এরপর রাজেনবাবু সুযোগ পান, লক্ষ্মীকান্তপুর রেল স্টেশনের কাছে 'রাধাশ্যাম অপেরা'য়। দলের মালিক যদিও ছিলেন অঘোর হালদার তবু লোকে বলত চাউল গোলার দল। ঐ সময়ে দক্ষিণে অনেক পেশাদার যাত্রা দল ছিল। সেই বিভিন্ন দলে কাজ করে চলে আসেন চারুচন্দ্র হালদারের ভূধর অপেরায়। ভূধর ছিল চারুবাবুর ছেলের নাম। এই দলকে পেশাদারে রূপান্তরিত করেন রাজেনবাবু। তখন হয় নিউ ভূধর অপেরা। ২ বছর চলার পর ব্যবসা বন্ধ হয়। এই সময়ে ননীগোপাল মণ্ডলের ছিল নিউ ভাণ্ডারী অপেরা। পুরাতন মিনার্ভা অপেরা ভেঙে তৈরি হয়েছিল এই দল। লেসি ছিলেন সুহাসিনী ঘোষ। সেই ভাণ্ডারীতে দক্ষিণের বিখ্যাত অভিনেতা রাজেন দাস যোগ দেন তাঁর দলবল নিয়ে। এই নিউ ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনেতা এবং দল ম্যানেজার হিসেবে যোগ দেন রাজেন মণ্ডল। ৪ খানা পালা নিয়ে দল ১ম

গাইতে গেল বনগাঁ বর্ডারে। নায়েকরা অনুরোধ জানালেন 'সিরাজদ্দৌলা' করার। অগত্যা রাজেন মণ্ডল এলেন পূর্ণেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। কারণ ভোলা ভট্ট আর ননী ভট্ট হঠাৎ দল ছেড়ে চলে গেছেন। পূর্ণেন্দুবাবু এলেন কিন্তু 'সিরাজ' হল না। পূর্ণেন্দু জানালেন, তাঁর দাদা শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় 'নাট্যভারতী' তৈরি করেছেন। পুরষরাই মেয়ে চরিত্রে। দলের ম্যানেজার তখন অভয় সাহা। রাজেনবাবু ভূধরের প্রায় সব স্টাফ নিয়ে নাট্যভারতীতে যুক্ত হলেন। নিজে হলেন সহকারী ম্যানেজার। কিছুদিনের মধ্যে দল বন্ধ হয়ে গেল টাকার অভাবে। বেশ কিছু দিন ধার করে দল চালিয়েছিলেন অভয় সাহা। 'কমলে কামিনী' মাত্র এক পালা শো হয়ে নাট্যভারতী বন্ধ হয়।

এরপর উপেন অধিকারী রাজেনবাবুকে নিয়ে যান প্রভাস অপেরায়। নাট্যভারতীর পুরো স্টাফ ঐ দলে যোগ দিল। রাজেনবাবু ম্যানেজার হলেন। অভিনয় করতেন। পালাও হিট করল। ১ বছর পর রাজেনবাবু ম্যানেজার ও অভিনেতা হিসেবে যোগ দেন আর্য অপেরায়। আর্য অপেরার মালিক তখন অতুলকৃষ্ণ বসুমল্লিক। দল পরিচালক ও অভিনেতা তখন বিখ্যাত অভিনেতা শিববাবু। আর্য তখন যাত্রা পাড়ার পরিভাষায় হাইকোর্ট। শিববাবু তখন দলের সর্বময় কর্তা। অতুলবাবুকে নানা দিক দিয়ে সাহায্য করেন। এ দলের বুকিং এজেন্ট তখন মুকুল বোস। দলে তখন দাশু রায়, অজিত দাস, শিব ভট্টাচার্য, গোপাল চট্টোপাধ্যায় একটা গ্রুপ। দাশুবাবু দলের প্রোগ্রাম বিক্রি করে কমিশন পেতেন। কিছু টাকাও দলে দিয়েছিলেন। নানা ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে টিহু গার্ডেনে ২ দিন গান না করে দল এলো শিলিগুড়িতে। সেখানে দেখার কেউ রইল না। দল পড়ে রইল সেখানেই। এর পরের বছর আর্য অপেরা নিলেন সৌরীন্দ্র কুণ্ডু। জেনারেল ম্যানেজার হলেন উপেন অধিকারী। কয়েক বছর পর অতুলকৃষ্ণ বসুমল্লিক মারা যান। ইতিমধ্যে ক্যালকাটা অপেরা তৈরি হয়। রাজেন মণ্ডল গৌর বর্মনের চিঠি নিয়ে যোগ দেন সেই দলে। তারপর নিউ প্রভাস, নাট্য ভারতী থেকে বহু দলের জন্ম লগ্নে রাজেন মণ্ডল জড়িত থেকেছেন, অভিনেতা জীবন থেকে অবসর নিয়ে দলের পর দলে ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কাজ করেছেন।

॥ রমেন পালিত ॥

এক সময়ে চরম উত্থানের দিনে চোখ দিয়ে যেমন দু'ফোটা চোখের জল ঝরেছিল, আজ পতনে তাঁর দু'চোখে খুশির ঝিলিক। চোখের জল ঝরেছিল আনন্দে সেদিন, যেদিন যাত্রার স্বপনকুমারকে নিয়ে এই যুবক যাত্রা প্রযোজকের প্লেন গিয়ে ল্যাণ্ড করেছিল সুন্দরবনের এক দ্বীপে। সে এক ইতিহাস!

জন্মের পর থেকেই ভাগ্য বিড়ম্বিত রমেন। বাবা রাইমোহন পালিত হঠাৎ মারা যাবার পর দুই ছেলেকে নিয়ে বিপন্ন হয়েছিলেন মা। দুই ছেলেকে মানুষ করার তাগিদে নিরুপায় মা দেখা করেছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে। ডাঃ রায় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সব শোনার পর গুমা হাবড়ার সরকারি অনাথ আশ্রমে বড় ছেলেকে ভর্তি করার ব্যবস্থা করেছিলেন। ছোট ছেলে রমেনকে পাঠালেন মা বারাকপুর নোনাচন্দনপুকুরে হরেকৃষ্ণ ঘোষের বাড়িতে। ওখানকার স্কুলে ভর্তি হয়েছিল রমেন। বছর দু'চারের মধ্যে পরের বাড়িতে অনাথের মত থাকতে ভাল না লাগায়, পড়াশোনায় ইস্তফা দিয়ে মায়ের কাছে চলে আসে। চরম দারিদ্র্যের জন্য কিশোর রমেন উড়ে পাড়ায় এক আলতা কারখানায় আলতার কৌটতে লেবেল লাগানর কাজে লাগে। তারপর এ কারখানা ও কারখানায় কাজ করতে থাকে। এরই মধ্যে নকশাল আন্দোলনের সময়ে বিনা অপরাধে পি. বি. এ্যাকটে ১ বছর জেল খাটতে হয় রমেনকে। স্বাভাবিকভাবে অভিভাবক শূন্য রমেনের জীবনটা নষ্ট ছেলের মত হতে শুরু করল। এক সময়ে মাছ বিক্রি করতে করতে রমেন হোল সেলার হলো। ঠিক যখন ব্যবসায় কিছুটা সাফল্য আসছে তখন লরিতে ডাকাত পড়ল। আবার

সর্বহারা রমেন। একদিন এই সদ্য যুবককে আশ্রয় দিলেন ভোলানাথ অপেরার মালিক-অভিনেতা শম্ভু সিন্‌হা। দু'বেলা খেতে পায়, মাঝে মাঝে ৫।১০ টা করে টাকাও। একটু-আধটু ফাইফরমাস খাটে। তখন নৃত্য পরিচালক বৈজু পোদ্দার ছিলেন ঐ দলের ম্যানেজার। বৈজুর সঙ্গে থেকে যাত্রা দলের কাজ শিখতে শিখতে ৩ বছর কাটিয়ে রমেন আশ্রয় পান পাড়ার পরিচিত নীরু নাগের কাছে। নীরু নাগ আরও ৩ জনের সঙ্গে অংশীদার হিসেবে মঞ্জরী অপেরা চালাচ্ছেন। রমেন সুযোগ পান অভিনয়ের। অভিনেতা হওয়া তাঁর ভাগ্যের লিখন তো নয়, অভিনেতা তৈরি করা ভাগ্য লিখন। তাই ভাগ্য তাঁকে সেখানে টিকতে দিল না। এরপর রমেনকে কাজ দেন প্রভাস অপেরার মালিক, সকলের শ্রদ্ধেয় বড়দা তিনকড়ি গুছাইত, প্রভাস অপেরায় অফিস ম্যানেজার পদে। এক বছর পর নীরু নাগের গড়া দুটি দল নাগ কোম্পানি ও গণবাণীর এক সঙ্গে পরিচালক হবার সুযোগ পান রমেন। রমেনের ব্যবহার, একনিষ্ঠতা, সততার জন্যেই বোধকরি নীরুবাবু তাঁকে ভালবেসেছিলেন। নিজের শ্যালিকার সঙ্গে রমেনের বিয়েও দিয়েছিলেন তিনি। নীরুবাবুর স্ত্রী তাঁর বোনের কথা ভেবে মানিকতলায় একটা ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করে দেন। রমেন পালিত আবার চাকরি পেলেন নিউ প্রভাসে। সহৃদয় তিনকড়ি গুছাইত রমেনের সেই ভাঙাচোরা ফ্ল্যাটকে সাজিয়ে দিলেন। এরপর একদিন তিনকড়িবাবুর কাছে স্বপ্নের কথা জানালেন রমেন। প্রযোজক হবার, নিজেই দল গড়বেন সেই স্বপ্ন। তিনকড়িবাবু খুশি হলেন। নানা ভাবে সহযোগিতা করলেন। একজন অংশীদার জুটিয়ে রমেন নিউ প্রভাসে বসেই দল গঠন শুরু করেন। পরে নিজেই নটসম্রাটের অনুমতিলাভ করে তৈরি করেন বিশ্বরূপ। রমেন পালিত প্রযোজিত, নটসম্রাট স্বপনকুমার অভিনীত প্রথম "ভাঙাগড়া" পালাতে সাফল্য আসে। ২য় বছর "ভাইবোন" পালা আসরস্থ করার আগেই এক চরম পরিস্থিতির মুখে এসে দাঁড়ান রমেন। স্বপনকুমার নদীপারের কোন আসরে যাবেন না এই হলো চুক্তি। কিন্তু সেই নদীপারের এক বিখ্যাত নায়েক এলেন দল বায়না করতে। বহু পুরাতন এবং অত্যন্ত ভদ্র-সভ্য নায়েক সাহেবখালি হাইস্কুলের সহকারী হেড মাষ্টার। তাঁরা জানালেন স্বপনবাবুর জন্য লাকসারী স্টীমারের ব্যবস্থা করবেন তাঁরা। রমেন এ ব্যাপারে যতবারই স্বপনবাবুকে অনুরোধ জানান ততবারই তিনি নাকচ করেন। শেষ পর্যন্ত বিশিষ্ট সেই নায়েক এবং কয়েকজন সঙ্গী রমেনবাবুর সঙ্গে ব্যক্তিগত অনুরোধ জানাতে যান নটসম্রাটের গড়িয়াহাটার মেঘমল্লারের ১১ তলার ফ্ল্যাটে। স্বপনবাবু তবুও রাজি হন না, বরং ঠাট্টা আর বিদ্রূপের সুরে বলেন, নদীপারে গিয়ে যাত্রা করতে তিনি পারেন, যদি উড়িয়ে নিয়ে যান তাঁরা—; অর্থাৎ হেলিকপ্টারে।

সেই মুহূর্তে সহকারী হেড মাষ্টার মশাই জানালেন, যদি তার ব্যবস্থা হয় তা হলে যাবেন তো নটসম্রাট। এরপর সেই চরম ইতিহাস। নায়েকদের সহযোগিতায়, বহু বিখ্যাত মানুষের চেষ্টায়, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সাহায্য নিয়ে যুবক প্রযোজক রমেন পালিত নটসম্রাট এবং নায়িকা পদ্মিনীকে এরোপ্লেনে করেই, নতুন রানওয়ে তৈরি করেই নিয়ে গিয়েছিলেন সাহেবখালির এক গ্রামে। সেই দিন আনন্দে রমেনের দু'চোখে জল দেখেছিল সবাই। এরপর নটসম্রাটকে নিয়েই রমেনের ৩য় প্রযোজনা "রাজারাণী" থেকে পতনের সূচনা। ৪র্থ প্রযোজনার জন্য রমেন যাত্রায় নিয়ে এলেন অনুপকুমারকে। পালা নামল আসরে। চুক্তি অনুসারে সব পান তিনি অথচ মাঝে মাঝেই অসহযোগিতা। মাত্র ৬২ পালা গান হলো। ঋণের বোঝা চাপল মাথায়। অপমানে জর্জরিত হলেন রমেন। শেষ রক্ষা হলো না। দল বন্ধ হলো। আবার সর্বহারা হলেন এই যুবক প্রযোজক।

১৯৯৬ সালে নিজেকে, নিজের পরিবারকে বাঁচাতে রমেন পালিত এ বছরে তৈরি হওয়া বিশ্ববাণী অপেরার সহৃদয় নতুন প্রযোজকের ডাকে চাকরি পেলেন সেই পুরাতন পরিচালকের পদে। এখন তাঁর দু'চোখে খুশির ঝিলিক, খুশি শুধু মাথা উঁচু করে হারানো সাম্রাজ্যে ফিরে আসার।

॥ সহকারী হেডমাষ্টার মশাই এবং এরোপ্লেন ॥

যাত্রার নটসম্রাট স্বপনকুমার যখন তাঁর আকাশের কাছাকাছি সুসজ্জিত ফ্ল্যাটে বসে ঠাট্টা আর বিদ্রূপের সুরে জানালেন, উড়িয়ে নিয়ে গেলে তিনি নদীপারে যাত্রা করতে যাবেন, শিক্ষার, আভিজাত্যের অথচ মাটির গন্ধ মাখা সুন্দরবন এলাকার সহজ-সরল একটি মানুষের রক্তে দোলা লাগল। মনে মনে যাত্রার টাকায় তৈরি হওয়া শহরের সম্রাটকে উড়িয়েই যাত্রার আসরে নিয়ে যাবার শপথ নিলেন, সুন্দরবন অঞ্চলের বড়মোল্লাখালির নিকটবর্তী সাহেবখালির বাসিন্দা, রাশি রাশি সবুজ আর বিশাল নীল আকাশের আলোয়, চারদিকের জলরাশির সঙ্গে খেলতে খেলতে বড় হওয়া, সাহেবখালির হাইস্কুলের সহকারী হেডমাষ্টার অমল মিস্ত্রি। শুরু করলেন কাজ। টাকা দিয়ে প্রযোজক রমেন পালিতের নিউ বিশ্বরূপের পালা বায়না করলেন। মেতে উঠলেন একজন অভিনেতাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে। যোগাযোগ করলেন রাজনৈতিক নেতা থেকে মন্ত্রীদের সঙ্গে। সহযোগিতার হাত বাড়ালেন কংগ্রেসের শক্তিমান নেতা সোমেন মিত্র, গণিখান চৌধুরী, রাজেশ খৈতান থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী পর্যন্ত। শুরু হয়ে গেল বিশাল কর্মকাণ্ড। জানা গেল হেলিকপ্টার ভাড়া পাওয়া যাবে না এখানে, ভাড়া করতে হবে এলাহাবাদ থেকে। প্লেন ভাড়া পাওয়া যাবে। ৬ সিটের পেঙ্গুইনের মত দেখতে প্লেন। অমল মিস্ত্রি এবার যাত্রাদলের মালিক, প্রযোজক রমেন পালিতের ওপর সব রকম যোগাযোগ আর দৌড়ঝাপ করার দায়িত্ব দেবার পর শুরু হলো কাজ। রাজেশ খৈতান ডিফেন্সের অনুমতি লাভের ব্যাপারে যোগাযোগ করলেন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সঙ্গে। সেই সূত্রে যাত্রা প্রযোজক হিসেবে হট্‌লাইনে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কয়েক সেকেণ্ড কথা বলার সুযোগ পেলেন রমেন পালিত। এবার প্রশ্ন উঠলো, রানওয়ে প্রসঙ্গে। বে অফ বেঙ্গল থেকে ৯০ কিলোমিটার দূরে, আম-জাম-নারকেল গাছের একটি কাঁচা মাটির গ্রামে, বর্ডার এলাকার ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে, একটা বিশাল অস্থায়ী রাণওয়ে তৈরি করা সম্ভব কিনা সে ব্যাপারে অনুসন্ধানের দায়িত্ব পড়ল ভি. কে. আগরওয়াল এণ্ড কোম্পানির ওপর। দ্বীপপুঞ্জ পরিদর্শন করা এই প্রতিষ্ঠানের কাজ। সেই সঙ্গে প্লেন পাওয়া যাবে আরও দুটি বিশেষ বিষয়ের ওপর অনুসন্ধান করে ইঞ্জিনীয়ররা যদি যথার্থ রিপোর্ট দেন। যেখানে রাণওয়ে তৈরি হবে সেখানে প্লেন নামাতে হলে চাই আকাশ পথে প্রয়োজনীয় টার্নিং পয়েন্ট বা স্টেশন। তাছাড়া যে মাটিতে প্লেন নামবে সেই মাটির শক্তি আছে কিনা! যথা সময়ে জানা গেল সুন্দরবনের দুলদুলি অঞ্চলের আকাশপথে প্লেনের একটি টার্নিং পয়েন্ট বা স্টেশন আছে। এবার সারেজমিন তদারকে গেলেন ২ জন্য বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়র। U. K. AHMED এবং P. K. AHMED. ওঁরা সমস্ত বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে রিপোর্ট দিলেন, অস্থায়ী রাণওয়ে তৈরি হওয়া সম্ভব। যথা সময়ে প্রায় ২০০ শ্রমিক লাগিয়ে যাত্রার প্যাণ্ডেলের কাছ থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার লম্বা এবং সোয়া থেকে দেড় কোয়াটার রাণওয়ে তৈরি হয়ে গেল। এরপর দু'জন বিখ্যাত পাইলট গেলেন সরেজমিন তদারকে। এই দু'জনই বৈমানিক হিসেবে খুবই দক্ষ এবং খ্যাতিমান। একজন চন্দন রায়, অন্যজন বালেশ্বরের গণেশ প্রধান। ঐ সময়ে চন্দনবাবু ছিলেন টাটা স্টীল কর্তৃপক্ষের চীফ পাইলট। গণেশবাবু ছিলেন নিউজিল্যাণ্ডের এক ধনাঢ্য সাধুর (যাঁর ৪ খানা বিমান ছিল) পাইলট। চন্দনবাবু পরে বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। যা হোক, বর্ণনাতীত শ্রম, প্রভূত অর্থব্যয় করে অবশেষে অমল মিস্ত্রির শপথ রক্ষিত হলো। সবুজ স্যুট, সবুজ টুপি পরিহিত নটসম্রাট স্বপনকুমার নায়িকা পদ্মিনীকে নিয়ে নেমে এলেন বিমান থেকে। বিমান অবতরণের সময় নির্দিষ্ট ছিল বেলা ১২টা থেকে ২.৫০ মিনিটে। প্রায় ৪০টি মেয়ের সম্মিলিত শঙ্খ ধ্বনি আর হাজার হাজার পুষ্পবৃষ্টিসহ জয়ধ্বনির মধ্যে দ্বীপ ঘেরা, জল ঘেরা, বন ঘেরা একটা সাধারণ গ্রামের একজন সাধারণ মানুষের, একজন শিক্ষকের আভিজাত্য আর বাসনার প্রতীক, একজন সাধারণ যাত্রাওয়ালা

(লোকে এখনও বলে), যাত্রা প্রযোজকের শ্রমের নিশান ঐ বিমান মাটি স্পর্শ করল। জন্ম হলো এমন একটি ইতিহাসের যা আর নতুন করে লেখা হবে না কোন দিন। জন্ম হলো এমন একটা আদর্শের যা সাহেবখালির ছাত্র-ছাত্রী থেকে ঘরে ঘরে বন্দিত হবে চিরকাল। সে আদর্শ অমল মিস্ত্রি নামক এক শিক্ষকের, এক যাত্রামোদীর আভিজাত্যের আদর্শ।

* সাহেবখালির উক্ত উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক অমল মিস্ত্রির নেতৃত্বে বহু বছর ধরে ওখানে যাত্রা হয়ে আসছে। স্থানীয় সকলের সাহায্যে-সহযোগিতায় এবং যাত্রা করানো লভ্যাংশের টাকায় অমলবাবুর নেতৃত্বে ইতিমধ্যে অনেক সমাজকল্যাণ, জনকল্যাণমূলক কাজ হয়েছে। বিদ্যালয়ের পাকাবাড়ি থেকে লঞ্চঘাটের জেটি, পথ-ঘাট সংস্কার সবই সম্ভব হয়েছে।

॥ তারাপদ ঘোষ ॥

১৩২৯ সনের কার্তিক মাসে কিরণচন্দ্র ঘোষের ছেলে তারাপদ ঘোষের জন্ম, কলকাতার হোগলা কুড়িয়া স্ট্রীটে (বর্তমান নাম, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট)। বাবা ছিলেন গোয়াবাগান স্পোর্টিং ক্লাবের ফুটবল খেলোয়াড়। আর্য মিশন ইনস্‌টিটিউশনে পড়ার সময় স্কুলের নাটক 'শিবাজী'তে তানাজী চরিত্রে বালক তারাপদ প্রথম অভিনয় করেন। এরপর গোয়াবাগান গুরু গৌরব নাট্য সমাজে মহেন্দ্র গুপ্তের 'উত্তরা' নাটকে অভিনয় করেন। স্বনামধন্য অভিনেতা সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় সেবার হয়েছিলেন এই নাটকে অর্জুন। তারপর গোয়াবাগান ইভনিং ক্লাবের 'পথের শেষে' নাটকেও তারাপদ অভিনয় করে প্রশংসা পান। আসেন চিৎপুরে। প্রথম ক্যালকাটা মিলন বীথিতে, পরে ক্যালকাটা অপেরা, তরুণ অপেরা, নাট্যভারতীতে অভিনয় করে প্রশংসা পান। স্বনামধন্য ফণি মতিলাল, সত্যেন বোস, ভোলা ভট্টাচার্য, মহেন্দ্র গুপ্ত, নীতিশ মুখার্জী, নবদ্বীপ হালদার, নৃপতি চ্যাটার্জী, শশাংকশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দদুলাল চৌধুরী, নিতাইরানী, বাবলিরানী, ফিরোজবালা, তারক পাল, ননী ভট্ট প্রমুখের সঙ্গে অভিনয় করেছেন তারাপদবাবু।

তারপদবাবুকে প্রথম যাত্রায় আনেন অজিত মুখার্জী নামে এক অভিনেতা। এরপর অফিসিয়াল কাজ বেছে নেন ; তরুণ অপেরার সঙ্গে যুক্ত হন কর্মী হিসেবে। অভিনয় জীবন থেকে সরে এসে একটানা ২৩ বছর তরুণ অপেরার জেঃ ম্যানেজার ছিলেন।

তারপর কয়েকটি দল ঘুরে ব্রজর ওয়ান ওয়াল থিয়েটার বুকিং অফিসে কাজ করেন।

॥ দিলীপ মুখার্জী ॥

প্রবীণ এবং প্রখ্যাত জেঃ ম্যানেজার সনৎ মুখার্জীর ছেলে দিলীপের জন্ম ১৯৫৯ সালে। '৬৭ সালে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনে ভর্তি হন। ওখানে থেকেই পড়া শোনা করত দিলীপ। তৃতীয় শ্রেণী থেকে হাঃ সেকেণ্ডারী পাশ করে '৭৬ সালে জয়পুরিয়া কলেজে ভর্তি হন। '৮০ সালে বি. কম পরীক্ষায় পাশ করে '৮১ সালে দিলীপ যাত্রা জগতের সঙ্গে যুক্ত হন। যুক্ত হন অফিস কর্মী হিসেবে রাজা ভট্টাচার্য ও শিবানী ভট্টাচার্যের নব অম্বিকায়। সেই থেকে এই শিক্ষিত-মার্জিত যুবক যাত্রার সঙ্গে জড়িত। বঙ্গলোক অপেরার সূচনা থেকেই জড়িত ছিলেন। পরে তপনকুমারের নব রঞ্জন অপেরায় কাজ করেন। কাজ করেন নটসূর্য দিলীপ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত গণনাট্যে। দিলীপ যাত্রা জগতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে শিল্পক্ষেত্রের কর্মী হয়ে যতটা গর্বিত বোধ করেন, এই জগতের সার্বিক পরিমণ্ডলের অনেক বিষয় তিনি ততটাই মানিয়ে নেন। দিলীপ মনে করেন ইদানিং যাত্রার সমস্ত তরুণ-যুবক কর্মীরা যাত্রার অভ্যন্তরিণ মালিন্য মুছে ফেলার যে চেষ্টা চালাচ্ছেন তাতে যাত্রার ভিতরকার চেহারা আগামী দিনে পাল্টাবে। দিলীপও এই সংস্কার মুক্তির একজন শরিক।

॥ নির্মল জানা ॥

মুক্ত অঙ্গন যাত্রা সমাজের সঙ্গে ম্যানেজার হিসেবে দীর্ঘ কয়েক বছর জড়িয়ে আছেন। ১৯৫৫ সালে নরেন্দ্রনাথ জানার ছেলে নির্মল জানার জন্ম হুগলী জেলার রহিমপুরে। হায়ার

সেকেণ্ডারী পাশ করে ১৯৭৫ সালে সত্যম্বর অপেরার কর্ণধার শৈলেন মোহান্তের সাহায্যে যাত্রা জগতে প্রবেশ করেন। শৈলেনবাবুর সান্নিধ্যে থেকে সত্যম্বর অপেরায় নির্মল জানার প্রথম দল পরিচালনার শিক্ষা লাভ। নির্মল সত্যম্বর অপেরার পর দল বদলের রীতি অনুসারে চলে আসেন জনতা অপেরায়। এরপর নিউ প্রভাস অপেরায় কাজ করে, চলে আসেন মুক্ত অঙ্গন যাত্রা সংস্থায়। এখানে আজও জড়িয়ে। নির্মল জানার সহকারী হিসেবে শ্যামল মিত্র ও অজয় বাগ এবং দলের বেশকারী গঙ্গা জানা ও রাম ভুঁইঞার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। স্বনামধন্য পালাকার অভিনেতা নির্মল মুখোপাধ্যায়ের মুক্ত-অঙ্গন থেকে নির্মল জানা ভাগ্যকে সাজিয়েছেন মনের মত।

॥ প্রদীপ সাহা ॥

মুক্ত অঙ্গন যাত্রা সমাজ প্রতিষ্ঠানের ইনি একজন দক্ষ কর্মী। অফিস ম্যানেজার। ১৩৫৯ সালে প্রিয়নাথ সাহার ছেলে কৃষ্ণ ওরফে প্রদীপ হুগলী জেলার চন্দননগরের হেলা পুকুরে জন্মান। চন্দননগর খোলিসানি কলেজ থেকে বি. কম. পাশ করা যুবককে দলের কর্ণধার, প্রখ্যাত নাট্যকার ও অভিনেতা স্বয়ং নির্মল মুখোপাধ্যায় নিয়ে আসেন যাত্রায়। জীবন গড়ার সুযোগ দেন তিনি। ১৯৮৮ সালের 'মানবী দেবী' পালার সময় থেকে প্রদীপ মুক্ত অঙ্গনের সঙ্গে জড়িত। আজও প্রদীপ দল বদলের ব্যাপারটির সঙ্গে পরিচিত নন। সন্তোষ বোস, তাঁর ছেলে সুভাষ বোস, নির্মল জানাদের মত এই প্রদীপও মুক্ত-অঙ্গনের মত এক রত্নগর্ভার রত্ন ছেলে। সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রদীপ।

॥ প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

যাত্রার অফিস ম্যানেজার প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মজীবন গড়ে ওঠে থিয়েটার জগৎ থেকে, অভিনেতা হিসেবে। ১৩৪৮ সনে মিনার্ভা থিয়েটারে 'ধাত্রীপান্না' নাটকে উদয়সিংহের চরিত্রে প্রতুল প্রথম অভিনয় করেন। সেই সূত্রে এই নাটকের শিল্পী ছবি বিশ্বাস, সরযূবালা দেবী, ফিরোজাবালা, শ্রীমতী সুবাসিনী, সুশীল রায়, বঙ্কিম দত্ত, শিবকালি চ্যাটার্জী, সূর্য সেন, শিব ভট্টাচার্য, রাধারমণ পালের সান্নিধ্য লাভ করেন। মিলন দত্ত তখন মিনার্ভায় ছিলেন, তাঁর চেষ্টাতেই প্রতুল থিয়েটারে অভিনয় জীবন শুরু করার সুযোগ পান। এরপর বিভিন্ন থিয়েটারে, একাধিক নাটকে অভিনয় করেন। স্বনামধন্য গণেশচন্দ্র গোস্বামীর টুরিং থিয়েটারে প্রতুল যুক্ত থেকেছেন। একবার 'রূপমহল' থিয়েটারের সঙ্গে রিষড়ায় 'কর্ণার্জ্জুন' নাটকে অভিনয় করে প্রতুল সকলের প্রশংসা পান। এই থিয়েটারের কর্ণধার ও নাট্য পরিচালক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ওঁর অভিনয়ে খুশি হয়ে গণেশ গোস্বামীর সঙ্গে আলোচনা করে 'রঙমহল' থিয়েটারে অভিনয় করার সুযোগ দেন। এই গণেশবাবু ছিলেন প্রতুলের নাট্য গুরু। মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে প্রতুল রঙমহলে চাকরি করার সুযোগ পান। এরপর যখন শিবকরণ জালান মিনার্ভায় হিন্দি নাটক শুরু করেন তখন প্রতুল "ভক্ত নরসী মেহেতা" নাটকে অভিনয় করেন। তারপর ভাগ্য তাঁকে আনে যাত্রায়। ক্যালকাটা অপেরায়। এখানে স্বনামধন্য অভিনেতা ভোলানাথ পাল প্রতুলের অভিনয়ে খুশি হয়ে ১৩৫৯ সনে গোষ্ঠ ঘোষের গণেশ অপেরায় সুযোগ দেন। এখানে ভোলানাথ পাল, প্রখ্যাত গায়ক বিনোদ ধাড়া, গোপাল চ্যাটার্জী, মেণ্টা বোস প্রমুখের সঙ্গে প্রতুল অভিনয় করেন। এই দলের সঙ্গে প্রতুল খুলনা থেকে বরিশালের অনেক আসরে অভিনয় করেন। তারপর ১৩৭১ সনে আবার ক্যালকাটা অপেরায়, ১৩৭৩-এ ভারতী রূপ নাট্যম ; ১৩৭৩ সনে শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের চলন্তিকা, ১৩৭৪ সনে আর্য অপেরা, '৭৫-এ নিউ প্রভাস, '৭৮ সনে জনতা অপেরায় কাজ করেন। এই বছরেই দিলীপ দাসের সহযোগিতায় জনতার ম্যানেজার হন প্রতুল। অভিনেতা থেকে অফিসকর্মী হন। জীবন রথের চাকা অন্য খাতে ঘুরতে থাকে। ১৩৭৯ সনে লোকনাট্যের গদিতে সর্বাধিনায়ক বিশেষণ নিয়ে যুক্ত হন। ১৩৮০-তে সুশীল নাট্য কোম্পানির ম্যানেজার হন। সেবার ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় দল লীজ নেন। '৮১ সনে তৈরি হয় অগ্রগামী। তখন প্রতুল হন ম্যানেজার। '৮১ থেকে '৮৬ পর্যন্ত অগ্রগামীতে

থাকার পর '৮৭ সনে প্রতুল আসেন শিল্পীতীর্থে। আবার '৮৮ থেকে অগ্রগামীতে কাজ করেন। এরপর মুক্ত অঙ্গন যাত্রা সমাজ, চন্দ্রলোক অপেরা ইত্যাদিতে কাজ করার পর '৯৩ সনে 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' অপেরার অফিস ম্যানেজার হন। ১৩৯৬ সনে বিশিষ্ট অভিনেতা নন্দকুমারের ওঁ শঙ্করী অপেরায় সসম্মানে থাকার পর আসেন গণনাট্যে। তারপর একে একে অনেক দলে কাজ করেছেন। করছেন। এই দীর্ঘ কর্মজীবনে অনেক বৈচিত্র্যের স্বাদ তিনি পেয়েছেন। চরিত্র গেলে, বিশ্বাস হারালে মানুষের মনুষ্যত্ব বলতে কিছু থাকে না, এই সত্যকে মনে রেখে আজও কাজ করে যাওয়া এই মানুষটি সংসার জীবনে খুবই সুখী। কন্যাকে সুপাত্রেই অর্পণ করেছেন। অভিনেতা থেকে যাত্রাকর্মী প্রতুলবাবু স্বীকার করেন, সংসার সুখের হয়েছে তাঁর স্ত্রীর গুণে। যাত্রা পাড়ায় যদি কোন সৎ মানুষ থাকে প্রতুল তার মধ্যে একজন বলেই দারিদ্র্য তাঁর সঙ্গ ছাড়েনি। মরেও কীভাবে বেঁচে থাকা যায় তারই পথের সন্ধান করেন ইনি। যার অর্থই বোঝেন না আজকের যাত্রার কেউ। এই ইতিহাস গ্রন্থ রচনায় প্রতুলের সংবাদ ও সূত্র দান তাঁকে অমর করল। স্বনামধন্য নাট্যকার ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতুলের অগ্রজ।

॥ হারাধন নন্দী ॥

দল পরিচালক হিসেবে হারাধন নন্দী সুপরিচিত। ১৩৪৫ সনের ২৯ আশ্বিন, ̊রাধাকান্ত নন্দীর ছেলে হারাধন নন্দীর জন্ম জোড়াবাগান থানার বিপরীতে চৌধুরীদের বাড়িতে। আদি বাড়ি শান্তিপুর। এখানকার মিউসিপ্যালিটি হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করে হারাধন কর্মজীবন শুরু করেন। কিছুদিন জুতোর ব্যবসা চালিয়ে, ভগ্নিপতির বেইমানিতে আবার বেকার জীবনের যন্ত্রণা ভোগ করেন। হারাধন এবার সোজা চলে আসেন মামার কাছে। যাত্রা পাড়ার প্রসিদ্ধ অর্থ বিনিয়োগকারী সৌরেন কুণ্ডু তাঁর মামা। ইনি সব দলেই টাকা খাটাতেন। অতুল বসুমল্লিক টাকা পরিশোধ করতে না পারার জন্য সৌরেনবাবু তাঁর দলটি নিয়ে নেন। ২ বছর পর দলের নাম রাখেন কুণ্ডু নাট্য কোম্পানি। এখানে হারাধনবাবু প্রথম কানাই নাথের 'কবরের কান্না' পালায় অভিনেতা হিসেবে কাজ করেন। সেই থেকে ৩৫ বছর যাত্রা জগতের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। ২টি পুত্র ও ১ কন্যার জনক হারাধন সস্ত্রীক সুখেই আছেন। বড় ছেলে ভাল তবলা বাজায়।

॥ বাসুদেব সাহা ॥

১৯৫৭ সালের ১০ অকটোবর বাসুদেবের জন্ম।

̊চারুমোহন সাহার ছেলে বাসুদেব সাহা ওরিয়েন্টাল সেমিনারী স্কুলে ছাত্রাবস্থা থেকে রাজনৈতিক উন্মাদনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। রাজনৈতিক অস্থিরতার শিকার হয়ে পালিয়ে যান। বছর কয়েক পর জামাইবাবু দীপকরঞ্জন সাহা রায়ের চেষ্টায় দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনে চাকরি পেয়ে বোকারোয় যান। ওখান থেকে চন্দ্রপুরা। এই জীবন বাসুদেবের ভাল না লাগায় চাকরি ছেড়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। তখন কলকাতার যাত্রা পাড়ার চেহারা রমরম করছে। স্কুলের বন্ধুরা অনেকেই রাজনীতি থেকে যাত্রায় জড়িয়ে কর্মজীবন শুরু করেছে। বাসুও স্বপন সিন্‌হার তৈরি "রাণার" যাত্রা ইউনিটে চাকরি পান ম্যানেজার হিসেবে। ৬ বছর কাজ করে আর কাজে পটু হয়ে যুক্ত হন নীরু নাগের নাগ কোম্পানি ও গণবাণীতে। এখানে সাত-আট বছর কাজ করে দীনেশ নন্দীর "অগ্রগামীতে" আসেন। এই ১ম শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানেও সাত বছর কাজ করে তরুণ এই ম্যানেজার আসেন বাবলু বর্মনের "যাত্রাভারতীর" জেনারেল ম্যানেজার হয়ে। এখনও সসম্মানে কর্মী হিসেবে কাজ করছেন বাসুদেব যাত্রাপাড়ায়।

॥ বিনোদ সাহু ॥

সাংবাদিক প্রবোধবন্ধু অধিকারীর সাহায্য ও সহযোগিতায় বিনোদ সাহু যাত্রা জগতে প্রবেশ করেন সরাসরি ম্যানেজার হিসেবে। সূত্র ছিলেন বিনোদের কাকা। কাকা রাজেন্দ্রনাথ সাহু ছিলেন

আনন্দবাজার পত্রিকার কর্মী। কাকার চেষ্টায় বিনোদ প্রথমে উক্ত দৈনিকে অস্থায়ী কম্পোজিটরের কাজ করেন কিছুদিন। 'নতুন খবর' পত্রিকাতেও কিছুদিন কাজ করেন। এক সময়ে আনন্দবাজার কর্তৃপক্ষ ছাঁটাই করল। এর পরই বিনোদ যাত্রায় আসেন।

মেদিনীপুরের সানোগনুয়া গ্রামে বিনোদের জন্ম। গৈতা হাইস্কুল থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ করে কাঁথি কলেজে বি.এ পড়াকালীন চাকরি জীবন বেছে নেন। অনামিকা যাত্রা ইউনিটে ৪ বছর কাজ করে, অত্যন্ত তিক্ত মানসিকতা নিয়ে দল ছাড়েন। এরপর চন্দ্রলোক অপেরায় চাকরি পান এবং খ্যাতি নিয়ে এই দলে সাত বছর কাটান। এরপর স্বনামখ্যাত যাত্রা মালিক সত্যনারায়ণ অপেরার কালিপদ দাস বিনোদকে তাঁর দলে সুযোগ দেন। এই প্রতিষ্ঠানেই বিনোদ এখনও আনন্দ ও খুশিতে যুক্ত আছেন। মা-বাবা, স্ত্রী আর এক ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে বিনোদের সাজানো সংসার।

॥ শক্তিপদ দাঁ ॥

১৩৩৬ সনের ২৯ চৈত্র ঁগোকুলচন্দ্র দাঁ'র ছেলে শক্তিপদ দাঁ বর্ধমানের মাদানাগড়ে জন্মান।

লেখাপড়ায় ভাল ছিলেন। আই, এস, সি পড়তে পড়তে থিয়েটারের নেশায়, থিয়েটার জগতের প্রত্যেকটি স্তরকে জানার আগ্রহে তৈরি করেন থিয়েটারে পোশাক-মেক আপ সাপ্লাই করার একটি ড্রেস কোম্পানি। ব্যবসা জমল না। শক্তি যখন নতুন পথের সন্ধান করছেন, সেই সময় পালাকার শম্ভু বাগ এবং অভিনেতা রাখাল সিংহ পূর্ব পরিচয় সূত্রে শক্তি দাঁকে যাত্রায় আসার পথ করে দিলেন। শক্তি এলেন নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরায়। মালিক নারায়ণ ভট্টাচার্য। দলের ম্যানেজার তখন চন্দন মিত্র। মাত্র ১১টি টাকা শক্তির হাতে দিয়ে মানুষ বায়নার কাজ করলেন নারায়ণবাবু। পরে চিঠি দিয়ে ডাকবেন বলেছিলেন, কিন্তু ডাকেননি। শক্তি রিহার্সালের সময় নিজেই চলে আসেন। তখন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন মালিক। চোখ ভেজে ব্যথায়। কিন্তু ঈশ্বর সহায়। স্বপন অপেরার পরিচালক নিমাই চক্রবর্তী তাঁকে নিয়ে আসেন দলে। চাকরি হয়। ১৩৭৬ সালে স্বপন অপেরায় আত্মপ্রকাশ করার পর থেকে অনেক দলেই সততা, বিশ্বাস আর ভালবাসা ঢেলে দিয়ে কাজ করেছেন। দলগুলি হলো ঃ নাট্যভারতী, জনতা অপেরা, গণেশ অপেরা, জনতীর্থ, আবার জনতা অপেরা, কল্যাণী অপেরা, আবার গণেশ, লোকরঙ্গ, নিউ বিশ্বরূপ, আরও অনেক। কর্মজীবনে যে শিল্পীদের সান্নিধ্য পেয়েছেন তাঁরা হলেন, স্বপনকুমার, পান্না চক্রবর্তী, তপনকুমার, ভোলা পাল, শিবদাস মুখার্জী আরও অনেকে। দল পরিচালকের প্রথম দায়িত্ব দলকে বুক দিয়ে আগলে রাখা, অন্য অনেকের মতই শক্তি দাঁ'রও ভাবনা, এই আগলে রাখার মূল্য কে দেবে? এই ভাবনা বুকে নিয়ে আজও তিনি কর্মমুখর।

॥ শম্ভু মুখার্জী ॥

১৯৪৩ সাল। বর্ধমানের মন্তেশর থানার মূল গ্রামে ঁঅমৃতলাল মুখার্জীর ছেলে, কবিয়াল রেণুপদ মুখার্জীর ভাইপো শম্ভু মুখার্জীর জন্ম। প্রথমে বসন্তপুর প্রাইমারী স্কুলে পরে শুশুনিয়া হাইস্কুলে যাঁর পড়াশোনার জীবন শুরু হয়েছিল, দারিদ্র্য কিন্তু সেই জীবনকে পূর্ণ হতে দেয়নি। ছেলেবেলা থেকে হাটে-বাজারে-মেলায় এটা ওটা বিক্রি করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ছেঁড়া সংসারে অর্থ জোগান দিতে হয়েছিল তাঁকে। এরই মধ্যে পাড়ার সখের ক্লাবে থিয়েটারে হাতে-খড়ি। অন্ধের যষ্ঠী যেমন, বালক শম্ভুর তেমনি ভৈরব। যেখানে ভৈরব মামা সেখানেই ভাগ্নে ম্যান। পাড়ার সবাই ডাকে ম্যান। সেই ম্যানের অর্থাৎ শম্ভুর মাতৃদেবীর আপন মামাতভাই আজকের দিকপাল পালাকার ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়। বয়সে চার-পাঁচ বছরের ছোট-বড়। দারিদ্র্যের চরম চেহারা, রাজনীতির স্বাদ, জীবন যন্ত্রণার তীব্রতা সব কিছুই দু'জনে একই সাথে উপভোগ করেছেন। স্কুল মাষ্টার মহম্মদ কুদ্দুস আলি নাটক লিখতে অনুপ্রেরণা জোগালে রাতারাতি একটা একাঙ্ক নাটক

লিখে ফেলেন ভৈরব গাঙ্গুলী। নাম রাখেন "কারাগার"। সেই নাটক আসরস্থ হলো। উল্লেখযোগ্য হলো, সেই নাটকে ১২ বছরের শম্ভুর যেমন অভিনেতা জীবনের সূচনা, তেমনি মাষ্টার মশাই কুদ্দুস আলি, গোলাম নবী মণ্ডল, সুভাষ সেন, সুকুমার ব্যানার্জী এমনকি স্বয়ং ভৈরববাবুর প্রথম অনুপ্রবেশ। এরপর ভৈরববাবুর প্রথম লেখা ৫ অঙ্কের পালা "অন্ধদেবতা"-য় "ক্ষমা" ছাড়াও ভৈরববাবুর "অরুণ-বরুণ-কিরণমালা", 'নাচমহল', 'সূর্যগ্রাস', ব্রজেন দে'র 'বাঙ্গালী', 'রাজলক্ষ্মী', 'কোহিনূর' পালায় নারী চরিত্রে অভিনয় করে সকলের প্রশংসা পেয়ে শিল্পী জীবনের ভিত্ শক্ত করেন শম্ভু। এরই মধ্যে এলো রাজনৈতিক অস্থিরতা। তারই মধ্যে শম্ভু টেলারিং শেখেন। মাস কয়েকের মধ্যে হন প্রায় মাষ্টার টেলাব! সে কাজ কাজে লাগল না। যুবক শম্ভু মাতেন রাজনীতিতে। কিছুদিনের মধ্যে স্পিকার, আইন মন্ত্রী মনসুব হবিবুল্লাহর জন্যেই বামপন্থী আদর্শে তৈরি শম্ভু পার্টির সদস্য হবার সুযোগ পান (সি.পি.এম)। ১৯৬৭ সাল। রাজনৈতিক আগুনের হল্কা চারদিকে। তপ্ত বুলেটে কুড়োরাম বাগদীর বুকের রক্ত ঝরল মাটিতে। এই সময়ে একদিকে যেমন শম্ভুরা শান্তি হারিয়ে অস্থির ঠিক তখন ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের পালাকার মন উঠল গর্জে। তিনি লিখলেন "রক্তে রোয়া ধান"। বল্য·দরকার, ইতিমধ্যে সংসার পেতেছিলেন শম্ভু। ১৯৬৯ সাল। কংগ্রেসের মদতপুষ্ট কিছু অসৎ কর্মী শম্ভুবাবুর সংসাবকে তছনছ করতে বদ্ধপরিকর। আসলে জোনাল কমিটির সম্পাদক হওয়া শম্ভু মুখার্জীকে হয়তো নিশ্চিহ্ন করার ইচ্ছে। ক্ষিপ্ত ওরা ফুটন্ত ভাতের হাড়ি শম্ভুবাবুব স্ত্রী সন্ধ্যা মুখার্জীব গায়ে ঢেলে দিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টাও করেছিল। শম্ভু হলেন পলাতক। বলাবাহুল্য, ইতিমধ্যে ভৈরববাবুও বাজনৈতিক আগুন থেকে সরে এসে উঠেছিলেন কলকাতাব সত্যম্বব অপেবার মালিক, সি পি.আই করা শিক্ষিত শৈলেন মোহান্তর গদিতে। ওখানে বসেই পালা বচনায় মগ্ন ছিলেন, সেই সূত্রে শম্ভুবাবুও আশ্রয় পান সেখানে। এই সময়ে কিছুদিন মন্ত্রী হবিবুল্লাহর বাড়িতেও কাটিয়েছিলেন। ১৯৭৩-এ আবার ঘরে ফেরেন শম্ভু। তখন তাঁর সাধের সংসাব প্রায় শ্মশান। অগত্যা ১৯৭৪-এ আবার তিনি চলে আসেন কলকাতায। অভিনেতা হিসেবে চাকবি পান অভিনেতা দিলীপ চ্যাটার্জীব 'গণনাট্য'-এ। 'অন্ধকাসুর' 'পঙ্গপাল' ইত্যাদি পালায় অভিনয়ের সঙ্গে অফিসেব কাজও কবতে থাকেন তিনি। শম্ভু ওরফে ম্যানেব অভিনেতা জীবনের স্মবণীয় ঘটনা হলো, বার তিনেক দিলীপবাবুর আসরে হাজির হতে বিলম্ব হওয়ায় 'পঙ্গপাল' পালায় দিলীপবাবু অভিনীত নিতাই মাষ্টারের চরিত্রে অভিনয় করে প্যাণ্ডেল বাঁচিয়েছিলেন। সেটা অবশ্য ৩।৪টি সিনের জন্য, তারপরই নটসূর্য অবতীর্ণ হন। ৮ বছর ছিলেন এই দলে। তারপর এ দল সে দল। তিনকড়ি গুছাইতের কাছ থেকে রমেন বসুমল্লিক 'যাত্রালোক' লীজ নেবার পর সেই দলে আসেন এবং 'ঢুলি' পালাটি তিনিই নতুন করে লেখান সুনীল চৌধুরীকে দিয়ে। এরপর আরও কয়েকটা পালা ব্যবসায়িক সাফল্য পায় ওঁর আমলে। ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র মেঘদূত গঙ্গোপাধ্যায় 'ভৈরব অপেরা' গড়লে ভৈরববাবু তাঁর ভাগ্নে, বহুকালের সাথী ম্যানের সাধ পূরণ করলেন। তাঁর উজাড় করা সাহায্য ও সহযোগিতায় শম্ভুবাবু তাঁর পুত্রদ্বয়ের জন্য গড়ে দেন 'নব দিগন্ত' অপেরা। শম্ভু মুখার্জী এখনও যাত্রাকর্মী। তিনি কর্মী সংগঠনের সহ সভাপতি।

॥ জানকী মিদ্দা ॥

যাত্রা কর্মীদের কাছে আজ এক দৃষ্টান্ত স্বরূপ নাম জানকী।

১৩৩৭ সালের ২০ মাঘ, বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানার পাঁজকোনা গ্রামে সূর্যনারায়ণ মিদ্দার এই ছেলের জন্ম। খুব ছেলেবেলায় যাত্রার প্রতি তীব্র আকর্ষণ থেকেই, জানকী হরিসিংপুরের একটা দলে "জয়দেব" পালায় 'ছোট রামকৃষ্ণ' চরিত্রে প্রথম অভিনয় করেই সবার ভালবাসা পান। এরপর আগাই ফ্রেণ্ডস অপেরার "মায়ের দেশে" পালায় "কঙ্কাবতী" চরিত্রে অভিনয় করার সঙ্গে সঙ্গে

'জানকীরানী' নামে খ্যাত হন। প্রথম নায়িকার পর কুলকী রঘুনাথ অপেরায় ব্রজেন দে'র 'রাজনন্দিনী'-র রাজনন্দিনী হয়ে অসামান্য খ্যাতি পান। তারপর এক টানা ৫৫ থেকে ৬০টি পালায়, (অধিকাংশ ব্রজেনবাবুর নাটক) চরম খ্যাতির সঙ্গে নারী চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এক সময়ে জানকীরানীর গাওয়া গানে মুগ্ধ হতো দর্শক। এই গান শিখেছিলেন দেশের মাষ্টারের কাছে। এক সময়ে, যখন যাত্রা মায়ের সন্তান হিসেবে মেয়েদের যাত্রা করা পাপ ছিল, তখন এই জানকী রানীরাই ছিলেন যাত্রামায়ের ভূষণ। পূর্ণেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, ননী ভট্টর মত শক্তিমান, খ্যাতিমান শিল্পীরা যখন যাত্রার আসরগুলো তোলপাড় করছিলেন, তখন লক্ষ্মণরূপী পূর্ণেন্দুবাবুর পাশে উর্মিলা আর দানবীর হরিশ্চন্দ্র রূপী ননী ভট্টের পাশে শৈব্যা চরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতির শিখরে পৌঁছেছিলেন জানকী।

একবার ঐ দলের শো ছিল চন্দ্রকোণা রোডে। ম্যানেজার তখন আজকের ভারতী অপেরার মালিক কালিপদ ঘোষ। সেখানে পালা শেষে হুলস্থুলু কাণ্ড হয়ে গিয়েছিল। বড় ফণিবাবুর লেখা "মুচির ছেলে" পালা। রুইদাসের বাবার চরিত্রে ননী ভট্ট। মা-এর ভূমিকায় জানকী। অভিনয় শেষে এক মাড়োয়াড়ী সুন্দরী মহিলা হিসেবে জানকীকে কিড্‌ন্যাপ করে নিয়ে গিয়েছিল আড়তে। পরে অবশ্য মুক্তি!

যাত্রা সংসারের রূপ বদলের আভাস পেতেই জানকীবাবু অভিনয় জীবন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। কালিবাবু গ্রামে তৈরি করেন যাত্রা দল। ভারতী অপেরা। এই দলের জনক-জননী বলতে কালিবাবু আর জানকীবাবুকেই বোঝায়।

সেই থেকে আজও জানকীবাবু ভারতীর সম্মানীয় আসনে অধিষ্ঠিত।

॥ জগদীশ হালদার ॥

যে যাত্রা জগতে কর্মীদের মধ্যে পুঁথি বিদ্যার খুবই অভাব, সেখানে জগদীশ হালদার কয়েকজনের মতই ব্যতিক্রম। জগদীশ হালদারের জন্ম দঃ চব্বিশপরগণার মথুরাপুরের পাকুড়তলা গ্রামে। বাবা, অমূল্য হালদার। সংসারে তীব্র অনটনের মধ্যে জগদীশ ১৯৭৪ সালে রাধাকান্তপুর জুনিয়ার হাইস্কুল থেকে পাশ করে গৌরমোহন শচীন হালদার কলেজ (লক্ষ্মীকান্তপুর) থেকে ১৯৭৯ সালে বি. এ. পাশ করে হরি সিং-এর (যাত্রায় গাড়ি সরবরাহকারী) সাহায্যে, মধু বড়ালের 'যুগযাত্রা' দলে চাকরি নেন। প্রথম প্রম্পটার হিসেবে চাকরি পান, পরে দলে। ছেলেবেলা থেকে নাটক লেখার প্রতি ঝোঁক ছিল, লিখতেনও ভাল, কিন্তু ভাগ্য ওঁকে নাট্যকার হতে দেয়নি। যাত্রায় আসার আগে লাইব্রেরিয়ানশীপ ট্রেনিং-এ উত্তীর্ণ হন, কিন্তু সে সাধ পূর্ণ হয়নি। যে গাড়িটা মানুষ ব্যবসায় খাটায়, যে দাঁড়িপাল্লায় মানুষ ওজন করে, সেই গাড়ির পুজো করে মানুষ, সেই দাঁড়িপাল্লা ধুয়ে-মুছে ধূপের ধোঁয়া লাগিয়ে মাথায় ঠেকায় কিন্তু জগদীশের দৃষ্টিকোণ থেকে যে 'যাত্রা'কে অবলম্বন করে মানুষ টাকা বানায় সেই যাত্রা শিল্পকে শিল্পের আসনে বসাতে চান না এখানকার মানুষ। আজকের যাত্রাপাড়ায় প্রকৃত গুণীজনের মর্যাদা নেই, বীজ বপন করে ফলের জন্য অপেক্ষা করতে হয়, এই জগতের মানুষ তা মানে না। জগদীশ গণনাট্যে কয়েকবছর কাটিয়ে বর্তমানে 'বঙ্গ লোক' অপেরায়।

॥ কার্তিক মুখার্জী ॥

চলচ্চিত্র অভিনেতা সুখ্যাত "কেষ্ট মুখার্জীর ছেলে কার্তিক মুখার্জীর জন্ম কলকাতায়। কলকাতার সারদাচরণ ইন্‌স্টিটিউশনে যাঁর প্রাথমিক শিক্ষা জীবন শুরু হয়েছিল, সেই শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি ঘটে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ১ম বর্ষে। কর্মজীবনে প্রথম প্রবেশ "গ্রাফিক মেশিনারী এণ্ড এ্যাপ্লায়েন্সেস"-এ, তারপর "ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস্"-এর ট্রাফিক বিভাগে। ৪ বছর এখানে চাকরি করেন। এর মধ্যে নিচু তলার কর্মচারীদের মান-সম্মান, সুযোগ-সুবিধার স্বার্থে কার্তিক যখন

মুখর হলেন, ঠিক তখন বিরোধিতা করতে এগিয়ে আসা ২ জন উর্ধ্বতন কর্মীর সঙ্গে সরাসরি সংঘাত বাধে। তারই ফলশ্রুতি, পদে ইস্তফা দিতে তাঁকে বাধ্য করা হয়। এরপর অনেক কষ্টে কার্তিকবাবু তাঁর এক বন্ধুকে অংশীদার করে একটা ব্যবসা শুরু করে এক সময়ে সর্বহারা হন। ভাগ্যবিড়ম্বিত এই যুবক অবশেষে আশ্রয় পান নিউ প্রভাস অপেরার কর্ণধারদের কাছে। ছোট্ট চরিত্রের অভিনেতার চাকরি জোটে। এইভাবে ৩ বছর কাটে। তারপর সুযোগ পান ম্যানেজারী কাজ করার। অদ্যাবধি কার্তিক মুখার্জী সেই কাজেই নিজেকে যুক্ত রেখেছেন। যাত্রায় কার্তিকবাবুকে ম্যানেজারী করে বেঁচে থাকার জন্য কখনও দলের স্বার্থে যেতে হয় ফিল্ডে আবার কখনও কাজ করতে হয় গদিতে।

॥ শংকর কোলে ॥

বর্তমান মোহন অপেরার ম্যানেজার শংকর কোলের জন্ম বাঁকুড়ায়।

শংকর যখন আঠার বছরের যুবক তখন তাঁর বাবা মারা যান। সংসারে অনটন ছিল তার উপরে পারিবারিক নানা অশান্তির মধ্যে শংকর কলকাতায় এসে অনেক কষ্টে বাগবাজারে একটি মিষ্টির দোকানে কাজে লাগেন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁদের ব্যবহারে যুবক শংকর অপমানিত হয়ে কাজ ছেড়ে দেন। কখনও দেশবন্ধু পার্কের বেঞ্চে, কখনও বরানগরে পাঠ বাড়িতে হরি সংকীর্তন শুনে, তাদের দেওয়া প্রসাদে কোন মতে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে একটা যেমন তেমন কাজের জন্য হন্যে হয়ে গেলেন। একদিন এক লরীর মালিকের কাছে একটা কাজ পেলেন। লরীতে পিচ্ ইত্যাদি মাল তোলা-নামানোর কাজ। মালিকের বাড়িতেই থাকা-খাওয়া। এখানেও থাকা হল না শংকরের। কয়েকদিনের মধ্যে শ্যামবাজারে দ্বারিক ঘোষের দোকানে জ্ঞান ঘোষের করুণায় একটা চাকরি হলো। এখানে শংকর সিঙাড়া ভাজা থেকে অনেক কাজই শিখলেন। অনেকদিনই ছিলেন এখানে। এখান থেকে বাড়ির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আগের মতই হলো। বাড়ি ফিরলেন শংকর। একদিন পাড়ার ছেলেরা 'হিরণ্যকশিপু' নাটক করেছিল, কাকার সুবাদে সেই নাটকে ছোট চরিত্রে অভিনয়ে হাতে খড়ি! এই সময়ে গ্রামে অনেক যাত্রা দল ছিল। তার মধ্যে হরগৌরী অপেরার মালিক শ্রীমতী আদকের সঙ্গে হঠাৎ আলাপ হয় তাঁর। এই দলের শরৎ দাস, শ্রীমতী আদকের কথায় শংকরকে কাজ দিলেন। এই শরৎ দাসের কাছে যাত্রার অনেক কাজ শেখাই লাভ হলো।

এরপর শংকর কাজ করেন সুধীর রায়ের রায় অপেরায়। ভারতী অপেরায়। ভারতী অপেরার মালিক কলিপদ ঘোষ তখন ওখানকার ম্যানেজার এবং জানকী মিদ্দা সহঃ ম্যানেজার। এখানে বিভিন্ন পালায় ছোটখাট রোলে অভিনয় এবং ফাইফরমাস খেটে, পুনরায় ফিরে আসেন হরগৌরী অপেরায়। বেশকারী থেকে রান্নার ঠাকুরের কাজেও পাকা হয়ে ওঠেন। এ দলের ডাকসাইটে অভিনেতা শচীনন্দন মণ্ডলের জামা-কাপড়ও কেচে দিতে হয়েছে শংকরকে।

এইভাবে যৌবনের প্রথম লগ্ন থেকে যাত্রার সর্ব বিষয়ে কিছু না কিছু শিক্ষায় নিজেকে পাকা করে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। এক সময়ে নটসূর্য দিলীপ চ্যাটার্জী তাঁর প্রথম নিজের দল শ্রীমা নাট্য কোম্পানিতে, ম্যানেজার অভয় সাহার পর শংকর কোলেকে ম্যানেজার করেন। পরে যখন নটসূর্য, 'গণনাট্য' প্রতিষ্ঠা করেন তখন থেকে দীর্ঘ কয়েক বছর গণনাট্যে কাজ করেন। এরপর যখন মোহন অপেরার প্রতিষ্ঠা, তখন ম্যানেজার মধু বড়ালের পর শংকর সেখানে আসেন। তারপর থেকে আজও মোহন অপেরা এবং তারা মা অপেরার সঙ্গে শংকর কোলের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। শংকর সংসার জীবনেও প্রতিষ্ঠিত।

॥ শিবনাথ পাল ॥

কেশোরাম কটন মিলের এক সাধারণ কর্মী প্রয়াত চণ্ডীচরণ পালের ছেলে শিবনাথের জন্ম,

১৯৪৮ সালের ৮ অকটোবর, গোয়াবাগানে। মেট্রোপলিটন ইন্‌স্টিটিউট থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং নানা আন্দোলন শিবনাথকে শিক্ষিত হতে দেয়নি। চাকরির সন্ধান চালালেন। রমেন বসুমল্লিকের সঙ্গে পূর্ব পরিচয়ের সূত্রে তাঁরই সাহায্যে নিউ প্রভাস অপেরার কর্ণধার তিনকড়ি গুছাইতের সান্নিধ্য লাভ করেন। সকলের বড়দা এই তিনকড়িবাবু শিবনাথকে চাকরি করার সুযোগ দেন প্রথমে প্রদীপ দেবনাথের প্রদীপ অপেরায়। কিন্তু তারও আগে কিছুদিনের জন্য প্রদীপবাবুর লীজ নেওয়া নাট্যভারতীতে তালিম নিয়েছিলেন। তখন দল পরিচালক ছিলেন দেবু হাজরা, শিবনাথ হলেন ম্যানেজার।

এরপর এক টানা ১১ বছর চাকরি করেছেন নিউ প্রভাস অপেরা এবং রমেন বসুমল্লিকের যাত্রালোকে। তারপর জনতা অপেরা এবং উর্বশী অপেরা এবং কার্তিক সামন্তের দ্বিগ্বিজয়ী অপেরা। মা, দাদা, স্ত্রী, এক কন্যা সব নিয়ে শিবনাথ ভাল আছেন। যাত্রা কর্মীদের গঠনমূলক সব কাজেই পুরোভাগে থাকেন শিবনাথ। একজন সাধারণ কর্মী হয়ে কত দ্রুত যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো যায় তার উপযুক্ত দৃষ্টান্ত তিনি।

॥ সুধীর মজুমদার ॥

হরেরাম মজুমদারের ছেলে সুধীর মজুমদার ১৩৪৪ সনের ২৮ চৈত্র বর্ধমান জেলার মণ্ডেশ্বর থানার ভুরকুণ্ডা গ্রামে জন্মান। নিতান্ত কৃষিজীবি পরিবারের ছেলে পুটশুরি হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে চাকরির সন্ধানে চলে আসেন কলকাতায়। চাকরি পান নিমতলা স্ট্রীটে বসন্ত ফ্যাকটরীতে সেল ট্যাক্স, ইনকাম্ ট্যাক্স দেখার। সেই সূত্রে পরিচয় হয় শোভাবাজারের ইন্‌কাম ট্যাক্স উকিল জগতবাবুর সঙ্গে। যে জগতবাবুর সহায়তায় সুধীরবাবু ১৩৭১ সনে চাকরি পান নট্ট কোম্পানিতে। কর্ণধার মাখনলাল নট্ট এবং আশুতোষ সাহার স্নেহচ্ছায়ায় সুধীরবাবু যাত্রাদলের কাজ দ্রুত শেখেন এবং এক টানা ১৮ বছর নট্টতে চাকরি করেন। প্রকৃতপক্ষে মাখনলাল নট্টই সুধীরবাবুর শিক্ষা গুরু। '৮৭তে নট্ট ত্যাগ করেন। ১৩৮৮ সনে কোন দলে চাকরি না করে '৮৯ সনে ভাণ্ডারী অপেরায় আসেন। ২ বছর কাটিয়ে '৯১ সনে লোকনাট্যের সর্বাধিনায়ক হন। আবার ভাণ্ডারীতে ২ বছর থেকে নিউ বিশ্বরূপে কাজ করে চলে আসেন অগ্রগামীতে। এই প্রতিষ্ঠানে আজও সসম্মানে কাজ করছেন সুধীরবাবু। আর্থিক সচ্ছলতা এবং জমি জমা তৈরির পিছনে নট্ট কোম্পানির মাখনলাল নট্টের দান অনেক বলে স্বীকার করেন।

॥ সতীশ নন্দী ॥

বরিশালের ফয়রা গ্রামের অনন্তকুমার নন্দীর ছেলে, প্রাচীনতম যাত্রা প্রতিষ্ঠান নট্ট কোম্পানির অতি পুরাতন কর্মী, আত্মীয়, জেনারেল ম্যানেজারের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত সতীশ নন্দীর জন্ম গ্রামের বাড়িতেই। বাড়িতে বারাবরই একটা যাত্রা কালচার ছিল, কারণ চিন্তাহরণ নন্দী হলেন সতীশবাবুর সেজ কাকা, যিনি এক টানা দীর্ঘ কয়েক বছর ছিলেন যাত্রার অভিনেতা। প্রতিবেশী এবং স্কুল বন্ধু অমূল্য নট্ট পড়তে পড়তে যাত্রায় জড়িয়ে পড়ে। তৎকালীন নট্ট কোম্পানির হয়ে অনেকেই আড়কাঠির কাজ করতেন। যেমন জলধর নট্ট'র মত যন্ত্র শিল্পী, রাজেন্দ্র নট্ট এঁরা নট্ট কোম্পানির স্বার্থে ভাল ছেলে দেখলেই তাকে দলে আনতেন। দল ছুটির পর এঁরা বেরিয়ে পড়তেন ভাল ছেলে খুঁজতে। একবার সতীশ যখন জলাশয়ে ডোঙায় বসেছিল ছেলেবেলায়, তখন ঐ জলধর আর রাজেন্দ্র নট্ট খুঁজছিল অমূল্য নট্টকে। সতীশ তাঁদের ডোঙায় চড়িয়ে অমূল্য নট্টর বাড়ি পৌঁছে দেয়। বছর কয়েক পর অমূল্য নট্টর ঠাট-বাট দেখে সতীশ নন্দী অবাক! আসলে অমূল্য তখন নট্ট কোম্পানির আর্টিস্ট। সেই থেকে সতীশও হলো অনুপ্রাণিত। ইতিমধ্যে পথের মাঝে তাঁরা সতীশকেও অফার দিতে ভোলেননি। তারপর সবার অনুমতি নিয়ে অমূল্যের সঙ্গে সতীশ আসেন নট্ট'র বানুরীপাড়ার বাড়িতে। তখন এই দলে থাকত পাঁচ-ছ'খানা

পালাগান। সতীশ প্রথম সুযোগ পান সখীর ব্যাচে। মাইনে বা হাত খরচ দশ টাকা। প্রথম সুযোগ, 'আকালের দেশে'। এরপর 'সমাজের বলি' পালায় সখীদের মধ্যে সতীশ পান সামান্য ডায়লগ। প্রথম বছর যাত্রা করার পরই দেশ ভাগ হলো। ওঁরা দেশ ছাড়েন। ওঠেন বনগাঁয়। ওখানে সরকারি সাহায্য নিয়ে সতীশবাবুরা আসেন বর্ধমানের গুসকরায় গভর্ণমেন্ট ক্যাম্পে। তারপর থেকে দুঃসহ দরিদ্রতার সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ চালিয়ে সতীশ নন্দী আবার আশ্রয় পান নট্ট কোম্পানিতে। সেই থেকে অদ্যাবধি প্রায় ৪০ বছর নট্টতেই জড়িত। সতীশ নন্দী বর্তমানে সুযোগ্য পুত্রের জনক। অনেকটা সুখী। নট্ট কোম্পানির দীর্ঘ ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠা এই সতীশ নন্দী। নট্ট কোম্পানি আর আপন ঘর ছাড়া সতীশবাবুর কাছে অন্য কোন পৃথিবী নেই। যাত্রার কোন আন্দোলন বা যাত্রা পাড়ার কোন কর্মকাণ্ডের মধ্যেই নিজেকে জড়াবার অবকাশ পান না।

॥ সনৎ মুখার্জী ॥

মাত্র ছ'বছর বয়সের পর থেকে যে নাটক-নাটক খেলা ছিল, পরবর্তী কালে সেই নাটক-যাত্রাই সনৎ মুখার্জীর একমাত্র অবলম্বন হয়ে গেল। বালক বয়সে বাবার মৃত্যু, সংসারের তীব্র দারিদ্র্য সবার প্রিয় পুটাইকে নিয়ে আসে এই জগতে। পুটাই ওরফে সনৎ মুখার্জীর জন্ম উত্তর কলকাতার সিমলা স্ট্রীটে। ফকির চক্রবর্তী লেনের এক সাধারণ পরিবেশে গড়ে ওঠে পুটাইয়ের জীবন। নাটক করার তীব্র সখ, সাংসারিক অনটন এবং বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা সনৎ মুখার্জীর লেখাপড়ায় বাদ সাধল। পাড়ায় থাকতেন তদানীন্তন সময়ের বিখ্যাত নাট্যকার অয়স্কান্ত বক্সী। তাঁর সাহায্যে সনৎ প্রথম আসেন 'রঙমহল' থিয়েটারে। রঙমহলের তদানীন্তন মালিক-নাট্য নির্দেশক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সনৎকে অভিনয় করার সুযোগ দিলেন। এখানেই বালক পুটাই অহীন্দ্র চৌধুরীর সান্নিধ্য লাভ করল। সান্নিধ্য লাভ করল অভিনেতা ও নাট্য শিক্ষক সন্তোষ সিংহের। এ ছাড়া আশু বোস, সন্তোষ দাস, বিজয়-কার্তিক দাস, রানীবালা, সুহাসিনীদেবী আরও অনেকের সঙ্গে পুটাই প্রথম অভিনয় করেন। এই নাটক ৩০০ রজনী অতিক্রম করেছিল, ৩০০ রজনীতেই উপস্থিত থাকার জন্য পুরস্কৃত হয়েছিলেন। বালক পুটাইয়ের মাসিক বেতন ছিল মাত্র ১০ টাকা। এরপর ছবি বিশ্বাস, রবি রায়, ভূমেন রায়, শরৎ চট্টোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী প্রমুখ দিকপাল অভিনেতাদের সঙ্গে পুটাই কর্ণার্জুন নাটকে 'বৃষকেতু' চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসা পান। এরপর শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিজয়া' ও 'সরলা' দুটি নাটকে অহীন্দ্র চৌধুরী, শান্তি গুপ্তা, সরযূবালার সঙ্গে অভিনয় করেন। এরপর সনৎ মুখার্জী নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সান্নিধ্য লাভ করেন। তখন কম্বিনেশান নাইট হতো। শ্রীরঙ্গম-এ 'বিজয়া' নাটকের কম্বিনেশান শোতে শিশির ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, জহর গাঙ্গুলী, সন্তোষ সিংহ, শান্তি গুপ্তা, সরযূবালা দেবী, রানীবালা, প্রভা দেবী এবং আরও স্বনামধন্য শিল্পীদের সঙ্গে অভিনয় করেন। দেবনারায়ণ গুপ্তের-'রামের সুমতি' নাটকে 'গোবিন্দ' চরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতি পান। এই নাটকেই হরিধন মুখার্জীর প্রথম আত্মপ্রকাশ। এই সময়ে প্রখ্যাত প্রোডাকসন ম্যানেজার তারক দাস সুযোগ দিলেন সিনেমায় অভিনয় করার। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'রায় চৌধুরী' ছবিতে প্রথম অভিনয় করেন সনৎ। বড় রোল। চৌধুরীদের ছেলে। সুপ্রভা মুখার্জী, প্রমীলা ত্রিবেদী, কমল মিত্র, দেবী মুখার্জী, অহীন্দ্র চৌধুরী এঁদের সঙ্গে অভিনয় করে সনৎ আশাতীত আশীর্বাদ কুড়িয়েছিলেন। এরপর ছবি বিশ্বাস, সন্ধ্যারাণী অভিনীত 'নতুন বউ', ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী (ডি. জি) পরিচালিত এবং ধীরাজ ভট্টাচার্য ও রেণুকা রায় অভিনীত 'ঝরা ফুল', এবং ছবি বিশ্বাস ও রেণুকা রায় অভিনীত 'মহাসম্পদ', অরবিন্দ মুখার্জীর 'ভাই বোন' ছবিতে অভিনয় করে সনৎ প্রশংসা পান। এখানেই চলচ্চিত্র জীবনের সমাপ্তি। এর মূলে ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। থিয়েটার বন্ধ হলো। স্টুডিওগুলো বন্ধ। চাকরির সন্ধানে মরিয়া সনৎ শেষ পর্যন্ত আশ্রয় পেলেন যাত্রা দলে। ঠিকে পার্টি "ক্যালকাটা মিলন বীথি অপেরা'র মালিক ও শক্তিমান অভিনেতা তারক পাল দলে চাকরি দিলেন।

শো প্রতি ২ টাকা পারিশ্রমিকে পুটাই অর্থাৎ সনৎ মুখার্জী এক টানা ৫-৭ বছর অভিনয় করলেন নারী চরিত্রে। এবার 'সত্যম্বর অপেরা'র সোনাইদীঘি পালা আসরে নামল। নারী চরিত্রে অভিনয় করতে যাত্রার আসরে আবির্ভূতা হলেন জ্যোৎস্না দত্ত। শ্রীমতী দত্ত যাত্রায় আসার পর থেকে মেয়েদের যাত্রায় আসার ঢল নামল। সনৎ মুখার্জীরা যাঁরা নারী চরিত্রে রূপদান করতেন, তাঁরা এবার নতুন পথের সন্ধান করলেন। সনৎ এবার পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করার পাশাপাশি ম্যানেজারীর কাজ করলেন ১৪ বছর। তারপর এলেন পেশাদার দল প্রভাস অপেরায়। কর্ণধার তিনকড়ি গুছাইত মাসিক ৩০০ টাকা বেতনে সনৎ মুখার্জীকে ম্যানেজার করলেন। তারপর আসেন শম্ভুনাথ ঘোষের নব রঞ্জন অপেরায়। শম্ভুবাবুর কাছে ম্যানেজারীতে আরও তালিম নিয়ে ৩য় বছরে নব রঞ্জনের পরিচালক হন। ৪র্থ বছরে পুটাইবাবু আসেন নাট্য ভারতীতে। এখানে তখন স্বপনকুমার নায়ক। সনৎ হলেন দল পরিচালক। 'নিশিপদ্ম' সুপার হিট হয়। এই পালায় সনৎবাবু অভিনয়ও করেন। 'মাইকেল' পালায় 'বিদ্যাসাগর' চরিত্রেও অভিনয় করেন সনৎ দল পরিচালনার দায়িত্ব পালনের মধ্যে। ১৩৬৮তে আবার নবরঞ্জন।

তারপর আর্য অপেরা, গণবাণী, গন্ধর্ব, নব অম্বিকা নাট্য কোম্পানি, মুক্তধারা, লোকশিল্প ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলিতে সসম্মানে চাকরি করেছেন। বর্তমানে স্বকর্মে সতেজ। সনৎবাবু কর্মী সংগঠনের সভাপতির আসনও অলঙ্কৃত করেছেন।

পুটাইবাবুর পুত্র দিলীপ মুখার্জী উত্তরাধিকার সূত্রে এই যাত্রা জাগতেরই কর্মী হয়েছেন।

॥ রণজিৎকুমার রায় ॥

যাত্রা জগতের সঙ্গে রণজিৎকুমার রায়ের কোথায় যেন নাড়ির যোগ। দাদু ঁসুরেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন বহুযুগ আগে গণেশ অপেরার সরকার। বাবা ঁবিধুপ্রসাদ রায়ও ছিলেন গণেশ অপেরা পরে জনতা, আনন্দলোকের ম্যানেজার। ধরতে গেলে রণজিতের যাত্রা জগতে প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা উত্তরাধিকার সূত্রে। দশ ক্লাশ পর্যন্ত পড়ে, সংসারে অর্থের প্রয়োজনে রণজিৎ প্রথমে চাকরি পান রঞ্জন অপেরায়। এই দলে ১ বছর থাকার পর রণজিৎ যোগ দেন জনতায় অফিস কর্মী হিসেবে। দলের ম্যানেজার হন প্রথম মাধবী নাট্য কোম্পানিতে। এখানে চার বছর থাকার পর আসেন নীলমণি দে'র লোকনাট্যে। এখানে এক টানা ১০ বছর কাটিয়ে, আর্য অপেরায় ২ বছর, আবার লোকনাট্যে ১ বছর কাটিয়ে যুক্ত হন সুভাষ চ্যাটার্জীর চন্দ্রলোক অপেরায়। মা, স্ত্রী এবং কন্যাকে নিয়ে সংসারে ভালই আছেন।

রণজিৎবাবু কথা কম বলেন। যাত্রার ভাল-মন্দ কোন ব্যাপারেই নিজেকে জড়ান না।

যাত্রা জগতে নিজের কাজটুকু ছাড়া আর কিছু বুঝবার চেষ্টাও করেন না রণজিৎবাবু আর তাই তিনি যে দলেই কাজ করেন সেই দলেই দীর্ঘস্থায়ী হন। বর্তমানে স্বনামধন্য পালাকার-নির্দেশক ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর যোগ্য পুত্রদের তৈরি ভৈরব অপেরা, আনন্দবাজার ও যুগান্তর অপেরার সংযোজক শ্রীরায়।

॥ হারাধন রায় ॥

১৯৬১ সালের ২৬ জানুয়ারি মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া থানার রাধাবল্লভ চকে ঁঅমূল্যচন্দ্র রায়ের এই ছেলের জন্ম।

পূর্ব চিলকা হাইস্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করা, খেলাধূলায় অত্যন্ত পটু, বিশেষ করে কবাডি খেলায় চ্যাম্পিয়ান হওয়া হারাধন ছেলেবেলা থেকেই ভাগ্যবিড়ম্বিত। ১৯৭৮ সালে বানের জলে ভেসে যাওয়া, সর্বস্ব হারানো হারাধন মূলত নিজের পায়ে দাঁড়াতে ঘর ছেড়ে অনিশ্চিতের পথে চলে এসেছিল কলকাতায়। সবে যৌবনে পা রাখা, ছিমছাম ফর্সা এই ছেলেটি অবশেষে ভাগ্যের করুণায় আশ্রয় পেয়েছিল ইনকাম ট্যাকস্ কমিশনার আর. এন. লাখোডিয়ার কাছে। বছর ছয় এই সহৃদয় মানুষটির জন্যই তাঁরই অফিসে পিয়নের কাজে যুক্ত থাকে হারাধন। ঐ সময়ে

টাকাকে চেনার সুযোগ আসে তার। অফিসার ভদ্রলোক হারাধনের কাজে, ব্যবহারে খুশি হয়ে এক সময়ে দিল্লীতে নিয়ে গিয়েছিলেন নিজের অফিসে। বেশ টাকাও তখন হাতে আসে তার। নিমু গোস্বামী লেনের মুখে হারাধন একটা দোকান লিজ নিয়েছিল। সিগারেট থেকে নানা পণ্য। এক সময়ে সেই দোকানও হাত ছাড়া হয়ে গেল। তারপর যাত্রা পাড়ায়। সামান্য মূলধন যা ছিল বিভিন্ন দলে সেই টাকা সুদে খাটাতে খাটাতে অশোক চক্রবর্তীর সাহায্যে তাঁরই 'হলিউড যাত্রা সংস্থা' আর 'লোকরঞ্জনে' ম্যানেজার হয় সে। পরের বছর 'সারদা মা অপেরা'য়। এরপর দক্ষিণারঞ্জন বসুর 'রাজদূত' অপেরার অভিনেতা-নির্দেশক ও সর্বেসর্বা রাজকুমার হারাধনকে পরিচালক করলেন। দক্ষিণাবাবু পরে অত্যন্ত ভালবেসে হারাধনকে করে দেন রাজদূত অপেরার মালিক। তরুণ এই মালিক ঠিক যে ভাবে ভাগ্যের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠেছিল, নানা চক্রান্তে সেই হারাধনের সব হারিয়ে গেল! এখন হারাধন আবার একটি যাত্রা দলের কর্মী। কিন্তু হারাধনের আত্মবিশ্বাস অনেক, তাই যেমন করে অতি সাধারণ হয়ে, যাত্রাপাড়ার ডাকসাইটে এক প্রযোজকের সঙ্গে মামলায় জিতেছেন, ঠিক সেই ভাবে আবার একদিন ফিরবেন মালিকের আসনে।

॥ হিমাংশু রায় ॥

অভিনেতা থেকে যাত্রাদলের ম্যানেজার-পরিচালক যাঁরা হয়েছেন হিমাংশু রায় তাঁদের একজন।

ডাঃ সতীশচন্দ্র রায়ের ছেলে হিমাংশুর জন্ম ময়মনসিং-এ ১৩৪০, আশ্বিন। ১৯৪৮-এ কলকাতায় এসে মতিঝিল স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, পরে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়ে চাকরি জীবন। ১৯৭২ সালে চাকরি থেকে যাত্রা জীবনের সূচনা। দমদম নাগেরবাজারে একই অঞ্চলে থাকতেন যাত্রা জগতের দুলাল চ্যাটার্জী আর হিমাংশু। ঐ সময়ে দুলালবাবু এবং সুভাষ ভৌমিক টনসার যাত্রা করতেন। তারপর তপোবন নাট্য কোম্পানি তৈরি করে দুলালবাবু হিমাংশুবাবুকে অভিনয়ের সঙ্গে দল ম্যানেজারীর সুযোগ দেন। ২ বছর এখানে, তারপর যোগ দেন নবরঞ্জন অপেরায় সহকারী ম্যানেজার হয়ে। যে বছর এই দলে অরুণ রায়ের 'পবিত্র পাপী' পালায় 'রেপ সিন' রাখার জন্য বিরাট গোলযোগ হয় সেই বছর থেকে এক টানা ৯ বছর ম্যানেজারী করেন। তারপর থেকে একে একে অনেক দল। এর মধ্যে অপ্সরা অপেরা অন্যতম। অভিনয় জীবন মুছে যায়। হিমাংশু রায় বেঁচে আছেন দল পরিচালক হয়ে।

॥ দেবু হাজরা ॥

গুরুপ্রসাদ হাজরা চৌধুরীর ছেলে দেবুর জন্ম বর্ধমানের কুসুমগ্রামে ১৯৪৯ সালের ১৯ মার্চ।

কুসুমগ্রাম হাইস্কুল থেকে পাশ করার পর, বোলপুর কলেজের ইতিহাসের ছাত্র ১৯৬১ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম. এ. পাশ করেন। ছাত্র জীবনে অভিনয় করতেন, সেই সূত্রে মেমারির সাধন হাজরা, যিনি নাট্যভারতীতে দেবুকে সহঃ ম্যানেজার হিসেবে যুক্ত করে নেন। এরপর প্রদীপ দেবনাথ যখন নাট্যভারতী নেন তখন দেবু সেখানে আসেন। তারপর একে একে অনেক বিশিষ্ট দলের পরিচালক পদে উন্নীত হন। যাত্রায় কর্মজীবনের মধ্যে দেবু হাজরার মূল্য অনেক, কিন্তু শিক্ষিত এই মানুষটি বাইরের জগতে আর পাঁচজনের মতই যাত্রাকর্মী। যাত্রার সার্বিক কল্যাণে কোন আন্দোলন হলে দেবু নিজেকে শরিক করেন এটাই তাঁর শিক্ষার গুণ।

॥ মিলন দত্ত ॥

প্রেসের টাইপের মাপ, বিজ্ঞাপনের কপি লেখা, একটা থিয়েটার বা যাত্রা দল পরিচালনা, একটা সিনেমা ইউনিটের যাবতীয় কাজ, মেক-আপ, সাজ পোশাক ইত্যাদি প্রসঙ্গে চরম অভিজ্ঞ মানুষ এই মিলন দত্ত। মিলন দত্ত প্রথম আমলে থিয়েটারের অন্দর মহলে যখন নিজেকে বেশ

চিনিয়েছিলেন, ঠিক তখনই উৎপল দত্ত এবং শোভা সেন নিয়ে যান মিনার্ভা থিয়েটারে। একজন নিষ্ঠাবান কর্মী হিসেবে মিলন দত্ত ছিলেন পি. এল. টি'র প্রাণ। মাঝে বছর কয়েক বম্বে চিত্র জগতে প্রোডাকসনের কাজ করেছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ছিলেন দীনেশ নন্দীর অগ্রগামীতে।

যাত্রা কর্মী হিসেবে একমাত্র মিলন দত্তই 'যাত্রাঅর্ঘ্য' পত্রিকার কপি যখনই হাতে পেতেন তখনই বলতেন,—"চালিয়ে যান, থামবেন না। যাত্রাজগতের মানুষের কথা লিখে যান। যখনই থামবেন, তখনই যাত্রার লোকসান—"

এই মানুষটির আকস্মিক মৃত্যুতে যাত্রাপাড়ার অধিকাংশ গদি ঘরের দরজা বন্ধ হয়েছিল তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে।

এই সাধারণ কর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ কলকাতায় বিলাসবহুল ফ্ল্যাট কিনেছেন, কেউ কেউ গ্রাম-শহরে দুটি সংসারের কর্তা হতেও পেরেছেন।

এমন ২।৩ জন যাত্রাকর্মী আছেন যাঁরা প্রতি বছর বা ২।৪ বছর অন্তর অন্তর দল বদলে বিশ্বাসী নন বলেই একই প্রতিষ্ঠানে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন। দারিদ্র্য ঘোচাতে পেরেছেন, কিন্তু অপবাদের আঁচড়টুকু লাগতে দেননি কোথাও! অতি ক্ষুদ্র অবস্থা থেকে একটু একটু করে উপরে পৌঁছে, মালিক হয়ে ব্যবসায়িক সাফল্য পেয়েও কেউ কেউ শেষ রক্ষা করতে পারেননি।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই **হরিপদ বায়েনের** কথা এসে যায়। হরিপদবাবু জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে "এপিক অপেরা" তৈরি করে শেষ পর্যন্ত গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার ভিতর দিয়ে মুক্তির স্বাদ নিয়েছিলেন। **প্রদীপ দেবনাথের** পরিণতি মর্মান্তিক। লটারিতে টাকা পাবার মত কয়েক বছরের মধ্যে তরতরিয়ে ক্যাশ টাকার পর্বতে চড়েছিলেন। একজন পুরুষ মানুষ যা চায় ভাগ্য দেবতা তাঁকে তাই দেন, প্রদীপকে দিয়েছিলেন, কিন্তু যা হারালে সব হারাতে হয় প্রদীপ তেমন কিছু হারালেন। মর্মান্তিক পরিণতি হলো তাঁর! **হৃষিকেশ মিত্র** ওরফে চন্দন মিত্র উত্থান আর পতনের এক জীবন্ত ইতিহাস। **পীযূষ বিশ্বাস** দুভার্গ্য আর কৃতকর্মের প্রকৃষ্ট উদারহণ। **রমেন পালিত** শূন্য অবস্থা থেকে আকাশ স্পর্শ করার অবস্থায় পৌঁছেই মুহূর্তে পতনের জীবন্ত সাক্ষী। রমেন হারেননি এখনও। অতি ক্ষুদ্র অবস্থা থেকে **সুভাষ চ্যাটার্জী** পৌঁছেছিলেন সৌভাগ্যের শিখরে। যাত্রা দলের এক সাধারণ কর্মী সুভাষ, পরবর্তী সময়ে যাত্রা দলের মালিক হয়ে, বিগ হিরোয়িন, বিগ আর্টিস্ট, বিগ বাজেটের প্রযোজনায় ব্যবসায়িক সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ম মেধায় তলায় তলায় নিজের দেশে হোটেল ব্যবসা থেকে, অন্য ঐশ্বর্য তৈরি করে যাত্রার তাজা দলটি তুলে দিয়ে নীরবে ফিরে গেলেন দেশে। **অশোক চক্রবর্তী** মুন্সিয়ানার সঙ্গে মালিকের আসনে আজও অধিষ্ঠিত। এই ব্যবসার মধ্যে আলাদা একটা আকর্ষণ আছে, আলাদা হাতছানি আছে। থাকবেও। তাই **শম্ভু মুখোপাধ্যায়ের** মত যাত্রার একনিষ্ঠ কর্মী, যাত্রা পাড়ার সকলের 'ম্যানদা' শেষ পর্যন্ত হয়েছেন যাত্রা দলের মালিক, তেমনি যে **নেপাল** অতি অল্প বয়সে প্রায় ভাসতে ভাসতে এসে উঠেছিলেন যাত্রা পাড়ায়, লেখাপড়া বিশেষ না জানা যে নেপাল যাত্রার গদিতে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন, সেই নেপাল, যাত্রা দলের দালালি থেকে, দলের ম্যানেজার পরিশেষে দলের পরিচালক পদে নিজেকে সসম্মানে তুলে এনেছিলেন, অনেক শ্রমে, অনেক কষ্টে—সেই নেপাল সরকার পৌঁছেছেন মালিকের আসনে। সুপ্রিয়া দেবীকে নায়িকা করে গড়েছেন যাত্রা দল।

যাত্রা শিল্পের সঙ্গে আত্মার আত্মীয়ের মত জড়িত প্রতিটি কর্মীর কথা বিস্তারিত বলা সম্ভব নয়, সুতরাং এখানে প্রতিটি কর্মী শ্রমিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে একটি নামের তালিকা পেশ করলাম। মনে রাখতে হবে, এই তালিকার অনেক নাম হয়তো আজ আর উজ্জ্বল নেই, হয়তো অনেক নাম মুছে গেছে ঘর থেকে, মন থেকে, কর্মক্ষেত্র থেকে, আবার এমন অনেক নাম আছে, যে নামের বাহকেরা আজ অন্য কর্মজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এখানে হয়তো এমন অনেক নাম

আছে, যারা যাত্রার কর্মজীবনে নতুন আবার এমন অনেক নাম আছে যারা পুরাতন। এই তালিকায় নতুন-পুরাতন পৃথক করা যেমন সম্ভব হয়নি, তেমনি কোন পজিশনে কাজ করছেন তাও আলাদা করে দেখানো সম্ভব হয়নি। কিছু নাম হয়তো তালিকাভুক্ত হয়নি। এখানে আদ্যাক্ষর দিয়ে সেই নামের তালিকা ইতিহাসের পাতায় চিরজন্মের মত বাঁচিয়ে রাখা হলো—

অ।। অজিত বিশ্বাস, অজিত মাজি, অজিত মণ্ডল, অজয় চৌধুরী, অনাথ ঘোষ, অনুপ মাইতি, অমল মাজি, অনুপ ঘোষ, অসীম রুদ্র, অমূল্য রায়, অশোক দাস, অরবিন্দ মহাপাত্র, অভয়পদ সিংহ, অপূর্ব সাহু।

আ।। আনন্দ চক্রবর্তী। **উ।।** উত্তম দাস, উজ্জ্বল ব্যানার্জী। **ক।।** কমলেশ চক্রবর্তী, ক্ষিতীশ রায়, কালীপদ দত্ত, কৃষ্ণ হাজরা, কালী ব্যানার্জী।

গ।। গণেশ দে, গয়ারাম নস্কর, গদাধর চ্যাটার্জী, গোপাল পাত্র, গোপেন দেব, গোপাল চক্রবর্তী, গোরাচাঁদ দাস, গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য, গণেশ হালদার, গৌতম করণ, গোরাচাঁদ ভট্টাচার্য, গোবিন্দ ঢালি, গয়েশ্বর ওঝা, গৌতম সরকার। **চ।।** চিত্ত বসু, চন্দন ঘোষ, চণ্ডী চক্রবর্তী। **জ।।** জহর চট্টোপাধ্যায়, জগবন্ধু পাল, জয়দেব সাহা, জগদীশ হালদার, জ্যোতির্ময় দে, জ্ঞানেন্দ্র কুণ্ডু। **ত।।** তারাপদ ঘোষ, তারাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, তমাল চ্যাটার্জী, তারক দাস, তাপস নাগ, তিনকড়ি গোস্বামী, তাপস ব্যানার্জী, তরুণ নায়েক, তুষার হালদার, তরুণ ব্যানার্জী, তুষারকান্তি বর্মণ। **দ।।** দুলাল পাত্র, দুলাল দত্ত, দেবেন দাস, দেবদাস পাল, দেবু দে, দেউল দে, দেবু নস্কর, দেবু হাজরা, দিলীপ মুখার্জী, দুর্গাপদ চ্যাটার্জী, দীপক ভট্টচার্য, দিলীপ পাল।

ন।। নিমাই প্রতিহার, নেপাল গোস্বামী, নেপাল সরকার, নির্মল জানা, নিরঞ্জন গুড়িয়া, নেপাল ঘোষ, নেপাল দাস, নারায়ণ গিরি, নির্মল পোলে, নরেন গুছাইত।

প।। পরেশ রাউত, পরিতোষ ধাড়া (ইনি গুরুদাস ধাড়ার কাকা), পরেশ কোলে, প্রদ্যোৎ ব্যানার্জী, প্রশান্ত সাহা, প্রসাদ চক্রবর্তী, পরাগ নস্কর, প্রভাত নন্দী, প্রভাস চ্যাটার্জী, প্রদীপ রায়, প্রদীপ সাহা, প্রবীর মিদ্দা, প্রফুল্ল হাজরা, প্রবীর সিংহ। **ব।।** বংশী সর, বনবিহারী পাণ্ডা, বাচ্চু ভট্টাচার্য, বাদল রায়, বারিন ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, বাদল বর্মণ, বিমান ঘোষ, বিমল ভৌমিক, বিজয় দাস, বিমল দত্ত, বিরাজ দে, বিনোদ সাহু, বাবলু চৌধুরী, বীরেন্দ্র গিরি, বেনু সেনগুপ্ত, বৈদ্যনাথ কোলে। **ভ।।** ভবানী বিষয়ী, ভানু বোস, ভাস্কর দত্ত।

ম।। মলয় রেজ, মহাদেব নন্দী, মন্তাকিন হালদার, মুকুল কর, মাধব রায়, মুকুল গোস্বামী, মৃণাল নস্কর, মিথুন রায়, মণি চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন সাউ। **য।।** যামিনী চক্রবর্তী। **র।।** রণজিৎ রায়, রবীন দাস, রবীন সরকার, রবি মিদ্দা, রবি হালদার, রবি সরকার, রাজেশ শাসমল, রামকৃষ্ণ মণ্ডল, রাজেন জানা, রামনারায়ণ চক্রবর্তী।

শ।। শম্ভু ভট্টাচার্য, শুভেন্দু রায়, শম্ভু মাইতি, শংকর বেরা, শশাঙ্ক দে, শক্তি শাসমল, শংকর ধাড়া, শংকর কোলে, শিবু মাইতি, শিবনাথ পাল, শ্রীশংকর, শিবাজী ব্যানার্জী, শান্তি মুখার্জী, শান্তনু অধিকারী, শৈবাল বেরা, শৈলেন মুখার্জী, শ্যামল দাস। **স।।** সন্তোষ বোস, সমর চ্যাটার্জী, সমর দে, সত্য ভট্টাচার্য, সত্য রায়, সজল পাল, সত্য কোলে, সুদাম চক্রবর্তী, সুনীল দত্ত, সুশীলকুমার, সুবোধ সাউ, সুজন ভট্টাচার্য, সুকান্ত মাইতি, সুকুমার বৈদ্য, সুকুমার কোলে. সাহেব আলি, সুশীল ব্যানার্জী, সুশান্ত রায়, স্বপন নন্দী, স্বপন কোঙার, সুনীল হাজরা, সুভাষ বোস, স্বপন চ্যাটার্জী, সুকুমার দাস, সুভাষ দাস, সুব্রত ঘোষ, সুভাষ চ্যাটার্জী, সুধীর অধিকারী, সুজন দেব, সত্যজিৎ ঘোষ, স্বপন দাস।

হ।। হরিদাস হাজরা, হরেন মণ্ডল, হরি সিং।

॥ প্রসঙ্গ সাজঘর ঃ একদল মানুষের ছবি ॥

যাত্রার জীবনযাত্রার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত না থাকলেও, যদি অন্ততঃ একটি গোটা দিন ধরে যাত্রার জীবন যাত্রার ওপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা যায়, যদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে একটি দলের সর্বস্তরের জীবন-যাত্রার ছবিটা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করার মনটাকে সম্পূর্ণ মেলে ধরা যায়, তা হলে একটি সত্যে পৌঁছনো যাবে, আর তা হলো বিবেক এবং বিবেকহীনতা, প্রেম আর প্রেমহীনতা, চরিত্র ও চরিত্রহীনতা, বড় ও ছোটর দুস্তর ব্যবধানের মধ্যে নিষ্ঠা, শ্রম, সাধনা, বিশ্বাস অর্জনের স্মরণীয় ইতিবৃত্ত।

গোটা দুনিয়াটা যখন আত্মসুখ রচনায় মগ্ন, যখন সরকারি-বেসরকারি সর্বক্ষেত্রে নিয়োগ পত্রের শর্তভঙ্গ একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে, স্বকর্মে নিষ্ঠা যখন প্রায় নিশ্চিহ্ন, তখন কী আশ্চর্য রকম নিষ্ঠা যাত্রা দলের অধিকাংশ শিল্পী থেকে একজন সাধারণ কর্মীর তা না দেখলে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়! বাসের মাথায়, বাসের পেটে বিরাট বিরাট বাক্স-প্যাটরা মাথায় করে তোলা থেকে আসরের সাজঘরে পৌঁছে দেওয়া, আবার অভিনয় শেষে প্রতিটি জিনিস মিলিয়ে গাড়িতে তোলা থেকে, শিল্পীদের বিছানা পেতে দেওয়া, সারিবদ্ধভাবে ছোট-বড় পজিশান মাথায় রেখে শিল্পীদের মেক-আপ নেবার আসন পেতে, নামে নামে মেক-আপ বক্স সাজিয়ে দেওয়া, রন্ধন শালা থেকে বেশভূষার বিভাগটিকে সাজানো, প্রয়োজন অনুসারে শিল্পীদের হাতে রিকিউজিশান তুলে দেওয়া, আসরে যন্ত্র সাজানো থেকে আসরে অভিনয়ের সময় পরিত্যক্ত জিনিস মুহূর্তে কুড়িয়ে আনা, সঠিক সময়ে প্রোগ্রাম বিক্রি থেকে টপ আর্টিস্টের সমস্ত ফাইফরমাস খাটা, দম দেওয়া কলের পুতুলের মত কাজ করে যাওয়ার ছবিটা না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না, কর্মীদের কী নিদারুণ ঘাম ঝরা শ্রমদান এখানে বিদ্যমান।

এই কর্মীদের বলা হয় সাজঘরের লোক! ৭ থেকে ৯ জন কর্মী নিযুক্ত হন একটি দলের জন্য। এর মধ্যে আবার শ্রেণী ভাগও আছে। যেমন, বেশকারী, টপ আর্টিস্টের ব্যক্তিগত চাকর ইত্যাদি। বেশকারী ৩ জন, তার মধ্যে একজন হন প্রধান। এই কর্মীদের মধ্যে একজন আবার প্রধান থাকেন, যিনি সাজ ঘরের যাবতীয় ডিসিপ্লিন রক্ষা করেন। অনেক সময় প্রধান বেশকারীর ওপরও ঐ ভার ন্যস্ত থাকে। এই সাজঘরের প্রধানই ২।৩ জন কর্মী নিয়ে সাজঘরে চালান চায়ের ক্যানটিন।

বলা বাহুল্য, অতীতে সাজঘরের মধ্যে চা তৈরির ব্যাপারটা ছিল না। টপের জন্য ব্যক্তিগত চাকর বাইরে থেকে এনে দিত, অন্যেরা বাইরে গিয়ে খেয়ে আসতেন বা কেউ কেউ ব্যাপারটা মুন্সিয়ানার সঙ্গে সেরে নিতেন।

কয়েকটি বড় দল ছাড়া কোন দলেই মালিকের পক্ষ থেকে চা পরিবেশনের ব্যবস্থা নেই। আছে ক্যান্টিন, যা তৈরি করেন সাজঘরের লোক। যত চা এবং বিস্কুট এমন কি পান-বিড়ি-সিগারেট যাই সাপ্লাই করা হোক, যাঁরা খাবেন তারা টাকা দিয়েই খাবেন। এটা কয়েকজন কর্মীর রুজি-রোজগারের একটা ছোট্ট দিক। সাজঘরের লোক বিক্রি করে প্রোগ্রাম। অতীতে যখন প্রোগ্রামের দাম মালিকরা ১০ পয়সা ধার্য করতেন তখন বিক্রেতা পেতেন টাকায় ১০ পয়সা। এখন প্রোগ্রামের দাম ১ থেকে ১।। টাকা। এ ক্ষেত্রে বিক্রেতা পান টাকা প্রতি ৩০ পয়সা। এ সবই সৃষ্টি হয়েছে, এই জীবনপাত করা শ্রমিকদের যৎসামান্য পারিশ্রমিক আর জলপানি এতই নগণ্য যে, তাঁদের অতিরিক্ত কিছু উপার্জনের পথ করে দিয়ে মালিকরা উদারতার নজির রেখেছেন। সাজঘরের প্রধানদের কিছু নাম, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে চিরজন্মের মত রেখে দিল্যম এই ইতিহাসের পাতায় ঃ

তালিকা পেশ করার আগে আর একটা সত্য ছবি আঁকা দরকার। জেনে রাখা দরকার, এক সময়ে এঁরা ছিলেন অভিশপ্ত। পান থেকে চুন খসলে টপ আর্টিস্টের কাছে যে ব্যবহার পেতেন বোধ

করি বাড়ির পোষা কুকুরটাও সেই ব্যবহার পায় না। আবার এমন দু'একজন মহৎ প্রাণ শিল্পী ছিলেন যাঁদের ভালবাসা, মমত্ববোধের কথা আজও মনে আছে অনেকের। বর্তমানে সেই অভিশাপ থেকে অনেকটাই মুক্ত এঁরা। এমন একজন **কানাই কুণ্ডু**। এখন আর কানাই কুণ্ডুকে দেখলে চিনবে না কেউ। জটাজুটধারী, কৌপিন অঙ্গে। কপালে সিঁদুর টিপ। প্রথম দর্শনেই মনে হবে সাধু বা কাপালিক! এই কানাই কুণ্ডু যৌবনে বিরাট বিরাট বাক্স-প্যাঁটরা মাথায় করে নিয়ে যেতেন সাজঘরে। আবার এই কানাই ছিলেন পূর্ণেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত চাকর! এই জীবন থেকে কঠিন অসুস্থতা তাঁকে মুক্তি দিয়েছে, বেছে নিয়েছেন এই সাধু বেশ! কিন্তু ভুলতে পারেন না পূর্ণেন্দুবাবুকে! পূর্ণবাবুর মত বিরাট শিল্পীর হৃদয়টা ছিল খুব বড়। তাঁর অনেক মহত্ব আর অনেক কার্যকলাপের এক রাশ স্মৃতি এখন কানাই কুণ্ডুর মনে।

এ ছাড়া সুবল, কালী, পশুপতির কথাও মনে আছে কানাইয়ের। তিনি বললেন, সুবল চাকর, কালী চাকর, পশু এমন ছেলে বিরল...

আরও যাঁরা শ্রম দানের ক্ষেত্রে সোনার ছেলে তাঁরা হলেন ঃ

অতুল মণ্ডল, কালীপদ মাইতি, গুরুপদ মাইতি, গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী, গৌরাঙ্গ দাস, তরুণ বিজলী, দেবদাস পাল, নকুল দাস, নিতাই অধিকারী, নিমাই সাঁতরা, পুলিন সামন্ত, বিশ্বনাথবাবু, রাম সামন্ত, রণজিৎ বেরা, রণজিৎ রায়, রঘু, শ্রীবাস সরদার, সত্য দাস, সুকুমার সরকার, সুধীর নস্কর, হেমন্ত সাউ, হরিপদ পাণ্ডা।

সাজঘরের এই প্রধানদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যাঁরা সব কাজেই প্রায় ওস্তাদ, যাত্রার চণ্ডীপাঠ থেকে জুতো সেলাই পর্যন্ত করতে পারেন। আবার এঁদের মধ্যে অনেকেই টপ শিল্পীর ব্যক্তিগত ফাইফরমাস খাটার জন্য প্রধানত নিযুক্ত, যেমন **পুলিন সামন্ত** হলেন বীণা দাশগুপ্তের জন্য বিশেষভাবে নিয়োজিত।

বেশকারী প্রধান ঃ অচ্যুত সামন্ত, অনিল পাত্র, তাপস মণ্ডল, নারায়ণচন্দ্র শী, নারায়ণ জানা, ভীম পাল, ভানুবাবু, শ্রীধর দাস, শম্ভুনাথ মাইতি, সুধাংশুবাবু, হৃদয় সিট আরও অনেকে।

এই বেশকারী প্রধানদের মধ্যে কেউ কেউ সাজঘরের প্রধান হিসেবে কাজ করেন।

॥ যাত্রার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ রন্ধনশালা ॥

যাত্রা ব্যবসা সুখের ব্যবসা নয়। যাত্রা জীবন প্রকৃত পক্ষে কচুর পাতায় জলের মত।

প্রযোজকরা যখন একটি পালা আসরস্থ করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন থেকেই একটা লটারির টিকিট কাটার মতো মনের অবস্থা হয় তাঁদের। পালার মহলা শেষ করে, কোন মঞ্চে বা মন্দিরে ট্রায়াল শো করে, ঠিক যেদিন, যখন দূর আসরের জন্য একগুচ্ছ তাজা প্রাণ বাসের পেটে পুরে দিয়ে রওনা করিয়ে দেন, তখন থেকেই উৎকণ্ঠা গ্রাস করে মালিকদের। প্রতি মুহূর্তে ঈশ্বরের কাছে চলমান বাস আর সম্প্রদায়ের শুভ কামনা করেন। চারটি চাকার ওপর থাকে কয়েকশত পরিবারের জীবন। যথা সময়ে বাস স্পটে পৌঁছলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে রন্ধনশালা, সাজঘর আর আলোক বিভাগের। এর মধ্যে রন্ধনশালার গুরুত্ব অনেক বেশি। সেদিক থেকে রান্নাঘরের ঠাকুর যাত্রার ইতিহাসে উঠে আসা বাঞ্ছনীয়। পঞ্চাশের দশকের আগের কোন খাঁটি ব্রাহ্মণ ঠাকুরের সন্ধান আমি পাইনি। কিন্তু পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকে নব্বই দশকের মধ্যে বহু ঠাকুরের কথা জানা যায়, কিন্তু সকলের কথা বিস্তারিত বলা যায় না। এ প্রসঙ্গে অবশ্য ননাঠাকুর বলেন, ইদানিং নানা জায়গা থেকে অনেক রান্নার ঠাকুর এসেছে যাত্রায়। এঁদের মধ্যে খাঁটি ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান ক'জন আছে তা নিয়ে অনেকেরই কৌতূহল আছে।—কিন্তু এক সময়ে যাত্রায় প্রধান ঠাকুর অবশ্যই উচ্চ শ্রেণীর

ব্রাহ্মণ বংশজাত ছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই রান্নার ব্যাপারে ছিলেন ওস্তাদ। এক একজন ঠাকুর এমন ছিলেন বা এখনও আছেন, যাঁরা এক দলে ঢুকে সেই দলেই প্রায় গোটা জীবন কাটিয়েছেন। কেউ কেউ চলে গেছেন।

এখানে কয়েকজন ঠাকুরের একটি তালিকা পেশ করি। পদ্মঠাকুর, অনন্তঠাকুর (মিশ্র), তারাঠাকুর, রামঠাকুর, দীনেশঠাকুর, ননাঠাকুর, কেষ্টঠাকুর, সুভদ্রঠাকুর পবনঠাকুর, দিবাকরঠাকুর, কৃষ্ণকান্ত পাণ্ডা, কিষাণ ঠাকুর, প্রমুখ। **পদ্মঠাকুর, অনন্তঠাকুর,** এঁরা দীর্ঘকাল যেমন নট্ট কোম্পানিতে থেকেছেন, তেমনি **রামঠাকুর,** অনুকূলঠাকুরের যাত্রা দল থেকে এসে প্রকৃত পক্ষে সত্যম্বর অপেরায় কাটিয়েছেন গোটা জীবন। **দীনেশঠাকুর** ছিলেন মৈথিলী ব্রাহ্মণ। রান্নাঘরে ঢোকার আগে পর্যন্ত দীনেশঠাকুর পুরদস্তুর অভিজাত বাঙালি হয়ে কাটাতেন। দর্শনে ও আচার আচরণে তিনি সত্যিই ছিলেন অভিজাত। দীনেশঠাকুরের মনটা সব দিক থেকে দরাজ ছিল বলেই তাঁর রান্না হতো অত্যন্ত সুস্বাদু। যাত্রা জগতের দিকপাল সবাই তাঁর রান্না খেয়েছেন। প্রবীণা অভিনেত্রী **অঞ্জলি ভট্টাচার্য** যাত্রায় এসেছিলেন রূপ আর গুণের ঐশ্বর্য নিয়ে। ঐশ্বর্য যেখানে, ভয়াল-ভয়ঙ্কর চোখ আর বিষাক্ত নখের থাবা সেখানে সর্বদা সজাগ থাকে ; দীনেশঠাকুর তেমনি দৃষ্টি আর থাবা থেকে শুধু রক্ষা করেননি অঞ্জলি দেবীকে, স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে সংসারে প্রতিষ্ঠা দিয়ে গিয়েছিলেন। আজকের প্রজন্ম এটা কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবে জানি না, কিন্তু একজন সাধারণ মানুষের এই মানবধর্ম পালনের কথা ইতিহাস স্মরণে রাখবে যুগ যুগান্তর।

ননা ঠাকুরের আর এক কীর্তি। এই ছোটখাট, সহজ-সরল-নারীসুলভ ভাব ভঙ্গিমার মানুষটি প্রথম জীবনে উড়িষ্যার রঘুনাথ পাণ্ডার দলে চুটিয়ে নারী চরিত্রে অভিনয় করতেন। তারপর আসেন কলকাতায়, সে প্রায় ৪২ বছর আগে। কলকাতায় এসেই ঢুকে ছিলেন স্বনামখ্যাত কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ির রান্নাঘরে। তারপর ভাগ্য তাঁকে আনে যাত্রায়। সত্যম্বর অপেরায় গৌর দাস তাঁকে সহকারী হিসেবে রান্নাঘরে চাকরি দেন। তারপর যাত্রা সম্রাজ্ঞী জ্যোৎস্না দত্ত তাঁকে আনেন নব রঞ্জনে। অল্প কয়েক মাসের মধ্যে ননাঠাকুর সকলের মন জয় করেন অসামান্য বান্নায়। ননাঠাকুরের সুক্তো, মোচার ঘণ্ট, ছ্যাচ্ড়া, কৈ মাছের গঙ্গা যমুনা, চিলি চিকেন, দৈ ইলিশ, ইলিশ পাতুরি, চিংড়ীর মালাইকারী, রোস্ট যাঁরা একবার খেয়েছেন তাঁরা ননাঠাকুর অন্ত প্রাণ! ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দলে রেখেছিলেন ননাঠাকুরকে। সেই ভানুবাবুর ইচ্ছে হলো, জন্মদিনে সবাইকে ননা ঠাকুরের রান্না খাইয়ে তৃপ্ত করবেন। তৃপ্ত হয়েছিলেন উত্তমকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় থেকে সিনেমার দিকপালেরা। যাত্রার বড় ফণিবাবু, সুনীল মুখার্জী (রামু) থেকে স্বপনকুমার সবাই ননাঠাকুরের রান্নার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। দলের অন্য সকলের মুখেই ননাঠাকুরের নাম। ননাঠাকুরের সেরা কীর্তি, তাঁর ২ ছেলের মধ্যে বড় ছেলে সুদেশকুমার পাণ্ডাকে গ্রাজুয়েট করেছেন। সে এখন এম. এ. ক্লাশের ছাত্র। ছোট ছেলে পড়ছে। এই জীবনের মধ্যে কোন উত্তরাধিকারকে রেখে যেতে তিনি চান না!

॥ যাত্রার বুকিং এজেন্টদের ঐতিহাসিক ভূমিকা ॥

গ্রাম-গ্রামান্তরে, হাটে-মাঠে-ঘাটে যাত্রাগান করানোর ব্যাপারে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছেন বহু নায়েক এবং বুকিং এজেন্ট। মাঠের পর মাঠ পায়ে পায়ে অতিক্রম করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, বুকের রক্ত জল করে এই বুকিং এজেন্টরা ঘুরে বেড়ান, গ্রাম-গ্রামান্তরের ক্লাব, বাজার কমিটি, স্কুল সর্বত্র। এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করে, কবে, কখন যাত্রা করালে কত কম টাকায় পেশাদার দল পাওয়া যাবে, যাত্রা করালে ব্যবসায়িক সাফল্য কতটা আসতে পারে বুঝিয়ে, যাত্রা করাতে ইচ্ছুক নায়েক পক্ষকে রাজি করিয়ে তাঁদের হয়ে যাত্রা দল বায়না করে সারাটা জীবন যাঁরা কাটিয়েছেন, অতীতে যখন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেবার রেওয়াজ ছিল না, তখন এইভাবে গ্রাম-গঞ্জে যাত্রার প্রসার ঘটিয়ে যাঁরা যাত্রার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, বা আজও যাঁরা

বুকিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করে চলেছেন, তাঁদের যাত্রা জগতে কোন শ্রদ্ধার আসন নেই। এঁরা যাত্রা দলের মালিকের কাছে দালাল ছাড়া আর কিছু নন। যাত্রার বায়না সংগ্রহ করার বিনিময়ে এঁরা পারিশ্রমিক পান এটাই যাত্রা জগতের কাছে বড় কথা। এই সব বায়নাকারী বুকিং এজেন্ট বা দালালরা অতীতে, একটি দল বায়না করলে যে পারিশ্রমিক বা দালালি পেতেন তাতে, ঘাম আর ঝরানো রক্তের দাম বিশেষ উঠত না। আজকের বুকিং এজেন্টরা শত করা ৬ শতাংশ দালালি পান। দলের রেট যেহেতু আকাশ ছোঁয়া, সেই হেতু আজকের বুকিং এজেন্টরা আর্থিক সচ্ছলতা হয়তো অতীতের তুলনায় বেশি ভোগ করছেন। শ্রমের মাত্রাও অনেক কম। অতীতে যেখানে একজন বুকিং এজেন্টকে গামছায় চিঁড়ে-মুড়ি বেঁধে মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে বায়না জোগাড় করতে হতো, এখন সেখানে যানবাহনের প্রাচুর্যে ততটা শ্রম দিতে হয় না। এ ছাড়া অনেক জেলা শহরে এই এজেন্টরা বুকিং কোম্পানি খুলেছেন বিভিন্ন নামে! যা হোক, এই সব বুকিং এজেন্টরা যাত্রা ব্যবসা ক্ষেত্রে কোন শ্রদ্ধা-ভালবাসা না পান, এঁদের ভূমিকা একটি শো বিজনেসের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে যাত্রার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া, এই সব মানুষরা যাঁরা শুধু নীরবে, নিতান্ত অন্ধকারে থেকে সারাটা জীবন উৎসর্গ করলেন, তাঁদের পরিবার-পরিজনের কাছে এঁদের প্রকৃত পরিচয় রেখে যাওয়া এই ইতিহাসের আর এক ভূমিকা।

॥ অনিল ভাণ্ডারী ॥

অনিল ভাণ্ডারী মানেই অতীত ও বর্তমান যাত্রার এক শক্ত সেতু।

যাত্রা ব্যবসার অন্যতম প্রধান ও বড় ব্যাপার হলো 'বায়না'। এই বায়নার ওপরে গোটা যাত্রা ব্যবসাটি নির্ভর করছে। নির্ভর করছে টপ অভিনেতা-অভিনেত্রী থেকে অতি সাধারণ একজন অভিনেতা-অভিনেত্রী-কর্মীদের, অর্থাৎ একটি যাত্রা দলের সঙ্গে জড়িত ৬০।৭০ জন মানুষের ভাগ্য এবং ৬০।৭০ পরিবারের অস্তিত্ব। আর এই বায়না বৃদ্ধির জন্যেই যাত্রা দলের মালিকরা সমস্ত শক্তি ও অর্থ ঢেলে দেন প্রতি মরশুমে। বায়না বৃদ্ধির জন্য যাত্রার মালিকরা তাঁদের দল সাজাতে, পালা চালাতে শিল্পীদের পিছনে যেমন অকাতরে টাকা ঢেলে বহু শিল্পীকে ধনী করেছেন, তেমনি সংবাদপত্রে লক্ষ লক্ষ টাকার বিজ্ঞাপন দেবার প্রতিযোগিতা এনেছেন। নায়েকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য, দর্শকদের মন মজাবার জন্য যেমন সাইক্লোরামা থেকে বাঘ-সিংহ আসরে নামাচ্ছেন, তেমনি আবার বুকিং এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন বেশি মাত্রায়। এমনি এক সর্বজনশ্রদ্ধেয়, সুবিখ্যাত বুকিং এজেন্ট হলেন অনিল ভাণ্ডারী! অতীতে এই বায়না জোগাড় করতে বহু এজেন্টকেই সারাজীবন উৎসর্গ করতে হয়েছে। এঁদের মধ্যে এখনও যাঁরা বুকিং এজেন্ট হিসেবে খ্যাতির সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে এক এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি অনিল ভাণ্ডারী। অনিলবাবুর অনেক দানে যে বহু যাত্রাদল পুষ্ট হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই! আর তাই গোটা যাত্রাজগৎ অনিল ভাণ্ডারীকে "যাত্রালর্ড" বা "কোলিয়ারী লর্ড" নামে অভিহিত করেছেন। একদা অনিলবাবুও মাইলের পর মাইল হেঁটে, দিনের পর দিন নিজেকে অভুক্ত রেখে, বুকের রক্ত ঝরিয়ে গোটা কোলিয়ারী অঞ্চলে, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, বর্ধমান, দুর্গাপুর এমন কি কলকাতার বাইরে, আসাম-উত্তরবঙ্গের প্রতিটি দরজায় ঘুরে যাত্রা দলের বায়না জোগাড় করে, নিতান্ত দুস্থ অবস্থা থেকে আজ প্রতিষ্ঠার শীর্ষে পৌঁছেছেন! আজ সত্যিই তিনি আসানসোল দুর্গাপুরের কোলিয়ারী বেল্টের একজন লর্ড। যাত্রা শিল্পের স্বার্থে, শিল্পী ও কর্মীদের স্বার্থে রাণীগঞ্জের রাণীসায়রের মোড়ে একদা গড়ে তুলেছিলেন যে বুকিং সেন্টার 'যাত্রাভবন', যে 'যাত্রাভবন'-এর দ্বারোদঘাটন করেছিলেন সাংবাদিক প্রবোধবন্ধু অধিকারী এবং আর বহু শিক্ষিত-বুদ্ধিজীবিরা, সেই 'যাত্রাভবন' অতি অল্পসময়ের মধ্যে বৃহত্তম যাত্রাবন্দরে রূপান্তরিত হয়েছে। মরশুম শুরুর অনেক আগে যাত্রা মালিকদের পাঠানো বিশাল বিশাল ব্যানার-হোর্ডিং যেমন যাত্রাভবনের পরিমণ্ডলকে জমজমাট করে তোলে, তেমনি

প্রতি সন্ধ্যায় দলের বিশাল বিশাল লাক্সারী বাস ভর্তি শিল্পী-কর্মী, প্রাইভেট কারে বসা টপ আর্টিস্ট, পালাকার, অতীতের কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত থেকে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল ঘোষ, শ্যামল সেন, আবার স্বপনকুমার, জ্যোৎস্না দত্ত, বীণা দাশগুপ্ত থেকে বেলা সরকার, কিংবা মঞ্জু দে থেকে ভিক্টর সবাইকেই এসে দাঁড়াতে হতো, দাঁড়াতে হয় যাত্রা ভবনের সামনে। ভোরের আলো ফোটার আগে যাত্রাভবনের সামনে জমায়েত হয় আসর ফিরতি কিছু কিছু বাস-প্রাইভেট। দাঁড়াতে হয় বিশ্রাম নিতে। দাঁড়াতে হয় প্রাতঃকালীন সব কাজ সেরে নিতে। একটি জংশন ষ্টেশনের মত একটি প্রধান ষ্টেশনের রূপ নেয় 'যাত্রাভবন'। অনিলবাবুর দুই যোগ্য পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে এখন যাত্রাভবনের গুরু দায়িত্ব পালন করছেন। এখন অনিল ভাণ্ডারী তাঁর একাধিক ফোনে যাত্রা দলের বায়না করেন লর্ডের মত। মরশুম আরম্ভের মাস কয়েক আগে থেকে কলকাতার সব দলেরই প্রতিনিধিরা জমায়েত হন "যাত্রাভবনে" পোস্টার নিয়ে, বায়না ধরার জন্য। ইদানিং আরও কিছু বিখ্যাত বুকিং এজেন্ট সরাসরি অনিল ভাণ্ডারীর পুরাতন কর্মচারী।

॥ আশুতোষ গাঙ্গুলী ॥

১৩০৫ সালের ১৪ ভাদ্র আশুতোষ গাঙ্গুলীর জন্ম হুগলী জেলার ভৈরবপুর গ্রামে। ১৩২১ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে আশুবাবু যাত্রার সঙ্গে যুক্ত হন। তারপর ৬২ বছর অর্থাৎ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যাত্রার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কোন যাত্রা দল কোন বিপদে পড়লে আশুবাবু বুক পেতে দিতেন। তৎকালে ২০ থেকে ২২ মাইল পথ পায়ে হেঁটে তিনি দলের জন্য বায়না জোগাড় করে আনতেন। আর এইভাবে অরণ্যে, একাকী পথে বহুবারই তাঁর জীবনহানির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। আজকের এই নব্যযুগের, সভ্য মানুষেরা হয়তো বিশ্বাস করবেন না, বায়না করে ফেরার পথে বহুদিন পথেই নেমেছে রাতের গাঢ় অন্ধকার। হিংস্র জীব-জন্তুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য অনেক দিনই শাল গাছের ডালে রাত কাটিয়েছিলেন আশুবাবু। পরবর্তী কালে আশুবাবুকে হাতে রাখলে দলের বায়না পাওয়া সহজ হবে এই স্বার্থপর মন নিয়ে যাত্রার বড় বড় মালিকরা এমনকি বিখ্যাত শিল্পীরা তাঁর বাড়িতে ধর্ণা দিতেন।

পঞ্চাশের দশকের তেমনি কিছু বিখ্যাত শিল্পী মালিক হলেন, সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়, সূর্য দত্ত, গৌর দাস, পঞ্চু সেন, বড় ভোলা পাল, শিব ভট্টাচার্য, ছোট ভোলা পাল, অমিয় বসু, বিমল লাহিড়ী, বিজয় মিত্র, নিরাপদ দাস, শৈলেন পাল, শম্ভু ঘোষ, গোষ্ঠবিহারী ঘোষ, জীবনকৃষ্ণ দাস, কিষাণ দাশগুপ্ত, শৈলেন মোহান্ত, মাখনলাল নট্ট, কালিপদ দাস আরও অনেকে। কম-বেশি সব দলকে বায়না দিতেন আশুবাবু। নট্ট কোম্পানির কর্ণধার মাখনলাল নট্ট এই মানুষটিকে 'বাবা', এবং সত্যম্বর অপেরার কর্ণধার শৈলেন মোহান্ত 'কাকা' বলে সম্বোধন করতেন। যাত্রা জগতের অনেকেই তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। ব্যতিক্রম ঘটেছিল একবার। সেই ঘটনা কিংবদন্তী হয়ে আছে।

নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরার মালিক নারায়ণ ভট্টাচার্য (অতীতে রূপকুমার নামে খ্যাত ছিলেন) বিনা কারণে আশুবাবুকে পদাঘাত করার জন্য পরের দিনই এক মোটর দুর্ঘটনায় নারায়ণবাবুর একটি পা সম্পূর্ণভাবে পঙ্গু হয়ে যায় এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ঐ কারণে শয্যাশায়ী ছিলেন।

আশুবাবু ২৫ বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন। তিনি জীবনে সব চাইতে বড় আঘাত পেয়েছিলেন তাঁর একমাত্র মেয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে। এই মর্মান্তিক ঘটনার ৩ বছর পর স্ত্রী মারা যান ও আশুবাবু সম্পূর্ণ একা হয়ে যান। কোন পুত্র সন্তান না থাকায়, আশুবাবু তাঁর আত্মীয় সাধন মুখার্জীকে সহযোগী হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন।...বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, হুগলী জেলার সমস্ত নায়েকদের কাছে আশুতোষ গাঙ্গুলী শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ১৩৮৩ সনের ২৬

চৈত্র, হুগলী জেলার মুল্‌টি গ্রামে নিজস্ব বাসভবনে ৭৮ বছর বয়সে আশুবাবু মারা যান। মৃত্যুর আগে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'অমর এজেন্সী' নামে বুকিং এজেন্ট অফিস।

॥ অজয় ঘোষ (চিনা) ॥

চিনা নামে খ্যাত এই মানুষটি দীর্ঘকাল যাত্রার সঙ্গে জড়িত। প্রভাতকুসুম ঘোষের ছেলে এই অজয়ের জন্ম ১৯৩৮ সালে, বিহার জেলার পূর্ণিয়ার অন্তর্গত কাটিহারে। বাবা ছিলেন রেল কর্মী। উচ্চপদস্থ। তাঁর বদলি চাকরি, সুতরাং মাত্র ৩ বছর বয়সে অজয় কলকাতায় চলে আসেন। মাত্র অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে অজয় একটু দুরন্ত প্রকৃতির হয়ে ওঠেন। মূলত রাজনীতির সঙ্গে সেই বয়স থেকে তাঁর জড়িয়ে পড়া। চিৎপুর যাত্রাপাড়ার কাছাকাছি অঞ্চলের ছেলে, তার উপরে প্রতিবাদী মন এই দুইয়ে মিলে অল্প বয়স থেকেই যাত্রাপাড়ায় তাঁর যাতায়াত ছিল। সেই সূত্রে যাত্রা প্রসঙ্গে গভীর কৌতূহল। সেই কৌতূহল থেকে যাত্রায় জড়িয়ে পড়া। প্রথমে অফিসিয়াল কাজ শেখার জন্য তপোবন নাট্য কোম্পানিতে চাকরি করেন। তার আগে মাধবী নাট্য কোম্পানির মালিক, স্বনামধন্যা অভিনেত্রী বেলা ঘোষকে 'দিদি' ডাকতেন বলে কিছুদিন মাধবীতে যুক্ত ছিলেন। তপোবনে কাজ করতে করতে অজয় ওরফে চিনা নিউ প্রভাস অপেরার তিনকড়ি গুছাইত ও প্রখ্যাত দল ম্যানেজার মধু বড়ালের উপদেশ অনুসারে শুরু করেন বুকিং এজেন্ট জীবন। দূর দূরান্ত থেকে বুকের রক্ত তুলে অজয় যাত্রা দলের বায়না করতে করতে সকলের প্রিয় হন। পারিশ্রমিকের সামান্য অর্থে ছোট্ট সংসার চালান। পুত্র খেলাধুলায় পারদর্শী বলে বাবা হিসেবে গর্বিত হন, কিন্তু আর্থিক সচ্ছলতা না থাকায় এবং একমাত্র ছেলের প্রতি গভীর ভালবাসায় ছেলের খেলোয়াড় জীবনকে বড় করে তুলতে না পারার ব্যথা থাকলেও অজয় কর্মজীবনে ফাঁকি দেননি কোনদিন। বুকিং এজেন্ট হয়ে কাজ করতে করতে অজয় তৈরি করেন 'আদি চণ্ডী অপেরা'। ৫ বছর এই দল চালাবার পর বাঁকুড়া জেলার ইন্দাসে এক গণ্ডগোলে তাঁর দলের সব কিছু লুঠ হয়ে যায়। বিপন্ন অজয় ওরফে চিনা আবার ঝাঁপিয়ে পড়েন দলের বায়না আনতে। পুরোপুরি ভাবে হন বুকিং এজেন্ট।

॥ গোষ্ঠবিহারী ঘোষ ॥

হাওড়া জেলার বাড়দাজপুরের সোমাটি গ্রামে ১৩৩৫ সনে রজনীকান্ত ঘোষের এই ছেলের জন্ম। জন্মের মাত্র আট মাসের মধ্যে বাবা ও মা দু'জনকেই হারাতে হয়। বড় মা জ্যেঠাইমার কাছে আশ্রয় পেয়ে ওঁরা তিনভাই মানুষ হন। মোসাইটি হাইস্কুলের ছাত্র ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অঙ্কে ফেল করায় আর পড়াশোনা করতে পারেননি। পঞ্চায়েতে সোস্যাল ওয়ার্ক ভাল বাসতেন গোষ্ঠবিহারীবাবু। অনেক চেষ্টার পর স্থানীয় ডাকঘরে চাকরি পান। ৮ বছর চাকরি করেন। তার মধ্যে অর্থ তছরূপের দায়ে মিথ্যা অভিযোগে গোষ্ঠবাবুর সাজা হয়। উলুবেড়িয়া কোর্ট থেকে মুক্তি পান। তারপর হাইকোর্টের বিচারে গোষ্ঠবাবু আবার চাকরি ফিরে পান। যে ৬ বছর তিনি সাস্‌পেনডেড্ ছিলেন, তার মধ্যে বেছে নেন যাত্রা-জীবন। ওদিকে বড় দুই ভাই আলাদা হন। ১৫ বছর ধরে মোসাইটি স্কুলের চ্যারিটি যাত্রার ব্যাপারে যুক্ত থাকার পর যাত্রার দালালি শুরু করেন। প্রতি শো বাবদ তিনশত টাকা, মোট চার নাইট বারোশত টাকায় বুকিং করেছিলেন। গণেশ অপেরার 'ভুলি নাই' পালা বুকিং করেছিলেন এক রাতের জন্য ষোল'শ টাকায়। মাত্র কয়েক্ বছরের মধ্যে যাত্রা দলের সব কিছু পাল্টে যায়। এই পাল্টে যাবার সাক্ষী গোষ্ঠবিহারী ঘোষ। দালালি করতে গিয়ে বুকের রক্ত ঝরিয়েছেন তিনি। মাথা গোঁজার মত বাড়ি করেছেন। দুই ছেলে ও তিন মেয়েকে বড় করেছেন। এটা'ই তাঁর সান্ত্বনা।

॥ নিরাপদ দাস ॥

খুব অল্প বয়সে আরামবাগের প্রত্যন্ত গ্রামের একটি অতি সাধারণ অশিক্ষিত ছেলে, যে

নিজের পায়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে, দারিদ্রের সংসার থেকে দরিদ্র্যকে নির্মূল করে, বাবা-মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে, ভাইদের প্রতিষ্ঠা দিতে ঘর ছেড়ে চলে এসেছিল কলকাতায়। শুনেছিল লোকমুখে কলকাতায় টাকা ওড়ে। বুদ্ধি থাকলে, পবিশ্রম করলে সেই টাকা মুঠো মুঠো ধরে নেওয়া যায়। আরও শুনেছিল বড়দের মুখে, টাকা না থাকলে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকা যায় না। তারপরই নিরাপদ প্রমাণ করেছিলেন কথাগুলো কত সত্য। কলকাতায় এসে, এ্যালেন মার্কেটের কাছে (সোনাগাছির কাছে) তিনি পেলেন এক পথের মাকে। মহিলা ছিলেন হিন্দুস্থানী। বালক নিরাপদকে নিজের ছেলের মত স্নেহ দিলেন। সেই চাচীর সাহয্যে একটা ঘর পেলেন, (এখন যে ঘরে কালী লিথো প্রেস), সেখানে চায়ের দোকান করে চা বিক্রি করতে লাগলেন নিরাপদ। বছর কয়েক পর সে কাজ ছেড়ে দিয়ে, শুরু করলেন রাংঝালাই। লোকের ভাঙা-ফুটো পাত্র মেরামতির কাজ। চায়েব দোকানের সময় পাশের পতিতা মেয়েরা যেমন চা খেত, পাশের ২।৫ ঘর যাত্রার গদির বড়বাবুরাও খেত! সেই সূত্রে নিরাপদ দাস পেলেন শম্ভুনাথ ঘোষের সান্নিধ্য। শম্ভুবাবু তখন যাত্রাপাড়ার একটা নাম। আবার সেই সূত্রে জীবনকৃষ্ণ দাস, অতুলকৃষ্ণ বসুমল্লিকদের মত যাত্রাদলের মালিকদের কাছে ওঠা বসা শুরু। একটু একটু করে যাত্রাকে বোঝার চেষ্টা করেন নিরাপদ। এই সময়ে হরিপদ বায়েনের মত বিরাট মাপের দল ম্যানেজারের সঙ্গেও আলাপ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে নিরাপদ বুঝেছেন টাকা উড়ছে চিৎপুরে। বং ঝালাইয়ের সঙ্গে শুরু করলেন নায়েক ধরার কাজ। এক পালা বায়না করলে কমিশন। সেই শুরু! অল্প সময়ের মধ্যে টাকার স্বাদ পেলেন। নিরাপদ যাত্রার দালাল হলেন। বছর কয়েকের মধ্যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। রং ঝালাই-এর ব্যবসা তুলে যাত্রার দালালির সঙ্গে তৈরি করলেন প্রেস। লিথো পোষ্টার ছাপার প্রেস যে সময়ে কলকাতায় ছিলই না বলা যায়, যে সময়ে কাঠের টাইপের পোষ্টারের আধিপত্য, নিরাপদ সেই আধিপত্য ভেঙ্গে দিয়ে লিথো পোষ্টার ছাপাব রাজ্যে হিরো হলেন। দেশ থেকে ভাইদের নিয়ে এলেন কলকাতার 'কালী লিথো'-তে। মনে হয় বাবা কালীপদ দাসের নামে এই প্রেসের নাম। ব্যবসায় লক্ষ্মীকে যেন বেঁধে ফেললেন। যাত্রার দালালিতে নিরাপদকে লোকে বলত 'চিৎপুরের চিল'। যাত্রাপাড়ায় নায়েক ঢুকলে ছোঁ মেরে ধরার শক্তি ছাড়াও বহু অঞ্চলে তাঁর কথায় চলতেন বহু নায়েক। ওপর থেকে দেখলে কঠিন কঠোর কিন্তু মন ছিল নরম। টাকাকে চিনতেন দারুণ। ভাই আর ছেলেদের চরম প্রতিষ্ঠা দিয়ে চলে যান নিরাপদ। যাত্রামায়ের কল্যাণে কিছু করার আছে কি না, অবশ্য নিরাপদরা জানতেন না আর টাকা বানাবার ক্ষেত্রে অসাধারণ এই মানুষটি জানতেন না, মৃত্যুর পরও কিভাবে অমর হয়ে থাকা যায়। তাই এখন আর নিপাপদর কোন স্মৃতিও নেই যাত্রায়।

॥ কুলদা গাঙ্গুলী ॥

হাওড়া জেলার পাঁচলা গ্রামের মানুষ কুলদা গাঙ্গুলী ছিলেন যাত্রা জগতে যাত্রার মালিকদের কাছে খুব দামী লোক। আসলে কুলদাবাবু ছিলেন যাত্রাপাড়ার একজন ডাকসাইটে দালাল। এমন একটা যুগের দালাল, যখন দেশের সঙ্গে দেশের, গ্রামের সঙ্গে শহরের, শহরের সঙ্গে জেলার দূরত্ব ছিল অনেক। এমনকি মানুষের সঙ্গে মানুষের দূরত্বও ছিল বিস্তর। না ছিল বড় বড় পথ, না ছিল প্রয়োজন মত যানবাহন। যাত্রাদল আসরে আসরে ছড়িয়ে পড়ত লরীতে। ট্রেনে। মন্থর গতির কোন গাড়িতে। আর কুলদাবাবুদের মত মানুষদের দু'বেলা দু'মুঠো ভাত আর লজ্জা নিবারণের এক টুকরো বস্ত্র জোগাড় করতে বেছে নিতে হয়েছিল যাত্রাগানের, শীতলা গানের বায়না করার কাজ। মাইলের পর মাইল হেঁটে, লরীতে, কখনও ট্রেনেও গিয়ে গ্রাম গ্রামান্তরের বিভিন্ন পূজাকমিটি, বিভিন্ন নায়েকদের সঙ্গে দেখা করে যাত্রা দলের বায়না ধরতেন এঁরা। ১৯ পয়সার টিকিট থেকে আট আনা এক টাকার টিকিটের যুগও অতিক্রম করে যাওয়া এই মানুষটি এক সময়ে হাওড়া জেলার যাত্রা লর্ড হয়েছিলেন। যাত্রা মালিকদের কাছে দালাল কুলদার দাম বাড়ল। দালালি করে কুলদা সংসারে

মানুষের দাম পেয়েছিলেন, **ঐশ্বর্য** করে যেতেও পারেননি, অসৎ হতে পারেননি, যাত্রা দলের টাকাকড়ির ব্যাপারে কোন কলঙ্ক ফেলেননি। অথচ যখন মারা গেলেন তখন যাত্রা জগতের কারও চোখে দু'ফোটা জল ঝরেনি। কেউ কেউ বলেছিলেন, একজন ভাল দালাল মরে গেল, আমাদের বায়নারও বারোটা বেজে গেল। কেউ কেউ বলেছিলেন—কুলদা গাঙ্গুলীর মুখের কথায় দল বায়না হতো। এ পর্যন্ত!—মৃত্যুর সঙ্গে কুলদা গাঙ্গুলীদের মত অনেক ডাকসাইটে দালালের সব স্মৃতি মুছে গেছে। বিশেষ লেখাপড়া না জানা কুলদা গাঙ্গুলী অবশ্য উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গেছেন আর এক দালালকে। তিনি কুলদাবাবুর ঔরসজাত সন্তান **সুশান্ত গাঙ্গুলী**!

কুলদা গাঙ্গুলীরও আগে বা সমসাময়িক পরিমণ্ডলে আরও যাঁরা এসেছিলেন এই দালালি জীবনে তাঁদের সম্পর্কে ঠিক এ কথাই বলা যায়। এঁরা জন্মেছিলেন, বড় হয়েছিলেন, নিজের আর পরিবারের ক'জনের পেট চালিয়েছিলেন, সংসারের প্রতি কর্তব্যটুকু সামর্থ্য অনুসারে করেছিলেন, তারপর একদিন যেমন নীরবে জন্মেছিলেন, তেমনি একদিন নীরবে চলে গেছেন। যে শো বিজনেসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, সেখানকার স্বার্থপর মানুষগুলোর কাছ থেকে বায়না আনতে পারলে পেয়েছেন কমিশন, নিদেন পক্ষে একটু হাসি মুখ। যখন বয়স বেড়েছে, দেহ আর মনের জোর কমেছে তখন আর কেউ তাঁদের খবরও নেয়নি কোনদিন। এঁরা হলেন **নিত্যগোপাল রায়, হরি সামন্ত, মহাদেব বারিক, কালী বারিক,** কোলিয়ারী অঞ্চলের ডাকসাইটে দালাল, পরবর্তীকালের 'কোলিয়ারী লর্ড' অনিল ভাণ্ডারীর দাদা **রজনী ভাণ্ডারী,** বর্ধমান জেলার বিখ্যাত দালাল **গুণাকরবাবু, মুরারী রায়, শৈলেন পাল, ধীরেন রায়** আরও অনেকে।

যাত্রার যুগ, যাত্রার রূপ, যাত্রার ভাষা, যাত্রার জীবন, যাত্রার মুনাফা, যাত্রার লোভ যত বাড়তে থাকল তত পুরাতনের স্মৃতি ফ্যাকাশে হতে থাকল, দালাল কথাটিও হয়ে গেল সর্বাধুনিক "বুকিং এজেন্ট"। রজনী ভাণ্ডারীর ভাই অনিল ভাণ্ডারী এই ব্যবসায় হলেন সকলের 'লর্ড'। শৈলেন পালের ছেলে **গৌর পাল** উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে খুবই জনপ্রিয় দালাল হিসেবে চিহ্নিত হলেন। ধীরেন রায়ের মত দালাল অজ্ঞাতনামা আততায়ীর হাতে খুন হয়েছিলেন। তাঁর লাশ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি শোনা যায়। তাঁব ভাই লক্ষ্মী রায় এখন এই কাজই করেন। গোটা উত্তরবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ যেমন ভিলাই, জব্বলপুর, চক্রধরপুর অঞ্চলে বাংলা যাত্রার প্রসারে **জীবন মুখার্জীর দান** স্মরণীয়। বর্ধমানের মণ্ডল গ্রামের মানুষ বহুকাল আগে ছিলেন অভিনেতা, পরে হন বুকিং এজেন্ট। বর্তমানে তাঁর পুত্র অসীম মুখার্জী অভিনেতা। সুভাষবাবু সাধারণ কর্মী থেকে পরে যাত্রাদলের মালিক হয়ে প্রভূত অর্থ আর প্রাচুর্য বানিয়ে যাত্রাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলে গেছেন দেশে। সেখানে হোটেল থেকে হয়তো আর কিছু ব্যবসা তৈরি করেছেন তিনি। কিন্তু একসময়ে এই সুভাষ চ্যাটার্জীর বাবা **নারায়ণ চ্যাটার্জী** যাত্রার দালালি করেই এঁদের পয়সা বানাবার পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

অশ্বিনী দাসও এক সময়ে বড় দালাল ছিলেন।

বর্তমানে অনিল ভাণ্ডারীর কাছে মানুষ হওয়া, দালালি ব্যবসার আটঘাট জেনে নে সা, স্নেহের ভাইপো **সন্দীপ ভাণ্ডারী** বুকিং এজেন্ট হিসেবে খুবই বড় ও বিখ্যাত। ধন-সম্পত্তি সবই করেছেন সন্দীপ। অনিলবাবুর 'যাত্রা ভবন'-এর মত সন্দীপও ঐ বর্ধমানের রাণীগঞ্জের রাণীসায়ের মোড়ে গড়েছেন বুকিং এজেন্ট অফিস, নাম—'নাট্য মন্দির'।

॥ নারায়ণ মণ্ডল ॥

নিতান্ত ছেলেবেলা থেকেই যাত্রাকে গভীরভাবে ভালবাসতেন নারায়ণ মণ্ডল। প্রথমে টাকা জোগাড় করে ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে কলকাতার পেশাদার যাত্রাদল বায়না করে যাত্রার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু নায়েক হিসেবে চরম আর্থিক লোকসান দিয়ে, তিনি কর্মজীবনের ধারা মুহূর্তে পাল্টে ফেলেন। শুরু করেন বুকিং এজেন্টের কাজ। বিগত ২০ বছর তিনি এই কর্মে নিযুক্ত

আছেন গভীরভাবে। বুকিং এজেন্ট হিসেবে নারায়ণবাবু প্রথম সত্যম্বর অপেরার 'খনা' পালার বেশ কয়েক পালা বায়না করে দিয়েছিলেন। নারায়ণবাবু মূলত বুকিং এজেন্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান অগ্রগামীর 'মীরার বধূঁয়া' পালার আশাতীত বায়না দিয়ে। কলকাতার প্রথম শ্রেণীর যাত্রা দল বায়নার দায়িত্ব নেন নারায়ণবাবু। এই এজেন্সীর কাজে অনেক ঝুঁকিও নিতে হয়। তবু মালিক এজেন্টদের পান থেকে চুন খসলে অত্যন্ত বাজে ব্যবহার করেন, যদিও নারায়ণবাবুর জীবনে তা ঘটেনি, কিন্তু অন্য এজেন্টদের ক্ষেত্রে ঘটছে বলে তিনি মর্মাহত হয়েছেন। অনেক সময় নায়েকরা এজেন্টের কাছে সঠিক সময়ে টাকা পৌঁছে দিলেও, বায়না করা দলের গদিঘরে সেই টাকা অনিবার্য কারণ বশতঃ পৌঁছতে দেরি করলে মালিক এজেন্টকে তিরস্কার করতেই পারেন। নারায়ণবাবু জানালেন, একজন এজেন্ট একবার এই ধরনের অপরাধ করায় সবং এলাকার এক প্যাণ্ডেলে সেই মালিকের লোকেরা এজেন্টকে প্রহার করেছিল। এই ধরণের প্রহারের প্রতিবাদ সব এজেন্টদেরই করা উচিত। নারায়ণবাবু মেদিনীপুর তমলুকে 'যাত্রাপীঠ' নামে বুকিং অফিস খুলেছেন।

॥ সাধন মুখার্জী ॥

যাত্রা জগতের প্রবাদপুরুষ আশুতোষ গাঙ্গুলীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে দল বায়নাকারী সাধন মুখার্জী যাত্রা জগতে সুপরিচিত। মাত্র ২১ বছর বয়সে সাধনবাবু, আশুবাবুর সান্নিধ্যলাভ করেন। সহযোগী হিসেবে কাজ শেখেন, পরিচিত হন। সাধনবাবু যাত্রা জগতে এক সময়ে দু'একটি দলে ম্যানেজারের কাজ করেছিলেন। ভোলানাথ অপেরার মালিক ও অভিনেতা শম্ভু সিন্‌হা সাধনবাবুকে পরিচালকের পদে উন্নীত করেন। হুগলী জেলার খন্যান ষ্টেশন বাজারে আশুবাবু তাঁর স্নেহের সাধনবাবুর স্বীকৃতির জন্য প্রতিষ্ঠা করেন 'অমর এজেন্সী' নামে যাত্রা বুকিং অফিস। এই বুকিং কেন্দ্রকে স্বাগত জানিয়েছিলেন যাত্রা জগতের অনেক বিখ্যাত মালিক-শিল্পী। হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনে সাধন মুখার্জীর এই যাত্রা বুকিং এজেন্সী নায়েকদের কাছে খুবই খ্যাতি পেয়েছিল। আজও বায়নার ব্যাপারে সাধনবাবু ও তাঁর অমর এজেন্সী খ্যাতির সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন।

॥ সন্দীপ ভাণ্ডারী ॥

ননীগোপাল ভাণ্ডারীর ছেলে সন্দীপ ভাণ্ডারী বর্ধমান জেলার রাণীগঞ্জ অন্তর্গত কাটাগড়িয়া গ্রামে ১৯৫৮ সালে জন্মান। মাত্র ৬ বছর বয়সে বাবাকে হারিয়ে মায়ের আঁচল ধরে দারিদ্র্যের চরম অবস্থার মধ্যে এসে দাঁড়াতে হয় তাঁকে। যাত্রা জগতে কোলিয়ারী অঞ্চলের অতীত দিনের বুকিং এজেন্ট রজনী ভাণ্ডারীর ভাই, প্রখ্যাত যাত্রা বুকিং এজেন্ট অনিল ভাণ্ডারী আপন জ্যেঠামশাই হিসেবে প্রাথমিক স্তরে সন্দীপকে মানুষ করেন। শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুল থেকে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করার পরই দারিদ্র্যের চরম অভিশাপ থেকে মাকে মুক্ত করার, মায়ের মুখে হাসি ফোটাবার শপথ নিয়ে একটা যেমন-তেমন কাজের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। যাত্রা জগতের আর একজন কৃতী বুকিং এজেন্ট নিরাপদ দাস সন্দীপকে নিয়ে গিয়েছিলেন নব রঞ্জন অপেরার শম্ভু ঘোষের কাছে। শ্রীঘোষ যেমন তেমন একটা চাকরি দিতে না পারায়, নিরাপদবাবু সন্দীপকে নিয়ে যান তরুণ অপেরায়। সুযোগ দিলেন তরুণের ম্যানেজার তারাপদ ঘোষ। স্বনামধন্য অভিনেতা, নির্দেশক তরুণ অপেরার কর্ণধার শান্তিগোপালের সাহায্য-সহযোগিতা-প্রেরণা আর উৎসাহে মূলত সন্দীপের কর্মজীবনের গোড়াটা শক্তভাবে তৈরি হয়েছিল। যে সন্দীপ যাত্রা অফিসের কোন কাজই জানত না, তাকে শান্তিবাবুই পাঠিয়েছিলেন প্লেনে করে আগরতলায়। শান্তিবাবুর জন্যই সন্দীপ যাত্রা বুকিং-এর যাবতীয় কাজ শেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তরুণ অপেরার শিল্পী সুপর্ণা নায়েকের সঙ্গে সন্দীপের বিবাহেও শান্তিবাবুর অবদানের কথা আজও স্মরণে রেখেছেন সন্দীপ। ৪ বছর তরুণে থাকার পর সন্দীপ আবার ফিরে এসেছিলেন জ্যেঠামশাই অনিল ভাণ্ডারীর কাছে। কিন্তু পুনরায় বিপর্যয়। এবার পারিবারিক বন্ধনও ছিঁড়ে গেল। এই সময়ে যাত্রা প্রযোজক দুলু পাণ্ডে

গৃহ হারা-সর্বহারা সন্দীপের পাশে দাঁড়ান। মায়ের হাত ধরে শ্রীপাণ্ডের দেওয়া বাড়িতে আশ্রয় নেন। তারপর বহু জনের ভালবাসা পাথেয় করে, প্রায় শূন্য পকেটে শুরু করেন যাত্রা বুকিং-এর কাজ। তখন শক্তি বলতে পাড়ার দুটি ছেলে। মকর চক্রবর্তী আর ভক্তি মাহাতো। কোন পারিশ্রমিক না নিয়ে ওঁরা সন্দীপের সঙ্গে উদয় অস্ত শ্রম দিতেন। আজও ভক্তি মাহাতো জড়িয়ে আছেন সন্দীপের নাট্যমন্দিরের সঙ্গে। অনেক ঘাম-অনেক রক্ত ঝরিয়ে আজ সন্দীপ হয়েছেন বুকিং এজেন্ট হিসেবে কোলিয়ারী প্রিন্স! রাণীগঞ্জের রাণীসায়ের মোড়ে তিল থেকে তিলোত্তমা হওয়া সন্দীপ ভাণ্ডারীর 'নাট্যমন্দির' অফিস কাম আধুনিক স্থাপত্যের বাড়ি গর্বের সঙ্গে জ্বল জ্বল করছে। মুর্শিদাবাদ, ধানবাদ, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং টাটার কিছু অংশের কয়েক শত যাত্রা নায়েক সন্দীপ ভাণ্ডারীর নিজস্ব পকেট হিসেবে চিহ্নিত।

॥ যাত্রায় আলোক সম্পাতের যুগ এবং তাপস সেন ॥

হ্যাজাকের যুগ পেরিয়ে 'যাত্রা' এলো বৈদ্যুতিক আলোর যুগে। যাত্রার বৈদ্যুতিক আলোর সূচনা থেকেই কিন্তু আলোকসম্পাত যাত্রার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিক হিসেবে চিহ্নিত হয়নি। ডালডার টিনে জোরালো বাল্বের সাহায্যে যদিও কিছু বৈচিত্র্য আনার প্রয়াস শুরু হয়েছিল, তবুও বলা যায়, যাত্রায় বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে, স্থান-কাল-পাত্রের গুরুত্ব অনুসারে, বিষয়ের বাস্তবানুগ চেহারা দিতে আলোক সম্পাতের যে কত বড় ভূমিকা থাকতে পারে তা ষাটের দশকের একেবারে গোড়ায় যাত্রাজগতে বুঝিয়ে দেবার দায়িত্ব যিনি নিয়েছিলেন তিনি সর্বজন পরিচিত তাপস সেন। ১৯৬২ সালে বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আয়োজিত রবীন্দ্রকাননে অনুষ্ঠিত প্রথম যাত্রা উৎসবে এই আলোক আঙ্গিকের প্রবর্তন করেন তাপস সেন। এরপর ভারতী অপেরা ১৯৬৯ সালে যাত্রার প্রয়োজনে আলোক-আঙ্গিকের গুরুত্ব অনুধাবন করে 'সূর্য সেন' পালার জন্য তাপস সেনের প্রতিভা ও ক্ষমতা কাজে লাগায়। এই সময়ে সুরেশ দত্ত শ্রীসেনের সহকারী হিসেবে কাজ করেন। তারপর থেকে অনেকেই নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোক রঞ্জিত করতে করতে যাত্রাকে আলোর জাদুতে রূপান্তরিত করেছেন। যাত্রা হারিয়ে গিয়ে আলো প্রধান হয়ে উঠেছে অনেক ক্ষেত্রে। যাত্রায় এসেছে সাইক্লোরামা, কম্পিউটারাইজড সাইক্লোরামা, হাই-ফাই সাইক্লোরামা ইত্যাদি। আলোর বিস্ময়কর জাদুতে দর্শকদের হাতের মুঠোয় এনে চরম ব্যবসায়িক সাফল্য চিৎপুরের মালিকরা যত অর্জন করেছেন, উড়িষ্যার একাধিক আলোক ব্যবসায়ী কলকাতায় আধিপত্য বিস্তার করেছে ততই। উড়িয়া ভাষাভাষীর নাট্যদলগুলি সেই সুযোগে কলকাতায় আলোর জাদু যে মূল নাটককে বিন্দুমাত্র ব্যহত না করেও কত বিস্ময়কর হতে পারে তার নমুনা হাজির করে ব্যবসায়িক সাফল্য নিয়ে দেশে ফিরে গেছে। সল্টলেকে ভুবনেশ্বরের "উড়িষ্যা যাত্রা সম্মেলন" ও পরে রবীন্দ্রকাননে আয়োজিত ঐ একই সম্মেলন এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এরপর থেকে ভুবনেশ্বরের এই কৃতী আলোক কোম্পানিগুলির সাহায্যে (চন্দননগরের আলোক শিল্পীদের মত) কলকাতার একাধিক যাত্রা দল এই পদ্ধতি প্রয়োগে ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করে। এরই মধ্যে কিন্তু অধিকাংশ যাত্রা প্রতিষ্ঠান পালার প্রয়োজনে আলোর ব্যবহারকে গুরুত্ব দেন। এর ফলে যাত্রাপাড়ায় একে একে বহু আলোক শিল্পীর আবির্ভাব ঘটে। তৈরি হয় আলোক সম্পাতের বিভাগ, যে বিভাগ পরিচালনা করেন আলোক শিল্পী তাঁদের নিযুক্ত আলোক কর্মীদের দিয়ে।

তাপস সেন পুনরায় নট্ট কোম্পানির আমন্ত্রণে যেমন একাধিক পালাকে যথার্থ করেছেন, তেমনি কনিষ্ক সেনের মত আলোক শিল্পীর ইউনিটও খ্যাতি অর্জন করেছে। এই ব্যবসায় স্থায়ী হতে পেরেছেন ভানু বিশ্বাসের মত অনেক আলোক শিল্পী।

যেহেতু তাপস সেন যাত্রায় বিজ্ঞান সম্মত আলোক আঙ্গিকের পুরোধা, সেই হেতু যাত্রার ইতিহাসে তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার ধরে রাখা হল।

॥ অডাসিটি অব ইমাজিনেশন-ই তাপস সেনের সাফল্যের চাবিকাঠি ॥

তিরিশের দশকের যাবতীয় নাট্যকর্মে খাঁটি বাস্তব জীবনের ছবিকে পরিস্কার উপলব্ধি করার কোন সুযোগই ছিল না। অথবা অন্যভাবে বলা যেতে পারে, একের পর এক নাটক উপস্থাপনা যখন মুখ্য উদ্দেশ্য হিসেবে চিহ্নিত ছিল, নাটকের যে আরও দায়িত্ব পালন করার আছে সেই সত্যটিকে নিয়ে তখন বাংলা থিয়েটার স্বাভাবিকভাবেই মুখর হতে পারছিল না। অথচ সে সময়ে রঙ্গশালাগুলি একের পর এক কৃতী রূপকারের প্রসব গর্বে গৌরবান্বিত হচ্ছিল এবং ঠিক তখনই আমরা পেয়েছিলাম সতু সেনের মত একটি মানুষকে। আজ বার বার ভাবতে মন চায়, তিরিশ দশকের নিস্তরঙ্গ নাট্য নদীতে ঢেউ উঠেছিল বোধকরি সতু সেনের মত একটি মানুষকে ঘিরে। আজ বার বার ভাবতে মন চায়, তিরিশ দশকের নিস্তরঙ্গ নাট্য নদীতে ঢেউ তুলেছিল বোধ করি সতু সেনের সেই অপরূপ প্রয়োগ নৈপুণ্যই। তিনি এলেন এবং প্রথমেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নাট্য উপস্থাপনার ভিতর দিয়ে দর্শকদের প্রতি মমত্ববোধকে প্রকাশ করে একটা গুরু দায়িত্ব পালন করলেন! শুধু তাই নয়, বাংলা নাটকে মুড লাইটিং-এর প্রবর্তকও তিনি!

পঞ্চাশের দশকের কিছু আগে অর্থাৎ চল্লিশের শেষ ভাগে সতু সেনের উত্তরসাধক হিসেবে বাংলা থিয়েটারের আঙ্গিনায় যে যুবকের আবির্ভাব, তিনি তাপস সেন। বলা বাহুল্য, তিরিশ দশকের থিয়েটার প্রসঙ্গে যেটুকু ছবি আঁকা গেল, বাংলা যাত্রার ছবি এই মুহূর্তে সে তুলনায় ব্যবসায়িক ভিত্তিভূমিতে অনেক বেশি ভাস্বর হলেও, অনেক বেশি সমকালীনও বটে। তিরিশ দশকের থিয়েটারে দর্শকদের মধ্যে একটা নৈরাশ্য দানা বেঁধে উঠেছিল, কিন্তু গ্রাম-গঞ্জের সাধারণ মানুষের প্রিয় বিনোদন, বাংলার লোকশিল্প পালাগান বা যাত্রার অতি আধুনিক চেহারায় দর্শকদের মনে প্রতি নিয়ত নতুন স্বাদ পাবার প্রত্যাশা!

প্রযোজক মাখন নট্ট এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, যুগ বা সময়ের সঙ্গে তাল রেখে না চলার অর্থ নিজেকে অসময়ে নিঃশেষ করে ফেলা, তবে যাত্রার ক্ষেত্রে সময় বা যুগচেতনার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে পালা-অভিনয় ইত্যাদির চেহারাকে ক্ষুণ্ণ করার অর্থ, মূল দায়িত্বপালন থেকে সরে আসা, পাশাপাশি দর্শকদের সঙ্গে কোথায় যেন ছলনা করা! সুতরাং নট্ট কোম্পানির আজকের জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী হবার এটি আর একটি কারণ। মোদ্দা কথা, নট্ট কোম্পানির একটা বড় ধরনের ব্যালান্স এখানে। প্রসঙ্গক্রমে সেই প্রতিষ্ঠানের 'কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ' পালার কথা আসে। পালাটির রিহার্সাল শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘোষিত হয়েছিল, পালার উদ্বোধন তারিখ। উদ্বোধনের তারিখ ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও নির্ধারিত দিনে অনিবার্য কারণে তা স্থগিত রাখা হয়। প্রযোজক মাখন নট্ট এ বিষয়ে আসল তথ্য প্রকাশ করতে চাননি, কিন্তু আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারি কোন দুর্ঘটনা বা অঘটনের জন্য নয়, আলোকশিল্পী তাপস সেনের জন্যই নির্ধারিত দিনে পালাটি মুক্তি পায়নি। এ প্রসঙ্গে শ্রীসেন জানিয়েছিলেন,—আলোর যথার্থ প্রয়োগরীতিই, পারফেকশন অব আর্ট...আর এই কারণেই যথা দিনে পালার উদ্বোধন হয়নি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাপসবাবুর একটি সাক্ষাৎকার "আজকাল" দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছিল যা আমারই লেখা।

কথা প্রসঙ্গে তাপসবাবুকে বলেছিলাম তিরিশ দশকে সতু সেন যখন বাংলা নাট্যক্ষেত্রে এই প্রয়োগরীতি ব্যবহারের জন্য এলেন তখন তাঁকে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয়েছে। এখন আমাদের মনে হয় আপনি কাজ করতে গিয়ে তেমন কোন অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন না, শুধু আপনি কেন—আরও যে ক'জন এই রীতিতে কাজ করছেন তাঁরাও কোন অসুবিধার মধ্যে নেই, এ প্রসঙ্গে আপনার মত কি? তাপসবাবু বলেছিলেন—"নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছড়িয়ে দিয়ে কাজ করতে হলে প্রথম যেটির অসুবিধা তা হল সাফিসিয়েন্ট স্পেস্ ফর ডেমনস্ট্রেশন। তাছাড়া, টাকা থাকলেই যে আমাদের এখানে সব কিছু পাওয়া যায় তা নয়। এরই মধ্যে ভাল কাজ হয়,

হতে পারেই ; যেমন সত্যজিৎ রায় করেছেন—অন্যেরা করছেন। এখানে চাই একটা শিল্পীর মন। এই যে আলোর প্রয়োগ, এখানে সাহিত্য-সঙ্গীত-নৃত্য-নাট্য ইত্যাদির একত্র সমাবেশ ঘটানর একটা মন দরকার। খুব ছেলেবেলা থেকে ওগুলির প্রতি আমার স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। চর্চাও থেমে থাকেনি। তার চাইতে আমি নিজের সম্বন্ধে যে কথাটি বলে থাকি বা যার ওপর ভিত্তি করে এই প্রয়োগরীতি অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছি, সেটি হল—অডাসিটি অব ইমাজিনেশন—আমি নাস্তিক, আমার আলাদা কোন ধর্ম নেই, আলোর ধর্মই আমার ধর্ম। কর্মে স্বাধীনতায় আমি সতেজ হতে পারি।"

॥ আলোক নিয়ন্ত্রণ আর সম্পাত ॥

এটিও আজকের যাত্রার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এই বিভাগগুলির মালিক অনেকেই। এঁদের নামেই মূলত প্রচার থাকে। কাউকে বলা হয় 'আলোকশিল্পী', কাউকে বলা হয় 'আলোক সম্পাতকারী'। কোন কোন ক্ষেত্রে বলা হয় "আলো"-অমুক! "আলোক নিয়ন্ত্রণ"-অমুক। মূলত এই প্রধান আলোকশিল্পী বা ইউনিট অধিকর্তা স্বযং আসরে থাকেন না। আসরে যাঁরা আলোক নিয়ন্ত্রণে থাকেন তাঁরা এক একটি ইউনিটের ছেলেরা। অনেক সময় একজন আলোক শিল্পীর একাধিক ইউনিট যাত্রার বিভিন্ন দলে কাজ করে।

যাত্রার মহলায় আলো নিয়ে বার কতক মহলা হয়। তখন মূল শিল্পী বা মালিক আলোক নিয়ন্ত্রণের নির্দেশক। ইউনিটের ছেলেরা মহলায় অংশ নিয়ে কাজ করেন আর তাঁদের নিয়ন্ত্রণে প্রশিক্ষণ থাকে প্রধান শিল্পীর।

যেমন তাপস সেন। কনিষ্ক সেন। আলোক শিল্পের জগতের এই দুই দিকপাল মূলত রিহার্সালে নিজেরা উপস্থিত থেকে আলোক প্রয়োগ এবং নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটা পাকা করে দেন, পরে ঠিক সেই নির্দেশমত আসরে আলোক নিয়ন্ত্রণ করেন নির্বাচিত কর্মীরা। এই আলোকশিল্পীদের মধ্যে যাত্রা ব্যবসায় যাঁরা দীর্ঘদিন জড়িয়ে আছেন, যাত্রার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন, যাত্রাব লাভ-লোকসানের সঙ্গেও নিজেদের জড়িয়ে রেখেছেন, অথবা যাত্রা থেকে অবসর নিয়েছেন নানা কারণে, যাঁদের কর্মকুশলতা পালার প্রশংসা এনে দিয়েছে তাঁদের তালিকা এই রকম ঃ

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, প্রখ্যাত আলোক শিল্পী কনিষ্ক সেন, ভানু বিশ্বাস, উত্তম বিশ্বাস, সোনিয়া সাউণ্ড, নারায়ণ পাল, বিমল চক্রবর্তী, শান্তি বিশ্বাস, অসীম দাস, রুণু অধিকারী, বাদল চক্রবর্তী, রমেন দেবনাথ, সুভাষ পাণ্ডা, অজয় ঘোষ, সুভাষ প্রামাণিক, মহাদেব দাস (ঝিকমিক), অজাতশত্রু, লক্ষ্মণ মাইতি, তারক প্রসাদ, অনিল সাহা, গোপাল সাঁতরা, বিমলকুমার ও সম্প্রদায়, বৈদ্যনাথ দাঁ, কালীপদ বারুই আরও অনেকে।

মনে রাখতে হবে, যাত্রায় যাত্রায় আলোক সম্পাত গুরুত্ব পেতে থাকে মূলত সত্তরের দশকের শেষ পর্ব থেকে, প্রকট হতে শুরু করে আশির দশক থেকে। আমরা 'অজাতশত্রু' ছদ্মনামে এক আলোকশিল্পীর সন্ধান পাচ্ছি। তারপরই যাত্রাপাড়ায় "সোনিয়া সাউণ্ডের" আবির্ভাব। পরবর্তী সময়ে উপরোক্ত সকলে এসেছেন, কিন্তু সোনিয়া সাউণ্ডের চাহিদা বেশি। পাল্লা দিয়ে অবশ্য আছেন ভানু বিশ্বাস।

সোনিয়া সাউণ্ডের মালিক শম্ভুনাথ শ্রীমানী যাঁকে সবাই সনু বলে ডাকেন। এঁর সহকর্মী হলেন জীবন চক্রবর্তী! আগে এঁরা নানা সভায় মাইক ভাড়া দিতেন। পরে যাত্রার বেশকারী সুধীর সরকার ওঁকে যাত্রায় আনেন। মাইক ও আলো দুই দিতেন দলে। পরে আলোক সম্পাতে খ্যাতি অর্জন করেন। এই বিরাট ইউনিটে প্রায় ৪৪ জন যুক্ত।

॥ যাত্রা পালার উদ্বোধনের পট পরিবর্তন ॥

মতিলাল রায় তাঁর যাত্রাপালা উদ্বোধন করতেন কখনও নবদ্বীপের পোড়ামা তলায় সামিয়ানা আর হ্যাজাকের আলোয়, কখনও উদ্বোধন করতেন আহেরীটোলার শীতলা মন্দিরের সামনে,

আবার কুলপি ঘাটে। এরপর মথুর সাহা থেকে পরবর্তী কালের প্রায় সকলেই নতুন পালা খুলতেন কোন জমিদার বাড়ির ঠাকুর দালানে বা কোন মন্দির সংলগ্ন প্রশস্ত অঙ্গনে।

ষাটের দশকের গোড়া থেকে আশীর দশকের গোড়া পর্যন্ত পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ ভাড়া করে পালা উদ্বোধনের রেওয়াজ বিশেষ ছিল না। অতীতে যে যে জায়গায় পালা খোলা হতো তার তালিকা ঃ

বাগবাজার মদনমোহনতলা, বর্তমান রঙ্গনা রঙ্গমঞ্চের বিপরীতে দীনমুচির ঠাকুর বাড়ি, কুমারটুলির স্বনামধন্য কবিবাজ বাড়ি, হ্যারিসান রোড ও চিৎপুর সংলগ্ন "মল্লিক ঠাকুর বাড়ি", বেহালার প্রাচীন সাবর্ণ চৌধুরীদের ভগ্ন দেবালয়, বেলাঘাটার সরকারদের ঠাকুর দালান, দক্ষিণেশ্বব মন্দির প্রাঙ্গন, আরও কয়েক জায়গা।

বর্তমানে পালার উদ্বোধন পেশাদার মঞ্চে বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

॥ প্রসঙ্গ ঃ সাজ পোশাক ও রূপসজ্জা ॥

আজকে যাত্রায় অধিকাংশ শিল্পীবা নিজেরাই মেক-আপ নিয়ে থাকেন।

কিন্তু এমন বিশেষ কিছু মেক-আপ নিতে হয় যেখানে অবশ্যই মেক-আপ শিল্পী হিসেবে স্বনামধন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয। বিশেষ করে বিশ্ববিখ্যাত অথবা প্রাতঃস্মরণীয় কোন ব্যক্তিত্বের রূপসজ্জা নিতে হলে প্রখ্যাত এবং সত্যিকারের কাজ জানা মেক-আপ শিল্পীর প্রয়োজন অনিবার্য। আজকের যাত্রার অধিকাংশ দলে তাই সাজসজ্জা এবং রূপসজ্জাকর থাকেন। অথচ এই শিল্পী বা প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন কল্যাণে কারও মাথা ব্যথা নেই। সরকারের আছে উন্নাসিকতা! এমন অনেক মেক-আপ শিল্পী আছেন যাঁরা আপন দক্ষতা, প্রতিভায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সম্মান বা স্বীকৃতি এঁরা কেউ কেউ পেয়েছেন এমন কয়েকজন শিল্পীর কাছ থেকে, যাঁরা অভিনেতা-অভিনেত্রী হিসেবে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন অথবা ইতিহাসে যাঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এর অতিরিক্ত কিছু নয়। উদাহরণ স্বরূপ শৈলেন গাঙ্গুলীর কথা স্মরণ করা যায়। মৃত্যুর আগে তিনি বহুবারই কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, ছবি বিশ্বাস, উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেনের উদ্দেশ্যে। কারণ ওঁরা শৈলেনবাবুর কাছে ছাড়া অন্যের কাছে মেক-আপ নিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করতেন না। তেমনি শক্তি সেন বা সাত্তার এঁরা এক একজন দিকপাল মেক-আপ শিল্পী।

যাত্রায় মেক-আপ প্রসঙ্গে কিছু বলার আগে এমন একজন বাঙালি মেক-আপ শিল্পীর কথা এখানে উল্লেখ করছি যিনি আজ কিংবদন্তী। মেক-আপ শিল্পের, মেক-আপ শিল্পীদের জন্ম জন্মান্তরের গৌরব। যাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে নাট্যকার, নির্দেশক, অভিনেতা, "রঙ্গনা" রঙ্গ মঞ্চের অন্যতম কর্ণধার গণেশ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন,—"ভারতবর্ষের সর্বজনশ্রদ্ধেয় মেক-আপম্যান **হরিপদ চন্দ** যদি কলকাতায় মারা যেতেন তাহলে তাঁর মর দেহের ওপরে কেউ একটি ফুলও দিতে যেত না—"!

হরিপদবাবু বাঙালি। পরে তিনি ভারতীয় এ কথা হরিপদবাবু স্পষ্ট করে উচ্চারণ করতেন মৃত্যুর আগে পর্যন্ত। তিনি বহুকাল ধরে ছিলেন মাদ্রাজে। সেই মাদ্রাজের মাটিতেই তিনি লীন হয়ে গেছেন। তাঁর নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে লীন হলেও গোটা ভারতের বিশেষ করে মাদ্রাজ-কলকাতার চলচ্চিত্র ও মঞ্চক্ষেত্রে যাঁরা সসম্মানে বেঁচে আছেন, তাঁদের মনের আসনে, ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে থাকবেন। এই কালজয়ী, কিংবদন্তীর মেক-আপ শিল্পী হরিপদবাবুর মর্মর মূর্তি সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মাদ্রাজের অকাদেমিতে। এই মূর্তি গড়েছিলেন স্বনামধন্য শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী।

যখন হরিপদবাবু খুবই বৃদ্ধ, কোন স্টুডিও বা থিয়েটারে গিয়ে কোন শিল্পীর মুখে রঙের

প্রলেপ লাগাতে পারতেন না, তখন দিক্‌পাল শিল্পীরা, শিবাজী গণেশন্‌-এর মত দিক্‌পালেরা অন্ততঃ একটি টিপ পরে যেতেন হরিপদবাবুর কাছে এসে। অথবা বলা যেতে পারে এই ধরনের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের আয়োজন হরিপদবাবু ছাড়া আর কারও জন্যে দেখা যায়নি। একজন অভিনেতা বা অভিনেত্রী অনায়াসেই হাতে তালি পেতে পারেন, খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে যেতে পারেন তরতরিয়ে। কিন্তু এই খ্যাতির জন্য কতকগুলি জিনিসের ওপর তাঁদের নির্ভর করতে হয়, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হলো, রূপসজ্জা বা কেশ বিন্যাস। চরিত্রানুগ রূপসজ্জা বা কেশ বিন্যাসের ব্যর্থতায়, চরিত্র সৃষ্টিও ব্যর্থ হতে বাধ্য! তাই যুগ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন অভিনয় ধারা বা উপস্থাপনায় বিবর্তন ঘটেছে, তেমনি তার সঙ্গে তাল রেখে বিস্ময়কর বিবর্তন এসেছে রূপসজ্জা-কেশ বিন্যাসের ক্ষেত্রে। বিবর্তন এসেছে রঙ্‌-কেমিক্যাল আর প্রয়োগরীতিতে। আর এর মূলে যাঁর শৈল্পিক চেতনা কাজ করেছে, যাঁর তুলির স্পর্শে একজন অভিনেতা জাত শিল্পীতে অনায়াসে রূপান্তরিত হতে পেরেছেন তিনিই হলেন হরিপদ চন্দ।

॥ প্রাচীন সাজ পোশাক প্রতিষ্ঠান "পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়" ॥

বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস দু'শ বছরের প্রাচীন। বাংলার নাট্য-প্রেমিক শিল্পী ও দর্শকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অনেক উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে যাত্রা-থিয়েটার আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। বিভিন্ন শক্তিশালী নট-নটী, নাট্যকার, পরিচালকরা ইতিহাসের স্বীকৃতি পেয়ে অমর হয়েছেন। কিন্তু যবনিকার অন্তরালে অচেনা রয়ে গেছেন অগণিত রূপসজ্জার শিল্পী ও প্রতিষ্ঠান যাঁদের অবর্তমানে রঙ্গমঞ্চ অচল হতে বাধ্য। কেননা বিশ্বের প্রাচীনতম নাট্যগ্রন্থ "ভারত নাট্যশাস্ত্র" অনুযায়ী অভিনয় চার প্রকার—আঙ্গিক অর্থাৎ অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা ; বাচিক,—অর্থাৎ সংলাপ দ্বারা ; আহার্য,—অর্থাৎ বেশভূষার দ্বারা এবং সাত্ত্বিক অর্থাৎ রোমাঞ্চ স্বেদোদম দ্বারা। তাহলে দেখা যাচ্ছে অভিনেতার পোশাক, কেশবিন্যাস, অঙ্গরাগ শিরোভূষণ, অলংকার ইত্যাদি বিষয়ে "নাট্যশাস্ত্র" অত্যন্ত সচেতন ও সতর্ক। সংশ্লিষ্ট ভূমিকা অনুযায়ী অভিনেতাদের সাজ পোশাক সম্বন্ধে বিষদ বিবরণ আছে "ভরত নাট্যশাস্ত্রের "আহার্যাভিনয়" অধ্যায়ে।

নানাবস্থাঃ প্রকৃতয়ঃ পূর্বং নেপথ্যসূচিতাঃ।
অঙ্গাদিভিরভিব্যক্তিমুপগচ্ছন্ত্যযত্নতঃ।।—ভরত নাট্যশাস্ত্র ২৩ ঃ ৩

অর্থাৎ নাটকের পাত্রপাত্রীগণ প্রথমে বেশের দ্বারা সূচীত হন তারপর আঙ্গিকাদি অভিনয়ের দ্বারা অভিব্যক্ত হন।

নাট্যাভিনয়ের মূল রূপকারই হল সাজসজ্জা ইত্যাদি উপকরণ প্রস্তুতকারকগণ। এরকমই একটি প্রতিষ্ঠান পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় কোং। যাত্রা-থিয়েটারের সাজ-পোশাক, অস্ত্রশস্ত্র, চুল-দাড়ি থেকে শুরু করে মুকুট, মুখোশ সরবরাহের অন্যতম প্রাচীন প্রতিষ্ঠান।

১৯০০ সালে পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় এই প্রতিষ্ঠানটির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। নিঃসন্তান পাঁচকড়িবাবুর শিল্পীসত্তা উপলব্ধি করেছিল এই অবহেলিত লোকশিল্পের এক সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ। জহুরির চোখ দিয়ে বেছে নিয়েছিলেন আপন শ্যালক বিষ্ণুপদ চক্রবর্তীকে উত্তরাধিকারী হিসেবে। নটনটীদের ভূমিকা অনুযায়ী পোশাক ডিজাইন-এ বিষ্ণুবাবুর ছিল সহজাত দক্ষতা। সে সময় বাংলা, অসম, উড়িষ্যার গ্রামগঞ্জে ছিল বিভিন্ন সৌখিন যাত্রা-নাটকের দল। স্থানীয় অর্থবানব্যক্তিদের আনুকূল্যে অভিনীত হত বিভিন্ন পালাগান: পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পালারই ছিল প্রাধান্য। লঙ্কেশ্বর রাবণ থেকে ঔরঙ্গজেব, মঁসিয়ে লালি থেকে টিপু সুলতান প্রত্যেককে চরিত্রানুযায়ী বিশ্বাস্য পোশাক, অস্ত্রশস্ত্র, এমনকি প্রসাধন পর্যন্ত রূপসজ্জার যাবতীয় সামগ্রীর যোগান দিতে হ'ত বিষ্ণুবাবুকেই। 'কর্ণার্জুন' নাটকের সমস্ত সাজ-পোশাকের দায়িত্বে ছিল এ প্রতিষ্ঠানটি। বিষ্ণুবাবুর আবিষ্কৃত বি. সি. পাউডার এখনও বাজারে সুনামের সাথে চলছে। আমরা অনেকেই জানি না

দেশনায়ক সুরাবর্দী ছিলেন যাত্রাপাগল মানুষ। তিনি সখের থিয়েটারে অভিনয়ও করতেন। সুরাবর্দী সাহেবের বন্ধু নারায়ণগঞ্জের ফেরিঘাটের মালিক রাণা সাহেব তাঁর সখের থিয়েটারের সব পোশাক বিষ্ণুবাবুর দোকান থেকেই নিতেন।

শ্রদ্ধেয় সূর্য দত্তের জীবদ্দশায় নট্ট-কোম্পানির সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহের দায়িত্বে ছিল এই প্রতিষ্ঠান। সূর্য দত্তের প্রসঙ্গ উঠতেই শ্রদ্ধায় অবনত হলেন ললিতবাবু। যাত্রা জগতে ঁসূর্য দত্তর মতো গুণী, নিষ্ঠাবান, সৎ লোক খুব কমই দেখেছেন ললিতবাবু। ঁসূর্য দত্তর আমলে দলে ভূমিকা নির্বিশেষে সব নটনটীর মর্যাদা ছিল সমান। বর্তমানে চিৎপুরে যা ভাবাই যায় না।

বর্তমানে কিন্তু নাটকের এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শিল্পটা বিলুপ্ত হতে বসেছে। এর মূল কারণ ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক পালার প্রতি বর্তমান পেশাদার যাত্রাদলগুলির অনীহা। ভাল জমকালো সাজপোশাকের প্রয়োজনও কমে আসছে। শুধু তাই নয়, চিৎপুরের বিত্তশালী দলগুলির সাথে অসম প্রতিযোগিতায় গ্রামবাংলার সৌখিন থিয়েটার ক্লাবগুলি উঠে যাচ্ছে। বর্তমানে রূপসজ্জার এই ব্যবসা টিকে আছে অসম, বিহার, উড়িষ্যা, বহির্বাংলার বাজারের উপর।

এই শিল্পে নিযুক্ত রয়েছেন অসংখ্য গ্রামীণ শিল্পী। হাওড়ার ধূলাগড়ি গ্রাম তো জরির কাজে রীতিমতো বিখ্যাত। এ গ্রামেরই লোক জরির কাজের সেরা কারিগর শ্রীবলাইচন্দ্র পণ্ডিত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বলাইবাবু কাজ শিখেছিলেন ঁবিষ্ণুবাবুর কাছে। তিনি পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় কোং ছাড়া অন্য কোনো দোকানের কাজ করেন না। এই হল বলাইবাবুর গুরু দক্ষিণা। সৃষ্টির মধ্যে দিয়েই গুরু ঁবিষ্ণুবাবুকে প্রণাম জানান বলাইবাবু। বলাইবাবুর বিশেষত্ব হল তিনি ৮০/১০০ ভরির নিচে কোনো জরির কাজ করেন না। সাজ পোশাকের জরির কাজের মজুরী ভরি প্রতি চার টাকা। একটি নবাবী পোশাকের মূল্য ৪৫০—৫০৯ টাকা। যাত্রা-থিয়েটারের কাজ কমে যেতে জরির শিল্পীরা শাড়ির কাজে লেগে পড়েছেন। জরি আমদানি করতে হয় গুজরাটের সুরাট থেকে। বর্তমানে মান খারাপ হয়ে যাওয়ায় জরির জৌলুষ দু' বছরের বেশি থাকে না।

যাত্রা থিয়েটার ছাড়াও সাজ-পোশাকের প্রয়োজন হয় জাদু শিল্পীদেরও। বিশ্ববন্দিত জাদুকর পি. সি. সরকার (সিনিয়র) সাজপোশাক কিনতেন এই প্রতিষ্ঠান থেকেই। পি. সি. সরকার (জুনিয়র) সমস্ত ড্রেস এখান থেকেই কেনেন। বিশেষ করে মাথার তাজ।

জুনিয়র পি. সি. সরকার মানুষ হিসেবেও যে কত মহান তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দেখা যায়, তিনি বিদেশে থেকেও সৌজন্য পত্র পাঠান প্রিয়জনদের কাছে। উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শ্রীসরকারের শুধু বিক্রেতা-ক্রেতা সম্পর্ক, তবুও পাঁচকড়ি চ্যাটার্জী কোং-এর পরবর্তী মালিক ললিতমোহন চক্রবর্তীর কাছে পত্র লিখতে ভুল হয় না। তেমনি একটি পত্র এখানে তুলে দেওয়া হলো ঃ

শ্রদ্ধেয় পাঁচকড়িবাবু,

"আমি প্রদীপ লিখছি। ভারত উৎসবে ইন্দ্রজাল দেখাতে সদলবলে আবার সোভিয়েত দেশে এসেছি। এদের বিভিন্ন PRSESS, T. V. খুব সুখ্যাতি করছে। বলেছেন, "ভারত উৎসবে ইন্দ্রজাল হচ্ছে শ্রেষ্ঠ মঞ্চানুষ্ঠান।" এরপর মঙ্গোলিয়া যাবো। আশীর্বাদ করুন যেন সর্বত্র জয়ী হই।"

ইতি আপনাদের
প্রদীপবাবু

এই সঙ্গে অতীতে নট্ট কোম্পানির প্রোগ্রামের পিছনে যে বিজ্ঞাপন ছাপা হতো তারও একটি নমুনা হাজির করছি ঃ

বিজ্ঞাপনের নমুনা ঃ

সবারে করি নমস্কার

ঘোষণা ঃ—

অভিজাত নাট্য সম্প্রদায়

ও

প্রখ্যাত যাত্রা পার্টির "রূপসজ্জার" ভার আমরাই নিয়ে থাকি আধুনিক রুচি সম্মত ঃ

যাত্রা ও থিয়েটারে

পোষাক, পরিচ্ছদ, বাদ্যযন্ত্র, সিন সিনারা ও মেক-আপ সরঞ্জাম সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান

পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়

৪৭ নং পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রীট (খোংরাপট্টী স্ট্রীট) বড়বাজার কলিকাতা-৭

দ্রষ্টব্য—

রূপচর্চায় "B. C." মার্কা পাউডারই সর্ব্বোত্তম।

॥ নাথ কোম্পানি ড্রেস হাউস ॥

বড়বাজারের খেংরাপট্টির গলিতে ঢুকে, বাংলার সংস্কৃতির অন্যতম শরিক, যাঁরা যুগ যুগ ধরে কাব্যের-সাহিত্যের-ইতিহাসের চরিত্রগুলিকে সাজিয়ে বাস্তবানুগ করেন, যাঁরা রামের মুখে রং মাখিয়ে, পোশাক পরিয়ে রহিম করেন, রহিমকে করেন রাম, কেরাণীকে সাজিয়ে করেন নবাব, একটি তরতাজা তরুণকে বেমালুম তৈরি করেন শীর্ণদেহী ক্ষুধার্ত ভিখারি, একটি অতি সাধারণ মেয়েকে মুহূর্তে তৈরি করেন শাহজাদী, একটি দুস্থ বালককে করেন ব্রজের কানাই, অথবা একজন যুবককে অনায়াসে রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র অথবা স্তালিন বা কার্লমার্কসে রূপান্তবিত করেন, সেই রূপসজ্জাকর, সেই পোশাক নির্মাতা, সেই কেশ বা মুখোশ শিল্পীদের কথা বলে না কেউ। এ এক অভিশাপ বোধ হয়! এ দেশের সাংস্কৃতিক সাংবাদিকেরা যত তাড়াতাড়ি বলে ফেলেন একটি সিনেমার ছবি দেখে "এই ছবির সম্পাদনা মনঃপূত হয়নি," বা যত সহজে বলেন "লেনিন চরিত্রে শান্তিগোপালের অভিনয় স্মরণীয়" তত সহজে কিন্তু বলা হয় না, রূপসজ্জার কথা! যুগের পর যুগ চলে গেছে, চিৎপুরে নাজ সিনেমার কাছে একচিলতে দোকানে সাজানো চামর অথবা খোঁপা আমরা দেখে খুঁজবার চেষ্টা করিনি এই কেশ শিল্পীর নেপথ্য ইতিহাস। বিশাল বিশাল বাক্সে রাজা-মহারাজার জরি চুমকি বসানো রয়েল ড্রেস কিংবা রাবণের খড়গ্ বা গদা দেখে ভাবিনি, এ সব তৈরি হয় কোথায়, কারা সেই কারুশিল্পী যাঁদের সুনিপুণ সূচে এমন করে ঝলমল করে পোশাকে-মুকুটে পাথর-চুমকী? আমরা 'টিপুসুলতানের তরবারি' দেখে ভাবি না, কে এর নির্মাতা! আকস্মিকভাবে সেই তাঁদের খুঁজে খুঁজে বার করে চিরজন্মের মত বাঁচিয়ে রাখার বাসনায়, যখন ফুটপাতের অজস্র গর্তে পা ক্ষত বিক্ষত করে খেংরাপট্টীর নাথ কোম্পানিতে এলাম, তখন এই প্রতিষ্ঠানের সকলের চোখে মুখে বিস্ময়। কাগজ থেকে এসেছি শুনে জানি না কেন সহজ হতে পারলেন না প্রথম দিন। পরে আবার হাজির হলাম সেখানে। এই সাজ পোশাকের প্রতিষ্ঠানটির নাম শুনেছি অনেকের মুখে। ভারতী অপেরার প্রবীণ প্রযোজক কালিপদ ঘোষ যেমন এই প্রতিষ্ঠান থেকেই প্রয়োজনে পোশাক করিয়ে নেন, তেমনি যাত্রা জগতের শীর্ষস্থানীয় নট্ট কোম্পানির অনেক ঐতিহাসিক পৌরাণিক পালার কস্টলি ড্রেস এই প্রতিষ্ঠান সাপ্লাই করেছে অনেকবার। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার সুনীলবরণ নাথ যখন বলেন, কি হবে এ সব লিখে—, বুঝতে পারি এর জন্য দায়ী আমরাই। তাই এই রচনার গুরুত্ব বোঝাতে হয়। আজ সুনীলবাবুরা যা করছেন, আগামী দিনে তা ইতিহাসর পাতায় ঝলমল করে উঠবে। সুনীলবাবুদের এই ব্যবসা বা পরিচয় যুগ যুগ ধরে বহন করবে ইতিহাসের পাতা।

অনেক বছর আগে বরিশালের মালোকাঠিতে ছিল স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র নাথেব "নাথ কোম্পানি" নামে একটি যাত্রাদল। প্রায় ১০ বছর বেঁচেছিল এই প্রতিষ্ঠান। দেশবিভাগের পর ওঁরা আসেন কলকাতায়। এখানেও ঐ নামে যাত্রাদল হয়েছিল, কিন্তু চলেছিল মাত্র একটি বছর। তারপর যাত্রাদল তুলে দিয়ে, যাত্রা-থিয়েটারে সাজ পোশাক—মেক-আপ মেটিরিয়ালস্, মুখোশ—যাবতীয় দ্রব্য সাপ্লাই করা শুরু হয়। বড়বাজারে খেংরাপট্টীতে প্রতিষ্ঠিত হয় "নাথ কোম্পানী ড্রেস হাউস"। সুনীল নাথ প্রায় ২০ বছর ধরে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এই প্রতিষ্ঠান।

॥ রূপসজ্জা কুটির ও সুধীরকুমার দে ॥

শিয়ালদা ফ্লাই ওভারের পাশে ছবিঘর সিনেমা হাউসের গা লাগোয়া গলির ভিতরে প্রায় ৩৫ বছরের প্রতিষ্ঠান 'রূপসজ্জা কুটির'। সখের অভিনেতা পরলোকগত বিশ্বনাথ দে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানে মাত্র চার-পাঁচ বছর জড়িত থাকার পর প্রতিষ্ঠানের সব দায়িত্ব তুলে দেন সুধীর দে'র হাতে। বিশ্বনাথবাবুর ভাইপো। যোগ্য উত্তরাধিকার হয়ে এখনও সাজসজ্জা ও রূপসজ্জার ক্ষেত্রে এই রূপসজ্জা কুটিরকে শুধু বাঁচিয়ে রাখেন নি, নৃত্য নাট্য, বিশেষ করে রবীন্দ্র-নজরুল নৃত্যনাট্যের ক্ষেত্রে পোশাক-পরিচ্ছদ, সাজসজ্জা, মেক-আপ ইত্যাদি ভাড়া বা তৈরি করে দিয়ে বিশেষ জনপ্রিয়তার শীর্ষে নিয়ে গেছেন। স্বর্গীয় বৈদ্যনাথ দে'র ভাইয়ের ছেলে সুধীরবাবু অকপটে স্বীকার করলেন, তিনি নিজে কখনও মেক-আপ ম্যান হিসেবে বা ড্রেসার হিসেবে হাতে-কলমে কাজ করেন নি। উদয়শংকরের ছাত্র সুখ্যাত নৃত্যশিল্পী সাধন গুহ-পলি গুহর দেওয়া আইডিয়াই রূপসজ্জা কুটিরের পথ প্রশস্ত করে। এঁদের নৃত্যনাট্য হলেই এই কোম্পানির ওপরেই সাজসজ্জার দায়িত্ব থাকে। তা ছাড়া প্রখ্যাত রবিতীর্থর অধিকাংশ রবীন্দ্রনাট্যে ; ক্যালকাটা কয়ারের নৃত্য নাট্যর সঙ্গে, রাগিণীর প্রযোজনায় সুপরিচিত অসিত চ্যাটার্জী উপস্থাপিত 'কবি', 'ফুটপাত' ইত্যাদি নৃত্যনাট্যে রূপসজ্জার কাজ করে খ্যাতি পায় এই প্রতিষ্ঠান। নবনালন্দার সঙ্গেও কাজ করেছে এই প্রতিষ্ঠান। রূপসজ্জা কুটিরের রূপ ও সাজসজ্জার স্মৃতি বিজড়িত কয়েকটি সেরা নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা, ওয়াজেদ আলী (নৃত্যনাট্য), বটু পাল উপস্থাপিত 'মহেশ'।

অতীতে স্বনামধন্য মহেন্দ্র গুপ্ত বেশ কয়েকবার এই প্রতিষ্ঠানের রূপসজ্জায় সজ্জিত হয়েছিলেন।

অনাদি প্রসাদ, শম্ভু ভট্টাচার্য এঁরাও এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করেছেন। বিখ্যাত-প্রাতঃস্মরণীয় কোন ব্যক্তির চরিত্র যদি কোন নাটকে থাকে তাকে বলা হয় চরিত্র নাটক। সেই চরিত্র নাটকে চরিত্র মেক-আপ দিয়ে রূপসজ্জা কুটির অনেকবারই প্রশংসা পায়। থিয়েটার রোডের অরবিন্দ ভবনের ছাত্ররা একবার একটি নাটক করেছিলেন। তাতে ছিল রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র বসু ইত্যাদি চরিত্র। আর একবার পুলিসের 'বহুমুখী' এমন একটি নাটক করেছিল যাতে ছিল অনেকগুলি ঐতিহাসিক চরিত্র। এই চরিত্রগুলিকে পোশাকে মেক-আপে নিখুঁত করেছিল এই প্রতিষ্ঠান।

মমতাশংকর যখন প্রথম ট্রুপ তৈরি করেন তখন রূপসজ্জার দায়িত্ব পালন করেছিল শিয়ালদার এই প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার সুধীরবাবু জানালেন, এখন এই ব্যবসার অবস্থা ভাল নয়। প্রথমত দুঃখের ব্যাপার হলো এখনকার ছেলেরা এ ব্যবসায় আসতে চায় না, দ্বিতীয়ত নানা কারণে সাংস্কৃতিক জীবন কোথায় যেন বড় বেশি পথ হারাচ্ছে।

এই প্রতিষ্ঠানে আছেন ৪।৫ জন মেক-আপ ম্যান। তাঁর হলেন, সুজিত সরকার, দিলীপ পরামাণিক, রবীন গুহ, প্রবোধ রায়। এঁদের পক্ষ থেকে সুজিত বাবু বললেন, আমরা যাত্রা-থিয়েটারে যেমন মেক-আপ দিতে অভ্যস্থ, সিনেমার ব্যাপারেও তাই, কিন্তু ওখানে ইউনিয়ন আছে তাই সহজে প্রবেশ করা যায় না।

॥ পি. জি. কুমার/পশুপতি মিত্র ॥

এই প্রতিষ্ঠানে যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা। খাপের মধ্যে তলোয়ারের মত, ঘরের মধ্যে মশারির মত, এক জায়গায় অফিসের মধ্যে অফিস, ঘরের মধ্যে ঘর, ব্যবসার মধ্যে ব্যবসা এ সবের ছবিটা এমন করে আগে দেখিনি। এ সবের মধ্যে বিস্ময় নেই। বিস্মিত হলাম, একটি ছোট্ট ঘরের ভিতরে পুরাণ থেকে ইতিহাস, ইতিহাস থেকে বাস্তব জীবনে দেব-দেবী থেকে নবাব-আমীর-ওমরাহ, সেখান থেকে রাজা-মহারাজা, সাধু থেকে ফকির, কৃষ্ণ থেকে চাণক্য, চাণক্য থেকে স্তালিন, সেখান থেকে হেডমাষ্টার, সুদখোর ; বাল্মিকী থেকে ব্লাউজ, কমণ্ডলু থেকে মদিরা পাত্র, সিরাজের মাথার তাজ থেকে পি. সি. সরকারের তাজ সেখান থেকে মাড়োয়ারী যুবকের বিয়ের পোশাক, তলোয়ার থেকে গদা, চাবুক থেকে চামর, স্টেথিস্কোপ থেকে হোমিপ্যাথির ব্যাগ ; দস্যু মোহনের দাড়ি থেকে উর্বশীর বেণী, হিটলারের গোঁফ থেকে রবীন্দ্রনাথের দাড়ি ; জটায়ুপাখীর ঠোঁট থেকে বীর হনুমান ; সিংহ থেকে গাধার মুখোশ, কী নেই দোকানে!

স্বর্গীয় সুধীরকুমার মিত্র প্রথম ১৯৪২ সালে তৈরি করেন কোহিনূর কোম্পানি। এক সময়ে সেই প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। তারপর তৈরি হয় পি. জি. কুমার পশুপতি মিত্র। এঁরা কাজ শিখেছিলেন চক্রবর্তী এণ্ড সন্স-এ থাকাকালীন। পশুপতিবাবু অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে বললেন, সাজ-সজ্জার অনেক কাজই তিনি শিখেছিলেন হাতে কলমে, কারণ তখন এই চক্রবর্তী এণ্ড সন্সের কর্মী ছিলেন দক্ষ কারিগর হিসেবে হরিচরণ ঘোষ ও আকসুদ্দীন। কথা প্রসঙ্গে জানা গেল ; যাত্রা জগতের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের অনেকদিনের সম্পর্ক। আগে অনেকেই এই কোম্পানিতে অর্ডার দিয়ে পোশাক করাতেন, যেমন আর্য অপেরা। অমিয় বসুর মৃত্যুর পর রাজা ভট্টাচার্য ও শিবানী ভট্টাচার্যের লিজ নেওয়া নব অম্বিকা, কোহিনূর অপেরা, সুশীল নাট্য কোং! বর্তমানে যাত্রার কাজ করার ইচ্ছা এই প্রতিষ্ঠানের থাকলেও তিক্ত অভিজ্ঞতা কম নেই। অনেক দলই চুক্তি মত সাজপোশাকের দাম পরিশোধ করেননি। ৩০ বছর আগে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকায় পুরো রয়েল ড্রেস হয়ে যেত, এখন পুরো রয়েল ড্রেসের এস্‌টেট করতে হলে ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকা লাগে। তা ছাড়া যাত্রা থেকে পৌরাণিক ঐতিহাসিক পালা আস্তে আস্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, সুতরাং এই ব্যবসায় মন্দাভাব চললেও 'পি. জি. কুমার পশুপতি মিত্র' প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা খুবই ভাল, তার কারণ, এখন যত বেশি মুখোশ শিল্প ধ্বংসের দিকে এগুচ্ছে, তত বেশি রবারের তৈরি মুখোশ ছাড়াও ছোটদের খেলার উপযোগী অনেক কিছুই এঁরা সরবরাহ করে থাকেন। প্রতিষ্ঠানের-সকলেই কয়েকটি ব্যাপারে খুবই গর্বিত বোঝা গেল। যেমন অতীতে ছিল **কালিকা নাট্য কোং। পুলিশমন্ত্রী কালিপদ মুখার্জীর দল**। সেই দলের অনেক পোশাক পরিচ্ছদ, অন্যান্য সব কিছুই এঁরা সাপ্লাই করতেন। ১৯৭০ সালে **চম্বলের ডাকাত মাধো সিং** স্বয়ং এই গলিতে এসে, এই প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁর প্রয়োজনীয় বেশ কিছু সাজ নিয়েছিলেন! ইতিহাস প্রসিদ্ধ জাদুকর **গোগিয়াপাশার কিছু ড্রেস** এখান থেকেই গিয়েছিল। সম্ভবত মেট্রো সিনেমার পাশে গোগিয়াপাশার একটি ফটোগ্রাফীর দোকান বিদ্যমান। সিনিয়ার পি. সি. সরকার, কে. লাল, শংকর এঁদের মত বিখ্যাত জাদুকরেরা অনেকেই অর্ডার দিয়ে এই প্রতিষ্ঠান থেকেই কিনেছেন প্রয়োজনীয় সাজ। স্বনামধন্য **শিল্পী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মলিনা দেবী** এঁরাও এখান থেকে অনেকবারই সাজ পোশাক কিনেছেন! এই প্রতিষ্ঠান রাজ্য সরকারের ফোক ডিপার্টমেন্টের অর্ডার অনুসারে নাটকের জন্য সব পাঠান, তেমনি ; প্রতি বছর টাটানগরে টাটার জন্মদিনে যে উৎসব হয় সেখানে এই প্রতিষ্ঠান থেকেই যায় সাজ-পোশাক।

বছরে বহু হাজার টাকার জরি-চুমকী, পুঁতি, পাথর প্রয়োজন হয় এই রয়েল ড্রেসের জন্য, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হলো এর কোনটাই এখানে তৈরি হয় না। চুমকী যেমন সাপ্লাই আসে

দিল্লী থেকে তেমনি, জরি-চুমকীর জন্মস্থান মূলত, সুরাট। যে ভেলভেট, টুপি সাজ বা পোশাকে ব্যবহার করা হয় তা তৈরি হয় দিল্লী-বোম্বাইতে। পুঁতি-মতি, কালারফুল স্টোন সব কিছুই আসে বম্বে থেকে। এই সব জরি-চুমকীর কাজ করেন হাওড়া জেলার ধুলাগিড়, ডোমজুড় ইত্যাদি একাধিক অঞ্চলের অনেক পরিবার, তবে বর্তমানে যাত্রা-থিয়েটারের রয়েল ড্রেসের পরিবর্তে এঁরা বেশি ব্যস্ত থাকেন শাড়িতে জরি-চুমকি বসাতে। ফলে এই লাইনে যেমন কমে যাচ্ছে শিল্পী তেমনি, মুখোশ শিল্পীও কমে আসছে। কমে আসছে ওস্তাগর।

পি. জি. কুমার, পশুপতি মিত্র এই দুই ব্যক্তির নামে এই প্রতিষ্ঠান এই ব্যবসা ক্ষেত্রে একটি শিরোনাম তাতে সন্দেহ নেই।

॥ বামনদাস দত্ত মেমোরিয়াল শীল্ড ॥

কীর্তিমান মেক-আপ শিল্পী। রতিকান্ত চিত্রকরের গুরু। থাকতেন হাওড়ার শিবপুরে। অতীতে দাড়ি-গোঁফ লাগানো হতো তার দিয়ে। বামনদাসই প্রথম ক্রেপ ব্যবহার করেন। বিশ্বরূপা থিয়েটারের কর্ণধার দক্ষিণারঞ্জন সরকার ও রাসবিহারী সরকার বাংলা থিয়েটার ও নাট্য উন্নতিকল্পে অনেক উল্লেখযোগ্য কাজই করেছিলেন, যার নজির আছে ইতিহাসের পাতায়। "নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ" অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। গ্রুপ থিয়েটার ও যাত্রার প্রসারের জন্য একদা নামমাত্র অর্থে বিশ্বরূপা থিয়েটার ব্যবহার করার সুযোগ দিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ। শ্রেষ্ঠ রূপসজ্জার জন্য এই পরিষদ শ্রেষ্ঠ মেক-আপ ম্যানকে সম্মানিত করত পুরস্কার দিয়ে। সেই পুরস্কারের নাম ছিল "বামনদাস দত্ত মেমোরিয়াল শীল্ড!"

কসমিক।। মেক আপ মেটিরিয়ালসের জন্য এই কোম্পানিটিও প্রখ্যাত। এই দোকানও খেংড়াপট্টীতে।

দি মেক-আপ।। প্রতিষ্ঠাতা, স্বনামধন্য ফরহাদ হোসেন। এখন ফরহাদ পুত্রেরা এই প্রতিষ্ঠান চালান। দি মেক-আপের চুল (উইগ) খুবই বিখ্যাত এবং নিখুঁত। এঁদের একই নামে আর একটি দোকান আছে যেখানে মেক আপ মেটিরিয়ালস্ পাওয়া যায়। ঠিকানা ঃ ১৫০, লোয়ার চিৎপুর রোড। কলকাতা-৯।

॥ যাত্রার অস্ত্র-শস্ত্র ॥

ইদানিং অনেকেই এই ব্যবসা করেন। তার মধ্যে নতুন বাজারের নিতাই কুণ্ডু প্রধান। যাত্রা দলে যে বড় বড় বাক্স আর মেক-আপ বাক্স প্রয়োজন হয়, তা তৈরি এবং মেরামতের জন্য এখন অনেক কোম্পানি বা ব্যক্তি নিযুক্ত আছেন, এঁদের মধ্যে সেরা নাম **ফ্রেণ্ডস্ ফ্যাক্টরী**। ১৮৩, আপার চিৎপুর রোড, কলিঃ-৫।

॥ পালার কৃষ্ণ যাঁর বাঁশি বাজান, আদ্যাপীঠের আদ্যা মায়ের মূর্তি গড়েন তিনিই ॥

যাত্রা পালার কৃষ্ণ যাঁর তৈরি বাঁশি বাজান, অথবা "সতরঞ্চকে খিলাড়ী" ছায়াছবির শ'দুয়েক সৈনিকের হাতে যাঁদের সোর্ড শত্রুর রক্ত নেবার নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল, সেই শিল্পীই গড়েছিলেন আদ্যাপীঠের আদ্যা মায়ের মূর্তি। এই শিল্পীরা এ দেশের মাটিতে জন্মেছেন এটা এ দেশের দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তাদের বা জনগণের ভোটে রাজনীতির ক্ষেত্রে আমীর-ওমরাহ বনে যাওয়া ব্যক্তিদের কাছে কোন গৌরবের ব্যাপার না হতে পারে, আমার কাছে তা গৌরবের।

নতুন বাজারের (চিৎপুর) গা লাগোয়া পিতল পট্টীর ভিতরে, এক জরাজীর্ণ ঘরে বসে দাস এণ্ড সন্সের বর্তমান দুই কর্ণধার শ্রীসত্যনারায়ণ দাস এবং তাঁর মেজ ভাই লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। নানা ধাতু দিয়ে তৈরি সব রকম দেব-দেবীর মূর্তি, যাত্রা-থিয়েটারের পৌরাণিক-ঐতিহাসিক পালা-নাটকের প্রয়োজনে অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাতা সত্যনারায়ণবাবুর এই কারখানায় বসে কথা বলছিলাম, তারই ফাঁকে ফাঁকে চোখের আলোয় দেখছিলাম কী নিদারুণ জীর্ণ দশা, শিল্প সৃষ্টির

পুরাতন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক এই কারখানার! একদিন হয়তো আকস্মিক ভাবে সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ছাদ ধ্বসে আজকের সভ্যতার নিচে চাপা পড়ে যাবে বাংলার এই শিল্প!

সত্যনারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণের বাবা ˚তিনকড়ি দাস এক সময়ে এই "দাস এণ্ড সন্স" প্রতিষ্ঠানটিকে নতুন করে সাজিয়েছিলেন! তারও বহু বছর আগে তিনকড়িবাবুর জ্যাঠামশাই স্বনামধন্য পিতল শিল্পী ˚প্রসাদচন্দ্র দাস ছিলেন কর্ণধার। এই বংশে বাংলার এই লোকশিল্পের প্রতি গভীর ভালবাসা চিরকালের। সত্যবাবুর ঠাকুরদা ˚মন্মথনাথ দাস একদা যাত্রা জগতে খুবই নাম করা শিল্পী ছিলেন। নারী চরিত্রে অভিনয় করে রানী খেতাব পেয়েছিলেন তিনি! সেই সূত্রেই বোধ করি প্রসাদবাবুরা যাত্রায় অস্ত্র-শস্ত্র তৈরি করার মন পেয়েছিলেন, পিতলের যাবতীয় কাজের মধ্যে। সত্যনারায়ণ যখন বালক তখন থেকেই বাবার কারখানায় এসে কাজ শিখতে থাকেন। তখন হরিপদ ঘোষ পাকা ওস্তাদ। মূলত সত্যবাবুকে কাজ শিখিয়েছিলেন তিনি। তারপর মেজ ভাই লক্ষ্মীকে।

বাবা ˚তিনকড়ি দাসের কাছে তখনকাব দিনের যাত্রা জগতের দিকপাল ব্যক্তিরা এসে, পালার প্রয়োজনে ক্যাটালগ দেখিয়ে সব তৈরি করাতেন। নট্ট কোম্পানির প্রাণপুরুষ সূর্য দত্ত অনেকবারই এসেছেন এই কারখানায়।

এক সময়ে কুমারটুলীর স্বনামখ্যাত শিল্পী এন, সি, পাল একটি বিষ্ণু মূর্তি (অষ্টধাতুর) তৈরি করাবার জন্য আসেন কারখানায়। যুবক সত্যনারায়ণ সেই মূর্তি তৈরি করে দেন। প্রথম কাজ, সুতরাং মূর্তির গায়ে বিন্দু বিন্দু "চড়" বা বাবলস্ ছিল। তবুও এন. সি. পাল খুশি। এর কিছু বছর পর একদিন আবার এন. সি. পাল এসে সত্যবাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে যান বেথুন কলেজে। কলেজের ভিতরে একটি গাছতলায় সত্যবাবুকে আড়াই ঘণ্টা বসিয়ে রেখে এন. সি. পাল যখন ফিরলেন তখন মনে মনে খুবই উত্তেজিত হয়েছিলেন সত্য। ব্যাপার কী! কেন আনলেন আর কেনই বা বসিয়ে রাখলেন সেই কথা এবার স্পষ্ট করে জানতে চাইলেন সত্য! শ্রীপাল বুঝলেন, সত্য উত্তেজিত। তখন শ্রীপাল যা বলেছিলেন মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তা ভুলবেন না সত্যবাবু। শ্রীপাল বলেছিলেন, তুমি ঢালাই মেটালের মূর্তি গড়! সব মানুষের মূর্তিই হলো শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম ঈশ্বরের। যত বেশি মানুষের দিকে তাকাবে, কালচার করবে তত বেশি তোমার মূর্তি প্রাণ পাবে। এই আড়াই ঘণ্টা ধরে বেথুনের ছাত্রীদের তুমি দেখেছ, কারও চোখ দুটি অসামান্য! কারও বা মুখের গড়ন! এ সবে তোমার জ্ঞান বৃদ্ধি হোক তাই চেয়েছিলাম।

পরবর্তী সময়ে সেই শ্রীপালের মাধ্যমে **আনন্দময়ী মায়ের** একটি মূর্তি নয়, আনন্দময়ী মায়ের যেখানে যত মঠ আছে সেখানকার সব মূর্তিই তৈরি করেছিলেন সত্যবাবুরা।

হঠাৎ একদিন **আড়িয়াদহের আদ্যাপীঠ** থেকে অর্থাৎ **দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ** থেকে ডাক এলো ˚তারক দাসের। কী ব্যাপার! জানা গেল আদ্যাপীঠের নব নির্মিত মন্দিরে আদ্যা মায়ের অষ্ট ধাতুর মূর্তি তৈরি করতে হবে। সঙ্গে গেলেন সত্যনারায়ণ। অষ্টম বর্ষীয়া বালিকারূপ হবে মায়ের। সোওয়া পাঁচ ফুটের মূর্তি! সম্পূর্ণ অষ্টধাতুতে তৈরি হবে মায়ের মূর্তি! তারকবাবু রাজি হলেন। সত্যবাবু আব্দার করলেন, মায়ের এই মূর্তি তৈরি করবেন তিনি। বাবা তারকবাবুর ভয়, ছেলে পারবে না! ডাকা হলো পুরাতন কারিগর হরিপদ ঘোষকে। হরিপদবাবু নিজে পারিশ্রমিক চাইলেন দশ হাজার টাকা। খারিজ হলেন তিনি। অবশেষে বাবার প্রধান সহকারী হিসেবে মূর্তি গড়ার পূর্ণ দায়িত্ব পেলেন শিল্পী সত্যনারায়ণ। পারিশ্রমিক সর্বমোট ২২০০০ টাকা। জনসাধারণের সোনা-রূপা পাওয়া গেল ৫০০ ভরির মত। বাকি সব মেটালের জন্য আবেদন করা হলো সরকারের স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রীর কাছে। সব এলো।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন নানা ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতা দিলেন। স্মল স্কেলের সঙ্গে চুক্তি ছিল, উদ্বৃত্ত মেটালের একসেস ফেরৎ দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত মেটালের মণ্ড ফেরৎ নেননি তাঁরা।

অবশেষে কথা ছিল লেবুতলার মন্দিরে প্রধান কার্যালয়ে অন্নদা ঠাকুরের মূর্তি সেই এক্‌সেস্‌ দ্রব্য দিয়ে তৈরি হবে। কিন্তু তা হয়নি। শিল্পী সত্যনারায়ণ দাস এবং লক্ষ্মীনারায়ণ দাস তাঁদের এই জরাজীর্ণ কারখানা থেকেই গড়েছেন কলকাতা তথা পঃ বাংলার বহু অভিজাত—ধনী পরিবারের দেব-দেবীর মূর্তি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বক্রেশ্বরে (যেখানে দেবীর ভ্রূ পড়েছিল) মহিষাসুর মর্দিনী মূর্তি, কালীঘাটের বগলা মূর্তি, তারাপীঠের মুণ্ডমালীতলার মূর্তি। আরও অনেক। অবসর প্রাপ্ত ইনস্‌পেকটর অফ পুলিশ হরিসাধন ঘোষ চৌধুরী, মেডিকেল কলেজের বিখ্যাত ডাক্তার পঞ্চানন চ্যাটার্জীর বাড়িতে আছে সত্যবাবুদের গড়া অষ্টধাতুর মূর্তি। প্রায় ৩০ বছর ধরে প্রাক্তন মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জীদের একডালিয়া এভারগ্রীন ক্লাবের দুর্গার অস্ত্রশস্ত্র এঁরাই তৈরি করে আসছে

আদ্যা মায়ের মূর্তি প্রসঙ্গে শিল্পী সত্যনারায়ণ দাসকে দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ একটি মে সার্টিফিকেট দেন ২৫.১.৬৭ তারিখে।

॥ ক্যালকাটা উইগ ॥

চিৎপুরের নাখোদা মসজিদ আর তার অনতিদূরে নাজ সিনেমার মাঝামাঝি জায়গায় চামর ঝোলানো পর পর কিছু দোকান। অতীতে এ ধরনের দোকান বা ব্যবসার প্রসার ছিল খুবই। এখন কমতে কমতে প্রায় অর্ধেকেরও কম হয়ে গেছে। আগে যেখানে চুল আর চামরের দোকান ছিল ১৮।২০ খানা, এখন সেখানে মাত্র ৬টি। এর মধ্যে "ক্যালকাটা উইগ হাউস" একটি। এক চিলতে ঘর, অথচ সেই ঘরের মধ্যে একটি পুরাতন স্মৃতি ভাণ্ডার! হিন্দুর দেবদেবীর মাথার চুল থেকে ফকির সাহেবের চুল-দাড়ি! ৫০ গ্রাম থেকে ৫০০ গ্রামের চামর। আরও কত কী! একখণ্ড কাঠের ওপরে প্রায় শতখানেক তীক্ষ্ণ ছুরির ফলা অথবা সুতীক্ষ্ণ লৌহদণ্ড উর্ধ্ব মুখ করে বসানো! ধোবিরা যেমন করে কাঠের পাটাতনের ওপরে কাপড় কাচেন আছড়ে-সজোরে, অথবা খামারে কাঠের পাটাতনের ওপরে যেমন পাঁজা পাঁজা ধান গাছ আছাড় মেরে ধান ঝাড়া হয়, ঠিক তেমনি কায়দায়, আপন মনে গোছা গোছা চামরি গরু বা নীল গাইয়ের লেজ সেই তীক্ষ্ণ শলাকার ওপর আছড়ে আছড়ে জট পাকানো, দলা পাকানো লোম টেনে টেনে সোজা করায় ব্যস্ত! সাদা-কালো মেশানো চুল কেটে কেটে আলাদা করছেন সৈয়দ ভাই! আর একজন মাথার খুলির মত কাঠের ব্লকের ওপর চুল রেখে একাগ্রচিত্তে সূচ দিয়ে সুনিপুণ ভাবে তৈরি করে চলেছেন অপরূপ খোঁপা! তার মধ্যে একবার এক খদ্দের এলেন। ছোট্ট মূর্তির চুল পাওয়া যাবে?

সৈয়দ বললেন, "তারাপীঠের মায়ের ৩ সেট চুল আমার দেওয়া। আমার সৌভাগ্য হলো, সারা ভারতে যত বেলুড় মঠের মঠ আছে [অর্থাৎ রামকৃষ্ণ মিশন] আমি সেখানে চুল / চামর সাপ্লাই করি!"

ফিল্মষ্টার বা সাধারণ মানুষেরা এই ধরনের আর্টিফিসিয়াল চুল বা পরচুলা কেমন ব্যবহার করেন? যুবক কেশ শিল্পী সৈয়দ বললেন, চুল মাথায় না থাকলে তবেই তো এই চুলের কদর, তবে পাকা কাজ, পিওর হিউম্যান হেয়ার এ সব যারা দিতে পারে তাদের কদর চিরকালই। কথা বলতে বলতে সৈয়দ আনলেন সুপ্রিয়া দেবী আর অপর্ণা সেনের নাম। অপর্ণা প্রসঙ্গে সৈয়দ খুবই শ্রদ্ধাশীল। "মেয়েমানুষ হয়ে এত বড় ডিরেকটার হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়! অপর্ণা তাই।" সেই অপর্ণা আর সুপ্রিয়া দেবী প্রায় ১০/১২ বছর ধরে এই প্রতিষ্ঠানের চুলই ব্যবহার করছেন যখন যে নাটকেই অভিনয় করেন। জানতে চাইলাম, ওঁরা কি আপনার কাছে সরাসরি এসে, মাথার মাপ আর ছবি দিয়ে চুল করান?—"না, তা নয়। ওঁদের মেক-আপ যাঁরা করেন সেই মিস রীতা আসেন। দুইজনের মেক-আপ শিল্পীর নাম এক। রীতা। তবে অপর্ণা সেনের রীতার ডাক নাম পিঙ্কি!"

কথা বলতে বলতে এলেন সৈয়দের বৃদ্ধ কাকা। নাম মহঃ ঈশা হক। তিনিও একদা এই

ব্যবসা করতেন। এখন অন্য ব্যবসা করেন। কথা বলে বুঝলাম, এই পরিবারটি শিক্ষিত। মার্জিত। এ লাইনে যার বড় অভাব।

শেখ সৈয়দ আলীর কাকার স্মৃতিচারণে বোঝা গেল, এই চুল-চামরের ব্যবসা সৈয়দদের রক্তে আছে। প্রায় ৪৫ বছর আগে সৈয়দের বাবা শেখ আতাউল হক তাঁর নামেই এই ব্যবসা গড়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে শেখ আয়ুব আলী চালিয়েছিলেন এই ব্যবসা তাঁর নিজের মত করে। এরপর সৈয়দ আলীর যুগ। সেই থেকে এই কোম্পানির নাম 'ক্যালকাটা উইগ হাউস'।

আগে এই চুলের কারবারের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল প্রায় ৩০০ পরিবার। সেটা কমতে কমতে এখন ৮০/৯০টি পরিবারে ঠেকেছে। হাওড়া জেলার দুলাই, দুলপুর, পাঁচলা, হাকলা গ্রামের কিছু, উলুবেড়িয়া অন্তর্গত জগদীশপুরে এখনও ঘরে ঘরে এই চুল শোধন হয়, তৈরি হয়। তাঁরা এসে বিক্রি করেন মার্কেটে। এরই মধ্যে সৈয়দরাও তৈরি করেন নিজের হাতে, বাইরে থেকে কেনেন অনেক।

সৈয়দ একটা ব্যাপারে খুবই স্পষ্ট—তা হলো, এই ব্যবসায় সততাই বড় কথা। হিন্দুর দেবদেবীর বিশেষ করে মন্দিরে-বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত মূর্তিতে কখনই মানুষের ছেঁটে ফেলা চুল ব্যবহার করা হয় না। এখানে চামরের চুল ব্যবহৃত হয়। তবে কুমারটুলী বা অন্যত্র যে দেবদেবীর মূর্তি হয় সেখানে চুল মূলত পাট দিয়ে। মাথার চুল-দাড়ি ইত্যাদিতে ১০০% ভাগ আসল চুল থাকে, যা বিস্ময়কর ভাবে পরিশোধিত।

॥ উলুবেড়িয়ার লাভলি উইগ হাউস ॥

ইদানিং দু' একটি গ্রামে বা অঞ্চলেও কলকাতার মত দু' একটা করে উইগ্ কোম্পানি গড়ে উঠছে। যাঁরা একদা চুল কিনে, নানা কেমিক্যাল দিয়ে শোধন করে, নানা রূপদান করতেন, এখন তাঁদের মধ্যেই সাইন বোর্ড টাঙিয়ে, রীতিমত কোম্পানি তৈরি করে চারদিকে সাপ্লাই দেন। আবার খুচরো বিক্রি করেন। এঁদের মধ্যে একজন হলেন কাদের আলী। বাবা হুসেন আলী এ সব কাজ করতেন যখন, বালক কাদের দু'চোখ ভরে স্বপ্ন দেখত। তারপর একদিন শেখ আয়ুব আলী আর পাঁচলা থানার অন্তর্গত এক গ্রামের মহম্মদের কাছে কাজ শেখেন। চুলের আগে কাদের কিছু জরির কাজ করতেন। শাড়িতে জরি-চুমকী বসাবার কাজ। তখন অঞ্চল-প্রধানের সহযোগিতা নিয়ে পেয়েছিলেন D. R. D. লোন। প্রায় ৬৭৭৫ টাকার মত। সেই অনুদানের অর্থে আর পরিশ্রমে কাদের আলী এখন গড়ে তুলেছেন এই প্রতিষ্ঠান।

পরচুলা ব্যবহার করার পর যদি পাঁচজন বুঝতে পারে পরচুলা বলে, তা হলে সেই চুলের কোন দাম থাকে? কাদের আলীর কাজ সেদিক থেকে খুবই প্রশংসার। সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেলে কাদের আলী আরও অনেক ভাল কাজ করতে পারেন বলে আত্মবিশ্বাসী।

॥ নিতাই কুণ্ডুর তরবারি ॥

মাঝে মাঝেই নিতাইবাবুকে দেখা যেত যাত্রা দলের গদিতে। কখনও মোহন অপেরা-তারা মা অপেরার গদিতে, কখন তপোবন নাট্য কোম্পানিতে, আবার কোনদিন সত্যনারায়ণ অপেরায় বা ভারতীতে। হাঁটু পর্যন্ত এক ফালি ধুতি জড়ানো, গায়ে গেঞ্জি। বয়সের ভারে দেহটা যতই ছোট হয়ে আসুক, মনের বয়স তাঁর কমেনি এক বিন্দুও। ওঁকে দেখলে বোঝাই যেত না, ওঁর ভিতরে এক কারিগর বেঁচে আছে। বেঁচে আছেন স্বয়ং বিশ্বকর্মা। উনি মনে প্রাণে একজন শিল্পী। ভিতরে শিল্পীর বাস না থাকলে কি নিতাইবাবু পিতলের কাজ করতে করতে তৈরি করতেন সুদর্শন চক্র কিম্বা ত্রিশূল, রামের তীর-ধনু থেকে হনুমানের গদা, অথবা সিরাজের সোর্ড থেকে পরশুরামের কুঠার? তাই পৌরাণিক, ঐতিহাসিক পালা-থিয়েটার হলেই ডাক পড়ত নিতাই কুণ্ডুর।

প্রায় একশো বছর। তখন পিতলের যাবতীয় জিনিস তৈরির ক্ষেত্রে স্বর্গীয় প্রসাদচন্দ্র দাসের

ছিল খুবই নাম ডাক। ৩০।৪০ বছর কাজ করার পর ভাগ্নে ধনঞ্জয় কুণ্ডুকে এই পিতলের কাজে পাকা করে গড়ে তুলে ব্যবসার সব কিছুর দায়-দায়িত্ব তুলে দিয়ে দেহ রাখেন প্রসাদবাবু। উত্তরাধিকার সূত্রে ধনঞ্জয়বাবু ১০/১৫ বছর এ ব্যবসা চালিয়ে যোগ্য উত্তরাধিকার নিতাই কুণ্ডুর ওপর ব্যবসা ন্যস্ত করে মারা যান। স্বর্গীয় ধনঞ্জয়বাবুর পুত্র নিতাই নিতান্তই অল্প বয়স থেকে এই পিতলের কাজে লেগে যান। তখন সত্যম্বর অপেরার কর্ণধার স্বর্গত গৌর দাসের খুবই নাম-ডাক যাত্রা জগতে। তিনি একদিন নিতাইবাবুকে যাত্রা-থিয়েটারের জন্য যাবতীয় অস্ত্র-শস্ত্র তৈরি করার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করেন। সেই থেকে নিতাইবাবু পিতলের সব জিনিস তৈরি করার ফাঁকে ফাঁকে যাত্রা দলের পালার অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে থাকেন। কালে কালে এমন হলো, কলকাতায় যে যেখানে যাত্রা-থিয়েটার করেন তাঁরাই অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে হলে ছুটে আসতেন নিতাই কুণ্ডুর কাছে। অস্ত্রশস্ত্র ভেঙে গেলে অথবা নিকেল নষ্ট হলে নিতাইবাবু তাও সারিয়ে দিতেন, নিকেল করে দিতেন। অতি অল্প দিনের মধ্যে নিতাইবাবুর প্রশংসায় সকলেই পঞ্চমুখ হন। নিতাইবাবুর গুরু ছিলেন স্বর্গত **হরিপদ ঘোষ** আর **কার্তিকচন্দ্র দাস**। বর্তমানে এই ব্যবসা কেমন জিজ্ঞাসা করায় নিতাইবাবু অত্যন্ত ভগ্ন হৃদয় নিয়ে কথা বলেছিলেন। অকৃতদার এই মানুষটি কাশীনাথ আর অমরনাথ দাস দুই ভাইপোর ওপর সব ভার দিয়ে নিঃশব্দে হারিয়ে গেছেন।

॥ সর্বাধুনিক মেক-আপ মেটিরিয়ালসের স্রষ্টা এবং পালাকার-নির্দেশক গণেশ মুখোপাধ্যায় ॥

যুগ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিস্ময়কর বিবর্তন এসেছে, অভিনয় ধারা বা নাট্য উপস্থাপনার ক্ষেত্রে অর্থাৎ যাবতীয় ভিস্যুয়াল আর্ট ফর্মের ক্ষেত্রে যে অবিস্মরণীয় পরিবর্তন এসেছে, ঠিক তার সঙ্গে তাল রেখে অসাধারণ রূপান্তর ঘটেছে রূপসজ্জা, সাজসজ্জা এবং দৃশ্য সজ্জায়। সম্পূর্ণ পাল্টেছে রং আর প্রয়োগ কুশলতার চরিত্র! বিশেষ করে মেক-আপ মেটিরিয়ালসকে একদিকে বিজ্ঞান, অন্যদিকে বিশ্বাসের হাত ধরে আনতে হয়েছে রূপবদলের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর চ্যালেঞ্জ!

বাংলা দেশের মাটিতে, ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি জেলায়, মহকুমায়, গ্রামে-গঞ্জে যাবতীয় লোক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, নাট্যক্ষেত্রের কর্ম যজ্ঞের প্রতিটি স্তরে, একদা অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মেক-আপ মেটিরিয়ালস-এর (যা মানুষের অবয়বের ক্ষেত্রে এক সর্বনাশা ভূমিকা পালন করে যেত নীরবে) সেই ভূমিকাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে, সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মেক-আপ মেটিরিয়ালস তৈরির ক্ষেত্রে যিনি বহু প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়ে, বহু চ্যালেঞ্জ আর প্রতিবন্ধকতার ভিতর দিয়ে এগিয়ে এসে আজ জনপ্রিয়তার শীর্ষে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছেন, তিনিই গণেশ মুখোপাধ্যায়। "গণেশ মেক-আপ", "মাই-ফাই", "গণেশ ব্রাণ্ড", "ডান্স-অপেরা" ইত্যাদি ব্রাণ্ডের সর্বাধুনিক মেক-আপ মেটিরিয়ালসের জনক বা গবেষক যিনি তিনিই আবার কুশলী নাট্যকার, সার্থক প্রযোজক এবং সফল রঙ্গমঞ্চ কর্ণধার গণেশ মুখোপাধ্যায়।

একদা গণেশবাবুর বাবা স্বর্গীয় কালীতনয় মুখোপাধ্যায় সখের যাত্রা-থিয়েটারের পিছনে অকাতরে অর্থ ব্যয় করেছিলেন। সুতরাং ছেলেবেলা থেকেই গণেশবাবুও থিয়েটার-যাত্রার প্রেমিক হয়ে ওঠেন। তারই ফলশ্রুতি পরবর্তীকালে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সান্নিধ্য লাভ। এখানেই গণেশবাবুর মনের গভীরে জাগে নাট্য বিষয়ক বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা, বিশেষ করে 'মেক-আপ'-এর মত এ্যাপ্লায়েড আর্ট বা ফলিত বিজ্ঞানের প্রতি নানা জিজ্ঞাসা এবং উত্তর খোঁজার তীব্র আকাঙ্খা। এরপর এখান থেকে ওখান থেকে শুধু 'মেক-আপ' সংক্রান্ত বই সংগ্রহ করে পড়ে যাওয়া। তারই পাশাপাশি মেতে যাওয়া থিয়েটার চর্চায়। "শ্রীমঞ্চ" গণেশবাবুর থিয়েটার চর্চার প্রথম পীঠস্থান। স্বনামখ্যাত প্রেমাংশু বসু, গণেশবাবু এঁরাই শ্রীমঞ্চের অন্যতম জনক।

১৯৫৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের "মিনিস্ট্রি অফ কালচারাল এডুকেশন" ডিপার্টমেন্ট

থিয়েট্রিক্যাল আর্ট ফর্মের ওপর স্কলারশিপ দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। গণেশবাবু আবেদন জানান। যান দিল্লী। সেখানে রচিত হয় এক স্মরণীয় অধ্যায়। স্বনামখ্যাত পৃথ্বীরাজ কাপুর, মামা ওয়েকর, শম্ভু মিত্রের মত থিয়েটার-সিনেমার দিক্‌পালরা নিলেন গণেশবাবুর সাক্ষাৎকার! সর্বভারতীয় এই প্রতিযোগিতায় গণেশবাবু উত্তীর্ণ হলেন। বৃত্তি পেলেন মাসিক ২৫০ টাকা। সেদিন আর যাঁরা পেয়েছিলেন তাঁরা বিদেশে পাড়ি দিলেন নাটকের নানা দিকে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে। এদিকে তখন পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হচ্ছে সংগীত-নাট্য আকাদেমী। সেখান মূলত অধিকর্তা এবং অধ্যক্ষের আসনে অধিষ্ঠিত নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী। গণেশবাবু ভর্তি হলেন এখানে। প্রিয় পাত্র হলেন অহীনবাবুর। অহীন্দ্রবাবু চেয়েছিলেন, রঙ্গমঞ্চের প্রসার। চেয়েছিলেন স্টেজের ওপর স্টেজ। নতুন নতুন ইকুইপমেন্টস্ আর টেকনিসিয়ান তৈরির ব্যাপারে তাঁর ছিল ব্যাপক চেষ্টা। তারই ফলশ্রুতি, আজকের মুক্ত অঙ্গন, রঙ্গনা, অহীন্দ্র মঞ্চ। এই সময়ে বঙ্গ থিয়েটারে একাধিক টেকনিসিয়ানও তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু যে দিকটা অবহেলিত থেকে গেল, সেদিকে কাজ করতে হলে প্রয়োজন অর্থের। এই সময়ে অবশ্য গণেশবাবুর মাসিক আয় ছিল দু'আড়াই হাজার টাকা। সেই আয় আঁকড়ে ধরে থাকলে কোন গবেষণাই সম্ভব নয়, তাই গণেশবাবু সব ত্যাগ করে শুরু করলেন মেক-আপ মেটিরিয়ালস নিয়ে গবেষণা। এ দেশে তখন 'ম্যাকস্ ফ্যাকটর', 'লিসনার'-এর ব্যাপক পসার। বিদেশী মেক-আপ, দামও বেশি। তবু চড়া দামে সেই মেক-আপ এ দেশে বিকিয়ে যাচ্ছে অকাতরে। এ দেশের লক্ষ লক্ষ টাকা চলে যাচ্ছে বিদেশে।

গণেশবাবু প্রতিকারে মরিয়া! শুরু করে দিলেন গবেষণা। এক সময়ে যাত্রা-থিয়েটার-সিনেমায় ব্যবহৃত হতো, সিঁদুর, জিংক-অকসাইড, পিউরি, কাজল, ভুষোকালি ইত্যাদি! এ সব চামড়াকে নষ্ট করে দিত। সিঁদুরে পারা থাকে, পিউরিতে থাকে সিসে, এ সব চামড়ার চরম শত্রু জেনেও ব্যবহৃত হতো! এখনও অনেক গ্রামীণ যাত্রা-থিয়েটারে হয়। গণেশবাবু আনলেন পারফেকশন! রঙিন চলচ্চিত্রে, টি.ভি/ভি.ডি.ও এবং সাদাকালো সিনেমায়, মঞ্চে-যাত্রার অভিনয়ে, যাবতীয় লোকনাট্যে মেক-আপ মেটিরিয়ালসে এক নতুন ধারা আনলেন। এর মধ্যে আবার মাথায় রাখলেন, উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত শ্রেণীর থিয়েটার-যাত্রা চর্চার ক্ষেত্রে ব্যয় বহনের ক্ষমতা। গ্রামীণ ক্ষেত্রেও গণেশবাবুর আবিষ্কৃত মেক-আপ, পারফিউমস্ যাতে অল্প খরচে ব্যবহার করা যায় অথচ চামড়ার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয় না সে দিকটাও সার্থক করলেন। কোন মিডিয়ামে কী জাতীয় রং-পারফিউম ব্যবহার করা বিশেষভাবে উচিৎ তারও পথ নির্দিষ্ট করলেন! মেক-আপ নিয়ে অহীন্দ্র চৌধুরী যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরি করেছিলেন সেখানে প্রাক্‌টিক্যাল ও থিওরিটিক্যাল শিক্ষা দানের জন্য যেমন এলেন সায়ান্স কলেজের অধ্যাপকেরা তেমনি এলেন সতু সেনের মত আলোর জাদুকর। নাট্যাকাশের দীপ্ত সূর্য অহীনবাবু তখন মধ্য গগনে। এখানে গণেশবাবুর সৃষ্টি পেল স্বীকৃতি!

যা হোক, শ্রদ্ধেয় ডঃ বিধানচন্দ্র রায় এই রিসার্চের জন্য সরকারি তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্য দিলেন। আড়াই বছর পর গণেশবাবু সামান্য একটা সূত্র আবিষ্কার করলেন। এই সময়ে গণেশবাবুকে অনেকবারই সেই প্রাতঃস্মরণীয় মেক-আপ-ম্যান হরিপদ চন্দের কাছে যেতে হয়েছিল মাদ্রাজে। যখন গবেষণা প্রাথমিক স্তরে তখন সব ওলট পালট হয়ে গেল। অকাদেমী, বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হলো। অহীন্দ্র চৌধুরী অবসর নিলেন। এই গবেষণায় যাঁরা ছিলেন তাঁদের অনেকেই হাল ছেড়ে দিলেন। কিন্তু চার বছর পর গণেশবাবু গবেষণায় হলেন কিছুটা উন্নীত। তারপর থেকে একদিকে তিনি যেমন গবেষণা চালিয়ে গেলেন, অন্যদিকে তেমনি এই মেক-আপ মেটিরিয়ালসের মার্কেট তৈরির ব্যাপারেও ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এ সবের মধ্যে নানা অশান্তির জন্ম। অংশীদারদের সঙ্গে আইন-আদালত। অবশেষে জয়। সৃষ্ট হলো "গণেশ মেক-আপ"। ম্যাক্স ফ্যাকটরের চাইতেও গণেশবাবুর সৃষ্টি মেক-আপ মেটিরিয়ালস বিন্দুমাত্র দুর্বল নয় প্রমাণিত হলো। ধীরে ধীরে

খ্যাতি! ভারতের সর্বত্রই এখন "গণেশ মেকা-আপ"-এর চাহিদা। এই চাহিদা বাড়াবার জন্য, আপন ল্যাবরেটরীতে উদয়-অস্ত শ্রম করার মধ্যে গণেশবাবু ছুটতে থাকলেন ; দিল্লীর "কিনারী মার্কেটে"। এই বৃহত্তম মার্কেটে মূলত মেক-আপ মেটিরিয়ালস বিক্রি হয়! গেলেন মথুরায়। গেলেন বোম্বাই-মাদ্রাজের চিত্রজগতে।

এই মুহূর্তে ৩৫০টিরও বেশি আইটেমের গবেষক-নির্মাতা গণেশবাবু! বলা বাহুল্য, এর মধ্যেও নাট্য রচনা—নির্দেশনা এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা এমন কি "রঙ্গনা" থিয়েটারের মালিকানা শর্ত ফিরিয়ে আনার কাজও করে গেছেন তিনি। যাত্রা-জগতের ডাকে পালা-নির্দেশনার কাজও চালিয়ে গেছেন! বর্তমানে 'রঙ্গনার' অন্যতম মালিকের আসনটি ফিরে পেয়েছেন। উপহার দিয়েছেন নাট্য নৈবেদ্য। তার মধ্যে চালিয়ে চলেছেন আজকের দিনের বাঙালির নিজস্ব শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান "গণেশ মেক-আপ"!

গণেশদা বার বার স্বনামধন্য অশোককুমারের কথা বললেন। এক সময়ে অশোককুমার এই গণেশদাকে সঙ্গে করে বম্বের স্টুডিওতে—প্রতিটি বড় মাপের শিল্পীর কাছে নিয়ে গেছেন। দেবানন্দ তখন ইম্পার সম্পাদক। তিনি গণেশদার মেক-আপ থেকে ১০ হাজার টাকার মেটিরিয়ালস্ কিনলেন! কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনার কথাও জানতে পারলাম তাঁর কাছ থেকে। বললেন,—"আমার অনেক আগে সন্তোষবাবু নামে একজন আবিষ্কারক প্রস্তুত করেছিলেন মেক-আপ টিউব। কোম্পানির নাম রেখেছিলেন "সাইনিং টিউব"। সেটা তিনি পেটেন্ট না করায় একাধিক ব্যক্তি "সাইনিং টিউব" বাজারে বার করলেন। সন্তোষবাবুর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবার মুখে। একদিন সেই সন্তোষবাবুকে চেষ্টা করলাম নতুন করে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, প্রাচীনত্বের ঐশ্বর্য দিয়ে নকলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। সন্তোষবাবু তাই করলেন। আবার তৈরি করলেন "টিউব"। নাম দিলেন "ম্যাকসোনা"। এখন এই "ম্যাকসোনা" টিউব আপন সৃষ্টি, বিশ্বাসঘাতক 'সাইনিং'কে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। তাই যায়। পাপ যেমন চাপা থাকে না, নকল তেমনি নকলই থাকে!"

গণেশবাবু পুরদস্তুর বাঙালি। সত্যিকারের প্রতিভাবান। তাই ভয় হয় গণেশবাবুর কীর্তির জয়গান হয়তো কোনদিনই গাইবে না সরকারি মহল! তাঁর মর্মর মূর্তি গড়বে না কেউ! তিনি বাঁচবেন চির জন্মের মত সাধারণ মানুষেরই অন্তরে।

॥ মেক-আপ শিল্পী বা প্রতিষ্ঠান ॥

আজকের যাত্রায় অধিকাংশ শিল্পীরা নিজেরাই মেক-আপ নিয়ে থাকেন। কিন্তু এমন কিছু স্পেশাল মেক-আপ আছে, যার জন্যে যে বিখ্যাত মেক-আপ শিল্পী এবং মেক-আপ প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নেওয়া হয়। তাঁরা হলেন, সুজিত মণ্ডল, নিশিকান্ত গিরি, সাত্তার, দি মেক-আপ, অজন্তা-চিত্রালয় (উড়িষ্যা) এবং শক্তি সেন।

॥ নৃত্য পরিচালনা ॥

অতীতে যাত্রার প্রধান অঙ্গ ছিল গান। নৃত্য ছিল অপরিহার্য। বর্তমান যাত্রায় সেই গান ও নৃত্য অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। তবুও যাঁদের নৃত্য নির্দেশনায় আজকের অনেক পালাগানের নৃত্যাংশ মন জয় করে, যাত্রার সঙ্গে জড়িত অনেক অভিনেতা ও অভিনেত্রী যাঁদের কাছে নৃত্যে তালিম নিয়ে নৃত্যে পারদর্শী হয়েছেন, সেই নৃত্য নির্দেশকদের তালিকা এই রকম ঃ কেনেথকুমার কনকলতা, চিত্তশংকর, সত্যশংকর, পার্থসারথি, মুকুল পোদ্দার, প্রেমব্রত, পান্নালাল মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ রক্ষিত, সঞ্জীবকুমার, লীনা চক্রবর্তী, প্রিয়াঙ্কা ঘোষ। এ ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখ্য, কনকলতা এবং লীনা চক্রবর্তী দু'জনেই যাত্রার সুপ্রতিষ্ঠিতা অভিনেত্রী, যাঁরা নৃত্যে বিশেষভাবে পারদর্শিনী। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা দরকার শম্ভু ভট্টাচার্যের মত নৃত্যবিদও এই যাত্রাকে যেমন কৃতার্থ করেছেন, তেমনি যাত্রা শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা তাঁর নৃত্যে শিক্ষিত হয়েছেন তাঁরাও ধন্য।

এখানে একটু **শম্ভু ভট্টাচার্যের** কথা বলি।

১৯৭০ সালের মাঝামাঝি সময়ে মাসিক 'প্রসাদ' পত্রিকা যখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে তখন ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেসে প্রসাদ দপ্তর। ঐ সময়ে এই প্রতিবেদকের কাছে হামেশাই যাঁবা আসতেন, আড্ডা জমাতেন, জীবন ও সৃষ্টির কথা বলতেন, এবং প্রসাদের কল্যাণে যাঁদের কথা তখন কিছু না কিছু ছাপার অক্ষরে তুলে ধরতে পারতাম, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ডি.জি), পূর্ণদাস বাউল, অজিত পাণ্ডে, সন্তোষকুমার ঘোষ (আনন্দবাজারে যাবার পথে ঘুরে যেতেন), সাংবাদিক সরোজ সেনগুপ্ত, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় [এঁদের ওপরে যখন আমরা বিশেষ সংখ্যা করি, তখন ইণ্ডিয়ান মীরর স্ট্রীটের দপ্তরে ভানুদা এসেছেন হামেশাই, সৌমিত্রদা মাত্র একদিন], বিকাশ রায়, আজকের ফিল্ম ডিরেকটর অঞ্জন চৌধুরী, প্রখ্যাত ডিরেকটর বিজয় বসু, নারায়ণ চৌধুরী ছাড়াও যাত্রার শিব ভট্টাচার্য, তপন গাঙ্গুলী, থেকে স্বনামধন্য শম্ভু ভট্টাচার্য। আমার সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক যত মধুরই হোক, আসলে ওঁদের আগমনে নিজে ধন্য হতাম। 'রাণার' কবিতাকে নৃত্যের মাধ্যমে দৃষ্টি ও হৃদয়নন্দন করে চতুর্দিকে একটা তোলপাড় কাণ্ড যিনি ঘটিয়েছিলেন, গণনৃত্যের ক্ষেত্রে যে মানুষটির অবদান, বিনয় রায় এবং শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় তৈরি 'নবান্ন' নাটকে যাঁর নৃত্যাংশ বিস্মৃত হবার নয়, যে শম্ভুবাবু তখনই একাধিক ছবিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সেই শম্ভু ভট্টাচার্য বোধ করি যতবারই এসেছেন (২।৩ বার হতে পারে) ততবারই তাঁর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি নতুন নতুন সংবাদ।

পরিশেষে এই অনন্য রূপকার যাত্রাপালায় নৃত্য নির্দেশনার কাজও করেছিলেন। সে মাত্র একবারই।

তেমনি এক সময়ে **প্রভাত হাজরার** মত নৃত্যশিল্পীর নৃত্য নির্দেশনাতেও তৈরি হয়েছিলেন যাত্রার অনেক অভিনেত্রী, অভিনেতা।

॥ যাত্রার স্থির চিত্রগ্রাহক ॥

আজকের যাত্রায় স্থির চিত্রের একটা গুরুত্ব অবশ্যই আছে। স্থির চিত্রের গুরুত্ব চল্লিশ বা পঞ্চাশের দশকেও যে ছিল, তা বোঝার মত জ্ঞানের খুবই অভাব ছিল তখন। সেই অজ্ঞানতাই আজ অতীত যাত্রার কোন স্মৃতিই ধরে রাখতে পারেনি, আর এই কারণেই জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে অনেক স্মরণীয় যাত্রা-ব্যক্তিত্ব আপশোস করেছেন। তাঁরা স্বীকার করে গেছেন, অতীতে বিভিন্ন যাত্রা আসরে আঞ্চলিক অনেক সখের ফটোগ্রাফার যাত্রার ছবি তুলতেন, অনেকে সখের খাতিরে ও ব্যক্তিগতভাবে ছবি তুলতেন। হ্যাজাকের আলোয় ছবি ভাল হবে না আশঙ্কায় ঐ আঞ্চলিক ফটোগ্রাফাররা অনেক সময়ে এঁদের অনুরোধ জানিয়ে সূর্যের আলোতেও, পোশাক পরিয়ে কিছু কিছু ছবি তুলে নিতেন। পরিতাপের বিষয়, যাঁরা তুলতেন তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়েও সেই ছবির কপি দিতেন না। আবার যাত্রাওয়ালাদের যাযাবর জীবন বলে ছবি সংগ্রহ করাও মুস্কিল হতো। আর একটা বড় অন্তরায় ছিল ঘরের আপনজনরা। তারা গাঁয়ের যোগীকে ভিক্ষা দিত না। অর্থাৎ যিনি বাইরের জগতে যতই বিখ্যাত হোন, ঘরে তাঁর আদর ছিল গৌণ। তা ছাড়া, তখন যাত্রায় বিশেষ বিশেষ বড় বড় শিল্পীরা যা ব্যবহার করতেন, বাড়ির বিখ্যাতজন যা ব্যবহার করতেন, তা যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে কদর পাবে এমন বোধই ছিল না কারও মধ্যে। এই চেতনা বোধের প্রকাশ ঘটতে শুরু করে মূলত ষাটের দশকের গোড়া থেকে। শোভাবাজার রাজবাড়িতে যাত্রার উৎসব, রবীন্দ্রকাননে যাত্রা উৎসব থেকে। কিন্তু তখনও কেউই এ ব্যাপারে কোন গুরুত্ব আরোপ করতেন না। যাত্রার আদি ফটোগ্রাফার বলতে অবশ্যই তখনকার চিত্র গ্রাহকদের বোঝায়। এমন কয়েকজন আদি ফটোগ্রাফারের নাম যাত্রা সম্রাজ্ঞী জ্যোৎস্না দত্তের মনে আছে। যেমন, অলোক

মিত্র, মীরেন অধিকারী, তারাপদ ব্যানার্জী, কলকাতার বাইরে থাকত একজন যাঁর নাম শ্রীমতী দত্ত মনে করতে পারেননি। মীরেন অধিকারী তৎকালে রঙ্গমঞ্চের জগতে ছিলেন একচ্ছত্র অধিপতির মত। অলোক মিত্র এবং তারাপদ ব্যানার্জী ছিলেন মূলত তৎকালীন বিখ্যাত কিছু মাসিক এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকার সঙ্গে জড়িত সিনেমা জগতের আলোকচিত্রী, হেমেন মিত্রের মত সুবিখ্যাত ফটোগ্রাফারও পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে যাত্রার কিছু ছবি তুলেছিলেন। যাত্রার ছবি তুলেছিলেন অজিত গোস্বামী, মতিলাল মণ্ডল, অর্ধেন্দু (যাত্রা পাড়ায় বাড়ি) এমন কি গৌতম রায় (দোল) আরও অনেকে। এঁরা কখনই যাত্রার ফটোগ্রাফার হয়ে বাঁচার বা যাত্রা ব্যবসা থেকে ছবির বিনিময়ে প্রভূত অর্থের অধিকারী হওয়ার স্বপ্নও দেখেন নি। এমন কি সিনেমা জগতের আলোকচিত্রী হয়ে জীবন কাটাতেও চাননি। এঁরা ফটোগ্রাফীর পৃথিবীতে স্মরণীয় ছবির জন্য প্রতিমুহূর্তে উত্তরণের পথ খুঁজেছেন। এগিয়ে গেছেন। সম্মানে-খ্যাতিতে সর্বক্ষেত্রে, সংবাদ দুনিয়ায় বিশেষ মর্যাদার আসনটিও শেষ পর্যন্ত জয় করেছেন।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে অথবা প্রায় গোড়ার দিক থেকে সাংবাদিক প্রবোধবন্ধু অধিকারীর প্রায় হাত ধরে যাত্রায় প্রবেশ করে, শ্রীঅধিকারীর স্নেহছায়ায়, পরামর্শে একটু একটু করে যে ফটোগ্রাফার অতি অল্প সময়ের মধ্যে যাত্রা পাড়া, যাত্রা ব্যবসা, যাত্রার শিল্পী-কর্মীদের পাল্‌সটি ধরে ফেলেছিলেন, তিনি রবি দাস। সামান্য অবস্থা থেকে এই যাত্রার দৌলতে বছর কয়েকের মধ্যে শ্রীদাস যাত্রার বিশাল ক্ষেত্রে চরম আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছিলেন। যাত্রা থেকে প্রভূত অর্থ উপার্জন করে, যাত্রা ব্যবসায় সেই অর্থ বিনিয়োগ করে অর্থ বানাবারও স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেখানে তিনি কতটা কৃতকার্য হতে পেরেছেন তা ব্যক্তিগতভাবে জানেন, কিন্তু বাইরের জগত উপকৃত হতে পেরেছে তাঁর ৩০ বছরের পুরাতন ফটোগ্রাফীকে সযত্নে রক্ষা করার জন্য। শ্রীদাসের চিত্রে বিগত ৩০ বছরের ইতিহাস রচনা করা যায় অনায়াসে!

অথচ চিৎপুরের বৃহত্তম যাত্রা জগতের পাশেই, শোভাবাজার অঞ্চলে গড়ে ওঠা, আজকের বিখ্যাত আলোকচিত্রশিল্পী বা চিত্র সাংবাদিক টুলু দাসও যাত্রাকে রবি দাসের মত বুঝে নেবার চেষ্টা করেননি তৎকালে। তবে টুলু দাস এবং তাঁর যোগ্য ভাই ঢুলু দাসের জ্ঞান চক্ষু খোলার পর থেকে ওঁদের পৈতৃক ছবির দোকানটি ধীরে ধীরে পেযেছে যাত্রা জগতের নানা পৃষ্ঠপোষকতা। সেই সূত্রে টুলু দাস তাঁর সিনেমা ও সাংস্কৃতিক জগতে আলোক চিত্রের কর্মব্যস্ততার মধ্যে, যাত্রায় আধিপত্য বিস্তার করেছেন ধীরে ধীরে! যাত্রার ছবি তোলার সঙ্গে নিজেদের ফটোগ্রাফী স্টুডিওকে শুধু যাত্রার পোষ্টার ডিজাইনের স্টুডিওতে রূপান্তরিত করেননি, বিভিন্ন যাত্রা দলের পোষ্টার ডিজাইন থেকে পোষ্টার-হ্যাণ্ডবিল ইত্যাদি ছেপে দেবার কাজটাও চালিয়ে গিয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন করে, পরিশেষে ঢুলু দাস সরাসরি যাত্রা দলের প্রযোজক হয়েছেন। সঙ্গে যাত্রার স্টিল ফটোগ্রাফীর ব্যবসাও চালু রেখেছেন।

যাত্রা পাড়ার স্থির চিত্র তুলতে এক সময়ে যাত্রা পাড়ায় যে রতন পোদ্দারের আবির্ভাব ঘটেছিল, অল্প সময়ের মধ্যে যে কোন কারণেই হোক তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা দিতে পেরেছেন। বিভিন্ন দলের পোষ্টার ইত্যাদি ছেপে অর্থ উপার্জন করার পথ করেছেন সুগম। সঙ্গে কিছু দলের স্থির চিত্র তোলার কাজও বজায় আছে।

যাত্রা দলের স্থির চিত্র তোলার কাজে আর একজন নিজেকে নিয়োজিত করেছেন, তিনি বাবু ঘোষ। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনিও এই ব্যবসায় সাফল্য অর্জন করেই কিছু কিছু দলে অর্থবিনিয়োগের কাজও করেছিলেন পাশাপাশি।

স্থির চিত্র গ্রহণ করতে যাত্রাপাড়ায় মতিলাল মণ্ডল, রজত বাগচী, সুমিতকুমার, গৌতম রায়

(দোল) এবং আরও কিছু ফটোগ্রাফারের আবির্ভাব ঘটেছিল। পরিতাপের বিষয়, এঁরা এক একজন দক্ষ ফটোগ্রাফার হয়েও এই জগতে বেশি দিন টিকতে পারেননি!

এঁদেব মধ্যে স্বনামখ্যাত আলোকচিত্রী নিমাই ঘোষ, তারাপদ ব্যানার্জী আমন্ত্রিত ফটোগ্রাফার হিসেবে মাঝে মধ্যে নট্ট কোম্পানি এবং আরও দু'একটি প্রথম শ্রেণীর যাত্রা দলের স্থির চিত্র তুলেছেন।

॥ স্থির চিত্রের প্রয়োজনীয়তা ॥

চলচ্চিত্র জগতে স্থির চিত্রের প্রয়োজনীয়তা অশেষ। স্টুডিওতে নির্মীয়মাণ ছবির সেট, মেক আপ, কস্টিউমস্ এমন কি অভিব্যক্তির কণ্টিনিউটিকে ধরে রাখার জন্য স্থির চিত্রের প্রয়োজনীয়তা আছে। বিভিন্ন চিত্রগৃহের লবিতে দর্শক আকর্ষণের জন্য স্থির চিত্রের গুরুত্ব অনেক। ব্যানার-হোর্ডিং -প্রেস লে আউট, পোষ্টার, হ্যাণ্ডবিল এবং বুকলেট ইত্যাদির জন্য স্থির চিত্র অপরিহার্য। এড্‌নালবেঞ্জ, পিকস্ ইত্যাদি প্রখ্যাত স্টিল ফটোগ্রাফী স্টুডিওগুলো উপরোক্ত কাজের জন্য স্টুডিওতে ছবি তোলার ব্যাপারে একেবারে গোড়া থেকেই নিযুক্ত হন। প্রযোজক-পরিবেশক বা উভয় পক্ষের প্রচারবিদের নির্দেশ ও মাপ মত উক্ত কোম্পানিগুলি স্থির চিত্রগুলি সাপ্লাই করেন। বিভিন্ন স্টুডিওতে, অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার বহু ফটোগ্রাফার সিনেমা সংক্রান্ত ছবি তুলে পাবিশ্রমিকের বিনিময়ে পত্র-পত্রিকায় সাপ্লাই করেন।

এক সময়ে চলচ্চিত্রের প্রযোজকরা ছবির প্রাক্ প্রচারের জন্য ফটোগ্রাফার নিযুক্ত করতেন। তাঁরা ছবি তুলে সেই ছবি নিয়ে যেতেন সংবাদপত্রে এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার দপ্তরে। বিভাগীয় সম্পাদকরা সেই ছবির বাণ্ডিল থেকে প্রয়োজনীয় ছবি বেছে নিতেন। কাগজে প্রকাশ করে ছবির সংবাদ বা প্রাক্ প্রচার দিতেন।

যাত্রার প্রযোজকরা গদি ঘরের শো বোর্ড সাজানো আর পোষ্টার তৈরির জন্য স্থির চিত্রগ্রাহক নিযুক্ত করেন। এঁরা অর্ডার মত ছবি সাপ্লাই করেন, টাকা পান কিন্তু প্রযোজকের স্বার্থে সেই ছবি নিজেরা উপযাচক হয়ে কোন সংবাদপত্রের দপ্তরে পৌঁছে দেন না। দু'একজন বিজ্ঞাপন সংগ্রাহক যাত্রার মালিকদের কাছে আপন কর্তব্যের নমুনা দেখাতে দু' একটি টপ শিল্পীর ছবি যাত্রার দল থেকে নিয়ে গিয়ে ছেপে দেন। ওয়ার্কিং স্টীল ফটোগ্রাফী বিশেষ ছাপাই হয় না। মোদ্দা কথা, যাত্রার স্থির চিত্র গ্রাহকদের যাত্রার ছবি তোলা, সেই ছবি ছোট-বড় করে নিজেরাই কেটে কুটে পোষ্টারে সেঁটে, ছোট ছোট বোর্ডে লাগিয়ে গ্রাম-গঞ্জের নায়েকদের আকৃষ্ট করার কাজ করে শুধু অর্থ রোজগারের পথ করেন। যাত্রা প্রযোজকের বা পালার কল্যাণে কীভাবে ফ্রি পাবলিসিটি করা যায়, তার চেষ্টা করেন না। এই বিশাল ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রচারবিদের কোন দাম নেই। পদ্ধতি গত কোন প্রচার কর্ম প্রসঙ্গে এই মালিকদের কোন জ্ঞানই নেই।

॥ বিবিধ ভারতী ও ক্যাসেট বিজ্ঞাপনের প্রচারক ॥

এই কর্মকাণ্ড যাঁরা দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে সম্পাদন করে চলেছেন, যাত্রার এই প্রচার কর্মের ভিতর দিয়ে যাঁরা ইতিমধ্যে অর্থনৈতিক সাফল্যে পৌঁছে গিয়ে, সেই সাফল্য বিনিয়োগ করে অল্প কয়েক বছরের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন, তেমনি গোষ্ঠী থেকে কে প্রথম যাত্রার প্রচারের এই দিকটা তুলে ধরেছিলেন, কে এই প্রচার পথের পথিকৃৎ, সে বিষয়ে চুল চেরা গবেষণা চালিয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিলে তা নিয়ে বিতর্ক অবধারিত। সকলেরই দাবী পথিকৃতের। তবুও ইতিহাসের খাতিরে যে মতবাদ পেশ করা যায় তা হলো, আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের "বিবিধ ভারতী", কলকাতা ক' কেন্দ্রের মত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র থেকে যাত্রাপালার প্রচার পথিকৃৎ হিসেবে "নট্ট কোম্পানি'র নাম সর্বাগ্রে প্রকাশ করা যায়। সেই সূত্রে এর প্রচারক, উপস্থাপক এবং পরিচালক হিসেবে প্রথমেই চিহ্নিত করা যায় কৌশিক ভদ্র নামটি। যাঁর আসল নাম নির্মল ভদ্র। নির্মলবাবু এই

ধরনের প্রচার মাধ্যম তৈরি করার আগে দীর্ঘ কয়েক বছর সহকারী চিত্রপরিচালক হিসেবে কাজ করেছিলেন। সেই জীবন থেকে অবসর নিয়ে নির্মলবাবু প্রকাশক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। সেই প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রথম 'বিবিধ ভারতী'তে নট্ট কোম্পানির প্রচার করেন কৌশিক ভদ্র। প্রকাশনার দুয়ার বন্ধ করে নিজের নামটিও বদল করেন। তারপর থেকে এক যোগে বহু যাত্রাদলের প্রচার চালিয়ে অল্প কয়েক বছরের মধ্যে খ্যাতি অর্জন করেন। অর্থনৈতিক চেহারাও উজ্জ্বল করেছেন।

এই কৌশিক ভদ্রের সমসাময়িক উদয় বসু। বেশ কয়েক বছর নট্ট কোম্পানিতে কাটিয়ে কৌশিকবাবু অন্য দলের সঙ্গে যুক্ত হলে সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করেন উদয় বসু। উদয়বাবুর অল্প সময়ের মধ্যে যাত্রা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল বেতার উপযোগী কণ্ঠস্বর। এ ছাড়া প্রচার পাণ্ডুলিপি তৈরি, রেকর্ডিং, সম্পাদনার ব্যাপারে তাঁর মুন্সিয়ানা ছিল যথেষ্ট। উদয়বাবুও এক সময়ে নট্ট কোম্পানির বন্ধন মুক্ত হয়ে যাত্রা পাড়ায় ছড়িয়ে পড়েন। এক যোগে একাধিক যাত্রাপালার সঙ্গে বহু চলচ্চিত্র পরিবেশক প্রতিষ্ঠানের 'বিবিধ ভারতী' প্রচার চালিয়ে যেতে থাকেন।

এরই মধ্যে একে একে অনেকেরই আত্মপ্রকাশ ঘটে। তার মধ্যে বিশেষভাবে স্থায়ী জায়গা তৈরি করে নিতে সক্ষম হন, আপন দক্ষতায় কল্যাণসুন্দর। বেতার প্রচারের সব চাইতে বড় দিক হলো কণ্ঠস্বর। কল্যাণসুন্দরের এবং তাঁদের স্টাফদের সকলেরই আছে কণ্ঠ সম্পদ। এ ছাড়া যাত্রায় এসেছেন, বেতারে পণ্যের প্রচারে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন অনেকেই, তার মধ্যে সমীরণ ব্যানার্জী যথেষ্ট চাহিদা সৃষ্টি করেন বটে, কিন্তু অরুণাভ গাঙ্গুলী ও অপর্ণা গাঙ্গুলী স্থায়ী হতে পারেননি।

এর মধ্যে বেতারে পণ্যের প্রচারের ক্ষেত্রে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন শ্রাবন্তী মজুমদার এবং তাঁর ইউনিট। এই ইউনিটের রেটও ছিল বেশি, তার কারণ স্বনামখ্যাত কণ্ঠশিল্পী শ্রাবন্তীর সুললিত কণ্ঠস্বর। পণ্যের প্রচারে নিজের গলার গানের অংশ, নিজেদের রেকর্ডি স্টুডিওর বিদেশী যন্ত্রপাতি ইত্যাদি এই প্রতিষ্ঠানের চাহিদা বাড়ায়, কিন্তু যাত্রায় স্থায়ী হতে পারেননি। মূলকথা, যাত্রাকে এঁরা কেউ হৃদয় দিয়ে ভালবাসতে আসেননি। এলে তার নজির এই ইতিহাসের পাতায় রাখা যেত। এঁরা এসেছেন, জয় করেছেন, আয় করেছেন ব্যস্।

॥ যাত্রার যানবাহন ॥

যাত্রা ব্যবসার প্রকৃত মেরুদণ্ড হলো যানবাহন!

এক সময়ে যাত্রাগান আসরে আসরে পৌঁছে যেত নদী পথে। বজরা, ছাউনি দেওয়া নৌকা ইত্যাদি। মতিলাল রায় থেকে অনেকেরই ছিল নিজস্ব নৌকা। নট্ট কোম্পানির ছিল দোতলা বজরা। নৌকা থেকে বাকস্ প্যাঁটরা নামিয়ে কাছে পিঠে আসর থাকলে দলের কর্মীরা মাথায় করে সব পৌঁছে দিত আসরে। নদী ঘাট থেকে আসরের দূরত্ব বেশি হলে বড় বড় শিল্পী থেকে বাকস্ প্যাঁটরা আসরে যেত গরুর গাড়িতে। রেলে চেপে যাত্রা করতে যাওয়া তো ছিলই। পায়ে হেঁটেও অনেক অধিকারী যেতেন পালা গাইতে সদলবলে।

শহর কলকাতায় যাত্রাদলের বাকস্ প্যাঁটরা যেত ঠেলা গাড়িতে আর দলের শ্রেষ্ঠ নটেদের মধ্যে কেউ কেউ আসরে যেতেন ঘোড়ার গাড়িতে। এই সময়ে একাধিকবার ফণিভূষণ মতিলালকে (ছোট ফণিবাবু) সর্বোচ্চ সম্মান দিয়ে পাল্কীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

এরপর এলো চার চাকার যুগ। লরীর যুগ। লরীতে ত্রিপলের ছাউনি করে যাত্রার শিল্পী-কর্মী-বাক্স প্যাঁটরা যেত যাত্রা করতে। এই লরীর যুগ বেঁচে ছিল অনেক বছর। প্রসঙ্গ ক্রমে বলে রাখা দরকার, যাত্রার পরিভাষায় "নদী পারের গাহনা" ছিল বরাবরই। এর অর্থ, বিশাল বিশাল নদী পার হয়ে গ্রাম-গ্রামান্তরে যাত্রা করা বারবরই ছিল। এখন এর পরিধি বিস্তার লাভ করেছে। বর্তমানে এ ব্যাপারে নদীপারের গান যাঁরা করান তাঁরাই ব্যবস্থা করেন স্টীমার, ভটভটি ইত্যাদি।

এলো লাকসারি বাসের এবং টপ আর্টিস্টের জন্য প্রাইভেট কারের যুগ।

এক শ্রেণীর মানুষের কাছে এটা একটা স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। যাত্রায় বাস-প্রাইভেট কার ভাড়া দিয়ে, এ ব্যাপারে সরাসরি দালালি করে এক শ্রেণীর মানুষ রাতারাতি ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকলেন। বেশ কিছু মালিক নতুন ব্যবসা থেকে আশাতিরিক্ত মুনাফার লোভে বাসের ব্যবসায় মন দিলেন। যাঁদের একটি বাস নিয়ে ব্যবসা শুরু হয়েছিল, তাঁরা বছর কয়েকের মধ্যে হয়ে গেলেন ২০ থেকে ৩০টি লাকসারী বাস আর ঝক ঝকে নতুন প্রাইভেট কারের মালিক। এই বাসের মালিকরা কেউ কেউ আবার যাত্রায় টাকা খাটাবার কাজে লাগলেন। এ প্রসঙ্গে যাঁর কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে তিনি শিশির চ্যাটার্জী। এই চ্যাটার্জীবাবু যাত্রা থেকে ভাগ্যটাকে যেমন সোনা দিয়ে মুড়ে ফেলতে পেরেছিলেন, তেমনি এক সময়ে এই যাত্রা নামক চোরাবালিতে অনেকটাই তলিয়েও গিয়েছেন বলে শোনা যায়। বিশেষভাবে তলিয়ে যাওয়া শুরু হয় যখন যাত্রা দলের অধিকাংশ মালিকই নিজেরাই এক থেকে একাধিক লাক্সারী বাস আর প্রাইভেট কারের মালিক হতে থাকলেন। যাত্রার মালিকরা যত বাস আর প্রাইভেট কার, পরবর্তী সময়ে যাত্রার প্রয়োজনে ম্যাটাডোর, ডি.সি.এম ইত্যাদির বৃদ্ধি ঘটাতে থাকলেন, ততবেশি এগুলির দেখা-শোনা, এর লাইসেন্স, এর পারমিট, ইত্যাদি যাবতীয় কাজ করবার জন্য একশ্রেণীর মানুষ যাত্রার গদিতে গদিতে শোভা পেতে থাকল। যাত্রার মেরুদণ্ড হলো চার চাকা। এই চার চাকার গুরুত্ব মালিকদের কাছে খুব বেশি এবং গাড়ি প্রসঙ্গে অভিজ্ঞতা কম থাকায় এই বাস মালিক থেকে দালাল এমন কি দলের বিশ্বাসী কিছু কিছু কর্মী পর্যন্ত দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অর্থ বানাবার কাজটি দ্রুত সমাধা করতে থাকলেন।

এই গাড়ি ব্যবসা থেকেই কেউ কেউ যাত্রা দলের মালিক হয়েছেন, কেউ কেউ প্রভূত অর্থ বানিয়ে যাত্রাতে উপযুক্ত লাভজনক শর্তে সেই অর্থ বিনিয়োগ করেছেন। প্রসঙ্গ ক্রমে বলা দরকার, এঁদের কারও কিন্তু পরিণতি সুখকর হয়নি। বেশ কিছু বিচক্ষণ মালিক, সিজ্‌নে বাস, লরী, প্রাইভেট কাজে লাগিয়ে, সিজনের পর বাসগুলোকে বিয়ে, পিকনিক, নানাবিধ অনুষ্ঠানে এমন কি বিভিন্ন রুটে ভাড়া দিয়ে আলাদা ব্যবসা চালু রাখার চেষ্টা করেছেন। কারও কারও বিড়ম্বিত ভাগ্যের পরিহাসে 'যাত্রা' গর্ভেই বিলীন হয়ে গেছে সব।

যাত্রায় বাস-প্রাইভেট কার ইত্যাদি ভাড়া দেবার ক্ষেত্রে যাঁর নামটি সবার আগে মনে আসে তিনি **কাশীনাথ পাল (কাঙ্গালী)**। এর পরেই বা সমসাময়িক হিসেবে যাঁর নাম এসে যায় তিনি হলেন গোরাচাঁদ রায়। তা ছাড়া মনোরঞ্জন সাহা, হরি সিং, বকু মুখার্জী, প্রকাশ ধর, বাবলু রায়, তপন আগস্তি, গৌতম দাস (ঝণ্টু) আরও অনেকে এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন।

হরি সিং কাজ শিখেছিলেন কাশীনাথ পালের কাছে। মনোরঞ্জনবাবুও এক সময়ে কাশীবাবু ও গোরাবাবুর সঙ্গে কাজ করেছেন।

আর বাসের যাবতীয় পারমিটের ব্যাপারে যিনি যাত্রাপাড়ার ঘরে ঘরে একাই একশো হয়ে উঠতে পেরেছিলেন তিনি জগন্নাথ সমাদ্দার।

যাত্রা জীবনের অসামান্য বহু কাহিনী জমা হয়ে আছে এঁদের কাছে।

॥ যাত্রার লং প্লে রেকর্ড এবং ক্যাসেট ॥

পালা	যাত্রা প্রতিষ্ঠান	রেকর্ড নাম্বার	প্রকাশ কাল	রেঃ কোম্পানি
মা মাটি মানুষ	নট্ট কোম্পানি	S/J NL 1016	১৯৭৬	মেগাফোন
মা মাটি মানুষ	নট্ট কোম্পানি	S/J NL 1017	১৯৭৬	মেগাফোন
আমি সুভাষ	তরুণ অপেরা	S/J RL 1002	১৯৭৭	গাথানি
অচল পয়সা	নট্ট কোম্পানি	S/J NLX 1029	১৯৭৭	মেগাফোন
লেনিন	তরুণ অপেরা	S/J RL 1005	১৯৭৮	গাথানি

জয় সন্তোষী মা			১৯৭৮	ই.এম.আই
সোনাইদীঘি	সত্যম্বর অপেরা	ECLP 2594	১৯৭৯	এইচ.এম.ভি
হিটলার	তরুণ অপেরা [রেকর্ড এবং ক্যাসেট]			
ময়লা কাগজ	নট্ট কোম্পানি	S/J NLX 1036	১৯৭৯	মেগাফোন
মীরার বঁধূয়া	অগ্রগামী	S/J NLX 1037	১৯৮১	মেগাফোন
দেবী সুলতানা	নট্ট কোম্পানি	ECST 2628	১৯৮১	এইচ.এম.ভি
দেবী	অগ্রগামী	S/J NLX 1039	১৯৮২	মেগাফোন
বৈজু বাওরা	শিল্পীতীর্থ	S/G RL 1016	১৯৮২	গাথানি
কাগজের ফুল	নট্ট কোম্পানি	S/J NLX 1041	১৯৮২	মেগাফোন
ওগো বিষ্ণুপ্রিয়া	অগ্রগামী	GRL 1027	১৯৮৩	গাথানি
গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম	নট্ট কোম্পানি	JNL 1044	১৯৮৩	মেগাফোন
মা মঙ্গল চণ্ডী	মোহন অপেরা	S/LRBC 2006	১৯৮৪	কিরণ
গান্ধারী জননী	লোকনাট্য	S/LBC 2004	১৯৮৪	কিরণ
কৃষ্ণদাসী পদ্মা	অগ্রগামী	S/LBRC 2005	১৯৮৫	কিরণ
নটী তারাসুন্দরী	অগ্রগামী	S/LBRC 2010	১৯৮৫	কিরণ
বীরাঙ্গনা ঝাঁসির রাণী	অনামিকা	MPL 1003		গাথানি
প্রণয় পিপাসা	উর্বশী অপেরা	PSLP 1523		এইচ.এম.ভি
প্রণয় পিপাসা	উর্বশী অপেরা	PSLP 1524		এইচ.এম.ভি
ব্রজের বাঁশরী	অগ্রগামী	S/LBC 2008	১৯৮৫	কিরণ
শার্দুল জারাক খাঁ	লোকরঙ্গ	S/LBRC 2007	১৯৮৫	কিরণ
সাত টাকার সন্তান	লোকনাট্য	S/LBRC 2016	১৯৮৮	কিরণ
নটী বিনোদিনী	নট্ট কোম্পানি	JNLX 1011	?	মেগাফোন

* এ ছাড়া বহু প্রতিষ্ঠান যাত্রাপালার ক্যাসেট প্রকাশে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। উপরোক্ত রেকর্ড ছাড়াও উপরোক্ত পালার ক্যাসেটও প্রকাশিত হয়েছে।

॥ সমাজ ও জনকল্যাণে যাত্রার অবদান ॥

এই পর্বে প্রথমেই এমন কিছু সৌখিন যাত্রাদলের কথা হাজির করা যাক, যেগুলি শুধু মাত্র নিজেদের অঞ্চলে বছরে একটি বা দু'টি যাত্রাপালা আসরস্থ করেই ক্ষান্ত হয় না। এই সংগঠনগুলির সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে, যা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করার জন্যই সরকারি এবং বেসরকারি নানা সাহায্য ও সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয় না। এঁরা একদিকে যেমন যাত্রার ঐতিহ্য, যাত্রার শৈল্পিক ভাবমূর্তিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে সজীব করে রাখেন, অন্যদিকে সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক বহু কাজ করেন। তবে দুঃখের বিষয়, সম্প্রতি এই ধরনের সংগঠন নানা দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে, বিশেষ করে কলকাতার ব্যবসায়িক যাত্রাদলগুলির রেট-এর দাপটে অবশেষে কিছু কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ১৯৬৪-৬৫ সালে সরকার আর্থিক সাহায্য প্রাপ্ত কয়েকটি গোষ্ঠীর তালিকা এই রকম।

শ্রীমা সারদামনি মহিলা বিদ্যাপীঠ ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ পল্লী, বেহালা, কলকাতা-৩৪।। সর্বমঙ্গলা যাত্রাপার্টি ঃ সর্বমঙ্গলাপল্লী, কলকাতা-৩৪।। সিঁথি পল্লী উন্নয়ন সমিতি, বরানগর, কলকাতা-৫০।। ন'পাড়া মিত্র সংঘ ঃ বরানগর, কলকাতা-৫০।। অগ্রণী পল্লীমঙ্গল সমিতি ঃ দমদম খানপাড়া, কলকাতা-২৮।

সত্তর ও আশীর দশকে সরকারি আর্থিক সাহায্য প্রাপ্ত যাত্রা দল বা সংগঠনের তালিকা ঃ বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আয়োজিত যাত্রা উৎসব ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী যাত্রা

প্রতিষ্ঠান, রামকৃষ্ণ নাট্য বীথি : প্রামাণিক রোড, কলকাতা-৩৬।। সান্ধ্য নাট্য সংঘ : নিমতলা, কলকাতা-৬।। অনামী শিল্পীচক্র : দমদম, কলকাতা-২৮।। জয়কালী সৌখিন নাট্য সমাজ : ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৩১।। সুর ও বাণী : দমদম, কলকাতা-২৮।। বিজয়া নাট্য সমাজ : মানিকতলা, কলকাতা-৬। চেনা অচেনা : শ্যামবাজার, কলকাতা-৪।। ক্যালকাটা ইনস্‌টিটিউট : বড়বাজার, কলকাতা-৭।। নান্দনিক : বেলগাছিয়া, কলকাতা-৩৭।। তারা নাট্যম : বড়বাজার, কলকাতা-৭।। রাজবল্লভপাড়া ব্যায়াম সমিতি : বাগবাজার, কলকাতা-৩।। নারকেলডাঙ্গা সংঘ : বাগমারী, কলকাতা-১১।

এই তালিকার বাইরেও আরও কিছু সংঘঠন বা গোষ্ঠী হয়তো ছিল, কিন্তু তার সন্ধান মেলেনি। এর মূলে নানা গুরুত্বপূর্ণ কারণের মধ্যে কলকাতার যাত্রাদলের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার। অগত্যা এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যেও পরিবর্তন এসেছে। যেগুলি বিনষ্ট হয়নি সেগুলি ভাবনা পাল্টে অন্য ভাবে সমাজ কল্যাণে নিয়োজিত হয়েছে। আবার বিভিন্ন জেলা, মহকুমা স্তরে এমন বহু সংগঠনের হদিশ পাওয়া গেছে, যেগুলি আঞ্চলিক বহু মানুষের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে বটে, কিন্তু কলকাতার পেশাদার যাত্রা দলের যাত্রা করিয়ে তার লভ্যাংশের টাকায় বিস্ময়কর সব সমাজ ও জনকল্যাণমূলক কাজ করার ভিতর দিয়ে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর হয়ে থাকার পথ সুগম করেছে। পরিতাপের বিষয়, এঁদের অনেক কর্মকাণ্ডের সংবাদ প্রকাশে এদেশের সংবাদপত্রগুলির মধ্যে যেমন কোন চেষ্টা দেখা যায়নি, তেমনি মফঃস্বলের সব পত্র-পত্রিকা, আদর্শবাদী লিট্‌ল ম্যাগাজিন এই বিষয়ে আশ্চর্যভাবে নীরব থেকেছে। আঞ্চলিক সাহিত্য-সংস্কৃতি-নাট্য ভাবনা প্রসঙ্গে আঞ্চলিক পত্র-পত্রিকা যত বেশি সোচ্চার হয়েছে ঠিক ততটাই আঞ্চলিক যাত্রা, যাত্রা গোষ্ঠী, যাত্রা শিল্পী এমন কি যাত্রার লভ্যাংশের টাকায় অঞ্চলের কল্যাণে যে গোষ্ঠীর অবদান স্মরণীয়, তাদের ওপরে কোন আলোকপাত করেনি।

ইতিহাসের মর্যাদায় আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং অনেকের সাহায্যে সেই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু গোষ্ঠী বা সংগঠনের সমাজ কল্যাণমূলক কাজের ওপর চিরস্থায়ী আলোকপাত করছি।

॥ হাওড়া জেলার যাত্রা প্রেম ॥

কলকাতার বড় বড় যাত্রাদল বায়না করে মরশুমে এক শ্রেণীর মানুষ যাত্রা ব্যবসা থেকে মুনাফা তোলেন, আর এক শ্রেণীর মানুষ মেদিনীপুর, চাকদার মাঝারি দল আনিয়েও ব্যবসা করেন, কোন কোন ক্লাব বা গোষ্ঠী আঞ্চলিক পূজাপার্বণে ফ্রি গান দিয়ে মানুষের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু দিন অন্তে নিজেদের আনন্দ দিতে, অঞ্চলের, পাড়ার সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে সার্বিক কল্যাণের কথা মাথায় রেখে এঁরাই গড়ে তোলেন ক্লাব বা গোষ্ঠী। বছরে নিজেরা যাত্রা করে, থিয়েটার করে, নানা রকম আনন্দ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, বারো মাসে তের পার্বণের আয়োজন করেন, তা অনুসন্ধান করে যে সব সখের যাত্রা দলের সন্ধান মেলে তার তালিকা এখানে দেওয়া হলো। **জয়পুরবিল :** নয়ীতালিম পাঠশালা।। **ঘোষ পাড়া :** ব্রতী সংঘ।। **উদং :** উদং সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র।। **অনুলিয়া :** অনুলিয়া অগ্রণী সংঘ।। **খাসমহল :** বালিচক শ্রীদুর্গা নাট্য সমাজ।। **জগৎবল্লভপুর :** মহিলা সমিতি।। **বিরামপুর :** দীপমালিকা নৈশ বিদ্যালয়।। **বাগনান :** পাতিনান সোসাল এডুকেশান সেণ্টার।। **রূপসাগরী :** শ্রীশ্রী শীতলামাতা নাট্য সমাজ।। **হল্যান :** হরিজন পল্লী মিলন সংঘ।। **কানুপাট :** কানুপাট পল্লীমঙ্গল নাট্য সমাজ।। **সাঁকরাইল :** রানী নাট্য সমাজ।। **সোনাগাছি :** শিবদুর্গা নাট্য সমাজ।। **গণেশপুর :** ডানপাটিয়া সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র।। **কামতি :** জাহ্নবী এ্যামেচার যাত্রা ক্লাব।। **অনন্তপুর :** বলতাবেড়িয়া পল্লী উন্নয়ন সমিতি।। **আন্দুল মৌরী :** আড়গোড়ী বাণী মন্দির।। **কান্দুয়া :** মহাকালী সমিতি।। **বনহরিশপুর :** সামন্তী রজক পাড়া নাট্য সমাজ।। **বনহরিশপুর :** দক্ষিণবাঁধ মহাপ্রভু নাট্য সমাজ।। **কুলডাঙ্গা :** রাধাগোবিন্দ যুবক সংঘ।।

মহিষরেখা ঃ প্রসাদপুর উত্তরপাড়া যুবক সংঘ।। **বেড়িয়া ঃ** বীরপুর যুবক সংঘ সম্মিলনী।। **নওপাড়া ঃ** মহিষাসুরী ভুবনেশ্বরী নাট্য সমাজ।। **নওপাড়া ঃ** কিশোর সংঘ।। **গাজিপুর ঃ** নেতাজী তরুণ সংঘ।। **নরিত ঃ** কামার গড়িয়া পল্লীমঙ্গল সমিতি।। **জোয়ারগাড়ি ঃ** উত্তরপাড়া নাট্য সমাজ।। **সুমদা ঃ** তরুণ সংঘ।।

এই প্রতিষ্ঠানগুলি জনকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে যাত্রাপালা আসরস্থ করে। সংগঠনগুলি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত।

॥ বেলঘরিয়ার ঐক্যতান ক্লাব ॥

এই ক্লাবের সভাপতি সমর দত্ত ও সম্পাদক হরিপদ দেবের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী বলা যায়, এই সংস্থা প্রতি বছর যাত্রা করায়, যাত্রার লভ্যাংশের টাকায় এই ক্লাবের উন্নতি সাধনের জন্য। ইতিমধ্যে তা অনেকটাই সফল হয়েছে। এর সদস্যরা জলা জমি ভরাট করে তার উপরে গড়ে তুলছেন ক্লাব, বাড়ি। যাত্রা করানো টাকায় সংঘের ব্যায়াম ও খেলাধূলা বিভাগের যাবতীয় সরঞ্জাম যেমন কেনা হয়েছে, তেমনি তৈরি হয়েছে এঁদের পাঠাগার। প্রতি বছর এই ক্লাব দুস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করে। এই পাঠাগারে নবম শ্রেণী থেকে এম. এ ; এম. বি. বি. এস ; আইন ও ইঞ্জিনীয়ারিং সব বই রাখা হয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। এই সংঘের নাট্য বিভাগও শক্তিশালী। ইনডোর-আউটডোর খেলাধূলা, রক্তদান শিবির করার পিছনে যে অর্থ প্রয়োজন হয় মূলত তা যাত্রা করানো টাকা থেকেই আসে!

॥ আরতি কটন মিলস রিক্রিয়েশান ক্লাব ॥

১৯ বছর ধরে উপরোক্ত ক্লাবের যাত্রা কমিটি কলকাতার যাত্রা দল বায়না করে যাত্রা করাচ্ছেন। অতীতে ৮ থেকে ১০ নাইট যাত্রা করানো হতো, এখন সেখানে ৬ নাইট যাত্রা হয়। স্বনামখ্যাত আলামোহন দাশের অন্যতম স্মরণীয় কীর্তি এই বিশাল কটন মিল এখন কেন্দ্রীয় সরকার অধিগ্রহণে এন. টি. সি হলেও ঐ আরতি কটন মিল রিক্রিয়েশন ক্লাবের যাত্রা কমিটি এই যাত্রা উৎসব করে আসছে শ্রমিক কল্যাণের জন্য শুধু না, সমাজ কল্যাণের দায়বদ্ধতা থেকে। হরিসাধনবাবু এই কমিটির প্রথম সম্পাদক হিসেবে বহুদিন কাজ করার পর দ্বিতীয় সম্পাদক হন হরিদাস সাহা এবং বর্তমানে অজয়কুমার আরু। এত বছর যাত্রা করিয়ে তার লভ্যাংশের টাকায় এবং শ্রমিকদের প্রিমিয়ামে তৈরি হয়েছে কো-অপারেটিভ। এই কো-আপারেটিভ সম্পাদকের আসনে অধিষ্ঠিত আছেন হরিসাধনবাবু। যাত্রা করানো লভ্যাংশের টাকায় যে সমাজ ও জনকল্যাণমূলক কাজ ইতিমধ্যে সম্পাদন করেছে এই ক্লাব, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য শিবপুর টি. বি. হাসপাতালে শ্রমিকদের জন্য ২টি বেড সংরক্ষণ, ডাঃ কানাই ভট্টাচার্য কলেজে ৫০০০ টাকা দান, মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৫০০০ টাকা দান, সল্ট লেক স্টেডিয়ামে ২০০১ টাকা চাঁদা, শ্রমিকদের শীল্ডের খেলা, যে খেলায় শীল্ড আলামোহন দাশের নামে আজও চালু আছে। রিক্রিয়েশান ক্লাবের দোতলা বাড়ি, ৬ খানা ঘর। যেখানে সুসজ্জিত ঘরে যাত্রা শিল্পীদের থাকতে দেওয়া হয়। এ ছাড়া ধান চাষ, মাছ চাষ, নারকেল গাছ চাষ থেকে বহু খরচই আসে যাত্রা করানো টাকায়।

॥ খেয়ালী সংঘ (ফলতা) ॥

দঃ ২৪ পরগণার ফলতা থানার মল্লিকপুরে এই 'খেয়ালী সংঘ'। সব দিক দিয়ে আজ এই ক্লাব ফলতার গৌরব। আর এই গৌরব অর্জনের পিছনে আছে এই সংঘের কয়েকজন উৎসাহী যুবকের শ্রম এবং যাত্রা করিয়ে তার লাভের অংশের টাকা। ১৯৫৮ সালে প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী সর্বজন শ্রদ্ধেয় নবকুমার চক্রবর্তীর প্রেরণায়, সত্যচরণ চক্রবর্তী ও শচীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর দান করা জমিতে স্থানীয় জন সাধারণের সহযোগিতায় প্রথম টালি ছাওয়া একটা কুটিরে খেয়ালী সংঘের জন্ম

হয়। অশিক্ষা ও দারিদ্র্য পীড়িত এই মল্লিকপুর অঞ্চলে যখন শিক্ষা প্রসার বা বিস্তারের কোন ব্যবস্থা ছিল না, তখন নবকুমারবাবু নিজে এই খেয়ালী সংঘের বারান্দায় পাঠশালার আকারে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সূচনা করেন। কিছুদিনের মধ্যে ফলতা থানার বিধায়ক খগেন্দ্রনাথ দাসেব চেষ্টায় এই প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারি অনুমোদন লাভ করে। পরে এই খগেনবাবুরই সহযোগিতায় খেয়ালী সংঘের স্বপ্ন একটু একটু করে সার্থক হতে থাকে। সেই পাঠশালা প্রথমে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণী তার পরেই সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত হয়। এরই মধ্যে এই ক্লাবের গড়ে তোলা স্কুল প্রাতঃ কালিন জুনিয়ার হাইস্কুল হিসেবে অনুমোদন লাভ করে। ছাত্র-ছাত্রী বৃদ্ধি পেতে থাকে বলে অচিরেই স্থানীয় লোকেরা চাইলেন একে মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করতে। রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী ও অর্ধেন্দু চক্রবর্তীর ভাইরা বিদ্যালয় সম্প্রসারণের জন্য জমি দান করেন। খেয়ালী সংঘের এই শিক্ষানিকেতনের জন্য এবার প্রভূত অর্থের প্রয়োজন হতে থাকল, অবশেষে যাত্রা করিয়ে তার টাকায় এই বৃহত্তম কর্মকাণ্ড সার্থক হয়। তৈরি হয় পাকা বাড়ি। ১৯৭৫ সাল থেকে এখানে নবম ও দশম শ্রেণী চালু হয়।

এইভাবে যাত্রার টাকায় 'খেয়ালী সংঘ শিক্ষানিকেতন'টি আজ মল্লিকপুর অঞ্চলে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। দুঃখের বিষয় মাধ্যমিক স্তরে সরকারি অনুমোদন পাওয়া যায়নি অনেকদিনের মধ্যে। যাত্রার টাকায় এঁরা যে পাঠাগার তৈরি করেছেন তাতে বর্তমানে আড়াই হাজার বই আছে। এই সংঘ সামাজিক জনকল্যাণ মূলক যাবতীয় কাজে জড়িয়ে পড়ে। এই সংঘের মহিলা সমিতিতে মেয়েদের রান্না, সেলাই নিরক্ষরকে সাক্ষর করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

॥ তাড়দহ রাস কমিটি ॥

১৯৭৬ সালে গঠিত। এই কমিটি প্রতি বছর যাত্রা করিয়ে তার লভ্যাংশের টাকায় অদ্যাবধি গ্রাম উন্নয়ন ও সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করেছে। যাত্রা করানোর লভ্যাংশের টাকায় ইতিমধ্যে এই কমিটির অবদান, খেলার মাঠ, ঘণ্টারাম স্মৃতি পাঠাগার। ১৯৭৮ সালে খরাত্রাণ তহবিলে ৬০০০ টাকা দান, '৮১ সালে তাড়দহ প্রাথমিক স্কুলের জন্য দুটি বড় এবং পাকা ঘর তৈরি, তাড়দহ হাইস্কুলের জন্য ৩টি বড় বড পাকা ঘর, তাড়দহ মিলন সংঘের পাকা বাড়ি তৈরি মানবিক ধর্ম পালনের নজির। এ ছাড়া, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন, এই সংঘ ও কমিটির প্রতি সকলের শ্রদ্ধা দানের কারণ।

কমিটির প্রথম দিকের সভাপতি ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ প্রামাণিক এবং সম্পাদক, নিরঞ্জনকুমার সাহা।

॥ ঠাকুরাণী বেড়িয়া প্রভাত সংঘ ॥

২৪ পরগনাব ক্যানিং থানার অন্তর্গত দাঁড়িয়া গ্রামের অভিজাত ক্লাব ঠাকুরাণী বেড়িয়া প্রভাত সংঘ। এই সংঘের সম্পাদক নির্মল মণ্ডল এবং বিশেষ প্রতিনিধি বাদলচন্দ্র মালীর দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায়, এই ক্লাব, পল্লীর উন্নতিকল্পে প্রতি বছর দু' তিন নাইট যাত্রা করান। কলকাতার পেশাদারি দল বায়না করে এনে, যাত্রা করিয়ে তার লাভের টাকায় ইতিমধ্যে তৈরি করেছেন অনেক কিছু। ক্লাবের পূজাপার্বণ এই টাকায় হয়। ক্লাবের আলমারি এবং আনুষঙ্গিক আসবাবপত্র শুধু নয়, প্রভাত সংঘ নার্সারী স্কুল তৈরি করেছে যাত্রা করানো টাকায়।

॥ চড়িয়াল বয়েজ ক্লাব ॥

ব্যাচেলর রোডে ১৯৭০ সালে বাসুদেব ধাড়ার দান করা জমির ওপরে তৈরি ছিটে বেড়া আর টালির ছাউনির এক ফালি ঘরে এই ক্লাবের জন্ম। পরে অছিপুর ব্রীক ফিল্ডের সনৎ রাণার ইঁট, সুবল মণ্ডলের টালি, গণেশ দাসের কপাট ইত্যাদির সাহায্যে ও আঞ্চলিক সকলের সহযোগিতায় এই ক্লাব পূর্ণতা লাভ করে। এই অঞ্চলে যাত্রা প্রীতি সকলেরই। সেই সূত্রে আঞ্চলিক জনসাধারণের

চিত্তবিনোদনের জন্য কালীপূজা, শিবরাত্রিতে ক্লাবের সদস্যরা সখের যাত্রা উপহার দিতেন। এখানকার সদস্য সংখ্যা শতাধিক তার মধ্যে অর্ধাংশ স্থানীয় জুট মিলের কর্মী। প্রথম প্রথম সদস্য চাঁদার উপর নির্ভর করে যাত্রা ও অন্যান্য উন্নয়ন মূলক কাজ হতো। পরে ক্লাবের উন্নতি ও কিছু সামাজিক কল্যাণকর কাজে অর্থ সংগ্রহ করার জন্য কলকাতার যাত্রা দল আনানো হয়। যাত্রার টাকায় এঁরা দাতব্য চিকিৎসালয় তৈরি করেন। এই ক্লাবের নাট্য বিভাগের সব নাটকেরই নির্দেশক সুবল মণ্ডল। এ ছাড়া বাখরা হাট, চকমানিক, বনরায়পুর, কালীপুর, ওরিয়েণ্ট ইত্যাদি জায়গায় যে সৌখিন দল আছে তাঁদের নাটকেরও নির্দেশক সুবলবাবু।

॥ পূজালী স্বাগতা সাংস্কৃতিক সংঘ ॥

১৯৬৩ সালে এই সংস্থা যখন জন্ম নেয় তখন নাম ছিল পূজালী স্বাগতা নাট্য সংসদ। কেবল নাটক ও যাত্রা অভিনয়ই ছিল ক্লাবের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রথম সম্পাদক ছিলেন শ্রীপাঁচুগোপাল মান্না। বজবজ অঞ্চলের নাট্য আন্দোলনের পথিকৃৎ ঁমণি সেনের নির্দেশনায় '৭৩ সাল থেকে এই সংস্থা নিয়মিত যাত্রা অভিনয় করে আসছে। বর্তমান নাট্য পরিচালক শ্রীরঞ্জন ঘোষ। এই ক্লাবের অধিকাংশ বজবজ ও কালীপুর জুটমিলের কর্মী। এই সংস্থার নিরঞ্জন খাঁড়া ও জয়দেব সাঁতরা চিৎপুরের যাত্রা দলে অভিনয় করেছিলেন এবং এখানকার পরিবেশকে তাঁরা খুব একটা পছন্দ করেন নি। গোটা দঃ চব্বিশ পরগণার মধ্যে এই সাংস্কৃতিক সংস্থার নাম ডাক খুব বেশি।

॥ বজবজের 'যুগযাত্রী' ॥

বজবজ সুভাষ উদ্যান আজ এক ঐতিহাসিক প্রাঙ্গণ। নির্বাচনের আগে ছিল ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক সমস্ত সভার এক উল্লেখযোগ্য স্থান। এই উদ্যান অন্যদিকে খেলাধূলা ও যাত্রা অনুষ্ঠানের জন্যও সুবিখ্যাত। বজবজ 'কুইন সিনেমার' কাছে এই বৃহৎ এবং সর্বজনপ্রিয় ক্লাব 'যুগ যাত্রা'। এই অভিজাত ক্লাবের বিভিন্ন তাক ও আলমারিতে বেশ কিছু কাপ-শীল্ড। অন্যদিকে টি.ভি. সেট, এবং নানাবিধ খেলার সরঞ্জাম। ক্লাবের সম্পাদক শ্রী রাধানাথ দাস, সহ সভাপতি সমীর রায়ের কাছ থেকে জানা গেল, ১৯৫৭ সালে আঞ্চলিক বেশ কয়েকজন উৎসাহী যুবক গড়ে তোলেন এই ক্লাব। ১৯৭৭ সালে রেজিস্ট্রীকৃত। ১৯৮৩ সাল থেকে এ যাবৎ এই সংস্থা কলকাতার বহু পেশাদার যাত্রা দলের যাত্রা করিয়ে তার লাভের অংশে ইতিমধ্যে ক্লাবের ৯০ জন ফুটবলারকে ৩টি স্তরে ভাগ করে ফুটবল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৈরি করেছে। বড়িষা স্পোর্টিং ক্লাবের কোচ্ শ্রীঅমিতাভ ঘোষ এখানকার ফুটবল ট্রেনার। এই ক্লাবের বাবলু প্রামাণিক কালীঘাট 'এ' ডিভিশানে, বিকাশ খাঁড়া খিদিরপুর ও ভ্রাতৃসঙ্ঘে, রবীন হাজরা, বড়িষা স্পোর্টিং-এ, কামালউদ্দীন সুব্রত মুখার্জী কাপে ও কুমার আশুতোষে খেলে ক্লাব ও অঞ্চলের মান বৃদ্ধি করেছেন। ক্লাবের সম্পাদক রাধানাথ দাস মোহনবাগান জুনিয়ারে একদা চুটিয়ে খেলতেন। কার্তিক প্রামাণিক 'পুলিশে' খেলে সম্মান বৃদ্ধি করেছেন। দঃ ২৪ পরগণার টুর্নামেণ্টে শুধু নয়, মেদিনীপুরের মহিষাদলে, রঘুনাথ বাটী, পঃ দিনাজপুরের ইসলামপুর, হাওড়ার উলুবেড়িয়া-আন্দুল আরও বহু জায়গা থেকে এই ক্লাবের সদস্য খেলোয়াড়রা জয় করে এনেছেন পুরস্কার। এই ক্লাব প্রতি বছর রক্ষাকালীর পূজা করে। এর নেপথ্যে আর্থিক প্রয়োজন যা ছিল তা মূলত আসত যাত্রা করিয়ে। আবার সেই যাত্রা দলের উত্তরোত্তর স্বার্থপর ভূমিকায় এই ক্লাব হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত।

॥ বজবজের শক্তি সংঘ ॥

বজবজ কুইন সিনেমার কাছে আর একটি ক্লাব এই শক্তি সংঘ। এই সংঘ প্রতি বছর সুভাষ উদ্যানে কলকাতার প্রথম শ্রেণীর পেশাদার দল আনিয়ে যাত্রা করিয়ে তার লাভের অংকে, 'নবদুর্গা' পূজা এবং অন্যান্য পূজার যাবতীয় খরচ বহন করে। এই ক্লাবের পূজা কমিটির সদস্য

নিশুম্ভচরণ মাইতি, বিশ্বনাথ মাইতি, বিশ্বনাথ দাস জানান শক্তি সংঘের অনেক সামাজিক কল্যাণকর কাজ করার নজিরও আছে।

॥ বাওয়ালী 'সখ্য সংঘ' ॥

বর্তমানের সব পত্র-পত্রিকাই শহরের যাবতীয় খবর ছাপতে ব্যস্ত। একমাত্র গ্রামীণ সংস্কৃতি চর্চা ছাড়া অন্যান্য খবর দৈনিকে অবশ্যই থাকে। ইদানিং খুন, ধর্ষণ, নেতাদের হাঁচি-কাশি সব খবর ফলাও করে ছাপা হয়। কিন্তু গ্রাম-গঞ্জের কোন সাংস্কৃতিক আন্দোলন, কোন নাট্য প্রতিভা, বিশেষভাবে যাত্রা আন্দোলনের কোন খবরই ছাপা হয় না। গ্রামীণ সংস্কৃতির শিল্প সুষমার বহিঃপ্রকাশ অবশ্যই উপেক্ষিত। তেমনি এক সংস্কৃতি চর্চার প্রাণকেন্দ্র, দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাওয়ালীর 'সখ্য সংঘ'।

বজবজ স্টেশন থেকে ৭৬।এ বাসে বাওয়ালী তেঁতুলতলায় নেমে উত্তর দিকে মিনিট পাঁচেক গেলে এই জনপ্রিয়, অভিজাত দোতলা ক্লাব বাড়ি। এর পাশেই বাওয়ালীর জমিদারদের বংশধর চন্দ্রদীপ মণ্ডলের বাগান। এই 'সখ্য সংঘ'-এর সম্পাদক সমর মণ্ডলের কাছ থেকে জানা তথ্যের ভিত্তিতে এই সংঘের ইতিবৃত্ত। একদিন এটি 'বালক সংঘ' ছিল। কয়েক বছর আগে বাওয়ালীর পশুপতি মান্না, সমব মণ্ডল, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, চন্দ্রনাথ দাস, অমবেন্দ্রবাবুরা মিলে এই বালক সংঘ গড়েছিলেন, ছিটে বেড়ার একটা ঘরে। এরপর স্থানীয় বয়স্ক ব্যক্তিরা বিভিন্ন দিক দিয়ে ছোটদের সব ব্যাপাবে উৎসাহ দিয়ে ক্লাবকে বড় কবার ব্যাপারে সাহায্য কবতে থাকেন। এঁদেব মধ্যে বিশেষভাবে স্মবণীয় নাম, অজিত চক্রবর্তী, শৈলেন রায়, শশধরবাবু। এই সময় ক্লাব সদস্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর বাবা নিতাই চক্রবর্তী যে 'দুইশত' জমি ক্লাবকে দান কবেছিলেন তার উপরেই গ্রামবাসীদের সাহায্যে, প্রাইভেট লটাবি প্রকল্পে, নির্মল রায়ের বিশেষ সাহায্যে ক্লাবেব পাকা বাড়ি তৈরি হয়। এরপর চ্যারিটি সিনেমা ও সদস্যদের স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পর মাধ্যমে সখ্য সংঘেব দোতলা বাড়ি তৈবি হয়। ১৯৪৬ সালের ১৫ আগষ্ট থেকে সংঘ বিভিন্ন সমাজ ও জনকল্যাণমূলক কাজ শুরু করে। তৈরি করে গ্রামের রাস্তা। দুস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের বই পত্র-খাতা দেওয়া, গ্রামবাসীবা বিপদে পড়লে তাদের পাশে দাঁড়ানো ক্লাবের আদর্শ হয়ে ওঠে। এঁরা গড়ে তোলেন পাঠাগার। যে পাঠাগারে প্রায় ১৫০০ শত বই আছে। মেঘনাদ চক্রবর্তী ক্লাবের সাংস্কৃতিক দিকটা পরিচালনা করেন। ক্লাব নাচ-গান শেখায়। নাটক ও যাত্রাপালা উপহার দেয়। মেঘনাদবাবু নিজে একজন আঞ্চলিক দক্ষ অভিনেতা। এ ছাড়া সুঅভিনেতা হিসেবে পরিচিত এই ক্লাবের আনন্দ মান্না, শঙ্কর দাস, সজল মণ্ডল। এঁদের কাছ থেকে জানা যায়, আঞ্চলিক পেশাদার শক্তিময়ী অভিনেত্রী হলেন পদ্মিনী, বীণা দত্ত। এই ক্লাব নানা খেলাধূলা ও যোগব্যায়ামে বিশেষভাবে খ্যাত। খো খো-তে বিশেষ বৃত্তি প্রাপ্ত প্রসেনজিৎ এই ক্লাবের সদস্য। ১৯৭০ সালের ১৪ মার্চ ক্লাবের রজত জয়ন্তী উৎসবে সভানেত্রী ছিলেন ডঃ রমা চৌধুরী। ৪১ তম উৎসব কমিটির সভাপতি ছিলেন গোপাল চক্রবর্তী ও সম্পাদক ছিলেন অশোক মান্না।

এই সংঘের ছেলে-মেয়েদের যোগ ব্যায়াম শেখান নীতিশ রায়। স্থানীয় সংগীত শিল্পী, এবং অন্যান্য প্রতিভার সন্ধান করে, তাঁদের এই 'সখ্য সংঘ' আনুষ্ঠানিক সম্বর্ধনা দিয়ে থাকে। সংগীত শিল্পী নিতাইচাঁদ মণ্ডল এবং আরও অনেকে ইতিমধ্যে তাঁদের প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ এই সংঘের সদস্যদের দ্বারা সম্বর্ধিত হয়েছেন।

॥ বসিরহাট স্মৃতি সংঘ ॥

সভাপতি প্রণব ঘোষ ও সম্পাদক দীপক বসু জানিয়েছেন, সংঘ ও অঞ্চলের গঠনমূলক কাজের খরচ চালাবার জন্য আর্থিক প্রয়োজন মেটাবার তাগিদে এঁরা যাত্রা করান। ইতিমধ্যে 'যাত্রা করানো টাকায় এঁরা দু' কামরা বিশিষ্ট পাকা বাড়ি করেছেন, পাঠাগার তৈরি করেছেন। তা ছাড়া

মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় এই সংঘ খেলাধূলায় অংশ নেয়, সামাজিক কিছু কিছু কল্যাণমূলক কাজ করে থাকে। এ সব কিছুরই মূলে টাকা আসে যাত্রা করিয়ে।

॥ কোন্নগর মিলন সংঘ ॥

কোন্নগর রেল স্টেশনে নেমে পূর্বদিকের ব্যস্ত রাস্তাটি ধরে মিনিট সাত-আট হাঁটলে যে সাংস্কৃতিক সাইন বোর্ড চোখে পড়বে তার নাম 'কোন্নগর মিলন সংঘ।'

সামান্য তের টাকা ভাড়ার একটা ঘরে যে সংস্থার জন্ম হয়েছিল, সেই ক্লাবই আজ লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তির অধিকারী। এই সাংস্কৃতিক সংগঠনের সম্পাদক বরুণ তরফদারের কাছ থেকে জানা গেছে জনমুখী প্রকল্পগুলির কথা। সংস্থার নিজস্ব বাড়ির জন্য জমি কেনা, বাড়ি তৈরি করা, গ্রন্থাগার গড়ে তোলা, গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পাঠ্য পুস্তক তুলে দেওয়া, দুর্গাপুজোয় দুস্থ জনদের মধ্যে নতুন জামা-কাপড়, কম্বল বিতরণ করা, ইনডোর খেলাধুলোর ব্যবস্থা চালু করা, টেবিল টেনিস প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে যাত্রা করানো টাকায়। ১৯৬৮ সালে এই ক্লাব বা সংগঠন "হিটলার" পালার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করার সূত্রপাত করে।

স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে গঠনমূলক কাজের জন্য এই সংস্থার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল।

॥ শ্রীপুর স্টাফ ক্লাব ॥

এই ক্লাবের যাত্রা কমিটির সম্পাদক অসিত মুখার্জী এবং মূল ক্লাবের সম্পাদক অশোক গুহের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম, যাত্রা করিয়ে তার টাকায় আসানসোল-রাণীগঞ্জের একটি অঞ্চলকে কতটা জনকল্যাণ কাজে ভরিয়ে তুলেছেন। ১৯৭৬ সালে মাত্র তিন রাত শো করিয়ে এই ক্লাব প্রথম সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করার শপথ নিয়েছিল।

প্রাথমিক স্তরে অগ্রগামীর 'রাইকমল' পালা এই কমিটির উদ্দেশ্যকে অনেকটাই সার্থক করেছিল।

শ্রীপুর শিশু বিদ্যালয় এই ক্লাবের প্রথম জনকল্যাণ মূলক অবদান যা যাত্রা করিয়ে তার টাকায় গড়া হয়েছিল। প্রথম খনি অঞ্চলে যে কটি দুর্গাপুজো হয় তার মধ্যে শ্রীপুর স্টাফ ক্লাবের পুজো এবং মণ্ডপ সজ্জা যেমন উল্লেখযোগ্য তেমনি কস্টলি। এই মহাপুজোর যাবতীয় বাসন যা ক্লাবের সম্পত্তি হিসেবে চিহ্নিত, এ গুলি কেনা হয়েছিল যাত্রার টাকায়। এ ছাড়া খেলাধূলা ও আরও অনেক খরচই ওঠে যাত্রা করানো টাকায়।

॥ মিতালি স্পোর্টিং ক্লাব ॥

মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা রোডের প্রাচীন ক্লাব "মিতালি স্পোর্টিং ক্লাব"। জানতে পারি এই ক্লাবের জন্ম ১৯৬২ সালে। বিগত ২১ বছর ধরে এই ক্লাব যাত্রা করিয়ে আসছে। এঁরা আগে তিন নাইট যাত্রা করাতেন এখন করান দুই নাইট। এই যাত্রা করাবার উদ্দেশ্য সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করা। সেই সমাজসেবা মূলক কাজের মধ্যে বর্তমানে ক্লাব পরিচালিত একটি শিশু ও মাতৃ মঙ্গল কেন্দ্র উল্লেখযোগ্য। এই কেন্দ্রটি ১৯৮১ সাল থেকে আজও সগৌরবে চলছে। তা ছাড়া যাত্রা করিয়ে তার টাকায় প্রতিবছর বিনামূল্যে চক্ষু অপারেশন শিবির স্থাপন, রক্তদান, মুখ্যমন্ত্রীর বন্যাত্রাণ তহবিলে সাহায্য, সাংস্কৃতিক মূলক উৎসব, ফুটবল টীম, ক্রিকেট টীম পরিচালনা, দুস্থ ও মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের আর্থিক সাহায্যদান ক্লাবের নৈতিক দায়িত্ব পালনের পর্যায়ভুক্ত। তা ছাড়া এই ক্লাব স্থানীয় মানুষের সমস্যা নিয়ে 'মিতালি' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করত, দুঃখের বিষয় পত্রিকাটি আপাতত বন্ধ আছে।

॥ অগ্রগামী এ্যাথেলেটিক ক্লাব ॥

যাত্রা করিয়ে তার টাকায় গড়ে তোলার ইতিহাস বিবৃত করতে গিয়ে চন্দ্রকোনার এই ক্লাবের সম্পাদক সুবীর সরকার (দুলাল) বললেন ; আমরা প্রতি বছর দু'নাইট পালা করি, কখনো বা ৩

নাইটও হয়।—যাত্রা করানোর উদ্দেশ্য সমাজকল্যাণমূলক কাজ করা এবং ভালভাবে ক্লাব পরিচালনা করা। শ্রীসরকারের কাছ থেকে আরও জানা গেল, সমাজসেবামূলক কাজের মধ্যে এই ক্লাব প্রতি বছর চক্ষু অপারেশন শিবির বসান, সেখানে বিনামূল্যে চোখের চিকিৎসা হয়। কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা এবং মেধাবী অথচ দুস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। নিরক্ষরতা দূরীকরণে এই ক্লাবের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। এই ক্লাব বিনামূল্যে মৃত্যুপথযাত্রী রুগীদের জন্য অক্সিজেন সরবরাহ করে থাকে। ফুটবল এবং ক্রিকেট খেলায় এবং তা পরিচালনার ক্ষেত্রে এই ক্লাবের যে বিশেষ ভূমিকা আছে তাও বিবৃত করলেন ক্লাব সম্পাদক শ্রীসরকার। সংস্কৃতি উৎসব পালন ক্লাবের আর এক কর্মযজ্ঞ।

॥ আলোচনা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ॥

১৯৭৮ সালে এই গোষ্ঠীর জন্ম হলেও চন্দ্রকোনা রোড বাসীদের কাছে খুবই গৌরবের। এই গোষ্ঠীর সম্পাদক মৃণাল রায় বেশ গর্বিত ভাবে বলেছিলেন, কয়েক বছর থেকে যাত্রা ক.াচিং। যাত্রা করানোর কারণ গোষ্ঠীর জনকল্যাণমূলক কাজের অগ্রগতি। এই এলাকায় প্রথম দাতব্য চিকিৎসালয় গড়ার কৃতিত্ব এই গোষ্ঠীর।

এছাড়া বন্যাত্রাণে সাহায্য দান, রক্তদান শিবির ইত্যাদি এই গোষ্ঠীর অন্যতম জনকল্যাণমূলক কাজ। শ্রীরায় আক্ষেপের সঙ্গে জানালেন যে, তাঁরা অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসের জন্য যাত্রা করাতে আরম্ভ করেছেন অথচ কারও কাছ থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা তাঁরা পাচ্ছেন না। ইতিমধ্যে হয়তো সেই ভাবনা ও কাজ সফল হয়েছে।

॥ ইলেভেন বুলেটস স্পোর্টিং ক্লাব ॥

১৯৮০ সালে 'বৈজুবাওরা' যাত্রা পালার মধ্য দিয়ে এই ক্লাবের পথ চলা শুরু হয়। আসলে কিন্তু এই ক্লাবের জন্ম ১৯৭৭ সালে। এই ক্লাবের সম্পাদক নাজির হোসেনের কাছ থেকে জানা গেল, জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য আর্থিক প্রয়োজন মেটাবার বাসনায় ১৯৮০ থেকে প্রতি বছর ২ রাত্রি ধরে যাত্রা করিয়ে আসছেন। ক্লাবের পক্ষে কোষাধ্যক্ষ শ্যামাপদ চক্রবর্তীর কাছ থেকে জানা গেল, যাত্রা করিয়ে তার লাভের অংশে সমাজসেবামূলক কাজ ও খেলাধূলা বিভাগ যেমন চালাচ্ছেন, তেমনি কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে আর্থিক সাহায্য দান করেন। রক্তদান শিবির চালান ও গরীব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সাহায্য করে থাকেন এই ক্লাবের কর্তৃপক্ষ।

॥ প্রগতি সংঘ ॥

১৯৮৫ সালে এই ক্লাবের জন্ম। ১৯৯১ সাল থেকে এঁরা যাত্রা করাতে থাকেন। ক্লাবের সম্পাদক প্রদীপ তেওয়ারী জানান, যাত্রা করিয়ে ইতিপূর্বে তাঁরা লাভের টাকায় অসুস্থ রুগীদের, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদের ও দুস্থ মেধাবী ছাত্রদের সাহায্য করেছেন, ভবিষ্যতে এই ধরনের জনকল্যাণমূলক কাজের অগ্রগতি অব্যাহত রাখার জন্য যাত্রা করানোর পরিকল্পনা সজীব রেখেছেন।

॥ পুরুষোত্তমপুর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও শরৎ স্মৃতি সংঘ ॥

মেদিনীপুরের নায়েক অনিলকুমার মাইতির কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, কলকাতার পেশাদার যাত্রাদলের যাত্রা করিয়ে তার লাভের অংশে এই নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রথম ৩ কামরা বিশিষ্ট পাকা ঘর পরে আরও ৩টি পাকা ঘর তৈরি করা হয়েছে। এ ছাড়া যাত্রা করানো টাকায় এক শতক জমির ওপরে শরৎস্মৃতি সংঘের দোতলা বাড়ি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

॥ অমর সেবা সংঘ ॥

নায়েক দেবাশিস চক্রবর্তীর দেওয়া সংবাদ থেকে জানা গেল, মেদিনীপুর জেলার

কোলাঘাটের রাইন অঞ্চলের বৃহত্তম, উন্নত ক্লাব এই অমর সেবা সংঘ। সাংস্কৃতিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান, খেলাধুলা, মহিলা সমিতি, দাতব্য চিকিৎসালয়, পাঠাগার ইত্যাদি সব বিভাগ, এই ক্লাবের সদস্যরা কলকাতার পেশাদার যাত্রা দলের যাত্রা করিয়ে তার লাভের অংশে করেছেন। তা ছাড়াও রাস্তাঘাট মেরামত, এবং আরও সমাজকল্যাণমূলক কাজ করেছেন! এই ক্লাবের সদস্য সংখ্যা প্রায় আড়াই শত।

॥ বীরেন মিলন মন্দির ॥

মেদিনীপুরের বিধান ঘোড়ই জানিয়েছেন, পাঁশকুড়ার বর্ধিষ্ণু ও বৃহৎ ক্লাব বীরেন মিলন মন্দির। এই সংগঠন সমাজকল্যাণমূলক কাজে বিশেষভাবে অঞ্চল খ্যাত। ক্লাবের পক্ষ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা ইত্যাদি বিষয়ে যেমন নিয়মিত কাজ করা হয়, তেমনি বিগত প্রায় কুড়ি বছর ধরে এঁরা কলকাতার বিশিষ্ট যাত্রাদল আনিয়ে তার লাভের অংকে তৈরি করেছেন মন্দির। রাস্তা ঘাট মেরামত করেছেন, প্রাথমিক স্কুলে অর্থ সাহায্য দিয়েছেন।

॥ ঝাঁকরার আমরা ক'জন ॥

মেদিনীপুর জেলার ঝাঁকরা অঞ্চলের 'আমরা ক'জন' একটি বিশিষ্ট-অভিজাত ক্লাব। ক্লাব সভাপতি পাঁচকড়ি মণ্ডল এবং সম্পাদক পরেশ মণ্ডল জানিয়েছেন, এই ক্লাবে নানা বিভাগ আছে। তার মধ্যে ভলিবল, ফুটবল ইত্যাদিতে এই ক্লাব যথেষ্ট খ্যাতি সম্পন্ন। ক্লাব জন কল্যাণমূলক কর্মযজ্ঞের সার্থক রূপায়ণের জন্য আর্থিক কাঠামোকে দৃঢ় করতে বছর কয়েক ধরে যাত্রা করাচ্ছেন।

॥ গয়েশপুর যুব গোষ্ঠী ॥

নদিয়া জেলার এই বিখ্যাত সংগঠন, গত কয়েক বছর ধরে যাত্রা করিয়ে তার লভ্যাংশের টাকায় আঞ্চলিক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের নানাবিধ সাহায্য দিয়ে আসছে। ইতিমধ্যে ১০৯ জন গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বই বিতরণ করা হয়েছে।

॥ শিবশক্তি ক্লাব (মনোহরপুর, হুগলী) ॥

বিগত কয়েকবছর ধরে এই অঞ্চলপ্রিয় ক্লাবের কর্মকর্তারা যাত্রা করিয়ে তৈরি করেছেন স্কুল, পাঠাগারের উন্নয়ন সাধন করেছেন। কয়েকজন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা এই ক্লাবের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নিয়ে কন্যাদের পাত্রস্থ করেছেন। বার্ষিক আনন্দ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই ক্লাব বছর কয়েক ধরে গরীব ছেলে-মেয়েদের জামা-কাপড়, বই দিয়ে আসছে। খরা ও বন্যায় যখনই এই অঞ্চলের মানুষ বিপন্ন হয় তখনই এই ক্লাব চাল, চিঁড়ে, গুড় ইত্যাদি দিয়ে দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছে, আজও এ-কাজ অব্যাহত আছে। এই বিশাল কর্মকাণ্ড বার বারই সুসম্পাদিত করতে এঁরা যাত্রার আশ্রয় নিয়েছেন ও যাত্রা করানো টাকায় সুসম্পাদন করেছেন।

॥ ডেবরা পপুলার ক্লাব ॥

বৃহত্তম একটি ক্লাব বা সংগঠন। এই সংগঠনের সমাজকল্যাণমূলক এবং সাংস্কৃতিক চেতনা জাগরণমূলক বিশাল কর্মকাণ্ডের জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয়তা। এর ফলে স্থানীয় বহু মানুষের নানাবিধ সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় ক্লাবের আশাতীত শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। তা ছাড়া কলকাতার যাত্রা দল আনিয়ে প্রতি বছর যাত্রা করিয়ে তার লভ্যাংশের টাকায় ক্লাবের বাড়ি তৈরি, খেলাধূলার সরঞ্জাম কেনা, পাঠাগার তৈরি থেকে বিরাট দাতব্য চিকিৎসালয় পর্যন্ত তৈরি করেছেন এঁরা।

॥ তেহট্ট হাইস্কুল ॥

বহু বছর ধরে এই স্কুলের শিক্ষকরা মিলিতভাবে যাত্রা কমিটি তৈরি করে, কলকাতার যাত্রাদলের পালা উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে, স্কুলের সার্বিক উন্নতি সাধন করেছেন। যাত্রা করিয়ে তার লভ্যাংশের টাকায় এই বিশাল হাইস্কুলটি এবং স্কুল সংক্রান্ত নানাবিধ কাজ হয়েছে।

॥ পিকনিক গার্ডেন দিলীপ স্মৃতি সংঘ (তিলজলা) ॥

যাত্রা করিয়ে তার লভ্যাংশের টাকায় এই স্মৃতি সংঘ অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে।

॥ গিদ্‌নী কালীমেলা কমিটি ॥

পশ্চিমবঙ্গ তথা উত্তরবঙ্গে যত যাত্রা কমিটি আছে তার মধ্যে সব চেয়ে বড় কমিটি এটি। কালীপুজো এই কমিটির অন্যতম সেরা কর্মযজ্ঞ। এই উপলক্ষে বিশাল মেলার আয়োজন তো হয়ই, সেই সঙ্গে এখনও ৮। ১০ দিন কলকাতার যাত্রাদলের পালা নিয়ে যাত্রা উৎসব হয়। যাত্রা করিয়ে এ যাবৎ লভ্যাংশের টাকায় কমিটি স্থায়ী সমাজকল্যাণমূলক কাজ করে।

॥ বাতকুল্লা ইউনাইটেড ক্লাব ॥

ক্লাব বিল্ডিং, স্থায়ী মঞ্চ, লাইব্রেরী থেকে দাতব্য চিকিৎসালয় এবং এ্যাম্বুলেনস্ সবই এই ক্লাব তৈরি করতে পেরেছে, যাত্রা করিয়ে তার লাভের অংশে। খেলাধূলা থেকে গরীব ছাত্র ছাত্রীদের বই বিতরণ, বার্ষিক নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সবই যেমন অনেকেরই সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে চলে, তেমনি যাত্রা করিয়ে তার লাভের অংশ থেকেও এই কাজ এঁরা করেন।

এ ছাড়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে সুপরিচিত পালাকার, নির্দেশক, অভিনেতা, সাহিত্য-প্রেমী, সিনেমা-থিয়েটার-সাহিত্য ক্ষেত্রে সকলের চেনা-জানা, স্বনামধন্যা অভিনেত্রী ছন্দা চ্যাটার্জীর স্বামী, 'গন্ধর্ব' অপেরার কর্ণধার, 'প্রতিদিন' সংবাদপত্রের 'যাত্রা সাংবাদিক' এক কালে বাগনানের ছেলে, আজীবন কম্যুনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম শরিক নিমাই শূরের এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে জানা যায়—হাওড়া জেলার অন্তর্গত বাগনানে ২টি বালিকা বিদ্যালয়। একটা সময়ে ছিল যখন এই অঞ্চলের যে দুটি প্রাইমারী স্কুল ছিল, যাত্রা করিয়ে তার লভ্যাংশের টাকায় সেই স্কুল দু'টি সম্পূর্ণ হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয়েছে। স্কুল দুটি হলো, (১) বাগনান উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (২) আদর্শ বালিকা উচ্চবিদ্যালয়। পুরো পাকা বাড়ি থেকে অনেক কিছুই হয়েছে যাত্রার টাকায়।

॥ প্রসঙ্গ ঃ হাওড়া কৃষ্ণনগরের আনন্দসমাজ ॥

হাওড়া জেলার কৃষ্ণনগরের জঙ্গীপাড়ার প্রাচীন ও অভিজাত ক্লাব "আনন্দসমাজ"-এর বয়স ৫০ পেরিয়েছে অনেকদিন আগেই। একে ক্লাবের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠান বলাই শ্রেয়। এর বর্তমান সভাপতি বয়োঃবৃদ্ধ হয়েও তরতাজা যুবকের মত, ব্যক্তিগত ভাবে প্রায় একান্নবর্তী পরিবারের সকলকে নিয়ে আঞ্চলিক মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য সর্বদা সচেষ্ট, সজীব। অবশ্যই আনন্দ-সমাজের মাধ্যমে। আর এটাকেই সভাপতি শৈলেন্দ্রপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতা। এই দায়বদ্ধতা থেকেই তিনি স্মৃতিচারণ করেন 'আনন্দসমাজ'-এর। এ প্রসঙ্গে এসে যায় সতীশ চট্টোপাধ্যায়ের কথা। এই অঞ্চলের পালাগানের প্রেমিক ছিলেন সতীশবাবু। সেই সূত্রে কীর্তন গানের দলের পাগল কর্তা অভয়বাবুকে সতীশবাবু ভালবাসতেন খুব। সেই ভালবাসাকে পাথেয় করে, পল্লীবাসীদের চিত্তবিনোদনের জন্য কীর্তন গানের দল বন্ধ করে দিয়ে অভয়বাবু তৈরি করেছিলেন পালাগানের আখড়া। সেই আখড়ায় নাম লিখিয়েছিলেন অনেকের সঙ্গে সতীশ চ্যাটার্জীর দুই ছেলে। পতিতপাবন আর শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়। পালা ছিল "কংস বধ"। সেই পালার শিক্ষক ও সুরকার ছিলেন যথাক্রমে পঞ্চানন মিত্র, অমরনাথ গাঙ্গুলী। এরই মধ্যে জঙ্গীপাড়ার একমাত্র আদর্শ প্রতিষ্ঠান, নকুলেশ্বর চক্রবর্তী প্রতিষ্ঠিত "জঙ্গীপাড়া ইয়ং মেন অ্যাসোসিয়েশন" হঠাৎ ভেঙে যায়। কিন্তু ভাঙেনি অ্যাসোসিয়েশনের শাখা প্রতিষ্ঠান "মহামায়া অপেরা পার্টি"। পল্লী গ্রামে এক সময়ে পালাভিনয়ের জন্য এই অপেরা পার্টির খ্যাতিও যথেষ্ট ছিল। শেষ পর্যন্ত এই অপেরা দলেও ভাঙন রোধ করা গেল না। উল্লেখযোগ্য হলো, অভয়বাবুর দল কিন্তু বেঁচে ছিল। ইয়ং মেন আর মহামায়ার সক্রিয় সদস্য শৈলেন্দ্রপ্রসাদ অবশেষে এসে যোগ দেন অভয়বাবুর দলে। দলের নতুন নামকরণ হলো "আনন্দময়ী নাট্য সমাজ"। ১৩৫৫ সনের ১ বৈশাখ এই নতুন দলের

জন্ম সূচিত হলো। এই নতুন দলের মহলার জন্য বাগীশপাড়ার সুখ্যাত অভিনেতা বাগীশবাবু তাঁর বৈঠকখানার দুয়ার উন্মুক্ত করে দেন। পরের বছরই এই নাট্য সমাজ স্থান পেল বর্ধিষ্ণু গাঙ্গুলীদের অন্নপূর্ণা ধামে। এই সময়ে এই সমাজের অনেকের সঙ্গে শৈলেনবাবু পল্লীবাসীদের সার্বিক কল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগ করেন। বছর চার পর বহিরাগড়ের সর্বজন শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ আহ্বান জানালেন সমাজের সঙ্গে যুক্ত সকলকে।

আলমারি ভর্তি এক রাশ প্রাচীন পালা গ্রন্থের গা থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে শৈলেন্দ্রপ্রসাদ বললেন,—"সরকার আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষাকেন্দ্র বলুন কারও কোন মাথা ব্যথা নেই বৈষ্ণব কবি, কৃষ্ণ যাত্রার প্রবাদ পুরুষ গোবিন্দ অধিকারীকে নিয়ে। গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আমাদের সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কত কাজই না করেছে ইতিমধ্যে, গিরীশ, দীনবন্ধু থেকে অহীন্দ্র চৌধুরীর নামে কত প্রেক্ষাগৃহের নামকরণ হয়েছে এই বছর কয়েকের মধ্যে, কিন্তু গোবিন্দ অধিকারী, কৃষ্ণকমল গোস্বামী, মতিলাল রায় এমন কি একালের বড় ফণিবাবু, ব্রজেন দে এঁদের স্মৃতি রক্ষার কোন চেষ্টাই হয়নি! সুরেনবাবু এককভাবে কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন।—"

গোবিন্দ অধিকারীর বাস্তুভিটার যে ভগ্নস্তূপ বহিরাগড় রেল ষ্টেশনের উত্তরে আজও পড়ে আছে, তার পাশে পড়ে আছে গোবিন্দ অধিকারীর দেবী মণ্ডপের ধ্বংসস্তূপ! সেই ধ্বংসস্তূপের ওপর সম্পূর্ণ নিজের টাকায় সুরেনবাবু একটা "মণ্ডপ" তৈরি করেছিলেন, নাম দিয়েছিলেন "শান্তি কুটির"। পাশে শ্বেত পাথরের স্মৃতিফলক। সুরেনবাবু চেয়েছিলেন ঐ 'শান্তিকুটির'কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠুক সমাজসেবা আর সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্র। সুরেনবাবু আরও চেয়েছিলেন, ঐ সমাজের যুবকদের ওপরে সেই দায়িত্ব তুলে দিতে। শৈলেনবাবুরা মাথা পেতে নিয়েছিলেন সেই দায়িত্বভার।

চিত্তবিনোদনের সঙ্গে সামাজিক দায়বদ্ধতা ক্রমশঃ দানা বাঁধতে থাকল। এর ফলে নতুন, যথার্থ নামকরণ হলো "আনন্দ সমাজ"। ক্রমশঃ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় নিরক্ষরতা দূরীকরণ নৈশ বিদ্যালয়, রেড ক্রসের সহায়তায় শিশু ও প্রসূতিদের জন্য বিনামূল্যে দুধ বিতরণ কেন্দ্র, আকাশবাণীর সৌজন্যে তৈরি হয় পল্লী বেতার গোষ্ঠী। সঙ্গে এঁরা শুরু করলেন শারদোৎসব, পথ ঘাট সংস্কার, দুস্থদের কম্বল দেওয়া, শরীর চর্চা কেন্দ্র, ভারতমাতার মৃণ্ময়ী মূর্তিপূজা—আরও বহু কর্মযজ্ঞ।

যাত্রা জগতের সর্বজন শ্রদ্ধেয় গুণীজনদের এঁরা আমন্ত্রণ জানিয়ে সম্বর্ধনা দিতে যেমন ভোলেননি কোন বছরে, তেমনি দেশ ও বিদেশের সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা আনন্দ-সমাজের কর্মকাণ্ড নিয়ে সংবাদ করতেও ভোলেননি। যেবার জাগলগড়ী গ্রামের প্রান্তে বৃটিশ এয়ার ওয়েজের জেট বিমান ভেঙে পড়েছিল, সেবার সেই ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে গলিত মৃতদেহ উদ্ধারের কাজে এই আনন্দসমাজ যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল যা লণ্ডনের একাধিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সমাজের তরুণরা পল্লীবাসীদের আনন্দ দিতে এ যাবৎ যে পঁচিশ-তিরিশটি যাত্রাপালা উপহার দিয়েছেন তা কলকাতার পেশাদার দলগুলির তুলনায় অনেক বেশি ভাল। এই সমাজের শিল্পীদ্বয় "ননী" আর "পূর্ণ"র তরজা গান আজও অনন্য। সুরেন্দ্র ঘোষ শান্তি কুটিরের আশে পাশে কয়েক শতক জমি দান করেছিলেন আনন্দসমাজকে। পরিতাপের বিষয়, বছর কয়েকের মধ্যে উকিলের নোটিশ দিয়ে সেই জমি ফিরিয়ে নিয়েছিলেন সুরেনবাবু। সমাজ আবার কিছু বছর কাটাল ডাঃ পুলিনবিহারী চক্রবর্তীর সদর ঘরে। তারপর ১৯৬১ সালের ২৭ ডিসেম্বর আনন্দসমাজ আবার জমি সংগ্রহ করল। ১৯৬৩ সালের ১৭ জানুয়ারি সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম শতবর্ষে সমাজ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন তারাপদ পাল। সেখানেই গড়ে উঠেছে আজকের "আনন্দসমাজ" ভবন। এ ব্যাপারে চণ্ডীচরণ পান দিলেন আর্থিক সাহায্য, তাই সমাজ ভবনের নামকরণ হল "চণ্ডী নিকেতন"।

যাঁদের প্রেরণায় আজও সমাজের অভিনয় চর্চা বা যাত্রা ঐতিহ্যের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল তাঁরা হলেন ঃ ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ, পশুপতি মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ দাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিতোষ মুখোপাধ্যায়, অমরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রসাদকুমার সরকার, সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন দে প্রমুখ। সমাজ অভিনীত পালা ঃ কংসবধ, রাজলক্ষ্মী, মিলন শঙ্খ, ভক্ত কবি জয়দেব, চন্দ্রধর, চন্দ্রহাস, জগদ্ধাত্রী, রূপ সাধনা, মাটির মা, মেদিনী, রূপ নগরের মেয়ে, মহিষাসুর, রক্তের টান, চন্দ্রশেখর, গ্রহশান্তি, বিদ্রোহী সন্তান, অভিযান, ভক্ত হরিদাস, জয় যাত্রা, নতুন জীবন, ছিন্নশির, জাহান্দার শাহ, শিবাজী, দ্বিতীয় পানিপথ, লীলাবসান, বাঙালী, বঙ্গবীর, চক্রচ্ছায়া, শাপমোচন, সুলতানা রিজিয়া। **মঞ্চের নাটক ঃ** রূপশিখা, আজব দেশ, ম্যানিয়া, অম্লমধুর, বারো ঘণ্টা, সংক্রান্তি, স্বীকৃতি। * উল্লেখ্য, এই গ্রন্থ রচয়িতা এবং যাত্রা শিল্পের অন্যতম জনপ্রিয় ও প্রবীণ সাংবাদিক হিসেবে "আনন্দসমাজ" আমাকেও (গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ) সম্বর্ধনা জানিয়েছিল।

॥ হাওড়ার শিবপুরে উমাচরণ বসুর যাত্রা দল ছিল ॥

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যয়ের 'শ্রীবৎস চিন্তা' পালায় অভিনয় করে খ্যাতি পান উমাচরণ বসু। **হাওড়ার কোনার জমিদার দীননাথ চৌধুরীর** সখের দলের খ্যাতি এসেছিল ঠাকুরদাসের "হরিশ্চন্দ্র" পালায়।

॥ দঃ চব্বিশ পরগণার আরও কিছু প্রতিষ্ঠান এবং যাত্রা শিল্পী-কর্মী ॥

● মণ্ডল কোম্পানি।। বুইতা, বজবজ।
প্রায় ৩০ বছরের প্রতিষ্ঠান। যাত্রা, থিয়েটাব, নৃত্যনাট্য এবং আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে পোশাক-পরিচ্ছদ আর মেক-আপ সরঞ্জাম বিক্রি এবং ভাড়া দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি জনপ্রিয়। এঁরা সুরপার্টী এবং মহিলা শিল্পীও সরবরাহ করেন।
প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার, মন্মথনাথ মণ্ডল।

● নিউ মডার্ন ডেকরেটার্স।। শামুক পোতা, রায়পুর রোড, বিষ্ণুপুর।
যাত্রা, থিয়েটার এবং সব রকম অনুষ্ঠানের আধুনিক প্যাণ্ডেল নির্মাতা। মালিক, সেখ সোলেমান।

● অমলকুমার মণ্ডল। ইনি আঞ্চলিক খ্যাতনামা আলোক সম্পাতকারী। বছর কয়েক মঞ্জরী অপেরায় অভিনয় করেছেন। রঙ্গনা থিয়েটারে ইলেকট্রিসিয়ান হিসেবে কাজ করেন। বর্তমানে দঃ চব্বিশ পরগণার বহু সৌখিন যাত্রাদলে আলোক সম্পাতের কাজ করেন।

● বাবলু ভট্টাচার্য। বিড়লাপুর। দঃ চব্বিশ পরগণা। প্রযত্নে, আলমপুর 'বিদ্যুৎ বাহিনী'। ইনি সু অভিনেতা। অঞ্চলে খুবই জনপ্রিয়।

● সতীশচন্দ্র দাস। বজবজ, পোকপাড়ী। ইনি মাষ্টারমশাই হিসেবে পরিচিত। অভিনয় জগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল জড়িত। অভিনয়ে, নির্দেশনায় যেমন দক্ষ, তেমনি সুর রচনার ক্ষেত্রেও সুপরিচিত। ড্রেসার ও পেণ্টার হিসেবেও তাঁর নাম ডাক যথেষ্ট। ছেলেবেলায় যাত্রায় এসেছিলেন, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেই যাত্রার জন্যই জীবন পাত করেছেন।

● ভক্তরাম মণ্ডল। বকুলতলা, বুডুল, ফলতা। ইনি একজন সুদক্ষ যাত্রার অভিনেতা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বজবজ, ফলতা, নোদাখালি, বিষ্ণুপুর অঞ্চলে ইনি খুবই খ্যাতিমান অভিনেতা হিসেবে পরিচিত।

● কবিতা গায়েন। কৃপারামপুর, জয়রামপুর, বিষ্ণুপুর। ইনি দঃ চব্বিশ পরগণার একজন নামী ও দামী অভিনেত্রী। অতুলনীয় গানের গলা। এই গানের জন্যেই ইনি গ্রামীণ বহু যাত্রা দলের মাথার মণি।

- শিখা রায়। কুসবেড়িয়া, মাথুর। ডায়মণ্ডহারবার। স্কুলে ও গ্রামে নাটক করতে করতে যাত্রার অভিনেত্রী হন। এখন দঃ চব্বিশ পরগণায় বহু যাত্রা দলে নিয়মিত অভিনয় করেন।
- সুমিত্রা চ্যাটার্জী। শিবরামপুর। দঃ চব্বিশ পরগণা। মায়ের রোলের এক অতুলনীয়া শিল্পী। কলকাতা, হাওড়া, দঃ চব্বিশ পরগণায় এই অভিনেত্রী খুবই জনপ্রিয়।
- কুরুবক নাট্য সংস্থা। বাখরা হাট, বেলটুনি বাগান, বিষ্ণুপুর। দঃ চব্বিশ পরগণা। প্রতি বছর অনেকগুলি সৌখিন যাত্রাদলকে নিয়ে যাত্রা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। এটি একটি যোগ ব্যায়াম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।
- উপেন মালিক। পুরাতন ডাকঘর। মহেশতলা। ইনি শক্তিমান অভিনেতা এবং নির্দেশক। গ্রাম বাংলার বহু সৌখিন যাত্রা দলে ইনি নির্দেশক হিসেবে কাজ করেন, অধিকাংশ দল যাত্রা প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। হাওড়া জেলাতেও ইনি খুবই জনপ্রিয়। বহু পুরস্কারে সম্মানিত।
- শম্ভুনাথ খাঁড়া। গ্রাম ঃ সাতগাছিয়া। নোদাখালি। দঃ চব্বিশ পরগণা। ইনি পেশায় স্কুল শিক্ষক। ব্যবসায়ী। এ সবের উর্ধ্ব তাঁর প্রধান পরিচয়, যাত্রার দক্ষ অভিনেতা ও নাট্য নির্দেশক। এই অঞ্চলের বহু দলে ইনি নিয়মিত আমন্ত্রিত ও সম্মানিত জনপ্রিয় নির্দেশক।
- কবিতা সাহা। বাটানগর, ১নং গেট। কসিম উদ্দিন বিল্ডিং। আঞ্চলিক যাত্রা দলে অভিনয় করা শ্রীমতী সাহার পেশা। খুবই জনপ্রিয় শিল্পী।
- শক্তিপদ মিস্ত্রি। গ্রাম ঃ পদ্মপুকুর (বুড়ুল), ফলতা। দঃ চব্বিশ পরগণা। ইনি একজন স্বনামখ্যাত সুরকার। আঞ্চলিক এবং বাইরের বহু যাত্রা-থিয়েটারে নিয়মিত কাজ করে খ্যাতিমান।
- দিলীপ মালিক। গ্রাম ঃ সাতগাছিয়া। নোদাখালি। দঃ চব্বিশ পরগণা। বিগত ২৫ বছর ধবে একটানা বিভিন্ন গ্রামীণ যাত্রা দলে মহিলা চরিত্রে অভিনয় করছেন খ্যাতির সঙ্গে। নারীর রূপসজ্জায় তিনি অনন্যা হয়ে ওঠেন।

॥ দঃ ২৪ পরগণার ড্রেসার ও মেক-আপম্যান ॥

- হানিফ মহম্মদ ও খগেন সরদার। বিড়লার মোড়। এঁদের প্রতিষ্ঠানের নাম 'পাপিয়া ড্রেস'। দু'জনেই প্রসিদ্ধ ড্রেসার ও মেক-আপ শিল্পী।
- নাট্য রূপাঞ্জলি। সাজসজ্জা ও মেক-আপ এবং মহিলা শিল্পী-সুর পার্টী ভাড়া দেবার প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠান। মালিক ঃ মিথুনচন্দ্র বর। ঠিকানা ঃ সহরার হাট। ফলতা। দঃ চব্বিশ পরগণা।
- দত্ত ড্রেসার। বজবজ চৌরাস্তার মোড়। বজবজ। মালিক বিশ্বনাথ দত্তের এই প্রতিষ্ঠান বহু জায়গার বহু যাত্রা-থিয়েটার মহলে সুবিখ্যাত।
- পাপিয়া ড্রেস। বিড়লার মোড়। বজবজ। দঃ চব্বিশ পরগণা। মালিক ঃ আবুল কালাম।
- শ্যামসুন্দর ডেকরেটর্স। এই প্রতিষ্ঠানের খুব নাম ডাক। যাত্রা-থিয়েটারের প্যাণ্ডেল আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে তৈরি করেন। দীঘির পাড় বাজার। ফলতা রোড। দঃ চব্বিশ পরগণা।
- মিত্র ব্রাদার্স ডেকরেটর্স। যাত্রা থিয়েটারের প্যাণ্ডেলে বিখ্যাত। ঠিকানা ঃ সাঁজুয়া (বাখরা হাট) থানা ঃ বিষ্ণুপুর। দঃ চব্বিশ পরগণা।
- ভক্ত ডেকরেটর্স। যাত্রা-থিয়েটারের জন্য বিখ্যাত প্যাণ্ডেল নির্মাতা। নোদাখালি। রায়পুর রোড। দঃ চব্বিশ পরগণা।

- মল্লিক ডেকরেটর্স। এই প্রতিষ্ঠানেরও যাত্রা-থিয়েটার প্যাণ্ডেলে খ্যাতি। কয়লা সড়ক রোড। বজবজ। দঃ চব্বিশ পরগণা।
- মহাশক্তি যাত্রা ইউনিট। ৩৫ বছরের দল। সম্পাদক ঃ অর্ধেন্দু হালদার। এঁরা কল শো করেন। ঠিকানা ঃ রাজারামপুর, ফলতা। দঃ চব্বিশ পরগণা।
- বিদ্যুৎ বাহিনী ক্লাব। আলমপুর। বিড়লাপুর। নোদাখালি। দঃ চব্বিশ পরগণা। এই দল নিয়মিত সৌখিন যাত্রা করে।
- পার্বতী পঞ্চবটী ক্লাব। এর সম্পাদক ঃ লক্ষ্মণ দলুই। গ্রাম ঃ পার্বতী। বুইতা। দঃ চব্বিশ পরগণা।
- ভ্রাতৃ সংঘ। দাসপাড়া। বুইতা। বজবজ। দঃ চব্বিশ পরগণা।
- তরুণ নাট্য সমাজ। ১৩৫১ সনে প্রতিষ্ঠিত সখের যাত্রা দল। গ্রাম ঃ অনন্তরামপুর। সহরার হাট। ফলতা। দঃ চব্বিশ পরগণা।
- লক্ষ্মী মাইক-ইলেকট্রিক। অমলকুমার মণ্ডল এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন ফলতা, মল্লিকপুর হাটের মধ্যে। যাত্রা-থিয়েটারে আলোক সম্পাত, শব্দ ও কণ্ঠ প্রক্ষেপণের কাজ করে শ্রীমণ্ডল এবং তাঁর এই কোম্পানি সুপ্রতিষ্ঠিত।
- তপন ইলেকট্রিকস। ফলতা, মল্লিকপুর হাটের মধ্যে জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান। মালিক তপন মণ্ডল। যাত্রা, থিয়েটার, নৃত্যনাট্য ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে আলোক সম্পাতকাবী হিসেবে খ্যাতিমান।
- গৌরাঙ্গ ডেকরেটর্স। মালিক গৌর সর্বাধিকারী তাঁর এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যাত্রা-থিয়েটারেব প্যাণ্ডেল কবে বিখ্যাত।

আলিপুব মহকুমার অন্তর্গত কাচবাগান মিলন মন্দির (বক্রাহাট), দৌলতপুর মিলন সংঘ (আমগাছিয়া), শিক্ষা-সংস্কৃতি চক্র (বিদ্যানগর, চরশ্যামদাস), কুশীলব (দক্ষিণ গৌরীপুর), সবোজবাসিনী নাট্য সমাজ (দক্ষিণ গৌরীপুর), বখরাহাট যুব সংঘ যাত্রাপার্টি (বখরাহাট), কন্যা নগর মহিলা সমিতি (কন্যা নগর), বাওয়ালী সখ্য সংঘ যাত্রাপার্টি (বাওয়ালী), চকমা নিক বান্ধব সমিতি (বাওয়ালী), বন্ধু সংঘ (জয়নগর মজিলপুর), কুষ্টিয়া কালিকা নাট্যসমাজ (কুষ্টিয়া), নিউ ত্রিনাথ অপেরা পার্টি (হরপুর, প্রতাপনগর), হরিহরপুর জাগৃতিসংঘ (মল্লিকপুর), শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (নিমপি), ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত হনরা যুব সংঘ যাত্রাপার্টি (দরিয়া), আমিরা ডায়মণ্ড ক্লাব (আমিরা), দয়ারামপুর রিক্রিয়েশন ক্লাব (গাববেড়িয়া), অগ্রদূত সংঘ যাত্রাপার্টি (ঘটেশ্বর), গদাধর বাস ও নাট্য-নিকেতন (ভুবন নগর), লক্ষ্মীপুর প্রগতি সংসদ (শিবকালীনগর), বিবেকানন্দ স্মৃতিসংঘ গণনাট্য পরিষদ (ভুবননগর), নারায়ণপুর শ্রীদুর্গা যুব সংঘ যাত্রা-পার্টি (নামখানা), যোড়শ নাট্য সংসদ (কাকদ্বীপ), গঙ্গাধরপুর রবীন্দ্রস্মৃতি বিশালাক্ষী অপেরা (গঙ্গাধরগঞ্জ), মিত্র সংঘ কালচারাল সেক্‌শন (মিরজাপুর—মথুরাপুর), মথুরাপুর ইয়ং মেনস্ এ্যাসোশিয়েশান (মথুরাপুর), শিবপুর পঞ্চানন অপেরা পার্টি (গোচারণ), বিশালাক্ষী নাট্য সমিতি (খেলারামপুর—সিরাকোল), চাঁদপাল যুব নাট্য সমাজ (চাঁদপাল), মিতালি নাট্য সমাজ (কাকদ্বীপ), তসরালা দক্ষিণেশ্বর নাট্য সম্প্রদায় (সরবেড়িয়া), দুর্গানগর সবুজ সংঘ (কুলপি),—বারাকপুর মহকুমার অন্তর্গত রূপায়ণ (গোলা), নাট্য বিতান (বিজয়পুর—সোদপুর), বেলঘরিয়া নারী মঙ্গল সমিতি (উমেশ মুখার্জী রোড, বেলঘরিয়া), প্রফুল্ল নগর ভারতী সংঘ (বেলঘরিয়া), বারাসাত মহকুমার অন্তর্গত মহেশপুর শিবদুর্গা সমিতি (বাদু), মেঘদূত নাট্য সমাজ (প্রণব পল্লী, চাঁদপুর), বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত বাহারহাটি রাখি সংঘ অপেরা পার্টি (খোলাপোতা), পল্লী উন্নয়ন সম্মিলনী (আঁধার মানিক,

রুদ্রপুর), বেলঘরিয়া তরুণ সংঘ (মডেল বেলঘরিয়া), নিউ উমাশংকর অপেরা পার্টি (গোপালপুর), বড় শেহারা তরুণ সংঘ (ছোট শেহারা), সিমুলিয়া পল্লীশ্রী সংহতি যাত্রাপার্টি (হাসনাবাদ), মিলন সমিতি যাত্রাপার্টি (বরুণহাট), বড়াল অপেরা পার্টি (হাসনাবাদ), শ্রীরাধাগোবিন্দ অপেরা পার্টি (ঘোষপুর), 'কালীনগর হাট সংস্থা' যাত্রানাট্য অভিনয় করে। উল্লিখিত সংস্থাগুলিকে সরকার কর্তৃক ১৯৬৪-৬৫ সালে মোট ২৫৭৫ টাকা এককালীন বার্ষিক সাহায্য দেওয়া হয়।

॥ কাকদ্বীপের সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং যাত্রার ভূমিকা ॥

সুন্দরবন তথা দঃ ২৪ পরগণা জেলার অন্যতম প্রাণ কেন্দ্র কাকদ্বীপ। ভৌগোলিক অবস্থান, বাণিজ্যিক সম্ভাবনা এবং ব্যবসায়িক যোগাযোগের দিক থেকে কাকদ্বীপ এই জেলার গুরুত্বপূর্ণ শহর। শহরটির সংস্কৃতি চর্চায় যাত্রার স্থান নিরূপণ করা মফঃস্বলীয় সংস্কৃতি সমীক্ষার একটি বিষয় হতে পারে।

বড়তলা ও কালনাগিনী নদীর উপকণ্ঠে অবস্থিত বর্তমানের কাকদ্বীপ শহর কিন্তু আজ থেকে প্রায় ৪৫/৫০ বছর আগেও এতখানি সম্ভাবনাপূর্ণ বিকাশশীল শহর হিসেবে গড়ে ওঠেনি। মূলত সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার লোকজনের সঙ্গে মেদিনীপুর ও হাওড়ার বিভিন্ন এলাকার জন সাধারণের (যাঁরা অথবা যাঁদের আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবরা মেদিনীপুর ও হাওড়া ছেড়ে ২৪ পরগণার বিভিন্ন প্লটে বসতি স্থাপন করেছিলেন) যোগসূত্র স্থাপনের জায়গা। কিন্তু দেশ বিভাগের পর চিত্রটা গেল আমূল বদলে। পূর্ববঙ্গের অনেক ভাগ্যহীন বাস্তুহারা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জায়গার মত কাকদ্বীপকে বেছে নিল তাদের জীবন জীবিকার কেন্দ্র হিসাবে।

নদীতীরের গেঁয়ো জঙ্গল কেটে গড়ে উঠল তাদের স্বপ্ন সৌধগুলি। এই ভাবে লোক সংখ্যা যত বাড়তে থাকল, অবস্থাটা চরমে দাঁড়াল ১৯৭১ সালে বাংলা দেশের মুক্তি যুদ্ধের সময়। পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর বর্বর অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে, যে লক্ষ লক্ষ মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল, তার মধ্যে বেশ কয়েক হাজার পরিবার আজ কাকদ্বীপ ও তার উপকণ্ঠে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছে। তারও পরে, এমন কি এখনও প্রতিদিন বেশ কিছু মানুষ সমস্ত সরকারি নিয়মকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ওপার বাংলা থেকে চলে আসে। এর ফলে কাকদ্বীপ আজ যেমন পঃ বঃ-এর অন্যতম সম্ভাবনা পূর্ণ বিনিয়োগ ও বাণিজ্য কেন্দ্র, তেমনি অন্য দিকে অসংখ্য মানুষের অসহনীয় উপস্থিতিতে সেখানে রুদ্ধশ্বাস অবস্থা।

এই বাস্তব প্রেক্ষাপটে কাকদ্বীপের সংস্কৃতি সমীক্ষায় যাত্রার স্থান, সমস্যা ও সম্ভাবনা আলোচনা করতে হবে। কাকদ্বীপ তথা সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে যাত্রার জনপ্রিয়তা বহু কালের। কলকাতার নামী দামী পোশাদার দলগুলির বৈভব ও বিলাস তখনও শুরু হয়নি। মেদিনীপুরের বিখ্যাত কয়েকটি যাত্রা সংস্থা যেমন 'ভার্গব অপেরা' (ধাওয়ার যাত্রা), 'তেতুবীর যাত্রা', 'আমদাবাদের যাত্রা', বালিসাইর রাধারাণী অপেরা প্রভৃতি তখন মেদিনীপুরের মত কাকদ্বীপ ও তার উপকণ্ঠের গ্রামগুলিকে আনন্দে ভরিয়ে রাখত। কিন্তু ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে কলকাতার যাত্রা দলগুলি কাকদ্বীপের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রধান স্থান দখল করে নেয়। বিশেষ করে সত্তরের দশকে কলকাতা ও মেদিনীপুরের এমন কি উড়িষ্যার পেশাদার যাত্রা সংস্থাগুলির অন্যতম আকর্ষণীয় বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল কাকদ্বীপ। নদী-নালা অধ্যুষিত এই এলাকার লোকজন সাপ্তাহিক বিনোদনের সুযোগ পেত। সপ্তাহে প্রায় দুটো করে যাত্রাদলের অভিনীত পালা দেখে (সময়টা অবশ্যই কালীপূজা থেকে ফাল্গুন মাসের শেষ পর্যন্ত) সাগর, নামখানা, পাথরপ্রতিমা থানার নদী অধ্যুষিত কচুবেড়িয়া, মৌসুমী দ্বীপ, বকখালি, গদামথুরা, গোপাল নগর' জি-প্লট, আই-প্লট, কে-প্লট প্রভৃতি এলাকা থেকে অসংখ্য মানুষ নৌকা, ভটভটী এমন কি লঞ্চ ভাড়া করে কাকদ্বীপে এসে

যাত্রার আসরগুলিকে ভরিয়ে দিতেন। তাই সত্তরের দশকের একটা সময়ে প্রতি বুধবার ও শনিবার কাকদ্বীপে কোন না কোন যাত্রার আসর বসতই। এই সময়ে কাকদ্বীপের একমাত্র সিনেমা হল 'অমর টকীজ' প্রায় এগার বছর (১৯৭৬-১৯৮৭) বন্ধ ছিল। আজকের দিনের মত ভিডিও হলগুলির প্রভাব চোখে পড়ত না। (এখন শুধু কাকদ্বীপের বাজারে কমপক্ষে গোটা দশেক ভি. ডি. ও হল প্রতিদিন ৩টি শো করছে)। ফলে এখানকার সাধারণ মানুষ যাত্রা মরশুমের দিকে তাকিয়ে থাকতেন পরম আগ্রহে।

কিন্তু আশীর দশকের মাঝামাঝি সময়ের পর থেকে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ধীরে ধীরে কাকদ্বীপে যাত্রার সংখ্যা কমতে থাকে। বর্তমানে কমতে কমতে বছরে যাত্রা মাত্র তিন চার নাইটে গিয়ে পৌঁছেছে। এর পিছনে কি যাত্রা সম্পর্কে এই এলাকার মানুষের অনাসক্তি দায়ী না অন্য কিছু?

ঠিক এই প্রসঙ্গে কিছু প্রশ্ন নিয়ে বর্তমান প্রতিবেদক হাজির হয়েছিল কাকদ্বীপের যাত্রা আন্দোলনের দুই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, দুই বিশিষ্ট নায়েক শ্রী দেবু নস্কর ও পূর্ণ জানার কাছে। দুটি পৃথক সাক্ষাৎকারে শ্রীনস্কর, শ্রীজানা এই সমস্যার বিভিন্ন দিকগুলির প্রতি আলোকপাত করেন। কাকদ্বীপে যাত্রা কমে যাওয়া প্রসঙ্গে আলোচনায় শ্রীনস্কর ও শ্রীজানা জানান ঃ কাকদ্বীপে যাত্রা কমে যাওয়ার মূল কারণ, আগে কলকাতাব নামী দলগুলি গ্রামের মধ্যে যেতে চাইত না। বর্তমানে প্রায় সব দলই গ্রামে যাচ্ছে। তাই গ্রামের লোকেরা কাকদ্বীপে না এসেই কলকাতার যাত্রা দলের পালা দেখার সুযোগ পান।

দ্বিতীয়তঃ দলগুলির দর (রেট) প্রতিনিয়ত বাড়ছে। ফলে সংগঠকদের টিকিটের হার বাড়াতে হচ্ছে। অনেক সময় তা মানুষজনের দেওয়ার পক্ষে কষ্টকর হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে একটা ছোট পরিসংখ্যান দেওয়া যেতে পারে। যদি কোন পালার টিকিটের হার ৫ টাকা করা হয়—তবুও যে লোক সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে কাকদ্বীপে যাত্রা দেখতে আসবেন তাঁর যাত্রা দেখতে, খেতে এবং বাড়ি ফিরে যেতে খরচ হয়, প্রায় ৫+১৫=২০ টাকা। কাকদ্বীপে যাত্রার অধিকাংশ দর্শকই এই ভাবে টাকা খরচ করে গ্রাম থেকে আসেন।

তৃতীয়তঃ, নায়েক পক্ষ অফিসের ঝামেলায় বীতশ্রদ্ধ। কোন কোন যাত্রা আসরের জন্য কেবল মাত্র বিভিন্ন অফিসে প্রায় ১০০০ এর বেশি পাশ দিতে হয়—যা দেওয়া তাঁদের পক্ষে বেশ কষ্টকর।

চতুর্থতঃ, কাকদ্বীপে যাত্রার আর একটি সমস্যা হল—যাত্রা অনুষ্ঠানের জন্য কাকদ্বীপের নিজস্ব কোন মাঠ নেই। কাকদ্বীপের বিধান ময়দান যাত্রা বা ঐ জাতীয় অনুষ্ঠানের পক্ষে আদর্শ হলেও বিধান ময়দান কমিটি যাত্রার জন্য মাঠ দিতে চান না। ফলে নির্ভর করতে হয় ব্যক্তি মালিকানার ধেনো জমি "সার্কাস ময়দানের" উপর। প্রতিটি আসর যাত্রার জন্য এর মালিককে ভাড়া দিতে হয় ৫০০ টাকা। এই মাঠের সব থেকে বড় সমস্যা হল, মাঠ থেকে ধান না উঠলে এখানে কোন শো করান যায় না। যদিও কালীপূজার দিন থেকে শো করানোর অবকাশ কাকদ্বীপে আছে। আর এই মাঠের প্রবেশ পথ-বাহির পথ একটি মাত্র হওয়ায় প্রদর্শনীর শেষের ১০/১৫ ফুট জায়গায় সংকীর্ণ মুখ দিয়ে হাজার হাজার মানুষকে বেরুতে হয় যা মর্মান্তিক।

এত সব সত্ত্বেও কাকদ্বীপে যাত্রার একটা উন্মাদনা রয়েছে, তার উপরে বর্তমানে যাত্রার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নামী শিল্পীদের বিচিত্রা অনুষ্ঠান। ফলে কাকদ্বীপে যাত্রা ভিন্ন মুখী রুচির আস্বাদনে মুখর।

[গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষের 'যাত্রা অর্ঘ্য" পত্রিকায় প্রকাশিত শিক্ষক তুহিনকান্তি পণ্ডার প্রবন্ধ থেকে নেওয়া]

॥ মেদিনীপুর ॥

প্রসঙ্গ যাত্রা : "ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশ পাথর"।

ব্যবসায়ী বা পেশাদার যাত্রার প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, মেদিনীপুর জেলায় যাত্রার একটা বড় মাপের বাজার হয়ে উঠেছে। বর্তমানে যাত্রার একটি বৃহত্তম মার্কেট এই বৃহত্তম জেলায়। পেশাদার যাত্রার পাশাপাশি এই জেলার সর্বত্র, প্রতিটি মহকুমা শহর,-গ্রাম-গঞ্জে যাত্রা চর্চা এবং যাত্রার প্রতি গভীর ভালবাসা আঞ্চলিক যুবমানসে দানা বেঁধে উঠেছে। এ কথা স্বীকার করতেই হয়, এখানে আঞ্চলিক লোক-সংস্কৃতির চর্চা, আঞ্চলিক লোক-গাথার ভাবমূর্তিকে সযত্নে রক্ষা করার মানসিকতা বরাবরের। আঞ্চলিক লোকসাহিত্য ও শিল্পের ক্রমবিবর্তনের রূপ ধরে রাখার সযত্ন প্রয়াস এই জেলার সর্বত্র খুবই স্পষ্ট। তেমনি যাত্রার প্রতি গভীর অনুরাগ অম্লান। বরং ষাটের দশকের শেষে যাত্রার চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যাত্রাকে পাথেয় করে, যেমন এক শ্রেণীর মানুষ অন্নসংস্থানের পথ প্রশস্ত করেছে, তেমনি আঞ্চলিক বহু ক্লাব-সমিতি-সংগঠন পেশাদার যাত্রাকে হাতিয়ার করে বহু সামাজিক ও জন কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড সার্থক করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। যাঁরা কলকাতার বা শহরতলীর পেশাদার যাত্রাদল বায়না করে থাকেন, যাত্রার পরিভাষায় তাঁদের বলা হয় 'নায়েক'। যাত্রার চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে এই 'নায়েক' বৃদ্ধি পেয়েছে আশাতীত।

যাত্রা দল বায়না করিয়ে দিয়ে অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে পাল্টে নিয়ে নিজেদের কর্মজীবনকে অনেকাংশে সার্থক করে তুলতে বরাবরই যাত্রার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বেশ কয়েকজন দালাল। যাত্রার চাহিদা বৃদ্ধি ও যুগচেতনার সমৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে সেই বৃত্তি গ্রহণ করেছেন বহু জন, সমকাল সভ্য মানসিকতার ফলশ্রুতিতে এখন তাঁরা 'বুকিং এজেন্ট' হিসেবে চিহ্নিত। এই সব 'বুকিং এজেন্ট'-দের মধ্যে প্রায় সকলেই স্ব স্ব জেলায় গড়ে তুলেছেন 'যাত্রা বুকিং সেণ্টার'।

পেশাদার যাত্রার এই দুরন্ত গতির সঙ্গে তাল রেখে প্রায় সব জেলায়, অধিকাংশ গ্রামে-গঞ্জে যাত্রা চর্চারও গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়েছে! এই চর্চা বা আঞ্চলিক লোক-সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে ধরে রাখা, বাঁচিয়ে রাখা বা মূল্যায়নের সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার জন্য এমন অনেক মানুষের সন্ধান আমরা পাই, যাঁরা আত্মপ্রচারের পরিবর্তে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নীরব ধারক ও বাহক হিসেবে নিজের মধ্যে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার তৃপ্তি খুঁজে পান। এমনি কয়েকজন মানুষ এবং তাঁদের আঞ্চলিক সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির চেতনার রঙে রাঙানো পরশ পাথর খোঁজার নজির এখানে হাজির করছি।

...তেমনি মানুষ হলেন দীঘা নিবাসী রমেশ মাইতি। যাঁর পরশ পাথর খুঁজে ফেরার নেশা চিরকালের। তিনি মেদিনীপুর জেলার এই পবিত্র মাটিতে জন্মে, জীবনের বহু বছর কাটিয়ে দিয়েছেন, কাঁথি, বেলদা, বালীসাই, রামনগর, দীঘা এবং আরও বহু অঞ্চলের, আঞ্চলিক লোক-সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত নিয়ে। খুঁজে ফিরেছেন সেই সব মানুষরত্ন যাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায়, যাঁদের পরোক্ষ আর প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও সাধনায় এই সব অঞ্চলের সাংস্কৃতিক চেতনা, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের জাগরণ সম্ভব হয়েছে! এখানকার গ্রামীণ জীবনে 'যাত্রা' চিরকালের আদরণীয় এক লোকসংস্কৃতি। কেমন করে, কাদের জন্য এই যাত্রার প্রতি এখানকার সব মানুষেরই এত ভালবাসা, কেমন করে, কাদের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে গ্রামীণ জীবনে যাত্রার প্রভাব বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ; কেমন করে গ্রামীণ পালা চর্চার প্রসার ; আবার কী ভাবে শহরের আধুনিক যাত্রার চকমকির আলো-আঁধারি ভূমিকায় গ্রামীণ জীবনের ওপর থেকে আদি ও পবিত্র যাত্রার চেহারা ফ্যাকাশে হতে হতে আধুনিক যাত্রার প্রতি আকর্ষণ, এ সব কিছুর গবেষণা মূলক ইতিবৃত্ত রচয়িতা রমেশ মাইতি আজ তাঁর অঞ্চলের সকলের কাছে সুপরিচিত হলেও, কোথায় যেন বড় বেশি অবহেলিত! ছেলেবেলা থেকে সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী রমেশবাবু যদিও ছিলেন সখের যাত্রার গায়ক, নারী চরিত্রে অভিনয় করা শিল্পী, তবুও

ভিতর থেকে তিনি প্রকৃত সংগীতের, সুর-তাল-লয় আর বাণীর পরশ পাথর খুঁজে ফেরা এক ক্ষ্যাপা!

মেদিনীপুর জেলার রামনগর থানার ঘণ্টশালা গ্রামের ঁকালীচরণ মাইতির ২য় ছেলে রমেশের জন্ম ১৯৪৬ সালে। মামা বাড়িতে সংগীতচর্চা ছিল। ঠাকুর্দা ঁক্ষেত্রমোহন মাইতি শুধু গানের সমঝদারই ছিলেন না, তাঁর সখের যাত্রার দল ছিল। মামা গয়াপ্রসাদ মাইতি খুব ভাল গায়ক-বাজিয়ে ছিলেন। এক সময়ে কাঁথি মহকুমার মধ্যে হয়েছিলেন খ্যাতিমান বিবেক। মাতুল সূত্রেই বোধ করি রমেশের সংগীত প্রীতি।

স্কুলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রমেশ মাঝে মাঝে সখের যাত্রায় গান গাইত। এই সময়ে বাধিয়ার ঁআদ্যাচরণ পণ্ডার ছিল খ্যাতি আর প্রতাপ। তাঁর তৈরি প্রভাতী সংগীত বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রভূত অর্থ খরচ করে আদ্যাবাবু সখের যাত্রা করাতেন। সাহিত্যে, পালা রচনায়, সুর সৃষ্টিতে, সংগীতে আদ্যাবাবু ছিলেন কিংবদন্তী। তাঁর 'চন্দনেশ্বর' পালার খ্যাতি কোনদিনও ম্লান হবে না। সেই আদ্যাবাবুর দলে রমেশ সখের গান গাইত। আদ্যাবাবু বুঝেছিলেন রমেশ যদি ভাল সুযোগ পায় একদিন বড় হবে। অগত্যা তিনি রমেশকে পাঠান ধনাঢ্য এবং সংগীতপ্রিয় পশুপতি মাইতির কাছে। পশুপতিবাবু এবং তাঁর স্ত্রী রমেশকে নিজেদের ছেলের মতই গ্রহণ করেন এবং নিজেদেরই স্কুল 'মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যাপীঠ'-এ পড়াতে লাগলেন। গান শেখাতে লাগলেন 'প্রভাতী সংগীত বিদ্যালয়'-এ। বলা বাহুল্য, মৃত্যুঞ্জয়বাবু ছিলেন পশুপতিবাবুর ঠাকুর্দা। পশুপতিবাবুর আশ্রয়ে চার বছর থাকার পর শুভেন্দু চৌধুরীর সান্নিধ্য লাভ। শুভেন্দুবাবু হলেন গোবরা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। তিনি ছিলেন নাট্যরসিক। ভাল গানও গাইতেন। রমেশের সংগীত প্রতিভা ও সুরেলা কণ্ঠের জন্য শুভেন্দুবাবু খুবই ভালবাসতেন। তিনি নানা দিক দিয়ে অনুপ্রাণিত করলেন। রমেশ অল্প বয়সেই যাত্রাপালার সুরকার হবার সুযোগ পেলেন সন্তোষকুমার পতির গ্রামীণ পেশাদার দল 'শ্যামসুন্দর অপেরায়'। তারপর বংশীধর মিদ্দার 'বাণেশ্বর অপেরা'তেও রমেশ হয়েছিলেন সুরকার। বাণেশ্বর অপেরার পর কামেশ্বর পণ্ডার উড়িষ্যার দল 'চন্দনেশ্বর অপেরায়', এলেন সুরকার হিসেবে দাঁতন থানার কেশরম্ভার 'শীতলা অপেরা'য়। এখানে চার বছর সুরকার ছিলেন। তারপর 'রূপবাণী অপেরা'। এই সময় রমেশের মন অতৃপ্ত। তিনি সব ছেড়ে সংগীত সাধনা করতে চান। মনে মনে খুঁজে বেড়ান পরশ পাথর। খাঁটি গুরু। সুযোগ খোঁজেন আর কাজ করে যান, তখনকার দিনের প্রখ্যাত কোনিওরা ভগবতী পোশাক স্টোর্সে। (এঁরা যাত্রা থিয়েটারে পোশাক থেকে বাজিয়ে-গাইয়ে সব ভাড়া দিত) অর্ডার নেওয়া পালায় সুর দিতেন আবার হারমোনিয়াম বাজাতেন। ১৯৭০ সালে রমেশ যাত্রা ছাড়লেন। শুভেন্দুবাবুর প্রেরণায় ঝাঁপ ছিলেন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সাগরে। গেলেন কলকাতায়। ভর্তি হলেন গীতবিতান সংগীত বিদ্যালয়ে। শিখতে লাগলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত। পাশাপাশি স্বনামধন্য সংগীতজ্ঞ এবং সংগীত বিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা নীলরতন ব্যানার্জীর সান্নিধ্য লাভ করলেন। তাঁর কাছ থেকে তালিম নিলেন উচ্চাঙ্গ সংগীতে। গীতবিতান থেকে পাশ করে পেলেন ডি, গুপ্ত মেমোরিয়াল মেডেল আর 'গীতভারতী' খেতাব। ওদিকে সংগীত প্রভাকর শেষ করে সংগীত বিশারদ শিক্ষা নিলেন। সর্বভারতীয় স্তরে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে পেলেন স্বর্ণপদক। এরই মধ্যে প্রশান্ত দাশগুপ্তের কাছেও কিছুদিন গানের তালিম নেন।

॥ রামনগর থানার অন্তর্গত আঞ্চলিক যাত্রার সেকাল ও একাল ॥

ঊনবিংশ শতকের প্রায় প্রথম থেকেই রামনগরের বিভিন্ন অঞ্চলে পালা যাত্রার বেশ প্রচলন ছিল। বিশেষ করে আঞ্চলিক ভাষায় অর্থাৎ বাংলা ও ওড়িয়া ভাষার সংমিশ্রণে রচিত নাটকই বেশির ভাগ অভিনয় হ'তো। বাংলা যাত্রা হ'তো না এমন নয়—তবে তৎকালীন শিক্ষিত ব্যক্তিরা যাত্রাশিল্পকে আদৌ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন না। কাজেই বাংলা যাত্রায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে পাঠ বলবার

মত শিক্ষিত ব্যক্তি কোন ক্রমেই যাত্রা দলে আসতে রাজি হতেন না। এই ধরনের অসুবিধার মধ্যেও বাংলা যাত্রার রিহার্সাল চলত ছ'মাস একবছর ধ'রে। বিবেক গান, নর্তকীদের নাচগান, একক ছেলের গান ইত্যাদি সবই শেখানো হতো। আসরে যখন জুড়ীগান চলতো, তখন বেহালা বাদক আসরে উঠে আনন্দ উত্তেজনায় বিভিন্ন ভঙ্গীতে বেহালা বাজিয়ে দর্শকদের মজিয়ে রাখতেন। তবে ওড়িয়া-বাংলা মিশ্রিত দোভাষী যাত্রা অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিতদের নিয়ে অভিনয় করতে তেমন কোন অসুবিধা হ'তো না। দোভাষী যাত্রার পালাকার, সুরকার ও পরিচালক প্রায় ক্ষেত্রেই একই ব্যক্তি হতেন। তার মধ্যে দেপালের স্বনামধন্য কৃপাসিন্ধু মিশ্রকেই এ অঞ্চলের পালা-যাত্রার পথিকৃৎ বলা যায়। তারপরে ষড়ানন মিশ্রর নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রূপসজ্জা, নৃত্য ও একাধিক যন্ত্র সংগীতের উপর এঁদের অসাধারণ দক্ষতার-কথা আজও শোনা যায়। কৃপাসিন্ধু মিশ্র ও ষড়ানন মিশ্রের পূর্ববর্তী কোন যাত্রা সংস্থা বা যাত্রা গুরুর সন্ধান রামনগরে পাওয়া যায় নি।

পালাকার নয় অথচ সুর, নৃত্য ও নাট্য পরিচালক হিসাবে বেশ কিছু গুণী শিল্পী তখনকার দিনে রামনগরে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। যেমন, পীতাম্বর পুষ্টি—দেপাল, পরেশ দাস—তেঘরী, পীতাম্বর মান্না, দিগম্বর মান্না—রাণীচক, বিভূতি জানা—কালিন্দী, বিপিন জানা—বাগপুর, হীরু প্রধান—পুরুষোত্তমপুর, রাসবিহারী দাস—মধুপুরা, মধু আচার্য—বহিরাগত, হরিহর মণ্ডল—রাণীসাই, হেমচন্দ্র দাস—বাঁধমুড়ি, ভুতকবি—বহিরাগত, ত্রিলোচন বারিক—গোবরা, মধু জানা—শ্যামপুর, গিরিধারী ভঞ্জ—দুর্গাপুর, প্রসন্ন শ্যামল—দেউলী, জগবন্ধু আচার্য—দক্ষিণ বাসুলীপাট, অন্ধ ওস্তাদ গিরিধারী জানা—বহিরাগত, দীনবন্ধু খাঁ, আশুতোষ নায়ক—বহিরাগত, ও মৃত্যুঞ্জয় জানা-মহাজন (বহিরাগত শব্দটি তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছে যাঁরা রামনগরের অধিবাসী নন)। মৃত্যুঞ্জয়বাবু পরবর্তীকালে বাংলা যাত্রা ও কৃষ্ণ যাত্রায় সুর দিয়ে যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। রাসবিহারী দাস যাত্রার আসরে একই সঙ্গে হারমোনিয়াম, কর্নেট, বা বেহালা-হারমোনিয়াম বাজিয়ে হাজার হাজার দর্শককে অভিভূত করে তাঁদের অকুণ্ঠ আশীর্বাদ কুড়িয়ে নিতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই যে, এখানে আলোচ্য বিষয় কেবল পালাযাত্রা, থিয়েটার বা একাংক নাটক নয়।

যাত্রা হলো গ্রামের মানুষের কাছে এক অপরিহার্য বিনোদন মাধ্যম। যে যুগে টি. ভি. দূরের কথা, রেডিও-র নাম-গন্ধ পর্যন্ত ছিল না, সে যুগে বিভিন্ন মঙ্গল গীতি, কৃষ্ণ যাত্রা, যুগীযাত্রা, ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কাহিনী সম্বলিত নাটক গ্রামের মানুষ উপভোগ ক'রে আসছিল। বর্তমানে শুধু বিষয় নির্বাচন নয়, আঙ্গিকের দিক থেকেও যাত্রার বৈশিষ্ট্যগুলি হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ যাত্রাশিল্প হলো লোকশিক্ষার প্রধান বাহক।

রামনগরের বাংলা পালা যাত্রার পর্ণকুটিরে কিছু রুচিশীল ও শিক্ষিত লোকের গোপন আনাগোনা শুরু হ'লো এবং বেশ কিছু উৎসাহী, সংস্কৃতিবান নাট্যগুরু ও সুর গুরুদের আমরা কাছে পেলাম। যেমন আদ্যাচরণ পণ্ডা—(মীরগোদা) প্যারীমোহন দাস অধিকারী (দহদয়া) রঞ্জিৎ বর্মন (মীরগোদা) গণেশ রঞ্জিৎ (সাদি) ত্রিলোচন পাত্র (যশতেঘরী) সুরেন্দ্রনাথ পাত্র (বিলামুড়িয়া) জীবনকৃষ্ণ মণ্ডল, রাধাশ্যাম মণ্ডল, রামচন্দ্র জানা (রাণীসা) সন্তোষ পাত্র (বোধরা) সুধীর মাইতি (উত্তর কচুয়া) অনন্ত কামিলা (কাঞ্জিয়া) সনাতন হাজরা (কানপুর) সুবীর মঙ্গল (চন্দনপুর) বিজয়কৃষ্ণ নায়ক (মিঞাবাগ) প্রফুল্ল পণ্ডা (মানিকাবসান) রমেশ সামন্ত (দেদাঁড়ি) কৃত্তিবাস দাস—(টেংরামারী) অমিয় নায়ক (নরশুিয়া) মতীন সার (তালগাছাড়ী) অতুল মণ্ডল (হলদিয়া) শশাংক গিরি (দক্ষিণ বাশুলীপাট) অঘোর চক্রবর্তী (পূর্ব মুকুন্দপুর) সুশীল মান্না (মৈতনা), বিপ্লব বাগচী (বহিরাগত) জীবন সাঁতরা (বাগমারী) এবং আরও অনেকে।

রামনগরের উৎসাহী সংস্কৃতিবান বহু যুবক প্রবাসে থেকেও বহুগুণী শিল্পী সমন্বয়ে ব্যয়বহুল যাত্রা সংস্থা নিজ নিজ গ্রামে এনে গান করিয়ে যাত্রা শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছেন। রামনগর

থানার মধ্যেকার অঞ্চলে বাংলা পালাযাত্রার বিশাল কর্মকাণ্ডে একমাত্র পুরোধা হিসেবে স্বর্গত আদ্যাচরণ পণ্ডার অবদান নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, সুরকার, নাট্য পরিচালক, সংগীত শিক্ষক ও শিল্পী। এই স্বল্প পরিসরে তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও কর্মদক্ষতার কথা বলে শেষ করা সম্ভব নয়। হাঁটা, চলা, বলা ইত্যাদির ভিতর তাঁর শিল্পী সত্তা ও কাব্য প্রতিভা প্রতিনিয়তই ফুটে উঠতো। ব্যাপক অর্থে সারা রামনগরবাসীই তাঁর ছাত্র। আদ্যাবাবুকে সবাই গুরুজী বলে ডাকতো এবং মানতোও। তিনি পঁচেট গড়ের ফৈয়াজ খাঁ ঘরানার ছাত্র ছিলেন। বেহালা, বাঁশী, তবলা, হারমোনিয়ম প্রভৃতি যন্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। বাধিয়া গ্রামের স্বনামধন্য শ্রীপশুপতি মাইতি মশায়ের একান্ত আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থানুকূল্যে "বাধিয়া প্রভাতী সংগীত বিদ্যালয়" স্থাপিত হয় ইং ১৯৪৮ সালে। গুরুজী আদ্যাবাবু একমাত্র শিক্ষকরূপে দীর্ঘদিন নিযুক্ত ছিলেন। সৎ-দরিদ্র-মেধাবী ছাত্রদের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে পারদর্শী করার জন্য পশুপতিবাবু বিনা খরচে স্ব-গৃহে পাঠ্যপুস্তক ও সংগীত যন্ত্রাদি দিয়ে এই অজ পাড়া গাঁয়ে শিক্ষা সংস্কৃতি প্রচার ও প্রসারের যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা করেছিলেন তা আজ—নিঃসন্দেহে ব্যর্থ হয়ে যায়নি। বৎসরান্তে মীরগোদা গঞ্জে শ্যামাপূজা উপলক্ষে যাত্রার আয়োজনই ছিল প্রভাতী সংগীত বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। প্রচুর অর্থব্যয়ে দূরদূরান্ত থেকে নামী দামী শিল্পীদের আনা হতো। যাত্রার বিশেষ আকর্ষণ থাকতো নৃত্য। নর্তকীদের নৃত্যের জন্য উড়িষ্যা থেকে প্রায় প্রতিবছর আসতো ষোলজন মহিলা, সঙ্গে আসতেন নামকরা নৃত্যশিল্পী। গুরুজী আদ্যাবাবুর সুরে প্রায় মাসাধিক কাল চলতো রিহার্সাল। যাত্রা আসরে মহিলাদের সমবেত নৃত্য বোধহয় রামনগরে এই প্রথম। বেশ কয়েকবার কলকাতা থেকে কথক নৃত্যের মহিলা শিল্পীও আনা হয়েছিল। আদ্যাবাবুর লেখা 'চন্দনেশ্বর' নাটকের কথা কে না জানে। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকের প্রায় শেষার্ধে গুরুজী যাত্রা জগত থেকে সরে গিয়ে হোমিও চিকিৎসা ও আধ্যাত্মিক সাধন-ভজনাদি নিয়ে বাকী জীবনটুকু কাটিয়ে দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই যে, আদ্যাবাবুর সমকালীন প্রতিভাধর তবলা শিল্পী গোপালচন্দ্র বারিক (মীরগোদা) মহাশয় ভারতীয় সংগীত ইতিহাসে উড়ে গোপাল নামে পরিচিতি লাভ করে অমর হয়ে আছেন।

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশ দশকের শেষার্ধ থেকে সত্তরদশক পর্যন্ত সৌখিন যাত্রা ও পেশাদার যাত্রার বেশ হিড়িক পড়ে। পেশাদার দলের মধ্যে কিয়াকুলী যাত্রাপার্টী, সানবালিসাই যাত্রাপার্টী, গোবরা বাগেশ্বরী অপেরা, মান্দার চন্দনেশ্বর অপেরা, খয়রাগুা শ্যামসুন্দর অপেরা, কনিওরা ভগবতী অপেরা, দুর্গাপুর কৃষ্ণকৈবল্যদায়িনী অপেরা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কোন কোন সৌখিন যাত্রাও আমন্ত্রণ মূলক ভাবে বিভিন্ন জায়গায় গান করতো। তাছাড়া সৌখিন যাত্রা প্রত্যেক গ্রামেই ছিল। গ্রামে কিছু অনুষ্ঠান বা বারোয়ারী করা মানেই যাত্রা করা। তখন ভাড়াটে পোশাক ও সুর পার্টীর কল্যাণে অনেকখানি মুস্কিল আসান হয়েছে। আর কোন ঝামেলা নেই। পাঠ মুখস্থ দূরের কথা, এমন কি প্রবেশ প্রস্থান প্রভৃতি স্মরণ করিয়ে দেবার স্মারক (প্রম্পটার) তখন ভাড়ায় পাওয়া যেতো। বইয়ের গানের পরিবর্তে গায়ক বাইরের গানই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গাইতেন। কোন কোন গায়ক প্রম্পট নিয়ে বইয়ের গান গাইতে গিয়ে প্রম্পটারকে কটাক্ষ করে গানের একই কলিতে অযথা 'ওরে-তুই' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগে শ্রোতাদের অতিষ্ঠ করে তুলতেন, পেশাদার দলে তবু কিছু সংগীতের অনুশীলন করার সুযোগ থাকত। সৌখিন যাত্রায় তার আর কোন বালাই থাকলো না। কাজেই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংগীতের যে মহত্ব তার বিস্তৃতির কোন সম্ভাবনা সৌখিন যাত্রায় আর রইল না। তাই সংগীতময়তার জন্য কিছু উৎসাহী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থানুকূল্যে গড়ে উঠলো রামনগরে 'স্বরলিপি সংগীত বিদ্যালয়'। বালিসাই গীতম্ (ভূতনাথ স্মৃতি সংগীত বিদ্যালয়) এবং পরে অবশ্য রামনগর থানায় বেশ কয়েকটি সংগীত বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

যাইহোক, সৌখিন কিংবা পেশাদার যাত্রায় মহিলা শিল্পীর উপস্থিতি তখনও হয়নি। পুরুষরাই মহিলা চরিত্রে বেশ দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করতেন, যা আজকের দিনে অনেক মহিলারাই পারবেন না। মঞ্চ সজ্জায় বিজলী আলো ও মাইকের প্রচলন এখনকার মত তখন ছিল না। আসরে চারপাশে কলাগাছ কেটে খুঁটির মত পোতা হতো, তার উপর সরায় থাকতো রেড়ির তেল, কলকের ভিতর বাতি দিয়ে আলো জ্বালানো হতো। পরে হ্যাজাক, ডে লাইট প্রভৃতি জ্বালিয়ে যাত্রা হতো। কোন কোন বনেদি আসরে বাহারী কাগজের ফুল ঝুলিয়ে নাচের তালে তালে নাড়ানো হতো।

রামনগর থানায় দুটি ব্লক। ১নং ব্লকের ৪নং ইউনিয়ন অর্থাৎ পদিমা ১ প ২নং অঞ্চল এখন দীঘা থানার অন্তর্গত। তা সত্ত্বেও দীঘা থানা রামনগর ১নং ব্লকের অধীনে থাকায় দীঘা থানার যাত্রা শিল্প এবং রামনগর থানার যাত্রা শিল্পকে পৃথক রূপে না ভেঙে একই সঙ্গে আলোচনা করা হল।

রামনগর ও দীঘা থানায় বর্তমান সৌখিন যাত্রা সংস্থা আগের চাইতে অনেক কম। পেশাদার দলতো নেই-ই। 'লক্ষ্মীবরাহ জীউ নাট্য সংস্থা (হলদিয়া)' অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ পরিচিতি লাভ করেছিল। বিভিন্ন যাত্রা প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পেয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিতও করেছিল, 'বাগপুরা মা কালী যাত্রা ইউনিট' অবশ্য ইতিমধ্যে বেশ সুনাম অর্জন করেছে। সৌখিন হয়েও আমন্ত্রণমূলক ভাবে বিভিন্ন আসরে যাত্রাগান করে পেশাদার দলের মত যাত্রা শিল্পের সঠিক মূল্যায়নে নিজেদের নিষ্ঠা ও একাগ্রতায় অনেকেই প্রতিষ্ঠা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। "রামনগরের শিল্পীমহল"—নিঃসন্দেহে সম্ভাবনাময়। তবে যেহেতু সৌখিন, তাই আমন্ত্রণমূলক ভাবে দু'দশ আসর গাইবার কথা তাঁরা ভাবেন না, নিতান্ত সৌখিনতার মধ্যেও প্রতিযোগিতামূলক যাত্রানুষ্ঠানে যথেষ্ট আগ্রহী।

রামনগরের প্রতিষ্ঠিত নাট্যকারের মধ্যে বিশ্বনাথ শী (রাণীসাই), সন্তোষকুমার পাত্র (বোধড়া) ও সর্বেশ্বর পণ্ডার (বিষ্ণুপুর) নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

এবার প্রতিযোগিতা সম্পর্কে দু'চার কথা আলোচনা করবো। প্রতিযোগিতার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না, রামনগর থানার যাত্রা প্রতিযোগিতা প্রথম শুরু নরকুলিতে। তারপর পানিপারুল মোড়, কনিওরা সাঁতড়া, মহাজন হাট, গোবরা, ও সাদী হাটে বারোয়ারী মেলা কিংবা বিশেষ কিছু অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শুরু হয় যাত্রা প্রতিযোগিতা, স্বল্পব্যয়ে চার / পাঁচ রাত্রি যাত্রা-অনুষ্ঠান।

রামনগরের যাত্রা শিল্প অনেক বেশি সুস্পষ্ট এবং সুসমৃদ্ধ হতে পারত যদি রামনগর থানার অন্তর্গত অঞ্চলের উৎসাহী মহিলারা যাত্রায় যোগ দিতেন।...[রমেশ মাইতির রচনা থেকে উদ্ধৃত]

॥ রামনগর স্পোর্টিং এ্যাসোসিয়েশন ॥

কাঁথি মহকুমার অত্যন্ত জনবহুল এবং বর্ধিষ্ণু রামনগরের অন্যতম ও প্রধান "রামনগর স্পোর্টিং এ্যাসোসিয়েশান" (R.S.A), এই মুহূর্তে রামনগরের খেলাধূলা এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারক ও বাহক। এক সময়ে এই অঞ্চলে গ্রামীণ জীবন-যাত্রার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে খেলাধূলা চর্চার প্রধান অন্তরায় ছিল, উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। ১৯৬৫ সালে কয়েকজন উৎসাহী এবং শিক্ষিত ও সাংস্কৃতিক চেতনা সম্পন্ন যুবক প্রাণপাত পরিশ্রমে, প্রভূত অর্থ (চাঁদা তুলে) ব্যয় করে, মাথায় করে শত শত ঝুড়ি মাটি ফেলে, এক বদ্ধ জলাভূমি সংস্কার করেছিলেন। বলা বাহুল্য, জমি সরকারি, অথচ বেসরকারিভাবে দখল করে রাখা হয়েছিল। তরতাজা যুবকেরা যখন মাঠের সংস্কার করে, রামনগর স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশান নামকরণ করে সেই মাঠে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, তখনই জমি বেদখলকারী কয়েকজন, স্বার্থ হানি হচ্ছে দেখে আদালতে নালিশ করেছিল। এই সময়ে কাঁথি কোর্টের প্রখ্যাত এ্যাডভোকেট এবং সাংস্কৃতিক চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তি শান্তি পণ্ডা উক্ত তরুণদের

পাশে দাঁড়িয়ে শুধু কেস টেকআপই করেননি, কেসের যাবতীয় খরচও তিনি বহন করেছিলেন। কেসে জয়লাভ হয়েছিল R.S.A.-এর। ১৯৮৮ সালে এই ক্লাব রেজিষ্ট্রী হয়। এক সময়ে সরকারি যুব কল্যাণ দপ্তর নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এই মাঠেই উদ্‌যাপন করে। এই মাঠেই সরকারের পাঁচ দিন ব্যাপী বর্ণাঢ্য যুব উৎসব হয়েছিল। এই যুব উৎসব উদ্বোধন প্রাক্তন করেছিলেন মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীসুভাষ চক্রবর্তী।

প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার, রামনগরের প্রায় ৫/৭টি ক্লাব উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য কলকাতার জনপ্রিয় যাত্রা দল আনিয়ে যাত্রা করান এই মাঠেই।

রামনগর স্পোর্টিং এ্যাসোসিয়েশান এবং উপরোক্ত ৫/৭টি জনপ্রিয় আঞ্চলিক ক্লাব বা সংগঠন, যাত্রা করিয়ে তার লভ্যাংশের টাকায় নানাবিধ সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কাজ সুসম্পাদিত করেছে। আর. এস. এ'র প্রধান স্বপ্ন তাঁদের মাঠে গড়ে উঠবে স্টেডিয়াম। আগামী প্রজন্মের স্বার্থে, ইতিহাসের স্বার্থে এই গড়ে ওঠার ইতিবৃত্ত হয়তো তুলে ধরবেন, ইতিহাসের পাতায় গ্রথিত করবেন পরবর্তী কোন ঐতিহাসিক বা অন্য কোন উৎসাহী সংস্কৃতি প্রেমী মানুষ।

রামনগরে সংগীত-যাত্রা চর্চার কথা সবিস্তারে এই স্বল্প পরিসরে লেখা সম্ভব নয়, তবুও যে কথা না বললে সংক্ষিপ্ত রচনাও অসম্পূর্ণ থেকে যাবে তা হলো, আগের দিনের সেই দোভাষী যাত্রার সহজিয়া গানের মাদকতা আজও এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মনে থেকে গেছে।

অনেক সমীক্ষা চালিয়ে যা জানা গেছে তা হল,—প্রায় প্রত্যেক গ্রামে পূজানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গীত হয়, মঙ্গলগীতি আলেখ্য। দোভাষী কথকতা ও সহজিয়া সুরের গানগুলো গ্রাম্য মেয়েদের কাছে আজও খুব উপভোগ্যের বিষয়। ছেলেভুলানোর জন্য এইসব গান আজকের বাচ্চাদের মনেও প্রভাব বিস্তার করে। এছাড়া শ্রমিক শ্রেণীর কিছু কর্মঠ প্রবীণ মানুষ অল্পবয়সী যুবকদের সঙ্গে কাজ করার সময় দাদু-নাতির সম্পর্ক নিয়ে রসিকতা করার মত মুক্ত কণ্ঠে কিছু ওড়িয়া নাট্য-সংলাপ ও একের পর এক ওই সব গান গাইতেই থাকেন। কাহিনী ধর্মী কথা ও সহজিয়া সুরের আকর্ষণে স্বভাবতই অন্যান্যরা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। এ অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা ওড়িয়া মিশ্রিত হওয়ায়, বাংলা ভাষা উচ্চারণের দীনতা যতখানি প্রকট গানের ক্ষেত্রেও ঠিক ততখানি। এই মিশ্রভাষা-প্রেম যুগ যুগ ধরে হয়তো এমনি প্রীতির বাঁধনে বাঁধা হয়েই থাকবে। ষাট দশকের শুরু থেকে আশী দশকের শেষার্ধ পর্যন্ত রামনগরের সংগীত চর্চা সম্পর্কে যা জানা যায়, তা আদৌ হতাশাব্যঞ্জক নয়, বরং গৌরবের। তবে অ-সংগীতোপযোগী শব্দ সম্বলিত হিন্দি গানে আধুনিক যুব সমাজ নিমগ্ন। হিস্-হস্-ছ্যাক্-ছুঁক্-টেঁও-ফেঁও ইত্যাদি নানান্ শব্দে যেভাবে মাথা, ঘাড়, কোমর, হাত-পা দোলায় তাতে মনে হয়, "এ একটি তাৎক্ষণিক বিশেষ দুরারোগ্য ব্যাধি।" কানে বা মনে এলেই action শুরু। গানে মানুষ বিমোহিত হয় আত্মস্থ হয় ; কিন্তু অমন বেহেড মাতাল কি কেউ হয়?

শাস্ত্রীয় ও উপশাস্ত্রীয় সংগীত থেকে শুরু করে নজরুলগীতি ও রবীন্দ্র সংগীত চর্চা ইত্যাদি যথেষ্ট বেড়েছে একথা সত্য। কিন্তু নির্ভুল ও পরিচ্ছন্ন গায়ন শৈলীর যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়নি এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় এর কারণ অবশ্য, ত্রুটিপূর্ণ প্রাথমিক প্রস্তুতি। যেমন—অনিয়মিত অনুশীলন, অ-বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষাদান, ছাত্রছাত্রীর সাময়িক শিক্ষাগ্রহণ প্রবণতা ও অভিভাবকদের অনীহা ইত্যাদি। এইসব বাধা কাটিয়ে উঠতে গেলে শিক্ষিত রুচিশীল ব্যক্তিদের আরো বেশি স্বত-স্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসতে হবে। সংগীত প্রেমিক ও শিক্ষকদের নিয়ে সেমিনারের আয়োজন করতে হবে। মাঝে-মধ্যে নেতৃ স্থানীয় অতিথি শিল্পী সহ স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে আমন্ত্রণমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশ গ্রহণে উৎসাহ দিতে হবে, এবং সাংগীতিক প্রতিভা বিকাশের জন্যে ছাত্র-ছাত্রী তথা শিক্ষকদের আত্মনিয়োগ

করতে হবে। তা নাহলে সুন্দর সমাজ ও সুস্থ মানসিকতা গঠনে সংগীতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা—দগদগে আধুনিক সভ্যতার নামে জয়ী হবে এক উলঙ্গ সভ্যতা।

॥ কাঁথি ইয়ং ষ্টার ক্লাব ॥

সমুদ্রের উপকূলবর্তী একটি মহকুমা শহর হলো কাঁথি। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'কণ্টাই'।

কাঁথি বর্ধিষ্ণু-অভিজাত শহর। একমাত্র এই শহর থেকে ৩টি দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। যথা, 'দৈনিক চেতনা', 'দৈনিক উপকূল বার্তা', 'দৈনিক তীরভূমি'। এখানে একাধিক সংঘ বা সংগঠন আছে যারা বিভিন্ন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আঞ্চলিক শিক্ষা-সংস্কৃতির মানকে উন্নত করার ব্যাপারে সদাজাগ্রত! কোন সংস্থা বইমেলা উপস্থাপনের ভিতর দিয়ে শিক্ষা-সংস্কৃতির বিস্তার ঘটাতে বদ্ধপরিকর, আবার কোন সংস্থা বা সংগঠন খেলাধূলা-শরীর চর্চা-নৃত্য-গীত-নাটকের মাধ্যমে বিভিন্ন বয়সের ছেলে-মেয়েদের তৈরি করে। পূজার্চনা, যাত্রা ইত্যাদির মাধ্যমে কোন কোন সংগঠন-মানুষের মনের খোরাক জোগান নিত্য এবং অনেকেই যাত্রা করিয়ে তার লাভের টাকায় সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কাজ করেন। এমনি কয়েকটি ক্লাব বা সংগঠনের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'লায়ন্স ক্লাব', 'লোটাস ক্লাব', 'ইয়ং ষ্টার ক্লাব'।

কাঁথির অন্যতম অভিজাত 'চৌধুরী লজ'-এর প্রাণপুরুষ, দক্ষ অঙ্কন শিল্পী রাজেন্দ্রপ্রসাদ চৌধুরীর সহযোগিতায় এই অঞ্চলের অনেক শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির কাছ থেকে, এখানকার যাত্রাপ্রীতি প্রসঙ্গে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে 'ইয়ং ষ্টার ক্লাব' অন্যতম। এই তথ্য সংগ্রহ এবং ইতিহাসের পাতায় চিবজন্মের মত লিপিবদ্ধ করে রাখার মূলে একমাত্র উদ্দেশ্য, আগামী প্রজন্মের কাছে আঞ্চলিক যুবশক্তির যে অঞ্চল বা জনপ্রীতি, যে সামাজিক কর্তব্য সম্পাদনের বা মানব ধর্ম পালনের সমকালীন মানসিকতা শুধু সেই সত্য ধরে রাখার প্রয়াস মাত্র। পরিতাপের বিষয়, এই সব পবিত্র কর্মকাণ্ডের কোন মূল্যায়নই হয় না। কোন আঞ্চলিক পত্র-পত্রিকায় এই সব জনকল্যাণমূলক, সংস্কৃতিমূলক কর্মকাণ্ডের সংবাদ প্রকাশিত হয় না! কলকাতার সংবাদপত্রগুলিতে গ্রামীণ কোন সাংস্কৃতিক কীর্তির সংবাদ নিয়মিত প্রকাশ করার আলাদা ব্যবস্থা বা ভাবনা না থাকায় কোন ক্লাব বা সংগঠন এই সব কর্মকাণ্ডের সংবাদ পাঠাতে আগ্রহী হন না। এই যে অবজ্ঞা বা অবহেলা গ্রামীণ সংস্কৃতি চেতনার প্রচার বা প্রসারের অন্তরায় তার প্রতি ধিক্কার জানিয়ে, আমি যতটা পেরেছি এই সব কর্মযজ্ঞের কথা একেবারে ইতিহাসের পাতায় চিরস্থায়ী করে দিলাম।

যা হোক, 'ইয়ং ষ্টার ক্লাবের' দীর্ঘস্থায়ী সম্পাদক, স্থানীয় বস্ত্র ব্যবসায়ী, রমেন্দ্রনাথ সিংহ। শ্রীসিংহের বক্তব্য থেকে জানা যায়, ১৯৬৮ সালে স্থানীয় প্রায় ২০০ উৎসাহী যুবক হাতে হাত আর মনে মন লাগিয়ে গড়েছিলেন এই ক্লাব। এই সময়ে কাঁথিতে অনেক ক্লাব ছিল। তার মধ্যে 'বেঙ্গল বুলেট', 'ব্রাইট ষ্টার', 'শ্রাবণী' ভেঙে তৈরি হয় এই 'ইয়ং ষ্টার'। একটি অতি সাধারণ ভাড়া করা ঘরে এই ক্লাবের জন্ম। খেলাধূলা, দুর্গাপূজা ছিল বা থাকবে ক্লাবের প্রধান বৃহৎ কর্মযজ্ঞে। ওয়াড়ী, রেলওয়ে এফ. সি. ক্লাবের ফুটবলার বিশ্বজিৎ বেরা এই ক্লাবের সম্পদ। এই ক্লাবের ফাউণ্ডার সদস্য প্রায় ২০০। সমাজ, জনজীবন এবং ক্লাবের সার্বিক কল্যাণের জন্য আর্থিক শক্তি সঞ্চয়ের তাগিদে এই ক্লাব ১৯৭৭-৭৮ সাল থেকে কলকাতার পেশাদারি যাত্রা দল এনে যাত্রা করাতে থাকে। প্রথম যাত্রা উৎসবের জন্য প্রাথমিক অর্থ সাহায্য দিয়েছিলেন বোধনকুমার দাস। এরপর নিয়মিত প্রতি বছর যাত্রা উৎসব করে তার লভ্যাংশের টাকায় এবং ক্লাবের আয় থেকে ইয়ং ষ্টার ক্লাব নিজস্ব দোতলা বাড়ি ক্রয় করে। যে মাঠে এই ক্লাব প্রথম পূজা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল, পরবর্তী সময়ে আদ্যনাথ পাহাড়ীর কাছ থেকে সেই মাঠ ক্লাব কিনে নেয়। এ ব্যাপারে সম্পাদক রমেন্দ্রবাবুকে সর্ব দিক থেকে সাহায্য করেছিলেন সমস্ত সদস্য, বিশেষ করে বিশ্বজিৎ

বেরা। যাত্রা করিয়ে তার লভ্যাংশের টাকায় ১ থেকে ৩নং ব্লকে প্রায় ৭৪টি স্কুলেব দুস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের বই দিয়েছিল এই ক্লাব, যা বিস্ময়কর রেকর্ড! কন্যাদায় গ্রস্ত পিতাদের আর্থিক সাহায্য দান এই ক্লাবের আদর্শ।

॥ রামনগরের শিল্পীমহল ॥

মেদিনীপুর জেলার রামনগরের 'শিল্পীমহল', অবশ্যই একটি অভিজাত, জনপ্রিয় সৌখিন যাত্রাসংস্থা। সৌখিন অর্থে এই সংস্থার প্রতিটি সদস্য স্ব স্ব কর্মজীবনেব আবর্ত থেকে সরে এসে মানসিক প্রশান্তি, শৈল্পিক ভাবনা প্রবাহের বিকাশ ও বিস্তার এবং চিত্তবিনোদনের তাগিদে সম্মিলিতভাবে নাট্যচর্চা বা যাত্রাপ্রীতিকে কোন রকম দর্শনী না নিয়ে জনমানসের কাছে উপস্থাপিত করেন। দল বলতে, কয়েকজনের নিত্য একত্রীভূত হওয়া এ ক্ষেত্রে যদিও যথার্থ, তবুও যাত্রা উপস্থাপনা প্রসঙ্গে বলা যায়, কলকাতার কোন ঠিকে দলের সার্বিক চেহারার মত নয়, রীতিমত প্রথম শ্রেণীর দলের সমতুল্য। রামনগরের এই সৌখিন যাত্রা দল তাই কলকাতার প্রথম শ্রেণীর যাত্রা দলের প্রযোজনা শক্তিকে খর্ব করতে সক্ষম মনে করি, যখন দেখি তাঁরা 'হিটলার'-এর মত পালা প্রযোজনায় রীতিমত বিস্ময় সৃষ্টি করেন।

রামনগরের এই বৃহত্তম, শক্তিশালী সৌখিন যাত্রাদলের পালায় আঞ্চলিক সাজ পোশাক ও মেক-আপ মেটিরিয়ালস বিক্রেতারাই মহিলা শিল্পী, সুরপার্টী ইত্যাদি ভাড়া দেন। এ ব্যাপারে রামনগরের মলয়কুমার পাল খুবই খ্যাতিমান। যন্ত্রী হিসেবে ননীগোপাল দাস, জয়দেব দাস, ফণিভূষণ মণ্ডল, চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, নগেন দিন্ডা খুবই জনপ্রিয়।

॥ দীঘা আঞ্চলিক লোক সংস্কৃতি ও যাত্রা চর্চা ॥

বেশ কয়েকবছর ধরে দীঘার 'হোটেল সী-হক স্টাফ রিক্রিয়েশান ক্লাবের' তুলনাহীন সাংস্কৃতিক ভূমিকা পালিত হয়ে আসছে। একদিকে উড়িষ্যার বর্ডার, অন্যদিকে রামনগর বিশাল অঞ্চল জুড়ে, বলা বাহুল্য গোটা মেদিনীপুর জেলার জন-জীবনে চিত্ত বিনোদনের একমাত্র মাধ্যম 'যাত্রা'। একদিকে 'যাত্রা' নির্ভর ব্যবসা, অন্যদিকে 'যাত্রা'কে হাতিয়ার করে তামাম মেদিনীপুরে যে জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড বহু কাল ধরে চলে আসছে তার নজির মেলা ভার। সিনেমা, থিয়েটার এবং সাম্প্রতিক কালের ভি. ডি. ও., ভি. সি. আর. গ্রামীণ সাধারণ ও অতিসাধারণ মানুষের ক্ষুদ্রতম একটা অংশের তাৎক্ষণিক চিত্ত বিনোদন করে, কিন্তু তার চাইতে ঢের বেশি এঁদের অর্থনৈতিক কাঠামোকে করে তোলে নড়বড়ে। একমাত্র 'যাত্রা', বিশেষ করে আকাশ ছোঁয়া চাহিদা মিটিয়ে কলকাতা থেকে আনা বড় বড় দলের 'যাত্রা' সম্প্রতি গ্রামীণ জন জীবনে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় এনে দিলেও, যাত্রা করিয়ে তার লভ্যাংশের অর্থে গোটা পশ্চিমবঙ্গে যে জনকল্যাণমূলক বা সমাজ কল্যাণমূলক কাজ হয়েছে তাও বিস্ময়কর! আর এই কারণেই দীঘার অন্যতম প্রখ্যাত বিলাসবহুল 'হোটেল সী-হক'-এর স্টাফ রিক্রিয়েশান ক্লাবের কথা এখানে অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এই বিশাল স্টাফ রিক্রিয়েশান ক্লাবের সম্পাদক গিরীশচন্দ্র রাউত শুধু এই ধরনের একাধিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত নন, তিনি গ্রামপঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্য। এক কথায় প্রচণ্ড ব্যস্ত মানুষ এই গিরীশবাবু। এক প্রশ্নের উত্তরে জানা গেল, ১৯৭৫ সাল নাগাদ হোটেল সী-হকের ১৩/১৪ জন কর্মীবন্ধু মিলিত চেষ্টায় এই ক্লাবটির জন্ম দেন। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৪০ জনের অধিক। অনেক হোটেলের বেশ কিছু কর্মীও এই ক্লাবের সদস্য। সুতরাং এ কথা সত্য, এই ক্লাবের একটা আদর্শগত বৈশিষ্ট্য আছে, আছে হাতে হাত রেখে চলার মত উদার মানসিকতা। সভাপতি ছিলেন শ্রীনারায়ণরঞ্জন সেনগুপ্ত। ক্লাবের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য, নানাবিধ খেলাধূলায় ছেলেদের পারদর্শী করে তোলা। আর এই শপথও এঁরা পালন করেছেন। ভলি বল, হকি, ব্যাডমিণ্টন, কবাডি, হাডুডু, ব্যায়াম ইত্যাদি খেলায় একদিকে যেমন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তেমনি ইতিমধ্যে নানা টুরনামেণ্টে

যোগ দিয়ে অনেক পুরস্কারও পেয়েছেন এই ক্লাবের সদস্যরা। গ্রামীণ জীবনে যাত্রার প্রতি গভীর ভালবাসা চিরকালের। সেই ভালবাসাকে অটুট রাখতে, গ্রামীণ প্রাচীন লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যকে বজায় রাখতে এই স্টাফ রিক্রিয়েশান ক্লাবের আর একটি শাখার জন্ম হয়। খেলাধূলার মত মূল ক্লাব পরিচালিত আর এক শাখা, নাম 'গণমুক্তি যাত্রা সংস্থা'।

১৯৮৭ সালে নরকুলি চৌদ্দমাদল কমিটি আয়োজিত যাত্রা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে এই শাখা সংস্থা গণমুক্তি (নাম করণ ব্যাপারটাও লক্ষণীয়) একাধিক শ্রেষ্ঠ পুরস্কার এবং সামগ্রিক কৃতিত্বের জন্য "স্বর্ণপদক" জয় করে এনেছেন। পালা ছিল, ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পদধ্বনি'। পালার নতুন নাম 'দিন বদলের ডাক'। শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছিলেন, নির্দেশক ও নায়ক বিমল ভঞ্জ, শ্রেষ্ঠ নায়িকার পুরস্কার পান এই অঞ্চলের খুবই শক্তিময়ী অভিনেত্রী বীণা নাগ, শ্রেষ্ঠ প্রোডাকসনের জন্য পুরস্কার পায় 'গণমুক্তি যাত্রা সংস্থা'। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা দরকার, প্রতি মরশুমে অধিকাংশ জেলা, মহকুমার শহরাঞ্চলে, বর্ধিষ্ণু গ্রামে বেশ কয়ে' সন্ধ্যার জন্য যাত্রা প্রতিযোগিতা হয়। নরকুলির প্রখ্যাত চৌদ্দমাদল কমিটিও তার মধ্যে অন্যতম। এঁরা প্রতি মরশুমে সাত দিনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন, অংশ নেয় ৭টি ক্লাব। প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য গণমুক্তি শুধু অভিনন্দিত হয়নি, উক্ত কমিটি খরচ বাবদ ১০০০ টাকাও দিয়েছিল।

১৯৭৯ সালে হোটেল সী-হক স্টাফ রিক্রিয়েশনের গঠনমূলক কাজের ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করার জন্য আদিবাসী কল্যাণমন্ত্রী শ্রীশম্ভু মাণ্ডি অনেকটা জমি দেন এবং সেই জমিতে এই স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিলান্যাসও করেন। ক্লাবের যাবতীয় অনুষ্ঠান ও উৎসব সেই নিজস্ব জমিতে হয়ে থাকে। এঁদের বার্ষিক অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম প্রধান হলো, মে দিবসে পতাকা উত্তোলন। ১৯৮৯ সালে এই পতাকা উত্তোলন করেছিলেন এ. বি. টি. এ-এর সম্পাদক মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সদস্য অরুণ চৌধুরী।

হোটেল সী-হক স্টাফ রিক্রিয়েশান ক্লাব বিগত কয়েক বছর কলকাতার প্রখ্যাত কিছু দলকে আনিয়ে যাত্রা করায়। গিরীশবাবু জানালেন, যাত্রা দেখিয়ে আমরা কোন প্রবেশমূল্য নিই না—

এই স্টাফ রিক্রিয়েশান ক্লাবের সভাপতি ও সম্পাদক অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে বললেন, আমাদের স্টাফ রিক্রিয়েশান ক্লাব কিছু কিছু জনকল্যাণমূলক কাজ করে কিন্তু তার কোন রকম সন্ধানও রাখে না স্থানীয় বা কলকাতার কোন পত্র-পত্রিকা!

পাশেই ছিলেন, কাঁথি মোটর পরিবহন সংস্থার সহকারী সম্পাদক বিমল পট্টনায়ক। তিনি প্রসঙ্গ ক্রমে জানালেন, গিরীশবাবু এই সংস্থারও উপদেষ্টা, সুতরাং বিশ্বকর্মাপূজায় যখন গরীবদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয় অথবা যখন বিশেষ কোন জনকল্যাণমূলক কাজ করা হয় তখনই আমাদের পরিবহন সংস্থার পাশে থাকে হোটেল সী হক স্টাফ রিক্রিয়েশান ক্লাব।

॥ বর্তমান মৎস্য মন্ত্রী কিরণময় নন্দের দাদুর সখের যাত্রাদল ॥

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্যমন্ত্রী শ্রীকিরণময় নন্দের দাদু গঙ্গাধর নন্দ ছিলেন স্বনামধন্য ব্যক্তি। কণ্টাই ও তমলুকের মাঝে মুকবেড়িয়া গ্রাম একদিকে যেমন বর্ধিষ্ণু, অভিজাত, অন্য দিকে তেমনি এর প্রতিটি ঘরেই শিক্ষিত মানুষের বাস। এই গ্রামে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে গঙ্গাধর নন্দ একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়েছিলেন। এর মধ্যে মুকবেড়িয়া সংস্কৃত কলেজ মূলত গঙ্গাধরবাবুরই তৈরি। গঙ্গাধর অত্যন্ত যাত্রা রসিক শুধু ছিলেন না, তাঁর নিজের সখের যাত্রা দল ছিল।

॥ শক্তিধর নন্দ ॥

মুকবেড়িয়ার ইনিও একজন প্রতিষ্ঠিত-অর্থবান ব্যক্তি। ইনিও একটি যাত্রার দল তৈরি করেছিলেন। নিজেও ছিলেন দক্ষ অভিনেতা।

॥ রামনগর অঞ্চলের আরও শিল্পীর সন্ধান ॥

রামনগর অঞ্চলের কয়েকজন প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী হলেন ঃ বীণা নাগ, শেফালী পাল, পূর্ণিমা সরকার, মাধবী জানা, নমিতা পাত্র আরও অনেকে। অনিল পণ্ডিত ঃ প্রবীণ অভিনেতা। মেদিনীপুরের শ্যামসুন্দর অপেরায় প্রথম আত্মপ্রকাশ। পরবর্তী সময়ে কলকাতার বড় দলেও অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনীত শ্রেষ্ঠ চরিত্র নাট্যালোকের 'নফর নবাব'। এক সময়ে নারী চরিত্রে রূপদান করে যথেষ্ট খ্যাতি পেয়েছিলেন, নদিয়া জেলা থেকে স্বর্ণপদকও পেয়েছিলেন।

॥ মেদিনীপুরের সৌখিন যাত্রা সম্প্রদায় ॥

গোটা মেদিনীপুরে সৌখিন যাত্রা দলের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সব যাত্রা দলের যদিও প্রধান উদ্দেশ্য চিত্তবিনোদন, তবুও এ কথা স্বীকার করতেই হয়, এই সব সৌখিন যাত্রা দল বা ক্লাবের সৌজন্যে, পৃষ্ঠপোষকতায় বেঁচে আছে বহু ছোট-আর্থিক অনটন সর্বস্ব, সরকারি সাহায্য বঞ্চিত বাংলার লোক সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক সাজপোশাক ও রূপসজ্জাকররা। বেঁচে আছেন আঞ্চলিক বহু দরিদ্র অথচ প্রতিভাময়ী পেশাদার মহিলা শিল্পী। টিকে আছেন অনেক যন্ত্রী-সুরকার-কণ্ঠ শিল্পী। কারণ, আঞ্চলিক এই যাত্রাদলে উপরোক্ত সাজপোশাক কোম্পানিগুলি দলের চাহিদা অনুসারে শুধু সাজপোশাকই নয়, ভাড়া দেয় সুর পার্টী, প্রতিভাময়ী শিল্পী, শিশু শিল্পী। এই সৌখিন দলগুলির তালিকা এই রকম ঃ বলাকা যাত্রা ইউনিট / সম্পাদক ঃ চিত্তরঞ্জন বেরা / পাথুরিয়া, চাপদা-মেদিঃ শ্রীহরি যাত্রা ইউনিট / সম্পাদক ঃ বাসুদেব সামন্ত / বৃন্দাবন চক, মেদিঃ কাশী বিশ্বনাথ নাট্য সংস্থা / পাকুড়িয়া-মেদিঃ।। **মেদিনীপুর সদরের অন্তর্গত** বিবেকানন্দ আশ্রম (কুইকোটা), নাট্যরূপা (কর্নেলগোলা), নাট্যশ্রী (কর্নেলগোলা), শিল্পীসংঘ (কর্নেলগোলা), বরমাণিকপুর নূতনদল (বরমাণিকপুর), তারা নাট্যপীঠ (মিরবাজার), ধদিকা বাণী নিকেতন (গড়বেতা), সনকা অপেরা পার্টী (গোয়ালতোড়), রাসকুণ্ডু তরুণ সংঘ (রাসকুণ্ডু), বংকাকুল বাণীসংঘ (তালবান্দি), মাঙ্গলিক যুব সংঘ (অমৃতপুর), সৎপতি শীতলা অপেরা পার্টী (পিরাকাটা), জলহরি মৌপাল যাত্রাপার্টী (মৌপাল), শ্রীশ্রীশীতলা মিলন সংঘ (ওয়ারদা), গোপীনাথ পুর রবীন্দ্রসংসদ (খুরসি), চড়াইগ্রাম নবারুণ সমিতি (পুরুলদা), তরুণ সংঘ নাট্য সংস্থা (সোনাকানিয়া), সিঙ্গাই সবুজ সংঘ (মারকুণ্ডা), ব্রাহ্মণীপুর লোকশিক্ষা সংঘ (যশরাজপুর), রামভদ্রপুর জনকল্যাণ সংঘ (বরজগু), অগরার নায়ক তরুণ সংঘ (পারই)। **ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত** কোটালপুর বাসন্তীময়ী বান্ধব অপেরা পার্টী (হরিনগর), শ্রীশ্রীশীতলা মাতা এ্যামেচার ক্লাব (রাধাকান্তপুর), জোতঘনশ্যাম শ্রীশ্রীবৈদ্যনাথ অপেরা ক্লাব (জোতঘনশ্যাম, দাশপুর), জয়কৃষ্ণপুর হেমন্ত সংঘ (সেকেন্দারী), বীরবানপুর কালিকা অপেরা (হেমন্তপুর), মিতালি নাট্য সমাজ (ছত্রগঞ্জ), **কনটাই মহকুমার অন্তর্গত** নটদীঘি আলোক সংঘ (ধানগাঁও), চণ্ডিবেতি বীরেন্দ্র স্মৃতি সংঘ (ভবানীচক), ধানঘড়া মিলন সংঘ (ধানঘড়া), বরচুনপাড়া তরুণ সংঘ (দেউলবাড়), মিলন সংঘ লোকরঞ্জন সংস্থা (ভগবানপুর), পশ্চিম দেউলবাড় তরুণ সংঘ (আড়গোয়াল), সোন্দালপুর শীতলা নাট্য সমাজ (শুখাখোলা), রামচক মিলনী ক্লাব (রামচক), বিক্রম নগর কিশোর সংঘ (হরিয়া), মির[illegible]পুর মণ্ডল শংকরনারায়ণ যুবক সংঘ (সাগরেশ্বর), কালিন্দী অঞ্চল সেবা সংঘ (কালিন্দী), চন্দনপুর অগ্রণী তরুণ সংঘ (মিরগোদা) সাহারা চক মুরারি পল্লী সেবা বাহিনী (সাহারা), উদয় সংঘ (দেবীদাসপুর)। **তমলুক মহকুমার অন্তর্গত** রাতোয়ালী নটরাজ নাট্য সম্প্রদায় (রাধাবল্লভপুর), বরহাতগেছিয়া নিউ সত্যনারায়ণ এ্যামেচার পার্টী (কাকগেছিয়া), বরমন্দগ্রাম কিশোর চক্র (উত্তরধলহরা), দোনাচক কালীমাতা ক্লাব (দোনাচক), রাজারামপুর কিশোর সংঘ যাত্রা পার্টী (শিবরাম নগর), দড়িবেড়িয়া মিতালি সংঘ (দড়িবেড়িয়া), হরশংকরপুর মৈত্রী সংঘ (হরশংকরপুর), উত্তরজিয়ান্দা ক্রীড়া ও শক্তিসিদ্ধা, কলাগেছিয়া পল্লী উন্নয়ন সমিতি (দয়ালদাড়ি),

মসলন্দপুর পল্লী উন্নয়ন সমিতি (গোপালপুর), নেতাজি সংঘ (রামপুর), আমড়াতলা দেশবন্ধু কিশোর সংঘ (আমড়াতলা), কুলাপাড়া শ্রীদুর্গা লাইব্রেরী যাত্রা পার্টী (কোটবার)। **ঝাড়গ্রাম মহকুমা অন্তর্গত** রাঙ্গরাকোলা রামপ্রসাদ যাত্রাভিনয় (খালশিউলি), ঝাড়বনী তরুণ সংঘ (নেকড়া শেল), কুলডিহা জনকল্যাণ সমিতি (কালিমাহুলি), ছাতিনাশোল তরুণ সংঘ (ছাতিনাশোল), ধাদনগিরি শিবদুর্গা অপেরা পার্টী (চোরচিতা), হাতিপোতা বীণাপাণি অপেরা পার্টী (গোপীবল্লভপুর), চিরাকুটি মাধবচন্দ্র স্মৃতি সংঘ (কেশিয়াপোতা), লালগড় মিলনী সংঘ (লালগড়), বাঙ্গাবাঁধ বীণাপাণি ক্লাব (শিলদা), যাত্রা সংস্থা এবং **কেশপুর থানার** কোটা শীতলা অপেরা পার্টী (শিরসা), **খাতাল থানার** জামিরা আদ্যাশক্তি অপেরা পার্টী (চৌকা) ও **নয়াগ্রাম থানার** অন্তর্গত জামিরপাল শচীন্দ্র যাত্রা পার্টী (জামিরপালগড়)। ১৯৬৫—৬৬ আর্থিক বর্ষে মোট ২৬৪০ টাকা সরকারি সাহায্য পেয়েছিল।

মেদিনীপুরের কয়েকজন বিশিষ্ট নায়েকের তালিকা ঃ

১। জগন্নাথ ঘোড়ই / বরদা বাড় / সাগর বাড়, মেদিনীপুর।। ২। নারায়ণ মণ্ডল / তমলুক, মেদিনীপুর।। ৩। সুবোধ হাজরা / পাঁশকুড়া, মেদিনীপুর।। ৪। বলাইকিশোর সামন্ত / রাইন, মেদিনীপুর। ৫। সোমনাথ মিত্র ও ভীমচন্দ্র দাস / কোলাঘাট, মেদিনীপুর।। ৬। জয়দেব বাগ্‌লী / বাথানবেড়িয়া, মেদিনীপুর।। ৭। মনীন্দ্র বেরা / বাথানবেড়িয়া, মেদিনীপুর।। ৮। কিশোরমোহন ঘোষ / কোলা, কোলাঘাট, মেদিঃ।। ৯। সুকুমার দোলই / কোলাঘাট, মেদিঃ।। ১০। নন্দকিশোর বাজাজ / কোলাঘাট, মেদিঃ।। ১১। শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র / কোলাঘাট, মেদিঃ।। ১২। পঙ্কজ জানা / দেউলিয়া, মেদিঃ।। ১৩। হিমাংশুশেখর দত্ত / কুমারহাট, পুলশিটা, মেদিঃ।। ১৪। নিতাইচরণ হাণ্ডা / তেঘরী, দেউলিয়া-মেদিঃ।। ১৫। রণজিৎ চক্রবর্তী / কোলাঘাট, মেদিঃ।। ১৬। জন্মেঞ্জয় মাইতি / কিশোর চক, ভোগপুর, মেদিঃ।। ১৭। শশাঙ্কশেখর মাইতি / হাউর, মেদিঃ।। ১৮। নারায়ণ ভৌমিক / কামার দা, মেদিঃ।। ১৯। সন্তোষ রায় / বাবুয়া, কোলাঘাট, মেদিঃ।। ২০। অনিলকুমার মাইতি, মেদিঃ।

॥ মেদিনীপুরের কয়েকটি বিখ্যাত ডেকরেটিং কোম্পানি ॥

[এই প্রতিষ্ঠানগুলি যাত্রা-থিয়েটারের প্যাণ্ডেল নির্মাতা হিসেবে বিখ্যাত]

- শ্রীদুর্গা ডেকরেটর্স। বরদাবাড়, সাগরবাড়, মেদিনীপুর।
- শ্রীমা ডেকরেটর্স। কোলাঘাট, মেদিনীপুর।
- বীণাপাণি ডেকরেটর। পাঁশকুড়া, মেদিনীপুর।
- তৃপ্তি ডেকরেটর। তমলুক, মেদিনীপুর।
- অনিন্দিতা ডেকরেটর। তমলুক, মেদিনীপুর।
- হেমলতা ডেকরেটর। দেউলিয়া বাজার, মেদিনীপুর।
- মডার্ন ডেকরেটর। ডেবরা, মেদিনীপুর।
- শ্রীদুর্গা ডেকরেটর। শালবনী, মেদিনীপুর।
- গৌরাঙ্গ ডেকরেটর। গৌরা, মেদিনীপুর।
- মা দুর্গা ডেকরেটর। চন্দ্রকোণা, মেদিনীপুর।
- রাধারাণী ডেকরেটর। কোলাঘাট, মেদিনীপুর।
- গীতাঞ্জলি ডেকরেটর। ঘাটাল, মেদিনীপুর।
- দাস ডেকরেটর। মেচেদা, মেদিনীপুর।

নির্মলকুমার মহাপাত্র ঃ যখন মেদিনীপুরের কুলটিকরী গ্রামের অভ্যন্তরে অশিক্ষার অন্ধকার ছড়িয়ে ছিল, যখন কিছু বিত্তবান মানুষের ছেলেরা দূর দূরান্তরের স্কুলে পড়তে যেত, তখন এই

নির্মল মহাপাত্র দূরবর্তী গ্রাম চিঙ্কিগড়ের স্কুলে পড়াশোনা করেন। ছাত্রাবস্থায় আবৃত্তিতে পুরস্কার পান। 'সিরাজের স্বপ্ন' পালায় অভিনয় করে সকলের মন জয় করেন। জমিদার **হরিশচন্দ্র দেব** ছিলেন নাট্যরসিক। সখের থিয়েটার করতেন। নির্মলবাবুর নাট্যগুরু প্রথম তিনি। পরে **পুলিন সামন্তর** কাছে অভিনয়ে তালিম নেন। নির্মলবাবুর প্রথম অভিনীত নাটক 'গয়াতীর্থ', বড় আকারে। ১ম যাত্রাভিনয় 'প্রায়শ্চিত্ত' পালায়। এরপর বহু অভিনয় করেছেন। পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছেন প্রচুর। স্বনামখ্যাত হরিপদ বায়েনের সহযোগিতায় ইনি পেশাদার অভিনেতা হন নাট্য ভারতীতে। মেদিনীপুরের অতীত বিখ্যাত যাত্রাদল 'ধাওয়াপার্টী'র হাওড়া জেলা নিবাসী দক্ষ অভিনেতা অরবিন্দবাবুর কাছে নির্মলবাবু কৃতজ্ঞ।

কুলটিকরীর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, **রবীন্দ্রনাথ জানা**, স্থানীয় সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষ **হরিহর সেনাপতি, শিশিররঞ্জন সাহু, নির্মলবাবু, বরেন্দ্রনাথ খাটুয়ার** মত স্থানীয় শিল্পীদের স্মৃতিচারণ করলেন।

অনিল পণ্ডিত ঃ মেদিনীপুরের শ্যামসুন্দর অপেরায় প্রথম আত্মপ্রকাশ। পরবর্তীকালে শ্রীদুর্গা, মাধবী নাট্য কোং, বীণাপাণি অপেরা, নাট্যলোকে খ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করেন।

॥ বর্ধমান জেলা ॥

- **জামুরিয়া নেতাজি সংঘ।।** গোটা আসানসোল, রাণীগঞ্জ অঞ্চলে জামুরিয়া নেতাজি সংঘ এক উজ্জ্বল নাম। গ্রামীণ পরিবেশের মধ্যে এই সংস্থা সমাজ ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের যে অজস্র নজির রেখেছে তা বাস্তবিক গৌরবের। প্রথমত এঁদের অনেক শ্রম এবং আঞ্চলিক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে পাঠাগার তৈরি হয়েছে তা স্মরণ যোগ্য। নেতাজি ক্লাবের নিজস্ব বিল্ডিং থেকে সামান্য দূরে ৫০ স্কোয়ার ফুট জমির ওপর এঁরা যে সাংস্কৃতিক মঞ্চ বা মুক্তঅঙ্গন তৈরি করেছেন তা শুধু জামুরিয়া, বর্ধমান নয় গোটা পশ্চিমবঙ্গের গৌরব।

  মূলত কলকাতার বিশিষ্ট যাত্রাদলের যাত্রা চ্যারিটি করে তার লভ্যাংশের টাকায় এই স্মরণীয় মুক্ত অঙ্গন এবং ক্লাবের যাবতীয় জনকল্যাণমূলক কাজের অনেকটা অগ্রগতি হয়েছে।
- **কাইতি তরুণ সংঘ।।** বর্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত ব্লক 'টু'-এর কাইতি অঞ্চলের, কাইতি গ্রামের অতি পুরাতন ক্লাব এই তরুণ সংঘ। প্রায় ৪০ বছরের এই সংস্থা প্রকৃত পক্ষে মানুষ গড়ার কাজ করছে। কাইতির বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন, যথা সিদ্ধেশ্বরী ফিশারী ক্লাব, বিশ্বাসপুকুর তফশিলি ক্লাব, দুর্গাবাটী সুকান্ত ক্লাব সম্মিলিত ভাবে অনেক সাংস্কৃতিক কাজ করতেন এক সময়ে। এই ক্লাবের ফুটবল টুরনামেন্ট, ভলিবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিণ্টন, শিশু বিভাগের ক্যারাম-লুডো অত্যন্ত জনপ্রিয়। এই ক্লাবের সদস্য-সদস্যাদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন প্রতিযোগিতা থেকে জয় করে এনেছেন শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট। ক্লাবের উন্নতি, যাবতীয় পরিকল্পনার যে রূপায়ণ অদ্যাবধি ঘটেছে, তার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয়েছে তার বড় অংশ এঁরা তুলেছেন কলকাতার যাত্রাদলের যাত্রা চ্যারিটি করে। মোহন অপেরার কর্ণধার-অভিনেতা চাঁদা বাবদ দু'হাজার টাকা এই ক্লাবে দিয়েছেন। এই ক্লাবের সক্রিয় সদস্য ৭০। ৮০, আর সর্বমোট সদস্য সংখ্যা তিন শতাধিকের বেশি।

॥ কাঁটাগড়িয়ার তরুণ সংঘ (রাণীগঞ্জ) ॥

এই বৃহত্তম সংস্থার সভাপতি নৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সম্পাদক, রাজেন্দ্রপ্রসাদ পাণ্ডে জানিয়ে ছিলেন, ১৯৭২ সাল থেকে এই সংস্থা যাত্রা অনুষ্ঠান করে আসছে, গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প সার্থক করার

জন্য। যাত্রা করিয়ে তার আয়লব্ধ অর্থে ইতিমধ্যে এই ক্লাব তৈরি করেছে গ্রামের রাস্তা। পুকুরের ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছে। সংঘের পাঠাগারের জন্য তৈরি করেছে ২০´ × ৬০´ ফুট লম্বা একটি হল ঘর। সংঘের পক্ষ থেকে গড়ে তোলা হয়েছে, নৈশ বিদ্যালয় এবং ক্লাবের পাকা ঘর৭ প্রতি বছর রাস্তা মেরামতের জন্য সংঘের ফাণ্ডের টাকা ব্যয় করা হয়।

॥ বর্ধমান জেলার বিখ্যাত ড্রেস ও মেক-আপ কোম্পানি ॥

- নটরাজ নাট্য নিকেতন।। যাত্রার নায়ক রাখাল সিংহের প্রতিষ্ঠান। ১নং রামকৃষ্ণ রোড, রাণী সায়ের উত্তরপাড়। দীর্ঘ ১৫ বছর পর বন্ধ হয়।
- ড্রেস হাউস। শ্রীমতী অমিতা ঘোষের এই প্রতিষ্ঠান বর্ধমান জেলার বহু যাত্রা-থিয়েটারের জগতে সুবিখ্যাত। ঠিকানা ঃ রামকৃষ্ণ মোড়। রাণীসায়ের পশ্চিমপাড়। বর্ধমান।
- বিবেকানন্দ পোশাক ঘর। শ্রীমতী মায়া বোসের এই প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি যাত্রা-থিয়েটার মহলে। জেলখানা রোড। বর্ধমান।
- নিরুপমা পোশাক ঘর। যাত্রা-থিয়েটার ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রূপ ও সাজসজ্জা, সুরপার্টী, মহিলা শিল্পী সাপ্লাই করে বিখ্যাত। বড়বাজার। বর্ধমান।
- সাবাসনা নাট্য নিকেতন। মালিক, বীরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী। ঘোষ বাগান। বর্ধমান।
- জগৎ গৌরী নাট্য নিকেতন। জ্যোতিপ্রকাশ ভট্টাচার্যের প্রতিষ্ঠান। ভাতশালা। বর্ধমান।
- নিউ ঠাকুর নাট্য নিকেতন। হরিসাধন দত্তের প্রতিষ্ঠান। রামকৃষ্ণ রোড। রাণীসায়ের উত্তরপাড়। বর্ধমান।
- শ্রীমা ড্রেস হাউস। মুক্ত ভট্টাচার্যের এই প্রতিষ্ঠান খুবই জনপ্রিয়। ঠিকানা, ভাতশালা। বর্ধমান।
- অনামিকা নাট্য নিকেতন। মনোহরপ্রসাদ সিং-এর এই প্রতিষ্ঠান খুবই জনপ্রিয়। বড়বাজার। বর্ধমান।
- নিউ ড্রেস। সুবল মালিকের এই প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি বর্ধমান যাত্রা-থিয়েটার মহলে খুবই ছড়িয়ে আছে। মঙ্গলাপাড়া। বর্ধমান।
- রামকৃষ্ণ নাট্য মন্দির। বর্ধমানের যাত্রা-থিয়েটার মহলে সুকুমার রায়ের এই প্রতিষ্ঠান খুবই জনপ্রিয়। ঠিকানা ঃ মঙ্গলাপাড়া।
- সীতারাম নাট্য নিকেতন। রাণীসায়ের উত্তর পাড়ের এই প্রতিষ্ঠান, বর্ধমান যাত্রা-থিয়েটার মহলে খ্যাত। মালিক ঃ ভক্তিরঞ্জন ব্যানার্জী।

॥ বর্ধমানের নাট্যরূপাঞ্জলি ড্রেস কোং ॥

বর্ধমানের অনন্তরামপুরের মানুষ মিথুনচন্দ্র বর, যাঁর অনেক শ্রম, অনেক সাধনায় গড়ে ওঠা ফলতা থানার সহরার হাট-বাজারে "নাট্যরূপাঞ্জলি ড্রেস কোং" বর্তমানে গ্রামীণ নানা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কাছে খুবই প্রিয়। বয়োবৃদ্ধ এই মিথুনবাবু অভিনয়ের দিকে ঝোঁকেন। অল্প সময়ের মধ্যে অভিনয়ে খ্যাতি পান, এরই মধ্যে পালা রচনা শুরু করেন। বাবার মৃত্যুর পর দারিদ্র্য। তার মধ্যে জমিদারের হাতে নিগৃহীত হন। কিন্তু তিনি থামেননি। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই, জমিদারের অন্যায়ের প্রতিবাদের মধ্যে অভিনয় ও পালা রচনা করেছেন। তাঁর বিখ্যাত পালা "রক্তে রাঙা মাটি", "পোষ্যপুত্র", "কৃষ্ণ দর্শন" আরও কিছু। ডায়মণ্ডহারবার, বজবজ, আবাসবেড়িয়া, হরিণঘাটা, বেহালা, অঞ্চলের বহু গোষ্ঠীর পালায় নির্দেশনার কাজ করেছেন, অভিনয় করেছেন। পরিশেষে গড়েন ঐ ড্রেস কোম্পানি। এর মধ্যে একসময়ে ইউনিয়ন মেম্বার ও পঞ্চায়েত অধ্যক্ষ হন। এই প্রতিষ্ঠানের বর্তমান কর্ণধার মিথুনবাবুর ছেলে মনোজ বর।

সেই সঙ্গে ড্রেসার ও মেক-আপম্যান হিসেবে এখানে আছেন রাম হালদার, সত্য চক্রবর্তী, নিমাই কোটাল। এখন এ সবের সঙ্গে বিভিন্ন দলে মহিলা শিল্পী সরবরাহ করা হয়। মিথুনবাবুর এখন অবসর জীবন।

॥ বর্ধমানের আলোক শিল্পী রুণু অধিকারী ॥

রবীন্দ্রনাথ অধিকারীর ছেলে রুণুর জন্ম ধানবাদ জেলার সাগরডিহিতে। সাগরডিহি চাসনালা কোলিয়ারীর প্রায় গা লাগোয়া। রুণু একেবারে বাল্যে জাতিস্মর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। ওদের বাড়িতে বরাবরই গান-বাজনার রেওয়াজ চলতো। ওর বাবা ছিলেন সংগীত পূজারী। স্বনামধন্য তবলাবাদক মিশিরজী ছিলেন রুণুর বাবাব ছাত্র। রুণু একবার বাড়ির সবাইকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়েছিল। তবলায় হাতে খড়ি না দিয়ে সে তবলা বাজিয়েছিল চৌতালে (ধ্রুপদ)। সকলে বলেছিলেন, এ ছেলে জাতিস্মর। পূর্ব জন্মে নিশ্চয় তবলাবাদক ছিল। এরপর থেকে রুণুকে তবলায় পাকা করে তোলার ব্যবস্থা হয়। দিদির সাথে বিহারের অনেক বিচিত্রানুষ্ঠানে রুণু তবলা বাজিয়ে পাকা তবলচিব সম্মান পেয়েছিলেন। বাবা রবীন্দ্রবাবু মাঝে মাঝে সখের থিয়েটারে অভিনয় করতেন, নির্দেশকও ছিলেন। সেই সূত্রে দিদিও নাটকে অভিনয় করতেন। সুতরাং নাটকের প্রতি রুণুর আকর্ষণ ছিল তীব্র। একবার বাবার উৎসাহে 'টিপুসুলতান' নাটকে পাথরডিহির এক ক্লাবের হয়ে অভিনয় করেছিলেন রুণু। টিপুর দুই ছেলের একজন হয়েছিলেন রুণু। অন্যজন ছোটবোন ডালিয়া। সেই রুণুর প্রথম অভিনয়। চরিত্র, মোয়াজুদ্দীন। এই সঙ্গে নিত্য চলত তবলা চর্চা।

ঝরিয়ায় থাকতেন ফণিভূষণ ব্যানার্জী। ফণিবাবু ছিলেন ঝরিয়া রাজবাড়ির সভা গায়ক। ফণিবাবু হলেন রুণুর দাদু সম্পর্কে। সেই ফণিবাবুর পরিবেশে রুণুর দিন কাটত, পাশাপাশি স্কুলের পড়াশোনা। এ বাড়িতে একদিন সাহিত্যেরও আসর বসত। লেখিকা প্রফুল্লবালা আর চারুবালা, যাঁদের গ্রন্থাবলী হয়তো অনেক প্রাচীন গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে, এঁরা ছিলেন রুণুর ঠাকুমা। সেই পরিবারে অর্থাৎ রবীন্দ্রবাবুর সংসারে একদিন আকস্মিক ভাবে এক সর্বনাশা ঝড় আছড়ে পড়ল। দাবিদ্র্য গ্রাস করল সবাইকে। এই সময়ে রুণুর বড় জামাইবাবু যাত্রায় অভিনয় করতেন। গাইতেন বিবেকের গান। সংসার অচল বলে এবং শিল্পের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা বলে একদিন বড়দি আর বড়জামাইবাবুর পরামর্শে রুণুর মেজদি বাবার অনুমতি নিয়ে যাত্রা করতে গেলেন। জামাইবাবুর সঙ্গে শ্যালিকা অভিনয় করবে তাতে ভয়ের কী, সেটা মঙ্গল। বড় জামাইবাবু সুশীল চ্যাটার্জী (টুকু) ছিলেন বর্ধমান জেলার ডাকসাইটে গায়ক-অভিনেতা। এ ভাবেই নানা ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে একদিন বর্ধমানের বিখ্যাত একটি ড্রেসার কোম্পানির মাষ্টার মশাই গোপালচন্দ্র দাসের সাহায্যে রুণুরও অভিনেতা জীবন শুরু হলো। পেশাদার অভিনেতা হিসেবে রুণুর আত্মপ্রকাশ "মসনদ কার" পালায়। তারপর কলকাতার বিখ্যাত যাত্রা দলগুলির নৃত্যশিল্পী, স্বনামধন্য বৈজু পোদ্দার রুণুকে নিয়ে আসেন প্রখ্যাত 'লোকনাট্যে'। এ দলে উৎপল দত্ত রচিত-নির্দেশিত "দিল্লী চলো" পালায় ৭০ টাকা মাইনে, দিনে বারো আনা আর রাতে দশ আনা জলপানিতে রুণুর শিল্পী জীবন আরম্ভ হয়। এই পালায় 'মাতুং' চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি। "উৎপল দত্ত আমাকে এক সেট পেন দিয়েছিলেন যেদিন বিশ্বরূপায় প্রথম লোকনাট্যের "সমুদ্র শাসন" হয়। এই দানের মর্যাদা আমি দিতে পারিনি—" কথাগুলোর রুণুর।

রুণু শুধু অভিনয় করতেন না, তিনি আলোক শিল্পীর সহকারী হিসেবেও কাজ করতেন। দিল্লী চলো, সন্ন্যাসীর তরবারি, ঝড়, বৈশাখী মেঘ, সমুদ্র শাসন, জয় বাংলা ইত্যাদি পালায় রুণু অভিনয় ও সহকারী আলোক শিল্পী হিসেবে কাজ করেন। তারপর নিউপ্রভাস, আবার লোকনাট্য, শিল্পীতীর্থে সহ আলোক শিল্পী হিসেবে কাজ করেন। এর মধ্যে অনেক পালায় তবলাও বাজিয়েছেন ইনি। আলোক শিল্পী হিসেবে প্রথম কাজ শেখেন স্বপন ব্যানার্জীর কাছে। "লোকশিল্পী' অপেরায়

রুণু প্রথম একক আলোক শিল্পী হন। 'জ্বালা' সেই পালা। লোকশিল্পী অপেরা বন্ধ হবার পর রুণু বর্ধমানে গড়ে তোলেন নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। **অধিকারী ইলেকট্রিকস্**। তারপর শুরু করেন গ্রাম-গঞ্জের ছোট-বড়, পেশাদার-অপেশাদার যাত্রাদলে আলোক সম্পাতের কাজ। এখন রুণু ওখানে যেমন স্বনামখ্যাত তেমনি প্রতিষ্ঠিত!

রুণু কাজ করেছেন আরও অনেক দলে, তার মধ্যে অন্যতম দল হলো আর্য অপেরা, শ্রীমা নাট্য কোম্পানি। কিন্তু রুণুর মত এক সহজ-সরল এবং পবিত্র অথচ অনেক বিষয়ের শক্তিমান কারিগর, প্রতিভাধব শিল্পী—আলোক সম্পাতকারীকে চরমতম আঘাত করেছেন 'বর্ণ পরিচয়'এর পরবর্তী মালিক-শিল্পী স্বনামধন্যা মঞ্জু দে। রুণু বললেন, "আমার মত এক সাধারণ মানুষের ২৮শত টাকা মঞ্জু দে'র মত শিল্পী দেননি, এই মঞ্জু দে'র ব্যবহারই আমার মনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে রেখেছে! চিৎপুর আমাকে গড়েছে যেমন ভেঙেছে তার বেশি, আমার আপন মাটি আমাকে কলকাতা থেকে সরিয়ে এনেছে, এ আমার গৌরব—"।

॥ কাটোয়ার শ্রীখণ্ড এবং যাত্রা ॥

"কাটোয়া অঞ্চলের যাত্রা বিষয়ে আলোচনা করলে প্রাসঙ্গিক ভাবেই এসে পড়ে শ্রীখণ্ড অঞ্চলের বাগটোনা গ্রামের কথা। একেবারে নিম্নবিত্ত তফশিল সম্প্রদায়ভুক্ত এই গ্রাম। তবু লোকশিল্পের এই শাখাটি এই গ্রামের মানুষের সামাজিক প্রতীক।...খুব সম্ভব স্বর্গীয় শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্তীর উদ্যোগেই এই গ্রামে যাত্রাপালার নিঃশব্দ প্রবেশ। শ্যাম প্রসাদ চক্রবর্তী মূলত ছিলেন সংগীতকার। জীবনের একটানা ৪০টি বছর তিনি কাটিয়েছিলেন যাত্রার সঙ্গে নানা ভাবে, বিশেষ করে সুরকার হিসেবে।"

শ্যামাপ্রসাদবাবুর হাতে যে যাত্রার সূচনা, তা পূর্ণতা পায় তাঁরই পুত্র ভুবনেশ্বর চক্রবর্তীর হাতে। বাংলা যাত্রার সার্বিক উন্নতি সাধনে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। সংস্কৃত চর্চা করেন, পরিশেষে 'সাহিত্য কাব্য ব্যাকরণ তীর্থ' উপাধি পান। এ ব্যাপারে তাঁর সহযোগী বর্ধমান জেলার **মঙ্গলকোটের গোপীপদ যশ**। এই গোপীবাবুর **লিঙ্গেশ্বর অপেরায়** কিংবদন্তী পুরুষ হিসেবে চিহ্নিত হন ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী। তিনি একটানা ১৪। ১৫ বছর এখানে অভিনয় করেছিলেন। সখের যাত্রার অভিনেতা যে কী বিস্ময়কর সমাদর পেয়েছিলেন তা বর্ণনাতীত।

ভুবনেশ্বরবাবুও একটা যাত্রাদল খুলেছিলেন। নাম, 'বাগেশ্বরী অপেরা'। একটানা ১৫। ২০ বছর ধরে এই দল নিজের ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষের চিত্তবিনোদনের কাজ করেছে। ভুবনেশ্বর চক্রবর্তীর লেখা একাধিক পালার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, 'সতীর পণ', 'তাপস কন্যা', 'বিধবার সিঁথের সিঁদুর' (কাল্পনিক), 'রক্তঝরা রাত্রি', 'বধূর চোখে জল' ইত্যাদি। এই অপেরা ভেঙে যাবার পরও ভুবনেশ্বর তাঁর যাত্রার প্রতি গভীর ভালবাসা থেকে বিভিন্ন সখের দলে অভিনয় করে বেড়িয়েছেন। কিছু পুরস্কারও পেয়েছিলেন। ১৯৯৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি এই সংস্কৃতিমনা মানুষটি আকস্মিক হৃদরোগে মারা যান।

[শ্রীখণ্ডের বাগটোনা গ্রামের পূর্ণেন্দুশেখর চক্রবর্তীর পাঠানো তথ্য থেকে।]

॥ বর্ধমানের আরও দল ॥

রামকৃষ্ণ অপেরা। এর মালিক ছিলেন বর্ধমান নীরাপুর নিবাসী পি. চক্রবর্তী। এটা ছিল পেশাদার দল। এই দলে আরামবাগের কয়েকজন পেশাদার অভিনেতা ছিলেন। আরও কিছু পেশাদার দল ছিল, যেমন ঃ নাট্য বীথি, দীপ্তি অপেরা, গণনাট্য, কল্পতরু অপেরা, লোকশিল্পী অপেরা ইত্যাদি। লোকশিল্পী অপেরার মালিক ছিলেন কৃষ্ণদাস মণ্ডল, এই কৃষ্ণদাস একসময়ে তরুণ অপেরার শিল্পী ছিলেন। শম্ভু বাগ এই লোকশিল্পীর পালাকার ছিলেন।

বর্ধমানের যাত্রাশিল্পী ও কলাকুশলীদের সন্ধান যা মেলে, তার মধ্যে বসন্তকুমার দাস একজন।

ইনি বসন্ত মাষ্টার হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বালক বয়সে ইনি একানি দলে ছিলেন পবে স্ত্রী চরিত্রে রূপদান করে খ্যাতি পান। এরপর অভিনয় জীবন ত্যাগ করে বিভিন্ন যাত্রা দলে হারমোনিয়াম ও বেহালা বাজিয়ে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

॥ পোশাক / স্টেজ লাইট সমিতি ॥

বর্ধমান জেলায় যাত্রা-থিয়েটারের পোশাক, স্টেজ লাইট থেকে শিল্পী পর্যন্ত ভাড়া দেওয়া বা যোগাযোগ করিয়ে দেবার মত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এত বেশি যে, এঁবা সম্মিলিত ভাবে একটি সমিতি গঠন করতে সমর্থ হয়েছেন। এই সমিতির যে কার্যকরী কমিটি তার সদস্য ছিলেন সর্বশ্রী অলোক ঘোষ, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সৌমেন চক্রবর্তী, জ্যোতিপ্রকাশ ভট্টাচার্য, তপন গাঙ্গুলী, রুণু অধিকারী, মনোহর প্রসাদ সিং, সুকুমার হাজরা, মুক্ত ভট্টাচার্য, বাবলু শেখ, নিজাম মির্দা আরও অনেকে।

॥ বর্ধমানের আরও সমাজসেবী যাত্রা সংগঠন ॥

জুনারা পল্লীমঙ্গল সমিতি (বাঘেন), বাঘেন এ. ই. সেন্টার (বাঘেন), সোনাপলাশী বাউল দল (সোনাপলাশী), কারমাম উদয়ন বাউল দল (কারমাম), কোনা কৃষ্ণপুর নেতাজি তরুণ পাঠাগার, কিউনতা কিষাণ সংঘ (কিউনতা), রূপসা যুবক সমিতি (রূপসা), কিউল তরুণ সংঘ পাঠাগার (ছগ্রাম), গোপাল বেরা অভিযাত্রী সংঘ (গোপালবেরা), সুলতানপুর তরুণ সংঘ (বেইন), পূর্বাঞ্চল হিন্দুমিলন মন্দির (নসীগ্রাম), হয়বৎপুর পল্লীমঙ্গল সমিতি, বিল্বগ্রাম কিষাণ সংঘ, প্রতাপপুর পাঠচক্র, ভূয়েরা তরুণ সংঘ (ভূয়েরা), পরজ অগ্রদূত সংঘ (পরজ), মথুরাপুর অপেবা পার্টী (মথুরাপুর), ডালিম গোড়িয়া নবতরুণ সংঘ, কলানবগ্রাম শিক্ষানিকেতন (কলানবগ্রাম), রসুলপুর অনাথ সমিতি (রসুলপুর), বৈদ্যডাঙ্গা জয়যাত্রী সংঘ (রসুলপুর), রামনগর পল্লী উন্নয়ন সমিতি, ধাত্রীগ্রাম নেতাজি সংঘ, কালীতলা মিলন সমিতি (পাতুলি), দামুদরপাড়া নিউ বান্ধব অপেরা (রায়পুর), লক্ষ্মীনারায়ণপুর বীণাপাণি ক্লাব (পাতুলি), নারায়ণপুর নাট্য সংঘ (পাতুলি), ফুলগ্রাম ক্ষেত্রপাল অপেরা পার্টী ; গোসুম্বা নেতাজি যুব সংঘ (আলমপুর), মাস্থালী ত্রিনয়নী অপেরা পার্টী, পলিতা যুব সংঘ, হাটরি বিধান সংঘ, আউশড়া গ্রামউন্নয়ন সমিতি (পলসোনা), মীরাপোনা নিউ মঙ্গল অপেরা (কাজোরা), সুনুর নেতাজী সংঘ (আমরুণ), জড়গ্রাম তরুণ কালী অপেরা, ভুরি যুগের যাত্রী ক্লাব, বড়পলাশন সুহৃদসংঘ, মদনটৌরি সম্মেলনী নাট্যসংঘ, পাবড়া তরুণ সংঘ, তমলুকা কমল অপেরা পার্টী, নিরোলগাছি আদিবাড়ি অপেরা, ধীরগা পাড়া পল্লী উন্নয়ন সমিতি, পিপলন ঈশ্বর বড়রাজ অপেরা, কুসুমগ্রাম গরবিয়া অপেরা পার্টি, হরিপুর হিতসাধনী সমিতি (খাজুরডিহি), গৌরডাঙ্গা প্রগতি সংঘ, নওদা পাড়া রামরঞ্জন মেমোরিয়াল (কালিকাপুর), ঝামটপুর পল্লী উন্নয়ন সমিতি, বাবলাডিহি মনসামঙ্গল এ্যামেচার পার্টী, মহরতুবা তরুণ সংঘ অপেরা, আমগোড়িয়া বাগচীপাড়া যুব সংঘ।

* এর মধ্যে প্রায় সব সংগঠনই ১৯৬৫-৬৬ আর্থিক বর্ষে পঃ বঃ সরকারের পক্ষ থেকে ২৫০০ টাকা করে আর্থিক অনুদান লাভ করেছে।

॥ দুর্গাপুর ॥

যাত্রার ইতিহাসে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে এবং তার আশপাশের গ্রামাঞ্চলে যাত্রার মাধ্যমে মানুষের চিত্তবিনোদনের যে বাতাবরণ, ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে যাত্রা হলেও তার লভ্যাংশের টাকায় সাংগঠনিক ও জনকল্যাণমূলক কাজ করার যে মানসিকতা, তার ইতিহাস রচয়িতা বলতে বোঝায় দুর্গাপুরের রবীন্দ্র পরিষদকে। এই পরিষদের স্রষ্টা ও কর্মীরা এই শিল্পাঞ্চলের সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনা বোধ, সাহিত্য প্রেমের ধারাবাহিকতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার প্রেরণা। এই প্রেরণার চিরস্থায়ী নিদর্শন হিসেবে, রবীন্দ্র পরিষদের একদা যাত্রা করিয়ে তার লভ্যাংশের টাকায় গড়ে

তোলা বিশাল পাঠাগার আজও সজীব। যাত্রা করিয়ে তার লভ্যাংশের টাকায় রবীন্দ্র পরিষদ-এর নিজস্ব বিশাল বাড়ি নির্মাণ, নিঃসন্দেহে উল্লেখ্যযোগ্য কৃতিত্ব। বছর কয়েক হলো এই পুরোধা প্রতিষ্ঠানের 'যাত্রা' ভাবনা নিশ্চিহ্ন! এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ ছিলেন মিষ্টার দাশগুপ্ত।

এইচ. কে. দত্ত হলেন দুর্গাপুর বুক স্টলের (বেনাচিতি) প্রতিষ্ঠাতা-কর্ণধার। পঞ্চাশের দশকের শেষাশেষি সময়ে অর্থাৎ দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের সূচনা থেকে ভবিষ্যৎ মাথায় রেখে, শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রয়োজন মেটাতে হীরেন্দ্রকুমার দত্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রথম এই পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা বিক্রির প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। এই বর্ণনাতীত শ্রমের মধ্যেই আবার দুর্গাপুরের নানাবিধ গঠনমূলক সংস্কৃতি চর্চার দিকটা সমানভাবে বাঁচিয়ে রেখেছেন। বর্তমানে শ্রীদত্ত তাঁর সুযোগ্য দুই পুত্রের ওপরে এই প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় দায়িত্বভার তুলে দিয়ে '৯৫ পর্যন্ত উজ্জ্বল সংঘের যাত্রা কমিটির কার্যকরী সভাপতি ছিলেন। দুর্গাপুরের বিখ্যাত ডাক্তার সমর মুখার্জী অবসর নিয়েও উক্ত যাত্রা কমিটির প্রাণপুরুষ। এই যাত্রা কমিটির সূচনা থেকে একটানা কয়েক বছর সভাপতির আসনে ছিলেন হীরেনবাবু। তেমনি এই কমিটির আর একজন প্রাণপুরুষ হলেন সুব্রত দাস, যিনি অদ্যাবধি সম্পাদকের আসনে অধিষ্ঠিত।

উজ্জ্বল সংঘ ঃ ট্রাংক রোড, দুর্গাপুর-৪। ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। সাব ডিভিশনাল স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশানের অন্তর্ভুক্ত ক্লাব। টেকনিক্যাল কিছু অসুবিধা থাকার জন্য, ১৯৭৬ সালে এই ক্লাব ট্রাংক রোড / হোস্টেল এভিন্যু নামে একটি আলাদা কমিটি তৈবি করে, আঞ্চলিক অধিবাসীদের চিত্তবিনোদনের জন্য যাত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে। কখনও মূল সংঘের নামে, কখনো কমিটির নামে এঁরা প্রতি বছর যাত্রাদল বায়না করে আনেন। এই ক্লাব গড়ে তোলার পিছনে যাঁদের শ্রম এবং সহযোগিতা ছিল তাঁদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য, সর্বশ্রী এইচ. কে. দত্ত, সুব্রত দাস, সুব্রত মুখার্জী, বীরেন সরকার, বিকাশ সরকার, বাদল মজুমদার, জীবন আইচ, প্রদীপ পাল, মৃত্যুঞ্জয় সিংহ এবং ডঃ সমর মুখার্জী। এঁরা সকলেই দুর্গাপুর ইস্পাত প্রকল্পের কর্মী। যাত্রা কমিটির বেশির ভাগ উজ্জ্বল সংঘের সদস্য। এই সংঘে সব রকম খেলাধূলার যেমন ব্যবস্থা আছে, তেমনি ছোটদের নিয়ে নাটক, আবৃত্তি, গান, নাচ, ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং এলাকার ছোট-বড়দের নিয়ে স্পোর্টস করানো সংঘের মুখ্য কাজ হলেও আঞ্চলিক জনকল্যাণমূলক নানা কাজ ও সাহায্যদান এই ক্লাবের বিশেষ ভূমিকা। ১৯৭৬ সালে কলকাতার প্রথম শ্রেণীর পাঁচটি যাত্রাদল এনে, প্রতি বছর যাত্রা করানোর পরিকল্পনার সূচনা করেন এঁরা। এই যাত্রা করিয়ে তার লভ্যাংশের টাকায় এলাকার মুকুল স্কুলের ঘর, ক্লাবের পাকা ঘর, বন্যাত্রাণ তহবিলে দান, মণিমেলার বাজনা, খেলার সরঞ্জাম, দুস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য অনেক কাজই এঁরা করেছেন, আজও যা অব্যাহত আছে।

॥ আসানসোল শ্রীপুর স্টাফ ক্লাব যাত্রা কমিটি ॥

১৯৭৬ সালে এই স্টাফ ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থ সংগ্রহ অভিযানের জন্য এই ক্লাব, পরিকল্পনা অনুসারে একটি যাত্রা কমিটি তৈরি করে প্রথম বছরেই অগ্রগামী যাত্রা প্রতিষ্ঠানের 'রাইকমল' পালার মাধ্যমে সেই কমিটির পত্তন করেন। আঞ্চলিক নানা জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য এবং সাধারণ মানুষের চিত্ত বিনোদনের জন্য এই যাত্রা অনুষ্ঠানে কলকাতার বড় দলের সঙ্গে হিন্দি যাত্রা নাটকও থাকে। যাত্রার টাকায় এঁরা শ্রীপুর শিশু বিদ্যালয় শুধু প্রতিষ্ঠা করেননি, স্কুলের জন্য পাকা বাড়ি তৈরি করেছেন। বৃহত্তম দুর্গাপূজার জন্য যাবতীয় তৈজসপত্র এঁরা কিনেছেন এবং ক্লাবের নানা উন্নতি সাধন করেছেন।

॥ খনি এবং শিল্পাঞ্চলের যাত্রা ভাবনা ॥

দুর্গাপুরের বেনাচিতি অঞ্চলের সুভাষ পল্লী নিবাসী, সাহিত্যিক, এবং সাংবাদিক মধু চট্টোপাধ্যায় তাঁর সাম্প্রতিক বৃহত্তম গবেষণা "শিল্পাঞ্চলের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি" গ্রন্থে যাত্রা

প্রসঙ্গ এনেছেন বিস্তারিত। আমার এই যাত্রার ইতিহাস গ্রন্থে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের স্বার্থে তার অংশ বিশেষ হাজির করছি।

"...১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে মফঃস্বল শহরেব মধ্যে আসানসোলেই প্রথম গড়ে ওঠে "প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘ।" এর পুর্বনাম ছিল 'ফ্যাসিস্ত বিরোধী লেখক সংঘ'।.. ১৯৪৫ অব্দ পর্যন্ত এই সংঘের নাম ছিল 'ফ্যাসিস্ত বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'। এই সময়ের পরে সর্বভারতীয় সংঘের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এর নতুন নামকরণ হয় 'প্রগতি লেখক সংঘ'। এই সংঘ গড়ে তোলার প্রধান প্রেরণা দাতা ছিলেন কমঃ বিজয় পাল। সহযোগী ছিলেন শ্রীরামশঙ্কর চৌধুরী। প্রতিষ্ঠাকালে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।...প্রগতি সংঘের উদ্যোগে তৈরি হয় "প্রগতি গ্রন্থাগার"। এই গ্রন্থাগারের জন্য টাকা তুলতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল গণনাট্য সংঘের ছায়া নাটক 'শহীদেব ডাক'। ১৯৪৭ অব্দের জুন-জুলাই নাগাদ সকালে বার্ণপুরে ও রাতে আসানসোল নিউ এম্পায়াব সিনেমা হলে (আগে নাম ছিল 'গোধূলি'।) মঞ্চস্থ হয়েছিল উক্ত নাটক। উপস্থিত ছিলেন গণনাট্য সংঘেব সর্বভাবতীয় সম্পাদক নিরঞ্জন সেন, জ্ঞান মজুমদার ও সলিল চৌধুরী প্রমুখ।...মূল কথা গণনাট্য সংঘ এবং প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ যুগ্মভাবে নাচ, গান, নাটক, আবৃত্তির মাধ্যমে আসানসোল শিল্পাঞ্চলেব জনজীবনে বিপুল সাড়া জাগায়।..নাটকের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সাথে পুজোয় সময় নানা জাযগা থেকে ডাক আসতে থাকে। মাঝে মাঝে লরী করে গানের স্কোয়াড বের হতো কোলিয়ারি এলাকায়।

১৯৪৭ সালে আসানসোলে গঠিত হয় 'টেলিফোন বিক্রিযেশান ক্লাব' , সংক্ষেপে টি. আর. সি। নাটক প্রযোজনার ক্ষেত্রে এই ক্লাবের অবদান অনবদ্য। মঞ্চস্থাপত্যে, আলোক সম্পাতে, আবহসঙ্গীতে, অভিনয়ে এই ক্লাবের মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া গেছে প্রতি নাট্যানুষ্ঠানে। নাট্য-উৎসব শুরু হতো নির্ধারিত সময়ে, ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায়।...

কুলটি প্রাচীন শিল্পশহর। সংস্কৃতি-চর্চায় বরাবরই বিশেষ ভূমিকা ছিল। ১৯৩৪-৩৫ সাল থেকে এখানে শুরু হয় সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চা। এখানকার সংস্কৃতি চর্চার প্রাণকেন্দ্র 'ইণ্ডিয়ান ইনস্‌টিটিউিট হল'। (বর্তমানে 'কুলটি সম্মিলনী')। এরা নিয়মিত 'যাত্রাভিনয়' করত। সীতা, মিশরকুমারী পালার মত পৌরাণিক, ঐতিহাসিক নাটকের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে মাটির ঘর, দুই পুরুষ, তটিনীর বিচার ইত্যাদি।

দুর্গাপুর অঞ্চলের নাট্যচর্চার ইতিহাস খুব প্রাচীন। আগেই বলেছি নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের কথা, যাঁর জন্ম হয়েছিল দুর্গাপুর মহকুমার ফরিদপুর থানার অন্তর্গত ধরণী গ্রামে।

শ্রীকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়। ইনি নীলকণ্ঠের ছোট ভাই। দাদার জীবদ্দশাতেই দলের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। 'নারদ'-এর ভূমিকায় অভিনয় করতেন। স্বরচিত গান প্রাসঙ্গিকভাবেই পালায় যুক্ত করতেন। কিন্তু ভক্তি সংগীতও লিখেছিলেন। ১৯১১ সালে নীলকণ্ঠের মৃত্যুর পর দলের দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাঁর পুত্র **কমলাকান্ত**। দীর্ঘদিন সুনামের সঙ্গে দল চালান। সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন কমলাকান্ত। নীলকণ্ঠের বাঁধা আসরগুলি তিনি ধরে রেখেছিলেন। ১৩৪২ সনে অগ্রহায়ণে কমলাকান্তের মৃত্যুর পর মূলত 'কৃষ্ণযাত্রা'র ঐতিহ্য ধারার অবসান হয়।

দুর্গাদাস। কমলাকান্তের পুত্র। বাবার মৃত্যুর পর পিতৃ-পিতামহের ঐতিহ্য ইনি বজায় রেখেছিলেন। নতুন দল গঠন করেছিলেন ১৩৫৯ সনে। তাঁরই পরামর্শে ধবনীতে গঠিত হয় "নীলকণ্ঠ সংগীত সমাজ"। নীলকণ্ঠের স্মৃতিরক্ষার জন্য গঠিত হয়েছে নীলকণ্ঠ স্মৃতি রক্ষা কমিটি। এই কমিটির উদ্যোগে প্রতি বছর নীলকণ্ঠের জন্মদিন পালিত হয়।

নীলকণ্ঠ রোড নীলকণ্ঠের নামে নাম। দুর্গাপুরের শিবপুর থেকে মলানদীঘি হয়ে ধবনীর ভিতর দিয়ে যে রাস্তাটি নাচন গ্রামে পৌঁছেছে তার নামই 'নীলকণ্ঠ রোড'।

স্বাধীনতার বহু আগে থেকেই দুর্গাপুর অঞ্চলে যাত্রা, থিয়েটারের প্রচলন ছিল। সাগর ডাঙ্গা-গোপীনাথপুরে বাঁশের উইংস প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। আশেপাশের জমিদাররা যাত্রায় উৎসাহ দিতেন। এর ফলে একের পর এক অপেরা পার্টী তৈরি হয় অনেক। **রাঢ়েশ্বর অপেরা পার্টী** আরা গ্রামের জমিদার ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহে তৈরি হয়। অভিনেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ভোলানাথ সামন্ত, রাধারমন প্রামাণিক, চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ব্যাসকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। **ধর্মরাজ অপেরা পার্টী ঃ** অণ্ডাল গ্রামের উৎসাহী মানুষেরা তৈরি করেন। উল্লেখযোগ্য অভিনেতারা হলেন, শ্যামাপদ গাঙ্গুলী, কৃষ্ণপদ রায়, রামপদ চ্যাটার্জী, সত্যকিঙ্কর চ্যাটার্জী, জিতেন রায়, অনিলবরণ রায়, বিশ্বনাথ পাল, সুবল হালদার, মনোরঞ্জন। **সরস্বতী ক্লাব ঃ সর্বমঙ্গলা সমিতি ঃ** সুজড়া ও মেজেডিহির গ্রামবাসীদের উদ্যোগে তৈরি। এখানকার উল্লেখযোগ্য অভিনেতারা হলেন, নবগোপাল ঘটক, পাঁচকড়ি ঘটক, নকুলেশ্বব ঘটক, শৈলেন ঘটক, রাখাল ঘটক, ক্ষুদিরাম ব্যানার্জী, বাদল ব্যানার্জী, কুলদানন্দ ব্যানার্জী। পরে সরস্বতী ক্লাব বদলে হয় সর্বমঙ্গলা সমিতি। অভিনেতা হলেন লাবণ্যগোপাল ঘটক, দু'কড়ি ঘটক, সন্তোষ ঘটক, উমাপদ ঘটক, ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ মুখার্জী, অরবিন্দ ব্যানার্জী, গুঁইরাম চ্যাটার্জী আবও অনেকে। **বীণাপাণি নাট্যসমাজ ঃ** দুর্গাপুর অঞ্চলে নাট্যচর্চার পথিকৃৎ গোপালপুরের এই ক্লাব। উৎসাহদাতা ও অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ মদনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রমানাথ ব্যানার্জী, নিত্যানন্দ ব্যানার্জী, যদুনাথ ব্যানার্জী, বনবিহারী চ্যাটার্জী, তায়েশ মিশ্র, ব্রহ্মানন্দ দত্ত। **নাচন নাট্য সমাজ ঃ** নাচন গ্রামের অধিবাসীদের তৈরি। উল্লেখযোগ্য অভিনেতারা হলেন, মুরারীদাস ব্যানার্জী, রামপদ মুখার্জী, কালীশঙ্কর ব্যানার্জী, ফকির ব্যানার্জী, নতুল ব্যানার্জী, ভূতনাথ ব্যানার্জী, কমলাক্ষ ব্যানার্জী, গোঁসাই দত্ত। সংগীতে দেবেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ও নিমাইচন্দ্র রায়। সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী ছিলেন অসামান্য বেহালাদার। দলের পরিচালক ছিলেন, কাণ্ডেশ্বর গ্রামের মৃত্যুঞ্জয় সাহা। **বেনাচিতি মিলন সংঘ / মিতালি সংঘ / অগ্রণী সাংস্কৃতিক পরিষদ ঃ** ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে কয়েকজন উৎসাহী মানুষ বেনাচিতির মহিমকাপুর প্লটে তৈরি করেন মিলন সংঘ। এদের প্রথম যাত্রাপালাব নাম ছিল "রক্তস্নান"। সদস্যদের মতান্তরের জন্য পরে নাম বদলে হয় মিতালী সংঘ। পবে আবার নাম বদলে হয় মিতালী নাট্য পরিষদ। এর ১ম অভিনীত পালা নিরাপদ মণ্ডলের 'সর্বহারা'। পরে হয় 'ময়নামহল'।

পরে এই সংঘের সদস্যরা যুক্ত হন অগ্রণী সংঘের সঙ্গে। পরে নাম বদলে হয় অগ্রণী সাংস্কৃতিক পরিষদ। ১৯৬৫ সালের মহালয়ায় এই পরিষদের উদ্বোধন করেন আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়।

১৯৫৮-৫৯ সাল নাগাদ নবগঠিত দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীতে শ্রমিক-কর্মচারীদের বসবাস ঘটতে থাকে ক্রমাগত। অধিক সংখ্যায় শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত বাঙালী তরুণদের আগমনে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য গড়ে উঠতে থাকে একের পর এক সংগঠন। ১৯৫৮ সালে দুর্গাপুর ইস্পাতের গ্যারেজ শাখা (বিভাগ) প্রথম যাত্রার মহড়া শুরু করে। এই সময়েই প্রয়াত কসক বকসীর উদ্যোগে জন্ম নেয় 'শৌভিক' নাট্য সংস্থা। এর পরই স্টোর্স বিভাগের কালীপদ বসুর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে একটি বৃহৎ নাট্য গোষ্ঠী। তখন এই গোষ্ঠীতে ছিলেন বাসুদেব চক্রবর্তী, ননী মুখার্জী, এস. কে. সান্যাল, মনীশ মজুমদার, সাধন ব্যানার্জী, অভয় দাস, শৈলেন চ্যাটার্জী, ডাঃ মদনমোহন দত্ত, ডাঃ পি. কে. দত্ত, সুনীল ব্যানার্জী, হেমাঙ্গ গাঙ্গুলী, স্বদেশ চ্যাটার্জী প্রমুখ। এই গোষ্ঠী ভেঙ্গে পরে বিভিন্ন গোষ্ঠীর জন্ম। ১৯৫৯ সালে কালীপদ বসুর পরিচালনায় একাধিক পালা বা নাটক মঞ্চস্থ হয়। অভয়পদ দাসের ছিল নবনাট্য আন্দোলনের প্রতি ঝোঁক। পরে অভয়পদ, নিত্যানন্দ ব্যানার্জী, নির্মাল্য ব্যানার্জী, সুনীল ব্যানার্জী, বেরিয়ে এসে আলাদাভাবে দল তৈরি করেন। ১৯৬০ সালে

স্বদেশ চট্টোপাধ্যায়, তার কোয়ার্টারে গড়ে তোলেন 'মিলনী নাট্য গোষ্ঠী'। এই গোষ্ঠীতে ছিলেন শান্তনু ঘোষ, তপেন চট্টোপাধ্যায়, গোপাল ভট্টাচার্য, বসন্ত দে, হরিহর ব্যানার্জী, বিশ্বনাথ ব্যানার্জী, বলাই ব্যানার্জী, শুভেন্দু মুখার্জী আরও অনেকে। প্রথমদিকে বাইরে থেকে মহিলা শিল্পী আনা হতো, পরে মহিলা কর্মী বন্ধুদের নিয়ে অভিনয় করত 'মিলনী'। ষাটের দশকে সাগর ডাঙ্গা অঞ্চলে তৈরি হয় আর একটি 'মিলনী' নামের নাট্য গোষ্ঠী।

এ ছাড়া বহু যাত্রার সংগঠনের হদিশ এখন আর না পাওয়া গেলেও, এক সময়ে ছিল বা এখনও আছে এমন সংগঠনের তালিকা এই রকম ঃ পি. এণ্ড. টি যাত্রা ইউনিট, গ্যারেজ রিক্রিয়েশান ক্লাব, ধনুরা প্লট যাত্রা ইউনিট, ফরিদপুর যাত্রাপার্টি, রামকৃষ্ণ অপেরা, শিবাজী ড্রামাটিক ক্লাব, পলাশডিহি যুবক গোষ্ঠী, সাঁঝের আসর, গণমুক্তি, যাযাবর, নবজাগরণ ইত্যাদি।

ইস্পাত নগরীর আশে পাশে প্রায় প্রতিটি গ্রামে আছে নাট্য গোষ্ঠী। প্রায় ৫০ বছর আগে ভরতপুর গ্রামে একটি নাট্য সংস্থা ছিল। নাম **"ভরতপুর পল্লিমঙ্গল সমিতি"**। ছিল **"বালক সঙ্গীতের দল"**। প্রায় ৩০ বছর আগে ঐ গ্রামে 'মহিলা সমিতি'র নাট্য সংস্থা ছিল। তার পরিচালক ছিলেন, তুলিকা ভট্টাচার্য।"

গোটা শিল্পাঞ্চলে যাত্রাব চাইতে ঢের বেশি নাট্যচর্চার প্রবণতা। এর মধ্যে আবার জন্ম নিয়েছে এমন কিছু সংগঠন বা সংগঠনের শাখা সংগঠন যাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন নিছক ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে নানাভাবে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে উপরি অর্থ উপার্জন করেন। আবার লভ্যাংশের টাকায় কিছু কিছু সমাজ কল্যাণের কাজও করে থাকেন। এ সব ক্ষেত্রে একাধিক মানুষকে প্রয়োজন হয়, যাঁরা নানাভাবে এই সব ব্যবসায়িক সংস্কৃতি চর্চার কাজে লাগেন। যেমন কলকাতা থেকে যাত্রা দল আনিয়ে যাত্রা করানোর জন্য দরকার হয় বুকিং এজেন্ট। সার্কাস থেকে জাদু, বিচিত্রানুষ্ঠান থেকে সংগীত সম্মেলনের জন্য দরকার হয় যোগ্যতর ব্যক্তি! **স্বপন মিত্র** তেমনি একজন ব্যক্তি। মূলত স্বপন মিত্র একজন সরকারি কর্মী। কর্মজীবনের মধ্যে ফাঁক-ফোকর থাকলে বা ছুটির পর নিজেকে একটু একটু করে গড়ে তুলেছিলেন মূকাভিনেতা হিসেবে। একাধিক প্রতিষ্ঠিত মূকাভিনেতার চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী মূকাভিনেতা হিসেবে দাগ রেখে যাবার মুখে, আকস্মিক দুর্ঘটনায় নিহত অরুণাভ মজুমদারের সমসাময়িক স্বপন মিত্র, চাকরি পেয়ে কলকাতা ছেড়ে দুর্গাপুরে চলে আসায়, যদিও পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বহু মানুষ সৎ মূকাভিনয় দেখা থেকে বঞ্চিত, তবুও স্বপন আজও সুনামের সঙ্গে সেই প্রতিভাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। দুর্গাপুর অঞ্চলে স্বপন মিত্র আর একটি ব্যাপারে খ্যাতিমান হন, তা হলো বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সার্থক সংযোগকারী হিসেবে। অনুষ্ঠান পরিচালক হিসেবে! বর্তমানে এই শিল্পী ও সাংস্কৃতিক চেতনাময় মানুষ দুর্গাপুর অঞ্চলের মুচিপাড়ার অন্তর্গত বামুনআড়ার বেণুবনে নিজস্ব বাসভবনে থেকেও মূকাভিনয়, নানাবিধ সাংস্কৃতিক কর্মের সঙ্গে যুক্ত। **অমল চক্রবর্তী ঃ** দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে এই আর এক প্রতিভা। দুর্গাপুরে কর্মজীবনের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে ইনি নীরবে যেমন সংগীত সাধনায় যুক্ত থেকেছেন, তেমনি স্বপন মিত্রের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্বের সূত্রে জড়িয়ে থেকেছেন নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে। তারই মধ্যে প্রথম দিকে নিজের কোয়ার্টারে, পরে সিটি সেণ্ট্রালস্থিত গ্রীণ পার্কে নিজস্ব বাসভবনে বসে নীরবে সুর রচনায় যেমন নিমগ্ন আছেন, তেমনি আত্মস্থ আছেন গীতি কবিতা রচনায়।

এই ধরনের বহু প্রতিভার সন্ধান মেলে দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীতে অথচ সেই সব প্রতিভার সন্ধান করে তা যথার্থ স্বীকৃতি দানের ব্যবস্থা নেই এই দেশে, এমন কি শিল্পাঞ্চলের শিক্ষিত-সাংস্কৃতিক চেতনা সম্পন্ন অনেকেরই।

॥ অতিরিক্ত সংযোজন ॥

● নদিয়া জেলায় আরও যাত্রা প্রীতি

তারক দাস স্মৃতি নাট্য সংঘ। কৃষ্ণনগরের এই জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক সংগঠনের নামের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে আছে, আঞ্চলিক সংস্কৃতিমনা, লোকনাট্যপ্রেমী এবং সামাজিক স্তরের বহু বিদ্বজনের কৃতজ্ঞতা স্থাপনের মানসিকতা। স্বাধীনতা সংগ্রামী, সংস্কৃতি প্রেমী, যাত্রা অনুরাগী, নদিয়ার শ্রদ্ধেয় জননেতা তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দেহরক্ষা করেন ১৯৫৭ সালে। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের মত কর্মবীর যখন সমাজ কল্যাণের নানা স্তরে প্রায় উৎসর্গীকৃত একটি জীবন, তখনও মাঝে মাঝেই দেখা যেত তাঁকে বিভিন্ন যাত্রার আসরে একজন নিষ্ঠাবান দর্শক হিসেবে। জনজীবনে যাত্রার যে প্রয়োজন অনিবার্য, তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বলেই মিউনিসিপ্যালিটির মাঠে এক সময়ে তিনি ডাক দিয়েছিলেন নদিয়া জেলা সাংস্কৃতিক সম্মেলনের। সেই সম্মেলনে যাত্রাকে আশাতীত গুরুত্ব দিয়ে টাউন হলে এক গুণীজন সম্বর্ধনার আয়োজন করেছিলেন, আর সেখানেই তাঁর ইচ্ছানুসারে একটি গুণীজন সম্বর্ধনার ভিতর দিয়ে তৎকালীন শক্তিমান অভিনেতা পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্মানিত করা হয়েছিল। যাত্রা ও পাশাপাশি জনজীবনের কল্যাণ কামনায় উৎসর্গীকৃত এই জীবনের স্মৃতিকে উজ্জ্বল করে রাখার জন্যই তারকবাবুকে মৃত্যুর পরও অমর করে রাখা সম্ভব হয়েছে এই সংঘের জন্যে।

এক সময়ে এই সংস্থা উপহার দিয়েছিল একাধিক শক্তিমান অভিনেতা এবং পালা। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য গোপীনাথ দত্তের নাম। মিউনিসিপ্যালিটির এই কর্মীর নারী চরিত্রে অভিনয় চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তা ছাড়া প্রভাত বিশ্বাস, কালীবাবু, জ্ঞান মুখার্জী, বীরেন বিশ্বাস, সত্য সাধুখাঁ, শিবাজী লাহিড়ী, তারাপদ দাস, অজিত বিশ্বাস, বিভূতি শিকদার, গৌর অধিকাবী, পরেশ রায়-কৃষ্ণনগরের যাত্রা প্রেমের ইতিহাস থেকে এঁদের নাম কোনদিন মুছে যাবে না।

অদ্যাবধি কৃষ্ণনগরের কয়েকশত পরিবার সৌখিন দলের জন্য জীবন ধারণ করে আছেন। যেমন, একাধিক পোশাক কোম্পানি, যাত্রা দল, বেশকারী, শিশুশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, গায়ক, অভিনেত্রীরা।

॥ নদিয়ার যুব গোষ্ঠী ॥

নদিয়ার এই যুব গোষ্ঠী বহু বছর ধরে যাত্রা করিয়ে তার লভ্যাংশের টাকায় গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের জামা-কাপড় দেওয়া থেকে একাধিক কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে আবেদনের ভিত্তিতে আর্থিক সাহায্য দিয়ে আসছে।

॥ জেলা হুগলী ॥

১৯২৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে হুগলীতে বিদ্যামন্দিরের বিপ্লবী যুবকদের চেষ্টায় "মুকুন্দ দাসের যাত্রা" অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল চকবাজারের বারোয়ারী তলায়। এখানে যাত্রা হতো ৭ দিন। ঐ সময়ে নজরুল ছিলেন চকবাজারের বাড়িতে। মুকুন্দ দাসের শিষ্য কালীকৃষ্ণ নট্টও সেই সময়ে অভিনেতা হিসেবে যশ করেছিলেন।

কবি নজরুলের সঙ্গে এই সময়ে মুকুন্দ দাসের দেখা হয়। হুগলীতে প্রতিদিন সকাল বেলা নজরুলের বাড়িতে গিয়ে মুকুন্দ দাস নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। মুকুন্দ দাস তাঁর যাত্রায় 'কবিরই' লেখা কয়েকটি বাছাই করা বৈপ্লবিক গান গাইবার জন্য অনুরোধ করেন।

বারোয়ারীতলা সেদিন ছিল জনসমাগমে পূর্ণ। কবি নজরুল মুকুন্দ দাসের মত গেরুয়া রঙের জামা (আলখাল্লা), পাগড়ি, কাপড় পরে আসরে অবতীর্ণ হয়ে যে প্রাণবন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন, যে উদ্দীপন সঞ্চার করেছিলেন তা বর্ণনাতীত। একদিকে মুকুন্দ দাস আর তাঁর উপযুক্ত শিষ্য কালীকৃষ্ণ

নষ্ট অন্যদিকে কবি নজরুল। এই দিনটা হুগলীর চকবাজারের মানুষ হয়তো হয়েছে, কিন্তু ইতিহাস বিস্মৃত হবে না কোনদিন।

কবি বলতেন, "মুকুন্দ দাসের জীবন ছিল মাতৃভক্তির প্রতীক। আমি তাঁর মত সাধকের কাছ থেকে অনেক প্রেরণা পেয়েছি—"

* * * * * *

১৩৩১ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে তারকেশ্বরের লম্পট মোহান্তের বিরুদ্ধে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল, তার ব্যাপক জন সমর্থনের জন্য কবি নজরুল দেশবন্ধুর অনুরোধে একটি গান লিখে হুগলীসহ বিভিন্ন জেলাব গ্রামে ও শহরে চারণ কবি রূপে সেই গান বজ্রকণ্ঠে গেয়ে বেড়িয়েছিলেন।

॥ আরামবাগ ॥

এখানকার মানুষের হৃদয় জুড়ে আছে যাত্রা। এখানকার একটি অঞ্চলকে তো বলা হয় মিনি চিৎপুর। একটা অঞ্চলে পরপর সারিবদ্ধ একাধিক পোশাক কোম্পানি। মাহিলা শিল্পী, গায়ক, নায়ক থেকে তীরধনুক পর্যন্ত সব কিছু ভাড়া পাওয়া যায় এখানে। এখানে পেশাদার আর সখের দলের সংখ্যা যেমন অনেক তেমনি এই প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যবসাও নেহাৎ মন্দ নয়। এঁদের ইউনিয়ন আছে। নাম ঃ "হুগলী জেলা পোশাক ব্যবসায়ী সমিতি।" এই সমিতির সদস্যভুক্ত, জনপ্রিয় কোম্পানিগুলি হলো ঃ সিংহবাহিনী, জয়গুরু, রূপমঞ্চ, সীমা পোশাকালয়, মহাশক্তি পোশাকালয়।

॥ পেশাদার যাত্রাদল ॥

এখনকার সেবা পেশাদাব যাত্রাদল হলো 'জগদ্ধাত্রী অপেরা'।

॥ আরামবাগের দুর্গাদাসবাবু ॥

যাত্রা ব্যবসা করেই দুর্গাদাসবাবু আবামবাগের অন্যতম সেরা ধনী ব্যক্তি। যাত্রা করিয়ে তার লাভের টাকা থেকে বাড়ি, গাড়ি, জমি যেমন করেছেন, তেমনি শোনা যায় দুই কন্যার বিয়েতে খরচ করেছিলেন ৩ লক্ষ টাকা।

॥ হুগলী জেলার আরও পোশাক কোম্পানি ॥

- কামারপুকুর ঃ রামকৃষ্ণ পরিচ্ছদাগার/ রূপশ্রী পোশাকালয়/মাইতি পোশাকালয়।
- তারকেশ্বর ঃ রূপায়ণ/নিত্যানন্দ অপেরা ঃ এঁরা যাত্রার জন্য সব কিছু সাপ্লাই করেন।
- জামালপুর ঃ কালীমাতা পোশাকালয়/অনিন্দিতা/রূপশ্রী নাট্য নিকেতন।
- শ্রীরামপুর ঃ বিশ্বাস ডেকরেটর্স।
- মাহেশ ঃ নীলমণি।

॥ জেলা বাঁকুড়া ॥

বাঁকুড়া জেলার 'যাত্রা' সংস্কৃতি বা ভাবনার বিবরণ দেবার আগে, প্রথমেই স্বনামধন্য শিল্পী রামকিংকরের যাত্রার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও আকর্ষণের কথা বলা দরকার। এ প্রসঙ্গে 'বাঁকুড়া লোক সংস্কৃতি' পত্রিকার ৭ম বর্ষ-৩য় "বাল্য ও কৈশোর জীবনে রামকিংকর" বিশেষ সংখ্যায় স্বয়ং সম্পাদক শৈলেন দাসের রচনা থেকে কিছুটা তুলে ধরা যাক। শ্রীদাস লিখছেন ঃ

"রামকিংকরের সাথে শিল্প ও ভাস্কর্য শিল্পের লোকায়ত চরিত্র নূতন যুগের সম্পর্ক অবিস্মরণীয়। ইউরোপিয় অনুকরণ বা অনুসরণ নয়, বরং বলা চলে বাঙলার নিজস্ব ভাবধারায় বিকশিত। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে শিল্প-সমৃদ্ধ ভারতের স্রোত ধারায় স্নান করে রামকিংকর ভারতীয় জনজীবনে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন, তাকে ভারতীয় শিল্পী সমাজ এবং পৃথিবীর শিল্প জগৎ সমাদর করেছে....."

রামকিংকর এক বিদ্রোহের প্রতীক। ভারতীয় ভাস্কর্যের আধুনিক যুগের প্রথম ভাস্কর। বাঁকুড়ার পাঠকপাড়ার বর্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ এক ধনাঢ্য পরিবার [চট্টোপাধ্যায়] রামকিংকরের বাবা চণ্ডীচরণকে বাঁকুড়ায় আনেন। তাঁকে প্রভূত ভূ-সম্পত্তিও দান করেন। সেই চণ্ডীচরণ আর তাঁর স্ত্রী সম্পূর্ণা দেবীর সন্তান রামকিংকর। ১৯০৬ সালের ২৫ মে রামকিংকরের জন্ম। জীবনের উনিশটি বছর তিনি বাঁকুড়ায় কাটান। বাল্য ও কৈশোরের জীবন তাঁর শিল্প সৌকর্যে মূর্ত হয়। ছেলেবেলার জীবনযাত্রা বা জীবন স্মৃতি শান্তিনিকেতনের অঙ্গনে উজ্জ্বলতর হয়। প্রতিভার প্রকৃত স্ফূরণ, শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রছত্র ছায়ায়।

রামকিংকরের পদবী "বেইজ"। এই "বেইজ" প্রসঙ্গে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন বলেছেন—"বেইজ টাইটেল অদ্ভুত, বৈদ্য বৈজ 'বেইজ' হয়েছে। "বেইজ" লেখাটি রামকিংকরের নিজস্ব স্টাইল।"

বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষের প্রথম সোপানে অধিষ্ঠিত শিল্পীদের মধ্যে যামিনী রায় আর রামকিংকরের নাম বিশেষভাবে উজ্জ্বল। এই দুই লোক-শিল্পীই বাঁকুড়ার লোক। আপন খেয়ালে বেড়ে ওঠা বৃক্ষ যেমন মহীরূহ হয়, রামকিংকরও তাই। তিনি প্রথম জীবনে কোন শিল্পীর কাছে তালিম নেননি। কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর শিল্পী জীবনের অভিষেক হয়নি। আপন খেয়াল, আপনার ভাবপ্রবাহে, অন্তরের সুগভীর টানে মাটি দিয়ে তৈরি এক গ্রামীণ কোঠাঘরের নির্জন কোণে বসে তুলে নিয়েছিলেন রং আর তুলি। কারও ওপরে কোনদিন নিজের ভার চাপিয়ে অথবা প্রত্যাশা করে চলেননি রামকিংকর।

বাঁকুড়া প্রধানত কৃষি নির্ভর জেলা। শহর। এই শহর বা গ্রামীণ জীবনে অর্থনৈতিক পরিকাঠামোটির শক্ত ভিত্ নেই, কিন্তু এখানে যা সম্পদ তা হলো লৌকিক শিল্প চেতনার নানা রঙের পূর্ণ পাত্র। এখানে বিশেষ করে গ্রামীণ পরিমণ্ডলের যে সৌন্দর্য তা মূর্ত হয় বিভিন্ন রকমের মেলায়। এই মেলা যথার্থ শিল্প আর শিল্পীদের মিলন মেলায় রূপান্তরিত। রামকিংকর সেই সব মেলার অন্যতম শরিক। ছেলেবেলায় এক্তেশ্বর, হরিপুর, সোনাতোপল, তপোবন, সঙ্কট তারিণী ইত্যাদি মেলায় রামকিংকর ছুটে যেতেন। মায়ের সঙ্গে যে মেলা ঘুরে ঘুরে মানুষের বিচিত্র সমাবেশ, বিচিত্র শিল্প চেতনার সৌন্দর্য আহরণ করতেন, সেই মেলায় একদিন রামকুমার আঁকা ছবির সম্ভার নিয়ে যেতে থাকলেন। ছবি হলো পণ্য। এইভাবে একটু একটু করে জলের সঙ্গে রং মেশার মত রামকিংকরের জীবনধারা মিলে মিশে একাকার হয়ে যেতে থাকল গ্রাম গ্রামান্তরের মৃৎ শিল্পীদের জীবনধারার সঙ্গে। পুতুল গড়া, ছবি আঁকা, মাটি দিয়ে মনের খেয়াল রূপদান রামকিংকরের নেশা হয়ে দাঁড়াল। সবাই চাইলেন রাম জাতিগত বৃত্তি দিয়ে সংসারের হাল টানুক, কিন্তু রামকিংকরের মনের প্রত্যাশা আরও গভীর। তিনি কষ্টের সংসারে জন্ম নিয়ে কষ্টকে ভালবাসতে শিখেছেন তখন, তবুও ইচ্ছে লেখাপড়া শেখার। সে সাধ মেটে না। কোন পথে গেলে প্রকৃত শিক্ষা, তার সন্ধান মেলা ভার। বাবার মন পাল্টালো। তিনি চাইলেন না তাঁর আদরের রাম আদর্শচ্যুত হোক। তিনি প্রেরণা জোগালেন। বললেন,—ছবি আঁক-পুতুল গড়-একদিন মাটির পুতুলই তোকে মানুষ গড়ার কাজ এনে দেবে—

এবার রামকিংকরের ডাক আসতে থাকল এখান-ওখান থেকে। কেউ চায় রামকে দিয়ে থিয়েটারের সিন-সিনারী আঁকাতে, কেউ চায় 'মূর্তি' গড়িয়ে নিতে, কারও বা নানা রঙের পোস্টার চাই। কারও ইচ্ছে গ্রামের যাত্রাপালা বা থিয়েটারের পরিচালনার ভার দিতে।

এই ভাবে রামকিংকরের যখন নাম ছড়ালো, তখন তিনি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে আসেন। শুধু রামানন্দ নন, অনেক বিশেষ ব্যক্তিত্ব রামকিংকরকে ভালবেসে ফেললেন। রামানন্দ

একদিন রামকিংকরকে পৌঁছে দিলেন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে। ১৯২৫ সালের এক শুভ মুহূর্ত থেকে কবির সান্নিধ্যে রামকিংকরের জীবন রথের চাকা নতুনভাবে ঘুরতে থাকল।

আগেই বলেছি, গ্রামের সখের থিয়েটার-যাত্রা থেকে ডাক আসত রামকিংকরের। এসব তাঁর শুধু ভালই লাগত না, মনের ওপর গভীর ছাপও ফেলত, যার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর চিত্র কর্মে। যাত্রা আসরের চমৎকার ছবি এঁকেছেন তিনি।

ভাদু পুজো বাঁকুড়ার এক প্রাচীন স্মরণীয় অনুষ্ঠান। লৌকিক সংস্কৃতির অঙ্গ ভাদু গান। কার্তিক পুজো যেমন পতিতাদের একটা বড় পুজো এ অঞ্চলে, তেমনি এই অঞ্চলে ভাদুপুজো প্রধানতঃ ছিল পতিতাদের। বাঁকুড়ার যুগী পাড়ার এক পাশে এই পতিতা পল্লী ছিল। রামকিংকরের বাড়ির কাছেও দু'চার ঘর পতিতা ছিল। ভাদ্র মাসে এই পতিতারা মহাসমারোহে এই ভাদু পুজো করত। এক সময়ে এই ভাদু মূর্তি তৈরি রামকুমার কম করেননি। দাদা রামপদ পতিতালয় থেকে মূর্তির অর্ডার আনতেন আর রামকিংকর গড়ে দিতেন।

সেলডুবকা অঞ্চলের ধনী চাটুজ্জ্যেরা সখের থিয়েটাব দল করেছিলেন। রামকিংকর বন্ধুদের পীড়াপীড়িতে এই সখেব থিয়েটারের সিন আঁকা, নাটকের নির্দেশনা থেকে পাত্রদের সাজানো সবই করতেন। সখের থিয়েটারের বাবুরা নাটকের নারী চরিত্রে পতিতাদের দিযে অভিনয় করাতেন, রামকিংকর ছিলেন তাঁদের মেক-আপ ম্যান। রামকিংকর বার কতক অভিনয়ও করেছেন। রামকিংকর অভিনীত প্রথম নাটক 'মালিনী'। এ ছাড়াও পাঠকপাড়ার অমর ভট্টাচার্যের পৃষ্ঠপোষকতায় 'রিজিযা', কুলুবেড়িয়ায় অভিনীত 'কারাগার'-এ রামকিংকর অভিনয় করেছেন। শোনা যায়, রামকিংকব একটি পালাগানও লিখেছিলেন।

এক সময়ে বাঁকুডা জেলায় যাত্রা বা পালাগানের প্রচার ও প্রসার যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতিব অন্যতম শবিক হিসেবে বিশেষ মর্যাদার দৃষ্টিকোণ থেকে ধরা হযনি বলেই, বাঁকুড়ায় যাত্রা একটা আন্দোলন হয়ে ওঠেনি। আর তাই যাত্রার প্রাচীন পালাকার, শিল্পী বা গোষ্ঠীর সঠিক মূল্যায়ন হয়নি। ধরে রাখা হয়নি প্রাচীন যাত্রা প্রীতির কোন নিদর্শন। অনেক অনুসন্ধানের পর একটি সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, বাঁকুড়া জেলার সর্বত্র যাত্রাগানের চাহিদা কিন্তু বরাবরই ছিল। আঞ্চলিক সাহিত্যের রত্নভাণ্ডারে এমন অনেক আঞ্চলিক পালাকারের পালারত্ন সঞ্চিত আছে এবং এই লোকনাট্যের ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্য এক সময়ে অঞ্চলবাসীদের যে অবদান ছিল তা স্মরণীয়। যেমন বিষ্ণুপুর ঃ

❑ **বিষ্ণুপুরের শ্রীবাস দাস ঃ** এই পণ্ডিত ব্যক্তির খ্যাতি ছিল 'সুবল সংবাদ' পালায়। লোকে বলত, শ্রীবাস নাকি অনেক ক্ষেত্রে নীলকণ্ঠের চাইতেও ভাল গাওনা করতেন। নীলকণ্ঠের ছিল কবিত্ব ভাব, শ্রীবাসের ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য।

❑ **বিষ্ণুপুরের নটবর দাস ঃ** বিষ্ণুপুরের বাসিন্দা এই নটবর দাসের খ্যাতি ছিল 'কৃষ্ণলীলা'য়।

❑ **বিষ্ণুপুরের রামেশ্বর শর্মা ঃ** ইনি ছিলেন রাধানগরের বাসিন্দা। 'রাবণবধ' ও 'রামলীলা'য় ছিলেন বিখ্যাত।

❑ **বৈষ্ণব মহৎ দাস ঃ** ইনিও 'কৃষ্ণলীলা'য় বিষ্ণুপুর বাসীদের হৃদয় জয় করেছিলেন।

❑ **করালীচরণ শর্মার দল ঃ** ১৩১৭ সনে ইনি বিষ্ণুপুরের যাত্রাদল তৈরি করেছিলেন। গোটা বঙ্গদেশে তাঁর দলের খ্যাতি ছিল। যাত্রা থেকে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন। এই দলের পালাকার ছিলেন হরিশ্চন্দ্র ঘোষাল। তাঁর বিখ্যাত পালাগুলি হলো, রাবণ বধ, সীতা উদ্ধার, প্রভাস যজ্ঞ, বালি বধ, বাণ বধ। হরিশ্চন্দ্র ছাড়াও বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়ের রাজলক্ষ্মী, অনুরাগিণী বেশ খ্যাতি পেয়েছিল।

❑ **বিষ্ণুপুরের পণ্ডিত সমাজ :** বিষ্ণুপুর নিবাসী কানাই কর্মকার, মতি রায়, শম্ভু মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র গোস্বামী যাত্রা অভিনেতা হিসেবে জনপ্রিয় ছিলেন। উপরোক্ত দলে অভিনয় করতেন। ১৯৪৩-৪৪ সালে এই দলের কয়েকজন অভিনেতার মৃত্যুর ফলে দল বন্ধ হয়।

চাঁদাই ডাঙ্গা : বাঁকুড়ার এই অঞ্চলে গোপেশ্বর চৌধুরী ও গোবিন্দ মণ্ডল, এমোকুলির গোবিন্দ মোহান্ত, ওস্তাদজী, শশী দাস এবং ডিহর নিবাসী সাগরকালিন্দীর জনপ্রিয়তা ছিল।

❑ **সায়রা রোড :** এখানকার অদ্বৈতপাল 'রামযাত্রা' করে জনপ্রিয় হন।

❑ **চন্দ্রকোনা :** এখানকার দ্বিতীয় গোবিন্দ অধিকারী 'কৃষ্ণযাত্রা'-য় বিখ্যাত ছিলেন।

❑ **রামজীবনপুর :** এখানকার আনন্দ অধিকারী 'রামযাত্রায়' জনপ্রিয় হন।

❑ **পাতাই হাটা :** এখানকার প্রেমচাঁদ অধিকারী 'রামযাত্রায়' জনপ্রিয় হন।

❑ **বাঁকুড়ার আরও দল :** খাতড়া, ঝড়িয়া, কাদরী রাজবাড়ি, কাশীপুর, শীতল ডাঙ্গার মোহান্ত মহারাজের আশ্রমে শর্মাবাবুর দলের চাহিদা ছিল বরাবরের। এ সব যাত্রা চলত ১৪। ১৫ ঘণ্টা ধরে। এই শর্মাবাবুর দলকে বলা হতো 'রাধানগরের দল'। এছাড়া নামকরা ছিল 'সোনামুখির দল'।

॥ মালদহ ॥

মালদহের মানুষেরা মালদহ জেলা এবং আঞ্চলিক যা কিছু প্রাচীন লোকসংস্কৃতি তার প্রতি চিরকালই একটু বেশি মাত্রায় শ্রদ্ধাশীল। মালদহের নিজস্ব শিল্প ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে ধরে রাখার প্রবণতা এখানে যথেষ্ট। সেই সূত্রে বাংলার লোকসংস্কৃতির অন্যতম শরিক যাত্রার প্রতি এঁদের আন্তরিক ভালবাসা সুবিদিত। যুগ বিবর্তনের সঙ্গে সমানভাবে বঙ্গসংস্কৃতির প্রেক্ষাপট বিশেষ করে যাত্রার ক্রমবিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করছে মালদহ। এক সময়ে মালদা জেলা এবং প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে স্থানীয় যুবগোষ্ঠী নিয়মিত যাত্রা চর্চা করতেন। তারই ভিতর দিয়ে গড়ে উঠেছিল বহু সখের যাত্রা দল। তৈরি হয়েছিল অনেক শক্তিমান অভিনেতা। পালা এবং অভিনয়ে এসেছিল সমকালীন ধারা। কালে কালে বহু সখের যাত্রাদলের দুয়ার হয়েছে বন্ধ। বহু শিল্পী গেছেন হারিয়ে। এসেছে নিছক চিত্তবিনোদনের চাহিদা। এই চাহিদা মেটাতে উত্তরবঙ্গে কলকাতার যাত্রা দলগুলির প্রসার বৃদ্ধি হয়েছে।

॥ ইউথ ক্লাব ॥

মালদহ শহরে এই ক্লাবটি নানা দিক দিয়েই উন্নত। এঁদের গঠন মূলক কাজের জন্যই খ্যাতি। সভাপতির নাম, শ্রীরমেন্দ্রকুমার বণিক, রামকৃষ্ণ পল্লী। সম্পাদক হলেন পিরোজপুরের শ্রীমানিক চক্রবর্তী। ১৯৫৭ সালে স্থানীয় বেশ কিছু যুবক সম্মিলিতভাবে এই ক্লাবটি গড়ে তোলেন রামকৃষ্ণ পল্লীতে। ১৯৬৮ সালে কলকাতার ভারতী অপেরার পালা প্রথম বায়না করে এনে এঁরা প্রতি বছর যাত্রা করার সিদ্ধান্তের সূচনা করেছিলেন।

যাত্রা করিয়ে তার টাকায় মালদহের এই 'ইউথ ক্লাব', একটি দোতলা ক্লাব ঘর বা বাড়ি তৈরি করেন। একটি চার কামরা যুক্ত একতলা প্রাইমারী স্কুলের বিল্ডিং তৈরি করেছেন এঁরা।

॥ মালদার আরও যাত্রাদল ও সমাজসেবী সংগঠন ॥

ফুলবেড়িয়া মুক্তবেণী অপেরা পার্টি (ফুলবেড়িয়া), মানিকপুর যাত্রাপার্টি (মাদাপুর), বিবেকানন্দ মিলন সংঘ (অমৃতি), জয়হিন্দ ড্রাম্যাটিক ক্লাব (শোভানগর), নব যুবক অপেরা পার্টি (সভারি), দেবীপুর মিলন সংঘ (দেবীপুর), হরিপুর মৃত্যুঞ্জয় ক্লাব এণ্ড লাইব্রেরী (একবোরনা, পরাণপুর), সাধারণ সংঘ (পরাণপুর), ভিঙ্গোল রাধারানী অপেরা পার্টি (ভিঙ্গোল), বৈরাট শক্তি

অপেরা পার্টি (ভিঙ্গোল), ছাতিয়ান মোড় বিনোদ নগর অপেরা পার্টি (সাহাপুর), পল্লী-শ্রী ক্লাব (যাত্রাডাঙ্গা), কালিয়াচক তরুণ নাট্য মন্দির (কালিয়াচক), রাজনগর লাইব্রেরী এণ্ড ক্লাব (রাজ-নগর), রাণীগঞ্জ সমাজ কল্যাণ সংঘ (কমলডাঙ্গা), নালাগোলা ড্রামাটিক পার্টি (নালাগোলা), সরস্বতী যাত্রা পার্টি (বামনগোলা),গান্ধীবাদ সংগঠনী পার্টি (দেবীগঞ্জ), কাত্যায়নী অপেরা (দেবীগঞ্জ), ক্ষেমপুর সৎসঙ্গ অপেরা পার্টি (চোরোলমণি),কাশীপারা সূর্যোদয় অপেরা পার্টি (মালতীপুর), আলাদিপুর বনফুল ক্লাব (করিয়ালি), কানপুর যোগেন্দ্র লাইব্রেরী ক্লাব (ধরমপুর), মুচিয়া নবারুণ নাট্য সংঘ (আইহো), লক্ষ্মীপুর নবীন সংঘ (আইহো), সৃজনী রুরাল লাইব্রেরী (আইহো), কগাছিয়া তরুণ অপেরা পার্টি (পুখুরিয়া), তরুণ সংঘ যাত্রা পার্টি (খুটাডাহা), বাহাদুরপুর সেবা সমিতি (মনিকোবা), ভূতনী জাতীয় পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র (ভূতনী), সরস্বতী পাঠাগার এণ্ড ক্লাব (ধরমপুর), শক্তি সংঘ অপেরা পার্টি (সলাইডাঙ্গা), পাঁচপাড়া কৃষকসংঘ ক্লাব (পাঁচপাড়া), গণশিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মোথাবাড়ি), শ্বেতাঙ্গিনী অপেরা পার্টি (হরিশচন্দ্রপুব), ইদ্‌ম সংকল্প নাট্য সমিতি (ডোহিল) ইত্যাদি সংস্থাগুলি যাত্রাপালা পরিবেশন কবে থাকে। উল্লিখিত সংস্থাগুলি সরকারি সাহায্য পায। মালদহে এই জাতীয় সংস্থা ক্রমেই বাড়ছে। ১৯৬৩-৬৪ সালে মালদহে সাতাশটি সংস্থার সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৬৪-৬৫ সালে সংস্থার সংখ্যা পঁয়ত্রিশের উর্ধ্বে ছিল।

॥ নাট্যভবন ॥

মালদা বাস স্ট্যাণ্ডের গা লাগোযা 'ইউথ ক্লাব'-এর দেওযা একটি ঘরে যাত্রার এই বুকিং অফিস। এর মালিক প্রশান্ত বিশ্বাস। প্রশান্তবাবু উত্তববঙ্গের বহু আসরের জন্য কলকাতা ও শহবতলীব বহু যাত্রা দলের বায়না কবেন। এক সময়ে ইনি অভিনেতা ছিলেন।

॥ পুরুলিয়া জিলা ॥

আরশা অঞ্চলে হবগৌরী অপেরা পার্টি (পুয়ারা), শ্রীদুর্গা অপেরা পার্টি (বোরাম), **বাগমুণ্ডী অঞ্চলে** বীণাপাণি ক্লাব (দেবতোরাং), **বরাবাজার অঞ্চলে** হরগৌবী অপেরা পার্টি (ভিখারী ছেলিয়া মা), বেরাদা সমাজ শিক্ষা অপেরা পার্টি (বেরাদা), **হুরা অঞ্চলে** নাডিহা নব কিশোর অপেরা পার্টি (লক্ষ্মণপুর), কুলগোবা বাণী অপেরা পার্টি (লক্ষ্মণপুর), **জয়পুর অঞ্চলে** বীণাপাণি অপেরা পার্টি (প্রতাপপুর), কারমাটার সৎসঙ্গ অপেরা পার্টি (সিন্ত্রী), বারটান নিউ চণ্ডী অপেরা পার্টি (সিন্ত্রী চাষ রোড), **ঝালদায়** বেনুয়াড়ি চণ্ডী পল্লীমঙ্গল যুব সমিতি (ইলু), নব তরুণ অপেরা পার্টি (চকিয়া), রামকৃষ্ণ অপেরা পার্টি (ততুয়ারা), সমাজশিক্ষা সংঘ (কলমা), গৌরাঙ্গ অপেরা পার্টি (উপরবতরি), সিংহবাহিনী অপেরা পার্টি (বেগুনকোতার) **কাশীপুর এলাকায়** কালাপাথর শ্যামসুন্দর নাট্যকলা ভবন (সোনাথালি), নারায়ণপুর যাত্রাপার্টি (পঞ্চকোটরাজ), **নেতুরিয়ায়** বাণীসাহিত্য মন্দির (বোরা), শর্বাণী ভিলেজ যাত্রা সংগীত কমিটি (নেতুরিয়া), ভামুরিয়া তরুণ বীণাপাণি অপেরা (ভামুরিয়া), **ধারা এলাকায়** জনতা লাইব্রেরী (দুবরা), মিলন অপেরা (ঝাপুর), ঠাকুরদি রামেশ্বরদি নীলকণ্ঠ অপেরা পার্টি (কালুহার), **পুঞ্চা অঞ্চলে** জনকল্যাণ অপেরা পার্টি (কানোরা), হোয়াইট হাউজ ক্লাব (পুঞ্চা), জয়কালী অপেরা পার্টি (কানোরা), **পুরুলিয়া অঞ্চলে** শ্রীশ্রীরঘুনাথ জিউ অপেরা পার্টি (সত্রো), শ্যামা অপেরা পার্টি (নরিডারা), বাণী এ্যামেচার ক্লাব (কৃষিপুরা), গোবিন্দপুর যাত্রা পার্টি (গোবিন্দপুর), হরগৌরী অপেরা পার্টি (কাকুর গোরিয়া), অন্নপূর্ণা অপেরা পার্টি (লাগদা), সত্য নারায়ণ অপেরা পার্টি (গোলকুণ্ডা), দুলারি সরস্বতী অপেরা পার্টি (চয়নপুর), মহামায়া অপেরা পার্টি (চিপিদা), নডিয়ারা বীণাপাণি অপেরা পার্টি (নডিয়ারা), রাণীবাঁধ কিশোর সংঘ (গোরাকুসরা), চিত্তরঞ্জন নাট্য সংঘ (নমোবাজার), সোনাইজুড়ি বীণাপাণি অপেরা পার্টি (মজুরিয়া), **রঘুনাথপুর অঞ্চলে** চৌপাহাড়ি ড্রামাটিক ক্লাব (চৌপাহাড়ি), মহামায়া অপেরা পার্টি

(গোবিন্দপুর), শ্রীদুর্গা অপেরা পার্টি (রঘুনাথপুর), **বলরামপুরে** হাঁসপুর মনসা যাত্রা পার্টি। এই সব সংস্থাকে ১৯৬৪-৬৫ আর্থিক বর্ষে ২৭৩০ টাকা সরকারি সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

অখণ্ড মানভূমের পুরুলিয়ার তুনতুড়ির দেওয়ানরা ছিলেন চক্রবর্তী। বর্ধিষ্ণু এই চক্রবর্তী পরিবারের ১৫০ বছরের পুরাতন দুর্গাবাড়িতে ছিল নিজস্ব যাত্রা মঞ্চ। এই যাত্রা মঞ্চে অভিজাত দেওয়ান পরিবারের সকলে সখের যাত্রা করতেন। এমন কি বাড়ির মহিলারাও সেই যাত্রাভিনয়ে অংশ নিতেন।

● পুরুলিয়ায় দুটি সাজপোশাক এবং রূপসজ্জার প্রতিষ্ঠান আছে।

● মানভূম স্পোর্টিং এ্যাসোসিয়েশানের স্টেডিয়াম মূলত যাত্রা করানোর টাকায় গড়ে উঠেছে। এম. এল. এ নটবর বাগদী এই এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক।

॥ মুর্শিদাবাদ জেলা ॥

বহরমপুর মহকুমার পঞ্চাননপুর রূপবান যাত্রা পার্টি (বহরমপুর সদর), দয়াময়ী অপেরা পার্টি (সৈদাবাদ), স্বর্গধাম নাট্য মন্দির (সৈদাবাদ), হিন্দ লাইব্রেরী নাট্য সমিতি (ভাবতা), নবতরুণ সংঘ (হাতিনগর), তরুণ নাট্য সংঘ (বহরমপুর), রূপালি নাট্য সংঘ (গকুণ্ডা), আনন্দলোক (কালীতলা দিয়ার),—**লালবাগ অঞ্চলের** নিউ মহাদেব অপেরা পার্টি (রায়পুর), রানীনগর ঝাউবেড়িয়া নাট্য সংঘ (রানীনগর), স্বপ্না অপেরা পার্টি (ধরমপুর) শশিভূষণ অপেরা পার্টি (পশলা), গোপীনাথ অপেরা পার্টি (লালবাগ), রাসবিহারী অপেরা পার্টি (রামপুর),—**কান্দি মহকুমান্তর্গত** প্রগতি নাট্য সংঘ (তেনিয়া), খরজুনা অপেরা পার্টি (কান্দি), বহরা অপেরা পার্টি (কান্দি), ঘনশ্যামপুর মহাপ্রভু অপেরা পার্টি (ঘনশ্যামপুর), অগ্রগামী যাত্রা পার্টি (আমজুয়া), ভরতপুর তরুণ অপেরা (ভরতপুর), শরৎ স্মৃতি নাট্য সমিতি (পুরন্দরপুর), রায় গ্রাম তরুণ অপেরা (রায় গ্রাম), পারুলিয়া নাট্যমন্দির (পারুলিয়া), নিউ অপেরা পার্টি (ব্রাহ্মণপাড়া),—**জঙ্গীপুর মহকুমার** ওসমানপুর মিলনী ক্লাব (ওসমানপুর), কৃষ্ণা অপেরা পার্টি (জঙ্গীপুর), সর্বেশ্বর বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র (জঙ্গীপুর), সৈদপুর পল্লীমঙ্গল তরুণ ক্লাব (সৈদপুর), সাধারণ গ্রন্থাগার (মিথিপুর) ইত্যাদি সংস্থা কর্তৃক লোকনাট্য পরিবেশিত হয়। এই সম্প্রদায়গুলিও বিভিন্ন বৎসরে বার্ষিক সরকারি আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকে।

॥ কুচবিহার জেলা ॥

বাণীতীর্থ (চকেহাকা), জোরপাকড়ি রিক্রিয়েশন পার্টি (জোরপাকড়ি), মদনমোহন ক্লাব (ঘুঘুমারি), ব্রহ্মোত্তরছত্র প্রগতি সংঘ যাত্রাপার্টি (ব্রহ্মোত্তরছত্র), উত্তর আমবাড়ি ক্লাব (আমবাড়ি), আমবাড়ি নিউ জিতেন্দ্র অপেরা পার্টি (আমবাড়ি), তরুণ সংঘ যাত্রা পার্টি (কোরিবাড়ি), মরুগঞ্জ এ্যামেচার পার্টি (মরাডাঙ্গা), কমলা অপেরা (সিদ্ধেশ্বরী), ধূমের খাতা যাত্রাপার্টি (ধূমের খাতা), কাত্যায়নী থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টি (বাবুরহাট), উদয়ন অপেরা (পোস্তারঝাড়), সঞ্জীবনী সংঘ যাত্রাপার্টি (আদাবাড়ি), শ্রীকৃষ্ণ অপেরা পার্টি (টালিগুড়ি), গৌরাঙ্গ অপেরা পার্টি (খরিজা বত্রিগাছ), সিঙ্গিমারী অরবিন্দ ক্লাব (সিঙ্গিমারী), মহামিলন যাত্রাপার্টি (যোগের কুঠি), জাগৃতি সংঘ যাত্রাপার্টি (শিলদুয়ার), মহাকালহাট সোস্যাল এডুকেশন সেন্টার (হোকাদহ), শৌলমারি সোস্যাল এডুকেশন সেন্টার (শৌলমারি), সবুজপল্লী ক্লাব (বারাশকদল), মদনমোহন যাত্রাপার্টি (গোপালপুর), রাজারহাট সজীব সংঘ (রাজারহাট), সিদ্ধেশ্বরী কল্যাণী সংঘ গ্রন্থাগার (সিদ্ধেশ্বরী), গীতালদহ ক্লাব (গীতালদহ), পল্লী-শ্রী সমিতি (ছোটবোয়ালমারি), সুরেশস্মৃতি যাত্রাপার্টি (বাণেশ্বর), মুক্তকেশী সম্প্রদায় (কুচবিহার), খাপাইডাঙ্গা যাত্রা পার্টি (খাপাইডাঙ্গা), গ্রামীণ সংঘ (ধর্মবারের কুঠি—পুণ্ডীবাড়ি), মিলন সংঘ (মরিচবাড়ি), উদয়ন সংস্কৃতি পরিষৎ (সেপাইটারি শকুনিবালা, পুণ্ডীবাড়ি পোষ্ট),

বোকালির মঠ নিউ অন্নদা অপেরা পার্টী (বোকালির মঠ)—সংস্থাগুলি প্রতিবৎসর যাত্রাভিনয় করে থাকে এবং এর জন্য সরকারি বার্ষিক সাহয্য পায়।

॥ পশ্চিম দিনাজপুর জেলা ॥

থালাহার এস. ই. সেণ্টার যাত্রাপার্টি (চঁচড়া), মনোহালী যাত্রাপার্টী (মনোহালী), গোপীনাথপুর সেবা সংঘ যাত্রাপার্টী (গোপীনাথপুর), চকভবানী জন্মাষ্টমী কমিটি (বালুরঘাট), শ্রীকৃষ্ণ রুরাল লাইব্রেরী যাত্রাপার্টী (তেওর), লক্ষ্মীপুর যাত্রাপার্টী (পাতিরাম), ফুলবরা মনসা অপেরা (খসপুর), মনাইল পি. কে. অপেরা (পাতিরাম), শ্রীদুর্গা অপেরা পার্টী (রামকৃষ্ণপুর), লক্ষ্মীনারায়ণ অপেরা পার্টী (ধদলপাড়া, গোপালগঞ্জ), কুলহবি যাত্রাপার্টী (চাঁদগঞ্জ), গোপালগঞ্জ যুব সংঘ যাত্রাপার্টী (গোপালগঞ্জ), ফরিদ আতরিপল্লী পাঠাগার যাত্রাপার্টী (বিদায়পুর), পিরোজপুর জগন্নাথ নাট্য সমিতি (গোবিন্দপুর), হরিপুর যাত্রাপার্টী (শুকদেবপুর), মথুরাপুর যাত্রাপার্টী (জনচি), অর্জুনপুর যাত্রাপার্টী (তিলান), জামালপুর যাত্রাপার্টী (করদহ), সন্দীপন নাটক সমিতি (ছত্রভোগ, দনগ্রাম), হরিরামপুব উদয়ন যাত্রাপার্টী (হবিরামপুর), চককাশী তরুণ অপেরা পার্টী (বালুরঘাট), চক রমানাথ সংগীত সমাজ (বালুরঘাট), উত্তমাশা সংঘ যাত্রাপার্টী (চকভবানী কলোনী, বালুরঘাট), অশোক অপেরা পার্টী (মহেন্দ্রগঞ্জ, কালীয়াগঞ্জ), চাঁদগঞ্জ রাম বনবাস যাত্রাপার্টী (কুনোইর), পূর্বগোলগাঁও যাত্রাপার্টী (টমচারী মঠবাড়ি), মহামায়া অপেরা পার্টী (মহেশপুর, ডালিমগাঁও), মাধবপুর বীণাপাণি অপেরা পার্টী (গোলনদর), টিটিহি যাত্রাপার্টী (সশসপুর), পরহরিপুর বান্ধব অপেরা পার্টী (পরহরিপুর), নবারুণ নাট্যসমাজ (কুশমোন্দি), চূড়ামোন সোস্যাল এডুকেশন সেণ্টার যাত্রাপার্টী (চূড়ামোন), মিলন যাত্রা পার্টী (কাঁটরাপাড়া, অরজিপানিশালা), আমিনপুর ইয়ং ক্লাব (আমিনপুর), চৌনতি যাত্রাপার্টী (যোগতাগাঁও), যোগতাগাঁও যাত্রাপার্টী (যোগতাগাঁও), পরবসু যাত্রাপার্টী (দাসপাড়া, কাটগাছ) তরুণ অপেরা সংঘ (খুনিয়া)—এই সংস্থাগুলি নিয়মিত যাত্রাভিনয় করে। বার্ষিক সরকারি সাহায্য পেয়ে থাকে।

॥ যাত্রা শিল্পের সংগঠন ॥

যাত্রা জগতে ষাটের দশকের প্রায় শেষ পর্ব থেকে একটা সংগঠন গড়ে তোলার প্রবণতা ছিল। কিন্তু অন্তরায় ছিল, 'বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?' তা ছাড়া, বিশেষভাবে যাত্রার মালিকপক্ষের ছিল ঘোরতর বিরোধিতা। এর মূলে ছিল অশিক্ষা, অজ্ঞতার অন্ধকার। মালিক শ্রেণীর মধ্যে একমাত্র শৈলেন মহান্ত, মাখনলাল নট্ট, কিষান দাশগুপ্ত ছাড়া আক্ষরিক অর্থে শিক্ষিত আর বিশেষ কেউ ছিলেন না। কিন্তু এঁদের যাত্রা ব্যবসায় সংগঠন প্রসঙ্গে বরাবরই একটা ভীতি ছিল। ইউনিয়ন বা সংগঠন হলো একটা ধ্বংসের প্রতীক, একনায়কতন্ত্রের আধিপত্য বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা, এই ভাবনাও ছিল প্রকট। অথচ শৈলেন মহান্ত ছিলেন সরাসরি কম্যুনিষ্ট আদর্শের ও পার্টীর বোধ করি সদস্য। কিন্তু যাত্রার মত ব্যবসায় সংগঠন মানেই সর্বনাশ, এমন একটা বিশ্বাস তাঁর প্রকট ছিল। তাছাড়া এঁদের মধ্যে ছিলেন, এমন এক বা দু'জন বহিরাগত ব্যক্তিত্ব, যাঁদের মন্ত্রণা এবং উপদেশ ছিল অন্তরায়। এরই মধ্যে প্রবীণ অভিনেতা শিব ভট্টাচার্য ছিলেন এমন একজন মানুষ যাঁর প্রগতিবাদী একটা ভূমিকা ছিল। যাত্রার অভ্যন্তরীণ অন্ধকার সরিয়ে আলো আনার একটা চেষ্টা ছিল বরাবরের। সেই শিববাবু ১৯৬৫ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, লোকনাট্য গবেষক ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য এবং আরও কয়েকজনের সাহায্য ও সহযোগিতা, উপদেশ মত যাত্রার শিল্পী ও কর্মীদের নিয়ে একটি সংগঠন তৈরি করেন। নাম রাখা হয় যাত্রা শিল্পী সংঘ। ১৯৬৬ সালে এই সংঘ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৬১ সালের বিধিবদ্ধ আইনের ২৬ ধারায় সমিতি বদ্ধ হয়। ১১৩, রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা-৬, ঠিকানায় তৈরি হয় সংঘের কার্যালয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে

শিব ভট্টাচার্য হন সংঘের সম্পাদক। এ ছাড়া পরিশেষে যাঁরা এই আদর্শের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদের আসনে বসেছিলেন, তাঁরা হলেন, নিউ প্রভাসের কর্ণধার তিনকড়ি গুছাইত, লোকনাট্যের কর্ণধার নীলমণি দে, সত্যম্বর, ভারতী, সত্যনারায়ণ, নবরঞ্জন অপেরার কর্ণধার যথাক্রমে শৈলেন মোহান্ত, কালিপদ ঘোষ, কালিপদ দাস এবং শম্ভুনাথ ঘোষ। যাত্রার সার্বিক কল্যাণের জন্য যে কয়েক দফা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল যাত্রার দুস্থ শিল্পীদের জন্য আর্থিক সাহায্য দান, এবং দাতব্য চিকিৎসালয়। কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ, বিশ্বরূপা মঞ্চ ও মহাজাতি সদনে এই সংঘের প্রচেষ্টায় 'যাত্রা উৎসব' হয়েছিল। পরিতাপের বিষয় এরই মধ্যে এক শ্রেণীর মালিক ও শিল্পীদের বিবোধিতায় কিছুদিনের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হয়। এবং অচিরেই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। এর বছর কয়েক পরই জন্ম নেয় **"পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলন"**। এর নেপথ্যে অথচ অগ্রভাগে যাঁর ভূমিকা ছিল বড় মাপের তিনি আনন্দবাজারের প্রবোধবন্ধু অধিকারী। এই সংস্থার পরিকল্পনা ছিল দুস্থ শিল্পীদের সাহায্য দান, অসুস্থ শিল্পী-কর্মীদের জন্য হাসপাতালে 'বেড' সংস্থাপন, যাত্রার নিজস্ব "যাত্রামঞ্চ", বার্ষিক "যাত্রা উৎসব"। এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন নট্ট কোম্পানির কর্ণধার মাখনলাল নট্ট, তরুণ অপেরার কর্ণধার-অভিনেতা শান্তিগোপাল আরও কেউ কেউ।

এ ছাড়া উপরোক্ত সকলেই ছিলেন। 'সম্মেলন' বেশ কিছু দুস্থ শিল্পীকে আর্থিক সাহায্য দিয়েছিল সাধ্যমত, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সুরকার মহেন্দ্র দত্ত। রাণীগঞ্জ রাণীসায়ের মোড়ে কোলিয়ারি লর্ড অনিল ভাণ্ডারীর 'যাত্রাভবনে' যাত্রা দলের কাজে গিয়ে একদা কমলরানী নামে খ্যাত অতীতের শিল্পী, প্রখ্যাত অফিস পরিচালক কমল খাঁ অসুস্থ হলে তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা, চিকিৎসা করা, এবং তাঁর মৃত্যুর পর সেই দেহের সদ্গতি করার জন্য তখন একাধিক যাত্রামালিকের সঙ্গে অনিল ভাণ্ডারীর ভূমিকা ছিল স্মরণীয়। শ্রীভাণ্ডারী এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্রেরা, যাত্রা কর্মী বাসুদেব সাহা থেকে অনেক কর্মী বন্ধু সেদিন যে মানবিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা স্মরণীয়। এরপর 'সম্মেলন' কমল খাঁয়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের জন্য আর্থিক সাহায্য দিয়েছিল।

'যাত্রা উৎসব'-এর আয়োজন করেছিল। যাত্রা জগতের প্রবীণ ও স্বনামধন্য ব্যক্তিদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন এই 'সম্মেলন'-এর গৌরব। এরই মধ্যে নানা বিরোধিতা, কর্মব্যস্ততার জন্য অসহযোগিতা, বিশৃঙ্খলা, নানা অঘটনে এক সময়ে "সম্মেলন"-এর গতি শ্লথ হয়। তারই মধ্যে রবীন্দ্রকাননে গড়ে ওঠা রামকৃষ্ণ মঠ (ইনস্‌টিটিউটের) আর মন্দির প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত ভাবে যাত্রা প্রযোজক তিনকড়ি গুছাইতের দান যেমন ছিল, তেমনি "যাত্রা সম্মেলন"-এর সহযোগিতা ও অবদান অনস্বীকার্য। তথাপি ফাটল রোধ করা সম্ভব হয়নি। পরিশেষে যাত্রা জগতের সঙ্গে ব্যবসায়িক সূত্রে জড়িয়ে পড়া নব্বই দশক বা তার কিছু আগের শিক্ষিত, মার্জিত কিছু প্রযোজক ও মালিকের চেষ্টায় "পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলন" গঠন মূলক কাজে স্থায়ী ভূমিকা পালন করে চলেছে। পুরোপুরি আইন সিদ্ধ এই সংগঠন নির্বাচনের মাধ্যমে সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ আসনে উপযুক্ত ব্যক্তিদের বসিয়ে নানা গঠনমূলক কাজ করে চলেছে। 'বঙ্গলোক' অপেরার অন্যতম কর্ণধার, ব্যক্তি জীবনে আইন ব্যবসায়ী, শৈল্পিক চেতনা সম্পন্ন মানুষ শংকর সেন পরপর কয়েক বছর নির্বাচনে জয়ী হয়ে সম্মেলনের 'সম্পাদক' পদে অধিষ্ঠিত আছেন। অতীত থেকে লোকনাট্য কর্ণধার নীলমণি দে কোষাধ্যক্ষ পদে আসীন, প্রযোজক কার্তিক সামন্ত, প্রযোজক কালিপদ দাস, প্রযোজক দিলীপ দাস, প্রাযোজক ডি. মুখার্জী, প্রযোজক দুলু পাণ্ডে, ভৈরব অপেরার কর্ণধার মেঘদূত গঙ্গোপাধ্যায়, যুগান্তর ও আনন্দবাজার অপেরার কর্ণধার যথাক্রমে রাজদূত ও দেবদূত গঙ্গোপাধ্যায় মূলত যোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে ইতিমধ্যে শুধু 'সম্মেলন'-এর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে রাখেননি, সেই সঙ্গে নানাবিধ গঠন মূলক আন্দোলন

চালিয়ে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে যাত্রার শিল্পী ও কর্মীদের শক্তিশালী সংগঠনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যাত্রার সার্বিক কল্যাণে প্রযোজকদের এই সংগঠন সক্রিয়।

॥ যাত্রা কর্মী পরিষদ ॥

বহু যুগ ধরে অজস্র ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে, গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত উপেক্ষা করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, যে সব যাত্রা কর্মীরা যাত্রা ব্যবসার মেরুদণ্ড হয়েও অবহেলিত, অবজ্ঞার ভিতর দিয়ে যাত্রাকে 'জীবন' মনে করে নীরবে কাজ করে যাচ্ছেন, যাঁরা অতীতে বহু সহকর্মীর সীমাহীন দারিদ্র্যের যন্ত্রণা, বর্ণনাতীত কদর্য জীবন দেখেছেন, তাঁরা মানুষেব অধিকার নিয়ে, প্রত্যক্ষ সংগ্রামী মনুষ্যত্বের অধিকাব নিয়ে, গড়ে তুলেছেন **'যাত্রা কর্মী পরিষদ'**। এই সংগঠনটি যাত্রার মালিকপক্ষের স্বার্থ, যাত্রাশিল্পের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেই অদ্যাবধি সঠিক পদক্ষেপ রেখেছে। এই সংগঠনের প্রতিটি সদস্য একদিকে যেমন সমস্ত অন্যায়েব বিরোধিতা কবেছে, তেমনি জনকল্যাণমূলক কাজও করেছে। যেমন, যাত্রা জগতেব অন্য দুটি সংগঠনের সহযোগিতা নিয়ে পরপর দু'বছর "রক্তদান" শিবির রচনা করে সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করেছে এবং আগামী দিনেও সংগঠনের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল বাখার জন্য একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। "পরিষদ" ট্রেড ইউনিয়নের অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় আইনের বিধি মতে সম্প্রতি 'পরিষদ'-এর পরিবর্তে "কলিকাতা যাত্রা কর্মী ইউনিয়ন" নামে এই সংগঠন গঠনমূলক কাজে লিপ্ত। ইলেকশানের ভিত্তিতে এর মূল কমিটি তৈরি হয়।

॥ যাত্রা প্রহরী ॥

যাত্রা শিল্পেব মর্যাদার কথা মনে রেখে, নিজেদের সর্ব স্তরের স্বার্থ রক্ষার তাগিদে, যাত্রা সংসারের ভিতরকার যা কিছু অন্যায়, যা কিছু যাত্রা ঐতিহ্যেব পরিপন্থী তা নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য, দুস্থ যাত্রা শিল্পীদের পাশে সাহায্যের হাত এগিয়ে দেওয়া, নানা সমস্যা থেকে যাত্রাকে মুক্ত করার তাগিদে যাত্রার শিল্পী গোষ্ঠী একত্রিত হয়ে এই সংগঠনটি তৈরি করেন। নাম রাখা হয় "যাত্রা প্রহরী"। যাঁদের স্বপ্নে এবং শ্রমে 'যাত্রা প্রহরী'র জন্ম হয়েছিল তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন বীণা দাশগুপ্ত, ইন্দ্র লাহিড়ী, গুরুদাস ধাড়া, গৌতম সাধুখাঁ আরও অনেকে। যাত্রার ফটোগ্রাফার উৎসাহী টুলু দাসের ছবি তোলার স্টুডিও'তে (পৈতৃক স্টুডিও) অস্থায়ী অফিস তৈরি হয়। তৈরি হয় লোগো। কমিটি। সূচনায় সভাপতি এবং সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন জ্যোৎস্না দত্ত এবং বীণা দাশগুপ্ত। কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন ফটোগ্রাফার, টুলু দাস। কার্যকরী সমিতির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন গৌতম সাধুখাঁ, শৈলেন ঘোষ, সুখেন্দু মুখার্জী, অরুণ মুখার্জী, গুরুদাস ধাড়া আরও অনেকে।

সদ্য প্রতিষ্ঠিত 'যাত্রা প্রহরী' প্রথমেই দুস্থ শিল্পীর সাহায্যে এগিয়ে আসে। এই সংগঠন তার ফাণ্ড তৈরির জন্য প্রথমেই ব্রজেন দে'র 'নটী বিনোদিনী' পালার কম্বিনেশান নাইটের আয়োজন করে কিন্তু পালা মহাজাতি সদনে আসরস্থ হবার আগেই নট্ট কোম্পানির কর্ণধার ইনজাংশান জারি করেন। সেই শো যথা দিনে হয়েছিল ইনজাংশান থাকা সত্ত্বেও তৎকালীন মাননীয় স্পীকারের সহযোগিতায়। এই সময়ে বণ্ডে সই করতে হয়েছিল উপযুক্ত সিকিউরিটি দিয়ে। এক সাক্ষাৎকার এ সব কথা বলতে বলতে সম্পাদিকা বীণা দাশগুপ্ত আরও জানালেন,—"আমি আমার সল্ট লেকের বাড়ি সিকিউরিটি হিসেবে শো করে বণ্ডে সই দিয়েছিলাম—"

তারপর আবার 'বাঙ্গালী' পালার কম্বিনেশন নাইট হয়েছিল। পুনরায় ইলেকশান ভিত্তিতে কমিটি তৈরি হয়েছিল নতুন করে। যে কমিটি আজও কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে প্রহরীর যুগ্ম সম্পাদক হলেন বীণা দাশগুপ্ত, অসীমকুমার। সভাপতি নির্বাচিত হন তিনু বন্দ্যোপাধ্যায়। কোষাধ্যক্ষ থেকে যান টুলু দাস।

যাত্রার পারমিশন, নিরাপত্তা প্রভৃতি একাধিক সমস্যা নিয়ে 'যাত্রা প্রহরী' বীণা দেবীর

নেতৃত্বে নানাভাবে অভিযান চালায়। বর্তমানে যাত্রার নানাবিধ গঠনমূলক কাজ হয় কর্মী ও মালিক সংগঠনের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে।

॥ স্মরণীয় স্রষ্টার বরণীয় সাহিত্যে ও ভাবনায় যাত্রা ॥

যুগ যুগান্তর ধরে বেগবতী-স্রোতস্বিনী নদীর ধারা-প্রবাহের মত 'যাত্রা' স্ব মহিমায় সমুজ্জ্বল। নদী যেমন অনেক ভাঙা আর গড়া, দেওয়া আর নেওয়ার নীরব সাক্ষী, মানব পূজার অনিবার্য অর্ঘ্য, আবার সহস্র অভিশাপেও অব্যাহত মহিমায় মহিমান্বিত, দেবতার চরণামৃত বিশ্বাসে যেমন পূজিত, তেমনি যুগ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার বিবর্তন, যাত্রার রূপ ও ভাষা বদলও মানবকীর্তি। এই যাত্রা যেমন মানুষের চিত্ত বিনোদনে সার্থক হয়েছে, তেমনি আবার এই 'যাত্রা' যুগ যুগ ধরে মানুষের চিত্ত জয়ে হয়েছে অক্ষম। 'যাত্রা' যেমন গণদেবতার শ্রদ্ধা কুড়িয়েছে, অন্যদিকে এক শ্রেণীর জনগণের দৃষ্টিকোণ থেকে কুড়িয়ে চলেছে ঘৃণা, তাচ্ছিল্য। 'যাত্রা' যেমন আপন শক্তিতে, স্বমহিমায় অর্থনৈতিক সামাজিক প্রেক্ষাপটে আলাদা একটা ভূমিকা পালন করে চলেছে, তেমনি তথাকথিত কিছু মানুষের বিচিত্র মানসিকতায় যাত্রা আজও সর্বস্তরে সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি। সমকালীন তথাকথিত পণ্ডিত সমাজ যে দৃষ্টিকোণ থেকে রঙ্গমঞ্চ এবং চলচ্চিত্রের সেবক হয়ে ওঠার জন্য দুর্বার, ঠিক সেই দৃষ্টিকোণ থেকে যাত্রাকে এক ঘরে রাখার জন্য যেন নীরবে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এই পণ্ডিত সমাজের কেউ কেউ যাত্রার নারী চরিত্রে অবতীর্ণ হওয়া পুরুষদের "বিড়ি খাওয়া রানী" বলে ঘৃণা করেছেন একদা তাদের পরিমণ্ডলে, তেমনি অনেক প্রগতিবাদী লেখক যাত্রার 'অভিনয়', 'যাত্রার সংলাপ', 'যাত্রার অভিব্যক্তি'কে কটাক্ষ করেছেন তাঁদের নাটকে, প্রবন্ধে, বক্তব্যে। এ যাবৎকাল পঃ বঃ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর অথবা অন্য কিছু প্রগতিবাদী সংস্থা যাত্রাকে পঙ্গু সন্তানের প্রতি পবিত্র দায়িত্ব পালনের নিদর্শন হিসেবে হাতে একটা মোয়া ধরিয়ে দিয়ে মেতেছেন চলচ্চিত্র গ্ল্যামারের কীর্তন নিয়ে। কিন্তু এরই পাশাপাশি যখন সভ্যতার ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখি, যখন মরেও যাঁরা মরেননি এমন অমর ব্যক্তিত্বদের রেখে যাওয়া সহিত্য-প্রবন্ধ-মন্তব্যের রত্নভাণ্ডারে চোখ রেখে বিস্ময়ে হতবাক হই, বাংলার লোকসংস্কৃতি, বাংলার লোকনাট্য, বাংলা যাত্রার প্রতি তাঁদের হৃদয় উৎসারিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের সহস্র নজির দেখি। যেমন ঃ

পুরাতন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় বার বার কলকাতার বাবু কালচারের অঙ্গ হিসেবে যাত্রার ভূমিকা, যাত্রার ক্রম বিবর্তনের আলোচনা, পর্যালোচনা যেমন নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যে, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে প্রাচীন যাত্রার ইতিবৃত্তে শ্রদ্ধার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে যাত্রা। তেমনি পরবর্তী সময়ে 'ভারতবর্ষ' এবং 'প্রবাসীর' পাতায় প্রকাশিত হয়েছে যাত্রার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এর মধ্যে, ১৩৩৮ সনের অগ্রহায়ণ মাসে, 'প্রবাসী'র ২য় সংখ্যায় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের "যাত্রা" প্রবন্ধটি স্মরণ যোগ্য। তারও বহুযুগ আগে 'ভরত-নাট্যশাস্ত্রে' যেমন যাত্রার কথা আছে, তেমনি গ্রীক মেগাস্থেনেসের বিবরণেও 'যাত্রা'র সূত্র মেলে। মহাভারতে যেমন 'ঘোষ যাত্রা'র কথা আছে, তেমনি 'হরিবংশ'-এ আছে 'বন-যাত্রা'-র বিবরণ। ভাগবতে 'লীলাভিনয়' বর্ণনা যেমন আজকের যাত্রার আদি রূপের ছবি, 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত'-এর ৮ম অধ্যায়ে আছে শ্রীচৈতন্যের যাত্রালীলার বর্ণনা। বৈষ্ণব শাস্ত্রে তো শ্রীচৈতন্যের সংকীর্তন ও কৃষ্ণ বিষয়ক যাত্রার উল্লেখ আছেই। 'চৈতন্য চরিতামৃত'-র যেমন চৈতন্য যাত্রা এবং তার বিভিন্ন স্তর প্রসঙ্গে বিশদ ব্যাখ্যা আছে, তেমনি প্রাতঃস্মরণীয় অনেকের 'আত্মস্মৃতি' মূলক রচনায় 'যাত্রা' কখনই অবহেলিত হয়নি।

যা হোক, 'যাত্রা'কে বিশেষ মর্যাদার আসনে বসাবার জন্য যে মানুষটির ভাবনা-চিন্তা কাজ করেছে বারবার, সেই অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের কথা একটু বলে নেওয়া যাক ঃ

উদয়নাথ ঘোষ মজুমদারের পুত্র অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের জন্ম ১৮৭৭ সালে। কাশীতে সংস্কৃত শিক্ষা গ্রহণের পর অমূল্যচরণ দেশী ও বিদেশী মোট ২৬টি ভাষা শিখেছিলেন। বিভিন্ন ভাষায় চিঠিপত্র অনুবাদের জন্য ১৮৯৭ সালে 'ট্রানস্লেটিং ব্যুরো' এবং ভাষা শিক্ষার জন্য ১৯০১ সালে 'এড্ওয়ার্ড ইন্স্টিটিউসন' গড়ে তোলেন। ১৯০৫ সালে বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপনা কর্মে নিযুক্ত হন। ১৯০৬-১৯০৭ সালে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনের ফ্রেঞ্চ, জার্মান, পালি ও. বাংলা ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। ১৯১২ সালে প্রথম প্রকাশিত 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকার প্রথম যুগ্ম সম্পাদক এবং বিভিন্ন সময়ে 'বাণী', 'ইণ্ডিয়ান অকাদেমী,' 'পঞ্চপুষ্প,' ইত্যাদি পত্রিকার সম্পাদক হন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য অমূল্যচরণ 'শ্রীকৃষ্ণ বিলাস,' 'জৈন জাতক,' 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' ইত্যাদি গ্রন্থ রচয়িতা হিসেবে খ্যাতিমান হন। ত্রিপুরা বাজবংশের ইতিহাস সংকলনের কাজ করেছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় 'বঙ্গীয় মহাকোষ' নামক অভিধান সংকলনের কাজ অসমাপ্ত রেখে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মারা যান ১৯৪০ সালের ৮ এপ্রিল।

এই গ্রন্থের পাঠক-পাঠিকাদের জন্য অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের "যাত্রা' প্রবন্ধের অংশ বিশেষ এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ

"বাঙ্গালা দেশে অনেক দিন হইতে অভিনয় হিসাবে যাত্রা চলিয়া আসিয়াছে। বস্তুতঃ যাত্রা হইতেই আমাদের দেশে থিয়েটারের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। যাত্রা নূতন জিনিস নয়। ইহার অস্তিত্ব প্রাচীন কাল হইতেই আছে। প্রাচীন কালে যাত্রার অর্থ দেবতা বিশেষের লীলা বা চরিত্রের অংশ-বিশেষ সাধারণের হৃদয়ে জাগরূক রাখিবার জন্য কোনও উৎসব। গ্রীক মেগাস্থেনেসের বিবরণে আছে, আজকালকার যাত্রাভিনয়ের মত যাত্রার গান পাটলিপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের সভায় হইত। ভরত-নাট্যশাস্ত্রেও যাত্রার উল্লেখ আছে। ভবভূতির 'মালতী মাধবে' ভগবান কালপ্রিয়নাথের যাত্রাভিনয়ের কথা আছে। এই যাত্রা উৎসবার্থে এবং পারিভাষিক উভয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। উৎসব হিসাবে মহাভারতে ঘোষযাত্রার কথা আছে। হরিবংশে বন-যাত্রার কথা আছে। বন যাত্রা, বন ভোজন। ইহাতে নৃত্যগীতের ব্যবস্থার কথা আছে। তার সঙ্গে এক রকম অভিনয়েরও কথা আছে। ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় পৌরাণিক বিষয় লইয়াই যাত্রার অভিনয় হইত। শিবযাত্রা সকলের চেয়ে পুরাতন। তারপর রাম যাত্রার প্রবর্ত্তন হয়। হিন্দু রাজত্বের সময় হইতেই রামযাত্রার প্রচলন দেখা যায়। রামযাত্রার অনেক পরে কৃষ্ণযাত্রার উদ্ভব। ভাগবতে লীলাভিনয়ের কথা আছে। ধর্ম্মোৎসব বা সামাজিক উৎসবে এই সকল অভিনয় হইত। যাত্রায় দৃশ্যপটাদির ব্যবস্থা ছিল না। সঙ্গীত ও উক্তি-প্রত্যুক্তি দ্বারা বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করা হইত। আমাদের যাত্রায় তখন সঙ্গীতের প্রভাব বড় বেশি ছিল। আর ভারতের সকল জায়গাতেই দেবলীলা কীর্ত্তনে গীতবাদ্য দেখিতে পাওয়া যাইত, এখনও যায়। বেশ প্রকাশ্য স্থানে স্ত্রী পুরুষ বেশভূষা করিয়া এই ব্যাপার করিত।

চতুর্দশ শতকের শেষের দিকে বাঙ্গালা দেশের সামাজিক অবস্থা এখনকার মত ছিল না। তখন দেশে অশনবসনের অভাব ছিল না, অন্ন চিন্তাও চমৎকার ছিল না। কাজেই লোকে সহজে উৎসবে আমোদে কাল কাটাইতে চাহিত। ভদ্র সমাজে বিদ্যা ও শাস্ত্রের চর্চ্চা ছিল। তাহাদের লক্ষ্য ছিল—সাধারণের মধ্যে ধর্ম্মভাবের বিকাশ করিয়া তোলা। এ কার্য্যে তাহাদের বিশেষ বেগ পাইতে হইত না, কেন-না, তখন ধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়াই গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের কর্ত্তব্য নিয়ন্ত্রিত হইত। লোকেও বড় অনুষ্ঠানপ্রিয় ছিল। তাহারা ছিল বেশ সরল বিশ্বাসী, অথচ দেব-দ্বিজে ভক্তিমান। তাহারা বৃক্ষ, দেবতা ও ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠা করিত ; জলাশয় খনন, রত্ন নির্ম্মাণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিত। অন্ন দান, জল দান, ভূমি দানে প্রচুর আনন্দ পাইত। কথকতা ও কীর্ত্তন লোক-

শিক্ষার প্রধান অবলম্বন ছিল। লোকে সাংসারিক বিপদ এড়াইবার জন্য মঙ্গল-চণ্ডীর গান করিত, সচ্ছল অবস্থায় থাকিবার জন্য সত্য-নারায়ণের পূজা করিত, পাছে সর্প ভয় হয় তজ্জন্য মনসা, পদ্মা বা বিষহরির গান করিত, জ্বর ও ফোড়ার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শীতলার গান, শিশুর মঙ্গলের জন্য শিশুর মাতা কার্ত্তিকেয় ও তাঁহার শক্তি ষষ্ঠীর গান, মাতৃকাপূজার জন্য বাসলী ও গজলক্ষ্মীর গান করিত। আর এই সমস্ত পালা শুনিতে সকলেই ভালবাসিত। এই সমস্ত দেবতার পূজায় তাহাদের আনন্দও খুব হইত। করতাল ও মৃদঙ্গ বাজাইয়া এই সমস্ত দেবদেবীর গান তাহারা করিত। অবস্থা বিশেষে বাদ্যকাররা ঢাক, ঢোল, ডঙ্কা, বীণা, সানাই, বাঁশী, কাঁসি প্রভৃতি বিয়াল্লিশ রকমের বাজনা বাজাইত। সময়ে সময়ে সংকীর্ত্তন করিয়াও তাহারা প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিত। এই সমস্ত দেবতার উদ্দেশ্যেই হইত। নৃত্য, গীত, বাদ্য লোকের মনোরঞ্জন করিত।"

॥ রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় "যাত্রা" ॥

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যাত্রাকে ভালবেসেছিলেন। যাত্রাকে ভালবেসে কবির মেজকাকা গিরীন্দ্রনাথও ঊনবিংশ শতাব্দীতে যাত্রাগানের দল তৈরি করেছিলেন। যাত্রার কতকগুলি আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন যাত্রায় দৃশ্যপট বা আঙ্গিকের ব্যবহার থাকে না (এখন অবশ্য থাকে), গানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হতো (এখন অবশ্য সেই ধারা নেই), যাত্রার দর্শক ও অভিনেতাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য, এ সবের জন্যই যাত্রার প্রতি এত প্রীতি ছিল কবির। কবি নিজেই বলেছিলেন......

"আমাদের দেশের যাত্রা আমার ঐ জন্যেই ভালো লাগে। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া ওঠে। কাব্যরস, যেটা আসল জিনিষ, সেটাই অভিনয়ের সাহায্যে ফোয়ারার মত চারিদিকে দর্শকদের পুলকিত চিত্তের উপর ছড়াইয়া পড়ে।...বিলাতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি তাহা ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ। তাহাকে নড়ানো শক্ত, তাহাকে আপামর সকলের দ্বারের কাছে আনিয়া দেওয়া দুঃসাধ্য, তাহাতে লক্ষ্মীর পেঁচাই সরস্বতীর পথকে প্রায় আচ্ছন্ন করিয়া আছে......" [বিচিত্র প্রবন্ধ (রঙ্গমঞ্চ)]

ইংরেজ আমলে আমাদের দেশে যে থিয়েটারের প্রচলন ছিল তা মূলত ইংরেজদের মঞ্চরীতি-প্রভাব দুষ্ট। দৃশ্যপট ইত্যাদিতে ভরা। কবিগুরু এই রীতিকে অপছন্দ করতেন বলে বলেছেন "......ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে, সে রঙ্গমঞ্চে স্থানাভাব নাই। সেখানে জাদুকরের হাতে দৃশ্যপট আপনি রচিত হইতে থাকে। সেই মঞ্চ, সেই পটই নাট্যকারের লক্ষ্যস্থল ; কোন কৃত্রিম মঞ্চ ও কৃত্রিম পট কবি কল্পনার উপযুক্ত হইতে পারে না।"

॥ শিক্ষার বিকিরণে ॥

'শিক্ষায়'-"শিক্ষার বিকিরণে" কবি জনশিক্ষার কথা বলেছেন কয়েকটি ঘটনা যোগে। চাষীরা একবার কবিকে গ্রামে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে যায়, অধিকাংশই ছিল তাদের মুসলমান। কবির সম্মানে চলেছিল যাত্রাগান। চাঁদোয়ার তলায় কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বলছে। মাটির ওপর ছেলে-বুড়ো সকলেই বসে আছে স্তব্ধ হয়ে। পালাটা আধ্যাত্মিক বিষয়ক। "রাত এগোতে লাগল, দুপুর পেরিয়ে একটা বাজে ; শ্রোতারা স্থির হয়ে বসে শুনছে। সব কথা বুঝুক বা না বুঝুক এমন একটা কিছুর স্বাদ পাচ্ছে যেটা প্রতিদিনের নিরস তুচ্ছতা ভেদ ক'রে পথ খুলে দিলে চিরন্তনের দিকে।" কবি বল্লেন, "এ রকম জনশিক্ষার ধারা আমাদের চলে আসছে আবিশ্যিক নয়, স্বৈচ্ছিক ভাবে", সে অনেক কালের। তার স্বতঃ সঞ্চার ছিল ঘরে ঘরে, যেমন রক্ত চলাচল হয় সর্বদেহে।

॥ পল্লীর যাত্রাভিনয় আসরে ॥

কবিগুরু তাঁর "ছেলেবেলা"-র এক জায়গায় অতীত যাত্রার ছবি এঁকেছেন। তিনি লিখছেন ঃ

"—সেকালে যাত্রাগান ছিল শুকনো গাঙে কোশ দু'কোশ অন্তর বালি খুঁড়ে জল তোলা। ঘণ্টা কয়েক তার মেয়াদ, পথের লোক হঠাৎ এসে পড়ে, আঁজলা করে তেষ্টা নেয় মিটিয়ে—"

"ছেলেবেলায়" তিনি আরও এক জায়গায় লিখছেন—,"আমাদের সময়কার কিছু ঘরে ছিল সখের যাত্রার চলন। মিহি গলাওয়ালা ছেলেদের বাছাই করে নিয়ে দল বাঁধার ধূম ছিল। আমার মেজকাকা ছিলেন এই রকম সখের দলের দলপতি। পালা রচনার শক্তি ছিল তাঁর। ছেলেদের তৈরি করে তোলবার উৎসাহ ছিল।"—

'জীবন স্মৃতি'তে আছে ঃ "জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যাত্রা শুনিবার জন্য চোখে ঘুম আসিত না। এগারটা রাত্রে যেই ঢোলে চাটি পড়িল অমনি বিছানা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া এক ছুটে তিনি বাহিরের মজলিশে গিয়া হাজির হইতেন। উঠানে লোকে লোকারণ্য।...এই তিন দিন সকলের জন্যই নির্বিচারে অবারিত দ্বার। অনেকগুলি মশালচী মশাল হাতে উঠানের চারদিকে রহিয়াছে। লাল পাগড়ীর দারোয়ানেরা 'বৈঠিয়ে বৈঠিয়ে' করিয়া লোকদিগকে বসাইবার চেষ্টা করিতেছে। তখনকার শ্রেষ্ঠ যাত্রাওয়ালা নিমাই ও নিতাই দাসের যাত্রাই এ-বাড়িতে হইত।"

॥ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছেলেবেলায় যাত্রা দেখার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর আত্মস্মৃতিতে। এক জায়গায় তিনি লিখছেন—"আমাদের বাড়ী দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী এই দুই পূজা হ'ত। দুর্গোৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন হ'ত। আমাদের উঠানের উপর সামিয়ানা খাটানো আর তিন দিন ধরে নৃত্যগীত আমোদ প্রমোদ, আমাদের আনন্দের আর সীমা থাকত না।...পূজার সময় যাত্রা হ'ত। কত রকম যাত্রার দল এসে মহল্লা দিত, তাদের মধ্যে যা সেরা তাই বেছে নেওয়া হ'ত। যাত্রায় বহু লোক সমাগম হ'ত। উঠানটা লোকে লোকারণ্য। আমরা আদ্যপান্ত সমস্তটা দেখতে পেতুম না। কেবল প্রথম ও শেষ ভাগে এসে বসতুম। প্রহ্লাদ চরিত্রে যে ছেলেটি প্রহ্লাদ সাজত তার বড় মিষ্টি গলা, তার গানে সকলে মোহিত হয়ে যেত। প্রহ্লাদ কত রকম উৎপীড়ন সহ্য করছে, আমরা তার দুঃখে অশ্রুপাত করতুম। এত উৎপীড়নেও তার ভক্তির স্খলন নেই। সে আপনাকে শোধরাবার কত চেষ্টা করছে কিন্তু সহস্র চেষ্টাতেও তার চিরকালের অভ্যাস কোথায় যাবে?

কালী কালী বলে ডাকি সদা এই বাসনা
অভ্যাসে দোষেতে তবু কৃষ্ণ বলে রসনা।

কিন্তু যাত্রার গানের চেয়ে আমাদের সং দেখতে বেশী আমোদ হ'ত। রামায়ণের পালাতে সঙের আসল ঘটা। একদিক রাবণ কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি রাক্ষসের দল, ওদিকে আবার রামের বানর সৈন্য,—সবই সঙ্গীন ব্যাপার। আমরা সারারাত কিছু সভায় থাকতুম না, রাত্রি শেষে আমাদের ঘুম থেকে উঠিয়ে আনা হ'ত। কোন ভাল অদ্ভুত সং আসছে তাই দেখবার জন্যে আমরা তাড়াতাড়ি উঠে আসতুম।...যাত্রার গান যেমন বিষ্ণুর, তেমনি Classical—সে কি চমৎকার ঠেকত, শুনে শ্রোতৃমণ্ডলী মোহিত হয়ে যেত। বিষ্ণুর একটি আগমনী গান আমার এখনো মনে আছে—"

□ **সত্যেন্দ্রনাথের যাত্রা প্রসঙ্গে বর্ণনার মধ্যে, পরবর্তী যুগ এমন কি ইদানিংকালে যাত্রা দল বায়নার রূপটি স্পষ্ট হয়ে আছে। বছর কয়েক হলো, কলকাতার চিৎপুরের যাত্রা মালিকরা চরম জাতে উঠেছেন। ইদানীং কোন যাত্রাই কোন বর্ধিষ্ণু ঠাকুর বাড়িতে উদ্বোধন না করে, নাম মাত্র খরচে হয়তো কোন ঠাকুর দালানে, অথবা দক্ষিণেশ্বর মন্দির কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে মন্দির প্রাঙ্গনে পালাগানের উদ্বোধন করলেও করতে পারে, কিন্তু নিরানব্বইভাগ যাত্রাপালার উদ্বোধন হয় কলকাতার বিখ্যাত সব রঙ্গমঞ্চে। উদ্বোধনের আগে, যারা নায়েক পক্ষ অর্থাৎ যারা যাত্রাদল বায়না করে নিয়ে গিয়ে গ্রামে-গঞ্জে যাত্রা করান, সেই নায়েক পক্ষকে পত্র দিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়ে আনা**

হয়, তাদের হাতে পাশ তুলে দেওয়া হয়, এমনকি অনেক যাত্রা মালিক দু'দশ জন নায়েককে, যাঁরা বহু দূর থেকে আসেন, বাড়ি ফিরতে পারেন না, তাঁদের গদি ঘরে থাকার, হোটেলে খাবার বন্দোবস্ত করে থাকেন। উদ্দেশ্য, উদ্বোধনে যাত্রা দেখে যাতে দল বায়না করেন। তবে, অনেক নায়েক পক্ষ আবার, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যানার, পালাকার, নায়ক-নায়িকা কতটা শক্ত পোক্ত, প্রখ্যাত তা ঢাউস হ্যান্ডবিলে পড়ে অথবা গদিতে গদিতে শুনে, বা সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন দেখে দল বায়না করে থাকেন। অনেক দল বায়না হয় নায়েক পক্ষের বিশ্বাসের ভিত্তিতে। সত্যেন্দ্রনাথের আমলে একাধিক অধিকারী বা অধিকারীর প্রতিনিধি অর্থাৎ দালাল (এখন যাঁদের দালাল বলা হয় না, বলা হয় 'বুকিং এজেন্ট') গ্রামে-গঞ্জে, ধনী বাড়িতে কিংবা মেলায় গিয়ে অর্ডার নিতেন। দল যেত, তারপর সিলেকটেড্ দু' একটা সিন দেখে যে দলকে ভাল লাগত তাকে রেখে দিতেন।...অর্থাৎ পালা দেখে বায়নার যে রেওয়াজ এক সময়ে ছিল, এখনও আলাদা এবং সর্বাধুনিক ফর্মে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পালা দেখে বায়না চলে।...

॥ এ কালের যাত্রায় রবীন্দ্রনাথ ॥

যাত্রার আসরে রবীন্দ্র সাহিত্যেব উপস্থাপনা বিশেষ সম্ভব হয়নি। আসলে যাত্রার প্রযোজক ও শিল্পীদের সহস্র দুর্বলতাই রবীন্দ্র সাহিত্যকে যাত্রার আসরে তুলে আনার স্পর্দ্ধা দেয়নি। তবে অতীতে যাত্রার শিল্পীদের দিয়ে রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করা হয়েছিল। বর্তমানে যাত্রার অধিকাংশ শিল্পী যদিও রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনে দক্ষ, তবুও পালাকার বা প্রযোজকরা কোন ঝুঁকি নিতে চান না। তবে একাধিক সুরকার 'আবহ সংগীত' হিসেবে একাধিক রবীন্দ্রসংগীতের সুর ব্যবহার করেন টুকরো টুকরো ভাবে। তবে যাত্রার আসরে রবীন্দ্র সাহিত্য-কাব্য যে একেবারেই অনুপস্থিত থেকেছে তা নয়। এ ব্যাপাবে নট্ট কোম্পানি প্রথম রবীন্দ্র সাহিত্যের যাত্রারূপ আসরস্থ করার গৌরবের ধারক ও বাহক। ১৯৫৩ সালে নট্ট কোম্পানি আসরস্থ করেছিল 'প্রতিশোধ' নামে একটি পালা। পালাটি কবির 'মস্তক বিক্রয়' কবিতার ছায়া অবলম্বনে রচনা করেছিলেন ব্রজেন্দ্রকুমার দে।

সেই পালার নির্দেশক ছিলেন অমিয় বসু। সেবার চূড়ান্ত খ্যাতি পেয়েছিল এই পালা। সংলাপে এবং উপস্থাপনায় আলাদা একটা মেজাজও তৈরি হয়েছিল। এই পালাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৬১ সনে। তার ভূমিকায় পালা সম্রাট লিখেছিলেন ঃ

"মহাবস্তুবদান"-এর একটি আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "মস্তক বিক্রয়" কবিতা ছাত্রাবস্থা হইতেই আমার মনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 'প্রতিশোধ' নাটক তারই পরিণতি—।...এই ধরনের কবিতা-মূল নাটক আর কখনই অভিনীত হয় নাই। অসংখ্য দর্শকের প্রশংসাধন্য এই নাটক পাঠকের কৃপা দৃষ্টি লাভ করিলে বাধিত হইব। ইতি—

বাসন্তী সপ্তমী — গ্রন্থকার
১৩৬১ সাল

নট্ট কোম্পানির কর্ণধার মাখনলাল নট্ট এই প্রসঙ্গে "শেষ আরতি" পালার কথাও বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "পূজারিণী" কবিতার ভাব অবলম্বনে এই পালাটিও রচনা করেছিলেন ব্রজেন দে।

রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' তো সরাসরি যাত্রার আসরে নামানো হয়েছিল। জোড়াবাগান থানার সামনে ছিল "সান্ধ্য নাট্য সংঘ", তাঁরাই কবির এই নাটককে যাত্রার মত করে লিখে আসরে এনেছিলেন। হিমাংশু দাস এই পালার সম্পাদনা ও নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। রঘুবীর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন আজকের শান্তিগোপাল।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "সামান্য ক্ষতি" অবলম্বনে রচিত "রাণী করুণাময়ী" আসরস্থ করেছিল অম্বিকা নাট্য কোম্পানি। পালার নির্দেশক ছিলেন অমিয় বসু।

নাট্যভারতী'র কর্ণধার কিষাণ দাশগুপ্ত রবীন্দ্র কাহিনীর পালারূপ আসরস্থ করেছিলেন। পালারূপ দিয়েছিলেন মন্মথ রায়। নির্দেশক ছিলেন শক্তিমান অভিনেতা পঞ্চু সেন।

যাত্রাপালার চরিত্রের মুখ দিয়ে প্রথম রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তি করান শম্ভু বাগ তাঁর "ঘুম ভাঙ্গার গান" পালায়। মাধবী নাট্য কোম্পানি আসরস্থ করেছিল 'কাবুলিওয়ালা'। সুজিত পাঠক রূপদান করেছিলেন।

॥ যাত্রাগান ঃ শান্তিনিকেতনের স্মৃতি প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশী ॥

"যাত্রাগান শুনিতে চিরকাল আমার ভালো লাগে। যাত্রা শুনিবার সুযোগ পাইলেই আমি আসরে গিয়া বসিতাম। বোলপুর শহরে গ্রীষ্ম কালে নানা উপলক্ষে যাত্রা-অভিনয় হইয়া থাকে। খবর পাইলেই আমি যাইতাম ; রাত্রির অন্ধকার বা পথের দূরত্ব কিছুই বাধা মনে হইত না ; সারা রাত্রি গান শুনিয়া ভোরে ফিরিয়া আসিতাম। কিন্তু কোনদিন যে নিজে যাত্রা লিখিব এমন কল্পনাও করি নাই।

হঠাৎ একদিন বিভূতি গুপ্ত বলিল, যাত্রাপালা লিখিলে হয়। এই বলিয়া সে একটা পালার দুই-চার পাতা দেখাইল। আমার ভালো লাগিল। পালাটা আমি লিখিয়া শেষ করিয়া ফেলিলাম। পালা তো লেখা হইল, এইবাব অভিনয়ের কী করা যায়? দু-চারজন বন্ধু-বান্ধবকে আইডিয়াটা বলিলাম, তাহারাও উৎসাহ অনুভব করিল।

কিন্তু যাত্রা লেখা এক কথা আর দশ জনকে টানিয়া লইয়া অভিনয় করা সে আর-এক কথা ; সেটা তত সহজ নয়। সৌভাগ্য ক্রমে এই সময়ে এমন একজনকে পাইলাম যাঁহাকে আমাদের দলের অধিকারী বলা যাইতে পারে। ইনি নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী, সংক্ষেপে গোঁসাইজি। গোঁসাইজি শান্তিপুরের অদ্বৈতবংশের সন্তান।...

নাটক ও যাত্রা সাহিত্যের মধ্যে সবচেয়ে জটিল শিল্প। তাহার এক দিকে লেখক, অন্য দিকে দর্শক ; কিন্তু মাঝখানে আছে অভিনেতা, প্রযোজক, গায়ক, নর্তক, মঞ্চ সজ্জাকর, চিত্রশিল্পী। এতগুলি লোকের সমবেত চেষ্টায় লেখকের রস সম্পূর্ণ উদ্‌বোধিত হইয়া তবে দর্শকদের কাছে পৌঁছায়। তাহাদের চেষ্টার সফলতায় রসের সার্থকতা ; তাহাদের চেষ্টা বিফল হইলে ভালো লেখাও ব্যর্থ হইতে পারে। যথার্থ নাটক যৌথ শিল্প, কেবলমাত্র ব্যক্তি বিশেষের কৃতি নয়।

...শচীন করের উপর গানের দলটি পরিচালনার ভার ছিল। অভিনেতার দল জুটিয়া গেল। কাজ বড়ো কম নয়,......কিন্তু আশ্রমের সব শ্রেণীর লোকের এমন উৎসাহ যে, কোন কাজই কঠিন বলিয়া মনে হইল না ; এমন-কি, জগদানন্দবাবুর মতো প্রবীণ লোক ও তেজেশবাবুর মত গম্ভীর লোকও অভিনয়ের দিন আলখাল্লা পরিয়া বেহালা হাতে করিয়া আসরে নামিলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও মাঝে মাঝে খোঁজ লইতেন, আমাদের পালাগানের অভ্যাস কিরকম অগ্রসর হইতেছে।

তারপর একদিন রাত্রে আশ্রমের প্রাঙ্গণে আসর বাঁধিয়া, সামিয়ানা টাঙাইয়া, আলো জ্বালিয়া অভিনয়ের উদ্যোগ হইল। দর্শকদের মধ্যে সকল শ্রেণীর লোক ছিল, চাকর-বাকর হইতে আরম্ভ করিয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত। তিনি আসরে বসিয়া ধৈর্যের সঙ্গে আগাগোড়া শুনিয়াছিলেন।

আমাদের প্রথম পালার নাম 'বীরভুমেশ্বর-পরাজয়'। কাহিনীটার খানিকটা পৌরাণিক, খানিকটা কাল্পনিক। রামচন্দ্রের অশ্বমেধের অশ্ব যেন বীরভূমে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে ; বীরভূমের রাজা সেই অশ্ব ধরিয়াছেন ; তাঁহার সঙ্গে রামচন্দ্রের যুদ্ধ ও বীরভুমেশ্বরের পরাজয়। রামচন্দ্রের অনুচরদের প্রধান হইলেন হনুমান—হনুমান সাজিবে কে?...মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত অকুতোভয়ে হনুমানরূপে অলংকৃত হইয়া আসরে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার অভিনয় এমন স্বাভাবিক হইয়াছিল

যে, তাহাতে মুগ্ধ হইয়া শিল্পীগুরু নন্দলাল বসু মণীন্দ্রভূষণকে আসবের মধ্যে একটি পদক দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। গোঁসাইজি ও লেখকের জন্য একজোড়া কমিক ভূমিকা ছিল।...

প্রথম পালাটির আশ্চর্য সফলতা দেখিয়া আমাদের উৎসাহ বাড়িয়া গেল। তখন দ্বিতীয় পালা লিখিয়া ফেলিলাম—'ঘোষযাত্রা'। এই পালাটি মুদ্রিত হইয়াছিল, এখন দুষ্প্রাপ্য। ঘোষযাত্রাও আসরে পরমোৎসাহে অভিনীত ও গৃহীত হইল। তার পরে লিখিলাম 'কর্ণমর্দন', অর্থাৎ কর্ণ বধের পালা। কর্ণমর্দন নামটার মধ্যে বোধ করি কিঞ্চিৎ শ্লেষ ছিল ; স্থানীয় কোনো কোনো লোক চটিয়া গেলেন ; শেষে এমন হইল যে, শ্লেষটা লেখকের উপরে বাস্তবিক আকারে আসিযা পড়ে আর কি। শেষ পর্যন্ত, লেখকের কান বাঁচিয়া গেলেও যাত্রাপালা রচনার এখানেই শেষ হইল। তখন আমাদের যাত্রার অনেক গান এমন লোকপ্রিয় হইয়াছিল যে, আশ্রমের অনেকেব মুখেই সর্বদা শোনা যাইত। এখনো হয়তো দু-চারটা গান কারো কাবো মনে থাকিতে পাবে। আমাদেব যাত্রাপালার সাফল্য দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের ঝোঁক হইল যাত্রা লিখিবেন। একদিন আমাকে বলিলেন, "দেখ্, এবাব যাত্রাপালা লিখব ভাবছি।" আমি বলিলাম, "সাহিত্যের সব পথই তো আপনার পদচিহ্নিত ; এক-আধটা গলিপথও কি আমাদের মতো আনাড়িদের জন্য রাখবেন না?" আমার কথা শুনিযা তিনি কী ভাবিলেন জানি না। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, যা।" ভাবটা এই, 'ও পথটা তোদেরই ছাড়িয়া দিলাম।'

[ববীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন ঃ শ্রীপ্রমথনাথ বিশী]

॥ শ্রীমতী নির্মলা যোশী ॥

ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সংগীত অকাদেমীর সম্পাদিকা শ্রীমতী নির্মলা যোশী অকাদেমীর অন্যতম সদস্য নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের সঙ্গে হুগলী জেলার অন্তর্গত চণ্ডীতলা গ্রামে অনুষ্ঠিত আর্য অপেরার "রামপ্রসাদ" গীতাভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন।

শ্রদ্ধেয় অতিথিদ্বয়কে আসরে আহ্বান জানিয়ে গ্রামবাসীদের এবং আর্য অপেরার পক্ষ হতে শ্রদ্ধা নিবেদন ও মাল্যদান করা হয়। পল্লীবাসী দর্শকদের কাছে শ্রীমতী নির্মলা যোশীর পরিচয় দান প্রসঙ্গে প্রবীণ নাট্যকার সংগীত অকাদেমীর উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দেন। বঙ্গ সংস্কৃতির বিশেষ বাহন যাত্রাভিনয় প্রধানত পল্লীবাসীরাই বাঁচিয়ে রেখেছেন বলে পল্লীর শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলকেই অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

শ্রীমতী যোশী বলেন, দীর্ঘকাল থেকেই তিনি বাংলা যাত্রাভিনয়ের খ্যাতি শুনে এসেছেন, তাই এটা দেখার সুযোগ তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি। দিল্লি অনেক দূর সত্য, কিন্তু সাংস্কৃতিক সংযোগ ভারতের সর্ব রাষ্ট্রকেই এমনভাবে ঐক্যবদ্ধ করবে যে ভূগোলের দূর মনের মিলনকে প্রতিরোধ করতে পারবে না। সংগীত নাটক অকাদেমী সেই লক্ষ্য সম্মুখে রেখেই কাজ করছে। সম্মানিত অতিথিদ্বয় সমস্ত রাত্র আসরে বসে যাত্রা দেখে ভোরে কলকাতায় ফিরে আসেন।

আর্য অপেরার 'রামপ্রসাদ' দেখে শ্রীযুক্তা যোশী লিখেছেন—"আর্য অপেরার রামপ্রসাদ গীতাভিনয় দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেছি। গীতাভিনয় যে এমন জনচিত্তজয়ী হতে পারে তা আমি পূর্বে কখনও উপলব্ধি করিনি। আর্য অপেরার এই অভিনয় আমার চিত্তে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে—"

॥ প্রাচীন সাহিত্যিক গঙ্গাচরণ সরকার ও যাত্রার এক যুগ ॥

গঙ্গাচরণের সুযোগ্য ছেলে, সুসাহিত্যিক-সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর স্মৃতিকথায়, বাবার কথা বলতে গিয়ে তৎকালীন যাত্রার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখছেন—

"...থাক এখন আমার কথা। পিতার সাহিত্য সেবার আর একটি অঙ্গ বলি। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় কবির গান প্রৌঢ়াবস্থা পাইয়াছে। হরু, নিলু প্রভৃতি ঠাকুরেরা,—চিন্তে, ভোলা

প্রভৃতি ময়রারা, বলাইচাঁদ, উদয়চাঁদ, কৃষ্ণ দাস, প্রভৃতি আমাদের নিকটস্থ বৈরাগী কবিয়ালরা—সকলেই প্রায় অস্তগত। একদিকে চিন্তামণি অন্যদিকে পরাণচন্দ্র বাদ-বিবাদ করিয়া কোনরূপে বাঙ্গলার আসর রক্ষা করিতেছিলেন। যাত্রার গানে বদন তখন ওস্তাদ হইয়াছেন। গোবিন্দ অধিকারীর তখন খুব জাঁক-পসার ; গোপাল উড়ের তখন মৃত্যু হইয়াছে, প্রসিদ্ধ নৃত্যকারী কেশে ধোবা সেই দল তখন জাঁকে-জমকে রক্ষা করিতেছেন। আর তখন জাঁক পসার পাঁচালীর। গুরু-দুম্ব, গঙ্গা লস্কর তখন চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু কথার ছটায় শব্দের ঘটায় দাশরথি তখন বাঙ্গলা আচ্ছন্ন করিয়াছেন ; আর আমাদের নিকটে চুঁচুড়ায় গাওনার জোরে, সুর-তালের বলে, সন্ন্যাসী তখন দাশরথির সমকক্ষতা করিতেছেন।

এই সন্ন্যাসীর দলে একজন তবলা-বাদ্যকার ছিলেন ঠাকুরদাস সরকার, আমাদের অতি নিকট প্রতিবেশী। উলায়-থাকা সময়ের মধ্যে, এই ঠাকুরদাসের অনুরোধে, পিতা তিন চারি পালা পাঁচালীর গান তাঁহাকে রচনা করিয়া দেন। ঠাকুরদাস সন্ন্যাসীর দল হইতে ভাঙ্গিয়া আসিয়া, এই রচনার বলে পৃথক দল করিয়াছিলেন।

এক পালা শিবের বিবাহ ; দ্বিতীয় পালা শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ, তৃতীয় পালা বিরহ, চতুর্থ পালা আগমনী।

শিব বিবাহের উপক্রমণিকার নমুনা এই রকম ঃ

"ভবানীর লীলা খেলা ভাবনা-অতীত।
যে ভাব ভাবিয়া ভব আপনি মোহিত।।
দেখ দক্ষালয়ে দেহ করি পরিহার।
হিমাচলে লীলা ছলে কুমারী-আকার।।
মহীয়সী মায়া তাঁর অপরূপ গণি।
মেনকারে মা বলেন জগতজননী।।"...

এই পালার একটি গানের নমুনাও দিয়েছেন অক্ষয়চন্দ্র। যেমন ঃ

"(আজি) গিরিবাসে জান হর সাজি বর,
আনন্দ অপার, পরিহিত বাঘাম্বর
শিরে শোভে শশধর, উথলিয়া গঙ্গাজল,
ঝরিছে ঝর ঝর..."

॥ যাত্রার ওপরে থিয়েটারের প্রভাব এবং শিশির ভাদুড়ী ॥

এ প্রসঙ্গে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী বলেছেন "...যাত্রার দুর্ভাগ্য বাঙলা থিয়েটার আজকালকার যাত্রাকে অত্যন্ত প্রভাবান্বিত করেছে। এই জন্যই আজ ত্রিশ বৎসর থেকে যাত্রার দল হয়ে দাঁড়িয়েছে 'থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টি"।

॥ কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ ও ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ॥

ত্রিশ / চল্লিশ দশকের কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ ও ভারতীয় গণনাট্য সংঘ মুকুন্দ দাসের যাত্রার আদর্শে তৈরি হয়।

১৩৪১ বঙ্গাব্দের ৪ জ্যৈষ্ঠ মুকুন্দ দাসের (১৯৩৪) মৃত্যু হয়। পরে সুযোগ্য শিষ্য কালীকৃষ্ণ নট্ট এই 'স্বদেশী যাত্রা'র দায়িত্ব নেন।

* "মুক্তি পথের অনন্যচারণ"—অমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ভারত ও সমাজতান্ত্রিক—জি.ডি. আর। শারদীয় ১৩৯৩ আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৮৬।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ছেলেবেলার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—"ছেলেবেলার কথা মনে আছে,...বৈচিত্র্যের লোভে মাঝে মাঝে যাত্রার দলে সাগরেদি করি।'

যাত্রা-থিয়েটারের ওপর শরৎচন্দ্রের গভীর অনুরাগ ছিল। এই কারণেই যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি সাগরেদ থেকে গুরুর পদে উন্নীত হয়েছিলেন। যখন ভাগলপুরে খঞ্জরপুর পল্লীতে ছিলেন তখন পাড়ার কয়েকজনকে নিয়ে একটা দল তৈরি করেছিলেন।-দলটি কয়েকবার অভিনয় করেছিল। তিনি ছিলেন প্রাণ স্বরূপ। তিনি একাধারে প্রযোজক, শিক্ষক, অভিনেতা। দস্তুর মত রিহার্সাল দিয়ে নাটক নামাতেন। অভিভাবকদের চোখ এড়িয়ে রিহার্সাল। কখনও যমুনার তীরে, ভগ্ন দেবালয়ে আবার কখনও মুসলমানদের কবর স্থানে।

শরৎচন্দ্র আদমপুরের সতীশচন্দ্রের "আদমপুর ক্লাব"-এর 'জনা', 'আলিবাবা' ইত্যাদি নাটকে অভিনয় করেছিলেন। শরৎচন্দ্র যখন বাজে শিবপুরে থাকতেন তখন অমরেন্দ্রনাথ মজুমদার নামে একজন স্নেহভাজন প্রতিবেশী থাকতেন সেখানে (অমববাবু পরবর্তী সময়ে হাওড়ার নরসিংহ দত্ত কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল হন)। শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ির কাছেই ছিল অমরবাবুর গ্রামের বাড়ি। সেই অমরবাবুর বিয়েতে শরৎচন্দ্র নিমন্ত্রিত। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার আগেই শরৎবাবুকে ঘিবে অনেকেব অনেক কিছু জানার ইচ্ছে। কথা উঠল যাত্রা নিয়ে।

দেশে একবার যাত্রা দেখেছিলেন শরৎচন্দ্র। নাম ঃ 'সাবিত্রী সত্যবান'। রাত ১০টার পর যাত্রা আবম্ভ হল। লোকে লোকারণ্য। যাত্রাওয়ালারা ভালই অভিনয় করছিল। দর্শকবা মুগ্ধ হয়ে যাত্রা দেখছিল। যাত্রা বেশ জমে উঠেছে। যখন সত্যবান মারা গেল, সাবিত্রী তার মৃত স্বামীকে ঘিরে যমেব উদ্দেশ্যে খুব কান্নাকাটি করতে লাগল। যম মৃত সত্যবানকে নিয়ে যেতে চায় কিন্তু সাবিত্রী ছাড়তে চায় না। মেয়েটির সে কী কান্না! এত জীবন্ত অভিনয়! কিন্তু নাট্যকার কি করেছিলেন? ঐ নাটকীয় চরম মুহূর্তে এনে তাঁর নাটকের একটা অঙ্ক শেষ করেছিলেন। তাই একটা অঙ্কের শেষে আর একটা অঙ্ক আরম্ভ হবার আগে পর্যন্ত সময়টার মধ্যে যে ঐক্যতান বাদন হয়, ঐ জমাটি সময়টায় সেই ঐক্যতান বাদন আরম্ভ করেছিলেন। একদিকে অভিনেতা যমরাজ তখন দর্শকদের মধ্য দিয়ে যাতায়াতের জন্য যে পথ ছিল সেই পথ দিয়ে সত্যবানকে নিয়ে চলেছে, আর সাবিত্রী আকুলি-বিকুলি করে কাঁদতে কাঁদতে তার পিছন পিছন যাচ্ছে! অন্যদিকে ঠিক ঐ সময়ে দর্শকদের ভিতর থেকে প্রৌঢ় গোছের একটি লোক দাঁড়িয়ে চিৎকার করে যমরাজকে ডেকে বললে—, ওহে যমবাজ! শোন-শোন যেও না! ওর স্বামীটাকে ছেড়ে দাও—, ওর স্বামীটাকে ছেড়ে দিয়ে বরং ঐ বাজনদারের লোককে ধরে নিয়ে যাও—, ওরা অনেকগুলো আছে! ব্যাটারা যাত্রাটাকে একেবারে মাটি করে দিলে গা! যখন যাত্রাটা জমে উঠেছে তখনই কিনা ফাটিয়ে বাজনা শুরু করে দিলে! তাও আবার একটা-আধটা বাজনা নয় এক সঙ্গে একেবারে সব কটা! শরৎচন্দ্রের কথা শুনে সবাই হাসতে লাগলেন। শরৎ সাহিত্যে যাত্রা যে কত ভাবে অঙ্কিত হয়েছে তা বাংলা সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীরা শরৎ সাহিত্যের এই দিকটা নিয়ে বিশেষভাবে গবেষণা করলেই জানতে পারবেন।

নজরুল সহচর প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় 'নজরুল জীবনী'তে বলেছেন—

১৯২৩-২৪ সালে বিদ্রোহী কবি নজরুল বহরমপুর জেলে থাকার সময়ে সর্বক্ষণ গান গেয়ে, গান-কবিতা লিখে সকলকে জেলের দুঃখ ভুলিয়ে আনন্দের মধ্যে দিন কাটাতে থাকলেন। এই আবহাওয়ার মধ্যে পূর্ণ দাস, নরেন্দ্রনারায়ণ ও কাজী এক পরিকল্পনা করলেন ঃ "কাজী পালা গাঁথিবেন, গানের সুর দিবেন ও গান গাহিবেন। আমার উপর থাকিবে অভিনয়ের দায়িত্ব, পরিচালনার ভার থাকিবে পূর্ণবাবুর উপর।"

মুকুন্দ দাসের যাত্রার কথা ভেবে নরেন্দ্রনারায়ণ কাজীকে দিয়ে এই রকম একটি স্বদেশী যাত্রার দল গড়ার কথাও ভেবেছিলেন।

॥ বিভূতিভূষণের সাহিত্যে যাত্রা ॥

বিভূতিভূষণ জীবনকে দেখেছেন খুব কাছ থেকে, তাকে উপলব্ধি করেছেন হৃদয়ের গভীরে। তাই তাঁর লেখা এত সহজে মনকে ছুঁয়ে যায়। গ্রামের মানুষের দুঃখ-দৈন্য যেমন প্রকাশিত তাঁর লেখায় তেমনই প্রকাশিত তাদের কঠিন জীবন-সংগ্রামের ছবি। সে-সংগ্রামে তারা সত্যিই অপরাজিত। দুঃখে ভরা দিনের মাঝেও তারা আনন্দ খুঁজে নিতে পারে।

'বারিক অপেরা পার্টি' গল্পে দেখি মুসলমান বারিক অনাহার দারিদ্র্যের কথা ভুলে গান বাজনাব মহলা দেয়। গলা ছেড়ে 'শ্যাম লটবরের' গান গায়। পাওনাদার গাই-বলদ সর্বস্ব ক্রোক করে নিলেও বেহালার তার কেনে সে, ডুগি তবলা ছেয়ে নেয় মহাজনের ধার শোধ না করে। সে মিথ্যেবাদী, ঠগবাজ, কিন্তু কি আশ্চর্য প্রাণশক্তি তার। বিভূতিভূষণ লিখছেন ঃ

'...একদিন সোনাই মণ্ডলের সঙ্গে দেখা। তাকে বলি—বারিক কেমন আছে?

—আর বাবু! আপনি শোনেন নি? তার যে সব্বনাশ হয়ে গিয়েচে।

—কি-কি-কি ব্যাপার? কি হল?

—ওর সেই বড় ছেলেডা আজ সাত দিন হবে মরে গিয়েচে!

—সে কি কথা? কি হয়েছিল?

—বাবু, পুরনো জ্বরে ভুগছিল।

পেটে পিলে। রোজ সন্দেবেলা জ্বর হত। ওষুধ নেই, পথ্যি নেই। জ্বর সেরে গেলে তো পান্তা ভাত আর পটল-পেঁজপোড়া খেলে! সে দিন রাত্তিরে জ্বর হয়েছে ওর সেই অপেরা পার্টি থেকে গান সেরে এসে। ভোর বেলা মারা গেল। কাফনের কাপড় জোটেনা শেষে, এই তো অবস্থা। বুড়ো বয়েসে ওই ছেলেডা তবুও মাথা ধরা হয়ে ঠেলে উঠছিল। আর একটা ছেলে, সে তো বাচ্চা, তার ভরসা কি?

অত্যন্ত মর্মাহত হলাম বলা বাহুল্য। মনের কোণে ঘোর মিথ্যেবাদী, জুয়োচোর, সদা প্রফুল্ল, বৃদ্ধ বারিকের প্রতি একটু অনুকম্পার ভাব সঞ্চিত ছিল। কাল সকালে একবার বারিকের বাড়ি যাবো। ভাগের জমি দু'বছর কেড়ে নিয়েছিলাম ওর কাছ থেকে, এবার ওর সঙ্গেই আবার বন্দোবস্ত করব। পুত্র শোকাতুর বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দেওয়া উচিত, সাহায্য করা উচিত।

সেই দিনই রাত দশটা এগারোটা। গোঁসাই বাড়িতে জন্মাষ্টমীর নিমন্ত্রণ খেতে যেতে যেতে শুনি কোথা থেকে বাঁশি, বেহালা, ডুগি তবলা ও মানুষের গলার একটা সম্মিলিত রব ভেসে আসচে। নিমচাঁদ গরাই বললে, বাবু গোঁসাই বাড়ির নাট মন্দিরে আজ জন্মাষ্টমীর দিন বারিক অপেরা পার্টির গাওনা হচ্চে। বেশ ভাল পালা হবে, গিয়ে শুনুন।

আসরে গিয়ে দেখি বারিক বিদূষকের ভূমিকায় দাড়ি নেড়ে নেড়ে খুব লোক হাসাচ্চে। পালা হচ্ছে 'সাধন সমর' বা 'অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ'।' এখানেই গল্পটি শেষ করেছেন বিভূতিভূষণ। একজন যাত্রা অভিনেতা তাঁর অভিনয়ের প্রতি যে কত নিষ্ঠাবান হতে পারেন, তা বিভূতিভূষণের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। এ-গল্পের বারিক বিভূতিভূষণের এক প্রজা।

ব্যক্তিগত জীবনে যাত্রার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করতেন বিভূতিভূষণ। যাত্রা-জগতের নানান খুঁটিনাটি বিষয় সবই জানতেন। তাঁর লেখায় যাত্রার জীবন, তার পূর্ণতা-অপূর্ণতা, হতাশা-আনন্দ নিয়ে হাজির হয়েছে চোখের সামনে। 'যদু হাজরা ও শিখিধ্বজ' গল্পের শুরুতে বিভূতিভূষণ লিখছেন ঃ

"আপনারা একালে যদু হাজরার নাম বোধহয় অনেকেই শোনেন নি। আমাদের বাল্যকালে কিন্তু যদু হাজরাকে কে না জানত? চব্বিশ পরগণা থেকে মুরশিদাবাদ এবং ওদিকে বর্ধমান থেকে খুলনার যেখানেই বাজারে বা গঞ্জে বড় বারোয়ারীর আসরে যাত্রা হত, সে সব স্থানে দশ-বারো

ক্রোশ পর্যন্ত যদু হাজরার নাম মুখে মুখে বেড়াত।...আপনারা কেউ কি যদু হাজরাকে 'নল-দময়ন্তী' পালাতে নলের পার্ট করতে দেখেন নি?...

আমি দেখেছি...কি কথা বলার ভঙ্গি, কি চোখ মুখের ভাব, কি হাত-পা নাড়ার ঢং।...বনে বনে ভ্রাম্যমান, রাজ্যহীন, সহায়-সম্পদহীন উন্মত্ত নলের সে কি করুণ ও মর্মস্পর্শী চিত্র..."

এরপর বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। বিভূতিভূষণ লিখছেন ঃ

"...যাত্রা জিনিসটা দেখিনি অনেককাল। দেখে বুঝলুম সেকালের যাত্রা আর নেই। জুড়ির গান, মেডেলধারী বেহালাদারদের দীর্ঘ কসরৎ-এ সব অতীত ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। সল্‌মা-চুমকীর কাজ করা পোশাকও আর নেই! কলকাতার থিয়েটারেব হুবহু অনুকরণ যেমন সাজ-পোশাকে তেমনি তরুণ অভিনেতাদের অভিনয়ের ঢঙে..."

যাত্রা জীবনকে কাছ থেকে দেখেছিলেন বলেই বিভূতিভূষণ সেই জীবনের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের ছবি এমন মমতার সঙ্গে আঁকতে পেরেছেন।

'আমোদ' গল্পে যাত্রা দেখার প্রসঙ্গ এসেছে। এসেছে পুরনো দিনের যাত্রার কথাও। 'রামধন পোদ' এক সময়ে যাত্রার বড় ভক্ত ছিল। একবার তার ছোট বেলায় মতি রায়ের বিখ্যাত যাত্রাদল এসে "তরণীবর্জন বধ' পালা গান করে। অমন গান কখনো এদেশে কেউ শোনেনি নাকি।

"মতি রায়ের দল গেল, তাঁর ছেলে ধর্মদাস রায়ের দল হল। ধর্মদাস নারদ সেজে কি সুন্দর অ্যাক্‌টো করত, শুনলে চোখে জল আসত।...

সাঁতরা কোম্পানির দলের পাঁচুলাল বাগদীর কথা সে কখনো ভুলবে? অমন জুড়ির গান, 'অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ" পালায় মুমূর্ষু অজামিলের সামনে দাঁড়িয়ে 'চেয়ে দেখো ঐ মহাপ্রস্থান'-গানখানা! নাঃ, সে সব জুড়িও আজকাল আর যাত্রাদলে নেই, তেমন গানও আর কেউ গায় না।...

একবার একটা স্বদেশী গান হয়েছিল, ভূষণদাসের 'মাতৃপূজা'।...জিনিসটা তার মাথায় ভালো ঢোকেনি যেন। বাইরে এসে সে একজনকে জিগ্যেস করল—সুরেন্দর বলচে কাকে ওরা?

—আহা, জানো না। সুরেন বাঁড়ুজ্যে। মস্ত স্বদেশী। সাহেব মেরেছিল, ধরে নিয়ে গিয়েছিল বরিশালের সভায়...

—কেন গো বাবু?

—স্বদেশী করবার জন্যে...কেন আবার?—কোথায় গেল সে সব দিন।"

তারপর এল নতুন ধরনের যাত্রার যুগ।

জুড়ি উঠে গেল, গান হয় নতুন ধরনের, সাবেক ধরনের পালাও আর নেই।...ঠাকুর দেবতার পালা এখন আর হয় না। একটা ব্যাপার এখানে লক্ষ্য করার মতো। 'বারিক অপেরা পার্টি' ও 'আমোদ' দুটি গল্পেই 'অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ' যাত্রা-পালার কথা এসেছে।

'দুই দিন' গল্পে বিভূতিভূষণ গ্রাম্য-মানুষের যাত্রা দেখার বর্ণনা করেছেন নিপুণ ভঙ্গিমায়। একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায়, সেকালের সঙ্গে একালের পার্থক্য যা কিছু-বহিরঙ্গে, অন্তরঙ্গে নয় ঃ

"...কতকগুলো লোক এসে আসরে আলো জ্বেলে দিয়ে গেল। লোকের ভিড় জমে গেল আসরে। বহু দূর-দূরান্তর থেকে লোক দেখতে এসেচে রসিক বাঁডুয্যের যাত্রা, তাদের হাতে চিঁড়ের পুঁটুলি, বগলে তামাক-টিকের ঠোঙা। আসরের বাইরে এক-একখানা থান ইঁট পেতে সবাই বসে গেল।...

যাত্রা আরম্ভ হয়ে গেল। বিস্ফারিত চোখে কাতু এক দৃষ্টে চেয়ে দেখলে পঞ্চনল

জাঁকজমকের সঙ্গে সল্‌মা চুম্‌কীর কাজ-করা জরির পোশাক পরে সভাস্থলে আলো করে বসেচে।

কি তাদের হাত-পা নাড়ার কায়দা, কি তাদের তরবারির আস্ফালন।

ইন্দ্রের সঙ্গে বরুণের কথা কাটাকাটির কি বাহার!

আর গান? এমন সুন্দর সুরের গান এ পর্যন্ত সে শোনে-নি এ পাড়াগাঁয়ে।

দৃশ্যের পর দৃশ্য বদলে চলেচে। প্রত্যেক দৃশ্যে অভিনব ঘটনার সমাবেশ, নতুন নতুন সুরের গান, নতুন নতুন সুন্দর মুখ। পরীর মত মেয়েরা। মেয়ে নয়, ওরা পুরুষ, কাতু জানে না যে এমন নয়, কিন্তু দু-একটি মেয়ে সম্বন্ধে কাতু ঠিক বুঝতে পারলে না ওরা ছেলে, না সত্যিই মেয়ে।..."

শেষ পর্যন্ত কাতুর অবশ্য পুরো যাত্রা দেখা হয়নি। বাবা উঠে পড়েছেন। কাতুকেও ফিরে আসতে হয়েছে।

'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে অপুর যাত্রা-দেখার দীর্ঘ বর্ণনা আছে।

"যাত্রা আরম্ভ হয়। জগৎ নাই, কেহ নাই—শুধু অপু আছে, আর নীলমনি হাজরার যাত্রার দল আছে সামনে। সন্ধ্যার আগে বেহালায় ইমন আলাপ করে। ভাল বেহালাদার, পাড়াগাঁয়ের ছেলে কখনও সে ভাল জিনিস শোনে না—উদাস-করুণ সুরে হঠাৎ মন কেমন করিয়া উঠে...পালা দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। সেবার সে বালক-কীর্তনের দলের যাত্রা শুনিয়াছিল—সে কি, আর একি! কি সব সাজ! কি সব চেহারা!...

...অজয়ের করুণ গান—"কোথা ছেড়ে গেলি এ বন কান্তারে প্রাণপ্রিয় প্রাণসাথী রে"—শুনিয়া অপু এতক্ষণ মুগ্ধ চোখে চাহিয়াছিল—আর থাকিতে পারে না, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদে।

কলিঙ্গরাজের সহিত বিচিত্রকেতুর যুদ্ধে তলোয়ার খেলা কী!...যায়, বুঝি ঝাড়গুলা গুঁড়া হয়, নয়তো কোন হতভাগ্য দর্শকের চোখ দুটি বা যায়! রব ওঠে—ঝাড় সামলে—ঝাড় সামলে!...কিন্তু অদ্ভুত যুদ্ধ কৌশল—সব বাঁচাইয়া চলে-ধন্য বিচিত্রকেতু!"...

বিভূতিভূষণের সাহিত্যে যাত্রা এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। আমাদের লোকায়ত সংস্কৃতির এই রূপ বিশেষ প্রিয় ছিল বিভূতিভূষণের। সামাজিক, পৌরাণিক পালাই হোক, কিংবা ঐতিহাসিক-স্বদেশী পালাই হোক—দেখার সুযোগ পেলে সে সুযোগ ছাড়তেন না তিনি। দিনলিপি 'স্মৃতির রেখা'র ১৪ মার্চ, ১৯২৮ তারিখের পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

"...সন্ধ্যাবেলা অনিলবাবু উকিলের সঙ্গে মুকুন্দ দাসের যাত্রা শোনা গেল..."

নিজের মনের ভাল-লাগা মন্দ-লাগার অনুভূতি খুব সহজ ভঙ্গিতে প্রকাশ করার অসামান্য ক্ষমতা ছিল বিভূতিভূষণের। জীবনের প্রতিটি স্তর তাঁর কাছে ছিল স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। তাই তাঁর সাহিত্যের পটভূমি, চরিত্র, পরিবেশ এত বেশি জীবন্ত, এত মর্মস্পর্শী। জীবনকে তিনি দেখেছেন একজন প্রকৃত চিত্রশিল্পীর দৃষ্টি দিয়ে, আলোক চিত্রীর দৃষ্টি দিয়ে নয়। সে জীবনের ছবি এঁকেছেন মনের তুলিতে। তাঁর সাহিত্যে যাত্রা-জগত ভিন্নতর এক মাত্রা পেয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, "সাহিত্যিকের কাজই হচ্ছে আনন্দের বার্তা সাধারণের প্রাণে পৌঁছে দেওয়া..." যাত্রা-জীবনের বিশ্বস্ত ছবি এঁকে সেই আনন্দের বার্তাই পৌঁছে দিতে চেয়েছেন বিভূতিভূষণ।

['যাত্রা অর্ঘ্য' '৯৩ সালের পূজা সংখ্যায় **শুভেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের** লেখা থেকে]

॥ তৃণাঙ্কুর / বিভূতিভূষণ ॥

পৃষ্ঠা ২ ঃ "গোপাল নগরের বারোয়ারীর যাত্রা দেখতে গিয়ে তাই সে ছেলেটার কথা মনে পড়লো যে আজ পঁচিশ বছর আগে কৃষ্ণ ঘোষের তামাকের দোকানের

বারান্দাতে বসে তার বাবার সঙ্গে যাত্রা দেখতে দেখতে দময়ন্তীর দুঃখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতো......”

* * * *

পৃষ্ঠা ২০ : “আজ বসে বসে সেই দিনগুলোর কথা ভাবছিলুম। যাত্রা দলের ফণি বাড়িতে খেতে এল......” [মনে হয় ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদের কথা]

* * * *

অনেক আগে যখন বকুলতলায় প্রথম বারোয়ারীর বেহালা বাজানো শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলুম—সে সব টাটকা-তাজা-আনকোরা আনন্দ এখনো কিন্তু যেন ভাবলে কিছু কিছু পাই—

* * * *

পৃষ্ঠা ৫৯ : উল্লেখ 'পরশুরামের মাতৃহত্যা' যাত্রা—

॥ বিভূতিভূষণের 'দিনলিপি' ॥

পৃষ্ঠা ৯০ : উল্লেখ “......শিবুদের সঙ্গে যাত্রা শুনতে গেলাম। করুণা আমি এক সঙ্গে বসে রাত তিনটে পর্যন্ত 'কুশধ্বজ' অভিনয় দেখলাম।...শেষ বাত্রে সাজঘরের সামনে এসে দাঁড়ালুম। যে লোকটা বশিষ্ঠ সেজেছিল, সে ভাল অভিনেতা, কিন্তু সাজ খুললেই তার চেহারা ও মুখের বুলি অন্য রকম হয়ে গেল...”

পৃষ্ঠা ২৫৩ : উল্লেখ □ গোপাল নগরে যাত্রা।...যাত্রা আরম্ভ হোল—বৃষ্টি হতে ভেঙ্গে গেল। ফিরে চলে এলুম।...

...অশ্বিনীর চাকরি বীণাপাণি অপেরায়...

॥ বিভূতিভূষণের সঙ্গে যাত্রা দেখার স্মৃতি ॥

[এই গ্রন্থের রচয়িতা গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ অর্থাৎ আমি যাত্রার সার্বিক কল্যাণের জন্য, দিল্লী থেকে ডিক্লারেশন এনে, ডাক বিভাগের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার নিয়ে, যাত্রার আজকের বৃহত্তম এক ব্যবসা এবং শিল্প ক্ষেত্রের লজ্জা ঢাকতে, শূন্যস্থান পূর্ণ করতে (এত বড় একটা জগতের একটা মুখপত্র না থাকা লজ্জার) প্রকাশ করেছিলাম “যাত্রা অর্ঘ্য” পাক্ষিক পত্রিকা। কয়েক বছর ধরে এই পত্রিকাকে বাঁচিয়ে রেখে, প্রকাশ করেছিলাম একাধিক “যাত্রা ক্রোড়পত্র”, “পূজা সংখ্যা” ইত্যাদি। কিন্তু যাত্রা জগতের অধিকাংশ মানুষই সাংস্কৃতিক, প্রকৃত শিল্প-চেতনা এবং পুঁথিগত শিক্ষার বাইরের যে শিক্ষা তার অভাব জনিত রোগে এই পত্রিকাটিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেনি। যাঁরা যেখান থেকে যাত্রা জগতে যান, তাঁরা যাত্রা থেকে টাকা তোলা ছাড়া আর কোন কাজই করেন না। ব্যবসায়িক এবং স্বার্থ সংক্রান্ত যোগাযোগ যাত্রার সঙ্গে তাঁদের। আমি সেই যাত্রার কল্যাণ কামনায় প্রভূত অর্থ নষ্ট করেছি। সংসারের সুখটুকু শেষ করেও, যাত্রা মাতৃকার সেবায় শেষ 'অর্ঘ্য'ও সাজিয়ে ছিলাম। সেই 'যাত্রা অর্ঘ্য'র ১৯৯৩ সালের পূজা সংখ্যা থেকে কিছু রচনার অংশ বিশেষ এখানে হাজির করলাম :]

প্রখ্যাত সাহিত্যিক শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাটশিলায় কথাশিল্পী বিভূতিভূষণের সঙ্গে যাত্রা দেখার স্মৃতি এই রকম :

“বিভূতিভূষণের সঙ্গে আমার যাত্রা দেখার অভিজ্ঞতা ঘটে ঘাটশিলাতে। তখন আমার তরুণ বয়স। ঘাটশিলা স্টেশনের পাশেই বেশ খানিকটা জমি ফাঁকা ছিল। অনেকটা মাঠের মতো দেখতে।

প্রত্যেক বছর কালীপূজার সময় এখানে যাত্রা হতো। আমাদের মাতন ছিল থিয়েটার নিয়ে। প্রতি বছর আমরাও আমাদের পল্লী ডাহিগোড়ায় থিয়েটার করতাম দুর্গাপূজার সময়। বিভূতিভূষণের একটা বাড়ি ছিল এখানে, কিন্তু সব সময় এখানে তিনি থাকতেন না। থাকতেন তাঁর ভাই, তিনি ছিলেন ডাক্তার। বিভূতিভূষণ এখানে আসতেন মাঝে মাঝে...একটি বছরের কথা বলি।...বন্ধুরা ধরলেন শরৎচন্দ্রের 'বিজয়া' নাটক। তাতে আমাকেও একটা পার্ট দিলেন...বিভূতিভূষণের ছোটভাই ডাক্তার ব্যানার্জী নিজে ছিলেন কৃতী গায়ক। বিশেষতঃ খেয়াল, ঠুংরি, রাগপ্রধান। তিনি 'বিজয়া'তে একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিনয় করবেন কথা ছিল।...

...কয়েকদিন কাটল। এলো কালীপূজার পরের দিন। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করে সবে উঠে নিজের ঘরে বসেছি, হঠাৎ আমার জানলার ওপর থেকে ভেসে এলো বিভূতিভূষণের কণ্ঠস্বর, শচীন? তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিতে হলো।...বিভূতিভূষণ বললেন, যাত্রা শুনতে যাচ্ছি স্টেশনে। অবশ্য আরম্ভের একটু দেরি আছে। বলেছে নটায় আরম্ভ করবে। কিন্তু আমি জানি-ও দশটার আগে কনসার্ট বাজবে না...বিভূতিভূষণ উঠে পড়লেন। বললেন,—খুব ভালো যাত্রা 'জয়দেব'।

যাইহোক, আমরা যখন আসরে বসলাম তখনো কনসার্ট বাজেনি। কিন্তু দর্শকে দর্শকে আসন একেবারে পরিপূর্ণ। কর্তাব্যক্তিরা ওঁকে দেখতে পেয়ে খাতির করে যাত্রা মঞ্চের খনিকটা কাছাকাছি চেয়ার পেতে বসালেন, আমিও অনুরূপ খাতির থেকে বঞ্চিত হলাম না। বিভূতিভূষণ চারদিক ভালো করে একবার তাকিয়ে নিলেন, তারপরে আমাকে বললেন, দেখেছো শচীন, আদিবাসীরাও এসে কেমন বসে পড়েছে। বেটাছেলেদের থেকে মেয়েদের ভিড়ই বেশি। কীভাবে অবাক হয়ে মঞ্চ দেখছে। আলো দেখছে, বাজনদারদের দেখছে। যাই দেখছে তাই ওদের কাছে নতুন। ঐ দ্যাখো, ছেলেদের কোলের ওপর 'টাঙি' শোয়ানো। আলো লেগে লোহার ফলাগুলো ঝক্‌ঝক্ করে উঠছে না? আমার দৃঢ় ধারণা এরা যাত্রা দেখবে বলে সেই ধারাগিরির আগের গ্রাম বাসাডেরা থেকে এসেছে। সে কি কম দূর? ছেলেরা নিয়েছে টাঙি, মেয়েরা মশাল। এ আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি। ধারাগিরির পথ কি সোজা পথ! একে পাহাড়ী রাস্তা তার ওপর ঘন বন। প্রথম যখন ঘাটশিলায় আসি, ক'জন বন্ধু মিলে পায়ে হেঁটে ধারাগিরি যাচ্ছি, বনের মধ্যে একজন আদিবাসীর সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞাসা করলাম, কাঁধে টাঙি নিয়েছিস কেন? তারা বললে, জানোয়ার-টানোয়ার বাইরতে পারে, তাই। বোঝ ব্যাপার।

এইরকম টুকটাক কথাবার্তা চলছে আমাদের, এক সময় যাত্রা শুরু হয়ে গেল কনসার্ট বাজিয়ে। সখীদের নাচ শেষ করে, নাটকের মূল চরিত্র, জয়দেব আর পদ্মাবতী। কিন্তু অন্য উপকাহিনীও আছে তাতে, রাজা, রাণী, মন্ত্রী আছে। সেনাপতি আছে, ষড়যন্ত্র আছে। যেই একজন চিৎকার করে বলবে, বেরিয়ে যাও! তার উত্তরে আর একজন বলবে—যাচ্ছি, কিন্তু যাবার আগে বলে যাই, ইত্যাদি। যাকে বলে 'টিপিক্যাল' যাত্রার ডায়ালগ! অভিনয়ে মাঝে মাঝেই মেলোড্রামার চূড়ান্ত, কিন্তু গানের বেলা মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। যেমন গলা সুন্দর, তেমনি সুর। সেই একই সুর যা আমি ছোটবেলায় নির্বাক-সিনেমার অনুসঙ্গ হিসাবে শুনেছিলাম। 'জয় জগদীশ হরে',—শুনে বিভূতিভূষণ অভিভূত হয়ে গেলেন, বললেন, জানো শচীন,—"মহাকবি জয়দেব রচিত এই গানই হচ্ছে আমাদের প্রথম জাতীয় সঙ্গীত।"

বলা বাহুল্য, জয়দেব যাত্রায় ছেলেরাই 'মেয়ে' সেজেছে, কিন্তু তাদের সুন্দর মানালো ও ভাবভঙ্গিতে আতিশয্য আছে, সেটা বিভূতিভূষণ লক্ষ্য করে বললেন, অভিনয়ের সংযমই চরিত্রকে ব্যক্তিত্ব এনে দেয়। মেয়েরা করছে মন্দ নয় কিন্তু চরিত্রের তাল রাখতে পারছে না। এদিক থেকে দেখতে গেলে তোমাদের 'বিজয়া'র তারিফ করতে হয়। তোমারটাই ছিল কঠিন। কিন্তু তুমি

আগাগোড়া ব্যক্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিলে বলেই শেষের দিকে মাধুর্যটুকু সকলের ভালো লেগেছিলো।

আমার দৃষ্টি তখন যাত্রার আসরে কিন্তু ওঁর কথাগুলো আমার বুক থেকে যেন পাষাণের ভার নামিয়ে দিলো। বুঝলাম, আসলে উনি আমার লজ্জাটা ধরতে পেরেছিলেন, তাই সে-বিষয়ে কিছু বলবার জন্যই আমাকে উনি যাত্রার আসরে টেনে এনেছিলেন। আমার বাবাকে নয়। বাকি সময়টুকু যাত্রা আর কী দেখবো? উনি তখন জয়দেব চরিত্রে অবগাহন করছিলেন। বাড়ি ফেরার মুহূর্তেও জয়দেব-সম্বন্ধে কতো কথা! কতো তথ্য! আজও ভুলিনি।

এর পরের বছরও ওঁর যাত্রা-সঙ্গী হয়েছিলাম। এবারের পালা দেখে আমরা চমকে গেলাম। কোথাও কোন আতিশয্য নেই। অনর্থক 'মেলোড্রামা' নেই, তার ওপর অনবদ্য টিম-ওয়ার্ক। পালার নাম ছিল 'কেদার রায়'। 'কেদার রায়' নাটকের শুরু ছিল, কন্যা সোনার প্রতি পিতা চাঁদ রায়ের উক্তি দিয়ে,—মা-মা, আবার কাঁদছিস! কিন্তু এঁরা তা করলেন না। এদের আরম্ভে কোনো সখীর নাচটাচ নেই। আরম্ভ হলো একেবারে বন্দুকের শব্দ দিয়ে। মুকুট রায় বন্দুক হাতে ছুটে এলো বলতে বলতে, কে মারলে! কে মারলে!

'হাম্মি মারিয়াছে',—বলতে বলতে দ্রুতপায়ে প্রবেশ করলো কার্ভালো। নাটক দেখতে দেখতে জমে গেল। প্রত্যেকেই ভালো অভিনয় করছে, কার্ভালো তো বটেই, কিন্তু সবাইকে ছাপিয়ে স্বকীয়তায় যিনি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলেন, তিনি 'কেদার রায়'। বিশেষ করে, নিজের অন্তঃ পুরে পরিজনদের কাছে চূড়ান্ত নাটকীয় মুহূর্তে গলা খাদে নামিয়ে 'তোরা আমার কেউ নস', বলে যখন তিনি প্রস্থান করতেন, তখন তাঁর এই exit ছিল দেখবার মত!

বিভূতিভূষণ দেখতে দেখতে একটি মূল্যবান কথা বললেন,—গতবারেও যাত্রা দেখেছো, এবারও দেখলে তো? কতো তফাৎ! এতো মামুলী যাত্রা নয়, একেবারে থিয়েটার,—অভিনয় সূক্ষ্ম কারুকার্যে ভরা। তার মানে, এইভাবেই এগিয়ে যায় আর্ট। এদের গ্রামে গঞ্জে মাঠে ঘাটে অভিনয় করে বেড়াতে হয়। দর্শক যা চায়, তাই এদের দিতে হয় নইলে চলে না। চাষাভুসোরাও এদের অভিনয় দেখে, বরং দলে তারাই বোধহয় ভারী, আর অভিনয় দেখে শহর গঞ্জের বাবু ও মধ্যবিত্ত সমাজ। সবাইকেই ভালো লাগাতে হবে। আবার যাত্রা দেখতে দেখতে দর্শকদেরও অভিজ্ঞতা বাড়ে। যারা গতবার 'জয়দেব' দেখেছে, নিয়েছেও সে নাটক। আর আজ দেখো? কেদার রায়-এরও তারিফ করছে। ঐ দেখো গাঁয়ের সেই আদিবাসীরা এবারও এসে বসে আছে। একজনও কি উঠে গেছে? ঐ দেখো, মুগ্ধ বিস্ময়ে তারা নাটক দেখছে। তার মানে, ওরাও এঁদের আর্ট ঠিকঠিক নিতে পারছে। ওদের অভিজ্ঞতাই ওদের এই স্তরে উঠিয়ে এনেছে। আমি বললাম, সতিই দেখবার মতো। বিশেষ করে, 'কেদার রায়'—এর ভূমিকা যিনি করলেন, তাঁর অভিনয় আমাকে মুগ্ধ করেছে।

বিভূতিভূষণ বললেন ঠিকই বলেছ। তুমি একটু যাও তো জিজ্ঞেস করে এসো ভদ্রলোকের নাম কি?

আমি উঠে সাজঘরের দরজার কাছে যাত্রাদলের যে এক কর্তা ব্যক্তি দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁকে গিয়ে কেদার রায়ের নাম জিজ্ঞাসা করলাম।

তিনি বললেন, কেন বলুন তো?

বিভূতিভূষণের ওঁর পার্ট খুব ভালো লেগেছে।

উনি বিস্মিত হয়ে বললেন, বিভূতিভূষণ! 'পথের পাঁচালীর' বিভূতিভূষণ! উনি যাত্রা দেখছিলেন!

বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ, ঐ যে চেয়ারে বসে আছেন। এখনো ওঠেন নি।

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে গেলেন, আর 'কেদার রায়'কে নিয়ে ফিরে এলেন। কেদার রায় এসে ওঁকে করজোড়ে অভিবাদন করলেন। 'যদুহাজরা ও শিখিধ্বজ' গল্পের লেখক বিভূতিভূষণ তাঁর সাবলীল এবং সংযত অভিনয়ের প্রশংসা করে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নামটা জানতে পারি কী?

'কেদার রায়' বললেন, আমার নাম—পঞ্চু সেন।"

॥ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাত্রা স্মৃতি ও ভাবনা ॥

"...জমিদার-বাড়িতে জগদ্ধাত্রী-পূজার সমারোহ।

ব্যবসায়ী বাড়িতে রাধাগোবিন্দের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে রামযাত্রায় সমারোহ করলেন।...

...জগদ্ধাত্রী-পূজায় জমিদার-বাড়িতে দুদিন যাত্রা হত। এদিকে ব্যবসায়ীর বাড়িতে রাসে হত মাসখানেক ধরে ভাগবতের কথকতা ও যাত্রা। অনেক বার দুই বাড়িতেই হয়েছে খেমটা নাচ। না হলেই চলত না। পূজা-পার্বণে হত, অন্নপ্রাশন-উপনয়নে হত, এমন কি আমাদের গ্রামের হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার সময় স্কুলের হলে কলকাতার মোটা দক্ষিণার খেমটা নাচ হয়েছিল।

এই ব্যবসায়ী ধনীর বাড়িতে আসত বড় বড় যাত্রার দল। সে কালের নীলকণ্ঠ শ্রীকণ্ঠ সিতিকণ্ঠ তিন ভাই আসতেন, মতি রায়ও আসতেন। অধিকাংশ সময় আসতেন আমাদের জেলার খ্যাতনামা কৃষ্ণযাত্রার অধিকারী যোগীন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর দল নিয়ে। আমাদের গ্রাম তখন জমজমাট গ্রাম। স্বচ্ছল গৃহস্থ বাড়ির যুবকের দল তখন প্রকাণ্ড। ব্যবসায়ীটির কল্যাণে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। কলকাতার নবজীবনের সংস্কৃতির অমৃত কেউ ভৃঙ্গারে করে আনতে না পারলেও, ফ্যাশানের হুইস্কির বোতল কেস-বন্দী হয়ে গ্রামে অনায়াসে পৌঁচেছে। তারই ফলে একবার একটি ঘটনা ঘটেছিল। শ্রীকণ্ঠ ও সিতিকণ্ঠ এসেছেন রাসের বাড়িতে গাওনা করতে। লোকে লোকারণ্য, গান চলছে। কিন্তু গ্রামের কয়েকজন যুবকের গান মনঃপূত হয়নি। তাঁরা আগেই কৃষ্ণযাত্রায় অমত জানিয়েছিলেন। বল-হরি-হরিবোল অর্থাৎ যাত্রাকে গঙ্গাযাত্রা বলে ব্যঙ্গ করে আসর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেই তাঁরা অকস্মাৎ চিৎকার করে উঠলেন—আগুন! আগুন! আগুন!

মাটির ঘরের দেশ, ঘনসন্নিবদ্ধ খড়ের চাল। চিৎকার শুনে মুহূর্তের মধ্যে আসর গেল ভেঙে। আতঙ্কিত গ্রাম্য শ্রোতার দল ছুটল আপন আপন বাড়ির দিকে।

যুবকের দল আবার হরিবোল দিয়ে উঠল—বল-হরি-হরিবোল।

নীলকণ্ঠের সহোদর—শ্রীকণ্ঠ এবং সিতিকণ্ঠ উভয়েই ছিলেন মানী লোক। তাঁরা সমস্ত বুঝলেন। এবং মাথা নিচু করে াসর ভেঙে লাভপুর থেকে বিদায় নিলেন। পরবৎসর উপযাচক হয়ে নীলকণ্ঠ, লোকে বলত 'কণ্ঠ মহাশয়', এলেন তাঁর দল নিয়ে, সঙ্গে তাঁর দুই ভাই। সে-বার তিনি গান করলেন। সে কী গান। আর সে কী জনতা! সে কী স্তব্ধতা! মানুষ হাসল, বুক ভাসিয়ে কাঁদল। কিন্তু এত অসুবিধাতেও কেউ 'আঃ' শব্দ করলে না। লাভপুরের যুবকদের উচ্ছৃঙ্খলতাকে জয় করে নীলকণ্ঠ সে-বার ফিরে গেলেন।"

[বীরভূমের লাভপুরে কথাশিল্পী তারাশঙ্করের জন্ম। জীবনস্মৃতিতে সেই লাভপুরের স্মৃতিচারণ "আমার কালের কথা" থেকে নেওয়া]

॥ আমার দেখা "গান" ॥

শক্তিমান এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক, সাহিত্যিক **অমিতাভ চৌধুরী** 'যাত্রা অর্ঘ্য' '৯৩ পূজা সংখ্যায় লিখেছিলেন "আমার দেখা গান"। তার অংশ বিশেষ ঃ

"ছোট বেলায় আমরা যাত্রাপালাকে 'গান' বলতাম। পালায় কোন গান না থাকলেও তা গান। তার কারণ আছে। প্রত্যেক যাত্রা দলের নাম ছিল অমুক অপেরা পার্টি, তমুক অপেরা পার্টি। অপেরা

মানেই তো গানের পসরা। আমাদের যাত্রা পালার আদিতে ছিল ওই গানেরই কারবার। এই বাংলায় প্রথম যে গানের পালা হয়, তা 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন'। অভিনয়ে ছিলেন তিন মহাপ্রভু—চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত। ওই ধরনের পালা আমরা ছোটবেলায় দেখেছি ও শুনেছি তখন বলা হত 'ঢপ্ কীর্তন'। তারপর বিলিতি অপেরা ও থিয়েটারের অনুকরণে কলকাতা শহরে দাপটের সঙ্গে শুরু হয় পালা অভিনয়। মনমোহন বসু ছিলেন প্রধান পালাকার। পরে সেই অপেরাই ছড়ায় মফঃস্বলে ও গ্রাম দেশে। আজও তা দাপটের সঙ্গে চলছে একটু রকমফের করে।

সেই সময়ে দু'জন পালাকার ছিলেন নাম করা। ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ ও ভোলানাথ কাব্যতীর্থ। ওঁদের লেখা বই কলকাতা থেকে দু'কপি আনিয়ে পূব বাংলায় জোর রিহার্সাল হত। আমরা তখন তাকে বলতাম তালিম। উচ্চ স্বর-গ্রামে কথা বলা, তরোয়াল হাতে যুদ্ধ, মাঝে মাঝে ভাঁড়ামি এবং ছেলেদের মেয়ে সেজে অভিনয় করা ছিল সেকালের যাত্রাগানের বৈশিষ্ট্য। সামাজিক পালাটালা হত ঠিকই, কিন্তু সমাজ সচেতনতা নৈব নৈব চ। মেয়েরা কিন্তু যুদ্ধ করতেন বাঁ হাতে তরোয়াল নিয়ে। ছোট বেলায় শোনা কয়েকটি গান এখনও আমার মনে আছে—'ওরে ও কপালপোড়া বর, কপালে তোর ঘুন ধরেছে, জুটল নারে বাসর ঘর' কিংবা 'শাল বনে ফুল দুলছে দোদুল ; গাগরি ভরনে চল যাই'। ছোট ছেলেরা ঘাঘরা পরে লাইন বেঁধে নাচতে নাচতে গান গাইত। আর গাইত বিবেক। বিবেকানন্দের মত গেরুয়া পাগড়ি বেঁধে ও আলখাল্লা পরে গান গাইতে গাইতে বিবেক সবাইকে তন্ময় করে দিত। থেমে যেত সংলাপ, থেমে যেত যুদ্ধ। আর আমরা শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম।

সেই ছোটবেলায় আমাদের প্রধান আকর্ষণ অবশ্য ছিল যুদ্ধ। যে পালায় যত বেশি যুদ্ধ তত বেশি আকর্যক আমাদের কাছে। যুদ্ধ না থাকলে কোন পালাই জমত না আমাদের কাছে। সেই সময় শুধু ক্ল্যারিওনেট নয় কর্নেটিও বাজত। ওদের বলতাম আমরা বাঁশিওলা। প্রধানত ত্রিপুরার ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চল থেকে ওই সব বাঁশিওলা এবং গানের মাষ্টার—যিনি গানে সুর দিতেন—আসতেন পালা নামার মাস দুই আগে। তাঁরা প্রধানত ছিলেন মুসলমান আমরা বলতুম নাগার্চি। আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের পরিবারও ছিলেন তাই। ওঁরা মুসলমান হলেও কিছু হিন্দু আচার মানতেন। সরস্বতী ও মা কালীর প্রতি শ্রদ্ধা ছিল।

সিলেট কাছাড়ের চা বাগানে ওঁরা [illegible]সার পরই পুজোর আসর জমে উঠত। ওই গান বাজনা সমেত 'তালিম' দেখা আমাদের প্রতি [illegible]র আকর্ষণ ছিল।

তা ছাড়া আমাদের সময়ে তিন চারটি বিখ্যাত যাত্রাদল ছিল। বরিশালের নট্ট কোম্পানি, খুলনার প্রভাত অপেরা, হবিগঞ্জের ঘাটিয়াদল এবং ঘোষাল অপেরা। তাঁরা ওই চা বাগানের যাত্রা ছাড়া বিশাল টাকা নিয়ে শহরে শহরে পালাগান করতেন। আমরা রাত জেগে দেখতাম। দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। রঙচঙ ও ঝলমলে পোশাক ছাড়া চরিত্রদের সকাল বেলা সাধারণ চেহারা দেখে আমরা অবাক বিস্ময়ে তাকাতাম।

কিন্তু হায়রে কবে কেটে গেছে যাত্রাগানের কাল। এখন আর দেখি না। চা বাগান থেকে যখন শান্তিনিকেতনে এলাম তখনও অবশ্য সেই পুরানো যাত্রাগানের আসরে বসতাম প্রত্যেক বছর পৌষ উৎসবের রাত্রে। সংলগ্ন সুরুল-আদিত্যপুর-গুসকরা ইত্যাদি গ্রাম থেকে যাত্রাদল আসত এবং আমরা সেই 'পুরানো ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে' দেখে আনন্দ পেতাম। সেই বিবেকের গান, সেই শাড়িপরা পুরুষদের গ্রীনরুমে বিড়ি খাওয়া, ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয় ইত্যাদি দেখে প্রচুর আনন্দ পেতাম।

কিন্তু আমার একটি প্রশ্ন আছে। আমার মনে হয় এই যাত্রাপালাই গ্রাম দেশে সাম্প্রদায়িকতা বিস্তারের অন্যতম কারণ। অনেক পালাতেই থাকে গরিব হিন্দু বিধবার প্রতি মুসলমান নবাবের

আকর্ষণ, তাকে পাওয়ার জন্যে কত ছল চাতুরি-কত বল প্রয়োগ। বিবেকের সাবধান বাণী সত্ত্বেও নবাব নারী হরণ করবেই কিন্তু শেষ মেষ পারবে না। কারণ ধর্মের জয় হবেই। এই ধরনের বিদ্বেষ প্রচার দর্শদের মনে গাঁথা হয়ে যাবে এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষ দ্রুত ছড়ায়। হালে যে সব সামাজিক নাটক হয় তাতে অবশ্য এই ধরনের কিছু থাকে না, বরং হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির বাণী ছড়ানো হয়ে থাকে। ওটা সুলক্ষণ।"

॥ সাহিত্যিক বিমল করের ছেলেবেলায় যাত্রা দেখার স্মৃতি ॥

"আমি মফঃস্বলের ছেলে। ছেলেবেলায় আমাদের কপালে আনন্দ পাবার মতন উপকরণ বেশি জুটত না। যা যা জুটত তার মধ্যে 'যাত্রা' ছিল বড় একটা উপকরণ। শীতকালে কালী পূজোর পর পরই আমাদের রেল শহরে যাত্রার আসর বসত দিন দু'য়েকের জন্যে। আসর নয় তো, যেন রাজসভা। রেলের বাবুদের কোনো কিছুর অভাব ছিল না, সামিয়ানা, তেরপল, ডে-লাইট্, সতরঞ্চি। ফলে আসরটা হতো জমকালো। এখানে বসে বসে অনেক যাত্রাই দেখেছি। তার মধ্যে দুটি দলের কথা মনে পড়ে, দুটি দলই তখন বিখ্যাত। 'শ্রীচরণ ভাণ্ডারি' আর অন্য দলটি ছিল 'গণেশ অপেরা।' তখন ছিল পৌরাণিক পালার চল—কাজেই যা দেখতাম সবই পুরাণ ঘটিত। আমি দুই বিখ্যাত অভিনেতার অভিনয় দেখেছি। বড় ফণিবাবু, আর ছোট ফণিবাবু। দু' জনেই অসামান্য।

কোলিয়ারিতে যাত্রা দেখেছি। ছেলেবেলায়। তখন যা বয়েস তাতে চমৎকৃত না হয়ে থাকতে পারতাম না। অধিকাংশ পালাই ভাল লাগত।

এরপর আর যাত্রা দেখিনি। একালের যাত্রা সম্পর্কে আমার কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। শুনেছি, সব পালটে গেছে। সময়ে সবই যখন পালটায়—যাত্রাও যে পালটাবে—এ আর নতুন কথা কী!"

॥ প্রখ্যাত ফুটবলার শৈলেন মান্না ॥

"আমার ছেলেবেলা কেটেছে হাওড়ার ব্যাঁটরা গ্রামে। মামারা সবাই খেলাধুলা বিশেষ করে ফুটবলের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। তবে মামাবাড়িতে বছরে একবার নিয়ম করে নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হতো।...গ্রামে তখন প্রায়ই যাত্রা হতো। গ্রামের এদিক-ওদিক যাত্রার আসরের খবর পেলেই আমরা ছুটে যেতাম। খুব ছোটবেলায় 'নদের নিমাই' পালাটি অনেকবার দেখেছি। জগাই-মাধাই আমার মনকে আচ্ছন্ন করে রাখতো। ফুটবলে যখন খুব নাম ডাক তখন ষ্টার থিয়েটারে একটা পৌরাণিক পালা দেখেছিলুম। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের পাশে বসে যাত্রা দেখার স্মৃতি ভুলিনি। মনে পড়ছে, দলের নায়ক দুলাল চট্টোপাধ্যায় অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন।...চলচ্চিত্র, নাটকের মত যাত্রাও একটা জনশিক্ষার মাধ্যম। তাই যাত্রা সব বয়সের মানুষকে কাছে টানে। আমার বিশ্বাস আগামী দিনগুলিতেও যাত্রা জনচেতনার শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে।"

॥ প্রফুল্ল রায় ॥

"আমার ছোটবেলা কেটেছে পূর্ব বাংলায়। আমাদের বাড়ি ছিল ধলেশ্বরী নদীর পাড়ে একটি গ্রামে। টিনের চাল, মাটির বাড়ি। অবশ্য দোতলা। আমরা দু'ভাই ছিলাম ভীষণ দুষ্টু। বড়রা বুঝতে পারতেন না, কখন কি কাণ্ডটি আমরা করে বসবো। তাই দোতলার একটি ঘরে বাইরে থেকে তালা দিয়ে আমাদের রাখা হতো। এতেও কিছু করা যায় নি। জানলার শিকল কেটে ঘরের পাশের সুপুরি গাছ বেয়ে আমরা নিচে নেমে আসতাম। ধলেশ্বরীতে গিয়ে মাছ ধরতাম। না হয় চলে যেতাম যাত্রা দেখতে। একবার আমাদের বাড়ি থেকে মাইল দুই দূরে 'রাবণ-বধ' হচ্ছে। তখন আমার বয়স এগারো-বারো। সেই সময় সারারাত যাত্রা হতো। শেষ হতো একেবারে ভোর বেলা। আমরা একা সূর্য ওঠার আগেই বাড়ি ফিরে আসতাম। বাড়ির লোক যেন টের না পায়। ওঁরা শিকল খুলে দেখতেন আমরা ঠিক আছি।

পূর্ববাংলা তো জলের দেশ। বেশিরভাগ মানুষ-ই আসতেন নৌকা করে। আমাদেরও নৌকা ছিল। একবার ওই 'রাবণ-বধ' পালা দেখতে গেছি। ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছে 'রাম-রাবণে'। আমরা দু'ভাই মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখছি। মনে মনে বলছি, 'এ-যুদ্ধ আরো অনেকক্ষণ চলুক।' যুদ্ধ তো চলছে, এদিকে 'গয়না নৌকা' সাতটার সময় ছেড়ে গেছে। অন্যদিন আমরাও পালাতাম। সেদিন যুদ্ধ থাকায় শেষ পর্যন্ত ছিলাম। বাড়িতে ধরা পড়ে গেলাম। কোনমতেই যাতে পালাতে না পারি, তাই আরো কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হেলো। অন্য ঘরে স্থানান্তরিত হলাম। এবার পালানোর জন্য শুরু হলো অন্য কৌশল। যাত্রা তো দেখতেই হবে।"

॥ শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাত্রা দেখার স্মৃতি ॥

'যাত্রা অর্ঘ্য' পত্রিকার প্রতিনিধি শম্পা মুখার্জীকে শিল্পী রামানন্দ বলেছিলেন—"আমার ছবিতেও যাত্রা বার বার এসেছে।..যাত্রা ভেঙ্গে গেলে অভিনেতা কাঁদতেন, যেন সংসার ভেঙ্গে গেছে। আর এখন দল ভেঙ্গে চলে যাওয়াটাই তো যাত্রার একটা অঙ্গ!" শিল্পী লিখছেন ঃ

"কলকাতার যাত্রা দেখা আর গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে বা গোলদীঘির মাঠে যাত্রা দেখার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। গ্রামে প্রস্তুতি পর্ব অনেক দিন ধরে চলত। ওদের ঘিরে সারা দিন আমরা দাঁড়িয়ে থাকতাম অনেকটা দুর্গা প্রতিমা তৈরি হবার সময় তাকে ঘিরে যে কৌতূহল সেই কৌতূহল, সেই মুগ্ধতা! যাত্রার দিন সকাল সকাল খেয়ে নেওয়া হতো। যদিও সারাদিনের ক্লান্তিতে পুরো যাত্রা দেখা হতো না, ঘুমিয়ে পড়তাম। শেষ রাত্রিতে বাবার কোলে চড়ে ঘবে ফেবা। তবে সেই উন্মাদনা ভুলে যাবার নয়। সে যেন মেলা দেখার আনন্দ।...

তখনকার দিনে ব্যক্তিগত আর্তিটা এত বেশি ছিল না। বিশেষ কোন নামের জন্যে উন্মাদনা নয়। যাত্রা ছিল একটা সামগ্রিক ব্যাপার। যাত্রার 'এরিণার' কুশীলবরাও থিয়েটারের অভিনেতা অভিনেত্রীদের থেকে অনেক বেশি ক্ষমতাবান হতেন। যেমন সাজঘর থেকে রাণী বার হচ্ছেন (ছেলেরাই তখন মেয়েদের চরিত্রে অভিনয় করতেন) তাঁর মুখে হয়তো তখনো বিড়ি রয়েছে, ধোঁয়া বার হচ্ছে। একটু পরেই তিনি স্টেজে ঢুকলেন। সেই ধোঁয়ার রেশ তখনও রয়েছে। এটা কোন বাধা হতো না। সবাই এত বেশি সিরিয়াস ছিলেন যে এ জন্যে কোন হাসির রোল উঠত না।...

তখন হ্যাজাকের আলোয় যাত্রা হতো। আলোর সাহায্যে বিষয়কে ফুটিয়ে তোলার কোন পথ ছিল না। অভিনয় দিয়েই অভিনেতারা সেই উপলব্ধির জগতে আমাদের পৌঁছে দিতেন। আজ প্রযুক্তি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। একজন অর্থের জন্য নায়ক হলেন আর একজন যাত্রার পরিমণ্ডলেই বেড়ে উঠলেন, দুজনের মধ্যে পার্থক্য অনেক।

আমি যখন শান্তিনিকেতনের কলা ভবনের ছাত্র তখন আমরা সবাই দল বেঁধে যাত্রা দেখেছি। আচার্য নন্দলালও দেখতেন। তাঁর ছবিতেও যাত্রা এসেছে। সেই সংস্কৃতিবান লোকেদের মাঝে বসে যাত্রা দেখার আনন্দ আলাদা। তাঁরা রসটাকে গ্রহণ করতেন।

আমাদের সময়ে সামাজিক যাত্রা কম হতো। পৌরাণিক বা ঐতিহাসির যাত্রাই বেশি হতো। আজ স্মৃতিচারণ করতে বসে মনে হচ্ছে "সিরাজদ্দৌলা" পালায় বিবেকের সেই করুণ গান মনকে কিভাবে নাড়া দিয়ে যেত। গান ভাল হলে আবার গাইতে হতো। কোন বিরক্তি ছিল না। সেই আন্তরিকতা আজ কোথায়।

যাত্রার অভিনেতাদের সঙ্গে সকলের সহজ মেলামেশা ছিল। তাঁরা দামী হোটেলে গিয়ে উঠতেন না। যাত্রার পরে তাঁরা বাড়িতে গিয়ে গল্প করতেন। চণ্ডীমণ্ডপে বসে বিড়ি ধরাতেন, সবাই যেন আত্মীয়। তখন যাত্রা ছিল সামাজিক জীবনেরই অঙ্গ, তাই যাত্রার অভিনেতা আমাদের অনাত্মীয় ছিলেন না। কতটুকু পয়সা তাঁরা পেতেন, কিন্তু অভিনয়ের আনন্দের কাছে সব ম্লান হয়ে যেত।

আমার ছবিতেও যাত্রা বার বার এসেছে। 'রাবণ বধ' পালায় 'রাবণ' স্টেজে ঢোকার আগে বিড়ি ধরাচ্ছেন, এই যে চিত্রকল্প, শিল্পীর কাছে তো এর আলাদা মজা আছে।

সেদিন চলে গেছে, বদলে গেছে অনেক কিছু, সেই গ্রামও আর নেই, নেই সেই যাত্রা। তখন একটা যাত্রা ভেঙ্গে গেলে অভিনেতা কাঁদতেন, যেন সংসার ভেঙ্গে গেছে! আর এখন দল ভেঙ্গে চলে যাওয়াটাই তো যাত্রার একটা অঙ্গ।"

॥ প্রসঙ্গ যাত্রা ঃ অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (এম. এ. পি. এইচ. ডি.) ॥

শরৎচন্দ্র অধ্যাপক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সাহিত্য অকাদেমীর কার্যকরী সমিতির সদস্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান। সাহিত্যিক। গবেষক শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাঁর স্মৃতি কথায় [যাত্রা অর্ঘ্য, ১ ফেব্রুয়ারি '৮৮] বলেছেন—"...একটু বড় হয়ে 'গয়াসুর বধ' ও 'ভবতমিলন' যাত্রা দেখেছিলাম। হ্যাজাগ জ্বালিয়ে সন্ধ্যা থেকে শুরু হতো ; চলত রাত ভোর পর্যন্ত। পৌরাণিক কাহিনী। গদ্য সংলাপের চেয়ে নৃত্য-গীত বেশি, এইটুকু মনে আছে। বর্তমান যাত্রা দেখার সময় হয় না। দু' একবার যাত্রার উদ্বোধনে আমাকে ডাকা হয়েছে। রাজনীতি, সামাজিক আন্দোলন ঘটিত কাহিনী.. ঘটনা-কাহিনী অতি কথনের ভারে পীড়িত, চরিত্র অনেক সময়ে বিশ্বাসের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। গায়ে সস্তা সিনেমার প্রভাব পড়ছে। বড় কৃত্রিম মনে হয়।

.সেকালের সঙ্গে এ কালের যাত্রার যথেষ্ট পার্থক্য। ভক্তিভাব ও পৌরাণিকতা বিদায় নিয়েছে। ..অবশ্য যুগ ভেদে বিষয় ও অভিনয়ের কলারূপের পরিবর্তন স্বাভাবিক। যাত্রার সঙ্গে দর্শক-শ্রোতার Identification একটা বড় ব্যাপার। এতে মোটা সুরের আমদানি হলেও লোকচিত্ত তাতেই বেশি সাড়া দেয়। তাই যাত্রা জনচিত্তের সংগে বেশি জড়িত।...সমাজ, রাজনীতি ও অন্যান্য আধুনিক ব্যাপারকে যাত্রায় ব্যবহার করলে লোকশিক্ষা অগ্রসর হবে। এ কথাও মনে রাখতে হবে, প্রচার ধর্ম প্রাধান্য পেলে শিল্পের ক্ষতি। আনন্দই সব শিল্পের শেষ কথা। যাত্রারও শেষ কথা।...কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও যাত্রা নিয়ে গবেষণা শুরু করেছে।"

॥ ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের বাড়িতে যাত্রা হ'ত ॥

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষাবিদ, নাট্যকার প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন—

"কলকাতার নিজস্ব বাড়িতে ছাড়াও বাগবাজারের সুবিখ্যাত ও বনেদী পরিবারের শ্রীযুক্ত পশুপতি বসু মহাশয়ের বাড়িতে বহু যাত্রা দেখেছি। তবে মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাত্রা আজও আমি ভুলতে পারি না। গ্রাম বাংলাতেও আমি বেশ কিছু যাত্রা দেখেছি। ...সেকালে হ্যাজাক বাতির আলোয় যাত্রাপালা হ'ত। তবে দৃষ্টি নন্দন প্যাণ্ডেল না থাকলেও শ্রোতা তথা দর্শকমণ্ডলী ছিল খুব সমঝদার, শান্ত ও ভদ্র। ভিড় উপছে পড়ত যাত্রাপালা দেখার জন্য।...সে সময় পেশাদারী যাত্রা দলের অভাব ছিল প্রচুর।...আমার 'রঙ্গিনী চম্পাবতী' যাত্রা পালায় অভিনয় করেছেন অরুণ দাশগুপ্ত ও বীণা দাশগুপ্তা।...এই শিল্প সহজে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগ স্থাপন করে।...আমি এই ধরনের 'এরিণা থিয়েটার' আমেরিকায় দেখেছি।"

॥ প্রাক্তন মেয়র কমল বসুর ছেলেবেলার যাত্রা-স্মৃতি ॥

'যাত্রা অর্ঘ্য' পাক্ষিক পত্রিকার '৮৮ সালের শারদ সংখ্যায় কমল বসু তাঁর ছেলেবেলার যাত্রা দেখার স্মৃতিচারণ করেছেন।

"...আমার যাত্রা দেখার অভিজ্ঞতা খুব একটা বেশি নেই। যা দু'চারটে দেখেছি তা খুব ছোট-বেলায়। আমাদের উত্তর কলকাতার বাড়িতে ছিল যৌথ পরিবার। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান লেগেই থাকত।...যাত্রা সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুব একটা উঁচু ছিল না। কেননা আমাদের বাড়ি ছিল খুব পিউরিটান। দু' একবার আমাদের বাড়িতে যাত্রা হয়েছিল। আমার তখন ৭। ৮ বছর বয়স।

সম্ভবতঃ ১৯২৪ সালের কথা। আমাদের বাড়ির উঠনে বসেছিল যাত্রার আসর। উৎসাহ নিযে দেখতে বসেছিলুম। কিন্তু লম্বা লম্বা জুড়ি গান আমার ভাল লাগেনি। বরং যুদ্ধের দৃশ্যগুলি আমাকে বেশ এক্সাইটেড করে তুলেছিল।...তখনকার যাত্রা ছিল এক ধরনের আর আধুনিক যাত্রা অন্য ধরনের। কিন্তু ইদানিংকালের যাত্রা আমি দেখিনি।"

* * * * * *

॥ আসন বা ব্লক ॥

অতীতে যাত্রার আসরে রাজা-মহারাজা বা বড় মাপেব চরিত্রের বসার জন্য বা পালার আয়োজন মেটাতে একটা অথবা দুটো পোশাকের বাক্স একটা করে চাদর ঢাকা দিয়ে গোড়া থেকেই রেখে দেওয়া হতো। ষাটের দশকের একেবারে গোড়া থেকে দু'একটি দলের আসরে দু'খানা কাঠের চেয়ার দেখা যেতে লাগল। এটা বিশেষভাবে চালু হতে থাকে, রবীন্দ্রকাননে বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আয়োজিত যাত্রা উৎসব থেকে।

১৯৬৯ সালে "ভাবতী অপেরা"-য পালা নির্দেশক জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায 'সূর্য সেন' পালায় ছোট ছোট চৌক কাঠেব ব্লক বা বাক্স শিল্পীদের ব্যবহারের জন্য প্রবর্তন করেন। এই সালেই তরুণ অপেরায় 'লেনিন' পালায একটু লম্বাটে কাঠের ব্লক বা বাক্স এবং একটি কাঠের গোলাকৃতি বেদি মঞ্চের মাঝখানে রেখে দ্বিতীয় মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করেন অমর ঘোষ, পালার নির্দেশক হিসেবে। একে ইংরেজিতে বলা হয় রোস্ট্রাম (Rostrum)।

॥ প্রবেশ ও প্রস্থান পথ ॥

বহু যুগ ধরে যাত্রায় আসরে প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য দর্শকদের ভিতর দিয়ে সাজঘর পর্যন্ত একটা পথের প্রচলন ছিল। তরুণ অপেরা 'লেনিন' পালা থেকে দুটি পথের প্রবর্তন করে। একটি আসরে প্রবেশ অন্যটি প্রস্থানের পথ।

॥ যাত্রা প্রতিযোগিতা ও সম্মান দান ॥

এ ব্যাপারেও বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের পক্ষে রাসবিহারী সরকার ও দক্ষিণেশ্বর সরকারের অবদান অনস্বীকার্য। এর পর থেকে যাত্রা প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার ও সম্মানদান শুরু হয়।

॥ রঙ্গমঞ্চে যাত্রাপালার উদ্বোধন ॥

আজকাল যে গণেশ অপেরা নামটি সকলের জানা মূলত ঐ নামটির জন্ম বিংশ শতাব্দীর গোড়ায়। ১৯১৫-১৬ সালে গণেশ অপেরার খুব পরিচিতি ছিল। ভোলানাথ নস্কর ছিলেন সেই দলের পালাকার। এই ভোলানাথ নানা দিক থেকে কলকাতার দর্শকদের যাত্রা-মুখী করার চেষ্টা করেছিলেন। প্রথমত তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতেন। তাঁর "পৃথিবী" পালার উদ্বোধন করেছিলেন মনমোহন থিয়েটারে। এই অনুষ্ঠানে ভোলানাথবাবু তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে পালা দেখিয়েছিলেন। ১৯১৭ সালের ১৮ অক্টোবর অমৃতবাজার পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

॥ যাত্রা সেমিনার ॥

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের পক্ষে রাসবিহারী সরকার এবং দক্ষিণেশ্বর সরকার 'যাত্রা'কে সমাজের বিশেষ শ্রদ্ধার আসনে বসাবার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করেছেন। তার মধ্যে 'বিশ্বরূপা' থিয়েটারের সামনে বিশাল মণ্ডপ তৈরি করে সেখানে বাৎসরিক নাট্য সম্মেলনের আয়োজন করতেন। সেই আসরে যাত্রা সেমিনারও হয়েছিল বার কতক। সেই সেমিনারে আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেনে ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ, যাত্রা শিল্পী সংঘের সম্পাদক শিব ভট্টাচার্য,

শুদ্ধসত্ত্ব বসু, ব্রজেন্দ্রকুমার দে। ১৯৬৮ সালের সেমিনারে সভাপতি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। ১৯৬৯ সালের সেমিনারে অভিনয় ও গানের ফলিত উদাহরণসহ ভাষণ দিয়েছিলেন যাত্রা অভিনেতা সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

॥ যাত্রাপালার উদ্বোধন ভাষণ ॥

এরপরই যাত্রার কয়েকটি পেশাদার দল তাদের পালার উদ্বোধনের দিন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দিয়ে উদ্বোধন ভাষণ দেবার ব্যবস্থা করেন। এ ব্যাপারে তরুণ অপেরার ভূমিকা গ্রহণ প্রথম। তারপরই 'সত্যম্বর অপেরা'র স্থান। বিভিন্ন ঠাকুরবাড়িতে, দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে আগে যাত্রা দলের পালার উদ্বোধন হতো। এই ধারার প্রায় শেষ পর্বে এবং পরে বিভিন্ন পেশাদার থিয়েটার মঞ্চে পালা উদ্বোধনের সূচনা পর্বে যাঁরা উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, নাট্যকার ডঃ মন্মথ রায়, ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য, ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, নাট্যকার দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধী প্রধান আরও অনেকে। কয়েক বছর পর পালা উদ্বোধনী ভাষণের বিলুপ্তি ঘটে।

॥ যাত্রাদলের মালিকপক্ষের সঙ্গে সংবাদপত্রের প্রথম সৌজন্যমূলক অধিবেশন ॥

অতীত থেকেই যাত্রার কল্যাণে এদেশের সংবাদপত্রগুলি যাত্রার প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে ব্যাপক সহযোগিতা মূলক ভূমিকা পালন করছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যাত্রার বড় বড় কিছু দলের মালিক কোনি ভাবেই তাঁদের দৃষ্টিকোণকে, মনকে উদার বা প্রশস্ত করতে পারছিলেন না। সার্বিক কল্যাণ নয়, ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধি বড় কথা, এটাই একমাত্র সত্য বলে জেনেছিলেন, এবং অশিক্ষা ও অন্ধকারাচ্ছন্ন মনকে কিছুতেই উদ্ধার করতে পারছিলেন না বলে, কোথায় যেন একমুখী হয়ে যাচ্ছিলেন। সমস্ত দৈনিক সংবাদপত্র এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকার সঙ্গে সমানভাবে মিশলে, সংবাদ ও প্রচারের ব্যাপারটা যে বিন্দুতে বিন্দুতে সিন্ধু হয়ে উঠতে পারে, সেই শিক্ষার আলোয় নিয়ে যাবার চেষ্টা করেও তাঁদের আনা সম্ভব হচ্ছিল না, পরিশেষে সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার জন্য একটি প্রথম সৌজন্যমূলক অধিবেশন ডাকা হয়েছিল। সেই অধিবেশনে বিশিষ্ট মালিকদের সঙ্গে সরাসরি মন্ত্রণাসভায় মিলিত হয়েছিলেন, অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ, অমৃতবাজার পত্রিকার নাট্য ও সিনেমা সম্পাদক এন.কে.জি (নির্মলকুমার ঘোষ), যুগান্তর পত্রিকার নাট্য ও সিনেমা সম্পাদক মহেন্দ্র সরকার, আবির পত্রিকার সম্পাদক এবং তৎকালীন বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'উল্টোরথ'-এর সাংবাদিক ও বিশেষ প্রতিনিধি, এই গ্রন্থের রচয়িতা আমি, অর্থাৎ গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ, দৈনিক বসুমতী পত্রিকার অসীম ঘোষ আরও অনেকে। এর ফলশ্রুতি, ১৯৬৭ সাল থেকে আনন্দবাজার ও দৈনিক বসুমতী যাত্রা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে এবং মাঝে মাঝে তার পুনরাবৃত্তি ঘটে।

॥ প্রথম যাত্রা বিষয়ক পত্রিকা ॥

প্রকৃত পক্ষে, আমি গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ ১৯৬১ সালে তৎকালীন জনপ্রিয়তম মাসিক 'উল্টোরথ' পত্রিকায় চাকরি করার মধ্যে নিয়মিত প্রকাশ করি থিয়েটারের মুখপত্র "মঞ্চজগৎ"। এর একাধিক সংখ্যায় 'যাত্রার সংবাদ' বিশেষভাবে প্রকাশিত হতো বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ যাত্রার পত্রিকা ছিল না। ১৯৬৫ সালে সেই অভাব পূর্ণ করতে পালাকার শম্ভু বাগ বর্ধমান থেকে প্রকাশ করতেন "যাত্রা জগৎ"। পত্রিকাটি দিল্লীর ডিক্লারেশন প্রাপ্ত ছিল না। পত্রিকাটি বেশি দিন বাঁচিয়ে রাখতে পারেননি শম্ভু বাগ।

সম্ভবত ১৯৬৬ সালে চিৎপুরের প্রখ্যাত নাটক প্রকাশক নির্মল শীল প্রকাশ করতে থাকেন সম্পূর্ণ যাত্রার কাগজ 'নাট্যলোক'।

॥ প্রথম ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকাশিত, দিল্লীর ডিক্লারেশন, পোস্টাল রেজিস্ট্রেশান নাম্বার প্রাপ্ত যাত্রার মুখপত্র ॥

গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত, সম্পাদিত, আকারে সান্ধ্য "আজকালের" মত "যাত্রা অর্ঘ্য"। ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য অর্থনৈতিক বিপন্ন দশার জন্য, যাত্রা জগতের অধিকাংশ যাত্রা মালিকদের অসহযোগিতার জন্য, যাত্রা জগতের সঙ্গে জড়িত প্রায় সকলের একটি শিল্পের ক্ষেত্রে একটি মুখপত্রের গুরুত্ব কতখানি এই জ্ঞান না থাকার জন্য, প্রায় সকলের অসহযোগিতা, নেপথ্য ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতায় মাঝে মাঝে এই আইনসিদ্ধ পত্রিকাটির প্রকাশনা স্থগিত রাখা হতো। তবুও "যাত্রা অর্ঘ্য" একাধিক পূজা সংখ্যা, বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করার একমাত্র গৌরব বহন করছে। পত্রিকাটি ২৪ পরগণার বিভিন্ন জেলায় জনপ্রিয়তা পায়। যাত্রার কর্মী ইউনিয়নের প্রথম রক্তদান শিবিরের ওপরে এবং যুবকেন্দ্রে আয়োজিত ২ দিনের 'যাত্রা সম্মেলন' উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যা, কলকাতার পণ্ডিত সমাজে সমাদৃত হয়। যাত্রা সম্মেলনের অন্যতম শরিক, শিল্পীদের সংগঠন 'যাত্রা প্রহরী'র সম্পাদিকা বীণা দাশগুপ্ত 'সম্মেলন সংখ্যা' প্রকাশের জন্য পত্রিকা সম্পাদকের আবেদনে ২০০০ টাকা অনুদান দেন। সংখ্যাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বামপন্থী নেতা লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের অহেতুক তীব্র ক্ষোভ এবং যুক্তিহীন প্রতিবাদে, যাত্রার নানা সমস্যা মুক্তির আশ্বাসদানকারী লক্ষ্মণবাবুর নেতৃত্বকে আঁকড়ে ধরার মোহে যাত্রা জগতের সহজ-সরল-নানা সমস্যায় দীর্ঘকাল জর্জরিত, যাত্রার ব্যাপারে চরম ব্যস্ত থাকা পালাকার, শিল্পী, কর্মীদের মধ্যে অনেকেই লক্ষ্মণবাবুরই নির্দেশে 'যাত্রা অর্ঘ্য' পত্রিকার কণ্ঠরোধ করেন। চিৎপুরে বর্ধিষ্ণু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রাসাদ অভ্যন্তরে 'যাত্রা সম্মেলনের' আয়োজক ৩টি সংগঠনের (পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলন, কলিকাতা যাত্রাকর্মী ইউনিয়ন, যাত্রাপ্রহরী) ডাকা এক সভায় সকলের সামনে, প্রকাশ্যে ঐ বামপন্থী নেতা 'যাত্রা অর্ঘ্য' পত্রিকার কর্ণধার, সম্পাদক এবং দীর্ঘ ৩০ বছরের যাত্রা সাংবাদিক, যাত্রাপ্রেমী গৌরাঙ্গপ্রসাদকে তিরস্কার করেন এবং 'যাত্রাঅর্ঘ্য' 'সম্মেলন সংখ্যাটি' যাতে পরের দিন থেকে যুবকেন্দ্রে ২ দিনের যে বিরাট সম্মেলন হতে চলেছে সেখানে প্রবেশ করতে না পাবে, বিক্রি না হয়, সে ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ দেন। প্রসঙ্গ ক্রমে জানানো দরকার, যাত্রা শিল্প, যাত্রা জগত, যাত্রার সঙ্গে জড়িত কোন কিছুরই সঙ্গে কোনদিন পরিচিত ছিলেন না, এই নেতা ভদ্রলোক। এই ঘটনার মাস কয়েক আগে, বরানগর নিবাসী এই নেতার প্রতিবেসী দিকপাল পালাকার ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের এবং সেই সূত্রে বীণা দাশগুপ্ত ও যাত্রা জগতের সঙ্গে লক্ষ্মণবাবুর পরিচয় ঘটে। বরানগর পৌরসভার ১২৫ তম বর্ষে আয়োজিত যাত্রা উৎসবে (১৯৯৪) যাত্রা জগতের উপরোক্ত কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে লক্ষ্মণবাবুর ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। সেই সূত্রে ভৈরববাবুরা তাঁর কাছে যাত্রার নানা সমস্যার কথা বলেন, এবং সমস্যা মুক্তি ও যাত্রার সার্বিক কল্যাণের ব্যাপারে সব রকম সাহায্য ও সহযোগিতা চান। সেই থেকে লক্ষ্মণবাবুর যাত্রাপাড়ায় আবির্ভাব। সেই সূত্রে রবীন্দ্রকাননস্থিত রামকৃষ্ণ মন্দিরের একটি সভাগৃহে লক্ষ্মণবাবুকে নিয়ে যাত্রাজগতের কল্যাণকামী মানুষেরা ২য় সভা করেন। উক্ত সভায় যাত্রার স্বনামধন্যরা, যাত্রার পুরাতন সাংবাদিক ও সুখ-দুঃখের ৩০ বছরের সাথী, 'আজকাল' দৈনিকের যাত্রা লেখক আমার সঙ্গে লক্ষ্মণবাবুর পরিচয় করিয়ে দেন।

পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রাজগতের পক্ষ থেকে গৌরাঙ্গবাবুকে যাত্রা শিল্পের সামগ্রিক চেহারা ও সমস্যা বর্ণনা করার অধিকার দেওয়া হয়। সকলের জেনে রাখা দরকার, ইতিপূর্বে যাত্রাজগতের পারমিশন নীতি থেকে সাধারণ কর্মীদের, একজন মেক-আপ ম্যান থেকে প্রায় সমস্ত শিল্পীর কথা ১৫ বছর ধরে এত লিখেছিলাম যা অন্য কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি। যার নিদর্শন শুধু 'দৈনিক

আজকাল', 'সান্ধ্য আজকাল' নয়, আরও একাধিক পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় আছে। সেই হেন আমি যাত্রার পক্ষে দীর্ঘ তথ্যবহুল ভাষণ দেবার পর থেকে উপলব্ধি করেছিলাম, শ্রীভট্টাচার্যের রাজনৈতিক মানসিকতার শিকার হয়ে পড়েছি। পরে আরও কয়েকটি বৈঠকে লক্ষ্মণবাবুর বাহ্যিক ব্যবহারে যাত্রা মাতৃকার অন্যতম পুরোহিত নিধন যজ্ঞের ইংগিত ছিল না। প্রসন্ন ঠাকুরের প্রাসাদে লক্ষ্মণবাবু অত্যন্ত রাজনৈতিক দক্ষতার চালে সেই পুরোহিত হত্যা করলেন। উক্ত বিশেষ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রধান সংবাদের মধ্যে লেখা হয়েছিল—"...সিটু শ্রমিক নেতা লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের সহযোগিতায়, মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর অঘোষিত প্রেরণায় যাত্রার ৩টি সংগঠন থেকে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে...বৃহত্তম রাজ্য সম্মেলন—"। এই প্রতিবেদনের হেড লাইন ছিল—**"পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা পরিষদের ২ দিনের রাজ্য সম্মেলন, যাত্রা জগতের ঐতিহাসিক অভিযান।"** এই প্রসঙ্গে আর একটি তথ্য ঃ আসন্ন ২ দিনের সম্মেলন উপলক্ষে মৌলালী যুবকেন্দ্রে অনুষ্ঠান মঞ্চের নাম "ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ মঞ্চ" রাখার আবেদন জানিয়েছিলাম আমি এই ঘটনার বেশ ক'টা দিন আগে, ১৭ জুলাই ১৯৯৪, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী প্রাঙ্গণে কর্মী ইউনিয়নের রক্তদান শিবির মঞ্চে (মাইক ধরে ; স্পষ্টভাবে)। যা হোক, ৩ আগষ্ট '৯৪ 'যাত্রা অর্ঘ্য' 'সম্মেলন সংখ্যা' প্রকাশিত হওয়া মাত্র লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য উক্ত "অঘোষিত প্রেরণায়" বাক্যের বিরোধিতা করেন। রাজ্যের একজন বড় মাপের মন্ত্রী, রাজ্যের একটা বৃহৎ মাপের শিল্পের সংস্কারে নামছেন কিন্তু প্রকাশ্যে কোন সভায় (এমন কি উক্ত রক্তদান শিবির সভাতেও), রাইটার্সে সাংবাদিকদের কাছে সেই পরিকল্পনার কথা সোচ্চারে বলেননি, সল্টলেক স্টেডিয়ামে একদিন যাত্রা জগতের জন কতক ব্যক্তির সঙ্গে লক্ষ্মণবাবুর সহযোগিতায় সুভাষবাবু এই সমস্যার কথা জেনে বলেছিলেন তিনি পাশে আছেন, ওঁদের কোন আন্দোলন সংগঠিত হলে সহযোগিতা করবেন। এটা ছিল এক ঘরোয়া আলোচনা। তারপর রবীন্দ্রকাননের সভাগৃহে ছিল যাত্রা জগতের ডাকা সভা, সেখানে সুভাষবাবু উপস্থিত থাকেন নি। সে ক্ষেত্রে "অঘোষিত প্রেরণা" কথাটি লেখার জন্য লক্ষ্মণবাবু ক্ষোভে ফেটে পড়েন। সম্পাদকের কোন যুক্তি, কোন অনুরোধ, তিনি কর্ণপাত না করে, কোন রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পাদক নিধন যজ্ঞের উদ্বোধন করলেন। ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়, বীণা দাশগুপ্ত, দিলীপ দাস থেকে যাত্রার সভায় উপস্থিত সকলে সেই মুহূর্তে "কুল রাখি না শ্যাম রাখি" দোটানায় পড়ে, যাত্রার পুরোহিত নিধন যজ্ঞের নীরব সাক্ষী হলেন। একজন গৌরাঙ্গপ্রসাদের মত যাত্রা সাংবাদিককে হারালে যাত্রার কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু এই মুহূর্তে একজন লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের মত নেতার হাত ধরে বৈতরণী পার হতে পারলে যাত্রার সার্বিক কল্যাণ অবধারিত, সেই ভাবনা থেকে "যাত্রাঅর্ঘ্য"-র মত যাত্রা জগতের একমাত্র মুখপত্রের (যে মুখপত্র গ্রাম-গঞ্জেও জনপ্রিয় হয়েছিল, যে মুখপত্র যাত্রা শিল্পের একমাত্র দলিল হতে পারত, যে মুখপত্র, যাত্রা করানো লভ্যাংশের টাকায় কী ভাবে রুরাল ডেভেলপমেণ্ট হচ্ছে নিয়মিত প্রকাশ করে আসছিল, যে মুখপত্র যাত্রার যাবতীয় সমস্যা মুক্তির জন্য বার বার মুখর হতো, যে মুখপত্র যাত্রার কর্মীদের কথা বলত, যে মুখপত্র সম্পূর্ণ একক শ্রম, একক আর্থিক ঝুঁকি নিয়ে "যাত্রামায়ের" একটা লজ্জার দিক (বৃহত্তম শিল্পে কোন মুখপত্র না থাকা, লজ্জা) দীর্ঘকাল ধরে পাগলের মত ঢেকে রাখতে গিয়ে ব্যক্তিগত সর্বনাশ রচনা করছিল, যে মুখপত্রে বহু যাত্রা মালিক বিজ্ঞাপন দিয়ে পরবর্তী সময়ে তার টাকা দিতেন না অথচ একটি আদর্শকে বাঁচাতে গৌরাঙ্গপ্রসাদ রসাতলে গিয়েছিলেন, যে মুখপত্র যাত্রা সম্রাজ্ঞী জ্যোৎস্না দত্তের আত্মস্মৃতি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছিল (বলা বাহুল্য, এ জগতে স্বয়ং জ্যোৎস্না দত্তকেই বা কে প্রকৃত শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, মূল্যায়ন করে!) সেই 'মুখপত্র' নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। যাত্রার এক সৎ-পবিত্র এবং পাগল প্রেমিকের নিধন যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দিয়েও কিন্তু উক্ত নেতা ভদ্রলোক যাত্রা জগতে শ্রদ্ধার আসন পাকা করতে পারেননি। তাই এই ইতিহাসের পাতায় উক্ত ঘটনার

বিবরণ অমর করে রাখার মধ্যে একটি প্রবাদেরই পুনরাবৃত্তি হলো—"ছলনার দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয় না—"।

॥ যাত্রা জগত থেকে পত্র-পত্রিকার ভূমিকা প্রায় নিশ্চিহ্ন ॥

যুগ যুগ ধরে এ দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার কর্ণধার, সম্পাদক, পণ্ডিতবর্গ, বিদ্বজন, গবেষক, প্রাবন্ধিকেরা 'যাত্রা' প্রসঙ্গে বার বার কলম ধরেছেন। যাত্রার মূল্যায়ন করেছেন, যাত্রার ক্রমবিবর্তনের সার্বিক পর্যালোচনা করেছেন, যাত্রা যাঁদের জীবন, যাত্রার জন্য যাঁরা গোটা জীবনটা উৎসর্গ করেছেন তাঁদের কথা লিখেছেন, পঞ্চাশের দশকের সমাপ্তি কাল থেকে সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়কাল পর্যন্ত যাত্রার মর্যাদা বৃদ্ধির কামনায় যেখানে সমস্ত পত্র-পত্রিকা এক যোগে সোচ্চার হয়েছিল, নব্বই দশকের সূচনা থেকে সেই মানসিকতার অবসান ঘটেছে। একে একে যাত্রা জগত প্রসঙ্গে প্রায় সমস্ত পত্র-পত্রিকা ধীরে ধীরে নীরব হতে শুরু করেছে। একটি বৃহত্তম শিল্পের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের নীরবতা যে কতটা মর্মান্তিক, একটি শিল্প ক্ষেত্রের সর্বস্তরের অগ্রগতির যে কতটা অন্তরায়, যাত্রা জগতের এই অগ্রগতির কালে একজনও তা ভাবছেন না, বা অনুধাবন করছেন না। এর ফলে যাত্রা শিল্প যথার্থ মর্যাদার আসনে আজও বসতে পেরেছে কিনা সে বিষয়ে ভাববার অবকাশ আছে। যদি তা সম্ভব না হয়ে থাকে, ব্যক্তি স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে যাত্রা শিল্পে প্রতিষ্ঠিত সকলের সংঘবদ্ধভাবে তার কারণ সন্ধানে ব্রতী হওয়া বাঞ্ছনীয়। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে, অন্ধকারে ঢাকা পড়ে থাকা যাত্রা সংস্কৃতির অবয়ব থেকে অন্ধকারের চাদর সরিয়ে দিয়ে আলোয় আনার জন্য যে পত্র-পত্রিকার অবদান অস্বীকার করা যাবে না, ষাটের দশকের একটু আগে থেকে সত্তরের দশকের শেষ পর্ব পর্যন্ত তার তালিকা ঃ

রূপমঞ্চ, উল্টোরথ, সিনেমা জগৎ, আবীর, মঞ্চজগৎ, যাত্রা জগৎ, নাট্যলোক, নবকল্লোল, নবরূপা, কীর্তিবাস, পরিচয়, সমকালীন, আসর পত্রিকা, তুলি পত্রিকা, চুমকী, দীপান্বিতা, অমৃত সাপ্তাহিক, প্রসাদ, দর্পণ, নতুন খবর, স্বাধীনতা, যুগান্তর, আনন্দবাজার, দৈনিক বসুমতী, কালান্তর, বিমল কর সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকা শিলাদিত্য, আজকাল, অভিনয়, গণশক্তি, দেশ, আনন্দলোক, ভূমিলক্ষ্মী, প্রতিদিন, স্টেটস্‌ম্যান, সিনে এডভান্স, অমৃতবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, আনন্দ, পালাগান, যাত্রাগান পরিবর্তন, শনিবারের চিঠি, যাত্রাঅর্ঘ্য আরও বহু পত্র-পত্রিকা।

❑ ১৯৫৯ সালে স্বনামধন্য প্রসাদ সিংহের আন্তরিক নির্দেশে "উল্টোরথ"-এর মত তৎকালীন একমাত্র জনপ্রিয় মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল "যাত্রা রানী"দের কথা। সেই"যাত্রা রানী"দের আসল পুরুষ চেহারার পাশে মেক-আপ নেওয়া রানীর ছবি প্রকাশিত হয়েছিল। ছবি তুলেছিলেন অলোক মিত্র।

❑ "পাক্ষিক আবির" প্রথম "যাত্রা বিশেষ সংখ্যা" বা "বিশেষ ক্রোড়পত্র" প্রকাশ করে। এতে স্বনামধন্য শিল্পী, মালিক ও যাত্রাদলের জীবনী প্রকাশিত হয়।

❑ "আনন্দবাজার" যাত্রার ওপরে বারকতক বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে।

❑ "যুগান্তর পূজা সংখ্যা"য় যাত্রাকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়।

❑ বিমল কর সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকা শিলাদিত্যে যাত্রাভিনেত্রী বীণা দাশগুপ্তর প্রথম রঙিন ছবি প্রকাশিত হয়।

❑ 'প্রসাদ' প্রণব বসু সম্পাদিত এই জনপ্রিয়তম মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত যাত্রা বিভাগ ছিল, "প্রসাদ যাত্রা অভিনেতা সংখ্যা", "প্রসাদ যাত্রা অভিনেত্রী সংখ্যা" প্রকাশ করে প্রথম আলোড়ন সৃষ্টি করে। ঐ ধরনের প্রভূত অর্থ ব্যয় করে অদ্যাবধি আর কোন পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি।

❑ হীরেন বসু সম্পাদিত তৎকালীন বিখ্যাত 'দর্পণ' সাপ্তাহিক, যাত্রার একটি বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেছিল। উৎপল দত্ত থেকে বহু বিদ্বজন লিখেছিলেন যাত্রা নিয়ে।

❑ আসর পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে।

❑ 'যাত্রা জগৎ' ব্রজেন দে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে।

❑ 'ভূমিলক্ষ্মী', আনন্দবাজার গোষ্ঠীর নিজস্ব পত্রিকা ছিল। বিশেষ 'রথযাত্রা' সংখ্যায় কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রীর ওপরে বিশেষ নিবন্ধ ও 'যাত্রার ওপরে' প্রবোধবন্ধু অধিকারীর একটি বড় প্রবন্ধ প্রকাশ করে।

❑ 'আজকাল' দৈনিকের প্রথম সংখ্যায় যাত্রা অভিনেত্রী বর্ণালী ব্যানার্জীর ছবি প্রকাশিত হয়। নিয়মিত যাত্রা বিভাগ অদ্যাবধি প্রকাশিত হচ্ছে। এই একটি মাত্র দৈনিক যেখানে যাত্রার সমস্ত সমস্যার কথা ফলাও করে বারবার লেখা হয়েছে। যাত্রার সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে প্রাক্তন তথ্যমন্ত্রী কান্তি বিশ্বাসেব ছবি সহ সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল।

❑ 'আজকাল সান্ধ্য' যাত্রার নানা সমস্যার সঙ্গে যাত্রার অতীত ইতিহাসের পাতা বারবার প্রকাশ করেছে।

❑ 'তুলি' ঃ যাত্রা শিল্পের জন্য 'তুলি'র ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। যাত্রা শিল্পের কল্যাণে 'তুলি' পুরস্কারের ভূমিকা স্মরণযোগ্য।

❑ 'আনন্দ', 'যাত্রাগান', 'পালাগান' ইত্যাদি প্রবোধবন্ধু অধিকারীর নেপথ্য মদত পুষ্ট কিছু পত্রিকা, মূলত যাত্রা থেকে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের একটা চেষ্টাই করেছিল বলে যাত্রা জগতের অভিমত। কোনটাই ২। ৩ সংখ্যার বেশি প্রকাশিত হয়নি। অথচ পূর্ণ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল আশাতীত।

যাত্রার ওপরে প্রথম গবেষণা পত্র রচনা করেন গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। যাত্রা জগতের নানা ঘটনা ও রসালো স্মৃতিমূলক বই "চিৎপুর চরিত্র" প্রবোধবন্ধু অধিকারীব কীর্তি।

বর্তমানে ব্যবসার স্বার্থে যাত্রা জগত প্রধানত আনন্দবাজার মুখী। কযেকটি দৈনিক যাত্রার খবর পরিবেশন করে মাত্র।

॥ দূরদর্শনের পর্দায় প্রথম যাত্রা প্রদর্শন ॥

১৯৬৮ সালে দিল্লী কালী বাড়িতে কিষাণ দাশগুপ্তের "নাট্য ভারতী'র" "রাজকুমার" যাত্রার অনুষ্ঠান হয়। ঐ সময়ে সাংবাদিক ও উক্ত যাত্রাদলের মালিক কিষাণবাবুর প্রচেষ্টায় দিল্লী দূরদর্শনে, উক্ত পালার অংশ বিশেষ প্রথম দেখানো হয়।

॥ যাত্রা উৎসবের প্রসার ॥

শোভাবাজার রাজবাড়ি, রবীন্দ্রকাননে যাত্রা উৎসবের পর পঃ বঃ সরকারের যাত্রা উৎসব যখন যাত্রার প্রসারে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল, তারপরই নানা দিকে যাত্রা উৎসব শুরু হতে থাকে। বিশ্বরূপা, কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ, মহাজাতি সদনে "যাত্রাশিল্পী সংঘ" যাত্রা উৎসব করে। "পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলন" রবীন্দ্রকাননে একাধিক বৃহত্তম উৎসব পালন করেছে।

১৯৬৯ সালে রবীন্দ্রসদন উৎসব উপসমিতি ১৬ দিনের যাত্রা উৎসব করে। ১৯৯৬ সালে পঃ বঃ সরকারের সঙ্গে যাত্রার ৩টি সংগঠন মিলিতভাবে যাত্রা উৎসব করে দীর্ঘ কয়েক বছর পর।

॥ যাত্রা পাঠাগার ॥

১৯৬৯ সালে সত্যম্বর অপেরার কর্ণধার শৈলেন মহান্ত 'যাত্রা লাইব্রেরী' স্থাপনের উদ্যোগ নেন। যাত্রা জগতের অসহযোগিতায় পাঠাগার অচিরেই বন্ধ হয়ে যায়। অদ্যাবধি সেই চেষ্টা আর হয়নি।

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং যাত্রা ॥

কংগ্রেস আমলের পঃ বঃ সরকার যাত্রার সার্বিক কল্যাণের জন্য বেশ কিছু পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ ঘটায়, তার মধ্যে স্মরণীয় পরিকল্পনার সার্থকরূপ, যাত্রার সার্বিক কল্যাণে প্রমোদকর

মুক্তি। শুধু তাই নয়, গ্রাম-গঞ্জের যে ক্লাব-গোষ্ঠী বা ব্যক্তি যাত্রাদল বায়না করে নিয়ে গিয়ে শো করান, তাঁরা যাতে প্রশাসনিক দপ্তর থেকে অনুমতি লাভে বিন্দুমাত্র বেগ না পান, তার জন্য স্থানীয় থানা এবং বড় জোর, সঙ্গে জেলা আধিকারিকের অনুমতি নিলেই যাত্রা করানো যাবে এই স্থায়ী আদেশ জারী করেছিলেন। এরই ফলশ্রুতি, যাত্রার মালিকরা পালার বায়নার হার বৃদ্ধি করলেন। তৎকালীন সংস্কৃতি মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় চেয়েছিলেন, প্রমোদকর মুক্ত করলে, যাত্রার মত এক বৃহত্তম প্রমোদ উপকরণে নাম মাত্র অর্থে গ্রামীণ লোকেরা চিত্তবিনোদনের চরম সুযোগ পাবেন। কিন্তু কার্যত হলো তার বিপরীত। প্রমোদকর মুক্তির সুবর্ণ সুযোগ নেন মালিকপক্ষ। এঁরা দলের দাম বৃদ্ধি করলেন। তারপর যুগ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা যত বেশি আধুনিক হলো, যত বেশি চমক প্রয়োগ করা হলো, তত বেশি দলের রেট বৃদ্ধি পেল। গ্রামীণ কৃষিজীবি, শ্রমিক শ্রেণীর সাধারণ মানুষের যাত্রা দেখার যে চিরন্তন ভালবাসা, যাত্রার প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা, সেই দুর্বলতাকে কাজে লাগালেন নায়েক পক্ষ। তাঁরা টিকিটের মূল্যবৃদ্ধি করতে থাকলেন উত্তরোত্তর। সাধারণ-অতি সাধারণ মানুষের বুকের রক্ত ঝরানো, শ্রমের টাকা ছিনিয়ে এসে শহর কলকাতার মালিকপক্ষ, শীর্ষস্থানীয় শিল্পীরা বিলাসে-বৈভবে-অর্থে-সম্পদে হলেন অধিষ্ঠিত! বসলেন স্বর্ণসিংহাসনে!

পঃ বঃ সরকার প্রদত্ত, অশোকস্তম্ভ মার্কা পুরস্কার যা সুব্রতবাবুর আমলে প্রবর্তিত হয়েছিল তা যাঁরা পেলেন—তার ছবি তুলে, সেই ছবি বৃহত্তম সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন হিসেবে ব্যবহার করে, গ্রামীণ মানুষের কাছে সরকারি পুরস্কার যে কত মহৎ ব্যাপার সেটা বুঝিয়ে, দলের রেট বাড়ালেন। যে পালাকার, শিল্পীরা এই পুরস্কার পেলেন, তিনি শ্রেষ্ঠ শিল্পী বা পালাকার এটা প্রমাণ করার সুযোগে পারিশ্রমিক ও অন্যান্য দাবী ষোল আনা আদায় করতে থাকলেন। এই পুরস্কারের পবিত্রতা বিনষ্ট হতে থাকল।

এই পুরস্কার প্রাপ্তির লোভ অনেক প্রতিষ্ঠিত শিল্পী-মালিকের, কারণ 'অমুক পুরস্কার' প্রাপ্ত, এই ঘোষণায় গ্রামীণ মানুষকে সহজে আকৃষ্ট করা যায়। এই সত্য যখন স্পষ্ট হয়ে উঠল, ঠিক তখনই যাত্রা জগতে অনুপ্রবেশ ঘটল একাধিক পুরস্কার প্রদান প্রতিষ্ঠানের। গোপন স্বার্থের বিনিময়ে, আনুষ্ঠানিকভাবে এই পুরস্কার প্রদান ও গ্রহণ একটা ব্যবসায়িক জাল বিস্তার করল! নব্বই দশকের সূচনা থেকে এই ব্যবসা অনেকটা শিথিল হতে থাকে। শিল্পী-মালিকরাও এ ব্যাপারে অনেকটা সচেতন হলেন!

॥ বামফ্রন্ট সরকারের যাত্রা ভাবনা ॥

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বামফ্রন্ট সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রচারিত একটি প্রেস নোট এখানে দেওয়া যাক ঃ

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর
২৭.৩.৮৪ তারিখের সাংবাদিক বৈঠকের
প্রেস নোট

॥ দীনবন্ধু স্মারক পুরস্কার ॥

বাংলা নাটকের গৌরবময় জয়যাত্রা প্রায় দেড়শো বছরের ঐতিহ্যবাহী। সমাজ-সংস্কার, জাতীয় মুক্তি থেকে সমাজ ক্রান্তির মহাব্রতে এই শিল্প মাধ্যম জাতির সেবায় নিয়োজিত। বাংলা নাটকের সুনাম সারা বিশ্বে। কিন্তু স্বাধীনতার পরেও বাংলা নাটকের জগৎ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা সামান্যই লাভ করেছে। বামফ্রন্ট সরকার বাংলা নাটকের উন্নয়নের জন্য বেশ কয়েকটি প্রকল্প রূপায়ণ করে চলেছে। সারাজীবন ধরে নাটকের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সৃজন ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, এমন ব্যক্তিত্ব বহু রয়েছেন আমাদের মধ্যে। শিল্প-সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে পুরস্কারের দ্বারা উৎসাহিত করার নজির সরকার ইতিপূর্বে রেখেছেন। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে যাঁরা দশকের পর

দশক যুগান্তকারী অবদান রেখেছেন, নাট্য জগতকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের পুরস্কৃত করে স্বীকৃতিদানের ব্যবস্থা এতদিন সরকারের তরফে ছিল না। এইবার সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, বাংলা নাটকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ দীনবন্ধু মিত্রের নামাঙ্কিত দশ হাজার টাকা মূল্যের একটি পুরস্কার দেওয়া হবে। নাট্য রচনা, পরিচালনা, অভিনয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে অর্থাৎ নাট্য জগতের যে কোন অংশে যাঁর দুই দশকের বেশি সময় ব্যাপী উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে তিনিই এই পুরস্কারের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

১৯৮৩ সালের জন্য সরকার নির্দ্দিষ্ট নির্বাচক মণ্ডলী প্রবীণতম নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়কে দীনবন্ধু পুরস্কার প্রাপক রূপে নির্বাচিত করেছেন। শ্রীরায়ের এই স্বীকৃতিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গর্বিত।...

এই প্রেস নোটে, ১৯৮৩ সালের নাট্য পুরস্কার প্রাপকদের নামের তালিকা দেওয়া হয়েছিল। নাট্যকর্ম ও সমালোচনায় নিয়োজিত ৮০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত কমিটির মতামতের ভিত্তিতে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছিল।

যাত্রার ব্যাপারেও এই বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই কার্যকরী হয়েছিল। ১৯৮৩ সালের যাত্রা পালার ভিত্তিতে এই পুরস্কার।

যাত্রা পুরস্কার প্রাপকদের তালিকা

১।	বিশিষ্ট যাত্রা প্রযোজনা	ঃ শের আফগান—ভারতী অপেরা
২।	বিশিষ্ট পরিচালক	ঃ শ্যামল ঘোষ—তিতাস একটি নদীর নাম (সুশীল নাট্য কোম্পানি)
৩।	বিশিষ্ট পালাকার	ঃ ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়—গান্ধারী জননী
৪।	বিশিষ্ট অভিনেতা	ঃ পূর্ণেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় (তিতাস একটি নদীর নাম)
৫।	বিশিষ্ট অভিনেত্রী	ঃ জ্যোৎস্না দত্ত (শাহাজাদী জাহানারা)
৬।	বিশিষ্ট সুরকার	ঃ প্রশান্ত ভট্টাচার্য (ছোট) বিশ্বত্রাস হিটলার

এই পুরস্কার আজও দেওয়া হয়। কিন্তু ইতিহাসের সত্য রক্ষার্থে যে কথা বলা দরকার তা হলো, বামফ্রণ্ট সরকারের যাত্রা শিল্পের প্রতি, এই প্রাচীনতম লোক সংস্কৃতির প্রতি, যাত্রার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পী-কর্মীদের প্রতি কোন উদারনীতি বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়নি। পঃ বঃ সরকার প্রবর্তিত যাত্রা উৎসব বামফ্রণ্ট সরকার স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, প্রথম এক বছর উৎসব পালনের পর। যাত্রার পারমিশন নীতি অর্থাৎ যাত্রা করাবার আগে সরকারি প্রশাসনিক দপ্তর থেকে যে অনুমতি নিতে হয়, সেই নীতির পুনর্বিন্যাস করা হয়। বর্তমানে নায়েক পক্ষকে প্রায় সাত-আটটি দপ্তর থেকে অনুমতি সংগ্রহ করতে হয়।

সরকারের এই পারমিশন নীতির জন্য যাত্রা ব্যবসা বিপন্ন হয়ে পড়ায়, পারমিশন নীতিকে শিথিল করার জন্য এ দেশের সংবাদপত্রগুলি বার বার সোচ্চার হয়েছে শুধু না, যাত্রা জগত থেকে দফায় দফায় মালিক-শিল্পীরা ১৯৯৩ সাল থেকে মহাকরণে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছে। শিল্পীদের সংগঠন "যাত্রা প্রহরী"-র পক্ষ থেকে সম্পাদিকা বীণা দাশগুপ্ত স্বয়ং মাননীয় মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর সহযোগিতায় তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলোচনা করেছেন মহাকরণে গিয়ে। পরিশেষে অনুপকুমারের নেতৃত্বে বিষয়টি একটি আন্দোলন সূচক চেহারা নিয়েছে। যাত্রা জগতের সার্বিক কল্যাণ সাধিত হতে পারে তেমনি কিছু পরিকল্পনা নিয়ে, যাত্রার ৩টি শক্তিশালী সংগঠন থেকে প্রতিনিধি নিয়ে একটি কমিটি তৈরি হয়েছে, যে কমিটির সঙ্গে নানাভাবে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর আলোচনা করে, পারমিশন নীতিকে শ্লথ করা শুধু না, বাগবাজার গিরীশ মঞ্চের প্রায় গা লাগোয়া জমিতে যাতে স্থায়ী "যাত্রামঞ্চ" তৈরি হয়, সেই স্থায়ী "যাত্রামঞ্চ"কে কেন্দ্র করে যাত্রার

আরও কিছু কল্যাণকর পরিকল্পনার রূপায়ণ যাতে ঘটে সে ব্যাপারে শোনা যাচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত তৎপর হয়েছেন। পারমিশন নীতি শিথিলের ব্যাপারে গত ২৯ ফেব্রুয়ারি '৯৬ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে সম্পাদক প্রধানের সাক্ষর যুক্ত একটি MEMORANDUM (NO. 1826-1CA) ৮, ৯, ৯৪-এর 7627-1CA-এর বিধিবদ্ধ নীতির পরিবর্তে প্রকাশ করা হয়। এই মর্মে এর প্রতিলিপিও পাঠানো হয়েছে বিভিন্ন জেলা সভাধিপতির কাছে।

এই গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হবে, তখন হয়তো যাত্রা জগতের বর্তমান কয়েকজন মানুষকে সঙ্গে নিয়ে অনুপকুমার প্রমুখের সংগ্রামের স্বর্ণমণ্ডিত ইতিহাসের পৃষ্ঠা হবে রঞ্জিত, যাত্রার সার্বিক কল্যাণের পুরোধা হিসেবে চিহ্নিত হবেন মহামান্য মন্ত্রী থেকে অনেক মাননীয় আমলা। বর্তমান সংস্কৃতি-চেতনার চন্দন মৃত্তিকায় চাপা পড়ে যাবে অনেক মানুষের সংগ্রামী অবয়ব, বিস্মৃত হয়ে যাবে অনেক নাম। তবু পূর্বসূরিদের স্মৃতি নিয়ে থাকবে এই ইতিবৃত্ত সেটাই সান্ত্বনা!

। বাংলা সাহিত্যের চলচ্চিত্রে যাত্রা প্রসঙ্গ ঃ

এ যাবৎ বাংলা সাহিত্যের রত্ন-ভাণ্ডার থেকে তুলে আনা বহু রত্ন-সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়িত রূপ আমরা দেখেছি, দেখছি।

কিন্তু অদ্যাবধি কোন বাংলা কাহিনী চিত্রের মধ্যে 'যাত্রা' কেন, কোন দৃষ্টিকোণ থেকে, কোন প্রসঙ্গে বার বার প্রতিফলিত হয়েছে তার খবর রাখেন কে? মনে হয় তেমন দর্শক একজনও পাওয়া যাবে না। তবে সিনেমার মধ্যে যাত্রা দৃশ্য বা যাত্রা প্রসঙ্গ দেখে অনুচ্চারিত আহ্লাদ হয়েছে অনেকেরই। যাত্রা যাঁদের নয়নের মণি, তাঁরা চলমান ছবির মধ্যে যাত্রা দৃশ্য দেখে বা যাত্রা প্রসঙ্গে বক্তব্য শুনে সকলেই অনুচ্চারিত পুলকে মেতেছেন।

সবাক চিত্রের সূচনা থেকে এ যাবৎ বিখ্যাত কথাকারদের যত কাহিনীর চিত্ররূপ হয়েছে তার কোনটির মধ্যে যাত্রা প্রসঙ্গ আছে তার তালিকা নিখুঁত ভাবে পেশ করা সম্ভব নয়। তবুও যতটুকু সম্ভব হলো তা শুধু 'যাত্রা'র মর্যাদার স্বার্থে। এই কাজ সম্পূর্ণ করবেন আগামী দিনের কোন মানুষ এই প্রত্যাশা থাকল।

● **অভিনয় নয়**।। কাহিনী ও নির্দেশনা ঃ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।। কালী ফিল্মস্ লিঃ-এর ছবি। এই ছবিতে যাত্রা প্রসঙ্গ গুরুত্ব পেয়েছে।

কাহিনীর সূচনাতে আছে—"বিনোদের ভারি দুঃখ, সে নাকি থিয়েটারের নাটক লিখতে পারে না। অথচ যাত্রার দলে তার লেখা নাটক কত চলেছে। দেবতাদের জীবন নিয়ে "গীতাভিনয়" রচনা আর তার ভাল লাগে না......"

● **অতিথি** ।। কাহিনী ঃ রবীন্দ্রনাথ। পরিচালনা, সংগীত, চিত্রনাট্য ঃ তপন সিংহ। নিউ থিয়েটার্স (এক্জিবিটার্স) প্রাঃ লিঃ।

"......বাড়ি পালিয়ে তারাপদ হাজির হয়েছে যাত্রার দলে। সেখানেও একই দশা। দলের সবাই যেই অযাচিত স্নেহে ভরিয়ে দিতে চেয়েছে, আর থাকেনি সে সেখানকার ত্রিসীমানায়......"

● **আপনজন**।। কাহিনী ঃ ইন্দ্র মিত্র।। পরিচালনা ঃ তপন সিংহ।। কে. এল. কাপুর প্রোডাকসন্স।।

"অজ পাড়াগাঁয়ে বুড়ী আনন্দময়ীর জীবনে কেউ নেই। বিয়ে হয়েছিল দশ বারো বছর বয়সে। স্বামী জমিদারের নায়েব বংশের বংশধর, কাজেই অর্থ উপার্জনের দিকে তার কোন আগ্রহই ছিল না। সে ভালবাসতো গান-বাজনা, যাত্রা, থিয়েটার......"

● **আকাশ প্রদীপ**।। কাহিনী, পরিচালনা ঃ কনক মুখার্জী।।......"মহাভারত অপেরার

অধিকারী তাঁর দলের নতুন নাটকের জন্য কেষ্ট খুঁজতে পথে নেমেছেন। নন্দ পকেট মারতে গিয়ে তাঁর হাতে ধরা পড়েছে। ননীবাবু তাকে থানায় নিয়ে যাননি, নিয়ে গেছেন তার অফিস ঘরে...যাত্রার অ্যাক্টর ক'রে তুলতে চেয়েছেন......"

● **কুহক**।। কাহিনী ও সংলাপ ঃ সমরেশ বসু। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা অগ্রদূত। "......তারই কুহকে লুব্ধ হয়ে উঠেছে দুই শ্বাপদ। সুনন্দ আর যাত্রা দলের গোকুল। তার পূর্ব জীবনের কুগ্রহ।..."

● **কেদার রাজা**।। কাহিনী ঃ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রনাট্য ঃ তপন সিংহ। পরিচালনা ঃ বলাই সেন।

"রাজ বংশের ছেলে। লোকে বলে রাজাবাবু। কিন্তু রাজা নয়। উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে কেবল বিশাল রাজপ্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ আর প্রতিদিনের বিপুল দারিদ্র্য। সংসারে প্রাণী বলতে দু'টি। বাবা আর মেয়ে। মেয়ে শরৎ বাল্য বিধবা।...মেয়েকে অভয় দিয়ে হাতে তুলে নেন বেহালা, যা তাঁর নিত্য সঙ্গী। বেহালার সুর আর গ্রামের কৃষ্ণ যাত্রার দলে গান—এই নিয়ে কেদারের জীবন আবেগে-আনন্দে ভরপুর।......"

● **জন্মতিথি**।। কাহিনী ঃ প্রশান্ত আর জয়ন্ত চৌধুরী। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ দিলীপ মুখোপাধ্যায়। "...পথ চলতে চলতে ঘটনাচক্রে পল্টু আর ভ্যাবলা এসে পড়ল এক যাত্রা দলের অধিকারীর কাছে। কানাই-বলাইয়ের ভূমিকায় অভিনয় করে ওরা সেখানকার জমিদার পত্নী কর্তৃক পুরস্কৃত হয়।......"

● **নবজন্ম**।। কাহিনী ঃ আশাপূর্ণা দেবী। পরিচালনা ঃ দেবকীকুমার বসু। ডিল্যুক্সের ছবি।

"...শ্যালকের সংসারে ঘর জামাই গৌরাঙ্গ খায়-দায় গান গায়। আনন্দ নিজে পায় অপরকে বিলোয়। বাসন্তীই শুধু চিনেছে তাকে ; এই শিশু ভোলানাথকে!...ছেলেকে নিয়ে পালাগান করে ফিরেছে গৌরাঙ্গ। হাতে করে নিয়ে এসেছে দু'গাছি মালা। তার একটি পরিয়ে দেয় বাসন্তীর গলায়......"

● **নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে**।। কাহিনী। অবধূত।। চিত্রনাট্য-পরিচালনা ঃ নির্মল দে। "......বিলোনিয়ার প্রহ্লাদ বোস—সকলে ডাকে তাকে পরাশর বলে। পরাশরের চরিত্রে অভিনয়ের পর থেকে এই নামটি অর্জন করেছে প্রহ্লাদ। বৌ আর মেয়েকে গ্রামে রেখে প্রহ্লাদ কলকাতায় এসেছিল উপার্জনের আশায়।...ব্যর্থ হয়ে ফেরে যাত্রা ও থিয়েটারের দরজায় দরজায়।..."

● **নবীন যাত্রা**।। কাহিনী ঃ মনোজ বসু। পরিচালনা, সম্পাদনা ঃ সুবোধ মিত্র। নিউ থিয়েটার্সের ছবি। "......ছেলে হারিয়ে ইন্দ্রাণী দেবী গ্রামে এলেন। গ্রামের মালিক তাঁরা।...ইন্দ্রাণী পাঠশালা আবার জাঁকিয়ে তুলবেন। সমারোহে সরস্বতী পুজো হচ্ছে। যাত্রার দল এসেছে এই উপলক্ষে। অমূল্য ঐ দলে গোপিনী সাজে।...অনেক দুঃখে ছুটি পেয়ে অবশেষে আসরে এসেছে। গান গেয়ে আজ খুশি করবে ইন্দ্রাণীকে। খুশি করে তার কাছে টাকা চাইবে। টাকা পেলে সে নতুন যাত্রার দল খুলবে...উল্টো বিপত্তি। ইন্দ্রাণী ক্ষেপে গিয়ে গান বন্ধ করে দিলেন। অধিকারীও সাজ ঘরে মারমুখি হয়ে পড়ল। অমূল্যকে ইন্দ্রাণী থাকতে দেবেন না এ দলে...ইস্কুলে পড়াবেন তাকে...কলকাতায় নিয়ে যাবেন..."

● **নন্দিনী** ।। গল্প, চিত্রনাট্য, পরিচালনা ঃ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। কে. বি. পিকচার্সের প্রথম ছবি।

"......যোগীন একটু অদ্ভুত প্রকৃতির। অত্যন্ত খামখেয়ালি, এক জেদী, সরল এবং গান বাজনা পাগল। দিনরাত সে বেহালা বাজায়, সখের যাত্রায় কখনো কখনো পার্টও করে......"

● **পুতুল নাচের ইতিকথা**।। কাহিনী ঃ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিচালনা ঃ অসিত

বন্দ্যোপাধ্যায়। "...বাংলা দেশের ছোট্ট একটি গ্রামের মানুষদের কথা বলছি। গ্রামের নাম গাওদিয়া। সেখানে গাছপালা আছে, খাল আছে। সারিবদ্ধ তাল গাছের প্রহরায় ঘেরা তালপুকুর আছে...গোপ সমাজের হারু ঘোষ, তার ছেলে পরাণ, বৌ মোক্ষদা, ছেলের বৌ কুসুম আর মেয়ে মতি আছে...এখানেই জমিদার-বাড়িতে যাত্রার দলের সঙ্গে আসে যাযাবর কুমুদ...গ্রামের যাত্রার দলের সঙ্গে কুমুদ এল।...গ্রাম্য মেয়ে মতি—সরল মতি, সুন্দরী। যাত্রা দেখতে গিয়ে সে প্রবীর বেশি কুমুদকে দেখে মুগ্ধ হলো। কুমুদ যেন রূপকথার মানুষ। পরদিন তালপুকুরের ধারে, হারানো মাকড়ি খোঁজার সময় এই রূপকথার মানুষটিকেই আবার দেখতে পেল মতি। দেখা থেকে আলাপ, তারপরে আরো আলাপ।...তারপরে একদিন আবার যাত্রার দলের সঙ্গে নিরুদ্দিষ্ট হল কুমুদ. ...."

● **বন্ধন**।। প্রশান্ত চৌধুরীর "ডাকো নতুন নামে" অবলম্বনে। চিত্রনাট্য-পরিচালনা ঃ অর্ধেন্দু মুখার্জী। ". .যাত্রার দলের রাখালকে দেখে ভক্ত কবি শ্রীনিবাস ভেবেছিলেন, এ বুঝি বৃন্দাবনের রাখাল বাজাব মর্ত্যরূপ। তাই স্নেহের বাঁধনে বেঁধেছিলেন তাকে। বিয়ে দিয়েছিলেন নিজের মাতৃহারা একমাত্র কন্যা ললিতার সঙ্গে। কিন্তু বাইরের চেহারা যেমনই হোক, রাখালের অন্তর ছিল নরক।"

● **বনপলাশির পদাবলী**।। কাহিনী, রমাপদ চৌধুরী। চিত্রনাট্য-পরিচালনা প্রধান অভিনেতা ঃ উত্তমকুমার। শিল্পী সংসদের ছবি।

"......গিরিজার বাল্যবন্ধু বংশীর ছেলে উদাস বড় হয়েছে—চাষবাসে তার মন ওঠে না—বড় হবার স্বপ্ন দেখে,—যাত্রা গানে ওর খুব নাম......"

● **মঞ্জরী অপেরা**।। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।। পরিচালনা ঃ অগ্রদূত। "...থিয়েটারে মঞ্জরীর খ্যাতি ক্রমশ বাড়তে থাকে। এমন একদিন থিয়েটারে দেখা হয়ে গেল, পত্নী-অপমানিত, সংসার ত্যাগী, মুক্ত মানুষ গোরাবাবুর সঙ্গে। মঞ্জরী নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল গোরাবাবুকে নিজের বাড়িতে। গোবার মনে হলো তাঁর রিক্ত হৃদয়কে ভরিয়ে দিতে পারবে মঞ্জরী। গোরা-মঞ্জরীর সার্থক ভালবাসার উপন্যাস এই "মঞ্জরী অপেরা"। স্মরণীয় করে রাখল তারা এই নামে যাত্রা দল খুলে।...রূপকার, বাজনদার, সাজকর এমনি কত শিল্পী আর কলাকুশলীদের নিয়ে এই যাত্রা দলের বিচিত্র জীবন।...এরা রাতে রাজা দিনে ফকির......"

● **চারণ কবি মুকুন্দ দাস**।। কাহিনী, চিত্রনাট্য, পরিচালনা ঃ নির্মল চৌধুরী।। চণ্ডীমাতা ফিল্মস পরিবেশিত। "...বরিশালের ব্রজমোহন স্কুলের ছাত্র যজ্ঞেশ্বর দে। পড়াশুনায় মন নেই, গানের দিকেই মন।...১৯৩৪ সাল। কলিকাতা কোম্পানীর বাগানে বসেছে মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাত্রার বিরাট আসর, হয়েছে বিরাট জন সমাবেশ। চারণ কবি গাইছেন" সাবধান সাবধান সাবধান আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড রুদ্র দীপ্ত মূর্তিমান.." অকস্মাৎ ছন্দ পতন ঘটে। সুর থেমে যায়। আসরের মাঝে লুটিয়ে পড়েন মুকুন্দ দাস। জীবন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে।...

● **শুক-সারী**।। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "হারানো সুর" অবলম্বনে। পরিচালনা ঃ সুশীল মজুমদার। বি. কে. প্রোডাকস্‌ন। "গান আর বাঁশি, বাঁশি আর গান। এই নিয়েই দিবারাত্তির মত্ত ছিল সে।..."

● **শবরী**।। কাহিনী, চিত্রনাট্য, পরিচালনা ঃ অশোককুমার দাস। "...আপন ভোলা গান পাগল গোবিন্দ যাত্রা দলে গান গেয়ে গেয়ে ঘুরে বেড়াতেই ভালবাসে..."

● **শহর থেকে দূরে**।। রচনা, পরিচালনা ঃ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। "...গ্রাম খানি ছোট। লোক সংখ্যাও কম।...সন্ধ্যে বেলা সরকারী বারোয়ারীতলায় সখের যাত্রার রিহার্সাল চলে..."

● **সন্ধি**।। কাহিনী ঃ শৈলজানন্দ।। চিত্রনাট্য ঃ দেবকী বসু।। পরিচালনা ঃ অপূর্ব মিত্র।

"...সুরেশ হাইকোর্টের উকিল, তার বাপ হয়ে দীননাথের যাত্রা-গান করা কি চলে? ছেলে জানায় সে কথা, অনুরোধও করে। বুড়ো বয়সে এখন ছেলের রোজগার খাওয়াই তো ভাল। দীননাথ রাজী হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারে না তা বজায় রাখতে। অধিকারী রসিক দাস নাছোড়বান্দা-দীননাথকে না হলে তার উপার্জন এক রকম বন্ধ।..."

● **সৎভাই**।। কাহিনী ও পরিচালনা : তারু মুখার্জী। "..রমেশ লেখাপড়া করে না। তার ভয়নক যাত্রা করার সখ। সে অনবরত যাত্রার মহড়া দেয়."

* এ ছাড়া আরও বহু চলচ্চিত্রায়িত কাহিনীতে যাত্রা প্রসঙ্গ এসেছে। বিশেষ করে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদেব বহু কাহিনীতে যাত্রা স্থান পেয়েছে সসম্মানে। বিশ্ববন্দিত সত্যজিৎ রায় তাঁর "পথের পাঁচালী"তে বিভূতিভূষণ অঙ্কিত "যাত্রা দৃশ্য" চলচ্চিত্রায়িত কবেছেন।

যুগে যুগে অভিযুক্ত পালা

মতিলাল ঘোষেব পালা **"মাতৃ পূজা"**। পালাটি ভূষণচন্দ্র দাসের দলে অভিনীত হয়।

কুঞ্জবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়ের **"মাতৃ পূজা"**। ১৯০৮ সালে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সরকার বাজেযাপ্ত করে।

□ মুকুন্দ দাসেব **"পথ"** ও **"সাথী"** এবং **"মাতৃ পূজা"** ইংবেজ সবকার বাজেয়াপ্ত করে। মুকুন্দ দাসকে জেলে পাঠানো হয়।

□ হবিপদ চট্টোপাধ্যায়ের **"রণজিতের জীবন যজ্ঞ"**, ইংরেজ সবকাব বাজেয়াপ্ত করে।

□ কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের **"রাণা প্রতাপ"** ১৯১০ সালে বাজেয়াপ্ত হয়।

□ ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর **"জরাসন্ধ"**, সংলাপ ও সংগীতে স্বাদেশিকতা প্রকাশ পাওয়ায় পালাটি ইংরেজ কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়, পরে সংশোধনের শর্তে ছেড়ে দেওয়া হয়।

* * * * * *

॥ যাত্রা শুরু ॥

'যাত্রা' শব্দটির মধ্যেই আছে না-থামার ইংগিত। এই প্রবহমানতাকে আপন অস্তিত্বের সঙ্গে গ্রামজীবন যতটা মিশিয়ে নিতে পেরেছে, শহর-জীবন কাছাকাছি এসেও ততটাই উদাসীনতার ভাণ করেছে। কিন্তু শতাব্দী পেরিয়ে যে স্রোত স্বতঃ উৎসারিত তার যে নিজস্ব একটা গতি আছে, শক্তি আছে তাকে অস্বীকার কবা চলে না। তা যদি না হোত, এতকাল পরেও তা টিকে থাকত না।

'গ্রাম্য সাহিত্য' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যেমনটি বলেছেন, ". জনপদে যেমন চাষবাস এবং খেয়া চলিতেছে—সেখানে কামারের ঘরে লাঙলের ফলা, ছুতাবের ঘরে ঢেঁকি এবং স্বর্ণকারের ঘরে টাকা দামের মোটরি নির্মাণ হইতেছে—তেমনি সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ভিতরে একটা সাহিত্যের গঠনকার্য্যও চলিতেছে ; তাহার বিশ্রাম নাই। প্রতিদিন যাহা বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড ভাবে সম্পন্ন হইতেছে সাহিত্য তাহাকে ঐক্যসূত্রে গাঁথিয়া নিত্যকালের জন্য প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছে।..."

পরিবর্তনের প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। যেমনটি কবি বলেছেন,—"কেবল সম্প্রতি অতি অল্পদিন হইল 'আধুনিক কাল' দূরদেশাগত নবীন জামাতার মতো নূতন চাল-চলন লইয়া পল্লীর অন্তঃপুরেও প্রবেশ করিয়াছে। গ্রামের মধ্যেও পরিবর্তনের হাত পড়িয়াছে।..."

'যাত্রা'র রূপবদলকে এর বাইরে ফেলা চলে না। তবে এই 'সজীব' শিল্প তার ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়েই, গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমেই নিজের স্থান নিজেই করে নিয়েছে, ভবিষ্যতেও নেবে।

এখানেই তাই এ গ্রন্থের শেষ বলা যায় না। একে সূত্রপাত বলা যেতে পারে। ভবিষ্যত দায়ভার রইল তথ্যানুসন্ধানীদের হাতে।